বাংলার
কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান

পঞ্চম খন্ড

সম্পাদনা

ভানুদেব দত্ত

মনীষা



Banglar Communist Aandolaner Itihas Anusandhan
Edited by : *Bhanudeb Dutta*

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৯
প্রচ্ছদ : গৌতম আচার্য

সত্য ভট্টাচার্য কর্তৃক মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
৪/৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ থেকে প্রকাশিত

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ৯—৭০

সহায়কতথ্য : শহিদনামা ১৫ □ SAVE BENGAL ৩২ □ গণনাট্য সংঘের গানের সংকলন ৪৬ □ IN EASTERN PAKISTAN "LIKE REVOLUTIONARY ARCHITECTS BUILD A NEW SOCIETY FREE OF IMPERIALISM" ৬৪

□ প্রথম অধ্যায়

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির পুণর্বিন্যাস এবং চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন ৭১—২৬০

সহায়কতথ্য : Communist Party of French India's Stand on Setting up a new Executive Council for French India ৮৭ □ কোচবিহারের প্রাথমিক পর্যায়ের পার্টি সম্পর্কে দু'টি বক্তব্য ৮৮ □ চতুর্থ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন—রাজনৈতিক রিপোর্ট ৯০ □ প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে দাঙ্গার বিরুদ্ধে কমরেড পিসি যোশীর ভাষণের অংশবিশেষ ১৫১ □ স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাংলা ১৫৩ □ স্পেশাল পাওয়ার্স বিল ১৬৬ □ স্পেশাল পাওয়ার্স বিলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ১৬৯ □ বিশেষ ক্ষমতা ১৭০ □ সংশোধিত নিরাপত্তা বিলের প্রতিবাদ ১৭৩ □ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জ্যোতি বসুর ভাষণ ১৭৪ □ বীরভূম পল্লী নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসকে সমর্থন প্রসঙ্গে ভবানী সেন ১৮৯ □ আসল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ১৯০ □ ON THE PRESENT POLICY AND TASKS OF THE COMMUNIST PARTY OF INDIA ২০১ □ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ২২৭ □ ভারতে মার্শাল প্ল্যান? ২৩২ □ সাম্প্রদায়িক আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজী নিহত ২৫৭ □ গান্ধীজীর মৃত্যুতে কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি ২৫৮ □ বিধানসভায় গান্ধীজী স্মরণে জ্যোতি বসু ২৫৯

❑ দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ২৬১—৪১৯

সহায়কতথ্য : সিপিআই-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে উত্থাপিত রাজনৈতিক থিসিস ২৭১ ❑ বিদেশে ভারতের বন্ধুদের দৃষ্টিতে দেশের "স্বাধীনতা" ৩১৪ ❑ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র ৩১৫ ❑ অন্ধ্র থিসিসের সারসংক্ষেপ ৩২৭ ❑ ON PEOPLE'S DEMOCRACY ৩২৮ ❑ বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশলের লেনিনবাদী ব্যাখ্যা ৩৪১ ❑ বুর্জোয়া গণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র ৩৫৩ ❑ Home Department Political Notification ৩৮৬ ❑ কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি ৩৮৭ ❑ The Calcutta Gazette ৩৯০ ❑ কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা ২৯৮ ❑ জওহরলাল নেহরুকে না জানিয়েই বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি করা হয়েছিল ৪০০ ❑ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির বিবৃতি ৪০১ ❑ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সমিতির সভাপতির বিবৃতি ৪০৩ ❑ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির তদন্তকারী প্রতিনিধিগণের বিবৃতি ৪০৬ ❑ পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী সম্পর্কে ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতির বিবৃতি ৪০৯ ❑ ছাত্র ফেডারেশনের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির বক্তব্য ৪১১ ❑ নিরাপত্তা আইন— কি ও কেন? ৪১২

❑ তৃতীয় অধ্যায়

পার্টির বেআইনি পর্বে পত্র-পত্রিকা এবং কৃষক-মহিলা-ছাত্র আন্দোলন ৪২০—৬২৬

সহায়কতথ্য : আমাদের এজেন্সি-প্রাপ্ত বই ৪৩৩ ❑ গোপন সংগঠনের কায়দা ৪৩৪ ❑ ১৯৪৮-৪৯ এর তেভাগা এবং অন্যান্য কৃষক আন্দোলনের শহিদ ৪৪৩ ❑ বাংলার শিশু তেলেঙ্গানা লালগঞ্জ ৪৪৪ ❑ অবিস্মরণীয় তেভাগা সংগ্রাম ও দিনাজপুর ৪৮৩ ❑ মেদিনীপুরে তেভাগা সংগ্রাম ৪৯১ ❑ ময়মনসিংহে তেভাগা আন্দোলনের এক অধ্যায় ৫৯৫ ❑ জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে শ্রমিক-কৃষকের রক্তের রাখীবন্ধন ৫০০ ❑ যশোরের মুক্ত অঞ্চল ৫০৩ ❑ মৌভোগ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি ৫০৬ ❑ তে-ভাগার লড়াইয়ে ৫১৩ ❑ এই জানুয়ারী মাসেই রিলিফের জন্য টাকা তুলুন ৫২৩ ❑ কৃষি-মজুরের সংগ্রামে নেমে পড়ুন ৫২৭ ❑ কৃষি-সংকট ও কৃষকের লড়াই ৫৩৪ ❑ ক্ষেতমজুরের সংগ্রাম ও সংগঠন ৫৪৩ ❑ কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে (মেদিনীপুর) ৫৮৭ ❑ মা বোনদের হত্যার প্রতিশোধ লও! শ্রমিক হত্যার জবাব দাও! ৬১২ ❑ শোচনীয় ঘটনা ৬১৪ ❑ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মা-বোনদের প্রতি এশিয়ার নারী সম্মেলনের আবেদন ৬১৭ ❑ মায়েদের প্রতি ম্যাকসিম গোর্কীর আবেদন ৬২৫

❑ চতুর্থ অধ্যায়

শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ ও বিভ্রান্তি ৬২৭—৮৪৫

সহায়ক তথ্য : কমিউনিস্ট বুলেটিন ৬৪৩ ☐ ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘটকে সফল করিয়া তুলুন ৬৫৯ ☐ রেল ধর্মঘট প্রসঙ্গে পার্টির প্রাদেশিক কমিটির মন্তব্য ৬৬২ ☐ কলিকাতা কর্পোরেশনের ধর্ম্মঘট হইতে কি শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে? ৬৬৩ ☐ পশ্চিমবাংলায় মুসলিম বিতাড়নে কার স্বার্থ— কার গোপন হস্ত কাজ করছে? ৬৭০ ☐ দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচন সম্পর্কে ৬৭৪ ☐ দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচন পর্যালোচনায় কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণ ৬৭৬ ☐ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ প্রচারিত ৬৭৭ ☐ পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত ৭০০ ☐ সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই! ৭১১ ☐ কলিকাতা জেলা কমিটির আত্মসমালোচনামূলক বিবৃতিতে কয়েকটি আন্দোলনের পর্যালোচনা ৭৪০ ☐ প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনের আয়োজন ৭৯৩ ☐ সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির কার্যালয়ে পুলিশের হানা এবং আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলনের উপর আক্রমণ ৭৯৭ ☐ বিশ্বশান্তির সংগ্রাম ৭৯৮ ☐ সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের আহ্বান ৮০১ ☐ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্র ৮০৪ ☐ সাহিত্য ও গণসংগ্রাম ৮০৮ ☐ FIGHT AGAINST BOURGEOIS NATIONALISM ON CULTURAL FRONT ৮১১ ☐ একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী ৮৩৬

❑ **ব্যক্তিনাম নির্দেশিকা** ৮৪৬—৮৫৭

❑ **কৃতজ্ঞতা স্বীকার** ৮৫৮

মুখবন্ধ

অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের পর্বটি ৪টি খণ্ডে সমাপ্ত হবার পর, পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হল। স্বাভাবিকভাবে এই খণ্ডটি হল এপার বাংলার অর্থাৎ 'পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান' বিষয়ক। ভারতের পরাধীনতার অবসানের পর এক নতুন অধ্যায় শুরু হল, শুরু হল স্বাধীন ভারতের যাত্রা।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও, কমিউনিস্টদের কাছে প্রধান ছিল সামাজিক মুক্তি ও জাতীয় মুক্তির ধারণা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে ঘটলো, মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির আংশিক বাস্তবায়ন। বাকি অংশের কাজটা হল সামাজিক মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামই তৈরি করবে সমাজতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে জাতীয় মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথকে। এটাই হল মার্ক্সবাদের ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বান্দ্বিকতায় পরিস্থিতি বদলের ফলে কর্তব্যকর্মের বদল বা ভিন্নরূপ।

কমিউনিস্টরা মনে করে স্বাধীনতার অর্থ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও। লেনিন আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, 'আসলে, দ্বিতীয়টাই হল প্রধান কথা।'[১] এটাকে বলা যেতে পারে স্বাধীনতা আন্দোলনের বা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব। ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলন সমাজতন্ত্র অর্জন পর্যন্ত এক সুদীর্ঘকালের ধারাবাহিক আন্দোলন। অর্থাৎ কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিষয় দু'টিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অবিভাজ্য ধারা বলে গণ্য করে থাকেন।

এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির '১৫ অগস্টের পর ভবিষ্যতের কাজের দিকে এগিয়ে যাও' এই আবেদনে উল্লিখিত কয়েকটি কথা ও কতর্ব্যকর্মকে। এগুলি হল :

- স্বাধীনতা যাত্রাপথের শেষ নয়;
- জমিদারি প্রথার অবসান চাই;
- মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ করতে হবে;
- শ্রমিকদের জীবনধারণ উপযোগী বেতন দিতে হবে;
- সংখ্যালঘুদের ন্যায় বিচার দিতে হবে। ইত্যাদি।[২]

এসবই ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কতর্ব্যকর্মের একটি ধারণা।

১৫ অগস্ট ১৯৪৭-এর 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

সোমনাথ লাহিড়ী লিখেছিলেন, "অসংখ্য বীরের রক্তের ঋণ পূর্ণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছি কি? ... যাহা পাইয়াছি তাহা আমরা জানি, সেজন্যই উৎসব করিতেছি। যাহা পাই নাই, আজ আনন্দ উৎসবের মধ্যেও সেকথা দৃঢ় চিত্তে স্মরণ করি যাহাতে আমরা উপান্তকেই সীমান্ত ভাবিয়া থামিয়া না যাই, আত্মসন্তোষের চেষ্টাহীনতা আমাদের চলার পথে বিরাম না আনে।"[৩]

অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম পর্যায়ের কাজের পর কমিউনিস্টরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের কাজকেই গণ্য করেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বলে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম চালাতে হবে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে। কমিউনিস্টদের এই দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে দাঁড়ালো জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতপার্থক্য জনিত বিতর্কের ক্ষেত্র। বস্তুত জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া একনায়কত্বের বনিয়াদ গড়ে তোলা। অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ছিল শ্রমিক-কৃষকের একনায়কত্ব গড়ে তোলা। অতএব উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য ও তজ্জনিত শ্রেণি-স্বার্থ সংঘাত থাকাটাই ছিল অবধারিত। দ্বিতীয় পর্বেও এটা চলেছিল যা আমরা দেখতে পাব পঞ্চম ও তার পরবর্তী খণ্ডগুলিতে।

এবিষয়ে প্রবেশের পূর্বে আমরা এখানে স্মরণ করব স্বাধীনতা আন্দোলনের অসংখ্য শহিদকে যারা কোন না কোন রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৪ সালে সিপিআই-এর বিভাজনের পর সাধারণ সম্পাদক রাজ্যেশ্বর রাও প্রত্যেক রাজ্যপার্টিকে পার্টির সূচনা থেকে শহিদদের জীবনী প্রকাশ করার জন্য এক নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ অনুসারে ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ পার্টির তরফ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট পর্যন্ত "কমিউনিস্ট আন্দোলনের শহিদনামা" প্রকাশিত হয়েছিল। তালিকাটি অসম্পূর্ণ হলেও, প্রচেষ্টার সূত্রপাতের জন্য কাজটি ছিল অভিনন্দনযোগ্য।[৪]

বর্তমান খণ্ডের যে সময়-কালকে ধরা হয়েছে তার শুরু ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে ১৯৪৯ সালের শেষকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। অতি বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী লাইন অনুসরণ করার সময় থেকে ঐ লাইন পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রচেষ্টা শুরুর এক সুযোগ উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়কালের মধ্যে ধরা আছে রাজ্যে সিপিআই-এর চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন, কেন্দ্রীয় পার্টির সর্বভারতীয় দ্বিতীয় পার্টি সম্মেলন (কংগ্রেস), তে-ভাগা আন্দোলনের অগ্রগতি, বাস্তুহারা আন্দোলন, কেন্দ্রীয় সরকারের দমনপীড়ন নীতি প্রভৃতি।

এই পর্বে একদিকে যেমন ছিল ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের সব হারানোর বেদনার্ত হাহাকার এবং তাঁদের জীবন-জীবিকা রক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের সংগ্রাম, অন্যদিকে ছিল স্বাধীনতার অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণতার দিকে যাত্রার প্রয়াসে কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তা-ভাবনা। এর মধ্যে রয়েছে দেশের আর্থ-সামাজিক চরিত্র বিশ্লেষণ, বিপ্লবের স্তর নির্ণয়, এই স্তরের শত্রু ও প্রতিবন্ধকতার শক্তি চিহ্নিতকরণ, সংগ্রামী সমাবেশ গঠন, বিপ্লবের পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ, বিপ্লবের নেতৃত্ব-ভাবনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কমিউনিস্ট পার্টি কেবল বাস্তব পরিস্থিতি ও সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর ব্যাখ্যাই করে না, তারা চায় পরিবর্তন। তাই তাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে থাকে দ্বান্দ্বিক বিচার-বিশ্লেষণ ও ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। কমিউনিস্ট

পার্টি এই পর্বে তাই করেছে। তা সত্ত্বেও তাঁদের ভুল হয়েছে, বিচ্যুতির শিকার হতে হয়েছে। এইপর্বেই কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সেই ভুল ও বিচ্যুতি ঘটেছে এবং এর প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন আন্দোলনে, এমনকী সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও।

কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক লাইন ভুল থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সংগ্রাম থেকে তারা কোনদিন সরে দাঁড়ায়নি। তে-ভাগার কত চাষী, কত ছাত্র-যুব, কত শ্রমিক গুলি খেয়েছে এবং অত্যাচার সহ্য করেছে। এমনকী বিধান রায়ের সরকার মহিলাদের ওপর গুলি চালাতেও দ্বিধা বোধ করেনি। কমিউনিস্ট পার্টি বুর্জোয়া শ্রেণির অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে চায়, পুজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষণের অবসান ঘটাতে চায় এবং ন্যায়, সমতাভিত্তিক ও শোষণহীন সমাজ গড়া মধ্য দিয়ে পরিবর্তন আনতে চায় বলেই, তাদের ওপর আসে শাসকশ্রেণির তরফ থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের দমন-পীড়ন ও নির্যাতন। এতেই পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার ক্ষান্ত থাকেনি। এই পর্বেই কমিউনিস্ট পার্টি, তার মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকা এবং বিভিন্ন গণসংগঠনকে বে-আইনি পর্যন্ত করা হয়েছিল। এই রাজ্য লড়াকু রাজ্য বলে ভারতের অন্য রাজ্যগুলি থেকে সবসময় এগিয়ে ছিল। তাই এই রাজ্যের পার্টিকেও বে-আইনি করেছিল সকলের আগে। সাধারণ মানুষের জন্য কমিউনিস্টদের লড়াইকে 'হিংসাত্মক' ও 'দেশদ্রোহী' কাজ বলে চিহ্নিত করে তাদের ওপর দমন পীড়নের রোলার চালাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে Communist Violence in India নামে এক শ্বেতপত্র প্রচার করতে হয়েছিল।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনে পার্টির যেমন ভুলভ্রান্তি ঘটেছে আবার তাকেই সংশোধন করে পার্টি এগিয়েও গেছে। এটা মনে করা ঠিক হবে না যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি অনেক ভুল ভ্রান্তির শিকার হয়েছিল, সেই কারণে পার্টির ইতিহাসটা হল ভুলের ইতিহাস। একথা অনেক বিদ্বজ্জনেরা মনে পোষণ করে থাকেন।[৫] এঁদের মনে করার পিছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করেছে তা হল পার্টি যেন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথ গ্রহণ করে এবং বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের পথ পরিহার করে। মেহনতী মানুষের স্বার্থে পার্টি যেমন সংগ্রামের ময়দানে থেকে ভুল করেছে, আবার সংগ্রামের ময়দানে থেকেই পার্টি রসদ সংগ্রহ করে সেই ভুলের সংশোধনও করেছে বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে। ভুল ত্রুটি সত্ত্বেও বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে, সংশোধন করেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলন উভয়কেই এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসকেও জানতে হবে।

স্বাধীনতার পূর্বে পার্টির সংস্কারবাদী লাইন যেমন কমিউনিস্ট পার্টির অনেক ক্ষতি করেছিল, স্বাধীনতার পরে পার্টির সংকীর্ণতাবাদী লাইন তদ্রূপ ক্ষতি করেছিল। তবে ক্ষতির ব্যাপকতা বেশি ছিল পরের পর্যায়ের রাজনৈতিক লাইনের ভ্রান্তনীতির জন্য। একথা স্বীকার্য যে আগের পর্বে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্র প্রভূত বিস্তার লাভ করেছিল, মননশীল সৃষ্টিসম্ভারের সমৃদ্ধি ঘটেছিল। আর পরের পর্বে সংকীর্ণতাবাদী লাইনের প্রভাবে প্রগতিশীল সাহিত্যবিচারে এবং উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মূল্যায়নে পার্টির অভ্যন্তরে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছিল। বর্তমান খণ্ডে এই আলোচনাকে আমরা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের উপাদান

হিসাবে বিশ্বস্তভাবে রাখবার চেষ্টা করেছি। আবার এব্যাপারে ভ্রান্তনীতির পূণর্মূল্যায়নকেও স্থান দিয়েছি। এই পূণর্মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছিল কারণ সেদিন পার্টির অভ্যন্তরে দৃঢ়ভাবে ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও উনবিংশ শতাব্দীর সঠিক মূল্যায়ণের একটি ধারা প্রবহমান ছিল এবং এই ধারাই অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে সঠিক অবস্থান নিতে পার্টিকে সাহায্য করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে যাতে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ না থাকে, তার জন্য পরবর্তীকালের সঠিক পূণর্মূল্যায়নের বিষয়টির অবতারণা এই খণ্ডেই করা সমীচীন বলে মনে করেছি।

কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তর দিল্লীর অজয় ভবনে পার্টির সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধনের সঙ্গে বর্তমান খণ্ডটির সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। তিনি জানতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের অনুসৃত লাইনের প্রভাব যে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পড়েছিল, তার উল্লেখ আমরা করছি কিনা। আমরা কীভাবে এই ব্যাপারটির উল্লেখ করেছি সেটা তাঁকে জানালাম। বললাম, সেসময় উনবিংশ শতাব্দী এবং রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ সম্পর্কে পার্টির এক অংশের মধ্যে বিরূপ মূল্যায়ণ থাকলেও আরেকটি অংশ যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এর প্রতিবাদ করেছিলেন এব্যাপারটি আমরা তুলে ধরেছি। পাশাপাশি পরবর্তীকালে ভ্রান্তবাদীরা যে সঠিক মূল্যায়ন এবং অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তার কথা উল্লেখ করে একটি লেখাও একই সঙ্গে সংযোজিত করেছি। কমরেড বর্ধন ইতিহাসের এইভাবে উপস্থাপনাকে সঠিক বলে ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর এই মন্তব্য আমাদেরকে খুশী করেছিল। আমরা উৎসাহিত হয়েছিলাম। এর জন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ সংগ্রাম করেছে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য। আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষও তাদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে বহু আন্দোলন করেছে যার মর্মবস্তুতে ছিল বিদেশী শাসনের অবসান। তাই স্বাধীনতা আন্দোলন জুড়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হয়েছিল বহু সঙ্গীত। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বদেশী সঙ্গীত ভারতের জনসাধারণকে উদ্বেল করে তুলেছিল। ফলে তা স্বাধীনতার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এক উচ্চ মাত্রা দিতে পেরেছিল। এঁদের মধ্যে কয়েকজন গীতিকারের নামোল্লেখ করা যায়, যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, মুকুন্দ দাস, রজনীকান্ত সেন, কাজী নজরুল প্রমুখ। এঁদের বাইরেও আরও অনেকে ছিলেন, এমনকী নাম না জানা গীতিকাররাও ছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্বে ভারতে ফ্যাসিবাদের বিপদ, দূর্ভিক্ষ, মহামারি, তেলেঙ্গানা ও পুন্নাপ্রা ভায়লারের লড়াই, ডাক-তার ধর্মঘট, নাবিক বিদ্রোহ, তে-ভাগার সংগ্রাম, শান্তির আন্দোলন প্রভৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টি দৃষ্টান্ত-স্থাপনকারী এবং সাড়া জাগানো এক ভূমিকা পালন করেছিল। এইসব ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারার মধ্যে এক অধিকতর বিপ্লবী ধারাকে শক্তিশালী ও ব্যাপক ক'রে তুলেছিল। আর এর মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এসেছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার উপাদান নিয়ে গণসঙ্গীতের ধারা। নতুন নতুন গানের সৃষ্টি হয়েছিল শ্রমজীবী মানুষকে কেন্দ্র করে, শান্তিপ্রিয়

মানুষকে কেন্দ্র ক'রে, দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষের জন্য। বাংলা ও পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা এই ধারার স্রষ্টা ছিলেন তাঁরা হলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী প্রমুখ। সেই সময় গণসঙ্গীতের যে সমস্ত সঙ্গীত বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সেগুলিকে নিয়েই রচিত হয়েছিল— ইংরাজীতে Save Bengal[৬] এবং বাংলায় গণনাট্য সংঘের গানের সংকলন।[৭]

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে আগামী পাকিস্তানের ভবিষ্যতের পথনির্দেশ সম্পর্কে সেখানকার জনগণের উদ্দেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অবিভক্ত কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এক আবেদন প্রচার করা হয়েছিল। এটি আমরা চতুর্থ খণ্ডে উল্লেখ করেছি এবং সহায়ক তথ্য হিসাবে সংযোজিত করেছি। (চতুর্থ অধ্যায় এবং সহায়ক তথ্য- ২২)। পার্টির নেতা ভবানী সেন চেয়েছিলেন দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান সমৃদ্ধশালী হোক। তাই তিনি কেন্দ্রীয় পার্টির আবেদনের আলোকে সেখানকার মুসলিম যুবদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[৮]

চতুর্থ খণ্ডে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ সম্পর্কে উল্লেখ করতে চাই। যেমন, মুখবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফটির শুরু হয়েছে 'পঞ্চম খণ্ড' বলে। এটি হবে 'চতুর্থ খণ্ড'। সকলে বুঝতে পারলেও, প্রুফ রিডিং-এর সময় এর সংশোধন হওয়া উচিত ছিল। আবার পৃষ্ঠা ১৩-র ২নং তথ্যসূত্রে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে "Was India's Partition *Unavoidaile*?" আসলে, শব্দটি হবে Unavoidable। এরপর আরেকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করছি। পৃ. ১৭৭এ শেষের দ্বিতীয় লাইনে বলা হয়েছে "১৯৪৫ সালের ২৫ নভেম্বর" 'স্বাধীনতা' পত্রিকা বেরোতে শুরু করে। এটি হবে 'ডিসেম্বর'। যদিও বইয়ের বহু জায়গায় ১৯৪৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'স্বাধীনতা' বেরোতে শুরু করে বলে লেখা আছে, তবুও একটি জায়গায় সেই ত্রুটি থাকবেই বা কেন? সংশোধনের নৈতিক দায় থেকেই এই ত্রুটির জায়গাগুলিকে সংশোধন করলাম।

পঞ্চম খণ্ডের সমাপ্তি টানছি ১৯৪৯ সালের শেষ পর্যন্ত ইতিহাস অনুসন্ধান কাজের উল্লেখ করে। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সংকীর্ণতাবাদী লাইন সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আন্তঃপার্টি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। ১৯৫০ সালে ২৭ জানুয়ারি 'ফর্ এ লাস্টিং পীস এণ্ড পিপলস্ ডেমোক্রেসি' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রকাশের পর এই সংগ্রাম যারা করছিলেন, তাঁরা যেন এর মধ্যে মীমাংসার এক রুপোলী রেখা দেখতে পেয়েছিলেন। এটাই শেষ পর্যন্ত আন্তঃপার্টি সংগ্রামকে মীমাংসার দিকে নিয়ে গেছিল ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সারা ভারত সম্মেলনে এবং ১৯৫৩ সালে মাদুরাইতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে। এ সম্পর্কে আলোচনা হবে এর পরের খণ্ডে।

তথ্যসূত্র :

১. Lenin Collected Works, Vol 18, Social Significance of Serbo-Bulgarian Victories, P 398.
২. Communist Party's Appeal to the People of India— August 15, Onward to tasks ahead — দ্র. বর্তমান গ্রন্থ সিরিজের চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫২-৬৬১।

৩. 'স্বাধীনতা' ১৫ আগস্ট ১৯৪৭, সম্পাদকীয় 'সঙ্কল্প' (দ্র. ঐ, পৃ. ৬৬৪)।

৪. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, 'কমিউনিস্ট আন্দোলনের শহিদনামা' (১৫ আগস্ট ১৯৪৭ পর্যন্ত), ১৯৬৯ (সহায়ক তথ্য - ১)

৫. The Indian Left Edited by Bipan Chandra, New Delhi, 1983

টিকা : ১. জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক কমিউনিস্ট পার্টির তিরিশ বছরের ইতিহাস (১৯২৫-১৯৫৫) নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এগুলিতে এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে এদেশের কমিউনিস্টরা বারবার ভুল করেছেন। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস হল ভুলের ইতিহাস।

২. এটা যে সঠিক নয় এ বিষয়ে নরহরি কবিরাজ 'মূল্যায়ন' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন— 'কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস কি ভুলের ইতিহাস'? (শারদীয় মূল্যায়ন ১৯৮৪)। (সম্পাদক)

৬. Save Bengal "Voice of Bengal" Published by Benoy Roy, New Age Printing Press, 190B Khetwadi Main Road, Bombay-4 (সহায়ক তথ্য - ২)

৭. ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গানের সংকলন, বংশী বটব্যাল কর্তৃক কায়েদে আজম প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (সহায়ক তথ্য - ৩)

৮. Bhowani Sen— In Eastern Pakistan "Like Revolutionary Architects Build a New Society Free of Imperialism", Bengal Communist Leader's call to Muslim Youths, 'People's Age," 15 August 1947 (সহায়ক তথ্য - ৪)

সহায়ক তথ্য - ১

কমিউনিস্ট আন্দোলনের

শহিদনামা

(১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ পর্যন্ত)

কমরেড,

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে পার্টি সদস্যদের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে কমরেড রাজেশ্বর রাও সম্প্রতি একটি 'নোটে' যে পাঁচ দফা কাজের উল্লেখ করেছেন তার একটি হল—

'... প্রত্যেকটি রাজ্যকে আমাদের পার্টির সূচনা থেকে শহিদদের জীবনী ও ফোটো সমেত পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে। ঐগুলির মধ্যে বাছাই করে কেন্দ্র থেকে একটি ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে।'

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট শহিদ ও মৃত কমরেডদের যে তালিকাটি আমরা এখানে প্রকাশ করছি তা কালের দিক থেকে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট [পর্যন্ত] আর তাই ভৌগলিক দিক থেকে স্বাধীনতা-পূর্বের অখণ্ড বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট', 'জনযুদ্ধ', 'পিপল্‌স ওয়ার' প্রভৃতি পত্রিকার পুরানো সংখ্যাগুলি থেকে সংগৃহীত এই তালিকাটি কালানুক্রমিক, জেলাওয়ারি নয়।

এ তালিকায় উল্লিখিত প্রত্যেকটি নাম আমাদের কোন না কোন রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। কমিউনিস্ট আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পক্ষে তাই এই সব তথ্য অপরিহার্য মালমশলা। আর সে-জন্যই এ তালিকাকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব এরাজ্যের সমস্ত কমরেডের।

জিলা পরিষদগুলিকে তাই উদ্যোগী হয়ে বিশেষ করেই নিজ নিজ জেলার নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আগামী ৩১শে জুলাই তারিখের মধ্যে প্রাদেশিক দপ্তরে পাঠাতে হবে—

১। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্টের পর যে সব কমরেড শহিদ হয়েছেন বা মারা গেছেন তাঁদের নাম, জীবনী ও সম্ভব হলে ফোটো;

২। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত যে সব শহিদ বা মৃত কমরেডের নাম এ তালিকায় বাদ পড়েছে তাঁদের জীবনী ও ফোটো;

৩। তালিকায় উল্লিখিত কমরেডদের ফোটো;

৪। তালিকায় যে জীবনীগুলি দেওয়া হয়েছে ত'তে কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য বাদ পড়ে থাকলে তালিকায় সংযোজনের জন্য সেই তথ্য;

৫। তালিকায় কোন ভুল তথ্য থাকলে সংশোধনের জন্য সঠিক তথ্য;

৬। তালিকা প্রকাশের ক্রম সম্পর্কে কোন প্রস্তাব।

পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থী, গণতান্ত্রিক এবং শ্রমিক, কৃষক আন্দোলনের শহিদদের একটি তালিকাও আমরা কিছু দিনের মধ্যেই পাঠাব। সে তালিকায় উল্লিখিত তথ্য সম্পর্কিত সমস্ত বক্তব্যও প্রাদেশিক দপ্তরে পাঠাতে হবে।

অভিনন্দন জানাই। ইতি—

সম্পাদক

২-৪-৬৯

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

কমরেড নরেশ সেন— ১৯৩৮ সনে যশোহর-খুলনা রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে যুব-লীগ, ছাত্র ফেডারেশন ও কিষান সভার সদস্যদের সম্মেলনে যোগদান বন্ধ করার তোড়জোড় করেন। যুব, ছাত্র ও কিষান কর্মীরা যখন এর প্রতিকারের জন্য সম্মেলন সভাপতির নিকট আবেদন করতে যান তখন তাঁদের উপরে সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নির্মম আক্রমণ চালায়। তরুণ ছাত্রকর্মী কমরেড নরেশ সেন এই অতর্কিত হামলায় গুরুতর আহত হয়ে মেডিকেল কলেজে মারা যান। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যে-শোভাযাত্রা বেরোয় তাতে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মুজফ্‌ফর আহমদ, বিশ্বনাথ মুখার্জি প্রমুখ যোগ দেন। সুভাষচন্দ্র এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এক বিবৃতিতে বলেন— 'এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা যে কংগ্রেস কর্মীদের সম্মেলনে ঘটতে পারল এর চাইতে উৎকট ব্যাপার আর কি হতে পারে?'

কমরেড জমীরুদ্দীন— ১৯৩৮ সনের ৬ই জুন কমরেড জমিরুদ্দীন, কমরেড জুলফিকর, কমরেড ওমর আলি খাঁ প্রমুখ কুষ্ঠিয়া মোহিনী মিল্‌সের কর্মিগণ যখন কাজের পর মিল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তখন মালিকপক্ষের একদল ভাড়াটে গুণ্ডা তাঁদের উপর আক্রমণ চালায়। তাদের ছুরিকাঘাতে আহত কমরেড জমীরুদ্দীন ন'দিন পরে মারা যান। তিনি 'কুষ্ঠিয়া টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের' একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। মারা যাবার কিছুক্ষণ আগে কমরেড জমীরুদ্দীন সহকর্মীদের বলেন : 'আমি যাচ্ছি, কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই। কারণ তোমরা নিশ্চয়ই ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের সংগ্রামের সাফল্য দেখতে পাবে।'

কমরেড সুকুমার ব্যানার্জি— ১৯৩৮ সনের ১৫ই নভেম্বর রানীগঞ্জ কাগজ কলে ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে ধর্মঘটের সাফল্যে আতঙ্কগ্রস্ত মিল কর্তৃপক্ষ পিকেটিং-রত কমরেড সুকুমার ব্যানার্জির উপর দিয়ে লরী চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রানীগঞ্জ শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং দু'দিন ধরে বন্ধ থাকে। মৃত্যুকালে কমরেড সুকুমারের বয়স ছিল ২৫ বছর। অল্প কিছুদিন আগে তিনি বিবাহ করেছিলেন। ১৯৩০ সনে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে এবং পরে দামোদর ক্যানাল ট্যাক্স-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। আসানসোল কোলিয়ারি মজুর ইউনিয়নের তিনি সহযোগী সম্পাদক ছিলেন এবং বার্নপুরের ইস্পাত কারখানা মজুরদের ধর্মঘটেও তিনি প্রাণপাত কাজ করেছিলেন। 'রানীগঞ্জ পেপার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের' তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সংগঠক।

কমরেড নীরদ দাশগুপ্ত— ৩০শে মার্চ, ১৯৩৯ বর্ধমান কেনাল অঞ্চলের জিরানা গ্রামে সর্পাঘাতে মারা যান। বরিশালে ছাত্রাবস্থায় গ্রেপ্তার হয়ে তিনি দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেল থেকে বেরিয়েই তিনি কেনাল কর-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন।

কমরেড ইউসুফ— কলিকাতা ডক মজুরদের প্রিয় নেতা, যক্ষ্মারোগে হাসপাতালে মারা যান। মৃত্যুর সময়েও তিনি কমরেডদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান।

কমরেড গৌরীশঙ্কর মিত্র— ১৯৩৮ সনে পার্টিতে যোগ দিয়ে ট্রামওয়ে মজদুর ইউনিয়নের বেলগাছিয়া শাখায় কাজ শুরু করেন। ঐ কাজে প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন ও ১৯৪০ সনে মারা যান।

কমরেড নীলমণি বক্সা— ময়মনসিংহ জেলার তরুণ কৃষক কর্মী; ১৯৪০ সনে মারা যান।

কমরেড মোহিনী মণ্ডল— মেদিনীপুর জেলা পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আত্মগোপনকালে ১৯৪২ সাল মারা যান।

কমরেড সোমেন চন্দ— ৮ই মার্চ ১৯৪২ ঢাকায় কমিউনিস্ট লেখক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ২২ বছর বয়সে ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাদের ছুরিকাঘাতে শহিদ হন। তিনি ঢাকার 'প্রতিরোধ' সাহিত্য গোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক ছিলেন। তাঁর মৃত্যু বাংলাদেশের লেখক মহলে ব্যাপক প্রতিবাদের উদ্রেক করে এবং ২৮শে মার্চ ১৯৪২-এ এরই সূত্রে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড হরিপদ সিকদার— ফরিদপুর জিলার মাদারীপুরের কিষান কমরেড ৩রা নভেম্বর ১৯৪২-এ ২৬ বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে মারা যান। সন্ত্রাসবাদী মামলায় তাঁর ৫ বছর জেল হয়। ১৯৩৯ সনে মুক্তির পর থেকে তিনি কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে মুসলমান কৃষকদের কৃষক সমিতিতে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

কমরেড গোলাম শরীফ— ৮ই মে, ১৯৪২ জাপানী হাওয়াই জাহাজ চট্টগ্রামে বোমা ফেলে। সেই বোমায় ডক মজদুর কমরেড গোলাম শরীফের মৃত্যু হয়। তিনি চট্টগ্রাম ডক মজদুর ইউনিয়নের সংগঠক ছিলেন।

কমরেড কিশোরী রায়— ১৮ই জুন, ১৯৪২ জলপাইগুড়ি জেলার কমিউনিস্ট কর্মী ডোমার কৃষক সম্মেলনে মিছিল নিয়ে যাবার প্রস্তুতিকাল সর্পাঘাতে মারা যান। সুন্দরদিঘি গ্রামের এক কৃষকের ঘরে তাঁর জন্ম। প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের মণ্ডপটিকে তাঁরই নামে 'কিশোরী নগরী' নামকরণ করা হয়।

কমরেড রমণী দাস— হবিগঞ্জ মহকুমার কমিউনিস্ট কর্মী ও বহুলা কৃষক সমিতির সম্পাদক। উত্তর হবিগঞ্জে কাজ করবার সময় ১০ দিন জ্বরে ভুগে ২৮শে জুলাই, ১৯৪২ মারা যান।

কমরেড বিশ্বনাথ তেলী— কাছাড়ের কমিউনিস্ট কর্মী প্রায় এক মাস রোগ ভোগের পর মারা গেছেন। তিনি অরুণাবন্ধ চা-বাগানে প্রথম মজুর ধর্মঘটের সময়ে আন্দোলনে যোগ দেন ও কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেন।

কমরেড ত্রিলোচন হাজং— ময়মনসিং জেলার পাঁচগাঁও অঞ্চলে কৃষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪২ সালে ৪৫ বছর বয়সে মারা যান।

কমরেড তিলকধারী সিং— হাজিনগরের মজুর কর্মী অল্পদিন রোগ ভোগের পর মারা যান।

কমরেড আশু হালদার— ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ জেলা কৃষক সম্মেলন থেকে ফেরার পথে ২৪ পরগণা জেলা কৃষক সমিতির সহকারী সম্পাদক, কমিউনিস্ট পার্টি সদস্য মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি ছিলেন গরীব কৃষক ঘরের সন্তান। ১১ বছর বয়সে তিনি জীবিকা অর্জনের জন্য কারখানার কাজে ঢোকেন।

কমরেড অনন্ত মাইতি— ১৭ বছরের চক দুর্গাপুর নিবাসী তরুণ ম্যালেরিয়ায় মারা যান। তিনি ছিলেন জাপবিরোধী প্রচার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

কমরেড খগেন পাল— নোয়াখালির কমরেড, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ কলেরায় মারা যান।

কমরেড প্রভাত মণ্ডল— গার্ডেনরীচ লৌহ শিল্প কারখানার মজুর কর্মী, পার্টি সদস্য। ৩০শে

ডিসেম্বর ১৯৪২ কলেরায় মারা যান।

কমরেড যোগেন গুপ্ত— পূর্ব কলকাতার কমরেড, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৪২ টাইফয়েড রোগে মারা যান। তিনি ছিলেন কর্পোরেশন শ্রমিকদের সংগঠক ও সেখানে দু'টি ধর্মঘট পরিচালনায় সাহায্য করেন।

কমরেড শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত— ২৪ পরগণা জেলার তরুণ কর্মী— ১৯ বছর বয়সে দু'দিনের জ্বরে মারা যান। ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি পার্টিতে এসে পরে কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

কমরেড সুধীর পোদ্দার— ২রা মার্চ, ১৯৪৩— নারায়ণগঞ্জ, ঢাকার রাস্তায় এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। দাঙ্গার সময়ে তিনি নির্ভীকভাবে দাঙ্গা প্রশমনের চেষ্টা করেন। ঢাকা জেলা টেক্সটাইল ইউনিয়নের তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট কর্মী।

কমরেড চিত্তরঞ্জন গুহ— ২০শে মে, ১৯৪৩ সালে ১৬ বছর বয়সে ফরিদপুর জেলার ইদিলপুরের হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র নিউমোনিয়া রোগে মারা যান। ১৯৩৯ সনে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তিনি পার্টি মিলিট্যাণ্ট হয়ে ওঠেন।

কমরেড দেবেন্দ্রনাথ দত্ত— ২৩শে মে, ১৯৪৩ সুরমা উপত্যকার কমিউনিস্ট নেতা ৪৫ বছরে সুনামগঞ্জে মারা গেছেন। তিনি কয়েক মাস যাবৎ যকৃতের রোগে ভুগছিলেন। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে তিনি কৃষক ফ্রন্টে কাজ করছিলেন।

শ্রী এম. কে. মিত্র— ১০ই জুন, ১৯৪৩— পার্টি দরদী, রেলওয়ে বোর্ডের প্রাক্তন কনট্রোলার অফ একাউন্টস মারা যান।

কমরেড সামসুদ্দীন— ময়মনসিংহ জেলার বালি অঞ্চলের কমরেড যক্ষ্মা রোগে মারা যান। পার্টির গোপন অবস্থায় পার্টির কাজ করে বালিতে তিনি পার্টির ভিত্তি দৃঢ় করেন। এইখানেই তাঁর যক্ষ্মা হয়। চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতায় যান কিন্তু যাদবপুরে সিট না পেয়ে ফিরে যান। নেত্রকোণা পার্টি অফিসে তাঁর মৃত্যু হয়।

কমরেড সুভাষ নাগ— ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাদের হাতে ১৯৪২ সনে ২২ বছর বয়সে নিহত হন। ইনি ছাত্র ফ্রন্টের কর্মী ছিলেন।

কমরেড গুরুদয়াল সরকার— মুসং হাজং পল্লার কমরেড। কলেরায় মারা যান। অনুন্নত হাজং অঞ্চলে পার্টি গড়বার কাজে তিনি পরিশ্রম করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি বলে যান, "পার্টির কাজ তো সম্পন্ন করে যেতে পারলাম না, স্বাধীন ভারত দেখে যেতেও পারলাম না। আমার সম্পত্তি, ১৫ একর জমি পার্টিতে দিয়ে গেলাম।"

কমরেড লালমোহন হাজং— ময়মনসিংহ নালিতাবাড়ি অঞ্চলের কৃষক কর্মী। ১৯৪২ সনে হাসপাতালে মারা যান।

কমরেড দেবেন সরকার— নালিতাবাড়ীর পাহাড় অঞ্চলের কমরেড। মাত্র ৭ দিনের জ্বরে মারা যান। তিন বৎসর অশেষ শ্রম করে তিনি নাগেরপাড়ায় কৃষক সমিতি গড়ে তোলেন।

শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী— চট্টগ্রাম জিলা নারী সমিতির কার্যকরী সমিতির সদস্যা। টাইফয়েড রোগে মারা যান। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র, কমরেড শান্তি চক্রবর্তী কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সংগঠক।

কমরেড ফণী চক্রবর্তী— ২৫শে জুলাই, ১৯৪৩ ময়মনসিংহ শহরের কমিউনিস্ট ছাত্রকর্মী রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডা কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

কমরেড শান্তি চক্রবর্তী— চট্টগ্রাম জিলা কমিটির অন্যতম সংগঠক। দীর্ঘদিন কঠোর যক্ষ্মা রোগের সঙ্গে লড়াই করে ২৩শে জুলাই (১৯৪৩) হাসপাতালে মারা যান।

কমরেড রেবতী দাস— ১৩ই আগস্ট, ১৯৪৩— চট্টগ্রামের কৃষক নেতা নিউমোনিয়ায় মারা যান। তিনি ছিলেন রতনপুর গ্রামের এক কৃষক পরিবারের সন্তান। রতনপুর চট্টগ্রামের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কমরেড রেবতীই সেই রতনপুরকে গড়ে তুলেছেন।

কমরেড অজিত ঘোষ— জামালপুরে (ময়মনসিংহ) থাকার সময় পার্টির সংস্পর্শে আসেন। সেইখানে তিনি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন। ১৯৪৩ সনে তিনি কলিকাতায় আসেন ও অল্পদিনের মধ্যেই 'ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' অফিস সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

কমরেড মাখন ঘোষ— ফেঁচুগঞ্জ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি, মজুর কর্মী। যক্ষ্মা রোগে মারা যান। দশ বছর যাবৎ তিনি কলিকাতা ও সুরমাভ্যালি জেলা পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কমরেড দিলীপ বসু— কান্দীর কৃষক সমিতির কমিউনিস্ট কর্মী। নিউমোনিয়া রোগে মারা যান।

কমরেড সন্তোষ চক্রবর্তী— ছাত্রকর্মী, ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৩ মারা যান। তাঁর চেষ্টায় গোবিন্দপুর হাই স্কুলে ছাত্র ফেডারেশন গড়ে ওঠে। শুধু সরারচরেই নয়, বাজিতপুর ও আগপুর স্কুলেও ছাত্র সংহতি গড়ার জন্য তিনি চেষ্টা করেন।

কমরেড শ্রীকৃষ্ণ সিংহ— কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপের মজুর, ২৭ শে আগস্ট ১৯৪৩ ৫/৬ দিনের জ্বরে মারা গেছেন।

কমরেড মণি চক্রবর্তী— নানকার আন্দোলনের কৃষক নেতা। ১৯৪৩ সনে ২৫ বছর বয়সে মারা যান।

কমরেড আমিন— ৭ই আগস্ট, ১৯৪৩-এ মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবী মুসলমান। ১৯৪০ সনে তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন। খড়্গপুরে (মেদিনীপুর) রেলশ্রমিকদের মধ্যে তিনি পার্টিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। ১৯৪০ সনে তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। কিছুদিন পরে অন্তরীণ আইন ভাঙার জন্য তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর যক্ষ্মা হয়। জেল থেকে বেরোবার পর তাঁর রোগ বেড়েই চলে। এই নিয়েই তিনি কাজ করতেন। ১৯৪২ সনের ২রা আগস্ট খড়্গপুরে যে-বিরাট ফ্যাসিষ্টবিরোধী জন-সমাবেশ হয় তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কমরেড আমিন।

কমরেড মহম্মদ— ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ বরিশাল মুলাদির এই জনপ্রিয় পার্টি কর্মীর মৃত্যু হয়।

কমরেড জনেন সেন— ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ পাবনা জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক ও জেলা পার্টির অন্যতম সংগঠকের মৃত্যু হয়।

কমরেড অমিয়া বসু— রংপুর, বদরগঞ্জের মহিলা কর্মীর মৃত্যু হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজের মধ্যে দিয়ে পার্টির সংস্পর্শে আসেন ও পার্টি সভ্য হন।

কমরেড দক্ষিণা মজুমদার— পানিহাটির সুতাকল মজুর ইউনিয়নের তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী। নিউমোনিয়া রোগে মারা যান।

কমরেড নবগোপাল সাধু— বীরভূম জেলার কাষ্ঠগড়া এলাকার কমরেড। ১৯৪৩ সনে মারা যান।

কমরেড ননী গুপ্ত— ১৯শে অক্টোবর, ১৯৪৩ বরিশালের ভোলা গ্রামের কমরেড যক্ষ্মা রোগে মারা গেছেন। ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তিনি পার্টিতে আসেন এবং বরিশাল কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি স্থানে পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

কমরেড আলি মাহ্‌মুদ— বীরভূমের মারগ্রামের কমরেড। ছাত্র আন্দোলন মারফৎ পার্টির ঘনিষ্ঠ হন। মৃত্যুর আগে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরে টাইফয়েড রোগে মারা যান।

কমরেড রাধাশ্যাম মণ্ডল— বীরভূমের কোপাই অঞ্চলের কমরেড। ১৯৪৪ সনে মারা যান।

কমরেড নীল— বড়ভিটার (রংপুর) কৃষক কর্মী। ৩০০ কৃষককে সমিতিতে আনেন। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

কমরেড বশীরা খানম— ২৪ পরগনা জেলার হাকিমপুর অধিবাসিনী, তাঁর গ্রামে পার্টি, কৃষক সমিতি ও মহিলা সমিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। কলেরা মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে কলেরায় মৃত্যু হয়।

কমরেড গোপেশ্বর মজুমদার— শ্রীরামপুর মাহেশের সুতাকল মজুর। টাইফয়েডে মারা যান। নিরন্নদের অন্ন যোগাবার কাজে ইনি অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন।

কমরেড বেণীমাধব গাঙ্গুলী— বালীর ছাত্র ফেডারেশন সম্পাদক ও বালীর কিশোরবাহিনীর উদ্যোক্তা মারা গেছেন। তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন।

কমরেড যোগীমোহন বর্মণ ও প্রভানন্দ বর্মণ— জলপাইগুড়ির দেবীগঞ্জ এলাকার দুই কমরেড। পার্টির বে-আইনি অবস্থায় পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং কৃষক সভা ও পার্টি সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁদের কলেরায় মৃত্যু হয়।

কমরেড কালিদাস ভৌমিক— ত্রিপুরার কমরেড। আমাশয়ে মারা গিয়েছেন। ইনি ও এঁর স্ত্রী কমরেড পূর্ণবাসিনী একসঙ্গে পার্টি সভ্য হন। দু'জনেই বে-আইনি অবস্থায় পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখেন।

কমরেড সুরেশ চক্রবর্তী— ফরিদপুরের কোরকদী অঞ্চলের কমরেড। হৃদরোগে মারা গিয়েছেন। ১৯৩৮ সনে ইনি কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। তারপর বে-আইনি অবস্থায় পার্টিতে আসেন। ইনি আগে পুরোহিত ছিলেন। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে। কৃষকদের মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তোলেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে ২১৬ জন কৃষক মেয়েকে সভ্যা করেন এবং খাদ্যাভাবের দিনে সারাদিন না খেয়ে গ্রুয়েল কিচেনে রান্না করতেন, আবার রাত্রিতে পার্টির অন্য কাজ করতেন।

কমরেড কৃষ্ণপদ— দিনাজপুর জেলার বংশীহারা থানার কৃষক কমরেড। কলেরা মহামারির বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে কলেরার মারা যান।

কমরেড নির্মল সেন— ইছাপুরের শ্রমিকদের প্রিয় কমরেড। ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৪ বসন্ত রোগে

মারা যান। ইছাপুর রাইফেল মেটাল এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গড়ার কাজে তাঁর দান অসামান্য।

কমরেড তারিণীকুমার পাত্র— কিশোর কমরেড। ২৫শে মার্চ, ১৯৪৪ কলেরায় মারা যান। তিনি মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার ৫নং ইউনিয়নের কিশোর বাহিনীর প্রিয় নেতা ছিলেন।

কমরেড নীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী— ৩রা এপ্রিল, ১৯৪৪ হঠাৎ মারা যান। তিনি মাগুরা (যশোহর) ছাত্র ফেডারেশনের একজন কর্মী ছিলেন।

কমরেড ভিখা চৌহান— ময়মনসিংহের নানকার আন্দোলনের কর্মী। ১৯৪৪ সনে ২৫ বছর বয়সে মারাযান।

কমরেড রাধাশ্যাম— সিউড়ির ভূমিহীন কৃষক। পার্টির বে-আইনি অবস্থাতেই তিনি সদস্যপদ অর্জন করেন। গ্রামের প্রত্যেকটি কৃষককে তিনি কৃষক সমিতির মধ্যে আনেন— অনেককে পার্টিতেও আনেন।

ডাঃ কাশীনাথ সেন— মল্লারপুরের কমরেড। মারা গেছেন। তিনি পার্টির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

কমরেড পশুপতি সাহা— বীরভূম জেলার কবিরাজপুর গ্রামের কমরেড। নিউমোনিয়া রোগে মারা গেছেন।

কমরেড ধীরেন বিশ্বাস— ফরিদপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক। ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩ কলেরায় মারা গেছেন।

কমরেড মহেশ্বর বর্মণ ও কমরেড বৃন্দাবন বর্মণ— দিনাজপুরের ৯নং শিবরামপুর ইউনিয়নের কমরেড। নিউমোনিয়া রোগে ২০শে নভেম্বর, ১৯৩৪ সনে মহেশ্বর বর্মণ মারা গেছেন। ঐখানেরই কমরেড বৃন্দাবন বর্মণ ২১ নভেম্বর, ১৯৪৩ কলেরায় মারা যান।

কমরেড রেণু চ্যাটার্জি— ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩, কলিকাতার ইউনিয়ন জুট মিলের কমরেড, ১৯ বছর বয়সে টাইফয়েডে মৃত্যু হয়েছে।

কমরেড ফণী মজুমদার— আসামের লামডিং-এর রেল মজুর কমরেড। ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৩-এ বসন্ত রোগে মারা গিয়েছেন। মারিয়ামিতে তিনি ইউনিয়নের শাখা গড়ছিলেন— এমন সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

কমরেড প্রাণকৃষ্ণ বর্মণ— জলপাইগুড়ি দেবীগঞ্জ থানার ৫নং ইউনিয়নের কমরেড। কলেরা রোগে মৃত্যু হয়েছে।

কমরেড সত্য প্রামাণিক— নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়ার ছাত্র কমরেড। ১৯ বছর বয়সে ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় মারা গেছেন। খাদ্য আন্দোলনের ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করবার সময়ে তিনি পার্টিতে আসেন।

কমরেড ভূপেশ ব্যানার্জি— দিনাজপুরের কৃষক কর্মী। ১৯শে জানুয়ারি, ১৯৪৪ ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া রোগে মারা গেছেন।

কমরেড দেবেন আচার্য— ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪-২১ বছর বয়সে বসন্ত রোগে কলিকাতায় মারা গেছেন। ছাত্র আন্দোলনের মারফৎ তিনি পার্টিতে আসেন।

কমরেড আবদুল আজিজ মুন্সী— ঢাকার মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়ন কৃষক সমিতির সম্পাদক। জ্বর ও আমাশয় রোগে ভুগে ১০ই ফেব্রুয়াররি, ১৯৪৪ মারা গেছেন। তিনি স্থানীয় কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন ও ঐ কাজের মারফৎ পার্টি সভ্যপদ অর্জন করেন।

কমরেড যতীন হাজং— ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়ীর কৃষক কমরেড। ২৪ দিনের টাইফয়েড জ্বরে ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ মারা গেছেন। পার্টির বে-আইনি অবস্থায় তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন ও ১৯৪৩ সনের প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের পর সর্বক্ষণের কর্মী হন।

কমরেড প্রভাস লাটুয়া— মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের কৃষক নেতা। ৬ মাস রোগ ভোগের পর ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ মারা গিয়েছেন। ১৯৪০ মার্চ ইনি কৃষক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন ও ১৯৪২ সনে পার্টি সভ্যের সম্মান লাভ করেন।

কমরেড নিখিল কর্মকার— ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর গ্রামের কমিউনিস্ট নেতা বসন্ত রোগে ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ মারা গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ঐ অঞ্চলে কৃষক, মহিলা, ছাত্র ও কিশোরেরা খাদ্যরিলিফের আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন।

কমরেড কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল— হাওড়া জেলার ডোমজুরের কিষান কর্মী। বসন্ত রোগে মারা গেছেন।

কমরেড জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত— ক্ষয় রোগে মারা গেছেন। ১৯৩২ সনে তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট এক মামলায় সাত বছরের কারদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেল থেকে বাইরে আসার পর তিনি পার্টিতে যোগ দেন। 'জনযুদ্ধ' যখন প্রথম বাহির হয় তখন 'জনযুদ্ধ' সেলে তাঁকে কাজ করতে দেওয়া হয়।

কমরেড বিপিন বৈষ্ণব— ময়মনসিংহ জেলার লাউচাপড়ার কিষান কর্মী। বসন্ত রোগে ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ মার' গেছেন। স্থানীয় হাজং, গারো ও কোচদের মধ্যে যে-আন্দোলন গড়ে উঠেছে কমরেড বিপিন ছিলেন তার অন্যতম নেতা।

কমরেড প্রভাত দত্ত— হুগলির কমরেড। ২৭শে মার্চ, ১৯৪৪ যক্ষ্মা রোগে মারা গেছেন। তাঁর চেষ্টাতেই মামলার চতুর্পার্শ্বস্থ ১৫টি গ্রামের চাষী ও জনসাধারণ ১৯৪১ সালে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করে খাল সংস্কার ও গেট তৈরি সম্ভব করেছিলেন। তিনি স্থানীয় জনরক্ষা কমিটি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন।

কমরেড তেজমণি শর্মা— মণিপুরী কমরেড। ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪— জ্বরও রক্তবমনের ফলে মারা গেছেন। কৃষক আন্দোলনের ফলে তিনি কৈলা শহরের বিশিষ্ট কর্মী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।

কমরেড রজ সিং— দিনাজপুর জেলার আটোয়ারী থানার বালিয়া গ্রামে ১২ই মার্চ, ১৯৪৪ নিউমোনিয়ায় মারা যান। জেলার আধিয়ার আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যে বালিয়ার কৃষক নেতা হিসাবে পরিচিত হন। দুর্ভিক্ষের সময়ে রিলিফের কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি পার্টি সভ্যপদ অর্জন করেন।

কমরেড জয় রায়— দিনাজপুর জেলার লালপুর গ্রামে, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৪— 'সেপটিক' রোগে মারা যান; গত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের সাফল্যের পিছনে যেসব কমরেডের

পরিশ্রম ছিল তিনি তাঁদেরই একজন। তিনি পার্টি সভ্য ও ভলান্টিয়ার-বাহিনীর নেতা ছিলেন।

কমরেড দেবাই বর্মন— রংপুরের, লালমণির হাট থানায় মোগলহাট ইউনিয়নের কৃষক কর্মী ও তাঁর স্ত্রী বসন্ত রোগে মারা যান। কমরেড বর্মন স্থানীয় সেল-সম্পাদক ছিলেন এবং প্রথম থেকেই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও মহিলা আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী ছিলেন।

কমরেড সাধন সেন— চট্টগ্রামে, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৪ এসিয়াটিক কলেরায় মারা যান। ছাত্রকর্মী হিসাবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বে-আইনি যুগে তিনি পার্টি সংস্পর্শে এসে পার্টি সভ্য হন। তিনি ভলান্টিয়ার বাহিনীর নেতা ছিলেন।

কমরেড কুঞ্জ বিহারী— খুলনা জেলার শোভনা অঞ্চলে, ১১ই মে, ১৯৪৪ কলেরায় মারা যান। কৃষক আন্দোলনের ফলে শোভনা অঞ্চলের ঋষিদের মধ্যে যে জাগরণ দেখা দেয় কমরেড কুঞ্জবিহারী তারই সূত্র ধরে আপন সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে কৃষক সমিতি ও পার্টির দিকে আকৃষ্ট হন।

কমরেড আউব আলি— ত্রিপুরা জেলার পয়ালগাছা ইউনিয়নের মইসার গ্রামে বসন্ত রোগে মারা গেছেন। তিনি কৃষক কর্মী ও পার্টি সভ্য ছিলেন।

কমরেড হরুবালা রায়— ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট থানার লক্ষ্মীবুড়া গ্রামে ৪ঠা মে, ১৯৪৪ কলেরায় মারা যান। তিনি মহিলা সমিতির কর্মী হিসাবে স্থানীয় হাজং, ডালু, বানাই কোচ প্রভৃতি কৃষক নারীদের প্রিয় নেত্রী ছিলেন। দুই বছরে তিনি ৪০০ মহিলাকে আত্মরক্ষা সমিতিভুক্ত করেন। টাকা পয়সা ও চাউল সংগ্রহে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কমরেড মরাদজ্জামান— গাইবান্ধার রামচন্দ্রপুরের পার্টি সভ্য। বসন্ত রোগে মারা গেছেন।

কমরেড যোগেন— বরিশালের উজিরপুর ইউনিয়নের শীকারপুর গ্রামের পার্টি সদস্য ১৪ই মে, ১৯৪৪, ১৩ দিনের জ্বরে মারা গেছেন। উজিরপুরের তন্তুবায়দের মধ্যে তিনি সমিতি ও তাঁতকেন্দ্র গঠন করেন।

কমরেড কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ— ফরিদপুরের নাড়য়া ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক ও কিশোর বাহিনীর সংগঠক। ১৫ বছর বয়সে ম্যালেরিয়ায় মারা গেছেন। তিনি স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন।

কমরেড শ্রীদাম দাস— খুলনার মহেশ্বরপাশার কিশোর। একদিনের জ্বরে মারা গেছেন। তিনি লেখাপড়া ও খেলাধুলায় খুবই ভালো ছিলেন ও কিশোর-বাহিনীর সংগঠক ছিলেন।

কমরেড সুনীল নাগ— ঢাকার কমিউনিস্ট কর্মী। অন্ধকার রাত্রে পথের মধ্যে ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডাদের দ্বারা গুরুতর আহত হন। ৩১শে মে, ১৯৪৪ তিনি হাসপাতালে মারা গেছেন।

কমরেড কমলা মহারাজ— ২৪ পরগনার নৈহাটি-গৌরীপুরের মজুর কমরেড। গৌরীপুর নদীয়া চটকল মজদুর ইউনিয়নের সহকারী সভাপতি। ২৪শে মে, ১৯৪৪ ব্ল্যাক ফিভারে মারা গেছেন। ১৯৩৬ সালে তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং অল্পকালের মধ্যেই পার্টি সদস্য পদ অর্জন করেন। চটকল ধর্মঘটে তিনি স্থানীয় মজুর নেতা হিসাবে পরিচিত হন। লেবার পার্টি, পানিনি গ্রুপ প্রভৃতি উপদলীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি বরাবর সংগ্রাম চালিয়েছেন।

কমরেড মনোহরি বর্মন ও রাজ বর্মন— রংপুর জেলার সিংহীমারী গ্রামে ১৯শে মে, ১৯৪৪

বসন্ত রোগে মারা গেছেন। পঞ্চগ্রামের কমরেড রাজ বর্মনও বসন্তে মারা গেছেন। এঁরা দু'জনেই গণ্ডী আন্দোলনে বিশেষ অংশগ্রহণ করেন।

কমরেড শ্যামলাল— কলিকাতা জেলা কমিটির নতুনবাজার সেলের সদস্য মারা গেছেন। তিনি বিড়ি মজদুর ছিলেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের কাজ করতেন, পরে পার্টি সদস্য হন।

কমরেড মনোহর সোম— বর্ধমান জেলার রায়না থানার নারায়ণপুর গ্রামের কৃষক কর্মী। ৩০শে মে, ১৯৪৪ ব্যাসিলারি ডিসেনট্রি রোগে মারা গেছেন। তিনি কৃষক সমিতির মধ্যে কাজ করতেন। তাঁরই চেষ্টায় মুডরা ইউনিয়ন কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। তিনি সেল-সম্পাদক ছিলেন।

কমরেড শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী— পাবনার ছাত্রকর্মী। ৩১শে মে, ১৯৪৪ ব্ল্যাকওয়াটার ফিভারে মারা গেছেন। সিরাজগঞ্জ কলেজের ছাত্রকর্মীদের সংস্পর্শে এসে তিনি পার্টির ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

কমরেড নগেন্দ্র চৌধুরী— ত্রিপুরা জিলার কৃষক কর্মী ও কমিউনিস্ট পার্টির জিলা সংগঠক। ৩১শে মে, ১৯৪৪, ৩২ বছর বয়সে হাঁপানী রোগে মারা গেছেন।

কমরেড ইয়াকুব আলী— ত্রিপুরার জয়শ্রী গ্রামের বাসিন্দা। ১১ই জুন, ১৯৪৪ ক্ষয় রোগে মারা গেছেন। তিনি কৃষককর্মী ও পার্টিসভ্য ছিলেন।

কমরেড হিমাংশু বিশ্বাস— ময়মনসিংহ জিলার করিমগঞ্জ ইউনিয়নের কৃষক সমিতির কর্মী। ১৮ বছর বয়সে ৭ই জুন, ১৯৪৪ ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় মারা গেছেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারির বিরুদ্ধে তিনি প্রাণপাত লড়াই করেছিলেন।

কমরেড শিমলা বর্মনী— ময়মনসিংহ হালুয়াঘাট থানার ডাহাপাড়া গ্রামের মহিলা কর্মী। ৩১শে মে, ১৯৪৪ কলেরা রোগে মারা গেছেন। গানের প্রচার বাহিনীর তিনি উৎসাহী কর্মী ছিলেন।

কমরেড ইন্দ্রমোহন সরকার— ময়মনসিংহ জিলার কালাপাড়া গ্রামে কলেরায় মারা গেছেন। তিনি ২ বছর কৃষক সমিতির কাজের মধ্যে দিয়ে পার্টি সভ্য পদ অর্জন করেন।

কমরেড যোগেন্দ্র সরকার— মধ্যমকুড়ায় কলেরায় মারা গেছেন। ৩ বছর কৃষক সমিতির কাজের মারফৎ তিনি পার্টি সভ্যপদ অর্জন করেন।

কমরেড হেমেন্দ্র চক্রবর্তী— বারহাট্টা ছাত্র ফেডারেশনের প্রাক্তন সম্পাদক। যক্ষ্মা রোগে মারা গেছেন। তিনি বারহাট্টা ছাত্র ফেডারেশন গড়ে তোলেন।

কমরেড ধীরেন্দ্রলাল রায়— সুগারীতে যক্ষ্মা রোগে মারা গেছেন। তিনি স্থানীয় যুব সমিতির সংগঠক ছিলেন।

কমরেড হৃদয় শুক্লদাস— সিংহেরবাংলার কৃষক। ম্যালেরিয়ায় মারা গেছেন।

কমরেড হেমন্ত সরকার— স্বল্পপাগলির ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছেন। স্থানীয় কৃষক সমিতি তাঁর চেষ্টাতেই গড়ে ওঠে।

কমরেড রাধানাথ ভট্টাচার্য— মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ছাত্রকর্মী মারা গেছেন। খাদ্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তিনি পার্টিসভ্য পদ অর্জন করেন।

কমরেড শরৎচন্দ্র দেব— ত্রিপুরা জেলার পেচাডহর গ্রামের কমিউনিস্ট সভ্য যক্ষ্মা রোগে

মারা গেছেন। আধিয়ার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কৃষক নেতা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

কমরেড রাজমোহন শর্মা— দুর্গাপুর গ্রামে ম্যালেরিয়ায় ও ব্রজেন্দ্র পাল বসন্ত রোগে মারা যান।

কমরেড মহাবীর— কলিকাতা ইলেকট্রিক মজদুর ইউনিয়নের সদস্য। ৬ই জুলাই, ১৯৪৪ মারা গেছেন। তিনি ইউনিয়নের অন্যতম প্রধান কর্মী ছিলেন।

কমরেড উপেন বর্মন— রংপুর জেলার তিস্তার কৃষক কর্মী। ৩০শে জুন, ১৯৪৪ বসন্ত রোগে মারা গেছেন। পার্টির গোপন যুগে তিনি পার্টি সভ্য হন।

কমরেড মোরাব আলি— করিমগঞ্জের কৃষক কর্মী। ১৪ই জুন, ১৯৪৪ ম্যালেরিয়ার মারা যান।

কমরেড সুজনেশ্বরী— ময়মনসিংহের টঙ্ক মহকুমার কৃষক সমিতির এলাকাধীন মাইজপাড়ার ইউনিয়নের কৃষক নারী। সর্পাঘাতে মারা গেছেন। তিনি কিশোরবাহিনীতে কাজ করতেন।

কমরেড ভানু মজুমদার— ২৬শে জুলাই, ১৯৪৪ সন্ধ্যাবেলায় ময়মনসিংহ শহরের কয়েকজন কমিউনিস্ট কর্মী যখন 'ফণী দিবস' উপলক্ষে প্রচারে বেরিয়েছিলেন তখন ৪ জন ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডা পিছন থেকে ছোরা মেরে তাঁকে হত্যা করে। ২৭শে জুলাই তাঁর মৃতদেহ নিয়ে বিরাট এক শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।

কমরেড উষা পাঠক— ২৩শে জুলাই, ১৯৪৪ যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ২২ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে।

কমরেড রঞ্জিৎ গুহ— ৬ই আগস্ট, ১৯৪৪ হাসপাতালে মারা গেছেন। বর্ধমানে ছাত্র আন্দোলনের ভিতর দিয়ে তিনি পার্টিতে আসেন। পার্টির বে-আইনি অবস্থায় তাঁর উপরে গৌরীপুর নৈহাটি-ইউনিয়ন গড়ে তোলার দায়িত্ব পড়ে। তাঁর চেষ্টায় সেখানে পার্টির শক্ত ঘাঁটি গড়ে ওঠে। পরে অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি আসানসোলের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন।

কমরেড কালি সোম— ট্রাম মজদুর, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ যক্ষ্মা রোগে মারা গেছেন। ১৯৩৫ সনে ট্রাম কোম্পানীতে চাকুরী নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেখানকার ইউনিয়নকে মজবুত করা জন্য সচেষ্ট হন। তাঁরই চেষ্টায় কালীঘাট সেকশন ট্রাম শ্রমিকদের জন্য তিনটি মেস স্থাপিত হয়। ১৯৩৭ সনে তিনি পার্টি সংস্পর্শে আসেন ও ১৯৪৩ সনে পার্টি সভ্যপদ অর্জন করেন। ১৯৪২ সনে ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টকে ইউনিয়নের মধ্যে টেনে আনার ব্যাপারে তাঁর দান ছিল প্রচুর।

কমরেড গোষ্ঠবিহারী ঘোষ— ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪— মেদিনীপুরের কমিউনিস্ট কর্মী। ৪৮ বছর বয়সে জণ্ডিস রোগে মারা গেছেন। ১৯২৯ সন থেকে কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৩ সনে তিনি কৃষক সমিতির কর্মী হিসাবে পার্টির সংস্পর্শে আসেন ও সভ্যপদ অর্জন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে পার্টির কাজ করতেন।

কমরেড অজিত অধিকারী— ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ যশোহরের শত্রুজিতপুরের ছাত্রকর্মী এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

কমরেড নিমাই সেন— ছয় মাস যক্ষ্মারোগে ভোগার পর ফরাসী চন্দননগরের কমিউনিস্ট

পার্টি সদস্য ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৪ প্রাণত্যাগ করেছেন। তিনি চন্দননগর বিড়ি মজুর আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৩০ সনে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন করে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিড়ি মজুরেরা তাঁকে বাঁচানোর জন্য 'রেড এড ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠা করে তাঁর চিকিৎসার ভার নেয়।

কমরেড গৌর দে— মৃত্যু ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৪৪। টাইফয়েড রোগে ভুগে মারা যান। ছাত্র, বয়স ১৭ বছর। কর্মক্ষেত্র মহেশ্বরপাশা (খুলনা)।

কমরেড গোলাম হোসেন— মৃত্যু ২রা নভেম্বব, ১৯৪৪। চুঁচুড়া বিড়ি ইউনিয়নের কর্মী। পার্টি সদস্য।

কমরেড নৃপতি নন্দী (পার্টি দরদী)— মৃত্যু ২২শে নভেম্বর, ১৯৪৪। কলেজের সেরা ছাত্র নৃপতি নন্দী ৫/৬ বছর ধরে পার্টির ঘনিষ্ঠ দরদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দাদা ভূপতি ও ছোট ভাই সুরপতি পার্টি সদস্য হন। যক্ষ্মা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

কমরেড ব্রজেন্দ্রনাথ পাল (পার্টি দরদী)— ২১শে ডিসেম্বর ১৯৪৪, ৫২ বছর বয়সে মারা যান। পার্টি মতবাদের অক্লান্ত প্রচারক ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সাহায্য ও নানা পার্টি কাজে অংশগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই উৎসাহী কর্মী। নদীয়া জেলায় কর্মী।

কমরেড বাশীনাথ বর্মণ— মৃত্যু ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪। ময়মানসিংহের টংক এলাকায় বিরাট কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

কমরেড গঙ্গেশ ভট্টাচার্য— মৃত্যু ৩রা জানুয়ারী, ১৯৪৫। পার্টির বে-আইনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং সেই থেকেই সব সময়ের জন্য পার্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কর্মক্ষেত্র নবদ্বীপ। টাইফয়েডে মারা যান।

কমরেড ফণী মুখার্জী— মৃত্যু ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪। ভবানীপুর পাড়া সেলের সেক্রেটারী, তরুণ পার্টি কর্মী। রোগ টাইফয়েড।

কমরেড অনিল গোস্বামী— ১৯৪৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পার্টি সভ্যপদ লাভের গৌরব অর্জন করেন। ছাত্রজীবন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আনন্দমোহন কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের উৎসাহী কর্মী ছিলেন। কৃষকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ময়মনসিংহ কর্মক্ষেত্র। ৩০ বছর বয়সে ক্ষয়রোগে মারা যান।

কমরেড দীনতারিণী মুখোপাধ্যায়— তরুণ বয়সে মারা গেছেন। পার্টির বে-আইনি অবস্থায় ইনি পার্টিকে বিশেষ সাহায্য করেন ও নিজ গ্রামে একটি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলেন।

কমরেড বীনাপাণি সুর (পার্টি দরদী)— কলকাতায় বিভিন্ন আত্মগোপনকারী পার্টি সদস্যকে তিনি আশ্রয় দেন। ১৯৩৮ থেকে পার্টির সংস্পর্শে আসেন। হঠাৎ হৃদ রোগে মারা যান।

কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল— মৃত্যু ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৪৫। বে-আইনি অবস্থায় পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৪৯ সালে পার্টিসভ্য পদ লাভের গৌরব অর্জন করেন। বজবজ কেলিডোনিয়ান মিলের শ্রমিক নেতা। কলেরায় মারা যান।

কমরেড দুখু প্রামাণিক— মৃত্যু ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৫। ১৯৪২-এ কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সমিতির মধ্য দিয়ে পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। কৃষক সন্তান। কলেরায় মারা যান।

কমরেড মিহির মুখার্জী— মৃত্যু ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫। ১৯৪২-এ পার্টি সভ্যপদ লাভ করেন। কলকাতার ৫নং ওয়ার্ডের বিশিষ্ট কর্মী। ২১ বছর বয়সে ট্রাম দুর্ঘটনার মারা যান।

কমরেড সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী— ৩০শে মার্চ, ১৯৪৫ মাত্র ৩৯ বছর বয়সে বসন্ত রোগে বিখ্যাত অধ্যাপক কমরেড সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মৃত্যু হয়। তিনি পার্টির একজন ঘনিষ্ঠ দরদী ছিলেন। মার্কসবাদী দার্শনিক হিসাবে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল দেশের সুধীসমাজে। তিনি বাংলাদেশে 'প্রগতি লেখক সংঘের' প্রথম সম্পাদক এবং ১৯৩৯ সালে কলিকাতায় যে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক। পার্টির বে-আইনী যুগেও তিনি পার্টির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রাখতেন, পার্টির মুখপত্র 'গণশক্তি'-রও তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক।

কমরেড সুনীল পান্থ (পার্টি দরদী)— মৃত্যু ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। হুগলী জেলা সুতাকল ও বেল্টিং মজদুর ইউনিয়নের তিনি একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। যক্ষ্মা রোগে মারা যান।

কমরেড মহেশ সরকার— দীর্ঘ দিন ধরে কালাজ্বরে ভোগার পর মালদহ জেলার কলিগ্রামের কমরেড মহেশ সরকার ১৯৪৫ সালের ২০শে এপ্রিল ৪৫ বছর বয়সে কলকাতায় পার্টির চিকিৎসা কেন্দ্রে মারা যান। কমরেড সরকার '২১ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং '২৮ সালে কলকাতার কিষাণ মজদুর সম্মেলনে যোগদান করেন। সেই সময় থেকেই পার্টির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। মালদহ জেলার পার্টি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। '৩৮ সালের চাঁচল রাজের সুদ মাপের আন্দোলনের জয়ে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

মৌঃ ছিদ্দিক রহমান— ত্রিপুরা জেলার কিষাণ কর্মী মৌঃ ছিদ্দিক রহমান পাঁচ দিন একনাগাড়ে জ্বরে ভোগার পর '৪৫ সালের ২৬শে এপ্রিল মারা যান। অগস্ট আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি ছ'মাস কারাভোগ করেন। কারামুক্তির পর তিনি জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন।

কমরেড শশীশেখর রায় চৌধুরী— চুঁচুড়ার কমিউনিস্ট কর্মী। কমরেড শশীশেখর রায় চৌধুরী চার মাস যক্ষ্মা রোগে ভোগার পর '৪৫ সালের ২১শেমে তারিখে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। চৌদ্দ বছর বয়সে সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দেন এবং '৩৩ থেকে '৩৮ সাল পর্যন্ত রাজবন্দী ছিলেন। জেলেই তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন।

কমরেড সিরাজুল হক— কিশোরগঞ্জের চাতল গ্রামের কৃষক কর্মী। কমরেড সিরাজুল হক '৪৫ সালের ৫ই জুন মাত্র ২২ বছর বয়সে মারা গেছেন। কৃষক সমিতির ও রিলিফের কাজের মধ্যে দিয়ে '৪৩ সালে তিনি পার্টি সভ্যপদ অর্জন করেন।

কমরেড লীলা লাহিড়ী— কিশোর-বাহিনীর নায়িকা কমরেড লীলা লাহিড়ী '৪৫ সালের ৮ই জুন মাত্র ১৪ বছর বয়সে মেনিনজাইটিস রোগে মারা যান। লীলা ছিলেন কোরকদি পার্টির (গোয়ালন্দ) একজন সক্রিয় কর্মী।

কমরেড নাদের হুসেন চৌধুরী— রাজশাহী জেলার কামারগাঁ এলাকার কৃষক কর্মী। কমরেড নাদের হুসেন চৌধুরী '৪৫ সালের ৪ঠা জুলাই মারা যান। পূর্বে তিনি একজন সাম্প্রদায়িকতাবাদী গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। '৪৩-এর দুর্ভিক্ষে সাধারণ দুর্দশা ও মৃত্যু তাঁকে

প্রচণ্ড নাড়া দেয় এবং তিনি পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হ'ন। ৭৫ বছর বয়সেও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই তিনি জনসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং পার্টি সভ্যপদ লাভ করেন।

কমরেড মতলেব শেখ— খুলনা শহরে পার্শ্ববর্তী রায়পাড়া অঞ্চলের কমরেড মতলব শেখ মাত্র ২৪ বছর বয়সে '৪৫ সালের ৯ই জুলাই সর্পাঘাতে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বস্ত্র আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

কমরেড স্বরূপা দেবী— ময়মনসিং জেলার পার্টি সভ্য কমরেড স্বরূপা দেবী গত ২৯শে জুন কলেরা রোগে মারা গেছেন। তিনি কৃষক আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। '৪২ সালে তিনি পার্টি সভ্য পদ অর্জন করেন।

কমরেড সারথি— কমরেড সারথি '৪৫ সালের ১১ই মে মাত্র ২১ বছর বয়সে মারা যান। '৪২ সালে তিনি পার্টি সভ্যপদ লাভ করেন। হাজং মেয়েদের মধ্যে তিনি শিক্ষিতা ছিলেন এবং বিবাহাদি ব্যাপারে হাজং সমাজের অনেক কুসংস্কার তিনি দূর করেন।

কমরেড বাণী দাশগুপ্তা— '৪৫ সালের ২২শে জুন খুব অল্প বয়সে আশুতোষ কলেজের কমরেড বাণী মারা যান। দুর্ভিক্ষের সময় আশুতোষ কলেজে রিলিফ আন্দোলনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি ছাত্র মহলে প্রিয়পাত্রী হন।

কমরেড পূর্ণিমা শীল— নোয়াখালি জেলার বারাহিপুর গ্রামের নারী সমিতির কর্মী। কমরেড পূর্ণিমা শীল '৪৫ সালের ২৬শে জুলাই মারা যান। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি রিলিফের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পার্টি সভ্যপদ লাভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ত্রিশ বছরও হয়নি।

কমরেড মটুররাম— বি.এগু.এ রেলের কাঁচড়াপাড়া পাওয়ার হাউসের শ্রমিক মটুররাম পায়ে চোট পাওয়ার পর বেশ কিছুকাল যাবৎ ভুগে '৫৫ সালের ৪ঠা অগস্ট মারা যান। রেল হাসপাতালে তাঁর তিনবার পায়ে অপারেশন হয়। কিন্তু এতেও কোন ফল হয় না।

কমরেড কল্যাণী কর— বিয়লিবাজারের কিশোর-বাহিনীর নেত্রী। ১৯৪৫ সালের ২৫শে জুলাই মারা যান।

কমরেড কালু গাঙ্গুলী— কমিউনিস্ট পার্টি বরিশাল জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কালু গাঙ্গুলী '৪৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় পার্টির চিকিৎসা-কেন্দ্রে মারা যান। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায় এবং মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে তাঁকে প্রায় অকর্মণ্য অবস্থায় বরিশাল থেকে পাটির চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। কমরেড গাঙ্গুলী স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই অনুশীলন পার্টির সংস্পর্শে আসেন। বিনা বিচারে তাঁকে ছ বছরের বেশি সময় কারাভোগ করতে হয়। বন্দী অবস্থায় তিনি পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হ'ন এবং কারাগারের বাইরে এসেই পার্টিতে যোগদান করেন।

কমরেড রতন প্রামাণিক— হাওড়া জেলার বাউড়িয়ার শ্রমিক কর্মী কমরেড রতন প্রামাণিক ১৫ই অক্টোবর ১৯৪৫, ২১ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে মারা গেছেন। কমরেড রতন ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মপন্থায় বিশ্বাস হারিয়ে '৪৩ সালে পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং রিলিফ ও মজুর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পার্টি কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠেন।

কমরেড সুধাংশুশেখর সিংহ— চব্বিশ পরগণা জেলার বহড়ু গ্রামের সুধাংশুশেখর সিংহ

১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫, ২২ বৎসর বয়সে মারা গেছেন। তিনি স্থানীয় সমস্ত জনপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বহড়ু বন্দী-মুক্তি আন্দোলন কমিটিরও একজন সদস্য ও কর্মী ছিলেন।

কমরেড বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়— ২রা অক্টোবর, ১৯৪৫ স্কটিশ চার্য কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র কমরেড বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় মাত্র ২০ বৎসর বয়সে টাইফয়েড রোগে মারা গেছেন। জনপ্রিয়তা, অমায়িকতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের দরুন সমস্ত ছাত্রসমাজ এবং শিক্ষকমণ্ডলীর তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কমরেড মহাবীর চৌহান— ময়মনসিংহ জেলার কমরেড মহাবীর চৌহান দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ২৫ বৎসর বয়সে মারা গেছেন। ছয় বৎসর পূর্বে পার্টির গোপন যুগে কমরেড মহাবীর পার্টি সভ্যপদের গৌরব অর্জন করেছিলেন। গত দুর্ভিক্ষ ও মহামারির সময় তিনি সমাজের দুস্থ ও পীড়িত জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দারিদ্র্য ও অনাহারের ফলে তখন থেকেই তাঁর দেহে ভাঙ্গন ধরে। অসুস্থ দেহ নিয়েই তিনি নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন। অর্থের অভাবে উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থাও তাঁর জন্য করা সম্ভব হয় নাই।

কমরেড বঙ্কিম শেঠ— কলকাতার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কিশোর ও ছাত্রকর্মী কমরেড বঙ্কিম শেঠ ১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৫ টাইফয়েড রোগে প্রাণত্যাগ করেন; নানা সেবা ও জনহিতকর কার্যের জন্য বঙ্কিমপল্লীর প্রত্যেকের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে তিনি পার্টির ইয়ং কমিউনিস্ট গ্রুপের সভ্যপদের গৌরব অর্জন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বৎসর হয়েছিল।

কমরেড পঞ্চানন সিংহ— ১৯৪৫ সালের ২রা ডিসেম্বর বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড পঞ্চানন সিংহের আকস্মিক মৃত্যু হয়। তিনি কদমতলা রুটের ড্রাইভার ছিলেন।

কমরেড বৈদ্যনাথ সেন— ছ'মাস রোগে ভোগের পর ১৯৪৫ সালের ১৮ই নভেম্বর কমরেড বৈদ্যনাথ দাস মারা যান। তিনি ওড়িয়া ছিলেন এবং কলকাতা প্রবাসী ওড়িয়া শ্রমিকদের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। ১৯৪৩ সালে তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯৪৪ সালে পার্টি সভ্য পদলাভ করেন। তিনি কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের একজন উৎসাহী কর্মী ও গোপবন্ধু শ্রমিক বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন।

কমরেড মুহম্মদ হারিস— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা জেলা কমিটির প্রথম মজুর সদস্য, বিড়ি শ্রমিক ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ টাইফয়েড রোগে মারা যান। বিড়ি শ্রমিকদের সংগ্রাম ও ইউনিয়ন গঠনের ভিতর দিয়েই তিনি পার্টিতে আসেন, পরে অন্যান্য কমরেডদের সহায়তায় গ্যাস শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। পার্টির বে-আইনি অবস্থায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে কলিকাতার বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে কাজ করার পর তাঁকে পাঠানো হয় ধানবাদে ও সর্বশেষে জামসেদপুরে। সেখানেই তাঁর টাইফয়েড হয়। অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতায় ফিরে ক'দিন পরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মারা যান।

কমরেড হারিসের প্রধান আগ্রহ ছিল সব কিছু জানার, মার্কসবাদ আয়ত্ত করার ব্যাপারে।

১৯৩৮ সাল পার্টি সম্পাদক কমরেড যোশীর কাছে তিনি কয়েকজন উর্দুভাষী কমরেডকে নিয়ে যান ও জিজ্ঞাসা করেন যে আমাদের পার্টির কাগজপত্র শুধু ইংরেজীতে বেরোয় কেন— তার সার্কুলার শুধু ইংরেজীতে দেওয়া হয় কেন? হিন্দী-উর্দু ভাষায় কাগজ না থাকলে, সার্কুলার দেওয়া না হলে মজুরেরা পার্টিতে কি ভাবে কাজ করবেন? কমরেড হারিস কমরেড যোশীর কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন উর্দু-হিন্দী পত্রিকা প্রকাশের। পার্টির প্রথম উর্দু মুখপত্র 'কমিউনিস্ট' প্রকাশিত হলে তিনি ঘুরে ঘুরে একাই ৫০ কপি বিক্রি করেন গোপন অবস্থা সত্ত্বেও।

কমরেড কদম রসুল— গ্যাস শ্রমিক ও লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের কর্মী, রসিদ আলি দিবসের (১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) পরবর্তী তিন চারদিনের মধ্যে মিলিটারির গুলিতে মারা যান।

কমরেড সুধাংশু চক্রবর্তী— ঢাকুরিয়া গোবিন্দপুরের লালঝাণ্ডা কর্মী। রসিদ আলি দিবসের পরবর্তী ৩/৪ দিনের মধ্যে মিলিটারির গুলিতে মারা যান।

কমরেড প্রাণগোপাল চক্রবর্তী, কমরেড সুধীর উকীল, কমরেড পবিত্র দে, কমরেড বলরাম গোপ— নারায়ণগঞ্জ কাপড় কলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপরে পুলিশের গুলিতে ইউনিয়নের এই চারজন লালঝাণ্ডা কর্মী মারা যান।

লালমোহন সেন— ১৯৪৬ সনের অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখতে গিয়ে নিহত হন। তিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলার আসামী হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ১৬ বছর আন্দামানে ও অন্যান্য কারাগারে থেকে মৃত্যুর কয়েকমাস মাত্র আগে মুক্তি পান।

'বীর মাতা' রাসমনি— ময়মনসিংহ জেলার মহিলা সমিতির বিশিষ্ট কর্মী। ১৯৪৬ সনে বহেরাতলীর সোমেশ্বরী নদীর তীরে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। ময়মনসিংহ জেলার কৃষক রমণীদের মধ্যে প্রথম শহিদ।

সুরেন্দ্র হাজং— ১৯৪৬ সনে বীরমাতা রাসমনির সহযোদ্ধা হিসাবে মাত্র ২৭ বছর বয়সে নিহত হন। তিনি কৃষক ফ্রন্টের কর্মী ছিলেন।

প্রথম প্রকাশ : ২ এপ্রিল, ১৯৬৯

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে রাজ্যেশ্বর সেন কর্তৃক ২০৮ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস পি-৪৩ ডাঃ সুন্দরী মোহন এভিনিউ, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত।

SAVE BENGAL

VOICE OF BENGAL

Synopsis & Songs Book

Happy Village Scence

MR. SAYADIANTS, Director of Soviet Film
Distribution for the Far East says :

" This is the real thing. It reminds me of Art
as we have in the Soviet Union."

Ek SUTRE by Rabindranath Tagore

This is an ode to Freedom, brimful of confidence in our united might and faith in our future. Chorus led by Binoy Roy it runs thus :

A thousand diverse minds strung on a single thread
Thousands of lives dedicated to one supreme cause—Freedom
Hail to thee, Mother !
Storms and tempests hold no threat for us
We shall plough our way through a thousand waves
This mortal life of ours may cease to be
But our strong bond of determination will never give way
Hail to thee, Mother!
Hail to thee!

GIVE ALL YOU CAN !

Bengal—the cradle of Indian patriotism, is being ravaged by disease and epidemics, the legacy of the last famine.

Nearly half the total population of 6 crores are today victims of malaria. Quinine is almost impossible to obtain except in the black market.

A Medical Relief Co-ordination Committee in which are united all relief bodies and popular organisations, has been formed under the Presidentship of the veteran Dr. B. C. Roy.

They have opened about 58 centres so far, each centre being composed of a doctor, a nurse and a batch of six or eight volunteers.

But the work done so far has only touched the fringe of the problem.' Rice is still sold in the deficit districts at Rs. 20 or 22 a maund. There are unmistakable signs of another famine, though the *aman* crop has been a bountiful one of 27 crore maunds. The Bengal Government has only been able to get 2% of the marketable .surplus, i.e., just enough to feed 1 crore people for 15 days. The rest has and is passing into the hands of rice speculators and hoarders-

Internally such appalling conditions end on top of it the Jap aggressors have crossed our frontiers. The people of Bengal must be helped to live, to be strong to resist.

Bengal needs medicines, doctors, nurses.

GIVE ALL YOU CAN AND MORE.
AID TO BENGAL IS THE WAY TO HELP THE DEFENCE OF OUR MOTHERLAND.

II. *Al RE Al by Binoy Roy*

Solo in Bengali by Binoy Roy in the famous "Bhatiali", the folk-tune most popular with Bengal's boatmen. It is the song of the boat that takes you to the Heaven of Freedom.

Composed by Binoy, it runs :

Come, oh come ! who want to get across
There is no time, brothers, no time to lose.
In the 'hats' of giving and taking
The last hour of reckoning is passing by

'Action' is the oarsman of this barge of mine
'Knowledge' grips the helm tight and firm
And it tells the world's disinherited
The way to win all plenty.

In disease, grief and hunger
Our Motherland goes up in ruin-flames
But my barge steers past and clear
From darkness towards the light.

You ! Heroes, rich in suffering

Make all humanity your own
Break through the barriers of strife
March forward for Human Liberation.

III. ANTIM ABHILASHA—A Play by Bijon Bhattacharya

Translated from the original play in Bengali into Hindi by Nemichand Jain, it is the story of a typical peasant family of Bengal and the vicissitudes it passes through.

It shows a whole humanity uprooted, dehumanised, roaming in the primordial quest for food- Honest peasants turned into selfish animals by months-long hunger.

The last desire of Paran, the peasant grandpa is that all the peasants must get back to their villages, their own Mother Earth, for the golden, life-giving Aman is standing untended in the fields.

"Go back" he says, "go back to Mother Earth, she will feed you at her breast and make humans out of you again."

SCENE I — A village in Bengal

SCENES II, III & IV— On a Calcutta Pavement.

CAST

Paran, peasant grandpa	— SAMBHU MITRA
Benda, his eldest son	— NEMICHAND JAIN
Pada, younger son	— BHUPATI NANDI
Ramzan, a neighbour	— DASHRATLAL
'Gentleman'	— SATYA JIBAN
A.R.P. Warden	— PREM DHAWAN
Manik, Benda's son	— SURENDRA
Paran's wife	— USHA DUTTA
Benda's wife	— REKHA JAIN

IV. BHOOKA HAI BENGAL by Wamiq

This is a poem composed by the young poet Wamiq Jaunpuri describing the horrors of Bengal famine and rousing the entire people of India to aid her. It is at once a powerful, pathetic and patriotic call. Particularly apt are the lines :

"The wheels of trade turn so wrongly
That life so dear has gone so cheap
Yes, cheaper than a fistful of rice O! comrade
Hungry Bengal calls.

भूखा है बंगाल

पूरब देशमें डुग्गी बाजी फैला सुखका काल
हुखकी अगनी कौन बुझाए सूख गए सब ताल
जिन हाथोंने मोती रोले आज वही कंगाल रे साथी
भूखा है बंगाल

पीठसे अपने पेट लगाए लाखों उलटे खाट
भीखमँग से थक-थक कर उतरे मौतके घाट
जियन मरनके डाँडे मिलाए बैठे चंडाल रे साथी
भूखा है बंगाल

नहीदाला गली डगर पर लार्शोको अम्बार
जानकी ऐसी महँगी शै उलर गया व्यौपार
मुट्टी भर चावलसे बड़कर सस्ता है यह माल रे साथी
भूखा है बंगाल

कोठरियोंमें गांजे बैठे बनिए सारा दाज
सुन्दर दारी भूखकी मारी बेचें घर घर लाज
चौपट नगरी कौन सम्हाले चारों तरफ भौंचाल रे साथी
भूखा है बंगाल

पुरखोंने घर-बार लुटाए छोड़के सबका साथ
माएँ रोयों बिलख बिलख कर बच्छे हुए अनाथ
सदा सुहागन विधवा राजे सरके बाल रे साथी
भूखा है बंगाल

अन्ती पन्ती चबा चबा कर झूँझ रहा है दैश
मौतने कितने घूँघट मारे बदले सौ सौ भेस
काल विकट फैलाय रहा है बीमारीका जाल रे साथी
भूखा है बंगाल

धरती माताके सीनेमें चोट लगी है कारी
माया कान्नीके फंटेमें वस्तू पड़ा है भारी
अबसे उठ जा नींदके माते देख तो जगका हालरे साथी
भूखा है बंगाल

V. HOI, HOI, HOI by Binoy Roy

Action song of peasant guerillas in the dialect of the Rangpur district of Bengal. Led by Binoy Roy. It was in 1942, when heated arguments were taking place as to whether defence of our Motherland was theoretically permissible or practically possible as long as Linlithgow was in Delhi, that Binoy Roy composed this song. It is a song that rouses to action and points the Road to Indian Freedom. The rough translation is as below—

I

Hark, Hark, HarK
The Japs are coming here
Come out O! Guerillas
The Youth of the village.

II

Come Rahim ! Come Rahman !
Come Jogesh ! Come Paran !
Come villagers—!
Hindus, Muslims;—all!

III

Sickle, axe, swords and lathis
Pike, Javelin, bow and arrow
All your weapons
Each wield firmly !

IV

Listen Luxmi! Listen Fatima !
Listen auntie, listen Bahu-ma !
Women of the village!
All of you listen !

VI

Hush, Hush, Hush
Be careful! Tread softly
Through bush and thicket
The devils musn't know we're coming.

VII

Strike with axe! Smite with lathis!
With bows- and arrows, knife and pike
Be very careful!
Not one must escape.

VIII

Inquilab Zindabad !
Ten devils laid low!
Ten rifles in our hands—
Who can stop us now ?

IX

Let a hundred Japs come
We'll knock them down like jute-stalks.
Bombs or cannon
Nothing will daunt us.

V

Sharpen all your fish-knives!
Get ready, dust and sand
Look out! The rascals must not
Enter our sacred homes.

X

Let any bastards come!
We'll mow them down
Like so many reeds
We kisans shall be free!

VI. JANG HAI JANG-E-AZADI by Maqdoom

Chorus song in Hindustani led by Mama Phansalkar of Bombay I.P.T.A. The song was composed by Maqdoom Mohideen, who was a professor in the City College, Hyderabad, Deccan. The patriotic urge was so strong that Maqdoom relinquished the professor's chair and became trade union organiser of railway labour in the Nizam's State.
Describes the Dawn of Freedom that can and must be ushered by the united action of all oppressed and exploited people of the world.

यह जंग है जंगो आज़ादी

[ले० मखदूम मुहीउद्दीन]

यह जंग है, जंगे आज़ादी, आज़ादीके परचमके तले।
हम हिन्दके रहनेवालों की, महकूमों की, मजवूरों की;
आज़ादीके मतवालों की, वहकानोंकी, मज़कानोंकी, मज़दूरोंकी;
यह जंग है जंगे आज़ादी;
आज़ादीके परचमके तले।

सारा संसार हमारा है, पूरब-पश्चिम, उत्तर-अक्खिन,
हम अफ़रंगी, हम अमरीकी, हम चीनी जाँबाजाने-वतन,
हम सुखै सिपाही जूल्म-शिकत, आहन-पहकर फौलाद-बदन
यह जंग है जंगे आज़ादी,
आज़ादीके परचमके तके।

हम हिन्दके रहनेवालोंकी महकूमोंकी मजबूरोंका,
आजादीके मतवालोंकी दहकानोंकी, मजदूरोंकी।
यह जंग है जंगे-आज़ादी,
आजादीके परचमके तले।

वह हिन्दके रहनेवालों की, महकूमों की मजबूरों की,

आज़ादी के मतवालों की, दहकानोंकी, मज़दूरों की;
यह जंग है जंगे-आज़ादी,
आजादीके परचमके तले।

लो सूर्ख सवेरा आता है, आज़ादी का, आज़ादी का!
गुलनार तराना गाता है, आज़ादी का, आज़ादी का!
देखो परचम लहराता है, आज़ादी का, आज़ादी का!
यह जंग है जंगे-आज़ादी,
आजादीके परचमके तले।

हम हिन्द के रहनेवालों की, महकूमों का, मज़बूरों की,
आज़ादी के मतवाालों की, दहकानोंकी मज़दूरों की;
यह जंग है जंगे-आज़ादी,
आजादीके परचमके तले।

VII. SWATANTRATA BHULAYANA by Ghandalia

A militant, patriotic call in Gujerati. Chorus of Bombay I.P.T.A. boys and girls led by Dina Sanghavi. Composed by Maganlal Chandalia, a kisan worker who is now organising the patriotic cultural movement in Gujerat.

जो भूलाय ना
जो भूलाय ना खतंत्रता भूलाय ना
जो जो जो जो गुलामी गमी जाय ना
वीर जनतानी शक्तिथी डरी रही
नफाखोरोना हाथमों रमी रही
एवी सत्ताथी देश बचावाय ना-जो जो
अंग्रोज़ी राज्यदमन करी रहयुं आजे
भूखमरो देश उपर फरी वळ्युं आजे
पूर्या कोंग्रेस-नेताओ कारागारमां
पड्यां कोंग्रेसने ताळां कारागारनां
तोडो बन्धन आ अन्धी सरकारना
हिन्दु-मुस्लीमो मिलावी हाथ हाथमां
चलो राष्ट्रीय सत्ता जितीए साथमां-जो भूलाय ना
लोही आंसुडाती नदी घरती पर आज

मोत रमत रमी रह्या फासिस्टो आजे
जो जो मुक्तिना दिन डूबी जायना
जो जो पूग जुगनी बेडी जकडायना
ए विनाशखोर देत्यना विनाशमां
शाहीवादनो विनाश थाय साथमां- जो भूलाय ना
हथियारो सजी सजी
निकलो मौ कमर कसी
हिन्द-माता दूश्मनथी वधेराय ना
जो जो जापानी खिला धबेडाय ना
सौ देशभक्त जागजो
युवानो तैयार हो
मर्दो होशियार हो
जो जो मातानी आबारु लुंटाय ना
हिन्द-मातानी आबारु लुंटाय ना-जो जो

VIII. STARVATION & EPIDEMICS DANCE by Panu Pal

Art that grips, art that powerfully portrays the conditions. The hoarder mints money, disregards the cry of the starving. Epidemics come in the wake of famine and a blood-curdling struggle between a people determined to live and epidemics determined to kill. It is an unforgettable portrayal. Composed by Panu Pal himself.

CAST

Hoarder — SATYAJIBAN
Destitutes— USHA DUTTA AND BHUPATI NANDI
Epidemic— PANU PAL.

IX SUNO HIND KE RAHNEWALO by Binoy Roy

Solo in Hindustani rendered by Reba Roy, the sister of Binoy who composed the song- Two lines in particular aptly awaken us to reality :
Vain is all vaunted wealth, when brothers and sisters go a-hungry, Vain is the magic word Freedom when Freedom's fighters lie dying.
It will make you empty your purse, Please don't restrain the hand.

सूनी हिन्दको रहने वालो

सूनी हिन्दु के रहनेवालो, सुनो सुनो
तुम हिन्दु हो था मुसलिम हो
औरत-मरद, अमीर फकीर सभी तुम सुनो सुनो
आजादिका झण्डा जिसने ऊँचा रखा है
दुश्मनके मुक़ाबिल जिसने मैदान लिया है
वह हिन्दुस्थानके पुरब दुआरी बंगलाके हंसान
भूख बिमारीसे लड़फर अब हो रहे कुरबान, सुनो सुनो
बेकार तुम्हारी दौलत है जब भाई बहन सब भूखे है
बेकार है आज़ादीका नाम जब लड़ने वाले मरते है
होश में आ,
आओ हिन्दु मुस्लिम आओ
अपना जो कुछ है सँग लाओ
हाथ मिलाओ आज बँगला मे
चालोस करोड़ अब क़दम बड़ाओ, सुनो सुनो
—विनय राय

FAMINE BALLET by Shanti Bardan
This is a ballet which vividly tells the story of how Bengal went the famine way and how awakened patriotism can save her and the rest of India. The ballet was conceived, planned and directed by Shanti Bardan. The music direction is by Abani Das Gupta.

Scene I
A happy village. The golden corn is brought in by the men. It is all bright and cheerful but the trader-hoarders lie in wait. The prices are tempting and despite the women's warnings all corn is sold away.

सुनहरि हुँई धानकी वालियाँ।।
मिहनत किसानोंकी ठिकाने लगी है
हवाओंमें क्या भीनी भीनी महक है।

Scene II

Starvation has begun. The men repent but it's too late. But in Calcutta- - there is food in plenty, so they say. The painful pilgrimage for food begins.

जागो भाइयो मेरे देखो तो क्या हुवा हाय
बनिये चावल लेगये घोका देके सारा
बरबादी हुई हमारी।। जागो।।
आज हम जाते है अपना घरबार छोड़कर
लौटकर फिर आयेंगे हम
घबरावो नहीं गाँ वासियों
आयेंगे दिन हमारे।

Scene III

On Calcutta pavements. Destitution, begging gets no food. People lie down and slip into graves. But the patriotism of India has been awakened. Aid is food in plenty, so they say. The painful pilgrimage for food begins.

अब नभमें पताका नाचत है, वाहरे उसका रंग।
अब घर छोड़ो तुम सब निकलो
अपने खूनसे लिख लो
आज़ादी, जनताकी आज़ादी, सरमायादारोंकी
बरबादी
निकालो, निकलो, चलो निकलो
अब शूरू हुई जंग। वाहरें उमका रंग
जनताकी वंतिम जंग।। १।।
हारे गुलामी आज़ादी चीज़ बहुत है दामी
हम रक्त बहाके खरीदहेंगे, अपना क्या है जो
नहीं देंगे।
आज़ादीके दिन जितेंगे, गुलामीके दिन बितेंगे।
आज़ादी।
अब शूरू हुई है जंग। वाहरे उसका रंग
जनताकी अंतिम जंग, हम बहल देंगे सब
ढंग।। २।।

XI. POVADA ON BENGAL by Anna Sathye

This is a Povada, folk-ballad on Bengal, composed by Anna Sathye of Bombay a textile worker from the depressed classes. He is the most outstanding example of the native genius of our people. His ballads on Lenin, on Spain, and on Stalingrad are so powerful, so vivid and so replete with poetic vision that they are demanded at every programme. Here is Anna's latest ballad on Bengal. Chorus led by Gavankar, who is himself a ballad-composer, and playwright of considerable talent.

बंगाल मारितो हांका। भारतीय युभका। उठा आतां ऐका। वांचवा त्याला घरा, सावरून।
सर्व जनतेंत ऐक्य उभारून! निराशा दुबंलता झुगारून।।
परतंत्र देश भारत। मतभेद स्थांत। फितुरीचा हात। त्यानें दु:खाचा बांध फुटला।
बंगालवरति कडा तुटका। डुकेचा महादैत्य उठला।।
ती वंगडूमी सुंदर। परंपरा थोर। क्रांतिआगर। स्वाभिमानाचा बाल्लेकिल्ला। जिथे टागोरांचा जन्म झाला। तेथें भूकेनं कहर केला।।
नफेबाज भांडवलदार। नफ्यावर नजर। कहिंनि गुरगूर। युद्धचें नांव पुढें केले। क्षोकी भरव्यांत गुंग झालें। जनतेच्या मानेवर बसके।।

(चाल बदलून)

चंगक झाली बघा त्याची नाचूं लागला।।
टाकुन मागे जनतेला। जणूं घोडा दौडूं लागला। लोकांच्या शक्तिचा ठाव त्यानं घेतला।।
घालाया होटकी त्याला। नोकर-शाहीते बेत उशीरां केला।। ती होती कंगडी नादान झाला गोटाका।।
तुरुंगांत गांधी जवाहिर आहेत या वेकां।।
मतभेद आहे इतरांत फार पसरला।।
महणून तफेबाजांता पूर्ण वाव मिकाका।।
वरपांगी कंट्रोल-कायदा लुका ठरका।।

(चाल पहिली)

भावनियंत्रणाचा कायदा। झाली म्हणे बैदा। चाईल अतां मैदा। पिसाकला नफेबाज बगका।
सांठा दडविला त्यानं सगका। गहं; बाजरी, तांडूक, जोंधका।।
भावनियंत्रण ऐकून। गेला भडकून। चिडला सडकून। धान्याचे सांठे ठेवले दडवून।
आधटीत घटना

[Pamphlet এর একটি পৃষ্ঠা না থাকাতে, সেই অংশটি দেওয়া গেল না— সম্পাদক]

compose popular songs on the new reality, the new tasks. He is the leader of the new cultural upsurge being organised by the Communist Party. The Progressive Writers and the Indian People's. Theatre Association.

2. SHANTI BARDAN : A fine dancer, he was a tutor in Uday Shankar's art centre at Almora. He is now dance-director of the cultural squad and is the brain behind the ballets and dances in this programme. He feels that art to be vital must go to the people.

3. ABANI DAS GUPTA : He is a versatile musician and was in Uday Shankar's troupe. He has come over with his wife and child and is now working as a full-time Music Director of the cultural squad.

4. DASHRATLAL : A tram conductor in Calcutta, he was a good union organiser. A good composer, he is now a whole time worker in the cultural movement.

5. SAMBHU MITRA : He is the only member of the squad who had previous stage experience. He is a fine actor. He came to the Communist Party through the cultural movement and is now director of plays in the squad.

6. NEMICHAND JAIN : He was working in the students' movement, was a progressive writer in Hindi and was on the editorial board of the Bengal Communist Party's Hindi weekly Svadhinta. A good writer he discovered that he was a good actor as well.

7. REKHA JAIN : Wife of Nemichand, she was working in the trade union movement in Calcutta. When her husband came into the squad, she came too and learnt quickly singing and dancing.

8. PANU PAL : He was a kisan worker and became an organiser of the Rangpur District Communist Party. He revealed great talent in dancing. You will see him in that awe-inspiring dance as epidemics. He composed and directed the dance.

9. BHUPATI NANDI : He worked in the students' movement in Calcutta. Became a Communist and works on the cultural front.

10. SATYAJIBAN : Was a student worker, now sings, acts and tours with the squad.

11. PREM DHAWAN : Hails from the Punjab. Became a Communist through his work in the students' movement. Is a good composer and singer. He wanted to do his best for Bengal and so joined the squad.

12. USHA DUTTA : Worked in the students' and women's movement. Became the best Kishore Bahini (Bala Sangh) organiser. She developed her talents as leader of the kids, singing, acting and dancing. She is the youngest member of the squad.

13. REBA ROY : Binoy's sister. But came to the squad in her own right. She was the leader of the Rangpur District women's movement.

14. KALYANI KUMARMANGALAM : One of the. leaders of Bengal Girl Students' movement. Her fine voice, brought her into the squad. She is married to Mohan Kumarmangalam, a member of the Central Committee of the Communist Party of India.

Printed by Sharaf Athar Ali, New Age Printing Press, 190B Khetwadi Main Road, Bombay-4 and Published by Benoy Roy, Bhavan, Sandhurst Road, Bombay-4

গণনাট্য সংঘের গানের

সংকলন

মাউন্টব্যাটেন মঙ্গল-কাব্য

মাউন্টব্যাটন সাহেব ও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও
তুমি সোনারপুরী আন্ধার কইরা ও, কই চলিলায়।।
সর্দার কান্দে, পণ্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায়
(কি রে হায় হায় হায়)
আর মাথাই-এ যে মাথা কুটে, বলদায় বুক থাপড়ায়
তোমার শ্যামা চেট্টি ভক্তবৃন্দে ও, তারা ধূলায় গড়াগড়ি যায়।।
কান্দে রাজা-মহারাজা তোমার পোষ্যবাছা
ফুঁ পাইয়া ফুপাইয়া কান্দে, ও, কালাবাজারের পেটলা হুতুম প্যাচা
তোমার নয়াদিল্লী ডুবুডুবু ও, বুঝি ভংগ বংগ ভেসে যায়।।
যেইন তোমার পরবর্তী
আইলা গোপাল রাজচক্রবর্তী
আইলা গান্ধী-ভস্ম তিলক মাথায় ধুতি-চাদর গা'য়
(মরি হায় হায় রে)
ক্লাইভ-কার্জনের বংশে বাতি বামুনে জ্বালায়
(মরি হায় হায় রে)
বামুনের খুশী মন, হাপুস নয়ন, তোমার লেডির
গাউন কান্দিয়া ভিজায়।।
রাম গেলা বনবাসে
বেউলা হইলা রাড়ি,
(আর) যুগল-ব্যাটন বিলাত গেলা
কান্দে রাজাগোপালাচারি।।
(আহা মরি মরি মা)
আহা মরি মরি মরি

দিল্লী হইতে পুষ্পরথে গেলায় উড়িয়া,
করজোড়ে ভক্তবৃন্দ আসমানে চাহিয়া।।
(প্রভু নাই নাই রে)
"কান্দিওনা সর্দার পণ্ডিত, কাইন্দনা কাইন্দনা,
আমি যাহা দিয়া গেলাম নাই যে তার তুলনা।"
(আমি যাই যাই রে)
"যাইবার যদি এটলী বাপরে তুমি কইও গিয়া,
ডোমিনিয়ন-প্রেমের ডোরে রাখে যেন বান্ধিয়া।"
(হায় নাই নাই রে)

"মিছা কেনে ভাবনা করো, ভয়ের কি-বা আছে,
অশরীরী ছায়া আমার থাকবে কাছে কাছে।'
(আমি যাই যাই রে)
"তোমার দক্ষিণ পূব-এশিয়ার গতিক ভালো নয়,
জান যে মোদের খাচাছাড়া, কখন কি-যে হয়।"
(প্রভু নাই নাই রে)
"আমরা আছি, মার্শাল আছে, আছে আমেরিকা,
এই জাহাজের হও গাধাবোট, নইলে বিষম ঠেকা।"
(আমি যাই যাই রে)
নয়াদিল্লীতে ঘোর কলিতে আইলা কল্কি-অবতার
কি বাহার
পতিত ভারত করিতে উদ্ধার।
বড় বড় দেশনেতা দিলা পায়ে ধর্ণা
তপস্যায় লভিলেন বর— স্বরাজ-অন্নপূর্ণা।
"হবে ধনধান্যে পূর্ণা
হবে ধনধান্যে পূর্ণা।"

শুন শুন শুন সবে, শুন দিয়া মন।	(ভালো বেশ বেশ)
স্বরাজের মাহাত্ম্য আমি করিব বর্ণন ॥	(,,)
পনেরো অগষ্ট দিনে সাতচল্লিশ সন।	(,,)
দশভুজা স্বরাজ-দেবী কৈলা আগমন ॥	(,,)
সাগর পারের বুড়া সিংগি রহিলা বাহন।	(,,)
দশ হাতে দেখি নূতন দশ প্রহরণ ॥	(,,)
প্রথম হাতেতে ধনের খড়্গ প্রহরণ।	(,,)
অখণ্ড দেশের মুণ্ড করিলেন ছেদন ॥	(,,)
দ্বিতীয় হাতে বরাভয়— অহিংস ব্যাটন।	(,,)
সাধুরে দমন করেন, চোরেরে পালন ॥	(,,)
তৃতীয় হাতে করেন দেবী কন্ট্রোল-নিধন।	(,,)
এক দৌড়ে চল্লিশ টাকায় ওঠে চাউলের মণ।	(,,)
চতুর্থ হাতেতে করেন বসন হরণ।	(,,)
ল্যাংটা শিবের ধর্ম দেশে করেন প্রচলন ॥	(,,)
পঞ্চম হাতে বশীকরণ-মারণ-উচাটন।	(,,)
ক্ষুধার ভূত কাঁদুনে গ্যাসে করেন বিতাড়ন ॥	(,,)
ষষ্ঠ হাতে বন্ধ করেন জাতীয়করণ।	(,,)

জাতি ভেদ দূর— আসে বিজাতি মূলধন॥ (,,)
সপ্তম হাতে গড়েন দেবী দালাল ইউনিয়ন। (,,)
কৃষক-সভা, মজুর সংঘে পাঠান বিভীষণ॥ (,,)
অষ্টম হাতে ভক্ত জনে বর বিতরণ। (,,)
মন্ত্রীগিরি, কন্ট্রাক্টরি করিলেন বন্টন॥ (,,)
নবম হাতে গান্ধী-ভস্ম ওষুধ ধারণ। (,,)
রাষ্ট্রদ্রোহী সর্বরোগে বিশল্যকরণ॥ (,,)
দশম হাতে নিরাপত্তার নাগপাশ-বন্ধন। (,,)
"লাল জুজু"— নিশম্ভুরে করিতে নিধন॥ (,,)
কণ্ঠে তার "গড্-সেভ্-দি-কিং" "জন-গণ-মন"। (,,)
দেশবাসী কর দেবীর গুণ-সংকীর্তন॥ (,,)

এবার দেশবাসীগণ গাও স্বরাজ ভজন
"রঘুপতি রাঘব মাউন্টব্যাটন"।
"জয় জয় রঘুপতি রাঘব মাউন্টব্যাটন, রঘুপতি রাঘব মাউন্টব্যাটন
টাটা-বিড়লা তেরে নাম, জয় বল্লভ গোপাল রাজা রাম।
মজুর-কিষাণ হ্যায় নিমকহারাম, মুঝকো মুনাফা দে ভগবান!"
এবার ক্ষুধা ভুলে নামের সুধায় হও সবে মগন॥
যে বাশীতে বাজলোরে ভাই স্বরাজের বাশরী,
সেই বাশ যে ডাণ্ডা হইয়া মাথায় মারলো বাড়ি॥
(আহা মরি মরি মরি)
মাটি চাইয়া লাঠি পাইলাম দিয়া বুকের খুন,
হাসির বদল ফাসি পাইলাম, দুই-এরবদল চুণ॥
(আহা মরি মরি মরি)
চাকরী চাইয়া ছাটাই পাইলাম, কাপড় চাইয়া দড়ি,
এখন কলস যে ভাই কিনি, হাতে নাই তো এমন কড়ি॥
(আহা মরি মরি মরি)
হিন্দুস্থানে শ্বশুরবাড়ী, পাকিস্তানে ঘর,
মধ্যিখানে ভূতের ময়দান, বউ যে হইল পর॥
(আহা মরি মরি মরি)
রাম রাজ্য চাইয়া পাইলাম হনুমানের বংশ,
লেজের আগুন দিয়া সোনার লংকা করে ধ্বংস॥
(আহা মরি মরি মরি)
ঠগের বাড়ী নিমন্তন্ন বুঝিলায় অবেলা,
রাজভোগ খাওয়াইব কইয়া খাওয়াইল কাচকলা॥
(আহা মরি মরি মরি)

মাথায় ভাঙলো কাঠাল ভাইরে মুখে লাগলো আঠা
স্বরাজের মন্দিরে আমরা হইলাম বলির পাঠা ॥
(আহা মরি মরি মরি)

(২)

মর্মেতে আজ যাচ্ছি মরে ভাই দুঃখেতে আর লজ্জাতে
জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন আমার অস্থিতে আর মজ্জাতে ॥
নরনারীর রক্তের ধারা, পথে পথে ঝরায় যারা,
ভাঙতে তাদের অন্ধকারা, সাজবে রণসজ্জাতে ॥
রক্ত-নদীর উঠছে তুফান, ধরবে কসে রক্ত নিশান,
সোনার দেশকে করলো শ্মশান, যত ছদ্মবেশী বজ্জাতে ॥
পরবি যদি জয়ের মালা, দিকে দিকে আগুন জ্বালা,
সাজিয়ে নেবে পূজার ডালা মৃত্যুচিতা-শয্যাতে ॥

তোরা ভাঙরে ভাঙ অন্ধ কারাগার,
জেলখানার ঐ দরজাতে ভাই ঝাঁপিয়ে পড় এবার ॥
নির্য্যাতিত মজুর চাষীর আদর্শ সন্তান,
অনশনে তিলে তিলে দিচ্ছে নিজের প্রাণ ॥
লৌহ কারাপ্রাচীরের ঐ অন্তরালে বসে',
গর্জ্জিছে অনবরত নিষ্ফল আক্রোশে ॥
নলিনী বিধান আর ঐ দত্ত মজুমদারে,
সহায় হারা বন্দীদের গুলি করে মারে ॥
কোথায় আছো জন্মভূমির আদর্শ পূজারী,
কোথায় আছো বাংলা দেশের বীরাংগনা নারী ॥
কোথায় আছো ঘরে ঘরে দানব দলনী
ভীমা-ভয়ংকরী-বেশা নৃমুণ্ড নালিনী ॥
কোথায় আছ আর্য্য জাতির বীর বংশধর,
সূর্য্যসেন আর ক্ষুধিরামের জয় সহচর ॥
মাতৃরক্ত পড়ছে ঝরে বসুধার ঐ বুকে
নির্বিকারে চুপটি করে' রইবো বা কোন মুখে ॥
অহল্যার আত্মা কাঁদে দূরে ঐ দূরে,
প্রতিধ্বনি আসছে ভেসে বিদ্রোহেরি সুরে ॥
প্রতিভার প্রতিটি ঐ রক্তের কণিকা,
ডাক দিয়ে যায় ঘরে ঘরে, ডাকছেরে লতিকা ॥
ধর্ষিতা ঐ কুলবধূর তপ্ত অশ্রুধারা,
তীব্র কশাঘাতে কহে ওঠরে ছন্নছাড়া ॥

আখেরি তো আসছে এবার যত পাওনা দেনা,
রক্ত দেওয়া নেওয়ার মাঝে হিসেব করে নে না।।

(৩)

এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্‌রে ভাঙ্‌রে ভাঙ্
দুঃশাসনের অন্ধ কারা ভাঙ্‌রে ভাঙ্
ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌রে ভাঙ্।
বন্দীরা সব বীরের মত লড়াই করে দিচ্ছে প্রাণ,
বাইরে থেকে মিছিল নিয়ে তীব্র আঘাত হান্।
তোমরা দেখেছিলে মুক্ত স্বাধীন
জনগণ জীবনের স্বপ্ন রঙিন
এলো যে পিশাচেরা
স্বপন কেড়ে নিল
মুখোসে মুখ ঢেকে
বিষের ছুরি দিল।
ক্ষেতে খামারে পথে শহরে কত জীবন হয় বলিদান।
নেহেরু মস্ত গান্ধী ভক্ত
দুহাতে সে মেখেছে গরীবের রক্ত
সুমথ মুকুলেরে
জেলেরি আড়ালেতে
বুলেটে খুন ক'রে
চাহে যে পার পেতে।
গর্জে জনতা বাঁধে একতা নির্ভীক শপথে হও আগুয়ান।

(৪)

ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে, আলো ফুটছে, প্রাণ জাগছে,
জাগছে জাগছে
গুরু, গুরু, গুরু গরু ডম্বরু পিনাকীর, বেজেছে বেজেছে, বেজেছে
মরা বন্দরে আর জোয়ার জাগানো ঢেউ
তরণী ভাসানো ঢেউ উঠছে।।

শোষণের চাকা আর ঘুরবেনা ঘুরবেনা
চিমনিতে কালো ধোঁয়া উঠবেনা উঠবেনা
বয়লারে চিতা আর জ্বলবেনা জ্বলবেনা
চাকা ঘুরবেনা— চিতা জ্বলবেনা— ধোঁয়া উঠবেনা—
লাখেলাখ করতালে হরতাল হেঁকেছে হরতাল, হরতাল, হরতাল—
আজ হরতাল, আজ চাকা বন্ধ।।

(আর) পারবেনা ভোলাতে মধুমাখা ছুরিতে
জনতাকে পারবেনা ভোলাতে
(আর) পারবেনা দোলাতে মরীচিকা মায়াতে
বিভেদের ছলনায় ছলিতে
মিছিলের গর্জ্জন দুর্জ্জয় শপথে গর্জ্জে
আর হরতাল, আজ চাকা বন্ধ ॥

(৫)

হেই সামালো, হেই সামালো
হেই সামালো ধান হো
কাস্তেটা দাও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেবনা, আর দেবনা
রক্তে বোনা ধান, মোদের প্রাণ ॥

চিনি তোমায় চিনি গো
জানি তোমায় জানি গো
সাদা হাতীর কালা মাহুত তুমিই না?
জান কবুল আর....

পঞ্চাশে লাখ প্রাণ দিছি
মা বোনেদের মান-দিছি
কালো বাজার আলো করো তুমিই না?
জান কবুল আর...

(মোরা) তুলবোনা ধান পরের গোলায়
মরবোনা আর ক্ষুধার জ্বালায়— মরবোনা
তার জমি, যে লাঙ্গল চালায়
ঢের সয়েছি আর ত' মোরা — সইবনা
লাঙল ধরা কড়া হাতের শপথ ভুলো না—
জান কবুল আর...

(৬)

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা ॥
তোমার গুলির তোমার ফাঁসীর
তোমার কারগারের পেষণ
শুধবে তারা ওজনে তা— এই জনতা ॥

তোমার সভায় আমীর যারা
ফাঁসীর কাঠে ঝুলবে তারা
তোমার রাজা মহারাজা
করজোড়ে মাগবে বিচার
ঠিক জেনো তা— এই জনতা ॥

(তারা) নতুন প্রাতে প্রাণ পেয়েছে
(তারা) ক্ষুদিরামের রক্তবীজে প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে
(তারা) জালিয়ানের রক্তস্নানে প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে
(তারা) ফাঁসীর কাঠে জীবন দিয়ে প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে
(তারা) গুলীর ঘায়ে কলজে ছিঁড়ে প্রাণ পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে
প্রাণ পেয়েছে— এই জনতা ॥

নিঃস্ব যারা সর্ব্বহারা তোমার বিচারে
সেই নিপীড়িত জনগণের পায়ের ধারে
ক্ষমা তোমায় চাইতে হবে নামিয়ে মাথা হে বিধাতা
রক্ত দিয়ে শুধতে হবে নামিয়ে মাথা হে বিধাতা
ঠিক জেনো তা— এই জনতা ॥

(৭)

মানবোনা এ বন্ধনে মানবোনা এ শৃঙ্খলে
মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা অধিকার
খর্ব করে যার ঘৃণ্য কৌশলে।
দুই শতাব্দীর নাগপাশ বন্ধন
নিঃস্ব হোলো কত অগণিত প্রাণ মন
দুঃশাসন ভেঙে মুক্তির তরে হায়
লাখো শহিদের অমূল্য প্রাণ যায়
মূল্যে তার যারা মসনদে গদীয়ান
জনতার দাবি দুই পায়ে দলে ॥

আজ দিকে দিকে আর্তের হাহাকার—হায়রে—
মাতা শিশু কাঁদে ঘরে ঘরে অনাহার—
বিদেশীর পাতে উচ্ছিষ্টের ভোজে
স্বার্থবাদী তার লুঠের স্বরাজ খোঁজে
অন্ন দেয় নাকো বুভুক্ষু জনতায় (তারা)
কণ্ঠরোধ করে লাঠি রাইফেলে ॥

আজ দেশে দেশে জনগণ তৈয়ার,
মুক্ত চীন জাগে, বর্মা মালয় আর।
গোলামীর যতো শোষণের দাসখত,
পায়ে দলে' গড়ে নতুন ভবিষ্যৎ।
বিশ্বযুদ্ধের চক্রান্তের জাল
ছিন্ন করে যারা আমরা সেই দলে॥

জমা আছে মনে রক্তের যতো ধার,
প্রতি বিন্দুতে শোধ দিতে হবে তার।
জেনে রেখো তুমি বিদেশীর তাঁবেদার
তোমাদের দিন শেষ হবে এইবার।
শেষ যুদ্ধের দুর্বার আঘাতে
সারা ভারত জুড়ে হবে তেলেংগানা॥

(৮)

নাকের বদলে নরুণ পেলুম— টাক ডুমাডুম ডুম
জান দিয়ে জানোয়ার পেলুম— লাগল দেশে ধুম।

আমরা হলাম বোকা ছেলে, কি বা বল বুঝি
(মোদের) যেমনি চালাও তেমনি চলি চোখের ঠুলি পুঁজি
(আর) ঘুরঘুর ঘুরে ঘোরাই ঘানি বুঝিনে তেলানী—
ও একচেটে তোমাদের রইল
চোখ বুঁজে মোরা রামনাম জপলুম॥

তোমরা বল আমরা শুনি মিঠে কড়া বুলি
(তাই) সত্যি ভেবে পাঁচু রহিম খেয়ে মরল গুলি।
বড় বোকা ছিল দাবাবোড়ের চাল বোঝেনি তারা
আজ কিস্তি মাত্ করেছো, আমরা
যেই ঘুঁটি সেই ঘুঁটিই রইলুম॥

আমার বাবাও বোকা ছিল আমি তো তার ছেলে
(সে) বিলেতী কাপড় পুড়িয়ে গিয়েছিল জেলে
(আর) তোমরা কেমন দেশী সুতোয় বানালে গাঁট ছড়া
তার এককোণ বাঁধলে গাউনের সাথে
আর এক কোণ গলায় দিয়ে ঝুললুম॥

(তবু) তোমরা আমরা প্রভেদ কি আর রাম রাজত্বের দেশে
(এই) এক ঘাটে জল খাবে বুঝি বাঘেতে আর মেষে।

(তাই) তোমরা রাজভোগ খেলে আমরা ঢেঁকুর তুলি কসে
(আজ) তোমরা প্রাসাদ চূড়ায় রইলে
আমরা তাহার ইঁট কাঠ বইলুম॥

আমার ছেলে মেঝেয় পড়ে বুড়ো আঙুল চোষে
(সে) বোকা ছেলে ক্ষিদে পেলে হঠাৎ কেঁদে বসে
(ওসে) বোঝে না তো আইন কানুন বড্ড বোকা কি না।
(তোমার) ক্ষুধাহরণ গুলি বিনা
চোখে তাহার আসবে না ঘুম॥

আমার ভিটেয় চরলো ঘুঘু ডিম দিল তোমাকে
(সেই) আজব ডিমের-আজব শিশু খাস দিল্লীতে থাকে
শোনো শিশুর পরিচয়
ওসে যেমন তেমন নয়ক' শিশু মস্ত মহাশয়
এই মোদের গায়ের চামড়ায় তার কাঁথা সেলাই হয়,
(ওই) হিটলার তাহার জ্যাঠা ছিল মুসোলিনি মেসো—
(আর) মার্কিন দেশের মার্শাল মাসী
পাঠায় খেলনা ডলার ঝুমঝুম॥

আমার প্রতিবাদের ভাষা

(৯)

আমার প্রতিবাদের ভাষা
আমার প্রতিরোধের আগুন
দ্বিগুন জ্বলে যেন দ্বিগুন
দারুণ প্রতিশোধে করে চূর্ণ
ছিন্নভিন্ন শত ষড়যন্ত্রের জাল যেন
আনে মুক্তির আলো আনে
আনে লক্ষ শত প্রাণে॥

আমার প্রতি নিঃশ্বাসের বিষে
বিশ্বের বঞ্চনার ভাষা
দারুণ বিস্ফোরণ যেন
ধ্বংসের গর্জ্জনে আসে।
যত বিপ্লব বিদ্রোহের আমি সাথী
আমি মাতি যুদ্ধে বার্সিলোনায়, তেলেঙ্গানায়-
আমারই রক্ত ঝরে—

কাকদ্বীপে, ডোঙাজোড়া, কমলাপুরে
আমারই রক্তে রচি
মৃত্যুর পরোয়ানা জীবনের স্বাক্ষরে।
মুক্তির অন্তিম দ্বন্দ্বে
ছন্দে ছন্দে রচি
গণতন্ত্রের গান যত।
আনে মুক্তির আলো আনে
আনে লক্ষ শত প্রাণে।

(১০)

আয়রে ও আয়রে
ভাইরে ও ভাইরে
ভাই বন্ধু চলো যাইরে।
ও রাম রহিমের বাছা
ও বাঁচা আপন বাঁচা
চলো ধান কাটি আর কাকে ডরি
নিজ খামার নিজে ভরি
কাস্তেটা শানাইরে॥

চাষী হ'বে জমির মালিক স্বরাজ হলে শুনি (ভাইরে)
এখন মালিক যত ঘুঘু শালিক পেশাদারী খুনী (ভাইরে)
আর নেতা বড় বড়
সব বক্তৃতাতে দড়
এখন নিজ হাতে ভাগ্য গড়ার
এসেছে সময় রে॥

লাল বাঁদরের পোষা হাতীর অত্যাচারে কত
ভেঙেছে ঘর মরেছে ভাই মা বোন লক্ষ শত
ঐ কমলাপুর বড়া
আর কাকদ্বীপ ডোঙাজোড়া
এসেছে ডাক চলনা সবাই
সোনা তুলি ঘরে॥

ও গাঁয়ের যত জোয়ান মরদ লাঠি নিও হাতে (ভাইরে)
আর খুনে রাঙা ঝাণ্ডা যেন থাকে সবার সাথে (ভাইরে)
আর দুশমন যদি আসে

যেন চোখের জলে ভাসে
যেন লুটে খাওয়ার ক্ষুধা তাহার
মেটে একেবারে॥

ও গাঁয়ের যত মা বোন আছো তোমরা থেকো ঘরে
ঐ আঁশবটি আর কাটারিটা রেখো হাতে করে
যেন দালাল বেইমান যত
পায় শিক্ষা উচিত মত
বোঝে— এই বাংলা দেশের মা বোন কত
শক্তি হাতে ধরে॥

(১১)

শুক-সারী সংবাদ।

হস্তিনাপুর নগরের এক কদমগাছের মগডালে,
শুক-সারীতে হঠাৎ দেখা আজ তারিখে এই সালে॥

সারী বলে শুক্ তোমার পাইনে দেখা কেন
শুক বলে হয়েছি মন্ত্রী শোননি এখনো!
সারী কাগজ পড়ো।
সারী বলে তোমার পালক চক্চকে বেশ দেখি
শুক বলে হবেই তো, রাম নামের গুণ নয় মেকি
ফল দেয় হাতে হাতে
সারী বলে কণ্ঠ তোমার আগের মত নেই
শুক বলে প্রত্যহ কত বক্তৃতা যে দেই
সারী জানতে যদি।
সারী বলে তোমায় কটা কথা জিগেস করি
শুক বলে জল্‌দি বলো, মোর সইবো না তো দেরি
আমার সময় যে কম।
সারী বলে ভাত কাপড়ের বাড়ল কেন দাম?
শুক বলে সে তো চড়া দামে কেনার পরিণাম
অর্থনীতি জানোনা?
সারী বলে তোমরা এবার মোদের অভাব মেটাও
শুক বলে তাইতো বলি, "উৎপাদন বাড়াও
ধর্ম্মঘট করোনা।"
সারী বলে মালিক তবে ছাঁটাই করে কেন?
শুক বলে তা-না হলে জিনিষের দর জেনো

মোটেই কমবে না তো।
সারী বলে এতদিন তো না খেয়ে কাটালাম
শুক বলে ঠিক ঐ কথাটাই মিটিংএ বলছিলাম
আত্মার আয়ু বাড়ে।
সারী বলে চোরাকারবারীদের হচ্ছে ফাঁসি কবে?
শুক বলে ওরা এবার স্বদেশ-প্রেমিক হবে
শপথ নিয়েছে যে।
সারী বলে বড় খাতির করো বিদেশী-বনিকে
শুক বলে ওরা মহাজন যে, থাক্‌লে ওরা টিকে
দেশের কল্যাণ হবে।
সারী বলে ব্যাখ্যা এমন শুনিনি কখনো
শুক বলে মন্ত্রীগিরি সোজা তো নয় জেনো
মগজ খাটাতে হয়॥
সারী বলে বাস্তুহারার উপায়টা কি হবে?
শুক বলে আন্দামানে গেলেই সুখে রবে
সে তো ঢের বলেছি।
সারী বলে কিষাণ-মজুর রাজ্য পাবে কবে?
শুক বলে আর দশটা বছর সবুর করতে হবে
ওকি একদিনে হয়?
সারী বলে আইন কানুন বানাও খুশি মত
শুক বলে শাসনকর্ত্তার সেটাই যে সঙ্গত
নজির অনেক আছে।
সারী বলে ধাপ্পা দিয়ে কতদিন চালাবে?
শুক বলে মোর মনে হচ্ছে তোমার কথার ভাবে
তুমি দেশদ্রোহী।
সারী বলে পষ্ট কথা শুনতে খারাপ বড়ো
শুক বলে বুঝলাম তুমি কাদের সঙ্গে ঘোরো
তোমায় শিক্ষা দেবো।
সারী বলে এটা তোমার কণ্ঠরোধের ফন্দী
শুক বলে নিরাপত্তা আইনে হলে বন্দী
এবার জব্দ হবে।
সারী বলে জবাবদিহির দিন বেশি নয় দূরে
শুক বলে একবার এসো শ্বশুরবাড়ী ঘুরে
তারপর দেখা যাবে।

এত বলি শ্রীশুক পক্ষী পুলিশ ডাকিল
(আর) রাইফেল হাতে তারা সবে অমনি আসিল

সারীকে তাহারা ধরে জেলে নিয়ে গেল
(আর) প্রেমানন্দে একবার সবে হরি হরি বলো॥

(১২)

আর কত কাল, বল কত কাল, সইব এ মৃত্যু অপমান।
প্রাণ আর মানেনা।
শহর বন্দরে ... কুটীরে নর-খাদক দলের অভিযান
এ আর সহেনা॥

কমলাপুর শহিদ ডাকে আয়রে আয় আয়রে
ডোঙাজোড়ার শহিদ সুরেন তোদের পানে চায়রে
চন্দনপিঁড়ির সরোজিনী অহল্যা মা, তাদের খুনের তর্পণ হ'বেনা
এ আর সহেনা॥

সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে ফলালো যে সোনা
তার মা বোনের রক্তে হোলো সোনার মাটি লোনা
রক্তের ধার বেঁধে মোদের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে, কবে বল কবে শুধব তা
এ আর সহেনা॥

শুনি নাকি স্বরাজ এখন, এইকি তার নমুনা
মা বোনেরি ইজ্জৎ লোটে কোন্ স্বরাজের সেনা
চরখা নয়, খদ্দর নয় আর, নয় অহিংসাব বুলি,
বুকে বেঁধে গরম সীসার গুলি
এ আর সহেনা॥

অহল্যা মা তোমার সন্তান জন্ম নিলোনা
ঘরে ঘরে সেই সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা
শত কংস ধ্বংস করে সে শিশু জন্মিবে মাঠে মাঠে তারি জল্পনা
এ আর সবোনা॥

চাষীর ঘরে উঠবে ধান ঘুচবে দেশের অকল্যাণ
আর দেবোনা রক্তে বোনা ধান— এ আর সবো না।
আর ডরিনা দুশমনেরে জেল ফাঁসী কি বন্দুকেরে
এক প্রতিজ্ঞা জানের বদলা জান— এ আর সবো না।
ডাক দিয়েছে তেলেঙ্গানা, তার জমি যে ফলায় সোনা।
কে রোখে আজ মোদের অভিযান— এ আর সবো না।
মুক্ত স্বাধীন এ দেশ হ'বে প্রতি মায়ের কোলে রবে
অহল্যা মা তোমারি সন্তান— এ আর সবো না॥

কিষাণ-কিষাণী-কথা

(১৩)

কিষাণী— পুলিশের গুলিতে আমার স্বামী পুত্র হায়
পরাণ যে হারায় এখন কি হবে উপায়।
জমি দখল করতে গিয়ে মাটিতে লুটায়
রক্তে ভেসে যায় এখন কি হবে উপায়।

কিষাণ— চোখেরি জলে বুকেরি অনল নিভায়োনা
দুশমন শাসকের তাণ্ডব দেখে ডরায়োনা
বুকে জ্বালো চিতা, চিতা নিভায়োনা
সে আগুনে জাগো জাগো ডরায়োনা।

কিষাণী— এ কি মোর কপালের লিখন
হারাইনু আপনার জন
কোথা যে দাঁড়াই
আমার সুখের সংসার ছিল
দারুণ বিধি হরে যে নিল
দয়া মায়া নাই।

কিষাণ— অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, জমি নাই
অন্ন বস্ত্র জমি নাই হায়রে সুখের সংসার
মাথা গোঁজার ঠাঁই নাই
হায়রে সুখের সংসার
বাঁচতে হলে লড়তে হবে নইলে নাহিরে নিস্তার!

কিষাণী— ওরা কত পুলিশ পোষে সৈন্য রাখে খাড়া
ওদের সাথে যাবে কিরে পারা
আমরা হলাম গরীব চাষী ভয়ে দিশেহারা
লড়তে গিয়ে পড়বো সবাই মারা।

কিষাণ— সবাই মিলে জোট বাঁধিলে কে দমাবে আমাদের
একটি প্রাণের বদলা নোব দশটি পরাণ দুশমনের

কিষাণী— ওদের আছে গুলি বারুদ সে যে বড় ভয়ংকর

কিষাণ— শাবল কুড়ুল দিয়ে মোরা জবাব দেব মুখের পর।

কিষাণী— ঘর জ্বালাবে পুড়িয়ে মারবে ওদের ত আর বিবেক নাই,

কিষাণ— বিদ্রোহেরি আগুণ দিয়ে আমরা ওদের করব ছাই।

কিষাণী— তোমরা যা আজ বলছো ক্রমে হচ্ছে যেন পরিষ্কার,

কিষাণ— সোজা কথা করতে হবে বেনিয়মের প্রতিকার।

কিষাণী— আমি যে অবলা নারী কতটুকু শক্তি মোর,

কিষাণ— ডুবিরভেরির পুষ্প, পাঁচু কোথায় পেলো এতো জোর।

কিষাণী— ঐ পথে কি সত্যি তবে আসবে নতুন সুখের দিন,
কিষাণ— ও ছাড়া আর নাই যে উপায় লড়তে হবে বিরাম হীন।
কিষাণী— দেখ আমি চোখেরি জল এবার তবে মুছিলাম—
কিষাণ— প্রতিশোধে ... নিলাম।
কিষাণী— স্বামী পুত্র শোক ভুলে সবার তরে জাগিলাম—
কিষাণ— প্রতিশোধের শপথ নিলাম।
কিষাণী— ভয়ের শিকল ছিঁড়ে এবার প্রাণে আগুণ জ্বালিলাম—
কিষাণ— প্রতিশোধের শপথ নিলাম!
কিষাণী— দুঃশাসনের রক্ত লাগি মাথার বেণী খুলিলাম,
কিষাণ— প্রতিশোধের শপথ নিলাম।
কিষাণী— জমি দখল না করে আর থামব না যে মানিলাম—
কিষাণ— প্রতিশোধের শপথ নিলাম।

সকলে— আয়রে সবাই নতুন দিনের গান গাই তবে
এই দুনিয়া দখল নিতে হবে।
মৃত্যুকে আজ তুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলো সবে
এই দুনিয়া দখল নিতে হবে।
শক্ত হাতে রক্ত নিশান উড়াও এবার গৌরবে
এই দুনিয়া দখল নিতে হবে॥

(১৪)

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা।
অনশন বন্দী ক্রীতদাস—
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস!

সনাতন জীর্ণ কু-আচার
চূর্ণ করি জাগো জনগণ

ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবনমরণ করি পণ।

শেষ যুদ্ধ শুরু কমরেড্
এসো মোরা মিলি এক সাথ
গাও ইন্টারন্যাশনাল
মিলাবে মানব জাত।*

* কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গানের বঙ্গানুবাদ।

(১৫)

তোড়ো বন্ধন তোড়ো, যে অন্যায়কে বন্ধন॥
হম ক্যা জানে কে ভারত মে আয়া হ্যয় স্বরাজ (ভৈয়া)
আজ ভী হম ভূখে নংগে হ্যঁয় আজভী হম মোহ্তাজ (ভৈয়া)
রোটী মাংগে তো খায়ে হম লাঠি গোলী আজ
সামরাজকে ঠোকরমে হ্যয় সারে দেশকী লাজ!

অ্যয় মজদুর কিসানো, অ্যয় দুখিয়ারে ইনসানোঁ—
ঝুটি আশা ছোড়ো— ॥
সও সও ওয়াদে করকে হমসে লিয়ে জিন্‌হোনে ভোট (ভৈয়া)
আজ হমীপে করতে হ্যয় বো কানুনকী চোট (ভৈয়া)
না হরতাল কা হক্ না জথ্যা বন্দীকা অধিকার
গলা হামরা ঘুঁটা লেকর আজাদী কী ভোট।
অ্যায় মজদুর কিসানো... ॥
কল্ জিনকে নারোসে ভড়কী আজাদী কী আগ (ভৈয়া)
আজ বোহী নেতা গাতে হ্যঁয় সমঝোতেকে রাগ (ভৈয়া)
অব বড়তী হ্যয় বিড়লা টাটা মে ভী শাহী লুট
অব ডসতে হ্যঁয় মিবকর হমকো গোরে কালে নাগ!
অ্যয় মজদুর কিসানোঁ... ॥
হমতো ঝুটে ঔর সচ্চে হ্যয়য়ে ধনদৌলত বালে (ভৈয়া)
হম গদ্দার ঔর দেশভগত্ হ্যয় য়ে বনিয়ে য়ে লালে (ভৈয়া)
হমতো ক্যয়দী ঔর আজাদ হ্যয় চোর মুমফাখোর
অ্যয় কৌমী সরকার তেরে হ্যয় য়ে কানুন, নিরালে!
অ্যয়, মজদুর কিসানোঁ... ॥
ডোল রহা হ্যয় রাজ সিংহাসন সরকারী নেতায়োঁ (শুনলো)
আখির কবতক চল্ সকতী হ্যয় য়ে কাগজকী নাও (ভৈয়া)
ন হ্যয় জনতাকী আঁখোমে দিলমে লাখো তুফান
য়ে তুফান অব রুকন সাকংয়ে আও সাথী আও।
অ্যয় মজদুর কিসানোঁ... ॥

(১৬)

অ্যাব্ কমর বাঁধ্ তৈয়ার হো
লক্স্ কোটি ভাইয়োঁ।

হম্ ভুখ্‌সে মরণে ওয়ালে
ক্যা মওত্‌সে ডরণে-ওয়ালে
আজাদী কা ডংকা বজা
উঠাও অগ্নি-ধ্বজা
বর্গ-যুধকি শেষ পুকার
আতি হায় বারংবার
হো তৈয়ার হো তৈয়ার!
মজদুর হোসিয়ার!
হো কিসান্ হোসিয়ার!
ভীত বুঝ দিলোঁকি হার
কভি নেহি করেংগে স্বীকার।*

* ১৭৪৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের গান "লা মার্সাই" এর হিন্দী অনুবাদ।

(১৭)

আইল্ লাল ঝাণ্ডাকে জমনবা
কুর্সী ছোড়ইকে পড়ি
আইল্ মার্কস্বাবাকে জমনবা
কুরসি ছোড়ইকে পড়ি
আইল মজদুর কিষানকে জমনবা
কুর্সী ছোড়ইকে পড়ি
কুরসী ছোড়ইকে পড়ি, সর্দার ছোড়ইকে পড়ি
পণ্ডিত ছোড়ইকে পড়ি, বাবা ছোড়ইকে পড়ি!
করবা কিত্নে তু দমনবা, লড়কে লেব হিন্দুস্তানবা
কুরসী ছোড়ইকে পড়ি।
খদ্দরধারী জিমিদারবা, অব ন বাঁচি হ্যয় পরণবা
লড়কে লে ভাই হিন্দুস্তানবা
কুর্সী ছোড়ইকে পড়ি।
ভাইয়া আর্থিক সঙ্কট কিৎনেকে ভিখারী কৈলাত্ না
নেহেরু সরকারবা গদ্দারি কৈলাত্ না
কিত্নে বচ্চে দুধকে খাতির মাকে গোদমে মর গয়েঁ
কিতনে শহিদ হো গয়েঁ
কিতনে পড়ে ফুটপর রোটী কাপড়াকে মহতাজ্ ভৈলানা
আথিক...
মৌত কফ্ ফন্ লেকে হাথমে আগে কদম বাড়ায়েকে পড়ি।
আইল্...
ভৈয়া নেহেরু সরকারবা হিটলারশাহী কৈলাত্না
নামধারী সোস্যালিষ্টবা গুণ্ডাদল জুটালৈস্না
মৌত্কি ঘন্টি বাজনে বালে উঠো বিশ্ব মজদুর—
লেলো বদ্লা ইন্ জালিমসে খুনকা বদলা খুন
না পস্তাবেকে পড়ি।
আইল্ ...

বংশী বটব্যাল কর্তৃক কায়েদে আজম প্রেস, ঢাকা হইতে মুদ্রিত।

IN EASTERN PAKISTAN "LIKE REVOLUTIONARY ARCHITECTS BUILD A NEW SOCIETY FREE OF IMPERIALISM"

By BHOWANI SEN

BENGAL COMMUNIST LEADER'S CALL TO MUSLIM YOUTHS

Two dangers face the people of East Pakistan today-the danger from British Imperialism and the danger from American Imperialism.

More than 80 percent of the population of East Pakistan lives on land. How appallingly poor this province is apparent from the one fact that 85 percent of Bengali's Industries are situated in West Bengal.

The lords of British monopoly capital will not easily give up the temptation of exploiting the backward, over-populated East Pakistan which depends mainly on agriculture. Besides, American Imperialism is also waiting to establish foothold here. They have mainly three objectives :

1. To invest capital in Industries.
2. To import and sell surplus goods from their own countries.
3. To purchase raw materials cheap.

This is precisely why the British wish that Pakistan would remain within the British Empire. They bank on the hope that the league leaders will not dare to take upon themselves the liability of declaring Pakistan completely independent, because of its backwardness.

If the league leaders surrender to British & American capitalists, because the State and Society of East Pakistan have to be built through blood and toil, Pakistan will remain but prison-house of foreign imperialism.

If the freedom of East Pakistan has to be achieved and maintained, the State and society of this Province have to be built up without the "help" of foreign imperialism.

Total Overhaul

Most of the districts of East Bengal are still being ground down by famine. The distressed kisans and artisans cannot sustain themselves even by begging. The official supply machinery has broken down. To prevent such recurrence of famine, there must be a complete overhaul of the system of cultivation.

It is through resisting famines that the foundation of East Pakistan will have to be laid, and so the first step of the new State should be the abolition of the Zamindari system without compensation.

By abolishing Zamindari and by exempting the peasants from all outstanding rents, the treasury, under the heading of agriculture, will get eight crores of rupees every year. Even by relieving the peasantry from the rent on land and by instituting instead the system of agricultural income tax, the exchequer will get from this source about five crores of rupees every year. By spending this five crores annually on proper irrigation, drainage and on the supply of suitable manure, seeds and healthy ploughoxen, the yield from land can be increased at least by 30 percent per bigha. Thus not only the present deficit in food in East Bengal be eliminated, but even a surplus may be for export abroad.

In the draft Bill prepared by the Bengal Government for the abolition of Permanent Settlement, there is provision that the excess land of those possessing more than 100 Bighas will be distributed among landless cultivators and share-croppers. This clause must at all costs be put into effect, and with it there must be a ban on sharecropping on 50-50 basis.

Tebhaga Without Delay

Until the land belonging to big Zamindars and Jotedars, as well as fallow lands, is actually distributed among the sharecroppers and other sections of poor cultivators, special legislation for the intervening period must be immediately promulgated establishing Tebhaga. The sharecroppers must by law get two-thirds share of the crop. Otherwise the owner of the land demanding half the share of the crop must be compelled to bear half the expenses of cultivation.

If Pakistan is "kept under the wings of Zamindars and Jotedars, it will not be long before she will turn 'Goresthan' (graveyard). But the

People of Pakistan must live, and they must live like free men. It is possible to do so if the Hindus and the Muslims unitedly strive in order to rid Pakistan of the curse of Zamindars and Jotedars and turn her into the free Pakistan of the common man.

In the whole of Bengal, there are 8000 market centres, and in each and everyone on them there rules a clique of rich merchants. They yield a monopoly control over all the important agricutural produce like paddy, jute, mustard, opium. These rich merchants, by cheating the kisans of the dues and by fleecing the purchases, grab a considerable portion of the national income and help the blackmarket to flourish.

Of the 8000 market-centres, nearby 5000 are in East Pakistan. These centres of trade must be brought under direct government control.

According to the Famine Enquiry Committee Report, 46 percent of Bengal's total rice crop is brought to the market for sale. On the basis of this calculation, out of the total yield or 20 crores maunds of rice in East Pakistan, little over nine crore maunds come to the market. The merchant by selling this nine crore maunds of rice make a clean profit of at least 30 crores of rupees if not more.

Every year, about five crores maunds of jute is sold in Bengal for foreign export and for the jute factories. Ninety-three percent of land under Jute-cultivation in Bengal is in East Pakistan. So it may be taken for granted that most of this five crores maunds of jute will be supplied from here. By selling this five crores maunds of jute, the merchants, make a profit to the tune of 30 to 40 crores of rupees.

This way, from rice and jute alone, the rich marchants expropriate 60 to 70 crores of rupees every year. This trade must be completely brought under government control. The government, of course, must not expropriate this whole amount of 60 to 70 crores of rupees : the kisan has to be paid his just price and the purchaser must also be provided with cheaper rates.

Besides, there will be expenses of carrying on the business. Taking all these into consideration, the government every year will make a profit of twenty crores, which in five years will come to 100 crores of rupees. With this amount as its new assents the Govt. of East Pakistan can undertake a five year plan of industrial development, every fifth year.

Paddy and Jute provide the life-blood of East Pakistan; hence these two must be brought under direct state control, and through this, the state will be able to fulfill its two main duties of elevating the condition of the peasant and developing industries.

Expansion of Industries

If any British or American, or for the matter of that any Indian or Pakistani big capitalist is permitted to invest monopoly capital in industries, East Pakistan will not in reality be endowed with industries It will only lead to intensified exploitation of the workers and peasants by the greedy rich.

The industrial development of Pakistan must be built on the basis of State Ownership, State Planning and State Control. For this, the government will be able to raise funds in three ways :

- Profit from Paddy and Jute trade.
- Raising Capital by selling shares among the public.
- Raising loans.

If the Govt. thus directly builds up some of the main industries, opportunities for starting private and joint stock companies, may also be given under state suppression and control. If the main industries are under state control, monopoly capital will not be able to extend its deadening grip.

For the success of this plan these must be statutory provision for adequate wages and better working conditions for the workers; and cooperation between the workers and the state must be established by providing for all freedom of organization for the workers.

The essential industries for East Pakistan are textiles, sugar, salt, mustard oil and steel. For all this industries raw material has to be imported from India. Chittangong, Chandpur, Goalanda and Narayanganj these four towns are situated on big rivers and export and import through these centres can be easily managed by water. If the above mentioned industries are developed round these four towns, then they will soon be developed into four prosperous ports.

The cry of hunger that rose from Bengali's village from five years ago, owing to the scarcity of essential commodities like cloth, oil, sugar

and agricultural implements, can still be heard. The situation has not improved even today, rather has become worse.

After the partition of Bengal, such scarcity will all the more increase in East Pakistan, because she will now have to depend entirely on a different state for all industrial products. To meet these demands it is necessary to go ahead with a plan for industrial development. Otherwise, the death-rattle of rural Bengal will soon rend the skies.

Development of factory industries will take considerable time. Meanwhile, the cottage industries of North and East Bengal have to be revived through the building of the co-operatives.

The weaver, the blacksmith and such other craftsmen today are in dire need of raw material, because your steel have gone to the blackmarket. These craftsman have to be saved by building cooperations with government aid.

New Democracy

East Pakistan can be made free, happy and powerful by such measures as abolition of the Zamindary system, institution of Tebhaga, state control of trade in rice and jute, state managed industries and co-operations.

To implement this programme the administrative machinery has to be purged to all influences of vested interests and the administrative personal has to be thoroughly overhauled.

We have witnessed with our own eyes that Mr. Suhrawardy did not dare to pass the Tebhaga Bill because of the dominance of Zamindars and Jotedars in the Bengal Legislative Assembly: rather, despite the recognition of the Justice of the Tebhaga demand, he sanctioned the excesses by the armed police on shore-croppers.

The draft Bill for the abolition of the Zamindary system that Mr. Suhrawardy ministry has prepared provides for such an enormous amount of compensation for the Zamindar that this burden of compensations may perhaps wreck the very project of abolishing the Zamindary system.

Mr. Suhrawardy has at least admitted that Tebhaga should be introduced and that the Zamindary system too should be abolished, but

the premier-designate of Eastern Pakistan Mr. Nazimuddin has not yet been reported to have said even that much.

For building a new society in Eastern Pakistan, there must be a complete weeding out of Zamindars, Jotedors profiteers and corrupt bureaucrats from both the legislative and the administative bodies every where from the legislature to the administration, persons imbued with sympathy and understanding for the people have to be appointed.

If this is not done, the reconstruction of East Pakistan will only turn into one big festival for the enemies of the people on the poor masses and will full the additional burden of this new order of loot.

In view of this it is for the Muslim youth to come forward and devote themselves to the building of new democracy. The workers, the kisans and other patriots, irrespective of race and community, have to be united in the battle for the extinction of the vested interests and the corrupt bureaucracy otherwise all the plan for the fullest development of Pakistan will be reduced to objects of factional squabbles for poser of property.

It is only by destroying the influence of big capitalists, Zamindars, Jotedars & blackmarketeers over the state machinery and the bureaucracy and installing in their place the true servants of the people, that the future of East Pakistan can be made bright indeed. For this, the more the free expression of public opinion is consulted in the matter of constitution-making, state planning of appointment of administrative personal, the better.

For a Free Pakistan

For this, it is essential to introduce universal adult suffrage in the state and a democratic constitution and functioning inside the league.

Which way Eastern Pakistan? Should it be along the path to freedom, happiness and prosperity for the common, or should it be towards the orgies of the vested interests, immersed in the greed for wealth.

The answer to this has to come from the Muslim youth. If they can blast the conspiracy of the greedy vested interests and like revolutionary architects of a new society, pledge themselves to destroy the power and

blackmarketeers from the three seats of power namely the Ministry, the Legislature and the Administration, East Pakistan shall emerge as the foremost model state in industry, trade, agriculture, education and culture.

(Translated from the special Idd Number of the Bangali Communist Daily Swadhinata) Source : *People's Age*, 15 August 1947, p. 21.

টিকা : বাংলা ভাগের প্রাক্কালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানে' সমৃদ্ধশালী নতুন সমাজ গড়ে তোলার ধারণা ব্যক্ত করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির ইংরাজী অনুবাদ People's Age-এর ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
স্বাধীনতা পত্রিকার যে সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সংখ্যাটির বহু অনুসন্ধান করেও হদিশ মেলেনি। সেকারণে ইংরাজী অনুবাদটি এখানে সংযোজিত হলো— গুরুত্ব বিবেচনায়।
বাংলা ভাগ হবার পরই অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট নেতাদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত একটি পথ নির্দেশ নামা পূর্ববঙ্গের নবীন কমিউনিস্টদের প্রতি বিদায়ী প্রবীন কমরেডদের কৌশল নির্ধারণের নির্দেশনা। এই দলিলটি দিলীপ ব্যানার্জির ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত। — (সম্পাদক)

প্রথম অধ্যায়

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির পুণর্বিন্যাস এবং চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন

১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট দেশের স্বাধীনতা দিবসে যখন ভারতবাসী জাতীয় উৎসবে আত্মহারা, তখন সেই পরিস্থিতিতে ভারতের জগণের কাছে কমিউনিস্ট পার্টি '১৫ আগস্টের পর ভবিষ্যতের কাজের দিকে এগিয়ে যাও' এই শিরোনামে এক আবেদন রেখেছিল। এই আবেদনটি বর্তমান গ্রন্থ সিরিজের চতুর্থ খণ্ডে ২১নং সহায়ক তথ্য (পৃ. ৬৫২) হিসাবে সংযোজিত করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যান্য বিষয়গুলি ছাড়াও একটি বিষয় ছিল— দেশীয় রাজ্য, ফরাসী ভারত ও পর্তুগীজ সরকারের অধীনস্থ গোয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে ভারতের সঙ্গে পূণর্মিলনের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। ফলে কমিউনিস্ট পার্টিরও এই ব্যপারে ভূমিকা পালন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির পুণর্বিন্যাস

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সমগ্র পূর্ববঙ্গটাই হয়ে দাঁড়ালো পূর্ব পাকিস্তান— ঘটলো যুক্ত বাংলার বিভাজন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিরও হলো বিভাজন। ভৌগলিক পূণর্বিন্যাসের দরুন পশ্চিমবঙ্গ একটি ভৌগলিক রূপ পায় এবং তদনুসারে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিও পূণর্বিন্যস্ত হয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ফরাসী সরকারের অধীন চন্দননগর এবং দেশীয় রাজ্য কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ফলে এই দুই অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টি ও পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল স্বাভাবিক কারণেই।

একদিকে বাংলার অঙ্গচ্ছেদের ফলে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, অন্যদিকে কিছু অঞ্চল এপার বাংলার অঙ্গীভূত হওয়ায় পার্টির পূণর্বিন্যাস। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রথমে 'অঙ্গীভূত' হওয়ার বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করবো।

(ক) চন্দননগর— ভারতের কতকগুলি স্থান ছিল ফরাসী সরকারের অধীন। এগুলি হল চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, কারিকেল, মাহে, ইয়ানান ও গৌরহাটি। ফরাসী অধিকৃত এই সব স্থানকে একত্রে বলা হত ফরাসী ভারত। এর মধ্যে চন্দনুনগর ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল।

ভারতের মতো ফরাসী ভারতেও ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। এই পার্টির সাধারণ সম্পাদক

ছিলেন কালিচরণ ঘোষ। ইনি ছিলেন চন্দননগরের অধিবাসী। ফরাসী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই ছিল বে-আইনি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আইনি হলে, ফরাসী সরকারও ফরাসী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আইনি বলে ঘোষণা করেছিল।[১] ১৯৪৪ সালে ফরাসী ভারতের স্বাধীনতাকামী মানুষ রাজধানী পণ্ডিচেরীতে গঠন করেছিলেন একটি গণতান্ত্রিক জোট— ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ.)। চন্দননগরেও গঠিত হয়েছিল অনুরূপ একটি জোট। এই জোটের সভাপতি ছিলেন সিদ্ধেশ্বর মল্লিক। সম্পাদক ছিলেন অংশুভূষণ মিত্র এবং কার্তিকচন্দ্র দাস।[২] এই জোটে চন্দননগরের কমিউনিস্ট পার্টিও ছিল আর ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক। ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি নিয়ে যখন আলাপ আলোচনা চলছিল সেই সময়েই চন্দননগরের মানুষ স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশায় চঞ্চল হয়ে উঠলো।

এরই প্রতিফলন ঘটল ১৯৪৬ সালে চন্দননগরে পৌরপরিষদ নির্বাচনে। এতে এন.ডি.এফ. অধিকাংশ আসনেই জয়লাভ করে। কিন্তু চন্দননগরের কংগ্রেস এই পৌর পরিষদকে ভেঙে দেবার জন্য ফরাসী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে। ঠিক এই সময়েই চন্দননগরের এন.ডি.এফ. নিজেদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠল। ফরাসী কর্তৃপক্ষকে তারা এবিষয়ে জানিয়েও দিয়েছিল। এই অবস্থায় ফরাসী ভারতের গভর্ণর একটি Executive Council গঠন করার কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় চন্দননগরের এন.ডি.এফ. তাদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের কাছে ওই কাউন্সিলকে বয়টক করার জন্য ১৯৪৭ সালের ১ জুলাই একটি প্রস্তাব পাঠায়। ফরাসী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কালিচরণ ঘোষ, যিনি কেন্দ্রীয় জোট গঠনেরও সম্পাদক ছিলেন, 'স্বাধীনতা' পত্রিকা মারফৎ পরদিনই এক বিবৃতি দেন। তিনি এই কাউন্সিল বয়কটের কথা ঘোষণা করেন। আর ঘোষণা করেন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এক সার্বভৌম গণপরিষদ গঠনের কথা।[৩]

৮ জুলাই ফরাসী ভারতের গভর্নর চন্দননগরে এসে তাঁদের দু'টি সিদ্ধান্তের কথা জানান। প্রথমটি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি শাসন পরিষদ গঠিত হবে, তবে তার সভাপতি হবেন একজন ফরাসী অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। দ্বিতীয়টি হল, পৌর পরিষদ ভেঙে দেওয়া হবে। স্থির হল ১৫ অগস্ট একটি মনোনীত শাসন পরিষদ গঠিত হবে। যদিও এন.ডি.এফ-এর সদস্যগণ ওই পরিষদে অংশগ্রহণ করেননি, তবে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করেছিল। পরদিন ১৬ অগস্ট কংগ্রেস ব্যতীত চন্দননগরের অন্যসব রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত ক'রে বিক্ষোভ জানায়। এই সমাবেশে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে ছিলেন মহিলা সমিতির সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, শেফালী নন্দী, কংগ্রেসের রুবি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।[৪] লক্ষণীয় যে এই সমাবেশে কংগ্রেসের বিরোধিতা থাকলেও কংগ্রেসের অনুগামীদের অনেকেরই এতে সমর্থন ছিল।

১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.আই-কে বে-আইনি ঘোষণা করে। সেসময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়। চন্দননগরেও ফরাসী কর্তৃপক্ষ অনুরূপ নির্দেশ জারি করে। ফলে সেখানকার কমিউনিস্ট কর্মীরা অনেকেই গ্রেফতার হন। আবার অনেকে আত্মগোপন করেন। এই রকম এক অবস্থায় ফরাসী ভারতের সরকারের নির্দেশ মতো চন্দননগরের শাসন পরিষদের এক গণভোটের

ব্যবস্থা করা হয়। যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে ১৯ জুন। মানুষ গণভোটের মধ্যে দিয়ে নিজেদের রায় জানালো। আমরা "স্বাধীনতা চাই, ভারতভূমির অঙ্গ হিসাবে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই।" ফরাসী কর্তৃপক্ষ এই রায়কে উপেক্ষা করলো।

এরপর ১৯৫১ সালের ৫ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের পার্টি আইনি স্বীকৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী কর্তৃপক্ষ চন্দননগরেও তদ্রুপ পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। কমিউনিস্ট কর্মী ও অন্যান্য শক্তি যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁরা ছাড়া পেলেন এবং যাঁরা আত্মগোপনে ছিলেন তাঁরা প্রকাশ্যে এসে আবার স্বাধীনতার দাবি নিয়ে কাজকর্ম শুরু করে দিলেন। নতুন ক'রে গড়ে তুললেন সংযুক্ত প্রগতিশীল ফ্রন্ট। এই ফ্রন্ট, ১৯৫১ সালের ১৫ জুলাই, চন্দননগরের শাসন পরিষদের নির্বাচনে ২৫টি আসনের সবকটিতেই জয়যুক্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে কমিউনিস্টদের সংখ্যা ছিল ৭/৮ জন এবং ২/৩ জন ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের। এঁরা সকলেই ছিলেন সৎ, আদর্শনিষ্ঠ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক। কমিউনিস্টদের মধ্যে অন্যতম জয়ী সদস্য হলেন কালিচরণ ঘোষ, ভবানী মুখার্জী প্রমুখ।

এইভাবে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তির উদ্বেল আকাঙ্ক্ষায় চন্দননগরবাসী সোচ্চার হয়ে ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে চন্দননগর ভারতের অঙ্গীভূত হল। ১৯৫২ সালের ১০ জুন সেখানে চালু হল ভারত-রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা। অর্থাৎ সেখানকার নির্বাচিত শাসন পরিষদ ভেঙে দেওয়া হল। কিন্তু সেখানকার মানুষ তা মেনে নিতে পারল না। তাদের স্বাধীনতার দাবি পূরণ হলেও, পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়ার দাবিতে নতুন ক'রে শুরু হল আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালের ২ অক্টোবর লোকসভার একটি আইনের মধ্য দিয়ে চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও হুগলী জেলার অন্তর্ভূক্ত বলে পাকাপাকিভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর পাশাপাশি রাজ্য বিধানসভায় 'চন্দননগর' নামে একটি নতুন আসন তৈরি হয়।[৫] সেইজন্য ১৯৫২ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে 'চন্দননগর' নামে কোন নির্বাচনী কেন্দ্র ছিল না। কিন্তু ১৯৫৭ সালে এই নির্বাচন কেন্দ্র তৈরি হল।

এই অন্তর্ভূক্তির মধ্য দিয়েই চন্দননগরের কমিউনিস্ট পার্টি স্বাভাবিক নিয়মেই পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ল।

(খ) কোচবিহার— ভারত যখন স্বাধীন হল, তখন কোচবিহার ছিল দেশীয় রাজ্য। ভারত জুড়ে এই ধরনের দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৫৬৫। ভারতে যোগদানের বিষয়ে কোচবিহার রাজ্যের মানুষের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা গেলেও, ব্যাপারটি কোনভাবেই সহজ ছিল না। কারণ এই রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থান এমন ছিল না যে ভারতে তার অন্তর্ভূক্তি অনায়াসেই ঘটে যাবে। এই রাজ্যের তিন দিকেই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অঞ্চল অর্থাৎ মুসলিম অধ্যুষিত। এর ওপর এখানকার অধিবাসীদের একটা বড় অংশই ছিল মুসলমান। শতকরা হিসাবে প্রায় ৪০ শতাংশ। ফলে স্বাধীনতার পর কোচবিহারের পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তির দাবিও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল।

কোচবিহার রাজ্যের পরিচালনায় ছিল একটি কাউন্সিল। এই পরিচালন পরিষদে একজন বাদে সকল সদস্যই ছিলেন জোতদার সম্প্রদায়ভুক্ত। হিন্দু রাজবংশী ও মুসলমান। উক্ত একজন সদস্য হলেন সুশীল কুমার চক্রবর্তী, একজন বর্ণ হিন্দু। তিনি বাদে পরিচালন সমিতির সকল সদস্যই কোচবিহার রাজ্যের পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্তির পক্ষে সমর্থন

জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ রাজ্যের রাজপরিবারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারারণ ভূপবাহাদুর ছিলেন ভারত ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে।[৬]

কোচবিহারে আরও দুটি সংগঠন ছিল যারা ভারত ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। একটি হল হিতসাধনী সভা। এরা ছিল কোচবিহার রাজ্যের ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভূক্তির বিরোধী। বলা চলে, দেশীয় বাজ্য হিসাবে থেকে যেতে আগ্রহী। এই দলটি আসলে ছিল সাম্প্রদায়িক। এরা রাজবংশী ও অরাজবংশী মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে কৃষকদের সংগঠিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করত। অপর দলটি ছিল 'প্রজামণ্ডল'। এটি গঠিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। এটি একটি অসাম্প্রদায়িক দল, যারা ছিল কোচবিহারের ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভূক্তির পক্ষে। এই দলে ছিলেন কমিউনিস্ট সদস্যরা এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নাগরিকবৃন্দ। কমিউনিস্টদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল জীবন দে, রমেশ রায়, অনিল রায়, শিবেন চৌধুরী প্রমুখ।

কোচবিহার সম্পর্কে সমস্ত বিতর্কের ঘটেছিল ১৯৪৮ সালের ২৮ অগস্ট মহারাজার সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি সাক্ষরের মধ্যদিয়ে। এর কিছুকালের মধ্যেই ১৯৪৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের প্রতিনিধি কোচবিহারের শাসনভার গ্রহণ করে, ফলে রাজ্যটি ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়।[৭] এর শাসন চালাতে থাকেন একজন চীফ কমিশনার। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হল না। পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম উভয়েই দাবি জানালো কোচবিহারকে নিজ নিজ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসাবে গণ্য হতে শুরু করে।

১০৪০ সালে একটি মার্ক্সিস্ট গ্রুপের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে কোচবিহারে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল। দেশীয় রাজ্য হিসাবে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি করা নিষিদ্ধ ছিল। সেই কারণেই এই গ্রুপ গোপনে রংপুর জেলা কমিটির সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলত। পরবর্তী কালে কয়েকজন সদস্য নিয়ে এখানে একটি পার্টি সেল গঠিত হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন বীরেন দে সরকার, নিখিল মুখার্জী, অনিল রায়, বিনয় ভৌমিক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এরপর এঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন শিবেন চৌধুরী, জীবন দে, দেবী নিয়োগী প্রমুখ। এইভাবে ১৯৪৬ সালে তৈরি হল একটি সংগঠনী কমিটি যার সম্পাদক ছিলেন বীরেন দে সরকার। এঁদেরই নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের জুন-জুলাই মাসে সংগঠিত হয়েছিল কৃষক আন্দোলন। এর একটি ছিল গবাদি পশু বিক্রয়ের ওপর অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে এবং অপরটি পানা পাওয়ার অধিকারের দাবিতে।[৮] স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসাবে গণ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে কোচবিহার জেলায় জেলাগত ভাবে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হল এবং পশ্চিমবঙ্গ পার্টির একটি জেলা পার্টি হিসাবে কাজ শুরু করল। তবে পার্টির সূত্রপাতে কে কখন কোন সময় থেকে ছিলেন, তা নিয়ে মতদ্বৈধতা থাকলেও, এঁরা সকলেই যে ১৯৮৬ সালের দু'এক বছরের ব্যবধানে পার্টিতে এসেছিলেন একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়।[৯]

এবার আমরা বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গচ্ছেদের দিক প্রসঙ্গে আলোচনায় আসব—

(ক) জামশেদপুরে কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে। তাই আমরা দেখি, রাজ্য পার্টির তৃতীয় সম্মেলনের রিপোর্টে, বিশেষ জেলা হিসাবে, 'জামশেদপুর'এর পার্টি ইউনিটের উল্লেখ আছে। কিন্তু চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন (অক্টোবর

১৯৪৭)-এর রিপোর্টে এর কোন উল্লেখ না থাকায়, ধরে নেওয়া যেতেই পারে, জামশেদপুর পার্টি ইউনিটের কাজকর্ম আর পশ্চিমবঙ্গ পার্টির অধীন ছিল না।

(খ) ১৯৩৫ সালে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত সিলেট জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। এটিও বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে ছিল। প্রথমে যে সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় তার সদস্যরা হলেন— চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা শরদিন্দু দে, দিগেন দাশগুপ্ত, চঞ্চল কুমার শর্মা, দীনেশ চৌধুরী ও অমরেন্দ্র কুমার পাল। স্বাধীনতার পর এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের পার্টির অধীনে থাকেনি কারণ কাছাড় ও করিমগঞ্জ মহকুমা বাদে সিলেট জেলার অন্য মহকুমাগুলি পূর্ব-পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল। জলপাইগুড়ি জেলার ৫টি এবং মালদহ জেলার ৩টি থানা পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত হয়েছিল। আবার দিনাজপুরের একটা বড় অংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্তি লাভ করে।[১০]

(গ) পূর্ববঙ্গের ১৫টি জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল এবং তা চিহ্নিত হয়েছিল পূর্বপাকিস্তান নামে। ফলে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্লিষ্ট অংশ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি নাম গ্রহণ করেছিল। এবং এর ফলে যুক্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিও দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়— পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি। সেই সময়ে অবিভক্ত বাংলার পার্টিসভ্য সংখ্যা ছিল মোট ১৯২৫০। এর মধ্যে ১২ হাজার পার্টি সভ্য পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির দলভূক্ত হন এবং ৭ হাজারের কিছু বেশি সদস্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম নতুন ক'রে শুরু করতে হল।

(পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির গঠন সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা যথাস্থানে করা হবে)

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন

দেশের স্বাধীনতা পেলাম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট। সঙ্গে পেলাম বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভাজন। এই বিভাজন অনেকের মধ্যে নিয়ে এল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকা। মানুষ নিজের বহুদিনের জন্মভূমির ছেড়ে, শরণার্থী হয়ে সীমান্ত পারাপার করতে লাগল। দিল্লী ও পাঞ্জাবের দাঙ্গার গুজব ছড়িয়ে পড়তে লাগল বাংলার সর্বত্র। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ— কোন অঞ্চলই রেহাই পেল না। দাঙ্গা যে কত ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতা কলকাতা বা বাংলার মানুষ অনুভব করেছিল ১৯৪৬ সালের অগস্ট মাসের Great Calcutta Killling-এর ঘটনায়। এবারে তাই দাঙ্গা প্রতিরোধী শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠল দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি আটকানোর জন্য। অন্যদিকে আবার দাঙ্গা বাঁধানো'র গোপন ষড়যন্ত্রও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এর পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদী নীতির অঙ্গুলি হেলনে এদেশের পুঁজিপতিদের সঙ্গে কায়েমী স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সক্রিয় হাত। র‍্যাডক্লিফ রোঁয়েদাদে এইভাবেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষের বীজ বপন করা হয়েছিল।

বিভাজন পরবর্তী অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মানুষের জন্য খাদ্য মজুত থাকা সত্ত্বেও, উভয়বঙ্গই খাদ্যাভাবের মুখোমুখি হল। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে একই সঙ্গে দেখা দিল আবার দূর্ভিক্ষ। আর এই অবস্থা সৃষ্টি করার পিছনে ছিল অতি-মুনাফা লাভের জন্য জোতদার, চোরাকারবারী এবং ব্যবসায়ীদের সক্রিয় ষড়যন্ত্র।

এইরকম এক পটভূমিতে অনুষ্ঠিত হল বঙ্গীয় কমিউনিস্ট পার্টি চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ৪-৬ অক্টোবর। কলকাতার ৮নং ডেকার্স লেনে তখন

পার্টি অফিস। এখানেই ১৯৪৬ সালের শুরু থেকে ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়কাল জুড়ে ছিল পার্টির প্রাদেশিক দপ্তর। এই বাড়ীর একটা গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। 'স্বাধীনতা' পত্রিকা ছাপা শুরু হয়েছিল এই বাড়ীর একতলা থেকে। এই বাড়ীর চারতলায় ছিল ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ (পরে প্রগতি লেখক সংঘ), গণনাট্য সংঘ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, রাজ্য শান্তি সংসদ এবং 'পরিচয়' পত্রিকার অফিস। এই বাড়ীর ছাদেই বক্তৃতা করেছিলেন রজনী পাম দত্ত। এমন কী হো-চি-মিন পর্যন্ত এই অফিসে এসেছিলেন।[১১]

ডেকার্স লেনের এই ঐতিহ্যময় ঠিকানার ছাদে প্যান্ডেল বেঁধে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় তথা শেষ রাজ্য সম্মেলন। তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন কালে সারা বাংলায় পার্টি সভ্যের মোট সংখ্যা ছিল ৩০০০। এই সভ্য সংখ্যা চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন কালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৯,২৫০। সবচাইতে বেশি সভ্য ছিল দিনাজপুর (৩৭০০) এবং সবচাইতে কম ছিল বগুড়ায় (৬০)। কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের ওপর আলোচনার জন্য এই সম্মেলন আহ্বান খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল। যেমন— দাঙ্গার পরিস্থিতি, স্বাধীন ভারতের সরকারি নীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, চোরাকারবারী, মালিক শ্রেণি, ও সরকারি আমলাদের জনবিরোধী কার্যকলাপের ফলে আসন্ন দুর্ভিক্ষের ছায়া, বাংলা বিভাজনের ফলে পূর্ববঙ্গের পার্টি গঠন ইত্যাদি।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি.সি. যোশী। তিনি ৬ ঘন্টার ওপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি নরম মনোভাব প্রদর্শন, কিছুকালের জন্য ধর্মঘট না করা, জাতীয় ঐক্য ও অগ্রগতির জন্য নেহেরু সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছিল। যদিও রিপোর্টে উল্লিখিত ছিল যে "বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দাবি অস্বীকৃত হইলে শ্রমিক শ্রেণি জনসাধারণের সহযোগিতায় ও জাতীয় স্বার্থে তাহার শেষ হাতিয়ার হিসাবে ধর্মঘট করিতে দ্বিধা করিবেন না।" তা সত্ত্বেও পি.সি. যোশীর ভাষণে উৎসাহিত হয়ে সম্মেলনে এক ট্রেড ইউনিয়ন প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবে উল্লেখ ছিল যে, স্বাধীন ভারতে কিছুকালের জন্য ধর্মঘট স্থগিত রাখতে হবে। 'ধর্মঘট না করার লাইন' উপস্থিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। রণেন সেন, গোপাল আচার্য প্রমুখ কমরেডদের হস্তক্ষেপে ও বিরোধিতায় প্রস্তাবের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু বাতিল হয়ে যায়। তবে অন্যান্য বিষয়গুলিতে কোন বিতর্ক ওঠেনি।[১২]

রাজ্য সম্মেলনে প্রধান যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল, সেগুলি হল—

(ক) দাঙ্গা-র বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু ও সৈয়দ সুরাবর্দীর ভূমিকাকে সম্মেলন ধন্যবাদ জানিয়েছিল। বাংলার সমস্ত কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে এই সম্মেলন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করার কথা ঘোষণা করেছিল। কংগ্রেস গভর্নমেন্টকে অপদস্থ করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীরা যাতে বাঙালী-অবাঙালী এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনরকম সংঘর্ষ বাধাতে না পারে তার জন্য সকল পার্টি কর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা হল।

(খ) পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য সম্মেলন সরকারি খাদ্যনীতির ব্যর্থতা যেমন তুলে ধরেছিল, তেমনি আসন্ন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কিছু প্রস্তাবও

দিয়েছিল। অবশ্য এগুলি ছিল তাৎক্ষণিক সমাধানের প্রস্তাব। তবে এরই পাশাপাশি স্থায়ী সমাধানের প্রস্তাবও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল। সম্মেলনের মতে বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ভূমিব্যবস্থাই ছিল প্রধান কারণ। সেজন্য জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, পতিত জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন, কৃষির উন্নতি, খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। কংগ্রেসের মধ্যে উপদলীয় ঝগড়ায় তিনি পদত্যাগ করলে, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী হন।

(গ) জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য কয়েকটি নীতি আইনে অন্তর্ভূক্ত করার উদ্দেশে এক প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে ভাগচাষীদের জন্য তে-ভাগার আইন করার কথাও উল্লিখিত ছিল।[১৩] সম্মেলনের অভ্যন্তরীণ এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে পি.সি. যোশীর দাঙ্গার বিরুদ্ধে পার্টি সদস্যদের সজাগ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১৪] আসন্ন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য ''বাঙালী জাতির স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কি এবং কোন্ পথে'' শীর্ষক একটি প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেছিলেন ভবানী সেন, যে রচনাটির শিরোনাম ছিল ''স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাংলা।'' এটি রচিত হয়েছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।[১৫]

এই রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীনতা ও বঙ্গ বিভাগের পরে পরেই। এসত্ত্বেও উভয় বাংলার প্রতিনিধিরা এই রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এখান থেকে যে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যেও ওপার বাংলার সদস্যরা তখনও পর্যন্ত ছিলেন। যেমন— মণি সিং, নেপাল নাগ, খোকা রায়, মণিকৃষ্ণ সেন প্রমুখ। যাই হোক, এই রাজ্য সম্মেলন থেকে রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ডাঃ রণেন সেন। প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীতে নির্বাচিত হয়েছিলেন মুজফ্‌ফর আহম্‌দ, সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন, সরোজ মুখার্জী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, নৃপেন চক্রবর্তী, পাঁচু গোপাল ভাদুড়ী এবং রণেন সেন। উল্লেখ্য যে, এই সম্পাদক মন্ডলীতে পূর্ববঙ্গের কারোকেই রাখা হয়নি। যদিও প্রাদেশিক কমিটিকে তাঁরা ছিলেন। আসলে পার্টি কংগ্রেসই ছিল একটা মঞ্চ যেখান থেকে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রাদেশিক কমিটিতে সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য এবং পূর্ববঙ্গের ৪ জন সদস্য ছাড়াও ছিলেন— আবদুর রেজ্জাক খাঁ, আবদুল্লাহ রসুল, আবদুল হালিম, কৃষ্ণবিনোদ রায়, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, আবদুল মোমিন, প্রমোদ দাশগুপ্ত, বঙ্কিম মুখার্জী, মনসুর হবিবুল্লাহ, ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতি বসু (?), জলি কল (?), মণিকুন্তলা সেন (?), স্নেহাংশু কান্ত আচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন জেলার আরও কিছু কমরেড।[১৬]

পার্টি কংগ্রেসের পূর্বের ৪ মাস

পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আর বঙ্গীয় চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনের পরেই অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গের প্রফুল্ল ঘোষের সরকার ধীরে ধীরে জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে। বাংলার সরকারের তরফ থেকে ১০ নভেম্বর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ''কারখানার শ্রমিক ও অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে সম্প্রতি 'সত্যাগ্রহ' ও 'অবস্থান ধর্মঘট' করিবার যে

আগ্রহ দেখা যাইতেছে তাহার সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।[১৭]

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার প্রথম অধিবেশন বসে স্বাধীনতার পর ২১ নভেম্বর তারিখে। আর শহীদ রামেশ্বর দিবসে ছাত্রদের মিছিল এবং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও তে-ভাগার দাবিতে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৫ হাজার ছাত্র-কৃষকের মিছিলের ওপরে কংগ্রেস সরকারের পুলিশ বাহিনী নির্মম ভাবে লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করেছিল। ঐ দিনই কমিউনিস্ট পার্টি এর প্রতিবাদে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করে। এই সভা থেকে সরকারের কার্যকলাপের নিন্দা করা হয়েছিল। এই সমস্ত দাবির প্রতি সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (RCPI)র নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদও জানানো হয়েছিল। এই প্রতিবাদ কর্মসূচি কেবলমাত্র কলকাতাতেই কেন্দ্রীভূত থাকেনি তা ছড়িয়ে পড়েছিল আরো অনেক জায়গায়। যেমন— বহরমপুর, আন্দুল-মৌড়ি, চুঁচুড়া, বাইনান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ করেছিল। ভূপাল পাণ্ডা (সম্পাদক, মেদিনীপুর জেলা কৃষক সমিতি), সরোজ রায় (সম্পাদক, মেদিনীপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টি), মানিক দত্ত (সম্পাদক, বাঁকুড়া জেলা কৃষক সমিতি), প্রমথ ঘোষ (সম্পাদক, বাঁকুড়া জেলা কমিউনিস্ট পার্টি), বিবৃতিও দিয়েছিলেন। এই বিবৃতিতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও আদিবাসীর ভূমি সমস্যার সমাধানের কথাও ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করেছিল তারা যেন পুলিশকে সংযত করে। কিন্তু তাত' তারা করলই না, বরং সরকারের নির্লিপ্ততা ছিল পুলিশের কার্যকলাপের প্রতি পরোক্ষ অনুমোদন। আসলে পুলিশ যা করেছিল, তা ছিল জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুলিশী নিপীড়নের এক সপ্তাহের মধ্যে গণ আন্দোলনকে দমন করাব জন্য 'স্পেশাল পাওয়ার' বা 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' নামে একটি বিল ২৭ নভেম্বর আইন সভায় পেশ করেছিল। এই বিলে সরকারের হাতে নিম্নলিখিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল— বিনা প্রমাণে জেলে বন্দী, কতকগুলি ক্ষেত্রে ধর্মঘট নিষিদ্ধ, সংবাদ পত্রের কণ্ঠ রোধ, রাস্তায় রাজনৈতিক প্রচার বন্ধ ইত্যাদি। অর্থাৎ এই বিলটি ছিল সম্পূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিক ও জনবিরোধী।[১৮]

এই বিলের বিরুদ্ধে দিকে দিকে আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকল। বিলের নিন্দা ও প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন কলকাতার ৬১ জন ব্যারিস্টার এবং লেখক শিল্পী মহল।[১৯] এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে ১৩ ডিসেম্বর বি.পি.টি.ইউ.সি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকেরা এই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল, সভা ও সমাবেশ সংগঠিত করেছিল। এই বিলের বিরুদ্ধে বাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিল— যেমন যুগান্তর, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, আজাদ, দৈনিক কৃষক, ভারত, আনন্দবাজার পত্রিকা ও বসুমতি।[২০] বাংলার সংবাদপত্রগুলির মধ্যে কেবলমাত্র স্টেটসম্যান পত্রিকা এই বিল সমর্থন করেনি। ফলে বিলটি শেষ পর্যন্ত সিলেক্ট কমিটিতে যায়। সেখানে কিঞ্চিত সংশোধন করে বিলটির নতুন নামকরণ হয় 'পশ্চিমবাংলা সিকিউরিটি বিল'। এতে বিনা বিচারে আটক, বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার ও তল্লাসীর ক্ষমতা এবং সংবাদ প্রকাশের পূর্বেই পত্রিকার ওপর সেন্সরের অধিকার বহাল ছিল।[২১] সংশোধিত নিরাপত্তা বিলের প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট

করেছিল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে এই বিলের বিরোধিতা করেছিলেন।[২২] কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'পিপলস এজ'এর ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে কলকাতার সাংবাদিকেরা এক প্রতিবাদী বিবৃতি দিয়েছিলেন।[২৩] এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সহযোগী সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি বসু, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, মিঃ জে এন সরকার, পরামানন্দ দত্ত, শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ ও অন্নদাচরণ মজুমদার, 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী, শ্রীঅখিল নিয়োগী ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু এবং 'অমৃতবাজার' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার বহু বিশিষ্ট সহ-সম্পাদক, সংবাদদাতা ও পাঠক। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ পি কে বোস প্রমুখ ২২ জন অধ্যাপকও এক প্রতিবাদ বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিবাদ আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বাংলার বহু জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বত্র শ্লোগান উঠতো 'স্বাধীন দেশে পুলিশী জুলুম চলবে না', 'বাংলাদেশে কালা কানুন চলবে না' ইত্যাদি।

এই বিলের প্রতিবাদ মুখ্যত কমিউনিস্ট পার্টি ও তার গণসংগঠনগুলি করলেও এর আবেদন কিন্তু গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও প্রভাবিত করেছিল। কোন কোন জায়গায় ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীদেরও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এমন কী কিছু কিছু জায়গায় কংগ্রেস কমিটিও এই বিলের প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি কখনই সামগ্রিক বিরুদ্ধাচারণের অবস্থানে ছিল না। যেমন— বি পি টি ইউ সি'র ১৩ ডিসেম্বরের ধর্মঘট আন্দোলনের ব্যপ্তি ঘটায় কংগ্রেস সরকার এই বিলের কোন কোন অংশ পরিবর্তন করতে রাজি হয়েছিল। যদিও এই রাজি হওয়ার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এবং গণবিক্ষোভকে স্তব্ধ করা। কিন্তু বিপিটিইউসি এটা মেনে নিতে পারেনি। আন্দোলন অব্যাহত রইল। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার এই বিল গ্রহণের ওপর আলোচনা কিছুকালের জন্য বন্ধ রাখতে রাজি হওয়ায় কমিউনিস্টরা ধর্মঘট তুলে নিয়েছিল।

সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির "স্বাধীনতা' পত্রিকা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই বিল সম্পর্কে সবরকম সংবাদ 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাতায় স্থান পেত। ফলে 'স্বাধীনতা'র ভূমিকায় পূর্ব পাকিস্তানের সরকার খুবই রুষ্ট হয়ে পড়ে। তারা প্রাদেশিকতা প্রচারের অভিযোগ তুলে এর প্রবেশ সে দেশে নিষিদ্ধ করেছিল। ১৯৪৭-এর ১৬ ডিসেম্বরের সংখ্যায় এই সংবাদ বেরিয়েছিল। আসলে 'স্বাধীনতা' সেখানকার মন্ত্রীসভা ও আমলাদের কাজের সমালোচনা করেছিল। পাদেশিকতার অভিযোগ ছিল কাল্পনিক ও হাস্যকর। ঢাকার ছাত্র সমাজ সে সময়ে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রবল বিক্ষোভ শুরু করেছিল। এটাতেই সেখানকার আমলারা পেল প্রাদেশিকতার গন্ধ। নাটোরের সাহিত্য সভায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "বাংলা পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা হইলে, নূতন ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়িয়া উঠিবে।" সোমনাথ লাহিড়ী স্বাধীনতার সম্পাদকীয়তে লিখলেন "বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকারের অর্থ অবাঙালীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ নয়, তাঁহাদের বাংলাদেশ হইতে বিতাড়ন নয়, উর্দ্দূ বা অন্য কোন ভাষার প্রতি অনাদর নয়। অবাঙালীদের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি আবেদন করিয়াই বাংলা ভাষাকে তাহার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। আত্মঘাতী প্রাদেশিকতায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিপন্ন হইতে দিবেন না।"[২৪]

সিলেক্ট কমিটি থেকে বিলটি আবার ৫ জানুয়ারি ১৯৪৮-এ বিধানসভায় আসে। জ্যোতি বসু এই বিলের ওপর মোট ৬০ বার হস্তক্ষেপ ও বক্তব্য পেশ করেছিলেন এবং ৬০টি সংশোধনী পেশ করেছিলেন।[২৫] এইভাবে কমিউনিস্টরা আইনসভার ভিতরে ও বাইরে প্রতিবাদ করেছিল। যাইহোক শেষপর্যন্ত এই বিলটি ৪৭-১২ ভোটে পাশ হয় ১৫ জানুয়ারি। এই বিল পাশের পরেই ঘোষ মন্ত্রীসভা অপসারিত হয়। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। প্রসঙ্গত, 'বিশেষ ক্ষমতা বিল'টি ছিল পূর্ববর্তী সুরাবর্দী সরকারের আমলের 'বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স ১৯৪৬'এর অনুরূপ।

এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের ২২ জুন ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে কংগ্রেস দল বিধান সভার নেতার হিসাবে মনোনীত করে। যদিও তখনও পর্যন্ত তিনি আইনসভার সদস্য ছিলেন না, তা সত্ত্বেও ১৫ আগস্টের আগেই একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল যার প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধনামন্ত্রী বলা হত) ছিলেন ডঃ ঘোষ। তাঁকে এক উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। তিনি নভেম্বর মাসে বীরভূম পল্লী নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি ডঃ ঘোষকে সমর্থন করেছিল। ডঃ ঘোষ পেয়েছিলেন ২২৪৮০টি ভোট এবং হিন্দু মহাসভা প্রার্থী হিসাবে শিবশঙ্কর মুখার্জী পেয়েছিলেন ১০৯৪২টি ভোট। কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনের সময়ে ডঃ ঘোষকে সমর্থন করেছিল আবার স্পেশাল পাওয়ার্স বিলের সময় তাঁর বিরোধিতা করেছিল। কারণ জনস্বার্থের দিকে তাকিয়ে বিচার করাটাই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির বিচারের মানদণ্ড। নির্বাচনের সময় তাঁকে সমর্থন করার কারণ দেখিয়েছিলেন ভবানী সেন এই বলে যে— দাঙ্গার শক্তিকে বিচ্ছিন্ন ও পরাস্ত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে হিন্দু মহাসভাকে হারানোর দরকার। তাই তারা ডঃ ঘোষকে ভোট দিয়েছিলেন।[২৬]

পার্টি সংস্কারবাদী লাইন পরিবর্তনের প্রয়াস

সরকারের জনবিরোধী মনোভাব স্বাধীনতার পর থেকেই শুরু হয়েছিল। কম-বেশি এটি সারা দেশজুড়ে ছিল পরিব্যাপ্ত। অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই ধনিকশ্রেণি অনুমোদিত পুঁজিবাদী পথকেই তারা অবলম্বন করেছিল। জনবিরোধী নীতি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর কঠোর দমন পীড়ন অর্থাৎ এককথায় সরকারের দমন নীতির ফলে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা পূর্বকালের লাইন পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকল। পার্টির অভ্যন্তরে এক অংশের মধ্যে পি সি যোশীর সংস্কারবাদী লাইন ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হতে থাকল। সে সময়ে অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানার সাধারণ মানুষ যেখানে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে চলছিল, সেখানে সেই লড়াইয়ের প্রতি পি সি যোশীর তুষ্টী মনোভাব সকলের মধ্যে বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। বঙ্গীয় প্রদেশিক কৃষক সভাও তে-ভাগা আইন চালু করার জন্য আন্দোলনের পথ থেকে সরে এসে বারবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদনের পথ ধরলো। পার্টি হেড কোয়ার্টার, কিষান সভার নেতারা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন না। অথচ কাকদ্বীপে কৃষকদের মনোভাব 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাতায় ব্যক্ত হয়েছিল এইভাবে— "জোতদারের গোলায় ধান তোলার জন্য কাকদ্বীপ ও মথুরাপুরথানায় সশস্ত্র পুলিশ ও

বেতার ঘাঁটি প্রস্তুত। প্রতিবাদে কৃষকরা ৬০ হাজার বিঘা জমিতে ধান কাটা বন্ধ রেখেছেন।[২৭]

এই রকম এক পটভূমিকায় ১৯৪৭ সালের ৭ থেকে ১৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুম্বাইতে। এই সভায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর দু'টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এর একটি হল 'আসল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র' সংক্রান্ত প্রস্তাব। অন্যটি পার্টির নতুন রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে একটি দলিল যার শিরোনাম হল 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নীতি ও কাজ'। প্রথমটি অর্থাৎ 'আসল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র' সংক্রান্ত প্রস্তাবের নির্যাস হল— (১) বিশ্ব আজ দু'টি শিবিরে বিভক্ত। একটি সাম্রাজ্যবাদী শিবির, অন্যটি গণতান্ত্রিক শিবির। (২) জওহরলাল নেহেরুর কথায় ভারত 'নিরপেক্ষ'। কিন্তু প্রস্তাব দাবি করছে ''ভারতকে তথাকথিত নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিতে হইবে।' (৩) ইঙ্গ -মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে যে সব গণতান্ত্রিক শক্তি দৃঢ়ভাবে লড়ছে তাদের সাথে যোগ দেবার নীতি ভারত পরিত্যাগ করেছে। (৪) ভারতের শ্রমিক শ্রেণির ক্রমবর্ধমান শক্তিতে শঙ্কিত হয়ে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছে এবং সামন্ত শক্তির সাথে আপস করেছে। (৫) মাউন্টব্যাটেনের রোঁয়েদাদ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত পশ্চাদপসরণ নয়, জাগ্রত জনগণের বিরুদ্ধে সুচতুর পাল্টা আক্রমণ। এর মধ্যে দিয়ে ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা পায়নি, পেয়েছে স্বাধীনতার নামে এক ধাপ্পা মাত্র।[২৮]

কেন্দ্রীয় কমিটির এই সভায় ''ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নীতি ও কাজ'' শীর্ষক পার্টির নতুন যে দলিল উপস্থিত সদস্যদের কাছে পেশ করা হয়েছিল সেটিতে যোশী আমলের ভুলগুলির সমালোচনা করা হয়। যেমন— (১) ১৯৪৭ সালের জুন মাসে মাউন্টব্যাটেন রোঁয়েদাদ ও জাতীয় সরকার সম্পর্কে যে ভুল ধারণা ছিল, সেটি পরিত্যাগ করা হয়। (২) বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বের প্রতি পার্টির একটা মোহের ভাব গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে পার্টি ঘোষণা করেছিল 'সরকারের প্রগতিশীল পুনর্গঠনের জন্য' নেহেরুর হাতকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।[২৯] কেন্দ্রীয় কমিটির এই সভা 'নেহেরু সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন-এর ঘোষণাকে সুবিধাবাদের সামিল বলে গণ্য করল। অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির মূল্যায়ন সম্পর্কে ভুলের সমালোচনা করা হল। (৩) জাতীয় পুনর্গঠন সম্পর্কে বুর্জোয়া শ্রেণির ওপর আস্থা স্থাপন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ককে গৌণ করা ইত্যাদি ভুলগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। (৪) 'জনগণ ও জাতীয় সরকারের মিলিত ফ্রন্ট'এর আওয়াজ ছিল ভুল। কারণ এটা মালিক শ্রেণির লেজুড় বৃত্তির সামিল ছাড়া কিছু নয়। কেন্দ্রীয় কমিটির এই দলিল ছিল আসলে আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের সম্ভাব্য পরিবর্তিত রাজনৈতিক লাইন।[৩০]

যোশী আমলের নেতৃত্বের মধ্যে এক সংস্কারবাদী বিচ্যুতির জন্য এই সব ভুল দেখা দিয়েছিল। এগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় উত্থাপন করার ক্ষেত্রে বি টি রণদীভের নেতৃত্বে গঙ্গাধর অধিকারী, ভবানী সেন প্রমুখ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমন কী তাঁরা পি সি যোশীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতেও ছাড়েননি। এর জন্য যোশীকে সরে যেতে হয়েছিল। সঠিক ভাবে বলতে গেলে, আনুষ্ঠানিক ভাবে নেতৃত্বের পদে তখন বহাল থাকলেও, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব তখনই তাঁর হাতছাড়া। সুনীল মুন্সীর কথামত ''যোশী নানা জায়গা থেকে বাছাই করা কমরেড এনে পি এইচ কিউ (পার্টি হেড কোয়ার্টার) তৈরি করেছিলেন। আমার মনে হল পি এইচ কিউ-এর পর যোশীর নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল হয়ে

আসছে। তাঁর হাত থেকে পি এইচ কিউ বেরিয়ে যাচ্ছে"।[৩১] ফলে, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব এসে পড়ল রণদীভের ওপর। এখান থেকে এক সাব কমিটি গঠিত হল, যার কাজ হল পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য রাজনৈতিক প্রস্তাব রচনা করা।

কেন্দ্রীয় কমিটির এই পরিবর্তিত লাইন গ্রহণ করার ব্যাপারে সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ্‌দের মূল্যায়ন কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, এঁদের মধ্যে ছিলেন ঝুকভ, ডায়াকভ, বালুবুশেভিচ এবং ঝানভ অন্যতম। এঁরা ভারতের বিপ্লবের স্তর এবং ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণির চরিত্র বিশ্লেষণে এক ভ্রান্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণি এবং সমগ্র জাতির বিরোধকে তাঁরা বিবেচনার মধ্যেই আনেননি। এসবের একটা প্রভাব পড়েছিল সিপিআই-এর মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই পার্টির মুখপত্র পিপলস্ এজ-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হল, "এটা একটা বিশ্রী ধরনের মিথ্যা যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। জাতীয় নেতারা যা অর্জন করেছে, তা হল ঝুটা স্বাধীনতা।"[৩২]

আর একটা কারণও থাকতে পারে। যোশী আমলের নির্দেশে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে রাশ টেনে ধরার প্রবণতা থাকলেও নীচের স্তরের মানুষের মধ্যে নিজামশাহী শাসন অবসানের মানসিক দৃঢ়তা তখনও ছিল। মানুষ লড়তে চাইছে তখন নেতৃত্ব রাশ টেনে আছে। এই ঘটনা সিপিআই-এর মধ্যে স্বাধীনতার পর আরো জঙ্গী মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল। আবার যদি কাকদ্বীপের কথা ধরি, তা হলে দেখবো, সেখানকার কৃষক সভার নেতৃত্বকে প্রাদেশিক নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছিল, "ধান কেটে জোতদারদের খামারেই দেবেন, নয়তো আমরা পারবো না।" কিন্তু দৃশ্যটা অন্যরূপ ধারণ করল। কৃষকেরা জমির ধান কাটল, তবে তারা জোতদারের ঘরে না দিয়ে ধান নিজেদের খামারেই রাখল। কংসারী হালদার, গজেন মালী প্রমুখ নেতারা প্রাদেশিক নেতৃত্বের নির্দেশ কৃষকদের বোঝালেও কৃষকেরা তাতে রাজী হল না। কারণ তখন কৃষকেরা লড়তে চাইছে।

আমরা যদি শ্রমিক আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি ফেরাই, সেখানেও দেখব, সাধারণভাবে নিস্তেজ শ্রমিক আন্দোলনের আবহাওয়ার মধ্যেও কোথাও কোথাও জঙ্গী মেজাজের দৃশ্য। যেমন— শ্রী দুর্গা কটন মিলে ৪ জন ইউনিয়ন কর্মীকে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মনোরঞ্জন হাজরার নেতৃত্বে আন্দোলন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও বাসন্তী কটন মিলের শ্রমিকদের অব্যাহত ধর্মঘট, ব্রুক বন্ডের ১০ জন ইউনিয়ন নেতার প্রতিবাদে ধর্মঘট, সরকারের মালিক ঘেঁষা শ্রমনীতির প্রতিবাদে কারখানায় কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ এবং এ আই টি ইউ সি'র ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতায় ৫০ হাজার শ্রমিকের প্রতিবাদ সমাবেশের ঘটনা। এসবই শ্রমিকদের সংগ্রামী মেজাজেরই প্রকাশ।

তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম, বাংলার তে-ভাগা আন্দোলন, কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলন এবং সারা ভারত জুড়ে আরো অনেক আন্দোলন পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে যোশী আমলের পার্টি লাইন পরিবর্তনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এছাড়াও কমিউনিস্ট আন্দোলন, কার্যকলাপ ও কর্মসূচির ওপর সরকারের দমন পীড়ন নীতির জন্য পার্টির নিচুস্তরে কর্মীদের মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা সম্পর্কের ভিত্তিটাই ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকল। যুক্তভাবে জাতীয় পুণর্গঠনের কাজ করার আশা কমিউনিস্টরা ত্যাগ করল।

সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ্‌দের মূল্যায়ন, ভারতের বিভিন্ন স্থানের গণ অভ্যুত্থান এবং

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে চিন, মালয়, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের সশস্ত্র সংগ্রাম সিপিআই'র মধ্যে পার্টি লাইন পরিবর্তনের মনোভাব তৈরি করেছিল। এর সঙ্গে দেশভাগ জনিত উদ্বাস্তু সমস্যার ভয়াবহ মাত্রাও সহায়ক ভূমিকা পালন করল।

এরই ফল ফললো ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে। এই সভাই দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের নতুন রাজনৈতিক লাইন গ্রহণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল।

পার্টির সংস্কারবাদী লাইন পরিবর্তনের চেষ্টার মধ্যেও দু'টি বিষয় তখনও দৃশ্যমান ছিল। এক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড় বড় আন্দোলন। দুই, পার্টির প্রতি মানুষের ভালবাসা। দ্বিতীয়টির এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হল 'স্বাধীনতা' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক সভা ও সংস্কৃতির অনুষ্ঠান। এই সভার আহ্বায়ক ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ ও সোমনাথ লাহিড়ী। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন মৃণালকান্তি বসু। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুখেন্দু গোস্বামী, রাজেন সরকার, পরিতোষ শীল, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, কালোবরণ দাস, গৌরী কেদার ভট্টাচার্য, কুমারেশ বসু, অজিত চ্যাটার্জী, গৌর ঘোষ, ক্ষিতিশ বসু, সুনীল রায়, অপরেশ লাহিড়ী, কেষ্ট ব্যানার্জী ও অজিত বসু। শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মহম্মদ ইলিয়াস, ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় রায়, খগেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বক্তৃতা করেছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 'স্বাধীনতা'র দ্বিতীয় বর্ষ শেষ সংখ্যার সঙ্গে আট পাতার "স্বাধীনতা দ্বিতীয় বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা" প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় নিখিল চক্রবর্তীর "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৩]

পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পূর্বে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চেহারা কেমন ছিল, তা সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্বাধীনতার পর দেশ এক গভীর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েছিল। এর মূল কারণ ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ও উৎপাদন হ্রাস। ষ্ট্যার্লিং ব্যালেন্স যাও বা ছিল, তা ছিল বিদেশে। ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তা দিতে নারাজ ছিল। বিদেশ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর আমদানির জন্য ডলার ছিল না। আমাদের দেশের শিল্পপতিরা চেয়েছিল যে আমেরিকান পুঁজিপতিরা ইউরোপের জন্য যে মার্শাল প্লান উপস্থিত করেছিল, তা এশিয়াতেও প্রয়োগ করার জন্য জাতীয় সরকার যেন তদ্বির শুরু করে। মার্শাল প্লান হল আসলে সোভিয়েত প্রভাবের বহির্ভূত দেশগুলিকে সাহায্য দান ক'রে সোভিয়েত প্রভাব রোধ করার একটি পরিকল্পনা। যদিও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেহেরুজী ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রীয় মালিকানার সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার সামঞ্জস্য বিধানের কথা অর্থাৎ মিশ্র অর্থনীতির কথা বলতে শুরু করেছিলেন। এসময় কমিউনিস্ট পার্টি আমেরিকা কর্তৃক ভারত গ্রাসের সূচনা শুরু হতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছিল। ভবানী সেনের লেখা পুস্তিকা "ভারতে মার্শাল প্লান?" প্রকাশিত হল পার্টি কংগ্রেসের ঠিক এক মাস আগে। তিনি বললেন, "১৫ আগস্টের পর তথাকথিত 'স্বাধীনতা' লাভে আমাদের এই ঔপনিবেশিক দাসত্বের কোন পরিবর্তন হয় নাই।"[৩৪]

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পূর্বে আরেকটি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটেছিল। তা হল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঘটনা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে উল্লাস সৃষ্টি করলেও, দু'সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গে হাজারে হাজারে উদ্বাস্তুদের আসা শুরু হয়ে গেল। বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্টে বাংলার বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য গোপন ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। দাঙ্গা নিবারণের জন্য সম্মেলন থেকে ১৩ পয়েন্টের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত মতো বাংলার কমিউনিস্টরা দাঙ্গা প্রতিরোধে এবং উদ্বাস্তুদের পূণর্বাসনের জন্য এক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই ভূমিকা পালনের একটা স্তরে তাঁরা উদ্বাস্তুদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। পুনর্বাসন এবং জীবন জীবিকার সমস্যাগুলিকে নিয়ে লাগাতার শুরু করেছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

এই আন্দোলনের ফলে বাংলায় দাঙ্গার প্রকোপ তখনও পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারেনি। কিন্তু অন্য রাজ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই রকম এক পরিস্থিতিতে হিন্দু মৌলবাদী শক্তির আক্রোশ পড়ল হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর ওপর। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে নিহত হলেন মহাত্মা গান্ধী। সেই শক্তির মতে গান্ধীজী ছিলেন সংখ্যালঘু মুসলিম তোষণনীতির একজন সমর্থক।

বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র পাতায় লেখা হল এক অবিস্মরণীয় সম্পাদকীয় "শোক নয়, ক্রোধ"। সোমনাথ লাহিড়ী ছিলেন সেসময়ে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এবং এই সম্পাদকীয় তিনিই লিখেছিলেন।[৩৫] এরই পাশাপাশি বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও ভবানী সেন। সেইসময় এঁরা দু'জনেই ছিলেন প্রাদেশিক সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।[৩৬] পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৪৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত গান্ধীজীর ওপর এক শোক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। আর জ্যোতি বসু এই প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দিয়েছিলেন।[৩৭]

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করার বিষয়টিকে গান্ধীজী নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি নেই। এমন কি তিনি লিখেছিলেন, "যদি কমিউনিজম-এর অর্থ হয় যে হিংসার মাধ্যমে ক্ষমতা ও সম্পত্তিকে করায়ত্ত করতে হবে, তা হলে জনসাধারণেরও এই অধিকার রয়েছে যে সেই রাক্ষসটাকে মেরে ফেলা।"[৩৮] গান্ধজীর এই মনোভাব সত্ত্বেও, আততায়ীর হাতে তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ওপর এক বিরাট আঘাত বলে মনে করেছিল বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি।

পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলন ১৯৪৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে (পূর্বতন ওয়েলিংটন স্কোয়ার)। সম্মেলন শেষের পর দিন অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারি বিদেশী যুব প্রতিনিধিদের এক সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল শিয়ালদহের কাছে ডিক্সন লেনের একজনের বাড়ীর ছাদে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল আই পি টি এ। এই সভায় কয়েকজন দুষ্কৃতকারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চড়াও হলে এবং গুলি চালালে সুশীল মুখার্জী ও ভাবমাধব ঘোষ নামে দু'জন যুবক মারা যায়। এই দুই শহীদ সহ আই পি টি এ এক শোক মিছিল নিয়ে পরদিন মহম্মদ আলি পার্কে আসে। আর ওই দিনই ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস।

স্বাভাবিক ভাবেই পার্টি নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা

হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ, ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী, বি টি রণদীভে প্রমুখ। তারপর সেই শোক মিছিল যায় নিমতলা শ্মশান ঘাটে। সেই মিছিলের পুরোভাগে আই পি টি এ নেতৃবর্গের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন চিন্মোহন সেহানবীশ, শ্যামসুন্দর দে, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কেদার ভট্টাচার্য, নির্মল ঘোষ এবং বিদেশী যুব প্রতিনিধিবৃন্দ।[৩৯] দক্ষিণপূর্ব এশিয় যুব সম্মেলনের ওপর এই আক্রমণ বস্তুত ছিল কমিউনিস্ট পার্টির আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের ওপর আক্রমণ। এ হল কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের আরেকটি দৃষ্টান্ত।

এই পটভূমিকাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। যার আলোচনা আমরা করব পরের অধ্যায়ে।

তথ্যসূত্র :

১. জনযুদ্ধ, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৩

২. চন্দননগর, জনজাগরণ ও এক মঞ্চ, সংযুক্ত নাগরিক কমিটি, চন্দননগর, পৃ. ৮

৩. Letter from Kali Charan Ghosh to Editor of 'Swadihinata' on 2.7.1947. File No. 35/26. Sl No. 149/26. State Archives. (সহায়ক তথ্য - ১)

৪. পূর্বোল্লিখিত তথ্যসূত্র নং ২, পৃ. ১০

৫. পূর্বোল্লিখিত তথ্যসূত্র নং ২, পৃ. ১৬

৬ আনন্দগোপাল ঘোষ— কোচবিহার রাজ্যের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পটভূমিকা, ইতিহাস অনুসন্ধান-২, ১৯৮৭, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ।

৭. 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা ২০০৬, কোচবিহার জেলা সংখ্যা Cooch Behar Merger Agreement.

টিকা : (১) Cooch Behar Merger Agreement-এ স্বাক্ষর দান করেছিলেন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ এবং ভারত সরকারের পরামর্শদাতা ভি.পি. মেনন।

(২) এই চুক্তির মোট ৯টি ধারা আছে। — (সম্পাদক)

৮. ভোলা দত্ত— কোচবিহার জেলার গণ আন্দোলনের কিছু কথা। 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা, কোচবিহার জেলা সংখ্যা ২০০৬।

টিকা : (১) হাটের ইজারাদারবা অতিরিক্ত খাজনা আদায় করত। তার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট কর্মী শিবেন চৌধুরী গান বেঁধেছিলেন— "ত্যাল চক্ চক্ দেহটা,/নাম ডাংরার ব্যাটাটা,/ মোক ঠকানু নিরিখ না দ্যাখেয়া'। এই আন্দোলনটি রাজ্যের সর্বত্র সংগঠিত হয়েছিল।

(২) অন্য আন্দোলনটি মেখলিগঞ্জের ধুলিয়া উছল পুকুরিতে সংগঠিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের দাবি ছিল, 'যে কৃষক জোতদারদের জমি নিজের হাল গরু নিয়ে চাষ করবে, সে বছরে ১২ মন ধান পাবে।' একে বলা হত 'পানা'। — (সম্পাদক)

৯. সরোজ মুখার্জি— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, কোচবিহারের প্রাথমিক পর্যায়ের পার্টি সম্পর্কে বীরেন চন্দ্র দে সরকারের বক্তব্য পৃ. ৫৯২ এবং 'স্মৃতি থেকে দেবী নিয়োগী' পুস্তিকায় ওই একই বিষয়ে মনোমোহন সেন এর বক্তব্য পৃ. ১৫। (সহায়ক তথ্য - ২)

১০. খোকা রায়— সংগ্রামের তিন দশক, পৃ. ৬৬।

১১. প্রদোষকুমার বাগচী— কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহ্যময় ঠিকানা।

১২. রণেন সেন— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত, পৃ. ১১২

১৩. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনের রাজনৈতিক রিপোর্ট এবং অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রন্থ সিরিজের প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪৪-১৭৫ দলিল (সহায়ক তথ্য - ৩)

১৪. ১৯৪৭ সালে রাজ্য সম্মেলনে পি সি যোশীর ভাষণ, 'স্বাধীনতা পত্রিকা ৫-১০-৪৭, ৯-১০-৪৭ ও ১০-১০-৪৭ (সহায়ক তথ্য - ৪)

১৫. ভবানী সেন— স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাংলা, (সহায়ক তথ্য - ৫)

১৬. রণেন সেন— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত, পৃ. ১১২
টিকা : (১) অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত বইয়ের প্রথম খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় প্রাদেশিক কমিটির সদস্যবৃন্দের যে নামগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে জ্যোতি বসু, জলি কল ও মণিকুন্তলা সেন এই ৩ জনের নামের কোন উল্লেখ নেই, যা রণেন সেন-এর বইয়ে আছে
(২) এই ৩ জনের নামের পাশে (?) এই চিহ্ন দেওয়ার হেতুই হল, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়াস চালানো। কিঞ্চিৎ প্রয়াস সম্পর্কে সহায়ক তথ্য-৩ এর টিকা (পৃ. ১৫০) দ্রষ্টব্য।
১৭. 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, ১২ নভেম্বর ১৯৪৭
১৮. 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, ২৯ নভেম্বর ১৯৪৭, 'স্পেশাল পাওয়ার্স বিল'এর বিভিন্ন ধারা। (সহায়ক তথ্য - ৬)
১৯. 'স্বাধীনতা', ৩/১২ ও ৪/১২ ১৯৪৭, স্পেশাল পাওয়ার্স বিলের নিন্দা ও প্রত্যাহারের দাবিতে ব্যারিষ্টার ও শিল্পী সাহিত্যিক সম্প্রদায়। (সহায়ক তথ্য - ৭)
২০. আনন্দবাজার পত্রিকা— ৮ ডিসেম্বর ১৯৪৭, সম্পাদকীয়, 'বিশেষ ক্ষমতা', (সহায়ক - তথ্য ৮)
২১. 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৭
২২. 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৭, সংশোধিত নিরাপত্তা বিলের প্রতিবাদ (সহায়ক তথ্য - ৯)
২৩. 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭
২৪. 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, ১৫-১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭
২৫. জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, সভাপতি - শ্যামল চক্রবর্তী, 'বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করো, পৃ. ৫০-৬৪ (সহায়ক তথ্য - ১০)
২৬. 'পার্টি সংগঠক' ১২ ডিসেম্বর ১৯৪৭, কংগ্রেসকে সমর্থন কেন? এই মর্মে ভবানী সেন-এর বক্তব্য। (সহায়ক তথ্য - ১১)
২৭. 'স্বাধীনতা' পত্রিকা ২৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭
২৮. সিপিআই কেন্দ্রীয় কমিটির ৭-১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭-এর সভায় গৃহীত বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর 'আসল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র' শিরোনামে প্রস্তাব। (সহায়ক তথ্য ১২)
২৯. people's Age, 30 Novermber 1947
৩০. তথ্যসূত্র ২৮-এ উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত আরেকটি দলিল — On the Present Policy and Tasks of the Communist Party of India. (সহায়ক তথ্য ১৩)
৩১. উদ্ধৃতি প্রাপ্তি - অমলেন্দু সেনগুপ্ত— উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ২২৫
টিকা : (১) সুনীল মুন্সীর এই বক্তব্য ছিল প্রত্যক্ষভাবে পিসি যোশীর সান্নিধ্যে আসার দরুন। সুনীল মুন্সী ১৯৪৬ সালে এম.এ পাস করার পর রমেন ব্যানার্জির নির্দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে AISF দপ্তরে কাজ করার জন্য মুম্বাই আসেন। সেখানে তাঁকে সংগঠনের মুখপত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। তিনি রোজই পার্টি হেড কোয়ার্টারে যেতেন দুপুরে খাওয়ার জন্য। দেখা হত যোশীর সঙ্গে। সেখানেই তিনি যোশীর মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতার বেদনা অনুভব করেছিলেন। সুনীল মুন্সীর সঙ্গে আলাপচারিতায় এই বিষয়টি জানতে পেরেছি। — সম্পাদক
৩২. People's Age, 21.1.1948
৩৩. 'স্বাধীনতা' দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যা, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭, নিখিল চক্রবর্তীর প্রবন্ধ— সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (সহায়ক তথ্য - ১৪)
৩৪. ভবানী সেন— ভারতে মার্শাল প্ল্যান? জানুয়ারি ১৯৪৮ (সহায়ক তথ্য - ১৫)
৩৫. 'স্বাধীনতা' ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৮ (সহায়ক - ১৬)
৩৬. 'স্বাধীনতা' ৩১ জানুয়ারি ১৯৪৮ কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি। (সহায়ক তথ্য - ১৭)
৩৭. জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, 'গান্ধীজী স্মরণে'। (সহায়ক তথ্য - ১৮)
৩৮. উদ্ধৃতি প্রাপ্তি : Narahari Kaviraj— Gandhi-Nehru through Marxist eyes, P.42
৩৯. সমীর দাশগুপ্ত— গণ আন্দোলনে ছাপাখানা, কমিউনিস্ট পার্টি ও সমদর্শী সংবাদপত্রের ক্রমপর্যায়, পৃ. ৩৫০

Communist Party of French India's Stand on Setting up a new Executive Council for French India

এই বিষয়টি ফরাসী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কালীচরণ ঘোষ 'স্বাধীনতা' পত্রিকাকে জানিয়েছিলেন।

"Governor of French India" has declared the intention of the French Government to set up a new executive Council for French India. Kali Ghosh, Secretary of the Communist Party of French India, issued a statement saying—

"It is a travesty of truth to call this council a step towards democratic Government of French India. The Communist Party of French India will have nothing to do with this proposed council and it calls upon all patriotic parties and people of French India to boycott this council.

"The French Indian people are not going to be satisfied with such Executive Council. ... the French (Government—সম্পাদক) should here and now declare the date of their withdrawal from India and leave the people to decide their own destinies in their own way. They (the French Indian people— সম্পাদক) are also united and uncompromising in their demand for a sovereign constituent assembly which will frame their independent future. On these twin demands there can be no compromise and to think, as the French Government thinks, that a French Indian people will be satisfied with fake reforms is not to face reality and that at a time when wise statesmanship and counsels should prevail above every other considerations."

প্রাপ্তিস্বীকার : Pol File 35/26, Sl. 149/26, dt- 2.7.1947

টিকা : চন্দননগরের National Democratic Front ফরাসী সরকারের প্রস্তাবিত Executive Council কে বয়কট করার জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করেছিল এবং ফরাসী ভারতের National Democratic Front-এর কেন্দ্রীয় কমিটিকে অনুরূপ কাজ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। (ঐ, ১.৭.১৯৪৭)

কোচবিহারের প্রাথমিক পর্যায়ের পার্টি সম্পর্কে দু'টি বক্তব্য

বীরেনচন্দ্র দে সরকার

কোচবিহার জেলা পার্টি সূত্রপাতে কোন কোন পার্টি সভ্য শুরু করেছে তার রিপোর্টে বীরেন দে সরকার, জীবন দে ও সরোজ ভট্টাচার্যেরর নাম উল্লেখ ছিল। এতে মনে হবে জীবন দে সূত্রপাতে ছিল— কিন্তু তা সঠিক নয়।

১৯৪০ সালে কোচবিহারে একটি মার্কসিস্ট গ্রুপ হিসাবে গড়ে ওঠে। রংপুরের পার্টির সাথে মার্কসিস্ট গ্রুপের যোগাযোগ হয়। কোচবিহার দেশীয় রাজ্য থাকায় রাজনীতি করা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৪৩ সালে ঐ গ্রুপটিকে রংপুর জেলা কমিটির সাথে আলোচনা করার পর মিশে যেতে বলা হয়। সেই সময়ে প্রথম ১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই প্রথম পার্টি সভ্যপদ পান বীরেন চন্দ্র দে সরকার। ১৯৪৬ অগস্ট মাসে আরো কয়েকজন পার্টি সভ্যপদ পান। অনিল রায়, বিনয় ভৌমিক প্রমুখ এই চারজনের মধ্যে ছিল। এঁদের নিয়ে একটি সেল গঠিত হয়। সম্পাদক হয়েছিলেন বীরেন্দ্রচন্দ্র দে সরকার। ১৯৪৫ সালে শিবেন চৌধুরী সভ্যপদ পান। ১৯৪৬ সালে জীবন দে রংপুর থেকে আসেন। ১৯৪৬ সালে সরোজ ভট্টাচার্য সভ্যপদ পান। তারপর দেবী নিয়োগী রাজশাহী থেকে আসেন। সুতরাং কোচবিহার জেলার সূত্রপাতে কোনমতেই জীবন দে, দেবী নিয়োগী থাকেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বীবেন চন্দ্র দে সরকারকে প্রথমে রংপুর জেলা কমিটি, জেলা কমিটি সংগঠক হিসাবে গ্রহণ করে। পরে বীরেন চন্দ্র দে সরকারকে সম্পাদক করে বেআইনী অবস্থায় জেলা সংগঠনী কমিটি সংগঠিত হয় ১৯৪৬ সালে।

১৯৪৬ সালে কোচবিহারে গোপনে রেল কোয়ার্টারে জীবন দে কোচবিহার আসবার আগে কোচবিহারে জেলা সংগঠনী কমিটি সংগঠিত করতে কমরেড সরোজ মুখার্জি কোচবিহারে গোপনে আসেন।

প্রাপ্তিস্বীকার : সরোজ মুখার্জি— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, পৃ. ৫৯২-৩।

মনোমোহন সেন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক তখন পুরণচাঁদ যোশী, দেশ তখন ইংরেজ শাসনে। সারা দেশে পার্টি অবৈধ। কোচবিহার তখনও জেলা হিসেবে পরিণত হয়নি। করদ ও

মিত্র রাজ্য কোচবিহারে পার্টির সম্পাদক কমরেড বীরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার (রবিদা)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সামরিক বিভাগের কয়েকটি পরিত্যক্ত ছাপড়া পড়েছিল কোচবিহার শহরের দক্ষিণ প্রান্তে নিউটাউনে। ঐখানে রবিদা ও কমরেড নিখিল মুখার্জী কোচবিহারের বড় জমিদার ও পদস্থ রাজকর্মচারী ললিত মোহন বকসীর শ্যালক আমাকে ও আরও তিন চারজন ছাত্রকে ঐ পরিত্যক্ত ছাপড়াগুলির একটিতে নিয়ে যেতেন পার্টির মুখপত্র জনযুদ্ধ পড়ে বোঝাতে।...

... প্রকৃতপক্ষে তে-ভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সনে কোচবিহার সদর মহকুমার কাঁকড়ীবাড়ি গ্রামে শশধর তালকুদারের জমিতে দেবী নিয়োগীর নেতৃত্বে। তাঁর সাথে ছিলেন বীরেন চন্দ্র দে সরকার, রেবতী ভট্টাচার্য ও শিবেন চৌধুরী। দেবীদার পরামর্শ মতই একই মহকুমার কালজানী গ্রামে দীনেশ কার্যী ও রজনী সিংহের নেতৃত্বে তে-ভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে দেবী নিয়োগীর নেতৃত্বে কোচবিহার শহরের উত্তরে ডোডেয়ার হাট গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দেবী নিয়োগী, বীরেন চন্দ্র দে সরকার, শিবেন চৌধুরী ও আরও ক'জন ১৯৪৮ সনে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন ও কারাবরণ করেন। তাদের রাখা হয়েছিল দিনহাটা জেলে।

প্রাপ্তিস্বীকার : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কোচবিহার জেলা পরিষদের পক্ষে "স্মৃতি থেকে দেবী নিয়োগী" বইয়ের একটি লেখা থেকে। লেখক— মনোমোহন সেন — সংগ্রামী দেবী নিয়োগী/মহানায়ক দেবী নিয়োগী, পৃ. ১৫-১৬।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির

চতুর্থ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন

৪ঠা, ৫ই ও ৬ই অক্টোবর, ১৯৪৭

কলিকাতা

রাজনৈতিক রিপোর্ট

(খসড়া)

প্রস্তাবক— ভবানী সেন

(শুধু প্রতিনিধিদের জন্য)

চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনে মূল রাজনৈতিক রিপোর্টের খসড়ার প্রস্তাবক ছিলেন ভবানী সেন। এটি আমরা সংযোজিত করলাম প্রথম দলিল হিসাবে। তবে অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত বইয়ের প্রথম খণ্ডের ১৪৪পৃ-১৭৫ পৃষ্ঠায় 'চতুর্থ রাজ্যসম্মেলন এই হেডিংএ' ''স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সারা বাংলার যুক্তফ্রন্ট চাই'' এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপা আছে। এই প্রতিবেদনটি রাজনৈতিক রিপোর্ট না হলেও, হতে পারে সম্মেলনে অন্য বিষয়ের ওপর আলোচনা সংক্রান্ত রিপোর্ট। সে জন্য এটিও আমরা মূল্যবান গণ্য করে দ্বিতীয় দলিল হিসাবে সংযোজিত করলাম। —সম্পাদক

প্রথম দলিল

প্রথম খণ্ড

রাজনৈতিক রিপোর্ট

১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে আমাদের পার্টির বিগত প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পর ঘটনাবহুল সাড়ে চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সেদিনকার পরাধীন ভারত আজ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস লাভ করিয়াছে। সেদিনকার ঐক্যবদ্ধ দেশ আজ ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত। সেদিনকার হিন্দুমুসলমান অনৈক্য আজ মারাত্মক গৃহযুদ্ধে পরিণত। দুনিয়ায় এক যুদ্ধ মিটিয়া আর এক যুদ্ধের ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। হিটলার এবং তোজোর দল বিধ্বস্ত, তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে আমেরিকার ধনকুবেরদের নেতা ট্রুমান। সেদিনকার ফ্যাসিষ্ট পদানত, পূর্ব ইউরোপে আজ নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আমাদের পার্টি এই সাড়ে চারি বৎসর ধরিয়া উজান স্রোত ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুর্বলতা, ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও আমরা সমস্ত সংকটেই দরিদ্র জনগণের অংশ হিসাবে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছি, তাই কঠোর দুর্যোগের মধ্যেও পাইয়াছি জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন। বিগত সম্মেলনের সময় বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যসংখ্যা ছিল ৩০০০, বর্তমানে আমাদের সভ্যসংখ্যা ২০০০০। বিগত সম্মেলনের সময় আমাদের সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি হইতে আগত লোক, আজ আমাদের সভ্যদের অধিকাংশ শ্রমিক এবং কৃষক।

১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ

আমাদের বিগত সম্মেলন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেশব্যাপী মন্বন্তরের সম্মুখীন হই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর এতবড় মন্বন্তর বাংলাদেশে আর হয় নাই। এই মন্বন্তরে ১৯৪৩ সালে ৩৫ লক্ষ নরনারী অনাহারে মারা গিয়াছিল, গ্রামের কারিগরেরা সর্বস্বান্ত ও ভিটাছাড়া হইয়াছিল, আড়াই লাখ কৃষক তাহাদের জমিজমা বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিল। অক্টোবর মাসে দুর্ভিক্ষ যখন চরমে উঠে তখন কলিকাতা শহরে যে নিরন্ন দুস্থদের সমাগম হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ।

এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থায় অলস ভূস্বামীরা কৃষির আয় ভোগ করে, হাজার করা ২৫ জন ভোগ করে কৃষিজাত আয়ের দশভাগের একভাগ। অথচ কৃষির উন্নতির দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করে না। গত ২৫ বৎসরে কৃষি উৎপাদন ৩ ভাগের এক ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে সারা বাংলায় ৩৭ লক্ষ একর জমি পতিত রহিয়াছে।

এই ব্যবস্থা কৃষকদের নিঃস্ব করিয়াছে এবং মুষ্ঠিমেয় অকৃষক ধনীর হাতে জমি পুঞ্জীভূত করিয়াছে। সারা বাংলার ৭৫ লাখ কৃষক পরিবারের অর্দ্ধেকের কাহারও হাতে জমির পরিমাণ ২ একরের বেশি নয়। ইহাদের মধ্যে ৩০ লাখ পরিবারের জমিতে কোন সত্ত্ব নাই, হয় তাহারা মজুর নয় ভাগচাষী। চাষের জমির শতকরা ৩৪ ভাগ এই সমস্ত সত্ত্বহীন চাষীরা চাষ করে। ইহা হইল ১৯৪০ সালের হিসাব, বিগত মহাযুদ্ধের ভিতর নিঃস্ব চাষীর সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে, জমি মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে আরও বেশি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। ইহারই ফলে আজকাল যখন তখন খাদ্যশস্য মজুত করিয়া ধনী ভূস্বামীরা খাদ্যের দর বাড়াইয়া দিতে পারে।

ইহার উপর ১৯৪৩ সালে বন্যা এবং অজন্মা খাদ্যাভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। বন্যা এবং অজন্মাও দেখা দেয় এই জন্য যে সমাজে কৃষকদের শোষণ করিবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু কৃষির উন্নতির ও নদীনালা সংস্কারের ব্যবস্থা নাই।

১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রিলিফের কাজে যোগদান করে। খাদ্য মজুতের বিরুদ্ধে আমরা ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে গণ অভিযান পরিচালনা করি। এই সময় আমরা সরকারি খাদ্য ক্রয় এবং রেশনিং পরিকল্পনা লইয়া আন্দোলন চালাইয়া ছিলাম। গ্রামে গ্রামে সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করিয়া খাদ্য সরবরাহের কাজ আমাদের পার্টি হইতেই প্রথম আরম্ভ হয়। অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের আন্দোলনে ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে আমাদের কৃষকেরা খাল কাটিয়া ও নালা বাঁধিয়া প্রচুর পতিত জমিকে আবাদযোগ্য করিয়া তুলে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুস্থদের পুনর্বসতির কাজে আমাদের পার্টির মহিলারা গঠনমূলক কাজ পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সময়কার খাদ্য আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টিকে দরিদ্র জনগণের নিকটতর করিয়া তুলে।

এই সময়কার খাদ্য আন্দোলনে আমাদের প্রধান দুর্বলতা ছিল এই যে, দুর্ভিক্ষের কারণ স্বরূপ আমরা শুধুমাত্র মজুতদার ব্যাপারীর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলাম কিন্তু ভূমিব্যবস্থার ভিতর যে দুর্ভিক্ষের কারণ নিহিত রহিয়াছে এবং চিরদিনের জন্য দুর্ভিক্ষের কারণ দূরীভূত করিতে হইলে যে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই সেদিকে তখন আমাদের দৃষ্টি যায় নাই। যতদিন এই প্রথার আমূল পরিবর্তন না করা হয় ততদিন দুর্ভিক্ষ এদেশে বার বার দেখা দিবে। খাদ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য কৃষকের হাতে জমি দিতে হইবে। জমির মালিকানা হইতে পরগাছা জমিদার ও ধনী জোতদারদের উচ্ছেদ করিয়া কৃষিজাত আয়ের লভ্যাংশ লইয়া নদী-নালা সংস্কার ও জমিতে সেচ, সার ও বীজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জাতীয় ঐক্যের সমস্যা

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কমরেড অধিকারীর পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবের সঙ্গে বাংলার সমস্যা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাংলার অধিকাংশ অর্থাৎ শতকরা ৫৫জন মুসলমান। কিন্তু সম্প্রদায়গত ভাবে

বাংলাদেশ দুই অঞ্চলে বিভক্ত, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুপ্রধান এবং পূর্ববঙ্গ মুসলমান প্রধান। অথচ সারা বাংলার ভাষা এক এবং দুই বাংলার অর্থনৈতিক সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ তাহা আজ বঙ্গভঙ্গের পর সবাই বুঝিতে পারিতেছেন।

আমাদের পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাবে ভারতবর্ষ যে বহু জাতির আবাসভূমি তাহা দেখান হইয়াছিল। এই সমস্ত জাতির মধ্যে বাঙ্গালী একটি জাতি। ভারতের সীমান্তে অবস্থিত জাতিগুলি মুসলমান প্রধান এবং এই জাতিসূহের আবাসভূমি গুলিই শিল্পে, বাণিজ্যে, শিক্ষায় অনুন্নত; এই অবস্থাটাই সুকৌশলে ব্যবহার করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিক্ষোভ হইতেই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বা পাকিস্তান দাবির উৎপত্তি।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের সারমর্ম্ম এই যে প্রথমত— ভারতের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইবার অধিকার মানিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, সমগ্র ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বেচ্ছামিলানের ভিত্তিতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, হিন্দুমুসলিম বিরোধের জন্য বাংলার দুই অংশে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা আছে, কারণ বাংলার দুই অংশের স্বেচ্ছামিলনের ভিত্তিতেই বাঙ্গালীজাতির অখণ্ড ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে আমরা গত কয়েক বৎসর কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য স্থাপনের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু কংগ্রেস কখনও অখণ্ড ভারতের দাবি পরিত্যাগ করে নাই। লীগও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি ছাড়ে নাই। উভয় পক্ষই বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করিয়াছে।

আমাদের প্রস্তাব যদি উভয় দল গ্রহণ করিত তাহা হইলে আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করিতে পারিত না।

কংগ্রেস এবং লীগ নেতাদের ভ্রান্ত নীতি আজ অশান্তি, অরাজকতা এবং গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়া ভারত বিভাগ ও বঙ্গভঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে। যখন বাংলার দুই অংশ স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া স্বাধীন বঙ্গদেশ গঠন করিবে তখন জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া স্বেচ্ছা মিলনের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে, তখনই গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান ঘটিবে। সে পথে দুইটি রাষ্ট্রকেই পরস্পর সহযোগিতার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় ঐক্যের ও আত্মনিস্ত্রণের অধিকারের যে নীতি উপস্থিত করিয়াছে উহাই ভারতীয় সমস্যা সমাধানের মূল কথা। পাকিস্তান ধ্বংস করিবার সংকল্প এই সমস্যার সমাধান করিবে না, পাকিস্তানকে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে।

এই নীতি প্রচার করিতে গিয়া আমরা মারাত্মক ভুলও করিয়াছি। ১৯৪৪ সালে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্বন্ধে প্রচার করিতে গিয়া আমরা বলিয়াছিলাম লীগের পাকিস্তান দাবি ন্যায্য দাবি। তখন আমরা পাকিস্তান ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একাকার করিয়া দেখিয়াছিলাম। ইহাতে ভুল ছিল এই যে—

লীগের পাকিস্তান দাবি কোন রকমের ভারতীয় ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র বরদাস্ত করে না অথচ সারা ভারতের ঐক্যই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রধান শক্তি।

লীগের পাকিস্তান দাবির পিছনে এই যুক্তি রহিয়াছে যে ভারতের হিন্দুরা এক জাতি এবং মুসলমানেরা এক জাতি। অথচ বাঙ্গালি, পাঠান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি।

(৩) লীগের পাকিস্তান দাবির অর্থ হইল স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র। অথচ আজ পাকিস্তান স্থাপনের পর জিন্নাসাহেবও বলিতেছেন সে পাকিস্তান হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রাষ্ট্র।

আমাদের এই ভুলের জন্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের আন্দোলন দুর্বল হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ভুল আমরা ১৯৪৬ সালে সংশোধন করিয়াছিলাম। আমাদের এই ভ্রমসংশোধনকে কোন কোন প্রগতিশীল লীগপন্থী লীগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা ভাবিয়াছেন যে কমিউনিস্টরা আগে ছিল পাকিস্তানের বন্ধু, এখন হইল পাকিস্তানের শত্রু। তাঁহাদের এই ধারণা ভুল। আমরা বরাবর একটি কথা বলিয়া আসিতেছি, সে কথা হইল এই যে, মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি যতদিন থাকিবে ততদিন পাকিস্তানের সমস্যা কংগ্রেসলীগ আপসে সমাধান করিতে হইবে, মুসলমান মেজরিটি অঞ্চলের স্বাধীন স্বেচ্ছা-সম্মতি লইয়াই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা চলিতে পারে। যতদিন সেই স্বেচ্ছাসম্মতি না পাওয়া যাইবে ততদিন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে হিন্দু ও মুসলমানকে, হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানকে সহযোগিতা করিয়া চলিতে হইবে।

সাধারণ নির্বাচন

যুদ্ধান্তে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন হয়। ইহার পূর্বেই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের কমিউনিস্ট বিদ্বেষের ফলে আমাদের পার্টিকে কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিতে হয়। সুতরাং সাধারণ নির্বাচনে আমরা স্বতন্ত্র পার্টি হিসাবে সারা বাংলায় মোট ১৯জন প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলাম। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সহ ভারতীয় ঐক্য, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অভিযান এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—এই সমস্ত দাবির উপর জনমত গঠনের জন্য আমরা সাধারণ নির্বাচনে নামিয়াছিলাম। যুদ্ধের সময় আমাদের ফ্যাসিস্ট বিরোধী পন্থাকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা বলিয়া কদর্থ করিয়া কুৎসা রটাইয়া কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড আমাদের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। আমরা দুইটি মুসলিম আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলাম বলিয়া ঐ একই সময় লীগও আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়।

প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা ৩টি আসনে জয়লাভ করিয়াছিলাম। এবং সারা বাংলায় ১,৫৯,০০০ ভোট পাইয়াছিলাম। মোট ১ লক্ষ ভোটদাতা আমাদের ভোট দিয়াছিলেন। এই এক লক্ষ ভোটদাতার অধিকাংশই কমিউনিস্ট নহেন, তথাপি কংগ্রেস ও লীগের বিপুল ও প্রচন্ড আক্রমণ সত্ত্বেও বাংলার ১ লক্ষ নরনারী কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দিয়াছিলেন এই জন্য যে, তাঁহারা তাঁহাদের দূরদৃষ্টিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন : কংগ্রেস ও লীগ যে উন্মত্ত বিরোধ বাড়াইয়া তুলিতেছে তাহার পরিণাম সাংঘাতিক হইবে এবং কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে ঐক্য অভিযানের আহ্বান জানাইতেছে উহাই বাংলার কল্যাণের পথ। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কৃষকের জমির জন্য ও মজুরের রুটির জন্য কমিউনিস্ট পার্টির অভিযানকে শক্তিশালী না করিলে বাঙ্গালী চিরদিন মুনাফাখোরের শিকার থাকিবে। বিগত

সাধারণ নির্বাচনে যে ১ লক্ষ ভোটদাতা আমাদের ভোট দিয়াছিলেন তাহাদের সমর্থক ছিলেন আরও কয়েক লক্ষ ভোটাধিকারশূন্য নরনারী। বিগত সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে সর্বসাধারণের ভিতর দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করে। ঐ নির্বাচনে পার্টি দূর্বল হয় নাই। বরং আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হইয়াছে।

১৯৪৩ ও ৪৪ সালে খাদ্য আন্দোলনের ভিতর দিয়া আমরা জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সাধারণ নির্বাচনে সে প্রতিষ্ঠা আরও ব্যাপক এবং দৃঢ় হইয়াছিল।

নতুন গণসংগ্রাম

শ্রমিকের ধর্ম্মঘট

যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট আরম্ভ হয়। যুদ্ধের সময় শ্রমিক লালঝান্ডার নীতি অনুসরণ করিয়া অভূতপূর্বরূপে সংগঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক বিজয় সংগ্রাম আরম্ভ করে এবং উপর্য্যুপরি জয়লাভ করিতে থাকে।

যুদ্ধের ফলে শ্রমিকের জীবনধারণের ব্যয় অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। বাংলা দেশে জীবনধারণের ব্যয় যেরূপ তাহাতে একজন শ্রমিকের কমসে কম মাসে ১২১টা: ৬ আ: লাগে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে। কিন্তু কলিকাতার একজন রেল শ্রমিক বড় জোর ৪৮।। টাকা পান, একজন নীচু গ্রেডের পোস্টাল শ্রমিকের মাগ্গী ভাতা সহ মোট রোজগার ৬৯টা: ১২ আনার বেশি নয়, কোন চটকল শ্রমিক ৩৮ টাঃ ৫ আনার বেশী পায় না, কোন কয়লার শ্রমিক ২৩ টাঃ ৬ আনার বেশি পায় না। অথচ মালিকেরা যুদ্ধের যুগে দেদার মুনাফা লুটিয়াছে। একটি শিল্পের গড় মুনাফা যদি ১৯৩৯ সালে ১০০ ধরা যায়, তাহা হইলে ১৯৪৩ সালে তাহার মুনাফা হইয়াছে নিম্নরূপ:

চটকল—৯২৬, সুতাকল—৬৪৫, বিবিধ—৪০১, কয়লা—১২৪, ইঞ্জিনিয়ারিং—২২৫।

এই জন্যই যুদ্ধান্তে ধর্ম্মঘটের হিড়িক লাগিয়া যায়। ১৯৪৫ সালে কলিকাতা ট্রাম শ্রমিকদের ৯ দিন ব্যাপী বিজয়ী ধর্মঘট দিয়া ইহা শুরু হয়, তাহার পর ১৯৪৬ সালে ২৯ জুলাই পোস্টাল ধর্ম্মঘটের সমর্থনে সাধারণ ধর্ম্মঘটের ভিতর উহা সর্বাপেক্ষা ব্যাপকতা লাভ করে। ১৬ই আগস্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইবার পর কিছুদিন ধর্ম্মঘটের গতি স্তিমিত ছিল কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার সংগ্রাম আরম্ভ হয়। রেল শ্রমিক এবং পোস্টাল শ্রমিকদের সংগ্রাম গভর্নমেন্টের নিকট হইতে পে-কমিশন আদায় করিয়াছে। এই সংগ্রামের ভিতর দিয়া ট্রেডইউনিয়নের কংগ্রেস সাধারণভাবে সর্বসাধারণের রাজনৈতিক শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে দেখিয়া মালিকেরা ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে নূতন ভেদের অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে। কংগ্রেস স্বতন্ত্র ভাবে জাতীয় ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করিয়াছে এবং সোস্যালিস্টরাও আর একটী স্বতন্ত্র সংগঠন তৈরি করিতেছে। শ্রমিক আন্দোলনের এই বিভেদ মালিকদেরই শক্তি বাড়াইবে। ট্রেডইউনিয়ন ঐক্যের জন্য আমাদের আবার নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শ্রমিক আন্দোলনের সম্মুখে নূতন সমস্যা দেখা

দিয়াছে। উৎপাদন বাড়াইবার জন্য জাতীয় স্বার্থে শ্রমিক ও মালিকের সহযোগিতার জন্য গভর্নমেন্ট ওয়ার্কস কমিটি গঠন করিতেছে। শ্রমিক এ ক্ষেত্রে কি করিবে? অনুন্নত অর্দ্ধ পরাধীন ভারত ও পাকিস্তানে শ্রমিক উৎপাদন বৃদ্ধির দায়িত্ব গ্রহণ নিশ্চয়ই করিবে এবং শ্রমিক ইউনিয়ন ওয়ার্কাস কমিটির সঙ্গে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করিবে। শ্রমিকবিরোধ নিস্পত্তির জন্য গভর্নমেন্ট এড্‌জুডিকেটর বা ট্রাইবুনাল নিয়োগ করিতেছে। শ্রমিক ইউনিয়ন নিশ্চয়ই শ্রমিকের দাবি আদায়ের জন্য ধর্ম্মঘটের পথ গ্রহণ করিবার পূর্বে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করিবে। কিন্তু যে জাতীয় স্বার্থে উৎপাদন বৃদ্ধি চাই শ্রমিকও সেই জাতির অংশ এবং উৎপাদন যে বাড়ে না শ্রমিকের অসীম দারিদ্র্য ও মালিকের অতিরিক্ত মুনাফা শিকার তাহার প্রধাণ কারণ। কাজেই জাতীয় সরকারের দায়িত্ব শ্রমিকের জীবন ধারণের নিম্নতম যোগ্য মান স্থির করিয়া আইন প্রণয়ন করা। জাতীয় সরকার যতক্ষণ সে দায়িত্ব পালন না করিবে ততক্ষণ আপস মীমাংসার পথে নিম্নতম দাবি আদায় করা অসম্ভব হইলে শ্রমিককে সংগঠিত ভাবে ধর্ম্মঘটের অস্ত্র ব্যবহার করিতেই হইবে।

তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে এক বৃহত্তম গণসংগ্রাম। ১৯৪৬ সালে এই সংগ্রামে সমগ্র বঙ্গদেশ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এবং সমস্ত কৃষকের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সংগ্রাম গ্রামের সমস্ত গরীবদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। ময়মনসিংহে হাজংদের টংকপ্রথা উচ্ছেদের অতুলনীয় সংগ্রাম এই একই সঙ্গে চলিয়াছিল। ১৯৪৭ সালেব জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সংগ্রাম সঠিক পথে সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আরম্ভ হয় সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি— এই দমননীতির সম্মুখে কৃষকেরা অতুলনীয় দৃঢ়তা ও মনোবলের পরিচয় দিয়াছে।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বাংলা সরকার তেভাগা আইনের খসড়া গেজেটে প্রকাশ করেন, আন্দোলন তখন প্রায় জয়লাভ করিয়াছে। এই সময় আমাদের ভুল হইল এই যে, আমরা ভাবিলাম আইন এবার নিশ্চয়ই পাশ হইবে, কারণ লীগমন্ত্রিমণ্ডলী যখন আইনের খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন তখন এই আইন বিধিবদ্ধ হইবেই। আমরা তখন আইন পাশের জন্য জনসাধারণের দিকে মনোযোগ দিই নাই, এবং তেভাগা বিলের পক্ষে মধ্যবিত্তের সমর্থন সৃষ্টির চেষ্টা না হওয়ায় পুরাতন ধারা অনুযায়ী সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছি। আইন পাশ হইবেই মনে করিয়া যে সমস্ত কৃষক প্রথম অবস্থায় জমি হইতে ধান জোতদারের বাড়ি তুলিয়াছিল তাহারাও জোতদারের বাড়ি হইতে সে ধান তুলিয়া আনিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে জোতদারেরা তখন আইন পাশ করিবার বিরুদ্ধে মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর প্রচণ্ড চাপ দিতে আরম্ভ করিল এবং কমিউনিস্টরা লুঠতরাজ করিতেছে এই অপবাদ ছড়াইয়া গভর্নমেন্টকে দমননীতি অবলম্বনে বাধ্য করিল। মন্ত্রীমণ্ডলী আইনসভার অধিকাংশ কংগ্রেসী ও লীগ সদস্যের চাপে তেভাগা বিল ধামাচাপা পড়িল এবং গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র ফৌজ অত্যাচার শুরু করিল।

এই অবস্থায় আমরা আন্দোলনের কৌশল পরিবর্ত্তন করি, অর্থাৎ দমননীতির বিরুদ্ধে জনসমাবেশ আরম্ভ করি এবং কৃষকদিগকে সশস্ত্র ফৌজের সম্মুখে নিষ্ফল আত্মহত্যার পথ হইতে নিরস্ত করি। সংগ্রাম কৌশলের এই দ্রুত পরিবর্ত্তন দমননীতির বিরুদ্ধে তেভাগাবিরোধী

মধ্যবিত্তদেরও সমর্থন অর্জন করে। তাহার পর দেশব্যাপী যে দমননীতি বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া উঠিল তাহারই চাপে গ্রামে পুলিশ জুলুম বন্ধ হয়। তাহারই ফলে শত অত্যাচারের ভিতর সংগঠিত কৃষকের শক্তি অটুট রহিয়াছে।

তেভাগা সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নাই বরং ঐ সংগ্রাম কৃষকদিগকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়াছে। এই এক সংগ্রামের ধাক্কায় জোতদারি শোষকের স্বরূপ দেশবাসীর চক্ষে ধরা পড়িয়াছে, জোতদারের সভ্যতার মুখোস খুলিয়া পড়িয়াছে। এতদিন জোতদার মধ্যবিত্ত পরিচয়ে দেশের সম্মান আদায় করিত এবং জোতদারি শোষণকে স্বাভাবিক সামাজিক নিয়ম বলিয়া চালাইত। তেভাগার লড়াই সকল দলের নিকট জোতদারকে সমাজের ঘাড়ে এমন একটি বোঝা হিসাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যাহাকে তাহারা রাখিতেও পারে না, তাড়াইতেও পারে না। কৃষক ও আধিয়ারের জমির দাবি আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, কৃষকের সংগঠিত শক্তি আজ সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত। এবার জমিদারি এবং জোতদারি উচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়নের বৃহত্তর গণসমাবেশের জোরে কৃষক-আধিয়ার তাহার সম্পূর্ণ দাবি আদায় করিতে পারিবে। জোতদার জমিদার নিশ্চয়ই বাঁচিতে চাহিবে কিন্তু তেভাগার লড়াই জমিদারি ও জোতদারি প্রথার জন্য পরোয়ানা জারি করিয়া দিয়াছে। এবার ভোটে জিতিতে হইলে তেভাগা দিতে হইবে, কারণ নূতন রাজনৈতিক অবস্থার সার্বজনীন ভোটাধিকার কৃষক ও আধিয়াদের নূতন অস্ত্র দিয়াছে। এই অস্ত্র ঠিকমত ব্যবহার করিতে হইবে। জোতদার তারপরও যদি বাধা সৃষ্টি করে তখন সমগ্র জনগণ কৃষকের পক্ষে দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনুমোদন করিবে।

বন্দীমুক্তি আন্দোলন

১৯৪৬ এবং ৪৭ সালে বন্দীমুক্তির আন্দোলনও বাংলাদেশে খুব ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। এই আন্দোলনের প্রথম সফলতা হইল দীর্ঘমেয়াদী বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি। তাহার পর ১৯৪৭ সালে তেভাগা ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির জন্য সারা বাংলায় আন্দোলন হইয়াছে। ১৫ই অগস্ট বঙ্গীয় মন্ত্রীমণ্ডলী ঘোষণা করেন যে, এই সমস্ত বন্দীদেরই মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহার পর সে ঘোষণা অনুযায়ী গভর্নমেন্ট কাজ করেন নাই। কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বন্দীমুক্তির দাবি আজ এত প্রবল যে সমস্ত বন্দীদের মুক্তি অনতিবিলম্বে দিতেই হইবে।

সংগ্রাম, আপস ও দাঙ্গা

১৯৪৫ ও ৪৬ সাল বিপ্লবী অভিযানের যুগ। এই যুগে সরকারের সশস্ত্র বাহিণীর মধ্যে পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের উন্মাদনা জাগিয়াছিল। নৌ-বিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভিয়েটনাম দিবসে ছাত্রদের সংগ্রাম, শ্রমিকের সাধারণ ধর্ম্মঘট হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষকের তে-ভাগার লড়াই, কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত দেশীয় রাজ্যের গণসংগ্রাম এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনে গণসমাবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া রসিদ আলী দিবসে কলিকাতার নাগরিকদের সশস্ত্র প্রতিরোধ —এই সমস্ত ঘটনায় সাম্রাজ্যবাদীর মনে আতংক জন্মিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, বিপ্লব আসিতেছে। তাই কংগ্রেস ও লীগের সঙ্গে আপস করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ব্যস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু বিপ্লবী শক্তি এত প্রবল ছিল যে, কংগ্রেস এবং লীগও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এমন কোন চুক্তি করিতে পারে

নাই যাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী তাহার প্রত্যক্ষ শাসন রাখিতে পারে।

কিন্তু কংগ্রেস নেতারা অনুসরণ করিতে থাকিলেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের পথ এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাঁহারা গণসংগ্রামের বিরোধিতা আরম্ভ করিলেন। এদিকে মুসলিম লীগও সংগ্রামের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশের নিকট লীগ উপস্থিত করিল আপসের সর্ত্ত হিসাবে পাকিস্তান দাবি।

মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতে যে গণ-অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে হিন্দু এবং মুসলমান জনসাধারণ সমবেত ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছিল। কংগ্রেস যদি তখন আপসের রাস্তা না ধরিয়া এই সংগ্রামে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত ভারতে আজ তাহা হইলে ডোমিনিয়ন স্টেটাস আসিত না, আসিত পূর্ণ স্বাধীনতা। তখন হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে আবহাওয়া সৃষ্ট হইতেছিল, কংগ্রেস সেই সময় যদি জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার মানিয়া লইয়া তাহাকে সাহায্য করিত, ভারত তাহা হইলে আজ বিভক্ত হইত না। কিন্তু তখন কংগ্রেস লীগের বিরুদ্ধে, লীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং উভয়েই গণসংগ্রামের বিরুদ্ধে যে রাস্তা ধরিলেন তাহাতে সাম্রাজ্যবাদীর ভেদনীতিই শক্তিশালী হইল।

ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশন তখন একের বিরুদ্ধে অপরকে উস্কানি দিয়া হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। কলিকাতায় ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগস্ট লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। আমাদের পার্টি পুনঃ পুনঃ দেশবাসীকে দাঙ্গার সম্ভাবনা সম্পর্কে সর্তক করিয়া দিয়াছিল কিন্তু তথাপি ১৬ই অগস্ট হইতে দীর্ঘকাল ব্যাপী এত বড় দাঙ্গা আরম্ভ হইবে তাহা আমরাও ভাবিতে পারি নাই।

আমরা ভাবিতেছিলাম, বিপ্লবী গণসংগ্রামের দিকেই দেশ অগ্রসর হইবে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের নীতি যে দাঙ্গা সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর সে সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ চেতনা ছিলনা। দেশবাসীর উপর বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রভাব কি অপরিসীম তাহা আমরা দাঙ্গার ভিতর দেখিয়াছি কিন্তু দাঙ্গার পূর্বে ভাবিতে পারি নাই যে বুর্জোয়া নেতৃত্ব দেশবাসীর মনে এত বড় মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে।

১৬ই অগস্ট দাঙ্গা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্টি দাঙ্গার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে। কলিকাতাব সংগঠিত শ্রমিক গত একবৎসর এই দাঙ্গা হইতে নিরস্ত ছিল, মাঝে মাঝে তাহারা দাঙ্গা প্রতিরোধ করিয়াছে। এই দাঙ্গার মধ্যে ট্রাম-শ্রমিকের পোর্ট শ্রমিকের দীর্ঘব্যাপী ধর্ম্মঘট প্রমাণ করিয়াছিল যে, সংগঠিত শ্রমিকের ঐক্য দাঙ্গার উত্তেজনায় ভাঙ্গে নাই। নোয়াখালির দাঙ্গার সময় হাসনাবাদের জনগণ দাঙ্গা প্রতিরোধ করিয়া বাংলার ইতিহাসে এক মহান আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে। তেভাগার লড়াই বাংলার পল্লী অঞ্চলে দাঙ্গা প্রবেশ করিতে দেয় নাই। ১৬ই অগস্ট হইতেই কলিকাতার দুই একটি মহল্লায় শান্তি কমিটি স্থাপন করিয়া আমরা ও অন্যান্য নাগরিকেরা দাঙ্গার গতি রোধ করিতে পারিয়াছিলাম।

কিন্তু কলিকাতার নাগরিক জীবন হইতে আমরা এত বিচ্ছিন্ন যে ১৯৪৭-এর ১৫ই অগস্টের পূর্বে সাধারণ ভাবে সমগ্র কলিকাতায় আমরা দাঙ্গা রোধ করিবার জন্য হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।

কলিকাতার দাঙ্গায় আমরা দেখিয়াছি যে, সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালী নেতাদের ভয়ে তাঁহারা সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারেন

নাই। অপর দলের নেতৃবৃন্দকে যতক্ষণ আমরা সক্রিয় করিতে পারি নাই ততক্ষণ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদেরও সক্রিয় সহযোগিতা আমরা পাই নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে বিভিন্ন দলের সমবেত শক্তি দাঙ্গার বিরুদ্ধে সমবেত হইয়াছে তখনই দাঙ্গাবাজেরা নিরস্ত হইয়াছে।

দাঙ্গার পিছনে যে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র আছে সে কথা জনগণের নিকট সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জনগণ দাঙ্গা থামায় নাই বরং দাঙ্গায় মাতিয়াছে, নিজ নিজ সম্প্রদায়কে সমর্থন করিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদের অভিসন্ধির কথা গোপন করিয়া একে অপর সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে। ইহাতেই দাঙ্গা বাড়িয়াছে।

"স্বাধীনতা" পত্রিকা তাই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দাঙ্গার পিছনে সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির স্বরূপ নগ্ন করিয়া দিয়াছে, গত এক বছর দিনের পর দিন দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে 'স্বাধীনতা' নির্ভীক অভিযান পরিচালনা করিয়াছে। এক 'স্বাধীনতা' ছাড়া কলিকাতার আর কোন দৈনিক পত্রিকাই দাঙ্গার বিরুদ্ধে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি সমান মনোভাব দেখাইতে পারে নাই, বরং কলিকাতার অধিকাংশ পত্রিকা দাঙ্গার উত্তেজনাতেই ইন্ধন জোগাইয়াছে।

এক বছর পর এবারকার ১৫ই অগস্ট হইতে দাঙ্গার বিরুদ্ধে জনতার বিজয়ী অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। জনসাধারণ যতক্ষণ না প্রচুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ঐক্যবদ্ধ অভিযানের মর্ম্ম ও দাঙ্গাবাজের কারসাজি বুঝিতে পারিয়াছে, ততক্ষণ তাহারা কেহ আমাদের কথা শুনিয়াছে, কেহ তারিফ করিয়াছে কেহ প্রতিবাদ করিয়াছে, কেহ উপেক্ষা করিয়াছে। আমাদের আহ্বান যখন তাহাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়াছে এবং যখন তাহারা কিছুটা সর্বদলীয় ঐক্যের সম্ভাবনা দেখিয়াছে তখনই বিপুল উৎসাহে তাহারা দাঙ্গাবাজীর প্রতিরোধ করিতে নামিয়াছে। শুধুমাত্র আমাদের পার্টি একটি গণ-অভিযান সৃষ্টি করিতে পারে না। জনসাধারণকে অভিজ্ঞতালাভে কতটা সাহায্য করিতে পারি এবং বিভিন্ন দলের ঐক্য কতখানি গড়িয়া দিতে পারি তাহার উপর আমাদের কৃতিত্ব নির্ভর করে।

দ্বিতীয় খণ্ড

এ্যাটলির ঘোষণা ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

১৯৪৬ সালের সারা ভারতব্যাপী গণ-সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীকে আতংকিত করিয়া তোলে। এদিকে মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগদান সম্পর্কে ইতস্তত করিতে থাকে। কংগ্রেস নেতারা তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উপর এই বলিয়া চাপ দিতে আরম্ভ করেন যে মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগ না দিলেও গণপরিষদের কাজ চলিতে থাকিবে এবং তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এই অবস্থায় ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ ভারত ছাড়িয়া যাইবে এবং ইহার মধ্যে যদি কংগ্রেস ও লীগের কোন আপস না হয় তাহা হইলে বিভিন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রী সভার হাতে পৃথক পৃথক ভাবে ক্ষমতা সমর্পণ করা যাইতে পারে।

এ্যাটলির এই ঘোষণা সাম্রাজ্যবাদীর ইঙ্গিত ফল প্রসব করিল। মুসলিম লীগ ভারতীয় গণপরিষদে যোগদান চূড়ান্তভাবে বর্জন করিল এবং কংগ্রেসও দাবি করিয়া বসিল যে ভারতবিভাগের শর্ত্ত হিসাবে পাঞ্জাব বিভাগ ও বঙ্গভঙ্গ চাই। এইভাবে এ্যাটলির ঘোষণায়

ভারতীয় ঐক্যের সমাধি রচিত হইল।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন আরম্ভ হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়া মহাসভা পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গ ভঙ্গের সপক্ষে এক প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এ্যাটলির ঘোষণাকে সম্বর্দ্ধনা করায় বাংলার সাধারণ হিন্দুদের মনে এই ধারণা জন্মে যে কংগ্রেস যখন এ্যাটলির ঘোষণা মানিয়া লইল তখন সমগ্র বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে মুসলিম লীগের শাসনাধীনে যাইবে, বঙ্গভঙ্গের দাবি অনিবার্য্য করিয়া তুলিলে লীগ হয়ত ভারত বিভাগের দাবি বর্জন করিবে। কংগ্রেস নেতারা এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া বঙ্গভঙ্গ দাবিই সমর্থন করিয়া বসিলেন। বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে কংগ্রেস নেতাদের যুক্তি ছিল এই যে, সমগ্র বঙ্গ দেশ ঐক্যবদ্ধ ভারতের অর্ন্তগত করিতে না পারিলেও বঙ্গদেশের যতটা সম্ভব ততটা রক্ষা করি, আমরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষপাতী নহি কিন্তু ভারত বিভাগ অনিবার্য বলিয়াই বঙ্গভঙ্গ চাই।

মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ জানাইলে কংগ্রেস পক্ষ হইতে জবাব আসিল যে লীগ যে-নীতি অনুসারে ভারত বিভাগ চায় সেই-নীতি অনুসারেই আমরা বঙ্গভঙ্গ চাই। কংগ্রেসের এই যুক্তির সম্মুখে লীগের প্রতিবাদ দুর্বল হইয়া পড়ে।

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়া উঠিবার শুরুতেই আমাদের পার্টি জনসাধারণকে এই আন্দোলনের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেয়। ফেব্রুয়ারি মাসেই আমাদের প্রাদেশিক কমিটি "স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাংলা" এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করে। এই পুস্তিকায় আমরা বলিয়াছিলাম:

"বাংলার ঐক্য সকল বাঙ্গালীরই মুক্তি ও নবজীবনের বিকাশ লাভের জন্য অপরিহার্য্য। বাংলার ঐক্যের জন্য পাকিস্তান এবং অখণ্ড হিন্দুস্তান দুই বুলিই ছাড়িতে হইবে। স্বাধীন ভারতে বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়িতে হইবে।"—'স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাংলা' ১১ পৃষ্ঠা

বঙ্গভঙ্গের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া এই পুস্তিকায় আমরা বলিয়াছিলাম :

"হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গ এবং মুসলমান প্রধান উত্তর ও পূর্ববঙ্গ এই দুই বঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলার শিল্প যা কিছু সব পশ্চিমবঙ্গে, কৃষির প্রধান স্থান উত্তর এবং পূর্ববঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ উভয় অংশেরই অগ্রগতির রোধ করিবে।" ঐ—৯ পৃষ্ঠা

আমাদের এই সতর্কবাণীতে দেশের খ্যাতনামা দলগুলি তখন কর্ণপাত করে নাই কিন্তু আজ বঙ্গভঙ্গের পর সবাই এই উক্তির সারবত্তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন।

বুর্জোয়া নেতারা তখন পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে বঙ্গভঙ্গের পর পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতের সাহায্যে অসামান্য শক্তির আধার হইবে, কিন্তু আজ বঙ্গভঙ্গের পর বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর স্বার্থ সংঘর্ষে তাঁহাদের সেদিনকার সে "পান্ডিত্য" অত্যন্ত বিপন্ন। তাঁহারা সেদিন তাঁহাদের ভক্তজনকে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলিযাছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গের চাপ লীগ সহ্য করিতে পারিবে না, বঙ্গভঙ্গই পাকিস্তান ধ্বংস করিবার উপযুক্ত অস্ত্র। আজ সেই ভবিষ্যদ্বাণী ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত বর্জন করিয়া তাঁহাদেরই বলিতে হইতেছে যে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের সহযোগিতা চাই।

ফেব্রুয়ারি হইতে এপ্রিল এই তিন মাস বাংলার সমস্ত জেলার পার্টি সম্মেলনে এবং পার্টি সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে আমরা "স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাংলা"র অনুসৃত

নীতি প্রচার করিয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের গতিরোধ করা আমাদের সাধ্যে কুলায় নাই। কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার বিপুল জনসমাবেশের তুলনায় আমাদের প্রচার এবং জনসমাবেশ অতি সামান্যই ছিল। পাকিস্তান দাবিতে লীগ যতই অনমনীয় হইয়া উঠে, বঙ্গভঙ্গের দাবিতে কংগ্রেস ও মহাসভার সমাবেশ ততই শক্তিশালী হয়। এমনিভাবে পাকিস্তান ও বঙ্গভঙ্গ উভয়ই অনিবার্য হইয়া উঠে, এবং কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে। 'হিন্দু এবং মুসলমানের এক রাষ্ট্র সম্ভব নয়, হিন্দু এবং মুসলমানে একত্র বসবাস সম্ভব নয়, প্রতিশোধ দ্বারা এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে জব্দ করিব, লোক অপসারণ দ্বারা বিশুদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র এবং বিশুদ্ধ মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করিব'— ইহাই হইল তখন কংগ্রেস, মহাসভা এবং লীগের প্রচার বাহিনীর একমাত্র কথা। জাতীয়তাবাদ জনসাধারণের মন হইতে সাময়িকভাবে সরিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করিল।

ঐ সমস্ত প্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং পূর্ববঙ্গের কোন কোন কংগ্রেস নেতা সাহসের সঙ্গে আন্দোলন চালাইতে বলিলেন। "স্বাধীনতা" পত্রিকায় অবিশ্রান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ ভারতে ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রচার চলিতে থাকিল। এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার জন্য মে মাসে আমাদের প্রাদেশিক কমিটি 'বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান' নামে একটি নতুন পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকায় আমরা খোলাখুলি ভাবে কংগ্রেস ও মহাসভার প্রচারসূত্রকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলি—পাকিস্তান অনিবার্য বলিয়া বঙ্গভঙ্গ অনিবার্য হয় নাই, বঙ্গ-ভঙ্গের দাবি তুলিয়া পাকিস্তান অনিবার্য করিয়া তোলা হইতেছে, বঙ্গভঙ্গের ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাড়িবে বই কমিবে না। এই পুস্তিকায় মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির তীব্র সমালোচনা করিয়া আমরা বলিয়াছিলাম ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতবিভাগ চাহিলে বঙ্গ-ভঙ্গও আসিয়া পড়িবে। পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চাই ভারতীয় ঐক্য এবং ভারতীয় ঐক্যের জন্য চাই স্বাধীন ভারতে বাঙ্গালী জাতির পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।

ভারতের ঐক্যের সম্ভাবনা সুদুর পরাহত মনে করিয়া যাহারা বঙ্গভঙ্গের জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান পুস্তকে আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম— "স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় ইউনিয়নকে আপনারা 'দুর্বল কেন্দ্র' বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু মন্দের ভাল হিসাবে তাহার চেয়েও কি বঙ্গভঙ্গ ভাল? ভারতীয় ইউনিয়নে একবার যোগ দিলে আর কখনও বাহির হওয়া যাইবে না এই ভয়েই মুসলমান জনগনের মনে হিন্দু প্রভুত্বের আশংকা দৃঢ় হইতেছে। ভারতীয় ইউনিয়নে যে সব অঞ্চল যোগ দিবে সে সব অঞ্চল গণভোটের সাহায্যে ইচ্ছামত ভারতীয় ইউনিয়নের বাহিরে আসিতে পারে এই প্রতিশ্রুতি দিতে কুণ্ঠিত হন কেন"?— (১০ পৃষ্ঠা) এই প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তের সভাপতিত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একটি কমিটি গঠন করেন, এই কমিটি গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্টি উক্ত কমিটির নিকট সমবেত কর্ম্মপদ্ধতির আহ্বান জানায়। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে সমগ্র কংগ্রেসের চাপ এত প্রবল হইল যে আমাদের আবেদনের উত্তর দিবারও তাঁহাদের সময় হইল না। উক্ত কমিটির উদ্যোক্তারাই একে একে বঙ্গভঙ্গের সমর্থন ঘোষণা করিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার জন্য শেষ মুহূর্তে আশার আর একটি ক্ষীণ রেখা দেখা দিল। বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুহরাবর্দ্দি সাহেব এবং কংগ্রেস নেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু এক

চুক্তিতে ঘোষণা করিলেন যে সমগ্র বঙ্গ ঐক্যবদ্ধ থাকিবে, ঐক্যবদ্ধ বঙ্গে যুক্ত নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটের অধিকার দেওয়া হইবে, সমগ্র বঙ্গের নবনির্বাচিত আইন সভার ভোটে স্থির হইবে যে, বঙ্গদেশ ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতর থাকিবে, না পাকিস্তানে যোগ দিবে অথবা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিবে।

এই চুক্তির মর্ম প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ্য বিবৃতিতে ও জনসভায় আমাদের পার্টি ইহার প্রতি সমর্থন জানায়।

কিন্তু কংগ্রেস এবং লীগ উভয় দলের হাই কম্যাণ্ড ও প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় ব্রিটিশ পরিকল্পনার সম্মুখস্থ শেষ বাধাও অপসারিত হইল। বসু-সুরাবর্দ্দি চুক্তি এত দেরিতে হইল যে ইহার জন্য গণআন্দোলন পরিচালনার আর সময় ছিল না। শ্রীযুক্ত বসু এবং সুহরাবর্দ্দী সাহেবও এই চুক্তির পক্ষে গণসমাবেশের পথে না নামিয়া কংগ্রেস এবং লীগ হাই কম্যাণ্ডের নিকট ওকালতির উপর নির্ভর করিলেন বেশি। তাহার উপর, গত এক বৎসর বাংলার গণসংগ্রামের বিরুদ্ধে ওই দুইজন নেতা এত লড়িয়াছেন যে তাঁহাদের চুক্তিতে সাধারণ লোকে সুবিধাবাদীর চুক্তি বলিয়া মনে করিল। সুতরাং বাংলার ঐক্যের জন্য বসু-সুরাবর্দ্দির প্রচেষ্টা বুদ্বুদের মত উঠিয়া বুদ্বুদের মতই মিলাইয়া গেল।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি কেন সফলতা লাভ করে নাই তাহার রাজনৈতিক কারণ প্রধানত তিনটি।

প্রথমত—ভারতের জাতীয় সমস্যা ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা অর্থাৎ পার্টির নেতৃত্ব উপযুক্ত পুস্তক সরবরাহ করিতে পারি নাই। ১৯৪২ সালে কমরেড অধিকারী "পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য" সম্পর্কে এক নূতন আদর্শ দেশের সম্মুখে উপাস্থিত করেন। তাহার পর মন্ত্রিমিশনের নিকট এই সম্পর্কীয় প্রস্তাবও উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তাহা ছাড়া এই নীতি সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য পুস্তক অদ্যাবধি লিখিত হয় নাই। বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মুসলমানদের কি ভাবে হিন্দু মেজরিটির অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারে তাহা বুঝিতে না পারিয়াই মুসলমান জনগণের মনে ভারত বিভাগের প্রতি অন্ধবিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল। ভারতীয় ঐক্য স্থাপনে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেন উপযোগী তাহা বুঝিতে না পারিয়াই বাঙ্গালী হিন্দু বঙ্গভঙ্গের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিল। অথচ পার্টি নেতৃত্ব এত বড় একটা সমস্যাকে শুধু মৌখিক শিক্ষার বিষয়বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। কাজেই পার্টির কর্ম্মিরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এই কথাটিকে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করা ছাড়া বেশি কিছু করিতে পারেন নাই। সুলিখিত বিপ্লবী নীতি না থাকিলে বিপ্লবী কর্ম্মপদ্ধতি দুর্বল হইতে বাধ্য। জাতীয় ঐক্যের জন্য জনমত গঠনের উপযুক্ত শিক্ষা ও শক্তি আমরা আমাদের পার্টি কর্ম্মীদের দিতে পারি নাই এবং সেই জন্য জনমতের উজানস্রোতের সম্মুখে আমাদের কর্ম্মীরা অনেক সময় অত্যন্ত অসহায় বোধ করিয়াছেন। পার্টির নেতৃত্বের এই গাফিলতি অমার্জনীয়।

দ্বিতীয়ত, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আমরা যে আন্দোলন চালাইয়াছি তাহাতে অনবরত এই কথাই বলিয়াছি যে বাংলার ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের জন্য সারা বাংলার গণভোট লইতে হইবে। যে হেতু বাঙ্গালী একটি জাতি সুতরাং সারা বাংলার গণভোট দ্বারা স্থির হইবে যে বাংলাদেশ পাকিস্থানের অন্তর্গত হইবে কিনা। অথচ লীগ তখন সমগ্র বঙ্গদেশ পাকিস্থানের মধ্যে

দাবি করিতেছে, ফলে বাঙ্গলার এক জাতীয়তাবোধ হিন্দুর মন হইতেও তখন দ্রুত দূরে সরিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় আমাদের উচিত ছিল এই প্রস্তাব জনসমক্ষে উপস্থিত করা যে—পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই উভয় বঙ্গের পৃথক পৃথক গণভোট দ্বারা বাঙ্গলার ভাগ্য নির্ণয় করা উচিত। এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে মুসলমান মেজরিটির ভয় হিন্দুর মন হইতে দূর হইত এবং হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালীর স্বেচ্ছামিলনের ভিত্তি তাহাতে প্রশস্ত হইত।

তৃতীয়ত, কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিধ্বনি তুলিয়া বাঙ্গালী জাতির ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে দেন নাই। বাঙ্গালী জাতির জাতীয়তার চেয়েও তাঁহাদের নিকট বেশি লোভনীয় বস্তু হইল পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্পদ! তাই তাঁহারা হিন্দুর মনকে বঙ্গভঙ্গের পথে উৎসাহিত করিয়া সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন দিয়াছিলেন। লীগ হাইকম্যাণ্ড মুসলিম কায়েমী স্বার্থের খাতিরে বাঙ্গালী এক জাতি এ শিক্ষা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর ভেদ কৌশল বাঙ্গালী জাতিকে সাম্প্রদায়িক ভাবে দ্বিধা বিভক্ত করিতে সমর্থ হয়। এ অবস্থায় বাঙ্গালী এক জাতি একথা ঘোষণা করিয়া যুক্তি দ্বারা উহা প্রমাণ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিলনা। জাতি-সমস্যায় সাম্প্রদায়িকতার অপকৌশলের পিছনে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও কায়েমী স্বার্থের অভিসন্ধি নগ্ন করিয়া খুব ব্যাপকভাবে দেখান আমাদের দায়িত্ব ছিল। এ দায়িত্ব আমরা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করিতে পারি নাই।

মাউন্টব্যাটেনের রোয়েদাদ

৩রা জুন তারিখে মাউন্টব্যাটেনের রোয়েদাদ বাহির হয়। রোয়েদাদ বাহির হইবার পূর্বেই কংগ্রেস এবং লীগের কর্ত্তৃপক্ষ দেশ বিভাগ একরকম মানিয়াই লইয়াছিল। মাউন্টব্যাটেনের রোয়েদাদকে কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই স্বাধীনতার ঘোষণা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করিয়াছে যে—

"মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেয় নাই। এই রোয়েদাদ সাম্রাজ্যবাদী দুমুখো নীতির শেষ পরিণতি। ইহাতে একদিকে ভারতের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জাতীয় দাবি স্বীকার করা হইয়াছে, অপরদিকে ইহাতে গণ অভ্যুত্থানে ভাঙ্গন ধরাইবার জন্য. প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ এবং ভারতের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংসের জন্য এই রোয়েদাদ প্রতিক্রিয়া ও বিভেদের শক্তিগুলিকে কাজ করিবার সুযোগ দিয়াছে।"

এই রোয়েদাদ অনুযায়ী সাময়িকভাবে ১১টি জেলা পড়ে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের ভিতর এবং ১৬টি জেলা পড়ে পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ববঙ্গের ভিতর। এই রোয়েদাদের ভিতর ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ থাকিবে কিনা এবং কি ভাবে বিভক্ত হইবে তাহা বাংলার আইন সভার ভোট লইয়া স্থির হইবে। আইন সভার একটি পূর্ণ অধিবেশনে স্থির হইবে বঙ্গদেশ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তবে কোন্ গণপরিষদে যোগ দিবে অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়নের গণপরিষদে অথবা পাকিস্তান গণপরিষদে। ইহার পর আইনসভার পূর্ববঙ্গীয় সদস্যগণ এবং পশ্চিমবঙ্গীয় সদস্যগণ পৃথক পৃথক দুইটি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন যে বঙ্গদেশ ঐক্যবদ্ধ থাকিবে কিংবা বিভক্ত হইবে। যদি কোন একটি অংশ স্থির করে যে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবে তাহা হইলে পুনরায় প্রত্যেকটি অংশ স্থির করিবে যে উহা কোন্

গণপরিষদে যোগ দিবে, ভারতীয় গণপরিষদে অথবা পাকিস্তান গণপরিষদে।

আমাদের সামনে প্রশ্ন উপস্থিত হইল আইন সভার কমিউনিস্ট সদস্যেরা কি ভাবে ভোট দিবেন।

আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রাদেশিক কমিটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল তাহার সারমর্ম্ম এই—

মাউণ্টব্যাটেনের রোঁয়েদাদ কংগ্রেস এবং লীগ-কর্তৃক সমর্থিত হইবার ফলে সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে ভারত বিভাগ চাইনা কিংবা বঙ্গ বিভাগ চাইনা আইন সভায় এইরূপ মত প্রকাশ করিলেই ভারত বিভাগ বা বঙ্গভঙ্গ বন্ধ হইবে না। মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের নূতন কৌশল হইল ভারত বিভক্ত করিয়া দুইটি শত্রুরাষ্ট্র সৃষ্টি করা। এখন এই দুইটি রাষ্ট্রকে কি করিয়া বন্ধুরাষ্ট্রে পরিণত করা যায় সেই পথই আমাদের দেখাইতে হইবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইন সভার সম্পূর্ণ বৈঠকে কমিউনিস্ট সদস্যগণ নিরপেক্ষ ছিলেন, কারণ গণভোটের ভিতর দিয়া পূর্ববঙ্গে জনমত গঠন করিবার সুযোগ না পাইলে সমগ্র বঙ্গকে ভারতীয় ইউনিয়নের গণপরিষদের ভিতর লওয়া চলে না, আবার সমগ্র বঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্গত করার দাবিও অসঙ্গত দাবি। কিন্তু প্রথম সভায় লীগের সদস্যদের ভোট অধিকাংশ থাকায় স্থির হইল যে বঙ্গদেশ যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহা হইলে তাহাকে পাকিস্তানের গণপরিষদে যোগ দিতেই হইবে। প্রথম অধিবেশনের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা সৃষ্টি করিল। ইহার অর্থ দাঁড়াইল এই যে, ঐক্যবদ্ধ বঙ্গদেশ গঠনের শর্ত হইল পাকিস্তানে যোগদান, স্বাধীন বঙ্গদেশ গঠন করিয়া সারা বাংলার ভবিষ্যৎ জনমতের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার সম্ভাবনা এই সিদ্ধান্তে বর্জিত হইল। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধেও পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানে লইতে চাহিলে তবে ঐক্যবদ্ধ বঙ্গের পক্ষে এ অবস্থায় ভোট দেওয়া চলে। তাই আইন সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে কমিউনিস্ট সদস্যগণ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। তৃতীয় অধিবেশনে আমাদের পশ্চিমবঙ্গীয় সদস্যগণ ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে এবং পূর্ব্ববঙ্গীয় সদস্য পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন।

বাংলার আইন সভায় আমাদের ভোটদানের সহজ অর্থ হইল এই যে, যতদিন না গণভোট দ্বারা জনমতের জোরে সারা বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিতেছি ততদিন পশ্চিমবঙ্গকে ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিয়া এবং পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানে থাকিয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।

মাউণ্টব্যাটেন রোঁয়েদাদের পূর্বে অবস্থা ছিল : ভারত তথা বাংলার ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত কিনা এই প্রশ্নই বড় প্রশ্ন। তখন আমরা স্বাধীন ভারতে ঐক্যবদ্ধ বাংলার জন্য আন্দোলন করিয়াছি। মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের পর প্রশ্ন দাঁড়াইল : গণভোট ব্যতীত জনমতের বিরুদ্ধে সমগ্র বঙ্গদেশকে হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানে লওয়া উচিত কিনা। অবস্থার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পার্টি অত্যন্ত দ্রুত কর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিল।

তখন অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, আমরা প্রথম ভোটে নিরপেক্ষ না থাকিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে ভোট দিয়া ভারতীয় ঐক্যের প্রতি আমাদের আনুগত্য ঘোষণা করি নাই কেন? আজ সমস্ত দলই বুঝিতে পারিয়াছে এবং স্বীকার করিতেছে যে, দুই রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই ভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা ছাড়া ভারতীয় ঐক্যের আর

কোন পথ খোলা নাই। সেদিন আইন সভার ভোটের ভিতর দিয়া সেই পথই আমরা দেশবাসীকে দেখাইয়াছি। মাউণ্টব্যাটেন রোঁয়েদাদ গৃহীত হইবার পর এই পথই হইল ভারতীয় ঐক্যের প্রতি আনুগত্য দেখাইবার সত্যকার পথ।

বঙ্গভঙ্গেব প্রশ্নে আমরা নিরপেক্ষ রহিলাম না কেন এ প্রশ্নও উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের জনমতের বিরুদ্ধে তাহাকে পাকিস্থানের অন্তর্গত করিবার প্রশ্নে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি না, কারণ ধর্ম্মের ভিত্তিতে দেশ-বিভাগ গৃহীত হইবার পর হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গকে কিছুতেই পাকিস্তানের অন্তর্গত করা চলে না।

মাউণ্টব্যাটেনের রোঁয়েদাদ সম্পর্কে আমাদের পার্টি যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহার মূলকথা ছিল—

আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য নূতন অস্ত্র লাভ করিয়াছি, সে অস্ত্র হইল সার্বভৌম গণপরিষদ এবং জাতীয় সরকার।

সাম্রাজ্যবাদীরা চায় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া সাম্রাজ্যবাদীর ক্ষমতা বাঁচাইয়া রাখা। আমাদের কাজ হইল দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া পূর্ব ক্ষমতা ও ঐক্যের পথে অগ্রসর হওয়া।

সাম্রাজ্যবাদীরা চায় আমাদের গণপরিষদ ও জাতীয় সরকারকে কায়েমী স্বার্থের যন্ত্রে পরিণত করিয়া তাহার নিজস্ব প্রভাব অপ্রতিহত রাখিতে। আমাদের কাজ হইল জনশক্তির জোরে গণপরিষদ ও জাতীয় সরকারকে জনগণের স্বার্থের পথে অগ্রসর করা।

উগ্র বামপন্থীরা আমাদের পার্টির নীতিকে এই বলিয়া আক্রমণ করিতেছেন যে, ইহা আপস পন্থী নীতি অর্থাৎ বিপ্লব বিরোধী। তাঁহাদের নীতি হইল কংগ্রেস এবং লীগ পরিচালিত জাতীয় সরকারকে জাতীয় সরকার হিসাবে না মানিয়া উহাকে সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে এক করিয়া দেখা এবং উহার উচ্ছেদের জন্য বিদ্রোহ সংগঠিত করা।

এই নীতি যে কত অসার তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে। স্বাধীনতা দিবসে বিপুল জনসমাবেশ অতীতের সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামকে অভিনন্দন জানাইয়া নতুন জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করিয়াছে। জাতীয় সরকারকে তাহারা জাতীয় সরকার হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে এবং নূতন ক্ষমতাকে জনগণের স্বার্থসাধনের পথে আহ্বান করিয়াছে। ১৫ই অগস্টের পূর্বে উগ্র বামপন্থীরা আশা করিয়াছিলেন যে ১৫ই আগস্ট কোন আনন্দ উৎসব হইবে না, যদি হয় তবে তাহা প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ১৫ই অগস্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা ঘটিয়াছে। সংগ্রামশীল জনতা সেদিন তাহাদেরই সমস্ত অতীত সংগ্রামের বিজয়ধ্বনি করিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছে এমন কথাও তাহারা বিশ্বাস করে নাই, তাই ইউনিয়ন জ্যাক তাহারা সেদিন টানিয়া নামাইয়াছে। ১৫ই অগস্ট জনতার সম্মুখে কোন দক্ষিণপন্থী নেতা এমন কথা বলিতে সাহস করেন নাই যে, সাম্রাজ্যবাদীরা স্বেচ্ছায় আমাদের স্বাধীনতা দিয়াছে অথবা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস মানিয়া লওয়াই আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। সেদিন কোন উগ্র বামপন্থীও জনতার সামনে এমন কথা বলিতে সাহস করেন নাই যে, জাতীয় সরকার নিপাত যাউক, স্বাধীনতা দিবসে অনুষ্ঠান বর্জন কর। রাজনৈতিক অবস্থার যে বিশ্লেষণ কমিউনিস্ট পার্টি করিয়াছিল মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদ ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ১৫ই অগস্ট সেই বিশ্লেষণ অনুযায়ী রণধ্বনিই জনতার মুখে মুখে ছিল।

১৫ই অগস্ট বাংলার প্রায় সর্বত্র কমিউনিস্ট পার্টি সকল দলের সমবেত জনসমাবেশে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। মাউন্টব্যাটেন রোঁয়েদাদের পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ে আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সঠিক ছিল বলিয়াই আমরা এই ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলাম। সেদিন অন্যান্য পার্টিকে নিজ বিশ্লেষণ ও নিজ শ্লোগান বর্জন করিয়া জনতার মনোভাব অনুযায়ী নূতন কথা বলিতে হইয়াছে, শুধু আমরাই সেদিন আমাদের পার্টির নিজ বিশ্লেষণ অনুযায়ী নীতি ও শ্লোগান জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিয়াছি। ১৫ই আগস্ট বাংলার সর্বত্র পথে পথে ও মাঠে মাঠে জনতার যে অভিযান দেখিয়াছি তাহা কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত রাজনীতির নির্ভুলতার জীবন্ত প্রদর্শনী।

স্বাধীনতা দিবস ও সীমানা কমিশনের রায়

মাউন্টব্যাটেনের রোঁয়েদাদকে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড স্বাধীনতার ঘোষণা বলিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ বোধ হয় পণ্ডিত নেহেরুও সে জন্য অনুতাপ করিবেন। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব পড়িয়া কোন কোন কংগ্রেস নেতা ইহাকে অবাস্তব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে আমরা বলিয়াছিলাম—

"মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করিবার জন্য যে পদ্ধতির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা মূল পরিকল্পনাটি অপেক্ষা কোন অংশেই কম বিভেদকারী নহে। এই পদ্ধতিকে এমন ভাবেই তৈরি করা হইয়াছে যে তাহা কার্যকরী করিতে হইলে একটির পর একটি ব্রিটিশ রোয়েদাদ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সীমানা কমিশন এবং দেশবিভাগের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণের জন্য যে কমিশনগুলি গঠিত হইতেছে তাহাব ফলে হিন্দু-মুসলিম-শিখদের মধ্যে আরও তিক্ততার সৃষ্টি হইবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সালিশী হিসাবে আরও কয়েকটি রোয়েদাদ চাপাইয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধকে আরও তীব্র করিয়া তুলিবে।"

র‍্যাডক্লিফ্ রোঁয়েদাদের ফলে পাঞ্জাবে ও দিল্লীতে ঠিক ইহাই ঘটিয়াছে।

বাংলাদেশে সীমানা কমিশনের সম্মুখে শুনানী আরম্ভ হইবার সময় হইতেই কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাড়িতে আরম্ভ করে। ১৫ই আগস্ট কলিকাতায় জনতার শান্তি অভিযান আরম্ভ না হইলে র‍্যাডক্লিফ্ রোয়েদাদের পর বাংলাদেশেও পঞ্জাবের মত অবস্থা ঘটিত।

অগস্ট মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে দিনের পর দিন কলিকাতার হত্যাকাণ্ড বাড়িতে আরম্ভ করে। "স্বাধীনতা" পত্রিকায় এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত প্রচার চলিতে থাকে কিন্তু কলিকাতার জনতার মধ্যে আমরা বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। বিভিন্ন দলের নেতাদের ও সংবাদপত্র সেবীদের আমরা অনুরোধ করিয়াছি সমবেত ভাবে এই দাঙ্গা প্রতিরোধ করিবার জন্য, কিন্তু বিশেষ সাড়া পাই নাই। আমরা আশংকা করিতেছিলাম যে, ১৫ই অগস্ট অবস্থা ঘোরতর হইয়া উঠিতে পারে। ১৫ই অগস্টের অনুষ্ঠান যাহাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয় সে জন্য আমরা কলিকাতার প্রতি মহল্লায় এবং বাংলার প্রত্যেক জেলায় সম্মিলিত জনসাধারণের জন্য অবিশ্রান্ত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কংগ্রেস এবং লীগের নেতারা অবস্থা হঠাৎ জটিল করিয়া তুলিলেন। কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী ঘোষণা করিলেন যে, পাকিস্তানের অন্তর্গত কংগ্রেস সেবীদের ১৫ই আগস্ট পালন করিবার দরকার নাই কারণ তাঁহাদের নিকট ঐ দিনটি দুঃখের দিন। ইহার প্রত্যুত্তরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগ

ঘোষণা করিলেন যে হিন্দুস্থানের মুসলমান অধিবাসীরা ঐ দিনটি শোক দিবস হিসাবে পালন করিবে। এই দুই দলের দুই বিবৃতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাংলার সর্বত্র হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। বামপন্থী দলগুলির অবশ্য এ বিষয়ে করিবার কিছুই ছিল না কারণ তাঁহারা ছিলেন ১৫ই আগস্ট বয়কট করিবার পক্ষপাতী।

কিন্তু ধীরে ধীরে কয়েকটি শুভ ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিল। কৃপালনীর বিবৃতির এবং লীগের সিদ্ধান্তের সমালোচনা আমরা কঠোর ভাবে করিলাম। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক রাষ্ট্রপতির বিবৃতি খণ্ডন করিলেন। গান্ধীজী স্বয়ং বেলেঘাটায় থাকিয়া মুসলমানদের জীবন রক্ষার জন্য হিন্দুদের আহ্বান জানাইলেন। মুসলিম লীগ মুসলমানদের নির্দেশ দিল : ১৫ই অগস্ট হিন্দুস্থানে ভারতীয় রাষ্ট্রপতাকা অভিবাদন করিতে হইবে। এই ঘটনাবলী আমাদের কার্যপন্থার অভিনব সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিল। তাহার পর ১৫ই অগস্ট সন্ধ্যা হইতে ৩১শে অগস্ট পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অভিনব গণ অভিযান দেখা দেয়। পাঞ্জাবে যখন ঘরে ঘরে আগুন জ্বলিতেছিল বাংলায় তখন ঘরে ঘরে চলিয়াছে হিন্দু-মুসলিম মিলনের রাখী বন্ধন।

বাংলায় এরূপ ঘটনা কেন ঘটিল? সাধারণ লোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে ইহা একটি আকস্মিক ঘটনা। রাজনীতিক কর্ম্মীরা বলিলেন ইহা গান্ধীজীর প্রভাব। গান্ধীজী বলিলেন ইহা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। যে যে কারণে বাংলায় এই অভূতপূর্ব ঘটনা সাম্রাজ্যবাদীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল তাহা এই —

(১) ১ বৎসরের দাঙ্গার অভিজ্ঞতায় জনসাধারণ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে দাঙ্গার পিছনে আছে ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র। দাঙ্গায় হিন্দু কিংবা মুসলমানেব কোন স্বার্থ নাই। যে প্রতিক্রিয়াশীলেরা দাঙ্গার জন্য গুণ্ডা পোষণ করে তাহাদের তাহারা চিনিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

(২) বঙ্গভঙ্গের কঠোর বাস্তব হিন্দু-মুসলমান সমস্ত বাঙ্গালীকে মুহ্যমান করিয়াছিল। বাঙ্গালী জাতির দেশপ্রেম এবং একজাতীয়তা এত প্রবল যে বঙ্গভঙ্গের পরমুহূর্তেই বাংলায় কংগ্রেস এবং লীগ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে বাঙ্গালীজাতির ভবিষ্যৎ হিন্দু এবং মুসলমানের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে।

(৩) ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বাংলার সর্বসাধারণের আকর্ষণ এত প্রবল যে নূতন ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া স্বাধীন দেশ গঠন করিতে হইলে শান্তি স্থাপন করিতে হইবে—এই অনুভূতি কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

(৪) এই অবস্থায় গান্ধীজীর নির্ভীক আহ্বান সুহরাবর্দ্দি সাহেবের সক্রিয় সহযোগিতায় শান্তিপ্রিয় ও স্বাধীনতাকামী নাগরিকদের মধ্যে দাঙ্গা দমনের দৃঢ়তা আনিয়া দিয়াছিল।

(৫) বাংলায় গত এক বৎসরের শ্রমিক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলন এবং ছাত্র অভিযান হিন্দু-মুসলমান জনতার মধ্যে যে ঐক্য সৃষ্টি করিয়াছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা সৃষ্টি করিয়াছিল দাঙ্গাবাজ সাম্প্রদায়িকেরা শত চেষ্টা করিয়াও তাহা কখনও একেবারে ধ্বংস করিতে পারে নাই।

কিন্তু দাঙ্গাবাজ প্রতিক্রিয়াশীলেরাও নিশ্চেষ্ট বসিয়াছিল না। কলিকাতায় তাহারা দিনের পর দিন দাঙ্গার উস্কানি দিতেছিল। তাহারা শুধু আর একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। র‍্যাডক্লিফের রোঁয়েদাদ প্রকাশিত হইবার পর খুলনা, যশোহর, নদীয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ তিক্ততার চরমপর্যায়ে উঠে। র‍্যাডক্লিফের রোঁয়েদাদ নূতন দাঙ্গার

ব্যবস্থা বেশ ভালভাবেই করিয়া রাখিয়াছিল। এই রোঁয়েদাদে হিন্দু প্রধান খুলনাকে পাকিস্তানে এবং মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদকে হিন্দুস্থানে ঢুকাইয়া নূতন উত্তেজনা সৃষ্টি করিল। যশোহর, দিনাজপুর এবং মালদহে এমন কতকগুলি অঞ্চল মূল জেলা হইতে কাটিয়া হিন্দুস্থানে ঢুকাইয়া দেয় যাহার সঙ্গে ঐ জেলাগুলির অর্থনৈতিক জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অথচ জলপাইগুড়ির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ সৃষ্টি না করিয়া হিন্দুবিক্ষোভ সতেজ করিয়া রাখিল। র‍্যাডক্লিফের রোঁয়েদাদ বিশ্লেষণ করিয়া বাংলার সমস্ত সংবাদপত্রেই ইহাকে নীতি বর্জিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু আসলে ইহার একটি নীতি আছে, সে নীতি হইল বাংলায় পাঞ্জাবের মত অবস্থা সৃষ্টি কর; যাহাতে ১৫ই অগস্টের পর সারা ভারতে আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং সেই সুযোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেস ও লীগের নিকট হইতে ব্রিটিশ সৈন্য ভারতে রাখিবার অঙ্গীকার এবং ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস চিরস্থায়ী করিবার প্রতিজ্ঞা আদায় করিতে পারে। মাউন্টব্যাটেনের অসমাপ্ত কাজই র‍্যাডক্লিফ্ সমাপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।

কলিকাতায় র‍্যাডক্লিফের সাহায্যকারী ছিল পুলিশ, গুণ্ডা এবং কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতা। তাহাদের চক্রান্তে ১লা সেপ্টেম্বর আবার কলিকাতায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কলিকাতার প্রগতিশীল জনগণ, বিশেষ করিয়া ছাত্রবাহিনী গর্জন করিয়া উঠিল, গান্ধীজী আমরণ অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া দাঙ্গাবাজদের চ্যালেঞ্জ করিলেন। মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও শান্তি বাহিনী দাঙ্গা থামাইতে বদ্ধপরিকর হইল। এই সংগ্রামের ভিতর এক নূতন শক্তি জন্মগ্রহণ করিল, এই শক্তি হইল সকলদলের সম্মিলিত শান্তিবাহিনী। বাংলা আর পাঞ্জাবের মত হইতে পারে নাই, বরং ৭ দিনের মধ্যে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাংলাদেশ অবশিষ্ট ভারত ও পাকিস্তানকে পথ দেখাইয়াছে। পাঞ্জাবে জেঙ্কিংস-এর রাজত্ব এরূপ কোন শান্তিবাহিনী গঠন করিতে দেয় নাই, কলিকাতাতেও ভূতপূর্ব ইংরেজ পুলিশ কমিশনার গত বৎসর ১৬ই অগস্টের পর এরূপ কোন শান্তিবাহিনী গঠিত হইতে দেয় নাই। নূতন জাতীয় সরকার শান্তিবাহিনী অনুমোদন করিয়া এবং গণআন্দোলন জাতীয় সরকারকে এই শান্তিবাহিনী অনুমোদনে বাধ্য করিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমান অবস্থার মধ্যে যে নূতন সম্ভাবনা দেখিয়াছে তাহা অমূলক নয়। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে আমরা বলিয়াছি যে "কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বাস যে জাতির অগ্রগতির পথে নূতন সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে। দুইটি জনপ্রিয় গভর্নমেন্ট এবং রাষ্ট্রগঠন পরিষদ জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষে শক্তিশালী হাতিয়ার। অবিলম্বে জাতীয় লক্ষ্য সাধনের কাজেই যাহাতে এই হাতিয়ারকে ব্যবহার করা হয়, তাহা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব জাতীয় আন্দোলনের।"

বাংলার জাতীয় আন্দোলন ব্রিটিশ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এ দায়িত্ব পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং আমরা কমিউনিস্টরা সে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করিতে পারিয়াছি। গত সাড়ে চারি বৎসর প্রতিক্রিয়ার উজান স্রোত ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার পর বর্তমানে আমরা স্রোতের গতি প্রগতির পক্ষে পাইতে আরম্ভ করিয়াছি।

শ্রীহট্টের গণভোট

শ্রীহট্টের গণভোটে আমাদের পার্টি পাকিস্তানে যোগদানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিল। উক্ত গণভোটে ২,৩৯,৬১৯ জন পাকিস্তানের পক্ষে এবং ১,৮৪,০৪১ জন হিন্দুস্থানের পক্ষে ভোট দিয়াছিল।

শ্রীহট্টের গণভোট উপলক্ষে আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ মহলে প্রচুর বিক্ষোভ দেখা দেয়। অনেক প্রগতিশীল লীগপন্থী প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে উক্ত গণভোটে আমরা কমিউনিস্টরা অন্তত নিরপেক্ষ থাকিলাম না কেন? এই বিক্ষোভের ফলে আমাদের পার্টির মুসলমান কর্ম্মীদের প্রচণ্ড ধাক্কা খাইতে হইয়াছে।

শ্রীহট্টের গণভোটে আমরা নিরপেক্ষ থাকিলে মারাত্মক ভুল হইত। পাকিস্তানে শ্রীহট্ট কেন যোগ দিবে তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া লীগ-নেতারা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পাকিস্তান ইসলামের রাষ্ট্র, সুতরাং মুসলমান প্রধান শ্রীহট্ট পাকিস্তানে যোগ দিবে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করা চলে না বলিয়াই আমরা শ্রীহট্টের জনসাধারণকে তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে বলিয়াছি। আজ পাকিস্তান গঠিত হইবার পর লীগের নেতারাই বলিতেছেন যে, পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র নয়, হিন্দু এবং মুসলমানের মিলিত রাষ্ট্র। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, শ্রীহট্টের অল্প সংখ্যক মুসলমান গণভোটে কমিউনিস্টদের পরামর্শ অনুযায়ী যে ভোট দিয়াছিল সেই ভোটের মর্ম্মই সত্য। অর্থাৎ ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করা চলে না, কারণ তাহাতে ভেদ বাড়ায় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের থাকিবার সুযোগ দেয়। শ্রীহট্টকে যাঁহারা ইসলামিক রাষ্ট্রে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন তাঁহারাই শ্রীহট্টের মুসলমানদের ভুল বুঝাইয়াছিলেন। শ্রীহট্টের গণভোটে কমিউনিস্ট পার্টি এই ভুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিল।

লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ আমাদের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রচার করিয়াছিল যে, পাকিস্তানকে দুর্বল করিবার জন্যই আমরা গণভোটে পাকিস্তানে যোগদানের বিরুদ্ধে ছিলাম। তাহা যে সত্য নয় তাহার প্রমাণ : আমরা পূর্ববঙ্গের আইন সভায় পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়াছি, বাংলার আইন সভায় যুক্ত অধিবেশনে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভোট না দিয়া আমরা নিরপেক্ষ ছিলাম। অর্থাৎ যেখানে গণভোট দ্বারা জনমত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ ছিল না সেখানে আমরা জনমতের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রধান অঞ্চলকে হিন্দুস্থানে লইবার বিরোধী ছিলাম। যেখানে জনমত প্রকাশের সুযোগ মিলিয়াছে সেখানে আমরা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ভোট দিয়াছি। সেই সঙ্গে আমরা ইহাও ঘোষণা করিয়াছি যে, ভোটের ফলাফল যাহাই হউক না কেন হিন্দুস্থানকে পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুভাব দেখাইতে হইবে, এবং পাকিস্তানের অধিবাসী হিন্দুদিগকে মুসলমানের সঙ্গে মিলিতভাবে পাকিস্তানকে স্বাধীন ও সুখী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। শ্রীহট্টের গণভোটের সময় সাময়িকভাবে মুসলমান জনগণ আমাদের পার্টির প্রতি বিক্ষুব্ধ হইলেও ক্রমশ মুসলমান জনগণের মধ্যে আমাদের পার্টির জনপ্রিয়তা বাড়িয়াছে এবং পূর্ববঙ্গেও মুসলিম লীগের সঙ্গে আমাদের পার্টি বহুস্থানে সমবেতভাবে পাকিস্তানের বিবিধ সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতেছে।

পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনগণ আজ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে. শুধু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিলেই হইল না, সত্যকার স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততক্ষণ নিপীড়িত মুসলমানের দুঃখ-বেদনা ঘুচিবে না। কমিউনিস্ট পার্টিই যে এ পথের সহায়ক তাহা মুসলিম জনগণ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

গত কয়েক বৎসর বিভিন্ন অবস্থা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া আমরা লেনিনের যে অমূল্য শিক্ষার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা হইতেছে—সঠিক কর্ম্মনীতি অনুসরণ করিয়া চলিলে জনতা সাময়িকভাবে ভুল বুঝিলেও আখেরে তাহারা ঠিকমত বুঝিবেই।

পুরাতন শক্তি ও নূতন শক্তি

বাংলার অবস্থা যদিও আজ বাহির হইতে শান্ত মনে হয় তথাপি ভিতরে ভিতরে ভেদপন্থীরা বেশ সক্রিয় আছে। কায়েমী স্বার্থ নানাদিক দিয়া ষড়যন্ত্র চালাইতেছে, বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালীর সংঘাত বাংলাদেশেও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া থাকে। দার্জিলিং-এ চা বাগানের মালিকেরা গুর্খা লীগের নেতাদের উস্কাইয়া গুর্খা বাঙ্গালী সংঘর্ষ সৃষ্টি করিয়াছিল। চা বাগানের মালিকদের ষড়যন্ত্র চলিতেছে দার্জিলিং আসামের ভিতর লইবার জন্য। দার্জিলিং যদি আসামের অন্তর্গত হয় তবে সেখানে সমস্ত চা বাগানের মালিকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইউরোপীয়ান মিশনারীদের সাহায্যে সমস্ত পাহাড় অঞ্চল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। ময়মনসিংহ জেলায় সুসং পাহাড়ে মিশনারীরা গারোদের ভিতরও আসামে যাইবার আন্দোলন চালাইতেছে। এখানে গারোদের ভিতর পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবের সুযোগ লইয়া তাহারা এই ষড়যন্ত্রে অগ্রসর হইতেছে। এই আন্দোলন তাহারা হাজংদের ভিতরও চালাইয়াছিল কিন্তু হাজংদের অধিকাংশের সমর্থন তাহারা পায় নাই, গারোদের ভিতরও এ বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়াছে। পাহাড় অঞ্চলগুলি আসামের ভিতর লইবার জন্য যে আন্দোলন চলিতেছে তাহার পিছনে ছিল পুরাতন ব্রিটিশ আমলারা। আসামের অধিবাসীদের ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কোন স্বার্থ নাই। অসমিয়াদের বুঝা উচিত ছিল যে এই কার্য্যে চা বাগানের মালিকেরা যদি সফল হয় তবে পর মুহূর্ত্তে আসামের সমগ্র উপজাতীয় অঞ্চলে তাহারা ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্র বিরোধী শাসনব্যবস্থা কায়েম করিবার লড়াই আরম্ভ করিবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নূতন গণতন্ত্রের ভয়ে চা বাগানের ধনকুবেরগণ এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। গণতান্ত্রিক অভিযান যে কোন সময় তাহাদের চা বাগানগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া ফেলিতে পারে, এই আশংকায় তাহারা উপজাতীয় অঞ্চলগুলিকে পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া লইতে চায়। নাগাদের স্বাধীনতা ঘোষণার সংকল্পে অসমিয়াদের সে কথা বুঝিবার সুযোগ ঘটিয়াছে।

চা বাগান মালিকদের এই ষড়যন্ত্র স্বরূপ উপজাতীয়েরা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। তাহারা ইহাকে উপজাতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিয়া মনে করিতেছে। চা বাগানের মালিকদের শোষণে উপজাতীয়েরা আজ জর্জরিত। এই শোষণ হইতে মুক্তি লাভের জন্য উপজাতীয়দের বন্ধু হইল সমতলের গরীব মজুর ও কৃষক। উপজাতীয়ের সঙ্গে সমতলের বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তাহারা এই শোষণ ব্যবস্থাকে কায়েম করিতে চায়।

গুর্খা, গারো, হাজং, ভুটানী প্রভৃতির শিক্ষা ও সম্পদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিতে পারিলেই সমতল এই উপজাতীয় ভাইদের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিবে। চা বাগান জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া উপজাতীয়দের এই শোষণ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। দার্জিলিং-এ গুর্খাজাতিকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিয়া তাহাদের ন্যায্য দাবি পূরণ করিতে হইবে। সমগ্র গুর্খাজাতি যাহাতে নেপাল, ভুটান, সিকিম ও দার্জিলিং এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিয়া পরিপূর্ণ স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমিউনিস্ট পার্টি এই দাবি লইয়াই পাহাড়ের চা বাগান মালিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়িতেছে।

কায়েমী স্বার্থ আরও নূতন নূতন পথে ভেদের ষড়যন্ত্র চালাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে সমস্ত উপদল আছে তাহাদের কোন কোন অংশ উপদলীয় স্বার্থ হাসিল করিবার জন্য পূর্ববঙ্গের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সমস্ত ভেদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টিকে সর্বদা সজাগ এবং সক্রিয় থাকিতে হইবে।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যাহাতে আবার বাধিয়া যায় তাহার জন্য দাঙ্গাবাজেরা সর্বদাই সচেষ্ট আছে। প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের একটি অংশ এবং বিত্তবান্ কায়েমী স্বার্থ সশস্ত্র গুণ্ডা পোষণ করিয়া থাকে। পুলিশ এবং আমলাতন্ত্র গত ২০০ বৎসর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদ নীতিতে এমন শিক্ষিত যে ইহারা অনবরত গুণ্ডাশক্তি পোষণ করিয়া থাকে। কলিকাতায় সর্বদলীয় শান্তিসেনাগঠনে এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ এত আতংকিত হইয়া উঠিয়াছে যে পাকচক্রে এই শক্তি তাহারা নষ্ট করিয়া দিতে চায়। এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ইঙ্গিতে পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেণ্ট পুলিশের অধীনে একটি সশস্ত্র ভলাণ্টিয়ার ফোর্স গঠন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। গভর্নমেণ্টের উচিত শান্তিসেনাকে শিক্ষা দিয়া সশস্ত্র করিবার ব্যবস্থা করা। পুলিশের কর্তৃত্বাধীনে যে ভলাণ্টিয়ার ফোর্স তৈরি হইবে তাহা পাঞ্জাবের বাউণ্ডারী ফোর্সের মত দাঙ্গার পক্ষেই উস্কানি দিবে এবং প্রগতিশীল গণ আন্দোলন দমন করিবার কাজে সহায়তা করিবে।

কলিকাতার মত শান্তিসেনা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলাতেই গড়িয়া তোলা উচিত। সমাজের শত্রুগণ সর্বত্রই অশান্তি এবং অরাজকতা বিস্তার করিতেছে। চুরি, ডাকাতি, সংঘবদ্ধভাবে মুনাফা শিকার ও চোরাকারবার এই সমস্তই আজ বাড়িয়া উঠিয়াছে। সর্বদলীয় শান্তিসেনা এই সমস্ত সমাজবিরোধী শক্তিকে রোধ করিবে। ময়মনসিংহে দুর্নীতি নিবারণের জন্য একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং এই কমিটি একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কলিকাতার শান্তিসেনার মতই জনস্বার্থের রক্ষক হইতে পারিবে।

বাংলার সর্বত্র আজ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রগতির ঘোরতর সংঘর্ষ চলিতেছে। প্রতিক্রিয়ার ভিতরে আছে ধনিক শ্রেণি, চোরাকারবারী ও বড় বড় ভূস্বামী এবং প্রগতির ভিতরে আছে মজুর, কৃষক ও গণতন্ত্রকামী মধ্যবিত্ত। প্রতিক্রিয়া চায় অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া জাতীয় সরকার সম্পূর্ণ নিজেদের হস্তগত করিতে। পুলিশ এবং আমলাতন্ত্র তাহাদের সাহায্যকারী। প্রগতি চায় এই প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধ করিয়া জাতীয় সরকারকে পরিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করিতে। পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয়ত্র এই একই অবস্থা। উভয়ত্র গভর্নমেণ্ট আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রগতিশীল শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছে কিন্তু প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া তাহার তুষ্টি সাধনেরও চেষ্টা করিতেছে। গভর্নমেণ্টের এই মধ্যপন্থা বেশিদিন টিকিবে না, সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ করিয়া গভর্নমেণ্টের প্রতিক্রিয়ার তুষ্টিসাধন নীতি বদলাইতে হইবে নতুবা প্রতিক্রিয়া বাঙ্গলাকে দ্বিতীয় পাঞ্জাবে পরিণত করিবে।

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট কেন কঠোর হইতে পারে না তাহার কারণ প্রতিক্রিয়ার একটি অংশ গভর্নমেণ্টের ভিতর রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের ভিতর যে ভেদনীতি উগ্রভাবে চালাইতেছেন তাহা লক্ষ্য করিলে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে। কোন শ্রমিক ইউনিয়ন যখন শ্রমমন্ত্রীর নিকট শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায় করিতে যায় তখন শ্রমমন্ত্রী প্রথম অনুসন্ধান করেন যে প্রতিনিধিরা তাঁহার নিজ দল বা নিজ উপদলের সভ্য কিনা। নিজ দলের সভ্য যদি তাহারা না হয় তবে তাহাদের অভাব অভিযোগের বিবরণ পর্যন্ত তিনি শুনিতে চাহেন না এবং তাহাদের সহিত কোম্পানির ম্যানেজারের মত দুর্ব্যবহার করেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে এই শ্রমমন্ত্রী খোলাখুলিভাবেই তাঁহার মন্ত্রীত্বপদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকেন। কোথাও শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকের সংঘর্ষ দেখা দিলে তিনি খোলাখুলিভাবে মালিকের পক্ষ গ্রহণ করেন যতক্ষণ না শ্রমিকদের একতার জোরে তিনি তাহাদের নিকট মাথানত করিতে বাধ্য হন। এই শ্রমমন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়া বলিয়া বেড়াইতেছেন যে শ্রমিককেই স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফাখোর মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন বক্তব্য শোনা যায় না, কোন কিছু করিতেও দেখা যায় না।

এই শ্রমমন্ত্রীর উপর প্রতিক্রিয়ার টান এত বেশি যে শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তির ভার তিনি এমন বিচারকের উপর দেন যিনি বিচার আসনে বসিয়া খোলাখুলিভাবে বলিয়া থাকেন যে আগেকার বিচারকেরা বাংলার অবস্থা জানিত না বলিয়া শ্রমিকদের প্রতি অহেতুক সহানুভূতির সঙ্গে রায় দিত, এবং শ্রমিকদের জীবনধারণের মান ঠিক উপযুক্তই আছে, উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রমমন্ত্রীর এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই ব্যর্থ করিতে পারিবে। চটকল শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরে এই শ্রমমন্ত্রীর নিকট হইতেই তাহাদের দাবি বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল নিয়োগ আদায় করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এরূপ শ্রমমন্ত্রী যদি মন্ত্রীত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন তবে বাংলার শ্রমিকদের সুবিচারের জন্য প্রতিপদে অনেক লড়াই করিতে হইবে। বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উচিত এমন প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীকে সরাইয়া শ্রমমন্ত্রীত্বের পদে একজন শ্রমিকদরদী নিযুক্ত করা।

দুর্ভিক্ষ

পশ্চিম এবং পূর্ববঙ্গ উভয়ত্রই আবার এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বাজার হইতে চাউল এবার একেবারে অদৃশ্য হয় নাই, কিন্তু দর অত্যন্ত বেশি, প্রতিমণ চাউল ৩০ টাকা হইতে ৬০ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালীর বন্যা অবস্থা আরও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। সরকারের হাতে ষ্টক নাই, কাজেই গ্রামের আংশিক রেশনিং ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, যে যে শহরে পুরা রেশনিং আছে তাহাও বিপন্ন। রেশনের পরিমাণ দৈনিক আধসের হইতে কমাইয়া ৫ ছটাক করা হইয়াছে, হয়ত আরও কমিবে।

এবার দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার অযোগ্যতা। এবার অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সালে সারা বাংলায় মোট ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টন বা ২৮ কোটি ৮১ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। গত পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর যত চাউল উৎপন্ন হইয়াছে এবারকার উৎপাদন তাহা অপেক্ষা শতকরা সাড়ে নয় ভাগ বেশি। এত উৎপাদন সত্ত্বেও সরকারি ক্রয়বিভাগ

উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ক্রয় করিতে পারে নাই। সমগ্র বাংলার গভর্নমেন্ট ২০শে পর্যন্ত কিনিয়াছিল মাত্র ৭৩ লক্ষ মণ চাউল, চোরাকারবারীরা এই সুযোগে দর চড়াইয়াছে। সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার কারণ নিম্নলিখিত—

(১) ক্রয়ের জন্য যে সরকারি কর্ম্মচারীদের উপর ভার দেওয়া ছিল তাহারা অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দেশের খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে উদাসীন।

(২) মন্ত্রীমণ্ডলী গত একবছর রাজনৈতিক দলাদলিতে নিযুক্ত ছিলেন, খাদ্যক্রয়ের জন্য দেশে কোন অভিযান পরিচালনা করেন নাই।

(৩) খাদ্যক্রয়ের জন্য সরকার গণপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করেন নাই।

(৪) ধানের যে দর গভর্নমেন্ট নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা এত কম যে উহার চেয়ে বেশি দরে ব্যাপারীরা চাউল ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

(৫) সরকারী ক্রয়কেন্দ্র শুধুমাত্র বড় বড় বন্দরে আছে, বন্দর হইতে দূরবর্তী বাজারে সরকারি ক্রয়ের কোন ব্যবস্থা নাই।

(৬) তেভাগা আন্দোলন ও টংক আন্দোলন দমন করিবার সময় পুলিশ হাজার হাজার কৃষকের ধান লুঠ করিয়াছে। ঐ ধান সরকারী ষ্টকে আসে নাই। জোতদারের গোলায় উঠিয়াছে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ গত বৎসর কৃষকদের নিপীড়ন করিবার কাজে ব্যস্ত ছিল, খাদ্যক্রয় উপেক্ষা করিয়া মজুতদারী জোতদারদেরই তাহারা সাহায্য করিয়াছেন।

এখনও তিনমাস গুরুতর সংকট চলিতে থাকিবে। কিন্তু চাউল এখনও জোতদার এবং ব্যাপারীদের নিকট আছে। খাদ্যক্রয়ের জন্য সকল দলের মিলিত অভিযান পরিচালনা করিলে চাউলের দর কমান যাইবে। পশ্চিম এবং পূর্ব্ববঙ্গে গভর্নমেন্ট সকল দলের খাদ্য সম্মেলন আহ্বান করিয়া সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত পথে পা বাড়াইয়াছেন। ইহার পর সম্মিলিত খাদ্য অভিযান যাহাতে চলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেকটি ইউনিটকে সেজন্য সর্বত্র সক্রিয় হইয়া উঠিতে হইবে। আগামী তিনমাস সমগ্র বাংলায় খাদ্যের জন্য অভূতপূর্ব গণসমাবেশের প্রতিজ্ঞা লইয়া আমরা এই সম্মেলন হইতে ফিরিয়া যাইব। কলিকাতায় সর্বদলীয় শান্তিসেনা যেভাবে দাঙ্গা দমন করিয়াছে এই ভাবে সারা বাংলায় সর্বদলীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিয়া মজুত বিরোধী খাদ্যক্রয়ের অভিযান সফল করিতে হইবে। কলিকাতায় বৃহৎ জনসমাবেশ যেভাবে দাঙ্গাবাজদের থামাইয়াছিল সেইরকম গণসমাবেশ সৃষ্টি করিয়া চোরাকারবারী ও ধনী মজুতকারীদের পরাস্ত করিতে হইবে। এ লড়াই শুধু চাউলের জন্য নহে, সমস্ত রকম খাদ্যবস্তু এবং বস্ত্রের জন্যও চালাইতে হইবে।

খাদ্যের জন্য এই গণসংগ্রাম পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তির ভাগ্য নির্ধারণ করিবে। তেভাগার সংগ্রামে গ্রামে গ্রামে যে অপূর্ব সংগঠন, বীরত্ব ও প্রেরণা কৃষকদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল এবারকার এই খাদ্য সংগ্রামে ঠিক সেই রকম শক্তি শহরে ও গ্রামে সর্বত্র সৃষ্টি করিতে হইবে। এ লড়াই তাহার চেয়েও বড় হইবে, কারণ ইহার মধ্যে থাকিবে সর্বদলীয় ঐক্য এবং পিছনে থাকিবে সরকারি সহযোগিতা। যে জোতদাররা ও চোরাকারবারীরা তেভাগার সংগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সরকারের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিল আজ তাহারা সম্পূর্ণ এক ঘরে। সুতরাং খাদ্যক্রয়ের অভিযানে গণতান্ত্রিক শক্তি জয়লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

সম্মুখের পথ

প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থ এখনও অত্যন্ত প্রবল। তাহার লক্ষ্য হইতেছে—
(১) পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস স্থায়ী করা
(২) হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ বাড়ানো
(৩) রাষ্ট্রীয় শক্তি সম্পূর্ণভাবে কায়েমী স্বার্থের হস্তগত করা
(৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিরোধ করা
(৫) গণ প্রতিষ্ঠানে ভাঙ্গন ধরানো এবং গণসংগ্রামে হটানো
প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের প্রভাব কংগ্রেস এবং লীগ উভয়ের ভিতর রহিয়াছে, হিন্দু মহাসভা, সম্পূর্ণভাবেই তাহার হস্তগত। কংগ্রেস এবং লীগের ভিতর পার্থক্য এই যে কংগ্রেসের জনতার যে গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা আছে লীগের জনতার অভিজ্ঞতা তাহার চেয়ে কম এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের ভিতর প্রগতিশীল অংশ লীগের ভিতরকার প্রগতিশীল অংশের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর লীগের ভিতর প্রগতিশীল অংশ দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে এবং লীগপন্থী জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চেতনা দ্রুত বাড়িতেছে। ইহাই হইল বাংলাদেশের অবস্থা। এ অবস্থা পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ উভয় অংশে বর্ত্তমান।

১৫ই অগস্টের পর জনতার মধ্যে প্রগতির শক্তি অভূতপূর্বরূপে বাড়িয়া উঠিতেছে।

কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট ঐক্যের কথা গত সাড়ে চারি বৎসর আমরা প্রচার করিয়া আসিতেছি, আজ এই ঐক্য জনতার সক্রিয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। মজুতদার ও মুনাফাখোরের বিরুদ্ধে অভিযান আজ এত জনপ্রিয় যে আগে কখনও এরূপ ছিল না। ১৯৪৩ সালের মজুত বিরোধী অভিযানের কথা বলিয়া আমরা আক্রান্ত হইতাম আজ জনতা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে মজুত বিরোধী অভিযান করে। ১৯৪৬ সালেও তেভাগার দাবি যে দেশভক্তদের কাছে নিন্দিত হইত আজ তাঁহাদের মধ্যেও তেভাগার সমর্থন আছে। শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত দাবির লড়াই আজ সর্বজনপ্রিয়। বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের আপস নীতির প্রতি জনতা বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। নূতন জাতীয় গভর্নমেন্টকে জনতা নিজেদের গভর্নমেন্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং জনতার স্বার্থ অনুযায়ী ঐ গভর্নমেন্টের পরিচালনা চায়। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে জনগণ আজ অনেক সজাগ। কিন্তু দেশ বিভাগের জন্য এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপর সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ এখনও কাটে নাই, জনগণের উপর কায়েমী স্বার্থের প্রিয় নেতাদের প্রভাব এখনও প্রবল আছে। কায়েমী স্বার্থ এই প্রভাবের সুযোগ লইয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

যাঁহারা অতিরিক্ত বামপন্থী তাঁহাদের কর্ম্মনীতি এই অবস্থার প্রতিকূল। সরকারের সঙ্গে জনগণের সহযোগিতা তাঁহাদের নীতি অনুসারে বিপ্লববিরোধী; তাঁহাদের থিওরী হইল এই যে নেতৃবৃন্দ, গভর্নমেন্ট এবং কায়েমী স্বার্থ সম্পূর্ণ এক এবং সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল; সুতরাং ইহাদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানই বিপ্লবীর কাজ।

এই নীতি অনুসারে খাদ্য সংকটে গভর্নমেন্টের খাদ্যক্রয় অভিযানে সাহায্য না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করাই উচিত। অথচ সে পথ প্রতিক্রিয়াশীল মজুতদারদেরই কাম্য পথ। এই নীতি অনুসারে সাম্প্রদায়িক অরাজকতা সরকারকে হেয়

প্রতিপন্ন করিতেছে সুতরাং শান্তিরক্ষার কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া তাহাকে আবার জনপ্রিয় করিয়া তোলা উচিত নয়। অথচ শান্তিসেনা অভিযান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা আদায় করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমূহকেই পরাস্ত করিতেছে। শান্তি এবং শৃঙ্খলার অভিযান আজ প্রগতিরই অভিযান। পাকিস্তানে সরকারি শাসনের অব্যবস্থা ও দৈন্য অত্যন্ত প্রকট। "বামপন্থী" নীতি অনুসারে এ অবস্থায় সরকারি সুব্যবস্থার দাবি করা অন্যায় বরং সরকারকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করা উচিত। অথচ পাকিস্তানকে গড়িয়া তুলিব জনতার এই আকাঙ্ক্ষাই যেখানে কায়েমী স্বার্থকে কোণঠাসা করিতেছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের পক্ষপাতী কায়েমী স্বার্থ। দেশে দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা বৃহত্তম ঘটনা, অথচ এই দুই ঘটনায় জনসমাবেশ যে রাস্তায় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়িতেছে সে রাস্তায় "বামপন্থী" নেতাদের নীতি পদে পদে খণ্ডিত হয়। বর্ত্তমান অবস্থার বর্ণনায় "বামপন্থীদের" মনে একই সঙ্গে দুইটি পরস্পর বিরোধী আইডিয়া ঘুরিতেছে—একটি হইল : ব্রিটিশ শাসন চলিয়া গিয়াছে এখন দেশী কায়েমী স্বার্থ উচ্ছেদ করিবার লড়াই চাই; আর একটি হইল স্বাধীনতার শক্তি কিছুই লাভ হয় নাই যাহা হইয়াছে সবই ফাঁকি এবং সবই মেকী। দেশে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সে পরিবর্ত্তন তাঁহাদের কাছে অর্থহীন। তাঁহাদের নীতি অনুসারে যে সমস্ত লড়াই গত দুই বৎসর জনগণ লড়িয়াছে সেই সমস্ত লড়াই আবার সেইভাবে লড়িতে হইবে, অতীতের লড়াই যেন কোনই পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করে নাই। বামপন্থীদের নীতি অনুসারে ১৫ই অগস্ট স্বাধীনতা দিবস বয়কট করাই সমুচিত ছিল। কারণ এই দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রতি জনগণের মোহ বাড়াইতে পারে। অথচ ১৫ই আগস্ট স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশে আমরা দেখিয়াছি যে বুর্জোয়া নেতৃত্বের মোহে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল।

অবশ্য সমস্ত দলের বামপন্থীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একতার শক্তিশালী ভিত্তি রহিয়াছে কারণ পূর্ণ গণতন্ত্র ও পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সমস্ত বামপন্থীরাই শোষিত জনসাধারণের সপক্ষে আছেন। বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে এই একতা গড়িয়া উঠিতেছে এবং আরও উঠিবে।

যে পথে দেশ আজ পূর্ণ স্বাধীনতা ও পূর্ণ গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবে তাহার সারমর্ম্ম হইল—

"পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য লোকায়ত্ত গভর্নমেণ্টগুলির পিছনে জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন, তাহার জন্য জাতীয় নেতৃত্বগুলির ভিতরকার আপসকামীদের উপর জনসাধারণের সতর্ক পাহারা বসাইতে হইবে। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের রোষ বিক্ষোভ জাগ্রত করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক উস্কানি যাহারা দেয় তাহাদের বিরুদ্ধে জাতির বিবেক সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে। এই যুগান্তরের মুখে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলকে ব্যাহত করার একমাত্র উপায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় শক্তিনিচয়কে ঐক্যবদ্ধ করা।"

—(কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব, জুন ১৯৪৭)

আপসকামীরা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস ও ব্রিটিশ ক্ষমতার অবশিষ্টাংশ রাখিয়া দিতে চায় আমাদের এই মুহূর্ত্তের কাজ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য জনমত দুর্বার করিয়া তোলা।

প্রতিক্রিয়াশীলরা কায়েমী স্বার্থে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে আনিতে চায়। আমাদের কাজ জনসমাবেশ গড়িয়া তুলিয়া গণতন্ত্র গড়িয়া তোলা।

জাতীয় সরকার কায়েমী স্বার্থের প্রতি তোষণ নীতি অবলম্বন করিতেছে, আমাদের কাজ

জনমতের জোরে এই নীতি ব্যর্থ করা।

বড় বড় মূলধনী, জমিদার, জোতদার ও মুনাফাখোরেরা অর্থসংকট সৃষ্টি করিয়া জনগণের জীবন দুর্যোগপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে—আমাদের কাজ জনগণের স্বার্থে এই সংকট রোধ করা।

পুরাতন আমলাতন্ত্রের প্রতি মন্ত্রিমণ্ডলীর নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে জনগণের সংগঠিত শক্তির প্রতি মন্ত্রিমণ্ডলীর সহযোগিতা আদায় করিতে হইবে এবং অনতিবিলম্বে দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্রের উৎখাতের জন্য দেশব্যাপী গণঅভিযান পরিচালনা করিতে হইবে।

জমিদারি ও জোতদারি প্রথার উচ্ছেদ ও পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে সারা বাংলায় শক্তিশালী গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া আমরা প্রতিক্রিয়াকে আঘাত করিব; শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার জন্য গড়িয়া তুলিব সকল দলের সমবেত প্রচেষ্টা। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া একাজ আরম্ভ করিতে হইবে।

এই পথেই বিভক্ত বঙ্গ আবার ঐক্যবদ্ধ হইবে, এই পথেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠস্বর এবং সমবেত সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করিবে।

দ্বিতীয় দলিল

অবিভক্ত বাংলার শেষ পার্টি সম্মেলন বা চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে। কলকাতার ৮-ই ডেকার্সলেনে তখনকার পার্টি অফিসের বিরাট ছাদে প্যান্ডেল বেঁধে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া অন্য বিষয়ে এই সম্মেলনে বিশেষ বিতর্ক হয়নি। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় পার্টির সম্পাদক পি সি যোশীর প্রভাবে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবে লেখা হয় যে স্বাধীন ভারতে অন্তত কিছুকালের জন্য সবরকমের শ্রমিক ধর্মঘট স্থগিত রাখা উচিত। কিন্তু, সম্মেলনে উপস্থিত শ্রমিক নেতারা এর তীব্র প্রতিবাদ করেন ফলে প্রস্তাবটি সম্মেলনে পাশ হয়নি।

যদিও ১৫ই অগস্ট দেশ স্বাধীন ও বাংলা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তবুও এই সম্মেলনে দুই বাংলার প্রতিনিধিরাই যোগ দেন। এই সম্মেলন থেকে ডাঃ রণেন সেন প্রাদেশিক পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, সোমনাথ লাহিড়ী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, নৃপেন চক্রবর্তী, ভবানী সেন, এবং পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। প্রাদেশিক কমিটিতে নির্বাচিত হন আবদুর রেজ্জাক খাঁ, আবদুল্লাহ্‌ রসুল, আবদুল হালিম, মণি সিং, কৃষ্ণবিনোদ রায়, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, আবদুল মোমিন, প্রমোদ দাশগুপ্ত, নেপাল নাগ, বঙ্কিম মুখার্জী, খোকা রায়, মনসুর হবিবুল্লাহ, ভূপেশ গুপ্ত, মণিকৃষ্ণ সেন, স্নেহাংশু আচার্য, হীরেন মুখার্জী এবং জেলা থেকে আরও কয়েকজন কমরেড। অল্প কিছুদিন পরেই দুই বাংলার পার্টি আলাদা হয়ে যায়। ফলে রাজ্য কমিটিতে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে ছিলেন তাঁদের বাদ দেওয়া হয়। এই চতুর্থ সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১৩৭ জন। পিসি যোশী একনাগাড়ে ছড় ঘন্টা ধরে নিজের অনুসৃত লাইন সম্পর্কে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কাছে বক্তব্য রেখেছিলেন।

বীর কমিউনিস্ট শহিদদের স্মরণে

গত চার বছরের মধ্যে আমাদের পার্টির বহু একনিষ্ঠ কর্মী সংগ্রামের ময়দানে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও পুষ্টিকর আহার অভাবে নানাবিধ রোগে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

বিগত তে-ভাগা সংগ্রামে, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ও নাগরিকদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানে সাম্রাজ্য-বাদী সশস্ত্র শক্তির সম্মুখীন হইয়া এবং দাঙ্গার উন্মত্ততার মধ্যে শান্তির কাজ করিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন এমন বহু পার্টি-সভ্য ও দরদী বীরের মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছেন।

সেই সব বীর শহিদদের স্মৃতিতে আমরা লাল পতাকা অবনমিত করিতেছি। শহিদদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের পার্টির পক্ষ হইতে সমবেদনা প্রকাশ করা হইতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে পার্টির এই সম্মেলন দৃঢ় মুষ্টিতে শপথ গ্রহণ করিতেছে— সেই সব বীর যোদ্ধাদের আদর্শ ও লক্ষ্যকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য সমগ্র পার্টি তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামীদের প্রতি অভিনন্দন

দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলন, কলিকাতার নাগরিক বিদ্রোহ বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহ ও অন্যান্য শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামে যাঁহারা নিহত ও আহত হইয়াছেন, সর্বোপরি হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যাঁহারা বীরের ন্যায় শান্তির বাণী বহন করিতে গিয়া নিহত ও আহত হইয়াছেন তাঁহাদের গৌরবোজ্জ্বল কার্যাবলী ও সংগ্রামস্পৃহাকে এই সম্মেলন অভিনন্দন জানাইতেছে। সম্মেলন মনে করে, তাঁহাদের সংগ্রামশীলতাও দেশবাসীর মনে অসীম প্রেরণা আত্মত্যাগ জাগাইবে। পার্টি তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম্ম সম্পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছে।

শত শত শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা, নাগরিক যুদ্ধোত্তর যুগে অসীম বীরত্বের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র ফৌজের সম্মুখীন হইয়াছে, স্বাধীনতার লড়াই লড়িয়াছে। তাঁহাদের প্রতি এই সম্মেলন আবার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছে।

সকলের মিলিত অভিযানে

বাংলার জনস্বার্থ বিরোধীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে হইবে

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য

সারা বাংলার যুক্ত ফ্রন্ট চাই

১৫ই অগস্ট বাংলার সর্বত্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে যে সমস্ত দেশবাসী সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন কমিউনিস্ট পার্টির এই সম্মেলন তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই সম্মেলন আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে এবং পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী শান্তি স্থাপনের জন্য যে সমস্ত প্রশংসনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার জন্য মন্ত্রিসভা দুইটিকেও এই সম্মেলন অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং শহিদ সুরাবর্দ্দী

প্রভৃতি যে সমস্ত নেতা দাঙ্গার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতেছেন এই সম্মেলন তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছে এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টার পিছনে জনমত শক্তিশালী করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে। বাংলা দেশে সমস্ত-কমিউনিস্টদের পক্ষ হইতে এই সম্মেলন প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে, সারা বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করা হইবে।

পাঞ্জাবের শিক্ষা

পাঞ্জবের সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ বাংলা দেশকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। এই গৃহযুদ্ধ বন্ধ করিয়া তথাকার আর্ত্ত জনসাধারণকে সাহায্য করিবার জন্য নেতৃবৃন্দ আবেদন জানাইছেন। উক্ত আবেদনে ষথোপযুক্ত সাড়া দিবার জন্য এই সম্মেলন দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছে। আমরা উদ্বেগেব সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি যে, দাঙ্গাবাজ প্রতিক্রিয়াশীলেরা পাঞ্জাব সম্পর্কে উত্তেজনামূলক সংবাদ ছড়াইয়া বাংলা দেশে আবার দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, বাংলার বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা বাধাইবার জন্য গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র চলিতেছে। দরিদ্র জনসাধারণকে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য যাহারা মিথ্যা আতঙ্ক প্রচার করিতেছে তাহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে; পাঞ্জাবে যাহা ঘটিয়াছে বাংলায় যেন তাহা না ঘটে।

কায়েমীস্বার্থের নীতি

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে জনসাধারণের মনে এখনও সীমানা বদলের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। দাঙ্গাবাজেরা এই আকাঙ্ক্ষার সুযোগ লইয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়াইতেছে। কমিউনিস্ট পার্টির এই সম্মেলন দুই বঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণকে সতর্ক করিয়া দিতে চায়। র‍্যাডক্লিফ রোঁয়েদাদে সাম্রাজ্যবাদীরা ইচ্ছা করিয়াই হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের বীজ বপন করিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর ইঙ্গিতে এদেশের পুঁজিপতি এবং ইংরেজ সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীরা দেশী কায়েমী স্বার্থের সহযোগিতায় এক প্রদেশের পর আর এক প্রদেশে গৃহযুদ্ধ বাড়াইয়া ভারত এবং পাকিস্তানের উপর সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। পাঞ্জাবের পর তাহাদের লক্ষ্য হইবে বাংলা দেশ। বাংলার স্বাধীনতাকামী দেশবাসী এবং বিশেষ করিয়া শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রগণ এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন। পাঞ্জাবের গৃহযুদ্ধে সমাজের সমস্ত ব্যবস্থা যেভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বাংলা দেশকে যদি তাহারা সেভাবে ভাঙ্গিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে দেশবাসীর অন্ন, রুজি ও জমির সংগ্রামত' পণ্ড হইবেই, বরং অগণিত জনগণের উপর মুনাফাখোরদের অবাধ শোষণ প্রতিষ্ঠিত হইবে। যতটুকু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃটিশের নিকট হইতে আদায় হইয়াছে তাহা হইতে আগাইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ত' হইবেই না, বরং রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিদেশীর হস্তগত হইবে। যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমরা লাভ করিয়াছি তাহাও সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের হস্তগত হইবে এবং আমাদেরই জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে।

লোক অপসারণের বিরুদ্ধে

পাঞ্জাবের গৃহযুদ্ধের পর লোক অপসারণের ধারণা ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তানে হিন্দু বাস করিতে পারিবে না এবং ভারতীয় ইউনিয়নে মুসলমান বাস করিতে পরিবে না, এইরূপ

প্রচারকার্য দেশবাসীকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছে। আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুদের মধ্যে অনেকে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কমিউনিস্ট পার্টির এই সম্মেলন লোক অপসারণের নীতিকে সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে। লোক অপসারণ বাংলার দুই রাষ্ট্রকেই দুর্বল করিয়া ফেলিবে এবং দুস্থ ও আশ্রয়প্রার্থীর সমস্যা দুই রাষ্ট্রকেই অসম্ভব রকমে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে। ইহার ফলে সারা বাংলার অর্থনৈতিক ও সমাজ-জীবন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আশ্রয় প্রার্থীদেরও দৈনন্দিন জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিবে। ইহাতে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও সংঘর্ষ শতগুণে বাড়িবে। কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের আবেদন জানাইতেছে যে, তাঁহারা নিজ নিজ অঞ্চলে বাস করিয়া তথাকার সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য গড়িয়া তুলুন। সংখ্যাগরিষ্ঠরা সর্বত্র সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভরসা দিন। আতঙ্ক দূর করিয়া লোক অপসারণ বন্ধ করিবার জন্য পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিগণ যুক্ত বৈঠকে মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ করুন।

শান্তিবাহিনী ও জাতীয়বাহিনী

এই সম্মেলন বিশ্বাস করে যে, বাঙ্গালীর স্বভাবসুলভ স্বদেশপ্রেম দাঙ্গার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিবে। কলিকাতার সর্বসাধারণ শান্তিসেনা গঠন করিয়া যেভাবে দাঙ্গা, মুনাফাখোরী এবং অরাজকতা প্রতিরোধ করিতেছে তাহা সারা ভারতের সম্মুখে এক প্রগতিশীল কর্মপন্থার আদর্শ। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে অশান্তি এবং অরাজকতার বিরুদ্ধে এইরূপ গণবাহিনী সংগঠিত হইয়াছে। কমিউনিস্টগণ যেন বাংলার সর্বত্র এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত করিয়া তোলেন। বাংলার প্রতি শহরে এবং গ্রামে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য বামপন্থী দলসমূহের মিলিত চেষ্টায় শান্তিবাহিনী গড়িয়া উঠুক।

কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রাদেশিক সম্মেলন পশ্চিম এবং পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট দাবি করিতেছে যে, তাঁহারা শান্তিবাহিনীকে অস্ত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করুন এবং উহাকে সশস্ত্র করিয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক রক্ষীবাহিনীর ক্ষমতা ও মর্যাদা দান করুন।

আমলাতন্ত্রের পরিবর্তন

১৫ই অগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পর দেশবাসীর মনে নূতন আশা জাগিয়াছে। সে আশা হইল খাদ্য, বস্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সর্বতোভাবে মাতৃভূমিকে শক্তিশালী করিবার আশা। মন্ত্রিমণ্ডলীর উচিত জনসাধারণের মৌলিক দাবিগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের আশা পূরণ করা। কিন্তু পুরাতন আমলাতন্ত্র দেশবাসীর মনে হতাশা আনিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুরাতন আমলাতন্ত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর শিক্ষা অনুযায়ী দুর্নীতি ও দাঙ্গাবাজীরই প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলীর বন্দীমুক্তির আদেশ পর্যন্ত এই সরকারি আমলারা যথাসম্ভব কার্যকরী করিতে অস্বীকার করিতেছে। প্রতিপত্তিশালী কায়েমী স্বার্থের সেবা করাই এই আমলাতন্ত্রের কার্য। অথচ উভয় বঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী পুরাতন পদস্থ প্রতিক্রিয়াশীল আমলাদেরই পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন; তাহাদেরই উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করিতে চাহেন। সরকারের এই আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

তদন্ত কমিশন

উক্ত উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে—

(১) সরকারি কর্মচারীদের অতীত কার্যাবলী পরীক্ষা করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করা হউক।

(২) যে সমস্ত কর্মচারী অতীতে প্রগতিশীল আন্দোলনকে সাহায্য করিয়াছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন অথবা জনকল্যাণের কাজে জনপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদের দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যান্য সমস্ত পুরাতন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্বশীল পদ হইতে সরানো হউক।

(৩) যে সমস্ত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা দাঙ্গায়, চোরাকারবারে এবং ঘুষখোরীতে কোন না কোন রকমে লিপ্ত আছেন বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহাদের সরকারি চাকুরী হইতে অপসারণ করা হউক।

(৪) নূতন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করিবার সময় দাঙ্গা, দুর্নীতি ও চোরাকারবারের বিরুদ্ধে এবং জনকল্যাণের জন্য তিনি অতীতে কি করিয়াছেন তাহার বিবেচনা বাধ্যতামূলক করা হউক। অনতিবিলম্বে নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া সরকরী কর্মচারী নিয়োগের বর্তমান ব্যবস্থা বাতিল করা হউক। দেশাত্মবোধসঙ্গত নূতন পরীক্ষার প্রবর্তন করিয়া কর্মচারী মনোনয়নের জন্য সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। সরকারি কর্মচারী পদে ভর্তি হইবার পথে রাজনৈতিক কারণের বিধিনিষেধ উঠাইয়া দেওয়া হউক।

উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাদের দুর্নীতি দমন করিবার জন্য স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন, সুতরাং উভয় বঙ্গের গভর্নমেন্ট অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া তাঁহাদের সক্রিয় সাহায্য আদায় করুন।

(৫) অতীতে যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের রাজনৈতিক কারণে বরখাস্ত করা হইয়াছে, তাঁহাদের পুনরায় কাজে বহাল করা হউক।

যদি এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে দাঙ্গা ও চোরাকারবার দমন করিয়া প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে এবং সত্যকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হইবে।

বাঙালী সৈন্যবাহিনী

এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে, সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান আছে তাহা অবিলম্বে অপসারণ করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী এতদিন সৈন্যবাহিনীতে দেশভক্ত জনসাধারণের পথ যথাসম্ভব রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বিশেষত বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সাবধানতা ছিল, সৈন্যবাহিনীকে বাঙ্গালীর স্থান একরকম নাই বলিলেই হয়। এই সম্মেলন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট দাবি করিতেছে যে (ক) সরকারি সশস্ত্রবাহিনীর প্রত্যেক বিভাগের জন্য ব্যাপকভাবে বাংলা হইতে লোক সংগ্রহ করা হউক এবং সামরিক কার্য হইতে ছাঁটাই বাঙ্গালী সৈন্যদের পুনর্নিয়োগ করা হউক। সৈন্যবাহিনী হইতে ব্রিটিশ অফিসারদের

অপসারণ করা হউক। (খ) বাংলার উভয় অঞ্চলে অবস্থিত প্রাপ্তবয়স্ক সর্বসাধারণকে সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হউক।

এই সম্মেলন বাংলার সর্বসাধারণকে আবেদন জানাইতেছে যে, ব্যাপক গণসমাবেশ দ্বারা প্রবল জনমত গঠন করিয়া সরকারি আমলা ও সশস্ত্র বাহিনীর পরিবর্তন অনিবার্য করিয়া তুলুন।

দুই বঙ্গের সহযোগিতা

বাংলার দুই অঞ্চলের স্বার্থ এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে খাদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারেই দুই সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অপরিহার্য। সংবাদপত্রে এইরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে যে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের এই সহযোগিতা স্থাপনের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত নির্দেশের মর্ম এইরূপ যে, ভারতের অন্তর্গত কোন প্রাদেশিক সরকার সরাসরি পাকিস্তানের কোন প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে আলোচনা বা পত্রালাপ চালাইতে পারিবে না। ভারত সরকারের এই নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি সাধন করিবে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের অবাধ সহযোগিতার জন্য ভারত সরকারের উক্ত নির্দেশের প্রত্যাহার চাই। এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সংকট সমাধানের জন্য উভয় বঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে সরাসরি সহযোগিতা ও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা হউক।

পূর্ববঙ্গে জনস্বার্থে সুপ্রতিষ্ঠিত সরকার চাই

নতুন রাষ্ট্র গঠিত হইবার পর পূর্ববঙ্গের শাসনযন্ত্র এখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। ইহার ফলে মজুতদার, চোরাকারবারী, ঘুষখোর আমলা প্রভৃতি জনশত্রুদের সুবিধা হইয়াছে। তাহারা অবাধে দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করিয়া চলিয়াছে। নতূন প্রগতিশীল আইন কানুন তৈরি করা তো দূরের কথা পুরাতন আইন কানুনের আশ্রয় লওয়াও দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া সমাজের কায়েমী স্বার্থ নিজের প্রভাব বাড়াইতেছে। জনসাধারণের স্বার্থে পূর্ববঙ্গের সরকারি কার্যব্যবস্থা যাহাতে তাড়াতাড়ি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেজন্য মন্ত্রিমণ্ডলী ও জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চাই, কমিউনিস্ট পার্টি এই সহযোগিতা স্থাপনের জন্য সর্বদাই চেষ্টা করিবে।

ভাষা ও শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা বাংলা ভাষাকেই সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করায় এই সম্মেলন তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতেছে। এই সম্মেলন আশা করে যে, পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী অনতিবিলম্বে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

বাংলার ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষাজগতে নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্য উভয় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে পরস্পরের সহযোগিতা করিতে সমর্থন হয় সেজন্য এই সম্মেলন মন্ত্রিসভাদ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

উপদলীয় চক্রান্ত

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গেই মন্ত্রিত্ব লইয়া একস্থানে লীগের ভিতর এবং অন্যস্থানে কংগ্রেসের ভিতর যে দলাদলি চলিতেছে তাহা বাংলার শান্তি, ঐক্য এবং অগ্রগতির পথে বিঘ্ন। এই দলাদলি যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে দেশের সঙ্কটসমূহ পূর্ণভাবে সমাধান করা সম্ভব হইবে না, কায়েমী স্বার্থই রাজনৈতিক শক্তি হস্তগত করিয়া রাখিতে পারিবে এবং হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিরোধ পর্যন্ত সমস্ত রকম অশান্তি বাড়িয়া উঠিবে। এমনকি খাদ্য সমস্যার সমাধানও এই দলগত বিরোধের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

কমিউনিস্ট পার্টি কোথাও কোন দলের দলীয় বা উপদলীয় চক্রান্ত সমর্থন করিবে না, তা সে চক্রান্ত মন্ত্রীদের পক্ষেই হোক আর বিরোধী পক্ষেই হউক। কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যেক দলকেই তাহার রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মপন্থা দেখিয়া বিচার করিবে। জনস্বার্থে মন্ত্রিত্ব লইয়া এই দলাদলির অবসান বাঞ্ছনীয়।

প্রগতিশীল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা

কমিউনিস্ট পার্টির এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে, বাংলার দুইটি মন্ত্রিসভাতেই কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হউক এবং প্রগতিশীল কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়া মন্ত্রিসভাতে সত্যকার জাতীয় সরকারে পরিণত করা হউক। পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যবদ্ধ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া জনগণের সমস্ত সঙ্কট দূর করিবার জন্য সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

বাঙ্গালীর সঙ্গে অবাঙ্গালীর যে সংঘর্ষ মাঝে মাঝে দেখা যায় উহা প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থেরই আর এক ষড়যন্ত্র। কংগ্রেস গভর্নমেন্টকে অপদস্থ করিবার জন্য তাহারা হিন্দু-মুসলমানে এবং বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীর মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টিতে ইন্ধন জোগাইতেছে। তাহাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই সম্মেলন দেশবাসীকে সজাগ করিয়া দিতে চায়। আমাদের দেশের বাঙালী কৃষকের সঙ্গে অবাঙ্গালী কৃষকের কোন বিরোধ নাই, বরং জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী কৃষকদের সংগ্রাম এক এবং অবিভাজ্য। বাঙ্গালী-বিহারী, বাঙ্গালী-অসমীয়া, বাঙ্গালী-উড়িয়া এবং বাঙ্গালী-গুর্খার মনোমালিন্য ও স্বার্থসংঘাত যাহারা সৃষ্টি করিতেছে তাহারা হইল জমিদার, খনির মালিক, চা-বাগানের মালিক এবং অনুরূপ বিত্তবান শ্রেণি। তাহাদের ষড়যন্ত্র হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের মতই আর এক গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করিতেছে। কমিউনিস্ট পার্টির এই সম্মেলন দেশবাসীকে আবেদন জানাইতেছে যে, বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালীর মধ্যে যেখানে যে কোন মতভেদই উপস্থিত হউক না কেন, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে তাহার নিষ্পত্তি করুন। দরিদ্র বাঙ্গালী এবং দরিদ্র অবাঙ্গালীর সমবেত শক্তি সমগ্র কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে নিযুক্ত হউক।

সহযোগিতার পথে ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশ আজ দুইভাগে বিভক্ত। কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশের এক ভাষা, এক স্বার্থ এবং এক ইতিহাস। অর্থনৈতিক সম্বন্ধের দিক দিয়াও বাংলার এক অংশ অপর অংশের সহিত জড়িত। এই বাংলাদেশ চিরদিন বিভক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। এই বাংলা দেশের এক অংশের সঙ্গে

অপর অংশের সংঘর্ষ চলিতে দিলে উভয় অংশেরই সর্বনাশ হইবে।

দুই বাংলাতেই সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া দুই বাংলার সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে।

সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক অধিকার লাভই উভয়বঙ্গের শান্তি এবং শক্তিলাভের প্রধান উপায়। সংখ্যালঘুদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য উভয়বঙ্গের জনসাধারণের সহযোগিতা চাই।

পূর্ববঙ্গে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবন রক্ষার দায়িত্ব মুসলিম দেশবাসীকে লইতে হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবন রক্ষার দায়িত্ব হিন্দু দেশবাসীকে লইতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম-উৎসব বাংলার সর্বত্র যাহাতে ১৫ই আগস্টের মত মিলনোৎসবরূপে পালিত হয় সেজন্য সমস্ত দেশবাসীর আন্তরিক প্রচেষ্টা চাই। বঙ্গভঙ্গে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ক্ষুব্ধ হইয়াছে, বাংলাদেশ এক হউক এ আকাঙ্ক্ষা উভয়েরই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু এক অঞ্চলের উপর অপর অঞ্চলের এবং এক সম্প্রদায়ের উপর অপর সম্প্রদায়ের জবরদস্তি বাংলাকে কোনদিন ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিবে না। সহযোগিতার পথে স্বাধীন, শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া দুই বাংলা একদিন স্বেচ্ছায় মিলিত হইবে।

বাংলার দুইটি রাষ্ট্রকেই সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য এই সম্মেলন বাংলার কংগ্রেস, লীগ ও বামপন্থী সকল দলের নিকট প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সমবেত অভিযানের আহ্বান জানাইতেছে। স্বাধীনতাকামী সমস্ত দলের মিলিত শক্তি সারা বাংলার ঘরে ঘরে শান্তি এবং সুখ প্রতিষ্ঠিত করুক।

দাঙ্গার বিরুদ্ধে

সাম্রাজ্যবাদী নীতি ভারতবর্ষে যে দাঙ্গা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এখন আর সাধারণ দাঙ্গা নহে। উহা এখন ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে, উহা আমাদের জাতীয়-প্রগতি ধ্বংস করিতেছে, জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধূলায় মিশাইয়া দিতেছে, জাতীয় মনুষ্যত্ব বোধকেও শেষ করিয়া দিতেছে। এই স্বাধীনতা-বিরোধী ষড়যন্ত্র পরিচালনা করিতেছে— বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী, দেশীয় রাজন্যবৃন্দ, জমিদার, চোরাকারবারী ও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকগণ। আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট, দেশের জনসাধারণ ও দেশের ভবিষ্যতকেই তাহারা আক্রমণ করিতেছে।

পাঞ্জাবের দাঙ্গার পর হইতে অবস্থা ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যা, নারী ও শিশুদের উপর ঘৃণিত আক্রমণ, জাতীয় সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ইত্যাদি তো ঘটিয়াছেই, তাহার উপর দুই পাঞ্জাবের প্রায় এক কোটি লোক পৈতৃক বাসভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়া সহায় সম্বলহীন ভিখারীর মত নূতন স্থানে আসিয়া আশ্রয়প্রার্থী হইতে বাধ্য হইতেছে। দাঙ্গা ও আশ্রয়প্রার্থী স্থানান্তর প্রভৃতি বিরাট সমস্যার চাপে যোগাযোগ ও শাসনব্যবস্থাও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আশ্রয়প্রার্থীর ব্যবস্থা করিতে না পারায় উহাদিগকে অন্যান্য প্রদেশে পাঠানো হইতেছে এবং সেখানে তাহাদের বিক্ষোভজনিত প্রচার ও উত্তেজনা শান্ত অঞ্চলেও দাঙ্গা ছড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতেছে, গভর্নমেন্টকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করিতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানেও ফিরোজ খাঁ নুন প্রভৃতি বৃটিশ-অনুগত

কায়েমী স্বার্থবান লোকেরা লীগের শান্তিপ্রিয় অংশকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করিতেছে, অনেক স্থানে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডকে অস্ত্র দিয়া তাহাদের সাহায্যে গভর্নমেন্টকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা হইতেছে। দিল্লীর সাম্প্রতিক দাঙ্গা ও তাহার পরবর্তী পরিস্থিতি পরিষ্কার দেখাইয়া দিয়াছে যে, দাঙ্গার সাহায্যে নেহরু গভর্নমেন্টকেই আক্রমণ কবার চেষ্টা হইতেছে।

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে কলকাতায় শচীন মিত্র প্রমুখ দাঙ্গা-বিরোধী শহীদদের আত্মদান, ছাত্র, শ্রমিক, নাগরিক ও শান্তিসেনাদের নির্ভীক সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ও গান্ধীজীর জীবনপণ আহ্বান এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমান জনসাধারণের ও দায়িত্বশীল নেতাদের দিক হইতে শান্তিতে পাকিস্তান গড়িয়া তুলিবার আগ্রহ— ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। কিন্তু এই অবস্থা আবার বিপদের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঞ্জাব ও দিল্লীর গুজব ছড়াইয়া উভয় বঙ্গেই নূতন উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছে। গুণ্ডাদের অস্ত্রশস্ত্র এখনও গুণ্ডাদের হাতেই আছে। তাহার সাহায্য লইয়া বর্তমান গভর্নমেন্টগুলির বিরোধী পক্ষ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তথা দাঙ্গা ছড়াইয়া উভয় বঙ্গেই ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করিতেছে। এই উদ্দেশ্যেই ঢাকা জন্মাষ্টমী মিছিল সম্পর্কে হিন্দুদের চিরাচরিত অধিকারের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গ গভর্নমেন্টবিরোধী এক শ্রেণীর মুসলমান গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়া যে আতঙ্ক সঞ্চার করিয়াছে তাহার ফলে আবার সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ আরম্ভ হইয়াছে। উভয় বঙ্গেই গভর্নমেন্টের দায়িত্বশীল পদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মচারী না থাকায় সংখ্যালঘুদের ভরসা আরও কমিতেছে। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে লোভী আমলাদের চক্রান্তে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ী অন্যায়ভাবে রিকুইজিশন করা, ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় সংখ্যালঘুদের দোকানাদি বয়কট করা, উভয় বঙ্গেরই কোনো কোনো স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শ্রমিককেও কাজ দেওয়ার অনিচ্ছা, জিনিস-পত্রের আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি লইয়া সীমান্ত অঞ্চলে দুই গভর্নমেন্টের পরস্পর বিরোধিতা, সশস্ত্র গুণ্ডাদল কর্তৃক সীমান্তযাত্রীর জিনিসপত্র ছিনাইয়া লওয়া, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কর্তৃক তল্লাশীর অতিরিক্ত উৎসাহ ইত্যাদি কারণে সীমান্ত অঞ্চল তথা দেশের অভ্যন্তরে প্রতিদিন সাম্প্রদায়িক বিরোধের নূতন নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করিতেছে। কলকাতা ও মেদিনীপুরে মুসলমান দাঙ্গা-দুর্গতদের পুনর্বসতিকার্যে বাড়ী, জমি, দোকান, বাজার প্রভৃতির মালিকদের বিরোধিতা সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বাড়াইতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা অবস্থা ঘোবাল করিয়া তুলিতেছে। বেতার কেন্দ্রের সংবাদ প্রচারের ধরনও অনেক সময় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার খোরাক যোগাইতেছে। সংবাদপত্রগুলির মধ্যেও আবার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সংবাদ ফলাও করিয়া ছাপিবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইতেছে।

হিন্দু-মুসলিম বিরোধের এই আবহাওয়া দেখিয়াও কোন কোন দায়িত্বশীল নেতা বিরাট সংখ্যায় লোক অপসারণ সমর্থন করিয়া দেশকে হিন্দু ও মুসলিম দুইটি রাষ্ট্রে ভাগ করিয়া ফেলিতে সাহায্য করিতেছেন এবং তাহার ফলে দুই সম্প্রদায় তথা দুই রাষ্ট্রে বিরোধিতা আরও তীব্র হইতেছে। লোকাপসারণ নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করিতে গিয়া তাহার চাপে দুই রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, আর্থিক ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামো একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং জাতিগঠনের মামুলি কাজও বহুদিনের মত স্থগিত রাখিতে হইতেছে তো বটেই। তাহার উপর এই নীতির সুযোগ লইয়া প্রতিক্রিয়াশীলেরা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইবার কথা প্রকাশ্যেই

বলিতেছে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে দুই গভর্নমেন্টের সশস্ত্র যুদ্ধরূপে আরও ভয়ঙ্কর ও সর্বনাশকর পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কোন কোন দায়িত্বশীল নেতা পর্যন্ত এখনও রাষ্ট্রীয় শত্রুতা ও যুদ্ধের উত্তেজনা প্রচারের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন ভাবে সাহস করিয়া কথা বলিতেছেন না বলিয়া বিপদ আরও ঘনাইয়া আসিতেছে।

উপরিউক্ত সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় সারা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের সম্মুখে আজ প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন হইল— দাঙ্গা থামানো যাইবে কি না, সংখ্যালঘুদের মনে ভরসা ফিরাইয়া আনা যাইবে কি না, দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তোলা যাইবে কি না। এই প্রশ্ন মিটাইতে পারিলে তবেই দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত ও সুসম্পূর্ণ হইতে পারে, দেশ ও জাতিগঠনের কাজে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। আর এই প্রশ্নের সমাধান না করিতে পারিলে দেশের সমস্ত ভবিষ্যতই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া লইয়া উভয় বঙ্গকেই শান্তির কঠোর সংগ্রামে আরও শতগুণ দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে হইবে, কারণ সংকটের গুরুত্ব একটুও কমে নাই। উভয় বঙ্গের জনসাধারণের সাধারণ শুভবুদ্ধি এবং কলকাতার জনগণের গুণ্ডাবিরোধী সংগ্রাম সারা ভারতবর্ষের কাছে আশার আলো জ্বালাইয়া তুলিয়াছে, বাংলা দেশের শান্তিই আজ আসাম, উড়িষ্যা, বিহার প্রমুখ ভারতের পূর্ব অঞ্চলের শান্তি বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বাংলার শান্তি যদি বিপন্ন হয় তো উহা সমগ্র পূর্ব অঞ্চলের শান্তি বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বাংলার শান্তি যদি বিপন্ন হয় তো উহা সমগ্র পূর্ব ভারতে আগুন জ্বালাইয়া দিবে। সেপ্টেম্বর হইতে এখন পর্যন্ত বাংলায় বিশেষ কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই বটে, কিন্তু অবস্থা আবার খারাপের দিকে চলিতেছে। তাই কমিউনিস্ট পার্টি আবার বাংলার শ্রমিক শ্রেণিকে, বাংলার ছাত্রসমাজকে ও বাংলার জনসাধাবণকে আহ্বান করিতেছে— দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়োজিত করুন, দেশের ভবিষ্যত রক্ষা করুন।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেন্ট দাঙ্গা দমনের জন্য ও সাম্প্রদায়িক নিরাপত্তা ফিরাইয়া আনিবার জন্য যাহা কিছু উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, এই কনফারেন্স তাহা পূর্ণরূপে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি জানাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুঃখের সহিত মন্তব্য করিতে বাধ্য হইতেছি যে, দুই গভর্নমেন্টের মধ্যেই এই কার্যে জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করার ও তাহাদের উপর ভরসা করার প্রবৃত্তি কম দেখা যায়— যে পুলিশ ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর অনেকখানি এখনও সাম্প্রদায়িকতায় ভরপুর বলিয়া তাঁহারাও স্বীকার করেন সেই কাঠামোর উপর ভরসা করার প্রবৃত্তিই বেশি দেখা যায়। পূর্ববঙ্গ গভর্নমেন্ট এখনও কোনো সর্বদলীয় শান্তি কমিটি গঠন করেন নাই, সর্বদলীয় শান্তিসেনা গঠনে সাহায্য করেন নাই, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডগুলিকে একক সুবিধা দিয়েছেন, উভয় সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাবাহিনী গঠনে সাহায্য করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট শান্তিসেনা বাহিনীকে বিশেষ কোন সাহায্য করার পরিবর্তে পুলিশের কর্তৃত্বে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করিতেছেন। এই কনফারেন্স মনে করে যে, এই মনোভাব দাঙ্গা দমনে অসুবিধা সৃষ্টি করিবে। দাঙ্গার সময় যাহাদিগকে শুধু সন্দেহ বা তুচ্ছ কারণে গ্রেপ্তার বা সাজা দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দুই গভর্নমেন্টই উচিত কাজ করিয়াছেন, কিন্তু যাহাদের বিরুদ্ধে বাস্তবিকই দাঙ্গা করার উপযুক্ত প্রমাণ আছে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার মনোভাবকে এই

সম্মেলন অন্যায় বলিয়া মনে করে। পূর্বোক্ত সকল বিষয়ে সমস্ত দুর্বলতা পরিহারের জন্য এই সম্মেলন উভয় গভর্নমেন্টকেই অনুরোধ করিতেছে।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও গভর্নমেন্টের নিকট এই সম্মেলন আহ্বান জানাইতেছে যে, দাঙ্গা নিবারণের জন্য অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক :

(১) নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অত্যাচার ও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গুণ্ডাকে তীব্র ও দ্বিধাহীন ভাবে নিন্দা করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ভরসা ফিরাইয়া আনুন।

(২) প্রতি মহল্লা ও গ্রামে শান্তিসেনা গড়িয়া সংখ্যালঘুদের রক্ষা, গুজব থামানো, উত্তেজনাসৃষ্টিকারীদের স্বরূপ প্রকাশ, অস্ত্রশস্ত্র ও লুটের মাল উদ্ধার, গুণ্ডা গ্রেপ্তারে সহায়তা ইত্যাদি ব্যবস্থা করুন, যাহাতে সংখ্যালঘুরা পৈত্রিক বাসভূমিতে থাকিবার ভরসা পায়, দেশত্যাগ করিতে না হয়।

(৩) শান্তি স্থাপনের জন্য গভর্নমেন্টের সকল প্রচেষ্টায় জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা চাই। যে সব অফিসার জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহে না এবং যাহারা সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিপরায়ণ বা অপদার্থ তাহাদিগকে দূর করা হোক।

(৪) দেশভক্ত প্রচারকদের সাহায্যে পুলিশবাহিনীর ভিতর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জাতীয়তার প্রচার হোক, দাঙ্গা দমনে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা হোক। তাহাদের ইউনিয়ন প্রভৃতি গঠনের অধিকার দিয়া তাহাদের গণতান্ত্রিক চেতনা বাড়ানো হোক।

(৫) শান্তি অভিযানে সাহায্যের জন্য সংবাদপত্রের উপর চাপ দেন। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রচারক কাগজ বয়কট করুন।

(৬) দাঙ্গাক্ষত বাংলা দেশে পাঞ্জাব প্রভৃতির আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য শিবির না খোলা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত সমর্থন করুন, কারণ দলবদ্ধ আশ্রয়প্রার্থী মারফত দাঙ্গার উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাব আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য টাকা, ঔষধপত্র ও লোক দিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করুন এবং মওলানা আজাদের প্রস্তাব মতো শান্তিমিশন প্রেরণের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করুন।

(৭) পূর্ববঙ্গ সরকার সর্বদলীয় শান্তি কমিটি গঠন করুন। পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিতে সকল দলের প্রতিনিধি লওয়া হোক। এই সব শান্তি কমিটিকে ক্ষমতা দেওয়া হোক যাহাতে তাঁহারা দাঙ্গা নিবারণ সম্পর্কে গভর্নমেন্ট ও পুলিশের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন ও পরামর্শ দিতে পারেন। এই কমিটি মারফতই রিলিফ সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা হোক। শান্তিসেনা ও গভর্নমেন্টের সাহায্যে তাঁহারাই পুনর্বসতির ব্যবস্থা করুন।

(৮) পূর্ববঙ্গে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডকে একক সুবিধা না দিয়া সর্বদলীয় শান্তিসেনা গঠিত হোক। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট শান্তিসেনার শিক্ষা, সরঞ্জাম প্রভৃতিতে সাহায্য করুন। পুলিশ উহাদের সহযোগিতা করুক। শান্তিসেনার ভিতর হইতে সশস্ত্র জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করা হোক। পুলিশের মতই শান্তিসেনাকেও তল্লাশী ও গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়া হোক। মফঃস্বলে শান্তিসেনা গঠনে উৎসাহ দিয়া, যেখানেই ঐরূপ বাহিনী গঠিত হইবে তাহাকে হোম-গার্ডের কাজ ও দায়িত্ব দেওয়া হোক।

(৯) সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে মাল আমদানি-রপ্তানী বিষয়ে উভয় গভর্নমেন্ট একটি যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং কেহ সে সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখুন।

(১০) উভয় বঙ্গেই কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের মিলিত শান্তি-মিশন জেলায় জেলায়

পরিভ্রমণ করুন। বিশেষ করিয়া পূজা ও ঈদের সময়ে ইহার ব্যবস্থা করা হোক।

(১১) সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হইলে তাহার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিবার দায়িত্ব উভয় গভর্নমেন্ট ঘোষণা করুন। সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের সুস্পষ্ট আইন রচিত না হওয়া পর্যন্ত উভয় রাষ্ট্রেরই সংখ্যালঘু অধিকার কমিটি গঠন করিয়া এ বিষয়ে দেখাশুনা করা হোক।

(১২) উভয় বঙ্গেই সরকারি বিভাগগুলিতে, বিশেষ করিয়া পুলিশ বিভাগে, উপযুক্ত সংখ্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অফিসার প্রভৃতি নিয়োগ করিয়া সংখ্যালঘুদের ভয় দূর করা হোক। যে সকল রেলওয়ে ও সরকারি কর্মচারী অবস্থা কি দাঁড়াইবে বুঝিতে না পারিয়া নিজ বাসভূমি ছাড়িয়া অপর বাংলায় আসিবেন বলিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আবার পুরাতন কর্মস্থলেই থাকিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদিগকে সে সুবিধা দেওয়া হোক।

(১৩) উভয় রাষ্ট্রেই কংগ্রেস লীগ সম্মিলিত মন্ত্রিমন্ডলী গঠিত হোক।

খাদ্য সম্পর্কীয় প্রস্তাব

পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে এবার আবার দুর্ভিক্ষের অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। উভয় সরকারেরই হাতে খাদ্যের স্টক শূন্য। উভয় বঙ্গেই রেশনিং বিপন্ন। কঠোর পরিশ্রমী মজুরদেরও রেশন কমানো হইয়াছে। আরও রেশন কমিবার ও রেশনিং ভাঙিয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের রেশনিং ব্যবস্থা শুধু যে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের জনসাধারণকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাই নয়, সমগ্র প্রদেশে চাউলের দর কমাইয়া রাখিয়াছে। রেশনের পরিমাণ কাটার সাথে সাথে কলিকাতা শহরের দিকেই চাউল আসিতেছে সারা প্রদেশে চাউলের দর বাড়িয়াছে, বহু লোক অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে থাকিতেছে। রেশনিং পড়িলে সমগ্র প্রদেশের জনসাধারণ ও রাষ্ট্র পর্যন্ত বিপন্ন হইবে।

পূর্ববঙ্গের অবস্থা

পূর্ববঙ্গের অবস্থা আরও খারাপ। পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ১২ লাখ লোকের মধ্যে ষাট লাখ লোকের জন্য রেশনিং রহিয়াছে, আর পূর্ববঙ্গে ৪ কোটি ৩৮ লাখ লোকের মধ্যে মাত্র ছয় লাখ লোকের রেশনিং আছে। তাহা ছাড়া চট্টগ্রাম নোয়াখালির সাংঘাতিক বন্যার ফলে সংকট আরও বাড়িয়াছে। কয়েক জায়গায় রিলিফ কিচেন খুলিতে হইয়াছে; শহরে শহরে দুস্থের ভিড় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। চাউলের দর ৪০ টাকা হইতে ৬০ টাকা, চট্টগ্রামের কোন কোন অঞ্চলে ১০০ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। এই সংকট প্রতিরোধ করিতে না পারিলে শুধু ব্যাপকভাবে অনাহার মৃত্যু হইবে তাই নয়, নবগঠিত রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হইবে, সাম্প্রদায়িক অশান্তি জ্বলিয়া উঠিবে।

খাদ্যের ঘাটতি নাই

অথচ দেশে এবার খাদ্য উৎপাদন কম হয় নাই। দুই বাংলা মিলাইয়া চাউলের দরকার ২৮ কোটি ৭০ লাখ মণ, সরকারি হিসাবে এবার উৎপন্ন হইয়াছে ২৯ কোটি ২৪ লাখ মণ।

নবগঠিত পূর্ববঙ্গে খাদ্যের বাড়তি রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১০ কোটি ১২ লাখ মণ খাদ্য দরকার। বাহির হইতে অল্প কিছু আমদানি হইয়াছে। আর এ বছর উৎপাদনের পরিমাণ গতবারের তুলনায় শতকরা সাড়ে নয় ভাগ বেশি; এবার উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ প্রায় দশ কোটি মণ। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গেও এবার খাদ্যের ঘাটতি নাই।

খাদ্যসংগ্রহ নীতি

কিন্তু দেশে খাদ্য থাকিলেও সাধারণ দেশবাসীর ঘরে খাদ্য নাই। খাদ্য মজুত রহিয়াছে মুষ্টিমেয় জোতদারের গোলায়, চাউলের চোরাকারবারীর গোপন গুদামে। এ বছর ১২/১৩ কোটি মণ চাউল বা ১৮ হইতে ২০ কোটি মণ ধান বাজারে আমদানির যোগ্য ছিল। কিন্তু বাংলা সরকার এক কোটি মণ চাউলও খরিদ করিতে পারে নাই। অথচ তাঁহারা আগেই যে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব লইয়াছিলেন, তাহার পরিমাণই মাসিক ৭০ হাজার টন বা বছরে দুই কোটি মণেরও বেশি। সরকারি খাদ্য সংগ্রহ নীতির এই শোচনীয় ব্যর্থতার ফলেই সমগ্র বাংলাদেশ আজ দুর্ভিক্ষের কবলিত।

সরকারি খাদ্যনীতির এই ব্যর্থতার কারণ এই— (ক) প্রথমত, প্রকৃতপক্ষে বাজারে যে পরিমাণ ধান আমদানি হইয়াছিল তাহাও খরিদ করিবার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা সরকার করিতে পারেন নাই। অসামরিক সরবরাহ বিভাগের আমলাতন্ত্র দুর্নীতির জন্য কুখ্যাত; অথচ তাহাদেরই উপর খাদ্য সংগ্রহের ভার ছিল; বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ ও জনসাধারণের দাবি সত্ত্বেও গণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয় নাই, সরকারি খরিদের জন্য নির্দিষ্ট ধানের দর খুবই কম ছিল; প্রতি জেলায় শুধুমাত্র কয়েকটি বড় বন্দরে সরকারি ক্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল; সেখানেও কার্যত খরিদের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। আর বন্দর হইতে দূরবর্তী বাজারে খরিদের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই।

(খ) দ্বিতীয়ত, জোতদার ও ব্যবসায়ীর ঘরের ধান চাউল সংগ্রহের কোনই ব্যবস্থা করা হয় নাই। বড় বড় জোতদারের হাতে এখন অনেক ধানের জমি; ভাগচাষীর মারফত উৎপন্ন ধানের অর্ধেক ইহাদের গোলায় মজুত হয়। অনেক স্থানে আবার এ জোতদারেরাই ধান চাউলের ব্যাপারী বা চাউলের কলের মালিক। কৃষকেরা বাজারে যে ধান আনে তাহাও ইহারা খরিদ করিয়া লয়। এইভাবে বৎসরের প্রথম কয়েক মাস গেলে এই জোতদার-ব্যবসায়ীদের হাতে দেশের সমস্ত খাদ্য মজুত হয়; অথচ ইহাদের নিকট হইতে খাদ্য সংগ্রহের জন্য কোন নীতি বা কর্মপন্থা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয় নাই। বরঞ্চ গতবারের তে-ভাগা ও টংক আন্দোলনের সময় পুলিশ হাজার হাজার কৃষকের ধান লুট করিয়া জোতদারের গোলায় তুলিয়া দিয়াছে। দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ ও আমলার সাহায্যেই চোরাবাজার চলিয়াছে।

(গ) গ্রামাঞ্চলে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস সরবরাহের ব্যবস্থা একেবারে বানচাল হইয়া গিয়াছে।

নূতন সরকারের প্রচেষ্টা

এখানে উভয় বাংলার নূতন গভর্নমেন্ট গঠিত হইয়াছে। উভয় সরকারই খাদ্য সংকটের সমাধানের জন্য খাদ্য সংগ্রহে তৎপর হইয়াছেন, মন্ত্রীরা জেলায় জেলায় যাইয়া ধান চাউল

খরিদের চেষ্টা করিতেছেন। ধানের দাম প্রভৃতি সম্পর্কে কিছুটা ব্যবস্থা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলী প্রাদেশিক খাদ্য সম্মেলন ডাকিয়া সর্বদলীয় খাদ্য পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন করিয়াছেন এবং জেলায় জেলায় অনুরূপ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে কয়েকটি জেলায় খাদ্য সম্মেলন হইয়াছে এবং খাদ্য সংগ্রহ সপ্তাহ ঘোষিত হইয়াছে। উভয় সরকারই মজুত ও দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান পরিচালনার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলন উভয় সরকারের এই নূতন খাদ্যনীতির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

নানা চক্রান্তজাল

চোরাকারবারীর দল আজ কতকটা কোণঠাসা হইলেও তারা পরাস্ত হইয়াছে বা সহজে পরাস্ত হইবে ইহা মনে করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। তাহারা মজুত চাউল স্বেচ্ছায় সরকারের নিকট বিক্রয় করিবে না। ইতিমধ্যেই সরকারি নীতি বানচাল করিবার জন্য ও জনতার অভিযান বিপর্যস্ত করিবার জন্য তাহারা নানাভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বাড়তি এলাকার দর বাড়াইয়া দিয়া তাহারা বাড়তি ও ঘাটতি এলাকার মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করিতেছে! সরকার ধান আনিয়া দিলেও বয়লার খারাপ ইত্যাদি নানা অছিলায় মালিকেরা ধান ভাঙানো বন্ধ রাখিতেছে। বড় সরকারি আমলারা অসামরিক সরবরাহ বিভাগের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানকে বানচাল করার চেষ্টা করিতেছে। মালিকেরা নানা জায়গায় মজুরদের রেশন সরবরাহ সাময়িক বন্ধ করিয়া শিল্প উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। আমলারা স্টীল ব্রাদার্স, চা বাগানের মালিক প্রভৃতি বড় বড় ধনিকদের চাউল সংগ্রহের পারমিট দিতেছে। তা ছাড়া খাদ্য অভিযানের কর্তৃত্ব আমলাতন্ত্রের হাতে রাখার প্রাণপণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সরকারি আমলারা অনেকেই মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত জনসাধারণের সহযোগিতা কার্যকরী করার পথে বাধা দিতেছে। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে উপদলীয় বিরোধও কায়েমী কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। কোন কোন ছোট ছোট দল কায়েমী স্বার্থের কুচক্রে পড়িয়া খাদ্য সংকটের অজুহাতে জনসাধারণকে অশান্তির পথে প্ররোচিত করিতেছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন এই সমস্ত কারণে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং আসন্ন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য উভয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

আসন্ন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের পথ

(ক) প্রতি জেলায় ও এলাকায় সকল গণ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া এখনই খাদ্য পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন করুন। পূর্ববঙ্গে প্রাদেশিক খাদ্য পরামর্শদাতা বোর্ডও গঠিত হইবে।

(খ) পূর্ববঙ্গ সরকার ১লা অক্টোবর হইতে ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত স্বেচ্ছামূলক খাদ্য সংগ্রহ সপ্তাহ ঘোষণা করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বেচ্ছায় ধান বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছে এবং জেলায় জেলায় অভিযান চালাইতেছে। এই স্বেচ্ছামূলক অভিযানের ফলে যথেষ্ট খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা কম। উভয় বাংলায় বাধ্যতামূলকভাবে বাড়তি মজুত উদ্ধারের জন্য ৭ই অক্টোবরের পরই 'বাড়তি মজুত উদ্ধার পক্ষ'' ঘোষণা করা হোক।

(গ) উভয় বাংলাতেই সর্বদলীয় ভলান্টিয়ারবাহিনী বা শান্তিসেনাকে মজুত উদ্ধারের ক্ষমতা দিতে হইবে এবং পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীরা যাহাতে তাহাদের এই কাজে সহায়তা করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদের কর্ডন পাহারা ও রক্ষার ক্ষমতা দিতে হইবে।

(ঘ) এখনই চোরাকারবারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া আইন করিতে হইবে। যে সকল চাউলের সকল খাদ্যনীতি সফল করার কাজে সহযোগিতা করিবে না, সেগুলি রিকুইজিশন করিতে হইবে।

(ঙ) খাদ্যবোর্ড বা কোন গণ-প্রতিষ্ঠানের মারফৎ অভিযোগ পাইলে তৎক্ষণাৎ যে কোন পদের সরকারি কর্মচারীকে তদন্তসাপেক্ষে কর্মচ্যুত করিতে হইবে।

(চ) ধানের দর ৮ টাকা ধার্য করিয়া সরাসরি নগদ মূল্যে কৃষকদের নিকট খরিদ করিতে হইবে।

(ছ) ধান খরিদের এলাকায় এবং সকল ঘাটতি এলাকায় সাধারণের জন্য প্রয়োজনমত কনট্রোল দরে ধান সরবরাহ, রিলিফ, কর্জ্জা প্রভৃতির জন্য ধান সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষকদিগকে কাপড়, খইল, সার অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করিতে হইবে।

(জ) মজুর শ্রেণী অর্ধাশনে থাকিয়াও বর্তমান রেশন কাটা মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু রেশন সরবরাহের দুর্নীতি ও অব্যবস্থার ফলে মিলের কাজ বন্ধ হইতেছে, উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইতেছে। অবিলম্বে এই দুর্নীতি বন্ধ করিতে হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব মজুরশ্রেণীর পুরা রেশন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঝ) পূর্ববঙ্গের সমস্ত জেলার শহরগুলিতে যত শীঘ্র সম্ভব রেশনিং চালু করার ব্যবস্থা কারতে হহবে।

আগামী বৎসরের খাদ্যনীতি

এই সম্মেলন উভয় বাংলার সরকারকে আরও স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে এখনই আগামী ফসল সংগ্রহ করিবার জন্য খাদ্যনীতি নির্ধারণ ও ঘোষণা না করিলে আগামী ফসলও মজুতদারের কবলিত হইবে। তাহারা এখনই কনট্রোল-বিরোধী মনোভাব সৃষ্ট করিতেছে; স্বাধীন ব্যবসায় চালু করিলে খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে, ইহার প্রচার চালাইতেছে। পদস্থ সরকারি আমলারা ভারত সরকারের খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আক্রমণ করিতেছে। আগামী ফসল এবারের তুলনায় কম হইবে। সারা ভারতে আগামী বছরও খাদ্যের ঘাটতি থাকিবে, ইহা একরূপ নিশ্চিত। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা দুনিয়ায় কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে।

অবিলম্বে ব্যবস্থা চাই

তাই এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে, অবিলম্বে নিম্নলিখিত ভিত্তিতে স্থায়ী খাদ্যনীতি ঘোষণা করা হোক—

(ক) সর্বদলীয় সহযোগিতা, ভলান্টিয়ার বাহিনীর ক্ষমতা, আমলাতন্ত্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইন ও খাদ্য ফসল বৃদ্ধির ব্যবস্থা কায়েমী করিতে হইবে।

(খ) বৎসরের প্রথম তিন মাসের মধ্যেই সরাসরি কৃষকের নিকট হইতে ধান সংগ্রহের জন্য খাদ্য কমিটির ও শান্তি-সেনার তত্ত্বাবধানে প্রতি হাটে বাজারে সরকারি কর্মচারী মারফত ধান খরিদ করিতে হইবে। প্রতি বড় হাটে ক্রয় কেন্দ্র ও গুদামের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) ধানের দর ৮ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং তাহার কম বা বেশি দরে ধান বিক্রয় বা খরিদ অপরাধ বলিয়া আইন করিয়া দিতে হইবে। রেশনের দাম কমাইয়া ১৫ টাকা করিতে হইবে। পুরা রেশন দিতে হইবে।

(ঘ) সর্বদলীয় খাদ্যবোর্ডের সহযোগিতায় বাড়তি মজুত ধান বা চাউল আছে এরূপ জোতদার মজুতদারের তালিকা তৈয়ার করিতে হইবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বাড়তি মজুত সরকারের নির্দিষ্ট দরে সরকারের কাছে বিক্রয় না করিলে উহা বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে। যাহাদের ২৫ বিঘার কম জমি তাহাদের এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(ঙ) এই উদ্দেশ্যে বিশেষ পৃথক আইন করিয়া ক্রেতা বিক্রেতা সমবায় গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কৃষকদিগকে কাপড়, খইল, সার ইত্যাদি সুবিধায় সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(চ) অভাবের সময় কৃষক যাহাতে কর্জ্জা, রিলিফ বা কনট্রোল দরে ধান পায় তাহার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিতে হইবে।

দুর্ভিক্ষের প্রকৃত সমাধান

সাম্রাজ্যবাদী ভূমিব্যবস্থাই বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষকে একটি স্থায়ী সমস্যা করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য এই সম্মেলন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, পতিত জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন, কৃষির উন্নতি, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য অবিলম্বে আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছে।

খাদ্যসংগ্রহ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা

খাদ্যের জন্য আজ যে গণসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে তাহাই পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তির ভাগ্য নির্ধারণ করিবে। এই সম্মেলন সমস্ত পার্টি ইউনিট ও জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছে— আগামী দুই মাস সারা বাংলায় খাদ্যের জন্য অভূতপূর্ব গণসমাবেশ ও বাড়তি-মজুত-উদ্ধার অভিযান পরিচালনার শপথ গ্রহণ করুন। এ লড়াই আগের সব লড়াইয়ের চেয়ে বড় হইবে। কারণ ইহার মধ্যে থাকিবে সর্বদলীয় ঐক্য, সাথে থাকিবে মন্ত্রিমণ্ডলীর সহযোগিতা। সর্বদলীয় ভলান্টিয়ার দল গঠন করুন, বাড়তি মজুত খুঁজিয়া বাহির ও উদ্ধার করুন, কর্ডন ব্যবস্থা করুন শহরে ও গ্রামে মিছিল ও সমাবেশ করুন এবং এই পথে কায়েমীস্বার্থের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া গ্রামবাসীকে বাঁচান, রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলুন।

ভূমি সমস্যা

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ চাই : কৃষকের হাতে জমি চাই

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহাদের স্বেচ্ছাচারী শাসন ও শোষণ কায়েম রাখার জন্যই বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিল। উভয় বাংলাতেই আজ যে চিরদুর্ভিক্ষ কায়েম হইয়াছে, তাহার

মূলে রহিয়াছে জমিদারি প্রথা। ইহার ফলেই পুরোনো সেচ ও জলনিকাশ ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ৪০ লাখ একর আবাদযোগ্য জমি পতিত রহিয়াছে, মান্ধাতা আমলের কৃষি ব্যবস্থা বহাল রহিয়াছে, একর প্রতি চাউলের উৎপাদন কমিতে কমিতে দশ মণ হইয়াছে। এই জমিদারি ব্যবস্থার ফলেই বাংলাদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর আসিয়াছে এবং চোরাকারবার ও মজুতদারীর অত্যাচারে বাংলার সেই কৃষি ব্যবস্থা এবং সমাজ ও অর্থনীতি ভাঙিয়া প্রায় চুরমার হইয়া গিয়াছে। বাংলার পুনর্গঠন ও নবনির্মাণের জন্য জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ আজ অপরিহার্য।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে সাথে নিপীড়িত জনসাধারণের মনে নবীন আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে লীগের হাতে এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের হাতে শাসনের ভার আসিয়াছে। কংগ্রেস তাহার নির্বাচনী ইস্তাহারে এবং বাংলার লীগ তাহার নির্বাচনী প্রচারে জমিদারি উচ্ছেদে প্রতিশ্রুত। আগের মন্ত্রীমণ্ডলী জমিদারি উচ্ছেদের বিল আইনসভায় পেশ করিয়াছিল। তাই আজ কোটি কোটি অন্নহীন জমিহারা কৃষক আশা করিতেছে, এখন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হইবে চাষী তাহার জমি ফিরিয়া পাইবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলন উভয় বাংলার সরকারের নিকট দাবি করিতেছে যে অবিলম্বে বাংলার জমি, জমা, নদনদী, জলা, বিল, খনিতে জমিদারি ও সর্বপ্রকার মধ্যস্বত্বের উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং তাহার জন্য উভয় আইন সভার আগামী অধিবেশনেই জমিদারি উচ্ছেদ বিল উপস্থিত করিয়া ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বেই জমিদারি উচ্ছেদের বিল আইনে পরিণত করিতে হইবে।

জমি আসিবে কৃষকের হাতে, ইহাই জমিদারি উচ্ছেদের মূল কথা। এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে নিম্নলিখিত নীতিগুলি ন্যূনতম ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া জমিদারি উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করিতে হইবে—

(ক) কোন পরিবারের ২৫ একরের বেশি আবাদী বা আবাদযোগ্য জমি থাকিতে পারিবে না। এখন যে সকল জমিদার জোতদারের নিজ দখলে ইহার বেশি জমি আছে তাহা রাষ্ট্রের হাতে আনিয়া ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের মধ্যে পুনর্বন্টন করিয়া দিতে হইবে।

(খ) জমিদারি, তালুকদারী, আধিবর্গা, ভাগচাষ, চুক্তিভাগ, ধানি খাজনা প্রভৃতি ধরনের জোতদারী ও সকল প্রকারের মধ্যস্বত্ব বিলুপ্ত করিতে হইবে। কোন অকৃষকের হাতে চাষের জমি থাকিবে না; তবে যিনি নিজ জোতে চাষের সমস্ত খরচ বহন করিয়া চাষ করিবেন তিনি অনধিক ২৫ একর পর্যন্ত নিজ দখলের জমি চাষ করিতে পারিবেন।

(গ) যে সকল মধ্যবিত্ত অবস্থার ভূমি স্বত্বভোগীদের জীবিকা নির্বাহ জমিদারি উচ্ছেদের ফলে বিপর্যস্ত হইবে, তাহাদের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য সরকারি ভাতা এই সম্মেলন সুপারিশ করিতেছে। এই ভাতার পরিমাণ অবস্থানুযায়ী ঊর্ধ্বপক্ষে বাৎসরিক ৫০০ টাকা এবং সাহায্যকাল ঊর্ধ্বপক্ষে দশ বছরের বেশি হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মেলনও জমিদার মধ্যস্বত্বভোগীদের কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতির তীব্র বিরোধিতা জানাইতেছে। ইহাদের ক্ষতিপূরণ পাইবার কোনরূপ অধিকার বা প্রয়োজন নাই; ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে অর্থনীতির উপর যে চাপ পড়িবে তাহাতে রাষ্ট্রের নবনির্মাণ ব্যাহত হইবে।

(ঘ) রাজস্ব, নগদ ও ফসলে খাজনার ব্যবস্থা ও আধিপ্রথা তুলিয়া দিয়া ভূমি-কর এমন ভাবে প্রবর্তন করিতে হইবে যাহাতে ভূমি হইতে আয়ের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য হইবে

এবং ভূমির আয়ে যাহাদের সংসার চলে না বা কোনমতে চলে তাহাদের কর হইতে মুক্তি দিতে হইবে।

(চ) জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ার ফলে কৃষির অবনতি হইতেছে। তাহার প্রতিকারের জন্য পুনর্বন্টন করিতে হইবে।

(ছ) কৃষি সমবায়ের মারফত চাষ ও উন্নত ধরনের কৃষি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(জ) উভয় বাংলার জমি-জমা, বন্যা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষার জন্য নদী নালা খাল বিল সংস্কার ও সেচের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঝ) নদ, নদী, জলা প্রভৃতিতে মৎস্যজীবীদের অবাধ মাছ ধরার অধিকার দিতে হইবে।

ইতিমধ্যে এই মুহূর্তের সমস্যা সমাধানের জন্য জরুরি আইন এখনই দরকার। বাংলাদেশে খাদ্যের ঘাটতি থাকে। এখনই খাদ্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করিলে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে দেশবাসীকে বাঁচানো যাইবে না। তাহার জন্য সেচব্যবস্থা, সার, বীজ, বলদ প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা, উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও উন্নত কৃসি শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সম্মেলন অবিলম্বে সর্বদলীয় জন সাধারণের সহযোগিতায় এই সকল ব্যবস্থা করা হউক ইহা দাবি করিতেছে।

কিন্তু খাদ্যফসল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা যে এতদিন সফল হয় নাই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ বর্তমান ভূমি-ব্যবস্থা। আধিপ্রথা, টংক, গুলা প্রভৃতি ফসলে খাজনার ব্যবস্থা একদিকে মজুতদারী ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে এবং অন্যদিকে উৎপাদন কমাইয়া দিতেছে। জমিদার জোতদারেরা উচ্ছেদ, কর্জ্জাবন্ধ, বে-আইনি আদায় ও জুলুম করিয়া ভাঙা কৃষিব্যবস্থাকে আরও বিকল করিয়া দিতেছে। উপযুক্ত মজুরির অভাবে ক্ষেতমজুরেরা ধ্বংস হইতেছে অথবা গ্রাম ছাড়িতে বাধ্য হইতেছে।

এই সব কারণে এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে অবিলম্বে নিম্নলিখিত জরুরি আইনগুলি অর্ডিন্যান্স আকারে প্রণয়ন করা হউক—

(১) ভাগচাষীর জন্য তে-ভাগার আইন পাশ করিতে হইবে।

(২) ফসল খাজনা রহিত করিয়া চলতি হাতের নগদ খাজনা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে; খাজনার হার কমাইতে হইবে। নানকার প্রথার অবসান ও হদ বেগারী প্রভৃতি বেআইনি ঘোষণা করিয়া নানকার প্রজাদের ভূমিস্বত্ব দিতে হইবে।

(৩) বাকী খাজনা মুকুব করিতে হইবে এবং তাহার ডিক্রি নীলাম প্রভৃতি নাকচ করিতে হইবে। সমস্ত হাজা, মজা, বালিচাপা ও বেসা জমির খাজনা রেহাই দিতে হইবে।

(৪) সব পতিত জমি ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের মধ্যে বিলি করিতে হইবে এবং চাষের জন্য সরকারি সাহায্য দিতে হইবে।

(৫) কৃষকদিগাকে জমিতে কায়েমী স্বত্ব দিতে হইবে এবং জমি হইতে উচ্ছেদ স্থগিত করিতে হইবে।

(৬) কৃষকদিগাকে কর্জ্জ সরবরাহের জন্য এলাকায় এলাকায় সরকারি গোলা (grain bank) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৭) কৃষি মজুরদের নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

এই সম্মেলন দেশের কৃষকশ্রেণি ও জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে ক্ষমতা আসিয়াছে সত্য; কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরও সৃষ্ট পুরাতন শক্তি সমূহ তাহাদের অনুচর জমিদার জোতদার কায়েমী-স্বার্থ এখনও প্রবল শক্তিশালী রহিয়াছে এবং এক দিকে তাহারা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে ও অন্য দিকে জনপ্রতিনিধিদের হাত হইতে ক্ষমতা হস্তগত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। বাংলার কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে তাহাদের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। আমলাতন্ত্র কায়েমী স্বার্থের সহিত সংযুক্ত। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ইহারা উপদলীয় চক্রান্ত বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধী উস্কানি দিতেছে।

অন্যদিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে সাথে বাংলার জনসাধারণের মধ্যে এক অপূর্ব শুভপ্রেরণা জাগ্রত হইয়াছে। জনতার সমাবেশ সাম্প্রদায়িক অশান্তি প্রতিরোধে সর্বদলীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীকেই সেই পথে টানিয়া লইয়াছে, দাঙ্গাকে স্তব্ধ করিয়াছে! জনতার অভিযান মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি অনেকটা সঠিক খাদ্যনীতির দিকে আনিয়াছে।

এই সম্মেলন জনতার এই অভিযানকে অভিনন্দন জানাইতেছে এবং আবেদন করিতেছে—

(ক) সকলের খাদ্য ও কৃষকের হাতে জমির জন্য কৃষক ও অকৃষকের সুদৃঢ় ঐক্য গড়িয়া তুলুন।

(খ) প্রতি জেলার ও দুইটি প্রদেশের নবনির্মাণের জন্য কিরূপ নূতন ভূমি ব্যবস্থা প্রয়োজন তাহার বাস্তব পরিকল্পনাদির দ্বারা সরকারকে সাহায্য করুন।

(গ) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বাস্তব পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়া তাহা কাজে পরিণত করুন।

(ঘ) জেলায় জেলায় এবং উভয় প্রদেশে জেলা ও প্রাদেশিক সর্বদলীয় জমিদারি উচ্ছেদ সমাবেশ সংগঠিত করিয়া খাদ্য ও নূতন ভূমিব্যবস্থার দাবিকে অমোঘ করিয়া তুলুন।

এই সম্মেলন বাংলার তে-ভাগা সংগ্রাম, টংক রদ, নানকার প্রথা অবসান ও অন্যান্য গণ সংগ্রামের জন্য বাংলার সংগঠিত কৃষকশ্রেণিকে অভিনন্দিত করিতেছে। তে-ভাগার সংগ্রাম জমিদারি জুলুম ও জমিদারি প্রথার মৃত্যুপরোয়ানার স্বাক্ষর করিয়াছে। এখন জমিদারি উচ্ছেদের জন্য সমগ্র কৃষকশ্রেণিকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করুন, অকৃষক দেশভক্তদের সমর্থন সংগঠন করুন। সর্বদলীয় ঐক্য ও সমাবেশ গড়িয়া তুলিয়া জমিদারি উচ্ছেদ সম্পূর্ণ করুন। ইহার জন্য সম্মেলন বাংলার জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানাইতেছে।

শিল্পজাতীয়করণ ও সমবায়

ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমাদের দেশের শিল্প পুনর্গঠন করা আশু প্রয়োজন। ইহার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করিতে হইবে। বৃটিশ শাসনের অবদান হিসাবে আমরা যে অর্থনীতি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের দেশের শিল্পের প্রসার চূড়ান্তভাবে ব্যাহত রাখা হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান শিল্পগুলির উপর বৃটিশ মূলধন আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। উপরন্তু শিল্পব্যবস্থায় যতটুকু প্রসার হইয়াছে সেখানে চলিয়াছে আমাদের দেশের সম্পদ ও মানুষের অবাধ শোষণ। জনসাধারণের স্বার্থকেও এইসব

মালিকেরা চূড়ান্তভাবে উপেক্ষা করিয়াছে।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রাম্য অর্থনীতির একটি প্রয়োজনীয় অংশ কুটীর ও কারুশিল্পকে আগাগোড়া অবহেলা করা হইয়াছে। ফলে আজ ইহারা ধ্বংসের পথে। যুদ্ধের সময়ে এই অবস্থা চরমে উঠিয়াছিল। কি দেশী, কি বিদেশী মালিক সকলেই দুর্নীতিকে মূলধন করিয়া দুই হাতে মুনাফা লুটিয়াছে। যুদ্ধ মিটিয়াছে, কিন্তু আমাদের প্রধান প্রধান শিল্পগুলির মাথায় বসিয়া আছে সমাজবিরোধী কাজে যাহারা হাত পাকাইয়াছে সেই সব মুনাফাখোর একচেটিয়া শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর দল।

ইহাদের লোভের অন্ত নাই। মুনাফার পাহাড় বাড়াইতে গিয়া ইহারা উৎপাদনে বিশৃঙ্খলা আনিয়াছে, শিল্প বিস্তারকে সংকুচিত করিয়াছে, শিল্প ও ব্যবসায় পরিচালনায় নিজেদের অযোগ্য প্রমাণ করিয়াছে। সর্বোপরি শ্রমিকদের জীবনধারণের নিম্নতম মজুরি দিতেও ইহাদের ঘোরতর আপত্তি। এমনিভাবে কয়লা, বস্ত্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে ইহাদের নীতি চরম সংকট আনিয়াছে।

তাই জনসাধারণের স্বার্থে এবং শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রয়োজন প্রধান প্রধান শিল্পগুলিতে বে-সরকারি মালিকানা অবসান করিয়া সেইক্ষেত্রে সরকাবি মালিকানা কায়েম করা অর্থাৎ জাতীয়করণ। ইহাই হইল জাতীয় পুনর্গঠনের প্রাথমিক ধাপ। এই পথেই সরকার জিনিষপত্রের দাম কমাইতে পারিবেন, এই নীতি গ্রহণ করিলেই রাষ্ট্রের আয় বাড়িবার নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হইবে।

পশ্চিমবাংলার প্রধান সমস্যা হইল আমাদের মূল শিল্পগুলিকে, বিশেষ করিয়া বিদেশী মূলধনে পরিচালিত শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা। এই হিসাবে পাট, বস্ত্র, লৌহ, ইস্পাত, কয়লা, চা প্রভৃতি শিল্প এবং ট্রাম, গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতি জনকল্যাণ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এখনই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রের পক্ষে এইগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে যদি যুক্তিসঙ্গত ভাবে কিছুটা দেরি হয়, তবে এইগুলিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনিতে এতটুকু দেরি করা চলিবে না। পরিকল্পনার ভিত্তিতে উৎপাদনের উন্নততর ব্যবস্থা, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের মজুরি এবং জীবনধারণের মান বাড়াইবার জন্য এই আশু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

পূর্ববঙ্গের প্রধান সমস্যা হইল নতুন নতুন মূল শিল্প গড়িয়া তোলা। কিন্তু এই সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া যুদ্ধে ফাঁপিয়া-ওঠা অর্থপতিদের কিংবা বিদেশী মূলধনের হাতে মূল শিল্প গড়িয়া তোলার উদ্যোগ এবং নিয়ন্ত্রণ ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। হয় সরকার নিজ হাতে এই সব শিল্পের গোড়াপত্তন করিবেন অথবা এইগুলি চালু করিবার ব্যবস্থা অন্যের হাতেও দিতে পারেন, কিন্তু সেই অবস্থায় কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিবে সরকারের হাতে।

জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত এবং সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সমস্ত শিল্পেই প্রত্যেকটি কারখানায় শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া যুক্ত পরিচালনা বোর্ড গঠন করিতে হইবে। দেখিতে হইবে এই সব বোর্ডে যেন শ্রমিকদের এবং ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব থাকে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিল্প সংগঠন এবং বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমবায় পদ্ধতিতে অন্যান্য শিল্প এবং কুটির শিল্পে যথাসম্ভব বিস্তার সাধন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিল্প সমবায় গঠন করিয়া নামমাত্র সুদে ঋণদান এবং সস্তাদরে মালমসলা এবং যন্ত্রপাতি

সরবরাহের নিশ্চিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। উভয় বাংলার তাঁতশিল্পের প্রতি বিশেষত ঢাকা ও শান্তিপুরে— আশু নজর দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া আধুনিক শিল্পে অনুন্নত পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে সমবায় ব্যবস্থায় প্রবর্তন অত্যন্ত জরুরি।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য চাই জিনিষ পত্রের সহজ চলাচল, বিস্তৃত বাজার। কিন্তু আজ সহজ চলাচলের পথ বন্ধ, দুর্নীতি সেখানে মস্তবড় বাধা। মুনাফাখোরী, চোরাবাজার আজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ না পাইয়া চারিদিকে হাহাকার, অথচ সে সব জিনিষ মজুতদারের কুক্ষিগত। এই সবের হাত হইতে রেহাই পাইতে হইলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত ক্রেতাদের কোঅপারেটিভ গঠন করিতে হইবে, পূর্ববাংলার জেলাগুলিতে ত' এই ব্যবস্থা অপরিহার্য।

বর্তমানে যে সমস্ত কোঅপারেটিভ সংগঠনগুলি আছে সেগুলি যে শুধু সংখ্যায় কম তাহা নহে, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও আমলাতান্ত্রিক কর্মচারী সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে গত কয় বৎসরে কোঅপারেটিভ গঠন প্রচেষ্টা অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাই কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলির কাঠামো সম্পূর্ণ নূতনভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, জনপ্রিয় সংগঠনগুলি এবং সাধারণ মানুষ যেন এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া কোঅপারেটিভগুলির গঠনে এবং পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, এবং সব ক্ষেত্রেই এইগুলির পরিচালনা ও নেতৃত্ব জনসাধারণের আস্থাভাজন নেতাদের হাতে থাকে।

জনস্বাস্থ্যের পুনর্গঠন

দুইশত বৎসরের প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসন অর্থনৈতিক অগ্রগতি শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রত্যেকটি দিক হইতে বাংলা এবং বাঙালীকে যেমন পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে— জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও একই অপদার্থ এবং উদাসীন নীতি চালু রাখিয়া বাঙালীকে একটি ক্ষয়িষ্ণু জাতিতে পরিণত

বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া রোগে মারা যায়। দুর্ভিক্ষের সময়ে এই মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া সাড়ে সাত লক্ষে পৌঁছিয়াছিল। গড়ে প্রতি বৎসর প্রতি তিন হাজার মানুষের মধ্যে এক জনের বসন্ত রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। ১৯৪৩ সনে ২১৭০০ জন লোক একমাত্র কলেরা রোগে মরিয়াছে। ১৯৪৪ সনে এই সংখ্যা কমিয়া ৪০০০০ হইলেও গড়পড়তা বাৎসরিক মৃত্যুর হার একটি অস্বাভাবিক উচ্চ স্তরেই রহিয়াছে। পৃথিবীর আর কোন সভ্য দেশে এই সব প্রতিরোধযোগ্য রোগের মহামারি নাই। বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটিও কলেরা রোগের নজির নাই।

বাংলাদেশে প্রতি হাজার শিশু মৃত্যুর হার ১৬৬। ইংরেজের দেশে এই হার ৫৮ এবং আমেরিকায় মাত্র ৫৪। বাংলায় মৃত্যুর হার হাজার করা ২২। ইংরেজের দেশে এই হার ১২.৪ এবং আমেরিকায় মাত্র ১১.২। বাংলাদেশে প্রসবকালীন মৃত্যুর গড়পড়তা বাৎসরিক সংখ্যা প্রায় ১৫০০০ এবং যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। পৃথিবীর আর কোন সভ্য দেশে এই শোচনীয় দূরবস্থার কোন তুলনা নাই। বাংলায় গড়পড়তা আয়ুর হার মাত্র ২৩ বৎসর। আমেরিকায় এই হার ৬০.৫ বৎসর এবং ইংরেজের নিজের দেশে ৬৩ বৎসর।

বাংলায় রেজিস্ট্রীকৃত ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ১৫০০০ এর সামান্য কিছু বেশি। অর্থাৎ

জনসংখ্যার প্রায় ৮ হাজারের জন্য মাত্র ১ জন ডাক্তার। ইংল্যান্ডের প্রতি হাজার মানুষে ১ জন ডাক্তার এবং আমেরিকায় প্রতি ৭৫০ জনে একজন। ডাক্তারদের মধ্যেও শতকরা প্রায় ৮০ জন শহর অঞ্চলে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ফলে বাংলার পল্লী অঞ্চলের জনতার ভাগ্যে গড়পড়তা প্রায় ১৯/২০ হাজার মানুষের জন্য মাত্র ১ জন পাশ করা ডাক্তার জুটিতেছে।

বাংলায় শিক্ষিতা নার্সের সংখ্যা মাত্র ২০০০। অর্থাৎ প্রতি ৩০ হাজার মানুষের জন্য মাত্র একজন নার্স। ইংরেজের দেশে এই হার প্রতি শত মানুষে একজন। পল্লী অঞ্চলে রোগ নিরোধের কাজে নিযুক্ত টিকাদাতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাস্থ্যবিভাগের উচ্চতম দপ্তরে নিয়োজিত সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মচারী সংখ্যা ১৯৩৯ সনের হিসাবমত মাত্র ৩৬৬৩ জন। এই সংখ্যা অবশ্য কিছুটা বাড়িয়াছে— কিন্তু সমস্যার তুলনায় তাহা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

সমগ্র বাংলায় মাত্র ৩টি ডাক্তারী কলেজ এবং ৯টি স্কুল আছে। বঙ্গভঙ্গের পর মাত্র ৩টি স্কুল এব ঢাকার নূতন কলেজটি ছাড়া বাকি সবগুলি প্রতিষ্ঠানই পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। এই সবগুলি প্রতিষ্ঠান মিলিয়া প্রতিবৎসর গড়ে মাত্র ৫৫০ জন চিকিৎসক তৈয়ারি করিয়া থাকে। সারা প্রদেশে মাত্র ১৮টি হাসপাতালে নার্সিং শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়া গড়ে প্রতি বৎসর মাত্র ৬০ জন শিক্ষিতা নার্স বাহির হইয়া থাকে।

১৯৩৯ সনে সারা বাংলায় হাসপাতালে বেড-এর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬১৮৯ অর্থাৎ প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য মাত্র একটি বেড, ইংরেজের দেশে প্রতি ১ হাজার মানুষের জন্য ৭.১৪টি বেড এবং আমেরিকায় ১০.৪৮টি বেড আছে। ১৯৪৩-৪৪ সনের মহামারির প্রবল হামলার পর কতগুলি জরুরি হাসপাতাল খুলিয়া ২২৫০০ সাময়িক বেড-এর ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অধিকাংশই এখন আবার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন ধরনের সরকারি এবং আধা সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা মাত্র ১২১৪টি অর্থাৎ ৩০ হইতে ৪০ হাজার মানুষের এবং প্রায় ৩/৪টি ইউনিয়ন এলাকার জন্য মাত্র একটি চিকিৎসালয়।

এমনি করিয়া ২ শত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদী কুশাসন সারা বাংলাকে স্বাস্থ্যসম্পদহীন একটি রোগ ও মহামারির ডিপোতে পরিণত করিয়াছে। একদিকে জনতার চরম দারিদ্র্য তাহাদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। অন্যদিকে রোগ নিরোধ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত আমলাতান্ত্রিক উদাসীন ও দায়িত্বহীন নীতি সারা বাংলাকে মহামারি ও মৃত্যুর একটি সহজ শিকার করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে ম্যালেরিয়া ও কলেরা প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাধিকে সমাজ জীবন হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব হইয়াছে— বাংলায় তাহারই মহামারি দেখা দেয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা প্রণালীর সর্ববিধ সুবিধা হইতে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। ঔষধের মান নির্ণয় ও প্রস্তুত সংক্রান্ত কোন সরকারি নীতি এবং প্রচেষ্টা না থাকায় ঔষধের জন্য বাংলাকে প্রধানত বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। ঔষধের দুষ্প্রাপ্যতা এবং চড়া দাম জনতার মাথায় একটি দুঃসহ বোঝা স্বরূপ চাপিয়া আছে। জনস্বাস্থ্যের জন্য গড়পড়তা মাথাপিছু খরচের হিসাব হইতেই সাম্রাজ্যবাদী আমলাতান্ত্রিক নির্লজ্জ নীতির সমগ্র চেহারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বাংলার জনস্বাস্থ্যের খাতে মাথাপিছু গড়পড়তা বাৎসরিক সরকারি খরচের হার মাত্র ১ আনা ৭ পাই। ইংল্যান্ডের ১৯৩৪-৩৫-এর বাজেটে এই হার ছিল ৫৪ টাকা ৮ আনা ১১ পাই। আমেরিকার ১৯৩৮ সনের বাজেটে এই ব্যয় বরাদ্দের হার ছিল ৫১ টাকা ৬ আনা।

সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসনের এই বিভীষিকা কাটিয়া ১৫ই অগস্ট হইতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। বাংলা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও উভয় অংশেই জনসাধারণের নেতাগণ শাসন ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সমৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে জনসাধারণের যে অপরিসীম ক্ষুধা সাম্রাজ্যবাদী এবং তাহার অনুচরবৃন্দ এতদিন জোর করিয়া চাপা দিয়া রাখিয়াছে— ১৫ই আগস্টের দেশব্যাপী বিরাট গণ অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়া আমরা তাহারই চেহারা এবং সেই পথের সমস্ত বাধা চূর্ণ করিবার বলিষ্ঠ সঙ্কল্পের প্রকাশ দেখিয়াছি! জনতার এই উদ্দীপনাই জনপ্রিয় মন্ত্রিসভাগুলির হাতে প্রধান হাতিয়ার। উভয় বঙ্গেই জনপ্রিয় সরকারকে এই হাতিয়ার লইয়া জনস্বাস্থ্যের সর্বাঙ্গীন পুনর্গঠনের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভোরা কমিটি এই বিষয়ে যে নীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহাই জাতীয় জনপ্রিয় সরকারের সমূহের আদর্শ করিতে হইবে। ভোর কমিটি বলিয়াছিলেন যে জনস্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেশের সরকারের, এবং একটি মানুষও যাহাতে জাতি, ধর্ম অথবা দারিদ্র্যের কারণে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার কোন সুবিধা হইতে বঞ্চিত না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক দেশের সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

এই নীতি গ্রহণ করিয়া উভয় বঙ্গের সরকারকে উভয় বঙ্গকে রোগমুক্ত এবং স্বাস্থ্যসম্পদে শক্তিশালী মানুষের আবাসভূমিতে পরিণত করিবার সবল কর্মপন্থা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে অসংখ্য বিভাগের সৃষ্টি করিয়া বিভাগীয় লালফিতার যে দুঃসহ বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল অবিলম্বে তাহার অবসান করিয়া জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টি একটি বিভাগে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে উহা কাগজে কলমে একবিভাগে কেন্দ্রীভূত হওয়া সত্ত্বেও বিভাগীয় আমলাদের অকর্মন্যতার জন্য জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন উন্নততর পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি।

ডাক্তারী শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। পূর্ববাংলার অবস্থা আরও শোচনীয়। উভয় বাংলায় অবিলম্বে ডাক্তারী শিক্ষার জন্য অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে।

নার্সিং শিক্ষার জন্যও উভয় বঙ্গে ব্যাপক, কার্যকরী এবং উন্নত ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভদ্র শিক্ষিতা মেয়েরা যাহাতে এই শিক্ষা এবং জীবিকার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন— শিক্ষা এবং কাজ উভয় ক্ষেত্রেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, যৌনব্যাধি প্রভৃতি ক্রমবর্দ্ধনশীল রোগগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান, প্রতিরোঅধ এবং চিকিৎসার জন্য ব্যাপক ও কার্যকরী ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার এবং ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি নিরোধযোগ্য রোগ নিবারণের জন্য, টিকাদার, স্বাস্থ্য-পরীক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের অধিক সংখ্যক এবং শিক্ষিত কর্মী তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষা, কুষ্ঠ, যৌন ব্যাধি প্রভৃতি ক্রমবর্ধনশীল রোগগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য ব্যাপক ও কার্যকরী ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়া চিকিৎসালয় প্রতি ইউনিয়নে একটি করিয়া প্রাথমিক হাসপাতাল— প্রতি থানায় একটি করিয়া অধিক সংখ্যক বেড সংযুক্ত উন্নততর ধরনের

হাসপাতাল— রোগীদের স্থানান্তরের জন্য উপযুক্ত অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের প্রবর্তন— পল্লী অঞ্চলে শিশু এবং প্রসূতি সদনের বিশেষ ব্যবস্থা— এবং শিল্প অঞ্চলে শিল্পজাত রোগ সমূহের জন্য বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা— প্রভৃতি চিকিৎসা সংক্রান্ত সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

ভোরা কমিটির রিপোর্টে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের পুনর্গঠনের বিস্তারিত প্রস্তাব রহিয়াছে। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে উভয়বঙ্গে জনস্বাস্থ্য পুনর্গঠনের সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং জননেতাদের লইয়া অবিলম্বে উভয় বঙ্গে দুইটি বোর্ড গঠন করিতে হইবে। একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কাজে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা এই বোর্ডকে অর্পণ করিতে হইবে।

কায়েমী স্বার্থের প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন হইবে না। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পজাত মুনাফার বিরাট পাহাড়ের সামান্য কিছু অংশ, পূর্ববঙ্গে জমিদারগোষ্ঠির কৃষিজাত বিনাশ্রমলব্ধ আয়ের কিছু অংশ পাইলেই এই কাজ পূর্ণ এবং সফল ভাবে অগ্রসর হইতে পারে। তাহা ছাড়া পুলিশ, শাসন বিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের বিরাট ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থা রদ করিয়া— জাতীয় স্বার্থে জাতীয় বাজেট রচনা করিতে আরম্ভ করিলেও সাধারণ আয় হইতেই এই কাজের জন্য প্রচুর অর্থের সংস্থান হইতে পারে।

এই কাজ যাহাতে সফল ভাবে অগ্রসর হইতে পারে— উভয় বঙ্গের সরকারই যাহাতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের বাঁধা চূর্ণ করিয়া এই বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে— তাহার জন্য উভয় বঙ্গে অবিলম্বে শক্তিশালী গণ আন্দোলন তৈরি করিতে হইবে। বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী হইতে আরম্ভ করিয়া পল্লীর হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষ সকলকে এই অভিযানের মধ্যে জমায়েত করিতে পারিলে তবেই রোগমুক্ত শক্তিশালী জাতি গঠনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা

ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ রচিত আইনকানুন ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজও রহিয়া গিয়াছে। কায়েমী স্বার্থ ও দাঙ্গাকারীরা ইহার সুযোগ লইয়া জনসাধারণের সমাজজীবন ও নাগরিক অধিকার বিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। যতদিন পুরাতন কাঠামোর এই আইনকানুন ও শাসনব্যবস্থা বজায় থাকিবে ততদিন নাগরিক অধিকার পুরাপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহা ছাড়া আমাদের দেশ যে পরিবেশে ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, সে পরিবেশের মধ্যে ধর্ম ও শ্রেণিগত কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারি পক্ষপাতবশত বহু অনাচার চলিয়াছে ও ভবিষ্যতে চলিতে পারে। তাই জনসাধারণ তাহাদের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকিলে সুস্থ সমাজজীবন গড়িয়া তোলা যাইবে না।

কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রাদেশিক সম্মেলন সমস্ত দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও জনসাধারণের নিকট এই আবেদন করিতেছে যে, উভয়বঙ্গের জেলায় জেলায় ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি গড়িয়া নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তাহারা যেন সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া তোলেন।

কলকাতার বস্তী ও বাসস্থান সমস্যা

কলকাতায় বাসস্থানের সমস্যার প্রতি এই সম্মেলন পশ্চিমবাংলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। দিনের পর দিন বাসস্থানের সমস্যা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে এবং অবস্থা খারাপের দিকে যাইতেছে। বাসস্থানের সংকট সবচেয়ে বেশি আঘাত করিয়াছে শহরের গরীব বাসিন্দাদের। প্রায় দশ লক্ষ লোক বস্তীতে বাস করে— বস্তীগুলি সাধারণত মানুষের বাসের অযোগ্য। এক্ষেত্রে নিম্নমধ্যবিত্তদের দুর্দশার কাহিনীও বর্ণনাতীত; বস্তীবাসীদের অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা বিশেষ উন্নত নয়।

বস্তীবাসীদের শোষণ করিয়া অত্যধিক ভাড়া আদায় করা হয়। অথচ বস্তীর স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় উন্নতির বিষয় বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বস্তীবাসীদের নিজ নিজ চালাঘরের উপরও কোন দখলীস্বত্ব নাই— সময় সময় অতি নির্দয়ভাবেই তাহাদের বস্তী হইতে উৎখাত করা হয়। দাঙ্গার ফলে তাহাদের দুঃখ দুর্দশা অধিকাংশে বাড়িয়া গিয়াছে। বস্তীর মালিকেরা দাঙ্গা বিধস্ত বস্তীবাসীদের তাহাদের নিজ নিজ পূর্ব বাসস্থানে ফিরিয়া আসিতে দিতেছে না। ফলে পুনর্বসতির পথে বিঘ্ন দেখা দিতেছে।

বাড়ী ভাড়া দিবার সময় নিম্নমধ্যবিত্তদের কাছ হইতে অত্যধিক হারে সেলামী নেওয়া হয় এবং বে-আইনিভাবে অন্যান্য উপায়েও তাহাদের রীতিমত শোষণ করা হয়। বাড়ীওয়ালাদের অত্যাচার উৎপীড়ন তাহাদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতায় বাসস্থানের যে ব্যবস্থা আছে তাহার তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহাদের বাসস্থানেরও সংকুলান হইতেছে না। এই সমস্যার সঙ্গে আসিয়া যোগ হইয়াছে বস্তীর বর্ণনাতীত অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। কলিকাতার মহামারী ও নানারকম ব্যাধির উৎসও এইখানেই। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া আজ কলিকাতাবাসীর জীবনের সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে কলিকাতার সমগ্র নাগরিক জীবনে অবনতি শুরু হইয়াছে।

কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে এই অবস্থার উন্নতির জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশে যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহার সাহায্যে মাত্র কয়েকটি বিশেষ শ্রেণির ভাড়াটিয়াকে মালিকের জুলুমের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব। ইহাছাড়া তথাকথিত বস্তী উন্নয়ন আইনের ফলেও বস্তীবাসীদের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই আইন এমনভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছে যে, তাহার দৌলতে বস্তীবাসীদের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। বরং এই আইন বস্তীবাসীদের উপর নতুন জুলুমের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। মালিকদের অত্যাচারে জর্জরিত ভাড়াটিয়াদের অধিকাংশেরই দুর্দশার লাঘবের কোন সুবিধা নাই।

এই অবস্থায় এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে, বাসস্থান সমস্যার সমাধানের জন্য অবিলম্বে পশ্চিমবাংলা সরকারকে সুচিন্তিত কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(১) পশ্চিমবাংলা সরকারকে অবিলম্বে বস্তীবাসীদের বস্তীর উপর দখলীস্বত্ব মঞ্জুর করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আইন করিয়া বস্তীগুলিকে বাসপোযোগ্য এবং স্বাস্থ্যোপোযোগী করিয়া তুলিতে বস্তী মালিকদের বাধ্য করিতে হইবে।

(২) ভাড়াটিয়াদের নিকট হইতে সেলামী এবং অন্যান্য আদায় বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা

করিতে হইবে এবং ইহার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেলামী আদায়ের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা চাই।

(৩) বিভিন্ন এলাকার অবস্থা বিবেচনা করিয়া, ঘরের সংখ্যা এবং জায়গায় পরিমাপের ভিত্তিতেই বাড়ীভাড়ার সর্বোচ্চ হার বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং নূতন হারেই পুরানো দিনের ভাড়াও স্থির করিতে হইবে। এই ভাবেই সরকারকে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

(৪) কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়ায় এবং ভাড়াটিয়া এবং বস্তীবাসীদের আস্থাভাজন হয় তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।

(৫) কলিকাতা ও শহরতলীতে গরীব বাসিন্দাদের জন্য বাসস্থান তৈরির ব্যবস্থা সোজাসুজি সরকারের কর্তৃত্বাধীনে হওয়া দরকার। এবং বে-সরকারি প্রচেষ্টায় সুপরিকল্পিত প্রোগ্রাম গ্রহণ করার জন্যও সরকারকেই আগাইয়া আসিতে হইবে। জনসাধারণের স্বার্থে নিম্নমধ্যবিত্তদের বাসোপযোগী ছোট ছোট ফ্ল্যাটের বড় বড় বাড়ি তৈরি করার জন্য বে-সরকারি সুযোগ সুবিধা ও প্রচেষ্টাকে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগাইতে হইবে, কিন্তু কি কি অবস্থায় ও শর্তে তাহারা সেই রকম বাড়ী তৈরি করিতে পারিবে সরকারই তাহা স্থির করিয়া দিবেন। এই রকম বাড়ী তৈরি করার মাল মশলার একটা বিশেষ অংশ পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

(৬) সরকারের প্রত্যেকটি বাসস্থান সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনায় যাঁহারা দাঙ্গার ফলে বাড়ী ঘর হারাইয়াছেন তাঁহাদের দাবিই সর্বাগ্রে বিবেচিত হইবে। দাঙ্গাবিধ্বস্ত বস্তীগুলির পুনর্গঠনের জন্য বস্তী মেরামতী মালমসলা সরকারকে কম দরে সরাসরি বস্তীবাসীদের সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) ভাড়াটিয়াদের স্বার্থে রেন্টকন্ট্রোল বিভাগকে পুনর্গঠন করিতে হইবে।

(৮) বৃহত্তর কলকাতায় বড় বড বাড়ি সরকারকে দখল করিয়া জনসাধারণের নিকট ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সম্মেলন কলকাতার কমরেডদের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে যে তাঁহারা এই প্রোগ্রামকে কার্যকরী করার জন্য পাড়ায় পাড়ায় শক্তিশালী জনপ্রিয় আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।

বাংলার দেশীয় রাজ্য ও গণতন্ত্র

আগরতলা ও কোচবিহার রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়াছে বলিয়া এই সম্মেলন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নে প্রজা সাধারণের নির্বাচিত আস্থাভাজন প্রতিনিধি প্রেরিত হয় নাই। এই উভয় রাজ্যেই পুরাদস্তুর সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত। বহুবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার তাহাদের নাই। এই রাজ্য দুইটিব জমি ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় ভূমিদাস প্রথার সামিল, রাজারা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজস্ব বাণিজ্যের উপরে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রজারা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। রাজ্যের শাসন যন্ত্র আগাগোড়া বহিরাগত মোটা বেতনের দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের কুক্ষিগত। স্বাধীনতার জন্য এখানকার প্রজাদের অতি সাধারণ আকাঙ্ক্ষাকেও পিষিয়া মারিবার জন্য আজও এই রাজ্য দুইটিতে নির্লজ্জ দমননীতি চলিতেছে। গ্রেপ্তার, জেল, আইন সঙ্গত রাজনৈতিক কার্যাবলী

নিষিদ্ধ করা— দমন নীতির সর্বপ্রকার পদ্ধতি এখানে নির্বিচারে চলিতেছে।

রাজাদের পক্ষ হইতে শাসন সংস্কারের যে সব প্রস্তাব আসিয়াছে তাহার কোনটাই এই রাজ্য দুইটির সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করে নাই।

সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য এখানকার প্রজাদের দাবি ও আন্দোলন এই সম্মেলন সমর্থন করিতেছে এবং এই আন্দোলনকে সাহায্য করিবার জন্য উভয় বাংলার অধিবাসীদের আহ্বান করিতেছে। কুচবিহারের ছাত্রদের সংগ্রামের প্রতি এই সম্মেলন পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি জানাইতেছে এবং তাহাদের উপর বর্বর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

'বৃহত্তর কোচবিহার' এবং 'বৃহত্তর ত্রিপুরা' রাজ্য এই দুরভিসন্ধিমূলক আওয়াজ তুলিয়া দুইটি প্রতিক্রিয়াশীল রাজস্ব গড়িবার জন্য সাম্রাজ্যবাদের অনুচরদের বিভেদমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কেও এই সম্মেলন সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছে।

এই সম্মেলন বিশ্বাস করে, একমাত্র জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা দ্বারাই এই সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও ইহার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অবসান ঘটান সম্ভব। একমাত্র এই পথেই এখানকার অধিবাসীরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে এবং ভারতীয় ইউনিয়নে তাহাদের ন্যায্য স্থান লইতে পারিবে।

প্রাদেশিকতা সম্পর্কে

বৃটিশ শাসন যে সব বিভেদকে ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রাদেশিকতা তাহাদের অন্যতম। কৃত্রিম উপায়ে প্রদেশ ভাগ দ্বারা বাঙালীর সঙ্গে বিহারী ও আসামীর কলহ সৃষ্টি করিয়া বৃটিশরাজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুর্বল রাখিতে চাহিয়াছে। ইহা ছাড়াও বৃটিশের শাসন ও শোষণের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের শাসনব্যাপারে বাঙালীর ভূমিকাও সেখানে পরবর্তী জাতীয় জাগরণের যুগে কমবেশি বাঙালী-অবাঙালী বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে; কায়েমী স্বার্থ এই বিদ্বেষকে বরাবরই নিজেদের কাজে লাগাইয়াছে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ইহাকে অবলম্বন করিয়া নূতন প্রাদেশিক সংঘর্ষের চক্রান্ত শুরু হইয়াছে।

আজিকার দিনে প্রাদেশিক সংঘর্ষের চক্রান্তের মূল লক্ষ্য শ্রমিক আন্দোলনকে খর্ব করা : মূল উদ্দেশ্য হইতেছে কয়লাখনি ও লৌহশিল্পের এলাকায়, কলিকাতার শিল্প অঞ্চলে, ডুয়ার্স ও আসামের চা-বাগানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আক্রমণ হইতে নিজেদের মুনাফার রাজ্য নিরাপদ রাখা।

এই সম্মেলন প্রগতিশীল জনসাধারণকে, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণিকে প্রাদেশিকতার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আহ্বান জানাইতেছে বিভিন্ন প্রাদেশিক-সরকার ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মারফৎ প্রাদেশিক সমস্যার গণতান্ত্রিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

এই সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে যে, একপ্রদেশে অন্যপ্রদেশবাসীর বসবাস ও জীবিকা অর্জনের অধিকার আছে কিন্তু কি নিজ প্রদেশে, কি অন্য প্রদেশে কোথায়ও আধিপত্য বা শোষণের অধিকার কাহারো নাই। শোষণের বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রামকে বসবাস ও জীবিকা অর্জনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সংঘর্ষ দ্বারা ছিন্নভিন্ন করা কায়েমী স্বার্থেরই কৌশল।

উপজাতিসমূহ সম্পর্কীয় প্রস্তাব

বাংলা দেশে তিন লাখ গুর্খা, প্রায় ৪ লাখ সাঁওতাল, লক্ষাধিক হাজং এবং বহুসংখ্যক গারো, পার্বত্য ত্রিপুরার আদিবাসী প্রভৃতি উপজাতি বাস করেন। গুর্খাগণ দার্জিলিং নেপাল ও তাহার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে, সাঁওতালগণ মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, দিনাজপুর ও মালদহে, হাজং, ডালু ও গারোগণ মৈমনসিংহের উত্তরাঞ্চলে এবং টিপরাইগণ ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে বাস করেন।

এই উপজাতিগণ খুবই গরীব। জমিদারি, জোতদারি ও সামন্তযুগীয় ভূমিপ্রথার শোষণে ইহারা জর্জরিত। গুর্খাগণের একটা বিরাট অংশ বড় বড় চা-বাগান মালিকের অত্যাচারে নিষ্পেষিত।

ইহাদের ভিতর শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। দেশের অন্যান্য জনসংখ্যা যে-সব রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করে, ইঁহারা সে-সব অধিকার হইতে বঞ্চিত। গুর্খা অঞ্চল, হাজং-গারো অঞ্চল এবং পার্বত্য ত্রিপুরার অধিবাসীগণের বাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আংশিক শাসন-বহির্ভূত অঞ্চল করিয়া নিজেদের খাস তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিল। আর, মিশনারীগণ উপজাতি অঞ্চল সমূহে সৃষ্টি করিয়াছে নিজেদের প্রভাব।

দেশের প্রগতিমূলক আন্দোলনের প্রভাবে এই অনুন্নত উপজাতি সমূহের ভিতর ধীরে ধীরে নূতন চেতনা ও নিজের অধিকার বোধ জাগিতেছে। অন্যদিকে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ও পরে এই উপজাতিদের লইয়া সাম্রাজ্যবাদী ও কায়েমী স্বার্থের নূতন খেলা সুদৃঢ় হইয়াছে।

গুর্খাদের ভিতর সমতলবাসীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া গুর্খা অঞ্চলকে আসামের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার এক আন্দোলন চলিতেছে। সাঁওতালদের ভিতরও বাঙালী বিদ্বেষ ছড়ানো হইতেছে। হাজং ও গারোদের ভিতর মুসলমান বিরোধী ও বাঙালী-বিরোধী মনোভাব জাগাইয়া মৈমনসিং এর উত্তর অঞ্চলকে আসামে জুড়িয়া দেওয়ার দাবিকে এক আন্দোলন সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এই সব বিভেদমূলক ষড়যন্ত্র দ্বারা উপজাতিদের দেশের প্রগতিমূলক ভাবধারা হইতে দূরে সরাইয়া তাঁহাদিগকে কায়েমী স্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনে রাখার প্রচেষ্টা চলিতেছে।।

এই কু-প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ করা দরকার। এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে, উপজাতিদের জন্য—

(১) শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা;

(২) জমির অধিকার;

(৩) জঙ্গল হইতে কাঠ-কাটিবার অধিকার;

(৪) উপজাতি অঞ্চল সমূহে আংশিক শাসন বর্হিভূত ব্যবস্থা এখনই বাতিল করিয়া পূর্ণ পৌর অধিকার প্রতিষ্ঠা;

(৫) চিকিৎসা, জল ও রাস্তার বিশেষ ব্যবস্থা; এবং

(৬) সর্বপ্রকার সামাজিক অত্যাচার অবসানের জন্য আইন প্রণয়ন— প্রভৃতি সাধারণ দাবিগুলি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সরকার এখনই মানিয়া লউক।

ইহা ছাড়াও এই সম্মেলনের দৃঢ় অভিমত এই যে, উপজতিদের রাজনৈতিক অধিকার ও

বিকাশের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা দরকার।

গুর্খাদের মূল দাবি নেপালী গণতন্ত্র। নেপালের রাণাশাহীর অবসান ও চা-বাগানের জাতীয়করণ এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য অঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শাসনের মধ্যে তাঁহাদের এখানকার দাবি—

(১) ডেপুটি কমিশনার ও চা-করদের রাজস্ব শেষ করিয়া জনগণের পূর্ণ পৌর অধিকার (২) স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ও (৩) আইন সভায় সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

সাঁওতাল, হাজং, গারো ও পার্বত্য ত্রিপুরার অধিবাসী প্রভৃতি উপজাতি সমূহকে রাজনৈতিক অধিকার দানের জন্য ঐ সব উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে এমনভাবে নির্বাচকমণ্ডলী ঠিক করা দরকার যাহাতে তাঁহারা পশ্চিম এবং পূর্ব বাংলার আইন সভার জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন।

এই সম্মেলন উপরোক্ত সমস্ত দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইতেছে ও আশা করিতেছে যে, পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক জনসাধারণও অনুন্নত উপজাতি সমূহের দাবিগুলির আন্দোলনের পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন। এই পথেই কায়েমী স্বার্থের ষড়যন্ত্র ধ্বংস করা যাইবে এবং উপজাতিদের নবজাগ্রত আন্দোলন বাকী দেশবাসীর সহিত একই প্রবাহে বহিবে।

এই সম্মেলন উপজাতীয় জনগণের মধ্যে নূতন জাগরণকে অভিনন্দন জানাইতেছে। এই সম্মেলন ভারতীয় ও পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠন পরিষদের নিকট আবেদন জানাইতেছে যে তাঁহারা উপজাতিদের দাবি স্বীকার করিয়া গণতন্ত্রকে জয়যুক্ত করুন।

শ্রমিক ও উৎপাদন

(১) শিল্পোন্নতির ভিত্তিতে জাতীয় পুনর্গঠনেরই আজিকার দিনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

জাতীয় পুনর্গঠন ব্যতীত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক কর্তৃত্ব হইতে দেশকে মুক্ত করার জন্যও চাই জাতীয় পুনর্গঠন।

জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বাংলার একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। ভারতের সমস্ত প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলাই ধনসম্পদে ঐশ্বর্যশালী— এই প্রদেশেই মূল শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শিল্পপ্রসারের প্রচুর সম্ভাবনাও রহিয়াছে। বাংলা-ই সুসংবদ্ধ বৃটিশ মূলধনের আদি কেন্দ্রস্থল। এই প্রদেশ কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহার উপর-ই জাতীয় পুনর্গঠনের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।

(২) জাতীয় পরিকল্পনা, পুনর্গঠনের কাজে দেশের ধনসম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ, সকলের জন্য চাকুরী এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে সমস্ত বাধার অপসারণের জন্যই শ্রমিকশ্রেণি লড়াই করিতেছে। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর বিলি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; পাব্লিক ইউটিলিটি সার্ভিস এবং যানবাহন ব্যবস্থাকে অধিকতর উন্নত করিতে হইবে এবং ঐ সব সার্ভিসে ভাড়া কমাইতে হইবে। দেশের উৎপাদন হইবে জনসাধারণের জন্য, মুনাফার জন্য নয়। এই সমস্তের জন্যই শ্রমিকশ্রেণির লড়াই এবং ইহাকেই তাহারা কার্যকরী করিতে চায়। যদিও তাহাদের এই পথে ১৫ই আগস্টের পর সুবিধার অনেক উৎসই খুলিয়া গিয়াছে, তবুও তাহাদের উদ্দেশ্যকে সফল করার পথে প্রচুর বাধা বিপত্তিও রহিয়াছে।

(৩) শ্রমিকশ্রেণির পথে সর্বপ্রথমেই বাধা আসিবে বড় বড় বৃটিশ ও ভারতীয়

ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে। বাংলাদেশের কায়েমী স্বার্থে তাহাদেরই একচেটিয়া অধিকার। চটকল, সুতাকল, কয়লার খনি, ইঞ্জিনিয়ারিং, চা-বাগান প্রভৃতি শিল্পের তাহারাই মালিক। দেশবাসীর স্বার্থে শিল্পোন্নতির সর্বপ্রকার কার্যকরী পরিকল্পনাকেই বানচাল করিয়া দিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর। যুদ্ধের যুগের মুনাফার বিশাল অঙ্ক বজায় রাখিয়া চলাই তাহাদের লক্ষ্য। তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যে বাহিরের কাহারো কোন হস্তক্ষেপই তারা সহ্য করিবে না। অবশ্য তাহাদের মুখে মুখে আজ উৎপাদন বাড়াইবার দেশপ্রেমিক শ্লোগানও শুনা যাইতেছে, কিন্তু তাহারা উৎপাদন বাড়াইতে চায় তাহাদের নিজেদের শর্তে, দেশবাসীর স্বার্থে নয়।

গত বৎসরে এবং বিশেষ করিয়া জানুয়ারি-এপ্রিলের ট্রাম ধর্মঘটের পর হইতে তাহাদের রণকৌশল সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথমত, তাহাদের নিজস্ব কল কারখানায় পে-কমিশনের সুপারিশ প্রয়োগ করার বিরুদ্ধে তাহার জীবনপণ করিয়া লড়াই করিবে, কলকারখানায় কাজের ঘন্টা বৃদ্ধি এবং কাজের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে শ্রমিক সংগ্রহের দাবি তাহারা জানাইবে; ট্রাইব্যুনাল এবং সালিশী বোর্ডের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার পথে তাহারা বাধা সৃষ্টি করিবে; ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংকুচিত করার জন্য এবং ধর্মঘট-বিরোধী আইনের জন্য তাহারা দাবি উঠাইবে; শ্রমিকদের অনাহারে রাখিয়া তাহাদের মনোবল ভাঙিয়া দিবার জন্য তাহারা উস্কানী দিয়া ধর্মঘট বাধাইবে। লক-আউট ঘোষণা করিবে এবং সেই ব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা করিবে। এবং এইভাবেই তাহারা আর্থিক সংকটের সমস্ত বোঝাই শ্রমিকদের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয়ত, যেখানেই মালিকেরা শ্রমিকদের সামান্য সুবিধা দিতেও বাধ্য হইবে, সেখানেই তাহারা তাহাদের মুনাফার হার পূর্বের ন্যায় নির্দিষ্ট রাখার চেষ্টা করিবে এবং শ্রমিকদের ঐ সুবিধা দেওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদ জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া জনসাধারণ ও শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবে। এইভাবেই শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির বিনিময়ে মালিকেরা কলিকাতায় পোর্ট ও ইলেকট্রিসিটিতে জনসাধারণের নিকট হইতে বেশি ভাড়া আদায় করার ব্যবস্থা করিয়াছে, ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে; সুতাকলগুলিতে শ্রমিক-বিরোধ ট্রাইব্যুনালে আলোচনার পূর্বাহ্নেই কাপড়ের দাম বাড়াইবার জন্য মালিকেরা সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এইভাবে মালিকেরা সমস্ত বোঝা-ই সমভাবে জনসাধারণ ও শ্রমিকদের উপর চাপাইয়া দিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৌশলে জনসাধারণ ও শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে।

দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়াই বাংলাদেশের শিল্পমালিকদের এই নীতি সার্থক হইতে পারে। পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা মালিকদের কতদূর সাহায্য করিবে এবং তাহাদের নীতির নিকট মাথা নত করিবে কিনা তাহার উপরই মালিক শ্রেণির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

(৪) বর্তমান অবস্থায় গভর্নমেন্টের শ্রমনীতি-ই সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে।

শ্রমিক-বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব এবং শ্রমিকদের মজুরি ও কাজের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নতম মান নির্দিষ্ট করিয়া দিতে গভর্নমেন্টের অস্বীকৃতির ফলে শিল্পক্ষেত্রে গভর্ণমেন্টের তথাকথিত শান্তি স্থাপনের পরিকল্পনা আজ বানচাল হইতে বসিয়াছে। শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসার পরিবর্তে এই নীতি প্রয়োগ করিয়া শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে

আগাইয়া দেওয়া হইতেছে।

জাতীয়করণের পরিকল্পনা এবং শিল্প পরিচালনার গভর্নমেন্টের কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বড় বড় কথা বলিয়া শ্রমমন্ত্রী মহাশয় শ্রমিকদের ভুলাইতে চাহিতেছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, বেশি মজুরি দেওয়া মালিকদের সামর্থ্যের বাহিরে। এইভাবে খোলাখুলিভাবে তিনি বড় বড় ব্যবসাদারীদের স্বার্থ-ই দেখিতেছেন এবং তাহাদের পক্ষেই প্রচার কার্য চালাইতেছেন।

সরকারিভাবে জাতীয় ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসকে গভর্নমেন্টেরই একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু করিয়া স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে শ্রমবিভাগ মারফৎ গভর্নমেন্টের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য শ্রমিকদের উপর চাপ দিয়া এবং তাহাদের ভয় দেখাইয়া শ্রমমন্ত্রী মহাশয় সরাসরিভাবে সুসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছেন। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ইউনিয়নগুলি আজ মালিকদের জাতীয়তাবিরোধী নীতির প্রধান হাতিয়ার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে নিজেদের কর্তব্য পালনে শ্রমিকদের অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হইতেছে, তাহাদের দুর্বল করিয়া দেওয়া হইতেছে এবং এইভাবে তাহাদের কর্মক্ষমতা কমাইয়া দেওয়া হইতেছে।

এই মারাত্মক নীতির অর্থ হইল খোলাখুলিভাবে বড় বড় ব্যবসায়ীদের তোষণ করা এবং তাহাদের দাবির নিকট আত্মসমর্পণ করা। এইভাবে যদি এই নীতিকে চলিতে দেওয়া হয়, তবে জনপ্রিয় গভর্নমেন্টই জনসাধারণের সম্মুখে হেয় এবং অকর্ম্মন্য প্রতিপন্ন হইবে এবং দেশের শিল্পজগতে এক বিরাট সংকট ডাকিয়া আনা হইবে।

(৫) জনসাধারণের স্বার্থে যে সমস্ত আর্থিক ও শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে, এই নীতি সেই সমস্ত পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

দেশবাসীর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে, শ্রমিকশ্রেণি দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করিতে এই নীতি কখনোই সক্ষম হইবে না।

যদি শ্রমিককে বুঝাইতে হয় যে মালিকের মুনাফা বাড়াইবার জন্য এবং চোরাবাজারের জন্য সে উৎপাদন করিতেছে না— জাতির স্বার্থের জন্যই সে উৎপাদন করিতেছে তাহা হইলে তাহাকে দেখাইতে হইবে যে বে-আইনি ব্যবসাবাণিজ্য, বস্ত্র, কয়লা এবং অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস মজুত করিয়া রাখা এবং অপ্রতিহত গতিতে মুনাফাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে গভর্নমেন্ট সত্যসত্যই কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। আরো বেশি কাজ করার জন্য এবং উৎপাদন বাড়াইবার জন্য তাহাকে শারীরিক ও মানসিক সুখ সুবিধা দিতে হইবে— শ্রমিকদের জন্য জীবনধারণোপযোগী মজুরি, প্রয়োজনীয় রেশন ও ভালো বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জাতির উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রত্যেকে এক একজন বীর সৈনিক— শ্রমিকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিতে হইবে। এই জন্য চাই তাহার চাকুরির স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা, বে-আইনি বরখাস্ত এবং অন্যায় ছাঁটাই-র বিরুদ্ধে, উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং অসুখের সময় ও বার্ধক্যে যথোপযুক্ত সাহায্য।

শ্রমিক যে-কাজ করে যে-কাজ সে দেশের পক্ষে গৌরবের তাহা তাহাকে বুঝাইতে হইলে

দেশের সাধারণ সমস্যার সমাধানে তাহাকেও অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে— তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে দেশের সাধারণ সমস্যায় তাঁহারও সমান দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে। তাহার ট্রেড ইউনিয়নকে মানিয়া নিতে হইবে এবং প্রত্যেকটি সমস্যায় ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতে হইবে এবং মালিক ও গভর্নমেন্ট কর্তৃক তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার স্বীকার করিয়া নিতে হইবে।

(৬) এই ন্যূনতম দাবি মিটাইবার জন্য মুনাফালোভী মালিকদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার জন্য এবং তাহাদের সমস্ত বিরোধিতাকে খর্ব করিবার জন্য গভর্নমেন্ট যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে তাহার প্রত্যেকটিতেই গভর্নমেন্ট শ্রমিকদের পূর্ণ সমর্থন এবং সক্রিয় সহযোগিতা পাইবে।

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, শ্রমিকরা তাহাদের শেষ হাতিয়ার ধর্মঘট ব্যবহার করিবার পূর্বে জনসাধারণের স্বার্থের দিক বিচার করিয়া বরাবর শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার যতরকম সম্ভাবনীয় ব্যবস্থা আছে তাহা গ্রহণ করে কিন্তু মালিক ও সরকারি আমলাদের অনমনীয় মনোভাব, নিষ্ক্রিয়তা ও আক্রমণাত্মক নীতি শ্রমিকদের প্রায়ই ধর্মঘটের পথে ঠেলিয়া দেয়।

সুতরাং বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দাবি দাওয়া অস্বীকৃত হইলে শ্রমিকশ্রেণি জনসাধারণের সহযোগিতায় ও জাতীয় স্বার্থে তাহার শেষ হাতিয়ার হিসাবে ধর্মঘট করিতে দ্বিধা করিবে না।

যে পর্যন্ত তাহার নিজের অধিকার সুরক্ষিত থাকিবে সে পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণি উৎপাদন বাড়াইবার অগ্রদূত হিসাবেই উৎসাহভরে আগাইয়া আসিতে সক্ষম হইবে— জাতির স্বার্থে বীরের ন্যায় আত্মত্যাগও তাহারা করিবে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার দুর্নীতি ও বাধাবিপত্তি এবং মালিকদের উৎপাদন বানচাল করিয়া দিবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাহারাই অনবরত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

দেশপ্রেমিক দায়িত্ব পালনে শ্রমিকদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য জনপ্রিয় মন্ত্রিসভাকে এবং সাধারণ দেশভক্তদেরও আগাইয়া আসিতে হইবে।

শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাব

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার আজ আমূল সংস্কার এখনি প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এবিষয়ে আর বিলম্ব করা চলে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে শিক্ষার যেটুকু আয়োজন করিয়াছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আমলা ও কেরানী সৃষ্টি। আজ জাতীয় পুনর্গঠনের যুগে আমাদের লক্ষ্য হইল সুস্থ সবল জাতীয় মর্যাদাবোধ ও চেতনাকে সবল করিয়া নূতন যুগের উপযোগী মানুষ গড়িয়া তোলা, দেশকে নূতন সম্ভাবনার পথে আগাইয়া লইয়া চলা।

যত কম দিনের মধ্যে সম্ভব আমাদের সমস্ত জনসাধারণের নিরক্ষরতার বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে হইবে। জাতীয় সরকারের এমন ব্যবস্থার আয়োজন শুরু করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকটি বাঙালী শিশু যেন লিখিতে ও পড়িতে শেখে; এই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষিত যুবকদের সহায়তায় অবসর সময়ে

নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য সরকারের উদ্যোগে ব্যাপক প্রচেষ্টা এখুনি শুরু করিতে হইবে। নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হাতে লইতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে শিশুমনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও আত্মনির্ভরশীলতা জাগাইয়া তোলা। ৬ হইতে ১১ বছর পর্যন্ত সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার পর এমন ভাবে নূতন ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে যাহাতে ছাত্রদের বৃহত্তর অংশ জীবন যাত্রার সহায়ক বিভিন্ন বৃত্তি চর্চার সহজপথে কার্যকরী শিক্ষালাভ করিতে পারে এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার স্তরে পৌঁছিতে পারে।

স্বাধীন বাংলায় জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা আগাইয়া আনিতে হইলে সেইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এতদিন সাধারণ শিক্ষার মারফত কেরানী সৃষ্টি হইত। এখন বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ বহুগুণে বাড়াইতে হইবে— সেইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনি বহুসংখ্যায় খুলিতে হইবে এবং শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের যুবকদের সেইসব প্রতিষ্ঠানে অবৈতনিকভাবে পড়িবার সুবিধা দিতে হইবে।

শক্তির অযথা অপব্যয় বন্ধ করিতে হইলে প্রাথমিক হইতে শেষ পর্যায় পর্যন্ত মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করা প্রয়োজন। অন্যদেশে যাহা সম্ভব হইয়াছে এদেশে তাহা অসম্ভব মনে করিবার কোনও কারণ নাই। বিদেশী ভাষার দাসত্ব ও দাসমনোভাব হইতে মুক্তি চাই।

শিক্ষাব্যবস্থাকেও কোনও ধর্ম ও বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বাহন করা চলিবে না। ধর্ম বা সম্প্রদায় বিশেষের বিরোধী প্রচারের সুযোগও ইহার মধ্যে স্থান পাইতে পারে না।

স্কুল কলেজে ব্যবহারের জন্য পাঠ্যপুস্তক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচনাও নির্বাচন করিতে হইবে। নির্বাচিত প্রস্তাবের প্রকাশ ও প্রচারের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর থাকিবে এবং ইহা লইয়া মুনাফা ব্যবসায় ফাঁদিবার অবকাশ কিছুতেই দেওয়া হইবে না।

প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখন যে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা কায়েমী হইয়া বসিয়াছে তাহাকে নির্মূল করিতে হইবে। দলগত ও গোষ্ঠীগত একচেটিয়া কর্তৃত্বের হাত হইতে উদ্ধার না পাইলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কখনও নতুন যুগের উপযোগী হইতে পরিবে না।

আমরা দাবি করি কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি লইয়া কলিকাতা ও ঢাকায় একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন কমিটি নিয়োগ করা হোক।

শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে সমস্ত শিক্ষক গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইবে। প্রত্যেকটি শিক্ষকের অন্নবস্ত্রের উপযুক্ত সংস্থানের জন্য সরকারকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বঙ্গভঙ্গের পর বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে যে অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে উভয় বঙ্গের সরকারকে এখনি তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। বহু শিক্ষকের স্থানান্তরের ফলে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলি অনেক জায়গায় অচল হইয়া পড়িয়াছে; এবিষয়ে অবিলম্বে সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

পূর্ববঙ্গের সরকার সম্প্রতি অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন যে পূর্ববঙ্গের সমস্ত স্কুল ও কলেজগুলিকে এইবার হইতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে সারা পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দুরবস্থা চরমে

উঠিয়াছে। সেজন্য এই অর্ডিনান্স অন্তত একবছরের জন্য রদ করা হউক, এবং সব স্কুল ও কলেজ ঢাকা বা কলিকাতা যে কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকিবার অধিকার এই বারের জন্য পাইবে।

বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্রে ভাগ করিয়া গেলেও বাঙালী জাতি বা বাংলা সংস্কৃতি এক ও অবিভাজ্য। দুই বাংলার মধ্যে তাই পূর্ণ সহযোগিতা গড়িয়া তুলিতে হইবে। সম্প্রীতির ভিত্তিতে উভয় বাংলার মধ্য দিয়ে জনশিক্ষার মিলিত আয়োজনের ব্যবস্থা করা আজ প্রত্যেকটি দেশভক্তের অবশ্য কর্তব্য।

সোভিয়েত সুহৃদ আন্দোলন

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি যে আন্দোলনের মুখপত্র, তাহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা ব্যাপারে কমিউনিস্টরা স্বভাবতই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৪১ সালে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত দেশ আক্রান্ত হওয়ার পর এই সমিতি স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষে বাংলাদেশই প্রথম এই সমিতি প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হয়। সোভিয়েত সম্পর্কে দেশবাসীর জ্ঞানাভাব দূর করিয়া বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে সোভিয়েত যে প্রগতির প্রধান প্রতীক এবং সর্বদেশে সাম্যবাদী সমাজ স্থাপন প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ সহায়, এ কথা দেশবাসীকে বুঝাইবার কাজে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির অনেক কিছু করিবার আছে। ১৯৪১ সালের তুলনায় সোভিয়েতের শক্তি ও খ্যাতি আজ বহুগুণ বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি পাইয়াছে, সোভিয়েত সম্বন্ধে পূর্বের মত কদর্য্য অপপ্রচার চালাইয়া সাম্রাজ্যবাদীরা আর সাধারণ মানুষকে সহজে ভুলাইতে পারে না। ঠিক সেই কারণে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা ও প্রগতির যাহারা শত্রু, তাহারা আজ প্রাণপণে বহুবিধ কৌশল প্রয়োগ করিয়া সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের মন বিষাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে সোভিয়েতের প্রকৃত বক্তব্যকে বিকৃত করিয়া, এবং সর্বদেশে স্বাধীনতা ও প্রগতির অনুকূলে সোভিয়েতের বিপুল আগ্রহ ও অনলস প্রচেষ্টার কথাকে গোপন রাখিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের পুঁজিপতিদের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত রাজনীতিকের দল সর্বদেশে সোভিয়েতের অপবাদ রটনায় শতমুখ হইয়াছে। মাঝে মাঝে এই অপপ্রচারের বন্যায় আমাদের দেশের নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ পথভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম করিলেও একথা অবিসংবাদিত যে ভারতবর্ষের দেশভক্ত মানুষ দল ও মত নির্বিশেষে আজ সোভিয়েতের প্রতি অনুরক্ত, সম্পূর্ণ সমান অধিকারের ভিত্তিতে বহু জাতির যে বিরাট ঐক্য হইল সোভিয়েত সমাজের অবিস্মরণীয় কীর্তি, সেই কীর্তি সম্পর্কে তাঁহারা জানিতে চান, বুঝিতে চান, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে সোভিয়েতের শিক্ষা প্রয়োগের উপায় লইয়া আলোচনা করিতে চান, বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে সোভিয়েতের প্রগতিশীল ভূমিকায় তাঁহারা বিশ্বাস করেন। বিশেষত সোভিয়েত এশিয়ার মুসলমান-অধ্যুষিত দেশগুলিতে যে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে এবং নূতন সোশালিস্ট সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। সেখানকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশদ গ্রন্থের প্রয়োজন আজ খুবই অনুভূত হইতেছে। আজ আমরা যখন নিজেরাই রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া আমাদের ক্লিষ্ট, বঞ্চিত দেশকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র, তখন যুদ্ধে সত্তর লক্ষ সোভিয়েত নাগরিকের জীবননাশ ও বিপুল অর্থনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও সেখানে যে প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া পুনর্নির্মাণের কাজ অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিয়া চলিতেছে, তাহার কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ

করিব। সমাজতন্ত্রের দেশেই যে অসাধ্যসাধন সম্ভব এ-কথা বুঝিব, আমাদের দেশকেও সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে গড়িবার প্রতিজ্ঞা যে সকল দেশভক্তকে লইতে হইবে তাহা বুঝাইতে পারিব। ধনতান্ত্রিক প্রভুত্বের ফলস্বরূপ আজ ফ্রান্স, ইতালী ও পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র সংকট চলিতেছে এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় হইতে বাঁচিবার জন্য আমেরিকার পুঁজিপতিদের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইতেছে, অথচ পূর্ব ইউরোপে পোলান্ড, চেকোশ্লোভিকিয়া ইত্যাদি দেশ সোভিয়েতের সাহায্য পাইতেছে, এবং পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক না হইলেও বহু বিষয়ে ধনতন্ত্রকে খর্ব করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রচলিত করিয়াছে বলিয়া সেখানে জনসাধারণের অবস্থায় অপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছে। এ-ধরনের বহু তথ্য লইয়া আজ শুধু আমরা সোভিয়েত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসাকেই তুষ্ট করিব না, জাতীয় পুনর্গঠনের কাজকেও আগাইয়া লইতে পারিব।

সুতরাং আজ যখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিপুঞ্জের সমবেত ও সুকৌশলী আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমতকে আরও শক্তিশালী করিয়া গড়িবার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, তখন সোভিয়েত সুহৃদ আন্দোলনের গুরুত্বও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে। সম্মেলন তাই নির্দেশ দিতেছে যে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির প্রাদেশিক সংগঠন এবং জেলায় জেলায় বিভিন্ন শাখাগুলিকে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করার কাজে অবিলম্বে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং সভাসমিতি, আলোচনা, বৈঠক, পোস্টার ও ফিল্‌ম্ প্রদর্শনী, পুস্তক প্রকাশ ইত্যাদি উপায়ে সোভিয়েতের প্রতি জনসাধারণের স্বাভাবিক অনুরাগকে সুদৃঢ় ভিত্তিব উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

প্রাপ্তিস্বীকার : বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড প্রধান সম্পাদক— অনিল বিশ্বাস।

টিকা : অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত বইয়ের এই দলিলের প্রথম দিকে চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন থেকে গঠিত প্রাদেশিক কমিটির সদস্যদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে একটি নোট এখানে দেওয়া হল।

এই তালিকায় (অনিল বিশ্বাসের বইয়ের ১৪৩ পৃষ্ঠায়) প্রাদেশিক কমিটির সদস্যবৃন্দের যে নামগুলি রয়েছে, তাতে জ্যোতিবসু, জলি কল ও মণিকুন্তলা সেন এই তিন জনের নাম নেই। এই তিন জনের নাম রণেন সেনের বইয়ের ১১২ পৃষ্ঠায় (তথ্যসূত্র ১৬) আছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই তিন জনের নামের পাশে (?) চিহ্ন দিলাম। উদ্দেশ্য হল নিশ্চিত হওয়া। নিশ্চিত হওয়ার প্রয়াসের ফলে জানা গেছে যে জ্যোতিবসু তাঁর রাজনৈতিক আত্মকথন "যতদূর মনে পড়ে" বইয়ের পৃ. ৩৯-এ বলেছেন যে তিনি চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন থেকে প্রাদেশিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। জলি কলের কাছ থেকে জানতে পারি যে তিনি প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হয়েছিলেন ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন থেকে। তবে তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে বলেছেন যে মণিকুন্তলা সেন চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন থেকেই প্রাদেশিক কমিটিতে ছিলেন। —সম্পাদক

প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে দাঙ্গার বিরুদ্ধে কমরেড পিসি যোশীর ভাষণের অংশবিশেষ

১

"বাংলার পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গর্বের বস্তু। দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলার পার্টি যে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা ভারতের প্রত্যেক দেশভক্তকে প্রেরণা দিয়াছে। শান্তির অভিযানে কমিউনিস্ট কর্মীদের অবদান গান্ধীজীরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।"

"আমাদের পার্টি তখন বলিয়াছিল মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণায় আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপুল শক্তি স্বীকৃতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এই রোয়েদাদের মধ্য দিয়াই বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাহাদের অনুচরবর্গের সাহায্যে বিভেদের আগুন জ্বালাইবার চক্রান্ত আঁটিয়াছে এবং এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করিতে না পারিলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনই বিপন্ন হইবে।

"আপসের নীতি অনুসরণ করিয়া নেতারা দেশ বিভাগের নীতি মানিয়া লন। আমাদের পার্টি তখনই বালিয়াছিল, ইহার ফলে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান হইবে না, বরং বৃটিশ গভর্নমেন্ট দেশকে বিভক্ত করিয়া উভয় রাষ্ট্রকে সংঘর্ষের পথে উত্তেজিত করার চেষ্টা করিবে।..."

(স্বাধীনতা, ৫ অক্টোবর ১৯৪৭)

২

'কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ২৫ হাজার জনতার সামনে কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশীর বক্তৃতা : দাঙ্গার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য বামপন্থীদের নিকট আবেদন'—

"আমাদের দেশ আজ সবচেয়ে গভীর সংকটের সম্মুখীন। আজ আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, আমরা কি হারাইতে বসিয়াছি। আমরা হারাইতে বসিয়াছি আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের জাতীয় আন্দোলন, আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত। আজ আমরা যেমন শক্তিশালী হইয়াছি এমন আর কখনো ছিলাম না, কিন্তু আমাদের শত্রুরাও সমান শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

"মাউন্টব্যাটেন ভারত-বিভাগ করিয়া দ্বিধাবিভক্ত পাঞ্জাবে সশস্ত্র সীমানাবাহিনী

বসাইয়াছে। সেই সশস্ত্র সীমানাবাহিনী পাঞ্জাবকে দাঙ্গার আগুনে ছাই করিয়াছে।

"পাঞ্জাবের সেই আগুন আজ ভারতীয় ইউনিয়নের রাজধানী দিল্লীকে জ্বালাইয়াছে। আসাম ও বাংলাদেশে সেই আগুন জ্বালাইবার চক্রান্ত চলিতেছে।

"দাঙ্গার এই দাবানল নিভাইতে না পারিলে সারা দেশে স্বাধীনতা অন্দোলন মুছিয়া যাইবে, নবলব্ধ জাতীয় সরকার ধ্বংস হইবে, দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে জনসাধারণ বেকারি ও অনাহারে নিঃশেষ হইবে।"

(স্বাধীনতা ৯ অক্টোবর ১৯৪৭)

৩

'দেশদ্রোহী দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা : রেডগার্ড সমাবেশে কমরেড পিসি যোশীর বক্তৃতা'—

'বৈপ্লবিক শৃঙ্খলাবোধ, বীরত্ব ও রাজনৈতিক চেতনা এই তিনটিকে ভিত্তি করিয়া রেডগার্ড বাহিনীকে আজ বাংলার জনসাধারণের দাঙ্গা-বিরোধী প্রেরণা দাঙ্গাবাজদের নিঃশেষ করিবার সংগ্রামে রূপ দিতে হইবে।"

... বক্তৃতার পর কমরেড যোশী বিভিন্ন রেডগার্ড ইউনিটগুলি পরিদর্শন করেন। বর্মার দেড়লক্ষ রেডগার্ড দলের নেতা বো-তেইন-ভান সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

(স্বাধীনতা ১০ অক্টোবর ১৯৪৭)

সহায়ক তথ্য - ৫

স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাংলা

- স্বাধীনতার অর্থ কি
- স্বাধীনতা কোন্ পথে

ভবানী সেন

দাম— দুই আনা

প্রকাশক :
কানাই রায়
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে
৮ই ডেকার্স লেন, কলিকাতা

ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭

মুদ্রাকর :
শ্রীকালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস
৮ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা

স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাংলা

বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কি এবং
কোন্ পথে

**(ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য
প্রস্তাবের খসড়া)**

স্বাধীনতা

ইংরেজের নিকট ভারতের পরাধীনতা আরম্ভ হয় বাংলাদেশ হইতে। প্রথমত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসিয়া ব্যবসার সুবিধা আদায় করে, তাহার পর কেল্লা গড়ে এবং শেষে রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব দখল করে।

এদেশে বিলাতী পণ্য চালাইবার জন্য তাহারা বাংলার কারিগরদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়াছিল। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য তাহারা কৃষকদের জমি বেপরোয়াভাবে ধনীদের মধ্যে বিতরণ করে। নীল ব্যবসায়ের জন্য জোর জুলুম চালাইয়া তাহারা কৃষকদের নীল চাষ করিতে বাধ্য করে। এমনিভাবে বাংলার কারিগরদের কারবার এবং চাষীর জমি আত্মসাৎ করিয়া ইংরেজরা এদেশে তাহাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই ক্ষমতার সুযোগে ক্রমশ বিলাতী মূলধন আমদানি করিয়া তাহারা বাংলায় রেলওয়ে, চটকল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে। আজ বাংলার সমস্ত মূলধনের শতকরা ৮৫ ভাগের মালিক ইংরেজ ধনিকেরা।

বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস অত্যাচার এবং লুণ্ঠনের ইতিহাস। রেল ও কারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে এবং বিদেশীর অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীরা একটি জাতিতে পরিণত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশ একটি অর্থনৈতিক আবেষ্টনে অবদ্ধ। তাহাদের ভাষা এক। বাঙ্গালীর বাসভূমি একটি বৃহৎ সন্নিবিষ্ট এলাকা। বিদেশীর দাসত্ব, জমিদারি প্রথা কারখানার অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি সমস্ত বাঙ্গালীর জীবনে এক নূতন আবেষ্টনী, এক সংস্কৃতি ও মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছে।

এই নব জাগ্রত ঐক্যবোধ ঠেকাইবার জন্য ইংরেজ সরকার বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত খণ্ডিত করিয়া সুরমা উপত্যকা আসামের সঙ্গে এবং মানভূম ও পূর্ণিয়ার অংশ বিহারের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে। তাহারা শিক্ষা ও শাসনক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা চালু করিয়া বাঙালীর জাতীয় জীবন পঙ্গু করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা জমিদারশ্রেণি সৃষ্টি করিয়া কৃষকদিগকে ভূমিদাস করিয়া রাখিয়াছে। শিল্পের উপর বিদেশী মূলধনের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তাহারা শ্রমিকদিগকে জীবনধারণের মজুরি হইতেও বঞ্চিত করিতেছে। চটকল, কয়লার খনি এবং চা-বাগানে শ্রমিকদের পশুর অবস্থায় রাখিয়াছে। তাহাদের থাকার জন্য বস্তী, কাজের ঘন্টা এবং দৈনন্দিন জবরদস্তি জুলুম এ সমস্তই অমানুষিক অত্যাচারের পরিচয় দেয়। ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণ কৃষকদিগকে সর্বস্বান্ত ও মধ্যবিত্তকে বেকারে পরিণত করিয়াছে।

দুইশত বৎসরের ইংরেজ শাসন শিল্পক্ষেত্রে বাংলাকে এবং সমগ্র ভারতকেই এমন অনুন্নত রাখিয়াছে যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে জনসাধারণের ঘরে ঘরে আজ দারুণ সংকট এবং হাহাকার।

বাঙালী জাতি যাহাতে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত না হইতে পারে তাহার জন্য ইংরেজের প্রধান কৌশল হইল হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করা। কায়েমী স্বার্থের লোকদিগকে হাত করিয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে ক্ষেপান তাহাদের নিয়মিত পেশা। ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ইতিহাস। ১৯১৬

সালের, ১৯২৬ সালের এবং ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা এই ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কময় অধ্যায়।

ইংরেজের অনুসৃত ভেদনীতির চরম নিদর্শন হইল এই কয়েকটি—

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জমিদার ও জোতদার সৃষ্টি করিয়া তাহারা অনুন্নত বা তফশিলি হিন্দু ও মুসলমানদের অধিকাংশকে জীবনধারণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাহারা জমিদারবর্গকে বিশেষ সুযোগ দান করিয়া অধিকাংশ বাঙালীকে অশিক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক কায়েমী স্বার্থের জন্য আইনসভায় বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া বাঙালীর জাতীয়তাবোধে ভাঙন লাগাইয়াছে।

ভোটের অধিকার হইতে সমস্ত সম্প্রদায়ের জনসাধারণকেই তাহারা বঞ্চিত রাখিয়াছে।

ইংরেজের একটি প্রধান অস্ত্র ভেদনীতি, অন্য প্রধান অস্ত্র দমননীতি।

বিনা বিচারে বন্দী করা, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত করা, ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সভা সমিতি বন্ধ করা এবং জরুরি প্রেস আইনের সাহায্যে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা— এ সমস্তই ইংরেজ রাজত্বের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পুলিশ এবং গুপ্তচর বিভাগের অত্যাচারে বাংলার শত শত কর্মী লাঠিতে, গুলিতে এবং ফাঁসীতে প্রাণ দিয়াছে। বাংলার কারাগারগুলি প্রায় সব সময়ই রাজনৈতিক বন্দীতে ভর্তি থাকে।

এই সমস্ত অত্যাচরের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ভিতর দিয়া নবীন বাঙালী জাতি গঠিত হইতেছে। এই জাতি গঠনের প্রধান শক্তি হইল শ্রমিকের ধর্মঘট, কৃষকের জমির লড়াই এবং মধ্যবিত্তের নানাবিধ সংগ্রাম।

ব্রিটিশ শাসন হইতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রথম কথা। বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রধান কথা হইল বাংলা হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ এবং বাংলার সমস্ত ব্রিটিশ মূলধন বাজেয়াপ্ত করিয়া বিদেশী মূলধনে পরিচালিত সমস্ত কারখানা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

জমি

যে কোন জাতির মেরুদণ্ড কৃষক, যে কোন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে কৃষকই হইল প্রধান বাহিনী। কৃষকের সমস্যাই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান সমস্যা।

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগে বাংলার কৃষক ছিল জমির মালিক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এদেশে প্রথম রাজত্ব বিস্তার করে তখন কৃষকের জমি কাড়িয়া লইয়া তাহারা উহা কয়েকঘর ধনীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে। সেই ধনীরাই হইলেন জমিদার। বাংলার কৃষকেরা সেদিন জমি হইতে বঞ্চিত হইল সেইদিন হইতেই বাঙ্গালীর দাসত্ব আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে কৃষকের দুর্ভাগ্যের সঙ্গেই লাঞ্ছিত বাংলার ইতিহাস জড়িত।

এই জমিদারি প্রথার ফলে আজ বাংলার সমস্ত চাষের জমির শতকরা ৩৭.৮ ভাগ জমিদার তালুকদার প্রভৃতি ধনীর খাস সম্পত্তি। এই জমির কিছু তাহারা আধি বর্গা লাগাইয়া এবং কিছু মজুর খাটাইয়া চাষ করে। আর কিছু তাহারা অনাবাদী ফেলিয়া রাখিয়াছে।

কৃষকদের শোষণ করিতে করিতে জমিদারেরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে যে কৃষিজাত আয়ের ১০ ভাগের এক ভাগ হাজারকরা মাত্র আড়াই জন ধনীর দখলে যায়। ইহাদের একজনের বার্ষিক আয় প্রায় ১০,০০০ টাকা আর একজন কৃষকের গড়পরতা আয় বৎসরে মাত্র ৪৩ টাকা। ইংরেজ শাসনের আশ্রয়ে খাজনা, আধিভাগ প্রভৃতি নানা আকারে জমিরদারবর্গ বিনা মূলধনে এবং বিনা মেহনতে এই বিত্তের অধিকারী হইয়াছেন। এই প্রচন্ড অর্থনৈতিক বৈষম্যই বাঙালী জাতির দৈন্য ও দারিদ্র্যের মূল কথা।

জমিদারি শোষণের ফলে বাংলার অধিকাংশ কৃষক আজ ভূমিহীন। চাষীদের শতকরা ৪১ জন বর্গাদার, জমিতে তাহাদের কোন স্বত্ব নাই। চাষীদের শতকরা প্রায় ৩০ জন দিনমজুর। ৫ একর জমি না হইলে একটি কৃষক পরিবারের সংসার চলে না। কিন্তু ৫ একরের বেশি জমি আছে এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা শতকরা ৮ জন, তাহাদেরও অধিকাংশ কৃষক নয়, মধ্যবিত্ত।

কৃষকের দারিদ্র্য এবং জমিদারের প্রভুত্বের ফলে বাংলায় এখনও অন্তত ৩৮ লক্ষ একর জমি পতিত আছে, এবং জমির ফলনও প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ কমিয়া গিয়াছে। তাই বাংলায় প্রায় প্রতি তিন বৎসর অন্তর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

এই জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করিয়া দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য হইতে বাংলাকে মুক্ত করিতে হইবে। কৃষক হইবে জমির মালিক এবং কৃষির উন্নতির দায়িত্ব হইবে গভর্নমেন্টের।

জমির লড়াই হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদিগকে একতাবদ্ধ করিতেছে, জমির অধিকার তাহাদিগকে নূতন জাতীয় শক্তি দান করিবে। লাঙ্গল যার জমি তার— এই রণধ্বনিই হইল বাঙালীর জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান ভিত্তি।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর ধারণা যে জমিদারি প্রথার অবসান ঘটিলে মধ্যবিত্তের সংকট বাড়িবে। এ ধারণা সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের মোহ হইতে উৎপন্ন। ব্রিটিশ মূলধন দখল করিয়াই বাঙালী মধ্যবিত্তকে বাঁচিতে হইবে, কৃষক জমি দখল করুক, মধ্যবিত্ত ব্রিটিশের মূলধন দখল করুক। ব্রিটিশ মূলধন স্পর্শ না করিবার জন্যই মধ্যবিত্ত জমিদারির মোহে আচ্ছন্ন। কিন্তু জমিদারি প্রথা কৃষকের যে দারিদ্র্য এবং কৃষির যে দৈন্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ফলে দুর্ভিক্ষের আঘাতে মধ্যবিত্তকে উজাড় হইতে হইতেছে। এই সংকট হইতে মুক্তির উপায় কৃষককে জমিদারি প্রথা হইতে মুক্ত করা।

শিল্প

বাংলার বিভিন্ন কারখানায় কিঞ্চিদধিক ১০০ কোটি টাকার মূলধন খাটিতেছে। এই মূলধনের বেশির ভাগেরই মালিক ইংরেজ। এই মূলধনের মুনাফা দ্বারা বাংলার মজুরদের অবস্থা উন্নত করিয়াও বাঙালীর প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম পণ্যসম্ভার সরবরাহ করিবার উপযোগী শিল্পবিস্তার নিশ্চয়ই সম্ভব। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দ্বারা বাঙালী জনসাধারণ সেই ক্ষমতা লাভ করিতে চাহে।

এই ১০০ কোটি টাকার মূলধন রেলপথ, চটকল, সুতাকল, চা বাগান প্রভৃতি শিল্পদ্বারা বাংলার সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে একটি যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রাচীনকালে যে বিচ্ছিন্নতা ছিল তাহা এই ১০০ কোটি টাকার মূলধন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে,

আজ কলিকাতা শহরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের গ্রাম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। রেলপথ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের মারফৎ সারা বাংলার মধ্যে এই যে যোগসূত্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দ্বারাই বাঙালী জাতি একটি জাতি হিসাব গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্পের অভাবে এখনও এই যোগসূত্রের মধ্যে দূর্বলতা আছে, কাজেই জাতিগঠন এখনও শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। ১০০ কোটি টাকা মূলধনের মুনাফার উপর সমগ্র জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যেক বাঙালীর জন্য রুজি এবং রুটির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই বিদেশী মূলধনের জন্যই বাংলার দারিদ্র্য। ১০০ কোটি টাকার মূলধন হইতে প্রতি বৎসর যে মুনাফা হয় তাহা দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশে শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার সাধন করা যায়। সমগ্র বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করিয়া উহা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে। বাংলার নবজাগ্রত শ্রমিকসংগ্রাম সেই লক্ষ্য সাধনের পথে সমগ্র বাঙালীজাতির অগ্রগামী পরিচালক। স্বাধীন বঙ্গদেশ বিদেশী মূলধন জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া বাংলাব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব মিটাইবে এবং বেকারসমস্যা দূর করিবে।

হিন্দু এবং মুসলমান ভেদে রাষ্ট্রগঠন করিতে হইলে বাংলাদেশ দুইভাগে বিভক্ত করিতে হয়। বর্ধমান বিভাগ, কলিকাতা, ২৪ পরগণা এবং খুলনা। এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি জেলায় হিন্দু মুসলমানের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং এই অঞ্চলে সমগ্রভাবে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৭২.৪ জন। বাংলার বাকি অংশে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং যশোহর লইয়া যে অঞ্চল গঠিত সেই অঞ্চলে শতকরা ৬৮.৩ জন মুসলমান। বাংলার সমস্ত শিল্প কারখানার শতকরা ৮৫ ভাগ কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া এবং হুগলী এই চারিটি জেলায় অবস্থিত। পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করার অর্থ এই মূলধনের উপর মুসলমান জনগণের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা এবং তাহাদিগকে অনুন্নত অবস্থায় বহুকালের জন্য কোন না কোন উন্নত বিদেশী রাষ্ট্রের শরণাপন্ন করিয়া রাখা।

হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গ এবং মুসলমান-প্রধান উত্তর ও পূর্ববঙ্গ— এই দুই বঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলার শিল্প যা কিছু সব পশ্চিমবঙ্গে, কৃষির প্রধান স্থান উত্তর এবং পূর্ববঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ উভয় অংশেরই অগ্রগতি রোধ করিবে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসম্পদ বাদ দিয়া উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের সামাজিক উন্নতির কথা কল্পনাও করা যায় না, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসম্পদ বাদ গেলে উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য জোতদারের কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসম্পদের উপর গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করিতে পারিলে উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের কৃষক জোতদারের মুখাপেক্ষী না হইয়াও সামাজিক সম্পদ বাড়াইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেও উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কৃষি-অঞ্চল ছাড়িলে চলে না। শিল্পের শতকরা ৮৫ ভাগ এই পশ্চিম অঞ্চলে কিন্তু বাংলার লোকসংখ্যার শতকরা ৬৮ ভাগ উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, নদীয়া, যশোহর এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বাস করে। শিল্পের বেশিরভাগ বাজার যেমন পশ্চিমবঙ্গে তেমনি এই অঞ্চলের শিল্পপ্রধান এলাকায় খাদ্য সরবরাহের জন্য উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উপর নির্ভর করিতে হয়। দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা, বরিশাল এই চারিটি খাদ্যসরবরাহের প্রধান জেলাই উত্তর এবং পূর্ববঙ্গে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে এক বর্ধমান ব্যতীত আর সমস্ত জেলাই আজকাল হয় ঘাটতি জেলা অথবা কোনও

রকমে স্বাবলম্বী। শধু কলিকাতার এবং ২৪ পরগণার শিল্পাঞ্চলের জন্যই উত্তরবঙ্গের খাদ্য অপরিহার্য্য।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর অনেক হিন্দু নেতাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে বাংলাদেশ দ্বিখন্ডিত করা হউক, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুপ্রধান এলাকা লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হউক। হিন্দু কায়েমী স্বার্থের সেবকগণ ভাবিতেছেন যে এইরূপ হিন্দুপ্রধান অংশে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইলে আমরা হিন্দুরাই মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারিব। কায়েমী স্বার্থের দৌড় মন্ত্রীসভা গঠন পর্যন্ত, সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশ এবং ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের কবল হইতে মুক্তিলাভ তাঁহাদের চিন্তার বিষয়বস্তু নয়। জনসাধারণ তাঁহাদের রাজনীতির কাঁচামাল, কাজেই তাঁদের কল্যাণকামনা কায়েমী স্বার্থের কাজ নহে। কায়েমী স্বার্থের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদী প্রভুশক্তিরই সেবা।

ধনতান্ত্রিক শিল্প বাস্তবক্ষেত্রে বাংলার হিন্দু এবং মুসলমানকে, উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গকে অর্থনৈতিক বন্ধনে বাঁধিয়া বাঙালী জাতি সৃষ্টি করিয়াছে। সেই জাতির সর্বসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মুসলমানের দৈন্য এবং অভাবও দূরীভূত করিবে। জমি দখলের লড়াই যেমন হিন্দু এবং মুসলমান কৃষকের স্বার্থ একসঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে, শিল্পসম্পদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের লড়াইও তেমনি তাহাদের একসূত্রে আবদ্ধ করিবে। ২৪ পরগণার চটকলের মুনাফা দ্বারা বাংলায় সস্তায় কাপড় সরবরাহের জন্য কল খুলিলে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের মুসলমান চাষীর অভাব যে দূর হয় তাহা কে না বুঝিবে? বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারই বাংলার মুসলমান চাষীর গোলামী এবং গরীবী হইতে মুক্তিলাভের পথ। বাংলার ঐক্য সকল বাঙালীরই মুক্তি ও নবজীবনের বিকাশলাভের জন্য অপরিহার্য্য। বাংলার ঐক্যের জন্য পাকিস্তান এবং অখণ্ড হিন্দুস্থান দুই বুলিই ছাড়িতে হইবে। স্বাধীন ভারতে বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জন্য লড়িতে হইবে।

ভাষা ও শিক্ষা

জাতি গঠনের প্রধান অবলম্বন ভাষা। ভাষায় ঐক্যই জাতীয়তার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভিত্তি। ভাষার সাহায্যেই মানুষ মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রধান করে, ভাষাই শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন, জাতীয় চরিত্র এবং জাতীয় ভাব এইরূপেই এক একটি ভাষাকে উপলক্ষ্য করিয়া গড়িয়া উঠে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এক ভাষাভাষী অঞ্চলে কারখানা বাজার ও জনতার ভিতর একটি জাতীয় গন্ডী রচনা করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া একট জাতি গঠিত হইতে পারে না, দুনিয়ায় সেরূপ কোন জাতি নাই। এক এক অঞ্চলে শিক্ষা, সাহিত্য, আদালত, আইনসভা সমস্তই ভাষার অবলম্বনে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়, কাজেই উপরে লিখিত এক অর্থনৈতিক আবেষ্টনী ছাড়াও এক জাতির এক ভাষাই হইতে হইবে। সুতরাং সমস্ত ভারতবাসী এক জাতি নয়, ভারতের সমস্ত মুসলমানেরাও এক জাতি নয়। ভারতের মধ্যে বাঙালী একটি স্বতন্ত্র জাতি।

বর্তমান বাংলার ছয় কোটি নরনারী, আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সমতলভূমি এবং বিহারের সীমান্তে কয়েকটি স্থান জুড়িয়া বঙ্গ ভাষাভাষী বা বাঙালী অঞ্চল। এই সমগ্র

অঞ্চল লইয়া নূতন বাংলার সীমানা রচনা করা উচিত কারণ বাঙালী সমাজের ভালমন্দর সঙ্গে এই সমগ্র অঞ্চলই সংশ্লিষ্ট। এই সমগ্র অঞ্চল একতাবদ্ধ হইলে বাঙালী কৃষকের জোর বাড়িবে, তাহারা তাহাদের সমভাষাভাষী এবং সম অবস্থাপন্ন কৃষক প্রতিবেশীদিগকে নিজেদের সঙ্গে লইবে। এই নূতন বাংলার লোকসংখ্যা হইবে প্রায় ৭ কোটি। ৭ কোটি বাঙালীর ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, জমি এবং শিল্প গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হইলে স্বাধীন ভারতে বাংলাদেশ হইবে সাম্য, সুখ এবং শান্তির পীঠস্থান। এই ৭ কোটি বাঙালীর অগ্রভাবে থাকিবে কলিকাতা এবং শহরতলীর বিভিন্ন ভাষাভাষী শ্রমিক এবং তাহার সঙ্গে থাকিবে সারা বাংলার কৃষক ও প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত। স্বাধীন ভারতে এই বৃহত্তর বাংলার সর্বসাধারণ নিজেদের ভাগ্য নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী দ্বারা নিজেরা নির্ধারিত করিবে— ইহাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থ।

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সময় এই বাংলা ভাষা ছিল কৃষকের মুখে মুখে এবং পল্লীকবিদের ছড়ায় ও গীতিকায়। ইংরেজ রাজত্বে যখন স্কুলে, আদালতে ও সরকারি কাজে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন হইল তখন নূতন উদীয়মান সমাজে বাংলার ভবিষ্যৎ হইল অন্ধকার। কিন্তু দাসত্বের বিরুদ্ধে বাঙালীর স্বাভাবিক বিদ্রোহ বাংলাদেশের নিজস্ব ভাষাকে বাঁচাইয়াছে।

লীগনেতারা বলেন যে হিন্দু সংস্কৃতি এবং ভাবধারা আর মুসলমানের সংস্কৃতি এবং ভাবধারা সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার অর্থ হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী বাঙালীরা একটি জাতি হইতে পারে না, বাঙালী সংস্কৃতি বা বাঙালী ভাবধারা বলিয়া কিছু নাই। লীগ নেতাদের এই মতবাদ সম্পূর্ণ অবাস্তব।

সপ্তদশ শতাব্দীর দৌলতকাজী এবং আলাওল প্রভৃতি কৃষক পল্লীকবি বাংলা ভাষায় বাঙালী গ্রাম্য সংস্কৃতির যে রূপ দিয়াছিলেন তাহা হিন্দু বা মুসলমান কাহারও একচেটিয়া নয়, তাহা সমস্ত বাঙালীরই সাধারণ সম্পত্তি।

গাজীর গীত, গম্ভীরা প্রভৃতি কৃষকের সৃষ্ট পল্লীগীতি বাঙালী-সভ্যতারই সম্পদ।

বাংলার কৃষক বাঙালী সংস্কৃতির প্রথম জন্মদাতা। কৃষকের এই সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষা এবং বাঙালী সংস্কৃতির নূতন সম্পদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই লেখকেরা হিন্দু ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের ছাপ আছে, কিন্তু তাহার ভিতর যে হিন্দুত্ব আছে তাহা তাহার গৌণ অংশ মাত্র। তাহার ভিতর পল্লীপ্রধান বাঙালী জীবনের যে মর্মবাণী আছে তাহাই ইহার প্রধান কথা।

কাজী নজরুল ইসলাম, জসিমুদ্দিন প্রভৃতি কবি সেই বলিষ্ঠ বাঙালী সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এবং তাহাকেই তাঁহারা নূতন ভাবে বিকশিত করিয়াছেন। আধুনিক মুসলিম সাহিত্যিকদের শিল্পে ইসলাম ধর্মের যে প্রভাব আছে হিন্দু বাঙালী যেন শুধু সেইটুকু না দেখেন, তাহার ভিতর দেখিতে পারেন পল্লীবাংলার মর্মবাণী। আলাওল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সকলের ভিতরই যাহা সাধারণ তাহাই নূতন বাঙালী সংস্কৃতি— এই সংস্কৃতির ভিতর হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদটা গৌণ, বাঙালীত্বই ইহার মুখ্য, সারবস্তু। হিন্দুধর্ম এবং মুসলমানের ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাংলার সেই নবজাতীয়ত্ব গঠিত হইতেছে।

ইংরেজ সরকার ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করিয়াছে, কংগ্রেস নেতারা চান

হিন্দুস্থানী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করিতে। লীগ নেতারা চান উর্দু ভাষা। আমরা চাই বাংলার রাষ্ট্রপরিচালনা, বাংলার আইন আদালত এবং বাংলার স্কুল কলেজের শিক্ষা বাংলা ভাষায় চলিবে। এই ভাষায় হিন্দু-মুসলমান তফশিলি সকল বাঙালী কথা বলে, কাজেই তাহাদের নিজস্ব ভাষা বাংলাদেশে সর্ববিষয়ে প্রাধান্য লাভ করুক— ইহাই বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।

আজকালকার হিন্দু সাহিত্যিকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক, কৃষক জীবনের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় কম, কাজেই তাঁহাদের লেখায় হিন্দুত্বের প্রাধান্য থাকে। ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলমান তরুণ সাহিত্যিকদের লেখায় ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য হইতেছে। কিন্তু গ্রাম্য কৃষকের জীবন নিজ নিজ ধর্মকে অক্ষুন্ন রাখিয়াই বাঙালীর সাধারণ জীবন এবং সাধারণ ভাবধারা সৃষ্টি করিতেছে। পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীর সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান কিংবা আফগানিস্তানের কাবুলির যত মিল তাহার চেয়ে ঢের বেশি মিল রহিয়াছে তাহার প্রতিবেশী নমঃশূদ্র এবং মাহিষ্য কৃষকের সঙ্গে। এই মিলটাই হইল বাঙালীর জাতীয়তা। গ্রামের কৃষক যখন শিক্ষালাভ করিয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টির কাজে অগ্রণী হইবে তখন বাংলার সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য আরও জোরের সঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইবে।

কৃষক যখন জমির মালিক ছিল তখন সে পল্লীগাথার ভিতর দিয়া বাংলার সংস্কৃতি সৃষ্টি করিত। জমিদার শ্রেণি জমি একচেটিয়া করিবার পর জমিদার শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিরও একচেটিয়া মালিক হইয়াছে। বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাই এইজন্য যাহাতে বাংলার কৃষক শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও অধিকার হইতে পারে।

বাংলার বিরাট কৃষকশ্রেণি আজ শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সমস্ত সুযোগ হইতে বঞ্চিত। বাংলাদেশে আজ মোট সাড়ে সাত জনের অক্ষর পরিচয় আছে। সর্বসাধারণের প্রাথমিক এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগের জন্য বাংলাদেশে সুগঠিত ৩৫০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৯৩০০ উচ্চ বিদ্যালয় চাই। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গণতান্ত্রিক কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া অনুন্নত জনসাধারণের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য চাই এককালীন সাড়ে ১২ কোটি টাকা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য চাই এককালীন সাড়ে ১৪ কোটি টাকা। বাংলার রাষ্ট্র যাহাতে এই ২৭ কোটি টাকা কায়েমী স্বার্থের সম্পত্তি আদায় করিবার অধিকার পায় এবং স্বাধীনভাবে জনসাধারণকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার দিতে পারে তাহারই জন্য চাই বাঙালী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।

রাষ্ট্র

ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশন যে নীতি চালু করিয়াছে তাহাতে বাংলা হইতে ব্রিটিশ সৈন্য এবং ব্রিটিশ মূলধন অপসারণের কোন ব্যবস্থা নাই। এই নীতি সমস্ত বাঙালী স্থান লইয়া অখণ্ড বঙ্গদেশ গড়িতে দেয় নাই, অথচ বাংলাদেশ এবং আসাম প্রদেশকে এক সঙ্গে এক গ্রুপের ভিতর থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। এই বাধ্যতামূলক গ্রুপগঠনের ফলে বাংলার প্রতিবেশী অসমিয়াদের মনে বাঙালী বিদ্বেষ ছড়াইবে কারণ ইহাতে বাংলার জমিদারবর্গ ইংরেজ ধনিকদের গৌণ অংশীদার হিসাবে অসমিয়া কৃষকদের শোষণ করিতে পারিবে। অথচ বিহারের প্রান্তে যে

বাঙালী ভূখণ্ড আছে তাহা বাংলার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে না।

আমরা বাঙালীরা বৃহত্তর বঙ্গে সম্মিলিত হইতে চাই, আমরা চাই ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতর যোগদান করিয়া যে কোন সময় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বঙ্গ রাষ্ট্র গঠনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার। আমরা চাই বঙ্গ রাষ্ট্রের কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতির অবাধ উন্নতির জন্য প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের সহযোগিতা। অন্য কোন প্রদেশকে জোর করিয়া বাংলার সঙ্গে এক গ্রুপে সমবেত করিলে বাঙালীর সঙ্গে অবাঙালীর যে সংঘর্ষ দেখা দিবে তাহার ফলে ইংরেজ পুঁজিপতিরাই শক্তিশালী হইবে।

মুসলিম লীগ বাংলার অখন্ডতায় বিশ্বাসী কিন্তু লীগের দাবি হইল পাকিস্তান অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।

এই দাবির অপরিহার্য্য ফল হইল বঙ্গভঙ্গ, কারণ মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিলে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গকে মুসলিমরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করা অন্যায়।

জোর করিয়া হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গকে মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিলে বাংলাদেশ চিরদিন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আবাসভূমি হইয়া থাকিবে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে লাভবান হইবে ইংরেজ এবং জমিদার। পাকিস্তান মানে বঙ্গভঙ্গ আর বঙ্গভঙ্গ মানে ইংরেজের গোলামী।

হিন্দু এবং মুসলমানের সম্মিলিত বঙ্গভূমি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কিংবা তাহার বাহিরে থাকিবে ইহার মীমাংসা করিবে সম্মিলিত বঙ্গের গণভোট। বৃহৎ বঙ্গের আইন সভায় সর্বসাধারণের ভোটের অধিকার থাকিবে এবং বিভিন্ন দল নিজ নিজ সমর্থকদের অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে।

এই বঙ্গরাষ্ট্রে মুসলমান ও তফশিলিদের পৃথক নির্বাচনের কোন আবশ্যকতা নাই। আজ সর্বসাধারণের ভোটের অধিকার নাই, ভোটের অধিকার আছে মাত্র বিত্তশালীদের। এই বিত্তশালীদের মধ্যে বর্ণহিন্দুর সংখ্যা বেশি, কাজেই এই অবস্থায় পৃথক নির্বাচন না থাকিলে মুসলমান ও তফশিলিদের স্বার্থহানি ঘটে।

কিন্তু সর্বসাধারণের ভোটের অধিকার থাকিলে যুক্তনির্বাচনের সাহায্যে সমস্ত কৃষকেরা মিলিয়া কায়েমী স্বার্থকে ভোটে পরাস্ত করিতে পারে। মুসলমান এবং তফশিলি মিলিয়া বাংলার মোট ছয় কোটি জনসংখ্যার মধ্যে সাড়ে চার কোটি। যুক্ত নির্বাচনে তাহাদেরই লাভ বেশি বরং বর্ণহিন্দুরই স্বার্থহানির আশংকা বেশি। যতক্ষণ সার্বজনীন ভোটের অধিকার নাই ততক্ষণ পৃথক নির্বাচন, সার্বজনীন ভোটের সঙ্গে সঙ্গে চাই যৌথ নির্বাচন। আমরা হিন্দু, মুসলমান, তফশিলি সমস্ত গরীব একসঙ্গে ভোট দিতে চাই, যাহাতে সকলে মিলিয়া বড়লোকের প্রতিনিধিকে পরাস্ত করিয়া গরীবের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারি। ইংরেজ সরকার গরীবের ভোট বিভক্ত করিয়া বড়লোকদের জিতাইবার জন্য সার্বজনীন ভোটের অধিকার না দিয়া পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

যৌথ নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে চাই সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা। বর্তমান ব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের পরাস্ত করা সহজ, কারণ একজন প্রতিনিধি যদি ৫০ হাজার ভোট পায় তবে ৪৯ হাজার ভোট যে পাইবে সে পরাস্ত হইবে, ঐ ৪৯০০০ ভোটারের কোন প্রতিনিধি আইন সভায় স্থান পাইবে না। আমরা চাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী

যে পার্টি মোট যত ভোট পাইবে সেই অনুপাতে প্রত্যেক পার্টির প্রতিনিধির সংখ্যা ঠিক হইবে। এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠরা সমান অধিকার লাভ করিবে। এই ব্যবস্থাই হইল খাঁটি গণতন্ত্র।

কংগ্রেস চায় অখন্ড ভারত, কিন্তু কংগ্রেস বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বঙ্গভূমি রচনার অধিকার দিতে চাহে না। অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেওয়া কিংবা না দেওয়ার স্বাধীনতা হরণ করিয়া কংগ্রেস জোর করিয়া বঙ্গদেশকে ভারতের অন্তর্গত রাখিতে চায়। কংগ্রেসের এই দাবি ইংরেজকে ভেদনীতি চালাইবার সুবিধা দিয়াছে। কংগ্রেসের এই দাবি অখণ্ড ভারতের পরিবর্তে পাকিস্তানের ভোট শক্তিশালী করিয়াছে। আমাদের দাবি হইল যে, বঙ্গদেশের ভাগ্যরচনার জন্য বাংলার জনসাধারণের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, বাংলার স্বাধীন জনমত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিবে।

সংগ্রাম

বাংলার পাঁচ লক্ষ সংগঠিত মজুর আজ বিদেশী মূলধন এবং সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে এটার পর একটা লড়াই চালাইয়া যাইতেছে। মজুরের এই ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম বাঙালীর নিকৃষ্ট শত্রু সামাজ্যবাদী শক্তিকে সর্বদা সন্ত্রস্ত রাখিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইবার পর এই সংগঠিত মজুর যে সব ধর্মঘট পরিচালনা করিতেছে তাহার আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদীর দুর্গ গুলিতে ভূমিকম্পের কাঁপন লাগাইয়াছে। ট্রাম, পোর্ট, রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক, কারখানা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যেকটি দুর্গে আজ অনবরত মজুরের অবরোধ চলিতেছে। পুলিশ জুলুম রুখিবার জন্য এই সংগঠিত মজুর বাংলার সর্বশ্রেণিকেই সাহায্য করে। এই সংগ্রামের গৌরবে বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জনসাধারণের রাজনৈতিক পরিচালকের স্থান গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মজুরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষক। জমি এবং ফসলের লড়াই চালাইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর প্রধান আশ্রয় জমিদারবর্গকে কৃষকেরা অনবরত সন্ত্রস্ত রাখিয়াছে। তে-ভাগার লড়াই এবং জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন গভর্নমেন্টকেও কৃষকের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থিতিশীল ও নিরাপদ করিবার জন্য সরকার যে জমিদারি প্রথার কায়েমী স্বার্থ করিয়াছিল, সংগঠিত কৃষকের আক্রমণে আজ তাহা ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম। বাংলার গ্রামাঞ্চলে ইহাই হইল সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং শক্তিশালী গণসংগ্রাম।

ছাত্রসমাজ বার বার সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে জঙ্গী অভিযান চালাইয়া বঙ্গদেশের নূতন বিপ্লবী ইতিহাস রচনা করিতেছে। আজাদ-হিন্দ-ফৌজ দিবস, রসিদ আলি দিবস এবং ভিয়েতনাম দিবসের ছাত্র অভিযানে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় জনতার সঙ্গে পুলিশের যে সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে তাহাতে সর্বশ্রেণি যোগদান করিয়াছে।

গণসংগ্রামের এই জোরালো গতির সম্মুখে সাম্রাজ্যবাদীর ও কায়েমী স্বার্থের ভেদনীতি দাঁড়াইতে পারে নাই। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ কিছুকালের জন্য এই সংগ্রামের গতিবেগ দুর্বল করিয়া দিয়াছিল কিন্তু থামাইয়া দিতে পারে নাই। হাসনাবাদ এবং একলাশপুরের কৃষক ও কলিকাতার সংগঠিত মজুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার গতিরোধ করিয়াছে। বাংলার উনিশটি জেলার কৃষক ফসলের সংগ্রামে পুলিশের সশস্ত্র শক্তি প্রতিরোধ করিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনের সেতু

ইস্পাতের মত শক্ত করিয়া দিয়াছে।

সংগ্রামের পথে এমন করিয়াই স্বাধীনতার ঐক্যবদ্ধ শিবির গঠিত হইবে। এমনি করিয়াই সারা ভারতের জনগণ একদিন রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগ্রামে অগ্রসর হইবে। প্রায় দুইশত বৎসর পর আজ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্তধারায় পলাশীর কলঙ্ক ধুইয়া যাইতেছে। কলিকাতার পথে পথে এবং গ্রামের মাঠে মাঠে রাজশক্তির অত্যাচরের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়িয়া উঠেতেছে ইহাই নূতন বাঙালীজাতির সৃষ্টিকর্তা, ইহাই একদিন চূড়ান্ত আঘাতে স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাংলার জন্ম দিবে।

টিকা : এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। উদ্দেশ্য ছিল অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিতব্য প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনের জন্য লিখিত খসড়া এই দলিলের ওপর আলোচনা। এই প্রস্তাবটি লিখিতকালে অ্যাটলীর ঘোষণা অনুসারে ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ নির্ধারিত ছিল ১৯৪৮ সালের জুন মাসে। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানে তা এগিয়ে নিয়ে আসা হয় অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য সম্মেলনের আগে ১৯৪৭ এর আগস্টে। তাই সম্মেলনের সময়কালের বিচারে না মিললেও, মর্মবস্তুর দিক থেকে তার মূল্য ছিল সমধিক। — সম্পাদক

স্পেশাল পাওয়ার্স বিল

'বিশেষ ক্ষমতা আইনের ধারায় ধারায় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু : দলীয় আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার লোভে ন্যায্য প্রতিবাদেরও কণ্ঠরোধ : দেশব্যাপী প্রতিবাদে জাতীয় সর্বনাশ রোধ করুন'—

বিনা বিচারে জেল সংবাদপত্রের সেন্সর, গুরুতর শিল্পে ন্যায্য ধর্মঘটও নিষিদ্ধ, রাজনৈতিক ধর্মঘটে পাঁচ বছরে সাজা, সরকারি কর্মচারীদের অভিযোগ চাপা দেওয়া, প্রমাণ ও বিচার বিহীন নিরঙ্কুশ দমননীতি—

'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা বিল' (স্পেশাল পাওয়ার্স বিল) মারফত পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিশেষ ক্ষমতা (কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতা প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে) গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : ভবিষ্যতে যে কোন রকম 'ব্যাপক বিশৃঙ্খলা' (disturbance) দমন করার জন্যেই এই আইন। ... যেকোন সাধারণ অবস্থায় আমলাতন্ত্র এই আইন প্রয়োগ করতে পারবে বিনা বিচারে ও বিনা প্রমাণে শ্রমিক, কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের গ্রেপ্তার করে মালিক, জমিদার ও চোরাকারবারীদের তুষ্ট করতে। আর মন্ত্রীমণ্ডলী তথা দলীয় গভর্নমেন্ট যাতে তাঁদের আইনসঙ্গত বিরোধী পক্ষকেও বিনা বিচারে ও বিনা প্রমাণে শাস্তি দিয়ে ন্যায়সঙ্গত বিরোধিতারও কণ্ঠরোধ করতে পারেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বর্তমান আইনে অনুমোদিত শ্রমিক আন্দোলনকেও বে-আইনি করে দিতে পারেন ও ধ্বংস করতে পারেন— বিলটির তাই হ'ল প্রধান উদ্দেশ্য। বিলের কয়েকটি ধারা নীচে বর্ণনা করা হলো, এ থেকেই বোঝা যাবে কি ভয়ঙ্কর আইন আজ কংগ্রেসের নাম নিয়ে চাপানো হচ্ছে।

১৬ ধারা — প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট (অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলের পুলিশ ও সিভিলিয়ানতন্ত্র কিংবা যে দল পরিষদে অধিকাংশ তাদের প্রতিনিধিরা) নিজেদের খুশিমত যেকোনো লোককে বিপজ্জনক বলে মনে করবেন, তাকেই তাঁরা বিনা বিচারে জেলে বন্দী করে রাখতে পারবেন, অন্তরীণ, বহিষ্কার, থানায় হাজিরা বা অন্য যেভাবে খুশি তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন। এর বিরুদ্ধে আদালতে কোনো আপীল চলবে না।

এন্ডার্সনী আইন— বিলের এই ধারাটি এতদিন অর্ডিনান্স আকারে বিল। (ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ) মন্ত্রিসভার আমলে কোনো চোরাকারবারী বা সাম্প্রদায়িক গুণ্ডা বা জীপ ডাকাতির নায়ককে ধরার জন্য এ ধারা একবারও প্রয়োগ করা হয়নি। কিন্তু প্রয়োগ করা হচ্ছে খিদিরপুর ব্রুকবণ্ড সাহেব কোম্পানীর ছ'জন হিন্দু ও মুসলমান ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর, আর প্রয়োগ করা হয়েছে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর এবং তাঁকে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে তা তাঁর

স্ত্রীকে পর্যন্ত জানতে দেওয়া হয়নি।

... এই ১৬ ধারার ৪ উপধারায় বলা হয়েছে যাদের বিনাবিচারে বন্দী করা হবে তাদের খাওয়া, শোওয়া, শাস্তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট যা খুশি স্থির করতে পারেন। অর্থাৎ তাদের যদি কয়েদীর মত খেতে পরতে দেওয়া হয় তাতেও আপত্তি করা চলবে না। ব্রিটিশ আমলে অন্তত এটুকু ছিল যে যাদের বিনা বিচারে বন্দী করা হত তাদের খাওয়া পরার কষ্ট দেওয়া হত না। কংগ্রেসী আমলে কি সে কষ্টও দেওয়া হবে?

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ

৯ ধারা— প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট নিজেদের খুশিমত যে কোন সময়ে যে কোনো সংবাদপত্রকে হুকুম দিতে পারবেন যে, কোন কিছু ছাপা বা মন্তব্য করার আগে গভর্নমেন্টের মঞ্জুরি নিতে হবে, মঞ্জুরি না পেলে ছাপতে পারবেন না। ছাপলে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা দুইই হতে পারবে।

অর্থাৎ মন্ত্রিসভা যদি এমন কোন অন্যায় করেন যাতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয় এবং মন্ত্রিসভার মঞ্জুরি না পেয়েও কাগজে কঠোর সমালোচনা হয় তখন মন্ত্রিসভা সেই কাগজের সম্পাদককে পাঁচ বছর সাজা দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করতে পারবেন।

৭ ধারা— (ক) যদি কেউ এমন কিছু করেন যাতে খাদ্য, জল, জ্বালানি, আলো, বিদ্যুৎ, যানবাহন ব্যবস্থা বা অন্য যে কোনো জরুরি জিনিস সরবরাহ ও বন্টনে মুশকিল হয় বা হতে পারে তাহলে তাঁর পাঁচ বছর জেল হবে।...

(খ) সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করলে, তাদের শৃঙ্খলা রক্ষায় বাধা সৃষ্টি করলে ... পাঁচ বছর জেল হবে...।

(গ) জনসাধারণের কোন অংশে ভয় সৃষ্টি করলে পাঁচ বছর জেল হবে।

(ঘ) ... যে কোন কারখানায় শিল্পবিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন কারণে ধর্মঘট করলে বা ধর্মঘটের জন্য প্রচার করলে পাঁচ বছর জেল হবে। কেন্দ্রীয় পরিষদে এমনি একটি আইন এসেছিল কিন্তু তাঁরা জনমতের চাপে তা প্রত্যাহার করেছেন। ঘোষ মন্ত্রিসভা যে ফাঁক পূর্ণ করেছেন।

(ঙ) পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের যে কোনোটি সম্বন্ধে কোন লেখা, ছবি, দলিল ইত্যাদি তৈরি, ছাপানো বা বিলির শাস্তি পাঁচবছর জেল।

সম্পাদককে পুলিসের গুপ্তচর হতে হবে

৮ ধারা— কোনো কাগজে যদি কেউ ঐ ধরনের কোন রিপোর্ট পাঠায় তবে সম্পাদকের ওপর হুকুম হলেই রিপোর্টরের নাম জানাতে হবে, নইলে তিন্ বছর সাজা...।

২৯ ধারা— যে কোনো দারোগা যদি তাঁর প্রকাণ্ড বিচার বুদ্ধি দিয়ে মনে করেন, কোনো লোক নিরাপত্তা-বিরোধী কাজ করছে অথবা গভর্নমেন্ট কর্তৃক বিজ্ঞাপিত এলাকায় কোনো লোক

বিদ্রোহের সাহায্য করছে বলে দারোগা বাহাদুর মনে করবেন, তাকেই বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করতে পারবেন।

চোঙ্গা ফুকলেও তিন বছর

১৯ ধারা— গভর্নমেন্ট নিজের খুশিমত ঢালাও হুকুম দিয়ে বা বিশেষ হুকুম দিয়ে রাস্তায় বা প্রকাশ্য জায়গায় লাউড স্পীকার থেকে টিনের চোঙ্গা পর্যন্ত যে কোনো শব্দযন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে পারবেন। সে হুকুম অমান্য হলে তিন বছর জেল এবং যন্ত্র বাজেয়াপ্ত।

২২ ধারা— গভর্নমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট যে কোনো এলাকায় শান্তি রক্ষার বা সম্পত্তি পাহারার কাজে সাহায্য করার জন্য যেকোনো পুরুষকে বাধ্য করা যেতে পারবে। অমান্য করলে ছ'মাস সাজা। ...

৩০ ও ৩৫ ধারা— শুধু প্রদেশিক গভর্নমেন্টই নন, তাঁদের অফিসারদেরও এই আইনের যেকোনো ধারা প্রয়োগের ক্ষমতা বর্ত্তাতে পারে। আর এই আইনের কোনো ধারার কোনো হুকুমের উপরই আদালতের বিচার চলবে না।

... চারদিক থেকে এখনি এর দারুণ প্রতিবাদ না উঠলে দেশে স্বাধীনতার অপমৃত্যু ঘটবে।

স্বাধীনতা, ২৯শে নভেম্বর ১৯৪৭

সহায়ক তথ্য - ৭

স্পেশাল পাওয়ার্স বিলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

১

কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যারিষ্টারবৃন্দের বিবৃতি—

পশ্চিমবঙ্গ স্পেশাল পাওয়ার্স বিল সম্পর্কে কলিকাতা হাইকোর্টের মিঃ এস পি রায়, বি সি ঘোষ, এন সি চ্যাটার্জি, এইচ এন মিত্র, এন এন বোস, পি এন সেন, এস সি সেন, বি কে ঘোষ, এস বসু, এম চ্যাটার্জি, পি সি বোস, কে সি মুখার্জি, জে কে ঘোষ, বি দাস, জে কে বসু, অমিয়কুমার বসু, এ এন রায়, এম এম সেন, নীরেন দে, বি রায়চৌধুরী, এস কে সেনগুপ্ত, অরুণ সেন প্রমুখ ৬১ জন ব্যারিষ্টার নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

"প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ স্পেশাল পাওয়ার্স বিল আমাদের মর্মাহত করিয়াছে। বিনা বিচারে আটক সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, প্রতিষ্ঠান গঠনের ও ধর্মঘট করিবার অধিকার অপহরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা আমরা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চরম অত্যাচারের যুগেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রস্তাবিত বিলে এই সকল ব্যবস্থাই স্থান পাইয়াছে ...।"

(স্বাধীনতা-৩ ডিসেম্বর ১৯৪৭)

২

বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিকদের দাবি—

৩রা ডিসেম্বর শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রথীন মৈত্র, জ্যোতির্ময় রায়, গোলাম কুদ্দুস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রভৃতি কলিকাতার বহু বিশিষ্ট প্রগতিশীল সাংবাদিক ও সাহিত্যিক 'স্পেশাল পাওয়ার্স বিল' প্রত্যাহারের দাবি জানাইয়া বিবৃতি দিয়াছেন...।

(ঐ, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

সহায়ক তথ্য - ৮

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়

'বিশেষ ক্ষমতা'

বর্তমান অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের শাসনকার্য চালাইবার জন্য গভর্নমেন্টের পক্ষে কতগুলি বিশেষ ক্ষমতার দাবি-করিয়া প্রধানমন্ত্রী মহাশয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট উত্থাপিত হইবে। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থা পরিষদ উহার মূল নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন অর্থাৎ পরিষদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থায় শাসনকার্য চালাইতে গভর্নমেন্টের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, পরিষদে প্রধানমন্ত্রী যখন এই প্রস্তাব উত্থপন করেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিলেন মাত্র দুইজন এবং সে দুইজনই কম্যুনিস্ট সদস্য।

প্রস্তাবিত আইনটি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে উল্লিখিত বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করি। মাত্র দুইজন কম্যুনিস্ট সদস্য ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ একবাক্যে এই বিলের মূলনীতি মানিয়া লইয়াছেন; বর্তমান অবস্থায় এইরূপ বিশেষ ক্ষমতা গভর্নমেন্টকে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা স্বীকার করিয়া পরিষদ সদস্যগণ পরস্পরের বিবেচনানুযায়ী সংশোধনের জন্য বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাইয়াছেন। অবস্থা বিবেচনায় গভর্নমেন্টের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দিতে হয় ইহা সর্বত্র স্বীকৃত রীতি ও নীতি। শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত বর্তমান অনিশ্চয়তার মধ্যে সেইরূপ অবস্থা দেখা দিয়াছে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ প্রায় একবাক্যে ধার্য করিয়াছেন। বিরুদ্ধ সমালোচকগণের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার ও ভাবিবার বিষয়।

প্রস্তাবিত আইনটি সম্বন্ধে মনোভাব নির্ধারণের সময় আর একটা কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। বৈদেশিক গভর্নমেন্ট ও যে গভর্নমেন্ট আপনাদের আয়ত্তের বাহিরে সেই গভর্নমেন্টের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দিতে যে কারণে আপত্তি করা হয়, জাতীয় গভর্নমেন্ট ও আপনাদের আয়ত্ত গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে সে কারণ বর্তমান থাকে না। এ গভর্নমেন্ট জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সংগঠিত এবং উহা স্বৈরাচারী হইলে সহজেই উহাকে অপসারিত করা যায়। সুতরাং বৈদেশিক গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরের গভর্নমেন্ট যে ক্ষমতা লইতে চাহিলে প্রবল প্রতিবাদ দেখা দেয়, জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সংগঠিত গভর্নমেন্টের হাতে সে ক্ষমতা অর্পণ করিতে লোকে সঙ্কুচিত হয় না। সাময়িক প্রয়োজনে মৌলিক অধিকারের সঙ্কোচের এই সম্ভাবনা তাহারা আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তার স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লয়। তাহারা জানে, জনসাধারণের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত এই বিশেষ ক্ষমতাকে গভর্নমেন্ট যদি অপপ্রয়োগ করেন, বা স্বৈরাচারে প্রয়োগ

করেন তৎক্ষণাৎ সে গভর্নমেন্টকে তাহারা টানিয়া নামাইতে পারে।

বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবার পর হইতে মন্ত্রিমণ্ডলের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া সংবাদপত্রে যে সকল আলোচনা হইয়াছে এবং সম্প্রতি প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়— বিশেষ কারণে এবং বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গভর্নমেন্টের বিশে ক্ষমতা গ্রহণ ও প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তবে সকল দিক হইতেই একটা কথা প্রধানভাবে প্রকাশ পাইতেছে— আইনের দ্বারা প্রদত্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা অপব্যবহারের আশংকা। সেই কথাটাই বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি। কয়েকটি দিক দিয়া এই আশংকার কথা উঠিয়াছে : প্রথম— আইনের দ্বারা পুলিশ ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারিদের হাতে যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, তাহারা সে ক্ষমতা সঙ্গতভাবে প্রয়োগ করিবে কিনা এবং স্বৈরাচারে প্রয়োগের লোভ সংযত করিতে পারিবে কিনা। দ্বিতীয়— মন্ত্রীদের অন্তরালে থাকিয়া পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীরাই প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইবে কিনা। তৃতীয়— বিশেষ আইনের বলে প্রাপ্ত ক্ষমতা গভর্নমেন্ট হিসাবে নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ না করিয়া যে রাজনৈতিক দল সাময়িকভাবে শাসন-শক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদের দলগত স্বার্থে ব্যবহৃত হইবে কিনা। চতুর্থ— প্রস্তাবিত আইনে-সংবাদপত্রের ক্ষমতা ও অধিকার যেভাবে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, তাহার ফলে আইনের অপপ্রয়োগ প্রশ্রয় পাইবে কিনা।

সম্প্রতি আহূত সম্পাদকগণের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মহাশয় প্রস্তাবিত আইনের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধীয় আশঙ্কা নিরসন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রেই এই আইন প্রযুক্ত হইবে— (১) সাম্প্রদায়িক শান্তির ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনায়, (২) অবৈধভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ নিবারণের জন্য, (৩) গুন্ডা দমনের উদ্দেশ্যে, (৪) সীমান্তে গুপ্তচর বৃত্তি ও গুপ্তভাবে দ্রব্যাদি অপসারণ (৫) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। এই সকল ক্ষেত্রে বিশেষ আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত হইবেন এবং তাহাকে সমর্থন করিবেন। কিন্তু পুলিশের ও সরকারি কর্মচারীদের হাতে ক্ষমতার অপব্যবহারের যে আশংকা লোকের মনে আছে, তাহাও অগ্রাহ্য করিবার নহে। এই ক্ষেত্রে মন্ত্রিমন্ডলের বিশেষ সতর্ক হইবার কারণ রহিয়াছে। পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীরা যদি মন্ত্রিমন্ডলের অন্তরালে থাকিয়া ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করে, তবে একমাত্র মন্ত্রিমন্ডলের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই তাহা-প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে। ব্যক্তিগত চরিত্র ও প্রভাবের দ্বারা প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা যদি স্ব স্ব বিভাগের কার্য সম্পূর্ণভাবে আপনাদের আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে পুলিশ ও কর্মচারীদের হাতে ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা যদি কেবল সেক্রেটারী-নির্ভর হন, তাহা হইলে প্রাপ্ত ক্ষমতার সঙ্গত ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান থাকিব।

সর্বাপেক্ষা প্রধান হইল বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে মন্ত্রীদের ও কর্মচারীদের আচরণের সমালোচনা করিতে সংবাদপত্রসমূহকে অক্ষুণ্ণ অধিকার দেওয়া। সংবাদপত্রের অধিকার যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাতে লোক-চিত্তের আশংকা প্রশমিত হইবে। প্রস্তাবিত আইনের কয়েকস্থলে সংবাদপত্রের মৌলিক অধিকারে এমনভাবে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, যাহা কোনমতেই সহনীয় নহে। সংবাদবিশেষ গভর্নমেন্টের পক্ষে আপত্তিজনক হইলে উহার মূল প্রকাশ করিবার জন্য

সম্পাদককে বাধ্য করা হইবে— ইহা যদি প্রচলিত আইনের বিধান হয়, তাহা হইলে সংবাদপত্র পরিচালনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। আইনের অষ্টম ধারার এই ব্যবস্থা ছাড়া নবম ধারায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করিলে সংবাদপত্রের প্রবন্ধাদি প্রকাশের পূর্বে সেন্সর করিবেন। এ ব্যবস্থাও সংবাদপত্রের মৌলিক অধিকারে আঘাত করে। ইহা ছাড়া আইনের ২৩ ধারাটিও সংবাদ প্রেরকের নাম প্রকাশে বাধ্য করিবার জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহারই সংশোধন করিতে হইবে।

অবস্থাবিশেষে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও মন্ত্রিমন্ডলকে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নীতি স্মরণ রাখিয়া চলিতে অনুরোধ করিব। শাসনকার্য ততক্ষণই সার্থক ও স্বাভাবিক, যতক্ষণ উহা সহজভাবে সাধারণ আইনের দ্বারা নির্বাহ করা যায়। শাসকগণ যখন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে উদ্যত হন তখন বুঝিতে হইবে জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের সহজ সাম্যাবস্থা বিচলিত হইয়াছে। সুতরাং বিশেষ ক্ষমতা যত কম প্রযুক্ত হয় শাসক ও শাসিত উভয়ের পক্ষেই তাহা মঙ্গল।

প্রাপ্তি স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ ডিসেম্বর ১৯৪৭

সংশোধিত নিরাপত্তা বিলের প্রতিবাদ

সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সংশোধিত আকারেও পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা বিল জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ৯ই ডিসেম্বর সিটি, স্কটিশ চার্চ, রিপন কলেজ ছাত্রদের প্রতিবাদ সভায় প্রত্যাহার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিলের প্রতিবাদে জয়পুরিয়া কলেজে আজ ছাত্রদের ধর্মঘট হইয়াছে। ভারতীয় সাংবাদিক সংঘের সাধারণ সভায় প্রত্যাহার দাবি করিয়া বলা হইয়াছে যে এই জরুরি আইনের কালে বোম্বাইতে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কাগজেরও কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে; বাংলায় তাহার পুনরাবৃত্তি হইতে দেওয়া হইবে না। শ্রী শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের ১৫ জন প্রতিনিধি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বিলে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করা হইয়াছে, ইহার প্রত্যাহার চাই। শ্রী মৃণালকান্তি বসু বিলের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বিলের নাম বদলানো হইলেও, আসল উদ্দেশ্য বদলানো হয় নাই, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ধ্বংস করাই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহার প্রত্যাহার চাই। ...

নিরাপত্তা বিলের প্রতিবাদে শ্রী শরৎচন্দ্র বসু (সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি), মিঃ আবুল হাশিম এম এল এ, দেবেন্দ্র নাথ মুখার্জী (হিন্দু মহাসভা), মাখন পাল (আর এস পি), ত্রিবিদ চৌধুরী (আর এস পি), হেমচন্দ্র ঘোষ (এস আর পি), নিরঞ্জন সেন (কমিউনিস্ট পার্টি), শ্রী জ্যোতি বসু এম এল এ (কমিউনিস্ট পার্টি), শ্রী শৈলেন চক্রবর্তী (বেঙ্গল ব্রিগেড), শ্রী স্নেহাংশু আচার্য (কমিউনিস্ট পার্টি), শ্রী ভূপেশ গুপ্ত (কমিউনিস্ট পার্টি), শ্রী মনোরঞ্জন রায় (বিপিটিইউসি), শ্রী বিশ্বনাথ দুবে (বলশেভিক পার্টি) এবং এন সি চ্যাটার্জি (হিন্দু মহাসভা) প্রমুখ বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এই বিলের বিরোধিতা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ...

(স্বাধীনতা, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৭)

বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করো

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জ্যোতি বসুর ভাষণ

১৯৪৭ সাল ২৭ নভেম্বর

ডঃ *প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ* : স্যর, বিশেষ পাওয়ার্স বিল, ১৯৪৭ পেশ করার জন্য আমি আবেদন করছি।

জ্যোতি বসু : আমি বিল পেশ করার বিরোধিতা করছি।

অধ্যক্ষ : এটা হতে পারে না।

জ্যোতি বসু : কেন নয়?

অধ্যক্ষ : সভার সামনে কোনো প্রস্তাব নেই।

(বিধানসভার সচিব বিলের সংক্ষিপ্তসার পড়েন)

ডঃ *প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ* : স্যর, পশ্চিমবঙ্গ স্পেশাল পাওয়ার্স বিল বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

মহঃ খুদা বক্স : ...

অধ্যক্ষ : অর্ডার অর্ডার, আমি মাননীয় সদস্যদের নাম যেভাবে আছে সেই ক্রমানুযায়ী বলতে বলব। মি. জ্যোতি বসুকে তাঁর সংশোধনী উত্থাপন করতে বলছি।

জ্যোতি বসু : মি. স্পিকার, আমার সংশোধনী প্রস্তাবে আমি প্রথমেই বলতে চাই যে, ১৫ই মার্চ, ১৯৪৮-এর মধ্যে গণ-মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে এই বিল সাধারণ্যে প্রচারিত হোক।

এই সংশোধনী উত্থাপন করে আমি একে একটি অনিষ্টকারী বিল হিসাবে চিহ্নিত করতে চাই। এই কয়েক মাস আগে যখন মি. সুরাবর্দি ঠিক এরকমই একটা বিল সভায় পেশ করেছিলেন তখন কংগ্রেস এই ব্যাপারে একমত ছিল যে এই বিল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। আমার মনে হয়, গত ছ'মাসে পরিস্থিতির এমন কিছু বিশাল পরিবর্তন ঘটেনি যার ফলে এইরকম একটা বিল আনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এ সভায় শক্তি বিন্যাসের বিষয়টি বিবেচনা করে, এ বিলের পাশ হওয়া আটকে দিতে পারবো এমন কোনো ধারণা থেকে আমি এই সংশোধনী আনছি না। কিন্তু, পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে এ-বিলের বিরুদ্ধে আমি আমার নৈতিক আপত্তি প্রকাশ করতে চাই। স্যর, বিদেশী সরকারেব ঘৃণ্য ভারত-সুরক্ষা আইন চিরস্থায়ী করে রাখতে চায় এই বিল। গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে এর

অবস্থান। এতো বছর ধরে কংগ্রেস যার পক্ষে দাঁড়িয়েছে, যার জন্যে তার এতো লড়াই সব কিছুকেই এই বিল লঙ্ঘন করছে। এর চেয়েও সাংঘাতিক হলো ব্রিটিশের একটা অজুহাত ছিল— তারা বিদেশী, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, সে কারণে সর্বজনীন বিরোধিতা সত্ত্বেও, এদেশে এই ভারতরক্ষা আইনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আজকের বাংলায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের কাছে কোনো যুক্তি নেই, কোনো অজুহাত নেই এরকম একটি বিল আনার জন্য। আমি জানি, আজ বাংলার শাসনক্ষমতা হাতে রাখতে কংগ্রেসের অনেক রকমের অসুবিধা হচ্ছে। এই বাংলার সমস্ত অংশের মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে অনেক জরুরি পদক্ষেপ, চটজলদি ব্যবস্থা যে নিতে হবে তা জানি। কিন্তু এই সমস্ত পদক্ষেপের সমর্থনে সমস্ত মানুষকে সরকারের পাশে দাঁড় করাবার জন্য প্রয়োজন জনসমাবেশ, মানুষকে সংগঠিত করা— একটা অধ্যাদেশ (ordinance) কি এরকম কোনো আইন তার বিকল্প হতে পারে না। কোনো শত্রু যদি থাকেই— আর একটা খুবই দুর্ভাগ্যের যে আজ হঠাৎ করে কংগ্রেস এখানে সেখানে সর্বত্র শত্রুর গুঞ্জন শুনতে শুরু করেছে— যদি সত্যিই কংগ্রেসের এমন কোনো শত্রু থাকে এবং তারা যদি এতই শক্তিশালী হয়ে উঠে থাকে, এতোই প্রবল যে, সাধারণ মানুষের সেবার জন্যে শত্রু দমনে আরো ক্ষমতার প্রয়োজন কংগ্রেসের তবে আমি বলবো এরাজ্যে এবং সারা ভারতে আজ কংগ্রেসকে ক্ষমতার আসনে নির্বাচিত করেছে তারা ছাড়া আর কেউ সরকারকে সেই সমর্থন দিতে পারে না। কেবল অলীক প্রতিচ্ছবি দেখার বদলে, মানুষের মনে সব ধরনের সংশয় সৃষ্টি করার বদলে— আমার বলতে খারাপ লাগছে, চারিদিকে একটা দূষিত আবহাওয়া তৈরি করা হচ্ছে, মানুষকে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হচ্ছে না— কারা শত্রু, তারা কী করার চেষ্টা করছে— পরিষ্কার ভাষায় সুস্পষ্টভাবে জনসাধারণের উপর আস্থা রাখতে হবে। শত্রুদের নাম জানাতে হবে— তাহলে আজ কংগ্রেস সাধারণ মানুষের জন্য যা যা করতে চাইছে সেই প্রতিটি ন্যায্য ব্যবস্থার পক্ষে কংগ্রেস সরকারের সমর্থনে জনতার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হবে— কিন্তু তার বদলে এরকম আইন জারি করা যেতে পারে না— যা কোনো আইনই নয়। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে কংগ্রেসই তো এসব কথা আমাদের শিখিয়েছে — কিন্তু আজ হঠাৎ যখন কংগ্রেস নিজে ক্ষমতায় এলো, ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো গণতন্ত্রের সব বাণী এবং বিল পেশ করা হলো। মি. স্পিকার স্যার, এরকম একটা আইন প্রণয়নের জন্য কংগ্রেসের নেতাদের বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন হচ্ছে না এটাই বড় আশ্চর্যের কথা।

স্যর, আমি জানি যে, বিপদগ্রস্ত এই দেশের সামনে কী কী যুক্তি খাড়া করা হবে আমি জানি। এটা বলা হবে যে, জনগণের স্বার্থে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে— কিষাণ, মজুর, মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থে— সকলের জন্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষার এবং স্বাস্থ্যের সুযোগ সৃষ্টি করতে সরকারের হাতে আরো কিছু অসাধারণ ক্ষমতা সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আজকের ভারতে ইতিমধ্যে যে আইন বলবৎ রয়েছে তার ওপর আরো কর্তৃত্ব ফলানোর ন্যায্যতা কী সেটাই আমি জানতে চাই। জনসাধারণের সমর্থন পাওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে সরকারের— অমি বলছি, যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বর্তমান আইনে— এমন ক্ষমতা যে, কোনো শত্রু যদি কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আজ সামান্য একটু মাথা ওঠায় তবে তার নিস্তার নেই। তবু কেন যে এই বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সেটাই বুঝে ওঠা অসম্ভব।

মি. স্পিকার, এই বিলের উপর এর বেশি কিছু আমি কখনই বলছি না। প্রত্যেকটি ধারাকে

একটার পর একটা আমি উল্লেখ করছি। কিন্তু তার আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করতে চাই যেখানে তিনি বলেছিলেন : "দক্ষতার প্রশ্নে সিভিল সার্ভিসের একটি স্বঘোষিত সুনাম ছিল। কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে সংকীর্ণ কর্মক্ষেত্রের বাইরে তারা অসহায় ও অদক্ষ। গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করার কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না তাদের"— 'গণতান্ত্রিকভাবে' শব্দটিকে খেয়াল করুন— "আর যে জনতাকে তারা একাধারে ভয় পেত এবং অবজ্ঞা করত তাদের শুভেচ্ছা, তাদের সহযোগিতা তারা কোনোমতেই লাভ করতে পারত না। সামাজিক অগ্রগতির দ্রুতসঞ্চারী পরিকল্পনার কোনে ধারণাই ছিল না তাদের। তাদের কল্পনাশক্তির অভাব আর লাল ফিতের ফাঁস কেবলমাত্র এই অগ্রগতির পথ বন্ধ করতে পারত।" আমাদের দেশের আই সি এস-দের সম্পর্কে এই কথা বলেছিলেন পন্ডিত নেহরু। কিন্তু আমি দেখছি যে, এই কংগ্রেসী-মন্ত্রিসভা ক্ষমতা হাতে পেয়েই অতীতের এতগুলো বছরে সিভিস সার্ভিস যা যা করেছে তার সমস্ত নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে। তাদের বিল তৈরি করতে বলা হয়েছে আর মাননীয় ডঃ ঘোষের মতো জনপ্রিয় নেতার সামনে সে বিল পেশ করতে বলা হয়েছে। অবাক কান্ড যে, আমলাতন্ত্র তাঁর সামনে যা কিছু নিয়ে আসছে তার ওপরই তিনি শুধু সরকারি মোহর লাগিয়ে দেবেন। কিন্তু এজন্য তো কেবল আমলাতন্ত্রকেই দায়ি করবো না। কেননা ডঃ ঘোষ তো জানেন, তিনি কি করছেন। এই সমস্ত আইনের অশুভ দিকগুলো তাঁর নিজের খুব ভালো করেই জানা। ব্রিটিশরা যখন এদেশে ছিলো তখন তাদের এধরনের সব কুখ্যাত আইনকানুনের বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ মানুষকে সর্বশক্তিতে মরণপণ সংগ্রাম করার শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনিই আর তাঁর মতো আরো সব নেতারা। বারেবারে আমরা শপথ নিয়েছি যে স্যর জন অ্যান্ডারসনের শাসনের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতিতে আর আমরা ফিরে যাব না। আমরা তাকে ঘৃণা করেছি, যতবার এরকম কোনো আইন পাশ করানো হয়েছে ততবারই যখনই পেরেছি জনতার উদ্দেশে আমাদের বক্তৃতায়, আমাদের সভায় আমরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি, প্রতিবাদ জানিয়েছি। কিন্তু স্যর, আজ যন্ত্রণাকাতর বাংলার মানুষ তীব্র হতাশায় এই কথাই জিজ্ঞাসা করবে যে, যখন সরকারের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে তখন এরকম একটা আইনের কী প্রয়োজন। আমাদের ওপর ভরসা না করে সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে পায়ের তলায় পিষে ফেলেছে যে আমলাতন্ত্র তার ওপর আস্থা রাখার কি প্রয়োজন সরকারের।

অন্তরপক্ষে, জনতার মতামতের জন্য সাধারণ্যে এ বিল প্রচার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে সবিশেষে আমি তাঁর সুবিবেচনার উপর আস্থা রেখে বলব, এই বিলের পরিণতি কী হতে চলেছে। এতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না, মানুষের অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে না। এর অর্থ হবে, যখনই জনসাধারণ অন্নের দাবিতে সোচ্চার হবে, যখনি তারা আরো ভালোভাবে বেঁচে থাকতে চাইবে আর তাদের দাবির সমর্থনে জনসভা করবে, বিক্ষোভ জানাবে, তখনি মন্ত্রীপরিষদের ভেতর কিংবা আমলাতন্ত্রের ভেতর ফিস্‌ফিসে স্বর শোনা যাবে, "এই মানুষগুলো ক্ষমতা দখল করতে চলেছে অতএব এদের শেষ করে দিতে হবে।" তারপর সমস্ত গণসংগ্রামকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। যেভাবে মি. সুরাবর্দি গণআন্দোলনকে স্তব্ধ করতে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন, আমি নিশ্চিত জনতার সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে বাংলার আমলাতন্ত্রের হাতে আবার সেই ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে। আমি জানি, এমনকি এখনও বিশেষ

ক্ষমতা অধ্যাদেশের বলে কত শ্রমিককে সরকার আটক করেছে। অতীতের মতো ব্যাপার-স্যাপার এমনকি এখনও ঘটতে চলেছে। আজই কয়েকজন আমার বাড়িতে এসে জানিয়ে গেলেন যে, শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ ক্ষমতা অধ্যাদেশে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেস যদি কোনো অভিযুক্তকে আদালতে হাজির না করতে পারে, তবে তাঁকে জনতার আদালতের মুখোমুখি হতে দেওয়া হোক। তা যদি না পারে, তবে শাসন ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার কংগ্রেসের নেই। এটা করার মতো যথেষ্ট জনসমর্থন কংগ্রেসের আছে। কংগ্রেস সরকারের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাবার মতো যথেষ্ট জনসমর্থন রয়েছে এখন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, দমনপীড়ন শুরু হয়েছে। যেমন, বাংলার শ্রমিকদের বিষয়ে আমাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী কী ধরনের নীতি নিয়ে চলছেন তা আমার জানা আছে। অতএব, মি. স্পিকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অন্তত এটুকু বলতে পারি যে, এই বিলটি প্রথমে বিচারের জন্য জনতার দরবারে হাজির করা হোক আর তারপর সেটি এই বিধানসভায় অবশ্যই আনতে পারা যাবে। জনগণের স্বাধীনতাহরণকারী এরকম একটা বিতর্কিত বিল প্রসঙ্গে সরকারকে জনমত যাচাই করতে বলার এটাই প্রথম নজির নয়। অতএব, মি. স্পিকার, আবার বলছি, বিলটি সাধারণের মতামতের জন্য অন্ততপক্ষে সাধারণ্যে উপস্থিত করা উচিত। কংগ্রেস যদি সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারে যে, এরকম একটা আইন জরুরি, তখন আমি বলবো যে, এটি সভায় পেশ করা হোক এবং মানুষ যেভাবে চায় সেভাবেই এই আইন পাশ করা হোক।

১৯৪৮ সালের ৫ জানুয়ারি

মি. স্পিকার স্যার, আজ আমি কেবলমাত্র আমার দলেরই প্রতিনিধিত্ব করছি না, আমি সমস্ত বামপন্থী দলগুলির হয়ে এই কালা বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি সমগ্র গণতান্ত্রিক মানুষের পক্ষ থেকে— এমন কি কংগ্রেস কর্মীদের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ জানাচ্ছি— যাঁরা এই সভাকক্ষের বাইরে এই কালা বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। আমি জানি এই বিলের নিন্দা করলেও এইসব গণতন্ত্রী কংগ্রেসকর্মীদের এই বিলের বিরুদ্ধে বিধানসভায় বক্তব্য পেশ করতে দেওয়া হবে না আর এই উদ্দেশ্যেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে বিশেষভাবে বাংলায় আনা হয়েছিল, এইসব কংগ্রেসকর্মীদের গণতান্ত্রিক মতামতের কণ্ঠরোধ করার জন্য। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সত্ত্বেও অমি এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিল যা ছিল কার্যত তার চেয়েও জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিলেক্ট কমিটি প্রকৃত কোনো পরিবর্তন ঘটায় নি বরং আইন তৈরির ক্ষমতা সংযোজিত করেছে যা মূল বিলে ছিল না। এটি এক নয়া স্বেচ্ছাচার। এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত বলতে চাই না। কারণ বিলটি স্বেচ্ছাচারী ও অগণতান্ত্রিক যা কংগ্রেসের মহত্তম ঐতিহ্যের বিরোধী। এটি আইনের শাসনের পবিবর্তে ফ্যাসিস্ট বর্বরতা ছাড়া কিছুই নয়। ডঃ ঘোষ ও তাঁর মন্ত্রীরা বিরক্ত বোধ করেন যখন আমি তাদের বার বার কংগ্রেসের অতীত ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দিই। সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের দিন থেকে সাম্প্রতিক কালের গভর্নর বারোজ-এর কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে ভারতের জনগণকে ব্রিটিশ সরকারের বে-আইনী কার্যকলাপ এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এসব কাজ গণতন্ত্র-বিরোধী এবং

যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে তখন তার প্রথম কাজ হবে এইসব আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে অত্যাচারের আইন-কানুনকে বাতিল করা। আমি কংগ্রেসের ইস্তাহার থেকে নাগরিক স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তুললে মন্ত্রীরা অস্বস্তি বোধ করবেন এবং অবশ্যই অপমানকর দৃশ্যের অবতারণা হবে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা প্রতিটি প্রদেশে পরস্পর লড়াই করছেন ব্রিটিশ শাসকদের অনুসরণ করে আর তাদের সর্বোচ্চ সম্মান দেখিয়ে সেইসব বর্বর আইন কানুন পুরোপুরি গ্রহণ করছেন। সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রে এগুলিকে শঠতা আর ভণ্ডামি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অবশ্যই ডঃ ঘোষ ও তাঁর বন্ধুদের মতো এই ধরাধামে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই ডিগবাজি— অতীতকে ত্যাগ করা— সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করাকে গালভরা শাস্ত্রীয় নীতি-নৈতিকতার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হবে।

ডঃ ঘোষ তাঁর বর্বর আইনের সমর্তনে গণপরিষদে গৃহীত 'মৌলিক অধিকার' থেকে ভুলভাবে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, বিশৃঙ্খলভাবে কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক বলেও ভারতের নতুন সংবিধান থেকে দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করে দেখাতে চাই যে আইন লঙ্ঘিত হয়নি বলা কতটা অলীক। যেমন ঐ বিশেষ নথিতে বলা হয়েছে যে বাকস্বাধীনতা, স্বাধীন মত প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে সমাবেশের অধিকার মানুষের থাকবে। কোনো মানুষই আইনের প্রক্রিয়া ব্যতীত তার জীবন ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হবে না। এ ছাড়াও যথাযোগ্য প্রথায় এবং আইনি পদ্ধতির মারফত সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যাবার অধিকার এই সনদ দ্বারা সুরক্ষিত। এমনকি হেবিয়াস করপাস, ম্যান্ডামাস প্রভৃতির মতো অধিকার রক্ষার প্রতিকারগুলি মুলতুবি রাখা হবে না কেবলমাত্র বিদ্রোহ বা আক্রমণ অথবা অত্যন্ত জরুরি অবস্থা ছাড়া— আমি ডঃ ঘোষকে এই কথা অনুধাবন করার জন্য অনুরোধ করছি। ডাঃ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করছি কোথায় এবং কী এই গুরুত্বপূর্ণ জরুরি অবস্থা! এই মর্মে ঘোষণা কার? কারণ আমি এই সনদ মৌলিক অধিকারগুলি যতটা পড়েছি তাতে যতক্ষণ না গুরুত্বপূর্ণ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হচ্ছে ততক্ষণ কোনো একটি প্রাদেশিক সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার তার শাসিত মানুষদের স্বাধীনতা হরণ করে কোনো আইন তৈরি করতে পারে না। বাংলার মন্ত্রিসভা তিনমাসের মধ্যেই বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিনান্স ব্যবহার করেছেন রাজনৈতিক নেতা ও দলের বিরুদ্ধে যেমন আর-সি-পি-আই এবং দেবনাথ দাস, সত্য গুপ্ত, জুবেরি, দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাঁদের আটক করা হয়েছে মিঃ বারোজের বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিনান্স বলে। অথচ ডঃ ঘোষ সেদিন বলেছেন যে এই ক্ষমতা তিনি কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন না। কিন্তু ডঃ ঘোষের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সব শ্রেণির বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হয়েছে শ্রমিকশ্রেণির ন্যায়সঙ্গত কার্যকলাপ দমন করার জন্য। এই অর্ডিনান্সের জোরে ব্রুকবন্ডের এবং শ্রীদুর্গা কটন মিলের শ্রমিকদের প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয় তারপর পরোয়ানা ছাড়াই গৃহতল্লাসী করা হয়। এবং বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে অসদাচরণ ও অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়। অপরপক্ষে ডঃ ঘোষ আমাদের জানালেন যে এই আইন গুন্ডাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিনান্সে হাজারেরও বেশি আটক গুণ্ডাদের মুক্তি দেওয়া হলো। আইনের সাহায্যে বেআইনিভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এই বিশেষ ক্ষমতা বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হওয়া মানে এই নয় যে রিভলবারের পাখনা গজাবে এবং তা থিয়েটার রোডে ডঃ ঘোষের শোবার ঘরে উড়ে যাবে। বেআইনি অস্ত্র খুঁজে বের করার কাজ পুলিশের। ডঃ ঘোষ

আমাদের জানিয়েছিলেন যে যাদের হাতে অস্ত্র আছে তাদের তালিকা আছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এ কথা বলা হয়েছিল। তাহলে কেন তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না? পুলিশ কেন তাদের কাজ করছে না? অপরপক্ষে বাংলার নাগরিকদের বলা হচ্ছে তাদের স্বাধীনতা ত্যাগ করতে এবং তা অবশ্যই বিপদগ্রস্ত হয়েছে। গুন্ডা দমন আইনের সাহায্যেই সাধারণভাবে গুণ্ডাদের ধরা যায়। যদি কারোর কাছে অস্ত্র পাওয়া যায় তাকে আদালতে চালান করা যায়। মনে হচ্ছে ডঃ ঘোষ সাধারণ বিচার আদালতের উপর আস্থা হারিয়েছেন। এমন কি কারোর কাছে অস্ত্র পাওয়া না গেলেও তাদের এই আইনহীন আইনে আটক করবেন। অতএব দেখা যাচ্ছে এইসব অজুহাত দেখিয়ে মন্ত্রীরা মানুষকে ঠকাতে চেষ্টা করছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অসত্য বলছেন। বাংলার মানুষ দ্ব্যর্থহীনভাবে এই বিলের বিরোধিতা করেছেন।

বিমল চন্দ্র সিন্‌হা : স্যর, এই সভার মাননীয় সদস্যদের ব্যাপারে 'ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা' শব্দগুলি অসংসদীয় কিনা সে ব্যাপারে আপনার নির্দেশ পেতে পারি কি?

অধ্যক্ষ : না, সভার কোনো সদস্য সম্পর্কে একথা বলা উচিত নয়। এটা প্রত্যাহার করা উচিত।

জ্যোতি বসু : মি. স্পিকার আপনার বক্তব্যর পরিপ্রেক্ষিতে 'মিথ্যা' শব্দটি প্রত্যাহার করছি। পরিবর্তে বলছি 'অসত্য'। ডঃ ঘোষ পশ্চিমবাংলার অন্যতম প্রধান শহর এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র কলকাতায় দুটি সভা করেছেন। একটি মুসলিম অধ্যুষিত পার্ক সার্কাসে। মনে হয় মিঃ জে সি গুপ্ত তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং অপরটি মেটিয়াবুরুজে। তিনি মুসলিমদের বলেন যে, হিন্দুদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যই এই বিল পাস করা হচ্ছে এবং আমরা শুনেছি যে সভায় উপস্থিত মুসলিমরা তাঁকে অভিনন্দন জানায়। আবার তিনি যখন হিন্দুদের কাছে যান তখন তিনি বলেন যে, আমার বিশেষ ক্ষমতা দরকার কারণ পাকিস্তান এবং মুসলিমবা পশ্চিমবাংলা আক্রমণ করতে পারে। চমৎকার এই অহিংস কংগ্রেসকর্মীর ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা! কিন্তু সর্দার প্যাটেলের ভাষণের পর মুসলিমরা নিশ্চয়ই প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করেছেন। আমরা মনে করি এবং আমাদের বিশ্বাস এই বিল শ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ মানুষের জীবন ও অধিকারের সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যই পাস করা হচ্ছে।

এটা বাংলার গৌরব যে এই কালা বিলকে বিনা প্রতিবাদে পাস করতে দেওয়া হয় নি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছেন যে, ইউ পি. বোম্বাই এবং ভারতের আরও কয়েকটি প্রদেশ এই ধরনের কালা বিল পাস করেছে। ডঃ ঘোষও এখানে এই বিল পাস করাবেন। কিন্তু আমরা কংগ্রেস নেতাদের জানাতে চাই যে, বাংলা অন্য ধাতুতে গড়া। বাংলা এই ধরনের কালা বিলকে পাস হতে দেবে না বিক্ষোভ এবং ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ ও সংগ্রাম ছাড়া। কার্যত, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সংগ্রামে বাংলা জয়ী হয়েছে। ভোটের জোরে এই বিল বিধানসভায় পাস হয়ে আইনে পরিণত হবে তা আমি জানি কিন্তু বাংলা চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কারণ সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে আনা হয়েছিল। তাদের রিভলবার আর বন্দুক মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে এবং যথেচ্ছ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা দেখলাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলকে বাংলায় আনা হলো। কারণ মন্ত্রীরা বিলটিকে নিজস্ব যৌক্তিকতায় পাস করাতে পারেন নি। বাংলার মানুষের এটাই নৈতিক জয়। এই সেই বিলকে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেছেন। এই সেই বিল যার বিরুদ্ধে কংগ্রেস গত চল্লিশ বছর ধরে লড়াই করেছিল। ফলে, আজ বাংলা, বাংলার মানুষ আর

বাংলার আপামর জনতা কংগ্রেসের ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন— এই কথা আমি মাননীয় মন্ত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমরা দেখতে পেলাম যে সংগ্রামরত, রক্তাক্ত, চিন্তাশীল বাংলা আরেকবার ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং বোম্বাই এবং ইউ পি'কে এই পথ অনুসরণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এমনকি আজ পর্যন্ত কলকাতা, হাওড়া এবং ২৪ পরগনার ৯২,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটরত বলে খবর আছে। বর্ধমানে সম্পূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়েছে। অহিংস কংগ্রেস নেতারা সর্বশক্তি দিয়ে ধর্মঘট প্রতিরোধ করতে সাধারণ মানুষকে নির্দেশ দিলেও তা উপেক্ষা করে সেখানকার বহু কংগ্রেস নেতা এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এদের গুণ্ডারাও সেইমত সক্রিয় ছিল। রিভলবার, লাঠি, ছুরি ব্যবহৃত হয়েছিল শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর। সোডা ওয়াটার বোতলও বাদ যায়নি। কার্যত শুধু কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা একা নয়, সঙ্গে সব রকম রসদ নিয়ে সাহায্য করেছে পুলিশ। তারা আমাদের কয়েকটি ইউনিয়ন অফিস পুড়িয়েছে। ইউনিয়ন কর্মীরা মার খেয়েছে। পুলিশ এইসব মার-খাওয়া মানুষদেরই গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ কাজ করছে, আমরা দেখেছি যে, ইউনিয়ন কর্মীদের যারা মারছিল সেইসব স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে পুলিস লাঠি তুলে দিচ্ছে। আমরা সর্দার প্যাটেলের সাম্প্রতিক ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন কর্মীদের মিল গেটের সামনে পিকেট করতে বলিনি। তাঁর ভাষণের মর্ম অমরা যদি ঠিক বুঝে থাকি তাহলো দেশে সরাসরি সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের আহ্বান যা কিনা বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিনান্সের আওতায় পড়ে এবং তা দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এটা ছিল হিন্দুদের কাছে উদাত্ত আহ্বান। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রচারাভিযান করলেন উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল। এটাই সব নয়। আমরা দেখলাম কিছু কংগ্রেসকর্মী নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে সর্বত্র তাদের অহিংস স্বেচ্ছাসেবকদের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর সহিংস লাঠি চালনার নির্দেশ দিচ্ছেন।

আমি অবশ্য আনন্দিত যে, এই দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পর অন্তত মানুষের চোখ খুলেছে। কংগ্রেস নেতারা দেশে কী করতে চায় মানুষ তা দেখতে পেয়েছে। কখনও কখনও অনেক সময় লেগে যায় মানুষের— অন্তত ইতিহাস তাই বলছে— তাদের নেতারা তাদের নিয়ে কি করতে চলেছে তা বুঝতে। কখনও কখনও এটা খুব দ্রুত হয়ে যায়। সরকারের কাজকর্ম দেখে মানুষের চোখ খুলে যায় এবং তারা নেতাদের আসল চরিত্র বুঝতে পারে। কলকাতা ও ফলতার আশেপাশে এটাই ঘটল এবং তা দেখে শ্রমিকশ্রেণি এবং সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে তাদের নেতারা কী করতে চলেছে। আমি জানি কয়েক জায়গায় পুলিশের সাহায্যে ধর্মঘট ভাঙতে কংগ্রেস সফল হয়েছে। কিন্তু মানুষের চোখ খুলে গেছে। আমি ডঃ ঘোষকে লিঙ্কনের সেই বিখ্যাত উক্তি মনে করিয়ে দিতে চাই— "তুমি সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানাতে পারো না, তুমি কিছু মানুষকে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানাতে পারো।"

মি. স্পিকার, অতএব অমি বলতে পারি যে এইসব ঘটনা থেকে মানুষ অবশ্যই একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে যতদিন এই মন্ত্রিসভা দমনমূলক নীতি অনুসরণ করবে ততদিন মানুষের মঙ্গল হবে না। স্যর, এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও এই বিলকে পাস করিয়ে আইনে পরিণত করা হচ্ছে। কারণ কংগ্রেস নেতারা আজ আর মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে চায় না। আমরা সবাই জানি যে ওরা বলছে

"আমাদের এটা শিশু রাষ্ট্র। মানুষের জন্য কিছু করতে আমাদের আরো কিছু সময়ের দরকার।" কিন্তু ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণার জন্য আইন পাশ করতে ওঁদের সময় লাগে না। বাড়তি মুনাফা কর রদ করার জন্য আইন পাস করতে তাঁদের সময়ের দরকার হয় না। যদি জমিদারি ব্যবস্থা কখনও তুলে দেওয়া হয় তাহলে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে একথা সংবাদপত্রকে জানাবার জন্য তাঁদের সময়ের দরকার হয় না। স্যার, এইসব কাজের জন্য ওঁদের সময়ের দরকার হয় না। কিন্তু কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে আইন তৈরির জন্য এঁদের সময়ের দরকার পড়ে। বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিনান্সবলে শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করতে বা বাড়ির মহিলা ও শিশুদের ভয় দেখানোর জন্য তাঁদের সময়ের দরকার হয় না। কিন্তু কালোবাজারীদের ক্ষেত্রে যাদের কেউ কেউ আবার মন্ত্রীদের বন্ধু— তাদের আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া গ্রেপ্তার করতে সাহস পান না। এঁরা এতই শ্রদ্ধাশীল এইসব কালোবাজারীদের সম্পর্কে। এই তো সেদিন খাদ্যবস্তুর সঙ্গে তেঁতুলের বীচি পাওয়া গেল। কিন্তু সেই ভদ্রলোক, সেই কালোবাজারীকে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে আটক রাখা গেল না; কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। তেঁতুল বীচি খাদ্যের পাশে পাওয়া গেছে, খাদ্যের ভিতরে নয়। ফলে, এইসব কালোবাজারীকে পরোয়ানা ছাড়া শাস্তি দেওয়া বা গ্রেপ্তার করা যাবে না— এই হচ্ছে আইনের ব্যাখ্যা। কিন্তু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণের দরকার হয় না। শ্রমিকদের জেলে নিয়ে গিয়ে আটক রাখা হচ্ছে। ওরা পরোয়ানা ছাড়াই শ্রমিকদের বাড়ি তল্লাসী করছে। বলা হচ্ছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যই তা করা হচ্ছে। মি. স্পিকার, তাহলে তো অন্যদিকে যেসব ভদ্রলোক বসে আছেন, এ সব কিছুই তো তাঁদের বোকামি ও ভণ্ডামি মাত্র। কারণ তাঁরা বলছেন মানুষের কল্যাণের জন্যই এই বিল পাস করছেন যার বিরুদ্ধে আমরা গত চল্লিশ বছর ধরে লড়াই করেছি। মানুষ এঁদের অর্থহীন কথা বিশ্বাস করবে এত বোকা নয়। মানুষ এদের অহিংস কথাবার্তা অনেক শুনেছেন এরা অহিংসার ভান করেন মাত্র। আমার দেখা সর্বকালের স্বৈরতান্ত্রিকের মতো এরা আচরণ করছে। মি. স্পিকার আমি জানি এরা দীর্ঘদিন ধরে অহিংসার চর্চা করছেন ধনীদের সম্পর্কে, কারখানার মালিকদের সঙ্গে, এমনকি ব্রিটিশদের প্রসঙ্গে। কিন্তু নিজেদের লোকের সঙ্গে আচরণে বিধানসভার বাইরে আমরা দেখেছি কোনরকম সতর্কীকরণ ছাড়াই পুলিস নির্বিচারে গুলি চালায়। এইসব লোকেরাই অহিংসার কথা বলে। তাঁরা বলুন যে আর তাঁরা অহিংস নেই। সে কথা সোজাসুজি বলুন। তা না করে অহিংসার ভান করে মানুষকে বোকা বানাতে চাইছে এই বলে যে "আমরা সাধুপুরুষ। আমরা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই সব কিছু করছি যদিও আমরা বড় বড় গাড়ি চড়ে বেড়াই।" কেন তাঁরা সোজাসুজি বলছেন না যে "আমরা স্বৈরতন্ত্রী। যেহেতু তোমরা আমাদের নির্বাচিত করেছো, আমাদের কাজকর্মের পাশে তোমরা থাকতে বাধ্য।" সর্দার প্যাটেলকে আমরা বুঝতে পারি। কারণ তিনি বলেছেন যে, হিংসা দিয়েই হিংসার মোকাবিলা হবে। আমরা এই ধরনের কথাবার্তা বুঝতে পারি। অত্যন্ত সোজা ও সরল ভাষা। কিন্তু অহিংসার এই ভণ্ড কথাবার্তা শ্রমিকরা বুঝতে পারে না। আমরা জানি আজকের ঘটনার পর মানুষ বুঝতে পারবে যে কংগ্রেস নেতারা আর আমাদের পাশে দাঁড়াবে না। আমার বিশ্বাস গণতন্ত্রপ্রিয় কংগ্রেসকর্মীও উপলব্ধি করছেন যে ক্ষমতায় আসীন এইসব ভদ্রলোকেরা মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করছে। মি. স্পিকার এই পরিস্থিতিতেও আমি বলব এই বিলকে ছুঁড়ে ফেলা উচিত। আমি জানি আমি কিছু বধির মানুষের সঙ্গে কথা বলছি যাঁরা সবরকম

সৌজন্যেও অনড়, যাঁরা মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন। আর নতুন করে আস্থা অর্জন করেছেন টিয়ার গ্যাস, রাইফেল আর পুলিশের ওপর। কারণ পুলিশ এখন দেশপ্রেমিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এখন গান্ধী-টুপি পরে তেরঙ্গা ঝান্ডা ওড়ায়। আমরা দেখেছি এইসব পুলিশের কিছু কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবককে ধর্মঘট ভাঙায় সাহায্য করতে। ডাঃ ঘোষের মতো এই ধরনের জনপ্রিয় নেতা কলকাতায় কোনো পার্কে জনসভা করতে পারলেন না। মিঃ জে. সি. গুপ্তের সঙ্গে তাঁকে পার্কসার্কাসে যেতে হলো গরিব মুসলমানদের ভাষণ দিতে এবং এই বিলকে সমর্থনের জন্য বলতে। (মি. জে. সি. গুপ্ত : অভিযোগটা কি?) জনসাধারণ বলছে ডঃ ঘোষের বিরুদ্ধে কিছু কংগ্রেস নেতাদের খেলা চলছে। মানুষ এসব কিছুই বুঝতে পারছে। তিনি নিজেকে যদি সত্যিই এতটা জনপ্রিয় মনে করেন তাহলে কলকাতার অন্যান্য পার্কে গিয়ে কেন সভা করছেন না। মি. স্পিকার, আমি জানি আজ ভোটের জোরে ওরা বিল পাস করতে পারে। সর্দার প্যাটেলও ওদের আশীর্বাদ করেছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলার মানুষ তা সহ্য করবে না। গণতান্ত্রিক জনমত বজায় থাকবে এইদেশে আর ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস দূর হবে।

অধ্যক্ষ : ...

জ্যোতি বসু : মি. স্পিকার, এটা স্পষ্ট যে এই বিল এখন আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হবে এবং মন্ত্রীরা এটি পাস করে আইনে পরিণত করবেন। আমি আপনার মারফত ওঁদের অনুরোধ করব যেভাবে এখানে সুপারিশ করা হয়েছে অন্তত আর একবার এই বিল জনমত গ্রহণের জন্য পাঠানো হোক। কারণ জনমত আসলে গৃহীত হয়নি।

অধ্যক্ষ : ...

জ্যোতি বসু : আমার বক্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য, জনমত গ্রহণের জন্য বলতে এই বিল পুনর্বার সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক। তার অর্থ জনসাধারণের প্রত্যাশা যে মন্ত্রীরা তাঁদের কাছে আসবেন এবং যথাযথভাবে বক্তব্য পেশ করবেন এবং ইতিমধ্যে যখন সিলেক্ট কমিটির বৈঠক বসবে ও কাজকর্ম শুরু করবে, তখন সাধারণ মানুষও মন্ত্রীদের ও সরকারি দলের সদস্যদের সঙ্গে বিলটি অনুধাবনের সুযোগ পাবেন। তা যদি করা হয় তাহলে এই বিল সম্পর্কে মন্ত্রীরা জনমত সংগ্রহ করতে পারবেন যদিও লক্ষাধিক মানুষ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর সর্দার প্যাটেলকে দেখতে ভিড় করে থাকে। স্যর, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি বলছি যে এই ধরনের সভা এই কালা বিল যেভাবে আমাদের সামনে রয়েছে, তা সমর্থন করে না। একটু আগেই সভার একজন সদস্য এই বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেন আমার সঙ্গে কথা বলার সময়। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই তিনি বুঝেছেন যে এই বিল আর তার উদ্দেশ্য এক নয়। তাই সিলেক্ট কমিটিতে পুনর্বিবেনার জন্য ফেরত পাঠালে কোনই ক্ষতি হবে না। বিশেষ করে বিলে আইন তৈরির ক্ষমতার বিষয়টি আনা হয়েছে যা নতুন ধরনের স্বৈরতন্ত্রের সামিল। সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে পারবেন। তাহলে, আমার ধারণা, মন্ত্রিসভা সঠিক কাজ করবেন। অবশ্য এই বিল পাস করিয়ে আইনে পরিণত করার ব্যাপারে আমরা যাই বলি না কেন, কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কিন্তু তবুও আমি ওঁদের অনুরোধ করব যে এই পরিস্থিতিতে বিলটি নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত হবে কিনা ভেবে দেখতে। ওঁরা সব সময় বলে থাকেন যে এটা শিশুরাষ্ট্র। মানুষ কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকেই ভয়

পাচ্ছেন যে এই শিশু কি ধরনের হিংসাত্মক ও দমনমূলক কাজকর্ম করতে পারে তা দেখে। স্যার, যতক্ষণ না শিশুটি একটু বড় হচ্ছে— ধরুন, পনেরো দিন কিংবা একমাস— যতক্ষণ না শিশুটি হাঁটতে শিখছে, সাধারণ মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখা দরকার, এমন কি শত শত কংগ্রেসকর্মীর বক্তব্যও শোনা যাবে কারণ বিলটি বিধানসভায় আনার আগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি নেওয়া হয়নি। [নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার : আপনি কি বিপিসিসি'র হয়ে বলছেন।] এখানে উপস্থিত কিছু কংগ্রেসকর্মীব অসুবিধা বুঝতে পারছি, কারণ সর্দার প্যাটেলের নির্দেশে তাঁদের বিলকে পাস করাতেই হবে।

স্যার, মন্ত্রীরা এখন যদি জনসাধারণের কাছে এই বিল নিয়ে যান তাহলে কোনো ক্ষতিই হবে না। বরং তাঁরা যদি এই সংশোধনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে না পারেন তাহলে বুঝতে হবে কংগ্রেস নেতারা যে মুখোসের আড়ালে মুখ লুকোচ্ছেন তা খসে পড়বে। সাধারণ মানুষ মন্ত্রীদের আসল রূপটি দেখতে পাবেন যাঁরা আজ বাংলাকে শাসন করছেন। যদিও তাঁরা নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে থাকেন। যেহেতু সাধারণ মানুষ পাঁচ বছরের জন্য ভোট দিয়েছেন তাই তাঁদের সহ্য করতে হবে। সাধারণ মানুষের কাজ হচ্ছে পাঁচ বছরে একবার ভোট দেওয়া। তারপর মানুষকে সবরকম দমন-পীড়ন আর ফ্যাসিস্ট বর্বরতা সহ্য করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ডঃ ঘোষকে আমি কংগ্রেসের ইস্তাহারের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। আমি জানিনা কেন কংগ্রেসের মন্ত্রীরা ইস্তাহারকে ছেঁড়া, বাতিল কাগজ মনে করছেন। এই ইস্তাহারের ওপর নির্ভর করেই কংগ্রেস কর্মীরা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই তাঁরা সেটি অস্বীকার করছেন। এমনকি যখন আমাদের রাষ্ট্র কৈশোর অবস্থাতেও পৌঁছায়নি তখন তাঁরা তা অস্বীকার কবছেন, আর শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে, কৃষকদের বিরুদ্ধে আর সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। যেমন অসামরিক সরবরাহের কেরানীদের বলছেন, তাঁদের ছাঁটাই করা হবে। তাঁদের জন্য কিছু করা যাবে না। কারণ যেহেতু আমাদের শিশু রাষ্ট্র তাই আমরা তোমাদের জন্য কী আর করতে পারি? ওঁরা বলছেন "আরও কিছুদিন তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে।" তোমাদের ত্রিশ হাজার মানুষকে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে অনাহারে থাকতে হবে। তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে যতদিন না আমরা কিছু আমেরিকান ঋণ পাচ্ছি বা ব্রিটিশরা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকা আমাদের কিছু টাকা ফেরত দিচ্ছে। এই টাকা চাইবার সাহস তাঁদের নেই যেহেতু সামরিকবাহিনীতে ব্রিটিশ উপদেষ্টারা রয়েছেন। তাই মানুষকে অপেক্ষা করতেই হবে। আমাদের বলা হচ্ছে যে, তাঁদের তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে যেহেতু এখন কিছু করার নেই। সর্দার প্যাটেল একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। ফলে, যতদিন না আমাদের রাষ্ট্রের বয়স তিন বছর হচ্ছে ততদিন আমাদের বিপরীত দিকে বসে থাকা ভদ্রলোকদের সহ্য করতেই শুধু হবে না, বাংলার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে তাঁরা যেসব ব্যবস্থা নেবেন সেসবও মেনে নিতে হবে। স্যার আমি আরেকবার মন্ত্রীদের কাছে দাবি জানাবো যে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য শুনুন, মেনে নিন। এই বিলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের আওয়াজ শুনুন। পুনর্বার আবেদন করব সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের কাছে, বিশেষ করে কমিটির একজন সদস্য যখন মনে করেন যে বিলটি আবার তাঁদের কাছে ফেরত পাঠানো হোক। সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের কাছে বিলটি ফেরত পাঠানো অবশ্যই দরকার বলে মনে করি। সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের কাছে এই বিলটি

ফেরত পাঠানো হোক। কমিটি এই বিল পাঠানোর আগে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়েছিল। কমিটি গোয়েন্দা বিভাগের ডি-সি কে ডেকেছিলেন। দুজন আই-সি-এস অফিসারকে ডেকেছিলেন কী করে বাংলার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় তা জানতে। তাঁরা সাধারণ আইন ব্যবস্থার ফাঁক-ফোকর বুঝেছেন এবং এই ফ্যাসিস্ট আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। যাকে সাধারণ ভাবে আইনহীন আইন বলে থাকি, যার দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা যাবে, জনমত প্রকাশ বন্ধ করা যাবে। এইসব বিশেষজ্ঞদের চেয়েও, আমি মনে করি, শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন আমাদের সাধারণ মানুষ— সেইসব মানুষ যাঁরা মন্ত্রীদের নির্বাচন করেছেন, যেসব মানুষ আত্মত্যাগ করেছেন, যাঁরা বছরের পর বছর ব্রিটিশের জেল খেটেছেন। [ভূপতি মজুমদার : তাঁরা এখানে আছেন।] আমি জানি তাঁরা এই সভায় রয়েছেন। কিন্তু তিনমাসের মধ্যে তাঁরা যেভাবেই হোক ভোলবদল করেছেন। শিশুরই যদি এমন ধারা হয় জানি না তিন বছর বয়স হলে তাঁরা কেমনতর হবেন। এমন ঘটনা ইতিহাসে প্রথম ঘটল তা নয়। ফরাসী বিপ্লবের পরও এরকম হয়েছিল। যেসব মানুষ স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের কথা বলেছিল তারা খুব দ্রুত সম্পূর্ণ ডিগবাজি খেয়েছিল। ফলে, দেশের ধনীদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস মন্ত্রীরা কমবেশি যা কিছুই করে থাকুক না কেন, তা সত্ত্বেও এই বিলটি পুনর্বিবেচনা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

১৯৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারি

জ্যোতি বসু : মি. ডেপুটি স্পিকার স্যর, আমরা আজ এমন নারকীয় ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছি যা বিশ্বের চোখে আমাদের জনগণকে অসম্মানিত করবে এবং যা বিশ্বব্যাপী সযত্নে লালিত গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে চূর্ণ করেছে। আজ সীমাহীন দুর্ভাগ্যের দিন, কারণ নাগরিক স্বাধীনতা আজ নৃশংসভাবে ধ্বংসের মুখে। আমার বিশ্বাস, এই নাটকের প্রধান অভিনেতা মঞ্চ থেকে বিদায় নেবার মুখে, তবে এর সঙ্গে কোনো নীতিগত কারণ যুক্ত নয় বরং এর কারণ কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকীর্ণ ও নোংরা ঈর্ষা। নতুন মন্ত্রিসভা গঠনেও যেমন আনন্দের কিছু নেই, ডঃ ঘোষের বিদায়েও তেমনি চোখের জলের কোনো কারণ নেই, কারণ তাঁর নেতৃত্বে চার মাসে বাংলার জনগণের ওপর কলঙ্ক এবং লজ্জার বোঝা চেপেছে। মন্ত্রিসভার আসন অলঙ্কৃত করে অত্যাচারের যে মদতদাতারা বসে রয়েছেন, তাদের বিপরীত পক্ষে আমি অগণিত লক্ষ জেলবন্দী এবং জেলের বাইরে গণতন্ত্র এবং মুক্তজীবনের জন্য লড়াইয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেছি। রাওলাট আইন এবং আন্ডারসনের শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, এমনকি মৃত্যুবরণও করেছে, আমি তাদের হয়ে কথা বলেছি।

আমি ক্ষুদিরাম, কানাইলাল এবং সূর্য সেন ও অন্যান্যদের আদর্শ ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছি যারা জীবন নয় মৃত্যু বলতে বলতে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন। আমার প্রতিবাদের অনুপ্রেরণা এসেছে সেই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যারা স্বৈরাচারী বিদেশী শাসন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জেগে উঠেছিলেন এবং বিশ্বাস রেখেছিলেন স্বাধীনতায়। আমার সংশোধনীতে একের পর এক ধারা তুলে তুলে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে এই বিলের উদ্দেশ্য জনগণকে শৃঙ্খলিত করা, এই বিলের উদ্দেশ্য হলো তাদের কাঁধে দাসত্ব আর দুর্দশার জোয়াল পরিয়ে

দেওয়া। উন্নততর জীবনের জন্য মানুষের সমস্ত আন্দোলনকে দলিত করার জন্য গৃহীত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের চেতনা ও সতর্কতা তীক্ষ্ণ করাই আমার লক্ষ্য থেকেছে। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা ও সরকারি পদক্ষেপের সমালোচকদের এবং যে কোনো উপায়ে সরকারের যারা বিরোধিতা করছে তাদের রাষ্ট্রের শত্রু বলে অভিহিত করার বিরুদ্ধে আমি জনগণকে সচেতন করতে চেয়েছি, কারণ যদিও একটি সংশোধনী গ্রহণ হয়েছে যাতে বলা হয়েছে সরকারের বৈধ সমালোচনা এই কালা বিলের আওতাভুক্ত হবে না। তবুও আমরা জানি, মাত্র কয়েকদিন আগে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা' এই বিলটির বিরোধিতা করায় এবং এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করায় তারা এর আগে যে সরকারি বিজ্ঞাপনগুলি পেত তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। স্যর, আমি আরো দেখিয়েছি কিভাবে পুলিশকে আমাদের প্রভু হিসেবে অধিষ্ঠিত করা হচ্ছে এবং তাদের অস্বাভাবিক ক্ষমতায় বলীয়ান করা হচ্ছে— জনবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী এবং নির্মমতার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ-বাহিনীর ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের পর কোনো পরিবর্তন হয়নি। স্পেশাল পাওয়ার অর্ডিন্যান্সের অধীনে কিভাবে শ্রমিক, রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিমানুষকে এখন যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে তা আমি কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছি। সামরিক বিভাগ এবং অপরাধ তদন্ত শাখার গোপন বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত করে আমি প্রমাণ করেছি কিভাবে কংগ্রেস সরকার বৈধ দলগুলির পিছনে গুপ্তচর লাগিয়েছে। আমি দেখিয়েছি তারা কিভাবে বৈধ দলগুলিকে ধ্বংসাত্মক দল এবং তাদের সদস্যদের কার্যকলাপকে ধ্বংসাত্মক রূপে চিহ্নিত করেছে।

এটা বলার চেষ্টা হচ্ছে যে সাম্প্রদায়িক বিপদ ছাড়াও ভেতর থেকে শত্রুর দল দেশকে ঘিরে ফেলেছে এবং সেই কারণেই পুলিসের জন্য বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োজন। শ্রী বিমল চন্দ্র সিন্‌হা এখনই বলার সময় উল্লেখ করেছেন যে এই বিল বহু স্বাধীনতা-প্রেমী মানুষের কাছে আপত্তিকর। আমি খুশি তিনি এই বক্তৃতা দিয়েছেন এবং কংগ্রেস পক্ষে অন্তত একজন এই বিষয়ে একমত হলেন। আমি তাকে এও পরামর্শ দেব যে আমি এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি নতুন বা পুরোনো যে কোন রাজ্যের পক্ষেই নিরাপত্তা প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু আমি পরে উল্লেখ করব যে পথে মন্ত্রীরা আজ চলেছেন সেই পথে নিরাপত্তা অর্জিত হবে না, বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে আমি তা বোঝানোর চেষ্টাও করেছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানি পুলিশ বা আমলাতন্ত্র এমনকি মন্ত্রীরাও নয়, কেবলমাত্র জনসাধারণই রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারেন। ইতিহাসে এমন অজস্র প্রমাণ আছে যেখানে সফল বিপ্লবের পর মুক্ত মানুষ সম্পূর্ণ সশস্ত্র অবস্থায় আছেন ও সরকারের বিশ্বাস উপভোগ করছেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করেছেন। কিন্তু জনসাধারণকে মুক্ত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ও সরকারের সমর্থনে সামিল করার জন্য দ্রুত ও জরুরি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন। এবং এই প্রশ্নে আমি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গত দিনের বক্তব্যের সঙ্গে একমত যে বাংলা এবং ভারতবর্ষে দ্রুত এবং জরুরি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু স্যার, সেই দ্রুত জরুরি ব্যবস্থাগুলি কী হবে সে প্রশ্নে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। আমি দাবি করছি রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, সাধারণ মানুষের অবস্থা উন্নত করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা, মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করা, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা, প্রধান শিল্পগুলির জাতীয়করণ করা, জমিদারি ব্যবস্থা ধ্বংস করে কৃষকের হাতে জমি তুলে দেবার

ব্যবস্থা করা এবং মুনাফাখোর, কালোবাজারী ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে যারা আঘাত করার চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্যর, এতেই দেশের সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে। ১৫ আগস্ট যখন আনন্দধ্বনি বাংলার আকাশ মুখরিত করেছিল তখন জনগণ এই পথেই চলতে চেয়েছিলেন। মানুষ তাদের যন্ত্রণা শেষ হবার আশায় উদ্বেলিত হয়েছিলেন কিন্তু তাদের মুগ্ধ স্বপ্ন মাত্র তিনমাসের মধ্যেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছিল। স্যর, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ একটি ভিন্ন পথ অনুসরণ করছেন। একদিকে তারা জনগণের প্রতি আস্থা না রেখে তাদের স্বাধীনতা হরণ করে, ধর্মঘট বেআইনি ঘোষণা করে, সরকারের পৃষ্টপোষকতায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মাধ্যমে তাদের পদ ভাগ করে রাষ্ট্রকে রক্ষার ভান করছেন। অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করা হচ্ছে বাড়তি মুনাফা কর তুলে দিয়ে, আরো মুনাফা, সীমাহীন মুনাফা সুনিশ্চিত করে, বিনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং ভারতীয় এবং বিদেশী শিল্পক্ষেত্রে জাতীয়করণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং বিনা ক্ষতিপূরণে ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করে। জনগণকে নাগরিক স্বাধীনতা ভুলে যেতে বলা হচ্ছে এবং পন্ডিত জওহরলাল নেহরু তার কলকাতা সফরকালে বক্তৃতায় তেমনই বলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে যন্ত্রণা এবং দারিদ্র নিয়ন্ত্রণে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা স্থগিত নেই কারণ বলা হয় ভারতের মৌলিক সংবিধানে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ গরিবদের দাস বানিয়ে ধনীদের নিরাপত্তা আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে। তাদের উৎকণ্ঠা পরজীবীদের জন্য, যার শ্রম করে তাদের জন্য নয়। আমার বিপরীতে বসে থাকা ভদ্রলোকেরা বিপ্লবের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন এবং ধনীদের সঙ্গে আপস করেছেন এবং ব্রিটিশ ও তাদের নতুন প্রভু আমেরিকানদের উত্তরসূরীতে পরিণত হয়েছেন। হিন্দুস্থান মোটরস যেমন ইংল্যান্ডে তৈরি হয় এবং ভারতে "হিন্দুস্থান" ছাপ মারা হয়, তাদের স্বাধীনতাও ঠিক সেরকমই জালিয়াতি। সুতরাং সম্মান জানাই বাংলাকে যা স্বাধীন মানুষের ঐতিহ্যকে উর্ধে তুলে ধরেছে, যা অতীতে রাওলাট আইন এবং আন্ডারসনের শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকর্মীদের মরণপণ লড়াইয়ের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বাংলায় হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড এবং আনন্দবাজার পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশ সংবাদপত্রই সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, যদিও তাদের পক্ষে, সম্পাদকদের নিজেদের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে তারা কি পছন্দ করে বলা খুব কঠিন। এই পদক্ষেপের নিন্দা করে বাংলার প্রতিটি কলেজ ইউনিয়ন সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সভা এবং ক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ এবং ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। সরকার তার সশস্ত্র বাহিনীকে পরিচালিত করেছে, সমবেত করেছে, আমাদের জনগণকে লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস এবং গুলি ছুঁড়েছে; হাজার হাজার টাকা খরচ করে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলকে নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে; আমাদের জনগণের গণতান্ত্রিক উত্থানকে অবরুদ্ধ করার জন্য হিন্দু মহাসভার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, সর্দার বলদেব সিং এবং ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে তড়িঘড়ি করে তলব করেছে। যেখানে যুক্তি ব্যর্থ হয়েছে, আইনের সম্মান রক্ষার অজুহাত দেখানো হয়েছে, ভয় দেখিয়ে নজজানু করতে আমাদের জনগণকে। সবশেষ হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে সম্পূর্ণ সরকারি শাসনযন্ত্রের সঙ্গে পুলিশ ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং সরকারের গুন্ডারা সেই জনগণকে সন্ত্রস্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, যাদের তারা নেতাদের চেতনানাশক জাদুতে ঘুম পাড়াতে পারেনি। এমনকি আজও বেলিয়াঘাটা এবং নারকেলডাঙ্গায়

সন্ত্রাস চলছে, কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে গত ৫ জানুয়ারির ধর্মঘটের ব্যর্থতা সত্ত্বেও বাংলার এক লাখের ওপর শ্রমিক এই কালা বিলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ধর্মঘটে যোগদান করেছিলেন এবং তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন।

মি. ডেপুটি স্পিকার স্যর, বিপরীতে বসে থাকা ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে রাজ্যে সত্যিই বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। রাজ্যের সমস্ত গোপন বিষয় ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে; আমাদের সিক্রেট সার্ভিসের লোকজনদের ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে; রাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ অঙ্গ, স্থলবাহিনী এবং নৌবাহিনী ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের দিয়ে কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে তোলার জন্য তাদের দালালরা অস্ত্র বিতরণ করছে। আমাদের দেশের স্বাধীনতা এবং মানবতার নামে, আমাদের মা, বোন, স্ত্রী এবং শিশুদের কল্যাণের স্বার্থে, আসুন আমরা এই বিপজ্জনক ডিক্রি প্রত্যাখ্যান করি, আসুন ঘৃণার সঙ্গে বরবাদ করি ঐ ভদ্রলোকদের যাবতীয় কলঙ্কিত আইনগুলি। কংগ্রেসকর্মীরা কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং এই লজ্জাকর আইনকে বিধিবদ্ধ হতে দেবেন? রাজ্যের নিরাপত্তাবিঘ্নকারী বিশ্বাসঘাতকতা এবং আত্মসমর্পণের স্মৃতিস্তম্ভ তারা কতদিন সহ্য করবেন? যুদ্ধ শেষ হয়নি। অভিজ্ঞতা এবং দুর্ভোগ নিষ্ঠুরভাবে জনগণকে জাগিয়ে তুলছে। তারা তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখছেন সেইসব নেতাদের মুখমণ্ডলের ওপর যাঁদের মুখোশ খুলে পড়ে গেছে। যতদিন না দাসত্বের এই লজ্জাজনক নথি ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে এবং সমাজের বিরুদ্ধে এই অপরাধের প্রতিকার করা হচ্ছে, ততদিন বাংলা শান্ত হবে না। কালা বিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আসল স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছেদ করার যুদ্ধ। স্যর পরিশেষে এই পবিত্র সংগ্রামে বাংলার মানুষকে আমি একটি অনুচ্ছেদ স্মরণ করতে বলব : মানুষের প্রিয়তম প্রাপ্তি হলো জীবন এবং যেহেতু তা একবারের বেশি তাকে দেওয়া হয় না তাই সে এমনভাবে বাঁচুক যাতে সাধারণ এবং ভীতু অতীতের লজ্জা তাকে অনুভব করতে না হয়, উদ্দেশ্যহীন কিছু বছর কাটিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে যেন অনুতাপ করতে না হয়, যাতে মৃত্যুর সময় সে বলতে পারে, "পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর কারণের জন্য আমার সমস্ত জীবন এবং আমার সমস্ত পরিশ্রম উৎসর্গীকৃত— তা হলো মানবজাতির স্বাধীনতা"।

[স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয় তা অচিরেই গণতন্ত্র-বিরোধী পথে হাঁটতে শুরু করেছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭-র ২১ নভেম্বর বসেছিল পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার প্রথম অধিবেশন। স্বাধীন বাংলার আইনসভাকে অভিনন্দন জানাতে, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং তেভাগা আইন পাশের দাবিবে ঐ দিন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে কলকাতায় আয়োজিত শোভাযাত্রার উপর পুলিশ হামলা চালায়। ২৭ নভেম্বর সরকার আইন সভায় 'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা বিল' বা 'ওয়েস্টবেঙ্গল স্পেশাল পাওয়ার্স বিল' পেশ করেছিল। এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গলে তুলেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। তাদের সঙ্গে ছিল কয়েকটি বামপন্থী দলও। ১০ ডিসেম্বর কলকাতার বিক্ষোভরত জনতার উপর পুলিস গুলি চালায়। নিহত হন একজন। ১৩ ডিসেম্বের এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালনের ডাক দেয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। অবস্থা বুঝে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বিলের উপর আলোচনা স্থগিত রাখা হয়। ইতিমধ্যে বিলটি আইনসভার সিলেক্ট কমিকটিতে পাঠানো হয়েছিল। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সহ বিলটি ৫ জানুয়ারি বিধানসভায় পেশ করা হয়। শেষপর্যন্ত ১৫ জানুয়ারি ৪৭-১২ ভোটে বিলটি পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। এই বিলের উপর

জ্যোতি বসু সর্বসাকুল্যে আইনসভায় প্রায় ৬০ বার বক্তব্য রাখেন এবং অন্তত ৬০টি সংশোধনীর উপর ভোটাভুটি দাবি করেছিলেন। এই বিল পাশের পরই প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভা অপসারিত হয়। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় (২৩ জানুয়ারি ১৯৪৮)।

প্রসঙ্গত, বিশেষ ক্ষমতা বিলটি ছিল এর আগে সুরাবর্দি সরকারের আমলে জারি করা 'বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স, ১৯৪৬' অনুপ্রাণিত।

এখানে পুনর্মুদ্রিত বসুর তিনটি ভাষণ আইনসভার কার্যবিবরণী থেকে সংগৃহীত। মূল ভাষণ ছিল ইংরাজীতে। শিরোনাম যুক্ত করা হয়েছে। এই তিনটি ভাষণের সময় বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন ঈশ্বর দাস জালান এবং উপাধ্যক্ষ ছিলেন আশুতোষ মল্লিক।]

টিকা : ১. জ্যোতি বসুর এই তিনটি ভাষণ আইনসভার কার্যবিবরণীতে রয়েছে। এর তথ্য সূত্র হল : WBL First Session Vol I (1947 Nov - 1948 January) 27.11.47 - P 48 - 57; 05.01.48 - P 158 - 176: 15.01.48 - 325 - 358

২. মূল ভাষণটি হল ইংরাজীতে, যার বাংলা অনুবাদটি বেরিয়েছে "জ্যোতি বসুর রচনা সংগ্রহ", প্রথম খণ্ড পৃ. ৫০-৬৩ এবং আমরা ইংরাজীর সঙ্গে অনুবাদটি মিলিয়ে নিয়ে এখানে তা সহায়ক তথ্য হিসাবে সংযোজিত করলাম।— সম্পাদক

বীরভূম পল্লী নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসকে সমর্থন প্রসঙ্গে ভবানী সেন

'বর্তমানে জাতীয় গভর্নমেন্টের দক্ষিণে রহিয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী, আমলাতন্ত্র, জমিদার, ধনী মালিক, দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং তাহার বামে রহিয়াছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত। জাতীয় গভর্নমেন্টের উপর দক্ষিণের টান ব্যর্থ করিয়া আমরা বামের টানকে জয়যুক্ত করিতে চাই। কংগ্রেসের সঙ্গে দক্ষিণের যে কোন সংগ্রামে বামের শক্তি কংগ্রেসকেই সমর্থন করিবে। শ্রমিক এবং কৃষকের স্বার্থ হইল প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অভিযান।

বীরভূমে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা দক্ষিণের পক্ষ লইয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছিল। সেইজন্য কমিউনিস্ট পার্টি সেখানে সর্বান্তকরণে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে সমর্থন করিয়াছিল। নির্বাচনী অভিযানে কমিউনিস্ট পার্টি বীরভূমে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং চোরাবাজারের উচ্ছেদকেই প্রধান দাবিতে পরিণত করিয়াছিল। মহাসভার অভিযান ছিল ঠিক এই সমস্তের বিরুদ্ধে। বীরভূমে মহাসভা যদি জয়ী হইত তাহা হইলে দাঙ্গার শক্তিই প্রবল হইত। এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন বামপন্থী দলের নিরপেক্ষতা কার্যত হিন্দু-মসহাসভাকেই সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

অবশ্য জাতীয় গভর্নমেন্টের ভিতরও দক্ষিণের শক্তি প্রবল, তাহার স্থান শূন্য করিয়া বামের শক্তির দ্বারা উহা পূর্ণ করিতে হইবে। সে কাজ সফল করিবার প্রধান উপায় প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ অভিযান। বীরভূমের নির্বাচনে ডাঃ ঘোষের সাফল্যের জন্য আন্দোলন করিয়া আমরা সেই অভিযানই চালাইয়াছি। তাহা যাঁহারা চালান নাই তাঁহাদের কেহ জ্ঞাতসারে কেহ অজ্ঞাতসারে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণের শক্তিলাভে সাহায্য করিয়াছেন।'

(পার্টি সংগঠক, ১২.১২.১৯৪৭)

সহায়ক তথ্য - ১২

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস আলোচনা সিরিজ - ১

আসল স্বাধীনতা
ও
গণতন্ত্র

কেন্দ্রীয় কমিটির ডিসেম্বর (১৯৪৭) প্রস্তাব

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

দুই আনা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
দ্বিতীয় কংগ্রেসের
আলোচনা সিরিজের বই

১। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব ডিসেম্বর, (১৯৪৭)

২। ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে কমরেড তোরের রিপোর্ট

৩। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি— কমরেড ঝ্দানভ

৪। যুগোশ্লাভিয়ার জনগণের মুক্তি ও রাষ্ট্রদখলের সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি— কমরেড কারদেলীর

৫। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের ভূমিকা (পার্টিসভ্যদের জন্য)

৬। যুদ্ধোত্তর যুগে উপনিবেশিক সমস্যা ও ভারতের অবস্থা সম্পর্কে কমরেড ঝুকভ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে রমেন সেন কর্তৃক
৮ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও কালীপদ চৌধুরী দ্বারা গণশক্তি প্রেস,
৮ই ডেকার্স লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

দুইটি শিবির, দুইটি লক্ষ্য

দুনিয়া আজ পরিস্কার দুইটি শিবিরে ভাগ হইয়া গিয়াছে। একটি সাম্রাজ্যবাদী শিবির, অপরটি গণতান্ত্রিক শিবির।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নেতা হইতেছে ইঙ্গ-মার্কিন সামাজ্যবাদ। ইহারা সমগ্র দুনিয়া দখল করিতে চায়। ইহাদের মূল লক্ষ্য হইল গোটা-দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করা, নূতন সাম্রজ্যবাদী যুদ্ধের আয়োজন করা এবং সোশ্যালিজম ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার জন্য প্রতি দেশে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টধর্মী গভর্নমেন্ট ও আন্দোলনকে সমর্থন করা।

আর গণতান্ত্রিক শিবিরে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইওরোপের নূতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ, চীনের শক্তিশালী মুক্তি আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের মত জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহ এবং গোটা দুনিয়াব্যাপী গণতান্ত্রিক শক্তিপুঞ্জ। গণতান্ত্রিক শিবিরের মূল লক্ষ্য হইতেছে নূতন যুদ্ধের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়া উহাকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং ফ্যাশিজমের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করার জন্য সংগ্রাম করাই ইহার উদ্দেশ্য।

বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের স্থান

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও বিশ্বশান্তির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আমাদের জাতীয় আদর্শ। এই আদর্শের মাপকাঠিতে ভারত ও পাকিস্তানের উপযুক্ত স্থান হইতেছে গণতান্ত্রিক শিবিরে। গণতন্ত্রের শিবির শুধু কয়েকটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের একটা ব্লক বা গোষ্ঠি মাত্র নয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গোটা দুনিয়ার সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তির মিলনে এই শিবির গঠিত।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্থান কি বর্ণনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন— আমরা কোন শিবিরেই নই, আমরা 'নিরপেক্ষ'। তথাকথিত এই নিরপেক্ষতা শুধু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর শিবিরে গোলামির পথেই নিয়া চলিয়াছে। জাতি সংঘের বৈঠকেই ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইদানীং বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারতের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন ও সাম্রাজ্যবাদী দলের পক্ষ নিয়াছেন। জাতি সংঘের ভিতর গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী শক্তিগুলিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলরা যে 'ক্ষুদে পরিষদ' গঠন করিয়াছে ভারতের প্রতিনিধিরা সেই 'ক্ষুদে পরিষদ' গঠনের পক্ষেই ভোট দিয়াছেন। কোরিয়া হইতে অবিলম্বে বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবির বিরুদ্ধেও তাঁহারা ভোট দিয়াছেন। ভারত ও পাকিস্তানের গভর্নমেন্ট জনসাধারণের চাপে পড়িয়া কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে প্রগতিশীল শক্তির পক্ষে দাঁড়াইলেও বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী সমরলিপ্সুদেরই লেজুড় হইয়া চলিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভবিষৎ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিবিরের সাথে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত যে ভারত ও পাকিস্তানকে তথাকথিত নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ এমন অনেক বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছে যাহারা প্রধানত ইঙ্গ-মার্কিন দলের সাথে যুক্ত। এই চুক্তি অনুযায়ী আমদানি তালিকায় যে সব মালের উল্লেখ আছে ভারতবর্ষ সেই সব মাল তৈয়ারীর জন্য ভারতীয় শিল্পে কোনরূপ সরকারি সাহায্য দিতে পারিবে না। অর্থাৎ সেই সব শিল্পকে জাতীয় শিল্পে পরিণত করা চলিবে না, অথবা দর কমান এবং মজুরের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য এই সব শিল্পে সরকারি অর্থ সাহায্যও করা চলিবে না।

এই চুক্তি অনুযায়ী আমদানি মালের মূল্য পরিশোধের জন্য ভারতবর্ষ মাল রপ্তানির বাজার পাইবে। সুতরাং মাল রপ্তানির জন্য সরকারের তরফ হইতে বেশি জোর দেওয়া হইবে। সুতরাং, প্রথমত, মূলশিল্প জাতীয় শিল্পে পরিণত করা হইবে না; দ্বিতীয়ত, রপ্তানির জন্যই মাল তৈরির উপর জোর দেওয়া হইবে। ফলে, দেশের ভিতরে নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন কমিয়া যাইবে এবং তাহার দর বাড়িবে।

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ভারতের বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠি মাল রপ্তানির বাজার পাইবার আশায় ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপসে আসিয়াছে এবং ভারত সরকার উহাদের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্য-বিস্তারক বৈদেশিক নীতি সমর্থন করিতেছে। ভারত সরকার ব্রিটেনের নিকট হইতে স্টার্লিং পাওনা আদায় করিবার জন্য লড়িতে রাজি নন। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যে সব গণতান্ত্রিক শক্তি দৃঢ়ভাবে লড়িতেছে তাহাদের সাথে যোগ দিবার নীতিও ভারত সরকার ত্যাগ করিয়াছে। তাই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে এই চুক্তি।

পাকিস্তান সরকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তির চেষ্টা না করিয়া আরও প্রকাশ্যে এই গোলামির নীতি গ্রহণ করিতেছেন। পাকিস্তান সরকার বন্দর গড়িয়া তোলা ও কলকারখানা বসাইবার জন্য ব্রিটিশ পুঁজি ও আমেরিকান ঋণ ভিক্ষা করিতেছে। ভারত ও পাকিস্তানের বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠি এশিয়াতে মার্শাল প্ল্যান বিস্তারের জন্য বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করিতেছে। মার্শাল প্ল্যান আমাদের জাতীয় আর্থনীতিক জীবনের উন্নতির পথে সহায়ক হইবে না, বরং আমাদের আর্থনীতিক জীবন আরও বেশি ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে ও ঔপনিবেশিক দাসত্ব কায়েম করিবে।

ভারত ও পাকিস্তানের আর্থনীতিক পুনর্গঠন দ্রুত সম্পন্ন করিবার জন্য বৈদেশিক সাহায্য লাভের একমাত্র পন্থা হইল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমান সমান লেনদেনের শর্তে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি।

কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান সরকার ইহার ঠিক বিপরীত পথ ধরিয়াছে, দেশীয় বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দলে ভিড়িবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

বুর্জোয়াদের ভূমিকা

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে হইবে যে আমাদের দেশে এক আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। ভারতের বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বিরুদ্ধাচরণ ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহারা সাম্রাজ্যবাদীর দলে ভিড়িয়াছে। যুদ্ধের সময় ভারতীয় পুঁজির সাথে বিদেশী পুঁজির মিলন ক্রমশ বাড়িয়াছে।

ভারতের পুঁজিপতিরা আগের চেয়ে অনেক বেশি সম্পদশালী হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের আত্মবিশ্বাসও অনেক বাড়িয়াছে। ইহারই ফলে তাহারা সাম্রাজ্যবাদকে ঘরে জায়গা দিতে সাহস করিতেছে। এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভারতীয় বুর্জোয়ারা তাহাদের আর্থনীতিক সম্প্রসারণ চায়। তাই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য তাহাদের প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই এই সব দেশে প্রভুত্ব করে।

ভারতীয় মজুরশ্রেণির ক্রমবর্ধমান শক্তিতে শঙ্কিত হইয়া ভারতীয় ধনিকশ্রেণি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে এবং জমিদার ও দেশীয় রাজা প্রমুখ সামন্ত শক্তির সহিত আপস করিতেছে। গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতি প্রতিহত করিবার জন্য আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে তাহাদের জাতীয়তা বিরোধী চুক্তি প্রয়োজন। এই সব কারণে ভারতীয় বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় ফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কংগ্রেস এবং লীগের নেতৃত্ব মাউন্টব্যাটেন রোঁয়েদাদ মানিয়া লইয়াছে। ইহাতেও বুঝা যায় যে ধনিক এবং জমিদার জোতদারদের প্রতিনিধিস্বরূপ এই নেতৃত্ব পাকাপাকিভাবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে আত্মস্থ হইয়াছে।

একদিকে ভারতীয় বুর্জোয়ারা গণশক্তির ভয়ে ভীত ও গণশক্তিকে দমন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দুর্বল জাতিগুলিকে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের আর্থনীতিক ক্ষমতা বিস্তারে সচেষ্ট। উভয় দিক দিয়াই ভারতীয় বুর্জোয়ারা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য চায়। তাহারা এই সাহায্য পাইবার আশায় ভারতের সমস্ত জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতেছে। অর্থাৎ স্টার্লিং পাওনা আর আদায় করে না এবং ভাবতে শিল্প বিস্তারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে না। তাহারা জাতীয়তা বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদের অনুগত।

মাউন্টব্যাটেন রোঁয়েদাদের আসল রূপ

মাউন্টব্যাটেন রোঁয়েদাদ আমাদের দেশের জনসাধারণকে যাহা দিয়াছে উহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে, স্বাধীনতার নামে উহা একটি ধাপ্পা। এই রোয়েদাদের মারফত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করিয়া দেশী বুর্জোয়াদের হাতে রাষ্ট্রশক্তির একটি জরুরি অংশ সমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি রাখিয়াছে সাম্রাজ্যবাদের আওতায়।

এদেশে ব্রিটেনের প্রভুত্ব শেষ হয় নাই, তাহার ভোল বদলাইয়াছে মাত্র। এতদিন দেশী বুর্জোয়াশ্রেণিকে রাষ্ট্রশক্তির বাহিরে রাখা হইয়াছিল, তাই সে ছিল এতদিন উহার বিরোধী। এখন বুর্জোয়াশ্রণির হাতে রাষ্ট্রশক্তির একটি জরুরি অংশ সমর্পণ করা হইল, উদ্দেশ্য হইতেছে গণতান্ত্রিক শিবিরে ভেদ সৃষ্টি করা এবং রক্তের বন্যায় উহাকে ডুবাইয়া দেওয়া। রাষ্ট্রের উচ্চতর অঙ্গগুলি, যথা সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং আমলাতন্ত্র এখনও সাম্রাজ্যবাদের দাসানুদাসদেরই দখলে আছে।

আর, বুর্জোয়াশ্রেণির প্রতিনিধিদের হাতে, জাতীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের হাতে দেওয়া হইয়াছে শাসনদণ্ড অর্থাৎ গভর্নমেন্ট গঠন ও চালনার ক্ষমতা। সাম্রাজ্যবাদ বাণিজ্য চুক্তি ও সামরিক চুক্তির ভিতর দিয়া এই নেতৃত্বের উপর তাহার প্রভাব খাটাইয়াছে।

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত পশ্চাদপসরণ নয়, জাগ্রত জনগণের বিরুদ্ধে সুচতুর পাল্টা আক্রমণ। ১৫ই আগস্টের পর সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তির পথে প্রবল বাধার ভিতর দিয়া ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য জনসাধারণের যে অপূর্ব অভ্যুত্থান দেখা দিয়াছিল তাহারই ফলে সাম্রাজ্যবাদ তাহার প্রভুত্বের রূপ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারত ছাড়িবার সম্ভাবনার সম্মুখীন হইয়া ধনিক ও জমিদারদের হাতে ক্ষমতার অংশ ছাড়িয়া দিয়া সাম্রাজ্যবাদ ভারতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। এই নয়া ব্যবস্থাকে জাতীয় স্বাধীনতা বলিয়া প্রচার করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদের আনুগত্য ঢাকিয়া রাখা।

জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা যে ধুলিসাৎ হইয়া যাইতেছে তাহা আকস্মিক ঘটনা নয়। সাম্রাজ্যবাদের সহিত মিতালির জাতীয়তাবিরোধী নীতিতে বিষবৃক্ষের ফল ফলিতেছে!

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ব্রিটিশ মন্ত্রিমিশনের সময় হইতে আজ পর্যন্ত যে সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলিতেছে তাহার ভিতর দিয়াই মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও বুর্জোয়াদের আপসেরই প্রত্যক্ষ ফল। সাম্রাজ্যবাদ চার প্রকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভিত্তি শক্ত করিয়াছে : (১) দেশবিভাগ— ইহার ফলে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে। (২) এমনভাবে সীমানা ভাগ করা হইয়াছে, যাহাতে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা চরমে উঠিয়াছে। (৩) দেশীয় রাজাদের স্বাধীন সত্তা— ইহার ফলে রাজারা ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনীতিক খেলা খেলিতেছে, উভয় রাষ্ট্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগাইতেছে। (৪) বেশির ভাগ সেনাধ্যক্ষ ও আমলাকে সাম্প্রদায়িকতায় বিষাক্ত করিতেছে— ইহার ফলে দাঙ্গা ছড়াইবার কাজে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে ব্যবহার করা সহজ হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদের দাঙ্গায় উসকানি দিবার উদ্দেশ্য হইতেছে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাহাতে জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব আরও বেশি করিয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে, এবং জনসাধারণ যাহাতে উচ্চ শ্রেণির নেতৃত্ব, অর্থাৎ জাতীয় নেতৃত্বের কাছে মাথা নত করে। জনসাধারণের ঐক্য ধ্বংস করা ও সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন চূর্ণ করাই ইহার লক্ষ্য।

দাঙ্গার প্রধান উদ্যোক্তা হইতেছে এই সব ফ্যাসিস্ট শক্তি; যেমন হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ যাহাদের পিছনে রাখিয়া গিয়াছে সেই আমলাতান্ত্রিক শাসকবর্গ। দেশীয় রাজা ও জমিদারশ্রেণি আছে ইহাদের পুরোভাগে। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের একটি অংশসহ বুর্জোয়াশ্রেণিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রধান অংশ নিয়াছে। অবশ্য কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের কোন কোন অংশ ইহাদের বিরুদ্ধে কিছুটা দাঁড়াইয়াছে।

মজুর, কৃষক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীশ্রেণি সমগ্র দাঙ্গার বিরুদ্ধে সবচেয়ে সুদৃঢ় শক্তি; কারণ দাঙ্গা সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন চূর্ণ করে। দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত সুযোগেরই ব্যবহার করিতে হইবে। দাঙ্গা প্রতিরোধে সরকারি ব্যবস্থারও সুযোগ নিতে হইবে। এই দিকে

জাতীয় নেতৃত্ব ও সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা করিবে তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে সমর্থন করিতে হইবে এবং আরোও সুদৃঢ় পথ অবলম্বনের জন্য চাপ দিতে হইবে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের দলে ভিড়িয়া বুর্জোয়ারা যাহা করিতেছে তাহা এবং বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি তাহাদের শত্রুতা যত দিন না সম্পূর্ণ পরাস্ত করা যাইবে ততদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বার বার দেখা দিবে।

শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই নয়, অন্য রকমের দাঙ্গাও দেখা দিবে। এক জাতির বিরুদ্ধে অপর জাতির, অগ্রসর বর্ণ পশ্চাৎপদ বর্ণের ভিতর, উপজাতি ও অন্য জাতির ভিতর নানাবিধ সংঘর্ষ ক্রমশ বৃহদাকারে দেখা দিবে। যতদিন না পূর্ণ গণতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্র-যন্ত্রের উপর হইতে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব নিঃশেষে চূর্ণ হয়, ততদিন ইহার বিরাম নাই।

তাই দাঙ্গার সমস্ত সম্ভাবনা শেষ করিতে হইলে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের আদর্শে বুর্জোয়াশ্রেণিও মত্ত। তাই পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষমতালাভের দরকষাকষিতে কংগ্রেস ও লীগনেতৃত্বও সাম্প্রদায়িক শক্তির উপর অনেকখানি ভরসা করেন। যদিও সাম্রাজ্যবাদী অনুচর সামন্তশ্রেণির পরিচালনায় গঠিত দাঙ্গার আকার দেখিয়া কোন কোন সময় নেতারা বিস্মিত ও হতবাক হইয়া যান। তথাপি দাঙ্গা থামাইতে তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন না। পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অগ্রগতির ফলেই এই দাঙ্গার অবসান হইতে পারে।

১৫ই আগস্টের পর

মোট কথা হইল, ১৫ই আগস্টের পর কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্ব ভারত ও পাকিস্তানের সরকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও সামরিক চুক্তি করিতে শুরু করিয়াছেন। আগাগোড়া তাঁহারা প্রতিক্রিয়ার শিবিরকে শক্তিশালী করিতেছেন।

পাকিস্তান ও ভারত সরকার যে রাজনীতিক পন্থা অনুসরণ করিতেছে উহাতে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের ভীতি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমীস্বার্থ রক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কুচিত ও দমন করার ভিতর দিয়াই ইহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উভয় সরকারের আর্থনীতিক পন্থা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করে না, পরগাছাদের মুনাফা বাড়ায়— বর্ত্তমান ঔপনিবেশিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা কায়েম রাখে।

ভারত সরকার ও ইহার অধীনস্থ প্রাদেশিক সরকারগুলি বৃহৎ ধনিক-গোষ্ঠির স্বার্থে মজুরদের নিংড়াইবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে; ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শক্তিতে শঙ্কিত হইয়া কংগ্রেস-নেতৃত্ব সরকার পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করিয়াছে।

মালিকের সৃষ্ট ইউনিয়নগুলির নামে 'জাতীয়' ছাপ লাগাইয়া শ্রমিকদের ঠকাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে যখন ঠেকাইয়া রাখার আর কোন উপায় থাকে না তখনই ট্রাইব্যুনাল ও সালিশী কোর্ট বসান হয়। সঙ্গে সঙ্গে এইসব কমিটিগুলি এমন সব লোক দিয়া গঠিত হয় যাহাতে শ্রমিকদের দাবিগুলির মধ্যে যে-কয়টা সম্ভব বাদ দেওয়া হয়।

পুঁজিপতিদের বিরাট মুনাফা যাহাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য সরকার চোরাবাজারের

বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। এই ব্যাপারেও তাহারা এখনও পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী নীতির জের টানিয়া চলিতেছে এবং এখন চোরাবাজারকেই আইনসঙ্গত করার জন্য সমস্ত কনট্রোল তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

পুরাতন কন্‌ট্রোল ব্যবস্থার ফলেও মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা গেল না দেখিয়া দেশবাসী বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা আশু প্রয়োজন। ঠিক সেই সময় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব আগাইয়া আসিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়া জাতীয়করণের ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, নির্দেশ দিলেন— কন্‌ট্রোলই তুলিয়া দাও।

কৃষি-সংকট আজ এমন একটা অবস্থায় পৌছিয়াছে যখন অবিলম্বে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করিয়া প্রকৃত চাষীর হাতে জমি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন কংগ্রেস গভর্নমেন্ট আইনগতভাবে জমিদারি প্রথা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব আনিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব প্রস্তাবের মধ্যে চাষীকে জমি দেওয়া এবং জমিদারের জমি কাড়িয়া লওয়ার কোন কথাই নাই।

হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক জমিদারদের বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ভাগচাষী ও জমিহীন ক্ষেত-মজুরকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে শহরবাসী জমিদারের দয়ার উপর। এই সব সরকারি ব্যবস্থার ফলে জমিদারি প্রথার বদলে রায়তেয়ারী প্রথার প্রবর্তন হইবে মাত্র, লাভের মধ্যে কৃষকের ঘাড়ে ক্ষতিপূরণের বিরাট বোঝা চাপিবে।

জমি সংক্রান্ত ব্যবস্থায় অত্যন্ত ছোটখাট উন্নতির প্রস্তাবও অত্যন্ত দ্বিধার সহিত বহু টালবাহানার পর আনা হইতেছে এবং তাহার উপরও আবার জমিদারের স্বার্থে নূতন নূতন সংশোধনী প্রস্তাব জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে। জাতীয় সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত কৃষি সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি ইচ্ছা করিয়া এমনভাবে রচিত যাহাতে কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ হয়।

কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতারা দেশীয় রাজাদের সহিত প্রতিক্রিয়াশীল চুক্তি করিতেছেন। সামন্ত স্বৈরতন্ত্রকে বজায় রাখিয়া তাহাকে শাসনতান্ত্রিকভাবে চিরস্থায়ী করা হইতেছে।

পুরাতন আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র, তাহার সৈন্যবাহিনী, তাহার আমলার দল— সমস্তই সম্পূর্ণ বজায় রাখা হইতেছে। আর সেই শাসনযন্ত্রের মধ্যে স্থান দেওয়া হইতেছে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা শিক্ষিত বিদেশী অফিসার ও ব্রিটিশ উপদেষ্টাদের।

সর্দার প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে রাষ্ট্রগঠন পরিষদ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতেছে তাহা মূলত গণতন্ত্র বিরোধী। অবশ্য তাহাতে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা, প্রভৃতি কয়েকটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্রে গভর্নর ও তাঁহার সহকারি আমলাদের হাতে ব্যাপক জরুরী ক্ষমতা রাখা হইয়াছে; বিদেশী ও দেশীয় ধনীদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবিকে মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, অর্ডিনান্স দ্বারা শাসন চালানোর রীতিকে অনুমোদন করা হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কোন স্থান তো নাই-ই, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে পর্যন্ত ইহাতে খর্ব করা হইয়াছে; আনুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবিকেও অস্বীকার করা হইয়াছে।

এইরূপ একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ চলিতে চলিতেই বিভিন্ন প্রদেশে ও কেন্দ্রে 'জরুরি আইন' পাস করা হইতেছে। এই সমস্ত আইনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদকে সেই

পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় বন্দুকের মুখে দমন করা হইতেছে। এইসব জরুরি আইন খুব কম ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান প্রয়োগ হইতেছে শ্রমিক-কৃষক ও ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে।

নূতন শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্বেই সমস্ত পুরাতন দমনমূলক আইন ও অর্ডিনান্স দ্বারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা হইতেছে— যাহাতে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার প্রভৃতি নূতন ব্যবস্থা জনসাধারণের স্বার্থে ব্যবহৃত হইতে না পারে।

পাকিস্তানেও ঠিক এইরূপ, অনেকক্ষেত্রে আরও খারাপ ঘটনা ঘটিতেছে। পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করিবার এবং তাহার গণতান্ত্রিক প্রতিবেশীদের সহিত মৈত্রীবন্ধন গড়িয়া তুলিবার সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেরও লীগের জমিদার পুঁজিপতি নেতৃত্ব সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে।

ভবিষ্যৎ কোন পথে

কংগ্রেস ও লীগ উভয় নেতৃত্বের সহযোগিতায় ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা দুনিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তারের ব্যবস্থা চালু করিতেছে। ভারত ও পাকিস্তান ধনিকশ্রেণির নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক দাসত্বের পঙ্কে ক্রমেই ডুবিয়া যাইতেছে। সমস্ত প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব, শ্রমিকদের ব্যাপক ছাঁটাই, নিরঙ্কুশ দমননীতি এবং আরও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গামেহনতকারী জনতার সম্মুখে ইহাই ভবিষ্যৎ।

মহান শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে পূর্ব ইওরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ইঙ্গ -মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অতুল সাহসের সহিত লড়িতেছে। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লড়িতেছে ফরাসী ও ইতালীর জনগণ; চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের জনতা ইহার উপর আঘাতের পর আঘাত হানিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে বীর ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন।

ভারতের বুকে যে সমস্ত শক্তি ক্রমেই বলশালী হইয়া ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগীদের পরাজিত করিবে সেগুলি হইল : দেশীয় রাজ্যে প্রজা অভ্যুত্থান; দক্ষিণ ভারত, বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলায় কৃষক বিক্ষোভ; শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগ্রাম; বিশেষ ক্ষমতা বিলের বিরুদ্ধে কলিকাতার গণঅভিযান; মধ্যবিত্ত, কর্মচারী ও ছাত্রদের সংগ্রাম।

পূর্ণ-স্বাধীনতা এবং প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিতে হইবে। সমস্ত বামপন্থীদল, কংগ্রেস ও লীগের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রগতিবাদী, কংগ্রেস ও লীগের ভিতরকার অনেক অংশ, শ্রমিক ও কৃষক গণসংগঠনগুলি এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী— ইহাদের সকলকে লইয়া এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়িয়া তোলা সম্ভব এবং অবশ্য করণীয়।

গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে কংগ্রেস এবং লীগের স্থান কোথায় তাহা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। লক্ষ লক্ষ লোক কংগ্রেস ও লীগের প্রতি অনুরক্ত। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে সব প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতন্ত্রী কাজ করিতেছেন কমিউনিস্ট পার্টি তাঁহাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

কংগ্রেস ও লীগের ভিতরে যাঁহারা বামপন্থী, তাঁহাদের নিকট কমিউনিস্ট পার্টি আবেদন জানাইতেছে যে তাঁহারা যেন গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্যান্য শক্তির সহিত হাত মিলাইয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রোগ্রামের জন্য প্রতিক্রিয়া ও ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম

চালাইয়া যান। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কার্যকলাপে কংগ্রেস ও লীগভক্ত জনগণের অংশ গ্রহণের অর্থ আপসকামীদের চূড়ান্ত আঘাত হানা এবং গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা।

সেইজন্যই বামপন্থীরা এমনভাবে আন্দোলন করিবেন যাহা কংগ্রেস ও লীগভক্ত জনগণকে বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রভাবমুক্ত হইতে সাহায্য করে— ইহা প্রধানত বামপন্থীদের স্বকীয় এবং ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সম্মিলিত কার্যকলাপের উপর নির্ভর করিবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইবার জন্য উদ্দেশ্যমূলক প্রচার, দমননীতির বিরুদ্ধে দেশীয় রাজ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং শ্রমিক, কৃষক অন্যান্য শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যুগ্ম প্রচার ও আন্দোলনের ভিতর দিয়া ঐরূপ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্ল্যান এবং ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের নীতিসমূহকে সুন্দরভাবে এবং সঠিকরূপে ফাঁস করিয়া ঐ গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে শক্তিশালী করিতে হইবে।

এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের উদ্দেশ্য হইল ভারত ও পাকিস্তানে গভর্নমেন্টের মৌলিক পুনর্গঠন। নুতন গভর্নমেন্ট স্বাধীনতা ও প্রগতিশীল গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাবস্থা করিবে। বামপন্থী দলগুলি ও জনগণের প্রগতিশীল অংশের সহযোগিতায় সাধারণ শ্রমজীবী জনগণের যে ঐক্য সৃষ্টি হইবে, ঐ ফ্রন্ট তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিবে।

ঐ ফ্রন্ট গঠন করিবার জন্য অবিলম্বে বামপন্থী দলগুলির ভিতরে যে মতভেদ আছে তাহা দূর করিতে হইবে যাহাতে তাঁহারা এখনই ঐক্যবদ্ধ হইতে পারেন। ভারত, পাকিস্তান, এমন কি সারা পৃথিবীতে ঐক্যবদ্ধ হইলে বর্তমানে প্রতিক্রিয়া অপেক্ষা প্রগতিশীল শক্তির সমাবেশ অনেক বেশি। নিম্নলিখিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হইবে :

১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সকাল সম্পর্কচ্ছেদ ও পূর্ণ স্বাধীনতা। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত পূর্ণ সহযোগিতা।

২) সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় ইউনিয়ন, সমভাষাভাষী প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অধিকার। সকল দমননীতি মূলক আইন প্রত্যাহার।

৩) উপজাতীয় এবং আদিবাসীরা সমষ্টিগতভাবে যেখানেই বাস করেন, সেখানেই তাঁহাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার।

৪) দেশীয় রাজ্যে রাজতন্ত্রের অবসান। দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে গণ-আন্দোলন চলিতেছে, তাহাকে শক্তিশালী করিতে হইবে এবং স্বেচ্ছাচারী রাজাদের পতন ঘটাইবার পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

ভারত বা পাকিস্তানে দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন গণভোটে নির্ধারিত হইবে।

প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া অন্তভুক্তির প্রশ্ন নির্ধারিত হইবে :

ক) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনগণের জাতিত্ব।

খ) রাজ্যের আর্থনীতিক সম্পর্ক।

গ) আন্দোলনের সাফল্যের গ্যারান্টি।

৫) সংখ্যালঘুদের স্বার্থ, তাঁহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও চাকুরীতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সহিত সমান অধিকার। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও দাঙ্গা হইতে রক্ষার প্রতিশ্রুতি। ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা।

৬) প্রধান প্রধান শিল্প ও আর্থিক সম্পদের জাতীয়করণ। চোরাবাজারের উচ্ছেদ। উৎপাদন যতদিন পর্যন্ত না যথেষ্ট পরিমাণে হইতেছে, ততদিনের জন্য সম্পূর্ণ রেশনিং এবং কার্যকরী মূল্য নিয়ন্ত্রণ, শিল্প ও কৃষির জাতীয়করণ, শিল্পব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এবং জনগণের সাহায্যে বন্টনব্যবস্থা দ্বারাই ইহা সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির ভিত্তিতে আর্থনীতিক পুনর্গঠন।

৭) বিনা ক্ষতিপূরণে সর্বপ্রকার জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ। নিখিল ভারত কৃষক সভার প্রস্তাব অনুসারে কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন।

৮) শ্রমিকদের জন্য দৈনিক আট ঘন্টা কাজ, বাঁচিবার মত মজুরি এবং সর্বক্ষেত্রে জীবনধারণের মান উন্নয়ন। সকলের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা; এবং ছাঁটাইয়ের প্রতিরোধ। ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্য।

৯) রাষ্ট্রকর্তৃক কুটিরশিল্প এবং কৃষিকে সাহায্যদান।

১০) প্রতিক্রিয়াশীলদের দূর করিয়া আমলাতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন।

১১) প্রতিক্রিয়াশীল কম্যান্ডার বর্জিত গণতান্ত্রিক সামরিক বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনী গঠন।

উক্ত প্রোগ্রাম আমাদের জাতীয় সংগ্রামের গণতান্ত্রিক পুণর্গঠনের ভিত্তি। আমাদের দেশে যে গভীর সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে, উহাই একমাত্র তাহার সমাধান করিতে পারে। উহা শ্রমজীবী সাধারণের ন্যূনতম দাবি মিটাইতে পারে, অনতিবিলম্বেই ইহা করা প্রয়োজন, কোনও দূর ভবিষ্যতের জন্য ইহা অপেক্ষা করিতে পারে না। ঐ প্রোগ্রামের পূর্ণ সাফল্যের উপর নির্ভর করে ভারত ও পাকিস্তানের ঐক্য, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি। এই লক্ষ্য সার্থক করিবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রত্যেকটি সংগ্রামে এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতিটি আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবে। জনগণের প্রগতিশীল অংশ যেখানেই থাকুন এবং যে কোনও সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত থাকুন না কেন, এই সংগ্রামের ভিতর দিয়া কমিউনিস্ট পার্টি তাঁহাদের ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

গণ-আন্দোলনের 'চাপে' কংগ্রেস নেতৃত্বের নীতি পরিবর্তন করা সম্ভব হইবে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে এখানে-ওখানে মন্ত্রিসভার রদবদল করিলেই রাজনীতিক পরিস্থিতি বদলাইয়া যাইবে— এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে ছোট করিয়া দেখা বা তাহার দায়িত্ব অস্বীকার করার অর্থ সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। একমাত্র গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে অগণিত শ্রমজীবী জনগণই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে এবং ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

সহায়ক তথ্য - ১৩

ON THE PRESENT POLICY AND TASKS OF THE COMMUNIST PARTY OF INDIA

(Adopted by the Central Committee in its meeting held from December 7th to 16th, 1947)

Great changes have taken place since 15th August throughout the Indian Union. The establishment of a Central Government manned by the leadership of the National Congress has led to new class alignments, changes in the role of organisations and classes, and render it imperative that a new strategical and tactical line should be adopted for carrying forward the task of completing the democratic revolution as a transition to socialism.

The establishment of the Central Government headed by Pandit Nehru has not solved a single problem of the democratic revolution. Its establishment does not symbolise that the Indian people have won either freedom or independence. Nor does it ensure that they will be moving in the direction of democracy and freedom for the people.

On the other hand, the Government is moving in the opposite direction——against the interests and freedom of the people and towards joining the Anglo-American bloc of imperialist powers — a bloc which seeks to crush all democratic revolutions and to create satellite states by rendering economic and political help to all reactionary vested interests to enable them to crush the struggles for democracy and freedom in different countries.

National Government and the People

The recent acts of the National Government and the trend of its policy prove beyond doubt that it is moving not towards democracy and

freedom but towards their suppression.

The Constituent Assembly, manned by the same leaders as lead the National Government, is preparing a Constitution authoritarian in content and democratic in form only. The working class and the Indian masses will not get anything except the right to vote. There is no guarantee of any fundamental rights while the vested interests have been given an absolute guarantee that the State would not nationalise any concern without giving adequate compensation —thus preventing through constitutional guarantees all plans of nationalisation. The Constitution framed by the Constituent Assembly will be a Constitution for the upper classes to rule the oppressed millions in the interest of joint exploitation by Indo-British capitalists.

Immediately the Government is carrying out the plan of Indian Big business to oppose nationalisation, suppress the workers and demand more production through longer hours of work; intensification of labour and rationalisation; freezing of wages in the name of stopping the wage-price spiral; sabotaging implementation of gains secured by the workers, viz., Railway agreement; holding forth no hope of legislation for a living wage, social security or curtailment of management's power of dismissal; assuring the capitalists of full freedom to loot the people in the name of building a "mixed economy" while slandering the workers for the fall in production; demanding an increase in the hours of work;—in short, passing the burden of the crisis on to the shoulders of workers to keep up capitalist profits.

The control of the Government by the national leadership has placed an additional and powerful weapon in their hands to sabotage the revolutionary struggles against Princely autocracy. They have persistently raised illusions that Princely autocracy can be fought through governmental pressure and have utilised them to enter into accession agreements with the Princes which keep autocracy intact. By parading accession as a big triumph, attention is sidetracked from the democratic struggle inside the States. The latest act of betrayal is the standstill agreement with the Nizam.

Only where the Prince have point blank refused to strike any compromise giving the bourgeoisie some elbow room, they have sanctioned mass action which was withdrawn at the first opportunity.

The policy that the Government follows can only be described as one of appeasing feudal reaction and sabotaging the revolutionary anti-feudal anti-imperialist struggle.

In matter of civil liberties and democratic rights the Provincial Government under the guidance of the Central Government, have passed the blackest Acts—Public Safety Acts—which are freely used.against the rising workers' and peasants' movement and against the students; hundreds are detained without trial, externed or .interned.

The leadership of the Central Government has applied the brake to the agrarian legislation of the Provincial Ministries which itself was an attempt to cheat the peasant of the full fruits of abolition of landlordism. Saddled with compensation and with no provision for land to the tiller, the legislation becomes a mild reform, with relief for certain sections, and is an attempt to split the peasant movement, and disrupt the growing forces of agrarian revolution. It is an attempt to broaden, the basis of the present bourgeois Government.

In the matter of minorities, the Government follows a communal policy which is really the bourgeois way of dealing with minorities-discrimination and favouritism and retreating before communal and feudal reaction, opening the way for mass murder of minorities.

The admission of Dr. Shyamaprosad Mukherjee into the Cabinet shows how the Government had compromised with communalism even before the mass massacres had started in Punjab. For a big section in the Cabinet led by Patel, the oppression of minorities is a deliberate policy.

Collaboration With Imperialism

While refusing to develop the industries of our country by nationalising key industries, the Government at the same time is encouraging the export drive in the interests of Indian Big business and at the expense of the people. This is a part of the plan of collaboration with the Anglo-American bloc since these export markets can only be secured in collaboration with the imperialists. By securing foreign exchange through these exports Indian Big business wants to purchase machinery for new industries with the help of the Anglo-American imperialists. Thus, again, they have to depend on the Anglo-American capitalists for their industries.

This 'double economic dependence on the Anglo-American

capitalists, both for the market for Indian products and for purchasing new machinery, necessitates a servility and abject surrender to them; and Big business, helped by the Government, is preparing to sell out India's future to Anglo-American imperialists.

The latter are demanding a number of concessions and fundamental rights—no discrimination against foreign capital, no nationalisation, no tariffs which are not agreed to, joint concerns for exploitation of the Indian people, full security to them—all of which are embodied in the Draft Trade Charter being discussed at Havana and disclose that Indian Big business and the Government are mortgaging Indian economy to Anglo-American capital in their selfish interests. The natural result of this is not only an economic but an indirect political domination, so that both the economy and the political freedom of India are being mortgaged to the Anglo-American monopolists.

This policy logically means no full-scale industrialisation of India, but only such industrialisation as suits Anglo-American imperialist interests; it means no nationalisation, no planning, no rise in the standard of living of the masses; it means the retention of present backward conditions, the colonial order, low wages cheap labour; it means suppression of the Indian masses in the interests of joint Indo-American and Indo-British exploitation. It means an intensification of the improverishment of the Indian masses and the suppression of their struggle against it.

Nehru's Foreign Policy

The foreign policy of the Government follows the class interests it represents, From tlie very beginning Pandit Nehru adopted a line of forming a third bloc—a line which represents the interests of Big business inasmuch as it kept India away from the Democratic camp and opened the way to the Imperialist camp.

The recent months have torn the mask of democracy from Nehru's foreign policy. On all crucial issues the Indian delegation has taken an anti-democratic and pro-imperialist stand-Korea, "Little Assembly," Ukraine. On the question of Ukraine it allowed itself to be exploited by USA, and took the hypocritical stand that India stood against Ukraine because South East Asia was not represented.

Foreign policy depends on economic policy, said Pandit Nehru, and that has been proved. India is rapidly preparing to line herself up with the Anglo-American bloc in matters of foreign policy also. Her diplomats are already, uttering anti-Soviet slanders viz., Sir 'Maharaj Singh's statement on war propaganda.

That is where the Government and Big business are dragging India—from the freedom struggle to Anglo-American camp.

These developments are taking place against the background of a rapidly worsening economic crisis throughout the capitalist world coupled with the drive of American imperialism, by far the strongest force among the world imperialist powers and the leader of world reaction, to subordinate to itself the bourgeoisie of every other country and enslave the freedom-loving peoples of the whole world. These developments are taking place against the background of a sharpening struggle inside every country—a struggle of the common people against the effects of the worsening crisis and against all those classes that are orientated towards Anglo-American imperialism; it is a struggle for national independence and democracy.

It is therefore clear that there can be no illusions about this "National" Government; it cannot be an instrument of people's will to achieve what the people urgently require—the completion of the national democratic revolution; there can be no united front between the people and the Government; the Indian people and the working . class will have to fight to defeat the Government's policies and to effect a fundamental reorganisation of it in order to clear the road to the democratic revolution.

Such slogans as "All Support to the Nehru Government" and "United Front of the Government and the People" are opportunist and wrong, and amount to dragging the working class and the people at the tail-end of the bourgeoisie and helping the latter to implement its anti-democratic policy.

New Role of Bourgeoisie

How is it that a Government headed by the national leaders and one which came to power on the crest of the wave of popular struggle should pursue these policies which have to be opposed?

This is so because the national leaders who headed the popular struggles all these years and who now are in the Government represent tlie class interests of the national bourgeoisie, the industrial bourgeoisie.

Gandhi, Nehru and Patel all represent the interests of the Indian capitalist class, and the formation of the Government after August 15—after what is known as the transfer of power but in reality sharing of power—has meant an immense change in the position of the national bourgeoisie vis-a-vis the people and their struggles.

Formerly the national bourgeoisie and its leaders had to rely on the masses, mass-struggles etc. to secure concessions, share in power etc., to advance their own interests. The bourgeoisie was excluded from political power, it had no real opportunity to develop industries and had no political power over the people, though in the past it has more and more vacillated at the crucial moments, sought to come to terms with imperialism and prevented or stopped struggles going out of its control.

The post-war revolutionary upsurge forced imperialism to change its tactics, in order to be able to strike at the democratic forces all the more ferociously.

To deceive the people, imperialism formally agreed to hand over the Government to the national leaders, i.e., the bourgeois leaders, and relied on the national bourgeoisie for the maintenance of the old colonial order. The bourgeoisie readily accepted the offer because it received big concessions and because it was frightened by the growing democratic revolution, the increasingly active role of the working class in it, and with the approaching world economic crisis.

The growing jealousy and rivalry between the dominant sections of the Hindu and Muslim bourgeoisie also contributed to its eagerness to accept the imperialist offer.

The Government established after August 15 makes big concessions to the bourgeoisie and hands it over the administrative power to rule the Indian people in its own narrow selfish interests.

At the same time the State it has won is dependent on imperialism and is a satellite State. Economically it is dependent for its future on imperialist help; its compromise with feudal elements places it in the same position; and its fear of Pakistan getting imperialist favour also ties it to imperialism.

In the new State, therefore, the national bourgeoisie shares powper with imperialism, with the latter still dominant indirectly.

This is the secret behind the reactionary policy of the National Government. The bourgeoisie has ceased to play an opposition role; it does not need mass struggles to get concessions from imperialism; it is now depending on imperialism for its economic advance; it is now depending on the new State and its control over Indian people to use them as pawns in its bargaining with imperialism, whenever differences and conflicts arise. These conflicts will be solved at governmental levels by offering new concessions to imperialism through customs, lowering of tariffs, securing of joint concerns, etc.

The bourgeoisie, therefore, turns its face from the mass, goes over to collaboration. That is why its Government consistently adopts an anti-mass, anti-democratic policy.

In the past the bourgeoisie, and the national leadership which represents it, was in the people's camp; now it is deserting it. This is the new change brought about by the transfer of power on August 15.

Henceforward the march of democratic revolution will have to proceed directly in opposition to the bourgeois Government and its policies, and the bourgeois leadership of the Congress.

Game Behind Riot Offensive

The fact that the Government is manned by popular leaders and that it arose on the crest of a wave of mass struggle has concealed the class character of the Government and the change in the position of the class.

The riot offensive of the feudal reactionaries and imperialist agents and their denunciation of the National Government has led many people to believe that the feudal reactionaries were attacking a revolutionary Government and that it was the business of the people to line up unconditionally behind the Government. This is a totally wrong understanding of the situation.

The unleashing of communal riots in Punjab, U.P. and Indian States, the massacre of tens of thousands of innocent Hindus and Muslims, the forcible extermination of minorities in the States, the terrific suffering and hardships inflicted on innocent men, women and children, and the economic chaos arising from all this were pre-planned and organised by

the forces of counter revolution—the feudal Princes, the imperialists, the landlords and the communalists; the object was to drown the Indian democratic revolution in blood, to disrupt and demoralise it. The main attack was against the people who were moving forward through strikes. armed conflicts and revolts of States' peoples to a democratic revolution.

The attempt of the forces of counter-revolution was to side-track the revolutionary discontent into communal channels, disorganise the people and through it force a new line-up of all. vested interest against the mass movement—a line-up in which the bourgeoisie will move to the Right, appeasing the feudal and communal interests all the more so that a stronger front against the masses could be erected.

This was to be achieved by compelling the Government to move to the Right, to appease Hindu communal reaction and surrender to the Princes on the question of maintenance of autocracy by strengthening the consistent appeasing policy of Patel and defeating the vacillating policy of Nehru.

There is no doubt that the deeply laid plot of counter-revolution very nearly succeeded in creating confusion, vacillation and demoralisation in the ranks of the people and the political parties. The main objectives were forgotten and a tendency to line up behind the Government in panic was noticed.

The imperialists and their agents would precisely like such a lining up of the working class and democratic forces behind the Government, as it would lead to the giving up of all further efforts to push forward the democratic revolution and to the doing away with all opposition and criticism of the Government in its policy of combating all further national democratic advance.

For such a policy ensures the success of their strategy. Why are.riots on a mass scale possible today? Precisely because the national bourgeois leadership has, through its anti-national compromise, disorganised the forces of revolution and allowed the reactionaries to divert the discontent.

Unmask Compromisers and Communalists

The policy of compromise with feudalism and imperialism has already bred riots and will breed more riots: Compromise feeds .counter-

revolution and it is so in the case of India. The hands of Gandhi, Nehru, Patel are alike tainted with this compromise and they all are politically responsible for this riot offensive. The recent AICC resolutions, though taking a somewhat progressive stand regarding the communal question, evade all fundamental issues and sanction decontrol. Later events have proved that even those resolutions were not seriously meant by the leadership.

Unless their compromising policies are exposed before the people, unless the connection between them and the riots is shown and unless their policies are defeated, the feudal-imperialist offensive cannot be effectively fought; on the other hand it will increase.

Secondly, the Government includes open supporters of communalism like Sardar Patel who use the State machinery to pursue communal ends and thus strengthen communal and feudal reaction.

Even Nehru and Gandhi by means of their anti-Pakistan statements, under emphasising Hindu communalism by describing it only as a reaction to Muslim communalism, and by their failure to condemn unequivocally the slogan of war against Pakistan and sometimes even encouraging this slogan by assurances of military action against Pakistan etc., help to keep communal feeling alive and indirectly prepare the ground for further riots.

It is futile to talk of ending riots without unmasking the communal policies of Patel; it is equally futile to expect that communal reaction will be defeated, with Patel inside the Cabinet, by the mere words of Jawaharlal.

The policy of an unconditional line-up behind the Government under the excuse of fighting riots is thus an opportunist policy.

This does not mean that the Party or the working class will not help the Government in quelling riots and restoring peace. But the party knows that by such help the root cause of riots is not removed. The Party also realises that generally the riot-quelling measures of the Government are but another name for the suppression of minorities.

The Party will utilise every opportunity to fight riots and will help the Government whenever honest measures to quell them are taken. It will regard riots as an offensive against the revolution but, at the same time, will have no illusion that the National Government can fight the

riots with its present policy. On the other hand; it realises that the riot-mongers cannot be fought without exposing the compromising and communal policies of the Government and rousing the people against them.

In doing this, it is, no doubt, the duty of the Party to utilise every anti-riot utterance of men like Nehru and Gandhi and counteract the openly provocative policy of Patel. Such utterances, acts and propaganda have much importance inasmuch as they enable us to isolate more easily men like Patel who arc nearest to feudal reaction.

Patel, Nehru and Gandhi

The distinction between Nehru and Gandhi on the one hand and Patel on the other, on the basis of their approach to communal question, is therefore valid within certain limits and is also of importance. It is no small advantage to have these two big leaders speaking against riots. The situation would certainly be more difficult if they also were to take a stand for riots, like Patel.

But to shower praise on Gandhi and Nehru as if they with their class outlook and policies can really fight riots is to join in the game of cheating the masses.

The politics pursued by Gandhi and Nehru can never defeat communalism and riots.

On the other hand, their policies are leading them to purchase communal peace by sharing power with the riot-mongers and communalists, the supporters of feudal reaction.

Not only on the question of riots but also on the question of democratic policies, there exist illusions about Nehru among Party leaders.

Nehru is seen as a fighter against Patel's policies and almost made to appear as the leader of the democratic forces. Every verbal opposition of Nehru to Patel is magnified and Nehru's surrenders are glossed over or ignored. It is thus that an illusion is created that if we strengthen Nehru's hands against Patel, we will transform the Government into an instrument of the people's will.

This estimate of Nehru is anti-Marxist and serves to tie down the masses to the bourgeois leadership. It must be clearly understood that

Nehru and Gandhi are as much representatives of the bourgeoisie as Patel is. They all defend the class policies and interests of the bourgeoisie which is now collaborating with imperialism.

The working class no doubt takes into full account the differences between the different bourgeois leaders and distinguishes between the progressive and the reactionary, to fight the reactionary all the more, But it means that the differences must be real and not imaginary.

Today Nehru is continually surrendering to Patel and not fighting him. It is so in the matter of foreign policy, of States, of decontrol, of industrial policy etc. He often outdoes Patel on vital issues. He denounces strikes of the working class as a stab in the back, He surrenders because there is no other independent policy for him unless he decides to fight Big business which he cannot do.

His progressive and democratic views, though they will be always limited by the class interests he represents, will have some importance and will be capable of being implemented only when the bourgeoisie finds itself against a big mass movement outside. That alone might enable Nehru to overcome his vacillation on a number of issues unless he decides to turn away from the people in the meanwhile,

In the absence of strong mass pressure from the left Nehru's utterances remain mere words and Nehru becomes more and more a democratic mask for Patel, His surrender may be stopped only by the independent action of the masses.

This means that it is anti-working class to raise a whole strategy on the illusions about Nehru.

Gandhi and CPI

A similar attitude is to be observed about Gandhi. Gandhi's espousal of the cause of decontrol and his cynical remarks about death of hundreds from starvation are due to the fact that he is the class-conscious representative of the bourgeoisie,

It is necessary here to remember that it is Gandhi who has always led the reformist and compromising bourgeois leadership and it is he who, in the post-war period, first came out sharply against the revolutionary upsurge and urged upon other leaders to come quickly to a compromise with imperialism. If the bourgeois leadership -has betrayed

the people and adopted the policy of collaboration with imperialism, it is Gandhi who was and is today the chief leader and inspirer of this betrayal.

The Communist Party of India has always regarded Gandhi as such and has fought Gandhism as an ideology, which stupefies the masses and saves the interests of the compromising bourgeoisie. Anything which makes the working class forget this must be sharply condemned.

It is thus clear that the Central Government manned by leaders of the National Congress cannot be the instrument of further advance—which is nothing but completion of the national democratic revolution. Marxism-Leninism has always taught us that in the period of declining capitalism—of the general crisis of capitalism—the bourgeoisie cannot be relied upon to lead the democratic revolution to its completion, that it betrays it and goes to the opposite camp, and it is the working class which must lead it.

Marxism has also laid down that in conditions of a revolutionary crisis the immediate task in the colonies is not reform, but completion of the democratic revolution. The working class today, after the second world war, has to carry out this task in conditions of the bourgeoisie quitting the people's camp and becoming collaborationist.

National Leaders and Masses

But too much emphasis cannot be laid on the fact that those in charge of the Government are still leaders of the people and the Government is still looked upon as a National Government in contrast to the previous imperialist Government.

The masses do not yet realise that the National Government is collaborating, that the country is being sold to Anglo-American imperialism, that the policies of the leadership are leading to riots, that the Government is being run in the interests of Big Business; they still believe it to be a freedom Government and are the victims of the national sentiment and national illusions about the Congress leadership. The trusting masses of our country though they are getting rapidly disillusioned with the National Government, have not yet lost their faith in Nehru, their faith in the Congress, and, though repeatedly bitten, they yet cling to old illusions.

Any attack against the National Government which does not take into account the sentiment behind it is likely to defeat the purpose.

At the same time, the rapid economic deterioration and disillusionment of the masses have created conditions for the successful unmasking of the national leadership; and no progress towards democracy and freedom is possible without the Party exposing the real character of the present Government in the course of struggles and on the basis of concrete issues of policies, and disillusioning the masses about it.

To be able to move the masses into action for the fulfillment of the democratic revolution, the working class must tear them away from the bourgeois leadership and build a new movement based on a new understanding of the national unity.

For A New Front of People's Unity

The Communist Party must give up the former conception of national unity, Congrcss-League-Communist, in which Congress was virtually the main basis of such a unity. It was correct for a period when the Congress together with its leadership was in the people's camp opposing imperialism.

Today the Congress leadership is collaborating with imperialism. Today the advance towards democracy and independence has to be won not only in opposition to imperialism but also in opposition to the Indian bourgeoisie.

In these conditions the Congress cannot be the main basis of the new democratic front. The leadership is attempting to make the Congress into an ordinary political party of the bourgeoisie and doing away with its united front character. Even if it does not succeed in this entirely the influence of the Congress leaders will be strongly exercised to keep it away from the democratic revolution and to make it an appendage of the bourgeoisie.

The masses inside the Congress will be cheated in the name of loyalty to the Congress national sentiment etc. The CPI should, therefore, give a call for a new front of people's unity—the Democratic Front.

The core of this new front will have to be the CPI with its working class and Kisan bases, the mass organisations of workers, peasants and

students and the Left parties with their mass following.

The unity of Left parties in the present situation will be a powerful lever to build a new front of the above organisations— disillusioning and activising the Congress and League masses, the States' peoples and other sections, and in building a united movement for the democratic revolution.

The strength of the Left forces today should not be underestimated. Their mass influence also should not be underestimated. This is really a fundamental change between the pre-war and post-war situation—in the pre-war days the Left forces were only a ginger group, today they are the main base and lever at the same time.

The Communist Party must, therefore, seek immediate agreements with the Left parties—for joint actions and for a common understanding of the problems of the democratic revolution and for building a front against the compromisers and their real masters.

The building of the Democratic Front is a process of struggle. It advances through a series of joint campaigns and partial struggles, jointly conducted, and through iocal united fronts between the Party and the local Congress and League masses (even Committees in some places), between the Left parties and the Congress and League masses at other places, between the Party and other mass organisations in still other places, etc.

The core of the new front would be formed of the Left parties together with the Communist Party, trade unions, Kisan Sabhas and students' and youth organisations. Round this core must be gathered the vast masses from the Congress, League, the States' Prajamandals. etc., so that a broad democratic front takes shape to meet the new situation.

In many provinces organised Left groups do not exist. There are thousands of unattached Lefts in all provinces. Unity of the Left parties is a weapon of drawing these thousands into the common front for joint action, In the South we must devote special attention to the unorganised Left; for, Left unity will mean drawing these unattached thousands in the common fight. In other provinces also, Left unity ought to be an instrument of attracting unorganised Left who will now find an effective platform and instrument for implementing its Left aspirations. It will also attract olher progressive Congressmen on specific issues.

It will be defeating the main purpose if unity of Left parties is worked in a way which either keeps the unattached Left away or hinders joint action with other Congressmen on specific issues.

Congress, League and Democratic Front

The place of the Congress and the League in the Democratic Front must be properly realised.

Both these organisations command the loyalty of lakhs of people—of vast sections of anti-imperialist masses. Desperate attempts will be made by the leaderships of these two organisations to keep these masses away from the struggle for democratic revolution and from the Democratic Front by exploiting old loyalties and the memories of anti-imperialist struggle. The forces of the democratic revolutions will be weak and paralysed if the bourgeois leaderships succeeded in keeping these organisations and masses away from the Democratic Front.

The Communist Party must devote the utmost attention to winning these masses away from the influence of the bourgeois leaders through propaganda, joint campaigns and joint struggles.

Great and vital importance, therefore, attaches to bringing these two organisations inside the Democratic Front, through the mass pressure of their followers and in opposition to their leaders. It is therefore essential that the Lefts who are inside these organisations should carry on a persistent battle to unmask the policies of the leaderships and win over the masses for the democratic revolution and for joining the Democratic Front.

The Congress with its sixty-year old tradition of anti-British fight and with the memories of national battles that it rouses, sways lakhs of anti-imperialists who earnestly desire to move forward. The name of the Congress is today used by the bourgeois leaders to keep popular opinion behind them in support of their collaborationist policy. What the people are unable to accept from the Central Government and Ministries, is pushed through the Congress and public criticism is paralysed. To abandon the fight inside the Congress, to ignore its important role in the Democratic Front, will be tantamount to making a present of lakhs of people to the bourgeois leaders. The CPI has no illusions that the Congress leadership will either accept the programme or the Democratic

Front. It will be dangerous opportunism to have such an illusion. But it is vital to win the Congress masses for the democratic revolution. The CPI, therefore, attaches great importance to the work of consistent anti-imperialists and democrats inside the Congress—the work of disillusioning the masses and pressing forward for a democratic revolutionary programme.

Role of the Left

The CPI appeals to the lefts who are inside the Congress not to give up the fight but press it on and defeat all attempts to make the Congress an authoritarian body—a subservient tool of the collaborationist policies of the bourgeois leadership. They should further wage a battle for people's unity by moving the Congress to join the Democratic Front, despite the opposition of the leadership.

That is why the Left should direct its agitation in a way which will help the Congress masses to release themselves from the influence of the bourgeois leaders. A major role in this release will be played by the independent actions of the Left—and of the growing Democratic Front. Not mere words and criticism alone, but the independent and decisive actions of the Left will be a major source of changing the consciousness of the Congress masses.

The Communist Party of India must therefore attempt to establish immediate fraternal relations with the Socialist Party, the Forward Bloc and other Left groups and make proposals to build Left unity on a common programme. The bitter resistance of Socialist Party leaders to Left unity, their opposition to the unity of mass organisations of the working class, the Kisans and students, their attack on Marxism-Leninism as "totalitarian Communism" and their advocacy of "democratic socialism" or reformism of the British Labour Party will not succeed in preventing unity, if the Communist Party patiently explains the situation to thc Socialist Party ranks, for in the ranks there is genuine desire for such unity. While offering Ltft unity on the basis of common programme and agreeing to start joint actions on immediate issues, the CPI should systematically struggle for ideological clarification on the basis of Marxism-Leninism, and point out the weaknesses of these parties.

There can be no other programme for Left unity and Democratic Front than the minimum programme of the democratic revolution.

Reforms and Revolution

Today, with the post-war revolutionary crisis which is upsetting the colonial order and which cannot remain at this level for all time, if we do not achieve the democratic revolution in the shortest possible period, the imperialists and the bourgeois will defeat the revolution and will attempt to solve the crisis by suppressing the masses and forcibly retaining the colonial order.

There are only two ways out : either a democratic revolution or an intensified slavery and misery under joint exploitation.

The Slogans of the democratic revolution are not mere propaganda slogans but achievable and realisable in the immediate future.

Those who argue as if the democratic revolution is a long way off, and are content with what they call advance, which in reality are petty reforms, are reformists who disrupt the democratic revolution in the interests of the bourgeois.

We must clearly understand that the concessions won today, the reforms big or small secured today, are temporary devices of the bourgeoisie to slay the agrarian revolution and to lull the peasantry to sleep. They will be attacked, and nothing will remain of them as soon as the strength of the masses is disrupted and the revolutionary crisis is allowed to peter out.

It has been the lesson of every revolution that when the revolution is imminent big concessions are made to the masses, to be withdrawn as soon as the revolution is defeated, i.e., as soon as the masses stop moving forward.

In the context of the present revolutionary situation the reforms and concessions must be first understood from this angle—let them not sidetrack us from relentlessly pursuing the path of the democratic revolution. We cannot be a party to boosting these concessions and lulling the consciousness of the masses, Every concession won will be utilised to build up still further the confidence of the masses that they can fight forward to secure the whole, and we shall ask the masses to compare the reforms secured with the whole that they are striving for.

Today even the eight-hour day is not safe without a democratic revolution. We must tell this bitter truth to the masses that even the concessions won will disappear unless the landsuckers and exploiters defeated.

This, of course, is not the same thing as the vulgar, conception : to achieve revolution in every partial struggle, This is what the enemies of Marxism always say about the Marxists in their attempts to slander them.

A correct outlook can come only if we realise that the direction of the struggles is towards an agrarian and democratic revolution, that social relations have collapsed to such an extent that no fundamental problem can be solved without a democratic revolution and, ..therefore, it is necessary to guide the several unconnected struggles consciously into this channel. All reforms, besides, are the bye-products of revolutionary struggles; this truth must never be forgotten.

These bye-products must be utilised to strengthen the revolution and not for removing revolution to a distant age.

Programme of Democratic Revolution

The programme of the Democratic Front and the Left parties should contain the following :

(1) A democratic Government representing the will of the people and not of the capitalists, and opposed to collaboration with Anglo-American imperialism and pursuing a democratic foreign and economic policy abroad.

(2) A Constitution guaranteeing full freedom and democracy to the common man, and ensuring full economic power for the people.

(3) Self-determination to national units—linguistic provinces,

(4) Full rights of Muslim minorities to be embodied in the Constitution.

(5) End of feudal rule and establishment of full democracy. On the question of accession to the Indian Union or Pakistan, the Democratic Front will decide the question by applying three criteria ; (i) what are the wishes of the people concerned, (ii) what course helps democracy in the State as well as in the Dominion, (iii) how does it affect the relations between the peoples of Indian Union and Pakistan.

(6) Tribals and similar backward people living in compact areas to

be given the right to form autonomous regions inside the provinces concerned. The Central as well as every Provincial Government must assure economic and cultural development of these tribal areas. Administration of agriculture, education, forest, shall be the jurisdiction of the Autonomous unit of the tribal and semi-tribal people.

(7) Co-operation between Indian Union and Pakistan for economic help, military and political alliances for defence, to pursue a democratic foreign policy in co-operation with the Democratic States against the Anglo-American bloc.

(8) Abolition of landlordism and distribution of land to the tillers of the soil. Abolition of Zemindary system without confiscation of Khas land of the non-cultivating landowners and without giving land to sub-tenants and share-croppers, while giving huge compensation to the landlords, will no longer be considered as a progressive step worth boosting up.

(9) Nationalisation of key industries, minimum living wage, 8-hour day, right to strike, trade union regulation, social security.

(10) Control of profits in industries in private hands.

(11) Economic plan to develop India's resources and removal of Big business from strategic economic points.

(12) Repeal of all repressive legislation.

(13) Support to democratic nations fighting against Anglo-American imperialism and pacts of mutual assistance with them in economic, political and military spheres.

The Democratic Front, and the Communist Party in building it up, will fight communal agents and riot-mongers as enemies of the people. They will unmask their talk about defence of Hindu or Muslim culture and expose their class affiliation. They will organise "Santi Senas," coopertate with all who stand for communal peace and help every genuine step that the Government might take to quell riots. At the same time, they will expose the policy of national compromise which spreads riots and will call upon the people to defeat the game of vested interests. They will also expose all communal acts of the Members of the Government which abet feudal reaction.

To start with, it is not necessary that there will be a joint front of only those who agree with the entire programme of the Democratic

Front. Immediate joint actions may start on specific questions. As joint actions develop and as Left cooperation develops, the correctness of the programme will be self-evident to all democratic elements and the Front will be progressively realised as part of the experience of the Left and the masses as a whole.

The left and "National" Government

The Left, as well as the Democratic Front, must take a correct attitude to the existing Central Government. The Democratic revolution will certainly have to find a new Government to carry out its will—a new Government, representative of classes different than those now ruling the present Government.

But the majority of the people arc not yet convinced about the necessity to have it and they continue to look upon the present Government as a popular Government.

Unmasking of the policies of the Central Government together with the concentration on Patel, whom all regard as the spokesman of Big business, opens the way to the new stage when we can demand a new democratic Government.

It is obvious that participation by any Left leaders in the present Government with its present policy is an act of treachery to the Left. All such participation must be denounced. The Left can agree to participate only when the Government is committed to a programme of democratic revolution—the extreme Right at least is expelled from the Government and the united Left has developed sufficient strength to apply decisive mass pressure for the realisation of the programme.

Wrong Ideas About Reconstruction

On the question of national reconstruction the position must be sharply stated. We must expose the bourgeois hoax of national reconstruction which is but another name for passing on the burden of the crisis to the workers and the people, through a 9-hour day, freezing of wages and intensification of labour.

We must expose that the production is falling because of the capitalist ownership and crisis of capitalism; we should not join in the hunt for preparing production plans with capitalist profits intact.

We must make it clear that there can be no national reconstruction and no reorganisation of production without nationalisation of industries, without liquidating the colonial order, without implementing the programme of the democratic revolution, without giving decent wages to the workers.

Overwhelmed by bourgeois propaganda we sometimes feel ashamed to advocate nationalisation of industries and a living wage as the basis of national reconstruction—thinking that these are too general and abstract bases. So demoralised are we sometimes that we do not see that these are the most practical and concrete proposals—and the only effective ones to change the social order and reorganise production. Only those who are accustomed to think even of the democratic revolution as a distant perspective and do not believe in fighting for it at the present, but want to argue on the basts of bourgeois practicality, will feel embarassed before our immediate programme.

Therefore to ask the workers to produce more for the capitalist plans, made for the purpose when the working ciass is engaged in a bitter struggle to prevent worsening of its standard of living, is a call to sacrifice the worker to the bourgeoisie, Those who give the call are victims of bourgeois propaganda against the workers.

We must expose and unmask the bourgeois plans, resist all attacks against the workers and boldly put forward nationalisation, control of profits, living wage etc. as our contribution to organising production. All Party leaders must get rid of the idea that nationalisation etc. is not a concrete proposal.

Decontrol — First Shot of Big Business

On tne question of decontrol versus control we must take a correct stand in consonance with the realities of the situation. Otherwise we will lose the initiative to Big business.

The decontrolling of commodities will vitally affect the interest of large sections of the working class, the town and city petty-bourgeoisie and also the peasants. Prices of industrial goods and agrarian products will rise. By raising the prices through decontrol Big business seeks to transfer the burden of the crisis on certain sections of the people. The wage increases will be resisted; prices will automatically rise.

Decontrol means fall in the real wage of the city petty-bourgeoisie and the working class, and also in the purchasing power of the poor peasants.

This must be exposed and the discontent of these sections must be harnessed to defend their own interests. The peasant perhaps will be cheated again. It almost looks certain that prices of goods that he will have to purchase will rise higher that the grain he has to sell.

How are the "exponents of Big business justify decontrol before the peasant masses and sections of other people?

By holding out hopes to the peasant that he will get a better price.

By holding out hopes to the city people that prices will fall.

By themselves taking a lead in denouncing administrative corruption, delays and blackmarketing; thus making a plausible case for decontrol.

We must, therefore, expose this game and show that it is the monied interests that are responsible for corruption and black marketing; that their game now is to exploit through the rising prices both the town and the village; that the real remedy against corruption in removal of corrupt officers; that the alternative is not between present corrupt controls and decontrol but between effective control — to check Big business and blackmarket—and decontrol; that effective control can be established by freezing all payment of rent to the landlords and interest to the money-lenders, by taking over the entire surplus with the rich peasants, by nationalising the industries, by giving the peasant a fair price and by assuring him industrial goods at cheap prices.

We thus expose the Big business and also the Government policy, and show that the Government instead of attacking Big business has succumbed to it through decontrol, giving it freedom to loot all. including the peasant.

Naturally, with the present decontrol, we will not ask the peasant to part with his grain unless he gets a fair price and supply of industrial goods at cheap prices. To do so will be to join in the exploitation of the peasant.

Reassess States People's Struggles

We have to adopt very correct tactics on the States people's front. All these days we have in our press glorified every compromise as a big

victory of the popular forces. We have fallen into bourgeois trap of glorifying every accession, even though it was accompanied by petty reforms and retention of Princely autocracy.

We must first assess the results of these struggles. Nowhere have the people really scored an irrevocable triumph. On the other hand, the compromise has been of such a thinly veiled character that as soon as the mass pressure declines there is every danger of the most reactionary elements in the States coming on top and practically nullifying the gains. The Central Government with its policy of appeasement will not be able to prevent this. We seem to be unaware of the betrayal of the trusting people.

Wo must, therefore, reassess these struggles. In the developing struggles we should do our best to fight the compromising policies and if we are unable to prevent compromise we should not at least join the chorus of glorification and cheat the people. By our criticism and explanation, and wherever possible by action also, we should gradually demarcate ourselves from the compromisers. We should not feel embarassed to put forward our full demand for abolition of autocracy, imagining that it will isolate us. There are a number of ways in which we can popularise it, without getting isolated. It is sheer opportunism on our part to start with a programme of compromise and not even raise the issue of abolition of autocracy.

We should utilise any interval that we might get to expose the real character of the settlement and show how little it is, compared with the strength of the people and their rights. We must teach the people to give up the servile attitude which judges any compromise as an advance over the past and does not examine it in relation to the present.

We are a very weak force in the States and our task to fight compromising policies is very difficult. In many States we are mere individuals or groups. Our opposition to compromise does not and cannot mean that we break with Prajamandals and do not participate in the struggles launched by them. On the other hand we just participate in these struggles and try to push them as further as possible. Our weak position should not be an excuse to always line up behind the compromisers, to always glorify their compromise and thus get popular. The Party has grown both by participation as well as by independent

criticism and action. Unless proper ways of independent criticism and understanding are found and the radical sections of the States peoples are roused to independent thinking, unless the masses are made familiar with their fundamental right to abolish feudalism, there will be no democracy, no fighting the compromise, but only a continuous surrender. The people's Age must help in this and not sow illusions. The comrades on the spot must attempt it and they will soon find that if they do not forget our present weakness, they will be able to do it in a manner which will not isolate us.

We must, besides fighting the compromising policies, boldly put forward, at least in our meetrngs, the programme of agrarian revolution and popularise legally or illegally abolition of feudalism. Without creating a core round this programme no fight against feudal order can be carried on, nor can the policies of compromise be defeated.

Lead Battles of the Masses

Disillusionment against the policies of the national leadership is rapidly growing among the people. These policies will not solve a single problem of the people. There is not scope for bourgeois development of India—beyond the colonial order and status, These policies, dominated by the capitalist crisis, will add to the misery and impoverishment of the Indian masses, rousing their anger and indignation and leading to mass strikes of the workers and peasant actions.

The Party and the working class must be in a position to lead everyone of these battles; of the workers fighting against the desperate efforts of the capitalists to throw the burden of the crisis on their shoulders; of the struggles of the Kisan masses against eviction, for rent reduction and for fair prices for crops and for getting industrial goods at cheap prices; of the middle-class employees, teachers, clerks, Government servants etc., for better living conditions; of the common people against black-marketeers and corrupt administrative officials; and of every struggle for civil liberties and democratic rights.

The Party must realise that everyone of these struggles, partial, economic and political, has a profound revolutionary meaning in the contest of the maturing of the democratic revolution in our country. The Party must work its utmost to win the maximum possible public support

to every one of these struggles with the confidence that with the worsening crisis affecting every section of the common man, it will be possible to nail down the vested interests as the chief enemy of our economic life.

The imperialists and their agents seek to build a line-up from the British and American imperialists to the bourgeoisie in order to stop the tide of the revolution. They hope that the bourgeoisie will succeed in splitting the popular forces, paralysing larger sections of the masses and repressing the rest. Their own agents have already started the softening process through riots.

At this stage the fate of the revolution depends on the correct policy of the CPI and of the working class—a policy which must see the great strength of tlie forces of the revolution and also their weakness in the illusions the masses have about the bourgeoisie. To gather that strength through the Democratic Front, to dispel the illusions by unmasking the "National Government" and to carry forward the fight on the basis of the programme of the democratic revolution is the special task of the Party of the working class. If the CPI itself suffers from illusions about bourgeois leadership, the revolution will be betrayed. If the Party comes out as a bold critic of the national leadership, it will accelerate the process of disillusionment of thousands, enabling the Democratic Front to grow and develop sufficient strength to defeat the present bourgeois policies and create pre-conditions for the establishment of a democratic Government, which will really be an instrument of the democratic revolution.

In the present period of world crisis the task of pushing the democratic revolution ahead is the responsibility of the working class and its party, the Communist Party, The independent role and activity of the working class, as the champion of the anti-imperialist masses against the imperialist-feudal combine and against the collaborationist bourgeoisie constitutes the guarantee for the success of the democratic revolution.

The working class cannot play this role unless it itself is growingly united under its vanguard, the Communist Party, and unless the Party is able to unite the people in the Democratic Front and activise broad masses in the cause of completion of the national democratic revolution,

It is, therefore, more than ever necessary to broaden the mass base

of the Party among workers, peasants, middle class, students, youths of all sections, women and oppressed minorities, so that the Party of the .working class becomes a real mass party capable of discharging the great responsibilities resting on its shoulders. It is necessary to attract fighters from all fronts and all sections, militants from partial struggles and all honest revolutionaries to the ranks of the party, educate them in Marxism-Leninism so that they in their turn become the real educators of the masses, guiding and leading them towards complete freedom and democracy.

A mass party with a conscious membership fully trained in Marxism-Leninism—such must be our watchword.

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

নিখিল চক্রবর্তী

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে এতদিন পরিগণিত হয়ে এসেছে। জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থায় ভারতের সংবাদপত্রগুলি ব্রিটিশ শাসনের তীব্র নিন্দা করে, স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী বহন করে দেশের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আমাদের দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র ব্রিটিশ শাসনের বহু হুমকি অমান্য করে বহু ত্যাগ, লাঞ্ছনা, অর্থদন্ড এমনকি কারাবরণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। বর্তমানে যখন প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের পরিবর্তে জাতীয় জীবন ও শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয় কর্তৃত্ব বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখনও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার বহু লক্ষণ চোখে পড়ে। ব্রিটিশ শাসনের আমলে সংবাদপত্রগুলি আপন স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য যে লড়াই করতে সর্বদাই উদগ্রীব থাকত, আজকে তার অভাব খুবই চোখে পড়ে।

পুঁজিপতিদের আধিপত্য

তবে এ অবস্থা শুধু আমাদের দেশেই একমাত্র দেখা দেয়নি। যেখানেই বড় বড় পুঁজিপতিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনে যদিও গণতন্ত্রের নামে কাগেজে কলমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়ে থাকে, তবু কার্যত সেখানে পুঁজিপতিদের প্রভুত্ব সংবাদপত্রগুলির উপর পুরোপুরি দেখা যায়। আমেরিকার প্রধান সংবাদপত্রগুলি এক একটি পুঁজিপতিগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসাবে পরিচিত এবং এই সব গোষ্ঠী একসঙ্গে শত শত সংবাদপত্র প্রকাশ করে জনসাধারণের মতামত সম্পূর্ণ নিজ স্বার্থ অনুসারে পরিচালনা করে। ব্রিটেনে এমনকি লেবার পার্টির মুখপত্র ডেইলি হেরাল্ডের অধিকাংশ অংশীদার হল কোন এক বিশিষ্ট বণিক। কমিউনিস্ট পার্টির ডেইলি ওয়ার্কার বাদে ব্রিটেনে কোন দৈনিক পুঁজিপতিদের কবল থেকে রক্ষা পায় নি।

আমাদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিপত্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে তারা আপন প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। গত ৫-৬ বছরে যুদ্ধের বাজারে আমাদের দেশে বুর্জোয়াশ্রেণি যেমন প্রচুর মুনাফালাভ করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তেমনি তারা জনসাধারণের মতামত প্রভাবিত করার উদ্দেশে প্রত্যক্ষভাবে সংবাদপত্রগুলি হস্তগত করার

জন্য বদ্ধপরিকর হয়। তাই গত বার বছরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই নাম করা পুঁজিপতিরা অনেক সংবাদপত্রের মালিকানা দখল করে রেখেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে। বিড়লাদের হাতে রয়েছে দিল্লীর 'হিন্দুস্তান টাইমস', এলাহাবাদের 'লীডার', পাটনার 'সার্চলাইট' প্রভৃতি ইংরাজী এবং 'হিন্দুস্তান' প্রভৃতি কয়েকটি প্রভাবশালী হিন্দু দৈনিক।

ডালমিয়ার সম্পত্তি হল বোম্বাই-এর 'টাইমস্ অব ইন্ডিয়া', 'দিল্লীর 'ইন্ডিয়ান নিউজ ক্রনিকল' ও 'ন্যাশনাল কল' ও কলকাতার 'ভারত' ও 'ইস্টার্ণ এক্সপ্রেস', তাছাড়া লক্ষ্ণৌর 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' এও তাঁর যথেস্ট শেয়ার আছে।

গোয়েঙ্কাদের হাতে রয়েছে মাদ্রাজের 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস', 'সানডে স্টান্ডার্ড', 'দিনমণি' ও 'অন্ধ্রপ্রভা' প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় পত্রাদি।

কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড ও বোম্বাইয়ের 'বম্বে ক্রনিকল' ও 'ফ্রি এক্সপ্রেস জার্নাল' ও নামজাদা পত্রব্যবসায়ীদের সম্পত্তি এবং সেই হিসাবে পুঁজিপতিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিজ্ঞাপনের লোভ

পুঁজিপতিদের দখলে শুধু এই কয়টা সংবাদপত্র নেই। বস্তুত যে কোন সংবাদপত্র বিশেষত দৈনিক সংবাদপত্র মাত্রই তাদের কবলে পড়ে যায়। আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই আমার বলতে পারি— কিভাবে বিজ্ঞাপনের মারফৎ সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতায় পুঁজিপতিরা অবাধে হস্তক্ষেপ করতে পারে। যে কোন দৈনিক কাগজ প্রচুর বিজ্ঞাপন ব্যতীত কিছুতেই চালানো সম্ভব নয়। গত কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা হাজার হাজার টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করতে আরম্ভ করেছেন শুধু আপন পণ্যের পরিচয় জনসাধারণকে দেওয়ার জন্য নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের লোভ দেখিয়ে সংবাদপত্রগুলিকে হাত করতে।

যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার প্রায় প্রত্যেকটি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রকে এইভাবে হস্তগত করার চেষ্টা করে এবং কতক পরিমাণে সক্ষম হয়। তাই ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারি বিজ্ঞাপনও বহু বিশিষ্ট কংগ্রেসী পত্রিকা ছাঁপিয়েছে, পরসার লোভ সংবরণ করতে পারে নি।

গণ আন্দোলনের কণ্ঠরোধ

সেই নীতি অনুসারে আমরা আজকাল প্রায়ই দেখতে পাই বহু সংবাদপত্রের শ্রমিক-বিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার। সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়ত ব্যক্তিগতভাবে এই সব হীন প্রচেষ্টায় আপত্তি করেন, কিন্তু সংবাদপত্রের মালিক কখনও বা স্বয়ং পুঁজিপতিদের সমর্থন করেন, কখনও বা পয়সার লোভে কোন ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন ছাপতে কুণ্ঠিত হন না। কলকাতায় এ বছরের গোড়ার দিকে যে ঐতিহাসিক ট্রাম ধর্মঘট হয় তখন শ্রমিকদের প্রতি বহু সংবাদপত্র-সেবীর সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও ট্রাম কোম্পানী ধর্মঘটের বিরুদ্ধে মিথ্যাপ্রচার বিজ্ঞাপন মারফত সংবাপত্রগুলিতে ছাপতে পেরেছিল। সম্প্রতি বাসন্তী ও শ্রীদুর্গা মিলের ধর্মঘটের সময়

বিজ্ঞাপনের মারফত বহুসংবাদপত্রে এইরূপ শ্রমিক-বিরোধী প্রচার হয়েছে।

অথচ শ্রমিকরা তাদের বক্তব্য জানাবার সুযোগও পায় খুব সামান্য। সাধারণভাবে বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, শ্রমিক বা কৃষক আন্দোলনের খবর আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে খুব সামান্যই স্থান পায়। বহু সংবাদপত্র অনেক সময় এইসব সংবাদ পরিবেশন সম্বন্ধে মালিকরা সম্পাদকের উপর হুকুম জারি করে থাকেন, ফলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিক-কৃষক সংবাদ, বিশেষত তাদের সংগ্রাম সম্বন্ধে প্রবন্ধ বা বিবৃতি প্রায় ধামাচাপা পড়ে যায়। তার উপর যখন মালিকপক্ষ বিজ্ঞাপন মারফত জনমতকে প্রভাবান্বিত করবার সুযোগ পান, তখন স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা কাগজে কলমেও বজায় থাকে না, এবং পুঁজিপতিদের কবল থেকে সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা নাম মাত্রেও নাই।

প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার

পুঁজিপতিদের চিরাচরিত নীতি হল জনগণের ঐক্য নষ্ট করে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এই নীতিই তাদের শ্রেণিসংগ্রামের নীতি। তাই সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা প্রচার করে মালিকশ্রেণি সর্বদাই শ্রমিকদের ও কৃষকদের মধ্যে বিভেদ আনতে চেষ্টা করে, সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন বা কৃষক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য উদ্যোগী হয়।

এই কাজে সংবাদপত্রের সাহায্য তারা নিয়ে থাকে। গত কয়েকমাস ধরে সারা দেশে যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন প্রতিক্রিয়াশীলেরা ছড়িয়ে দিয়েছে, তাতেও সংবাদপত্র সাহায্য করেছে। "মেও"দের "বিদ্রোহ", মুসলমানদের "দিল্লী দখলের ষড়যন্ত্র" ইত্যাদি বহু মিথ্যা রটনার পিছনে কতটুকু সত্যঘটনা রয়েছে তা 'স্বাধীনতা'র বিশেষ সংবাদদাতারা বারবার প্রমাণ করে দিয়েছেন। তেমনি পাকিস্তানের সংবাদপত্রেরা 'আজাদকাশ্মীর' আন্দোলনের নামে কাশ্মীরের হানাদারদের পক্ষ নিয়ে এবং হায়দরাবাদ উপলক্ষে ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে বহু বিষোদগার করে দুই রাষ্ট্রের জনসাধারণকে তফাৎ রাখবার জন্য বারবার চেষ্টা করেছে।

অথচ দাঙ্গার বিরুদ্ধে উভয় বাংলার জনসাধারণের যে বিরাট প্রচেষ্টা তার কতটুকু ভারতীয় ইউনিয়ন বা পাকিস্তানের সংবাদপত্রেরা প্রাধান্য দিয়েছেন? জনসাধারণের মহৎ ঐক্য প্রচেষ্টার বদলে মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের উস্কানিকেই তাঁরা ফলাও ছাপিয়েছেন!

প্রাদেশিকতার বিষ ঢালতেও পুঁজিপতিদের কাগজেরা ত্রুটি করে না। পাটনা থেকে প্রকাশিত বিড়লার 'সার্চলাইট' কিছুদিন পূর্বে বিহারে বাঙালী বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে অগ্রণী হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি, বিড়লার এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'লীডার' সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশে বাঙালী বিদ্বেষ ছড়াতে আরম্ভ করে।

কায়েমী স্বার্থের বেড়াজাল

শুধু এইসব সংবাদপত্রগুলিকে সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা বিস্তারের জন্য দায়ি করা ঠিক হবে না। আসলে আমাদের বুঝতে হবে যে এই সব সংবাদপত্র মারফত কায়েমী স্বার্থ সমাজ-বিরোধী প্রচার চালিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও বিদ্বেষের মধ্যে ঠেলে দেবার ক্রমাগত চেষ্টা করে।

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এসম্পর্কে আরেকটি জ্বলন্ত উদাহরণ আমরা পাই। কন্ট্রোল তুলে দেওয়া সম্বন্ধে দেশময় আলোচনা চলছে। কন্ট্রোলের মধ্যে দুর্নীতি থাকার ফলে সাধারণ মানুষ কন্ট্রোল বিরোধী হয়ে উঠছিল। কিন্তু আসলে বড় বড় পুঁজিপতিরা চিনি, কাপড় ইত্যাদির ওপর থেকে কন্ট্রোল তুলে নেবার দাবি করেছেন যাতে তারা অবাধ মুনাফা লুটতে পারেন। যদিও বহুসংবাদপত্র কন্ট্রোল তুলে দেওয়া সম্বন্ধে পুরোপুরি পুঁজিপতিদের সঙ্গে মত মিলিয়ে নিতে পারে নি, শুধু লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিড়লার 'হিন্দুস্থান টাইমস্' ক্রমাগত কন্ট্রোলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে নিরাপত্তা বিল নিয়ে যে আন্দোলন চলছে, তার প্রতি বাংলার সংবাদপত্রগুলির মনোভাব থেকেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অভাব প্রকট হয়েছে। প্রায় সকল সম্পাদক মাত্রই এই বিলের বিরোধিতা করেছেন এবং সেই অনুসারে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বহুসংবাদপত্র বিলটির নিন্দা করেছে। ইহা স্বাভাবিক; কারণ বিলটিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর জবরদস্তি হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। তবু কিন্তু, বিলটির বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচার আন্দোলন করতে বাংলার বহু বিশিষ্ট পত্রিকা আগুয়ান হতে সাহস পায়নি। কারণ মালিকগোষ্ঠী এই বিলের সমর্থন করছে এবং বিল প্রত্যাহার দাবির আন্দোলন ধ্বংস করবার জন্য তারা উদগ্রীব। এই অবস্থায় বহু সম্পাদকই বিল-বিরোধী আন্দোলনে সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করতে পারেন নি এবং সংবাদের স্তম্ভে বিলের সপক্ষে খবর ফলাও করে ছাপছেন।

সরাকারি কোপদৃষ্টি

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি বহুবার সরকারি কোপদৃষ্টিতে পড়েছে; কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা হিসাবে আমাদের দেশের বহুসংবাদপত্র এগিয়ে এসেছিল। ব্রিটিশ সরকার তাই বহু উপায়ে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা খর্ব করে। সে বিষয়ে অর্ডিন্যান্স জারি, এমনকি সম্পাদক ও প্রকাশকের জেল দিতেও তাদের বাধেনি।

আজ জাতীয় নেতারা সরকার চালাচ্ছেন। কিন্তু তবু গণআন্দোলন দমন করার সবরকম ব্রিটিশ কায়দা আজও বজায় রাখা হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন, জাতীয় সরকারের হাতে এমন ক্ষমতা থাকলে কিছু ক্ষতি নাই; কারণ জাতীয় নেতারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, আজ গণ আন্দোলন যখন কায়েমি স্বার্থের বুনিয়াদের উপর আঘাত করছে তখনই সংবাদপত্রগুলির উপর দুই দিক থেকে আক্রমণ আসছে— একদিকে পুঁজিপতিদের নিজস্ব প্রভাবে সংবাদপত্রগুলিকে হাত করা হয়; অন্যদিকে, সরকারি কঠোর ব্যবস্থায় সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা দমন করা হয়।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান সরকার কায়েমী স্বার্থ ও পুঁজিপতিদের নির্দেশ অবহেলা করতে সক্ষম হবে না; এবং সেই অনুসারে বহুক্ষেত্রে এইসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। ব্রিটিশ আমলে যেভাবে সংবাদপত্রগুলি শৃঙ্খল জর্জরিত ছিল, আজও তার ব্যতিক্রম চোখে পড়ে না। সরকারের নিন্দা না করেও গত এক বছরে আমাদের কমিউনিস্ট পত্রিকাগুলি বহুবার সরকারি লাঞ্ছনা, এমনকি শাস্তিও ভোগ করেছে : অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অপরাধ ছিল জমিদার, মিল

মালিক, দেশীয় নৃপতিদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সমর্থন করা।

'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য লড়াই'— তাই আজকের দিনে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব নতুন করে দেখা দিয়েছে। দেশ যত স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে, ততই শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থের দল কর্তৃত্ব লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, এবং গণশক্তির কোন অগ্রগতি তারা মানতে নারাজ। গণ-আন্দোলনকে ধ্বংস করতে বা গণ-আন্দোলনকে খর্ব করতে তারা তাদের মালিকানার অধিকার ও সরকারি প্রভাবের জোরে সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করতে সেগুলিকে শ্রেণিস্বার্থের মুখপত্রে পরিণত করবার চেষ্টা করছে। তাই আজ আমাদের দেশে কায়েমী স্বার্থযুক্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ·হাতিয়ার হিসাবে সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা রক্ষা করে দেশপ্রেমিক কর্তব্য হিসাবে দেখা দিয়েছে।

('স্বাধীনতা', ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭)

সহায়ক তথ্য - ১৫

ভারতে
মার্শাল প্ল্যান?

আমেরিকা কর্ত্তৃক ভারত-গ্রাসের সূচনা

ভবানী সেন

ছয় আনা

প্রকাশক
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

জানুয়ারী, ১৯৪৮

প্রিন্টার
কালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস
৮ই, ডেকার্স লেন
কলিকাতা-১

(১)

ভারতে নূতন সংকট

সমগ্র ভারতে এক ঘোরতর অর্থনৈতিক সংকটের ঢেউ লাগিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের ৫ম বার্ষিকী সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুত বিনয়কৃষ্ণ রোহাতগী বলিয়াছেন যে, এই সংকট "গত যুদ্ধকালীন সংকটের চেয়েও গুরুতর।" প্রত্যেক শিল্পপতি এবং প্রত্যেক কংগ্রেস নেতাই এই সংকটের কথা ঘোষণা করিতেছেন, এবং এই সংকটের সমাধানের জন্য একটি রাস্তাও অবলম্বন করিয়াছেন। এই রাস্তাটি হইল আমেরিকার 'মার্শাল প্ল্যান' গ্রহণের অনুরূপ রাস্তা। এই রাস্তায় কি সংকটের সমাধান আসিবে, না সংকটের চাপে দরিদ্র জনগণ আরও বেশি নিষ্পিষ্ট হইবে? ইহা কি "সমগ্র জাতিকে" সংকট ত্রাণের রাস্তায় উঠাইতেছে, না কি কোটিপতি মালিকদের পসার বাড়াইবার জন্য সমগ্র দেশটাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাসত্বের অতলস্পর্শী গহ্বরে ডুবাইয়া দিতেছে? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে সর্বপ্রথম এই সংকটের স্বরূপ কি তাহা দেখিতে হইবে।

সংকটের স্বরূপ

জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি

জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পণ্যের দর ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। মজুরদের জীবনধারণের ব্যয় কি সাংঘাতিকভাবে বাড়িয়াছে তাহা দেখিলেই সর্বসাধারণের অবস্থাটা অনুমান করা যায়। বম্বে প্রদেশে ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৫ পর্যন্ত জীবনধারণের ব্যয়ের মাত্রা ২১৯ হইতে ২৩০ পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

যুদ্ধের এই কয়টি বৎসরই ছিল সব চেয়ে দুর্মূল্যের বৎসর। ইহার পর ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে এই ব্যয় বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৪৭ সালের মে মাসে ইহার মাত্রা ২৫৮তে উঠে। ঠিক এই সময় মজুরদের জীবনধারণের ব্যয়ের মাত্রা আমেদাবাদে ২৯০, সোলাপুরে ৩২৩, কানপুরে ৩৪৯, নাগপুরে ৩১১ এবং লাহোরে ৩২৭। অর্থাৎ যুদ্ধের সময়কার তুলনায় বর্তমানে জিনিসপত্রের দর শতকরা পঁচিশ ভাগ বাড়িয়াছে। এই হিসাবের ভিতর জীবন ধারণের ব্যয় কম করিয়াই ধরা হইয়াছে, তথাপি ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধির আন্দাজ পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময় সবাই ভাবিতেছিল যে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর জনতার অসহনীয় অবস্থার লাঘব হইবে, কিন্তু যুদ্ধের পর অবস্থা আরও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ কি?

যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পরও আমদানি তেমন বাড়িতেছে না। আজ দুনিয়ার সমস্ত পণ্যদ্রব্যের আড়ত হইল ধনকুবের-শাসিত আমেরিকা, কিন্তু আমেরিকা হইতে পণ্য আমদানি করিতে হইলে ডলার চাই। আমাদের দেশের অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের সঙ্গে বাঁধা, কাজেই ডলার পাইবার উপায় বিলাতের মুদ্রা স্টার্লিং-এর বিনিময়। বিলাতে আমাদের পাওনা ১৩০০ কোটি টাকার স্টার্লিং জমা আছে, কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট উহা আটকাইয়া রাখিয়াছে। অবশ্য মাঝে

মাঝে কিছু কিছু স্ট্যার্লিং তাহারা ছাড়িতেছে কিন্তু আমাদের মোট পাওনার তুলনায় তাহা যৎসামান্য। যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের লোকদের দুর্ভিক্ষে মারিয়া ঐ স্টার্লিং বিলাতে জমিয়াছে, এখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বলিতেছে আমাদের দেশেও গুরুতর সংকট, আমরা ঐ স্টার্লিং দিতে পারি না।

উৎপাদন হ্রাস

আমাদের দেশের উৎপাদন বাড়িতেছে না, বরং কমিতেছে। যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ প্রয়োজনে এ দেশের ধনিককে অতিরিক্ত মুনাফা দিয়া উৎপাদন কিছুটা বাড়ায়। তাহাতে ধনিকের শক্তি বাড়ে কিন্তু জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। দেশের প্রকৃত উৎপাদন-ক্ষমতা তাহাতেও বাড়ে নাই, কারণ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এক রকম বাড়ে নাই বলিলেই চলে। সে সময় ব্রিটেন এবং আমেরিকায় যন্ত্রপাতি বাড়িয়াছিল শতকরা ৫০ ভাগ, আর আমাদের দেশে বাড়িয়াছিল মাত্র শতকরা ১ ভাগ। এখন সমস্যা এই যে, যন্ত্রপাতির আমদানি না বাড়াইলে উৎপাদন বাড়ানো কঠিন, কিন্তু ডলার নাই, স্টার্লিং পাওয়া যায় না, সুতরাং যন্ত্রপাতি আমদানি করা অসম্ভব।

এখন নূতন যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া নূতন কারখানা খুলিয়া উৎপাদন বাড়ান তো দূরের কথা, চলতি কারখানাগুলিতেও উৎপাদন কমিতেছে। অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি পণ্যই ১৯৪৩ সালের চেয়ে ১৯৪৭ সালে কম উৎপন্ন হইয়াছে।

পণ্যের নাম	*১৯৪৩-৪৪*	*১৯৪৬-৪৭*
বস্ত্র	৪৮৭১ হাজার টন	৩৮৬৩ হাজার টন
চিনি	১৹২৪ হাজার টন	৯২১ হাজার টন
সিমেন্ট	২১১২ হাজার টন	২০১৬.৩ হাজার টন
পিগ্ আয়রণ	১৩৬৬ হাজার টন	১১৯৯.৩ হাজার টন

খাদ্য সমস্যাও পূর্ববৎ আছে। খাদ্য আমদানিও কমিয়া যাইতেছে। দুনিয়ায় খাদ্যের প্রধান মজুতদার আমেরিকা। আমেরিকার খাদ্য তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রই বেশি পায়। ভারতের খাদ্য উৎপাদনও কমিয়াছে, যুদ্ধের আগে হইতেই আমাদের দেশের কৃষির অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধের আগে ২৫ বৎসরে ভারতে প্রতি একরের ফলন গড়পড়তা শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়াছে। বর্তমানে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাইতেছে।

পুঁজিপতির মুনাফাই বড় কথা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে শিল্পে অনুন্নত রাখিয়াছে, এমন কি যুদ্ধের সময়ও ভারতে যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়িতে দেয় নাই এবং এখনও ইংল্যান্ডে আমাদের পাওনা স্টার্লিং আটকাইয়া রাখিয়া শিল্পের উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৫ই অগস্টের পর তথাকথিত "স্বাধীনতা" লাভে আমাদের এই উপনিবেশিক দাসত্বের প্রকৃত কোন পরিবর্তন হয় নাই। দেশী পুঁজিপতিরাও আরো বেশি দর এবং আরো বেশি মুনাফা না পাইলে উৎপাদন বাড়ান যতটা সম্ভব তাহাও বাড়াইবে না। কংগ্রেস গভর্নমেন্ট পাছে জনমতের চাপে শিল্পগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া ফেলে সেই ভয়ে শিল্পপতিরা ইচ্ছা করিয়াই উৎপাদন

কমাইতেছে এবং দাবি করিতেছে যে শিল্পের জাতীয়করণ সম্পর্কে সরকারের মনোভাব কি তাহা খুলিয়া বলিতে হইবে, অর্থাৎ শিল্প-বাণিজ্যে ব্যক্তিগত মুনাফার সুযোগ অব্যাহত থাকিবে, ভাল করিয়া এই আশ্বাস না পাইলে তাহারা উৎপাদন বাড়াইবে না। আরও অতিরিক্ত মুনাফা যাহাতে পাওয়া যায় এবং শিল্পের জাতীয়করণ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য শিল্পপতিরা চারিদিকে আন্দোলন শুরু করিয়া দিয়াছে।

শ্রীযুত বিনয়কৃষ্ণ রোহাতগী ইঞ্জিনিয়ারিং সমিতির ৫ম বার্ষিকী সম্মেলনে বলিয়াছেন — "মোটরগাড়ী, জাহাজ তৈরি এবং বিমান যান প্রভৃতিতে সবেমাত্র ব্যক্তিগত মূলধন খাটান আরম্ভ হইয়াছে, এগুলির মালিকানা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হইলে ব্যক্তিগত শিল্প প্রচেষ্টার মৃত্যু ঘটিবে।"— অমৃতবাজার পত্রিকা ২৩/১২/৪৭।

ইন্ডিয়ান্ চেম্বার্স অব্ কমার্সের বাৎসরিক সভায় মিঃ দরাব ড্রাইভার বলেন— "কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের মত পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস জাতীয়করণ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আরও কত অধিকতর বাঞ্ছনীয় কাজ টাকার অভাবে সম্ভব হইতেছে না। বিদেশী মূলধন দেশী মূলধনে রূপান্তরিত করিবার গৌরব অর্জনের জন্য ৩০ কোটি টাকা এখন ধার করা কি উচিত? অধিকতর উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা যখন খুব বেশি হইয়া পড়িয়াছে তখন এই টাকা শিল্প ও কৃষির উন্নতি বিধানে ব্যয় করাই কি উচিত নয়?"

শুধু ক্যাপিটালিস্ট্ (পুঁজিপতি) ড্রাইভার নন, সোশালিস্ট (সমাজতন্ত্রী) জয়প্রকাশ নারায়ণও এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। গৌহাটীতে সাংবাদিকদের নিকট তিনি সম্প্রতি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ ২৬শে ডিসেম্বর "হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে—

"চা, তেল এবং আসামের অন্যান্য শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে উক্ত সোশালিস্ট নেতা বলেন, তিনি অবিলম্বে এগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার পক্ষপাতী নহেন কারণ তাহা করিতে হইলে ক্ষতিপূরণের জন্য যে বিস্তর অর্থ লাগিবে তাহা নষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে মূলধনের অভাবে শিল্পের অগ্রগতি বন্ধ হইয়া যাইবে।"

অবশ্য ড্রাইভার এবং জয়প্রকাশদের মতে বিনা ক্ষতিপূরণে জাতীয়করণের প্রশ্নই উঠে না, সে পথ তাঁহারা আগেই বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখপাত্র-স্বরূপ কংগ্রেস নেতারা গণপরিষদে রচিত গঠনতন্ত্রে এমন একটি ধারা রাখিয়াছেন যাহাতে বিনা ক্ষতিপুরণে এমন কি অল্প ক্ষতিপূরণে কোন বিদেশী বা দেশী মূলধন জাতীয়করণ বে-আইনি হয়। তাহাদিগকে 'উপযুক্ত' ক্ষতিপূরণ দিতে সরকার আইনত বাধ্য থাকিবে।

এখন তাঁহারা সুর তুলিয়াছেন যে, টাকা ধার করিয়া ক্ষতিপূরণ দিয়া কোন শিল্পের জাতীয়করণ সম্ভব নয়। তবু তাঁহারা একথা বলিতেছেন না যে, বিনা ক্ষতিপূরণেই শিল্পসম্পদ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হোক।

যুদ্ধের কয়েক বৎসর পুঁজিপতিরা অবিশ্রান্ত মুনাফা লুটিয়াছেন। কিন্তু দেশের শিল্প এখন আর তাঁহারা বাড়াইতে পারিতেছেন না। এখন তাঁহাদের আরও মুনাফা চাই নতুবা তাঁহারা উৎপাদন বাড়াইবেন না। মুনাফা আরও বাড়াইতে হইলে জিনিসপত্রের দর আরও বাড়াইতে হইবে; তাহাতে সাধারণ লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটুক। দেশবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে যন্ত্রপাতি চাই, তাহার উৎপাদন এদেশে হয় না কারণ তাহা

উৎপন্ন করিতে হইলে কিছুকাল লাভের আশা ছাড়িয়া বিস্তর পুঁজি খাটাইতে হইবে। বিদেশ হইতেও আমদানির পথ বন্ধ, কারণ ডলার পাওয়া যায় না, ইংরেজবাও স্টার্লিং দেয় না। একদিকে মালিকদের হাতে পুঁজি রহিয়াছে অন্যদিকে দেশে বিপুল শ্রমশক্তি রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি উৎপাদন কমিয়াছে। ইহাই ব্যক্তিগত মুনাফার ভিত্তিতে শিল্প সংগঠনের অরাজকতা। এই অরাজকতা নানাভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

যানবাহন ও বাসগৃহের অব্যবস্থা

যুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে কয়লার উৎপাদন কমে নাই বরং কিছু বাড়িয়াছে। বাংলা ও বিহারের খনিগুলিতে প্রায় ২০ লক্ষ টন কয়লা জমিয়া রহিয়াছে। মালগাড়ীর অভাবে এই কয়লা যথারীতি সরবরাহ করা যায় না। এদিকে খনিতে কয়লা জমিয়া রহিয়াছে, ওদিকে কয়লার অভাবে অন্যান্য শিল্প ঠিকমত চলে না, মালগাড়ী তৈরির পাকা ব্যবস্থা নাই। তেলের অভাবে, কেরোসিনের অভাবে, পেট্রোলের অভাবে সর্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে কিন্তু টিন, পিপে, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির ঘাটতি পড়িয়াছে সুতরাং তেল তৈরি হইলেও সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা বানচাল হইয়া গিয়াছে। চিনির উৎপাদন বাড়ে না কারণ ইক্ষুর উৎপাদন খুব কম।

ভারতের ও পাকিস্তানের প্রত্যেক শহরেই বাসগৃহের অভাব ভীষণভাবে অনুভূত হইতেছে। ক্যাপিটালিস্টরা বাসগৃহ তৈরি একরকম বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কারণ উহা আর লাভজনক নয়। বাসগৃহ তৈরির উপকরণের দর অত্যন্ত বাড়িয়াছে। বালি, সিমেন্ট, কাঠ, স্টীল, ইট প্রভৃতির দর এত বাড়িয়াছে যে, একজন মানুষের বাসোপযোগী দুই-কামরা বিশিষ্ট বাসগৃহের খরচ জমির খাজনা বাদেই মাসিক অন্যূন ৩৮ টাকা দাঁড়ায়। (ইস্টার্ণ ইকনমিস্ট ১৭/১০/৪৭)। এত ভাড়া দিয়া কোন মজুরের পক্ষে বাস করা সম্ভব নয় কারণ, মাসে ৩৮ টাকা ভাড়া দিবার মত মজুরি পান এমন ভাগ্যবান মজুর এদেশে খুবই কম। অথচ ইহার বেশি ভাড়া না পাইলে কোন ক্যাপিটালিস্টের যথেষ্ট মুনাফা থাকে না। বাসগৃহ তৈরির ক্যাপিটালিস্টকে মুনাফা দিতে হইলে অন্যান্য ক্যাপিটালিস্টদের মুনাফা কমাইয়া মজুরের ও কেরাণীর বেতন বাড়াইতে হইবে, কিন্তু সে কথা বলিলে আর রক্ষা নাই।

সংকটের মূল কারণ

ধনতন্ত্রের এই অরাজকতাই আমাদের দেশের সমূহ সংকটের কারণ। ইহার জন্যই শিল্পের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ। অথচ এদিকে শ্রমশক্তির বিরাট অপচয় ঘটিতেছে। ভারত ও পাকিস্তানের ৪০ কোটি অধিবাসীর অধিকাংশই কৃষিজীবী। কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় দেড় কোটি উদ্বৃত্ত কাজের লোক রহিয়াছে। সৈন্যবাহিনীতে ২৫ হইতে ৩০ লক্ষ লোক 'উদ্বৃত্ত' হইয়াছে, ক্রমশঃ তাহারা ছাঁটাই হইয়া বেকার শ্রেণিভুক্ত হইবে। রেল, বিভিন্ন শিল্প ও অফিস হইতে শীঘ্রই প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হইবে। কারণ তাহাদের কোন কাজ দেওয়া যাইতেছে না। এমনিভাবে প্রায় দুই কোটি লোকের শ্রমশক্তির অপচয় ঘটিতেছে। এই দুই কোটি লোককে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করাই দেশের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। অথচ উৎপাদন সংকটের জন্য দোষ দেওয়া হইতেছে মজুরদের ধর্মঘটকে। ২৩শে ডিসেম্বর কলকাতার অর্থনৈতিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীরাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন, "আগামী তিন বৎসর শিল্পক্ষেত্রে

শান্তি স্থাপনের জন্য যে চুক্তি হইয়াছে আমি তাহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি, এখন কাজ চাই কেবল কাজ এবং কোন ধর্মঘট চাই না।" কিন্তু দুই কোটি বেকারদের কাজ দেয় কে? ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট না করিলেই তো কাজ চলিয়া যায়। মজুরি বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট না করিলে কাজ হয় বটে, কিন্তু কাজের ফলটা যায় মালিকের মুনাফাবৃদ্ধিতে, মজুর না খাইয়া থাকে। এই সমস্যার সমাধান মালিকের মুনাফা বৃদ্ধির পথে করা যায় না, তাই "কাজ চাই কেবল কাজ" এই চীৎকার দরিদ্র মজুর ও কেরানীর নিকট অর্থহীন।

মোটকথা, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ হইল মুনাফাশিকারজনিত উৎপাদন ব্যবস্থার সংকীর্ণতা এবং উপনিবেশিক অর্থনৈতিক বন্ধনের ভিতর প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমশক্তির বিপুল অপচয়। ১৫ই আগস্টের পর কংগ্রেস নেতারা ভারতে এবং লীগ নেতারা পাকিস্তানে সরকারি যন্ত্রের কর্ণধার হইয়াছেন বটে কিন্তু এই অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান তাঁহাদের সাধ্যাতীত। এই অর্থনৈতিক সংকট দূর করিতে হইলে চাই (১) সমস্ত বড় বড় শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, (২) মুনাফার জন্য উৎপাদন না চালাইয়া মজুরদের উন্নতি এবং সস্তাদরে পণ্য সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা, (৩) স্টার্লিং ব্যালান্স আদায় এবং এদেশে অবস্থিত বিলাতী মূলধন দখল করা, (৪) অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি।

কংগ্রেস সরকার এবং লীগ সরকার এই পথ অবলম্বন করিতেছেন না। তাঁহারা যে পথ অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে সংকটের বোঝা দরিদ্র জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে, সংকট তাহাতে আরও ঘোরতর হইবে।

(২)

আমেরিকার সাহায্য ভিক্ষা

জেনেভা বাণিজ্য চুক্তি

ভারতের অর্থনৈতিক সংকট দূর করিবার জন্য ভারত সরকার একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা হইল ইঙ্গ-আমেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদী এবং তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে এক বাণিজ্যচুক্তি।

জেনেভাতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীভাবা ১৩টি দেশের সঙ্গে এক বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন। এই ১৩টি দেশের নাম হইল অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, ব্রেজিল, চিলি, চীন, ফ্রান্স, নরওয়ে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং চেকোস্লোভাকিয়া। (ইস্টার্ন ইকনমিস্ট, ৫/১২/৪৭)। ইহার মধ্যে এক চেকোস্লোভাকিয়া ছাড়া আর সমস্ত রাষ্ট্রই বর্তমানে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার। চেকোস্লোভাকিয়ার কথা ধর্তব্য নয় কারণ তাহার সঙ্গে নামমাত্র কারবারের কথা হইয়াছে, তাহা প্রস্তাবিত সমগ্র বহির্বাণিজ্যের শতকরা ১.৪ ভাগ মাত্র। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই চুক্তি হইয়াছে সবচাইতে বেশি, শতকরা ২৫.২ ভাগ। এই চুক্তি অনুসারে ভারত ঐ সমস্ত দেশ হইতে নিম্নলিখিত পণ্যগুলি আমদানি করিবে— দুধ, দুধের তৈরি অন্যান্য জিনিস, টিনের খাদ্য, ফল, কেমিক্যাল বা রাসায়নিক দ্রব্য,

ঔষধ, কয়লা, উৎপাদন যন্ত্র, মটর গাড়ী, রেডিও সেট, টাইপরাইটার ইত্যাদি। এই চুক্তির মেয়াদ আপাতত তিন বৎসর।

বিদেশ হইতে এইসব জিনিস আমদানি করাই যে খারাপ তাহা নয়, এ সব জিনিসের অভাব এদেশে আছে সুতরাং আমদানিটা তেমন দোষের নয়। কিন্তু এই আমদানির মূলে যদি এমন কোন শর্ত করা হয় যে, এদেশে এই সব-জিনিসের উৎপাদনে সরকার কোন রকম সাহায্য দান করিতে পারিবেন না তাহা হইলেই দেশের সর্বনাশ করা হয়। এবং এই রকম শর্তই করা হইয়াছে।

চুক্তির ফলে উৎপাদনে কনট্রোল

একটি আন্তর্জাতিক ট্রেড চার্টার অনুযায়ী উল্লিখিত বাণিজ্যচুক্তি করা হইয়াছে। উহাতে এইরূপ একটি ধারা আছে যে, এক দেশ অন্য দেশ হইতে যে-সমস্ত পণ্য আমদানি করিবে নিজ দেশের ভিতর যে সমস্ত পণ্যের উৎপাদনের জন্য কোন রকম সরকারি সাহায্য দেওয়া চলিবে না। এই শর্তের তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ভারত রাসায়নিক পণ্য ও ঔষধ আমদানি করিবে সুতরাং ভারতে রাসায়নিক পণ্য ও ঔষধের দরের উপর কোন কনট্রোল থাকিবে না; যে যে কোম্পানী ভারতে ঐ সমস্ত পণ্য তৈরি করে তাহাদের কোন রকম সরকারি সাহায্য দেওয়া চলিবে না; ঐ সমস্ত শিল্প জাতির সম্পত্তিতে পরিণত করা চলিবে না, কারণ তাহাতেও ঐ শিল্পকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দান করা হয়।

আমরা কি ধরনের পণ্য আমদানি করিতেছি তাহা লক্ষ্য করিলেই এই আত্মঘাতী শর্তের তাৎপর্য আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। আমরা খাদ্য ছাড়া প্রধানত যন্ত্রপাতি, মটরকার, কেমিক্যাল প্রভৃতি শিল্পের পণ্য আমদানি করিব, সুতরাং ভারতে আগামী তিনবৎসর এই সমস্ত পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের ব্যাপক এবং দ্রুত প্রসারের জন্য কোন রকম সরকারি ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলিবে না।

তথাপি বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীভাবা বলিয়াছেন যে, "জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিয়াই আমরা এই বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করিয়াছি।"

যুদ্ধের সময়ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে যন্ত্রপাতি উৎপাদন বাড়িতে দেয় নাই। যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উৎপাদন যতক্ষণ না বাড়িতেছে ততক্ষণ ভারতের অর্থনৈতিক পরাধীনতা ঘুচিবে না। এখন কংগ্রেস পরিচালিত ভারত সরকার ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে এমন চুক্তি করিয়াছেন যাহাতে ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাও আগামী তিন বৎসর করা চলিবে না।

উল্লিখিত শর্তটি কংগ্রেস নেতারা জনতার সমক্ষে খোলাখুলি সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। তাই হাভানা সম্মেলনে শ্রীভাবা ঘোষণা করিয়াছেন যে ঐ শর্তটি সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্টের এখনও কিছুটা আপত্তি আছে। শ্রীভাবার এই উক্তিতে ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক নেতারা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে, তাই যদি হয় তবে জেনেভাতে যে বাণ্যিজচুক্তি হইল ভারত গভর্ণমেন্ট কি তাহা বাতিল করিয়া দিবেন? 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' পত্রিকার (৫/১২/৪৭) ওয়াশিংটনের সংবাদদাতা শ্রীভাবার হাভানা বক্তৃতার উপর টিপ্পনী করিয়া এই উক্তি করিয়াছেন : "ভারত সরকার হয়ত জেনেভার চুক্তি বাতিল করিয়াছেন অথবা ভাবার বক্তৃতা

হয়ত প্রধানত ভারতীয় জনসাধারণের মন ভুলাইবার জন্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দরকষাকষির পাল্লা ভারী করিবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।" ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন; কারণ শ্রীভাবা হাভানা যাত্রার পূর্ব মুহূর্তেও জেনেভা চুক্তি সমর্থন করিয়াছেন বলিয়াই জানি। অপরদিকে আমেরিকান্ রাষ্ট্রদূত গ্রেডিও ইঙ্গিতে শাসাইয়াছেন যে ভারত হাভানা চুক্তিতে সহি না দেওয়া পর্যন্ত আমেরিকার সাহায্য পাইবে না।

অন্য পন্থা কি ছিল না?

এই চুক্তি ছাড়া কি ভারতের অন্য কোন উপায় ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। সম্প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন সোভিয়েতকে কতকগুলি জিনিস নির্দিষ্ট দরে দিবে আর সোভিয়েত সমমূল্যের কতকগুলি জিনিস নির্দিষ্ট দরে ব্রিটেনকে দিবে। পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমস্ত দেশের মধ্যে উল্লিখিত ধরণের বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। এই চুক্তির মধ্যে কোন দেশের শিল্প বিস্তারের উপর বা রাষ্ট্রনীতির উপর অপর দেশের হস্তক্ষেপের বা সীমা নির্ধারণের কোন শর্ত নাই। কিন্তু ভারত গভর্নমেন্ট এই সমস্ত দেশের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করিতে অগ্রসর হন নাই, কারণ এই রাষ্টগুলি ইঙ্গ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণেব লক্ষ্য।

এই চুক্তিতে আমদানির ফলাফল

এখন সমস্যা এই আমদানি পণ্যের দাম দিতে হইলে যে ডলার লাগিবে সেই ডলার কোথায় পাওয়া যাইবে? ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পাওনা স্টার্লিং দিবে না। স্টার্লিং পাওনা আদায় লইয়া অনেক সলাপরামর্শ চলিতেছে এবং এমনভাবে প্রচার করা হইতেছে যেন উহা আদায় করিবার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু আসল কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ দরাব কুরসেটজী ড্রাইভার। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিগত বার্ষিক সম্মেলনে বলিয়াছেন— "আমরা যেন স্টার্লিং ব্যালান্স পাওয়া সম্পর্কে বেশি আস্থা না রাখি। উহা মরীচিকা এবং স্মৃতিমাত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ব্রিটিশ অর্থনীতির মরুভূমিতে এই স্টার্লিং ব্যালান্সের চাকচিক্য আমাদের দেশের যন্ত্রপাতির অভাবে অভাবগ্রস্ত শিল্পপতিদের তৃষ্ণাতুরের মত আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁহারা যতই সেদিকে অগ্রসর হয়, কাম্য বস্তু ততই দূরে সরিয়া যায়।" বিচক্ষণ সন্ধানী শিল্পপতির এই মন্তব্যের উপর টিপ্পনি নিষ্প্রয়োজন। ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা বলিতেছে, স্টার্লিং-এর বদলে "আমাদের কাছ হইতে মাল কেনো, আমাদের অর্থনৈতিক যন্ত্র সামলাইবার জন্য আমরা স্বদেশের লোকদের বঞ্চিত করিয়াও বিদেশে মাল রফ্তানি করিব।" অর্থাৎ ভারত তাহার পুরা পাওনা স্টার্লিং পাইবে না, যাহা পাইবে তাহার বেশির ভাগ দিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে মাল কিনিতে হইবে। তাহা হইলে ভারত আমেরিকার মাল কিনিবার জন্য আবশ্যকীয় ডলার পাইবে কোথায়? এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার এখন 'রফ্তানি অভিযানের' আওয়াজ তুলিয়াছেন। আমদানি পণ্যের দর শোধ করিতে হইলে প্রতিবৎসর ভারত হইতে বর্তমান রফতানির উপর আরও প্রায় ১০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানি করিতে হইবে।

রপ্তানির ফলাফল

জেনেভা বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী আমদানির ফল কি হইবে আমরা দেখিয়াছি, এবার রপ্তানি অভিযানের ফল কি হইবে তাহা দেখা যাক।

বিড়লার মুখপাত্র 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' কি বলিতেছে তা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"একমাত্র পথ হইল আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে এতকাল যে সমস্ত পণ্য ছিল না সেই সমস্ত পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করিয়া একটি বৃহৎ রপ্তানি বাণিজ্য সৃষ্টি করা। বিশেষ করিয়া এই জন্যই জাপান যে সমস্ত বাজার পরিত্যাগ করিয়াছে সেই সমস্ত বাজার করায়ত্ত করিবার জন্য ভারত সম্মুখে দিকে তাকাইয়া আছে।"— ইস্টার্ন ইকনমিস্ট, ২১/১১/৪৭।

ভারত যে সমস্ত পণ্য রপ্তানি করিয়া থাকে তাহার মধ্যে প্রধান হইল তুলা, সুতা, বস্ত্র, পাট, চটের থলে, চামড়া, চা, তেলের বীজ। এ ছাড়া শ্রীভাবা আর একটি নূতন তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, যথা কাঠের পুতুল, পিতলের বাসন, সতরঞ্চি, সোনারূপার কারুকার্য করা জিনিস প্রভৃতি। শ্রীভাবা অবশ্য দ্বিতীয় তালিকাটির উপরই জোর দিতেছেন কারণ এই সমস্ত জিনিস রপ্তানি করিবার কথা বলিলে দেশের লোক তত হৈ চৈ করিবে না, যত হৈ চৈ করিবে সুতা, বস্ত্র, তেলের বীজ প্রভৃতি ভারতের অত্যাবশ্যকীয় জিনিস রপ্তানি করার কথা বলিলে। কিন্তু কাঠের পুতুল, পিতলের বাসন প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে রপ্তানি করিতে প্রায় দুই তিন বৎসর সময় লাগিবে, কাজেই বিড়লা পরিচালিত ইস্টার্ন ইকনমিস্ট পত্রিকা (২১/১১/৪৭) মন্তব্য করিতেছেন যে "সবাই জানে যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সুতা ও বস্ত্র রপ্তানির অফুরন্ত সুযোগ রহিয়াছে। বর্তমানে যদিও ভারতে ৪৮০ কোটি গজেরও কম বস্ত্র তৈরি হয় তথাপি এখনই আমরা বৎসরে ত্রিশ কোটি গজ কাপড় রপ্তানি করিতেছি। এই রপ্তানির পরিমাণ এখনই দ্বিগুণ করা সম্ভব।" পাঠকবর্গ এখন বোধ হয় বুঝিতেছেন যে আমাদের এত কাপড়ের অভাব কেন। ইহাও বুঝিতেছেন যে ভারত সরকারের রপ্তানি অভিযানে এই অভাব আরো বাড়িবে। ভারত সরকার এখন বেপরোয়া। যেমন করিয়া হোক রপ্তানি অভিযান সফল করিতে হইবে। সুতরাং শ্রীভাবার ঘোষিত নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের সাহায্য এখন রপ্তানি-যোগ্য পণ্য উৎপাদনের কাজেই অধিক পরিমাণে নিযুক্ত হইবে।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব বাড়িবে

ভারত সরকারের উৎপাদন নীতির লক্ষ্য এখন কি হইবে? এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করিয়া বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীভাবা বলিয়াছেন—

"আমরা অবশ্য বিদেশে পাঠাইবার জন্য উদ্বৃত্ত পণ্য সৃষ্টি করিতে গিয়া দেশের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজার শূণ্য করিয়া দিতে পারি না, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে এখন হইতে দেশের ভিতরকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই দুইয়ের মধ্যে খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা সামঞ্জস্য করিতে হইবে।"— ইস্টার্ন ইকনমিস্ট ২১/১১/৪৭।

এই সামঞ্জস্য বিধানের অর্থ কি এই নয় যে, ভারতবাসীর জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন যতটা করা সম্ভব ছিল, ততটা আর করা হইবে না? শ্রীভাবা দেশের বাজার শূন্য

করিয়া দিবেন না বটে কিন্তু পূর্ণ করিবার কোন ভরসা যে নাই তাহাই বলিয়া দিলেন।

কংগ্রেস নেতৃত্ব যে পথে ভারতকে লইয়া চলিয়াছেন তাহার শেষ কোথায়? আমরা যে সমস্ত পণ্য আমদানি করি তাহার দর এদেশে বাড়িবে বই কমিবে না। কিন্তু যে সমস্ত পণ্য আমরা রপ্তানি করিব ইস্টার্ন ইকনমিস্টের মতে "তাহার দর সম্ভবত কমিবে এবং তাহার ফলে আমাদের আন্তর্জাতিক দেনা বাড়িবে।" ডলারের দেনা যতই বাড়িবে ততই আরও বেশি রপ্তানি করিতে হইবে, রপ্তানির ঝোঁক যতই বেশি হইবে ততই ভারতীয়দের অভাব বাড়িবে এবং ততই বেশি বিদেশী মাল আমদানি করিতে হইবে। বিদেশী মাল আমদানি যত বাড়াইবে ততই ডলার দেনা বাড়িবে, ততই আরও বেশি রপ্তানি করিতে হইবে। এমনি করিয়া এই ব্যবস্থা আমেরিকার কাছে ভারতের এক বিরাট ডলার দেনা সৃষ্টি করিবে। আবার এই ডলার দেনা যাহাতে বেশি না হয় তাহার জন্য আমদানি যথাসম্ভব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্টার্লিং এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা হইবে। এমনিভাবে চলিলে ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে ভারতীয় অর্থনীতির মুক্তি কোথায়?

আমেরিকান মূলধনের গ্রাস

শুধুমাত্র আমদানি রপ্তানির ভিতর দিয়াই যে ভারতের আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবে না এ বিষয়ে আমাদের দেশের শিল্পপতিরাও সজাগ আছেন। তাই স্টার্লিং ব্যালান্সের আশা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা আমেরিকার ঋণ এবং আমেরিকার মূলধনের জন্য প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। আমেরিকান পুঁজিপতিরা ইওরোপের জন্য যে মার্শাল প্ল্যান উপস্থিত করিয়াছে উহা যাহাতে এশিয়াতেও প্রয়োগ করা হয় সে জন্য ভারতে রীতিমত তদ্বির আরম্ভ হইয়াছে।

মার্শাল প্ল্যান কী?

এই বিশ্ববিখ্যাত মার্শাল প্ল্যানটি কী, সে সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ভার্গা বলিয়াছেন :

"গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী হইতে ইহা পরিস্কার হইয়া গিয়াছে যে, এই মার্শাল প্ল্যানটি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ পরবর্তীযুগের নীতি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রচার করা হইতেছে যে, এই প্ল্যানটি আমেরিকার বিশ্বমানবতারই একটি নিদর্শন, কিন্তু আসলে ইহা আমেরিকান্ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বাস্তব স্বার্থ অনুযায়ী পরিকল্পিত।" আমেরিকার বর্তমান বৈদেশিক নীতির মত এই মার্শাল প্ল্যানেরও উদ্দেশ্য হইল সমগ্র পৃথিবীর উপর, বিশেষত ইওরোপের উপর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।" (নিউ টাইম্‌স্ ৩৯শ সংখ্যা)

এই মার্শাল প্ল্যান সম্বন্ধে সর্দ্দার পান্নিকর (ইউ-এন-ওতে অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি) লিখিয়াছেন— "পশ্চিম ইওরোপ সম্পর্কে আমেরিকার নীতি খুবই সহজ। এই নীতি হইল সোভিয়েতের প্রভাবের বহির্ভূত দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য দেওয়া যাহাতে তাহারা তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পন্ন করিয়া সোভিয়েতের প্রভাব রোধ করিবার মত শক্তিলাভ করিতে পারে। ইহারই নাম মার্শাল প্ল্যান। (আমেরিকার) বেসরকারি মহলে সরলভাবেই স্বীকার করা

হয় যে, এই প্ল্যানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কমিউনিজম-এর গতিরোধ করা। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত যুগোস্লোভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া এবং পোলান্ডকেও এই প্ল্যানের সুবিধা গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল কিন্তু উক্ত দেশগুলি মার্শাল প্ল্যানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উহা বর্জন করিয়াছে।''

—ইন্ডিয়া, ২৮/১২/৪৭, পৃষ্ঠা ৯ ও ২৩

এই মার্শাল প্ল্যানের আসল কথা হইল আমেরিকা অর্থ সাহায্য দান করিবে কিন্তু খাতক দেশ এই অর্থ কিভাবে খরচ করিবে তাহা আমেরিকান পুঁজিপতিরা ঠিক করিয়া দিবে। এই অর্থ হইতে আমেরিকান মাল কিনিতে হইবে এবং সেই মালের জন্য আমেরিকানদের মনোমত দব দিতে হইবে, খাতক নিজ দেশে শুধু সেই সমস্ত শিল্পে এই অর্থ খরচ করিবে যে সমস্ত শিল্প আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খাতক দেশটিকে আমেরিকান ব্লকে যোগ দিয়া সোভিয়েত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিতে হইবে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং ইতালীকে ঠিক এই রকম শর্তেই অর্থসাহায্য দান করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

এই প্ল্যান সম্পর্কে গণতান্ত্রিক দেশগুলির মনোভাব

মার্শাল প্ল্যানের সাহায্যে আমেরিকা কি ভাবে ইওরোপের স্বাধীনতা হরণ করিতে চাহিতেছে সে সম্পর্কে সোভিয়েত নেতা ঝদানভ বলেন :

''ইওরোপের অর্থনৈতিক সংকট, বিশেষ করিয়া কাঁচামাল, খাদ্য, কয়লা প্রভৃতির অভাব দেখিয়া আমেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদ ঠিক সুদখোর মহাজনের মত উহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিকে অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে অত্যন্ত কঠোর শর্ত দান করা হইতেছে। যে দেশের সংকট যত গভীর সেই দেশকে তত কঠোর শর্ত দান করা হইতেছে।

''আমেরিকার সাহায্য যে দেশ গ্রহণ করিবে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মপন্থা বদলাইতে হইবে। যে দল ও যে ব্যক্তি ওয়াশিংটনের নির্দেশ অনুযায়ী আমেরিকার স্বার্থে স্বরাষ্ট্র ও বৈদেশিক নীতি চালাইতে সক্ষম সেই দল ও সেই ব্যক্তি গভর্নমেন্ট গঠন করিবে।''

এই জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া এবং হাঙ্গেরী এই ৮টি দেশ মার্শাল প্ল্যানকে স্বাধীনতা বন্ধ রাখিবার তমসুক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

ভারতের মনোভাব

এ হেন মার্শাল প্ল্যানের ''সুবিধা'' পাইবার জন্য ভারতে রীতিমত আন্দোলন শুরু হইয়াছে। এই আন্দোলনের পিছনে যে আমেরিকান্ পুঁজিপতিদের ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমেরিকার নিকট ঋণ ও মূলধন লইবার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু অত্যন্ত আগ্রহশীল। তাহা বুঝা গিয়াছে এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের সভায় তিনি যে ভাবে বিদেশী মূলধন আহ্বান করিয়াছেন তাহা হইতে।

ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলের অন্যতম পত্রিকা 'কমার্স এন্ড ইনডাসট্রি' কাগজে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদটি দেওয়া হইয়াছে :

''এ কথা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে নেহেরু গভর্নমেন্ট আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ

গ্রহণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। আমি জানি যে, আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আসফ আলী যাহাতে এ বিষয়ে সেখানে কথাবার্তা চালান সেজন্য কিছুদিন আগে তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।"

এ বিষয়ে কথাবার্তা যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ লোকনাথন-এর বক্তৃতা হইতে। ডাঃ লোকনাথন হইতেছেন ইউ'-এন-ও'র এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশনের এক্সিকিউটিভ্ সেক্রেটারী। তিনি ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৪৭) কলকাতার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন— 'ভবিষ্যতে এশিয়ার জন্য মার্শাল প্ল্যানের অনুরূপ একটি পরিকল্পনা তৈরি হইতে পারে।"

— স্টেট্সম্যান, ২৫/১২/৪৭

ভারতে আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ অথবা মূলধন পাইতে হইলে তাহার জন্য শর্ত কি হইবে তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় কয়েকজন খ্যাতনামা আমেরিকানের কথার ভিতর। ডাঃ গ্রেডি হইলেন ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত। তিনি গত ৩১শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এক বক্তৃতায় নিম্নলিখিত কথা বলেন :

"কয়েকজন আমেরিকান্ ব্যবসায়ী ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। যখনই তাঁহারা বুঝিলেন যে, ভারতে মূলধন নিযুক্ত করার সময় আসিতেছে তখনই তাঁহারা তাহা করিবেন, কিন্তু ভারতীয় মালিকেরা এখনও প্রস্তুত হন নাই। আগামী কয়েকমাসে ভারতের অবস্থা কি দাঁড়ায় তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন এবং মালিক ও শ্রমিকের সম্বন্ধ নির্ধারণে ভারত গভর্নমেন্টের নীতি কি হয় তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে চাহিতেছেন।"

—স্টেটস্ম্যান, ১/১১/৪৭

৭ই ডিসেম্বর বম্বে শহরে ডাঃ গ্রেডি বলেন :

"আমার ভয় এই যে, উৎপাদনের দিক হইতে ভারতের অবনতি ঘটিতেছে। উৎপাদন বাড়িলেই মজুরি বাড়িতে পারে, নতুবা নয়। আমার মতে ভারতীয় মজুরের উচিত আরও অধিক মেহনতের সঙ্গে কাজ করা।"

৩১শে অক্টোবর কলিকাতায় গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে জনৈক সাংবাদিক ডাঃ গ্রেডিকে জিজ্ঞাসা করেন— "ভারত সরকার যদি ভারতের সমস্ত শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার দিকে অগ্রসর হন তাহা হইলে আমেরিকানরা কি করিবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ গ্রেডি বলেন, "সে অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি রপ্তানি ব্যাঙ্ক কি করিবে তাহা বলিবার মত অবস্থা তাঁহার নয়, তবে একথা ঠিক যে ভারত গভর্নমেন্ট যদি একটি মাঝামাঝি রাস্তা নেন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান মিলাইয়া চলেন তাহা হইলে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না।"

— স্টেটস্ম্যান, ১/১১/৪৭

মার্কিন ঋণের শর্ত

আমেরিকায় রপ্তানি ব্যবসায়ের জনৈক ম্যানেজার রবার্ট এলফার্ডসন গত ২১শে অক্টোবর তারিখে নিউইয়র্কে এক্সপোর্ট ম্যানেজার্স ক্লাবে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন : "ভারতে যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে তাহা সরকারি ঋণ আকারেই হোক আর ব্যাঙ্ক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত মূলধন আকারেই হোক, তাহা ভারতে কিভাবে ব্যয়িত হইবে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ

পরিচালনার ভার থাকিবে আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের হতে।"

এলফার্ডসনের এই উক্তি উপেক্ষা করিবার নহে, কারণ প্যাটেল-নেহেরু গভর্নমেন্ট যে আমেরিকানদের নিকট হইতে ঋণ ও মূলধন আনিবার ব্যবস্থা করিতেছেন ইহা তাঁহাদেরই সভায় তাঁহাদেরই একজন প্রতিনিধির উক্তি। আর একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী মিঃ জর্জ গুডম্যান গর্ডন ভারত পরিভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া 'সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো এক্সামিনার' নামক পত্রিকা নিম্নলিখিত সংবাদটি দিয়াছেন— "গর্ডন বিশ্বাস করেন যে ভারতীয় শিল্পের বিস্তার ও যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ভারতকে ঋণ দিতে হইবে। অর্থনীতিবিদ্‌রা হিন্দু ও মুসলিম ডমিনিয়নের জন্য মোট ২০০ কোটি ডলার লাগিবে এইরূপ হিসাব দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই ঋণে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরিবে, স্টার্লিং এলাকা হইতে দেশ বাহির হইতে পারিবে এবং গভর্ণমেন্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইবে। গর্ডন বলেন যে, এই ঋণ শুধু শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির জন্যই দেওয়া উচিত কিন্তু কিভাবে এই ঋণ ব্যয়িত হইবে তাহার ভার একটি সম্মিলিত ইন্ডো-আমেরিকান্ বোর্ডের হাতে দিতে হইবে এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে যদি শাসন ব্যবস্থা অচল হয় তাহা হইলে এই ঋণদান বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।"— কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ২৪/১২/৪৭, পৃষ্ঠা ৫

অর্থাৎ আমেরিকান সরকার ভারতকে ঋণ দিবে, কিন্তু সেই ঋণ খরচ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভারত গভর্নমেন্টের থাকিবে না, তাহাতে আমেরিকানদেরও হাত থাকিবে, শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখিতে হইবে, শ্রমিকদের মজুরি না বাড়াইয়া মেহনত বাড়াইতে হইবে এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বন্ধ করিয়া গভর্নমেন্টের স্থায়িত্ব প্রমাণ করিতে হইবে।

ডাঃ গ্রেডি বলিতেছেন যে, ভারত-আমেরিকান চুক্তির আলাপ আলোচনা বেসরকারি ভাবে দুই সপ্তাহ আগে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট চুক্তির একটা খসড়াও রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন।"

— স্টেটস্‌ম্যান, ১০/১২/৪৭

এই সমস্ত উক্তি হইতে কি মনে হয় না যে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ভারত ও পাকিস্তান সরকারের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার পথে অগ্রসর হইতেছে এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ঋণের শর্ত অনুযায়ী ভারত সরকার ধর্মঘট রহিত করা, জরুরি নিরাপত্তা আইন চালু করা এবং শিল্পের জাতীয়করণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন?

(৩)

ভারতীয় সরকারের অর্থনীতি

১৫ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের সভায় ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির সঙ্গে-ব্যক্তিগত সম্পত্তির "সামঞ্জস্য" সাধনের সংকল্পই ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে করা হইবে তাহাও নেহেরু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। উক্ত বক্তৃতায় নেহেরু বলিয়াছেন :

"ব্যক্তিগত মুনাফার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান চলিতে থাকিবে এবং তাহাকে উৎসাহও দেওয়া

হইবে, কিন্তু কয়েকটি মূল শিল্প রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনার আনিবার দিকে ঝোঁক দেওয়া হইবে। সম্ভবত ব্যবস্থাটা এইরূপ হইবে যে, সেগুলিকে পাবলিক কর্পোরেশনের মত চালান হইবে যাহাতে গণতন্ত্রজনিত কুফল না দেখা দেয়।"

এই সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতজী আশ্বাস দিয়া বলেন যে, "বিদেশী মুলধনকে প্রচুর ক্ষেত্র দেওয়া হইবে।"

সোশালিস্ট পার্টির নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আসামে চা বাগান শ্রমিকদের সভায় আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, "আপাতত চা বাগান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা উচিত নয়।"— হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ২৬/১২/৪৭

নেহেরু শিল্পক্ষেত্র হইতে গণতন্ত্রের কুফল দূর কবিরার জন্য এবং জয়প্রকাশ অত্যন্ত বাস্তব কারণের জন্য শিল্পসম্পদ জাতীয়করণের বিরোধী। গত এক বৎসর ধরিয়া আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি গ্রেডি সাহেব এই নূতন বন্ধুত্ব অর্জন করিয়া দেশে রিপোর্ট করিবার জন্য ফিরিয়া গিয়াছেন।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, দেশের প্রধান প্রধান শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নিজেকে এতদিন সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিয়াছেন। কংগ্রেস কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিবার পূর্বে পণ্ডিত নেহেরুর সভাপতিত্বে ন্যাশ্‌নাল প্ল্যানিং কমিটি (জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি) গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, দেশে প্রধান প্রধান মূল-শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু নেহেরু কর্তৃকঅস্থায়ী গভর্নমেন্ট গঠন করিবার পর নূতন করিয়া একটি এডভাইসারী প্ল্যানিং বোর্ড (পরামর্শদাতা কমিটি) গঠিত হয়। এই বোর্ড পূর্বেকার ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি নেরুের নীতি হইল মিশ্রিত অর্থনীতি (মিক্সড্‌ ইকনমি) অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানার সঙ্গে বক্তিগত মালিকানার সামঞ্জস্য। এই 'সামঞ্জস্যে'র একটি নমুনা দেখুন।

কেন্দ্রীয় আইনভার সম্মুখে ভারত সরকার একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা হইল বিভিন্ন শিল্পকে মূলধন দিয়া সাহায্য করিবার জন্য একটি ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন গঠন করিবার প্রস্তাব। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ৫ কোটি টাকার মূলধনে একটি ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে। এক একটি শেয়ার হইবে ২৫০০০ টাকার এবং এইরূপ ২০০০ শেয়ার থাকিবে। ইহার মধ্যে ৪০০ শেয়ার কিনিবেন ভারত গভর্নমেন্ট, ৪০০ শেয়ার কিনিবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ৮০০ শেয়ার কিনিবেন বিভিন্ন তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং বাকী ৪০০ শেয়ার কিনিবেন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। ইহাতে দেখা যায় যে, উক্ত ফিনান্স কর্পোরেশনের মাত্র ৫ ভাগের এক ভাগ শেয়ার থাকিবে ভারত গভর্নমেন্টের হাতে আর অধিকাংশ শেয়ার থাকিবে বড় বড় ধনিক একচেটিয়াদের হাতে। বলা বাহুল্য যে, এই ফিনান্স কর্পোরেশনটি হইবে ধনিক-বনিকদের একচেটিয়া মূলধনের প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে বাৎসরিক শতকরা ২৪০ টাকার মুনাফার গ্যারান্টি সরকার দিতেছেন। এই কর্পোরেশনটিই ভারতে শিল্প বিস্তারের গতি নির্দেশ করিবে। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের উপর ইহার ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম, ইহারই ইঙ্গিতে ভারত সরকারের নীতি নির্দ্ধারিত হইবে।

নেহেরুজীর আদর্শ

ইহাই হইল রাষ্ট্রীয় মালিকানার সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার "সামঞ্জস্যের" নমুনা। ইহাই হইল সমাজতন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের মাঝামাঝি রাস্তার আদর্শ। পণ্ডিতজী এখন এই আদর্শেরই প্রচারক এবং প্রধান কার্য নির্বাহক।

বলা বাহুল্য যে ইহার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা সমাজতন্ত্রের বিপরীত জিনিস। এ জিনিস পৃথিবীতে নূতন নয়, হিটলারের আমলে জার্মানীর অর্থনৈতিক জীবন এই রকম প্রতিষ্ঠান দ্বারাই পরিচালিত হইত। সম্প্রতি আমেরিকার অর্থনৈতিক জীবন এইরকম প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাকে বলে একচেটিয়া ধনতন্ত্র (মনোপলি ক্যাপিটালিজম্)।

আমেরিকার নিকট হইতে নেহেরু সরকার যে শর্তে মূলধন অথবা ঋণ আনিতেছেন তাহাতে সহজেই অনুমেয় যে উল্লিখিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনটির নীতি মিঃ এলফার্ডসন কর্তৃক বর্ণিত "আমেরিকান বিশেষজ্ঞ" দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইহার ভিতর আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ডাঃ গ্রেডির নির্দেশ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। তথাপি পণ্ডিত নেহেরু ভারতীয়দের মন রাখিবার জন্য একটি কথা বলিয়াছেন : "কতকগুলি মূল শিল্প রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনার অধীনে আনার দিকে ঝোঁক দেওয়া হইবে।" আমেরিকানরা হয়ত ইহাতেও ভুল বুঝিতে পারে। তাই আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অন্যতম কংগ্রেস নেতা আসফ আলি কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, এই ঝোঁকটা কি রকম এবং কতখানি হইবে।

নেহেরুর কলিকাতা বক্তৃতার তিন দিন পরে ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) নিউইয়র্কের এক সভায় আসফ আলি ঘোষণা করিয়াছেন—

"ভারত ধনতন্ত্রের পথে চলিবে, না সমাজতন্ত্রের পথে চলিবে তাহা লইয়া অনেক গবেষণা সুরু হইয়াছে। ভারত তাহার নিজের পায়ে দাঁড়াইবে— আমরা ব্যক্তিগত মুনাফা-মূলক প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দিব কিন্তু কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ চালাইব, যথা দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প এবং যানবাহন প্রভৃতি।" — হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ১৯/১২/৪৭

সোজা ভাষায় ইহার অর্থ হইল রেল এবং অস্ত্র তৈরির কারখানা প্রভৃতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিবে আর সমস্ত ক্ষেত্রে থাকিবে অবাধ ব্যক্তিগত মুনাফার সুযোগ। কারণ, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় জনসাধারণের নিকট কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতিই দিয়া থাকুক না কেন, বর্তমানে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ভারতে মুনাফা লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ চায়, অবশ্য ব্রিটিশ যতটা সুযোগ রাখিতে সমর্থ তাহা থাকিবে এবং ভারতীয় পুজিপতিদের যতটুকু দেওয়া যায় আমেরিকার স্বার্থ হানি না করিয়া তাহাও দেওয়া হইবে।

ভারতীয় 'স্বাধীনতার'র স্বরূপ

ভারত এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আছে, তাহার উপর আবার আমেরিকার অধীনতা আসিতেছে। সেই জন্যই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ "স্বাধীনতা" রক্ষার নামে বিশেষ জরুরি ক্ষমতা গ্রহণ এবং শ্রমিক দমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীর সর্বত্রই এই শর্তে মূলধন এবং বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করিতেছে। গ্রীস, ফিলিপাইন,

ইরান— এই সমস্ত দেশে আমেরিকানরা ঠিক এই ধরণের 'সাহায্য' দিতেছে।

ভারত কতখানি এবং কি রকম স্বাধীন তাহার বিবরণ দিয়াছেন জনৈক অভিজ্ঞ আমেরিকান পুঁজিপতি। স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়ামের (পেট্রোল কোম্পানী) বম্বে শহরস্থ-ম্যানেজার সি.বি.মার্শাল নিউইয়র্কে ফিরিয়া গিয়া নিম্নলিখিত মর্মে বিবৃতি দিয়াছেন :

"ভারতের বর্তমান অরাজকতা সত্ত্বেও সেখানে পেট্রোলের ক্রমবর্দ্ধমান সীমাহীন বাজার আছে। হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান উভয় সরকারই আমেরিকান কেম্পানীগুলিকে ব্যবসায় বাড়াইবার যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন। ...আর একটি স্বস্তির কথা হইতেছে এই যে, ভারতীয় জনসাধারণের ধারণা অন্যরকম হওয়া সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, ইংরেজরা এখন ভারত হইতে একেবারে পাততাড়ি গুটাইতেছে না, ব্রিটিশ তৈল কোম্পানীগুলি স্বাভাবিক ভাবেই তাহাদের কাজ চালাইতেছে, কেবল দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় ছাড়া। বিদেশী শিল্প জাতীয়করণের কোন প্রচেষ্টা হইতেছে না। বরং ঠিক বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে। উভয় গভর্নমেন্টই আমেরিকান এবং ইওরোপীয়ান ব্যবসায়ীদের নূতন নূতন কারখানা খুলিবার উৎসাহ দিতেছেন এবং নূতন নূতন বিক্রির সুবিধা করিয়া দিতেছেন। এমন কি গভর্নমেন্টের ভিতর ব্রিটিশই এখন নেতৃত্ব করিতেছে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত গভর্নমেন্টের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান এবং এটাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে, রাউল্যান্ড হইয়াছেন পাকিস্তানে জিন্নার পরামর্শদাতা।"— ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম নিউজ, ১৬/১২/৪৭

আমেরিকার সংকট

আমেরিকান ধনকুবেরদের গুণমুগ্ধ ভারতীয় (এবং পাকিস্তানী) নেতারা আমেরিকান 'সাহায্যের' মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জনসাধারণের মনে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, আমেরিকার সাহায্যে ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব এবং আমেরিকান 'সাহায্য' গ্রহণের ফলে ভারত ও পাকিস্তানের 'স্বাধীনতা'র বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই। ডাঃ গ্রেডি, ডাঃ বি. সি. রায় এবং ইস্পাহানি সেই বিষয়ে ভারতবাসীকে এবং পাকিস্তানবাসীকে আশ্বাস দিয়াছেন। এই আশ্বাস যে কতখানি ভূয়া তাহা আমেরিকার সংকট বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভিতর আমেরিকান ধনতন্ত্রই অন্যান্য দেশের ধনতন্ত্রের চেয়ে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় আমেরিকার শিল্প উৎপাদনের মাত্রা হয় ১৯৪২ সালে ১৯৪, ১৯৪৩ সালে ২৩৭, ১৯৪৪ সালে ২৩১ এবং ১৯৪৫ সালে ১৯৭। অর্থাৎ যুদ্ধের সময়ই আমেরিকার উৎপাদন বাড়িয়া দ্বিগুণ হয়। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ১৯৪৬ সালে উহা আরো বাড়ে।

উৎপাদন যেমন বাড়ে, মজুর শ্রেণির প্রকৃত আয় তেমনি কমে, কারণ একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা পণ্যের দর অসম্ভব বাড়াইয়া দেয়। যুদ্ধ-পূর্ব যুগের তুলনায় ১৯৪৭ সালে জিনিসপত্রের দর দ্বিগুণ হইয়াছে। কনট্রোল তুলয়া দিবার পর আরো দর বাড়িয়াছে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ। কাজেই মজুর এবং কেরাণীদের ক্রয়-ক্ষমতা ভীষণভাবে কমিয়া গিয়াছে।

সুতরাং আমেরিকান ক্রোড়পতিদের গুদামে বিস্তর উদ্বৃত্ত পণ্য জমিয়া গিয়াছে। এই উদ্বৃত্ত পণ্যের জন্যে অবিলম্বে নূতন বাজার চাই নতুবা অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিবে। বাজার পাইবার সুবিধাও জুটিয়াছে; জার্মানী এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বাজার এখন খালি, ব্রিটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদও দুর্বল।

কিন্তু আমেরিকান জনসাধারণ যে মার্কিনী দর দিতে অপারগ, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দুনিয়ার কোন দেশ সেই দর কি দিতে পারে?

ঋণদানের পরিকল্পনা

এইত গেল প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা এই যে আমেরিকা দুনিয়ার দেশে দেশে মাল রপ্তানি করিতে চায় কিন্তু কোন দেশ হইতে মাল আমদানি করিবার প্রয়োজনীয়তা এবং ইচ্ছা তাহার নাই। এ অবস্থায় যাহারা আমেরিকার মাল কিনিবে তাহারা ডলার পাইবে কোথায়? কি করিয়া তাহারা আমেরিকার মালের দাম শোধ করিবে?

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য মার্শাল প্ল্যান রচিত হইয়াছে। এই অনুযায়ী আমেরিকা ডলার ঋণ দিবে, সেই ঋণ লইয়া আমেরিকার নিকট হইতেই মাল কিনিতে হইবে। ইহা হইল মার্শাল প্ল্যানের প্রথম শর্ত। মার্শাল প্ল্যানের অপর শর্ত হইল ঋণ গ্রহণের সঙ্গে আমেরিকার প্রতি রাজনৈতিক বশ্যতা। এই শর্তে আমেরিকার নিকট হইতে যে দেশ ঋণ লইবে সে দেশ ফতুর হইয়া যাইবে। ইংল্যান্ডের সংকটই তাহার প্রমাণ।

ইংল্যান্ডের সংকট

যুদ্ধে ইংল্যান্ডের শ্রমশক্তির শতকরা ৪২ ভাগ যুদ্ধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হইবার পর দেখা গেল ইংল্যান্ড তাহার আবশ্যকীয় পণ্যের জন্য বিদেশের উপর, বিশেষতঃ আমেরিকার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইংল্যান্ডের রপ্তানি বাজার সংকুচিত হইয়া গিয়াছে; এই অবস্থায় ইংল্যান্ড ডলার পায় কোথায়! আমদানি এবং রপ্তানির মধ্যে যে ঘাটতি দেখা দিয়াছে তাহা পূরণ করিবার উপায় কি? সুতরাং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমেরিকার নিকট হইতে ৩৭৫ কোটি ডলার এবং কানাডার নিকট হইতে ১৭৫ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করিলেন। এই ঋণের মহিমায় ইংল্যান্ডের চার্চিলরা মার্কিন বদান্যতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা হিসাব করিয়া দেখিলেন যে এই ঋণে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা হইবে। অবশ্য ইহার মধ্যে ধরিয়াই লওয়া হইয়াছিল যে ভারতের পাওনা স্টার্লিং দেওয়া হইবে না, তাহা দিতে হইলে দেনার পরিমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে একেবারে লালবাতি জ্বালাইয়া ছাড়িবে।

কিন্তু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কৌশলীনীতি এই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের হিসাব বান্চাল করিয়া দিল। ইংল্যান্ডকে ডলার-ধার দিয়া আমেরিকা দর কনট্রোল রহিত করিয়া ফেলিল এবং পণ্যের দর বাড়াইয়া দিল শতকরা ৫০ ভাগ। আমেরিকার ঋণ লইয়া এই বর্দ্ধিত দরে আমেরিকার মাল কিনিতে কিনিতে ইংল্যান্ডের ডলার ঋণ ১৯৪৭ সাল শেষ হইতে না হইতে খতম হইয়া গেল। তখন আবার তাহার ঋণের প্রয়োজন, কিন্তু এবার নূতন ঋণ দিবার

আগে আমেরিকান সরকার নিশ্চিত হইতে চায় যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইংল্যান্ডের প্রধান প্রধান শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার কল্পনা বর্জন করিবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর তাহাকে টুঁ মারিতে দিবে। ইংল্যান্ড তাহাতেই রাজি।

বর্তমান সংকট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ইংল্যান্ড রপ্তানি অভিযান আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ আমদানি কমাইয়া রপ্তানি বাড়াইতেছে। দেশের প্রয়োজনে যে সমস্ত পণ্য এখনও প্রচুর উৎপন্ন হয় না দেশের লোকদের বঞ্চিত করিয়া তাহাও বিদেশে রপ্তানি করিতে হইতেছে। ইংল্যান্ডে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাব ও দর বাড়িতেছে।

আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করিয়া ভারতও ঠিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর ঐ পথেই পা বাড়াইল।

আমেরিকার সাহায্যের অর্থ

আমেরিকা বিদেশী রাষ্ট্রকে ঋণ দিতে প্রস্তুত আছে কিন্তু সে ঋণ কিভাবে বায়িত হইবে তাহা আমেরিকান সরকার ঠিক করিয়া দিবে, কারণ আমেরিকা চায় না যে, আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্র এমন শিল্প গড়িয়া তুলে যাহাতে ভবিষ্যতে সে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। আমেরিকা বিদেশে মূলধন খাটাইতে রাজি আছে কিন্তু আমেরিকা যে দেশে মূলধন পাঠাইবে সে দেশের গভর্নমেন্ট এবং তাহার নীতি কি হইবে তাহা আমেরিকান্ সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক হওয়া দরকার। কারণ, ঐ দেশের গভর্নমেন্ট যদি শিল্প সম্পদ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং মজুরদের মজুরি বাড়ায় তাহা হইলে আমেরিকান মূলধনের মুনাফা মারা যাইবে! আর তাহা ছাড়া কোন বিপদাপন্ন দুস্থ রাষ্ট্র যদি আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ বা মূলধন গ্রহণ করে তবে তাহাকে আমেরিকার সঙ্গেই সামরিক সন্ধি করিতে হইবে। আমেরিকা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে এবং দুনিয়ায় অন্যান্য দেশের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের আয়োজন করিবে তাহাতে তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে।

এইসব ব্যবস্থায় রাজি হইয়া আমেরিকার গোলামী মানিয়া লইলে এবং দেশের জনসাধারণের উপর জুলুম রাজ কায়েম করিলে আমেরিকা ভদ্রভাবে সে দেশটাকে মুখে 'স্বাধীন' ও 'গণতান্ত্রিক' দেশ বলিয়া মানিয়া লইবে আর তাহাতে রাজি না হইলে আমেরিকা তাহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে।

ইহাই হইল আমেরিকান সাহায্যের স্বরূপ এবং এই আমেরিকান সাহায্য পাইবার জন্য ডাঃ বি.সি. রায় তাহার গুণগান করিয়া বেড়াইতেছেন।

(৪)

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নিকট জাতীয় স্বার্থ বলি দিবার যে ধারা লক্ষ্য করা গেল, ভারতের বৈদেশিক সম্বন্ধও ঠিক সেই ধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। পণ্ডিত

জওহরলাল নেহেরুই বলিয়াছেন যে আমাদের "অর্থনৈতিক নীতি হইতেই পররাষ্ট্র নীতির উদ্ভব"।

ভারত সরকারের নিরপেক্ষতার স্বরূপ

ভারতের বৈদেশিক সম্বন্ধ কোন্ নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এই প্রশ্নের উত্তরে গণপরিষদে পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন— "ভারত কোন বৈদেশিক ঝক্কির মধ্যে জড়াইয়া পড়ে নাই, আমরা কোন ব্লকেই নাই।" অর্থাৎ একদিকে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী অন্যদিকে সোভিয়েত প্রভৃতি রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক গণ-আন্দোলন এই দুইয়ের মধ্যে পণ্ডিতজীর নিকট কোন পার্থক্য নাই। পণ্ডিতজী তাই বলিয়াছেন, "আমরা আমেরিকার বন্ধু এবং তাহার সহিত সহযোগিতা চাই,আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত পুরাপুরি সহযোগিতা করিতে ইচ্ছা করি।" কিন্তু হস্‌রত মোহানি সহজে ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সোভিয়েতের সঙ্গে যদি আমেরিকার যুদ্ধ বাধে তবে ভারত কোন পক্ষে যোগ দিবে?" এই 'অসুবিধাজনক' প্রশ্নে চটিয়া গিয়া পণ্ডিতজী বলেন— এরূপ প্রশ্ন যে করে সে বৈদেশিক নীতির কিছুই বুঝে না। পণ্ডিতজী জবাব দেন— "ভারত এই যুদ্ধে কোন দিকেই যোগ না দিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু যদি যোগ দিতেই হয় তবে যে দিকে যোগ দিলে ভারতের স্বার্থ রক্ষিত হয় সেই দিকেই যোগ দিবে।"

নেহেরুর বক্তব্য এই যে আমেরিকা এবং সোভিয়েতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের দেশ যুগোশ্লাভিয়া এবং তাহার স্বাধীনতা হরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আমেরিকার মধ্যে পক্ষাপক্ষ বাছাই করিবার কিছুই নাই, গ্রীসে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার গভর্নমেন্ট এবং গ্রীক্ গণতন্ত্রী বাহিনীর পাল্টা গভর্নমেন্ট একই পর্যায়ভুক্ত!

নেহেরুর একথা স্মরণ আছে বোধ হয় যে, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে (ইউ.এন.ও) সোভিয়েত, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতকে সমপর্যায়ে কখনও ফেলে নাই, বরাবর ভারতকে সমর্থন করিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতজীকে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার এই তথাকথিত 'নিরপেক্ষতা' তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে সোভিয়েত প্রস্তাব করিয়াছিল যে, অবিলম্বে কোরিয়া হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড ইহার বিরুদ্ধে ছিল, ভারতীয় প্রতিনিধিগণও ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে। ইহাই কি নেহেরুর বহুবিঘোষিত নিরপেক্ষতা এবং এশিয়ায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা?

ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ মনে করেন যে, নেহেরুর নিরপেক্ষতার অন্তরালে ইঙ্গ-আমেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তবে তাঁহাদিগেকে প্রচ্ছন্ন ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করি।

১৮ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) তারিখে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' এক সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। এই সংবাদের সারমর্ম হইল এই যে ভারত, পাকিস্তান, বর্মা, ব্রিটেন, সিংহল, মালয় এবং অস্ট্রেলিয়া এই কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইতেছে, অন্তত তাহার উদ্যোগ পর্ব আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে এই চুক্তির পিছনে আমেরিকার অনুমোদন আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া হইতে মলোটভ্ নাকি বলিয়াছেন যে, এই চুক্তির বিষয় তাঁহাদের কিছুই জানান হয় নাই। ইঙ্গ-আমেরিকান

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিলিতভাবে এমন গোপন সামরিক চুক্তিকে আর যাহাই বলা হোক নিরপেক্ষতা বলা চলে না। এই সংবাদটি উড়াইয়া দিবার নহে। ২৫শে ডিসেম্বর 'বম্বে ক্রনিকেল' অবিকল এইরকম একটি সংবাদ পরিবেশন করিয়াছে। ঐ সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেন, আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি লইয়া একটি মিলিটারী ব্লক গঠনের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আফগানিস্তানকেও ইহার ভিতর টানিয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ভিয়েতনামকে নাকি লওয়া হইবে না কারণ ভিয়েতনাম ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। উক্ত সংবাদেই লিখিত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং বর্মী মহলের ধারণা যে এশিয়াতে একটি সোভিয়েত বিরোধী ব্লক গঠনের জন্যই এই চেষ্টা হইতেছে। এই সংবাদ হইতে কি মনে হয় না যে নেহেরু গভর্নমেন্ট 'স্বাতন্ত্র', 'নিরপেক্ষতা' প্রভৃতি বুলির আড়ালে গোপনে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ব্লক গঠন করিতেছেন এবং ভারতকে এশিয়াতে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদারে পরিণত করিতেছেন।

শ্রী কে. এম. মুন্সী ১৮ই ই নভেম্বর দিল্লীতে থিয়োসফিকাল সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবসে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"ভারত যে নীতি অবলম্বন করিবে তাহার মধ্যে থাকিবে শক্তি বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের কথা। শক্তি-বৃদ্ধি নির্ভর করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রক্ষা করিবার মত সামরিক শক্তি এবং সেই শক্তি রাখিবার মত সম্পদের উপর। সেজন্য আমাদের সৈন্যসংখ্যা বাড়াইতে হইবে না, কিন্তু তাহার উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার সাহায্য ছাড়া তাহা সম্ভব নয়। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেন আমাদের বন্ধু, অতীতে সে আমাদের উপর যতো দুর্ব্যবহার করিয়া থাকুক না কেন, এক শতাব্দীর ঘনিষ্ঠতাজনিত সাহচর্য বন্ধনে আমরা তাহার সহিত আবদ্ধ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের আদর্শ এবং দুনিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। ... এই ব্রিটেন এবং আমেরিকার সঙ্গে সম্মিলিত থাকিয়াই ভারত তাহার ইপ্সিত শক্তি লাভ করিবে।"— পীপলস্ এজ, ২৮/১১/৪৭

কে. এম. মুন্সী সর্দ্দার প্যাটেলের বন্ধু এবং ভারতের গঠনতন্ত্র রচনায় তাঁহার উল্লেখযোগ্য হাত আছে। কাজেই তাঁহার কথার ভিতর ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতির সত্যকার আভাষ পাওয়া যায় একথা বলা অসঙ্গত হইবে না।

ভারত কোন পক্ষে

গণপরিষদে নেহেরু ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারত সরকার ভবিষ্যত যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিবারই চেষ্টা করিবে। কিন্তু ইঙ্গ-আমেরিকান্ নেতৃত্বে এশিয়াতে ব্লক গঠনের মধ্যে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় কি? ইহা যুদ্ধেরই প্রস্তুতি। নেহেরু বলিয়াছেন যে যুদ্ধে যদি জড়িত হইতেই হয় তবে ভারতের স্বার্থ যে দিকে ভারত সরকার সেই দিকেই যোগ দিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, ভারত সরকারের মতে ভারতের স্বার্থ ইঙ্গ-আমেরিকান ব্লকের পক্ষ অবলম্বন করা। অর্থাৎ ভারতের স্বার্থ কোন্ দিকে তাহা তাঁহারা স্থিরই করিয়া ফেলিয়াছেন।

সেই জন্যই সোভিয়েতকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী দেশ বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, তেমনি আমেরিকার সঙ্গে ভারতের মৈত্রীবন্ধনের প্রতিও জোর দেওয়া হইতেছে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বড় বড় ভারতীয় পুঁজিপতিদের বিশ্বাসভাজন রাজনীতিবিধ এবং কংগ্রেসের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। ডাঃ রায় সম্প্রতি আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়া পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে যে সমস্ত বিবৃতি দিতেছেন তাহাতে একই সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুইটি শিবিরের আত্মকলহের নিন্দা করিতেছেন এবং আমেরিকান গভর্নমেন্টের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন।

২রা নভেম্বর ১৯৪৭ কলিকাতার এক প্রেস কনফারেন্সে ডাঃ রায় বলিয়াছেন— "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করিতে যাইয়া ভারত তাহার আত্মমর্যাদা হারাইবে না কিংবা কোন রকম রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করিবে না।"

কিন্তু পরমূহুর্তেই তিনি বলিতেছেন— "ইওরোপের পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকা মার্শাল প্ল্যান তৈরি করিয়াছে, কারণ যুদ্ধে ইওরোপের ধ্বংসের জন্য আমেরিকা নিজেদের দায়ি মনে করে। কাজেই ভারতকেও সাহায্য করা তাহার উচিত?"

ইউ.এন.ও-তে আমেরিকা ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে বরাবর ভোট দিয়াছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতীয় স্বার্থের পক্ষেই ভোট দিয়াছে। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষী পণ্ডিতও এজন্য সোভিয়েত প্রতিনিধি মলোটভকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমেরিকায় ইউ.এন.ও-র কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া আমেরিকার চেয়ে ভারতের বড় বন্ধু আর কাহাকেও দেখেন নাই। কলিকাতার এক রোটারী ক্লাবের বক্তৃতায় তিনি তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন— "আমার স্বভাবতই জানিতে ইচ্ছা হইল যে, আমেরিকানরা কি করিয়া আজ দুনিয়ার নিকট শুধু দাতা হইল কিন্তু কোন কিছুর গ্রহীতা হইল না। বাস্তব ঐশ্বর্যের দিক দিয়া আমেরিকা আজ দুনিয়াকে শুধু দিতে পারে, নিতে পারে না।"— হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ৩/১২/৪৭

হঠাৎ আজ ভারতীয় নেতার মুখে আমেরিকান ঐশ্বর্যের এই অজস্র প্রশংসা কি বিনা কারণে? এই স্তোকবাক্যের মধ্যে কোথাও ইওরোপ এবং এশিয়ায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক অভিযান এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতির কোন উল্লেখই নাই। ইহাও কি বিনা কারণে?

হিটলার যখন সমগ্র ইওরোপকে পদানত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল তখন ফ্রাঙ্কো এবং ডি-ভেলেরা স্বাতন্ত্র এবং নিরপেক্ষতাই ঘোষণা করিয়াছিল, তলে তলে তাহারা জার্মান ফ্যাসিস্টদেরই সাহায্য করিত। আজ আমেরিকান ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদ হিটলারের স্থান গ্রহণ করিয়াছে, আর ভারতীয় নেতারা নিরপেক্ষতার আড়ালে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিই বন্ধুত্বের হাত বাড়াইতেছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দুনিয়ার গণতন্ত্রবাদী জনগণ চিরদিন অকুণ্ঠ সমর্থন দান করিয়া আসিয়াছে। তাহারা কোন দিন বলে নাই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে তাহারা নিরপেক্ষ। তাহারা চিরদিনই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। আজ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাহাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত গভর্নমেন্ট তথা কংগ্রেস-নেতৃত্ব প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিতেছেন এবং গোপনে এশিয়ায় সোভিয়েত বিরোধী ব্লক গঠন করিয়া আমেরিকান প্রভুত্ব স্থাপনের সহায়তা করিতেছেন।

(৫)

ধনতন্ত্র, না গণতন্ত্র

দাসত্বের পথ

কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত কোন পথে চলিল? ভারত কি এশিয়ায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদার হইয়া থাকিবে? আমেরিকান সামরিক বিশেনজ্ঞগণ ইরানের সামরিক বাহিনীর 'পরামর্শদাতা' হইয়া আসিতেছেন, ভারতের সেনাবাহিনীর জন্যও কি আমেরিকান বিশেষজ্ঞ আনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর যে সমস্ত রাষ্ট্র স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজ নিজ দেশের আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্রলাভের জন্য লড়িতেছে আজ ভারতের সঙ্গে তাহাদের কেন পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্বন্ধ হয় না? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে আমেরিকান সরকার হিটলারী ফ্যাসিস্টদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে আজ তাহাদেরই সঙ্গে কেন ভারত সরকারের এত বন্ধুত্ব? অর্থনৈতিক এবং সামরিক সহযোগিতার জন্য ভারত সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করিতে অগ্রসর না হইয়া আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে কেন চুক্তি করিতেছেন? পূর্ব ইওরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলি তো আমেরিকান সাহায্য ছাড়াই নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি দ্বারা শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিতে সামরিক শক্তিতে খুব তাড়াতাড়ি শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহারা আমেরিকান সাহায্য নেয় নাই বলিয়াই আজ সঙ্কট-মুক্ত। পৃথিবীর মহাজন আমেরিকার নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ না করিয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত পোল্যান্ড তাহার ভারী শিল্প যুদ্ধের পর এত বাড়াইতেছে যে উহার পরিমাণ এখন যুদ্ধপূর্ব যুগের চেয়েও শতকরা ২৮.২ ভাগ বেশি। ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন এখন যুদ্ধপূর্ব যুগের চেয়েও শতকরা ৫২ ভাগ বেশি। ইহা এই জন্যই সম্ভব হইয়াছে যে দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। পোল্যান্ড হইল নূতন গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে অনুন্নত এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত। যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের উন্নতির পরিমাণ আরও বেশি। আর এদিকে আমেরিকান ঋণগ্রহণ করিয়া ইংল্যান্ড সংকটের আবর্তে আরও জড়াইয়া পড়িতেছে, আমেরিকান সাহায্য গ্রহণ করিয়া ইরানের স্বাধীনতা আজ আমেকরিকার নিকট বিক্রীত।

তবে কিসের লোভে ভারত সরকার (এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান সরকার) আজ আমেরিকান সাহায্যের জন্য এত ব্যস্ত, কিসের লোভে কংগ্রেস নেতারা সোভিয়েতের নিন্দা করেন তাহাকে সাম্রাজবাদী বলিয়া আর একই নিঃশ্বাসে ইওরোপের পুনর্গঠনে আমেরিকান ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারণ করেন?

কারণ কি এই নয় যে, আমেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রকে নিরাপদ করিবার ভরসা দিয়াছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ধনতন্ত্রকে সমাধিস্থ করিতেছে? একথা কি সত্য নয় যে, সেই জন্যই ইউ.এন.ও-র সভায় কোরিয়া হইতে অবিলম্বে আমেরিকান সৈন্য অপসারণের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিনিধিরা ভোট দিয়াছেন?

ভারতীয় প্রতিনিধিরা আমেরিকার পক্ষে ভোট দিয়া এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে নিরাপদ করিবার এই যে সুযোগ দিলেন এবং তাহার পর এশিয়ায় যে সোভিয়েত-বিরোধী ও ভিয়েতনাম্-বিরোধী ব্লক গঠন করিতেছেন তাহারও কারণ কি এই নয় যে, আমেরিকানরা এশিয়ার লুণ্ঠনে ভারতীয় ধনিকদের অংশীদার করিতে সম্মত হইয়াছে?

যে পথে ভারত এখন চলিয়াছে সে পথে ভারতীয় জনগণের জীবনে সংকটের পর সংকটের আঘাত আসিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখনও এদেশের শিল্পে ও বাণিজ্যে চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর আসিতেছে সর্বগ্রাসী আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ। আর একটা যুদ্ধে তাহারা ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে জড়াইয়া ফেলিতেছে। আমেরিকান্ ধনতন্ত্র আজ সংকটের সম্মুখীন, তাই তাহারা ভারতে অবাধ মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতীয় পুঁজিপতিরা তাহাদের এবং নিজেদের অবাধ মুনাফার ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার জন্য দর কন্ট্রোল তুলিয়া দিয়া জনসাধারণের জীবন ধারণের অবস্থা অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। মজুরের মজুরি, কৃষকের আয়, কেরানীর বেতন সমস্তই এখন পণ্যের দরবৃদ্ধির অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিবে। তাহার পর আরম্ভ হইবে কারখানায় কারখানায় এবং দপ্তরে দপ্তরে ছাঁটাই। ছাঁটাইয়ের হিড়িক আসিয়া পড়িয়াছে বলিলেই হয়। মজুর-কৃষক যাহাতে এই অসহনীয় অবস্থায় অতিষ্ঠ হইয়া কাজ ও জীবিকার জন্য লড়াই করিতে না পারে সেজন্য আধুনিক আমেরিকান কায়দায় তাহাদের দমন করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সংবাদপত্রের প্রচার, রাজনৈতিক প্রচারক বাহিনীর আক্রমণ এবং মিলিটারী ও পুলিশের হাতে ব্যাপক জরুরি ক্ষমতা— এই সমস্ত শক্তি একযোগে সমগ্র দরিদ্র জনগণের বিরুদ্ধে যুক্ত হইতেছে। ভারতের জাতীয় শিল্পকে এখনও আমেরিকান্ ও ব্রিটিশ স্বার্থ অনুযায়ী সঙ্কুচিত ও নির্ভরশীল করা হইবে। আমেরিকার ধনতন্ত্র যে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন তাহাতে আমেরিকান পুঁজিপতিরা ভারতকেও জড়াইয়া ফেলিতেছে।

স্বাধীনতার পথ

উৎপাদনের বর্তমান দুরবস্থা স্বাধীনভাবে দূর করিবার একমাত্র উপায় সমস্ত বড় বড় শিল্প বিনা ক্ষতিপূরণে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা। উৎপাদনের পরিচালনা সংগঠিত শ্রমিকদের হাতে দিতে হইবে এবং ভারতবাসীর প্রয়োজনে কোন জিনিস কতটা উৎপন্ন করা দরকার ও কোন জিনিসের দর কত হওয়া উচিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতে শিল্প বিস্তারের জন্য যে মূলধন আবশ্যক তাহা পাইবার উপায় ভারতে অবস্থিত সমস্ত বিদেশী মূলধন অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করা। ইংল্যান্ড যদি আমাদের পাওনা স্টার্লিং আটকাইয়া রাখে তাহা হইলে ভারতে অবস্থিত সমস্ত ব্রিটিশ মূলধন বাজেয়াপ্ত করিতে কাহারও 'ধর্মবুদ্ধি'তেও আটকাইবার কথা নয়। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কোন বিদেশের নিকট ভারতকে ঋণের জন্য দ্বারস্থ হইতে হইবে না। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভারত সরকার যে বিপুল বিত্তের অধিকারী হইবে তাহার ফলে কোন বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার জন্য জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কোন চুক্তি করিবার আবশ্যকতা হইবে না।

ভারতের সমস্ত বড় বড় শিল্প বিনাক্ষতিপূরণে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিলে যে

মুনাফা সরকারের হস্তগত হইবে তাহা দ্বারা মজুর এবং কেরানীদের জীবন ধারণের মান অভাবনীয়রূপে উন্নত করা সম্ভব হইবে।

কমিউনিস্ট পার্ট বিশ্বাস করে যে, দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং কৃষি ও শিল্প বিস্তারের জন্য প্রধানত স্বদেশের সম্পদের উপরই নির্ভর করা উচিত। দেশের স্বাধীনতা তাহাতে নিরাপদ থাকে। সেই জন্যই কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপন্থা হইল বিদেশী মূলধন, সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বড় বড় শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্থাপন করা এবং ঐ সমস্ত সম্পদের মুনাফা দ্বারা কৃষি এবং শিল্পের বিস্তার সাধন করা। কমিউনিস্ট পার্টি অন্য দেশ হইতে ঋণ গহণের জন্য কোনরকম 'শর্ত' গ্রহণের বিরোধী। অন্য দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের ভিত্তি হইবে সমান সমান লেনদেন, কোন দেশের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে সে ঋণ কিভাবে আমরা খরচ করিব তাহার উপর কোন বিদেশের কোন হস্তক্ষেপ চলিবে না।

ভারতের সহানুভূতি, সমর্থন এবং সহযোগিতা গণতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গেই রাখিতে হইবে নতুবা ভারত হইয়া পড়িবে আর একটা যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যের দাবার ব'ড়ে। প্রাচ্য মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদীরা যদি ভারতের সহযোগিতা না পায় তবে তাহাদের পক্ষে নূতন কোন যুদ্ধ ঘোষণা করা অসম্ভব। ভারত যদি আজ ইঙ্গ-আমেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করে তবে পৃথিবীর শান্তি অব্যাহত থাকিবে।

কিন্তু ঘটনা এখন অনেক দূর গড়াইয়া গিয়াছে। ভারতে (এবং পাকিস্তানে) আমেরিকান্ 'সাহায্য', আমেরিকান্ পুঁজি, আমেরিকান 'বদান্যতা' প্রভৃতির গুণগানে নেতা, মন্ত্রী ও ব্যাপারীদের মুখর দেখিয়া প্রত্যেক দেশভক্তের এখনই সজাগ হওয়া উচিত। অবিলম্বে এক ঐক্যবদ্ধ প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক বাহিনীই দেশকে সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাসের শুঁড়ের প্যাঁচ হইতে মুক্ত করিতে পারে। নতুবা মার্শাল পেঁতা ফ্রান্সের যে দশা করিয়াছিল, ওয়াং চিং উই চীনের যে দশা করিয়াছিল, এবং আমেকরিকানদের অদৃশ্য হস্ত গ্রীসে ও চীনে গণতান্ত্রিক শক্তির যে দশা ঘটাইতেছে, ভারতেও ঠিক তাহাই ঘটিবে। আমেরিকান সেনাপতিদের কর্তৃত্ব ইরান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া গিয়াছে, যবনিকার অন্তরালে ভারত সম্বন্ধেও যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাহারও আভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'স্বাধীনতা পাইয়াছি', 'স্বাধীনতা রক্ষা কর' এই ধ্বনির আড়ালে 'জাতীয়' নেতারা ইঙ্গ আমেরিকানদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের নিকট ভারতীয় স্বাধীনতা বন্ধক রাখিতেছেন, জনগণের ভাগ্য বলি দিবার ষড়যন্ত্র গোপন করিতেছেন। পরাধীনতার পঙ্কে দেশকে তাঁহারা ডুবাইতেছেন।

প্রগতীশীল শক্তি সমূহই ঐক্যবদ্ধ ভাবে ইহার প্রতিরোধ করিতে পারে। সেইজন্য মজুর, কেরানী, কৃষক এবং অন্যান্য গরীবদের সম্মিলিত সংগ্রাম অবিলম্বে গড়িয়া তুলিতে হইবে। জনসাধারণের নিকট নেতাদের আত্মসমর্পণের ঘৃণ্য নীতির মুখোস খুলিয়া ধরিতে পারিলে জনসাধারণই ঘটনার গতি ফিরাইয়া দিবে। জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। বীরের মত তাহা রোধ করিতে হইবে। প্রতিটি প্রতিরোধ জাতীয় স্বার্থকে শক্তিশালী এবং নিরাপদ করিবে, প্রতিটি প্রতিরোধ আমাদের মাতৃভূমিকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর করিবে।

সাম্প্রদায়িক আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজী নিহত

শোক নয়, ক্রোধ

গান্ধীজীর মৃত্যু হয় নাই, তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সুবিন্যস্ত বাণী কিংবা বিহ্বল শোকের খোলশ অশ্রু বিলাস আজ তাঁহার মৃত্যুকেই অপমান করিবে।

শোক নয়, অগ্নিবর্ষী ক্রোধ ও ঘৃণার চূড়ান্ত দিন আসিয়াছে। যে হত্যাকারীর দল গান্ধীজীকে হত্যা করিল তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করার কঠোর প্রতিজ্ঞার ভিতরই আজ দেশবাসীর প্রায়শ্চিত্ত।

সে হত্যাকারী কাহারা? যাহারা গুলি করিয়াছে তাহারা তো লক্ষ্য মাত্র। তাহাদের পিছনে বসিয়া যাহারা তিলে তিলে, দিনে দিনে দেশের আবহাওয়া বিষাইতেছে— 'হিন্দুস্থানে' হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তানে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার জঘন্য উন্মত্ততায় যাহারা সুকৌশলে দেশকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে আসল হত্যাকারী তাহারাই।

চক্রান্তকারী বৃটিশের মসনদ হইতে দেশের রাজা, নবাব, কায়েমী স্বার্থ পর্যন্ত সেই হত্যাকারীরা ছড়াইয়া আছে। নানা রংয়ের ও নানা ঢংয়ের পতাকার আশ্রয় হইতে যাহারা সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধ প্রচারের ইন্ধন যোগায়, হত্যাকারীর ছুরিকা তাহাদেরই হাতে। ক্ষমতার গদীতে বসিয়া যাহারা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান যুদ্ধের হুংকার ছাড়ে তাহাদের মুখোসের পিছনে হত্যাকারীদের মুখই লুকাইয়া আছে।

শত্রুকে চেনো, অগ্নিময় ক্রোধে উহাদের মুখোশ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলো। উহারাই দেশের হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভিটামাটি হইতে উচ্ছন্ন করিয়া আশ্রয়প্রার্থী ভিখারীতে পরিণত করিয়াছে— আর আজ ক্রুরতম স্পর্দ্ধায় সকল মানুষের প্রিয় গান্ধীজীকেও হত্যা করিয়াছে। আগামীকাল সমস্ত দেশকে হত্যা করিবে।

ক্ষমা নাই, মমতা নাই, নিজ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখাইবার সময় নাই। শত্রুদের চেনো। আগ্নেয়গিরির লেলিহান শিখায় সমস্ত মানুষের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হোক। সাম্প্রদায়িকতাকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতে অগ্রসর হও।

('স্বাধীনতা', ৩১শে জানুয়ারি, ১৯৪৮)

টিকা : এই সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। তিনি ছিলেন 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি। (- সম্পাদক)

গান্ধীজীর মৃত্যুতে কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি

বাংলার প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও ভবানী সেন নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন—

যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও হত্যাকারীরা ইতিহাসের অন্যতম মহান মানবকে এইভাবে হত্যা করিয়া দেশের এতবড় ক্ষতি করিল, তাহাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন ঘৃণার ব্যাপকতম প্রকাশের মধ্য দিয়াই শোকদিবস পালন করিতে হইবে। যাহারা জাতির এই দুর্দৈবের সময়ও গান্ধীজীর আন্তরিকতম ইচ্ছা ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এই গভীর বেদনাকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিণত করার চেষ্টা করিবে আমরা তাহাদের সাবধান করিতে চাই। আজ গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর অসমাপ্ত কাজকে আগাইয়া লইতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য দৃঢ়তর এবং যে কোন মুখোশ পরিহিত সাম্প্রদায়িক প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। প্রিয় নেতার মৃত্যু আমাদের এই চেতনা অনিয়া দিক যে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষসৃষ্টিকারীরাই জনসাধারণের সবচেয়ে বড় শত্রু। কমিউনিস্ট পার্টি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছে যে তিনি যে কাজের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়াছেন পার্টি তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া সেই সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিবে।

(স্বাধীনতা, ৩১ জানুয়ারী ১৯৪৮)

টিকা : এই সময় পার্টির রাজ্য সম্পাদক ছিলেন রণেন সেন। (- সম্পাদক)

বিধানসভায় গান্ধীজী স্মরণে জ্যোতি বসু

১৯৪৮ সালের ১০ ফেব্রুয়াবি

জ্যোতি বসু : মি. স্পিকার, সারা দেশের সঙ্গেই আমার পার্টি গান্ধীজীর হত্যায় শোকাহত। ভারতীয় রাজনীতিতে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে গান্ধীজীর ভূমিকা বিবরণের চেষ্টা আজ আমি করব না। এর কোনো প্রয়োজন আছে বলেও আমি মনে করি না। এই শতাব্দীর চতুর্থাংশ জুড়ে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রবল প্রভাব সর্বজনবিদিত। গত কয়েকমাসে গান্ধীজী তাঁর অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমরাও এসেছিলাম। গভীর দূরদৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক হানাহানি আবার একবার পরাধীনতার নয়া সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল আমাদের পায়ে পরিয়ে দেবার পথ প্রশস্ত করবে। যখন ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ আমাদের মন ছেয়ে ফেলেছিল, হাজার হাজার নারী-পুরুষ-শিশুর যন্ত্রণাবিদ্ধ চীৎকারে বাতাস যখন ভারি হয়ে উঠেছিল, এমনকি কংগ্রেসের নামী-দামী নেতারাও যখন আদর্শচ্যুত, এই সার্বজনীন ঘৃণার প্লাবনের গতিরুদ্ধ করতে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব যখন সর্বাংশে ব্যর্থ, তখন নিজস্ব সহজ সরল পথে গান্ধীজী নোয়াখালি, কলকাতা, দিল্লী, দেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষের দরজায় দরজায় তাঁদের মৌলিক মনুষ্যত্বের দরবারে আবেদন জানিয়ে ফিরেছেন। কংগ্রেসের নেতারা এবং সরকার যখন তাঁকে হতাশ করেছে, তখন তিনি জীবনের সর্বোত্তম আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। কি হিন্দু, কি মুসলিম, ভারতে কি পাকিস্তানে, সর্বত্র সাধারণ মানুষ তাঁর ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিল। এটা নিশ্চিত যে এই মহান কর্তব্য সম্পূর্ণ করার মধ্যেই গান্ধীজী তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন, খুন হয়ে গেলেন সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভার আততায়ীর নোংরা হাতে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এখনো পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার গান্ধীজীর উপদেশের প্রতি তাদের বিশ্বাসের নিদর্শন রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এইসব নেতারা 'অহিংসা'য় বিশ্বাসই করে না। গান্ধীজী যখন একতার বাণী প্রচার করছিলেন, কংগ্রেস সরকার তখন আই এন টি ইউ সি'র মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণিকেই দুই শিবিরে ভাগ করে ফেলছে। গান্ধীজী যখন সত্যে আস্থাশীল তখন গান্ধীজী তাঁর শিষ্যের দল, কংগ্রেস নেতারা আর সরকার মিথ্যের ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন পুলিশ, আর এস এস, হিন্দু মহাসভা এবং অন্যসব সাম্প্রদায়িক দল নয়। শ্রমিকরা, কমিউনিস্টরা আর বামদলগুলোই নাকি হিংসার আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুলেছে। ভাবে গদগদ একটা প্রস্তাব পাশ করে কিংবা প্রার্থনাসভায় যোগ দিয়ে কিংবা

স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে কখনোই গান্ধীজীর অত্যন্ত প্রিয় সেই কর্তব্য পালন করা যাবে না। রেডিও-তে আর জনসভায় সর্বক্ষণ এই যে প্রচার করা হচ্ছে, 'পিতা, তুমি ওদের ক্ষমা করো, কেননা ওরা জানে না ওরা কি করছে'— সে তো এক মিথ্যে কান্না। সাম্প্রদায়িকতার অসূয়াপরায়ণ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় আমরা দায়বদ্ধ; আমাদের মধ্যে তিক্ততার বীজ বপন করেছে জঘন্য যে শক্তি, তার প্রতি ঘৃণায় আমরা দায়বদ্ধ; সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষণের চেষ্টা করছে যারা তাদের বিরুদ্ধে সরকারের ভেতরে কিংবা বাইরে মানুষের পবিত্র ক্রোধ জাগিয়ে তুলতে আমরা দায়বদ্ধ। তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করবো। সত্যিকারের মুক্ত এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় আমরা সকলেই সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আমরা অপেক্ষা করবো। লক্ষ্য রাখবো, এই চূড়ান্ত ট্র্যাজেডির পরে আজ পর্যন্ত সব কাজেই অকৃতকার্য কংগ্রেস সরকারের মনোভাবে কোনো পরিবর্তন আসে কিনা। নিছক প্রার্থনায় নয়, এমন ভাবে তারা কাজ করে কিনা যা হবে গান্ধীজীর স্মৃতির উপযুক্ত স্মারক।

টিকা : বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে ইংরাজীর অনুবাদ জ্যোতি বসু রচনাবলী প্রথম খণ্ড থেকে সংগৃহীত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি

১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি বিশেষ কারণের জন্য বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সর্বভারতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল। এর প্রধান দু'টি কারণ ছিল। প্রথমত, ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কংগ্রেসের গুণ্ডারা সেসময় কমিউনিস্টদের ওপর চড়াও হত। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে কেশোরাম রেয়নে ও পূর্ব কলকাতার বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হামলা এবং ডিক্সন লেনে গুলি চালনার ঘটনাকে। দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্ট পার্টির আসন্ন পার্টি কংগ্রেস যে আরও জঙ্গি লাইন গ্রহণ করতে চলেছে তার একটা সংকেত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের কেন্দ্রীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত থেকে। সেই কারণে কংগ্রেস ও তার পুলিশ বাহিনীর তরফ থেকে গোলমাল করার একটা প্রবল আশংকা ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির ওপর কংগ্রেসী হামলা প্রতিহত করার জন্য বাংলার পার্টি ইতিমধ্যেই রেড গার্ড সংগঠন তৈরি করেছিল। এটি তৈরি হয়েছিল ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও ডাঃ নারায়ণ রায় ছিলেন পার্টি কংগ্রেসের সময়ে রেডগার্ডদের চার্জে।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক :

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে কেবলমাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা এখানে উল্লেখ করছি। প্রথমত, কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই পার্টি কংগ্রেসে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি এসেছিলেন বেশ কিছু দেশ থেকে। দেশগুলি হল অস্ট্রেলিয়া, বর্মা (বর্তমানে মায়ানমার), শ্রীলংকা ও যুগোস্লাভিয়া। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৬৬২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ভারত-বিভাজন হলেও দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি সাংগঠনিকভাবে তখনও পর্যন্ত ছিল ঐক্যবদ্ধ। সেই কারণে ভারত ও পাকিস্তানের উভয় অংশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দ এই পার্টি কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১২৫ জন প্রতিনিধি এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৫ জন প্রতিনিধি দ্বিতীয়

পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস ছিল যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির শেষ পার্টি কংগ্রেস। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনে যুক্ত প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়েছিল। তবে বছরের শেষ দিকে, পূর্ববঙ্গের, যাকে পূর্ব পাকিস্তান বলা হ'ত, সেখানকার কমিউনিস্টদের নিয়েই পাকিস্তানের পৃথক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রস্তুতিতে গঠিত হয়েছিল এক আঞ্চলিক কমিটি। উদ্দেশ্য হল ঐ অঞ্চলে আন্দোলন পরিচালনা করা এবং পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করা। এই আঞ্চলিক কমিটির সদস্যবৃন্দ ছিলেন খোকা রায় (সম্পাদক), মণি সিংহ, নেপাল নাগ, ফণী গুহ, শেখ রওসন আলি, মুনীর চৌধুরী ও চিত্তরঞ্জন দাস।[১] সেসময় পূর্ব পাকিস্তানের ১৫টি জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১২ হাজার।[২]

পার্টির এই দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে পাকিস্তানের উভয় অংশের (পূর্ব ও পশ্চিম) কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের ৬ মার্চ একসঙ্গে বসিয়ে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হবে। এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন ভবানী সেন। প্রস্তাবটি হল : "কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিতেছে যে অতঃপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন সমূহ ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। বর্তমান যে-সব পার্টি কমিটি ও ইউনিট পাকিস্তানে রহিয়াছে তাহাদের একটি আলাদা পার্টিতে সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা থাকিবে।" এইভাবে তৈরি হল পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি। তৈরি হল এক কেন্দ্রীয় কমিটি যার সদস্যরা হলেন সাজ্জাদ জাহির, খোকা রায়, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, নেপাল নাগ, মণি সিংহ, আতা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, জামালউদ্দীন, বুখারী ও মনসুর হবিবুল্লাহ। সাজ্জাদ জাহির ছিলেন সাধারণ সম্পাদক এবং প্রথম ৩ জনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পলিট ব্যুরো।[৩]

একই দিনে (৬ মার্চ, ১৯৪৮) পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে পৃথকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রথম প্রাদেশিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন খোকা রায় এবং অন্যান্য সদস্যরা হলেন মণি সিংহ, নেপাল নাগ, বারীন দত্ত (আব্দুস সালাম), মনসুর হবিবুল্লাহ, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, ফণী গুহ, নিরঞ্জন গুপ্ত, আলতাব আলি, সুবীর দত্ত চৌধুরী, বিভূতি গুহ, প্রমথ ভৌমিক, অবণী বাগচী, মুকুল সেন, মারুফ হোসেন, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, ইয়াকুব মিঞা, আবদুল কাদের চৌধুরী, অমূল্য লাহিড়ী প্রমুখ। ঢাকার কাপ্তান বাজারে ছিল প্রাদেশিক কমিটির অফিস।[৪]

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই পার্টি কংগ্রেসে 'যোশী লাইন' এর পরিবর্তন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হল। এই পরিবর্তিত লাইন কী হবে তা ২ মাস আগেই ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রস্তাবাকারে বলে দেওয়া হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে সেই লাইনের চূড়ান্তরূপ কী হবে, সেটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টি স্থির হল পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনে।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিষয়বস্তু :

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের বিষয়সূচি ছিল নিম্নরূপ :

(ক) রাজনৈতিক থিসিস। এটি ছিল রাজনৈতিক প্রস্তাব। এর লেখক ও প্রস্তাবক ছিলেন বি. টি. রণদিভে। (খ) সংস্কারবাদী বিচ্যুতির ওপর রিপোর্ট। এরও লেখক ও প্রস্তাবক ছিলেন

বি. টি. রণদিভে। (গ) সিপিআই-এর সংবিধান। এটি পেশ করেছিলেন জি. অধিকারী। (ঘ) রিভিয়্যু রিপোর্ট। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের দলিল, রিপোর্ট ও প্রস্তাবাদি নিয়ে পূর্ণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। তাই ঐ প্রসঙ্গের পূর্ণ অবতারনা করা থেকে বিরত থাকছি। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক পরিবর্তিত লাইনে যে সব তত্ত্ব হাজির করা হয়েছিল, সেগুলির একটা ধারণা দেওয়ার জন্য এইসব দলিলের মধ্যে আমরা রাজনৈতিক থিসিসটি ঈষৎ সংক্ষেপিত করে সহায়ক তথ্য হিসাবে সন্নিবেশিত করলাম। এর মূল কথাগুলি হল :

(ক) ভারতের স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, ঝুটা স্বাধীনতা (Fake Independence); (খ) সাম্রাজ্যবাদের প্রতি জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণির বশ্যতা; (গ) গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে এবং একই সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে (Intertwining of two revolutions); (ঘ) এই বিপ্লবের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিকশ্রেণি।[৫]

ভবানী সেন উক্ত বক্তব্যগুলিকে সমর্থন ক'রে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, "তেলেঙ্গানার বীর জনগণের পথই হল সত্যিকারের পথ।" রণদিভে বলেছিলেন, "আজ তেলেঙ্গানার অর্থই হল কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্টদের অপরনাম তেলেঙ্গানা।"[৬] অর্থাৎ তেলেঙ্গানার বীর কমরেডরা যে পন্থা অবলম্বন করে এগোচ্ছিলেন, সেই পথ অবলম্বনের ওপর তাঁরা দু'জনেই বক্তব্য রেখেছিলেন প্রতিনিধিবৃন্দের সামনে।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের দলিলগুলিকে যে বিষয়গুলি সঠিকভাবে উত্থাপিত হয় নি, সেগুলি হল : ভারতে বিপ্লবের স্তর, বুর্জোয়া শ্রেণির ভূমিকা, দেশের জনগণের শ্রেণি বিন্যাস ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের নীতি অনুসারে এবং সুনির্দিষ্টভাবে ভারতের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে আলোচিত হয় নি। ফলে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত এক ভ্রান্তপথে এগিয়েছিল। পার্টির অভ্যন্তরীণ দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী বিচ্যুতিকে দূর করার জন্য পার্টি তার দ্বিতীয় কংগ্রেসে যে লাইন গ্রহণ করল, তা হয়ে দাঁড়ালো অতিবাম হঠকারী এক সংকীর্ণতাবাদী লাইন।

এই পরিবর্তনের এক বস্তুগত ভিত্তি ছিল। ১৯৪৮ সালটা ছিল 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র শতবার্ষিকী। কমিউনিস্টদের কাছে এই সময়ে তার বিপ্লবী আবেগ ছিল বেশি। এছাড়াও ছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে— চীন, মালয়, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়ায় চলছিল সশস্ত্র সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম প্রভাব বিস্তার করেছিল এদেশের কমিউনিস্টদের মানসিকতায়। আরও কিছু ঘটনা প্রভাব বিস্তার করেছিল— সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদদের ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি ও পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়ন, দেশ বিভাগের যন্ত্রণা এবং বাস্তুহারাদের স্বদেশত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা প্রভৃতি ঘটনাবলীর পরোক্ষ প্রভাব। বিদেশে যারা ভারত-বন্ধু নামে পরিচিত ছিলেন, যেমন হ্যারিপলিট, ডি. এন. প্রিট, প্লাটস্মিল, এঁদের কাছেও ভারতের স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না, ছিল আধা-স্বাধীনতা বিশেষ।[৭]

বি. টি. রণদিভের থিসিস যেমন ভারতের প্রতিনিধিবৃন্দকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, তেমনি করেছিল দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দকে। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস থেকে বি. টি. রণদিভে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

হয়েছিলেন, যদিও এর ৩ মাস আগে থেকেই তিনি সংস্কারবাদী বিচ্যুতিকে আক্রমণ করতে গিয়ে পি. সি. যোশীকে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে নিজেই এই পদে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এই পার্টি কংগ্রেস থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গের যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, রণেন সেন, অরুণ বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জি, মুজফ্ফর আহ্‌মদ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে প্রথম দু'জন ছিলেন পলিটব্যুরোর সদস্য। কন্ট্রোল কমিশনের ৩ জন সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের। তিনি হলেন রাধা রমণ মিত্র।

এই পার্টি কংগ্রেসে পার্টির বিদ্যমান সংবিধানে কিছু কিছু সংশোধন করা হয়েছিল। তা করা হয়েছিল পার্টির পরিবর্তিত লাইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। যেমন— সভ্যদের অধিকার ও দায়িত্বকে আরও কঠোর করা হল, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে কেন্দ্রিকতার ওপর জোর দেওয়া হল। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হল, "শ্রমজীবী জনসাধারণের সমস্ত সংগঠনের ভিতরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করিবে। উদ্দেশ্য হইবে ভারতে আশু জনসাধারণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য এবং কমিউনিজমের প্রথম ধাপ স্বরূপ সমাজবাদ স্থাপনার জন্য জনসাধারণকে সংস্কারবাদীদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া নিজেদের দিকে টানিয়া আনা।"[৮]

এই পর্বে পার্টির তত্ত্বগত লাইন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'বিপ্লবের পথ' বিষয়ে কয়েকটা কথা উঠেছিল। পার্টি-লাইনের পরিবর্তন হলেও, বিপ্লবের প্রস্তুতি কোন্ পথে হবে এই প্রশ্নটা তুলে ধরলেন অন্ধ্রপ্রদেশের কমিউনিস্টরা। সময়টা ছিল ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে। এদের মূল বক্তব্য ছিল— বিপ্লবের পথ ও পদ্ধতি হবে চিন বিপ্লব অনুসারী। তাঁদের মতে বিপ্লবের পথ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি হবে চিন দেশের বিপ্লবের পথ ও পদ্ধতি যে ধরনের ছিল, তাকেই গ্রহণ করেই হবে। এর মধ্যে প্রধান ছিল মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করা।[৯]

অন্ধ্রপ্রদেশের মূল দলিলকে আক্রমণ করে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্টির পলিটব্যুরো আরও ৩টি দলিল গ্রহণ করেছিল। এগুলি হল— (ক) ভারতের কৃষি প্রশ্ন; (খ) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য পার্টির রণনীতি ও রণকৌশল এবং (গ) জনগণতন্ত্র প্রসঙ্গে। এগুলি ছিল দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক লাইনের পরিপূরক। এই সব দলিলের অন্তর্নিহিত বক্তব্য হল রুশ বিপ্লব যেমন দুই স্তরের কাজকে একসঙ্গে সম্পন্ন করেছিল, তেমনি ভারতেও তা করতে হবে। দুইটি স্তর ছিল— গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। বলা হয়েছিল শ্রমিক ও কৃষক সংগ্রামের সাধারণ কর্মসূচিকে সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মসূচির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আক্রমণের বর্শাফলক থাকবে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণির দিকে।[১০]

১৯৪৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ পার্টির পক্ষ থেকে যোশী আমলের সংস্কারবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত রাজনৈতিক লাইনের সমর্থনে 'মার্কস্‌বাদী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করল। এই পত্রিকার ৩য় সংকলনে 'অন্ধ্র থিসিসে'র জবাবে এবং পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবের সমর্থনে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশলের লেনিনবাদী ব্যাখ্যা' যা বস্তুত ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে গৃহীত 'ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল' শীর্ষক দলিলকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল।[১১]

'অন্ধ্র থিসিস'কে আক্রমণ করে পলিটব্যুরোর পক্ষ থেকে বি. টি. রণদিভে বললেন যে, চিন বিপ্লবের চরম সাফল্য সত্ত্বেও, ভারতের ক্ষেত্রে তার রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োজ্য নয়। রুশ বিপ্লবের সমগ্র অভিজ্ঞতা ভারতের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক। এ ব্যাপারে ঐ একই পত্রিকায় আরেকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, যার শিরোনামটি ছিল 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র'।[১২]

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত :

কলকাতায় অনুষ্ঠিত সি পি আই-এর পার্টি কংগ্রেস শেষ হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ। ইতোমধ্যে ১৫ জানুয়ারিতে আইনসভায় গৃহীত 'জন নিরাপত্তা আইন' বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আঘাত হানলো। ২৬ মার্চ বাংলার পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করা হল। সেসময় পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রী বলা হত না) ছিলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, যিনি এই পদে আসীন হয়েছিলেন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে সরিয়ে 'জন নিরাপত্তা বিল' পাস হওয়ার ৪ দিন পর অর্থাৎ ১৯ জানুয়ারি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন কিরণ শংকর রায়।

কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষিত করার সরকারি নোটিফিকেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারি রঞ্জিত গুপ্ত-র স্বাক্ষর সহ জারি করা হয়েছিল। নোটিফিকেশন নম্বর হল ১৭৫৯/এ-পি, তারিখ ২৫ মার্চ ১৯৪৮। কলকাতা গেজেটে উল্লিখিত হল ৩১ মার্চ ১৯৪৮। কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি হওয়ার সঙ্গে তার আরও কয়েকটি সংগঠন বে-আইনি বলে ঘোষিত হল। পার্টির প্রাদেশিক সদর দপ্তর ৮ই ডেকার্স লেন এবং ঐ বাড়িতেই পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা' এবং 'গণশক্তি' প্রেস তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পার্টির সব শাখা তার ভলান্টিয়ার্স সংগঠন— কমিউন, রেডগার্ডদের বে-আইনি করা হল।[১৩]

পার্টিকে বে-আইনি ঘোষিত করার কারণ কিরণশংকর রায় আইনসভায় ব্যক্ত করেছিলেন। কারণগুলির মধ্যে ছিল (ক) মহাত্মা গান্ধীর হত্যাজনিত মৃত্যুর পর সিপিআই দেশের জাতীয় কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে। (খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেখানে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বাসন নিয়ে ব্যগ্র, সেখানে সিপিআই এই সব বিষয়ে এক অরাজকতা সৃষ্টি করে চলেছে। (গ) শিল্পক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও ধর্মঘট সংগঠিত করার জন্য সিপিআই খুবই ব্যগ্র। (ঘ) সিপিআই এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনা করার সিদ্ধান্তটি ছিল অশুভ ইঙ্গিতবহ।[১৪] অর্থাৎ কিরণশংকর রায়ের বক্তব্যের সারবস্তু হল : সিপিআই-এর গোপনীয়তা অবলম্বন করে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা, রেডগার্ড সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ দান এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত।[১৫]

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টেই বলা হয়েছিল "তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ।" তেলেঙ্গানার পার্টি সেসময় সশস্ত্র ও গেরিলা কায়দায় রাজ্যন্যপ্রভু ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে লড়ছিল। আর শ্রেণি সমাবেশের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের দ্বারাই গঠিত হবে উদ্দেশ্য সাধনের জোট। উদ্দেশ্যটা হল সাম্রাজ্যবাদের ভরসাস্থল রাজন্যপ্রভু ও ভূস্বামীদের ধ্বংস করা, বুর্জোয়া শ্রেণির অবসান এবং সমাজতন্ত্রের জন্য বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

জেলায় জেলায় পার্টি অফিসের ওপর চড়াও, খানাতল্লাসী ও তালাবন্ধ প্রভৃতি ঘটনা ঘটতে শুরু করল। সেসময় কমিউনিস্ট পার্টি অন্য অনেকের বাড়ী নানাভাবে ব্যবহার করতো। ঝুঁকি ছিল জেনেও বাড়ীর মালিকরা পার্টিকে তাদের বাড়ী ভাড়া দিতেন বা ব্যবহার করতে দিতেন। আজকের দিনে পার্টির ক'জনেই বা জানেন এই কথা। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পাটিকর্মীরা যাতে জানতে পারেন এসব ব্যক্তিদের কথা সেই কারণে কলকাতা গেজেট থেকে Home Department (political) এর Notification হুবহু সহায়ক তথ্য হিসাবে সংযোজিত হল। যে সরকারি নোটিফিকেশন বলে জেলায় এই আদেশ জারি করা হয়েছিল, তার নম্বর হল ২৩৮৩পি এবং ২৩৮৪পি তাং ২৪ এপ্রিল ১৯৪৮। এই আদেশ গেজেট হয়েছিল ২৯ এপ্রিল।[১৬]

সেদিন যে সব নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, জ্যোতি বসু, আবদুর রেজ্জাক খাঁ, গোপাল হালদার, বিশ্বনাথ মুখার্জি, গীতা মুখার্জি, মণিকুন্তলা সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন হাজরা, পাঁচু গোপাল ভাদুড়ী, সতীশ পাকড়াশী, অরুণ বসু ও শিশির গাঙ্গুলী।[১৭] বিভিন্ন জেলা থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মোট ১৭৯ জন কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এর মধ্যে কলকাতা থেকে ৫৩ জন, দার্জিলিঙ থেকে ৯ জন, জলপাইগুড়ি থেকে ৩৪ জন, বাঁকুড়া থেকে ৯ জন, মেদিনীপুর থেকে ৭ জন, মুর্শিদাবাদ থেকে ৫ জন, বর্ধমান থেকে ৮ জন, হুগলীর ১৮ জন, হাওড়ার ১৪ জন, ২৪ পরগণার ৪ জন, মালদহের ৪ জন এবং আরো অনেকে। জেলার নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন রতনলাল ব্রাহ্মণ, গণেশ সুব্বা, উদয়ভানু ঘোষ, জগদীশচন্দ্র পালিত, অনন্ত মাজী, অনন্তকুমার ভট্টাচার্য, সনৎকুমার রাহা, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ। গ্রেপ্তারের সংখ্যা যতই দিন যেতে থাকল, ততই আরো বৃদ্ধি পেল।

আনন্দবাজার পত্রিকার চোখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি করার কাজটি সময়োচিত ও যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হয়েছিল। পত্রিকাটির বক্তব্য ছিল এই কাজ আরো আগে করা উচিত ছিল। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল 'সময়োচিত ব্যবস্থা' এই শিরোনামে।[১৮] পত্রিকার কাছে কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেকটি কার্যকলাপ ছিল সমাজবিরোধী ও জাতীয় স্বার্থের বিরোধী, অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করাই হল তাঁদের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য।

সেদিন যারা গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন, এমন প্রথম সারির নেতারা হলেন সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত, ভূপেশ গুপ্ত প্রমুখ নেতৃবর্গ। কমিউনিস্টদের প্রতি কংগ্রেসের আক্রোশমূলক মনোভাব দেখে এবং সরকারি আমলাদের তরফ থেকে 'কিছু একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে' এমন মনোভাব ব্যক্ত করার ফলে অনেকেই আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তাই তাঁরা একে একে চলে গেলেন গোপন আস্তানায়। ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে যোগাযোগ হত। সর্বত্রই যেন সরকারি সন্ত্রাস। পার্টির সংগঠনিক কাঠামোটা সেদিন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল ক্যুরিয়ারদের তৎপরতার উপর।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের তরফ থেকে কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ছিল জাতক্রোধের মতো, যদিও সিপিআই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে, শ্রমিক-

কৃষক আন্দোলনে অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলন করার চেষ্টা করেছে। এখানে উল্লেখ্য আরেকটি বিষয় আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিকে যখন নিষিদ্ধ করল, তখন কেন্দ্রীয় সরকার বা অন্য কোন রাজ্য সরকার অন্য রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করেনি। বাংলার পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে না জানিয়েই।[১৯] নেহরু ব্যক্ত করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ধরনের কাজ সর্বত্র এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, তাই এর প্রয়োগ এক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনা করেই করা উচিত। নেহরুর এই বক্তব্য যে আন্তরিকতা প্রসূত নয়, বরং বলা চলে যে কপটতাপূর্ণ, তার প্রমাণ আমরা পাই ১ বছর পর, যখন কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশেই ১৯৪৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর গোটা দেশজুড়েই কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি করা হল।

ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি :

স্বাধীনতার পূর্বে "বন্দী মুক্তি কমিটি" নামে এক সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বন্দীদের মুক্তিদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। পরে এই সংগঠনের নামের পরিবর্তন হয়— ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি। স্বাধীনতা উত্তরকালে নিরাপত্তা বিল পাস হবার পর ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে থাকে। এই অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়। 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়; 'গণশক্তি' প্রেস তালাবন্ধ করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১৮ মে তারিখে কমিটিকে পুনর্গঠিত করার জন্য বিভিন্ন দলের লোকদের নিয়ে একটি সভার আহ্বান করা হয়। এখান থেকে এই কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে পুনর্গঠিত হয়। যেমন সভাপতি -অতুলচন্দ্র গুপ্ত (অ্যাডভোকেট), কার্যকরী সভাপতি - ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক), যুগ্ম সম্পাদক - প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত (আজাদ হিন্দ ফৌজ) ও যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য (কবিরাজ), কোষাধ্যক্ষ - ফণীন্দ্রনাথ শেঠ (সভাপতি, ৩ নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি), সভ্য— জে. সি. গুপ্ত (এম. এল. এ.), জ্যোতি বসু (এম. এল. এ.), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সম্পাদক, স্বরাজ), জনাব আবুল মনসুর আহ্মদ (সম্পাদক, ইত্তেহাদ), বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, যুগান্তর), দেবনাথ দাস (আজাদ হিন্দ ফৌজ), নীরেন দে (বার-এট-ল), গীতা মল্লিক (সম্পাদিকা, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি), অধ্যাপক মহীমোহন বসু, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদ ঘোষাল প্রমুখ।

১৮ মে তারিখে ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটি একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মুখপত্র 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, এই বিবৃতি সেগুলি খণ্ডন করেছিল। উল্লেখ করা হয়েছিল যে "পুলিশ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে কমিউনিস্ট পার্টির লোকজনের কাহারও কাছে এক টুকরা ভাঙ্গা বন্দুকও পাওয়া যায় নাই। 'স্বাধীনতা' পত্রিকা স্তম্ভেও সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান কোথাও দেখা যায় নাই।" বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে সব অভিযোগ করা হয়েছিল, সেগুলি যেন তথ্য সহকারে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিকে রোগশয্যা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের মুক্তির দাবি

করেছিল এই বিবৃতি। ২৬ মে তারিখে আহূত এক জনসভা থেকে এই বিবৃতি গৃহীত হয়েছিল।[২০]

বিনা বিচারে আটক, কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রভৃতি বিষয়গুলির ওপর ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতি ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এক বিবৃতি মুদ্রিত হয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা'য়।[২১] কলকাতার বাইরে গ্রামাঞ্চলেও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছিল। মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করা হচ্ছিল। এমন এক ঘটনা হল বড়াকমলাপুরের কৃষকদের আন্দোলনকে "কমিউনিস্ট উপদ্রব", "দস্যুবৃত্তি" প্রভৃতি অভিযোগ করা হত। অথচ কৃষকরা সেসময় আন্দোলন করত হাটতোলা প্রথার এবং বে-আইনি খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে। ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির তরফ থেকে তদন্ত করার জন্য এক প্রতিনিধিদল সেই অঞ্চলে যায় এবং এক বিবৃতি প্রদান করে।[২২] এই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল "কংগ্রেসী সরকারের আধিপত্যে একটি বিস্তীর্ণ কৃষক এলাকায় যে এইরূপ পুলিশী জুলুম চলিতে পারে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। গুলি, লাঠি, পাইকারী গ্রেপ্তার, কারফিউ, বিনা পরোয়ানায় তল্লাসী, সম্পত্তি বেদখল ও লুণ্ঠন, কিছুই বাদ যায় নাই।" এসব কিছুই করা হয়েছিল ডাকাতির অভিযোগ পেশ করে। উদ্দেশ্য ছিল কৃষক আন্দোলনকে দমন করা, এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়না, যখন দেখা যায় যে কৃষক আন্দোলনের নেতাদেরই ডাকাতি মামলার প্রধান আসামী হিসাবে খাড়া করা হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একইভাবে তদন্ত করেছিল। যেমন— বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি।

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ইংরাজ শাসনের আমলে কারারুদ্ধ ছিলেন অনেক বছর। এর ফলে তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এই অবস্থাতেও তিনি "স্বাধীন" ও জাতীয় সরকারের হাত থেকে রেহাই পান নি। তিনি আবার কারারুদ্ধ হন। এমন কি সেখানেও চলেছিল নির্যাতন। এটা আমরা জানতে পারি ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতি ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি থেকে।[২৩]

সরকারের তরফ থেকে ছাত্র ফেডারেশনের ওপর যে আঘাত এসেছিল, সে সম্পর্কেও ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় উল্লিখিত হয়েছিল। সেসময় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদিকা গীতা মুখার্জির কারাবাসকাল আরও ৬ মাস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সংগঠনের সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তারের জন্য।[২৪]

এইভাবে সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর আঘাত হেনেছিল। আর এই আঘাত অনেক গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষও সেদিন বরদাস্ত করতে পারে নি। যে নিরাপত্তা বিল ১৯৪৭ সালের ১০ ডিসেম্বর আলোচনা কালে প্রতিবাদকারী জনতার ওপর পুলিশের আক্রমণে শিশির মণ্ডল প্রাণ দিয়েছিলেন, যে বিল আইনে রূপ পাওয়ার পর ১৯৪৯ সালে এবং তারপরেও মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা সকলের কাছে দেওয়ার জন্য একটা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল— 'নিরাপত্তা আইন - কি ও কেন'? এটা লিখেছিলেন ভূপেশ গুপ্ত।[২৫] স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকারের চরিত্র বোঝার পক্ষে এবং এর দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণসংগঠন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর আঘাত হানার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা এই নিরাপত্তা আইন নিতে পারে তা বোঝার পক্ষে অনেক সহজ হবে।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জী, পৃ. ৪।

২. মোতাহার হোসেন সুফী - কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন, জীবন ও সংগ্রাম, পৃ. ৫৫, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

৩. তথ্যসূত্র-১, পৃ. ৪

টিকা : পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যবৃন্দের একটি নাম হল মনসুর হবিবুল্লাহ। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন থেকে মনসুর হবিবুল্লাহ প্রাদেশিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশ বিভাগের পর পার্টির নির্দেশেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে গেছিলেন এবং সেই সূবাদেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতেও স্থান পেয়েছিলেন। তবে তিনি সেই দেশ থেকে ১৯৫২ সালে ভারতে ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রীও ছিলেন।

৪. তথ্যসূত্র-১, পৃ. ৪।

৫. Documents of the History of the Communist Party of India, Vol. VII, 1948-50, Ed by M.B. Rao, Political thesis, P1-118, Adopted at the 2nd Congress, 28 February to 6 March 1948, Calcutta. (সহায়ক তথ্য-১)

টিকা : এই থিসিসটি বি.টি. রণদিভে কর্তৃক উত্থাপিত এবং ভবানী সেন কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিল।

৬. ঐ, পৃ. ১৯৭ ও ২০১।

৭. নতুন সংবাদ, ১৯-৮-৪৮ (সহায়ক তথ্য-২)।

৮. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র (সহায়ক তথ্য-৩)।

টিকা : ক. এই গঠনতন্ত্রটি ১৯৪৩ সালের প্রথম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল।

খ. ১৯৪৮ সালের পার্টি কংগ্রেসে সংবিধানের কিছু জায়গায় পরিবর্তন আনা হয়, যেমন— পার্টি কাঠামোর বেশ কিছু জায়গায় এবং সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে দৃঢ়তা আনা হয়। প্রস্তাবনায় গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টি অনুল্লেখ রাখা হয়। জনসাধারণকে সংস্কারবাদীদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সমাজতন্ত্রের প্রথম ধাপে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়।

গ. এই গঠনতন্ত্রের শেষে ১৯৫১ সালে সারা ভারত পার্টি সম্মেলনে গৃহীত কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের কাজ সম্পর্কে একটি অংশ সংযোজিত করা হয়েছে।

ঘ. সারা ভারত পার্টি সম্মেলনে স্থির হয়েছিল যে, যারা নতুন সভ্য হবেন তাদেরকে প্রথমে প্রার্থী সভ্য হিসাবে গণ্য করতে হবে। (- সম্পাদক)

৯. অমলেন্দু সেনগুপ্ত - উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ২৫৬, অন্ধ্র থিসিসের সারসংক্ষেপ (সহায়ক তথ্য-৪)।

১০. On People's Democracy, 'Communist', January 1949. (সহায়ক তথ্য-৫)।

১১. 'মার্ক্সবাদী', ৩য় সংকলন, পৃ ৬৩-৮১', 'বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশলের লেনিনবাদী ব্যাখ্যা' (সহায়ক তথ্য-৬)।

১২. ঐ, পৃ ৮২-১৩১, 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র' (সহায়ক তথ্য-৭)।

১৩. The Calcutta Gazette (Extraordinary), 31 March 1948, Home Dept (Political), Notification signed by R. Gupta, Secretary, to the Government of West Bengal. (সহায়ক তথ্য-৮)।

১৪. পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায়ের পূর্ণ বিবৃতি। আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১-৩-৪৮ (সহায়ক তথ্য-৯)।

১৫. WBLAP, Vol II, No. 2, 8-30 March 1948, P346.

১৬. তথ্য সূত্র - ১৩, 29 April 1948, No 2383 and 2384 dt 24 April 1948. (সহায়ক তথ্য-১০)।

১৭. তথ্যসূত্র - ৯, পৃ. ২৩০।

১৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদকীয় - সময়োচিত ব্যবস্থা, ২৯-৩-৪৮ (সহায়ক তথ্য-১১)।

১৯. J. Nehru, Letters to Chief Ministers, 1947-64, Vol I, P99.
টিকা : প্রধানমন্ত্রীকে না জানিয়েই বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা (সহায়ক তথ্য-১২)।

২০. ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির বিবৃতি, ১৮ মে ১৯৪৮ (সহায়ক তথ্য-১৩)।

২১. ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতির বিবৃতি, ৬ জুন ১৯৪৮ (সহায়ক তথ্য-১৪)।

২২. ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির প্রতিনিধিদলের বিবৃতি, ২১ জুন ১৯৪৮ (সহায়ক তথ্য-১৫)।

২৩. ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতির বিবৃতি, ২১ মে ১৯৪৮, (সহায়ক তথ্য-১৬)।

২৪. ছাত্র ফেডারেশনের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি'র বক্তব্য। (সহায়ক তথ্য-১৭)।

২৫. ভূপেশ গুপ্ত - নিরাপত্তা আইন কি ও কেন? (সহায়ক তথ্য -১৮)।
টিকা : এই পুস্তিকার প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। দ্বিতীয়বার এর প্রকাশ হয়েছিল আরো তথ্যের update করে। মনে হয়, এটির প্রকাশ হয় ১৯৫৩ সালে (সম্পাদক)।

সিপিআই-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে উত্থাপিত রাজনৈতিক থিসিস

(১) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের জার্মানি এবং ফ্যাসিস্ট জাপানের পরাজয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই শ্রমিকশ্রেণি এবং বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে তার পাল্লা ঝুঁকে পড়েছে। জার্মানি ও জাপানের পরাজয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা শক্তিশালী হয়েছে বলে মনে হলেও সামগ্রিক ফলাফল কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা বিশ্ব পুঁজিবাদকে শক্তিশালী না করে বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এবং সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির আন্দোলনকেই অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলেছে। বিপ্লবী শক্তিগুলির ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধিতেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী যুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচণ্ড দুর্বলতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় না ঘটে বরং বিপরীতটাই সত্য হয়েছে।

প্রাণ ও ধন সম্পদের বিপুল ক্ষয় ক্ষতি সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং বিপ্লবী শক্তিসমূহের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছে। সোভিয়েতের সামরিক শক্তি সকল দেশের জনগণের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী সামরিক শক্তির অপরাজেয়তার ভ্রান্ত ধারণাকে তছনছ করে দিয়েছে। শুধু সামরিক শক্তিরই নয় সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি, সাংগঠনিক শক্তি ও শ্রমশিল্পের মর্যাদাও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুঁজিবাদী দেশের মানুষেরা সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত জীবনের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের নৈরাজ্যের তুলনা করছে।

দ্বিতীয়ত পূর্ব ইউরোপের জনগণতন্ত্রগুলিতে জনগণের ক্ষমতালাভ বড় বড় শিল্প পরিবহন ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং শ্রমজীবি শ্রেণিগুলির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাব বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আর এক বিরাট আঘাত। এর ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার সমান মানুষজন ও বিশাল এলাকা পুঁজিবাদের এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেল। ১৯১৭-এ রুশ বিপ্লবের পর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এ দ্বিতীয় ধস।

শ্রমিকশ্রেণির শক্তিবৃদ্ধির আরও উদাহরণ হল ইউরোপে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রবল ক্ষমতা বৃদ্ধি। পূর্ব ইউরোপ ছাড়াও ফ্রান্সে ও ইতালিতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মহান সংগ্রামী ভূমিকার স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উত্থান ঘটেছে। কেবলমাত্র সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতেই নয়, গণসংগঠনের বিস্তার ও সংসদীয় নির্বাচনে সাফল্যেও তার প্রমাণ পাওয়া

যাচ্ছে। প্রায়শই তারা একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

এই সব শক্তিবৃদ্ধি নির্দেশ করছে যে দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলি যুদ্ধপূর্ব অবস্থার দিকে পাল্লা ঝুঁকিয়ে দেওয়ার এবং শাসকশ্রেণিদের সংকটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার আগেই শ্রমিকশ্রেণিকে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, কারণ দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিকশ্রেণি নূতন আঘাত প্রতিরোধে এবং বর্তমান পরিস্থিতির বৈপ্লবিক কর্তব্য সমাপনে সক্ষম।

ইউরোপে পুঁজিবাদীরা চরম বিপদে! ব্রিটেনের লেবার পার্টি প্রবল অসন্তোষের মুখে। আমেরিকা ক্রমে সঙ্কটে জড়াচ্ছে ও বিশ্বের সর্বত্র ক্ষুধার্তের মত বাজার খুঁজছে, নিজের দেশের মানুষজনের জীবনযাত্রার মান কমিয়ে আনছে ও অন্যদেশের স্বাধীনতাকে আক্রমণ করছে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর এক বিরাট আঘাত। চিয়াং কাইসেকের ক্রমাগত বিপর্যয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নীতির হেনস্তা স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে যে জনগণের মুক্তির লড়াই সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অপ্রতিরোধ্য।

দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ভূমিকা

দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা বরাবরই বুর্জোয়াদের তল্পিবাহক, বর্তমানেও তাই। ফ্যাসি-বিরোধী লড়াইয়ে তারা ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে তাদের পুঁজিবাদী প্রভুদের সঙ্গে নিয়ে জনগণের শিবিরে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। যোগ দেওয়ার আগে অবশ্য তারা সোভিয়েতের বিরোধিতা ও মিউনিখপন্থীদের সমর্থন করেছিল। পপুলার ফ্রন্টে ও শ্রমজীবী শিবিরে ভাঙন ধরিয়েছিল এবং তাদের প্রভুদের বিদেশনীতির বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নেতারা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সশস্ত্র লড়াইকে বারবার পণ্ড করার চেষ্টা করেছে। তারা নির্ভর করেছে ইঙ্গ-মার্কিন হানাদারদের ওপরে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ওপরে নয়। জনগণের উদ্যোগ গ্রহণকে তারা সর্বদাই রুখে দিতে চেয়েছে।

আজ যখন প্রতিটি দেশে পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা উঠছে তখন এরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারকের ভূমিকায় পুঁজিবাদের পক্ষে অবতীর্ণ হয়ে শ্রমিকশ্রেণির ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে এবং নিজেদের তৃতীয় শক্তি আখ্যা দেওয়ার ভণ্ডামি করছে। যুদ্ধ পরবর্তী নির্বাচনে, যেমন ব্রিটেনে, চিরাচরিত বুর্জোয়া পার্টিগুলির বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ এবং ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে অর্জিত মর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে তারা পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নেতাবা তাদের পুঁজিবাদী প্রভুদের প্রয়োজন অনুসারে দেশের শ্রমিকশ্রেণি ও জনসাধারণের ওপর তাদের অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে। তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জিইয়ে রেখে জনগণকে আর একটা যুদ্ধে ঠেলে দিতে চাইছে। দক্ষিণপন্থী নেতারা তাদের অধীনস্থ দেশগুলির জনসাধারণকে পশুশক্তি দ্বারা দমন করছে। তারা তাদের সামরিক শক্তির সঙ্গে উপনিবেশের বুর্জোয়া শ্রেণিগুলির জোট গড়ে তুলে এক নূতন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের সৃষ্টি করছে, এবং তার নাম দিচ্ছে 'স্বাধীনতা'। ব্রিটিশ লেবার পার্টির সরকার ভারত, পাকিস্তান, বর্মা প্রভৃতি দেশকে এই ভুয়ো 'স্বাধীনতা' মঞ্জুর করেছে।

ফ্রান্সের সোশ্যালিস্ট সরকার ফরাসি সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্য ভিয়েতনামি জনগণের

স্বাধীনতার লড়াইকে অস্ত্র দিয়ে দমন করতে চাইছে। ওলন্দাজ সোশ্যালিস্টরা ইন্দোনেশিয়ায় উপনিবেশ বজায় রাখার যুদ্ধকে পুরোপুরি সমর্থন করছে।

দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নেতারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলিহেলনে কমিউনিস্ট সরকারগুলিকে উৎখাৎ করার, বিপ্লবী অসন্তোষের কণ্ঠরোধ করার এবং মার্কিন মদতে পুতুল সরকার গড়ার প্রয়াস চালাচ্ছে। সোভিয়েত বিরোধিতা, কম্যুনিজম বিরোধিতা ও পুঁজিবাদের পক্ষাবলম্বন এদের নীতির মূল কথা।

নূতন শ্রেণি সমাবেশ

যুদ্ধ শেষে তাই এক নূতন শ্রেণি বিন্যাস ঘটেছে। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে বুর্জোয়াদের যে অংশ অভিন্ন লড়াইয়ের স্বার্থে জনগণের শিবিরে যোগ দিয়েছিল তারা এখন কট্টর পুঁজিবাদী অংশের কাছে ফিরে গেছে। বিশ্বের সমস্ত বুর্জোয়া শক্তি এখন বিপ্লবের জোয়ারকে ঠেকাতে এবং শ্রমিকশ্রেণি, জনগণ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপের গণতন্ত্রগুলি এবং উপনিবেশের জনগণের বিরুদ্ধাচরণ করতে একত্রিত হচ্ছে। জাতিসঙ্ঘে এই নূতন জোট তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠাতাকে বেশি বেশি করে এই আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট ও আশু বিপ্লবের ভীতি এদের এই জোটবদ্ধতার কারণ। ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধের সময়ই সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখা দিচ্ছিল। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলায় বিলম্ব সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্তাক্ত করার, ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্র, প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের সমর্থন প্রভৃত তার উদাহরণ। এখন এই বিরোধ তীব্রতর হয়েছে।

পুরোনো বিন্যাস সম্পূর্ণ পাল্‌টে গেছে। এখন তৈরি হয়েছে দুটি শিবির— একটি সাম্রাজ্যবাদী শিবির অন্যটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক শিবির। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপীয় গণতন্ত্রগুলি এবং বিশ্বের সকল সংগ্রামী মানুষ নিয়ে এই দ্বিতীয় শিবির।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নেতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শিবিরভুক্ত অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় তার শক্তি অনেক বেশি। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তার এলাকা অনেক দূরে হওয়ায় যুদ্ধের সময় সে তার সম্পদের অনেক বিকাশ ঘটাতে পেরেছে, যার ফলে তার উৎপাদন শক্তি বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। এর সাথে সাথে বেড়েছে বাজারের ক্ষুধা এবং প্রয়োজনও। আর্থিক বিনিয়োগ এবং যুদ্ধ ঘাঁটির মারফৎ নূতন উপনিবেশ শুধু নয় উন্নত পুঁজিবাদী দেশসহ সকল দেশের সরকারকেই তারা সন্ত্রস্ত রেখে নিজেদের সংকট থেকে পরিত্রাণ খুঁজছে। আমেরিকার এই সর্বগ্রাসী মত্ততাই নূতন পরিস্থিতির এক প্রধান উপাদান।

সব দেশের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে দিয়ে এবং সারা বিশ্বে ফ্যাসিস্ট প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেই কেবল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব ও সম্প্রসারণ সম্ভব। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই মূল ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখেই বিভিন্ন শ্রেণি, রাজনৈতিক দল, নেতা ও সংগঠনের আচরণের বিচার করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে বিরোধও এই একই সঙ্গে তীব্র হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তেই ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হয়েছে। ব্রিটেন, আজ আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই সব প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাধান মার্কিন স্বার্থের অনুকূলেই ঘটছে। যতদিন ব্রিটেন পুঁজিবাদী পথে থাকছে, ততদিন তার আর এছাড়া এবং আমেরিকার

পশ্চাদবর্তী হয়ে থাকা ভিন্ন কোনও উপায় নেই। কিন্তু এর ফলে ব্রিটিশ জনগণের অবস্থার ও দেশের উন্নয়নের অবনতি ঘটছে। এর ফলে ইঙ্গ-মার্কিন সমঝোতার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণি সহ সকল জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদের পরিত্রাণের পথ

ইউরোপের পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপর্যয়, শ্রমিকশ্রেণির নূতন নূতন জয়লাভ এবং বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদী উৎপাদনের ভরাডুবির বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ নিস্তারের পথ খুঁজছে। মার্শাল পরিকল্পনার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির একটি তাঁবেদার জোট গড়ে তুলছে। পশ্চিম জার্মানির ফ্যাসিস্টরা এর কেন্দ্রে স্থান পাবে। ইউরোপের ধ্বসে পড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে যে মার্কিন ঋণ আসবে, তার মাধ্যমে এই দেশগুলি প্রকৃত পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত হবে। ট্রুম্যান তত্ত্ব ও মার্শাল পরিকল্পনা মার্কিন সম্প্রসারনের প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক সাহায্যদানের মারফৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার পণ্যের বাজার খুঁজে নিচ্ছে এবং দেশের 'অতিউৎপাদনের' সমস্যার সুরাহা করতে চাইছে। রাজনৈতিকভাবে এই পরিকল্পনা প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্র বিরোধী এমন সব সরকারকে মদত দিচ্ছে যারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বেঁচে দেবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক ও শ্রমজীবী জনগণকে পদদলিত করবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোনও কোনও দেশে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ওপর এ কাজের জন্য নির্ভর করে।

শ্রমিকশ্রেণিকে বিভক্ত করার জন্য সংস্কারবাদী দল সমূহের দক্ষিণপন্থী নেতাদের এখন প্রথম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এভাবেই একটি দেশকে ফ্যাসিবাদের দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। একই সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্য গলের মত প্রকৃত ফ্যাসিবাদীদেরও অস্ত্র জোগায় ও শক্তিশালী হতে সাহায্য করে।

এইভাবেই দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ও বুর্জোয়া পার্টিগুলির ঐক্যবদ্ধ জোট গড়ে পুঁজিবাদী ফ্যাসিস্ট জার্মানির পুনর্গঠন ও সোভিয়েত শিবিরের বিরুদ্ধে আক্রামণ ও যুদ্ধের দ্বারা পুঁজিবাদী সংকট থেকে বেরিয়ে আসাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য। ক্রমাগত আণবিক বোমার হুমকি ও যুদ্ধের প্রচার তাদের এই আক্রমণের অঙ্গ। জনগণের ওপর বোমা চাপিয়ে সম্ভব হলে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ তারা খুঁজছে।

এই উদ্দেশ্য সাধন অবশ্য সহজ নয়, কারণ তা করতে গেলে যা দরকার, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির স্বাধীনতা হরণ এবং তাদেরকে মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করা— ঐসব দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে লড়ছে এবং লড়বে।

উপনিবেশগুলিতে

যুদ্ধ পরবর্তী বিপ্লবী যুগে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশগুলি সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছে। সে সব দেশে এই সংগ্রাম এত তীব্র ও এত ব্যাপক যে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির মত আজ এক ধাক্কায় জনগণতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব। শুধুমাত্র জাতীয় মুক্তি নয়, সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অবসান ও সমাজতন্ত্রের গঠন ও আশু অর্জন সাধ্যায়ত্ত হয়ে উঠেছে।

যেমন উন্নত দেশগুলিতে তেমনি উপনিবেশ সমূহে পুরানো সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। প্রথমে সাম্রাজ্যবাদ ও পরে ফ্যাসিবাদের দ্বারা পিষ্ট, শোষণ ও দারিদ্র জর্জরিত মানুষেরা জাপানের পরাজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদীদের পুনরাগমনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতার জন্য রীতিমত যুদ্ধ চালিয়েছে। ব্রহ্মদেশ সশস্ত্র লড়াই করেছে, ভারতবর্ষেও সশস্ত্র লড়াই শুরু হয়েছিল, সেনাবাহিনী ও পুলিশের সৌভ্রাতৃত্ব তাতে পাওয়া গেছে।

উপনিবেশিক মুক্তির মহান সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণমুক্তি ফৌজের নেতৃত্বে চীনা জনগণের গৌরবময় লড়াই। চীনা জনগণের জয় সারা এশিয়ার ও পৃথিবীর চেহারাকে বদলে দেবে এবং ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান নিশ্চিত করবে।

বিপ্লবের ধাবমান জোয়ারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিকতাবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদ এমন মিত্র খুঁজছে যাদের প্রভাব ও গণভিত্তি আছে। এই উদ্দেশ্যে তারা স্বাধীনতার দ্বারা জনগণকে প্রতারিত করছে। চীনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খুনী চিযাং কাইশেক ও তার দল কুয়োমিন্টাংকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অস্ত্র সাহায্য করছে। ইন্দোনেশিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণির দোদুল্যমানতাকে জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। বিপ্লব দমনে ইউরোপের দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মতই সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য গণভিত্তি আছে এমন মিত্র সংগ্রহ।

সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের ভরাডুবি

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ও তাদের তল্পিবাহকেরা অবশ্য কী এশিয়ায়, কী ইউরোপে সর্বত্র একঘরে হয়ে পড়ছে। ১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ন'টি ইউরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতার স্বার্থে যে 'ইনফরমেশন ব্যুরো' গঠনের সিদ্ধান্ত হল তাতে গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের লড়াই এক ঐতিহাসিক মোড় নিল। এই সম্মেলনের আহ্বানে সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের স্থানীয় দোসরদের বিরুদ্ধে নূতন উদ্যমে লড়াই শুরু করেছে।

হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি ইউরোপের গণপ্রজাতন্ত্রী দেশগুলি মার্শাল পরিকল্পনাকে বর্জন করেছে। ঐ সব দেশের মানুষ বিশ্বাসঘাতকদের বর্জন করে গণতান্ত্রিক জোটের ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ঘনিয়ে তোলার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিয়েছে।

গ্রিসে জেনালের মার্কোসের গণতান্ত্রিক বাহিনী ঐ দেশের সাত দশমাংশকে মার্কিন মদতপুষ্ট গ্রিক ফ্যাসিস্টদের থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও শ্রমিকশ্রেণির অধিকারের জন্য ফরাসি শ্রমিকশ্রেণির সাহসী লড়াই মার্কিন আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে আর একটি আঘাত অনুরূপ ভাবে ইতালিতেও কমিউনিস্ট-সোশ্যালিস্টদের ঐক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক গণ আন্দোলন সংগঠিত করে সাফল্যের সঙ্গে ইতালিকে মার্কিন উপনিবেশ করে তোলাকে প্রতিহত করছে।

চীনে কুয়োমিন্টাং-মার্কিন আঁতাত একের পর এক পরাস্ত হচ্ছে ও শোষিত মানুষের বিপুল আন্দোলনের সামনে ভেঙে পড়ছে।

আরব-ইহুদি দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও মিশর, ইরাক, ইরান ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ ব্রিটিশ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হচ্ছে এবং বিপুল বৈপ্লবিক সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং নিজের শক্তিকে ছোট করে দেখা এবং বিরোধী শিবিরকে শক্তিশালী মনে করাই বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণির প্রধান বিপদ।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের সংকট থেকে ত্রাণ পেতে আর একটি নূতন বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এর ফলে পুঁজিবাদী সংকট আরও গভীর হবে এবং বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিরোধ আরও বাড়বে।

(২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিবর্তন সমূহ এবং বুর্জোয়া শ্রেণির যোগ সাজসের নীতির অর্থনৈতিক ভিত্তি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে বিপ্লবের করাল মূর্তি দেখে বুঝতে পেরেছিল যে পুরনো দিনের অবসান্ হয়েছে। পুরনো ব্যবস্থায় ব্রিটিশরাই ছিল প্রভু, তারা সামন্ততন্ত্রকে জিইয়ে রেখেছিল এবং দেশি বুর্জোয়াদের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তাদের বা তাদের সমর্থক সামন্তশ্রেণি ও রাজন্যবর্গের কোনও গণভিত্তি ছিলনা, তাই সমগ্র জনগণের ওপর নগ্ন অত্যাচার ভিন্ন তাদের শাসন কায়েম রাখা সম্ভব ছিলনা; জাতীয় মুক্তির লড়াই ব্যাপক আকার ধারণ না করা পর্যন্তই কেবল এ ভাবে চলা সম্ভব ছিল।

বুর্জোয়া শ্রেণি নিজের স্বার্থে এই সংগ্রামে যোগ দিলেও, তারা সর্বদাই বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দোলাচলে রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে তারা সব সময়ই জঙ্গি হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছে এবং জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে আপস করেছে।

যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে গণ অসন্তোষ সশস্ত্র লড়াইয়ের পর্যায়ে চলে এল। ১৯৪২-এ ফ্যাসিস্ট-আক্রমণের সুযোগে 'দ্রুত ও সহজে' লড়াই শেষ করার জুয়া খেলায় জাতীয় বুর্জোয়ারা হেরে গেলেও, জনগণের কাছে তারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের নেতা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছিল। এ অবস্থায় তারা যদি দেশের মধ্যে গণ-অসন্তোষকে ঐক্যবদ্ধ করে নেতৃত্ব দিতে পারত তবে সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুর ঘন্টা বেজে উঠত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার এই বিপদের দিনে যখন দেখতে পেল যে জাতীয় বুর্জোয়ারাও বিপ্লবকে ভয় পায়, তখন তারা তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করল এবং তার নাম দিল স্বাধীনতা। উদ্দেশ্য হল ইউরোপের মত একই রকম নূতন অর্থনৈতিক বন্ধনের দাসত্ব সৃষ্টি করা। বুর্জোয়া শ্রেণিকে খাতায় কলমে ক্ষমতা দেওয়া হলেও, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে চিরস্থায়ীভাবে করে রাখা হল অধস্তন সহযোগী। উদ্দেশ্য হল এমন একটি কায়েমি স্বার্থবাদী প্রতিক্রিয়াশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা যে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। মার্শাল পরিকল্পনার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপে যা করতে চাইছে ভারতবর্ষে তার উদ্দেশ্য সেই একই।

বিপ্লবী জোয়ারের ভিত্তি

যুদ্ধ-পরবর্তী কালে বিপ্লবের জোয়ার এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়ার গলাগলি— উভয়েরই ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছিল যুদ্ধের সময়েই যখন উপনিবেশিক শোষণ

উঠেছিল চরমে। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্টগুলি হল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শিল্প, ঋণ দাসত্ব অনাহারে জর্জরিত কৃষক, পরগাছা জমিদার শ্রেণি ও দেশের অর্থনৈতিক ঘাটতি। কৃষির ক্রমেই অবনতি ঘটছিল। ১৯২১-২২ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত ২০ বছরে প্রধান খাদ্যশস্য চাষের এলাকা ৫.৮৬ কোটি একর থেকে কমে ৪.৫৭ কোটি একরে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ২৫ বছরে একর প্রতি চাল উৎপাদন ৯৮২ পাউণ্ড থেকে ৭২৮ পাউণ্ডে নেমে গিয়েছিল। গম উৎপাদন ৭২৪ পাউণ্ড থেকে কমে হয়েছিল ৬৩৬ পাউণ্ড! এই হ্রাসপ্রাপ্ত উৎপাদন থেকে কৃষককে একটা বড় অংশ দিতে হত জমিদারকে।

যুদ্ধের আগেই ঘাটতি মেটাতে বার্মা থেকে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছিল। যুদ্ধে অর্থ ব্যয়ের ফলে উদ্ভুত বিপুল মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে বার্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে দুর্ভিক্ষে লাখো লাখো মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। জমিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, যুদ্ধ এবং তজ্জনিত অর্থনীতি কৃষক ও জনসাধারণের সমূহ সর্বনাশ ডেকে এনেছিল এবং তাদের বিক্ষোভ উঠেছিল চরমে।

জাপানের আক্রমণে যুদ্ধ ঘরের দরজায় এসে গিয়েছিল, এবং যুদ্ধের চাহিদা মেটাতে জিনিষের দাম বেড়ে গিয়েছিল। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে যে ঘাটতি হয়েছিল, তার বাবদ দেশের মানুষকে শোধ করতে হয়েছিল ব্রিটেনের কাছে ১৬০০ কোটি টাকার 'দেনা'। এই প্রতারণা ছাড়াও কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের প্রকৃত আয় কমে গিয়েছিল শতকরা ৫০ ভাগের ওপরে।` সব কিছুর মোট ফল হয়েছিল কৃষকের ব্যাপক দেউলিয়া অবস্থা, জমিদার ও ধনী কৃষকদের হাতে আরও বেশি জমির কেন্দ্রীভবন, দুর্ভিক্ষ ও বাংলার মন্বন্তরে ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু।

বলদ, লোহা, লাঙ্গলের দাম অত্যন্ত চড়ে যাওয়ায় কৃষকের পক্ষে চাষবাস অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। মুদ্রাস্ফীতির ফলে ভূমি থেকে উচ্ছেদ ও অর্থের জুলুম বেড়ে গিয়ে কৃষকের জীবন অতিষ্ঠ করেছিল।

শ্রমিক ও মজুরি সংকট

ভারতবর্ষে শিল্পের বিকাশ প্রতিহত করার সাম্রাজ্যবাদী নীতি যুদ্ধের সময়ও অব্যাহত ছিল। তাই যুদ্ধের প্রয়েজনে সৈন্যদলে, কলকারখানায়, অফিস কাছারিতে যে সব অতিরিক্ত নিয়োগ হয়েছিল যুদ্ধের শেষে তারা সব দলে দলে বেকার হয়ে পড়ল, বিকল্প কাজ মিলল না। যুদ্ধের সময় মালের জন্য যে অতিরিক্ত অর্ডার পাওয়া গিয়েছিল, তাতে পুঁজিপতিরা পুরোনো কারখানাই চব্বিশ ঘন্টা চালু রেখে অতিরিক্ত কামিয়ে নিয়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের প্রকৃত আয় মুদ্রাস্ফীতির ফলে এক টাকায় (ষোল আনা) মাত্র ছ' আনায় রূপান্তরিত হয়েছে। যে সব জায়গায় শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পেরেছে ও ধর্মঘট করেছে সেখানে খানিকটা মাগগিভাতা তারা আদায় করেছে বটে, কিন্তু অন্যত্র তারা বঞ্চনার শিকার হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণি গত সাত বছর ধরে তাদের অবস্থার ক্রমাবনতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

যুদ্ধের পর জীবনযাত্রার সূচক ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এমনকি সরকারি হিসেব যাতে প্রকৃত অবস্থাকে অনেক কম করে দেখানো হয়েছে— তাতেও দেখা যায় ১৯৩৯ থেকে '৪৭ এর মধ্যে জীবনযাত্রার সূচক ১০০ থেকে নিম্নোক্ত হারে বেড়ে গেছে : বোম্বাই - ২৮৫, আমেদাবাদ - ৩২২, শোলাপুর - ৩৬০, কানপুর - ৪২০, মাদ্রাজ - ২৮৫, ত্রিচুর - ৩০১।

সর্বভারতীয় মূল্য সূচকেও দেখা যায় যে শ্রমিককে যুদ্ধ পূর্ববর্তী কালের

তুলনায় বর্তমানে প্রায় চারগুণ বেশি দাম দিতে হচ্ছে।

স্বভাবতই এর ফলে শ্রমিকশ্রেণি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং আট ঘন্টা কাজের সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সবেতন ছুটি, সরকারি কর্মচারীদের পে-কমিশন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ অবস্থা সামাল দিতে চেয়েছে, কিন্তু অসন্তোষ দূর করা যায়নি।

শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট ক্রমেই বিস্তৃততর হয়েছে। ১৯৪২-এ ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭.৭২ লক্ষ, ১৯৪৬-এ এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল অভূতপূর্বভাবে প্রায় ২০ লক্ষে, আর ১৯৪৭ এর প্রথম ৮ মাসেই এই সংখ্যা ১৩ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই ধর্মঘটের ঢেউ প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক সংকট ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে এবং জনগণ এই সংকটের নিরসনে মরিয়া। তারা চাইছে জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি, শিল্পে নৈরাজ্যের অবসান ও পরিকল্পনা এবং জাতীয়করণ।

অপর পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিরা চাইছে যান্ত্রিকীকরণ, মজুরি হ্রাস ও অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে সংকট থেকে মুক্তি। অভিজ্ঞতা থেকে শ্রমিকশ্রেণি দেখতে পাচ্ছে যে দেশের সামনে দুটি পথ খোলা আছে— হয় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী পথ, নয় জনগণের বিপ্লবী পথ।

পেটি-বুর্জোয়া জনসমষ্টি যুদ্ধের বিভীষিকাময় কালোবাজারির দিনগুলির মধ্য দিয়ে যে শিক্ষালাভ করেছে, তার ফলে তারাও ধৈর্য হারিয়েছে। ছাত্র, কেরানি, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক প্রমুখরা ধর্মঘটে সামিল হচ্ছে।

দেশীয় রাজ্যগুলিতেও খাদ্যাভাব, কালোবাজারি, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের হাহাকারের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব গণজাগরণ ঘটছে। 'কাশ্মীর ছাড়ো' আন্দোলনের মত ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির ফলে রাজা মহারাজারা ভয়ে কাঁপছে।

দেখা যাচ্ছে যে প্রতিরোধ সব দিক থেকে হচ্ছে। শোষিত জনগণের কোনও অংশই বর্তমান অবস্থাকে মেনে নিতে রাজি নয়।

সাম্রাজ্যবাদী-জাতীয় বুর্জোয়ার সহযোগিতার ভিত্তি

কিন্তু যুদ্ধের ফলে জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরিয়া হলেও জাতীয় বুর্জোয়া তাকে মিত্র রূপে খুঁজে পেয়েছে।

প্রথমত যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বুর্জোয়ার হাতে প্রচুর নগদ মূলধন এসেছে। শিল্পে মুনাফা বেড়ে গেছে বিপুল পরিমাণে। ১৯২৮-এর সূচককে ১০০ ধরে সারা ভারতের শিল্পে মুনাফা ১৯৩৯-এ ছিল ৭২.৪ ও ১৯৪২-এ তা বেড়ে হয় ১৬৯.৪। বস্ত্র শিল্পে এই মুনাফার সূচক ১৯৩৯-এ ১৫৪.৬ থেকে বেড়ে ১৯৪২-এ হয়ে যায় ৭৬০.৭!

যুদ্ধের সময়ে বাড়তি চাহিদার ফলে ২৪ ঘন্টা উৎপাদন ও কালোবাজারের চোরা পথ ভারতীয় পুঁজিপতিদের এমন রমরমা এনে দিয়েছিল, যেমনটি আগে কখনো ঘটেনি। অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর বসালেও ভারতীয় পুঁজিপতিরা প্রচুর লাভ করেছিল। সরকার এক অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে তার সুযোগ করে দিয়েছিল। সরকারকে ঋণ দিতে ভারতীয় রাজি ছিল না। 'আগস্ট আন্দোলনে'র মধ্য দিয়ে তাদের নেতা জাতীয় কংগ্রেস এ

বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত, ১৯৪২ সালে জমশেদপুরে ও আমেদাবাদে ভারতীয় পুঁজিপতিদের দুটি বড় শিল্পে লক-আউট ছিল এই চাপ সৃষ্টির উদাহরণ।

ভারতীয় পুঁজিপতিদের শান্ত করতে বিশাল পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছিল। শিল্পপতিরা তাদের উৎপাদনের একটা অংশ সস্তায় সরকারকে দিতে রাজি হয়েছিল। বিনিময়ে কালোবাজারে জনসাধারণের কাছে যে কোনও দামে বিক্রি করার স্বাধীনতা তাদের দিতে হয়েছিল। খোলা বাজারে ও কালোবাজারে অভূতপূর্ব দরবৃদ্ধির দ্বারাই বোঝা যায় সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশলে কীভাবে শিল্পপতিরা দেশের মানুষদের লুঠ করেছিল। গরিব দেশের নগদ পুঁজির অভাবের সমস্যা এভাবে পূরণ হয়েছিল।

ভারতীয় বুর্জোয়া ও বৃহৎশিল্প এই লুণ্ঠনের দৌলতে এখন নূতন আত্মপ্রত্যয় পেয়েছে। এদের রচিত টাটা-বিড়লা পরিকল্পনা সারা পৃথিবীকে জানান দিচ্ছে যে ভারতীয় পুঁজিপতিরা বড় আকারে পুঁজি বিনিয়োগ করতে এবং বৃহৎ বিদেশি পুঁজিকে আহ্বানের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।

অন্য দিকে ব্রিটিশ ও মার্কিন পুঁজির ওপর তাদের নিজেদের নির্ভরতা বোঝার মত বুদ্ধিও তাদের আছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে নূতন যন্ত্রাংশ আনার বা নূতন যন্ত্রপাতি এনে নূতন শিল্প গড়ে তোলার প্রয়াসকে বাধা দিয়ে এসেছে। এ সবের জন্য কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন এবং এই সব মূলধনী সামগ্রীর একচেটিয়া মালিকানা রয়েছে ব্রিটিশ ও মার্কিন পুঁজিপতিদের। হাতে যতই নগদ টাকা আসুক পশ্চাৎপদতা, ঔপনিবেশিক সীমাবদ্ধতা ও ব্রিটেনের ওপর নির্ভরশীলতা তাদের চারদিক থেকে চেপে রেখেছে।

ভারতের কাছে ব্রিটেনের যে ১৬০০ কোটি টাকা ঋণ আছে তাতে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যার সমাধান হবে বলে ভারতের বৃহৎ শিল্পপতিরা ভাবছেন, কিন্তু ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ঐ ঋণ শোধ অস্বীকারের জন্য একজোট হয়েছে। ব্রিটিশরা কিস্তিতে অল্প স্বল্প শোধ করার আর বাকিটার বিনিময়ে কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দিতে চাইছে। ৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ এ স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ চুক্তির ১০নং ধারায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির স্টার্লিং ঋণ শোধ সম্পর্কে এই মর্মে সুস্পষ্ট ঐকমত্য দেখা যাচ্ছে। ওরা যে অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়ার কথা বলছে, তা আসলে সুবিধার টোপ দিয়ে আরও কিছু গুছিয়ে নেওয়ার মতলব।

ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এইভাবে অধমর্ণ হয়েও ভারতকে শাসাচ্ছে, এবং যতক্ষণ না ভারত চুক্তি করছে, ততক্ষণ তারা মূলধনী দ্রব্যে ঋণ শোধ করছেনা, যদিও ইতিমধ্যেই তারা ঐ ঋণের একাংশের পরিবর্তে খাদ্যশস্য দিয়েছে গলাকাটা দামে।

এই অবস্থায় মূলধনী দ্রব্য আমদানি করতে গেলে যে টাকা চাই, তা আসতে পারে রপ্তানি করে যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অল্প। সুতরাং তিক্ত সত্য হল এই যে ভারতের বৃহৎ বাণিজ্যের আমেরিকা ও বৃটেন ছাড়া ভরসা নেই।

রপ্তানি করে মূলধনী সামগ্রী সংগ্রহ করতে গেলে বছরের পর বছর কেটে যাবে আর তাই ঋণ শোধ না করার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-ভারতীয় বুর্জোয়াকে এমন অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ করতে চাইছে, যাতে সে বশংবদ হয়ে থাকে। বড় রপ্তানি বাণিজ্যের বাজার পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন অর্থনৈতিক জালে তাকে বেঁধে ফেলারও এ এক উপায় বটে।

অর্থনৈতিক সংকটের ফলে দেশের বাজার সঙ্কুচিত, ফলে বাইরের বাজার ছাড়া গতি

নেই, অথচ তার জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন বদান্যতার ওপরে। তাছাড়া এভাবে যে অর্থ আসবে, প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য, আর তাই ভারতীয় বুর্জোয়াদের সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদের কাছে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে দাঁড়াতে হবে, খাতায় কলমে সে যতই স্বাধীন হোক না কেন।

ভারতীয় বৃহৎ ব্যবসায়ীরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে জাপানের ছেড়ে যাওয়া এলাকায় বাজার দখলের উচ্চাভিলাষে মগ্ন আছে। ভারত সরকারের সদস্যরা এ নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জনগণকে শোষণ করা এদের রাজনীতির একটা বড় অঙ্গ। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা বজায় রেখে বিদেশি বাণিজ্য বাড়ানো এদের কাছে শিল্পায়নের একমাত্র পথ। এদেশের জাতীয় বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা ছাড়া কোনও কিছুই করতে অক্ষম।

এরা জানে যে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীতে অবিলম্বে বাজার দখল করতে না পারলে অন্যরা দখল নিয়ে নেবে, আর তাই সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য তাদের এত দরকার। এই প্রয়োজনের তাগিদে ঔপনিবেশিক বাজারে ভাগ নেবার বিনিময়ে তারা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে, বিদেশি পুঁজির সঙ্গে যৌথ ব্যবসা করতে এবং বিদেশি পুঁজিকে ঢালাও সুযোগ সুবিধা ও ছাড়া দিতে প্রস্তুত।

হাভানা বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বিদেশি পুঁজি দেশি পুঁজির সঙ্গে সম্পূর্ণ সমতা দাবি করছে এবং রাষ্ট্র কোনও কোম্পানি নিয়ে নিলে তারজন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ এবং কোনও জাতীয়করণ না করার প্রতিশ্রুতি চাইছে। ভারত সরকার অবশ্য বলেই দিয়েছে পাঁচ বছর কোনও জাতীয়করণ হবে না। তারা চাইছে শুল্কের ব্যাপারে এবং শ্রমিক ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষা।

এই সব শর্ত ভারতীয় বুর্জোয়ারা মেনে নিয়েছে। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত উদ্ধত ডঃ গ্রেডি ১৯৪৭, এপ্রিলে নিউইয়র্কে এবং অক্টোবরে ও নভেম্বরে কলকাতায় তাঁর বক্তৃতায় পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে ভারতীয় কর ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার, শুল্কের বাধা নিষেধ অপসারিত না হলে সহযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব নয় এবং ভারত সরকার যদি ঢালাও জাতীয়করণের পথ নেয় তবে সে বিদেশের ঋণ পাবে কিনা তা বিবেচনার বিষয়।

এইসব ঔদ্ধত্যের জবাবে ভারত সরকার দুর্বল কণ্ঠে প্রায় সবই মেনে নিয়েছে।

ডিসেম্বর, ১৯৪৭-এ পণ্ডিত নেহরু কলকাতায় অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'কোনও বিদেশি বাণিজ্যের জন্য বিশেষ সুবিধা আমরা দিতে পারিনা। তবে, আমি মনে করি ব্রিটিশ বা যে কোনও বিদেশি শিল্পের জন্য আমাদের দেশে প্রচুর ক্ষেত্র খোলা পড়ে আছে ...।

অর্থাৎ যদিও কোনও বিশেষ সুবিধা না দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তাহলেও ভারতবর্ষে আধিপত্য করার জন্য বিদেশি পুঁজির প্রতি এই খোলা আমন্ত্রণ প্রমাণ করছে যে ভারত সরকার বিদেশি সাহায্য ভিক্ষা করছে।

বাস্তবে, বিদেশি পুঁজির প্রতিটি দাবি সরকার মেনে নিচ্ছে। জানুয়ারি, ১৯৪৮-এ নয়াদিল্লীতে শিল্প সম্মেলনে সরকার দেশি শিল্পপতিদের গোপনে বলে দিয়েছে, যে পাঁচ বছরের

মধ্যে জাতীয়করণ হচ্ছে না। সম্মেলনে বিদেশি পুঁজি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্ধত হুমকি গুলি সম্বন্ধে নীরব থেকে কেবল বলা হয়েছে যে জাতীয় স্বার্থের দ্বারাই কেবল এদেশে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে এবং দেশি ও বিদেশি পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত যে কোনও চুক্তির ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

ফলত কোনও শিল্প বিপ্লব বা আমূল ভূমি সংস্কার ঘটল না, যেটা ঘটল তা হচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন ঔপনিবেশিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে সঞ্চিত লুটের পয়সায় কিছু দেশি শিল্প। দেশীয় বুর্জোয়ারা যেহেতু এতে খুশি, তাতেই প্রকাশ পাচ্ছে তাদের সঙ্কীর্ণ ও জাতীয়তাবিরোধী চরিত্র। সাধারণ মানুষের জন্য এর ফলে বজায় থেকে যাচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, নিম্ন বেতন, বেকারি, দারিদ্র ও অনাহার।

সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় বুর্জোয়ার এই গলাগলি দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কৃষি-বিপ্লব, জাতীয়করণ, শিল্পের প্রসার ও পরিকল্পিত ব্যবস্থার বিরোধী। এই সহযোগিতার ফলে পুরোনো ব্যবস্থা কায়েম থাকছে, এদেশের বুর্জোয়া শ্রেণি হয়ে থাকছে সাম্রাজ্যবাদের কণিষ্ঠ দোসর (Junior Partner)।

প্রশ্ন হতে পারে সাম্রাজ্যবাদ পুরোনো পদ্ধতি বর্জন করে দেশি বুর্জোয়াকে আদৌ কণিষ্ঠ দোসর বলেই বা মেনে নিচ্ছে কেন? কারণ, প্রথমত যুদ্ধ ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বদলে দিয়েছে। ভারতের কাছে তার বিপুল ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে কাঁচা মাল ভারত থেকে আমদানি করে এদেশে শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করার প্রথা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ভারতে নূতন ভাবে বিনিয়োগ করা আজ ব্রিটেনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি, যাতে সে আগেকার মত ভারতকে আবার ঋণের জালে জড়াতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনের ভয় যে ভারতীয় বুর্জোয়াদের তোয়াজ না করে আমেরিকা এসে ঢুকে পড়তে পারে, যা তার পক্ষে ভীতিকর।

তৃতীয়ত, ভারতীয় পুঁজি আর আগেকার মত দুর্বল নয়, এবং এর পেছনে এক শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন আছে, যাকে সে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।

তাছাড়া রাজনৈতিক ভাবে 'আইন শৃঙ্খলা' বজায় রাখতে গেলে বুর্জোয়ার সমর্থন দরকার। ধর্মঘট দমন করা বা ব্রিটিশদের নিরাপত্তা রক্ষা করা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না স্থানীয় বুর্জোয়া নেতারা সাহায্য করে।

এইসব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই তথাকথিত 'ক্ষমতা হস্তান্তর'। কণিষ্ঠ দোসর রূপে ক্ষমতা হাতে পেয়েই ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বপ্ন পূরণ হল। কিন্তু বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর অর্থ একটাই এবং তা হল— এখন থেকে বুর্জোয়ারা পুরোনো ব্যবস্থার পাহারাদার।

(৩) যুদ্ধ পরবর্তী অভ্যুত্থান এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় বুর্জোয়াদের নয়া কৌশল — নূতন শ্রেণি বিন্যাস

গভীর অর্থনৈতিক সংকট ও জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংগ্রামী মনোভাবকে বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে যুদ্ধ পরবর্তীকালে

বিপ্লবী লড়াই প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

শান্তিপূর্ণভাবে ভারত ত্যাগের ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকাশ্য ঘোষণার অন্তরালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়কেরা যদিও দমন পীড়নের এবং কংগ্রেস-লীগ দ্বন্দ্বের ও ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার উস্কানি দানের গোপন চক্রান্ত করছিলেন আর তার পাশাপাশি কংগ্রেস ও লীগের নেতারা করছিলেন আপসকামী, বিভেদমূলক ও সংগ্রাম-বিরোধী নীতির অনুসরণ— তা সত্ত্বেও ১৯৪৫-৪৬-এ শ্রমিক কর্মচারী কৃষক, ক্ষেতমজুর, এবং দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের বিপ্লবী আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল।

এই আন্দোলনের ধাক্কায় এমনকি সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ধর্মঘট ও হরতাল দেখা দিয়েছিল। সিকি শতকের বেশি কাল ধরে বুর্জোয়াদের পাহারাদারিতে থাকা গান্ধীজির অহিংস ভারত হঠাৎ হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের এ ছিল নব অধ্যায় এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল।

এই পরিস্থিতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণির মহান ভূমিকা। এমন কি জাতীয় কংগ্রেস যখন সরে দাঁড়িয়েছে (অনেক সময় তাদের তীব্র বিরোধীতার মধ্যেও), শ্রমিকশ্রেণির ধর্মঘটগুলি বিপ্লবকে সংহত করেছে এবং গৌরবময় আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছে। সেনাবাহিনী ও সরকারি কর্মচারীদের সমর্থনে সারা দেশব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘটের দিকে পরিস্থিতি এগোচ্ছিল।

বিপ্লবের এমন উত্তাল ঢেউ, গণরোষের সামনে সেনাবাহিনীর এমন হতচকিত অবস্থা, শ্রমিকশ্রেণির এমন ভয়ংকর তেজ ভারতে ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। সাম্রাজ্যবাদের শেষ মুহূর্ত এসে গিয়েছিল।

প্রতিটি জাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণি ধর্মঘটে নেমে পড়ছিলএবং তা ছড়িয়ে পড়ছিল সর্বস্তরের কর্মচারীদের মধ্যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি হাজার হাজার সৈন্যের ওপর জুলুম ও অত্যাচার এবং ফৌজের নেতাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে বিচার আরম্ভের বিরুদ্ধে সারা ভারত গর্জে উঠেছিল, ১৯৪৫ নভেম্বরে কলকাতায় ছাত্র ও শ্রমিকেরা শুরু করেছিল ধর্মঘট ও হরতাল, কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পতাকার তলে সংগঠিত মিছিলে চলেছিল গুলি, শহিদের রক্ত ঝরেছিল, ১৯৪৬-এ ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বন্দিদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, শুরু হয়ে যায় নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে বিদ্রোহ, নৌ বিদ্রোহীরাও জাহাজে উড়িয়ে দেন কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা, নৌ সৈন্যরা গ্রেপ্তার ও গুলি চালনার বিরুদ্ধে রীতিমত লড়াই করেন, ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গুলি চালাতে অস্বীকার করে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণি এই নৌ বিদ্রোহের সমর্থনে বোম্বাই, কলকাতা, ত্রিচিনোপল্লি, মাদ্রাজ ও মাদুরায় সর্বাত্মক ধমঘট ও হরতালে সামিল হয়।

বল্লভভাই প্যাটেল ও কংগ্রেস নেতৃত্বের নিষেধ সত্ত্বেও নৌ বিদ্রোহীদের সমর্থনে ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬-এ বোম্বাইয়ে সর্বাত্মক ধর্মঘট ও হরতাল সাম্রাজ্যবাদীদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল এবং গোরা সৈন্যদের সাঁজোয়া বাহিনী ও ট্যাঙ্কসহ অভিযানে দুই দিনে ২০০ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল।

এ সব কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। নৌ বিদ্রোহের এক সপ্তাহের মধ্যে জব্বলপুরে

৩০০ সিপাহি কাজ বন্ধ করে কংগ্রেস লীগ ও লাল পতাকা উড়িয়ে রাস্তায় মিছিল করে, ৮ মার্চ দিল্লীর শ্রমিক ও নাগরিকরা ধর্মঘট ও হরতাল করে আর টাউন হলে আগুণ লাগিয়ে দেয়, ১৮ মার্চ গোর্খা বাহিনী দেরাদুনে বিদ্রোহ করে, দিল্লী ও এলাহাবাদের পুলিশ অনশন ধর্মঘট শুরু করে, বিহারে ১০ হাজার পুলিশ ধর্মঘটে নামে।

সেনাবাহিনী, পুলিশ ও শ্রমিকশ্রেণির এই বিদ্রোহ দেশীয় রাজ্যের মানুষদেরও আলোড়িত করেছিল। কাশ্মীরে রাজপরিবারের বিরুদ্ধে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাবিতে প্রবল বিদ্রোহ ভারতের অন্যান্য অংশেও রাজতন্ত্রের অবসানের জন্য আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল।

সারা দেশের এই আন্দোলনগুলি কেবল আর অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ছিল না, ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীদের উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার আশু কর্মসূচি রূপায়ণের আহ্বান।

সাম্রাজ্যবাদ কেবল অর্থনৈতিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়েনি তার সামরিক ও পুলিশ বাহিনীও আর বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ত ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ দেওয়ালের লেখা পড়তে পারে এবং দেশের দুই বুর্জোয়া পার্টি কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দেয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদই কেবল ভয় পায়নি, ভয় পেয়েছিল বুর্জোয়া নেতৃত্বও, তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল যে আন্দোলন তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং শ্রমিকশ্রেণি ও শোষিত জনগণ চলে আসছে আন্দোলনের পুরোভাগে। তারা তাই আপস করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং জনগণের জঙ্গি আন্দোলনকে আক্রমণ করল। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতারা গণ অভ্যুত্থানের ভয়ে গুটিয়ে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসে তৎপর হল এবং কেবিনেট মিশন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

কেবিনেট মিশন যখন তার পরিকল্পনা নিয়ে এদেশে এল তখন কংগ্রেস নেতৃত্ব বেশি করে সংগ্রাম বিরোধী হয়ে পড়ল, তাদের মন্ত্রীসভা শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনগুলির ওপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল। রাজন্যবর্গকে খুশি করতে তারা কাশ্মীরের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং ব্রিটিশদের দেওয়া সূত্র অনুযায়ী গণতান্ত্রিক সংবিধানের পরিবর্তে রাজার প্রধান্যই সেখানে রেখে দেওয়া হল।

ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণির প্রতিনিধি রূপে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এমন একটা সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন যখন সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে তা উৎখাৎ করতে তৎপর। তাঁরা এই আন্দোলনকে কেবল পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্কীর্ণ স্বার্থে যত বেশি সম্ভব সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য ব্যবহার করলেন।

মুসলিম পুঁজিপতি ও ভুস্বামীদের প্রতিনিধি মুসলিম লীগ নেতৃত্ব বরাবরই বিভেদমূলক ও সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। লিগের 'মুসলিম স্বাধীনতা'র বুলি কতটা অন্তঃসারশূণ্য, নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে বোম্বাই-আন্দোলনে মুসলিম শ্রমিক ও নাগরিকদের যোগদানের প্রতি মিঃ জিন্নার বিরোধিতাতেই তা স্পষ্ট হয়েছে। স্পষ্টতই তিনি সাধারণ মানুষের স্বাধীন কর্মপদ্ধতিকে ভয় পান।

মুসলিম লীগ নেতৃত্ব সর্বদাই মুসলিম জনতাকে বিপ্লবী ঘূর্ণাবর্ত থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে। কখনও কখনও মুসলিমদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবকে সন্তুষ্ট করতে কিছু

আন্দোলন করলেও তারা প্রধানত পাকিস্তানের দাবি আদায়ের জন্য কংগ্রেসকে সন্ত্রস্ত ও বিব্রত করে রাখতেই তাদের মনোযোগকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। সুতরাং নিজেদের স্বার্থে মুক্তি আন্দোলনকে বেচে দেওয়ার জন্য কেবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিতে তাদের কোনও ইতস্তত করতে হয়নি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই পরিস্থিতিকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিপুণ ভাবে ব্যবহার করল। কংগ্রেসের বিপ্লব-ভীতি, ব্রিটেনের ওপর সাহায্যের জন্য নির্ভরতা ও লীগের সঙ্গে বিরোধ এবং দেশীয় রাজাদের স্বাধীন অস্তিত্বের আগ্রহ তাদেরকে মাউন্টব্যাটেন-পরিকল্পনা স্বেচ্ছায় মেনে নিতে বাধ্য করল। কংগ্রেসকে খুশি করার জন্য প্রথম কেবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ভারত বিভাগ ছিল না। কিন্তু কংগ্রেসি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়া মাত্র লীগের 'প্রত্যক্ষ লড়াই'য়ের ডাকে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। মুসলিম লীগের সদস্যরা পরে মন্ত্রী পরিষদে ঢুকে সেখানে কংগ্রেসের সরকার চালানোকে অসাধ্য করে তুলল। কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারতভাগ মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের আসল স্বরূপ

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি জাতীয় কংগ্রেস ও লীগের বিশ্বাসঘাতকতার শেষ পরিণাম মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ।

বুর্জোয়া নেতারা যদিও স্বাধীনতা অর্জনের বড়াই করেন, প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধার্ত মানুষের অগোচরে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় ভারত ভাগ করা হয়েছে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই যারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের বিরোধিতা করে এসেছে সব সময়েই, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের সাম্রাজ্যবাদী সমাধান তারা মেনে নিল। বীভৎস দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু নিধন এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ জিইয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সাধানের পথ এর দ্বারা খুলে গেল। ভারতবর্ষের জনগণের বৈপ্লবিক ঐক্যের বিরুদ্ধে এ হল বৃহত্তম আঘাত, এবং উভয় রাষ্ট্রের বুর্জোয়া শ্রেণিকে দুর্বল করে রাখার হাতিয়ারও বটে।

দ্বিতীয়ত, এই পরিকল্পনায় সাম্রাজ্যবাদের বরাবরের বন্ধু রাজন্যবর্গকে বহাল তবিয়তে রেখে দেওয়া হল এবং তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হল।

তৃতীয়ত, মূল অর্থনৈতিক কলকাঠি রয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদেরই হাতে। জনগণকে দমন করার জন্য এভাবে গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার, রাজন্যবর্গ ও বুর্জোয়ার এক নয়া জোট। জাতীয়তাবিরোধী, জনবিরোধী ও বিপ্লববিরোধী এই পরিকল্পনা বিপ্লবকে রক্তে ডুবিয়ে দিতে উদ্যোগী হল।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা জনসাধারণকে যেটা দিয়েছে তা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, জাল স্বাধীনতা। ভারত ব্রিটিশের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়নি, শুধু সেই পরাধীনতার রূপ বদলে গেছে। এখন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বুর্জোয়ারাও রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার হয়েছে, যাতে তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ছত্রভঙ্গ করতে ও রক্তে ডুবিয়ে দিতে পারে।

সৈন্য ও আমলার নিয়ন্ত্রণে থেকে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সেই পুরনো সেবকেরাই, তার

ওপর সাম্রাজ্যবাদী কতৃত্ব বজায় থাকবে ভারত সরকার কর্তৃক 'স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া' সামরিক প্রতিনিধি ও উপদেষ্টাবৃন্দের মারফৎ। সেই সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি ও খোলাখুলি সামরিক চুক্তির মাধ্যমে সরকারের রাশ থাকবে সাম্রাজ্যবাদের হাতেই।

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ যে সাম্রাজ্যবাদের প্রস্থান নয়, ১৫ আগস্টের পর সাম্প্রদায়িক গণহত্যা এবং গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিপর্যয় তার প্রমাণ। একে জাতীয় স্বাধীনতা বা প্রগতি বলে চালাবার চেষ্টা আসলে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও বুর্জোয়াদের দাসত্ব স্বীকারকে আড়াল করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাতীয় সরকার ও জনগণ

পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে 'জাতীয় সরকার' গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি সমস্যারও সমাধান করতে পারেনি, বরং তা দেশের মানুষের স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখে গেছে। এই সরকার ইঙ্গ-মার্কিন জোটে একটা সুবিধাজনক স্থান জুটিয়ে নেওয়ার জন্য কৌশল করছে।

জাতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দকে নিয়েই তৈরি করা গণপরিষদ এক স্বৈরতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করছেন। এতে শ্রমিকশ্রেণি তথা জনগণ বহুদিন বাদে বাদে একবার ভোট দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কিছুই পাবে না, এবং তাও কেবল প্রাদেশিক বিধান সভায়। এই সংবিধান হবে ভারতীয় ও ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের শোষণের স্বার্থে উচ্চশ্রেণির শাসনের হাতিয়ার।

এই সংবিধানে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে জেল, রাজ্যপালদের যদৃচ্ছা কাজ, আইনের বদলে অর্ডিন্যান্স, জরুরি অবস্থার নামে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকছে। প্রদেশগুলিতেই আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ থাকবে এবং তাতে রাজ্যপালের মনোনীত সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত হবেন। ভাষাগত জাতীয় গোষ্ঠীগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকার এতে স্বীকৃত হয়নি।

সংবিধানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কোনও ব্যবস্থা থাকছে না, থাকছে না আদিবাসী ও পশ্চাৎপদ জনজাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের কোনও উপায়।

কাজের অধিকার, জীবন যাপনের উপযুক্ত মজুরির অধিকার, সমান কাজের জন্য সমান মজুরি, বার্ধক্য-অসুস্থতা-বেকারি জনিত ভাতা ইত্যাদি কোনও কিছুই সংবিধানের মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃত হয়নি। শ্রমজীবী মানুষদের এইসব অধিকার দেওয়া না হলেও সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং জাতীয় প্রয়োজনে বিনা ক্ষতিপূরণে কোনও সম্পত্তি নেওয়া হবে না বলার ফলে দেশি বিদেশি যে কোনও শিল্পের জাতীয়করণ রুখে দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিকের কাজের বোঝা বাড়িয়ে, মজুরি বৃদ্ধি রুখে দিয়ে এবং শ্রমিক-সুরক্ষার কোনও ব্যবস্থা না করে শোষণের পূর্ণ সুযোগ এই সরকার বৃহৎ ব্যবসাকে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। 'মিশ্র অর্থনীতি'র নামে জনগণকে লুঠ করার এবং পুঁজিবাদী সংকটের যাবতীয় বোঝা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার পথ এরা নিয়েছে।

রাজন্যদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনকেও সরকার বানচাল করে দিচ্ছে! দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে তারা বাহবা পাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু রাজ্যগুলির মানুষ এই দেশীয় রাজাদের কাছে যা দাবি করছিল তাকে আড়াল করে রাখা হচ্ছে। নিজামের সঙ্গে

স্থিতাবস্থা বজায় রাখার যে চুক্তি সরকার করেছে, জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার তা শেষ উদাহরণ।

অন্যান্য বড় রাজ্যগুলিতে রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনকে ব্যবহার করে খানিকটা সাংবিধানিক সংস্কার করা হয়েছে বটে কিন্তু তাতে জনগণের হাতে কোনও ক্ষমতা যায়নি, বুর্জোয়ারা রাজন্যদের ছোট শরিক হতে পেরেছে মাত্র। বিনিময়ে তারা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও অত্যাচার অব্যাহত রাখতে ও গণ অসন্তোষকে পিষ্ট করতে রাজা মহারাজাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় রাজ্যসরকারগুলি জন নিরাপত্তার নামে সব রকমের আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমনপীড়নমূলক আইন তৈরি করেছে, শত শত শ্রমিক কৃষক ছাত্র বিনা বিচারে জেলে যাচ্ছে।

রাজ্য সরকারগুলি জমিদারি উচ্ছেদের নামে যে সব প্রতারণামূলক আইন তৈরি করছিল কেন্দ্রীয় সরকার তাকেও শ্লথ করে দিয়েছে। বিরাট ক্ষতিপূরণ দান এবং কৃষকদের হাতে জমি না দেওয়ার ফলে জমিদারি প্রথাই অন্য নামে বহাল থাকছে এবং বুর্জোয়া সরকারের ভিত্তি সুদৃঢ় হচ্ছে।

সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে সরকার সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করছে এবং এতে দুই সম্প্রদায়ে বিরোধ বাড়ছে। কোনও কোনও অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের পাইকারি ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কেবিনেট মন্ত্রী করা কিংবা আকালি দলের নেতা বলদেব সিং-কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পদ দেওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে সরকার সাম্প্রদায়িক বিভেদের অস্ত্রকে ব্যবহার করেছে। পাঞ্জাবের গণহত্যা ঘটেছে তার পরেই। পাতিয়ালা, ভরতপুর, নবনগরের যে সব রাজারা প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক উক্তি করেন, তাদের ও আর এস এসকে প্রশংসা করে এবং মুসলিম ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উত্তেজিত করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই সব শক্তিকে সাহস জুগিয়েছেন। তার ফল হয়েছে আর এস এস-এর এক প্রধান সংগঠকের হাতে গান্ধীজির মৃত্যু।

সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার এবং তাকে আড়াল করার জন্য নেতারা এতই তৎপর যে গান্ধীজির হত্যার পরও তা অব্যাহত আছে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের গ্রেপ্তার ও হত্যা করা হচ্ছে। গণরোষ প্রবল হওয়ার ফলেই কেবল কোথাও কোথাও অপরাধীদের লোক দেখানো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে বা আর এস এস-কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সবই করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে সরকারের গাঁটছড়া বাঁধার নীতিকে আড়াল করে সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। পণ্ডিত নেহরুর নিজের উক্তি অনুযায়ী কেবিনেটের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক মতভেদ নেই, কেবল মেজাজের ফারাক রয়েছে। জাতীয় সরকারের ওপর সাম্প্রদায়িক শক্তির কতটা প্রভাব রয়েছে, এতেই তা প্রমাণ হয়।

সরকারের আর্থিক নীতি

মূল ও প্রধান শিল্পগুলিকে জাতীয়করণের মাধ্যমে দেশের শিল্প বিকাশ না ঘটিয়ে সরকার রপ্তানি বাড়াতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। এর ফলে যে বিদেশি মুদ্রা পাওয়া যাবে, তা দিয়ে যন্ত্রপাতি

কেনা হবে। এতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সুবিধা, কারণ তাতে সস্তায় ভারতীয় পণ্য কেনা ও ভারতে তাদের যন্ত্রপাতি বিক্রয় সম্ভব হবে। দেশের স্বার্থের বিনিময়ে এ দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা এভাবেই ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থের সহায়ক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইঙ্গ-মার্কিন জোট এই সহায়কদের কাছ থেকে নানা সুবিধে দাবি করছে, যেমন— বিদেশি পুঁজির ও দেশি পুঁজির সমানাধিকার, শুল্ক বিলোপ, জাতীয়করণে নিষেধাজ্ঞা, ভারতীয় জনগণের শোষণের জন্য দেশি বিদেশি যৌথ উদ্যোগ, বিদেশি পুঁজির সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ইত্যাদি। এই সব দাবি খসড়া বাণিজ্য সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা নিয়ে এখন হাভানাতে আলোচনা চলছে। প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়ী ও সরকার ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজির কাছে ভারতের অর্থনীতিকে বন্ধক রেখে এদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই বিপন্ন করে তুলছে।

সরকারের বিদেশ নীতি

গোড়া থেকেই পণ্ডিত নেহরু এক তথাকথিত তৃতীয় জোট গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করেছেন, যা বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষা করবে, কারণ এতে ভারত গণতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে থেকে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে তার প্রবেশের পথ প্রশস্ত হবে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সরকারের তথাকথিত নিরপেক্ষ বিদেশনীতির মুখোশ খুলে দিয়েছে। কোরিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি প্রশ্নে ভারত গণতন্ত্র বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা অবস্থান নিয়েছে। চিনের বিরুদ্ধে মার্কিন নির্দেশিত কুওমিন্টাং আক্রমণ এবং ভিয়েতনামে ফরাসি উপনিবেশবাদী যুদ্ধ নিয়ে ভারত কোনও কথা বলছেনা। অন্য দিকে জাপান-শান্তি চুক্তির ব্যাপারে সে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। মার্কিন মদতে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ওলন্দাজ আক্রমণের ব্যাপারে মার্কিনদের ছক অনুসারে সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান অভিনন্দিত যে সমঝোতাটি হয়েছে ভারত তা সমর্থন করেছে। এই চুক্তি ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

স্যার মহারাজ সিংয়ের মত ভারতীয় কূটনীতিকরা সোভিয়েত বিরোধী কুৎসা চালাচ্ছেন। ভারতের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় একটি সোভিয়েত বিরোধী শিবির গড়ে তোলার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রকাশ্যে ইঙ্গিত দিচ্ছে। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ বেভিন গত ২২ জানুয়ারি হাউস অফ কমন্স্-এ এই মর্মে পরিকল্পনা পেশ করেছেন।

ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল নিয়ে ব্রিটিশ সহযোগিতায় একটি 'আত্মরক্ষা মূলক' শিবির গড়ে তোলার উদ্যোগও এই সঙ্গে চলছে বলে খবর আসছে। দাবি করা হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 'কম্যুনিজমের প্রসার ঠেকানো'; যার অর্থ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখা এবং এই দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে নিয়ে আসা। ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করছে যাতে ঐসব দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে আমাদের দেশের জনগণ আকৃষ্ট না হয় এবং উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে তারাও ঐসব দেশের বাজারে খানিকটা পা রাখতে পারে।

ব্রিটেন থেকে সামরিক মিশন আসার কথাও শোনা যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য ব্রিটিশ কমন ওয়েলথের চৌহদ্দির বাইরে কোনও স্বাধীন নীতি যেন ভারত বা পাকিস্তান না নিতে পারে।

বুর্জোয়াদের নূতন ভূমিকা

গণ সংগ্রামের ঢেউয়ের মাথায় চড়ে যে সরকার এল, তাদের এই নীতি কেন? এই নীতি এ জন্য যে পণ্ডিত নেহরু আর সর্দার প্যাটেল সহ তাঁরা সকলেই জাতীয় বুর্জোয়ার শ্রেণি স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৫ আগস্টের তথাকথিত ক্ষমতা হস্তান্তর— আসলে যা ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারা— জনগণের বিপরীতে জাতীয় বুর্জোয়াকে এক সম্পূর্ণ নূতন অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

আগে জাতীয় বুর্জোয়ার কোনও ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না, তাই জনগণের ওপর তাদের নির্ভর করতে হত। যুদ্ধ পরবর্তী বিপুল গণ আন্দোলনের চাপে সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে রক্ষার জন্য জাতীয় বুর্জোয়াকে সরকার পরিচালনার অধিকার দিয়ে দিল, কিন্তু এই নূতন রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল রইল। এই রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক। জাতীয় বুর্জোয়ার হাতে ক্ষমতা আছে বটে, তবে তা সাম্রাজ্যবাদের গৌণ সহকারী হিসেবে। এটাই তাদের নূতন নীতির রহস্য। তারা আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীর ভূমিকায় নেই। এখন তারা রাষ্ট্রক্ষমতা ও দেশের জনগণের ওপর তাদের অধিকারকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দর কষাকষিতে সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদকে নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে চলেছে।

অতএব, এর পর থেকে ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে যেতে হবে বুর্জোয়া সরকার ও তার নীতির এবং কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বের সরাসরি বিরোধিতা করে।

দাঙ্গার রাজনীতির পিছনে আসল খেলা

সরকারে জনপ্রিয় নেতারা থাকার ফলে তাদের শ্রেণি চরিত্র মানুষের চোখের আড়াল হয়ে আছে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের সামন্ততান্ত্রিক অনুচরদের লাগানো দাঙ্গা আসলে দেশের বিপ্লবী সরকারকে অপদস্থ করার অপচেষ্টা এবং তাই আমাদের এই সরকারকে নিঃশর্তে সমর্থন করা উচিত।

পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে লক্ষ লক্ষ নির্দোষ হিন্দু মুসলিম ও শিখের নিধন ও বিতাড়ন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের সামন্ত সহচরদের প্রতিবিপ্লবী কৌশল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্তে ভাসিয়ে তছনছ করে দেওয়া। তাদের প্রধান আক্রমণ ছিল ধর্মঘট, সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিপ্লবের মাধ্যমে যারা অগ্রসর হতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে। এদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিপ্লবী অসন্তোষকে সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত করা, সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে একত্র করে গণআন্দোলনের ওপর আক্রমণ ঘণীভূত করা এবং বুর্জোয়াশ্রেণিকে আরও দক্ষিণে ঠেলে দেওয়া।

এটা করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে সরকারের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদত দেওয়া, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করা, রাজা মহারাজদের স্বৈরাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করা, সরদার প্যাটেলের সাম্প্রদায়িক নীতিকে শক্তিশালী করা এবং পণ্ডিত নেহরুর অসঙ্গতিপূর্ণ দোদুল্যমান নীতিকে সামাল দেওয়া।

সন্দেহ নেই যে এই গভীর ষড়যন্ত্র বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে অনেকটা সমর্থ হয়েছে এবং জনগণ

ও রাজনৈতিক দলগুলি ভয়ে আসল কর্তব্য ভুলে সরকারের পিছনে দাঁড়াবার প্রবণতা বোধ করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলরা এটাই চায় কারণ, তাহলেই দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে একত্র করে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার উদ্যোগ বানচাল হয়ে যাবে।

ব্যাপক দাঙ্গা আজ কিভাবে সম্ভব হচ্ছে? জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি জাতীয়তা বিরোধী সমঝোতার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের শক্তিকে দুর্বল ও প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিশালী করে তুলেছে বলেই তা ঘটছে, অন্য কোনও কারণে নয়।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও বুর্জোয়াদের আপসের প্রত্যক্ষ ফল এই দাঙ্গা। সাম্রাজ্যবাদীরা চার ভাবে দাঙ্গার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে : (১) দেশভাগ করে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, (২) সীমানা চিহ্নিতকরণ এমন ভাবে করে যাতে পারস্পরিক তিক্ততা চরমে ওঠে, (৩) দেশীয় রাজ্যগুলিকে স্বাধীন নীতি নেওয়ার অধিকার দিয়ে যাতে তারা ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সঙ্গে দরকষাকষি করে একেকে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে পারে, (৪) অধিকাংশ সেনা প্রধান ও আমলাদের মনকে সাম্প্রদায়িকতায় বিষিয়ে দিয়ে।

সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণিকে হাতের মুঠোয় আনার এবং সাধারণ মানুষকে ওপরের তলার লোকদের অনুগত করার জন্য এসব খেলা খেলছে। তারা চাইছে জনগণের ঐক্য ও যাবতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিতে। আর. এস. এস ও হিন্দু-মুসলিম-শিখ্ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মত ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের অনুচর হিসেবে কাজ করছে। সামন্ত ও জমিদারেরা এদের পুরোভাগে আছে। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণি এবং কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের কিছু অংশ এই দাঙ্গায় নেতৃত্বকারী ভূমিকায় রয়েছে, যদিও তাদের অন্য কিছু অংশ দাঙ্গার বিরোধিতাও করেছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তি করতে গিয়ে বুর্জোয়াদের একাংশ সংখ্যালঘু নিধনের নীতি নিয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের শাসকরা একে অপরকে কোনঠাসা করার জন্য নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘুদের হাজারে হাজারে হত্যা করছে এবং এতে ব্রিটিশ স্বার্থের চমৎকার পরিপোষণ হয়েছে। বুর্জোয়া নেতৃত্বের একাংশ সাম্প্রদায়িক গুণ্ডা বাহিনী পোষে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে। পুলিশ, হোমগার্ড ও সৈন্যদলে পর্যন্ত এদের ওরা ঢোকায়। অন্য আর এক দল নিজেদের আপসের মনোভাবে সৃষ্ট দাঙ্গা যখন সত্যি ঘটে, তখন তাকে ভয় পায় এবং সেটা যাতে চূড়ান্ত পর্যায়ে না যায় সে জন্য ক্ষতে প্রলেপ লাগায়। কিন্তু বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদীদের অনুচরবৃত্তি ত্যাগ না করলে দাঙ্গা বারবার ঘটতেই থাকবে।

যতদিন পূর্ণ গণতন্ত্র এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণের অবসান না হচ্ছে, ততদিন শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই নয় প্রাদেশিক ও জাতপাতের সংঘর্ষও ঘটতেই থাকবে।

আপসকারী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মুখোশ খোল

আপস প্রতিবিপ্লবের জন্ম দেয় এবং ভারতবর্ষেও সেটাই ঘটছে। সকল জাতীয় নেতাদের হাত আপসে কলঙ্কিত এবং তাই তারা সকলেই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বাড়বাড়ন্তের জন্য সম পরিমাণে দায়ি। অতএব, বিভিন্ন জাতীয় নেতাদের, যেমন— পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার

প্যাটেলের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনও পার্থক্য টানা অনুচিত। উভয়েই আপসের দুষ্ট চক্রে চলাফেরা করেন। শেষ পর্যন্ত, মুখে যতই দাঙ্গা বিরোধিতার কথা বলুন, সর্দার প্যাটেলের খপ্পরে পড়া ছাড়া পণ্ডিত নেহরুর কোনও গতি নেই।

আমাদের পার্টি দাঙ্গার বিরোধিতায় যথা শক্তি প্রয়োগ করবে এবং দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য সরকারি পদক্ষেপগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে, যদিও আমাদের জাতীয় সরকার দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়তে পারে বা লড়বে, এমন মোহ আমাদের পার্টির নেই। এই কাজ করতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরুর মত লোকেরা মুখে যা বলেন, তার ব্যবহার আমরা করব, যাতে প্যাটেলদের মত মানুষদের মুখোশ আমরা সহজে খুলে ফেলতে পারি।

প্যাটেল ও নেহরু

কেবল দাঙ্গা নয়, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক নীতির প্রশ্নেও নেহরু সম্বন্ধে মোহ আছে। নেহরুকে গণতান্ত্রিক শক্তির একজন নেতা গোছের বলে মনে করা হয় এবং এই বিভ্রমের সৃষ্টি হয় যে প্যাটেলের বিরুদ্ধে নেহরুর হাতকে শক্তিশালী করা গেলে জাতীয় সরকার জনগণের ইচ্ছার হাতিয়ারে পরিণত হবে। এই ধারণা মার্ক্সবাদ-বিরোধী এবং তা জনগণকে বুর্জোয়ার লেজুড়ে পরিণত করে। মনে রাখতে হবে যে নেহরু ও প্যাটেল উভয়েই বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, যারা বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের দোসর। সকল ব্যাপারেই নেহরু প্যাটেলেরই নীতি অনুসরণ করছেন। অনেক সময় তিনি প্যাটেলকেও ছাড়িয়ে যান। শ্রমিকশ্রেণির ধর্মঘটকে তিনি পেছন থেকে ছুরিকাঘাত বলে বর্ণনা করেছেন।

প্যাটেল ও নেহরুর মধ্যে যত বিরোধই থাক, বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ তোষণের নীতির চৌহদ্দির মধ্যেই তার মীমাংসা হয়ে যেতে বাধ্য। তাই নেহরু ও প্যাটেলের মধ্যে তফাত খুঁজে বেড়ানোর প্রয়াস মার্ক্সবাদ-বিরোধী। জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত এই সরকার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বঘোষিত শত্রু। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ আমাদের সর্বদাই শিক্ষা দিয়েছে যে ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের সময় বুর্জোয়ারা কখনোই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারে না, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণিই পারে এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে।

জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণ

মনে রাখতে হবে যে দেশের অধিকাংশ মানুষ এই সরকারের নেতাদেরই এখনো নেতা বলে মানে এবং এই সরকারকে জাতীয় সরকার বলে মনে করে। দেশকে যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বেচে দেওয়া হচ্ছে তা না বুঝে তারা এই সরকারকে একটি স্বাধীন সরকার ভেবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে। দ্রুত মোহভঙ্গ হলেও জনসাধারণ এখনও নেহরুর প্রতি ও জাতীয় সরকারের প্রতি পুরনো বিশ্বাসকে আঁকড়ে আছে।

জাতীয় সরকারের সমালোচনা করার সময় এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে। সুতরাং সরকারের নীতির সমালোচনার সময় নির্দিষ্ট উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে সরকারের বিশ্বাসঘাতক চরিত্রটাকে সাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই বিষয়টি বুঝতে পারে। বর্তমানে দ্রুত অর্থনৈতিক অবনতি ঘটে চলার ফলে অতীতের

চেয়ে এ কাজ সহজতর হয়েছে।

গণতান্ত্রিক লক্ষ্য পূরণের লড়াইয়ে জনগণকে সামিল করতে গেলে শ্রমিকশ্রেণিকে বুর্জোয়া নেতৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে এসে এক নূতন ধরনের জাতীয় ঐক্যভিত্তিক আন্দোলন শুরু করতে হবে।

(৪) ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট — পুঁজিবাদী পথ ও জনগণের মুক্তির উপায়

ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সংকটের প্রধান দিকগুলি হল :

(ক) সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সর্ম্পকের কারণে কৃষি উৎপাদন হ্রাস ও ক্ষুদ্র শিল্প ধ্বংস,

(খ) যুদ্ধের সময় থেকেই অনুকূল পরিবেশ সত্ত্বেও শিল্প উৎপাদন হ্রাস,

(গ) যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে ভারতের ওপর চাপানো ঔপনিবেশিক সংকটের বোঝার ক্রমবৃদ্ধি, এবং

(ঘ) ফলত ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি এবং শ্রমিক কৃষকের জীবনযাত্রার মানে ক্রমাবনতি ও চরম দারিদ্র্য।

যুদ্ধের পরেও সংকট বেড়েই চলেছে কারণ শিল্প ও কৃষিতে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ধনিকশ্রেণি, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তশ্রেণি শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্তের স্বার্থকে বলি দিয়ে নিজেদের মুনাফা, অধিকার ও স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখছে। ফলে অর্থনৈতিক লড়াই তীব্রতর হচ্ছে এবং তা পরিণত হচ্ছে উচ্চতর সংগ্রামে— রাজনৈতিক লড়াইয়ে।

সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভিত্তিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতি যুদ্ধের অনেক আগেই বিকল হয়ে পড়েছিল। ১৯২৯ সালের বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের সময় কৃষি বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এই প্রয়োজন আরও বাড়ে। পুরোনো জমিদারি প্রথা অর্থনীতির এতটাই শেকলে পরিণত হয়েছিল যে এমনকি ভূমি রাজস্ব বিষয়ে রয়্যাল কমিশন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিলের সুপারিশ করে। তারা অবশ্য জমিদারদের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলে।

কৃষকদের ১৯৩০-৪০ এর এক দশক ব্যাপী যে লড়াই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বারবার ফেটে পড়েছিল তাতে স্পষ্ট হয়েছিল যে সমাজ চায় বিনা ক্ষতিপূরণে যাবতীয় জমিদারি প্রথার অবসান এবং কৃষকের মধ্যে জমির পুনর্বন্টন।

এর ওপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধকালীন অর্থনীতি গ্রামীণ অর্থনীতিকেই তছনছ করে দিল। ১৯৪৩ এ বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং বিহার, উড়িষ্যা, মালাবার ও অন্ধ্রপ্রদেশের দুর্ভিক্ষগুলি দেখিয়ে দিচ্ছিল যে ভূমি ব্যবস্থা দ্রুত ধ্বসে পড়ছে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অর্থনীতি কৃষকদের যে সর্বনাশ ডেকে এনেছিল, তার সুযোগে জামিদারেরা দু হাতে তাদের জমি লুটে নিয়েছে। ক্ষুদ্র কৃষকদের জমি চলে গেছে জমিদারদের হাতে। এরাই হয়েছে খাদ্যের মজুতদার আর খাদ্যশস্যের চোরাকারবারী। ধনী কৃষকরাও ক্ষুদ্র কৃষকের জমি দখল করে ও উদ্বৃত্ত খাদ্যমজুত বেচে আরও ধনী হয়েছে। জমিদার, ধনী কৃষক, ব্যাপারি ও দালাল মিলে গড়ে উঠেছে গ্রামীণ বণিকদের কালোবাজারি চক্র।

এসবের ফলে মাঝারি কৃষকের সংখ্যা কমে গরিব চাষী ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়ে গেছে অভূতপূর্ব বেগে। কিছু মধ্যচাষী ধনী চাষীর দল ভারি করেছে। মধ্যচাষীর বিলোপ বর্তমান সময়ের একটি বিশেষ লক্ষণ। ক্ষুদ্র জোতের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে।

গ্রামের মধ্য ও গরিব চাষী ও অন্যান্য প্রায় সর্বহারাদের ওপর বোঝার পরিমাণ ব্রিটেনের নেওয়া স্টার্লিং উদ্বৃত্ত ১.৬০০ কোটি টাকার চেয়ে বেশি, কারণ এর সাথে যুক্ত হয়েছে কালোবাজারি ও ফাটকাবাজদের শুষে নেওয়া অর্থ' যুদ্ধের শেষে তাই গ্রামে শ্রেণিভেদ ও শ্রেণিসংগ্রাম অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৪৬-এর প্রবল কৃষক অভ্যুত্থানগুলি তার উদাহরণ।

নূতন ধনীর দল, মজুতদার ও জমি দখলকারীরা যেহেতু পরগাছা শ্রেণি, তাই তারা কৃষির সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। কৃষির কাজ করে চলেছে একমাত্র গরিব চাষীরা। ফলে কৃষি উৎপাদন দ্রুত কমছে ও দুর্ভিক্ষ হয়ে উঠেছে সাধারণ ঘটনা।

কৃষকদের লড়াইয়ের পাশাপাশি এর ফলে পুঁজিপতিদের তৈরি সামগ্রীর বাজার সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছে, কারণ কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমে কমছে। পুঁজির বিনিয়োগ বাড়ার সঙ্গে বাজারও সঙ্কীর্ণ হচ্ছে অথচ সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপতিরা কোটি কোটি মানুষের বাজারের ভরসায় ছিল। বুর্জোয়ারা যে নিজেদের বাজার বাড়াবার স্বার্থে কৃষকদের কুটির শিল্প ধ্বংস করে দিয়ে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং ফলে আখেরে নিজেদেরই ক্ষতি করে ও নূতন গড়ে ওঠা কারখানাগুলির বাজার নষ্ট করে— এঙ্গেল্‌স একটি পত্রে তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। — Marx Engels Correspondence - NBA, Calcutta, P439.

ভারতবর্ষে কৃষকের শুধু শিল্প ধ্বংস হয়নি, তার জোতজমিও গেছে। ফলে বাজার সঙ্কীর্ণ হয়েছে আরও। এই সমস্ত বিরোধের ফলে ভারতীয় কৃষি ধ্বংসের মুখে এসে পড়েছে।

বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের সংকটের আঘাত এসে পড়বে শ্রমজীবী কৃষকদেরই ওপরে। কৃষিপণ্যের দাম শিল্পজাত পণ্যের চাইতে দ্রুত হারে কমবে এবং ফলে শোষণ আরও তীব্র হবে। এর পরিণতিতে বিপুল শ্রেণি-শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থার পতন ঘটাবে। সব ধরনের জমিদারির অবলুপ্তির এবং কৃষকের হাতে জমির দাবি হবে সংগ্রামী কৃষকদের রণ নির্ঘোষ।

ভারতবর্ষের কৃষি অঞ্চল এক বিশাল আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে। বাংলার মহান তেভাগা আন্দোলন, নিজামের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানার লড়াই, বোম্বাইয়ের আদিবাসী ওয়ার্লিদের সংগ্রাম, বিহারের বিখ্যাত কৃষক আন্দোলন এবং মালাবার ও তামিলনাড়ুর কৃষকদের লড়াইয়ে কৃষকশ্রেণির বেপরোয়া মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

এই বিচ্ছিন্ন সংগ্রামগুলির দাবি একটাই : সমস্ত প্রকার জমিদারির অবসান ও কৃষকের হাতে জমি চাই। সব পথ এখন চলেছে কৃষি বিপ্লবের দিকে।

শিল্প ও যুদ্ধ

সাম্রাজ্যবাদ প্রতিযোগিতার ভয়ে তাদের বরাবরের নীতি অনুযায়ী যুদ্ধের সময় এদেশে কোনও শিল্প গড়ার অনুমতি দেয়নি। আমেরিকার উৎপাদনের উপকরণ বেড়েছে শতকরা ৫০ ভাগ আর ব্রিটেনের বেড়েছে ২৫ ভাগ, কিন্তু ভারতের কিছুই বাড়েনি।

সাম্রাজ্যবাদ ভারতে পুরোনো যন্ত্রপাতি বদলে নূতন যন্ত্রপাতি আমদানি করতে দেয়নি।

কারখানায় শিফ্‌ট বাড়িয়ে যুদ্ধের সময় উৎপাদন বাড়ানো হয়েছিল। ফলে কর্মক্ষেত্রে নূতন সুযোগ ভারতে প্রায় কিছুই হয়নি।

সঙ্কীর্ণ গ্রামীণ বাজারের ফলে যুদ্ধের সময়ই শিল্পে উৎপাদন কমে যেতে শুরু করেছিল, যুদ্ধ না থাকলে উৎপাদন মুখ থুবড়ে পড়ত। বিশাল পরিমাণে সরকারি অর্ডার যোগান দিয়ে ভারতীয় শিল্প কোনও রকমে টিকে থেকেছে। কাপড়, সিমেন্ট ইত্যাদির ৬০ থেকে ৯০ ভাগ কিনে নিয়েছে সামরিক বাহিনী।

এইভাবে উৎপাদনের অধিকাংশই সরকারি অর্ডার সরবরাহে লেগে যাওয়ায় কারখানার মালিকদের লাভ হয়েছে দু রকম। এক, পণ্যের বিক্রয়ে কোনও অনিশ্চয়তা ছিল না এবং দুই, সরকারি অর্ডার সামলাতে গিয়ে সাধারণের ভোগ্যপণ্যের যে ঘাটতি তৈরি হয়েছিল, তাতে ঐ সব পণ্যের দাম হয়ে গিয়েছিল আকাশ ছোঁয়া, এবং মুনাফার পাহাড় তৈরি হচ্ছিল। কাপড়, কয়লা, লোহা, পাট প্রভৃতির দাম ১৯৩৯-৪০ থেকে ১৯৪৪-৪৫-এর মধ্যে দ্বিগুণ তিনগুণ পর্যন্ত বেড়েছিল। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে এসে ঠেকলেও বাজার একমাত্র সরকারি অর্ডারের জোরে এরকম চাঙ্গা হয়ে উঠতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়ত যুদ্ধের সময় ফুলে ফেঁপে যারা বড়লোক হয়ে উঠছিল, তারা সংখ্যায় অল্প হলেও, তাদের হাতে যথেষ্ট টাকা থাকায় বাজারের এই তেজি ভাবটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল।

তখনকার মত বাজারের সমস্যার সমাধান হলেও যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় এবং সরকারি অর্ডার বন্ধ হওয়ায় শিল্পকে আবার সেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

প্রথমত, নূতন কারখানা গড়ে উঠছে না, অর্থাৎ বাজার সঙ্কুচিত। সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি দেবেনা, যতক্ষণ না ভারত তাদের শর্ত মেনে চুক্তি করে।

দ্বিতীয়ত, দেশের মানুষ দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। শিল্পের উৎপাদিত পণ্য কেনার ক্ষমতাও তাদের নেই। কারখানার পণ্য এখন আর যুদ্ধের সময়ের মত কেবল বড়লোক ও উচ্চ মধ্যবিত্তের কাছে বেচলেই হবেনা, কারণ এখন আর যুদ্ধের মালের চাহিদা নেই। পুঁজিপতিরা বিশাল পুঁজি তৈরি করতে গিয়ে বাজারকেই ধ্বংস করে দিয়েছে, এখন তাদের এই সমস্যা সামলাতে হবে।

অন্যদিকে যুদ্ধ থেকে যাওয়ায় বাজারের সংকট আরও বেড়েছে। যুদ্ধের জন্য যে সব সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল, যুদ্ধের ও প্রতিরক্ষার সৈনিকরা, অস্ত্র তৈরির কারখানার লোকেরা, সরকারি পরিবহন, রেল ও ডকের শ্রমিকরা— হাজারে হাজারে কাজ হারাচ্ছেন এবং তার ফলে বাজারের সংকট বাড়ছে। ইতিমধ্যেই জানা গেছে যে ৫ লক্ষ সৈনিককে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে ছাঁটাই হচ্ছে কয়েক হাজার কর্মচারী।

এর ফলে পণ্যের বিক্রয় কমবে, অবিক্রীত মালের মজুত বাড়বে, উৎপাদন কমবে এবং কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই ও মজুরি হ্রাস ঘটবে। আর এর ফলে বাজার সঙ্কুচিত হবে আরও।

ইতিমধ্যেই উৎপাদন কমেছে। কারখানা বন্ধ থাকার সংখ্যাও বেড়ে গেছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে। ১৯৪৫-৪৬ ও '৪৬-৪৭-এর ধর্মঘটের জোয়ারের কারণ ছিল শ্রমিকদের দাবি মেটাতে পুঁজিপতিদের অসম্মতি। সঙ্কুচিত বাজারে নিজেদের মুনাফাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মালিকরা কোপ মেরেছে শ্রমিকের মজুরি ও আয়ে, এবং তারই ফলে ঘটেছে এই ধর্মঘটগুলি।

মানুষ এমন সঙ্গতিহীন হয়ে পড়েছে যে বর্তমানের চড়া দামে কিছু কেনার মত অর্থ তাদের নেই। এর স্বাভাবিক পরিণতি হওয়ার কথা অতি-উৎপাদন অর্থাৎ অবিক্রীত পণ্য ও শ্রমিক ছাঁটাই। কিন্তু চিত্রটা দেখাচ্ছে এমন যেন বাজারে যথেষ্ট মাল নেই, যদিও লোকের কেনার ক্ষমতা আছে যথেষ্ট।

বস্তুতপক্ষে বর্তমান পণ্যের ঘাটতি দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত দারিদ্র্যের উল্টো পিঠ। মূল্যবৃদ্ধি যুদ্ধের সময় ভারতের মানুষের কোটি কোটি টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। এর ফলে জাতীয় আয়ের পুনর্বিন্যাস হয়েছে, ধনী আরও ধনী এবং গরিব আরও গরিব হয়েছে। পুঁজিপতি, বড় বড় সরকারি কর্মচারী ও উচ্চ মধ্যবিত্তরা এতে লাভবান হয়েছে, অজস্র সাধারণ মানুষ হয়েছে বঞ্চিত।

এই প্রথম শ্রেণির মানুষেরাই বাজারে ভিড় জমাচ্ছে, আর উঁচু দামে জিনিস কিনছে এবং তার ফলে একটা সমৃদ্ধির বিভ্রম তৈরি হচ্ছে। খোলা বাজার ও কালোবাজারের প্রধান ক্রেতা এরাই। দেশের বিপুল অধিকাংশ মানুষের কোনও ক্রয় ক্ষমতা নেই।

ব্যবসাদার ও কারবারিরা ফাটকা ও কালোবাজারের জন্য প্রচুর পরিমাণে কেনে, কারণ টাকার দাম কমছে, বাড়ছে জিনিসের দাম। কালোবাজারের দর এত লোভনীয় যে অল্প বেচেও লাভ থাকে। সকলেই জানে যে কালোবাজারে জিনিসের কোনও অভাব নেই, তবুও কালোবাজার ফুলে ফেঁপে উঠছে।

কিন্তু কালোবাজারের এই দাম যদি চলতে থাকে, তবে একটা সময় আসবেই যখন আর চড়া দামে এই মাল বেচা যাবে না, কারণ ঘটনা হল এই যে অভাবটা কৃত্রিম আর বাজারে প্রচুর জিনিস আছে, যা কেনার লোক নেই।

সরকারের কন্ট্রোল তুলে দেওয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতেই প্রমাণ যে বুর্জোয়ারা বুঝে গেছে কালোবাজারের দামে মাল বেশি বেচা যাবে না। কনট্রোল তোলার উদ্দেশ্য হল বাজারকে বিস্তৃততর করা। এতে কালোবাজারের তুলনায় দাম কমবে কিন্তু কনট্রোলের তুলনায় বাড়বে। এর দ্বারা সঙ্গতিপন্ন লোকদের আরও বেশি অংশের কাছে পৌঁছনো যাবে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আগেকার মতই আওতার বাইরে থেকে যাবে।

সুতরাং পুঁজিপতিদের মুনাফার লোভ প্রতি পদক্ষেপে সংকটকে ঘণীভূত করছে। তাদের এই লোভ শ্রমিককে বিক্ষুব্ধ করছে, পণ্য থেকে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে এবং লাভ খুঁজতে গিয়ে উৎপাদনকেই তা বিপর্যস্ত করছে। এই সংকট সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন, পুঁজিপতিদের লোভ এবং ভারতীয় কৃষির ঔপনিবেশিক চরিত্রের ফল।

পুঁজিপতিরা ও জাতীয় সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চৌহদ্দির মধ্যেই এই সংকটের সমাধান করতে চান। সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির ওপরে হাত দিতে, পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নির্মূল করতে এরা অনিচ্ছুক। কারণ তাঁরা জনগণকে ও তাঁদের উদ্যোগকে ভয় পান। কারণ তাঁরা ভাবছেন তাঁদের সম্পত্তির অধিকারও এতে বিপন্ন হবে বিশেষত যখন শিল্পের জাতীয়করণের প্রস্তাবের দাবি ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। অথচ এই আমূল পরিবর্তন ছাড়া মানুষের দারিদ্র্যমুক্তির কোনও পথ নেই।

সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ কৃষককে স্বচ্ছল করবে, তারা হবে ভালো ক্রেতা এবং বাজার এতে বাড়বে। কিন্তু, এদের ভয় জনগণ তাহলে আরও এগিয়ে যাবে, পুরো জাতীয় অর্থনীতিকেই

কব্জা করে নেবে এবং বুর্জোয়াদের মসনদ থেকে হঠিয়ে দেবে। ফলে, বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক - দুভাবেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করছে।

সরকারের আনা তথাকথিত ভূমি বিলগুলি জমিদারদের সঙ্গে আপসের প্রমাণ। এই বিলগুলি কোনও না কোনও আকারে জমিদারি প্রথাকে অটুট রেখে দিচ্ছে। কংগ্রেস মন্ত্রীরা জমির ক্ষতিপূরণের ওপর জোর দিচ্ছেন, কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার কোনও প্রসঙ্গ নেই, ধনী কৃষকদের বড় জোর কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা আছে। অর্থাৎ কৃষক সাধারণের দারিদ্র্য যথাপূর্বম্ থেকে আছে, আর তাই বাজারও থাকছে সঙ্কুচিত।

বাজারের সামান্য প্রসার ঘটছে ওপরতলার কৃষকদের মধ্যে। এরা গরিব চাষীদের জমি কেড়ে নেওয়ার নূতন সুযোগ পাবে। ভূস্বামীদের অধিকারে যদি খানিকটা হাত দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সেটা ঠিক তাদের নিচের তলার মানুষদের সুবিধার জন্য। এতে বাজারের পরিসর কিঞ্চিৎ বাড়বে বটে, কিন্তু বিপুল সংখ্যক কৃষক এর বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

জাতীয় সরকার বাকিটা সমাধা করতে চায় সেচ, সার, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রসার ও আরও বেশি জমি চাষের আওতায় এনে, যা সেই পুরনো সাম্রাজ্যবাদী ধরন। এরা প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে না বদলেই কৃষি ব্যবস্থায় যেন মন্ত্রবলে পরিবর্তন আনতে চান।

জাতীয় বুর্জোয়া তাই তার সম্ভাব্য বিশাল বাজার ব্যবহারে ও দেশের দ্রুত শিল্পায়নে অক্ষম, এবং সে কারণেই দেশের ঔপনিবেশিক দশার অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত ধনতান্ত্রিক পথে শিল্পায়ন এ দেশে হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই। প্রতিপদে ধনতান্ত্রিক পথে উন্নয়নের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিপতিদের গলাগলির বিরোধ বাধে।

যুদ্ধপরবর্তী সংকটে পুঁজিপতি ও জাতীয় সরকারের অবদমন ও বল প্রয়োগের পথ গ্রহণ করা ছাড়া মুক্তির আর কোনও পরিকল্পনা নেই। দেশের অধিকাংশ মানুষ, গ্রামের কোটি কোটি অধিবাসী, এদের কাছে পুরনো সাম্রাজ্যবাদী, পশ্চাৎপদ, প্রাক্ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই আশা করতে পারেনা। শিল্পের উন্নতি দূরের কথা, এ অবস্থায়, বর্তমান উৎপাদনের হার বজায় রাখাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া শ্রেণি ও জাতীয় সরকার কিভাবে শিল্পক্ষেত্রে সংকটের সামাল দেবার কথা ভাবছেন? অধিকাংশ মানুষকে দরিদ্র রেখে উৎপাদন বাড়াবার একমাত্র আশা শ্রমিককে বেশি ঘাম ঝরাতে বাধ্য করা, মজুরির খরচ কমানো এবং কম শ্রমিকে বেশি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। তারা আবার ন'ঘন্টা শ্রম চালু করতে, যাবতীয় মজুরি বৃদ্ধি রদ করতে, শ্রমিকদের জন্য মজুরির আলাদা মান নির্দিষ্ট করতে এবং যেখানে যেখানে সম্ভব ছাঁটাই ও র‍্যাশনালাইজেশন চালু করতে চাইছে। তারা শ্রমিককে গরিব করে গরিব মানুষের কাছে পণ্য নিয়ে আসতে চাইছে। সংকট তাতে আরও বাড়ছে।

বুর্জোয়ারা উৎপাদন কমে গেল বলে প্রথমে হল্লা শুরু করে, আর তারপরই শ্রমিকদের ধর্মঘটের ওপর তাদের ক্রোধ উগরে দিতে থাকে। তারা চায় যে শ্রমিকদের ঘাড়ে পা রেখে তারা যে মুনাফা করতে চায়, শ্রমিকরা তা নত মস্তকে মেনে নিক। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকার ও রাজ্যের কংগ্রেস সরকারগুলি স্ট্রাইক-বিরোধী ও শ্রমিক দলনকারী আইন নিয়ে এসেছে।

র‍্যাশনালাইজেশনে মদত দিয়ে, কোনও মজুরি আইন তৈরি না করে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে মোকাবিলায় মালিকদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে জাতীয় সরকার বণিকদের যাবতীয় সংকটের

বোঝা শ্রমিকদের কাঁধে চাপিয়ে দিতে সাহায্য করছেন।

এ সবের ফলে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা যেহেতু আরও কমছে, সংকট তাই দূরীভূত না হয়ে আরও বাড়ছে। কিন্তু ধণিকশ্রেণির সামনে আর কোনও পথ নেই। স্বভাবতই, এই অবস্থায় তারা বিদেশি বাজারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে। কেবল বর্তমানের মজুত মালই নয়, ভবিষ্যতে যে সব শিল্প তারা গড়বে ভাবছে তার উৎপাদিত পণ্যও তারা রপ্তানি করার কথা চিন্তা করছে। বিদেশে কেবল আমেরিকা ও ব্রিটেন এ জাতীয় বাজার দিতে পারে।

এর ফল হবে দুটি :

প্রথমত, এর অর্থ হবে বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতায় টেকার জন্য শ্রমিকের ওপর আরও আক্রমণ,

দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি রপ্তানি ও যোগানের বিনিময়ে বিদেশি পুঁজিপতিদের যৌথ বিনিয়োগ ও এদেশের বাজারকে শোষণ করার যৌথ অধিকার স্বীকার করে চুক্তি সম্পাদন। আর তার অর্থই হল জাতীয়করণ না করার গ্যারান্টি, বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের অবাধ স্বাধীনতা এবং শ্রমিকের ওপর কড়া শাসন। এর আরও ফল হবে ব্রিটেন বা আমেরিকা যা চায় নূতন শিল্পের ক্ষেত্রে কেবল তারই উৎপাদন, বাকিটাতে পুরোনো ঔপনিবেশিক চিত্র বহাল থাকবে। পরিকল্পনা, সমৃদ্ধি, ভারতীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রভৃতি যাবতীয় পুরোনো প্রতিশ্রুতির ইতি ঘটবে এই নীতির মধ্য দিয়ে।

যে কারণেই জাতীয় সরকার আর পরিকল্পনার কথা বলছেন ...। সে কারণেই তাঁরা ধর্মঘট বিরোধী আইন পাশ করাচ্ছেন। সে কারণেই তাঁরা পুঁজিপতিদের মুনাফা করার জন্য কনট্রোল তুলে দিয়েছেন। রপ্তানির সঙ্গেও এমন সব শর্ত জড়ানো যে তাতে সংকটের কোনও সুরাহা তো হবেই না বরং দেশের মানুষের দুঃখ বাড়বে এবং কৃষি ও শিল্প দুইই ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাই সমস্ত স্তরের মানুষ— শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত পুঁজিবাদী পথের বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষ চাইছেন জমিদারির অবলুপ্তি ও কৃষকের হাতে জমি, মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ ও তার ওপর শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ, ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ, বেঁচে থাকার মত মজুরি ও বেতন, ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি, ধর্মঘটের অধিকার ও শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, মুনাফার নিয়ন্ত্রণ, ব্রিটিশ পুঁজি বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতির ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

একমাত্র এই পথেই, উৎপাদন ও সঙ্কীর্ণ বাজারের মধ্যে পুঁজিবাদী নীতির ফলে উদ্ভুত দ্বন্দ্বের সমাধান হতে পারে। এই পথে জনসাধারণ তার প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনা করে এগোতে, সকলের স্বার্থে সকলে মিলে উৎপাদন বাড়াতে এবং শ্রম অনুযায়ী তা বন্টন করতে পারে। এভাবেই এক সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে।

সংকটের সমাধানের এই দুই পথ পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী। দ্বিতীয় পথেই কেবল ভারতবর্ষের দুর্দশার মূল কারণটিকে দূরীভূত করা সম্ভব। তাই শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের মিলিত আক্রমণকে ঠেকাতে ও জনগণের স্বার্থে সংকটের সমাধান করতেই হবে, লক্ষ রাখতে হবে তাদের আন্দোলনকে যেন কেউ বল প্রয়োগে সন্ত্রস্ত করে তুলতে না পারে।

আংশিক লড়াইগুলিতে, ধর্মঘটে, রাজনৈতিক সংঘর্ষে এই দুই পথ পরস্পরের মুখোমুখি

হচ্ছে। পুঁজিবাদী পথ প্রতিদিন মানুষকে প্রতিস্পর্ধী করে তুলছে, তাদের জীবনযাত্রাকে করে তুলছে অসহনীয় এবং চতুর্দিকে ব্যাপক অভ্যুত্থানকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলছে।

(৫) সাম্রাজ্যবাদী-বুর্জোয়া চক্রান্তের বিরুদ্ধে নূতন শ্রেণি ঐক্য গড়ে তোল — গণতান্ত্রিক জোটের কর্মসূচি

জনসাধারণের পাল্টা লড়াই

রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসি সরকার এবং পরে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, প্রতিক্রিয়াশীলদের সাম্প্রদায়িক আক্রমণ এবং কংগ্রেসের বিভেদমূলক নীতি জনগণের যুদ্ধ পরবর্তী বিদ্রোহের ঢেউকে থামিয়ে দিতে পারেনি। কেবলমাত্র সরকার গড়ে এই বিদ্রোহের অবসান হয়না, কারণ বিদ্রোহের কারণ ছিল গভীরে। শোষণের মাত্রা সহ্যের সীমানা অতিক্রম করার ফলেই ছিল এই অসন্তোষ।

প্রথম দিকে কংগ্রেস নেতারা যদিও স্তোকবাক্য দিয়ে জনসাধারণকে আশ্বস্ত রাখতে পেরেছিলেন, ১৫ আগস্টের পর মোহভঙ্গ ঘটছে দ্রুত গতিতে। প্রতিদিনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জনগণ বুঝতে পারছে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের মধ্য দিয়েই কেবল দারিদ্র্য ও শোষণ মুক্তি সম্ভব। জমিদারির অবলুপ্তি ও কৃষকের হাতে জমি, স্বৈরতন্ত্রের অবসান, মূল শিল্পের জাতীয়করণ এবং সকলের জন্য বাঁচার মত মজুরির গণতান্ত্রিক দাবিগুলির যৌক্তিকতা আজকের মত কখনো মানুষের কাছে এত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু বর্তমানের মোহমুক্তির মধ্য দিয়ে জনগণ আরও নূতন কিছু শিখছে। তারা বুঝতে পারছে যে, যে নেতাদের তারা এত বিশ্বাস করেছিল, তারা একটি সমস্যারও সমাধান করতে পারে না, এবং তারা তাদের জমি, রুটি বা শান্তি— কোনওটিই দিতে পারে না। তারা বেশি করে বুঝতে পারছে যে এই সরকার কায়েমি স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত। সরকার ও বণিকদের মধ্যে যোগসাজস তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এই মোহমুক্তির থেকে জন্মাবে অন্য ধরনের এক সরকারের দাবি। কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হল সাহসের এবং জোরের সঙ্গে এই দাবি উত্থাপন করতে জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়া।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচি রূপায়ণ কেবল তখনই সম্ভব যখন রাষ্ট্রশক্তি পূর্ণ গণতন্ত্রে উৎসাহী শ্রেণিসমূহের হাতে এবং যখন গণতন্ত্রের সমস্ত বিরোধীরা সেই রাষ্ট্রশক্তি থেকে বিতাড়িত। এ ধরনের রাষ্ট্র হবে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও নিপীড়িত পেটিবুর্জোয়াদের মৈত্রীর ওপর প্রতিষ্ঠিত এক জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বর্তমানের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রত্যক্ষ পরিচালনা হবে এই রাষ্ট্রের ভিত্তি।

বর্তমান অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে বুর্জোয়ারা অতীতের মত আজ আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরে নেই। তাই আজ জনগণের মুক্তির জন্য শ্রমিক, কৃষক ও নিপীড়িত পেটি বুর্জোয়াদের ঐক্য গড়ে তুলে সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী বুর্জোয়াদের পরাস্ত করাই হবে সংগ্রামের কেন্দ্রীয় রণধ্বনি। গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার জন্য জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে হবে এবং তারই সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে সমাজতন্ত্র। অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণির ওপর শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেই তা সম্ভব।

নূতন শ্রেণি ঐক্য

সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়াদের মৈত্রীকে পরাস্ত করার জন্য বিপ্লবী জনগণের ঐক্যকে নূতন ভাবে গড়ে তোলা দরকার। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় যে সমস্ত শ্রেণির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদের ঐক্যবদ্ধ না করে তা সম্ভব নয়।

শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলির ফলে যে শক্তি সমাবেশ ঘটছে তাকে একটি নূতন গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ করাই হবে শ্রমিকশ্রেণি ও কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব। জাতীয় বুর্জোয়ার বিশ্বাসঘাতক নীতি ও সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী সকলকে এই ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

এই ফ্রন্টের কেন্দ্রে থাকবে শ্রমিকশ্রেণি কমিউনিস্ট পার্টি এবং পার্টি পরিচালিত গণ সংগঠনগুলি। বাম দলগুলির সংগ্রামী অনুসরণকারীরা এবং সকল প্রকৃত বামপন্থীরা হবে এর গুরুত্বপূর্ণ শরিক। সমস্ত সংগ্রামশীল জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও লিগের অনুসরণকারীদের মধ্যে যারা প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তাদেরকেও ঐ ফ্রন্টের ভিতরে নিয়ে এসে এর শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে, যাতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লড়াইয়ে জনগণের ব্যাপকতম ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।

এই ফ্রন্ট গড়তে গিয়ে কমিউনিস্টরা বামপন্থী পার্টিগুলির ও বামপন্থী ব্যক্তিদের সহযোগিতা নেবে, কিন্তু এই মূল কথাটি মনে রাখতে হবে যে শ্রমিকশ্রেণির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই এই ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। শ্রমিকশ্রেণির কর্মসূচি ও নীতির জন্য লড়াইয়ের পক্ষে কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াদের জয় করে নিয়ে আসতে হবে।

এক অভিন্ন কর্মসূচির জন্য নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমশ শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব অর্জনের পাশাপাশি জনগণের ব্যাপক রাজনৈতিক সংগঠনে শৃঙ্খলা ও ঐক্যের ওপরেও জোর দিতে হবে।

গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট আই কেবল বাম দলগুলির ওপর তলার ঐক্যের জোট নয়। এই ফ্রন্ট গণভিত্তিক। শ্রমিক, কৃষক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের এই জোট শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভাবে যত ঐক্যবদ্ধ হবে এবং শ্রমিকশ্রেণি তার মিত্রদের যত বেশি আস্থা অর্জন করতে পারবে, ততই এই জোট শক্তিশালী হবে ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

কমিউনিস্টরা যদি এটা না বোঝে, তাহলে আবার অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে, বাম ঐক্যের নামে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ মাথা চাড়া দেবে এবং দোদুল্যমান শ্রেণির পিছনে শ্রমিকশ্রেণিকে সমবেত করা হবে।

মোহমুক্ত জনসাধারণ ক্রমেই বেশি সংখ্যায় আন্দোলনমুখী হবে, অত্যন্ত পশ্চাৎপদদের মধ্যেও দ্রুত সংগ্রামী মনোভাবের সৃষ্টি হবে। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কাজ হবে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বুর্জোয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে এই সমস্ত লড়াইকে একত্রিত করা। কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে একটি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী গণসংগঠনে পরিণত করেই তা সম্ভব।

বাম দলগুলির সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট

বাম দলগুলির যুক্তফ্রন্ট এই নূতন গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে সাহায্য করবে এবং কংগ্রেস ও লীগের অনুসরণকারীদেরও কাছে টানবে। কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব শক্তি এবং জনসাধারণের

বামমুখিনতা বাম শক্তিগুলির জোর বাড়িয়ে তোলে এবং নূতন ঐক্য গঠনে সহায়ক হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে তাই বাম দলগুলির সঙ্গে অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের উদ্যোগ নিতে হবে এবং সে উদ্দেশ্যে অভিন্ন লক্ষ্যে ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। এই সঙ্গে এও খেয়াল রাখতে হবে যে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিক বিরোধী ক্রোধের সুযোগ নিতে অসৎ ও কুখ্যাত লোক বা গোষ্ঠীরা যেন এই ফ্রন্টে ভিড়ে না পরে।

গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলাটা এক লড়াইয়ের রাস্তা। যুক্ত ও ছোট ছোট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তা অগ্রসর হয়। কোথাও কংগ্রেস ও লীগ অনুগামীদের আবার কোথাও বা বিভিন্ন গণ সংগঠনের সঙ্গে পার্টি বা বামপার্টিগুলি একযোগে স্থানীয়ভাবে যুক্তফ্রন্ট বা এমনকি কমিটিও গড়ে তোলে। এইসবের মৌলিক ভিত্তি অবশ্য হল সর্বহারার স্বাধীন কর্মপদ্ধতি এবং তার গণসংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা। যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রে থাকবে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার গণসংগঠন সমূহ। তাকে ঘিরে থাকবে অন্যবামপন্থী, কংগ্রেস, লিগ প্রমুখের অনুসারী জনগণ।

বহু প্রদেশে সংগঠিত বাম গোষ্ঠী নেই, আবার সব প্রদেশেই হাজার হাজার বামপন্থী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছেন। বামপন্থী ঐক্য এদেরকে লড়াইয়ে আনবে। দক্ষিণে এবং অন্যান্য প্রদেশেও বামদের সংগঠিত করতে হবে। বামপন্থী ঐক্য কংগ্রেসিদেরও নানান বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করবে।

কংগ্রেস, লীগ ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট

কংগ্রেস ও লীগ লক্ষ লক্ষ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানুষের আনুগত্য লাভ করে। এই দুই সংগঠনের নেতারা পুরোনো দিনের কথা বলে এই মানুষদের গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে প্রাণপণে চেষ্টা করবে। কমিউনিস্ট পার্টিকে অনবরত প্রচার ও যুক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের এই কৌশলকে ব্যর্থ করতে হবে। এই সব সংগঠনের সাথে যুক্ত বামপন্থীদের সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

জনসাধারণ যা সরকারের কাছ থেকে নিতে অস্বীকার করে কংগ্রেসের ষাট বছরের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্য ভাঙিয়ে তাই কংগ্রেসের নামে নেতারা স্বীকার করিয়ে নেন। কংগ্রেসের অনুগত এই বিপুল জনতাকে আমরা হারাতে পারি না। প্রতিটি জ্বলন্ত প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যেই যেন বিতর্ক ওঠে, আমাদের সর্বতোভাবে সে চেষ্টা করতে হবে, এবং কংগ্রেস পন্থীদের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে টেনে আনতে হবে। কংগ্রেস দল একটি বুর্জোয়া পার্টি, তারা কখনোই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি মেনে নেবেনা, কিন্তু কংগ্রেসের অনুসারী জনগণকে এই কর্মসূচীর পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

সোশ্যালিস্ট পার্টি

দেশের সংকট, জনসাধারণের সংগ্রামী মনোভাব, অগস্ট আন্দোলনের প্রভাব ও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সম্পর্কে বিরাট সংখ্যক কংগ্রেসির মোহমুক্তি পুঁজিপতি-বিরোধী বামপন্থা মনস্ক অনেক কংগ্রেসিকে সোশ্যালিস্ট পার্টির দিকে আকৃষ্ট করছে। বোম্বাইয়ের মত জায়গাগুলিতে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে এদের ভিত্তি আছে। কলকাতার মত জায়গায় পুরোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে এদের সদস্য পাওয়া যাবে। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রদের মধ্যে গণ সংগঠন

গড়ায় উৎসাহী বহু সৎকর্মী এদের আছে।

দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসি নেতারা এদের ভয় পায়, আবার এদের কাছেও টানতে চায়।

সোশ্যালিস্ট পার্টির শক্তির মূল উৎস পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি। এরা পুঁজিপতিদের ঘৃণা করে ও নেহরু সরকারের তোষণনীতিতে এরা অসন্তুষ্ট। এরা নিজেদের সমাজতন্ত্রী ভাবে, আসলে এরা বাম জাতীয়তাবাদী। তথাপি এই দলের বিপথগামী নেতাদের বাধা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্র ও সর্বহারার প্রতি এদের সাধারণ সভ্যদের ঝোঁক অবশ্যই খাঁটি।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সঙ্গে নিতে হবে। সেই সঙ্গে সোশ্যালিস্ট নেতাদের শ্রমিক বিরোধী সোভিয়েত বিরোধী ও কমিউনিস্ট বিরোধী বিষোদগারের মোকাবিলা করে তাদের বিকৃত সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের মুখোশ খুলে দিতে হবে। এও মনে রাখতে হবে যে সোশ্যালিস্টদের ওপরতলার চার পাঁচজন ছাড়া কারুর মধ্যে মতৈক্য নেই এবং তাই সবার সঙ্গে একরকম আচরণ চলবে না।

জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুৎ পট্টবর্ধন, রাম মনোহর লোহিয়া ও অশোক মেহতার মত নেতারা সমাজতন্ত্রের কথার আড়ালে সোশ্যালিস্ট পার্টিকে আসলে একটি বুর্জোয়া বিরোধী দলে পরিণত করতে চাইছেন। সমাজতন্ত্রের কর্মসূচি বলতে এঁরা বলছেন নিছক শাসন সংস্কারের ও সংসদের কাছে মন্ত্রীমণ্ডলীর দায়বদ্ধতার কথা। দুঃসাহসী পদক্ষেপই বটে! এঁরা এমন ভাব করছেন যেন জনগণের হাতে ক্ষমতা এসেই গেছে, দরকার এখন শুধু সমাজতন্ত্রের দিকে পা বাড়ানোর।

এঁরা বলতে চাইছেন যে গঠনতান্ত্রিক পথেই সমাজতন্ত্র আনা যাবে, আর এই পথকে তাঁরা বলছেন 'গণতান্ত্রিক পন্থা'।

সোশ্যালিস্ট নেতারা গঠনতান্ত্রিক অধিকারের দাবির মধ্যে অন্ধ্র, তামিলবাদ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতির জন্য জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেন না, বা তাঁরা অবিলম্বে ও বিনা ক্ষতি পূরণে জাতীয়করণের কথাও বলেন না। তাদের মুখে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম বিবর্জিত সমাজতন্ত্রের বুলিগুলি নেহাৎই বুর্জোয়া সুলভ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাঁদের দৈনন্দিন ক্রিয়া কর্মে তাঁরা জনবিরোধী। তাঁরা কন্ট্রোল তুলে দেওয়ার সমর্থক, শ্রমিকরা কাজ করেন না বলে তাঁরা ধণিকদের সুরে সুর মিলিয়ে কুৎসা করেন (জয়প্রকাশ রেল বোর্ডকে এ নিয়ে চিঠি লিখেছেন)। সদস্যদের চাপে স্ট্রাইকে গেলেও তারা সাধারণত স্ট্রাইকের বিরোধিতা করেন, স্ট্রাইক ভাঙেনও, তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যকে ভেঙে মালিকের সুবিধে করে দেন। তাঁরা তাঁদের যাবতীয় অগ্ন্যুদগার কমিউনিস্টদের ওপর বর্ষণ করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে দমন পীড়নকে নির্লজ্জভাবে সমর্থন করেন। তাঁরা বাম ঐক্যের ঘোরতর বিরোধী।

সদস্য ও সমর্থকদের চাপে মাঝে মধ্যেই কংগ্রেস ছেড়ে দেওয়ার কথা বললেও সোশ্যালিস্ট নেতাদের এ নিয়ে কোনও তাড়া নেই। এসব কথা তারা বলছে নিজেদের বামপন্থী ভাবমূর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার ও কংগ্রেসকে চাপে রাখার জন্য। ওরা যখন সত্যি কংগ্রেস ছাড়বে, তখন সেটা বিপ্লবের জন্য নয়, নির্বাচনে বিরোধী বুর্জোয়া দল হিসেবে দাঁড়াবার মত শক্তি সঞ্চিত হলেই কেবল তা করবে।

তাদের ঘোষিত কর্মসূচি থেকে বোঝা যায় যে তারা ইউরোপ ও আমেরিকার কট্টর

দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের অনুসরণ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তারা ঘোর বিরোধী। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিজেদের গাঁটছড়াকে আড়াল করার জন্য বিদেশনীতিতে তারা এক তৃতীয় পক্ষের ওকালতি করছে। তাদের ঘোষিত নীতিতে ইচ্ছাকৃত ভাবে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে নীরবতা পালন করছে, যাতে বোঝা যায় যে তা তারা মার্কিন নির্দেশেই চলবে।

সর্বশেষে, উন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশের বিরোধের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তারা এক লহমায় পুঁজিবাদ ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে বিরোধের অগ্রগণ্যতাকে উড়িয়ে দিতে চায়, এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের নামে এই মূল কথাটিকে চাপা দিতে চায় যে পশ্চাৎপদ দেশের লড়াই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্ব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়েরই অঙ্গ।

এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তারা উগ্র জাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকে জাতীয়তাবাদের নামে যে কোনও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার পথে যেতে প্রস্তুত। ঐ দলের সাধারণ সদস্য ও সমর্থকরা এসব নীতি পছন্দ করেন না। তাই মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে আদর্শগত লড়াইয়ে এদের নীতির মুখোশ খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের সভ্য সমর্থকদের মন জয় করার দিকেও নজর দিতে হবে। নির্দিষ্ট ঘটনা নিয়ে এই ঐক্য গঠনের প্রয়াস চালাতে হবে। ভুললে চলবে না যে এদের নেতৃত্ব কখনোই এই ঐক্য চাইবে না, যদি না তাদের অনুসরণকারীরা তা করতে তাদের বাধ্য করে।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি

গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও বাম দলগুলির কর্মসূচির মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হবে —

(১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ এবং প্রকৃত ও পূর্ণ স্বাধীনতা।

(২) ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং শান্তি ও সকল জাতির স্বাধীনতার জন্য কর্মরত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে জোটবদ্ধ শ্রমিক, শ্রমজীবী, কৃষক, নিপীড়িত পেটি বুর্জোয়ার প্রতিনিধিত্বমূলক একটি গণতান্ত্রিক সরকার।

(৩) সকল পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকারের ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত গঠনতন্ত্র, যা সাধারণ মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও বুনিয়াদি অর্থনৈতিক অধিকার দেবে।

(৪) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারসহ প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। একটি স্বেচ্ছামূলক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, স্বশাসিত ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠন।

(৫) গঠনতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ; সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাম্য ও নিরাপত্তা, জাত, জাতি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক যাবতীয় বিভেদের অবসান।

(৬) দেশীয় রাজ্য সমূহের রাজা ও সামন্তদের অবলুপ্তি ও পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কে কোন রাষ্ট্রে যোগ দেবে— ভারতে না পাকিস্তানে— তার নির্ণয়কারী হবে জনগণ।

(৭) উপজাতি ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতি সমূহের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি এবং তাদের জন্য পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার, তাদের উন্নয়নের জন্য সত্বর রাষ্ট্রীয় সহায়তা, উপজাতীয় এলাকা সমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসন, এবং এই প্রকার এলাকার যে কোনও রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার।

(৮) শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা।

(৯) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি এবং কৃষকের হাতে জমি সমর্পণ, গ্রামীণ ঋণ থেকে মুক্তি ও কুশিদ জীবিকার অবসান, ক্ষেত মজুরদের জন্য বাঁচার মত মজুরি।

(১০) ব্যাঙ্ক, শিল্প, পরিবহন, খনি, চা-বাগান প্রভৃতিতে যাবতীয় বিদেশি পুঁজির সুদের বাজেয়াপ্তকরণ এবং ঐ সব শিল্পের জাতীয়করণ।

(১১) বৃহৎ শিল্প, বৃহৎ ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স কোম্পারি জাতীয়কবণ, শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা, ন্যূনতম বাঁচার মত মজুরি, আট ঘন্টা কাজ ইত্যাদি।

(১২) ভারতের নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতার উন্নয়ন ও অর্থনীতির বুনিয়াদি ক্ষেত্র থেকে বড় পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মুনাফার নিয়ন্ত্রণ।

(১৩) সমস্ত দমনমূলক আইন প্রত্যাহার।

(১৪) প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের পরিবর্তে গণকমিটির পরিচালনায় নির্বাচিত আধিকারিক নিয়োগ।

(১৫) জনগণের হাতে অস্ত্র প্রদান এবং একটি জনগণতান্ত্রিক সৈন্যবাহিনীর প্রতিষ্ঠা।

(১৬) অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

(১৭) নারীদের জন্য গণতান্ত্রিক সমানাধিকার।

গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং তার নির্মাতা কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল দাঙ্গাবাজ ও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তারা শান্তিসেনা গড়ে তুলবে, দাঙ্গার বিরোধীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং দাঙ্গা নিবারণের জন্য যাবতীয় দাঙ্গাবিরোধী সরকারি ব্যবস্থাগুলির ব্যবহার করবে এবং সেই সঙ্গে দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে সরকারি ব্যক্তিদের আপসের মনোভাবকেও প্রকাশ করে দেবে।

শুরুতেই সমগ্র কর্মসূচি নিয়ে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ফ্রন্ট গঠনের কোনও প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে যুক্ত সংগ্রাম চলতে চলতে ক্রমে সকল গণতান্ত্রিক মানুষেরাই সমগ্র কর্মসূচিটির যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারবে, এবং বামেদের ও জনগণের মিলিত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ক্রমে ফ্রন্ট গড়ে উঠবে।

(৬) জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য লড়াইয়ে পার্টির কাজ

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে উপরোক্ত কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে মৌলিক পরিবর্তন আসবে তাতে এ দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ার, দেশের মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করার ভিত্তি রচিত হবে। কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হবে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষদের আন্দোলনগুলিকে এই এক উদ্দেশ্যে এক অভিন্ন আন্দোলনে সংহত করা।

ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের কাজ

পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণি সাম্প্রতিক কালে অনেক গৌরবময় সংগ্রাম করেছে। প্রবল দমন পীড়ন সত্ত্বেও ধর্মঘটের ঢেউ প্রবলতর বেগে আছড়ে পড়ছে। জাতীয় সরকার মজুরি হ্রাস, ছাঁটাই, বেকারি, মাগগিভাতা হ্রাস প্রভৃতির দ্বারা শ্রমিকদের দলনে মালিকদের সাহায্য করছেন। অধুনা অনুষ্ঠিত 'শিল্পে যুদ্ধ বিরতি' সম্মেলন আসলে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ভিন্ন কিছুই নয়। এতে বলা হয়েছে যে পাঁচ বছর জাতীয়করণ হবে না। ন্যায্য মজুরি ও মুনাফা দুয়েরই অধিকার স্বীকার করতে হবে বলে মজুরি ও মুনাফাকে এক গোত্রে ফেলা হয়েছে। অপর দিকে মধ্যস্থতার মাধ্যমে শিল্প বিরোধের নামে ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ করতে চাওয়া হচ্ছে। এইবার সালিশির নামে শ্রমিকদের যাবতীয় অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

এই অবস্থায় আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণিকে লড়াইয়ে নামতেই হবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এই অভিযানের পুরোভাগে থাকতে হবে। এই লড়াইয়ের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন অন্য শ্রমজীবী জনগণের থেকে শ্রমিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে, কারণ সরকার সেটারই চেষ্টা করবে।

সরকার ও জাতীয় নেতৃত্ব দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ধুয়ো তুলে শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রামে সামিল হয়, এবং দেশের লোকের দুর্দশা ও জিনিসের উচ্চমূল্য ও অভাবের জন্য শ্রমিকদের লড়াই ও ধর্মঘটকে দায়ি করে। এই অপপ্রচারের মোকাবিলা আমাদের করতে হবে এবং মানুষকে বোঝাতে হবে যে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথাবার্তা ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয়, এ হল কাজের সময় বৃদ্ধি, মজুরি হ্রাস, কম শ্রম বিনিয়োগ ও ঢালাও বেকারির ব্যবস্থার দ্বারা পুঁজিবাদের সংকটের বোঝা জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা মাত্র। উৎপাদন হ্রাসের প্রকৃত কারণগুলি এবং তা থেকে মুক্তির উপায় আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে। পুনর্গঠনের নামে বুর্জোয়াদের মুনাফাবৃদ্ধির পরিকল্পনার শরিক না হওয়ার জন্য জনসাধারণকে সাবধান করে দিতে হবে।

আমাদের এটা স্পষ্ট করে দিতে হবে যে শিল্পের জাতীয়করণ, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির রূপায়ণ এবং শ্রমিককে বাঁচার মত মজুরি প্রদান ভিন্ন কোনও জাতীয় পুনর্গঠন সম্ভব নয়।

ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টিকে সংগ্রামে জয়ী হতে হবে, যাতে তা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষক ও মধ্যবিত্ত সহ অন্যান্য শ্রমজীবীদেরও আত্মবিশ্বাস যোগাতে পারে। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণিকে একটি গণসংগঠনে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এই ঐক্যই নূতন গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও তার ভিত্তিতে এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলবে।

আজ যখন বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকশ্রেণি বিভিন্ন দিকে আহূত হচ্ছে— কোথাও আই.এন.টি.ইউ.সি. দ্বারা, কোথাও সোশ্যালিস্ট পার্টি দ্বারা— আবার কোথাও বা তারা সরকারের ভূমিকায় নানাভাবে দ্বিধাগ্রস্থ, তখনই প্রতিটি লড়াইয়ে এই সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলা সবচেয়ে বেশি জরুরি। এই ঐক্য সংগ্রামের আগে বা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হতে পারে। যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকটে প্রতিটি শ্রমিকই একই ভাবে আক্রান্ত, তাই সঠিক কৌশল অবলম্বন করা হলে অবশ্যই এই ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। এ জাতীয় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই

সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিশ্বাসঘাতক ভূমিকা সম্পর্কে শ্রমিকদের চোখ খুলে দেবে।

আজ মধ্যবিত্তদের মধ্যেও ধর্মঘটের পক্ষে বিপুল জনমত রয়েছে, কারণ তাদেরও দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য ধর্মঘটের পথে যেতে হচ্ছে। জন সমর্থন আদায়ের এ এক বড় ভিত্তি। এই সমর্থন কত কার্যকরী হতে পারে, কলকাতায় ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে কেরানিদের বিশাল মিছিল ও জমায়েত তার প্রমাণ।

শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলার স্বার্থে আমাদের হিন্দু মুসলিম ভ্রাতৃত্বের, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার এবং সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে। শ্রমিক ঐক্য রক্ষার জন্য যে নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষা প্রয়োজন এবং যারা সংখ্যালঘু নিধন করে তাদের নিশ্চিহ্ন করা যে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির স্বার্থে জরুরি— শ্রমিকশ্রেণিকে এ বিষয়ে সচেতন করে দিতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে আমাদের শক্তিবৃদ্ধির ভয়ে ভীত হয়ে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে জাতীয় বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণিকে বিভক্ত করার জন্য আই.এন.টি.ইউ.সি. গঠন করেছে। আই.এন.টি.ইউ.সি. যে সরকারের তাঁবেদার, ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াদের তল্পিবাহক এবং শ্রমিক ঐক্যের শত্রু— ক্রমশই তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ধর্মঘট ভাঙা, ধর্মঘটিদের বিরুদ্ধে গুণ্ডাবাজি, পুলিশ ও মালিকদের দালালি করা ইত্যাদি এদের কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে এ.আই.টি.ইউ.সি.র জায়গায় এরা ভারতের শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

আই.এন.টি.ইউ.সি. অনেক জায়গায়ই কংগ্রেসের প্রভাবের ফলে সমর্থক পেয়ে থাকে, কিন্তু অচিরেই তারা দুর্নাম কুড়োয়। দু একটি জায়গায় ছাড়া এদের কোনও গণ সমর্থন নেই। তাই এদের ভরসা হল কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ভাড়াটে গুণ্ডারা, যারা শ্রমিকদের চাঁদা দিতে বাধ্য করে এবং যারা তার বিরোধিতা করে মালিকের কাছে তাদের ছাঁটাই করে দেওয়ার সুপারিশ করে। আই.এন.টি.ইউ.সি. কোনও সাধারণ সংস্কারপন্থী সংগঠন নয়, দ্রুত তা হিটলারীয় শ্রমিক ফ্রন্টের মত হয়ে উঠতে যাচ্ছে। এরা এখন গুণ্ডা দিয়ে শ্রমিক পেটাচ্ছে এবং আরও বেশি করে তা করবে যতদিন না শ্রমিকেরা তাদের উল্টে মার দিতে পারছে।

এই সব ঘটনা আই.এন.টি.ইউ.সি.-র গণসংগঠন হিসেবে ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করছে। শ্রমিকদের কাছে তাদের এই চরিত্র উদঘাটন করতে ও তাদের ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে, যাতে আই.এন.টি.ইউ.সি.-র কোনও গণভিত্তি তৈরি হতে না পারে। যেখানে তাদের গণভিত্তি আছে সেখানে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মজুরি ও জীবনজীবিকার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে তাদের ডাকতে এবং ধণিকদের বিরুদ্ধে তাদের যে কোন লড়াইয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতারা আর এক বিভেদপন্থীর দল। আই.এন.টি.ইউ.সি.-র সঙ্গে সঙ্গে তারা এ.আই.টি.ইউ.সি. ছেড়ে গেছে কিন্তু সভ্য সমর্থকদের ভয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেনি। বোম্বাইতে আই এন টি ইউ সি-র খানিকটা বিরোধিতা করলেও শত্রুতা তাদের এ আই টি ইউ সি-র সঙ্গেই এবং কলকাতায় তারা ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে আই এন টি ইউ সি-র সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সোশ্যালিস্টদের বামপন্থী বুলির আকর্ষণে তাদের যে গণভিত্তি তৈরি হয়েছে তার সাহায্যে তারা একটি শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে এবং এইভাবে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে বিভেদ

বাড়াতে তৎপর আছে। আমাদের ডাকা ধর্মঘটগুলির তারা বিরোধিতা করছে। তাদের পরিচালিত ইউনিয়নগুলি যদি ধর্মঘট ডেকে থাকে, তাবে তা করছে এ কারণে যে তাদের সভ্য সমর্থকদের মধ্যে অনেক লড়াকু আছে। তাদের এইসব সংগ্রামে সব সময়েই আমাদের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

ধর্মঝটের প্রতি সোশ্যালিস্ট নেতাদের লোক দেখানো সমর্থন এবং তাদের প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকতার তীব্রভাবে নিন্দা করতে হবে, যাতে শ্রমিকরা এ আই টি ইউ সি-র প্রতি আকৃষ্ট হয়। যৌথ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্রমে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের দাবি দঢ় হয়ে উঠবে। আমরা আমাদের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এ আই টি ইউ সি-র সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এবং তাকে শ্রমিকদের একমাত্র নিজস্ব শ্রেণি সংগঠনে পরিণত করতে পারব। কেন্দ্রীয় সরকার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমাদের সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব কেড়ে নিতে চাইছেন। সোশ্যালিস্ট কর্মীদের কাছে একটি ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা যথা সময়ে তুলে ধরতে পারিনি। যদি তা পারতাম, তাহলে তাদের পক্ষে এ.আই.টি.ইউ.সি. ছেড়ে যাওয়া সহজ হত না।

আজ এ.আই.টি.ইউ.সি.-র মর্যাদা এত বেড়ে গেছে যে নব-গঠিত ইউনিয়নগুলি তার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসছে। এই শক্তিই যে শ্রমিকদের শক্তি, তা আমাদের বুঝতে হবে। শ্রমিকদের লড়াই ধর্মঘটের মধ্যে তাদের আশু দাবিগুলির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের ছাঁটাই ও মজুরি হ্রাসের অবসানের জন্য সমস্ত মূল শিল্পের জাতীয়করণ, মুনাফা নিয়ন্ত্রণ ও সকলের জন্য বাঁচার যত মজুরির দাবিগুলিকেও প্রচার করতে হবে।

সকলকে এই মার্ক্সবাদী অবস্থান বুঝতে হবে যে বর্তমান সংকটে কোনও আংশিক জয় স্থায়ী হবে না যদি না পুঁজিবাদী আক্রমণকে সামগ্রিকভাবে পরাজিত করা যায়। প্রতিটি আংশিক জয়েই যতটুকু সুবিধা পাওয়া যায় তা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই বুনিয়াদি কথাটি শ্রমিকদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। সর্বোপরি বুর্জোয়া সরকারের নিযুক্ত সালিশি বিচারের প্রতি আমাদের কোনও মোহ রাখা চলবে না।

শ্রমিকদের প্রতিদিনের লড়াই ও ধর্মঘট পরিচালনার সময় তা এমনভাবে করতে হবে যেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক লড়াই— একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার সংগ্রাম সম্বন্ধে তারা সচেতন ও শ্রেণিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

শ্রমিকরা তাঁদের প্রাত্যহিক সমস্যার মোকাবিলার সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনগণের স্বার্থের জন্যও সংগ্রাম করবেন। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বুর্জোয়া জোটের সমস্ত প্রকার দমন পীড়নের বিরুদ্ধে তারা বিশাল গণসংগ্রাম সংগঠিত করবেন। সমাবেশ, প্রতিবাদ ও ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তাঁরা হয়ে উঠবেন গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতা, সংগঠক ও ঐক্যস্থাপক।

কৃষক ফ্রন্টের কাজ

কৃষকদের কেন্দ্রীয় দাবি 'কৃষকের হাতে জমি'র পক্ষে কৃষকদের জাগ্রত ও আন্দোলনমুখী করে তোলাই কৃষক ফ্রন্টের মূল দায়িত্ব। জমিদার, মহাজন ও ব্যাপারিদের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইকে দৃঢ়তর করতে হবে। দুই তৃতীয়াংশ ফসলের ভাগের দাবির লড়াইকে আরও জোরদার

করে তুলে তাকেই 'কৃষকের হাতে জমি'র লড়াইয়ে উন্নীত করতে হবে। খেতমজুরদের সারা ভারত কিষাণ সভার মধ্যে অথবা এই সভার দ্বারা স্বীকৃত কোনও আলাদা সংগঠনে তাদের জন্য ন্যায্য মজুরি ও শ্রমের শর্তাবলির দাবিতে বিশেষভাবে সংগঠিত করে তুলতে হবে।

কৃষকদের লড়াই আজ এত ব্যাপক যে কংগ্রেসি মন্ত্রীরাও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কথা বলছেন, কারণ বুর্জোয়ারা বুঝেছে যে এসব না বললে কৃষকরা শান্ত হবেনা। কিন্তু তাদের প্রস্তাবিত 'জমিদারি প্রথা অবলুপ্তি' যে মেকি সেটা সবাইকে বোঝাতে হবে। কংগ্রেস নেতারা এখন ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন আর তাই সারা দেশে এক আইন প্রবর্তনের অছিলায় তাদের তথাকথিত জমিদারি প্রথা অবলুপ্তি আইন পাশ করাতে দেরি করছেন।

সরকারের প্রস্তাবিত আইনে জমিদারদের খাস জমিতে হাত দেওয়া হয়নি এবং যে জমি খাজনার বিনিময়ে প্রজাদের দেওয়া হয়েছে, কেবল সেটুকু ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সরকার হাতে নিচ্ছে। ফলে জমিদারি প্রথা অন্যভাবে থেকেই যাচ্ছে, উদ্বৃত্ত জমি গরিব কৃষকদের মধ্যে বিলি হচ্ছে না এবং ভাগ চাষীদেরও কোনও উপকার হবেনা। উপরন্তু প্রদেয় বিশাল ক্ষতিপূরণের বোঝা করভারে জর্জরিত ও দরিদ্র জন সাধারণের কাঁধে এসে চাপবে। এইসব প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লড়াই অবশ্যই করতে হবে।

নূতন আইন আসার আগেই জমিদাররা ব্যাপক ভাবে পুলিশের সাহায্যে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করছে। নূতন আইন পাশ হয়ে গেলে এইসব জমি আইনত জমিদারদের হাতেই রয়ে যাবে। এ জাতীয় আইনকে প্রগতি আখ্যা দেওয়া প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। এই আইনে কৃষক আরও দরিদ্র হবে এবং খাদ্য সংকট বাড়বে। খাদ্যের ওপর একচেটিয়া অধিকার বাড়বে এবং তাই বাড়বে কালোবাজারিও।

জমিদারদের ক্ষতিপূরণের বিরোধিতা এবং কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি ও কৃষি কার্যে কৃষককে সহায়তা দানের দাবি আমাদের করতে হবে। অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল জমিদারদের কেবল কিছুদিনের জন্য মোটামুটি ভাতা দেওয়া কিংবা তাদের ভরণপোষণের উপযুক্ত জমি রেখে দেওয়ার অধিকার দেওয়া যেতে পারে।

খাজনা বা ঋণ হ্রাসের আংশিক দাবিগুলিকে জমির জন্য এক ঐক্যবদ্ধ ও ব্যাপক দাবির লড়াইয়ে উন্নীত করতে হবে। সরকারের তৈরি খাদ্যের আকালের বিরুদ্ধে বিনা দ্বিধায় আমাদের লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে হবে। বড় ব্যাপারি ও জমিদারদের হাতে মজুত খাদ্য বাজেয়াপ্ত করে তা জনগণের মধ্যে বিলি করার দাবি আমাদের করতে হবে। পশ্চাৎপদ অঞ্চলে ভূমিদাস প্রথা, বেগার প্রথা, বেআইনি আদায় প্রভৃতির অবসানের দাবি থেকে শুরু করে 'কৃষকের হাতে জমি'র মূল দাবিতে পৌঁছোতে হবে। দেশীয় রাজ্যগুলিতে যাবতীয় সামন্তপ্রথার অবসানের জন্য লড়াইয়ে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত ব্যাপক কৃষি এলাকায় যে বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে, তা গরিব ও মধ্যচাষী এবং সর্বহারা কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করবে। এই বিশাল জন সমষ্টি শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে মিলিত হয়ে যে কোনও সফল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে যে পূর্বশর্তটি প্রয়োজনীয় তা রচনা করবে।

এই সব কর্তব্য সমাপনের উপযুক্ত করে সারা ভারত কিষাণ সভাকে এক সংগ্রামী সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

ছাত্র ফ্রন্টের কাজ

যুদ্ধ পরবর্তী বৈপ্লবিক জোয়ারে ছাত্র আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনাদের মুক্তির দাবিতে কিংবা শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্রদের সাহসী লড়াই ও পুলিশ ও মিলিটারির সঙ্গে সংঘর্ষগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনে এক নূতন পর্বের সূচনা করেছিল।

১৯৪৭, ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মিথ্যা মায়া ছাত্রদের যদিও আবিষ্ট করতে পেরেছিল, খুব দ্রুত তাদের আন্দোলন আবার শুরু হয়ে গেছে। ছাত্রদের বেতনবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বহু প্রদেশে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ হয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের ওপর পাশবিক আক্রমণের ফলে এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কার্যক্রমের পরিণতিতে সরকার ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ নাগরিক স্বাধীনতার জন্য সর্বজনীন লড়াইয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। ছাত্রদের নিজস্ব দাবির সঙ্গে গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের এই মিলনে সন্ত্রস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা ছাত্রদের মনোবল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'ছাত্র বিদ্রোহ দমনে'র পাশবিক পথ গ্রহণ করেছে।

কংগ্রেস নেতারা প্রচার করছেন যে ছাত্রদের জঙ্গি আন্দোলনের পরিবর্তে 'গঠন মূলক কাজে' ব্যাপৃত হওয়া উচিত। তাঁরা চান জঙ্গি ছাত্রসংগঠন বন্ধ করে দিয়ে সরকার পোষিত অ-রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন। সোশ্যালিস্ট নেতারাও এই একই সুরে সুর মেলাচ্ছেন। তাঁরা ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্রব না রেখে কেবল তাঁদের পার্টিতে ছাত্রদের সদস্যপদ দেওয়ায় মনোনিবেশ করেছেন।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে ছাত্রদের ভূমিকাকে ছোট করে দেখা মারাত্মক ক্ষতিকারক। পার্টির সভ্য সমর্থকদের মধ্য থেকে এ জাতীয় চিন্তার মূলোচ্ছেদ করতে হবে। অনুরূপ ভাবে 'ছাত্র আন্দোলনে ঐক্য রক্ষা'র নামে ও 'বিচ্ছিন্ন' হয়ে পড়ার কাল্পনিক ভয়ে শ্রমিক কৃষকদের সংগ্রাম থেকে ছাত্রদের দূরে সরিয়ে রাখা হবে অমার্ক্সীয় ও শ্রমিকবিরোধী এবং জঙ্গি ছাত্র আন্দোলনকেই তা পঙ্গু করে দেবে।

কমিউনিস্ট ছাত্রদের সঠিক মার্ক্সীয় পথে চলার জন্য ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতে হবে, যাতে সমগ্র ছাত্রসমাজ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও কর্মসূচিকে গ্রহণ করতে পারে।

যুবকদের মধ্যে কাজ

শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত যুবকদের বর্তমান বিপ্লবী লড়াইয়ে এক বিশেষ ভূমিকা আছে। শ্রমিক কৃষক আন্দোলনে ও জাতীয় আন্দোলনে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী কেরানি ও মধ্যবিত্তদের আন্দোলনে যুব সমাজ সর্বদাই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, তারা জঙ্গি আন্দোলনের পুরোভাগে থেকেছে, ব্যারিকেড গড়েছে ও সারা শহরকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উত্তাল করে দিয়েছে। বর্তমানের ব্যাপক সংকট আরও বেশি সংখ্যায় যুবক যুবতীকে লড়াইয়ের ময়দানে নিয়ে আসছে।

সর্বহারার নেতৃত্বে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যুবশক্তিকে নিয়োগ করার এবং শ্রমজীবী যুবকদের কাছে সরাসরি সাম্যবাদের তত্ত্বকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যর্থতা হতাশ মধ্যবিত্ত (এবং এমনকি শ্রমিক ও কৃষক) যুবকদের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক স্বয়ংসেবী সংগঠন সমূহ ও গণতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণি বিরোধী শোষক শ্রেণির ক্রীড়ণক নানা সংস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

কমিউনিস্ট পার্টিকে তাই শ্রমজীবী যুবকদের কমিউনিস্ট আদর্শ ও কর্মসূচির দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ যত্নবান হতে হবে। যুবকদের প্রবণতাকে বুঝতে হবে। শ্রম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রমজীবী যুবকদের বিশেষ আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রকৃত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে এক শক্তিশালী সংগঠিত শক্তি হিসেবে তাদের একত্রিত করতে হবে।

মহিলা ফ্রন্টের কাজ

গত কয়েক বছর যাবৎ নারীদের মধ্যে যে সংগ্রামের শক্তি ও সাহস লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মহিলারা প্রবল বিক্রমে লড়াই করছেন। তেভাগা ও তেলাঙ্গানা আন্দোলনে, প্রাথমিক শিক্ষিকা, টেলিফোন কর্মী, নার্স, সূতাকল শ্রমিক প্রভৃতির আন্দোলনে তাঁদের দীর্ঘস্থায়ী, কষ্টসাধ্য ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু সচেতন ভাবে নারী আন্দোলনের জন্য গঠিত ফ্রন্ট মধ্যবিত্ত গৃহবধূদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, এবং এদের জন্যও খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির লড়াইয়ের কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। সুতরাং বলার মত কোনও আন্দোলন মহিলা ফ্রন্টের নেতৃত্বে করা যায়নি।

আজকের ক্রমবর্ধমান সংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও ছাঁটাইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক, কৃষক ও কর্মে নিযুক্ত মহিলা এবং শ্রমিক ও নিম্ন পদস্থ কর্মচারীদের স্ত্রীদের একত্র করে আন্দোলন গড়ে তোলার সময় এসেছে। আমাদের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সমস্ত কর্মসূচি এই উদ্দেশ্যে তাঁদের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং এই কর্মসূচির জন্য লড়াইয়ে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের সমবেত করতে হবে। সেই সঙ্গে নারীদের প্রতি যে চিরাচরিত অসাম্য, নির্যাতন, কুসংস্কার, প্রভৃতি রয়েছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামকেও গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের এক আবশ্যিক অঙ্গ হতে হবে।

মহিলাদের নিজস্ব দাবি দাওয়ার পাশাপাশি শ্রমিক, কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষের শ্রেণিগত দাবির লড়াইকে বেশি বেশি করে মহিলাদের সমবেত করা অত্যন্ত জরুরি। পার্টিকে নজর দিতে হবে যে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত খেটে খাওয় মহিলারা যেন বেশি সংখ্যায় মহিলা ফ্রন্টে সমবেত হন। মহিলাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আগামী দিতে তাদের চেতনা আরও বাড়বে এবং তাহলেই জনসংখ্যার অর্ধেককে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে এক শক্তিশালী ও নিয়ামক অংশীদারের ভূমিকায় আমরা পাব।

দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের মধ্যে কাজ

স্বৈরাচারী ও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো সম্পন্ন এবং ন্যূনতম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিবর্জিত ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদী-সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোর দুর্বলতম গ্রন্থি। এই রাজ্যগুলি গণবিক্ষোভের এক আঘাতে ভেঙে পড়বে। এইসব রাজ্যের গণভিত্তি বিবর্জিত শাসকরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও আর এস এসের কাঁধে ভর করতে চাইছে এবং জনরোষকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার জন্য মুসলিম গণ হত্যার উস্কানি দিচ্ছে।

তাদের এইসব প্রয়াস ও প্রবল দমন নিপীড়ণ সত্ত্বেও স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণ ঐক্যবদ্ধ। সম্প্রতি কোনও কোনও দেশীয় রাজার সঙ্গে প্রজামণ্ডলের চুক্তি অনুযায়ী পুরোনো ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হলেও, তা সফল হবে না, কারণ কংগ্রেসের নেতাদের

মত জনসাধারণকে স্তোকবাক্যে থামিয়ে রাখার মত জনমান্যতা প্রজা মণ্ডলের নেই।

প্রজা মণ্ডলের প্রস্তাব অনুযায়ী রাজা রাজড়াদের টিকিয়ে রেখে অর্ধেক গণতন্ত্র লাভের কোনও অর্থ নেই। দেশীয় রাজ্যে স্বৈর শাসকদের আমূল উচ্ছেদ চাই। ওদের প্রস্তাব মানতে গিয়ে আমরা প্রজা মণ্ডলের পিছনে পড়ে গেছি। তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের স্বাধীনভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়তে হবে।

জনসাধারণের আন্দোলন কী পরাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারে তা দেখা গেছে কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ বা ত্রিবাঙ্কুরে। এইসব লড়াই সংস্কারবাদীরা শুরু করলেও তা এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে যে স্বৈরতন্ত্র ভয়ে কাঁপছে। এতেই বোঝা যায় যে ঠিকভাবে পরিচালিত হলে জনগণ এইসব রাজ্যে অপরাজেয়।

তেলেঙ্গানার কমিউনিস্ট ও অন্ধ্র মহাসভা পরিচালিত আন্দোলন তার প্রমাণ। নিজামের পুলিশ ও ফ্যাসিস্ট মজলিশ-এ-ইত্তেহাদ-উল-মসলিসিনদের সন্ত্রাস সত্ত্বেও তেলেঙ্গানার জনগণ ২০০০ গ্রামকে মুক্ত করেছে এবং তারা জমি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে, বুর্জোয়ারা বিবশ করে না দিলে লড়াই কতদূর যেতে পারে, জনগণ তা দেখিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যে লড়াইয়ের নেতৃত্বে থেকেছে প্রজা মণ্ডল বা রাজ্য কংগ্রেস। তারা জনসাধারণকে দাবার ঘুটির মত ব্যবহার করে সামন্তদের সঙ্গে ঘৃণ্য চুক্তি সম্পন্ন করছে এবং চুক্তির অবকাশ এলেই আন্দোলন থামিয়ে দিচ্ছে।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার চৌহদ্দির মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা বা না করাকেই প্রধান প্রশ্ন করে তোলাটা ছিল বুর্জোয়াদের একটা কৌশল। কোনও কোনও দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগদানের বিরুদ্ধে একটা ছদ্ম প্রতিবাদ করেছে এবং তাকে প্রতিহত করে কংগ্রেস সরকার ছদ্ম বীর সেজেছে, এবং সেই অবসরে মানুষের গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়াগুলি আড়ালে চলে গেছে। বুর্জোয়ারা দেশীয় সামন্তদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অর্থনৈতিক শোষণের একটি অভিন্ন মুক্ত বাজার তৈরি করে নিয়েছে। সামন্তরা এই সুযোগে গণরোষ থেকে অব্যাহতি পেয়ে নিজেদের জমিজমা ধনরত্ন নিয়ে বহাল তবিয়তে আছে। এই জন বিরোধী চক্রান্তকে প্রকাশ করে দিতে হবে!

যেখানে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের সংযুক্তি ঘটছে, সেখানে দেশীয় রাজারা নিশ্চিন্তে থাকছে, আর যে সব জায়গায় কয়েকটি দেশীয় রাজ্য মিলে একটি যুক্তরাজ্য গঠিত হচ্ছে— যেমন কাথিওয়াড়ে বা মধ্য ভারতে— সেখানে জনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ক্ষমতাসীন হচ্ছে। যা সামান্য সংস্কার এসব জায়গায় হয়েছে তাতে বুর্জোয়ারা কণিষ্ঠ শরিক হিসেবে কিছু ক্ষমতা পেলেও জনগণের চাপ কমে এলেই তারা ক্ষমতাচ্যুত হবে। বস্তুত বিভিন্ন রাজ্যে রাজন্যবর্গ, জমিদার ও জায়গিরদাররা, আর এস এস, হিন্দু মহাসভা ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তিকে জনগণের সংগ্রামের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও গুণ্ডাবাজিতে লেলিয়ে দিচ্ছে, যাতে গণতান্ত্রিক দাবি আর উত্থাপিত না হয়। রাজন্যবর্গ মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করছে ও মুসলমানদের বিতাড়িত করছে।

বুর্জোয়ারা যখন এভাবে আপস করছে তখন আমাদেরও স্বৈরতন্ত্রের সম্পূর্ণ অবসান দাবি না করা এবং কেবল সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সীমাবদ্ধ থাকা হবে জনসাধারণের সংগ্রাম ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি অবমাননা।

এইরকম ভুল হবে প্রগতিশীল শক্তির সাংগঠনিক দুর্বলতার অজুহাতে আপসকামীদের পিছনে দাঁড়ানো ও তার দ্বারা 'জনপ্রিয়তা' অর্জন করা। কারণ স্বৈরতন্ত্রের অবসানের মত একটি বুনিয়াদি দাবি কখনো সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে পরিত্যাগ করা চলে না। যদি এই সঠিক দাবি উত্থাপন করতে গিয়ে আমরা আক্রান্ত হই ও আমরা সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, তাহলেও তাকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। সামন্তশাসন অবসানের দাবি থেকে আমরা কখনো সরে আসতে পারিনা।

দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লড়াইকে আমাদের অবিচলভাবে সমর্থন করতে হবে। সংস্কারবাদীদের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ কালেও আমরা আমাদের মূল দাবিগুলি ভুলতে পারিনা। লড়াইয়ে সবার সাথে থাকা, আপসের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং লড়াইকে আমাদের মূল লক্ষ্যে পরিচালিত করা— এই হল আমাদের কাজ। আমাদের দ্বিধাহীন অবস্থান ও আমাদের সুস্পষ্ট কর্মসূচি দ্রুত রাজ্যের সংগ্রামী শক্তিকে আমাদের চারপাশে সমবেত করবে। শ্রমিকশ্রেণি দ্বিধাগ্রস্থ হলে এই ঐক্য ব্যাহত হবে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে তা ফাটল ধরাবে।

অস্পৃশ্যগণ

দেশের সবচেয়ে শোষিত ও নির্যাতিত দেশের ছ' কোটি অচ্ছুৎ মানুষ আমাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এক শক্তিশালী অতিরিক্ত বাহিনী। কংগ্রেস অচ্ছুৎদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিকে জাতীয় মুক্তির সাধারণ সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করতে সর্বদাই অস্বীকার করে এসেছে এবং ফলে ডঃ আম্বেদকরের মত সংস্কারবাদী ও বিভেদকামী নেতা তাদেরকে জাতীয় মুক্তির লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পেরেছেন। তিনি এই বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন যে সাম্রাজ্যবাদের ওপর ভরসা করে অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়।

এঁদের এই নীতির শূন্যগর্ভতার প্রমাণ হল এই যে যখন আম্বেদকর ও মণ্ডলের মত নেতারা মন্ত্রী হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মন্ত্রীমণ্ডলীতে শোভা পাচ্ছেন, তখন এই দু দেশের অস্পৃশ্য মানুষেরা আগেকার দুরবস্থার মধ্যেই পড়ে রয়েছে, আইনের চোখে সমতার প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই তাদের মেলেনি। কংগ্রেস এবং অস্পৃশ্যদের নেতারা— উভয় পক্ষই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শোষণের বিরুদ্ধে দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া তাদের মুক্তি সম্ভব নয়।

সাম্প্রতিককালে শহরে ও গ্রামে দুর্বিসহ জীবনের ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে এরা বড় বড় লড়াই করেছে। বোম্বাই, নাগপুর ও অন্যান্য স্থানে অস্পৃশ্যরা জনগণের সাধারণ সংগ্রামে বেশি বেশি করে সামিল হচ্ছে এবং ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দিচ্ছে। তাদের রাজনৈতিক চেতনা দ্রুত বাড়ছে।

এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে অস্পৃশ্যদের নিয়ে আসা, উচ্চ বর্ণের শ্রমিক কৃষকদের জাতপাতের সংস্কার ভেঙে দেওয়া এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জাতপাত নির্বিশেষে সকলকে একত্রিত করা আমাদের কাজ। এই উদ্দেশ্যে উচ্চবর্ণের বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ ও অচ্ছুৎদের বিভেদপন্থী নেতাদের মুখোশ উন্মোচন করা এবং সকলের ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রামই যে অচ্ছুৎদের মুক্তির পথ, এ কথা বোঝানো আমাদের কর্তব্য। তাদের প্রতি প্রতিটি অসাম্যকে

বুর্জোয়াদের জনসাধারণকে বিভক্ত রাখার কৌশল হিসেবে ধিক্কার জানাতে হবে, এবং তাদের প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত দাবিকে সমস্ত জনগণের অধিকারের জন্য সংগ্রামের অংশ হিসেবে নিয়ে লড়তে হবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

সংখ্যালঘু নিগ্রহকারীদের পরাস্ত না করা গেলে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে বারবার ভাঙ্গন ধরবে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বার বার মুসলিম সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করছে। এইসব আক্রমণের মধ্যে কোনও ধর্ম বা সম্প্রদায় নেই, আসলে এ সবই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সৈনিকদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী লড়াই বাঁধিয়ে আন্দোলনকে দুর্বল করা। শত্রুরা জানে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তাকে থামাবার এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

অতএব, শ্রমিকশ্রেণি ও কমিউনিস্ট পার্টিকে হিন্দু ও মুসলিম উভয় প্রকার সাম্প্রদায়িকতাবাদের ও যে কোনও দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়তে এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংখ্যালঘুদের অধিকারের পক্ষে এবং তাদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণি যদি অন্যান্য শ্রেণিকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে, তা হলে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কখনো জয়যুক্ত হতে পারে না।

যুদ্ধের বিপদ

সাম্রাজ্যবাদীদের মতলবই হল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সব সময় বৈরিতা জাগিয়ে রাখা, যাতে যে কোনও একটি দেশে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সামান্যতম লক্ষণ দেখা দিলেই দু দেশকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে বিপ্লব এড়ানো যায়। এই যুদ্ধোন্মাদনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে এবং জোরের সাথে বলতে হবে যে উভয় দেশেরই শোষিতদের স্বার্থ এক, এবং তা হল শোষকের বিরুদ্ধে এবং উভয়েরই অভিন্ন শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

সর্বদা সচেতন না থাকলে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের ক্রীড়নক বুর্জোয়াদের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। সরকারের পিছনে জনসমর্থন বজায় রাখার জন্যই যদিও আজ যুদ্ধের প্রচার চালানো হয়ে থাকে, তাহলেও কাশ্মীরের মত প্রকৃত সমস্যাও আছে, যা সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। এ ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণির স্পষ্ট মত হল এই যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং কৃষকদের সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্তির মূল দাবি পূরণ ভিন্ন উভয় রাষ্ট্রের নিছক এলাকা দখলে সাধারণ মানুষের কোনও স্বার্থ নেই। সাধারণ মানুষের স্বার্থ হল সাম্রাজ্যবাদের ও শোষক জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়াই, এদের নির্দেশে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি নয়। কাশ্মীর বা অন্য যে কোনও প্রসঙ্গেই সংঘর্ষ বাধুক না কেন শ্রমিকশ্রেণিকে এই অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উদ্দেশ্য দাঙ্গা বাঁধানো, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিভক্ত করা। এইসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিটি রাজ্যে, প্রতিটি শহরে, প্রতিটি মহল্লায়, ট্রেড ইউনিয়নে ও কিষাণ সভায় অনলস প্রচার চালিয়ে যেতে হবে এবং দাঙ্গা বিরোধিতার পথে নামতে হবে। তাহলেই গণতান্ত্রিক লড়াই শক্তিশালী হবে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের লড়াই

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি মেনে নেওয়ার অস্বীকৃতি ও আপসের নীতির পরিণতিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারত বিভাগের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। প্রভাবশালী বুর্জোয়াদের চাপে কংগ্রেস আজও একই অপরাধ করে চলেছে,— মহারাষ্ট্র, কেরালা, তামিলনাদ প্রভৃতির জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তারা মেনে নিতে অস্বীকার করছে। এই নীতির ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা তার সুযোগ নেবে। পার্টিকে তাই জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য এবং তা গঠনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার সপক্ষে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে।

বৈদেশিক নীতি

ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি সাম্রাজ্যবাদের সহচর। কিন্তু গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শিবিরের প্রতি এবং ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের পক্ষে দেশের জনসাধারণের বিপুল সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের আসল আনুগত্যকে গোপন করে 'নিরপেক্ষতা'র কথা বলছে যা নগ্ন সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে সাহসের সঙ্গে বলতে হবে যে দেশের মধ্যে শোষক ও শোষিতের মধ্যে যেমন, বিশ্বের ক্ষেত্রেও তেমনি সাম্রাজ্যবাদ এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক্তির লড়াইয়ে নিরপেক্ষতা সম্ভব নয়।

দেশের সরকারের বিদেশনীতিতে প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে এবং প্রতিটি দেশের গণতান্ত্রিক স্বার্থের পক্ষে জনসাধারণকে সমবেত করতে হবে। বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের ও সোশ্যালিস্ট নেতাদের সোভিয়েত বিরোধী কুৎসার বিরুদ্ধতা করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও স্থায়ী শান্তির জন্য সংগ্রামে বিশ্বমানবের নেতা হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

চিনের বিপ্লবের গৌরবময় সাফল্যকে এবং এর আন্তর্জাতিক বিশেষত এশিয়ার জনগণের পক্ষে গুরুত্বকে জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে।

ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের বিপ্লবকে চূর্ণ করার সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াসের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার ও গণ-সমাবেশ সংগঠিত করতে হবে।

ভারতকে একটি প্রধান ভূমিকায় রেখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'প্রতিরক্ষা জোট' গঠনের জন্য ব্রিটিশ, ফরাসি ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরা যে চক্রান্ত করছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাদের এই পরিকল্পনা সফল হলেই তাদের এই এলাকা পুনর্দখলের স্বপ্ন পূরণ হয়ে যাবে।

জনগণকে নেতৃত্ব দাও

জাতীয় নেতৃবৃন্দের বন্ধ্যা নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ জনসাধারণের আংশিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামগুলির তাৎপর্য বর্তমানের ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিকায় অপরিসীম। এইসব লড়াইয়ের পক্ষে অধিকতম সংখ্যক মানুষকে সমবেত করার জন্য পার্টিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে, কারণ দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ যখন বর্তমান সংকটের

দ্বারা আক্রান্ত, তখন আমাদের অর্থনীতির প্রধান শত্রু রূপে কায়েমি স্বার্থকে চিহ্নিত করা সবচেয়ে সহজ হবে।

সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসর বুর্জোয়ারা ভাবছে যে দেশের অধিকাংশকে মোহে বশীভূত করে এবং বাকি অংশের ওপর নির্যাতন চালিয়ে তারা বিপ্লবের তরঙ্গকে রুখে দেবে। দাঙ্গার মধ্য দিয়ে তাদের দালালরা সে চেষ্টাই শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাগ্য কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণির অনুসৃত সঠিক নীতির ওপর নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক শক্তির প্রবল ক্ষমতা এবং বুর্জোয়া নেতৃত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের মোহ— উভয়ের সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। শ্রমিকশ্রেণির পার্টি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হবে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়, বিশ্বাসঘাতকদের মুখোশ খুলে দিয়ে জনসাধারণের মোহভঞ্জন এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি হলে পুঁজিবাদের অন্তর্বর্তী স্তরকে বাদ দিয়েই আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পর্যায়ে পৌঁছে যাব। বর্তমানের বিশ্ব সংকটের পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণির স্বাধীন ভূমিকা ও কার্যাবলিই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যকে নিশ্চিত করতে পারে। শ্রমিকশ্রেণি তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হলে, এবং কমিউনিস্টরা গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে জনগণকে সমবেত করতে ও বিপুল সংখ্যক মানুষকে জনগণতন্ত্রের জন্য সক্রিয় করে তুলতে পারলেই কেবল তা সম্ভব।

পার্টির গণভিত্তি প্রসারের প্রয়োজনীয়তা আজকের মত তাই কখনো ছিলনা। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, যুব, নারী ও নির্যাতিত সংখ্যালঘু— সকলের মধ্যে পার্টির ভিত্তিকে প্রসারিত করে একটি গণপার্টিতে একে রূপান্তরিত করতে হবে। সকল ফ্রন্ট থেকে লড়াকু মানুষদের পার্টির মধ্যে নিয়ে এসে তাদের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে শিক্ষিত করতে হবে, যাতে তারা জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে।

বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে শ্রমিকশ্রেণি থেকে লড়াকুদের টেনে আনা, তাদের শিক্ষিত করা, তাদের হাতে পার্টির দায়িত্ব দেওয়া ও পার্টির মধ্যে সর্বহারার গুরুত্ব বৃদ্ধি করা। সচেতন, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে সম্পূর্ণ শিক্ষিত সভ্যদের নিয়ে গণ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনই হোক আমাদের রণধ্বনি।

টিকা : এই রাজনৈতিক থিসিসটি সম্পর্কে পাঠককে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে এখানে মুদ্রিত হল। বাংলায় অনুবাদের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন প্রদীপ দাশগুপ্ত। তবে এর পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে CPI-Documents, Vol VII, Ed. by MBRao, P. 1-118. (- সম্পাদক)

বিদেশে ভারতের বন্ধুদের দৃষ্টিতে দেশের "স্বাধীনতা"

ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হ্যারি পলিট লিখিয়াছেন, এক বছর আগে কমিউনিস্টরা সাবধান করিয়া ছিল যে, 'মাউন্টব্যাটেন মার্কা 'স্বাধীনতা' প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, গত এক বছরের অভিজ্ঞতায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

তারপর মিঃ পলিট ভারত ও পাকিস্তানবাসীদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, "আজিকার দুনিয়া দুই শিবিরে বিভক্ত, একদিকে গণতন্ত্র ও শান্তির শিবির, অপর দিকে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের শিবির। এখানে নিরপেক্ষতার স্থান নাই। নিরপেক্ষতা আসলে ডলার সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বকে ঢাকিবার আবরণ। বৈদেশিক নীতিতে এই নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করাই নেহরুর পক্ষে সবচেয়ে বড় ভুল হইয়াছে। ইহার ফলে তাহারা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে খেলিতেছেন, সাম্রাজ্যবাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার জন্য লাইনে দাড়াইয়াছেন, মার্কিন কায়েমী স্বার্থ ভারতীয় জনসাধারণকে শোষণের জন্য যে শর্ত দিবে তাহা নীরবে গ্রহণ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিতেছেন।

সর্বশেষে পলিট বলেন, কোন দেশেই গভর্নমেন্টের বৈদেশিক নীতি হইতে অভ্যন্তরীণ নীতিকে ভিন্ন করিয়া দেখা যায় না। বার্মা মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীনের গণতান্ত্রিক জাতীয় জাগরণের বিরুদ্ধে ভারত তাহাদের প্রাচ্যের ঘাঁটি হিসাবে কাজ করিবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইহাই চাহে। তাহার জন্যই ভারতের অভ্যন্তরে দমন-নীতি এবং অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়াছে।

ডি.এন.প্রিট (ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'স্বতন্ত্র' সদস্য)
... "একদিন যে সকল নেতাকে প্রশংসা করিতাম, তাঁহারা আজ ব্রিটিশেরই মত আমাদের আরো বেশি প্রশংসাভাজন শ্রমিক নেতাদের আটক করিতেছেন।

জন প্লাটস মিল (বিলাতের বামপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতা)
মন্তব্য করেছেন যে, ইহাকে বড় জোর আধা-স্বাধীনতা বলা চলে। ভারতের সমাজতন্ত্রীদের লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, ভারতে বামপন্থী সমাজতন্ত্র, কমিউনিস্ট, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং কৃষক নেতাদের নির্যাতনের সংবাদ, বিলাতের প্রগতিবাদীদের ভীষণভাবে আঘাত করিয়াছে। কিন্তু তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে সাম্রাজ্যবাদীরা ঘড়ির কাঁটা উল্টাইয়া দিতে পারে না।...

নতুন সংবাদ ১৯/৮/৪৮

সহায়ক তথ্য - ৩

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র

ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য (Explanatory Note)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ১৯৪৮ সালের ৬ই মার্চ তারিখে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

"কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, অতঃপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনসমূহ ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। বর্তমানে যে-সব পার্টি কমিটি ও ইউনিট পাকিস্তানে রহিয়াছে একটি আলাদা পার্টিতে সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা তাহাদের থাকিবে।"

এই পুস্তিকায় যে-গঠনতন্ত্র লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, উহা উপরের প্রস্তাবের শর্ত অনুসারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ সংগঠনসমূহের গঠনতন্ত্র।

প্রস্তাবনা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতিক পার্টি। ইহা তাঁহাদের অগ্রগামী এবং সর্বাপেক্ষা সংগঠিত বাহিনী,— তাঁহাদের শ্রেণি-সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ।

মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের শিক্ষানুসারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণির, কৃষকদের ও মেহনতী জনসাধারণের অন্যান্য অংশের নেতৃত্বের ভূমিকা এইভাবে পালন করে যে সফল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লব ও কৃষি বিপ্লবের জন্য, পরিপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, শ্রমিক শ্রেণির দ্বারা পরিচালিত জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজবাদ ও শ্রেণিহীন সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া শ্রেণির একনায়কত্ব স্থাপনের জন্য,— ইহা তাঁহাদের সংগ্রামে সংগঠিত করিয়া তোলে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একটি দৃঢ়-সংবদ্ধ (অখণ্ড) সংগ্রামকারী সংগঠন। সংহতি ও লৌহ-কঠোর শৃঙ্খলা থাকার কারণে ইহা শক্তিশালী। পার্টির ইচ্ছা ও কাজের ঐক্যের মধ্যে ইহার শক্তি নিহিত রহিয়াছে, যে-শক্তি পার্টির কর্মসূচী হইতে কোন বিচ্যুতি, কোন পার্টি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করণ এবং পার্টির ভিতরে উপদলসমূহ গঠনকে প্রশ্রয় দেয় না।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি উহার মেম্বরদের নিকট হইতে পার্টির কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ দাবি করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মসূচী কার্যে পরিণত করার জন্য পার্টি ইহার সদস্যদের নিকট হইতে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ দাবি করে।

ইহা আরও দাবি করে যে পার্টি সভ্যরা পার্টির গঠনতন্ত্র মানিয়া চলুক, পার্টির সমস্ত সিদ্ধান্তকে কাজে প্রয়োগ করুক এবং ভারতের বিভিন্ন জাতির মেহনতী জনতা ও জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের মেহনতি জনতার মধ্যে ভ্রাত্রীয় আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে শক্তিশালী করিয়া তুলুক।

শ্রমজীবী জনসাধারণের সমস্ত সংগঠনের ভিতরে এবং জনগণের ভিতরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করিবে। উদ্দেশ্য হইবে ভারতে আশু জনসাধারণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য এবং কমিউনিজমের প্রথম ধাপ স্বরূপ সমাজবাদ স্থাপনের জন্য জনসাধারণকে সংস্কারবাদীদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া নিজেদের দিকে টানিয়া আনা।

প্রথম ধারা

নাম

এই সংগঠনের নাম হইবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

দ্বিতীয় ধারা

প্রতীক পরিচয়-চিহ্ন

একটি পাঁচ কোণওয়ালা লাল তারা পার্টির প্রতীক বা পরিচয়-চিহ্ন হইবে। এই তারার কেন্দ্রস্থলে মজুর ও কৃষকের ঐক্যের চিহ্ন স্বরূপ হাতুড়ি ও কাস্তে আড়াআড়িভাবে বসানো থাকিবে। কাস্তে ও হাতুড়িকে ঘিরিয়া বৃত্তাকারে লেখা হইবে "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।"

তৃতীয় ধারা

সভ্যপদ

উপধারা-১ ॥ "দেশীয় রাজ্যগুলি"সহ সমগ্র ভারতের মানবগোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আঠারো বৎসর বা উহার বেশি বয়সের যে কোন অধিবাসী মজুর শ্রেণির প্রতি যাঁহার আনুগত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না, পার্টির সভ্যপদের অধিকারী হইতে পারিবেন।

মন্তব্য : ১৪ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক তরুণ কমরেডদের স্বতন্ত্র সেলে সংগঠিত করা হইবে। তাঁহারা গণ-সংগঠনসমূহের, যথা— ছাত্র ইউনিয়ন ও যুব লীগ সমূহের মধ্যে ফ্রাকশন হিসাবে কাজ করিবেন। তাঁহাদের তরুণ কমিউনিস্ট হিসাবে গণ্য করা হইবে। তাঁহারা নির্বাচনে বা পার্টির প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করিবেন না। তবে তাঁহারা স্ব স্ব অঞ্চলের পার্টি কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

উপধারা-২ ॥ যিনি পার্টির কর্মসূচী গ্রহণ করেন, যিনি কোন না কোন পার্টি সংগঠনে কাজ করেন, পার্টির সিদ্ধান্ত মানিয়া চলেন এবং নিয়মিত সভ্য চাঁদা দেন তিনিই সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

উপধারা-৩ ॥ পার্টি সভ্যপদের জন্য প্রত্যেকটি দরখাস্ত ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় সেলের নামে করিতে হইবে। দরখাস্তকারীকে তাঁহার কর্মস্থলে ও আবাসস্থলে ভাল করিয়া চিনেন, অন্তত এই রকম দুইজন পার্টি সভ্য দ্বারা তাঁহার দরখাস্তটি অনুমোদিত হওয়া দরকার। সেলসমূহের দ্বারা

সংগৃহীত নূতন সদস্যের সদস্যপদ অবশ্যই পার্টির স্থানীয়, শহর বা জেলা কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

মন্তব্য : (১) যদি অন্য রাজনীতিক দলের নেতৃস্থানীয় সদস্য পার্টিতে আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পার্টির সভ্যপদ দিবার পূর্বে স্থানীয়, শহর ও জেলা কমিটির সম্মতির উপরেও প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মতি লওয়া প্রয়োজন হইবে। (২) পার্টি হইতে একবার বহিষ্কৃত সদস্যদের একমাত্র প্রাদেশিক কমিটিই পুনরায় (পার্টিতে) গ্রহণ করিতে পারিবেন।

চতুর্থ ধারা

পার্টিকে দেয়

উপধারা-১ ॥ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ধার্যহারে সভ্য চাঁদা প্রত্যেক সভ্য প্রতি মাসে দিবেন। কৃষকদের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া নির্দিষ্ট সময় অন্তর সভ্য-চাঁদা সংগ্রহ করা চলিবে।

মন্তব্য : সেলের সুপারিশ অনুসারে স্থানীয়, বা শহর কমিটি বেকারী ইত্যাদি কারণে যে-কোন সভ্যকে সভ্য চাঁদা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

উপধারা-২ ॥ সভ্য চাঁদা হইতে যাহা আয় হইবে তাহা জেলা কমিটিতে যাইবে।

উপধারা-৩ ॥ জেলা, প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় কমিটি তাহাদের তহবিলের জন্য সভ্যদের আয়ের উপর চাঁদা (levy) ধার্য করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবে।

পঞ্চম ধারা

সভ্যদের অধিকার ও দায়িত্ব

উপধারা-১ ॥ পার্টির সভ্যকে কঠোরতম শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হইবে; সক্রিয় ও নিয়মিতভাবে পার্টির ও দেশের রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে এবং পার্টি সংগঠনের সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে।

উপধারা-২ ॥ তত্ত্বমূলক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য এবং পার্টির প্রধান রাজনীতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করিয়া পার্টির বাহিরের জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করিবার জন্য পার্টি সভ্যকে অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

উপধারা-৩ ॥ বিশেষ কারণে অব্যাহতি না দিলে একজন পার্টি সভ্যকে তিনি যে-গণ-প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদের অধিকারী তাঁহাকে সেই গণসংগঠনের (ট্রেড ইউনিয়ন, কিষান সভা ইত্যাদি) সভ্য হইতে হইবে এবং পার্টি কমিটির নেতৃত্বে সেখানে কাজ করিতে হইবে।

উপধারা-৪ ॥ স্থানীয় কমিটি হইতে কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত পার্টির প্রত্যেক পরিচালক-কমিটি পার্টি সভ্যপদের প্রত্যক্ষ ভোটে বা পার্টি সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক কমিটিকে তাহাদের কার্যাবলী সম্পর্কে তাহাদের পার্টি সংগঠনের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

উপধারা-৫ ॥ প্রদেশ ও জেলার ব্যাপারে, পার্টির সাধারণ নীতি এবং সিদ্ধান্তের কাঠামোর মধ্যে

তথাকার পার্টি সংগঠনের পূর্ণ উদ্যোগ ব্যবহারের এবং সিদ্ধান্ত লইবার অধিকার আছে।

উপধারা-৬।। আদ্যোপান্ত আলোচনার পর সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে পার্টি নীতি নির্ধারিত হইবে। সংখ্যা লঘিষ্ঠরা এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করিতে বাধ্য থাকিবেন।

উপধারা-৭।। পার্টি সদস্যদের পার্টি সংগঠন বা কমিটির সিদ্ধান্তের সহিত মতানৈক্য ঘটিলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চতম সংস্থা কেন্দ্রীয় কমিটি ও সারা-ভারত (পার্টি) কংগ্রেসের কাছে তাঁহাদের আপীল করিবার অধিকার থাকিবে। সারা-ভারত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে। আপীল-বিচারাধীন থাকা অবস্থায় অবশ্যই প্রত্যেক পার্টি সদস্যকে সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে হইবে।

উপধারা-৮।। কোন সদস্য তাঁহার জেলা বা প্রাদেশিক কমিটির অনুমতি লইয়া এক জেলা বা প্রদেশ হইতে স্থানান্তরিত হইতে পারিবেন। অন্য আর এক দেশে স্থানান্তরিত হইতে হইলে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি লওয়া প্রয়োজন হইবে।

উপধারা-৯।। কোন সদস্যের বহিষ্কারের প্রশ্ন উক্ত সদস্য যে সেল বা পার্টি ইউনিটের সভ্য সে সেল বা ইউনিটের সভায় মীমাংসিত হইবে। এই সিদ্ধান্ত জেলা কমিটি বা উচ্চতর কমিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পার্টির কাজ হইতে অপসারিত করা চলিবে।

ষষ্ঠ ধারা

পার্টির কাঠামো

উপধারা-১।। যে-মূল নীতির উপরে পার্টির কাঠামো ও সংগঠনের ভিত্তি স্থাপিত আছে তাহার নাম গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ। ইহার অর্থ হইতেছে যে—

ক) উপর হইতে নীচে পর্যন্ত পার্টির সমস্ত পরিচালক যন্ত্র (অর্থাৎ, পার্টি কমিটিগুলি) নির্বাচিত হইয়া থাকে।

খ) পরিচালক পার্টি কমিটিগুলি সময় সময় উহাদের কাজ সম্বন্ধে পার্টি সংগঠনগুলির নিকটে রিপোর্ট করিবে।

গ) পার্টিতে কঠোরতম শৃঙ্খলা চালু থাকিবে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠরা মানিয়া চলিবেন।

ঘ) পার্টির প্রত্যেক সংগঠন, প্রত্যেক শাখা এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক পার্টি সভ্য আপন ইচ্ছা, প্রস্তাব, মন্তব্য ও অভিযোগ সোজাসুজি পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটিকে যে-কোনো সময়ে জানাইতে পারিবেন।

ঙ) কেন্দ্রীয় কমিটি ও উচ্চতর পার্টি সংগঠনের সিদ্ধান্ত নিম্নতর পার্টি সংগঠনগুলি ও সমস্ত পার্টি সভ্যের পক্ষে বিনা প্রশ্নে মানিয়া লওয়া বাধ্যতামূলক হইবে।

সপ্তম ধারা

প্রাথমিক ইউনিট

উপধারা-১।। পার্টির বুনিয়াদি এবং নিম্নতম সংগঠন হইল সেল। ইহা শিল্প বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত হয়। কোন ফ্যাক্টরী, মিল, ডিপার্টমেন্ট, বাগান, ইউনিট, বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তিন বা উহার বেশি পার্টি সভ্য লইয়া একটি সেল গঠিত হয়। যে-সব পার্টি সভ্যকে ফ্যাক্টরী

সেল ইত্যাদিতে সংগঠিত করা যাইবে না তাঁহাদের রাস্তা, অঞ্চল, চাল, বস্তী, ওয়ার্ড বা গ্রাম সেলে সংগঠিত করা হইবে।

উপধারা-২।। যে এলাকা বা সীমানায় সেল গঠিত হয় সেই এলাকা বা সীমানার শ্রমিক ও কৃষক সাধারণ এবং অন্যান্য নাগরিকদের সহিত পার্টির নেতৃস্থানীয় কমিটির যোগসূত্র সেল বজায় রাখে। ইহার কাজ হইল—

ক) উচ্চতর কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা।

খ) উহার ফ্যাক্টরী ইত্যদির বা এলাকার জনসাধারণকে পার্টির রাজনীতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের পথে টানিয়া আনা।

গ) জঙ্গী ও দরদীদের নূতন সভ্য হিসাবে টানিয়া আনা এবং তাঁহাদের রাজনীতিক ভাবে শিক্ষিত করা।

ঘ) জেলা, স্থানীয় বা শহর কমিটিকে উহাদের রোজকার সাংগঠনিক ও আন্দোলনের কাজে সাহায্য করা।

উপধারা-৩।। চলতি কাজ সম্পাদনের জন্য সেল উহার সভায় একজন সম্পাদক নির্বাচন করিবে। এই নির্বাচন স্থানীয়, শহর বা জেলা কমিটির দ্বারা অনুমোদিত হইবে।

অষ্টম ধারা

জেলা সংগঠন

উপধারা-১।। জেলা, শহর ও অঞ্চলের এলাকার সমস্ত সেল লইয়া জেলা, শহর বা স্থানীয় কমিটি গঠিত হইবে। প্রাদেশিক কমিটি এই এলাকা নির্ধারিত করিয়া দিবে। সাধারণভাবে শাসনতান্ত্রিক বিভাগ অনুসরণ করিয়া সীমানা নির্ধারিত হইবে। পরবর্তী উচ্চতর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ এইসব সংগঠন গঠিত হইবে।

মন্তব্য : জেলা ও সেলসমূহের মধ্যবর্তী কমিটি হইল স্থানীয় ও শহর কমিটিসমূহ। জেলা কমিটি সময় সময় ইহাদের এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

উপধারা-২।। জেলা, শহর বা স্থানীয় সংগঠনের সর্বোচ্চ সংস্থা হইল জেলা, শহর বা স্থানীয় সম্মেলন (কন্‌ফারেন্স)। প্রতি বৎসর অন্তত একবার সম্মেলনের অধিবেশন করিতে হইবে। জেলা বা প্রদেশিক কমিটির বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন। এই সম্মেলন, জেলা, শহর বা স্থানীয় কমিটির রিপোর্ট আলোচনা ও অনুমোদন করিবে। সম্মেলন জেলা, শহর বা স্থানীয় কমিটি নির্বাচিত করিবে। কমিটির আয়তন উক্ত সম্মেলন নির্ধারণ করিবে। সম্মেলন প্রাদেশিক বা জেলা সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধিও নির্বাচন করিবে। এই প্রতিনিধির সংখ্যা পূর্বাহ্নেই প্রাদেশিক কমিটি নির্ধারণ করিবে।

দুইটি জেলা, শহর বা স্থানীয় সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে জেলা, শহর বা স্থানীয় কমিটি হইল জেলা শহর বা স্থানীয় উচ্চতম পার্টি সংগঠন।

উপধারা-৩।। জেলা, শহর বা স্থানীয় কমিটি একজন সম্পাদক নির্বাচন করে (প্রাদেশিক বা জেলা কমিটিকে দিয়া এই নির্বাচন অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে), নিম্নতর ইউনিট ও গণ-সংগঠনের ফ্রাকশন গঠনও অনুমোদন করে, সভ্য চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করে, নিম্নতর ইউনিটসমূহের ও গণ-সংগঠনের ভিতরে ফ্রাকশনসমূহের কাজ তদারক করে। জেলা, শহর বা

অঞ্চলের তহবিলের ভারও উহাদের উপর ন্যস্ত থাকে। নিজেদের সম্মেলন করা সম্ভব না হইলে উচ্চতর কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ উহারা পরবর্তী উচ্চতর কমিটির সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে।

পারদর্শিতার সহিত কাজ চালাইবার জন্য জেলা, শহর বা স্থানীয় কমিটির সভ্যরা উক্ত কমিটির প্রধান কাজগুলি নিম্নলিখিত রূপে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে পারেন—

সমগ্রভাবে কমিটির কাজের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব থাকিবে সম্পাদকের উপর।

- নিম্নতর ইউনিটসমূহের কাজ পরীক্ষা করার জন্য সংগঠক।
- গণ-সংগঠনসমূহের ভিতরে ফ্রাকশনগুলির ভারপ্রাপ্ত সভ্য।
- সাহিত্য বিলি ও সাহিত্যের হিসাবপত্র।
- কোষাধ্যক্ষ ও তহবিলের হিসাব রক্ষক।
- বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত সভ্য।
- পার্টি স্কুল ও শিক্ষা।

জেলা, শহর ও স্থানীয় কমিটি, প্রাদেশিক কিংবা জেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দিনে এবং ফর্মে প্রাদেশিক কিংবা জেলা কমিটির নিকটে রিপোর্ট দিবেন।

মন্তব্য : (১) বাস্তব কাজের অবস্থা অনুসারে জেলা, শহর বা স্থানীয় কমিটি একাধিক কাজ একসঙ্গে মিলাইতে পারে। জেলা কমিটি নিম্নতর ইউনিটসমূহ ও গণ-সংগঠনের ভিতরের ফ্রাকশনগুলির কাজকর্ম তদারক করার জন্য কমিটি সদস্য ছাড়াও সংগঠক নিয়োগ করিতে পারে। কমিটি প্রয়োজন হইলে পার্টি ও গণ-ফ্রন্টের কাজ যথাযথভাবে চালাইবার জন্য সাব-কমিটি বা স্পেশাল সেল গঠন করিতে পারে। (২) প্রয়োজন হইলে জেলা বা তালুক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী স্থাপনের জন্য প্রাদেশিক কমিটি অনুমতি দিতে পারে।

নবম ধারা

প্রাদেশিক সংগঠন

উপধারা-১ ॥ একটি প্রদেশের সবগুলি পার্টি-সংগঠন লইয়া প্রাদেশিক সংগঠন গঠিত হয়। সারা-ভারত পার্টি কংগ্রেস বা কেন্দ্রীয় কমিটি ইহার সীমারেখা নির্ধারিত করিয়া দিবে।

প্রাদেশিক সংগঠনের উচ্চতম সংস্থা হইল প্রাদেশিক সম্মেলন। সাধারণত বছরে একবার এই সম্মেলন বসিবে। প্রদেশের জেলা-সম্মেলনসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া এই সম্মেলন হইবে। জেলার পার্টি সভ্য-সংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে বিবেচনা করিয়া প্রতিবার প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সংখ্যা প্রাদেশিক কমিটি স্থির করিয়া দিবে।

প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলন প্রাদেশিক কমিটির কাজের রিপোর্ট আলোচনা ও অনুমোদন করে এবং নতুন প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচন করে। কমিটি কত বড় হইবে তাহা সম্মেলনে নির্ধারিত হয়। সম্মেলনে সারা-ভারত পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিও নির্বাচিত হয়। প্রাদেশিক কমিটি কিংবা পূর্ববর্তী সম্মেলনে যে-সব পার্টি ইউনিটের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন সে-সব পার্টি ইউনিটের এক তৃতীয়াংশ সভ্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করা যাইতে পারে, অবশ্য যদি কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমতি দেয়।

উপধারা-২ ॥ প্রাদেশিক কমিটি একজন সম্পাদক নির্বাচন করে। ইহা সম্পাদক-সহ নয়জনের

অনধিক একটি সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচন করে। প্রাদেশিক কমিটির দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ও উহার কাজ চালাইবার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ি থাকিবে। প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক পার্টি কর্মীদের কাজের উপযুক্ত বিলি-ব্যবস্থার তদারক করেন, আর প্রাদেশিক সম্মেলনের ও প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশসমূহ যাহাতে কার্যকরী হয় তাহা দেখেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকের নির্বাচন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা অনুমোদিত করাইতে হয়। প্রাদেশিক কমিটির সভা দুই মাসে একবার অবশ্যই বসিবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট দিনে ও ফর্মে নিজেদের কাজ সম্পর্কে রিপোর্ট দিবে। প্রাদেশিক সম্মেলন করা সম্ভব না হইলে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি লইয়া প্রাদেশিক কমিটি সারা-ভারত কংগ্রেসের বা সম্মেলনের প্রতিনিধিও নির্বাচন করিতে পারে।

উপধারা-৩।। প্রাদেশিক কমিটির সামনে যে-কাজ রহিয়াছে তাহা পারদর্শিতার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য এবং নিম্নতর ইউনিটসমূহকে যথাযথ নেতৃত্ব দিবার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক কমিটির সভ্যদের নির্দিষ্ট জেলার সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা নিম্নলিখিতভাবে প্রাদেশিক কমিটির কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন, যেমন—

ক) প্রদেশিক পত্রিকার সম্পাদক (কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে);
খ) নিম্নতর ইউনিট সমূহের কাজ পরীক্ষার জন্য সংগঠকবৃন্দ;
গ) গণ-সংগঠনগুলির ভিতরের ফ্রাকশন সমূহের ভারপ্রাপ্ত;
ঘ) সাহিত্য বন্টন এবং প্রকাশ (যদি কেন্দ্রীয় কমিটি মঞ্জুর করে) ও তাহার হিসাব রক্ষণ;
ঙ) প্রাদেশিক পার্টি তহবিলের কোষাধ্যক্ষ;
চ) পার্টি স্কুল ও পার্টি শিক্ষা;
ছ) স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত

মন্তব্য : কাজের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রাদেশিক কমিটি উপরে উল্লেখ করা একাধিক কাজ মিলাইয়া একজন কমরেডের হাতে দিতে পারেন, নূতন কাজ ইত্যাদিও চালু করিতে পারেন। প্রাদেশিক কমিটি নিম্নতর ইউনিটসমূহ ও গণ-সংগঠনের ভিতরকার ফ্রাকশনগুলির কাজ পরিদর্শনের জন্য প্রাদেশিক কমিটির সভ্য ছাড়াও বাহিরের কমরেডদের সংগঠক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারেন। প্রয়োজন হইলে, পার্টি এবং গণ-সংগঠনের কাজ যথাযথ ভাবে চালাইবার জন্য ইহা সাব-কমিটি ও স্পেশাল সেল গঠন করিতে পারেন।

উপধারা-৪।। দুইটি প্রাদেশিক সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাদেশিক কমিটি সকল প্রাদেশিক সংগঠনের কাজে নেতৃত্ব দেয়; অন্যান্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পার্টির প্রাদেশিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে; বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে ও তাহাদের কাজ পরিচালনা করে, প্রাদেশিক সংগঠনগুলির শক্তি ও তহবিলের বিলি ব্যবস্থা করে; প্রাদেশিক কোষাগারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রদেশের অন্তর্গত জেলাসমূহের নেতৃত্ব শক্তিশালী করিবার জন্য ও সিদ্ধান্তসমূহ কাজে পরিণত হইতেছে কিনা তাহা আগাগোড়া পরীক্ষা করার জন্য প্রাদেশিক কমিটি জেলায় জেলায় সংগঠক ও রিপোর্টার হিসাবে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠায়।

মন্তব্য : শ্রম-শিল্পগত ও রাজনীতিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া প্রাদেশিক কমিটি যে-কোন শহর কমিটিকে জেলা কমিটি হিসাবে গঠন করিতে পারে।

উপধারা-৫ ।। কোন আসন শূন্য হইলে প্রাদেশিক, জেলা বা স্থানীয় কমিটি নূতন মেম্বর লইয়া (কো-অপ্ট করিয়া) সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারে। তাহারা নিম্নতর কমিটি ভাঙ্গিয়া দিতে পারে এবং নিম্নতর ইউনিট বা উহার সভ্যদের মনোনয়ন করিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে এই কমিটিগুলি নিম্নতর ইউনিটের সম্মেলন স্থগিত রাখিতে পারে।

দশম ধারা

কেন্দ্রীয় সংগঠন

উপধারা-১ ।। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হইল সারা-ভারত পার্টি কংগ্রেস। সাধারণত, বৎসরে একবার নিয়মিত ভাবে সারা ভারত পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির আপন উদ্যোগে কিংবা গত পার্টি কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণকারী সমগ্র পার্টি সভ্যের এক তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে এমন সব পার্টি ইউনিটের দাবি অনুসারে বিশেষ (extraordinary) পার্টি কংগ্রেস আহূত হয়। গত নিয়মিত পার্টি কংগ্রেসে যাঁহারা প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন, বিশেষ কংগ্রেসে যদি সেই সভ্য সংখ্যার কমপক্ষে অর্ধাংশের প্রতিনিধি থাকেন তাহা হইলে তাহা পূর্ণ ক্ষমতাযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ও নির্বাচন পদ্ধতি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

মন্তব্য : যদি পার্টির কংগ্রেস ডাকা অসম্ভব হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রাদেশিক কমিটি সমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বর্দ্ধিত অধিবেশন বা প্লেনাম ডাকিবে।

উপধারা-২ ।। সারা ভারত পার্টি কংগ্রেস

ক) কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট আলোচনা ও অনুমোদন করে;

খ) পার্টির কর্মসূচী এবং গঠনতন্ত্র সংশোধন ও পরিবর্তন করে;

গ) সমসাময়িক রাজনীতির মূল প্রশ্নসমূহের উপরে পার্টির রণকৌশল (ট্যাকটিক্যাল লাইন) নির্ধারণ করে;

ঘ) সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন করে;

ঙ) কন্ট্রোল কমিশন নির্বাচন করে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে আপীলসমূহ কেন্দ্রীয় কমিটি কন্ট্রোল কমিশনের নিকট পাঠায়।

পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালে একটি ছোট হিসাব পরীক্ষক কমিশন নির্বাচন করিতে হইবে। এই কমিশন বিগত সময়ের অর্থনীতিক ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া কংগ্রেসের শেষে নিজেদের কাজের রিপোর্ট দিবে। তারপর কমিশনটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।

উপধারা-৩ ।। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য সংখ্যা প্রত্যেক সারা-ভারত কংগ্রেসে নির্ধারিত হইবে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে সভ্য কো-অপ্ট করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় কমিটির থাকিবে।

উপধারা-৪ ।। দুইটি সারা-ভারত পার্টি কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে পার্টির সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে থাকিবে। গঠনতন্ত্রের প্রয়োগ এবং পার্টি কংগ্রেসে সমবেত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত সাধারণ নীতি কার্যে পরিণত করাইবার জন্য ইহা দায়ি থাকিবে। কেন্দ্রীয় কমিটি সমগ্রভাবে পার্টির প্রতিনিধিত্ব করে। দুইটি পার্টি কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে যে সব সমস্যা দেখা দিবে সে-সম্পর্কে পূর্ব কর্তৃত্বের সহিত সিদ্ধান্ত লইবার অধিকার কেন্দ্রীয় কমিটির আছে।

দুইটি পার্টি কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে পার্টির সমস্ত কাজের নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় কমিটি দেয়। ইহা বিভিন্ন পার্টি প্রতিষ্ঠান গঠন করে ও তাহাদের কাজ তদারক করে, পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদক নিয়োগ করে, প্রাদেশিক মুখপত্রগুলির ও প্রাদেশিক কমিটিসমূহের সম্পাদকদের নির্বাচন অনুমোদন করে, পার্টির কর্মীদের কাজ ও পার্টির তহবিল বন্টন করে। কেন্দ্রীয় তহবিলের ভার কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে থাকে।

বিশেষ পরিস্থিতিতে, নিজেকে বা অন্যান্য কমিটিকে ও ফ্রাকশনসমূহকে পুনর্গঠিত করিবার নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় কমিটির আছে। যথাসম্ভব শীঘ্র কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহূত একটি সারা-ভারত কংগ্রেস বা একটি সারা-ভারত পার্টি সম্মেলন (কনফারেন্স) দ্বারা এই পুনর্গঠন অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

উপধারা-৫ ।। কেন্দ্রীয় কমিটি নিজ সদস্যবর্গের মধ্য হইতে একটি পলিটিক্যাল ব্যুরো এবং একজন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে। সাধারণ সম্পাদক 'পলিটিক্যাল ব্যুরো'র সভ্য হইবেন এবং উহার সম্পাদক হিসাবে কাজ করিবেন। অতিশয় দক্ষতার সহিত কাজ চালাইবার জন্য প্রয়োজন বিবেচিত হইলে কেন্দ্রীয় কমিটি অতিরিক্ত সম্পাদকগণ নির্বাচন করিবে ও বিভিন্ন বিভাগ গঠন করিবে। কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ব অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ কার্যে পরিণত করার ও কাজ চালাইবার দায়িত্ব পলিটিক্যাল ব্যুরোর উপর ন্যস্ত থাকিবে। ইহার সকল সিদ্ধান্তের জন্য ইহা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে দায়ি থাকিবে। পলিটিক্যাল ব্যুরোর সভ্যসংখ্যা কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে স্থির হইবে।

কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণত তিন মাসে অন্তত একবার ও পলিটিক্যাল ব্যুরো মাসে অন্তত একবার সভা করিবে।

উপধারা-৬ ।। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যেরা কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি, সংগঠক ও উপদেষ্টা রূপে নির্দিষ্ট প্রাদেশিক সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকিবেন। তাঁহারা কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের বিভিন্ন অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবেন—

ক) কেন্দ্রীয় পার্টি পত্রিকা ও কেন্দ্রীয় পার্টি প্রকাশনের সম্পাদক।

খ) পার্টির ছাপাখানার পরিচালনা ও সাহিত্য বন্টন।

গ) সর্বভারতীয় গণ-সংগঠন সমূহের কাজের ভারপ্রাপ্ত।

ঘ) পার্টি স্কুল ও পার্টি শিক্ষা।

ঙ) কোষাধ্যক্ষ ও কেন্দ্রের হিসাব রক্ষক।

চ) স্পেশাল যন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত।

উপধারা-৭ ।। পার্টির বলশেভিক নেতৃত্ব শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এবং প্রাদেশিক ও জেলা সংগঠনসমূহের কাজের পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিনিধি, সংগঠক বা উপদেষ্টা পাঠাইয়া থাকে, যাঁহারা কেন্দ্রীয় কমিটি বা পলিটিক্যাল ব্যুরো প্রতিবারে যে-বিশেষ নির্দেশ দিবে তাহার ভিত্তিতে কাজ করিবেন।

উপধারা-৮ ।। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে সারা-ভারত পার্টি সম্মেলনসমূহ ডাকিতে পারে। এই সব সম্মেলনে উপস্থিতির ভিত্তি কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করিবে। এই সম্মেলনগুলি কেন্দ্রীয় কমিটিকে পরামর্শদানকারী ও সাহায্যকারী সম্মেলন হইবে।

একাদশ ধারা

গণ-সংগঠন সমূহের মধ্যে ফ্রাকশন

উপধারা-১ ।। গণ-প্রতিষ্ঠান সমূহের সমস্ত কংগ্রেসে, সভায় ও নির্বাচিত কমিটিগুলিতে, ট্রেড-ইউনিয়নসমূহ, কিষান সভা, ছাত্র ও নারী সংগঠনে, সমবায় সমিতি, স্পোর্টস ক্লাব, যুব সংগঠন প্রভৃতিতে এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে ও আইন পরিষদে, যেখানেই পার্টি সভ্যের সংখ্যা দুই জনের কম নহে সেখানেই পার্টি ফ্রাকশন গঠিত হয়। এই ফ্রাকশনগুলিকে সুশৃঙ্খল পার্টি পদ্ধতিতে কাজ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ঐক্য, লড়াই করিবার ক্ষমতা ও গণ-ভিত্তি শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে পার্টি-নীতির প্রতি পার্টির বাহিরের জনসাধারণের সমর্থন অর্জন করিবার জন্য তাহাদের অবশ্যই সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

উপধারা-২ ।। ফ্রাকশনগুলি উহাদের উপরিস্থিত পার্টি কমিটি (কেন্দ্রীয় কমিটি, প্রাদেশিক কমিটি, জেলা, শহর বা স্থানীয় কমিটি বা সেল) কর্তৃক পুরাপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়। যে-পার্টি সংগঠন ফ্রাকশনের নেতৃত্ব করে, প্রতি প্রশ্নে তাহার সিদ্ধান্তসমূহ বিনা দ্বিধায়, কড়াকড়ি ভাবে ফ্রাকশনের পক্ষে অবশ্য পালনীয়।

গণ-সংগঠনের উচ্চতর সংস্থার ফ্রাকশন তাহার উপরিস্থিত পার্টি কমিটির সম্মতিক্রমে সেই গণ-প্রতিষ্ঠানের নিম্নতর সংস্থার ফ্রাকশনের কাছে নির্দেশ পাঠাইতে পারিবে এবং উচ্চতর পার্টি সংগঠনের নির্দেশ হিসাবে উহা তাহাদের অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

চলতি কাজের জন্য ফ্রাকশন এক্জন সম্পাদক নির্বাচন করে।

দ্বাদশ ধারা

পার্টি শৃঙ্খলা ও তাহার প্রয়োগ

উপধারা-১ ।। পার্টির ঐক্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিভেদমূলক উপদল গঠনের পার্টি-বিরোধী ঝোঁকের বিরুদ্ধে ও পার্টির মধ্যে বিভেদমূলক লড়াই উস্কানো ও পার্টিতে ভাঙ্গন ধরাইবার চেষ্টার বিরুদ্ধে নির্ম্মম সংগ্রাম চালান প্রয়োজন। পার্টির মধ্যে কঠিনতম শৃঙ্খলা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ও সর্বাধিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি শুধু যে বিভেদমূলক উপদল নির্মূল করিবার জন্যই সর্বাধিক চেষ্টা করিবে তাহাই নহে, শৃঙ্খলা ভঙ্গের ক্ষেত্রে এবং বিভেদমূলক কার্যকলাপের জন্য বহিষ্কার পর্যন্ত পার্টি-শাস্তি প্রয়োগের অধিকারও উহার থাকিবে।

উপধারা-২ ।। নেতৃস্থানীয় পার্টি কমিটির সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে এবং অবিলম্বে পালন করিতে হইবে। কোন পার্টি সভ্য ইহা না করিলে তাঁহার প্রতি অমনি বা প্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া, দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া, পার্টি হইতে সাসপেণ্ড কিংবা বহিষ্কার করিয়া তাঁহাকে সাজা দেওয়া যাইতে পারে।

কোন পার্টি কমিটি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে উহার উচ্চতর কমিটি উক্ত কমিটিকে অপসারিত করিয়া শাস্তি দিতে পারে। তৎপর উক্ত উচ্চতর কমিটি নূতন নির্বাচন পরিচালনা করিতে বা নূতন কমিটি মনোনয়ন করিতে পারে।

উপধারা-৩ ।। যে-সব পার্টি সভ্য ধর্মঘট ভঙ্গকারী, মাতলামি যাহাদের স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে (Habitual drunkards), চারিত্রিক দিক হইতে যাহরা অধঃপতিত (Moral degenerates),

পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতক, আর্থিক বিশৃঙ্খলা ঘটাইবার অপরাধে অপরাধী, উস্কানিদাতা (Provocateur), **কিংবা যাহাদের আচরণ এবং কাজ পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণির পক্ষে ক্ষতিকর** তাহাদের সরাসরি পার্টি হইতে বহিষ্কার করা হইবে এবং জনসাধারণের সমক্ষে তাহাদের মুখোস খুলিয়া দেওয়া হইবে।

উপধারা-৪ ॥ সেল হইতে শুরু করিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত, সমস্ত পার্টি সংগঠনের নিজ নিজ এলাকার যে-কোন পার্টি সভ্য বা পার্টি সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনার বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। অধস্তন কমিটি কর্তৃক অবলম্বিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে উহার উচ্চতর কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে। এই অনুমোদন সাপেক্ষ তাঁহারা দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসারিত হইবেন।

উপধারা-৫ ॥ যে-কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চতর কমিটিগুলির নিকটে, এমন কি কন্ট্রোল কমিশন এবং সারা-ভারত পার্টি কংগ্রেসের নিকটে পর্যন্ত শাস্তিপ্রাপ্ত সভ্যদের আপিল করিবার অধিকার থাকিবে।

ত্রয়োদশ ধারা

পার্টির আভ্যন্তরিক আলোচনা

পার্টির বিভিন্ন সংগঠনের ভিতরে কিংবা সমগ্র পার্টির ভিতরে পার্টির নীতি সম্পর্কে স্বাধীন ও কার্যকরী আলোচনা করিবার অখণ্ডনীয় অধিকার প্রত্যেক পার্টি সভ্যের আছে। এই অধিকার পার্টির আভ্যন্তরিক গণতন্ত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু পার্টি নীতির বিভিন্ন বিষয়ের উপরে সীমাহীন আলোচনা সহ্য করা যাইতে পারে না। এই রকম আলোচনা অতি অল্প সংখ্যক পার্টি সভ্যের মত বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি সভ্যদের উপরে জোর করিয়া চাপাইবার প্রচেষ্টায় অধঃপতিত হইয়া থাকে, কিংবা ইহা বিভিন্ন উপদল গঠনের নিম্নস্তরে পতিত হয়। এই জাতীয় আলোচনা সহ্য করিলে ইহার দ্বারা পার্টির ভিতরকার গণতন্ত্রের চরম অপব্যবহার হয়। ইহার ফলে মজুর শ্রেণি ও পার্টির ভিতরে ভাঙন ধরে। এই কারণে, ব্যাপকভাবে পার্টিতে আভ্যন্তরিক আলোচনা তখনই শুধু আবশ্যক বিবেচিত হইবে যখন—

ক) এক বা একাধিক প্রাদেশিক সংগঠন ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবে,

খ) কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে পার্টি নীতির প্রধান বিষয় সম্পর্কে সুদৃঢ় সংখ্যাধিক্যের অভাব যখন ঘটিবে;

গ) কোন একটি মত সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটিতে দৃঢ় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটি যখন পার্টির মধ্যে আলোচনার দ্বারা তাহার নীতির যথার্থতা পরীক্ষা করিয়া লইবার প্রয়োজন বোধ করে।

মন্তব্য : উপরিউক্ত শর্তে যখন পার্টিতে আভ্যন্তরিক আলোচনা চলিতে দেওয়া হইবে তখনও অবশ্যই সে আলোচনা কেন্দ্রীয় কমিটি ও অধস্তন কমিটি সমূহের শক্তিশালী নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে। আলোচ্য নীতির প্রধান বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে একটি লিখিত রিপোর্ট ও প্রস্তাবে উপস্থিত করিতে হইবে। ইহাই হইবে বিভিন্ন ইউনিটে আলোচনার ভিত্তি। এই আলোচনা যতটা সম্ভব কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রাদেশিক কমিটির দ্বারা বিশেষভাবে প্রেরিত রিপোর্টারদের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

চতুর্দ্দশ ধারা

বিধি ও উপবিধি

উপধারা-১ ॥ একই রকমের পার্টি সংগঠনসমূহ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে বিধি ও উপবিধি গ্রহণ করিতে পারা যাইবে। সারা-ভারত কংগ্রেসের দ্বারা কিংবা দুইটি কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা উপবিধিসমূহ গ্রহণ করা বা পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

উপধারা-২ ॥ প্রাদেশিক সম্মেলনের সংখ্যাধিক্যের ভোটের দ্বারা কিংবা দুইটি প্রাদেশিক সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাদেশিক কমিটির সংখ্যাধিক্যের ভোটের দ্বারা সারা-ভারত গঠনতন্ত্রের ও উপবিধি সমূহের বিরোধী না হইলে প্রাদেশিক উপবিধিসমূহ গৃহীত বা পরিবর্তিত হইতে পারে।

টিকা :

কন্ট্রোল কমিশন সম্পর্কে

সারা-ভারত পার্টি সম্মেলন (১৯৫১) একটি কন্ট্রোল কমিশন নির্বাচিত করিয়াছে। কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের কাজ হইবে—

১। কেন্দ্রীয় কমিটি কিংবা অন্য পার্টি কমিটিসমূহের দ্বারা পার্টি সভ্যদের উপরে যে-শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হইবে তারা প্রয়োগ করা, বাতিল করা বা পুনঃপরীক্ষা করা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা পাঠানো পার্টি সভ্যদের নালিশ কিংবা পার্টি সভ্যদের দ্বারা সোজাসুজি পাঠানো নালিশ কিংবা কন্ট্রোল কমিশনের নিজ প্রেরণায় গৃহীত নালিশ সম্পর্কে মীমাংসা করা।

পার্টি সভ্যরা সোজাসুজি কনট্রোল কমিশনকে লিখিতে পারিবে। কন্ট্রোল কমিশন এই সব ব্যাপার লোকাল কমিটির নিকটে ফেরৎ পাঠাইতে পারে, কিংবা নিজেও মীমাংসা করিতে পারে।

২। নিয়মিত কেন্দ্রীয় কমিটির হিসাব পরীক্ষা করা।

১৯৫১ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভায় স্থির হইয়াছে যে পার্টিতে যাঁহারা নতুন সভ্য হইবেন তাঁহাদিগকে প্রথমে প্রার্থী সভ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে সারা-ভারত সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইয়াছে।

সহায়ক তথ্য - ৪

অন্ধ্র থিসিসের সারসংক্ষেপ

ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তর ও তার আনুষঙ্গিক রণনীতি-রণকৌশল সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন— ১৯৪৮ সালের শেষাশেষি অন্ধ্র প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী রচনা করেন। তার মূল বক্তব্য—

১. সাম্রাজ্যবাদী দেশের সমাজবিপ্লব এবং ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবকে একাকার করে ফেলা উচিত নয়। প্রসঙ্গত, জারতন্ত্রী রাশিয়া ছিল একটি স্বাধীন, সামন্ততান্ত্রিক ও সামরিক রাষ্ট্র এবং অপরপক্ষে আজকের ভারতবর্ষ আদৌ স্বাধীন নয় এবং একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ মাত্র।

২. ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তর হুবহু এক না হলেও মূলত ১৯২৭ সালের চিন বিপ্লবের স্তরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত— অর্থাৎ যখন কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার আক্রমণ শুরু হয়েছে। অতএব রুশ বিপ্লবের অক্টোবর পর্যায়ের রণনীতির হুবহু অনুকরণ এক্ষেত্রে স·ম্পূর্ণ ভুল, বিভ্রান্তিকর ও বিপদগামিতার সামিল।

৩. আমাদের বিপ্লবের বেলায় মাঝারি বুর্জোয়াদের ভূমিকা হবে নিরপেক্ষ এবং এমনকি তারা বিপ্লবে অংশও নিতে পারে।

৪. রুশ বিপ্লবের অক্টোবর পর্যায়ের কথা মনে রেখে কেউ কেউ মাঝারি কৃষককুলকে নিরপেক্ষ রাখার কথা বলেন; আসলে তাদের বিপ্লবে সামিল করতে হবে। মাঝারি কৃষককে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে সামিল করা ও তাদের সঙ্গে শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তোলা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

৫. কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নেহরু সরকারের এই আক্রমণ আসলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-অনুসৃত আক্রমণেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অতএব এমন একটা স্তরে আমরা পৌঁছেছি যখন প্রতিটি আংশিক লড়াই সশস্ত্র রূপ নিতে বাধ্য। বুর্জোয়াদের আক্রমণ— সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া অন্য কোনভাবে প্রতিহত করা যাবে না। সশস্ত্র সংগ্রাম বিপ্লবের বর্তমান স্তরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

৬. আমাদের বিপ্লবের পথ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি চিন বিপ্লব-অনুসারী এবং মুক্তাঞ্চল সৃষ্টিই হবে আমাদের প্রধান করণীয়।

তথ্যসূত্র : অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ২৫৬

সহায়ক তথ্য - ৫

ON PEOPLE'S DEMOCRACY

(Adopted by the December 1948 PB Meeting)

1

QUESTIONS have been raised by comrades about the stage of revolution in India. Are we in the stage of February Revolution in Russia or are we on the eve of October? And what is People's Democracy?

The stage of revolution at any given time in any given counrty is determined by the maturity of class relations in that country—understood in the context of the class relations in the world, in the context of the crumbling of the capitalist order, and the dominant class antagonism of our times, the bourgeoisie versus the proletariat. The dominant class antagonism in the world puts the Socialist Revolution on the order of the day. What intermediate stage is necessary to pass on to the Socialist Revolution—whether it is necessary at all—is determined by the sum total of class relations in the country.

Marxism-Leninism has always regarded the democratic revolution in colonial and less developed countries as a link in the chain—as a more or less short stage leading to proletarian revolution. This was so because in the period of declining capitalism, capitalism could not play a progressive role and carry out consistently the task of the democratic revolution, the emancipation of the colonies from imperialist yoke, much less solve the major problem of the capitalist world. Only opportunists imagined that a long period of capitalist rule and development must necessarily ensue as the result of the emancipation of the colonies.

The proletariat, on the other hand, had taken up a position to carry on the anti-imperialist struggle to the final phase of democratic revolution, the transitional point to the Dictatorship of the Proletariat— the

Democratic Dictatorship of Workers and Peasants. Imperialism was to be overthrown not to put the bourgeoisie in power, but to exclude it from power; the masses were to take power— Democratic Dictatorship of Workers and Peasants— and a corresponding economic programme was to be realised, a programme which would place the key economic resources in the hands of the workers and peasants, and one from which a transition could be made, according to circumstances, to the next stage.

2

Basing itself on the great experience of the Russian Revolution and the Leninist teachings on Russian Revolution of 1905-1917— the Sixth Congress of the Communist International in its Colonial Thesis outlined the Communist strategy and tactics in colonial countries as follows:

"As in all colonies and semi-colonies, so also in China and India the development of productive forces and the socialisation of labour stands at a comparatively low level. This circumstance, together with the fact of foreign domination and also the presence of powerful relics of feudalism and pre-capitalist relations, determines the character of the immediate stage of the revolution in these countries. In the revolutionary movement of these countries, we have to deal with the bourgeois-democratic revolution, i.e., of the stage signifying preparing of the prerequisites for proletarian dictatorship and socialist revolution. Corresponding to this, the following kinds of tasks can be pointed out, which may be considered as general basic tasks of the bourgeois-democratic revolution in the colonies and semi-colonies:

"(a) A shifting in the relationship of forces in favour of the proletariat: emancipation of the country from the yoke of imperialism (nationalisation of foreign concessions, railways, banks, etc.) and the establishment of the national unity of the country where this has not yet been attained: overthrow of the power of the exploiting classes at the back of which imperialism stands : organisation of Soviets of Workers and Peasants: establishment of the dictatorship of the proletariat and peasantry : consolidation of the hegemony of the proletariat.

"(b) The carrying through of the agrarian revolution : emancipation of the peasants from all pre-capitalist and colonial conditions of exploitation

and bondage : nationalisation of the land : radical measures for alleviating the position of the peasantry with the object of establishing the closest possible economic and political union between the town and village.

"(c) In correspondence with the further development of industry, transport, etc., and with the accompanying growth of the proletariat, the widespread development of trade union organisations of the working class, strengthening of the Communist Party and its conquest of a firm leading position among the toiling masses : the achievement of the eight-hour day.

"(d) Establishment of equal rights for nationalities and of sex equality (equal rights for women) : separation of the Church from the State and the abolition of caste distinctions : political education and raising of the general cultural level of the masses in town and country, etc.

"How far the bourgeois-democratic revolution will be able in practice to realise all its basic tasks, and how far it will be the case that part of these tasks will be carried into effect only by the socialist revolution, will depend on the course of the revolutionary movement of the workers and peasants and its successes or defeats in the struggles against the imperialists, feudal lords and the bourgeoisie. In particular, the emancipation of the colony from the imperialist yoke is facilitated by the development of the socialist revolution in the capitalist world, and can only be completely guaranteed by the victory of the proletariat in the leading capitalist countries. The transition of the revolution to a socialist phase demands the presence of certain minimum prerequisites as, for example, a certain definite level of development in the country of industry, of trade union organisations of the proletariat and of a strong Communist Party. The most important is precisely the development of a strong Communist Party with a big mass influence, which would be in the highest degree a slow and difficult process were it not accelerated by the bourgeois-democratic revolution which already grows and develops as a result of the objective conditions in these countries."

(Revolutionary Movement in the Colonies And Semi-Colonies, PPH Edition, pp. 22-23)

The Programme of the Communist International, under the section "Struggle for the World Dictatorship of the Proletariat and Colonial Revolution," laid down the following :

"The special conditions of the revolutionary struggle prevailing in colonial and semi-colonial countries, the inevitably long period of struggle

required for the democratic dictatorship of the proletariat and the peasantry and for the transformation of this dictatorship into the dictatorship of the proletariat, and finally, the decisive importance of the national aspects of the struggle impose upon the Communist Parties of these countries a number of special tasks, which are preparatory stages to the general tasks of the dictatorship of the proletariat. The Communist International considers the following to be the most important of these special tasks :

"(1) To overthrow the rule of foreign imperialism, of the feudal rulers and of the landlord bureaucracy.

"(2) To establish the dictatorship of the proletariat and the peasantry on a Soviet basis.

"(3) Complete national independence and national unification.

(4) Annulment of State debts.

"(5) Nationalisation of large-scale enterprises (industrial, transport, banking and others) owned by the imperialists.

"(6) The confiscation of landlord, church and monastery lands. The nationalisation of all the land.

"(7) Introduction of the 8-hour day.

"(8) The organisation of revolutionary workers' and peasants' armies.

"In the colonies and semi-colonies where the proletariat is the leader of, and commands hegemony in, the struggle, the consistent bourgeois-democratic revolution will grow into proletarian revolution— in proportion as the struggle develops and becomes more intense (sabotage by the bourgeoisie, confiscation of the enterprises belonging to the sabotaging section of the bourgeoisie, which inevitably extends to the nationalisation of the whole of large-scale industry). In the colonies where there is no proletariat, the overthrow of the domination of the imperialists implies the establishment of the rule of people's (peasant) Soviets, the confiscation and transfer to the State of foreign enterprises and lands."

(Programme of the Communist International, PPH Edition, pp. 46-47.)

It is thus clear that colonial or national democratic revolutions were intermediary steps to proletarian revolution—which was already maturing on a world scale. How soon and how quickly the one passed into the other, depended on a number of factors, including the international

situation and the preparedness and maturity of the proletariat in the country to lead the masses—the maturity and strength of the Communist Party to act as the vanguard.

3

The passing over of the democratic revolution into the Socialist revolution is a Leninist conception. It was propounded by Lenin in his Two Tactics of Social Democracy. Its truth was proved in the 1917 Revolution when in nine months the proletariat had to pass from the Democratic Dictatorship of Workers and Peasants to the Dictatorship of the Proletariat, to the Socialist Revolution. Stalin in the History of the C.P.S.U.(B) writes:

"While advocating the victory of the bourgeois revolution and the achievement of a democratic republic, Lenin had not the least intention of coming to a halt in the democratic stage and confining the scope of the revolutionary movement to the accomplishment of bourgeois-democratic tasks. On the contrary, Lenin maintained that following upon the accomplishment of the democratic tasks, the proletariat and the other exploited masses would have to begin a struggle, this time for the Socialist revolution. Lenin knew this and regarded it as the duty of Social-Democrats to do everything to make the bourgeois-democratic revolution pass into the Socialist revolution. Lenin held that the dictatorship of the proletariat and the peasantry was necessary not in order to end the revolution at the point of consummation of its victory over Tsardom, but in order to prolong the state of revolution as much as possible, to destroy the last remnants of counter-revolution, to make the flame of revolution spread to Europe, and, having in the meantime given the proletariat the opportunity of educating itself politically and organising itself into a great army, to begin the direct transition to the Socialist revolution.

"Dealing with the scope of the bourgeois revolution and with the character the Marxist party should lend it, Lenin writes:

"The proletariat must carry to completion the democratic revolution, by allying to itself the mass of the peasantry in order to crush by force the resistance of the autocracy and to paralyse the instability of the bourgeoisie. The proletariat must accomplish the Socialist revolution, by

allying to itself the mass of the semi-proletarian elements of the population in order to crush by force the resistance of the bourgeoisie and to paralyse the instability of the peasantry and the petty bourgeoisie. Such are the tasks of the proletariat, which the new Iskra-ists (that is, Mensheviks—Ed.) always present so narrowly in their arguments and resolutions about, the scope of the revolution.'

"In order to leave nothing unclear, two months after the appearance of the Two Tactics Lenin wrote an article entitled 'Attitude of Social-Democrats to the Peasant Movement,' in which he explained:

"'From the democratic revolution we shall at once, and just in accordance with the measure of our strength, the strength of the class-conscious and organised proletariat, begin to pass to the Socialist revolution. We stand for uninterrupted revolution. We shall not stop half-way.'

"This was a new line in the question of the relation between the bourgeois revolution and the Socialist revolution, a new theory of a regrouping of forces around the proletariat, towards the end of the bourgeois revolution, for a direct transition to the Socialist revolution—the theory of the bourgeois-democratic revolution passing into the Socialist revolution.

"This line confuted the tactical position of the West-European Social-Democratic Parties who took it for granted that after the bourgeois revolution the peasant masses, including the poor peasant, would necessarily desert the revolution, as a result of which the bourgeois revolution would be followed by a prolonged interval, a long 'lull' lasting fifty or a hundred years, if not longer, during which the proletariat would be 'peacefully' exploited and the bourgeoisie would 'lawfully' enrich itself until the time came round for a new revolution, a Socialist revolution.

"This was a new theory which held that the Socialist revolution would be accomplished not by the proletariat in isolation as against the whole bourgeoisie, but by the proletariat- as the leading class which would have as allies the semi-proletarian elements of the population, the 'toiling and exploited millions.'

According to this theory the hegemony of the proletariat in the bourgeois revolution, the proletariat being in alliance with the peasantry, would grow into the hegemony of the proletariat in the Socialist

revolution, the proletariat now being in alliance with the other labouring and exploited masses, while the democratic dictatorship of the proletariat and the peasantry would prepare the ground for the Socialist dictatorship of the proletariat."

(History of CPSU (B), Moscow Edition, pp. 73-76)

This passing over, this interlinking of the two revolutions, was a sign of the maturity of Socialist revolutions—a sign that the world had entered the epoch of Socialist revolutions—the countries with advanced capitalism having the Socialist revolution immediately on the agenda. It was a sign of the sharpened class conflict of the capitalist world to which all other antagonisms were long subordinated.

4

Today all these contradictions have sharpened to an immense degree. Firstly, as a result of the war, because of the leading role it played in the anti-fascist war, the power of the Great Socialist State, the Soviet Union, has increased tremendously. Secondly, a number of countries of Eastern Europe have broken away from the capitalist orbit. The power of the Socialist world has increased; the strength of the imperialist world has decreased. Thirdly, the liberation of a great part of China from the yoke of the agents of American imperialism has dealt yet another blow to the capitalist order, sharpening the world conflict between the bourgeoisie and the proletariat. Fourthly, the powerful rise of working class movements, the rise of the Communist Parties in a number of countries and the growing awakening of the people in these countries against the Marshall enslavement and the attempt at stabilisation of the capitalist order, makes this conflict intense and brings it to the point of civil war. The poverty and destitution created by decrepit capitalism, the enslavement being imposed by aggressive American imperialism, the world economic crisis—all these sharply pose the question: Capitalism versus Socialism. The internal crisis of the imperialist system is still further aggravated and the system is brought near collapse by the rise of colonial struggles which develop into prolonged wars and in which the working class and its Party are taking a leading or active role, preventing compromise and carrying forward the revolution. This sharpens the conflict inside the imperialist countries; it further creates the threat inside

the colonies of the whole struggle passing into the hands of the proletariat and the threat that with independence the colonies might get altogether out of the capitalist orbit, because of the active role played by the proletariat. The two camps that are formed today, the camp of imperialism and the camp of anti-imperialist forces, more and more stand revealed as the camp of world capitalist order and the camp of world Socialist front led by the Soviet Union. The war preparations of the first camp are directed against the Soviet Union and other democratic States and are part of its war against world Socialism. The class conflict in the world, in each country, has sharpened so much that the capitalists in their desperation are dreaming of an international war against the forces of Socialism, democracy and peace.

It is, therefore, impermissible to talk about building capitalism, giving a long period of development for capitalism, as certain Communist leaders have done. It is a throw-back to the discredited Social-Democratic conception which wanted to erect a Chinese Wall between the democratic and the Socialist revolutions.

It is in the context of this world situation that the developing revolutions in each country, including ours, must be viewed. The new feature that will be found in backward and colonial countries is that the delayed democratic revolutions are breaking out in the midst of the most intense and sharpened conflict in each country between the bourgeoisie and the proletariat, between the bourgeoisie and the toiling masses—proletarian and non-proletarian. This heightened conflict in each country, together with the intensified conflict between the bourgeoisie and the proletariat on a world plane, interlaces the two revolutions far more closely, inextricably, and makes it impossible to win the first without passing over to win the second. It is this deep interlacing, the fact that in each country the revolution is taking place in the midst of unprecedented conflict between the bourgeoisie and the proletariat, between the former and the non-proletarian masses as well, that underlines the character of the present revolution as People's Democratic Revolution— which emphasises its extreme nearness to the Socialist Revolution and, at the same time, sharply demarcates it from the bourgeois-democratic revolution— and People's Democracy from bourgeois democracy.

5

In India we find all these features in our struggle for People's Democracy. The delayed democratic revolution is to be pushed forward in the midst of an unprecedented antagonism between the bourgeoisie, on the one hand, and the proletariat and toiling non proletarians, on the other. On every issue we see the toiling people coming into conflict with the bourgeoisie. This is natural because the bourgeoisie, with capitalism on the point of collapse, is unable to reorganise economic life but only adds capitalist exploitation to the unbearable yoke of feudal exploitation of the peasant. Its land programme, for instance, brings it into conflict not only with the proletariat but with poor and middle peasants as well.

Nothing need be written about the sharpened conflict with the proletariat— the attack on the Communist Party and the strike struggles, the terror against workers, the legislations passed and its wage policy are clear witnesses to the sharpened conflict. By upholding private production, by refusing to nationalise industries and curb profiteering, by its policy of high prices and inflation, by its failure to tackle black-marketing— the bourgeoisie comes into conflict with the proletarian as well as non-proletarian masses of town and village. By linking India's fate with the world capitalist order which is on the brink of collapse, by attempting to throw the burdens of the crisis on the people, the bourgeoisie and its Government come into conflict with the people.

Whether it is building of industries and more scope for employment, or national planning or prices and monetary policy, there is not one question on which measures of the Government can be supported as progressive ones; there is not one question on which the proletariat can do anything except advance measures of the transitional period— measures which can be realised only by a People's Democratic Government. On every front, in every activity, everything that the bourgeoisie does is reactionary and has to be countered by proletarian measures. Every step forward for the realisation of democratic revolution necessarily takes an anti-capitalist character and thus the two stages get interwoven.

The situation is totally unlike any we had witnessed. This is typified in the fact that the immediate aim of the revolution is to dethrone the

bourgeoisie from power, to eliminate the political rule of the bourgeoisie. In the earlier period the democratic revolution marched against imperialism and sought to paralyse the instability of the bourgeoisie; now its aim is to deliver the frontal blow against the power of the bourgeoisie itself. Not paralysing the instability, but open defeat, vanquishing, in a political battle, of the bourgeoisie. Such is the immediate political objective of the People's Democratic Revolution.

This is a totally new feature of the situation. It is missed by those who take an opportunist line by saying that nothing has changed, argue as if it is imperialism that is to be overthrown as in the earlier days and screen the new class relations involved in the necessity to eliminate the rule of the bourgeoisie. This necessity, as it can be easily seen, links the struggle for democratic revolution with the struggle for proletarian revolution which cannot be achieved without overthrowing the rule of the bourgeoisie.

What place does fight against imperialism occupy in the struggle? Here again it is to be carried on at a different level. The bourgeoisie has secured a National State, linked with world capitalism—and, therefore, a satellite State. The struggle for real independence means taking the country out of the orbit of world capitalist order, into the Socialist front, the Socialist system. Freedom and independence now mean freedom from the world capitalist order— not from this or that imperialism only. Thus, again, the task of fighting for real freedom is linked with the defeat of capital at home and abroad and breaking away from the capitalist system.

Further, the revolution has, of course, to liquidate feudalism, but, as we have seen, even this task cannot be done without simultaneously fighting the capitalist elements in the countryside and overthrowing the political rule of the bourgeoisie. Thus, both the anti-feudal and anti-capitalist character of the struggle gets emphasised.

It is this mixing, this combination, that gives us People's Democratic Revolution in our country.

6

Is the present phase of the Indian Revolution comparable with the February or the October Revolution in Russia? It is neither. It is mixed.

In India the interlacing has taken place not exactly in the way it took place in Russia. It is not February— because our aim is not to overthrow autocracy, but the rule of the bourgeoisie. Our aim is not to paralyse the instability of the bourgeoisie, but to overthrow it.

It is not October— because, though we are eliminating the political rule of the bourgeoisie, we are not able to raise the slogan of the Dictatorship of the Proletariat immediately— because the intermediary strata, parties, classes have not yet exhausted their full possibilities and, therefore, a bloc with them cannot be ruled out. We have already seen that large sections of the petty-bourgeois masses, middle peasants, etc., are coming into conflict with the bourgeoisie, especially because of its failure to liquidate feudal relations in a revolutionary way— i.e., failure to carry out the democratic revolution— and this force is a valuable force. To forget that it has not exhausted its possibilities, is to outrun its consciousness, to disrupt the democratic front and hand it over to the bourgeoisie. In Russia, the Bolsheviks could raise the slogan of the Dictatorship of the Proletariat only after the Democratic Dictatorship had exhausted its possibilities, the majority of the people had been won over, etc.

Those who argue that we are on the eve of October forget that before October, side by side with the dictatorship of the bourgeoisie, there was the Democratic Dictatorship of the Workers and Peasants—a bloc which was rendered inevitable at that time by the petty-bourgeois composition of Russian population.

Only one warning is necessary. No one can say whether in the course of the struggle we will not march straight to the Dictatorship of the Proletariat. It becomes a question of the strength of the proletariat, its hegemony, its capacity to lead the toilers, how quickly in the process of the struggle the non-proletarian toiling sections shed their illusions, etc. No dogmatic assertion can be made. But for the present we can only work on the strength of the correlation of forces as it exists.

This means that the proletariat must attach great importance to the intermediary strata, to winning them over, to see that they are not split, to defeat every manoeuvre of the bourgeoisie to mislead them, to adopt supple tactics and manoeuvres to enable these masses to shed their illusions by their own experience. To hurl phrases at them, to act on the

presumption that they will automatically come, to belittle the concrete task of winning them over, and to concern oneself with repeating fundamental slogans only will put the initiative in the hands of the bourgeoisie or its agents—the Socialists, etc.

The People's Democratic Revolution is thus the democratic revolution which is more than ever interlaced with the Socialist revolution in each country and in the world. It begins by throwing the bourgeoisie out of power. So far as we can see, in our country the immediate State form will be a bloc of the proletariat with non-proletarian elements, a Democratic Dictatorship of the Workers and Peasants. But this State, arising in the context of world Socialist Revolution and in the course of direct struggle against the rule of capital, will quickly pass into the Dictatorship of the Proletariat. Its programme— nationalisation of land and large-scale industries, etc.— itself constitutes a transitional programme.

The State cannot mark time. The bloc must immediately move against the capitalist elements in the countryside and towns and begin a process of squeezing them out. It will be in a position to do it more quickly than in the past because the countries of the Socialist system will be in a position to supply it with the technical means to overcome backwardness, reorganise industry and reconstruct economy on Socialist lines.

To the extent that the proletariat leads the bloc decisively and makes the State act energetically against the political and economic sabotage of capitalists, the State matures into a Dictatorship of the Proletariat, the bloc is replaced by a unified leadership of the proletariat, hegemony of the proletariat. The mistake of Tito and others lay in imagining that after People's Democracy the class struggle dies down and does not get intensified. The proletariat will have to struggle against the vacillations of its allies to see that the State marches forward, the bourgeoisie is crushed and firm steps are taken towards Socialism. This cannot be done unless in the process the proletariat brings all its allies firmly under its leadership— i.e., establishes the Dictatorship of the Proletariat.

Zhdanov, in his Report on the International Situation at the Warsaw Nine Parties Conference, describes the People's Democratic Government as a bloc headed by the working class— a bloc of peasants, people, etc., i.e., one in which the bourgeoisie has no place. He says that the bloc has introduced nationalisation, gone beyond bourgeois democracy, etc.—

meaning towards Socialism.

Kuusinen in his article "Are You For or Against the Soviet Union?" described it as the intermediary stage to Socialism. This also is important. The intermediary stage is the stage in which the class struggle is the sharpest, because the issue has yet to be finally decided. The bourgeoisie is thrown out of political power, but not yet economically vanquished, etc.

7

People's Democracy is thus not qualitatively a new element. It is the delayed democratic revolution ripening into Socialist revolution in the midst of sharpened world conflict. It is the consistent application of Leninism to the present situation. It is not a substitute which dispenses with the Dictatorship of the Proletariat. It is the consistent application of the principle of proletarian hegemony to all the stages of the revolution— based on a sober estimate of the class relations and the situation at any given stage.

It is easy to see which classes will actively participate in it. Just because of the sharpened antagonism between the bourgeoisie and the proletariat, between the bourgeoisie and other sections— it is only the proletariat that will lead it consistently. Its firm ally will be the proletarians of rural areas and, next to that, the poor peasant. The middle peasant vacillates, but has to be won over. The petty bourgeoisie vacillates, but the section which is turning more and more towards Socialism will be won over; the other sections will vacillate more, and be split. It is the same with the intellectuals. It will be a desperate race, for the bourgeoisie will try to tear away sections from the proletariat and the proletariat will have to wage a virtual war of ideology, actions, etc, to win over the vacillating sections.

The leading combination will be, of course, the proletariat in alliance with rural proletarians and poor peasantry— the same combination that brings about the proletarian revolution. Once more we see the interlacing, and how quietly one stage ripens into the other depends on the strength of this combination.

টিকা : Published by V. M. Kaul for Communist Party of India, Raj Bhavan, Sandhurst Roao, Bombay - 4 ('COMMUNIST', Jan, 1949)

বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশলের লেনিনবাদী ব্যাখ্যা

ভারতবর্ষ, রুশিয়ার পথ অনুসরণ করবে না চীনের পথ অনুসরণ করবে?-- সংস্কারবাদী সংশয়াকুলেরা আজ আবার এই প্রশ্ন তুলেছেন; এইভাবে এঁরা রুশিয়া এবং চীনের বিপ্লবের সংস্কারবাদী ব্যাখ্যা করে থাকেন।

কয়েকটি মূল ধারণা পরিষ্কার না হলে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব নয়। বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশলের পার্থক্য, একটি সমগ্র সময়ের রণকৌশল ও বিভিন্ন অবস্থায় কৌশলগত স্লোগানের পার্থক্য, মূল স্লোগান এবং মূল স্লোগান সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করার জন্য কোনও সাময়িক স্লোগানের পার্থক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাব থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে নানারকম ভ্রমাত্মক ধারণার সৃষ্টি হয়। শ্রমিকশ্রেণির পার্টির অগ্রগামী ভূমিকার তাৎপর্য বোঝার অক্ষমতা থেকেও এমন ভুল হয়ে থাকে।

একটি সমগ্র অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত একবার গ্রহণ করা হয় এবং বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সমস্ত রণনীতি ঠিক করা হয়, মার্ক্সবাদীদের মধ্যে যখন তখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার সঠিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা অমার্জনীয়। যদি বুঝতে পারা যায় যে, কোনও একটি পূর্ণাঙ্গ সময় সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা ভুল হয়েছে সেই সময়ের শ্রেণিসম্পর্কের স্বরূপ ঠিক ধরতে পারা যায় নি, অথবা পুরোনো শ্রেণি-সম্পর্ক অচল হয়ে উঠেছে কিম্বা বিপ্লবের যে স্তরের উপর সে সময়ের বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছিল সেই স্তর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং সেই হেতু বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত এবং রণনীতির পরিবর্তন প্রয়োজন, একমাত্র তা হলেই মার্ক্সবাদী পার্টির সেই সমগ্র সময়ের ব্যাখ্যা ও রণনীতির পরিবর্তন করা যেতে পারে। কোনও বিশেষ সময়ে চলতি শ্রেণি-সম্পর্কের অবস্থা ও বিভিন্ন শ্রেণির ভূমিকার ভিত্তিতেই মার্ক্সবাদী পার্টি সেই সময়ের ব্যাখ্যা করে এবং তদনুযায়ী রণনীতি ঠিক করে। কাজেই সেই নীতির পরিবর্তন করতে হলে আগে প্রমাণ করতে হবে যে, বিভিন্ন শ্রেণির ভূমিকা পরিবর্তিত হয়েছে, এবং পূর্বের বিশেষ সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। মৌলিক প্রশ্ন (যথা বিশ্বসংকট, ভারতের শ্রেণি-সম্পর্ক ইত্যাদি) না তুলে কোনও ইঙ্গিত, সংশোধনী প্রস্তাব, প্রশ্ন ও সন্দেহের দ্বারা পরোক্ষ এবং প্রচ্ছন্নভাবে মূল বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার পরিবর্তনের চেষ্টা করা অমার্জনীয়। গণ-অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়েছে কিনা— এমন প্রশ্ন যদি কেউ তোলে তাহলে বুঝতে হবে যে, বিশ্ব-সংকট দেখা দিয়েছে কিনা অথবা আমরা আজ বিপ্লবী অগ্রগতি এবং বিজয়ের যুগে কিনা, এই তার প্রশ্ন। কেউ এমন প্রশ্ন আজকে করতে সাহস করে না; অথচ সুবিধাবাদ মৌলিক প্রশ্নের উপর সংগ্রাম এড়িয়ে চোরাপথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মূল প্রশ্নগুলির পরিবর্তন করবার চেষ্টা করে।

এই ভ্রান্তি মোচনের জন্য রণনীতি, মূল শ্লোগান ও রণকৌশল সম্বন্ধে লেনিনবাদী ধারণার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার আজ প্রয়োজন। 'লেনিনবাদের ভিত্তি' নামক বইতে ষ্ট্যালিন দেখিয়েছিলেন "রণনীতি ও রণকৌশিল হল শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণি-সংগ্রামে নেতৃত্ব-বিজ্ঞান।"

স্ট্যালিন বলেছেন— "রণীনীতি হচ্ছে, বিপ্লবের কোন একটি স্তরে শ্রমিকশ্রেণি কোথায় প্রধান আঘাত হানবে, তাই স্থির করা, বিপ্লবী ফৌজের বিন্যাস পরিকল্পনা করা এবং বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরের আগাগোড়া সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পরিকল্পনা প্রকৃষ্টভাবে তৈরি করা।"(পৃ. ৫৯)

"বিপ্লবের আসল ফৌজ এবং মজুত ফৌজ নিয়েই রণনীতির কারবার। বিপ্লবের স্তর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রণনীতিরও পরিবর্তন হয়; কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট স্তরের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত মূলত অপরিবর্তিতই থাকে।" (পৃ. ৬০-৬১)

বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ের রণ-নীতির বর্ণনা করে ষ্ট্যালিন বলেছেন— "আমাদের বিপ্লব ইতিমধ্যেই দুটি স্তর অতিক্রম করেছে এবং অক্টোবর বিপ্লবের পর তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রণনীতিরও পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম স্তর— ১৯০৩ থেকে ১৯১৭। উদ্দেশ্য : জারের উচ্ছেদ এবং মধ্যযুগের শেষ চিহ্নগুলিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করা। বিপ্লবের প্রধান ফৌজ : শ্রমিকশ্রেণি। মজুত ফৌজ : কৃষক সম্প্রদায়। আঘাতের প্রধান লক্ষ্য : উদারনৈতিক রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াশ্রেণির বিচ্ছিন্ন অবস্থা। এই বুর্জোয়াশ্রেণি জারের সঙ্গে আপস করে বিপ্লবকে বানচাল করবার চেষ্টা করছে এবং এই ব্যাপারে তারা কৃষক সম্প্রদায়কে দলে টানবার চেষ্টা করছে। ফৌজ বিন্যাসের পরিকল্পনা : শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের মৈত্রী। স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করবার জন্য এবং বুর্জোয়াশ্রেণির অস্থিতিশীলতাকে অকেজো করবার জন্য কৃষক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় শ্রমিকশ্রেণিকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে।" (লেনিনের সিলেক্টড ওয়ার্কস্)

"দ্বিতীয় স্তর— ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে ১৯১৭ সালের অক্টোবর। উদ্দেশ্য : রুশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ। বিপ্লবের প্রধান ফৌজ : শ্রমিকশ্রেণি। মজুত ফৌজ : দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়। পার্শ্ববর্তী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণিও সম্ভাব্য মজুত ফৌজ। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদের সংকট অনুকূল পরিস্থিতি। আঘাতের প্রধান লক্ষ্য : পাতি বুর্জোয়াদের (মেনশেভিক এবং সোশালিস্ট-বিপ্লবী) বিচ্ছিন্ন অবস্থা। পাতি বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে বিপ্লবের অবসান ঘটাবার জন্য কৃষক সম্প্রদায়কে দলে টানবার চেষ্টা করছে। ফৌজ বিন্যাসের পরিকল্পনা : দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির মৈত্রী। বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করবার জন্য এবং পাতি বুর্জোয়া ও কৃষকদের অস্থিতিশীলতা নাশ করবার জন্য জনসাধারণের আধা-শ্রমিক অংশের সহযোগিতায় শ্রমিকশ্রেণিকে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে।" (ঐ)

অল্প কথায় বলা যায় যে, সংগ্রামের রীতিনীতি হচ্ছে বিশেষ শ্রেণি-মৈত্রী— বিপ্লবী ফৌজের বিন্যাস। ক্ষমতায় আসীন শত্রুকে ধ্বংস করবার জন্য শ্রমিকশ্রেণিকে এই কাজ করতে হবে। বিপ্লবের স্তরে সকল সময়ের জন্যই এই রীতিনীতি প্রযোজ্য। আমাদের বিপ্লবের বর্তমান স্তরের জন্য আমরা কি রণনীতি নির্ধারণ করেছি? গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শ্লোগানে স্বল্প কথায় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে— আমাদের রণনীতি হচ্ছে— বুর্জোয়া-সামন্ত্রতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদ চক্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক এবং নিপীড়িত মধ্যবিত্তের মৈত্রী।

লেনিনবাদীর ভাষায় আমাদের রণনীতির ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হয়—

উদ্দেশ্য : সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বুর্জোয়া চক্রের পরিচালক বুর্জোয়া শাসনের উচ্ছেদ। মধ্যযুগের শেষ চিহ্নগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত করে জাতীয়করণ প্রভৃতির দ্বারা মধ্যকালীন অর্থনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি করা। বিপ্লবের প্রধান ফৌজ : শ্রমিকশ্রেণি। মজুত ফৌজ : কৃষিমজুর ও জনমজুর, দরিদ্র কৃষক ও মধ্য কৃষক এবং শহরের নিপীড়িত পাতি বুর্জোয়া। আঘাতের প্রধান লক্ষ্য : বুর্জোয়া শাসক চক্র এবং অন্যান্য বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয়া (সোশালিস্ট পার্টি ইত্যাদি) দলগুলোর সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন করে কোণঠাসা করা। ফৌজ বিন্যাসের পরিকল্পনা : কৃষিমজুরের ও দরিদ্র কৃষকের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে উপরোক্ত কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির মৈত্রী। "বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে শক্তি বলে তাদের প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করবার জন্য শ্রমিকশ্রেণিকে দরিদ্র কৃষক ও কৃষিমজুর এবং তৎপরে মধ্য কৃষকের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে।"

দেখা যাচ্ছে যে, বিপ্লবের যে স্তরে আমরা আছি তাকে রুশ বিপ্লবের উভয় স্তরের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বুর্জোয়াকে বিচ্ছিন্ন করা এবং উচ্ছেদ করা— এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে কিন্তু এমন হয়নি। রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে আঘাতের প্রধান লক্ষ্য ছিল পাতি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে; কারণ, বুর্জোয়া দলগুলো তার আগেই অপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং সোভিয়েতে সক্রিয় একমাত্র পাতি বুর্জোয়া মেনশেভিক এবং সমাজ-বিপ্লবীরাই তখন জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বুর্জোয়াদের রক্ষা করেছে।

আমাদের দেশে বুর্জোয়া শাসক সম্প্রদায়— কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। জনগণের উপর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অন্য যে কোন পাতি বুর্জোয়া দলের চেয়ে অনেক বেশি। তারা এখনও তাদের জন-প্রভাব হারায় নি। তাদের বিচ্ছিন্ন এবং উচ্ছেদ করতে হলে সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টায় ক্রমাগতভাবে তাদের মুখোস খুলে দিতে হবে।

ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য নিম্নলিখিত কর্তব্যের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে—

"আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান গভর্নমেন্টের অধিনায়কদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও নেতা বলিয়া মানে, আগেকার সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেন্টের তুলনায় বর্তমান গভর্নমেন্টকে এখনও তাহারা জাতীয় গভর্নমেন্ট বলিয়াই মানে।

"জাতীয় সরকার যে সাম্রাজ্যবাদের তল্পী ধরিয়াছে, জনসাধারণ এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেশকে বিক্রয় করা হইতেছে; নেতৃবৃন্দের নীতিই দাঙ্গা সৃষ্টি করিতেছে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, ধনকুবেরদের স্বার্থেই গভর্নমেন্ট পরিচালিত হইতেছে। তাঁহারা এখনও বর্তমান গভর্নমেন্টকে স্বরাজ গভর্ণমেন্ট বলিয়া মনে করেন। ফলে তাঁহারা মিথ্যা জাতীয়তার মোহে আচ্ছন্ন। কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্পর্কেও তাঁহাদের মধ্যে মোহ রহিয়া গিয়াছে। জাতীয় গভর্নমেন্ট সম্পর্কে জনতার এই মিথ্যা মোহ যদিও অতি দ্রুত কাটিয়া যাইতেছে তবুও নেহরু এবং কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস কিন্তু নষ্ট হইতেছে না। যদিও তাঁহারা বারে বারে ঠকিতেছেন তবুও পুরোনো মোহ তাঁহারা এখনও আঁকড়াইয়া থাকিতেছেন।

"এই সত্য মনে না রাখিয়া জাতীয় গভর্নমেন্টের সমালোচনা করিলে সমালোচনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। ... গণতান্ত্রিক লক্ষ্য হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে সক্রিয় কর্মপন্থায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শ্রমিকশ্রেণিকে বুর্জোয়া নেতৃত্বের খপ্পর হইতে তাঁহাদের ছিনাইয়া আনিতে হইবে। (এই লাইনের উপর আমরা জোর দিতেছি) এবং নূতন জাতীয় ঐক্য চেতনার ভিত্তিতে নূতন আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

এখানে বুর্জোয়া নেতৃত্ব উচ্ছেদ সংগ্রামের নীতির একটা দিক পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে— জনসাধারণকে বুর্জোয়া নেতৃত্বের আওতা থেকে ছিনিয়ে এনে বুর্জোয়া নেতৃত্বকে জন-সম্পর্কশূন্য করা এবং তাদের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যকেই আঘাতের প্রধান লক্ষ্যবস্তু করা এই রণনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

মনে রাখতে হবে উপরে যে রণনীতির পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের দ্বিতীয় কংগ্রেসেও ঠিক এই একই পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। বামপন্থী সমালোচনার আবরণে অথবা সরাসরি দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের নামে, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে, পরোক্ষভাবে এই পরিকল্পনা পরিবর্তনের জন্য ওকালতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। স্ট্যালিন বলেছেন— (লেনিনিজম : পৃ. ৬১)

"আন্দোলনের জোয়ার অথবা ভাটায় বিপ্লবের উত্থান অথবা পতনে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণি কোন পন্থা দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করবে তাই স্থির করা এবং পুরোনো ধরনের সংগঠন ও সংগ্রামের পরিবর্তে নূতন ধরনের সংগ্রাম ও সংগঠন চালু করে নূতন ও পুরাতন ধরনের সমন্বয় সাধন করাই হচ্ছে সংগ্রামের কৌশল। রণনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জার বিরোধী সংগ্রামে জয়লাভ করা, বুর্জোয়াদের পরাজিত করা এবং জার ও বুর্জোয়া বিরোধী সংগ্রামকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করা। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রণকৌশলের কাজ, সমগ্রভাবে যুদ্ধ জয় করা কৌশলের উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছোট ছোট খণ্ড যুদ্ধে জয়লাভ করা, কোনও বিশেষ অভিযানকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিপ্লবের উত্থান পতনের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিশেষ কোনও খণ্ড যুদ্ধ যা হবে, তাকে জয়লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই কৌশলের কাজ। রণকৌশল হচ্ছে রণনীতিরই অঙ্গ এবং তার অধীনস্থ হয়ে তারই কাজ করে। (এই লাইনের উপর আমরা জোর দিয়েছি)

"জোয়ার ভাটা অনুযায়ী রণকৌশলের অদল বদল হয়। বিপ্লবের প্রথম স্তরে (১৯০৩ সাল থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী) রণনীতি অপরিবর্তিতই ছিল, কিন্তু কৌশলের অদল বদল হয় বহুবার। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত পার্টি আক্রমণাত্মক কৌশল চালু রাখে, কারণ বিপ্লবের ঢেউ ছিল ঊর্দ্ধমুখী, আন্দোলন ছিল উঁচুস্তরে এবং এই ঘটনার পটভূমিকায় কৌশল স্থির করতে হয়েছিল। এই বিপ্লবের ঊর্দ্ধমুখী গতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সংগ্রামের ধরনও বিপ্লবাত্মক করা হয়েছিল। সেই সময় স্থানীয় রাজনৈতিক ধর্মঘট, রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন, রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট, ডুমা বয়কট, সশস্ত্র অভ্যুত্থান, বিপ্লবী সংগ্রামাত্মক স্লোগান— একের পর এক এইভাবে সংগ্রামের ধরন সেই সময়ে বদলে গেছে। সংগ্রামের ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের ধরনও পাল্টে গেছে। কারখানা কমিটি, বিপ্লবী কৃষক কমিটি, ধর্মঘট কমিটি, শ্রমিক প্রতিনিধি লইয়া সোভিয়েত— প্রায় প্রকাশ্যভাবে পরিচালিত শ্রমিকদল

প্রভৃতি সংগঠনের সৃষ্টি হয় সেই সময়ে।

"১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত পার্টি পশ্চাদপসরণের কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হয়, কারণ আমরা তখন বিপ্লবী আন্দোলনের ঘাটতি, বিপ্লবের ভাটা লক্ষ্য করি। কৌশল অবলম্বনের সময় একথা বিবেচনা করতে হয়েছিল। যথারীতি সংগ্রামের ধরন এবং সংগঠনের ধরন বদলে যায়। ডুমা বয়কটের বদলে ডুমায় যোগদান করা হয়। ডুমার বাইরে খোলাখুলিভাবে প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কার্যকলাপের পরিবর্তে পার্লামেন্টারী বক্তৃতা এবং ডুমার কাজকর্ম চলতে থাকে। সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটের বদলে আরম্ভ হয় আংশিক অর্থনৈতিক ধর্মঘট; বা কার্যকলাপে ঢিমে ভাব এসে যায়। সেই সময় অবশ্য পার্টিকে গা-ঢাকা দিতে হয়েছিল। বিপ্লবী গণসংগঠনের পরিবর্তে সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, এবং সমবায় প্রভৃতি আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান মারফৎ কাজ কর্ম চলতে থাকে।

"বিপ্লবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। কৌশলের অসংখ্য পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু রণনীতির কোনও পরিবর্তন হয়নি।

"শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম ও সংগঠনের ধরন, সেগুলির পরিবর্তন এবং সমন্বয় নিয়েই কৌশলের কারবার। বিপ্লবের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে বিপ্লবের জোয়ার ভাটা এবং উত্থান পতনের উপর নির্ভর ক'রে বহুবার কৌশলের পরিবর্তন হতে পারে।" (ঐ, পৃ. ৬১-৬২)

স্ট্যালিন বলেছেন (লেনিনিজম, পৃ. ৬৬-৬৮) : "কৌশলের নেতৃত্ব হচ্ছে রণনীতির নেতৃত্বেরই অঙ্গ। শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম এবং সংগঠনের প্রয়োজন তাকে মেনে চলতে হয়। সমগ্র রণনীতির সাফল্যের জন্য নির্দিষ্ট ফৌজ বিন্যাসের দ্বারা সর্বাধিক পরিমাণ ফললাভের উদ্দেশ্যেই যাতে শ্রমিকশ্রেণির সংগঠন এবং সংগ্রাম পরিচালিত হয় তাই ঠিক রাখাই কৌশলের কাজ।

"শ্রমিকশ্রেণির সংগঠন এবং সংগ্রামের ধরনের যথোপযুক্ত পরিচালনার অর্থ কি?

"তাঁর অর্থ, কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত পালন, তার মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তগুলিকে প্রধান শর্ত বলে ধরে নিতে হবে :

"প্রথম : কোনও নির্দিষ্ট সময়ে তৎকালীন আন্দোলনের জোয়ার ভাটার অবস্থার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ধরনের সংগ্রাম এবং সংগঠনকে সামনে তুলে ধরা, ফলে যাতে জনগণের বিপ্লবী অবস্থায় আসা, কোটি কোটি লোকের বিপ্লবের রণাঙ্গনে আসা এবং বিপ্লবের রণাঙ্গনে তাদের বিন্যাস সাধন সুনির্দিষ্ট এবং সুবিধাজনক হয়।

"এখানে উদ্দেশ্য এই নয় যে, অগ্রগামীরাই পুরোনো অবস্থা জিইয়ে রাখার অসম্ভবতা এবং তার উচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবিতা হৃদয়ঙ্গম করুক। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, কোটি কোটি জনগণ এই অবশ্যম্ভাবিতা বুঝতে পেরে অগ্রগামীদের সমর্থন করার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করুক। কিন্তু একমাত্র নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারাই জনগণ তা বুঝতে পারে। পুরোনো ব্যবস্থার উচ্ছেদের অবশ্যম্ভাবিতা অভিজ্ঞতার দ্বারা জনগণ যাতে বুঝতে পারে তাই করাই হচ্ছে কর্তব্য ও এমন ধরনের সংগঠন এবং সংগ্রাম পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত যার প্রেরণায় জনগণ অভিজ্ঞতার দ্বারা বিপ্লবী স্লোগানের সঠিকতা সহজেই স্বীকার করতে শিখবে।

"জনগণকে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা ডুমার নিষ্ফলতা, কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রাটদের নিয়মতান্ত্রিক, গণতন্ত্রী প্রতিশ্রুতির অসত্যতা, জারের সঙ্গে আপসের অসম্ভবতা

এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর অবশ্যম্ভাবিতা সহজে বোঝাবার জন্য পার্টি যদি ডুমায় যোগ দিয়ে ডুমার কাজের ভিত্তিতে সংগ্রামের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত না করত, তাহলে অগ্রগামীরা শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে এবং শ্রমিকশ্রেণি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ হারাত। সেই সময় জনগণ যদি ডুমার অভিজ্ঞতা না লাভ করত, তাহলে কন্‌স্টিটিউশনাল ডেমোক্রাটদের (গণতন্ত্রী) মুখোস উন্মোচন অসম্ভব হয়ে পড়ত এবং শ্রমিকশ্রেণির শাসন প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব হত।

"অজোভিস্ট* কৌশলের বিপদ ছিল এই যে, তাতে কোটি কোটি মজুত ফৌজের সঙ্গে অগ্রগামীদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশংকা ছিল।

"১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে বামপন্থী কমিউনিস্টরা সশস্ত্র উত্থানের ডাক দিয়েছিল, কিন্তু তখনও পর্যন্ত যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসাবে মেনশেভিক এবং সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবীদের স্বরূপ জনসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত হয়নি এবং শান্তি, স্বাধীনতা ও জমি সম্পর্কে মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবীদের বক্তৃতার অসত্যতা জনসাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুধাবন করে নি। কাজেই সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণি সেই সময় বামপন্থী কমিউনিস্টদের অনুসরণ করলে পার্টি শ্রমিকশ্রেণি কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং বিরাট জনসমাজের উপর শ্রমিকশ্রেণির প্রভাব ক্ষুণ্ণ হত। কেরেনস্কির সময় জনগণ এই অভিজ্ঞতা না লাভ করলে সমাজতন্ত্রী এবং মেনশেভিকদের জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেত না এবং শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বও অসম্ভব হয়ে পড়ত। কাজেই পাতি বুর্জোয়া দলগুলির ভ্রান্তি এবং সোভিয়েতের মধ্যে প্রকাশ্য সংগ্রামের ব্যর্থতা বুঝিয়ে দেবার জন্য 'ধৈর্যসহকারে ব্যাখ্যা' করার যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, সেই কৌশলই ছিল একমাত্র সঠিক কৌশল।

"বামপন্থী কমিউনিস্টদের কৌশল অবলম্বনের বিপদ ছিল এই যে, তাতে পার্টি শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের নেতৃত্ব হারিয়ে কোনও প্রকার অবলম্বনবিহীন মুষ্টিমেয় নির্বোধ ষড়যন্ত্রকারীর দলে রূপান্তরিত হয়ে যেত।"

লেনিন বলেছেন : "কেবলমাত্র অগ্রগামীদের দ্বারা জয়লাভ সম্ভব নয়। সমগ্র শ্রেণি এবং বিরাট জনসমাজ যতক্ষণ না অগ্রগামীদের প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করছেন, অথবা কমপক্ষে অগ্রগামীদের পক্ষে সুবিধাজনক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করছেন, ততক্ষণ শুধু মাত্র অগ্রগামীদের চূড়ান্ত যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। এ শুধু ভুল নয়, মস্ত অপরাধ। সমগ্র শ্রমিকশ্রেণির এবং পুঁজিপতিদের দ্বারা অত্যাচারিত খেটে খাওয়া বিরাট জনসমাজকে এই অবস্থায় আনতে হলে শুধু প্রচারকার্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতাও দরকার। সমস্ত বড় বড় বিপ্লবের এই হচ্ছে মৌলিক কানুন। রুশ এবং জার্মান বিপ্লবের ক্ষেত্রে আরও স্পষ্টভাবে সে কথা স্বীকৃত হয়েছে। রুশিয়ার মত অসংস্কৃত এবং প্রায় অশিক্ষিত জনগণের জন্যই শুধু নয়, জার্মানীর মত সুসংস্কৃত এবং সম্পূর্ণ শিক্ষিত জনগণের জন্যও এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার একান্ত প্রয়োজন। বুর্জোয়াদের সামনে তাঁদের সম্পূর্ণ নিষ্ফলতা, মেরুদণ্ডহীনতা, অসহায়তা, দাসোচিত অবস্থা, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ধুরন্ধরদের গভর্নমেন্টের জঘন্যতা এবং শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের বিকল্প হিসাবে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের (রুশিয়ার কর্নিলভ এবং জার্মানীর

*রুশিয়ার একদল প্রাক্তন বলশেভিক। এঁরা ডুমা থেকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার এবং আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান মারফৎ কাজ করা স্থগিত রাখবার দাবি করেছিলেন।

ক্যাপ এণ্ড কোং) একনায়কত্বের অবশ্যম্ভাবিকতা অত্যন্ত বেদনাময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলে তবেই জনগণ আরও দৃঢ়তার সঙ্গে কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়ে।" (লেনিন: সিলকটেড ওয়ার্কস)

বলশেভিকরা কিভাবে জনগণকে পরিষ্কার বুঝাতে ও তাদের নেতৃত্ব করতে সফল হয়েছিল, সে সম্পর্কে ষ্ট্যালিন লিখেছেন (লেনিনিজম : পৃষ্ঠা ১০৯) : "চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : অবস্থার বর্ণনা পরিষ্কার হবে না যতক্ষণ না আমরা আলোচনা করি বলশেভিকরা কিভাবে এবং কেন তাঁদের পার্টির স্লোগানকে বিরাট জনতার স্লোগানে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কেন এবং কিভাবে তাঁরা তাঁদের নীতির যথার্থতা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন শুধু অগ্রগামী অংশ বা শ্রমিকশ্রেণির অধিকাংশদের নয় এমন কি জনগণের অধিকাংশদেরও।

"আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, লক্ষ কোটি জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকৃত গণ বিপ্লবের বিজয়ের জন্য শুধু সঠিক পার্টি স্লোগানই যথেষ্ট নয়। বিপ্লবের জয়ের জন্য আর একটি বস্তুর প্রয়োজন এবং সেই বস্তু হচ্ছে এই যে, এই সমস্ত স্লোগানের সঠিকতা হৃদয়ঙ্গমের জন্য জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতা। একমাত্র তখনই পার্টির স্লোগান জনগণের স্লোগানে রূপান্তরিত হয়, বিপ্লব প্রকৃত গণবিপ্লবে পরিণত হয়। অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতির সময় বলশেভিকদের কৌশলের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাঁরা জনগণকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে পার্টির স্লোগানে আনবার এবং তাদের বিপ্লবের দ্বারে উপনীত করবার সঠিক পথ এবং পথের মোড় তাঁরা নির্ধারণ করেছিলেন। অর্থাৎ নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা জনগণ যাতে পার্টির স্লোগানের সঠিকতা অনুভব করে ও পরীক্ষা করে বুঝতে পারে তাতে তাঁরা সাহায্য করেছিলেন। অন্য কথায় বলা চলে যে, বলশেভিক কৌশলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাঁরা পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে জনগণের নেতৃত্বকে গুলিয়ে ফেলেন নি। প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের নেতৃত্বের প্রভেদ তাঁরা পরিষ্কার বুঝেছিলেন। তাই তাঁরা শুধু পার্টির নেতৃত্ব-বিজ্ঞানই অনুধাবন করেন নি, বিরাট মেহনতকারী জনসমাজের নেতৃত্ব-বিজ্ঞানও তাঁদের আয়ত্তাধীন হয়েছিল।

"গণপরিষদের আহ্বান এবং ভেঙে দেওয়ার মধ্যে বলশেভিকদের উপরোক্ত কৌশল বৈশিষ্ট্যের চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়।

"সকলেই জানেন যে, ১৯১৭ সালের এপ্রিল থেকে বলশেভিকরা সোভিয়েত রিপাবলিক গড়বার স্লোগান তোলেন। একথাও সকলে জানেন যে, গণপরিষদ হচ্ছে সোভিয়েত রিপাবলিকের মূল নীতি বিরোধী বুর্জোয়া পার্লামেন্ট। কিন্তু এ সত্ত্বেও সোভিযেত রিপাবলিক গঠনকামীরা অবিলম্বে গণপরিষদ আহ্বান করার জন্য অস্থায়ী গভর্নমেন্টের কাছে দাবি তুলছেন কেন? বলশেভিকরা শুধু নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করেন নি, গণপরিষদ আহ্বানও করেছিলেন নিজেরা, কিন্তু কেন? সশস্ত্র অভ্যুত্থানের একমাস আগে পুরাতন থেকে নূতনের রূপান্তরের সময়ে বলশেভিকরা সোভিয়েত রিপাবলিক এবং গণপরিষদের সাময়িক সংযোগ স্বীকার করে নিয়েছিলেন কেন? কারণ :

"(১) বিরাট জনসমাজের মধ্যে গণপরিষদের সম্বন্ধে ধারণা তখন একটি জনপ্রিয় ধারণা ছিল।

"(২) অবিলম্বে গণপরিষদ আহ্বানের স্লোগান অস্থায়ী মধ্যকালীন গভর্নমেন্টের বিপ্লব বিরোধী স্বরূপ উদঘাটিত করতে সাহায্যে করেছিল।

"(৩) জনগণের কাছে গণপরিষদকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য জমি, শান্তি এবং সোভিয়েতগুলিকে ক্ষমতাদানের দাবি নিয়ে জনগণকে গণপরিষদের প্রাচীর পর্যন্ত নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল এবং এইভাবে তাদের প্রকৃত ও অকৃত্রিম গণপরিষদের মুখোমুখী করা হয়েছিল।

"(৪) গণপরিষদের বিপ্লববিরোধী রূপ সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞতা লাভ করে গণপরিষদ ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে এইভাবে জনগণকে সাহায্য করা হয়েছিল।

"(৫) এই সমস্ত কারণে গণপরিষদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে গণপরিষদ ও সোভিয়েত রিপাবলিকের সাময়িক সংযোগের সম্ভাবনা স্বভাবতই আগে থেকেই অনুমান করে নেওয়া হয়েছিল।

"(৬) সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতগুলিকে হস্তান্তরের ভিত্তিতে এই সংযোগ সাধিত হলে সোভিয়েতগুলির কাছে গণপরিষদের অধঃস্তনতাই প্রকাশ পেত এবং গণপরিষদ হয়ে পড়ত সোভিয়েতের উপাঙ্গ। ফলে এর যন্ত্রণাহীন উচ্ছেদ করা যেত।

"বলশেভিকরা উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন না করলে গণপরিষদের অবসান যে অত মসৃণভাবে সম্ভব হত না, এবং মেনশেভিক ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের 'গণপরিষদের হাতে সকল ক্ষমতা দাও' স্লোগান অত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হত না, তা বলাই বাহুল্য।"

লেনিন বলেছেন : "আমরা রুশীয় বুর্জোয়া পার্লামেন্ট ও গণপরিষদের নির্বাচনে যোগ দিয়েছিলাম ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর। আমাদের সে কৌশল ঠিক হয়েছিল কি? ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে রুশিয়ায় পার্লামেন্টীয় কার্যকলাপের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করবার অধিকার পশ্চিমের অন্যান্য কমিউনিস্টদের চেয়েও রুশ বলশেভিকদের বেশি ছিল না কি? নিশ্চয়ই ছিল, কারণ বুর্জোয়া পার্লামেন্ট অনেক দিন ধরে চালু ছিল, না, অল্পদিন চালু হয়েছে সে প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে মেহনতকারী মানুষের বিরাট জনসমাজ সোভিয়েত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টকে ভেঙে দিতে (অথবা ভাঙতে দিতে) কতদূর প্রস্তুত আছে (নীতিগত ভাবে, রাজনৈতিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে)। রুশিয়ার ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে শহরের শ্রমিকশ্রেণি, সৈন্যগণ এবং কৃষক সম্প্রদায় কয়েকটি বিশেষ কারণে যে সোভিয়েত ব্যবস্থা গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে বিশেষভাবে প্রস্তুত ছিল, তা ঐতিহাসিক ঘটনা। তা সত্ত্বেও বলশেভিকরা গণপরিষদ বয়কট করেনি, বরং শ্রমিকশ্রেণি রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার পূর্বে এবং পরেও নির্বাচনে অংশ নেয়।" (লেনিন : সিলেকটেড ওয়ার্কস)

"তাঁরা তখন গণ পরিষদ বয়কট করে নি কেন?" তার কারণ সম্বন্ধে লেনিন বলছেন : "... সোভিয়েত রিপাবলিকের জয়ের কয়েক সপ্তাহ আগে এবং পরেও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে অংশ গ্রহণে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণির কোন ক্ষতি তো হয়ই না বরং এই পার্লামেন্ট ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয়তা জনগণের পশ্চাদপদ অংশকে বোঝাবার সুবিধা হয়। ফলে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের রাজনৈতিক অবসানের পদ্ধতি আরও মসৃণ হয়।" (ঐ)

উপরোক্ত সংগ্রাম পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমাদের কৌশল পদ্ধতি কি? কি ধরনের সংগ্রাম এবং শ্রমিক সংগঠন গড়তে হবে?

বিপ্লবের অবস্থা এবং রণ-নীতির লক্ষ্য অনুযায়ী সংগ্রাম পদ্ধতি স্থির হয়। বুর্জোয়াশ্রেণির

পতন ঘটানোর উদ্দেশ্য এবং বিপ্লবী সময়ের অস্তিত্ব দ্রুত পরিবর্তনশীল বিপ্লবী ঘটনাবলী আমাদের জঙ্গী এবং বিপ্লবী ধরনের সংগ্রাম ও সংগঠনের আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। তাই ধর্মঘট, কৃষক সংগ্রাম, সশস্ত্র সংঘর্ষ, সাধারণ ধর্মঘট, রাজনৈতিক ধর্মঘট প্রভৃতি সব কিছু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যায়— এই পরিস্থিতিতে এ সবই হল সংগ্রামের ধরন ও পদ্ধতি। এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে সংগঠনের রূপ ও পদ্ধতি হবে বিপ্লবী কৃষক কমিটি (তেলেঙ্গানা), অথবা ধর্মঘট কমিটি, ধর্মঘট পরিচালনাকারী বে-আইনী কারখানা কমিটি অথবা কৃষক কমিটি, স্কোয়াড, শ্রমিক কৃষকদের রক্ষাকারী গেরিলা অথবা স্বেচ্ছাসেবক স্কোয়াড ইত্যাদি। পরে এগুলো আক্রমণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়।

এই সব সংগ্রাম পদ্ধতিই সমস্ত কিছু নয়, আমাদের যে সব সংগ্রাম পদ্ধতি কাজে লাগাতে হবে বা লাগাচ্ছি তা এর বাইরেও আছে। আমরা এখনও পার্লামেন্টে যোগদান করি, ডেপুটেশন এবং শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করি, শিল্পবিরোধ-মীমাংসা ট্রাইব্যুনালের কাছে যাই, ত্রিদলীয় সম্মেলনে যোগ দিই এবং প্রস্তুতি মূলক নানারকমের কাজ করে থাকি, ইউনিয়নের সাধারণ সভা থেকে আরম্ভ করে গভর্নমেন্টের স্বরূপ উদ্ঘাটন, সমালোচনা ও আক্রমণ করে রাজনৈতিক ও গ্রুপ মিটিং করি। এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পরিস্থিতি বিপ্লবী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হলেও প্রতিবাদ আন্দোলন এবং সংগ্রামের প্রাথমিক ও মৌলিক ধরন এবং পদ্ধতি আমরা বাদ দিতে পারি না।

এর কারণ কি? কারণ পরিস্থিতি বিপ্লবী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হলেও সকল স্থানের জনগণ একই প্রকার দ্রুততা এবং সচেতন ভাবে শিখতে বা এগোতে পারবে না। কোথাও কোথাও জনগণ ইতিমধ্যেই প্রস্তুতির স্তর ত্যাগ করে চরম দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম ঘোষণা করতে দৃঢ় সংকল্প। নিঃসন্দেহে তারা বুঝেছে যে গভর্নমেন্টের সঙ্গে লড়াই করতেই হবে। কোথাও কোথাও জনগণ এই শাসনের উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সচেতন এবং দৃঢ়সংকল্প। বিরাট বিরাট অঞ্চলে সংগ্রাম শুরু হচ্ছে মাত্র। জনগণের বিরাট বিরাট অংশ বর্তমান গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রথম প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পক্ষপাতী। তারা কোনও আশু সমস্যা অথবা জমি ও বেতনের মৌলিক প্রশ্নের উপর সংগ্রাম আরম্ভ করতে চায় কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেরই বুঝতে বাকী আছে যে, তাদের সংগ্রাম কেবল জমিদারের বিরুদ্ধেই নয়, এই শাসনের বিরুদ্ধেও। সংগ্রাম যত ঘনিয়ে উঠবে, ততই তারা আশ্চর্য রকম দ্রুততার সঙ্গে সেই সত্য উপলব্ধি করে খণ্ড সংগ্রামে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং বুঝতে পারবে যে, এই শাসনের অবসান করতেই হবে। এইভাবে দ্রুততার সঙ্গে খণ্ড সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে জনগণ রাজনৈতিক সংগ্রামের স্তরে পৌঁছাতে শেখে— তাদের রাজনৈতিক চেতনা এসে পড়ে। মার্ক্সবাদী নেতৃত্বে জনগণের সম্মুখে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রশ্ন, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিরোধীদের মুখোশ খুলে ধরার ফলে উপরোক্ত রূপান্তর পদ্ধতি আরও সহজ এবং দ্রুততর হয়। এই দুই প্রবাহ জনগণকে নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দেয় যে, এই শাসনের অবসান করতেই হবে।

মোহমুক্তি এবং চেতনার এই অসমান গতি, জনগণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অসমানতা, বিভিন্ন প্রদেশ ও এলাকায় জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণি এবং তাদের পার্টির ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও প্রভাবের অসমানতা এবং শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া নেতৃত্বের

প্রভাব— এই সমস্ত কিছুর সংমিশ্রণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, শ্রমিকশ্রেণিকে সংগ্রামের অত্যন্ত প্রাথমিক ধরন ও পদ্ধতি থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত বিপ্লবী ধরন এবং পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামের উদ্দেশ্য হবে দ্রুততার সঙ্গে জনগণকে এমন জায়গায় আনা, যেখানে তারা নিজেরাই এই শাসনের উচ্ছেদের জন্য মার্ক্সবাদীদের ডাকে সাড়া দেবে।

এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, তেলেঙ্গানায় সামন্ত শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকেরা সশস্ত্র সংগ্রাম করছে, বিপ্লবী কমিটি জমি বাজেয়াপ্ত এবং বন্টন করে বিপ্লবী পন্থায় জমি সমস্যার সমাধান করছে এবং জনগণের নূতন ক্ষমতার কাঠামো হিসাবে কাজ করছে।

আবার দেখতে পাচ্ছি, কলকাতা এবং বোম্বাইয়ে অত্যন্ত সাধারণ রকমের ধর্মঘট হচ্ছে এবং শিল্প-বিরোধ-মীমাংসা ট্রাইব্যুনালে যোগ দেওয়া হচ্ছে। সাধারণত অনেক লালঝাণ্ডার কর্মী তেলেঙ্গানা এবং শিল্প-বিরোধ ট্রাইব্যুনালে অংশ গ্রহণের কথা এক মুখে বলতে দ্বিধাবোধ করবেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রেণিসংগ্রামের প্রাণ এবং বাস্তবতা এমনই যে, যে নেতৃত্ব তেলেঙ্গানায় অস্ত্র ধরেছে, সেই নেতৃত্বই আবার বোম্বাই এবং কলকাতায় শিল্প-বিরোধ-মীমাংসা ট্রাইব্যুনালে শ্রমিকদের মামলা চালাচ্ছে। একদিকে কেরালায় চলেছে কৃষকের প্রচণ্ড প্রতিরোধ, আর অন্যদিকে অন্যান্য প্রদেশে চলেছে কৃষকদের অতি সাধারণ সমর্থন-সভা; ফিরোজাবাদে ক্রুদ্ধ শ্রমিকরা কারখানা দখল করছে আর অন্যত্র শ্রমিকরা অত্যন্ত সাধারণ সুযোগ সুবিধা মেনে নিচ্ছে।

আমরা যদি এই পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল অথবা স্থায়ী করে রাখবার চেষ্টা করি, অথবা সচেতনভাবে দেখবার চেষ্টা না করি যে, বর্তমান শাসনের অবসানের জন্য সর্বত্র জনগণ প্রাথমিক প্রতিরোধের ধরন ও পদ্ধতি ত্যাগ করে উচ্চতর সংগ্রাম পদ্ধতি অবলম্বন করে সংগ্রামের মুখোমুখি হচ্ছে, তাহলে সে হবে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। যদি কেউ বলে যে, আজকের দিনের চেতনা অনুযায়ী আমাদের কেবল খণ্ড সংগ্রামেই কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ করা উচিত, তাহলে সে হবে সুবিধাবাদের কথা। বর্তমান চেতনার স্তরকে এইভাবে কাজে লাগান, আর জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা— একই কথা। যুগটা বিপ্লবের, কাজেই আমরা জানি যে, অত্যন্ত প্রাথমিক সংগ্রামও এমন সব শক্তিকে সক্রিয় করে তুলবে, যার ফলে জনগণ তাদের বর্তমান চেতনাকে পরাভূত করে এগিয়ে যাবে। তাই আজ আর আমরা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের মাঝে চীনের প্রাচীর খাড়া করি না। একথাও আমরা মানি না যে, অগ্রসর চেতনার স্তরে পৌছাতে জনগণের বিভিন্ন অংশের বহু বৎসর লাগবে। বরং আমরা জানি, জনগণের সংগ্রাম হচ্ছে সমস্ত পশ্চাদপদতা পরাভূত করার বড় শিক্ষাদাতা।

তবুও চেতনার অসমানতার কথাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে এবং সংগ্রামীদের চেতনার সঙ্গে মিলিয়ে সংগ্রামের ধরন এবং পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, এই অসমানতার কারণ— বুর্জোয়ারা এখনও প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং শ্রমিকশ্রেণির প্রভাব অসমান। বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করার সংগ্রামই হচ্ছে অসমানতাকে পরাভূত করে জনগণকে অগ্রবর্তী অংশের চেতনার স্তরে পৌঁছে দেবার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণ বুঝতে পারবে যে, বিপ্লবী সংগ্রামের দ্বারা বর্তমান সমাজ কাঠামোর উচ্ছেদ ছাড়া বর্তমান অবস্থার হাত থেকে অব্যাহতি নেই।

এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে তাদের বিচ্ছিন্ন করার সমগ্র রণনীতি অবস্থানুযায়ী সংগ্রাম কৌশলের মধ্যে রূপ পাচ্ছে।

এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু সংগ্রামের ধরন এবং পদ্ধতির বেলাতেই নয়, রাজনৈতিক স্লোগানের বেলাতেও একই নিয়ম চালু করতে হবে। জনগণের চেতনার স্তর ইত্যাদি বিবেচনা করে মার্ক্সবাদীদের এমন পথের সন্ধান করতে হবে, এমন উপায় নির্ধারণ করতে হবে যাতে মার্ক্সবাদীদের স্লোগানকে জনগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজেদের শ্লোগান করে নেয়। মার্ক্সবাদীদের এমনভাবে চলতে হবে, গণসংগ্রাম চালাতে হবে, বিভিন্ন সময়ে এমন এমন স্লোগান দিতে হবে, যাতে জনগণ মূল স্লোগানের সঠিকতা নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সকল অবস্থায় মূল স্লোগানের শুধু পুনরাবৃত্তি করে সেই স্লোগানের উপর এই আশা নিয়ে আমরা যদি তাঁবু গাড়ি যে, জনগণ একদিন সত্য আবিষ্কার করে তাঁবুর মধ্যে ভিড়ে পড়বে তাহলে আমাদের চেষ্টা মোটেই সফল হবে না।

জার্মান বামপন্থীদের ভ্রম সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন : 'জার্মানীর কমিউনিস্টদের কাছে অবশ্য পার্লামেন্টারিজম হল রাজনৈতিক ভাবে অকেজো। এবং সেইটাই আসল কথা। আমরা যেন কখনও না মনে করি যে, আমাদের কাছে যা অকেজো তা শ্রেণি এবং জনগণের কাছেও অকেজো। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বামপন্থীরা যুক্তির ধার ধারেন না, শ্রেণি এবং শ্রেণির পশ্চাদপদ অংশে পার্টি হিসাবে নিজেদের পরিচালিত করতে জানেন না। এতে কোন মতবিরোধ নেই। তাঁদের আপনারা তিক্ত সত্য বলে দেবেন। তাঁদের এই বুর্জোয়া-গণতন্ত্রী এবং পার্লামেন্টারী কুসংস্কারই বলবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনারা শ্রেণি সচেতনতার প্রকৃত (এই কথার উপর লেনিন জোর দিয়েছেন) অবস্থা এবং সমগ্র শ্রেণির (শুধু কয়েকটি বিশেষ অংশে নয়) প্রস্তুতি ধীর-মস্তিষ্কে পর্যবেক্ষণ করবেন।''

(''বামপন্থী কমিউনিজম'' : পৃ. ৬০০, লেনিন : সিলেকটেড ওয়ার্কস— দ্বিতীয় খণ্ড, মস্কো সংস্করণ)

সব শেষে স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের রণনীতি ও কৌশলের লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়াকে ধ্বংস করবার জন্য যত বেশি সম্ভব জনগণকে টেনে আনা জনগণের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে এবং তার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা শ্রেণিমৈত্রী হচ্ছে জনগণের অধিকাংশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন। জনগণের অধিকাংশকে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বাধীনে আনবার এটা একটা অস্ত্র মাত্র। আমাদের প্রত্যেকটি চাল, প্রত্যেকটি কৌশল জনগণের অধিকাংশকে বিপ্লবের দিকে কতখানি টানছে, তারই ভিত্তিতে বিচার হবে সেই চালের, সেই কৌশলের। লেনিন বলেছেন—

''কোন বিপ্লবী পার্টি যদি বিপ্লবী শ্রেণিগুলির অগ্রগামীদের অধিকাংশকে এবং সাধারণভাবে দেশের অধিকাংশ লোককে তার দিকে না পায়, তাহলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কোন প্রশ্নই ওঠে না।'' (ষ্ট্যালিন : ''প্রবলেমস অফ্ লেনিনিজম্''— পৃ. ১৪৫)

''শ্রমিকশ্রেণির অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে বিপ্লব অসম্ভব এবং জনগণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন ঘটে।'' (পৃ. ১৪৫)

''আদর্শগতভাবে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামী অংশকে জয় করা— সেটাই আসল জিনিস। এ ছাড়া বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপও নেওয়া যায় না। কিন্তু সম্পূর্ণ জয়লাভ আরও দূরের কথা। কেবলমাত্র অগ্রগামীদের দ্বারা জয়লাভ সম্ভব হয় না। সমগ্র শ্রেণি এবং জনগণ

যতক্ষণ না প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করছে অথবা অগ্রগামীদের পক্ষে সুবিধাজনক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করছে এবং শত্রুপক্ষকে সমর্থন করা তাদের সম্ভব নয় ততক্ষণ অগ্রগামীদের কোন চূড়ান্ত সংগ্রামে ঠেলে দেওয়া শুধু ভুল নয়, ঘোর অপরাধ। সমগ্র শ্রেণি এবং পুঁজিপতিদের দ্বারা উৎপীড়িত মেহনতকারী জনগণকে উপরোক্ত অবস্থায় আনলে হলে শুধু প্রচারকার্য যথেষ্ট নয়। এজন্য জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।" (পৃ. ১৪৫)

স্ট্যালিন প্রশ্ন করেছেন : "পার্টির নীতি যখন নির্ভুল এবং অগ্রগামী অংশ ও শ্রেণির মধ্যে যখন সম্পর্ক সঠিক থাকে তখন নেতৃত্বের অর্থ কি?"

"এই অবস্থায় নেতৃত্বের অর্থ হচ্ছে জনগণকে পার্টির নীতির সঠিকতা বোঝাবার দক্ষতা; জনগণের সামনে এমন সব স্লোগান তুলে ধরার দক্ষতা, যাতে জনগণ পার্টির স্থান গ্রহণ করতে পারে এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা পার্টিনীতির সঠিকতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে; এবং এইভাবে জনগণকে পার্টির চেতনার স্তরে এনে চূড়ান্ত সংগ্রামে তাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা লাভের ক্ষমতাই হচ্ছে নেতৃত্ব।" (পৃ. ১৪৫)

কোনও প্রশ্ন বিচার অথবা বিচ্যুতি ধরার সময় এই মানদণ্ডের কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। জনগণের অধিকাংশকে জয় করার সময় পার্টিকে সব সময়ে এইসব কাজগুলিই মনে রাখতে হবে, শ্রমিকশ্রেণিকে এই সব কাজগুলি সম্পাদন করতে হবে।

শেষোক্ত কর্তব্য সম্পর্কে কমিনফর্মের মুখপত্র সতর্কবাণী করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, বহু দেশে এখনও কমিউনিস্ট পার্টি এ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণির অধিকাংশকে জয় করতে পারেন নি। কমিনফর্ম মুখপত্রের এই সতর্কবাণী ভারতবর্ষ সম্পর্কেও প্রযোজ্য :

"ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণির সামনে কঠোর সংগ্রাম। বুর্জোয়া এবং তাদের দালাল দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী এবং বিশ্বাসঘাতকরা আবার গণতান্ত্রিক ঐক্য এবং শক্তিকে খর্ব করার জন্য এবং মেহনতকারী জনসাধারণের কোন কোন গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে। জনগণের উপর থেকে বুর্জোয়া আদর্শের প্রভাব ঘোচাবার জন্য এবং অধিকাংশ শ্রমিক কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের টেনে আনবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে অবিরাম এবং ক্রমবর্ধমান সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। এর প্রয়োজন আরও বেশি এই জন্য যে, বহুদেশে কমিউনিস্টদের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক এবং শিক্ষামূলক কাজে যথেষ্ট দোষ ত্রুটি আছে এবং তাঁরা বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকশ্রেণির অধিকাংশের উপরও চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।

'ক্রমাগতভাবে জনগণের মধ্যে নিজেদের সাংগঠনিক ও সমাবেশমূলক ভূমিকার উৎকর্ষ সাধন করলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলি নূতন নূতন সাফল্য অর্জন করবে।" (লাষ্টিং পিস— ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৮)

প্রাপ্তিস্বীকার : 'মার্কসবাদী' তৃতীয় সংকলন, মে ১৯৪৯

বুর্জোয়া গণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র

ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের মধ্যে বিপ্লবের স্তর ও রণনীতি সম্বন্ধে বর্তমানে বহু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে। এই বিষয়ে অন্ধ্রদেশের মার্ক্সবাদী নেতৃত্বের কয়েকটি প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ সম্প্রতি যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা নূতন আলোকপাত করে। এই প্রবন্ধে সেই আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হইল।

অন্ধ্রদেশের এক নেতৃস্থানীয় কর্মী বলিয়াছেন, বিপ্লবের বর্তমান স্তরের সহিত ফেব্রুয়ারী ও অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যবর্তী স্তরের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের স্তরের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই যুক্তিকে খণ্ডন করিতে গিয়া অন্ধ্রের মার্ক্সবাদী নেতৃত্ব বলিতেছেন :

"শ্রমিকশ্রেণির এক নেতৃত্ব নীতিগত এবং কর্মপন্থাগত নেতৃত্ব রুশ-বিপ্লবের এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া বিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত ছিল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব সত্যই সম্ভব হইয়াছিল কেবলমাত্র দ্বিতীয় স্তরের শেষে, যদিও ইহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় গভর্নমেন্ট হইতে বামপন্থী সোশালিস্ট রেভলিউশনারীদের বিতাড়নের পর। অতএব মনে রাখিতে হইবে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব হইতে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব সম্পূর্ণ পৃথক"।

অতীত সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণির ডিক্টেটরী প্রতিষ্ঠার সহিত বিপ্লবের প্রত্যেক স্তরের নেতৃত্বকে মিশাইয়া না দেখিবার জন্য যদি এখানে সাধারণভাবে সতর্কবাণী উচ্চরণ করা হইত, তবে সেই নির্দেশ নির্ভুল হইত। কিন্তু তাঁহারা সাধারণভাবে নেতৃত্বকে ডিক্টেটরী হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন; অন্তত তাঁহাদের নির্ণীত নীতি হইতে এই ধারণাই জন্মে যে, বিপ্লবের লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণি-প্রভূত্ব অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব, এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটি তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া নেতৃত্বের ধারণাকে তাঁহারা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বকে "নীতিগত ও কর্মপন্থাগত নেতৃত্ব..." বলিয়া অভিহিত করা ঠিক কি? ইহা শুধু ভুল নহে, ইহার অর্থ দাঁড়ায় পার্টি ও মজুরশ্রেণির অগ্রগামী ভূমিকাকে বর্জন করা। কারণ, শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব শুধু নীতিগত ও কর্মপন্থাগত নেতৃত্ব নহে, সাংগঠনিক নেতৃত্বও বটে। নেতৃত্বকে যে ভাবে অভিহিত করা হইয়াছে তাহা লেনিনপন্থার বিরোধী।

কেবলমাত্র নীতি ও কর্মপন্থার ক্ষেত্রে নহে, সংগ্রামের বাস্তব ক্ষেত্রেও পার্টির পরিচালনায় সমগ্র শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমজীবীরা চালিত হইবে, লেনিন-ষ্ট্যালিনপন্থী মতবাদ অনুসারে ইহাই শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বের মূল কথা। শুধু মাত্র নীতি ও কর্মপন্থার নেতৃত্বের কথা বলা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বের বিপ্লবী তাৎপর্যের বিকৃতিসাধন ছাড়া কিছুই নহে। সমগ্র শ্রমিকশ্রেণিকে

সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকুক বা নাই থাকুক, কোনও পার্টির নীতি ও কর্মপন্থা যদি শ্রমিকশ্রেণির নীতি ও কর্মপন্থা হয়, তবেই সে কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে পারিবে এবং এই নেতৃত্বই যথেষ্ট ও ঔপনিবেশিক অবস্থায় ইহাই শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বের সমতুল্য— বিপ্লবী মতবাদের অভিজ্ঞতার এই ভ্রান্ত বোধ হইতেই মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত ধরনের বিকৃতির জন্ম হয়।

যে ধারণা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বকে নীতি ও কর্মপন্থার ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে ধারণা ভ্রান্ত। ষ্ট্যালিন রচিত বলশেভিক পার্টির ইতিহাস হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে সংগ্রামক্ষেত্রে নেতৃত্বের নিদর্শন পাওয়া যাইবে :

"পেট্রোগ্রাড পুলিশ রিপোর্ট করিল, সাধারণ ধর্মঘট চাহে এমন লোকের সংখ্যা রোজই বাড়িতেছে এবং ১৯০৫ সালের মতই ইহা জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

"২৫শে ফেব্রুয়ারী (১০ই মার্চ) পেট্রোগ্রাডের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণি বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিল। জেলায় জেলায় যে রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলি চলিতেছিল সেগুলি একত্র মিশিয়া সমগ্র শহরের একটি সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটে পরিণত হইল। সর্বত্র চলিতে লাগিল বিক্ষুব্ধ জনসমাবেশ ও পুলিশের সহিত সংঘর্ষ। শ্রমিক শোভাযাত্রার মাথার উপর উড়িতে লাগিল লাল ঝাণ্ডা, তাহাতে লেখা 'জার ধ্বংস হোক' 'যুদ্ধ বন্ধ হোক!' 'আমরা রুটি চাই!' "

"২৬শে ফেব্রুয়ারি (১১ই মার্চ) সকালে রাজনৈতিক ধর্মঘট ও বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রা অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করিতে শুরু করিল। পুলিশ ও সিপাহীদের অস্ত্র কাড়িয়া মজুরেরা নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত করিল। সবচেয়ে বেশি ও বিশেষ চেষ্টা হইল সৈন্যদের দলে ভিড়াইবার, এ চেষ্টায় অগ্রণী হইল শ্রমিক মেয়েরা। তাহারা সরাসরি ডাক দিল সৈন্যদের, আবেদন জানাইল আত্মীয়তার, আহ্বান জানাইল ঘৃণিত স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রের উচ্ছেদে জনসাধারণকে সাহায্য করিতে।

"বিদ্রোহী শ্রমিক ও সৈন্যেরা জারের মন্ত্রী ও সেনাপতিদের গ্রেপ্তার করিতে লাগিল এবং জেল হইতে বিপ্লবীদের মুক্তি দিতে লাগিল। মুক্ত রাজবন্দীরা বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিতে লাগিলেন।

"বাড়ির ছাতে ও বারান্দায় মেশিনগান লইয়া মোতায়েন পুলিশ ও সিপাহীদের সহিত রাস্তায় রাস্তায় গুলিবিনিময় চলিতে লাগিল। কিন্তু সৈন্যেরা খুব তাড়াতাড়ি শ্রমিকদের পক্ষে চলিয়া গেল। ইহাতেই জার স্বেচ্ছাতন্ত্রের ভাগ্য চিরদিনের মত নির্ধারিত হইয়া গেল।"

"পেট্রোগ্রাডে বিপ্লবের জয়লাভের সংবাদ যখন অন্যান্য শহরে ও যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিল তখন শ্রমিক ও সৈন্যেরা সর্বত্র জারের কর্মচারীদের বিতাড়নপর্ব শুরু করিল।

"জয়ী হইল ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।"

"বিপ্লব জয়ী হইল তাহার কারণ ইহার অগ্রগামী দল ছিল শ্রমিকশ্রেণি; শান্তি, রুটি ও স্বাধীনতার দাবি হইয়া সৈনিকের পোষাকপরা লক্ষ লক্ষ কৃষকের আন্দোলনের নেতৃত্ব করে এই শ্রমিকশ্রেণি। এই শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বই বিপ্লবের জয়লাভের কারণ।"

"বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় লেনিন লেখেন :

"শ্রমিকশ্রেণিই বিপ্লব করে। বীরত্ব দেখায় এই শ্রমিকশ্রেণিই, রক্ত দান করে ইহারাই; শ্রমজীবী, দরিদ্র জনসাধারণের বৃহত্তম অংশকে ইহারাই নিজেদের সাথে টানিয়া লইয়া যায়।' (লেনিন, সংকলিত রচনাবলী, রুশ সংস্করণ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪)।

"প্রথম বিপ্লব অর্থাৎ ১৯০৫ সালের বিপ্লব দ্বিতীয় বিপ্লব অর্থাৎ ১৯১৭ সালের বিপ্লবের দ্রুত সাফল্যের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।"

"লেনিন লিখিয়াছেন, '১৯০৫-০৭ সাল, এই তিন বৎসর ধরিয়া যে প্রচণ্ড শ্রেণিসংগ্রাম চলিয়াছিল এবং রুশ শ্রমিকশ্রেণি যে বিপ্লবী শক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা না হইলে দ্বিতীয় বিপ্লব এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হইত না, অর্থাৎ বিপ্লবের প্রথম স্তর অল্প কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হইত না।" (লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, ইংরাজী সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩-৪ পৃ.)

"বিপ্লবের প্রথম কয়দিনের মধ্যেই সোভিয়েতগুলি গড়িয়া ওঠে। শ্রমিক ও সৈনিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েতগুলির সমর্থন হইল বিজয়ী বিপ্লবের ভিত্তি। বিদ্রোহী শ্রমিক ও সৈনিকেরাই শ্রমিক ও সৈনিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েত গঠন করিল। ১৯০৫ সালের বিপ্লবে দেখা গিয়াছে, সোভিয়েতগুলি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পবিচালন যন্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিপ্লবী শক্তির কেন্দ্রমূল। সোভিয়েটের ধারণা শ্রমিকশ্রেণির মনে রহিয়া গিয়াছিল এবং জারতন্ত্র উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই উহা তাহারা কার্যে পরিণত করে। শুধু পার্থক্য হয় এইটুকু যে, ১৯০৫ সালে হইয়াছিল কেবল শ্রমিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েত, কিন্তু ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বলশেভিকদের উদ্যোগে দেখা দিল শ্রমিক ও সৈন্যদের ডেপুটিদের সোভিয়েত।" (বলশেভিক পার্টির ইতিহাস, ১৭৪-১৭৭ পৃ.)

ইহাই হইতেছে শ্রমিক নেতৃত্বের লেনিন-ষ্ট্যালিনপন্থী ধারণা, ইহা শুধু নীতি ও কর্মপন্থা ক্ষেত্রের নেতৃত্ব নহে, এ নেতৃত্ব সংগ্রামের লড়াইয়ের; এ নেতৃত্ব দেয় সংগ্রামে নূতন রূপ, লড়াইয়ে ফলাফলের স্পষ্টতা, বাস্তব আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেয় সাহসী নেতৃত্ব যাহার ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী সংগ্রামের জন্য সংগঠিত হইয়া ওঠে, যাহা অন্য শ্রমজীবীদের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। এই নেতৃত্ব হইতেই শ্রমিকশ্রেণির হাতিয়ার সাধারণ ধর্মঘটের জন্ম, এই নেতৃত্বই দিয়াছে সংগ্রামের নূতন সংগঠন-অস্ত্র, শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্রের রূপ— সোভিয়েত।

দ্বিতীয়ত, ইহা কি সত্য যে, বিপ্লবের তিন স্তরেই শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব অবিচ্ছিন্ন সমানভাবে বিদ্যমান ছিল? ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী অংশ বলশেভিক পার্টি শ্রমিক ও কৃষকের সামনে যে নির্ভুল নীতি ও কর্মপন্থা রাখিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কর্মপন্থা গ্রহণ করাইবার জন্য তাঁহাদের অবিশ্রাম সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, সংগ্রাম করিতে হইয়াছে কৃষকশ্রেণীর দোদুল্যচিত্ততার বিরুদ্ধে আর সুবিধাবাদী দলগুলির বিরুদ্ধে। যদি শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব অটুট থাকিবে তবে কোথা হইতে আসিল ফেব্রুয়ীর ও অক্টোবরের মধ্যবর্তী সংকটকাল, যখন কৃষকেরা বুর্জোয়াদের হাতে প্রায় সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছিল এবং শ্রমিকশ্রেণিকে অক্টোবর বিপ্লব সংগঠিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল? বিপ্লবের ইতিহাসের অবিসংবাদী ঘটনাগুলিকে ভুলিয়া গিয়াছেন, অথচ ঘটনাগুলিকে সকলেরই জানা উচিত। নেতৃত্বের জন্য অবিশ্রাম সংগ্রাম চালাইয়া অবশেষে শ্রমিকশ্রেণি অনেক চেষ্টার পর কতকগুলি কর্মপূর্ণ বিষয়ে কৃষকশ্রেণিকে টানিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু কৃষকশ্রেণি আবার দোদুল্যমান হইল— যেমন সোভিয়েতগুলি গঠিত হইবার পরও ক্ষমতা তাহারা প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের হাতে তুলিয়া দিল, যেমন, ক্যাডেটদের প্রতি তাহারা আস্থা রাখিয়াছিল, ইত্যাদি।

অবশেষে অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে ও পরে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব পূর্ণভাবে ও চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। নেতৃত্বের এই সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার পরিচয় শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিপ্রভুত্ব, যাহার অর্থ

রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণির সুদৃঢ় নেতৃত্ব।

অতএব, উক্ত সমালোচকেরা যেভাবে নেতৃত্ব ও শ্রেণিপ্রভুত্বের মধ্যে ভেদরেখা টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা কি ঠিক? না, ইহা ভ্রান্ত ও লেনিনবাদের বিরোধী। স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের সংগ্রামের নেতৃত্ব রাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিণত হয়—ইহাই শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিপ্রভুত্ব।

বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিপ্রভুত্বের মধ্যে যে যোগসূত্র রহিয়াছে স্টালিন বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

"এই (লেনিনবাদী) তত্ত্ব অনুসারে, কৃষকশ্রেণির সহিত শ্রমিকশ্রেণির মৈত্রীবন্ধন থাকায় বুর্জোয়া বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশেণির নেতৃত্বে পরিণত হইবে; অন্যান্য শ্রমজীবী শোষিত জনসাধারণের সহিত তখন শ্রমিকশ্রেণির মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষকশ্রেণির গণতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্ব শ্রমিকশ্রেণির সমাজতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্বের পথ প্রশস্ত করিবে।" (৭৫-৭৬ পৃ.)

শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিপ্রভুত্বকে একটি বিশেষ ধরনের মৈত্রীবন্ধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া স্ট্যালিন রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব ও অগ্রণী ভূমিকার উপর জোর দিয়াছেন :

"পশ্চিম ইওরোপের সোশাল ডেমোক্রাটগণ বলিতেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণি কোন সহযোগী পাইবে না, তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে একাকী সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে, শ্রমিকশ্রেণি ছাড়া আর সমস্ত শ্রেণি ও সামাজিক স্তরের বিরুদ্ধে। তাঁহারা দেখিতে পাইতেন না যে, পুঁজি শুধু শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, শহর ও গ্রামের লক্ষ লক্ষ আধা-শ্রমিককেও সে শোষণ করিয়া থাকে এবং পুঁজিবাদের শৃঙ্খল হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার সংগ্রামে পুঁজিবাদের রথচক্রে নিষ্পেষিত এই জনগণ শ্রমিকশ্রেণির সহযোগী হইতে পারে। পশ্চিম ইওরোপের সোশাল ডেমোক্রাটগণ তাই মনে করিতেন, ইওরোপের অবস্থা এখনও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপযুক্ত হয় নাই, এবং উপযুক্ত কেবলমাত্র তখনই হইতে পারে যখন, সমাজের আরও অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে শ্রমিকশ্রেণি জাতির ও সমাজের অধিকাংশ হইয়া দাঁড়াইবে।"

"পশ্চিম ইওরোপের সোশাল ডেমোক্রাটদের এই শ্রমিক বিরোধী মিথ্যা মতবাদ লেনিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-তত্ত্বের আঘাতে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়।"

"একটি দেশে আলাদাভাবে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্বে তখনও কোনও প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত ছিল না বটে, কিন্তু আজ হউক কি কাল হউক, এই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য যে সকল মূল বিষয়গুলির প্রয়োজন তাহার সমস্তই কিংবা প্রায় সমস্তই লেনিনের তত্ত্বে ছিল।"

"এই মৈত্রীবন্ধনকে পরিচালনা করিবে শ্রমিকশ্রেণি, মৈত্রীবন্ধনের ইহাই হইবে বিশেষ রূপ। বিশেষ রূপ বলিতে বুঝাইবে, রাষ্ট্রের নেতা, শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিপ্রভুত্ব ব্যবস্থার নেতা হইতেছে একটি পার্টি, শ্রমিকশ্রেণির পার্টি, কমিউনিস্টদের পার্টি— যে পার্টি অন্য কোনও পার্টিকেই তাহার নেতৃত্বের অংশীদার করে না।" (লেনিনিজম—১২৮ পৃ.)

ঐ একই পৃষ্ঠায় 'অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের কৌশল' নামক তাঁহার নিজের পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া স্ট্যালিন বলিতেছেন :

''মৈত্রীবন্ধনের পরিচালন শক্তি শ্রমিকশ্রেণির হাতে থাকিবে এই শর্তে— শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষকশ্রেণীর শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে, পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য যে শ্রেণিগত মৈত্রীবন্ধন তাহাই শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিপ্রভুত্ব।''

এখানে আবার অগ্রণী ভূমিকা ও নেতৃত্বের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। অন্ধ্রের নেতৃবৃন্দ যদি বলিতেন, রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণি অংশ গ্রহণ করিলেই যে তাহা শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিপ্রভুত্ব হইবে তাহার অর্থ নাই, যদি বলিতেন শ্রেণিপ্রভুত্ব কেবলমাত্র তখনই আসে যখন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব কৃষিজীবী জনসাধারণের নেতৃত্বের মধ্য দিয়া শ্রমিকশ্রেণির পূর্ণ করায়ত্ব হইয়াছে এবং যখন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্য কোনও শ্রেণি তাহার ক্ষমতার অংশভোগী নহে, তবে তাঁহারা সত্য কথাই বলিতেন। কিন্তু তাহা না বলিয়া তাঁহারা নেতৃত্বের সহিত শ্রেণিপ্রভুত্বের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিপ্রভুত্বের সহিত নেতৃত্বকে এইভাবে পৃথক করিয়া দেখাইতে দেওয়া কিছুতেই চলিতে পারে না।

রুশ বিপ্লব সম্পর্কিত আরেকটি প্রশ্ন সম্পর্কেও ঠিক এই ধরনের ভুল করা হইয়াছে, একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক :

''উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একবার একজন নেতৃস্থানীয় মার্ক্সবাদী বলিয়াছিলেন যে বর্তমান জাতীয় গভর্নমেন্টকে কেরেনস্কি গভর্নমেন্টের সহিত তুলনা করা চলে। এই ধরনের সামঞ্জস্য দেখান ঠিক কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে সৈন্য ও শ্রমিকদের ডেপুটিদের সোভিয়েট— এই রূপ ধরিয়া একটি দ্বৈত-ক্ষমতা আবির্ভূত হয় কিন্তু সাংগঠনিক শক্তি ও সাফল্যের এই স্তরে পৌঁছতে ভারতবর্ষের বিপ্লবী শক্তিগুলির এখনও অনেক বাকী। প্রকৃতপক্ষে, এই দ্বৈত-ক্ষমতার অস্তিত্বের উপর ঐ যুগের বিপ্লবের স্তর ও সাধারণ কৌশল নির্ধারণ বিশেষ নির্ভর করে নাই। ঐ ধরনের কোনও দ্বৈত-ক্ষমতার অস্তিত্ব তখন যদি নাও থাকিত, তবুও 'শ্রমিকশ্রেণি ও গরীব কৃষকের সমাজতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্ব' ছাড়া অন্য কোন স্লোগান দেওয়া কি বলশেভিক পার্টির পক্ষে সম্ভব হইত? আমাদের স্পষ্ট উত্তর 'না, হইতেই পারে না।' সেখানে মূল প্রশ্ন ছিল, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন। ঐ ক্ষমতা তখন বুর্জোয়াদের হাতে এবং শ্রমিকশ্রেণির কর্তব্য ছিল তখন বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করিয়া গরীব কৃষকদের সহযোগিতায় ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ব করা।''

রুশ বিপ্লবের দুই স্তরের মধ্যেকার, দুই স্তরের দুই লক্ষ্যবস্তুর মধ্যেকার মূল ও প্রধান যোগসূত্রটি অন্ধ্রের মার্ক্সবাদীরা এখানে ধরিতে পারেন নাই। অর্থাৎ, লেনিনবাদের ও রুশ বিপ্লবে লেনিনবাদী নেতৃত্বের সারমর্মটুকুই তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই।

দ্বৈত-ক্ষমতার তাৎপর্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ক্ষমতা তখন বুর্জোয়াদের হাতেই ছিল এবং সেইজন্যই শ্রমিকশ্রেণি ও গরীব কৃষকের সমাজতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্ব ছাড়া অন্য কোন স্লোগান দেওয়া চলিত না। বুর্জোয়াদের উচ্ছেদের পর শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার তাৎপর্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।

দ্বৈত-ক্ষমতার দুই ভাগ— (১) শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্ব—ইহাই ক্ষমতার আসল উৎস; (২) বুর্জোয়া অস্থায়ী গভর্নমেন্ট— প্রথমটি যাহার হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিতেছিল। ১৯০৫ সালের পর হইতে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বাধীন শ্রমিকশ্রেণির লড়াইয়ের

লক্ষ্যবস্তু ছিল প্রথমটি। লেনিন বারংবার এই ব্যাপারটির উপর জোর দিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণিই নেতৃত্ব করিতে পারে, কৃষকশ্রেণির সহযোগিতায় একমাত্র শ্রমিকশ্রেণিই জারকে উচ্ছেদ করিতে পারে এবং এই বিপ্লবকে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী শ্রেণিপ্রভুত্বে পরিণত করিতে হইবে। এবং যেহেতু কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণিই ইহার নেতৃত্ব করিতে পারে এবং যেহেতু কৃষক জনসাধারণের অধিকাংশই ইহার সমর্থন করিবে সেইজন্য এই বিপ্লব দ্রুত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হইবে। বিপ্লবের প্রথম স্তরের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানর পর ক্ষমতা যে বুর্জোয়াদের হাতে চলিয়া যায় তাহার কারণ, লেনিন দেখাইয়াছেন, জনসাধারণের শ্রেণি-চেতনার অপূর্ণতা—এবং ইহার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণির একাংশও ছিল।

গণতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্ব বলিতে কি বুঝায়? বুঝায় যে, এক আঘাতেই বিপ্লব সাধারণ বুর্জোয়া বিপ্লবের সীমারেখা চূর্ণ করিয়াছে, দ্বিতীয় স্তরের জন্য উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে; এমন সমস্ত শ্রেণিকে সম্মুখে আনিয়াছে যাহারা কঠিন মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বিপ্লবকে পরবর্তী স্তরে— শ্রমিকশ্রেণির স্তরে— লইয়া যাইতে পারে। অতএব শ্রমিক ও কৃষকের গণতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্ব ছিল বলিয়াই বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরের জন্য শ্রমিকশ্রেণি স্লোগান তুলিতে পারিয়াছিল। যাঁহারা বলশেভিক পার্টির ইতিহাস বা লেনিনের লেখা পড়িয়াছেন তাঁহারা এই মারাত্মক সিদ্ধান্তে কি করিয়া আসিলেন যে ঐ সময়ে বিপ্লবের তৃতীয় স্তর ও সাধারণ কৌশল নির্ধারণ দ্বৈত-ক্ষমতার অস্তিত্বের উপর বিশেষ নির্ভর করে নাই? গণতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্বের অর্থ ছিল, অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্ররূপ আসিয়া গিয়াছে এবং পরবর্তী ধাপের জন্য পা বাড়াইতে হইবে। বুঝা গিয়াছিল, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক, অর্থাৎ রাষ্ট্রের দিক দিয়া ঐ বিপ্লব সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাই, পরবর্তী স্তর শ্রমিক ও গরীব কৃষকের সমাজতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্ব ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না এবং কেরেনস্কি ক্ষমতালাভ না করিলে ও সোভিয়েতগুলির উদ্ভব না হইলে শ্রমিক ও গরীব কৃষকের শ্রেণিপ্রভুত্বের স্লোগান দেওয়া চলিত কিনা, এই কাল্পনিক অবস্থা লইয়া বাদবিতণ্ডা নিতান্ত অর্থহীন। শুধু এইটুকু বলা চলে, তখনকার শ্রেণিসম্পর্কের উপযোগী হইলেই অর্থাৎ অন্যান্য মধ্যবর্তী শ্রেণি ও পার্টিগুলির ভূমিকা নিঃশেষিত হইয়া যাইয়া থাকিলে, এই স্লোগান দেওয়া চলে। যাহা হউক, এই প্রস্তাবের আসল ব্যাপার হইতেছে, শ্রমিক কৃষকের গণতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্বের ও অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্ররূপ হিসাবে তাহার অস্তিত্বের বিপ্লবী তাৎপর্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, পরবর্তী স্তরের লড়াই-এর লক্ষ্য বস্তুর সহিত তাহার যোগসূত্রও তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই, দেখিতে পান নাই যে, পূর্ববর্তী যুগের লড়াই এর লক্ষ্যবস্তু ছিল ইহা নিজে, ইহাই ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেকার সেতুপথ।

অন্ধ্রের সমালোচকেরা কখন কখন এমনভাবে সওয়াল করিয়াছেন যে, রুশিয়া ছিল যেন একটি শিল্পোন্নত দেশ— অর্থাৎ বর্তমান ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দেশ—অতএব রুশিয়ার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের ব্যাপারে খুব বেশি প্রযোজ্য নহে। ইহা ভুল। প্রথমত, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেস সমস্ত পৃথিবী এবং ভারতবর্ষের মত উপনিবেশগুলির জন্য যে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে তাহাতে রুশিয়ার অভিজ্ঞতা ও লেনিনপন্থী সাধারণ কৌশলের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতবর্ষের জন্য শ্রমিক ও কৃষকের গণতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্বকে (ডিক্টেটরী) সম্মুখবর্তী লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, রুশিয়াকে অগ্রসর শিল্পোন্নত দেশ বলিয়া, ভারতবর্ষ হইতে গুণগতভাবে পৃথক ধরনের দেশ বলিয়া মনে করাই ভুল। প্রকৃতপক্ষে, অর্থনীতির দিক দিয়া রুশিয়া ছিল অনুন্নত। প্রত্যেক শিল্প-ইউনিটে শ্রমিকের সংখ্যা আমেরিকা অপেক্ষাও রুশিয়ায় বেশি ছিল, এই ঘটনার মাঝে মাঝে এই ভুল ব্যাখ্যা করা হয় যে, সমগ্রভাবে রুশিয়া অগ্রসর শিল্পোন্নত দেশ ছিল। স্ট্যালিন যখন তাঁহার 'লেনিনিজমে' এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তিনি শুধু এইটুকু দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, এই ঘন শ্রমিক সমাবেশের ফলে শ্রমিকদের দ্রুত সংগঠিত করিতে বলশেভিকদের সুবিধা হইয়াছিল। বলশেভিক পার্টির ইতিহাসে (২১২ পৃ.) রুশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সহজ জয়লাভের যে কয়টি কারণ স্ট্যালিন নির্দেশ করিয়াছেন তাহার প্রথমটি এই :

"রুশ বুর্জোয়াশ্রেণির মত দুর্বল, শিথিলভাবে সংগঠিত, রাজনীতি ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ এক শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইল অক্টোবর বিপ্লবকে। আর্থিক দিক দিয়া তখনো দুর্বল, সরকারী কনট্রাক্টগুলির উপর নির্ভরশীল রুশ বুর্জোয়াশ্রেণির বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার মত যথেষ্ট রাজনৈতিক আত্মনির্ভরতা ও কর্মোদ্যোগ ছিল না।"

মনে রাখিতে হইবে, শিল্প-বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ও বিপ্লবের পূর্বেকার রুশিয়ার মধ্যে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন উহা গুণগত নহে এবং রুশবিপ্লবের সমস্ত অভিজ্ঞতাই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত, রুশিয়াকে শিল্পোন্নত দেশ বলিলে ভুল বলা হইবে। রুশবিপ্লবের নেতাদের সাক্ষ্য বৈপরীত্যকেই প্রমাণ করে।

রুশবিপ্লব সম্পর্কে এই মূলগত ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা অন্ধ্রদেশের সমালোচকদের প্রস্তাবিত সংস্কারবাদী নীতি ও কর্মপন্থা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যে তত্ত্বগত ভিত্তির উপর এই সংস্কারবাদী কাঠামো দাঁড় করানো হইয়াছে ঐ ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা দিয়াই তাহা রচিত হইয়াছে।

এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হইতে কি করিয়া ক্রমে ক্রমে সুবিধাবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় নিচে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইল। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রস্তাবের কর্মনীতির বিভিন্ন ধারাগুলির বর্ণনা দিতে হইলে অনেকটা এই ভাবেই দিতে হয়; ধনী কৃষকদের সহিত সহযোগিতার, অর্থাৎ 'নিরপেক্ষিকরণের' অজুহাত বাহির করিতে গিয়া অন্ধ্রের কর্মীরা অজ্ঞাতসারেই এই ধরনের যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন :

(১) বিবেচ্য বিষয়ের তালিকার মধ্যে যখন শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লব থাকিবে, তখনই কেবল ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা রুশবিপ্লবের উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) বুর্জোয়াশ্রেণি যখন ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, তখন শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লব সংগঠিত হয়। তাঁহারা কেরেনস্কির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

(৩) কিন্তু ভারতবর্ষে বুর্জোয়াশ্রেণি ক্ষমতা লাভ করে নাই, কারণ ঔপনিবেশিক কাঠামো এখনো রহিয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা এই কাঠামোকে প্রকৃতপক্ষে সেই একই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব হিসাবেই দেখিতেছেন।

(৪) ভারতবর্ষের বিপ্লব আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থার বিপ্লব এবং বুর্জোয়া এখানে ক্ষমতার অংশীদার মাত্র। অতএব ইহা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, নূতন গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কিন্তু

শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লব নহে; অতএব ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে লড়াই চলিবে না। কেবলমাত্র বৃহৎ ব্যবসায়ীরা সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা করিতেছে বলিয়া শুধু ধনী কৃষক নহে, পেটি-বুর্জোয়াদের অন্যান্য অংশকেও নিরপেক্ষ করিয়া রাখা চলে।

(৫) ভারতীয় বিপ্লবের পরবর্তী স্তরকে নূতন গণতান্ত্রিক স্তর বলা হইয়াছে কিন্তু ইহার শ্রেণিরূপের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই যাহাতে শ্রমিক ও কৃষকের গণতান্ত্রিক শ্রেণিপ্রভুত্বের অভিজ্ঞতাকে বাতিল করা চলে। মাও সে-তুং হইতে একটি সুবিধা মাফিক উদ্ধৃতির সাহায্যে নূতন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, 'বহুশ্রেণীর শ্রেণিপ্রভুত্ব'— শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবী পেটি-বুর্জোয়াদের বিশেষ শ্রেণিপ্রভুত্ব নহে। ইহার অর্থ বুর্জোয়াশ্রেণির কিছু অংশও গভর্ণমেন্টে অংশগ্রহণ করিতে পারে।

এইভাবে আমরা আবার সেই পুরাতন কাসুন্দিতে ফিরিয়া আসিলাম। যোশী ও ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের পুরাতন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণি ও পার্টিকে জাতীয় নেতৃত্বকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়া তাহাদের বুর্জোয়াদের তল্পীবাহকে পরিণত করার অপরাধে অপরাধী ছিলেন। জাতীয় নেতৃত্বকে তাঁহারা জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া অবিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শ্রেণিচরিত্র বিচার করিয়া দেখেন নাই।

ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে অন্ধ্রের নেতারা ঐ একই ব্যাপার করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা ধনী কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের সহিত সহযোগিতার নির্দেশ দিয়াছেন নিরপেক্ষিকরণের নামে; অর্থাৎ বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সহিত অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বিভেদকে ভিত্তি করিয়া বিপ্লবের মৌলিক সাধারণ কৌশল প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন— নিরপেক্ষিকরণের নামে বুর্জোয়াশ্রেণির কোন কোন অংশের সহিত সহযোগিতা করিতে বলিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের উপর ভ্রান্ত প্রস্তাবের দ্বারস্থ হইয়াছেন— শুধুমাত্র বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী।

উপরোক্ত বিচার যে খুব বেশি কড়া হয় নাই, নিচের উদ্ধৃতি হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে। ইহাতে বুঝা যাইবে, অন্ধ্রের নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকটি ব্যাপারে এমন কি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের কংগ্রেস হইতে ভিন্ন মত পোষণ করে।

বিস্ময়কর মনে হইলেও ইহা সত্য যে, কমিনফর্ম ও কমরেড জ্দানভ নির্দিষ্ট নীতি ও পন্থা অনুযায়ী বিচার করিলে দেখা যায় দুনিয়া দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া গিয়েছে— অন্ধ্রের নেতারা তাহাও মানিতে রাজী নহেন। অপরপক্ষে, তাঁহারা বর্তমান দুনিয়া সম্পর্কে এক সংস্কারপন্থী বিশ্লেষণ দিয়াছেন। তাঁহারা বুর্জোয়াদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রাধান্য দিয়া তাহারই উপর গড়িয়া তুলিয়াছেন শ্রেণিসহযোগিতার কর্মনীতি। নিচের উদ্ধৃতিটি পড়ুন :

"আজিকার যে পরিস্থিতি আমাদের বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত করিয়াছে, অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বাহ্নের আন্তর্জাতিক পটভূমি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেনিন বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন : 'একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ হইতেছে স্থায়ী সংকটে পতিত পুঁজিবাদ। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের মুমূর্ষু রূপ।' বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই বৈশিষ্ট্য রুশবিপ্লবের পটভূমি রচনা করে। কিন্তু বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ 'সমাপ্তির সূচনা' অবস্থা হইতে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যাহাকে 'মৃত্যুশয্যায় সাম্রাজ্যবাদ' বলা চলে। বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদ যে সংকটে

পড়িয়াছিল, বর্তমান সংকট সেই তুলনায় অনেক গভীর। আজ ইহাকে বাঁচিতে হইলে আধা-ফ্যাশিজম বা ফ্যাশিজমের রূপ লইয়া বাঁচিতে হইবে, নতুবা বিশ্ববিপ্লবের বন্যাস্রোতে ইহার বিলুপ্তি অনিবার্য। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ আজ এমন দুর্বল হইয়া পড়িয়োছে যে ইহার অভ্যন্তরীণ যুদ্ধমান শিবিরগুলির কোন অস্তিত্ব আর নাই; আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরাট দানব একাই বিশ্বসাম্রাজ্যবাদকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে একভাবে বা অন্যভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়াছে। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বর্তমান সংকট ভালোভাবে ফুটিযা উঠিয়াছে ট্রুম্যানের মার্কিন প্রসারনীতিতে। অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি হইয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কেবল যে উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশগুলিকে কুক্ষিগত করিতে সচেষ্ট তাহা নহে, এক পা এক পা করিয়া স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিকেও সে উপনিবেশে পরিণত করিতে চলিয়াছে। স্বজাতির দুর্বল অংশগুলিকে গ্রাস করিবার এই পরগাছা প্রবৃত্তির প্রভাব বর্তমান বিশ্ব ঘটনাস্রোতের উপর প্রচণ্ডভাবে পড়িতেছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদ আজ এমন নগ্নরূপ ধারণ করিয়াছে যে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রই আজ আর তাহার একমাত্র শত্রু নহে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রও তাহার শত্রুতে পরিণত হইয়াছে। আজ শ্রমজীবী জনগণকে গ্রাস করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য নহে, নিজস্ব শ্রেণির স্বল্পবিত্ত অংশকেও, অর্থাৎ, ছোট বুর্জোয়াকেও সে গ্রাস করিতে চাহিতেছে। তাই, বর্তমানকালের আন্তর্জাতিক পটভূমিতে সাম্রাজ্যবাদকে আমরা দেখিতেছি তাহার অন্তিম দশায়,— গভীর, ব্যাপক ও অশ্রুতপূর্ব এক সংকটের আবর্তে।''

এই উদ্ধৃতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গিই, অন্ধ্র নেতাদের সংস্কারবাদী মনোভাবের মর্ম উদঘাটন করিয়া দেয়। বিশ্ব সংকট, সাম্রাজ্যবাদী সংকট প্রভৃতি বড় বড় বুলি বার বার উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা শেষ পর্যন্ত কোন্ মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন? এ সিদ্ধান্ত নয় যে, সাম্রাজ্যবাদ ও জনসাধারণ, বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণি—এই দুই শিবিরে দুনিয়া বিভক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রথম সিদ্ধান্ত হইল যে, বুর্জোয়াদের কোনও কোনও অংশ সাম্রাজ্যবাদ গ্রাস করিতেছে এবং এই ঘটনা বিশ্ব পরিস্থিতিকে প্রচণ্ড ভাবে প্রভাবিত করিতেছে। সত্য কথা বলিতে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছাঁকিয়া অন্ধ্রের মার্ক্সবাদীরা শুধুমাত্র এই সত্যটুকুই আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের বলেই পরে তাঁহারা বুর্জোয়াদের কোন কোন অংশের প্রতি, বিশেষত ধনী কৃষকদের প্রতি, সদয় ব্যবহার করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

ইহার অর্থ, দুনিয়ার সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে বিপন্ন বুর্জোয়াশ্রেণির 'নিপীড়িত' অংশের সহিত হাত মিলাইবে। ইহা শ্রেণিসহযোগিতার নির্লজ্জ নীতি।

ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাব কিংবা কমিনফর্মের নির্দেশ— কাহারও সহিত এই নীতির কোথাও মিল নাই। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবে রহিয়াছে এই :

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার জার্মানী এবং ফ্যাশিস্ট জাপানের পরাজয়ের ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হইয়াছে— ইতিহাসের মানদণ্ড শ্রমিকশ্রেণি ও তাহার বিপ্লবী আন্দোলনের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। জার্মানী ও জাপানের মত শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার ফলে অবশ্য মনে হইতে পারে অপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি জোরদার

হইয়াছে। কিন্তু সমগ্রভাবে এই পরাজয়ের ফলে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা শক্তিশালী তো হয়ই নাই, বরং প্রচুর পরিমাণে দুর্বল হইয়াছে; দেখা যাইবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শক্তিবৃদ্ধি হয় নাই, বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে তাহা দুর্বল হইয়াছে; পুঁজিবাদী দুনিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হয় নাই, শক্তিশালী হইয়াছে সমাজতন্ত্রী দুনিয়া, শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর জনতার, শক্তিশালী হইয়াছে জাতীয় মুক্তির জন্য জনসাধারণের আন্দোলন।

"বিপ্লবী শক্তিসমূহের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধির মধ্যেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

"যুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভীষণ দুর্বল হইয়া পড়িবে, সেখানে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে— সাম্রাজ্যবাদীদের এই আশা তো পূর্ণ হয়ই নাই বরং তাহাদের আশার বিপরীতই সত্যে পরিণত হইয়াছে।

"জনবল ও সম্পদের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ জনতার শ্রদ্ধার বস্তু, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণি ও জনতা এই সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরিয়াই মিলিত হইতেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্রবল আজ দুনিয়ার জনসাধারণের মনে ভরসা আনিয়া দিয়াছে, ধূলিবিলীন করিয়া দিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রবলের অজেয়তার কাল্পনিক গল্পকাহিনী।

"শুধু সামরিক দিক হইতে নহে, অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক এবং শিল্প ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুঁজিবাদী দেশের জনসাধারণ আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পিত, সংগঠিত জীবনযাত্রার সহিত ধনতান্ত্রিক সমাজের বিশৃঙ্খলাকে তুলনা করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

"দ্বিতীয়ত, পূর্ব ইওরোপে নয়া গণতন্ত্রের অভ্যুদয় বিশ্বধনতন্ত্রের উপর আর একটি চরম আঘাত। এইসব রাষ্ট্রে জনসাধারণই ক্ষমতার অধিকারী। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান, যানবাহন এবং ব্যাংক ইত্যাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এইসব রাষ্ট্রের অগ্রদূতের ভূমিকায় আছে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষের ব্লক। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান এক জনসংখ্যা ও এক বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডকে পুঁজিবাদের চক্র হইতে ছিনাইয়া আনিয়া সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

"সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার কবল হইতে মুক্ত করিয়া এইখানে জনতার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ফলে, শোষকশ্রেণির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছে। শ্রমিক, কৃষক ও নির্যাতিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিসমূহের সহযোগিতায় এইসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জনগণের সার্বভৌম রাষ্ট্র— শক্তিশালী হইয়াছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া। এইভাবে ১৯১৭ সালে রুশবিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় যে ফাটল সৃষ্টি করিয়াছিল পূর্ব ইওরোপের গণতন্ত্রসমূহ তাহার পরিধি আরও বৃদ্ধি করিয়াছে।

"ইওরোপ মহাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন যে শক্তিশালী হইয়াছে এবং পুঁজিবাদ দুর্বল হইয়াছে তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে শ্রমিকশ্রেণির অগ্রদূত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অভূতপূর্ব শক্তিবৃদ্ধির মধ্যে, এই পার্টিকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র শ্রমিকশ্রেণির ক্রমবর্ধমান ঐক্যের মধ্যে। পূর্ব ইওরোপের কথা বাদ দিলেও, ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে ফ্রান্স ও ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টি যে মহান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অতি যুক্তিসঙ্গত পরিণাম

হিসাবেই এই দুইটি দেশের পার্টি অমিত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।''

''এই শক্তির পরিচয় শুধু পার্টির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধিতে নয়; তাহার পরিচয় পার্টির পরিচালনায় যে সব গণসংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধিতে, পার্টির নির্বাচনী সাফল্যে। অনেকক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি দল হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

''এইসব দেশে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধির মধ্যে প্রতিভাত হইয়াছে শ্রমিকশ্রেণির শক্তি, পরিস্ফুট হইয়াছে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্থায়িত্ব। বিপ্লবী পরিস্থিতি যে কতখানি পরিপক্ক হইয়াছে তাহারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের পূর্বেকার পুঁজিবাদী ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পূর্বে দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে এবং সংকটের বোঝা সাফল্যের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে পারার পূর্বে শাসকশ্রেণীকেও শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নামিতে হইবে। আর এই যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির শক্তি আজ বিপুল এবং বিরাট। শ্রমিকশ্রেণি আজ নূতন আক্রমণ পরাজিত করিতে সক্ষম এবং বর্তমান সময়ের বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন করিতে তাহারা সমর্থ।

''ধনিকশ্রেণির ইওরোপ আজ ধ্বংসের কিনারায়— ব্রিটেনে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ এবং পুঁজিবাদী শাসনের মাঝে আজ লেবার গভর্ণমেন্ট দাঁড়াইয়া আছে; আমেরিকা দিনের পর দিন সংকটের পঙ্কে ডুবিয়া যাইতেছে। আর তাই সে ক্ষুধিতের মত সারা দুনিয়ায় বাজার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, নিজের দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর আক্রমণ করিতেছে এবং অন্য জাতির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেছে। আমেরিকার এই সংকট ধনিক স্বৈরাচারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নূতন সংঘর্ষের সূচনা করিতেছে।''

''চীনের জনসাধারণের মুক্তির জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রাম দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় আর একটি শক্তিশালী আঘাত হানিয়াছে। ইহার ফলে এশিয়ার রাজনৈতিক দৃশ্যপটের আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে; সাম্রাজ্যবাদী ও তাহাদের তাঁবেদারদের উপনিবেশ হইতে উচ্ছেদের পথ তৈয়ারী হইতেছে। চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদলের ক্রমবর্ধমান উচ্ছেদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নীতিব বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া এই সত্যই অভ্রান্তভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং লক্ষ্য সর্বত্রই জনসাধারণের স্বাধীনতা সংগ্রামের মারফত প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতেছে।...

''ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের শেষে এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণি-শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন হইয়াছে। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের সময়ে বুর্জোয়াদের একাংশ তাহাদের সংস্কারপন্থী পদলেহী সমেত জনতার শিবিরে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে বিপ্লবের স্রোত প্রতিহত করিবার জন্য দুনিয়ার সমস্ত বুর্জোয়া তাহাদের সংস্কারপন্থী পদলেহী এবং প্রতিক্রিয়াশীল সমর্থকদের লইয়া শ্রমিকশ্রেণি, সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ, পূর্ব ইওরোপের গণতন্ত্রসমূহ এবং উপনিবেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে একজোট বাঁধিয়াছে। এইভাবে পুরাতন শ্রেণি-সমাবেশের বদলে এক নূতন শ্রেণি-সমাবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে।''

''অর্থনৈতিক সংকটের আঘাত এবং আসন্ন বিপ্লবের আশংকা— এই মূল কারণেই এই নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই কারণেই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গণতান্ত্রিক জাতিসমূহের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিসংঘে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে একটি ব্লক হিসাবে ব্যবহার করিতেছে।''

জনসাধারণ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে, শ্রমিক ও বুর্জোয়াদের মধ্যে যে বৈপ্লবিক অসামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহাতে আস্থা স্থাপন না করিয়া অন্ধ্র নেতৃবৃন্দ বুর্জোয়াদের অন্তর্দলীয় বিভেদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক অবস্থার এই ধারণা বুর্জোয়াদের লেজুড় হিসাবে শ্রমিকশ্রেণিকে জুড়িয়া দিবারই নামান্তর। এই ব্যাখ্যা হইতে আরও একটি কথা স্পষ্ট হইয়া ওঠে যে, অন্ধ্রের নেতারা নিরপেক্ষিকরণের কথা বলিয়া আসলে সহযোগিতা ও আত্মসমর্পণের স্বপক্ষে বলিতেছেন, ও তাহা না হইলে "ক্ষুদ্রতর পুঁজিবাদীদের বিলুপ্তি" তাঁহাদের নিকট এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত না। যাহার ফলে সাম্রাজ্যবাদ এবং জনসাধারণের, বুর্জোয়া এবং শ্রমিকশ্রেণির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নূতন গণতন্ত্রগুলির, শ্রমিক আন্দোলনের এবং দুনিয়ার শক্তিসাম্য পরিবর্তনের তাৎপর্য সম্পর্কেও তাঁহারা ঐ একই সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শিবির যে শক্তিসঞ্চয় করিয়াছে তাহাকে তাঁহারা শুধু ছোট করিয়াই দেখেন নাই, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষা করিয়া এমন ভাবে তাঁহাদের বক্তব্য বলিয়া গিয়াছেন যেন মনে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয় নাই, দুনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বাড়িয়া ওঠে নাই, চীনের মুক্তি সংগ্রাম প্রচণ্ড আঘাত হানে নাই, উপনিবেশে বিপ্লবী সংগ্রাম চলে নাই। ইহা অমার্জনীয় অপরাধ। নূতন গণতন্ত্রের নামে গণশক্তিকে ইহা ছোট করিয়া দেখিতে শিখায় এবং শ্রেণি-সহযোগিতার অজুহাত তৈয়ারি করে। নীচের উদ্ধৃতিটি পড়ুন :

"আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় দিক হইতেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব। ইহাই আমাদের বর্তমান বিপ্লবের পটভূমিকা। অক্টোবর বিপ্লব ও তাহার ত্রিশ বৎসরের কীর্তি ও সাফল্য বিশ্ব ঘটনাধারাকে পরিবর্তিত এবং জনসাধারণের ব্যাপক অংশকে প্রভাবিত করিয়াছে। পূর্বে মার্কস্ ও এঙ্গেল্সের মতবাদকে বহু বুদ্ধিজীবী অবাস্তব কল্পনাবিলাস বলিয়া ভাবিতেন। অক্টোবর বিপ্লব তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছে; মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মতকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। শুধু তাই নয়, দুনিয়ার এক ষষ্ঠাংশে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সর্বক্ষেত্রেই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে গণতন্ত্র ও সর্বব্যাপক প্রগতির সত্যকার ধারক ও বাহক হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অক্টোবর বিপ্লবের প্রসার ও সংহতি কৃষক, শহরের পেটি বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহারাই পূর্বে বুর্জোয়াশ্রেণির মজুতশক্তি হিসাবে পরিগণিত হইত। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া আজ দুনিয়ার শ্রমজীবী জনসাধারণের আশার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত প্রগতিশীল মানুষ— যাহারা শান্তি চায়, যাহারা জাতীয় মুক্তি ও প্রগতির জন্য লড়াই করিতেছে তাহাদের সকলেরই আশার স্থল এই সমাজতান্ত্রিক জগৎ। সমস্ত সত্যকার বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও শিক্ষাবিদেরা প্রকৃত প্রগতির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে তাকাইয়া আছে। সমস্ত দুনিয়ার কৃষকশ্রেণি যাহারা একদিন ফিউডাল জমিদারদের নিকট হইতে বুর্জোয়াদের সাহায্যে জমি পাইয়াছিল তাহারাও ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণিই তাহাদের জমি দিতে পারে, বুর্জোয়ারা পারে না; কারণ তাহাদের ভূমিকা শেষ হইয়াছে এবং তাহারা সামন্ততন্ত্রের সহিত হাত মিলাইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক জগতের অস্তিত্বই আমাদের বিপ্লবের সত্যকার পটভূমি এবং

এই বিপ্লবের বিভিন্ন দিক নির্ধারণে তাহার দান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।"

শেষ বাক্যটির মধ্যেই সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; জনগণের শিবিরের শক্তিকে তাঁহারা যে কতখানি ছোট করিয়া দেখিতেছেন ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্যের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে নাই; পুঁজিবাদের ধ্বংসের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামগুলি অগ্রসর হইতেছে না; জনগণের শক্তি, সমাজতন্ত্রের শক্তি যখন পুঁজিবাদের শক্তি অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি তখন নূতন বিপ্লবের লড়াই চলিতেছে না। শুধু "সমাজতান্ত্রিক জগতের অস্তিত্বই আমাদের বিপ্লবের সত্যকার পটভূমি এবং এই বিপ্লবের বিভিন্ন দিক নির্ধারণে তাহার দান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।"— ঘটিয়াছে শুধু এইটুকু, পটভূমি শুধু এইটুকুই এবং সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিবার পক্ষে এইটুকুর বেশি প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব ও জ্দানভের উক্তির সহিত এই বক্তব্যের তুলনা করা যাক :

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার জার্মানী ফ্যাশিস্ট জাপানের পরাজয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হইয়াছে— ইতিহাসের মানদণ্ড শ্রমিকশ্রেণি ও তাহার বিপ্লবী আন্দোলনের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ...জনবল ও সম্পদের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ...পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণি ও জনতা এই সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরিয়াই মিলিত হইতেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্রবল আজ দুনিয়ার জনসাধারণের মনে ভরসা আনিয়া দিয়াছে, ধূলিবিলীন করিয়া দিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রবলের অজেয়তার কাল্পনিক গল্পকাহিনী। ...দ্বিতীয়ত, পূর্ব ইওরোপে নয়া গণতন্ত্রের অভ্যুদয় বিশ্বধনতন্ত্রের উপর আর একটি চরম আঘাত। এইসব রাষ্ট্রে জনসাধারণই ক্ষমতার অধিকারী। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান, যানবাহন এবং ব্যাংক ইত্যাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এইসব রাষ্ট্রে অগ্রদূতের ভূমিকায় আছে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমজীবী মানুষের ব্লক। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান এক জনসংখ্যা ও এক বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডকে পুঁজিবাদের চক্র হইতে ছিনাইয়া আনিয়া সমাজতন্ত্রের পথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ...রুশ বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় যে ফাটল সৃষ্টি করিয়াছিল পূর্ব ইওরোপের গণতন্ত্রসমূহ তাহার পরিধি আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। ইওরোপ মহাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন যে শক্তিশালী হইয়াছে এবং পুঁজিবাদ দুর্বল হইয়াছে তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে শ্রমিকশ্রেণির অগ্রদূত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অভূতপূর্ব শক্তিবৃদ্ধির মধ্যে, এই পার্টিকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র শ্রমিকশ্রেণির ক্রমবর্ধমান ঐক্যের মধ্যে।...

"চীনের জনসাধারণের মুক্তির জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রাম দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় আর একটি শক্তিশালী আঘাত হানিয়াছে। ইহার ফলে এশিয়ার রাজনৈতিক দৃশ্যপটের আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ও তাহাদের তাঁবেদারদের উপনিবেশ হইতে উচ্ছেদের পথ তৈয়ারি হইতেছে।...

"ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের শেষে এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণিশক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন হইয়াছে। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের সময়ে বুর্জোয়াদের একাংশ তাহাদের সংস্কারপন্থী পদলেহী সমেত জনতার শিবিরে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে বিপ্লবের স্রোত প্রতিহত করিবার জন্য দুনিয়ার সমস্ত বুর্জোয়া তাহাদের সংস্কারপন্থী পদলেহী এবং প্রতিক্রিয়াশীল

সমর্থকদের লইয়া শ্রমিকশ্রেণি, সমাজতন্ত্রী, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ, পূর্ব ইওরোপের গণতন্ত্রসমূহ এবং উপনিবেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে একজোট বাঁধিয়াছে।...

"মার্কিন দানবের প্রসার... হইল নূতন পরিস্থিতির একটি মূল সূত্র। ...পুরোনো ব্যবস্থা জীয়াইয়া রাখিবার তাগিদই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সমগ্র মানবতার প্রকাশ্য শত্রু হিসাবে দাঁড়াইতে বাধ্য করিয়াছে।... ইহার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও নূতনভাবে ফাটিয়া পড়িতেছে। ... কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী দাবির এই ধরনের নিষ্পত্তির ফলে বৃটিশ জনতার অবস্থাই দিনের পর দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, ব্রিটেনের অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাহত হইতেছে। ...এইভাবে জনসাধারণের অভিজ্ঞতার ফলে সেভিয়েট ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইঙ্গ মার্কিন সহযোগিতার ভিত্তি দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে।" (রাজনৈতিক প্রস্তাব, ১ম পরিচ্ছেদ।)

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সহিত অন্ধ্র নেতৃবৃন্দের এইখানেই মূলগত পার্থক্য। বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যেকার যে মূল বিরোধগুলি তীব্র হইয়া উঠিতেছে তাহাদের উপরেই রাজনৈতিক প্রস্তাবের ভিত্তি, সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রচণ্ড শক্তিবৃদ্ধিকেও রাজনৈতিক প্রস্তাব তাহার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বর্ধিত বিরোধকে রাজনৈতিক প্রস্তাব স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে, নূতন পরিস্থিতির মৌলিক উপাদান হইতেছে দুই শিবির— এক শিবিরে বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্য শিবিরে সমাজতন্ত্র, শ্রমিকশ্রেণি, গণতন্ত্র ও জনসাধারণ। অন্ধ্র নেতারা দুই শিবিরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন বলিয়াই, বুর্জোয়াদের ভিতরকার বর্ধিত বিরোধকেই ভিত্তি করিয়াছে এবং যখন বুর্জোয়াদের সমস্ত দলগুলি শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের দুনিয়াব্যাপী ফ্রন্ট গঠনে একত্রিত হইয়াছে তখন বুর্জোয়াশ্রেণির এক অংশের সহিত সহযোগিতার কথা বলিতেছেন। ২৫ বছর পূর্বে রুশ বিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে স্ট্যালিন যে বিশ্লেষণ দিয়াছিলেন সোভিয়েতের কথা বলিতে গিয়া অন্ধ্র প্রাস্তাব তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার বেশি অগ্রসর হন নাই। তাহার পর দুনিয়ার শক্তিসাম্যের যে প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই।

বলা বাহুল্য অন্ধ্র প্রস্তাবে যে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব ও নয়টি কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে জ্দানভের বিবৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ভারতবর্ষ সম্পর্কে অন্ধ্র নেতারা যে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিবেন তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে?

"মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের ফলে এবং তাহার পরে তথাকথিত জাতীয় সরকার সৃষ্টির ফলে বর্তমান ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের এতটুকুও ধ্বংস হয় নাই; শুধু বুর্জোয়াশ্রেণির প্রভাবশালী দল রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশ লাভ করিয়াছে! এই আপসের ফলে সমগ্র পুঁজিবাদীশ্রেণি লাভবান হয় নাই, হইয়াছে শুধু এমন কতকগুলি বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যাহারা ব্রিটিশ পুঁজিবাদীদের সহিত কারবারের অংশীদার হইয়াছে।"

এই ভাবে আমরা আবার মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ সম্বন্ধে ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের পুরোনো প্রস্তাবে ফিরিয়া আসিলাম। সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত আপস ও সহযোগিতা করিতেছে শুধু বৃহৎ

ব্যবসায়ীশ্রেণি। মাঝারী বুর্জোয়ার এই আপসে লাভবান হয় নাই বলা হইতেছে বলিয়া তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে, অন্তত পক্ষে তাহাদের "নিরপেক্ষ করিয়া রাখিতে হইবে"। বর্তমান অবস্থায় ইহার অর্থ তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করা। প্রকৃতপক্ষে অন্ধ্র নেতারা মাঝারী বুর্জোয়াদের সহিত সহযোগিতার কথা বলিতেছেন। মাও সে-তুং এর যে উদ্ধৃতিটি তাঁহারা কাজে লাগাইয়াছেন তাহা হইতে ইহা পরিষ্কার বোঝা যায়। এই উদ্ধৃতিটিতে নূতন গণতন্ত্রকে কয়েকটি শ্রেণির সংযুক্ত প্রভুত্ব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে— ইহার অর্থ ইহার মধ্যে বুর্জোয়ারাও থাকিবে।

টাটা ও বিড়লা ছাড়া বুর্জোয়াশ্রেণির অন্যান্য অংশগুলির সহিত সহযোগিতার জন্য ইহা আর একবার নির্লজ্জ ওকালতি। কিন্তু এই দলগুলি মূলত টাটা-বিড়লার নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে। রাজনৈতিক প্রস্তাবে কোথাও এই ধরনের নির্দেশ নাই। কিন্তু অন্ধ্র নেতারা এই নির্দেশ দিয়াছেন বুঝিয়াই তাঁহারা এমন একটি পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা রাজনৈতিক প্রস্তাব বর্জন ছাড়া আর কিছুই নহে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাধারা সম্পর্কে সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হইতে এই নীতি ও কর্মপন্থার জন্ম হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, "কোনও পরিবর্তনই ঘটে নাই"; পুরাতন কাঠামো এখনও রহিয়াছে ইত্যাদি আপাতবিপ্লবী কথাগুলির আসল মানে এখানে ধরা পড়িতেছে। কারণ এই সমস্ত কথাই বুর্জোয়াদের এক বা অপর দলের সহিত সহযোগিতার পথ প্রস্তুত করিয়াছে; কারণ যদি কোন পরিবর্তনই না ঘটিয়া থাকে, নূতন রাষ্ট্রকে রক্ষা করা ও তাহার সহযোগিতা করা যদি বুর্জোয়াশ্রেণির কেবল মাত্র একটি দলেরই স্বার্থের অনুকূল হয়, যদি অন্যান্য দলগুলি নূতন গভর্ণমেন্ট ও রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য কোনও স্বার্থের তাগিদ বোধ না করে তবে এই সিদ্ধান্তে না আসিয়া উপায় থাকে না যে, বুর্জোয়াশ্রেণির এক অংশের বিরোধী ভূমিকা রহিয়াছে এবং আগেকার মত তাহারা এখনও জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাইতে পারে। অন্ধ্র নেতারা বলিতে চাহেন যে, বুর্জোয়াদের কোন কোন দলের বিরোধী ভূমিকা রহিয়াছে। নতুবা মাঝারী বুর্জোয়াদের সহিত বড় বুর্জোয়াদের তথাকথিত বিরোধকে এতখানি প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ হয় না।

ইহা কি সত্য কোনও পরিবর্তনই ঘটে নাই? না, সত্য নহে। সত্য বলিলে ১৯৪৬-৪৭ সালে যে বিরাট বিপ্লবী জাগরণ ভারতবর্ষকে নাড়া দিয়াছিল, তাহাকে ছোট করিয়া দেখা হয়। রাজনৈতিক প্রস্তাবে ঠিকই বলা হইয়াছে যে, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ একটি চতুর আক্রমণ, ইহা অগ্রগতি নহে পশ্চাদগতি; প্রভুত্বের রূপের পরিবর্তন হইয়াছে। বিপ্লবী আন্দোলনের এবং জনসাধারণের দাবি সম্পর্কে এই বিশ্লেষণ নির্ভুল।

ঐ একই সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণির লাভ সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে— সাম্রাজ্যবাদ বুর্জোয়াশ্রেণিকে বেশ মোটা কিছু দিয়াছে এবং নিজের সংকীর্ণ শ্রেণি-স্বার্থে ভারতীয় জনসাধারণকে শাসন করিবার জন্য শাসন ক্ষমতা তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণি যে রাষ্ট্র লাভ করিয়াছে তাহা সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল, ইত্যাদি। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ নূতন সহযোগিতা সৃষ্টি করিয়া পুরাতন ব্যবস্থা রক্ষার জন্য বুর্জোয়া-শ্রেণির উপর নির্ভর করিতেছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর যে সামাজিক ভিত্তি রহিয়াছে তাহার দ্বারাই

রাষ্ট্র পরিচালিত হইতে পারে। বড় রকমের কিছু দেওয়া হইয়াছে। ঐ সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণির দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা, দুনিয়াব্যাপী কমিউনিজম্ ও সোভিয়েত উইনিয়নের সম্পর্কে ভয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ লইয়া সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রে তাহাদের বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। নিজেদের দেশের জনসাধারণকে শোষণ করিবার অবাধ স্বাধীনতা বুর্জোয়াশ্রেণি লাভ করিয়াছে বটে; কিন্তু ঐ সঙ্গে দুনিয়াব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের উপর তাহাদের অর্থনৈতিক বিকাশ নির্ভর করিতেছে।

মনে রাখিতে হইবে বুর্জোয়াশ্রেণি তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে, রাষ্ট্রের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ করিয়াছে, লাভ করিয়াছে শোষণের অবাধ অধিকার। এই জন্যই তাহারা রাষ্ট্র রক্ষায় এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে হয় যে, কেবল মাত্র বৃহৎ ব্যবসায়ীর দল নহে সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণি সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী নূতন রাষ্ট্র রক্ষায় উৎসাহী। কেন? কারণ তাহারা সকলেই বুঝিতেছে যে, জনসাধারণকে শোষণ করিবার অবাধ সুযোগ তাহাদের আসিয়াছে এবং জনসাধারণের সহিত তাহাদের যে বিরোধ, তাহার সমাধান রাষ্ট্র নিজের স্বার্থেই করিবে।

দ্বিতীয়ত, তাঁবেদার হিসাবে তাহাদের অর্থনৈতিক বিকাশের পথে যে সমস্ত বাধা রহিয়াছে, তাহারা মনে করে সেগুলি চাপ দিয়াই দূর করা যাইবে এবং নূতন রাষ্ট্র তাহাদের হাতে আছে বলিয়া এ চাপ দেওয়ার শক্তিও তাহাদের রহিয়াছে।

তৃতীয়ত, তাহারা প্রতিযোগিতা ও বিরোধের কথাই ভাবিতেছে না— বিশ্ব-কমিউনিজম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সহযোগিতার কথাটাই বেশি করিয়া ভাবিতেছে।

চতুর্থত, তাহারা জানে যে, জনসাধারণের এতখানি বিরোধী অথচ সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এমন রাষ্ট্র পাওয়া যাইবে না।

অন্ধ্র নেতারা সব সময় মূল শ্রেণি-বিরোধের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন এবং বুর্জোয়াদের মধ্যেকার বর্ধিত বিরোধকেই ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। বুর্জোয়াশ্রেণির কোন কোন অংশ যদি বর্তমান রাষ্ট্র হইতে যথেষ্ট অথবা কিছুটা সুবিধা নাও পায় তবে তাহারা কি একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের রাষ্ট্রের কথা ভাবিতে পারে? সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বর্তমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সত্যই কি তাহারা কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব দেখাইতে পারে? সে সাহস তাহারা করিতে পারে না। কারণ এই রাষ্ট্রের স্থানে অন্য রাষ্ট্রের অর্থই জনসাধারণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র— অন্য কোন ধরনের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নহে। এই জন্যই এমন কি যাহারা অসন্তুষ্ট তাহারাও নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতা ও নিয়মতান্ত্রিক উপায় গভর্ণমেন্ট দখলের চেষ্টার অতিরিক্ত কিছুই করিতে চাহিবে না; অথচ জনগণের বিরুদ্ধে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রকে সব সময় সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

শোষিত জনসাধারণ ও পুঁজিবাদীর মধ্যেকার বিরোধের প্রাধান্য, বিশ্ব কমিউনিজমের অভিযান ও তাহার সম্মুখে বিশ্বধনতন্ত্রের আন্তর্জাতিক ফ্রন্টগঠন-- অন্ধ্র নেতৃবৃন্দ এ সব কিছুই ভুলিয়া পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের উপরেই সাধারণ কর্মকৌশলের ভিত্তি রচনার আশা করিয়াছেন, অথচ বিভেদ সত্ত্বেও সমস্ত দলই তাহাদের শত্রু শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে একজোট হইয়াছে। বুর্জোয়াদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যতটুকু বিভেদ থাকে শ্রমিকশ্রেণি নিঃসন্দেহে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু কোন দলের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; সব দলকেই বে-

ইজ্জত ও বে-আব্রু করিয়া দিতে হইবে। বর্তমান সময়ে এই বিভেদের উপর কর্মকৌশলের ভিত্তি করা চলিবে না এবং অন্ধ্র নেতাদের মত বুর্জোয়াশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির আসল মূল বিরোধকে ভুলিয়া যাওয়া চলিবে না। অন্ধ্র প্রস্তাব শুধুমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণির কয়েকটি দলের উপরেই অর্থনৈতিক সংকট, সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা প্রভৃতির ফল দেখিয়াছে এবং জনসাধারণকে ভুলিয়া গিয়াছে; তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এই সংকট ও সহযোগিতাই জনগণ ও বুর্জোয়াশ্রেণির বিরোধকে শতগুণ তীব্র করিয়া দুই-এর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামই বাধাইয়া তোলে। এই ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ বুর্জোয়াশ্রেণির এক বা অপর অংশের সহিত কোন না কোন ভাবে সহযোগিতার কথা বলা এবং এই সহযোগিতা ও এই ব্যাপক ফ্রন্টের নামে শ্রমিকশ্রেণিকে বুর্জোয়াশ্রেণির পিছনে জুড়িয়া দেওয়া।

এই বিশ্লেষণের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি ইহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এবং প্রকৃতপক্ষে অন্ধ্র প্রস্তাবে সোজাসুজি এই রণনীতিরই ঘোষণা করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে লড়াই বন্ধ করা এবং তাহাদের সহিত মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করা (কোন কোন অবস্থায় এই শ্রেণির কথা খোলাখুলিই বলা হইয়াছে)। যে শত্রুকে সোজাসুজি লড়াইয়ে খতম করিতে হইবে, এই প্রস্তাবে সেই শত্রুকে সাধারণ ভাবে নিরপেক্ষ করিয়া রাখার কথাই বলে এবং এই নিরপেক্ষিকরণই শত্রুর সহিত শ্রেণি-সহযোগিতার মূল মন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। নীচের উদ্ধৃতিটি পড়িয়া দেখুন :

"যেহেতু বিপ্লবের বর্তমান স্তর নূতন গণতান্ত্রিক স্তর, সমাজতান্ত্রিক স্তর নহে, সেহেতু কৃষক বিপ্লবের দৃঢ়সহযোগী এবং বিপ্লবে সে অংশগ্রহণ করে। ধনী কৃষকের কোন সামন্ততান্ত্রিক লেজুড় নাই বলিয়া শ্রেণি হিসাবে তাহাকে 'নিরপেক্ষ' করিয়া রাখা চলে এবং তেলেঙ্গানা ও রয়ালাসীমার মত স্থানে, যেখানে সামন্ততন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী, সেখানে ধনী-কৃষকের কোন কোন অংশকে পর্যন্ত লড়াইয়ের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে (যদিও তাহারা দোদুল্যচিত্ত)।"

অন্ধ্র নেতৃবর্গের বিশ্বাস : "ধান সংগ্রহ ব্যাপারে ধনী কৃষককে নিরপেক্ষ করিয়া রাখা সম্ভব, কারণ গভর্ণমেন্টের পরিকল্পনা ধনী কৃষকের স্বার্থকেও আঘাত করে। যদিও শ্রেণি হিসাবে ধনী কৃষক এই লড়াইয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতেছে না বটে, কিন্তু খুশী মনে ইহারা ধান ছাড়িয়া দিতেছে না। আমরা যখন সমাবেশ করিতে পারি তখন তাহাবা সাধারণ কৃষকদের সহিতই আসিয়া থাকে।"

ক্ষেতমজুরদের দাবি সম্পর্কে অন্ধ্র নেতৃবর্গের মত এই যে "গ্রামে কৃষক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাধান্য বলিয়া সেখানে পুঁজিবাদী ও শিল্পমজুরের সম্পর্ককে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা ভুল হইবে। ইহাতে নূতন গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বিচ্ছিন্ন হইবে, অথচ ক্ষেতমজুরদের দাবি মিটিবে না, কারণ এই যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে গরীব ও মাঝারী কৃষক ধনী কৃষকের দলে গিয়া পড়িবে। অতএব ক্ষেতমজুরের দাবিকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হইল যাহাতে নূতন গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বিচ্ছিন্ন হইবে না অথচ গরীব ও মাঝারী কৃষক ক্ষেতমজুরদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে।"

আবার : "যাহারা সামন্ততন্ত্রের লেজুড় ছিঁড়িয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছে এবং যাহারা হয় নাই তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য না করিয়া ধনী কৃষকদের একটি দল হিসাবে দেখিয়া সমস্ত ধনী কৃষককে বিপ্লব বিরোধী বলা হইয়াছে; বর্তমান গণতান্ত্রিক বিপ্লবে তাহাদের একটি অংশকে যে নিরপেক্ষ করিয়া রাখা চলে তাহাও স্বীকার করা হয় নাই। অন্তত তেলেঙ্গানার মত

সামন্ততান্ত্রিক অঞ্চলগুলিতে মুক্তিসংগ্রামের বর্তমান স্তরে ধনী কৃষককে যে সঙ্গে লওয়া চলিতে পারে তাহাও স্বীকার করা হয় নাই। আজ এই ফ্রন্টের বাস্তব অবস্থাই এই ধরনের নীতি নির্ধারণের বিরুদ্ধে জাজ্জল্যমান সাক্ষ্য। ধনী কৃষকদের একাংশ মুক্তি সংগ্রামে আমাদের সঙ্গে সত্যই আসিতেছে।''

প্রস্তাবের ইহাই হইল সত্যকার বাস্তব রূপ— পল্লী অঞ্চলে শ্রেণি সহযোগিতা ও ধনী কৃষকদের পায়ে আত্মসমর্পণের কর্মসূচী। এ প্রসঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, ধনী কৃষকের প্রশ্নে যদি অন্ধ্র নেতারা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় বোধ করিয়া থাকেন, তবে সে দোষ সম্পূর্ণ তাঁহাদের। ভারতের মার্ক্সবাদীদের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব ধনী কৃষক সম্পর্কে কোন বিশেষ বিশ্লেষণ করে নাই বটে, কিন্তু প্রস্তাবে প্রদত্ত নীতিকে যদি অন্ধ্র কর্মীরা নির্ভুলভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করিতেন, তবে তাঁহাদের এমন সিদ্ধান্তে আসিতে হইত না যাহার অর্থ ধনী কৃষকদের নিকট আত্মসমর্পণ।

ধনী কৃষকের ভূমিকা ও তাহাদের প্রতি ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের নীতি সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইয়াছে গত সংখ্যায় মার্ক্সবাদীতে ''কৃষক আন্দোলনের নূতন ধারা'' এবং ''ভারতে নয়া গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র''— এই দুইটি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধ দুইটিতে স্পষ্ট দেখান হইয়াছে যে, অন্ধ্র নেতারা যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা ভুল এবং সমাজতান্ত্রিক লেজুড়হীন ধনী কৃষক সম্পর্কে মাও সে-তুংয়ের নিকট হইতে যে কথাটি ধার করিয়া শ্রেণিসম্পর্কগুলির বিচার ও ওজন না করিয়াই প্রয়োগ করা হইয়াছে সে কথাটি শুধু ধনী কৃষকদের রক্ষার জন্যই ব্যবহার করা হইয়াছে; অথচ জমিদারের মত ধনী কৃষকও গ্রামের জনসাধারণের শত্রু।

সংস্কারবাদের যুগে কিষান আন্দোলনে ভারতীয় মার্ক্সবাদীরা যে একান্ত সংস্কারবাদী নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন আজ এতদিন পরে তাহারই নীতিগত সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন অন্ধ্র নেতারা। সে যুগে তাঁহারা মাঝারী কৃষকের উপর নির্ভর করিয়া ধনী কৃষকের প্রভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পল্লী অঞ্চলের ঐক্যের নামে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের লড়াইকে দাবাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের অগ্রণী ভূমিকাকে চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। পল্লী অঞ্চলের সংযুক্ত জাতীয় ফ্রন্টের ইহাই ছিল প্রকৃত রূপ।

অন্ধ্রে যখন নির্যাতন সুরু হইল তখন এই নীতির ফল পাওয়া গেল।

অন্যতম শত্রু হিসাবে ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে যখন লড়িতে হইবে তখন তাহাকে নিরপেক্ষ করিয়া রাখিবার কথা দিয়া প্রস্তাব সুরু করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তেলেঙ্গানার মত সামন্ততন্ত্রের শক্ত ঘাঁটিতে ধনী কৃষককে মিত্ররূপে পাইবার কথা বলা হইল। নিরপেক্ষতা হইতে সোজা যাওয়া হইল সহযোগিতায়, এই অজুহাতে যে, যে সকল অঞ্চলে সামন্ততন্ত্র শক্তিশালী সেখানে ধনী কৃষক গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামে সক্রিয় সামন্ততন্ত্রবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করিবে। শোষণকারী শক্তিগুলির মধ্যেকার বিভেদ ও বিরোধের উপর আবার সেই নির্বোধ নির্ভরশীলতা, জনসাধারণের শোষণে তাহাদের সাধারণ স্বার্থকে আবার সেই উপেক্ষা। যখন সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণি আপস চাহে এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে সামন্ততন্ত্রের সহিত সহযোগিতার পথ গ্রহণ করিয়াছে, যখন তাহাদের নেতা, শিল্প ক্ষেত্রের বুর্জোয়ারা, সামন্ততন্ত্রের সহিত নূতন সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে, যখন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে ধনী কৃষকের স্বার্থ জনসাধারণের হাতে বিপন্ন হইতেছে তখন ধনী কৃষক সামন্ততান্ত্রিক অঞ্চলেই বা

কি করিয়া সত্যকার সামন্ততন্ত্রবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে? শোষক ও শোষিতের শ্রেণি-বিরোধ যখন এতখানি তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তখন ইহা কি করিয়া সম্ভব?

অন্ধ্র প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তেলেঙ্গানায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, ইহার কোন প্রমাণই নাই। মনে রাখিতে হইবে প্রস্তাবে যাহা বলা হইয়াছে তাহা কোথাও কোথাও খণ্ড সংগ্রামের প্রাথমিক অবস্থায় ধনী কৃষকের কিছু সহানুভূতি নহে— এক কারখানার মালিক যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কারখানার ধর্মঘটকে অনেক সময় টাকা দিয়া সাহায্য করে তেমনই এই সহানুভূতিও সম্পূর্ণ সম্ভব— বলা হইয়াছে রাজনৈতিক সংগ্রামে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে ধনী কৃষকদের দ্বিধাগ্রস্ত সমর্থনের কথা!

দেখা যাইতেছে, নিরপেক্ষ করিয়া রাখার নামে শ্রমিকশ্রেণিকেই সমর্থন করিতে হইবে ধনী কৃষকের সংকীর্ণ স্বার্থকে, বিপ্লবী সংগ্রামে ধনী কৃষক শ্রমিকশ্রেণিকে সমর্থন করিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায় ধান্য সংগ্রহে গরীব কৃষকের যে বিপ্লবী প্রতিরোধ তাহার সহিত ধনী কৃষকের বাধাদানের কোনও সম্পর্ক নাই। ধনী কৃষকের গভর্ণমেন্ট বিরোধী কার্যকলাপ সমর্থনের নামে শোষিতের বিরুদ্ধে ধনী কৃষকের লড়াইকে সমর্থনের দাবি শ্রমিকশ্রেণি করিবে না, সে দাবি করিবে ধনী কৃষকের সমস্ত অতিরিক্ত শস্য বাজেয়াপ্ত করা হোক, কিন্তু যাহাদের অতিরিক্ত নাই তাহাদের কিছুই নেওয়া চলিবে না। কিন্তু, অতিরিক্ত শষ্য সংগ্রহে ধনী কৃষকের বাধাদানকে এবং তাহার মজুতমালকে চোরাবাজারস্থ করিবার পরিকল্পনাকে অন্ধ্র নেতৃত্ব সমর্থনের নির্দেশ দিতেছেন। মাঝারী বুর্জোয়া ও বড় বুর্জোয়ার বিরোধের উপর আপনার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া অন্ধ্র নেতারা বাস্তবক্ষেত্রে ধনী কৃষকের চোরাবাজারী নীতিকেই সমর্থন করিয়াছেন, সমর্থন করিয়াছেন এক শোষকের বিরুদ্ধে অপর শোষককে। ইহার ফলে, শ্রমিকশ্রেণি বুর্জোয়াশ্রেণির এক দলের তল্পীবাহক হইয়া দাঁড়ায়।

যদি গভর্ণমেন্টের যে কোনরূপ বিরোধিতাকেই প্রগতিশীল বলিয়া অভিনন্দিত করিতে হয়, তবে মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বানচাল করিবার জন্য পুঁজিবাদীদের চক্রান্তকেও সমর্থন করিতে হয়।

ইহার পর শোষিতের বিরুদ্ধে শোষকদের খোলাখুলি সমর্থন করা হইয়াছে। সকলেই জানেন, গত ছয় বৎসরের সংস্কারবাদের ফলে, কৃষক ঐক্যের স্বার্থে ক্ষেতমজুরের লড়াইকে পরিহার করা হইয়াছে, এবং গরীব কৃষকদের লড়াইয়ে ভাটা পড়িয়াছে। ইহার অর্থ শ্রমিকশ্রেণি ক্ষেতমজুরকে সংগঠিত করিতে পারে নাই এবং ক্ষেতমজুরের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে। উচিত ছিল, এই সুবিধাবাদী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। কিন্তু তাহার পরিবর্তে কৃষক ঐক্যের নামে ক্ষেতমজুরের স্বার্থ বিসর্জনের সেই আগেকার নীতিকেই ঘোষণা করা হইতেছে। নিরপেক্ষ করিয়া রাখার মানে দাঁড়াইতেছে, ক্ষেতমজুরের মজুরির জন্য ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে লড়াই না করা। প্রশ্নটি এমনভাবে তোলা হইতেছে যেন, ক্ষেতমজুরের লড়াই শুধু মাঝারী এবং গরীব কৃষকের বিরুদ্ধে; কিন্তু আসল শোষক যে ধনী কৃষক তাহার নাম না করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে এবং কৃষক ঐক্য রক্ষার নামে, মাঝারী, গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরের ঐক্য রক্ষার নামে ক্ষেতমজুরের লড়াইকে শিথিল অথবা বর্জন করা হইতেছে— স্বভাবতই ষোলো আনা লাভ হইতেছে ধনী কৃষকের, কারণ সেই ক্ষেতমুজরের আসল শোষক।

অতীতে যখন শ্রমিকেরা জাতীয়করণের কথা বলিত, পুঁজিবাদীদের সমর্থকেরা প্রশ্ন করিত— তোমরা কিসের জাতীয়করণ চাও? গরীব বিধবার সেলাইয়ের কলের? এইভাবে

তাহারা দেখাইত জাতীয়করণে ছোটরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অন্ধ্র নেতৃবৃন্দের যুক্তিও এইরূপ। ক্ষেতমজুরের মজুরির কথা যখন তাঁহারা বলেন, তখন কেবল গরীব কৃষক ও মাঝারী কৃষক সম্পর্কেই বলেন— ক্ষেতমজুর ও ধনী কৃষকের বিরোধকে ধামাচাপা দেন। এইভাবে 'নিরপেক্ষ করিয়া রাখা'র নামে শ্রেণি-বিরোধকে পাশ কাটাইয়া জনসাধারণের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হইতেছে।

গরীব কৃষক, মাঝারী কৃষক ও ক্ষেতমজুরের ঐক্যের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আরও ভাল মজুরি ও বাঁচিয়া থাকিবার মত মজুরির জন্য ক্ষেতমজুরের আসল শোষক ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরের লড়াই যে কোন ভাবে চালাইয়া যাওয়ার উপর জোর দেওয়া মার্ক্সবাদীর প্রধান কর্তব্য। তারপর যেহেতু মাঝারী ও গরীব কৃষক মজুর নিয়োগ করে সেইহেতু তাহাদের নিজেদের লড়াই হিসাবে ক্ষেতমজুরের লড়াইয়ের গুরুত্ব তাহাদের বুঝাইতে হইবে। ইহার ঠিক উল্টা কথাই অন্ধ্র প্রস্তাবে বলা হইয়াছে।

'মাঝারী কৃষক বিপ্লবের দৃঢ়সহযোগী' এবং যে ধনী কৃষকের 'সামন্ততান্ত্রিক লেজুড়' নাই তাহাকে নিরপেক্ষ করিয়া রাখিতে হইবে— এসব কথার অর্থ কিষান আন্দোলনে অতীতে যে নিকৃষ্টতম সংস্কারবাদী নীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহারই নীতিগত মুখোশ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই নীতি ছিল মাঝারী কৃষককে ভিত্তি করিয়া, ধনী কৃষকের সহযোগিতা লইয়া এবং গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরকে নিরপেক্ষ রাখিয়া কৃষক আন্দোলন চালাইবার নীতি। ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক ভিত্তি না হইয়া ভিত্তি হইয়াছে আসলে মাঝারী কৃষক আর ধনী কৃষক হইয়াছে তাহার সহযোগী। মাঝারী কৃষক বিপ্লবের সুদৃঢ় সহযোগী— একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে দ্বিধাগ্রস্ত সহযোগী এবং আমাদের বিপ্লবে তাহার দ্বিধা যে গুরুতর আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে তাহা অন্য প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে। কৃষক জনসাধারণের ও ক্ষেতমজুরের প্রধান শোষক হিসাবে ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। সে শত্রু এবং প্রতিপক্ষের শিবিরে রহিয়াছে। পল্লী অঞ্চলের শ্রেণি-পার্থক্যকে তাঁহারা দেখিতে চাহেন নাই বলিয়াই তাঁহারা শ্রেণি-সহযোগিতার কথা বলিয়াছেন এবং এমন এক রণনীতি গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন যাহার মূলে রহিয়াছে এই ধারণা যে, সামন্ততান্ত্রিক লেজুড়হীন ধনী কৃষক ছাড়া, আর সমস্ত কৃষক অর্থাৎ গরীব, মাঝারী, ধনী, এমন কি, পুঁজিবাদী ধনী কৃষক পর্যন্ত লইয়া গঠিত সমগ্র কৃষকশ্রেণীই জনসাধারণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত যুগ ধরিয়া বিপ্লবী শ্রেণি হিসাবে কার্য করিবে। অন্ধ্র নেতারা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন : 'নূতন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের' যুগে ধনী কৃষক বিপ্লবী। অবিশ্বাস্য হইলেও ইহা সত্য। তাহারা লিখিয়াছেন :

"বিপ্লবের আসল শক্তি : গ্রামাঞ্চলের ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক; আশু মজুত শক্তি : সামন্ততান্ত্রিকতার লেজুড় যাহারা ছাড়িতে পারে নাই সেই সব ধনী কৃষক বাদে সমস্ত সাধারণ কৃষক এবং বিশেষত গরীব ও মাঝারী কৃষক নূতন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে বিপ্লবের আশু মজুত শক্তি হিসাবে রহিবে।"

গতসংখ্যার 'মার্ক্সবাদী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধে যে শ্রেণি-সম্মেলন দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত ইহার তুলনা করুন। সেখানে বলা হইয়াছে, জমিদারী উচ্ছেদের জন্য ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভরশীল হইতে হইবে, মাঝারী কৃষক হইবে দ্বিধাগ্রস্ত সহযোগী। অন্ধ্র প্রস্তাবে আসল সংগ্রামশীল জনসাধারণের উপর অর্থাৎ গরীব

কৃষক ও ক্ষেতমজুরের উপর নির্ভর করা হয় নাই অথচ শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে একমাত্র ইহারাই অগ্রণী শক্তি হিসাবে কাজ করিতে পারে। উপরন্তু মাঝারী ও গরীব কৃষকের কাছে ইহাদের স্বার্থ সমর্পণ করা হইয়াছে। সকল শ্রেণির স্বার্থের ভিত্তিতে রচিত যে রণনীতির কথা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ। কারণ দ্বিধাগ্রস্ত সহযোগীকে যখন অটল সহযোগী বলিয়া মনে করা হয়, যখন শ্রেণি-শত্রুকে বিপ্লবী আখ্যা দিয়া তাহার সহিত সহযোগিতার চেষ্টা করা হয়, (যে সহযোগিতা শুধু শত্রুর শর্তেই হইতে পারে) তখন এই সহযোগিতা ও কৃষক ঐক্যের নামে একটির পর একটি করিয়া সংগ্রামী ঘাঁটিকে বিসর্জন দিতে হয়, আর সেই সঙ্গে মনকে সান্ত্বনা দিতে হয় যে, বিপ্লবের আদর্শই জয়যুক্ত করা হইতেছে। নীতি নির্ধারণেও ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে, কারণ ক্ষেতমজুরের মৌলিক দাবি সম্পর্কেও সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। যখন সত্য সত্যই বিপ্লবী সংঘর্ষ আরম্ভ হইবে, তখন এই আত্মসমর্পণ না জানি আরও কত বেশি হইবে!

এইভাবে ইঁহারা মার্ক্সবাদকে ঢালিয়া সাজিয়াছেন। শ্রেণি-সম্পর্কগুলির বাস্তব অনুশীলন না করিয়া কোন দেশে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করার কথা কে কবে শুনিয়াছে? তাঁহারা আগে স্তরটি কি হইবে স্থির করিতেছেন এবং পরে সেই বিশেষ স্তরের উপযোগী করিয়া অদ্ভুত শ্রেণি-সম্পর্ক উদ্ভাবন করিতেছেন। তাঁহারা ঠিক করিলেন, বর্তমান স্তর ফেব্রুয়ারী 'বিপ্লবের স্তর,' কারণ তাঁহারা ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে চাহেন না; তারপর কল্পনা করিলেন এমন শ্রেণি-সম্পর্ক যাহার কোন অস্তিত্ব নাই— 'বিপ্লবী ধনী কৃষক' 'কিছুরই পরিবর্তন হয় নাই', 'শুধুমাত্র বড় ব্যবসায়ীরাই সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলাইয়াছে', 'নূতন গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু সামন্ততন্ত্র বিরোধী হিসাবেই পরিচালিত হইবে', ইত্যাদি।

এইভাবে ইঁহারা মার্ক্সবাদ লইয়া ছেলেখেলা করিয়াছেন। রুশ বিপ্লবের দুই স্তরের শ্রেণি-সম্মেলনগুলিকে তাঁহারা যান্ত্রিকভাবে ভারতীয় পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করিয়াছেন; অথচ ভাবিয়া দেখেন নাই অক্টোবর বিপ্লবের পর ত্রিশটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেশের শ্রেণি-শক্তির ভারসাম্যকে সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়াছে, বিভিন্ন স্তরের পরস্পরের সহিত জড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে— শ্রেণি-সম্পর্কগুলির এবং এক স্তরের শ্রেণি-সম্মেলনের সহিত অন্য স্তরের শ্রেণি-সম্মেলনের মিশিয়া, মিলিয়া যাইবার। তাই, রুশ বিপ্লবের সমগ্র বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা এই যান্ত্রিক প্রয়োগের মধ্যে একেবারেই ধরা পড়ে নাই।

বিপ্লবের দুই স্তরের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক মার্ক্সবাদের বিপুলতম, বিচিত্রতম অভিজ্ঞতা। অতএব ইহার পর্যালোচনা করা যে ঠিকই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশেষ সময়ের শ্রেণি-সম্পর্কগুলিকে বাদ দিয়া এ আলোচনা করা অর্থহীন। শুধুমাত্র বাস্তব শ্রেণি-সম্পর্কের ভিত্তিতেই এই আলোচনা প্রভূত ফলপ্রসূ হইতে পারে।

লেনিন দেখাইয়াছেন, বাস্তব জীবন অতীতের পুনরাবৃত্তি করে না, বিভিন্ন বিচিত্র সম্মেলনের সৃষ্টি করে। এক দেশের বিপ্লবে যে শ্রেণি-সম্মেলন দেখা যায়, অন্য সময় অন্যদেশে তাহার যথাযথ পুনরাবৃত্তি ঘটে না; তাহার কারণ বিপ্লবের একটি স্তর পরবর্তী স্তরের সহিত কমবেশি জড়াইয়া যায়, শ্রেণি-সম্মেলনগুলি মিশিয়া যায় ইত্যাদি। রুশ বিপ্লবের দুই স্তরের বিভিন্ন শ্রেণির অবস্থার সঠিক যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ভারতীয় অবস্থায় ঘটিবে এইরূপ আশা করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয় ও ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়।

অন্ধ্র প্রস্তাবের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হইতেছে সমস্ত অসামন্ততান্ত্রিক শোষকদের সহিত, তাহাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় শোষক, তাহারও সহিত সহযোগিতা। প্রস্তাবের সমর্থকগণ এতদূর যাইতে সাহস করেন নাই। তাই ধনী কৃষকের সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া তাঁহারা সহযোগিতার সীমা সংকীর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। ১০০০/- টাকা হইতে ২০০০/- টাকার মধ্যে যাহাদের আয় তাহাদেরই ধনী কৃষক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বাকী যাহাদের বার্ষিক আয় ২০০০/- টাকার বেশি সাধারণভাবে তাহারা জমিদারের পর্যায়ে পড়ে; তাহারা সামন্ততান্ত্রিক শোষকই হউক অথবা পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে আধুনিক ব্যবসায়ীই হউক কিছুই আসে যায় না। ইহাদের মধ্যেও অবশ্য পার্থক্যের বিভিন্ন স্তর আছে।" অতএব দেখা যাইতেছে এই সংজ্ঞার মধ্য দিয়া, অর্থাৎ কোন কোন অংশকে জমিদার বলিয়া, ধনী কৃষকদের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিজেদের মূল প্রস্তাবের যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তকে বাতিল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই পার্থক্য করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু না করিয়া উপায় ছিল না। কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই পার্থক্য না করিলে সমস্ত নীতি নির্মমতম শোষকদের সহিত খোলাখুলি সহযোগিতার নীতি হিসাবে উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহাদের নীতির প্রয়োগের অনিবার্য পরিণতির হাত হইতে শুধুমাত্র এই সংজ্ঞা তাঁহাদের রক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ গ্রামের নূতন পুঁজিবাদী শোষকের ভূমিকা বুঝিবার অক্ষমতা হইতেই সমস্ত ব্যাপারটার উৎপত্তি।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে কৃষি সমস্যা সম্পর্কে যে খসড়া থিসিস লেনিন পেশ করেন তাহাতে কৃষকশ্রেণির বিভিন্ন অংশের যে সংজ্ঞা তিনি দেন অন্ধ্র কর্মীরা তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাতেই প্রমাণিত হইয়াছে, কতখানি খেয়াল খুশীমত, কতখানি অসাবধানে তাঁহারা লেনিনকে ব্যাখ্যা করেন। লেনিন সেখানে বিভিন্ন স্তরের সংজ্ঞা দিয়া মজুর ভাড়া করার উপর এবং প্রত্যেক স্তরের উৎপাদনের ভাড়াটে মজুরের ভূমিকার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন। লেনিনের সংজ্ঞা সম্পর্কে অন্ধ্র নেতারা এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন : "লেনিনের উক্তিতে এখানে দেখা যাইতেছে যে, কৃষকদের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগে আসল কথাটি হইতেছে কৃষকের আয়ের ভিত্তি, অর্থাৎ পরিবার এবং খামার রক্ষণ ব্যাপারে উহা যথেষ্ট কিংবা যথেষ্ট নহে তাহার বিচার।" ইহা অপেক্ষা অধিক বিকৃতি আর কি হইতে পারে?

পরিশেষে নিজেদের ভ্রান্ত নীতির সমর্থনে তাঁহারা মাও সে-তুং হইতে কতকগুলি স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথমে এইটুকু পড়ুন : "মার্ক্সবাদ কোন গোঁড়া মতবাদ নহে। ইহা এমন একটি বিজ্ঞান যাহা আমাদের কর্মপন্থা পরিচালনার শক্তি যোগায়। অক্টোবর বিপ্লবের পর এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন দেশে, উপনিবেশে, আধা-উপনিবেশে বিপুল বিপ্লবী সংগ্রাম চলিয়াছে। তাহারা আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দেয়। এই যুগে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভাণ্ডারে অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষাসমূহ জমা হইয়াছে। ঐতিহাসিক চীনা মুক্তিসংগ্রামের নেতা মাও তাঁহার অপূর্ব, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে নয়া গণতন্ত্রের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবার বিপ্লবী সংগ্রামের ইহা এক নূতন রূপ। শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণি-প্রভুত্ব ডিক্টেটরী হইতে স্বতন্ত্র নূতন গণতন্ত্রের তত্ত্ব মাও প্রচার করিয়াছেন।"

প্রথমেই এই কথাটি জোরের সহিত বলিতে চাই যে, মার্ক্স, এঙ্গেল্স, লেনিন ও ষ্ট্যালিনকেই ভারতীয় মার্ক্সবাদীরা প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ছাড়া মার্ক্সবাদের অন্য কোন নূতন উৎস তাঁহারা আবিষ্কার করেন নাই। তা ছাড়া মাও কর্তৃক ঘোষিত বলিয়া কথিত নয়া গণতন্ত্রের তথাকথিত তত্ত্বকে কোনও কমিউনিস্ট পার্টিই গ্রহণ করে নাই এবং মার্ক্সবাদে নূতন অবদান বলিয়াও উহাকে ঘোষণা করে নাই। নয়টি কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে মার্ক্সবাদের এই নূতন সংযোজনার উল্লেখও করা হয় নাই। মার্ক্সবাদীদের একটি সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য সম্মেলনে যাহাকে গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিল না, সেই নূতন আবিষ্কারকে সুপারিশ করিবার দায়িত্ব এই অবস্থায় ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের নেতৃত্বের একাংশের গ্রহণ করা অত্যন্ত অন্যায়। এই ধরনের নির্দেশদানের পূর্বে এবং এই অবদান সম্পর্কে নূতন মনোভাব গ্রহণের পূর্বে দশবার চিন্তা করা উচিত ছিল। কারণ, হালকাভাবে নূতন অবদান ও আবিষ্কারের কথা বলা মার্ক্সবাদীদের চলিবে না, কারণ এই ধরনের দাবি বহুবার প্রচ্ছন্ন বিকৃতি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে (টিটো, ব্রাউডার ইত্যাদি)।

দ্বিতীয়ত, নিজের মতের সমর্থনে অন্ধ্র নেতারা নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে মাও-এর পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিসহ নয়টি অগ্রণী কমিউনিস্ট পার্টির যে একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে তাঁহারা একটি কথাও বলেন নাই। এই সম্মেলনে জ্দানভ জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা করিয়া যে রিপোর্ট পেশ করেন এবং সম্মেলনটিকে যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি নূতন অধ্যায় বলিয়া অভিনন্দন জানান হয় তাহার কোন উল্লেখই অন্ধ্র প্রস্তাবে নাই। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি সুস্পষ্ট শ্রেণি প্রকৃতির ছবি সেখানে দেওয়া হইয়াছে— বুর্জোয়াশ্রেণির ক্ষমতাচ্যুতিই উহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, এসব কিছুই অন্ধ্র প্রস্তাবে স্থান পায় নাই।

কমরেড মাও তাঁহার 'নয়া গণতন্ত্রে' যে ব্যাখ্য দিয়াছিলেন তাহার বিচার করিবার স্থান এ নয়; কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতি ও জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে জ্দানভ ও বলশেভিক পার্টির বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে অন্ধ্র নেতারা যখন মাও-এর শরণাপন্ন হইয়াছেন, তখন তাঁহার কোন কোন নির্দেশকে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মাও এমন অনেক নীতির নির্দেশ দিয়াছেন যাহা কোন কমিউনিস্ট পার্টিই গ্রহণ করিতে পারে না; ঐ নীতিগুলি কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। নীচে মাও-এর একটি মারাত্মক উক্তি উদ্ধৃত করা হইল; উক্তিটি আত্মপক্ষ সমর্থনে অন্ধ্র উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাঁহারা যে কি পথ গ্রহণ করিতে চান এই উক্তি হইতেই তাহা বুঝা যায় :

"কেহ কেহ বুঝিতে পারেন না কেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পুঁজিবাদের প্রতি সহানুভূতি-হীন হওয়া দূরে থাকুক, প্রকৃতপক্ষে উহার বিকাশে সাহায্য করিতেছে। চীন যাহা চায় না তাহা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী সামন্ততন্ত্র; দেশী পুঁজিবাদকে সে বর্জন করিতে চাহে না কারণ উহা অত্যন্ত দুর্বল।"

কোন মার্ক্সবাদীই এই প্রতিক্রিয়াশীল উক্তির সমর্থন করিতে পারে না। দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে ভারতীয় মার্ক্সবাদীরা এই অভ্রান্ত ঘোষণা করিয়াছে যে, যে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাহা সমস্ত মূল শিল্প, ব্যাংক প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া

জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে এবং যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য মূল ঘাঁটিগুলি হইতে পুঁজিবাদীদের তাড়াইয়া দিবে।

আমরা কি ধরিয়া লইব যে, ফ্রান্স, ইতালী, ইংলণ্ডের বিপ্লবী শ্রমিকেরা এবং মহান সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইওরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলি ও ভারতবর্ষের মত দেশের বিপ্লবী জনসাধারণ যখন বিশ্ব ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত তখন চীনের মাটিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাহে? আমরা কি বুঝিব, যে পুঁজিবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হইয়া গিয়াছে চীনের মাটিতে সে আবার নবজীবন লাভ করিবে? আমরা কি ধরিয়া লইব যে, অন্তত চীনের পক্ষে আমরা আবার সেই থিওরীতে ফিরিয়া আসিয়াছি যে থিওরী বলে, কোন দেশে— অন্তত চীনে— পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশ না হইলে সমাজতন্ত্র আসিতে পারে না? পুঁজি ও পুঁজিবাদের শাসনের মধ্য দিয়া না গিয়াও যে উপনিবেশ ও অনুন্নত দেশগুলি ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের দিকে যাইতে পারে— এই লেনিনপন্থী ধারণা কি আমাদের বদলাইতে হইবে? ইহা কি মার্ক্সবাদের প্রাথমিক শিক্ষা নহে যে, পুঁজিবাদ তাহার পতনের যুগে কখনো উৎপাদন বাড়াইতে পারিবে না; বাধা দিবে উৎপাদনে, আনিবে সংকট ও তীব্র শোষণ; অতএব উহার আর প্রসার সম্ভব নহে? মার্ক্সবাদের প্রাথমিক শিক্ষা কি এই কথাই বলে না যে, পুঁজিবাদের প্রসারের চেষ্টার অনিবার্য পরিণতি বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রেণিপ্রভুত্ব? ইহাই কি মার্ক্সবাদের মৌলিক শিক্ষা নহে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে শ্রেণিপ্রভুত্ব করিবে, রাজনীতিতেও সেই প্রভুত্ব করিবে এবং যে পার্টি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজির প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে, রাষ্ট্রে পুঁজির প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টাও সেই করে? জিজ্ঞাসা করিতে চাই, চীনের শ্রমিক শ্রেণি ও জনসাধারণ গত ২৫ বৎসর ধরিয়া যে লড়াই করিতেছে, যে দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করিতেছে সে কি শুধু পুঁজিবাদের প্রসারের জন্য, মজুরির দাসত্ব ও অবাধ শোষণ ব্যবস্থার জন্য? ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, পুঁজিবাদের প্রসারের অর্থ চিয়াং-কাই-শেক উপদলের মত ফ্যাশিস্ট উপদলের শাসন-প্রতিষ্ঠা, কারণ চীনের বর্তমান অবস্থায় ফ্যাশিজম ছাড়া অন্য কোনরূপে পুঁজিবাদ টিকিতে পারে না।

পুঁজিবাদ প্রসারের এই ধারণা যে প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপ্লব বিরোধী তাহারা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই শিথিল উক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্য উক্তিও মাও সে-তুং করিয়াছেন।

যেমন, তিনি বারংবার জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, নূতন বিপ্লব, চীনের বিপ্লব, পুরাতন বুর্জোয়া ধরনের বিপ্লব হইবে না, এবং প্রত্যেকেই জানে যে পুরাতন বুর্জোয়া ধরনের বিপ্লবই একমাত্র বিপ্লব যাহা পুঁজিবাদকে প্রসারিত করে।

নয়া গণতন্ত্রের এমন এক ভিত্তির নির্দেশ তিনি দিয়াছেন যাহা বিপ্লবী শ্রেণির হাতে পুঁজিবাদের প্রসারের পরিবর্তে উচ্ছেদের হাতিয়ার হইয়া দাঁড়াইবে :

"এই ধরনের সাধারণতন্ত্রে সমস্ত বড় বড় ব্যাংক, বড় বড় শিল্প ও বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা থাকিবে রাষ্ট্রের। ব্যক্তিগত লাভের প্রভাব হইতে জনসাধারণের জীবিকাকে মুক্ত রাখিবার জন্য, দেশী মালিকেরই হউক অথবা বিদেশী মালিকেরই হউক, একচেটিয়ার প্রভুত্বাধীনই হউক অথবা ব্যাংক, রেলপথ ইত্যাদির মত ব্যক্তিগত মালিকানার আয়ত্তাতীতই হউক— এ সমস্ত ব্যবসায়ই শুধুমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

ইহাই পুঁজি নিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব ও সারমর্ম।"

স্পষ্ট বুঝা যায়, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে এই হাতিয়ার থাকিলে পুঁজিবাদ প্রসারিত হয় না, ক্রমে ক্রমে উৎপাদনের একের পর এক শাখা হইতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের উচ্ছেদ হইতে থাকে।

বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নাই, শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, কতকগুলি বিচ্যুতির বিরুদ্ধে বিতর্কের মধ্য দিয়া লড়াই করিতে গিয়া মাও নিজে কতকগুলি নূতন বিচ্যুতির মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, জয়লাভের পরদিনই চীনের বিপ্লব আদেশ জারি করিয়া সমাজতন্ত্র গঠন শুরু করিতে পারে না। তাঁহার এ উক্তি নির্ভুল। যে দেশে কৃষিতে ছোট উৎপাদনের প্রাধান্য, সে দেশে বিপ্লবের পরদিনই তুমি সমাজতন্ত্র ও ব্যাপক কৃষির প্রতিষ্ঠা করিতে পার না। পার না এই সহজ কারণে যে, ব্যাপক কৃষির উপযোগী উৎপাদনের উপকরণ তোমার নাই এবং ছোট উৎপাদনকারীদের অধিকাংশকে তোমাকে বুঝাইয়া দলে টানিতে হইবে। ইহার মধ্যে নতুন কিছুই নাই। ইহাই অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা।

আবার এই দেশে, বিপ্লবের পরদিনই আদেশ জারি করিয়া তুমি সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যবসা, কৃষি ও শিল্পে সমস্ত ব্যক্তিগত উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিতে পার না। কারণ সহজ; শতকরা একশত ভাগ সমষ্টিগত উৎপাদনের উপকরণ নাই এবং কৃষিতে ছোট উৎপাদনকারীদের অধিকাংশকে একদিনে দলে টানা যায় না।

বিপ্লবের পরদিনই যাহারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিবে, বিপুলসংখ্যক কৃষকের সহিত তাহাদের বিরোধ বাধিবে এবং তাহারা শ্রমিকশ্রেণির শত্রুদের হাতে গিয়া পড়িবে।

একথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না যে, যে অবস্থায় ব্যক্তিগত উৎপাদনকে সহ্য করিতে হয়, সেই অবস্থাও অবিরাম পুঁজিবাদী সমাজের সম্পর্ক ও স্তরগুলিকে জন্ম দিতে থাকে— যেমন কোন গ্রামে কিছু কৃষক ধনী হইয়া উঠিতে পারে; যদি বাধা না দেওয়া হয়, তবে পরিণতি হইবে পুঁজিবাদে। কিন্তু, বিপ্লবী জনসাধারণের রাষ্ট্রের হাতে থাকে রাজনৈতিক ও মূল অর্থনৈতিক শক্তি এবং এই শক্তিকে তাহারা ব্যবহার করে পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলিকে বাধা দিতে, ছাঁটিয়া দিতে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের উচ্ছেদ ঘটাইতে; জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া গণরাষ্ট্রে তাহারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকে। ইহাই অন্তর্বর্তীকালীন স্তরের প্রকৃতি। এইভাবে, এই স্তর পুঁজিবাদের বিকাশের নহে, উহার উচ্ছেদের অবিশ্রাম সংগ্রামের স্তর হইয়া দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত উৎপাদনের অধিকার রহিয়াছে, এখনও উহা সমাজতন্ত্র নহে, পুঁজিবাদও নহে, কারণ উহার উচ্ছেদের জন্য লড়াই চলিতেছে এবং মূল ঘাঁটিগুলি বিপ্লবী জনসাধারণের হাতে।

ইহা সবই রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা। শাসন জনগণের হাতে এবং বড় বড় শিল্প ও ব্যাংক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত— এই শর্তাধীনে পণ্যোৎপাদন, স্বল্প সংকীর্ণ উৎপাদন ও ব্যক্তিগত উৎপাদনকে চালু থাকিতে দেওয়ার সহিত পুঁজিবাদের প্রসারকে মাও সে-তুং ভুলক্রমে এক করিয়া দেখিয়াছেন এবং জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্বর্তীকালীন পুঁজিবাদ বিরোধী প্রকৃতি একেবারেই তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

জনসাধারণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষেও স্বল্প ও সংকীর্ণ ব্যক্তিগত উৎপাদন কিছুকাল চলিবে— বিশেষত কৃষির ক্ষেত্রে। পরদিনই ইহাকে উচ্ছেদ করা

যায় না। কিন্তু মূল অর্থনৈতিক ঘাঁটিগুলি বিপ্লবী জনসাধারণের হাতে ইতিমধ্যেই আসিবে এবং তাহারা ছোট উৎপাদনের গুরুত্বকে খর্ব করিবার জন্য লড়াই চালাইবে এবং সমষ্টিগত উৎপাদন গড়িয়া তুলিবে।

পল্লী অঞ্চলে প্রথমে স্বল্প ও সংকীর্ণ উৎপাদনের ফলে কৃষকদের মধ্যে স্তরবিভাগ দেখা দিতে পারে, কেহ কেহ টাকা জমাইয়া ধনী কৃষক হইতে পারে। কিন্তু মজুরি ও কারবার সম্পর্কিত আইনের দ্বারা বারংবার তাহাদের প্রসারকে খর্ব করা হইবে, শোষণের জাল বিস্তার করিতে দেওয়া হইবে না এবং পরিশেষে সমষ্টিগত কৃষির উপযোগী উপকরণ যখন হাতে আসিবে তখন তাহাদের উচ্ছেদ করা হইবে। ইহা শ্রেণি-সংগ্রামের নূতন রূপ।

অন্তর্বর্তীযুগে ছোট উৎপাদনের অর্থনীতি টিকিয়া থাকিতে পারে এবং সাময়িকভাবে ধনী কৃষকের জন্ম দিতে পারে বলিয়া আমরা ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে লড়াই করিব না, একথা অত্যন্ত ভুল। আজ যেমন তেমনি আগামী কালও ধনী কৃষক আমাদের শত্রু থাকিবে। যে রাষ্ট্রকে আজ আমরা ধ্বংস করিতে যাইতেছি, সেই রাষ্ট্রকে সে সমর্থন করে। রাজনৈতিকভাবে তাহার উচ্ছেদ ও পরাজয় ঘটাইতে হইবে। ক্ষেতমজুরের ধর্মঘট প্রভৃতির মধ্য দিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে লড়াই চালাইতে হইবে এবং তাহাদের শোষণশক্তি খর্ব করিতে হইবে। ব্যাপক সমষ্টিগত উৎপাদনের প্রসার ঘটাইয়া শ্রেণি হিসাবে তাহার উচ্ছেদের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণিরও মনে রাখিতে হইবে যে, যে অবস্থা হইতে ধনী কৃষকের উৎপত্তি সেই অবস্থার অবসান না ঘটাইয়া কেবলমাত্র আদেশ জারি করিয়া ধনী কৃষককে বিলুপ্ত করা চলে না। অতএব যতদিন পর্যন্ত এই অবস্থার সৃষ্টি না হয় এবং ধনী কৃষক চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত না হয় ততদিন পর্যন্ত ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির অবিশ্রাম লড়াই চালাইতে হইবে।

দীর্ঘ প্রস্তুতি ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে, একথার উপর জোর দিয়া মাও ঠিকই করিয়াছেন। তবু কতকগুলি ভুল নীতি তিনি ঘোষণা করিয়াছেন।

পাঁচ বৎসর পূর্বে লেখা মাওয়ের বই হইতে অন্ধ্র নেতারা উদ্ধৃতি দিয়াছেন; কিন্তু জ্‌দানভের রিপোর্ট এবং তাঁহার জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বর্ণনার উল্লেখ পর্যন্ত করিতে তাঁহারা দ্বিধা কবিয়াছেন। অথচ, জ্‌দানভের বিবৃতিকেই দুনিয়ার কমিউনিস্টরা গ্রহণ করিয়াছেন, মাওয়ের বিবৃতিকে নহে। জ্‌দানভ বলিয়াছেন :

“যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ও আলবেনিয়ার নয়া গণতান্ত্রিক গভর্ণমেন্টগুলি জনসাধারণের সাহায্যে ও সমর্থনে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে এমন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করিয়াছে যাহা কোন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দ্বারা আর সম্ভব নহে। কৃষি-সংস্কারের ফলে জমি গিয়াছে কৃষকের হাতে, জমিদারশ্রেণি বিলুপ্ত হইয়াছে। বড় বড় শিল্প ও ব্যাংক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, জার্মানদের সহিত যাহারা সহযোগিতা করিয়াছিল, সেইসব বিশ্বাসঘাতকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে, এই সকল দেশে একচেটিয়া পুঁজির অবস্থা একান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে এবং জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাইয়াছে। এই সঙ্গে জাতীয় মালিকানায় গভর্ণমেন্টের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং এক নূতন ধরনের রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা জনগণের সাধারণতন্ত্র— এখানে রাষ্ট্রক্ষমতা জনসাধারণের হাতে, ব্যাপক শিল্পের,

ব্যাংকের, যানবাহন ব্যবস্থার মালিক রাষ্ট্র এবং শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বাধীন জনসাধারণের শ্রমশীল শ্রেণিগুলির একটি সমষ্টি ('ব্লক') এখানকার অগ্রণী শক্তি। ফলে, এই সব দেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল ছিন্ন করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই, সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে পা দিবার রাস্তা প্রস্তুত করিতেছে।" (পৃ. ৯-১০)

ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে :

"গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচীকে কেবলমাত্র তখনই কার্যকরী করা চলিতে পারে যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা সেই সকল শ্রেণির হাতে আসিয়াছে যাহারা পূর্ণ গণতন্ত্র চাহে এবং যখন গণতন্ত্রের সকল বিরোধীদেরই রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। এই রাষ্ট্র শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও নিপীড়িত পেটি বুর্জোয়ার সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হইবে। এ রাষ্ট্র হইবে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, ইহার ভিত্তি হইবে শ্রমিক, কৃষক ও নিপীড়িত পেটি বুর্জোয়ার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্রেণিগুলির সহযোগিতা। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী অথবা শোষকের স্থান এ রাষ্ট্রে হইবে না। বর্তমান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে এই রাষ্ট্র শ্রমজীবী জনগণের প্রত্যক্ষ শাসনের উপর স্থাপিত হইবে।

"বর্তমানে বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাহাতে গণসংগ্রামের প্রত্যেক অগ্রগামী পদক্ষেপ শুধু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই যাইবে না, বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধেও যাইবে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয়, যে স্তরে বুর্জোয়াশ্রেণির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরে ছিল সেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পুরাতন স্তর শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ সমগ্র ঘটনাবলী শ্রমিক, কৃষক ও নিপীড়িত পেটি বুর্জোয়া লইয়া গঠিত এমন এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাবি জানাইতেছে, যে দাবিকে কেন্দ্র করিয়া জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার বুর্জোয়া তাঁবেদারদের পরাজিত ও নিজেদের মুক্ত করিবার সংগ্রামে অগ্রসর হইবে। ইহার অর্থ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সমাধা করিবার এবং সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্র গঠন করিবার জন্য জনসাধারণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজন। শ্রমজীবী জনসাধারণের অন্যান্য অংশের উপর শ্রমিকশ্রেণির দৃঢ় নেতৃত্ব স্থাপন ছাড়া ইহা সম্ভব নহে।" (৭৪ পৃ.)

অন্ধ্র নেতৃবৃন্দ যদি এই নির্দেশ মানিয়া চলিতেন, তবে জনগণের গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁহাদের আর জল্পনা কল্পনা করিতে হইত না এবং সুবিধাবাদের ফাঁদেও পড়িতে হইত না। মাও সে-তুং-এর শিথিল উক্তিগুলির সাহায্যে অন্ধ্র নেতারা যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অর্থ জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সামন্ততন্ত্র বিরোধী বিপ্লবের সহিত, অর্থাৎ সাধারণ বুর্জোয়া ধরনের বিপ্লবের সহিত এক করিয়া দেখা। ইহা যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নহে তাহা প্রমাণ করিবার অজুহাতে অন্ধ্র নেতারা এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, ইহা সাধারণ বুর্জোয়া বিপ্লব। ভাবতবর্ষকে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশ বলিয়া উল্লেখ এবং প্রস্তাবিত রণনীতি সব কিছুই ইহাতে আসিয়া দাঁড়ায়। যদি তাঁহারা জ্‌দানভের উক্তিগুলি ভালভাবে পড়িয়া দেখিতেন তবে সব প্রশ্নেরই জবাব সেখান হইতে পাইতেন। জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু সামন্ততন্ত্র বিরোধী নহে, পুঁজিবাদ বিরোধীও বটে— ইহা শুধু সামন্ততন্ত্রেরই উচ্ছেদ ঘটায় না; অর্থনৈতিক জীবন ও রাজনৈতিক প্রভুত্বের আসল ঘাঁটিগুলি হইতে পুঁজিবাদীদের বিতাড়িত করিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাফল্যময় চূড়ান্ত সংগ্রামে জনসাধারণকে সমর্থ করিয়া তোলে। এই

ভাবেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সহিত জড়াইয়া থাকে এবং একটি অপরটির মধ্যে চলিয়া যায়।

অন্ধ্র প্রস্তাব যে কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়াছে তাহাতে জনসাধারণকে গণনার মধ্যে আনা হয় নাই। ইহারই চূড়ান্ত পরিণতি দেখিতে পাই চীনের উদ্ধৃতিতে :

"এই সব কথা মনে রাখিয়া, অন্ধ্র, বাংলা, কেরালার অনেক স্থানের মত যে সব অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে আমরা অধিক সংখ্যায় আছি সেই সব অঞ্চলে, আমাদের উচ্ছেদে নিষ্ঠুরভাবে বদ্ধপরিকর নেহরু সরকারের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে (চীনের পন্থায়) গেরিলা যুদ্ধ চালাইবার কথা আমাদের চিন্তা করিতে হইবে।"

ধনী কৃষকদের সহযোগিতায় নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ! আর কি চাই? ঠাট্টা নয়, কারণ জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত যুগ ধরিয়া তেলেঙ্গানার মত অঞ্চলগুলিতে ধনী কৃষক দ্বিধাগ্রস্ত সহযোগীর কাজ করিবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা মূঢ়তা আর কি হইতে পারে! লালঝাণ্ডাকে যখন নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তখন অন্ধ্রের ধনী কৃষকেরা যে কী ভীষণ কাণ্ড করিয়াছিল তাহা অন্ধ্রের মার্ক্সবাদীরা জানেন, তবু পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই ধরনের কথা লেখা হইয়াছে। এবং প্রস্তাবটিতে জনসাধারণকে দলে টানিবার কোন আহ্বান নাই, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কোন আহ্বান নাই, যে সব অঞ্চলে লালঝাণ্ডা শক্তিশালী অথবা দুর্বল সেই সব অঞ্চলে জনসাধারণের অধিকাংশকে দলে টানিবারও কোন আহ্বান নাই। যেখানে তুমি শক্তিশালী সেখানে ধনী কৃষকের সহযোগিতায় গেরিলা যুদ্ধ চালাও— এই আহ্বান জানান হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন না থাকিলে যে গেরিলা যুদ্ধ চালান যায় না— এই সহজ সত্যটি পর্যন্ত মনে নাই। ধনী কৃষক ও বুর্জোয়াশ্রেণির অন্যান্য অংশের নিকট বিপ্লবী জনসাধারণের স্বার্থকে বলি দিয়া বীর সাজিবার চেষ্টা ছাড়া ইহা আর কিছুই নহে। সর্বশেষে বলা হইয়াছে :

"রুশ বিপ্লব হইতে আমাদের বিপ্লব অনেক ব্যাপারে স্বতন্ত্র : কিন্তু চীনের বিপ্লবের সহিত ইহার প্রচুর মিল আছে। সাধারণ ধর্মঘট ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া গ্রামাঞ্চলের মুক্তি সাধনের সম্ভাবনা এখানে কম। অটল প্রতিরোধ ও সুদীর্ঘ গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়া কৃষি বিপ্লবের পথে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সম্ভাবনাই এখানে বেশী।"

রুশ বিপ্লব ও চীনা বিপ্লবকে যেভাবে বর্ণনা ও তুলনা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

রুশিয়ায় কি গৃহযুদ্ধ, কৃষি-বিপ্লব, সুদীর্ঘ লড়াই হয় নাই? বলশেভিকরা কি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া লড়াই করেন নাই? এ সকল প্রশ্নের অর্থ এইরূপ তুলনার দেউলিয়াপনাকে উন্মুক্ত করিয়া দেখান।

সাংহাই ও ক্যান্টনের ধর্মঘটগুলি কি চীনা লালফৌজ গঠনে এবং কৃষকদের বিপ্লবী করিয়া তুলিতে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে নাই?

শ্রমিকশ্রেণির বিশেষ হাতিয়ার সাধারণ ধর্মঘটকে যদি কেহ, যে অজুহাতেই হউক না কেন, বিপ্লবী হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করিতে না চান অথবা ছোট করিয়া দেখেন, তবে তিনি লেনিনবাদ ও মার্ক্সবাদের বিরোধী। শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকাকে তিনি ছোট করিয়া দেখেন এবং মনে করিতে থাকেন যে, সংগ্রামের কেন্দ্র শ্রমিক নহে, কৃষক। কিন্তু ভারতীয় মার্ক্সবাদীরা এই হাতিয়ারটিকে বিপ্লবের অস্ত্রশালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার বলিয়া মনে করেন এবং বুর্জোয়া

শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে তাঁহারা এই সাধারণ ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইবেন।

আজিকার অবস্থায় যখন কৃষক অগ্রসর হইতে শুরু করিয়াছে তখন রেল-শ্রমিকদের ধর্মঘট যে কী বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়। সাধারণ ধর্মঘটের ভূমিকা যে মানিতে চাহে না, সে বিপ্লবী সংগ্রামের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ারকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দিবার অপরাধে অপরাধী। সমস্ত শিল্পে একটি সাধারণ ধর্মঘটের পরেই আসে সমস্ত দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান, যদি ইতিমধ্যে চালু শাসনের উচ্ছেদের জন্য জনসাধারণের অধিকাংশকে দলে টানিতে সমর্থ হইয়া শ্রমিকশ্রেণি জনসাধারণের মধ্যে তাহার নেতৃত্ব মানিবার মত আস্থা অর্জন করিয়া থাকে। রুশিয়ার সাধারণ ধর্মঘটের পরেই আসিল অভ্যুত্থান। ইহা স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নহে; ইহা শ্রমিকশ্রেণির ত্রিশ বৎসরের সংগ্রামের এবং জনসাধারণের মধ্যে বলশেভিকদের প্রতিপত্তির ফল।

সুদীর্ঘ গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়া চীনাদের যাইতে হইয়াছে কেন? তাহার কারণ, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সময় সময় শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বের লড়াই চালাইতে পারে নাই, জনাধারণের অধিকাংশকে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বাধীনে আনিতে পারে নাই, তাহার সহযোগী করিতে পারে নাই, রণনীতির ক্ষেত্রে এমন পন্থা অনুসরণ করিয়াছিল যাহাতে বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ঔপনিবেশিক আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসের থিসিসে লিখিত হইয়াছে :

"২৬। চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম স্তর শেষ হইয়াছে। এই স্তরের মধ্যে যে জীবন্ত, বাস্তব ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা হইতে কমিউনিস্টরা, বিশেষত ঔপনিবেশিক দেশের কমিউনিস্টরা, মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করিবেন। এই অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে অনুশীলন করিতে হইবে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য; বিশেষত উপনিবেশসমূহে কমিউনিস্টদের কার্যে যে সমস্ত ভুল ত্রুটি হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে সতর্ক হইতে হইবে এই অভিজ্ঞতা হইতে। সুদীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সহিত সংযুক্ত ছিল বলিয়াই চীনের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ঢেউ অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী (দুই বৎসরের উপর) হইয়াছিল। উত্তরের অভিযান বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে চালান হয় নাই। এবং ঐ শক্তিগুলিও নিজেদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার জন্য প্রথম অবস্থায় কিছুটা নিষ্ক্রিয়ই ছিল; জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্বের হাতে তখন কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্যান্টন রহিয়াছে— যদিও সংকীর্ণ তথাপি সুস্পষ্ট এই অঞ্চল। এবং বুর্জোয়া নেতৃত্ব তখন সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সমর্থিত একটি কেন্দ্রীয় শক্তি। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াশ্রেণির একটি বৃহৎ অংশ কেন যে গোড়াতে এই জাতীয় মুক্তির যুদ্ধকে নিজেদের ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল তাহা এখান হইতেই বোঝা যায়। কুওমিনটাং-এ ইহারা ছিল অগ্রণী ভূমিকায়; অল্পকালের মধ্যেই ইহারা জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল; ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া দেখা গেল বিপ্লবের পক্ষে ইহারা এক মারাত্মক বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"অন্যদিকে চীনের পরিস্থিতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণির চেয়ে সেখানকার শ্রমিকশ্রেণি বুর্জোয়ার তুলনায় বেশী শক্তিশালী ছিল। তাহারা ভালভাবে সংগঠিত ছিল না বটে, কিন্তু বিপ্লবের ঢেউ যখন উপরে উঠিতেছিল তখন শ্রমিক

সংগঠন বৃদ্ধি পায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। কমিউনিস্ট পার্টিও অল্প সময়ের মধ্যে একটি ছোট দল হইতে ৬০ হাজার সভ্যের পার্টিতে পরিণত হয় (এখন আরও বেশি) এবং শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। স্বভাবতই এই অবস্থায় বুর্জোয়া ভাবাপন্ন অনেকেই পার্টিতে ঢুকিয়া পড়ে। পার্টির তখন বিপ্লবী অভিজ্ঞতা ছিল না। বলশেভিজমের কোন ঐতিহ্যও তাহার ছিল না। প্রথমে, পার্টি নেতৃত্বে প্রাধান্য ছিল দ্বিধাগ্রস্তদের; পেটি বুর্জোয়া সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি তখনও তাহাদের আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির স্বতন্ত্র কর্তব্য ও ভূমিকা তাহারা ভাল বুঝিত না। কৃষি বিপ্লবে যখনই কোন বিশেষ ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দিত, তখনই তাহার বিরোধিতা করিত।

"জাতীয় বিপ্লবের অগ্রণী দল কুওমিনটাং-এর মধ্যে কিছুকাল ধরিয়া কমিউনিস্টদের অবস্থান তখনকার সংগ্রামের ও পরিস্থিতির অনুযায়ীই হইয়াছিল এবং শ্রমজীবীদের যে ব্যাপক অংশ কমিউনিস্ট পার্টিকে অনুসরণ করিত তাহাদের মধ্যে একান্ত আবশ্যকীয় কাজ চালাইবার জন্যও ইহার প্রয়োজন ছিল। ইহা ছাড়া কুওমিনটাং গভর্ণমেন্টের শাসনাধীন অঞ্চলে শ্রমিক, কৃষক এবং জাতীয় বাহিনী ও তাহার প্রতিষ্ঠানগুলির সৈন্যদের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলন চালাইবার সুবিধা পার্টি পাইয়াছিল। সে সময় পার্টির সম্মুখে যে সুবিধা ছিল, পার্টি তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে নাই। সে সময় সে জনসাধারণের নিকট সুন-ইয়ত-সেনের মতবাদ ও অন্যান্য পেটি বুর্জোয়া মতবাদ হইতে নিজের শ্রমিকশ্রেণিরূপকে স্বতন্ত্র ও পৃথক করিয়া যথেষ্টভাবে প্রচার করে নাই। কুওমিনটাং-এর কর্মীদের মধ্যে কমিউনিস্টরা নিজস্ব নীতি অনুসরণ করে নাই; তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, এই ধরনের অপরিহার্য 'ব্লকের' মধ্যে কমিউনিস্টরা বুর্জোয়াদের সম্পর্কে বিনা শর্তে সমালোচনা চালাইয়া যাইবে এবং সব সময় স্বাধীন শক্তি হিসাবে দেখা দিবে। ঠিক যে সময় জাতীয় বুর্জোয়ার ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের দ্বিধা দুর্বলতাকে উন্মুক্ত করিয়া দেখান কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে বড় কাজ ছিল ঠিক সেই সময়ই এই কাজে তাহারা অবহেলা দেখাইয়াছে। জাতীয় সৈন্যবাহিনী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই কুওমিনটাং-এর অভ্যন্তরীণ অনিবার্য বিভেদ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। কিন্তু ভাঙন সুরু হইলে যাহা করিতে হইবে সে সম্পর্কে এবং পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এবং বিপ্লবী শ্রমিক কৃষককে একটি স্বাধীন ও সংগ্রামশীল ব্লকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া কুওমিনটাং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাড় করান সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন না।

"তাই চিয়াং কাই-শেকের বুর্জোয়া বিপ্লব বিরোধী অভিযানের সম্মুখে অপ্রস্তুত বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব তখনও এক স্তর হইতে অন্য স্তরে বিপ্লবের বিকাশের প্রণালীকে বুঝিতে পারিলেন না এবং চিয়াং-এর অভিযানে পার্টির নীতিতে যে ভ্রম সংশোধনের প্রয়োজন হইল তাহাও করা হইল না। কুওমিনটাং-এর পেটি বুর্জোয়া নেতাদের বামপন্থী অংশ তখনও কিছুকাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেই রহিল; ফলে অঞ্চলগত বিভেদ হইয়া গেল। দুইটি গভর্ণমেন্ট স্থাপিত হইল— নানকিং ও উহান। কিন্তু উহানেও কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের স্থান দখল করিতে পারিল না। কিন্তু উহান অঞ্চলে শীঘ্রই দ্বিতীয় স্তর শুরু হইল। এ স্তরের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে একদিকে দুর্বল, অস্পষ্ট এবং দ্বৈত-ক্ষমতার আবির্ভাব (কৃষক সমিতি কর্তৃক বলপূর্বক গ্রামের কতকগুলি শাসনব্যাপার গ্রহণ, ট্রেড

ইউনিয়নের কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি এবং এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা-সমস্যার 'সাধারণ মানুষের উপযোগী' স্বাধীন সমাধানের জন্য জনগণের প্রচেষ্টা) এবং অন্যদিকে উহান গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতিষ্ঠান হিসাবে সোভিয়েত সংগঠনের উপযোগী অবস্থার অভাব; কারণ উহান গভর্ণমেন্ট তখন বিপ্লবের প্রতি বুর্জোয়ার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক নানকিং গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম চালাইতেছিল।

''কমিউনিস্ট পার্টি তখন বিপ্লবী জনগণের স্বাধীন কর্মধারাকে সোজাসুজি বাধা দিয়াছে, তাহাদের একত্রিত ও সংগঠিত করিয়া তোলে নাই, কুওমিনটাং-এর বামপন্থী নেতাদের প্রভাব নষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই, দেশের মধ্যে ও সৈন্যবাহিনীতে তাহাদের প্রতিপত্তিকে ধ্বংস করিতে চাহে নাই। এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেন্টে তাঁহাদের অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা গভর্ণমেন্টের সমস্ত কাজকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন (পার্টির স্বতন্ত্র পেটি বুর্জোয়া নেতৃস্থানীয় সভ্যেরা এতদূর পর্যন্ত গিয়াছিলেন যে, উহানে শ্রমিক পিকেটারদের নিরস্ত্র করার ব্যাপারে এবং চাংসায় পিটুনী অভিযান প্রেরণের ব্যাপারে পর্যন্ত তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন)।

''উহান গভর্ণমেন্টের পেটি বুর্জোয়া নেতাদের সহিত বিচ্ছেদ এড়াইবার আশাই ছিল এই সুবিধাবাদী নীতির মূলে। কিন্তু, এ বিচ্ছেদ অতি অল্পকালের জন্যই এড়ান গিয়াছিল। যখন গণ-অভ্যুত্থান ভীষণ আকার ধারণ করিল তখন উহান কুওমিনটাং-এর নেতারা শত্রুশিবিরের মিত্রদের সহিত ঐক্যস্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী আন্দোলন তখনও জয়লাভের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতেছিল। এবার চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাহার ভ্রান্ত নীতি সংশোধন করিল এবং নূতন নেতৃত্ব নির্বাচন করিয়া বিপ্লবের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বিপ্লবের ঢেউ তখন নামিয়া আসিতেছে। সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার স্লোগান লইয়া বীরত্বপূর্ণ গণ আন্দোলন কোথাও কোথাও শুধুমাত্র সাময়িক সাফল্য লাভ করিল। কেবলমাত্র কয়েকটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের অভ্যুত্থান যথেষ্ট পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল; অন্যান্য অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ কৃষকের পশ্চাদ্বাহিনীর অগ্রগতিতে বিলম্ব হইয়া গেল। সুবিধাবাদী নেতৃত্বের আগেকার মারাত্মক ভুলের পরিবর্তে বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত ক্ষতিকর 'আকস্মিক আঘাত হানিবার' (Putschist) ভুল দেখা দিল। অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতেও কমিউনিস্টরা অনেক মারাত্মক ভুল করিল। গভীর পরাজয় আরেকবার বিপ্লবকে পিছু হটাইয়া বর্তমান স্তরের সূচনায় আনিয়া ফেলিল; এদিকে দক্ষিণে ইতিমধ্যেই বিপ্লব দ্বিতীয় স্তরে পা দিয়াছে।''

(উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে বিপ্লবী আন্দোলন— পৃ. ৩৯-৪০)

একথা সত্য যে, সম্মুখে কঠোর সংগ্রাম, জনসাধারণকে দলে টানিতে হইবে, সে সকল পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবী মনে করেন বিপ্লবের জন্য জনগণের প্রয়োজন নাই এবং যাঁহারা ভুলিয়া যান যে বিপ্লব করে জনগণের অধিকাংশ তাঁহাদের বুঝাইতে হইবে দ্রুত ও সহজ জয়লাভের আশা করিও না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ ধর্মঘট ও অভ্যুত্থান বিলুপ্ত হইবে। ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, এই সব বিপ্লবী লড়াইয়ে শহরের ঘাঁটিগুলি সাময়িকভাবে ভাঙিয়া যাইতে পারে এবং বিশাল প্রসারতার জন্য কৃষি অঞ্চলগুলি প্রতিরোধের ঘাঁটি হইয়া থাকিবে এবং লড়াই সেখানে তীব্র হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ ধর্মঘট থাকিবে না, থাকিবে না সশস্ত্র অভ্যুত্থান, থাকিবে শুধু পল্লী অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ। পরন্তু এই সকল অবস্থায়

সাধারণ ধর্মঘটের ফল হইবে বিদ্যুতের মত। আর এক ধরনের চিন্তাধারা আছে। অনেকে মনে করেন, তেলেঙ্গানা প্রভৃতির মত কৃষিসংগ্রাম খণ্ড সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নহে; এই সংগ্রামগুলিকে খণ্ডসংগ্রাম হিসাবেই চালাইতে হইবে; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শহরগুলিতে শ্রমিকশ্রেণি ক্ষমতা দখল না করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ কৃষিসংগ্রামগুলি সংগ্রামী অঞ্চলগুলিকে মুক্ত করিবার পর্যায় পর্যন্ত বাড়িতে পারে না— ইহা ভ্রান্তিমূলক ধারণা। এই ধারণা দেখিতে পায় না যে, ধনতন্ত্রের সংকট কত গভীর এবং কৃষিসংকট উহারই অংশ হিসাবে বাড়িতেছে। এই ধারণা দেখিতে পায় না যে, যে সময়ে পল্লী অঞ্চলে কৃষিসংগ্রাম ফাটিয়া পড়ে সেই সময়ে শহরগুলিতে জনগণের রাজনৈতিক ধর্মঘট কৃষিমজুর ও গরীব কৃষকের সংগ্রামকে এমন শক্তিশালী করিতে পারে যে তাহা সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরে পৌঁছাইতে পারে, এমন কি, সংগ্রামশীল এলাকাগুলিকে মুক্ত অবস্থায় লইয়া ফেলিতে পারে।

যাঁহারা চীনের পথ ও রুশের পথ তফাৎ করিয়া দেখেন তাঁহাদের মনে অনেক ভুল জিনিস আছে। প্রথমত, রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা ভুল। তাঁহারা মনে করেন, রুশ বিপ্লব ঘটিয়াছিল হঠাৎ একদিনের ধাক্কায়— ৭ই নভেম্বরে— ইহা যেন একটি হঠাৎ-ক্ষমতা-দখলের তামাসা। এবং তাঁহারা ভুলিয়া যান কি প্রচণ্ড একটানা সংগ্রাম তিন যুগ ধরিয়া চালাইতে হইয়াছিল, কি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল বিপ্লবের সময় এবং তাহার পূর্বে জনগণের অধিকাংশকে টানিয়া নামাইবার জন্য। তাঁহারা ভুলিয়া যান গৃহযুদ্ধের কথা।

দ্বিতীয়ত, যখন তাঁহারা যাহাকে চীনের পথ বলিতেছেন তাহা তুলিয়া ধরেন এবং তাহার পার্থক্য দেখাইতে চাহেন, তখন তাঁহারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণির আধিপত্য বাতিল করেন এবং মনে করেন যে চীনের বিপ্লব যেন দেখাইয়া দিয়াছে যে শ্রমিকশ্রেণির আধিপত্যের প্রয়োজন নাই। সাধারণ ধর্মঘটের এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, পুরোনো অকেজো বলিয়া চালান পল্লী অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ এবং সুদীর্ঘ সংগ্রামের আড়ালে রহিয়াছে একটি ধারণা যে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বের প্রয়োজন নাই। সামন্ততন্ত্র বিরোধী বিপ্লব, কৃষি বিপ্লব ইত্যাদির নামে এই প্রচেষ্টা চলে— এক কথায়, কৃষকের নেতৃত্বের এক থিওরী খাড়া করা হয়। ইহার মার্ক্সবাদ বিরোধী রূপ ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রমিকশ্রেণির আধিপত্য সরাসরি নাকচ করা হয় না, কিন্তু ঐ কথাটি এমনভাবে বলা হয় যে, তাহা বাতিল হইয়া যায়। চীনের পথ বলিয়া চালাইবার যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদের কেহ কেহ মুখে শ্রমিকশ্রেণির আধিপত্য স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা বলিতে চাহেন, চীনের অভিজ্ঞতা দেখাইয়াছে রাজনৈতিকভাবে, আদর্শগতভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্য দিয়াই শ্রমিকশ্রেণির এই আধিপত্য কায়েম করা হইতেছে— ইহার অর্থ দাঁড়ায় যে শ্রমিকশ্রেণির আদর্শগত ও রাজনীতিগত ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কমিউনিস্ট পার্টিই সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে; শ্রমিকশ্রেণিকে, শ্রমিকদের অধিকাংশকে সংগ্রামের মধ্যে না টানিয়াই এই নেতৃত্ব সম্ভব; কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্য দিয়াই এই আধিপত্য চালু হইবে; সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণির প্রত্যক্ষ যোগদান ও নেতৃত্ব না দিয়াই ইহা, কায়েম করা যাইবে।

উপরে দেখানো হইয়াছে যে ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। এমন কি চীনের ক্ষেত্রেও ইহা খাটে না। যাঁহারা চীনের পল্লী অঞ্চলের লড়াইয়ের ব্যাপারটাই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং জানেন না চীনের অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে কৃষি বিপ্লবের আগুন কে ছড়াইয়াছে, তাঁহারা সহজেই ভুলিয়া যান

চীনের শ্রমিকশ্রেণির বীরত্বপূর্ণ ও নেতৃত্বের ভূমিকা। প্রথমত, সাংহাই, ক্যান্টন ও অন্যান্য স্থানে চীনের শ্রমিকশ্রেণির বীরত্বপূর্ণ ও বিপ্লবী সংগ্রাম, তাহাদের গণ-প্রতিবাদ আন্দোলন, সাধারণ ধর্মঘট, ক্যান্টনের বিরাট অভ্যুত্থান ও কমিউন প্রতিষ্ঠা— এইসব ব্যতীত অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া ইস্পাতের মত মজবুত চীনের শ্রমিকশ্রেণির পার্টি গড়িয়া উঠিতে পারিত না। মুক্তিসংগ্রামে চীনের শ্রমিকশ্রেণির বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বের ভিতর হইতেই সোজা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে কমিউনিস্ট পার্টি। দ্বিতীয়ত, যখন শহরগুলি হইতে তাঁহারা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন, তখন বিপ্লবের বহ্নি কাহারা লইয়া যায় চীনের পল্লী অঞ্চলে? তাহারা হইল ক্যান্টন কমিউনের বীর শ্রমিক যোদ্ধারা, সাংহাইয়ের শ্রমিক বাহিনী, যাহারা শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণিসংগ্রামে নিজেদের শিক্ষিত করিয়াছিল। তাহারা হইল চীনের শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠা সৈন্যবাহিনী। ইহাদের বাদ দিয়া লালঝাণ্ডার হাজার হাজার মাইলের বিখ্যাত অভিযান, এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব রাখাই সম্ভব হইত না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণিকে বাদ দিয়া শুধু পার্টির আধিপত্যকে শ্রমিকশ্রেণির আধিপত্য বলা চলে না; তাহার আসল অর্থ হইল পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণির আধিপত্য, সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণির আধিপত্য।

অতএব, অন্ধ্রের দলিলপত্রের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি মার্ক্সবাদ বিরোধী ও লেনিনবাদ বিরোধী; ইহা ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে এবং জ্দানভের বিবৃতিতে বিশ্ব-পরিস্থিতি, জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে যে গৃহীত মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া হইয়াছে তাহার বিরোধী। এই কারণে অন্ধ্র নেতৃবর্গের প্রস্তাব ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের উচ্চতম নেতৃত্ব বর্জন করে।

প্রাপ্তিস্বীকার : 'মার্ক্সবাদী' তৃতীয় সংকলন, মে ১৯৪৯।

The Calcutta Gazette (Extraordinary)
Wednesday, March 31, 1948

Home Department Political Notification

No.1759/A-P - 25th March, 1948 -
Whereas in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 16 of the Indian Criminal Law Ammendment Act, 1948 (XIV of 1908), the Governor has, by notification No. 1759 P dated 25th March, 1948, declared the Communist Party of India and its Committees, Branches and Communes and also its Volunteer Organisations, including the Red Guards, to be unlawful associations;

And whereas the place specified and described in the schedule hereto annexed is used for purposes of the said unlawful associations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 17A of the Indian Criminal Law Ammendment Act, 1908 (XIV of 1908), the Governor is hereby pleased to notify the said place as place which is used for the purposes of unlawful associations.

SCHEDULE

A four-storied building being premises N0.8E, Dacres Lane, Calcutta. used for the location of the Ganasakti Press, the Swadhinata office, the Provincial Headquarters of the Communist Party of India, Bengal Branch, and the Party Commune, bounded on the -
North - By Premises No. 8/1, Dacres Lane.
East - By Premises No. 9, Dacres Lane.
South - By Crooked Lane.
West - By Dacres Lane.

By the Order of the Governor
R. GUPTA
Secy. to the Govt. of West Bengal.

কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র সচিবের বিবৃতি

"গভর্নমেন্ট ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন পরিষদ সে সম্বন্ধে আমার নিকট এক বিবৃতি আশা করিতে পারেন। ২৭শে মার্চ সংবাদপত্রে আমি এক বিবৃতি দিয়াছিলাম; আপনারা অনেকেই তাহা পড়িয়া থাকিবেন। আপনারা একথা উপলব্ধি করিবেন যে, কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে এবং গত কয়েকদিনে যেসব তল্লাসী হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ আমি এখনও পাই নাই। দ্বিতীয়ত জনস্বার্থের খাতিরে বর্তমানে সকল তথ্য প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে না। তথাপি বর্তমানে যতটা সম্ভব ততটা পরিষদে প্রকাশ করা আমি কর্তব্য বোধ করিতেছি।

"গত কয়েক মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সম্ভবত পরিষদের অনেক সদস্যই ওয়াকিফহাল নহেন। সদস্যগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর কমিউনিস্ট পার্টি জাতির কতিপয় নেতার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্ররোচিত করিতে প্রবল প্রচারকার্য চালায়। সেই প্রচারকার্য বন্ধের জন্য গভর্নমেন্টকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতার' উপর পূর্বাহ্নে সংবাদাদি সরকারীসূত্রে অনুমোদিত করাইয়া লইবার আদেশ জারি হয়। সম্প্রতি খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতি, বেকার প্রভৃতি আশু সমাধান সাপেক্ষ সমস্যাগুলির উপর গভর্নমেন্টের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া আছে; কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের এই তন্ময়তার সুযোগ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল একটা অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করা এবং শেষাশেষি ঐ সুযোগে হিংসাপন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। গ্রামাঞ্চলে ঐ পার্টি খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কিরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে গভর্নমেন্ট তাহার অসংখ্য সংবাদ পাইয়াছেন। এই পার্টি যেসব অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে পরিয়াছে সেইসব অঞ্চলে তাহারা গ্রামবাসীদিগকে আইন ও শৃঙ্খলা অমান্যের জন্য উস্কানি দিয়াছে। হুগলী জেলায় কমলপুর গ্রামের সম্প্রতিক ঘটনা পরিষদের স্মরণ থাকিতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে গ্রামবাসিগণ বেশ কিছুকাল যাবৎ কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে। এই ক্ষেত্রে তাহারা এক পুলিশ দলের উপর চড়াও হয়; ঐ পুলিশ দল ফৌজদারী মামলা সম্পর্কে কয়েকজন পলাতককে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিল। পরিশেষে পুলিশ দল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গুলি চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

"শ্রমিক মহলেও এই পার্টির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অনেক সদস্যই বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল আছেন। যে সময়ে জাতির নেতৃবৃন্দ উৎপাদন বৃদ্ধির জরুরি সমস্যায় নিমগ্ন তখন এই পার্টি শ্রমিক বিরোধ জাগাইয়া তুলিতে থাকে। গভর্নমেন্ট পুনঃ পুনঃ বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ

পাইয়াছেন যে, কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকদিগকে মতলব করিয়া প্রতিষ্ঠান-পরিচালকদের উপর হামলা করিতে ও উৎপাদন বন্ধ করিতে প্ররোচনা দেওয়া হইয়াছে। এরকম উদাহরণের অভাব নাই যেখানে প্রতিষ্ঠান-কর্তৃপক্ষকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, মারপিট করা হইয়াছে এবং সামান্য কারণে ধর্মঘট আহ্বানের ফলে কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গভর্নমেন্ট সর্বদাই তাহা সালিশী বা মধ্যস্থতায় দিতে উৎকণ্ঠিত; কিন্তু শ্রমিকদিগকে ঐ ব্যবস্থায় সম্মত না হইতে ক্রমাগত প্ররোচনা দেওয়া হইয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের আচরণে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, তাহারা যতটা না অভিযোগ প্রতিকার বা সমাধানের জন্য ব্যস্ত তাহার চাইতে শিল্পক্ষেত্রে একটা বিশৃঙ্খলা ও স্থগিতাবস্থা সৃষ্টি করার জন্য বেশি ব্যগ্র। এইভাবে প্রকৃত অভিযোগ আছে এমন শ্রমিক মহলেরও একাংশ বিভ্রান্ত এবং বেআইনী ও হিংসাত্মক পথে পরিচালিত হইয়াছে; সাধারণ অবস্থায় তাহারা এরূপ পন্থাবলম্বনের কথা মনেও স্থান দিত না। গভর্নমেন্টের পক্ষে যতটা সম্ভব বাঁধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলিকাতায় উক্ত পার্টির ক্রিয়াকলাপ এইভাবে প্রকাশ পাইতেছিল : তাহারা প্রতিদিন লাউড স্পীকার সহ শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে করিতে সরকারি দপ্তরখানার সম্মুখে জমায়েত হইত এবং ঘন্টার পর ঘন্টা সেখানে অবস্থান করিয়া কাহারও পক্ষে কাজ করা অথবা দপ্তরখানায় যাওয়া আসা অসম্ভব করিয়া তুলিত।

"ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতায় সম্প্রতি যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহা পরিষদ সদস্যদের স্মরণ থাকিতে পারে। এই সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত হয় তাহা কার্যত সকল ক্ষেত্রে দেশের কংগ্রেস গভর্নমেন্টসমূহের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত। উহার একটি প্রস্তাব তো অশুভ ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে জনসাধারণকে অস্ত্র সরবরাহ ও গণবাহিনী গঠনের কথা বলা হইয়াছে। গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যেই খবর পাইতেছিলেন যে, এই পার্টির সদস্যগণ অর্থ ও বে-আইনি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে এবং রেড গার্ড নামে অভিহিত পার্টির স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানকে অস্ত্র ব্যবহারে শিক্ষা দিতেছে। গভর্নমেন্টের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, পার্টি অবিলম্বে সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিয়া জননিরাপত্তা ও কল্যাণ বিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল।

"পরিষদ সদস্যগণ সম্ভবত জ্ঞাত আছেন যে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সম্প্রতি তাহাদের হেড অফিস মুম্বাই হইতে কলকাতায় আনার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। অর্থাৎ বাঙলাকে তাহারা তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রথম ক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইয়াছিল। দলটি বে-আইনি করিবার পূর্বেই উহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের আশঙ্কায় দলের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নেতা অন্তরালে থাকিয়া আন্দোলন চালাইবার জন্য আত্মগোপন করেন।

"আমি যাহা বলিলাম তাহা হইতে পরিষদ সদস্যগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমান গভর্নমেন্টের উৎসাদন ও তাহাদের ক্ষমতা হরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ফাঁদিতে ও দলকে সুসংহত করিবার অবসর দিলে গভর্নমেন্টের পক্ষে মূর্খতা ও বিপজ্জনক হইত। এই কারণেই গভর্নমেন্ট স্থির করেন যে, ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় হইয়াছে। আমি পরিষদকে এই ভরসা দিতে পারি যে, গভর্নমেন্টের কাহারও অভিমত ও মতবাদ প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা হরণের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নাই, ন্যায়সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন ক্রিয়াকলাপ নিবারণেরও বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। একথা বলা বাহুল্য যে, বিরোধী দল নিশ্চিহ্ন

করার উদ্দেশ্যেও গভর্নমেন্ট এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কথা উঠিয়াছে যে, ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পরিপুষ্টির সহায়তায়ই কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি করা হইয়াছে। ইহা একেবারে অসত্য। গভর্নমেন্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। পরিষদের জ্ঞাতার্থে আমি উল্লেখ করিতে পারি যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট যখন আমাদের নিকট এই অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন অফিসের সম্মুখে পুলিশ প্রহরী মোতায়েন থাকায় প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সেখানে যাইতে পারিতেছে না, আমরা তৎক্ষণাৎ সেখানকার প্রহরী সরাইয়া লই। একথা বলা দরকার যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অফিস ও ২৪ পরগনা কমিউনিস্ট পার্টির অফিস একই বাড়ীতে অবস্থিত। যে বাড়ীতে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস সেই বাড়ীতে বিপিটিইউসি অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ইউনিয়নেরও অফিস। প্রকৃত কোন ট্রেড ইউনিয়নের যদি কোনরূপ অসুবিধা দেখা দেয়, তবে বিধিমত আমাদের জানাইলে আমরা যতটা সম্ভব সেই অসুবিধা দূরীকরণে প্রস্তুত আছি।

"গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে আমি এইকথা বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিতে চাই যে, আমরা অত্যন্ত দুঃখের এবং অনিচ্ছার সঙ্গে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি। কোন জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্টের পক্ষে এইসব অসাধারণ ক্ষমতার প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে একটা আসন্ন বিপদ নিবারণের জন্যই এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন। কেন না, এই বিপদ অত্যন্ত দ্রুত প্রসারলাভ করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছিল। জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য গভর্নমেন্টের, সেই গভর্নমেন্ট যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের কর্তব্যচ্যুতি হয় এবং তাঁহাদের শাসনভার ত্যাগ করা উচিত।

"আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য গভর্নমেন্ট দুঃখিত। এই সম্পর্কে সমগ্র প্রদেশে এ পর্যন্ত ১৯৫ জনকে আটক রাখা হইয়াছে। আমি পরিষদকে এই ভরসা দিতে পারি যে, আমরা যেদিন বুঝিব, কমিউনিস্ট পার্টি নিয়মানুগ পদ্ধতিতে কাজ করিতে প্রস্তুত সে দিনই আমরা অকুণ্ঠচিত্তে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিব ও ধৃত ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দিব। কমিউনিস্ট পার্টির যদি শাসনভার গ্রহণের ইচ্ছা থাকে, তবে সাধারণ নির্বাচনে অধিকাংশ ভোটদাতার সমর্থন লাভের গণতান্ত্রিক পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত আছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এইসব পথ পরিহার করিয়া তাহারা হিংসাত্মক প্রণালীর অনুসরণ করিতেছে ততদিন প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে গভর্নমেন্টের পক্ষে কর্তব্যচ্যুতি হইবে।"

প্রাপ্তিস্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ মার্চ ১৯৪৮।

টিকা : ১। কিছু কিছু স্থানে বানানের সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক।
২। স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়।

April 29. 1918
Part I. Page 503 - 505

The Calcutta Gazette

(Annexures of unlawful Association – সম্পাদক)

No. 2383P - 24th April, 1948 -

Whereas in exercise of the power conferred by the sub-section (1) of Section 16 of the Indian Criminal Law Ammendment Act, 1908 (XIV of 1908), the Provincial Government has, by Notification No. 1759 P, dated the 25th March, 1948, has declared the Communist Party of India and its Committees, Sub-Committees, Branches and Communes and also its Volunteer Organisations, including the Red Guards, to be unlawful association;

And whereas the places specified and described in the schedule hereto annexed are in the opinion of the Provincial Government used for the purposes of the said unlawful associations;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 17A of the Indian Criminal Law Ammendment Act, 1908 (XIV of 1908), the Governor is pleased hereby to notify the said places.

2. The Notification shall be deemed to have effect and to have always had effect as if it had been issued on the 26th March, 1948.

SCHEDULE

The room used as the office of the Communist Party of India, in the one-storied pucca house belonging to Sri Ram Bilas Chatterjee of Sontatorpara, Suri, Birbhum district.

2. The first floor of the two-storied tin-roofed mud house belonging to Rajat Bhusan Dutta of Muchipara, Ahmadpur, Birbhum District.

3. The house of Late Shyama Sundari Dasi, sister of Late K M. Saha at Popham St., Serampore, Hooghly District.

4. The house in Pratappur, Chinsurah, Hooghly District.

East - Banku Behari Kundu's Pucca house.

West - Pratappur Municipal Bye Lane.

North - Pratappur Municipality.

South - Adish Ghosh's Pucca house.

5. The house at Babughat, Uttarpara, Hooghly District, bounded as follows :

North - Babughat Rd. and Uttarpara water works.

East - Babughat

South - The house of Kumar Bhupendra Nath Banerjee.

West - The house of Sailendra Nath Halder.

6. The house at Ferryghat Street, Telinipara, Bhadreswar, Hooghly District, bounded as follows :

North - Ferryghat St.

East - House of Ram Khelawan.

West - House of Ram Khelawan now occupied by Razzak Mia of Ferryghat St.

7. The house in Jalpaiguri Town, Jalpaiguri District, bounded as follows:

North - House of Ramananda Daga.

South - House of Late Abdul Sattar and Students Federation.

East - Ukilpara Rd.

West - House of Sersera Rd.

8. The upper flat of the two-storied building of Uttam Chand Saha, being Holding No.12, Ward No.111 at Golapatti Lane, English Bazar Town. Malda District. The boundaries of the building are :

East - House of Uttam Chand Saha and that of Monomohan Saha.

North - House of Uttam Chand Saha (Holding No.148)

West - Golapatti Lane.

South - House of Uttam Chand (Holding No.13).

9. The three rooms, accommodating the District Communist Party and Commune and its library known and "Sahitya Jagat", in the buildings (Holding No.l67, Ward No.IlI) in Barabazar, Midnapur Town, owned by Mrs. Jogmaya Addy, wife of Gour Chand Addy of Barabazar, Midnapur. The boundaries of the premises are :

North - Municipal drain and the house of Surendra Nath Rana.

East - Kacharibari of Mahesh Chandra Ghose, Pleader, Manikpore, Midnapur Town.

South - A room of the aforesaid holding occupied by, Safiullah Khalifa and the house of Santosh Chandra Pyne.

West - Barabazar Main Rd.

10. The three rooms, accommodating the District Party and Commune, in the first floor of a building (Holding no.161) at Aliganj, Midnapur town, owned by Manmatha Nath Saha of Mirza Bazar, Midnapur. The boundaries of the building are :

North - Aliganj Rd.

East - Aliganj Lane.

South - House of Ram Dulari.

West - House of Basanti Dasi.

11. Communist Party of India office room in the Pucca building (Plot No. 1026, Khatian No. 697, Tanzi No. 2723, Mauza Kharagpur Khas Jungle, Mahal Mathurakiti Khas Jungle, Khas Mahal land on permanent lease), owned by Bihari Lal Arya Benbansi, of Golebazar, Kharagpur, Midnapur District, and bounded as follows :

North - New Malancha Rd.

East & West - Three units of the aforesaid block.

South - House of Bihari Lal Arya Benbansi of Golebazar.

12. Communist Party of India office rooms, being the western room of the thatched house with mud wall, owned by Monmatha Nath Purkait, at Diamond Harbour in the district of 24 Parganas, and bounded as follows ;-

North - House of Jatindra Nath Deb and Ajit Purakait. West - Tank of Monmatha Nath Purkait. South - House occupied by Bankim Behari Bose. East - House of Manmotha Nath Mitra.

13. Communist Party of India office room on the first floor of the house on the Garden Reach Rd. Police Station Metiaburuz, 24 Parganas District, owned by Basudeb Das and bounded as follows :

North - Garden Reach Rd.

East - Mazibur Rahaman's house.

South - House of Wachel Molla.

West - Coolie Bustee of Abul Khoirjee.

14. Communist Party of India office in the first floor of the building at Gouripore, Naihati, 24 Parganas District, owned by Gopal Singh of Gouripore and bounded as follows :

North - Gola Fatak Rd.

South - The building of Ramji Bosha.

East - Gola Fatak Bustee.

West - G.P. Road.

15. Communist Party of India office room in the house of Belgharia, Police Station Baranagar, 24 Parganas District, owned by Bibhuti Bhusan Chatterjee of Belgharia and bounded as follows :

North - House of Nirapada De.

East - A small pool with the house of Haridas Dutta further east.

South - Thakurudin Banerjee Rd.

West - Kalipada Ghosal St.

16. Communist Party of India office, being the thatched house situated by the side of Basirhat Kacharipara Rd., at Basirhat in the District of 24 Parganas, owned by Shri Niranjan Nath of Basirhat Town and bounded as follows :

North - River Ichamati.

South, East & West - Land of the owner of the aforesaid house.

17. Communist Party of India office room, being the room on the eastern side of the first floor of a building known as "Kabuli Kuthir" on the A.P. Devi Rd., Titagarh, 24 Parganas District, which is bounded as follows :

North - A.P. Devi Rd.

East, West & South - Bustees of Mahendra Babu's Cooli Line.

18. Communist Party of India office room, being the room in the upper storey of a house at South Jhapardah, Police Station Domjur, Howrah District, owned by Nirmala Bala Dasi alias Gandhabala Dasi, widow of Late Satya Charan Dutta and bounded as follows :

North - D.B. Rd.

South - Open land of Jogendra Nath Dutta and Gourhari Parui.

West - Sweet meat shop of Amrit Modak.

19. The three-storied house, being Premises No. 2, Iswar Dutta Lane, Howrah, belonging to Sailapada Chatterjee. The boundaries are :

North - House of Late Bistupada Mukherjee

South - House of Late Atul Chandra Ghose

East - Iswar Dutta Lane

West - House of Sibukedar Addya.
20. Communist Party of India office room, being the room in the north-east of the first floor of the building situated on Sir B.C. Rd., Burabazar, Burdwan, belonging to Sri Baidyanath Dutta and bounded as follows :
North - Sir B.C. Rd.
South & West - House of Sri Anil Mitra.
East - House of Janab Baru Miyan
21. Communist Party of India office rooms, being the room in a house known as Kamala Bhawan, at Asansol in Burdwan District, the boundaries of the room, being :
North - Lylton Rd.
East - A room occupid by Fateh Chand Marwari
West - A room occupied by Kisan Lal.
South - A room occupied by Dinabandhu Basu
22. The house at Paharipur, Burdwan District, belonging to Khuruddin, son of Mati Shaik, and bounded as follows :
North - Paharipur Saddar Rd.
East - Fakir Bera Dangal
West - A vallage path and the house of Lakhu Muchi
South - House of Rahamat Lal Chamar
23. Communist Party of India office room, being the room in the out house of the building occupied by Sri Tincouri Chatterjee at Bara Kalitala in Bankura Town, and bounded as follows :
North - House of Sri Gobinda Chandra Roy, Pleader
East - Rampur Rd.
South - The house of Bankim Chandra Nandy
West - The house of Gokul Mitra
24. Communist Party of India office room, being the room on the ground floor of the house in Gardaraja Mohalla, Vishnupur, Bankura District, beraring Municipal Holding No.1010 and belonging to Sri Gokul Chandra Nag. The boundaries of the room are :
North - A room of the aforesaid house.
East - House of Shibdas Kar. South - Vishnupur - Kotalpur Road.
West - A room of the aforesaid house now used as a stall for controlled foodstuff of Mrinmoyee Stores.

No.2384 P - 24th April, 1948

Whereas in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Indian Criminal Law Amendement Act, 1908 (XIV of 1908), the Provincial Government has, by Notification No.1759P, dated the 25th March, 1948 declared the Communist Party of India and its Committees, Branches and Communes and also its Volunteer Organisations, including the Red Guards, to be unlawful Associations;

And, whereas, the places specified and described in the schedule hereto annexed are in the opinion of the Provincial Government used for the purposes of the said unlawful associations;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section

(1) of Section 17A of the Indian Criminal Law Amendment Act,1908 (XIV of 1908), the Governor is hereby pleased to notify the said places.

2. This notification shall be deemed to have effect and to have always had effect as if it had been issued on the 27th March, 1948.

SCHEDULE

1. Room No.37 on the first floor of Municipal "D" Building situated at Chawkbazar, Darjeeling. The boundaries of the rooms being :

North - Room No. 38 on the first floor of the aforesaid building occupied by Sital Bhojwala

South - Room No.36 on the first floor of the aforesaid building occupied by Chandrika Prasad.

East - The boundary wall of the room concerned

West - The common passage on the first floor of the building facing the Market Square.

2. Communist Party of India office, being the three rooms on the first floor of Anand Bhawan on the New Market Rd. (being Holding No.138) of Kalimpong Town, Darjeeling District, belonging to Sri Ram Krishna Ram. The boundaries of the office are :

North - A room occupied by Bagoli Ram

South - A room occupied by Chinese named Yata

East - The common passage on the first floor of the building facing the New Market Rd.

West - The boundary wall of the room concerned

3. The North-West room of the barrack on the Hill Cart Rd., Siliguri, Darjeeling District, belonging to Sri Gangaprasad Choudhury of Siliguri Town. The boundaries of the barrack are :

North - Gurudwar, Siliguri Town

South - Office of the Siliguri Mazdoor Union and the dispensary of Dr. R.N. Roy

East - The house of Sri Ganga Prasad Choudhury of Siliguri Town.

West - The Darjeeling Himalyan Railways lines and the Hill Cart Rd.

4. Communist Party of India office, being the eastern portion of the north-facing building of Sri Kali Narayan Ray of Berhampore town, Murshidabad District. bounded as follows :

North - The Berhampore Electric Power House

East - The "Poor Pharmacy"

South - Bhairabtalaghat Rd, and the house of Ananda Chakraborty

West - Mahabir Mandtr (Shib Temple)

5. The two-storied building situated on the north side of Mohitosh Biswas Rd., Krishnanagar, Nadia District, owned by Ram Gopal Bhaduri of Matpur, P.S. Chapra, District Nadia and bounded as follows :

South - Mahitosh Biswas Rd. North - Mess of Kalyani Boarding

East - Shib Mitra's house

(Prop. of Saraswati Press, Krishnanagar)

West - House of Haripada Mukherjee, Pleader, Krishnanagar

6. Communist Party of India office rooms, being the rooms on the top floor of the building belonging to Lakshmandas Kausari at Paramatala. Nabadwip Town, Nadia District, and bounded as follows :

North - Bazar Rd. and Paramatala

South & East - House of Sri Rebati Mohan Goswami, Retired Judge

West - House of Bir Chand Das

7. The first floor of the building situated on the southern side of Barabazar Rd., Santipur, Nadia District owned by Sri Jatin Lahiri of Santipur Town, and bounded as follows :

South - Open field of Jatin Lahiri

North - Barabazar Rd.

East - Tea Stall of Tarak Dutta

West - Shop of Jnan Mukherjee of Shyama Chand Para

8. The thatched house at Hili, West Dinajpur District belonging to Sri Aswini Kr. Saha, and bounded as follows :

North - House of Aswini Kr. Saha

South - Garden of Aswini Babu

East - Road (D.B)

West - Flower Garden of Aswini Babu and some other houses.

9. Communist Party of India office, being the room in the western corner of the outhouse of Sri Provash Chandra Neogi at Muktarpara, Balurghat Town. West Dinajpur District The boundaries of the office are:

North - House of Sri Provash Ch. Neogi

West and South - A Public Rd.

East - A portion of the outhouse of Shri Provash Chandra Neogi

By order of the Governor
R. GUPTA
Secy. to the Govt. of W.B.

প্রাপ্তিস্বীকার : এই দলিলটি দিলীপ কুমার ব্যানার্জির ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

সহায়ক তথ্য - ১১

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়

কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা

'সময়োচিত ব্যবস্থা'

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই সংবাদে দেশের জনসাধারণ বিস্মিত না হইলেও জিজ্ঞাসা করিবে, ইহা আরও পূর্বে করা হয় নাই কেন? আমরাও লক্ষ্য করিয়াছি, গভর্নমেন্ট এযাবৎ কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে অতিরিক্ত উদাসীনতার নীতি গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। দেশের জনসাধারণের জীবনকে শতভাবে বিড়ম্বিত ও উপদ্রুত করিবার জন্য যে কোন হীন ও কুটিল পন্থা অবলম্বন করিতে উক্ত পার্টি তিলমাত্র সংকোচ অনুভব করে নাই। ১৯৪১ সাল হইতে দেশের জাতীয় শক্তি, সংহতি ও শান্তিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সর্বপ্রকার উদ্যম করিয়া আসিতেছে। জনসাধারণ ইতিপূর্বে ইহাদিগের আচরণে বহুবার ধৈর্য হারাইবার উপক্রম করিয়াও নিজেকে সংযত করিয়াছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ দিন দিন এমন গর্হিত হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহা জনসাধারণের পক্ষে নিঃশব্দে সহ্য করা খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাই হউক, জনসাধারণের এই মনোভাবের প্রতি মর্যাদা দিয়া পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট যে শেষ পর্যন্ত কর্তব্যবোধের প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন, তাহাই সুখের বিষয়। একটি রাজনৈতিক দল, যাহার প্রত্যেকটি কর্মপন্থা সমাজ-বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থের বিরোধী, অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি যাহার প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য, তাহাকে বে-আইনি ঘোষণা করিয়া গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ সঙ্গত কাজই করিয়াছেন।

... বর্তমান জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা হইল ব্যাপক ও বহুল সম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস। জাতির কল্যাণের প্রতি তিলমাত্র যাহার দরদ আছে, তাহার কাছে ইহাই বর্তমানের প্রাথমিক আদর্শ ও কর্তব্য। ঠিক ইহার বিপরীত হইল কমিউনিস্ট পার্টি নামে পরিচিত রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থা। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে, জনসাধারণের অভাব ও দৈন্য লাঘবের প্রচেষ্টা সার্থক হইলে জাতীয় গভর্নমেন্টের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে! সুতরাং মুষ্টিমেয় কমিউনিস্টের রাজা হইবার সখও ব্যাহত হইবে। অতএব, দেশের অভাব, দৈন্য ও অশান্তিকে স্থায়ী করিয়া কংগ্রেস ও কংগ্রেস গভর্নমেন্টের প্রতি জনসাধারণকে বিরূপ করিয়া তুলিবার প্রকাশ্য ও গোপন পথ কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করিয়াছে। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও সরকারি কর্মচারী, প্রত্যেকের মনে হিংসা বিদ্বেষ ও লোভের ভাব জাগ্রত করিয়া, কমিউনিস্ট পার্টি জাতির নৈতিক সত্তাটিকেও কলঙ্কিত করিবার সব রকম প্রয়াস করিয়াছে। অথচ, জাতির জীবনে সেবা ও শ্রদ্ধা দিয়া ইহারা আজ পর্যন্ত কোথাও কোন কল্যাণ সংগঠন করিতে পারে নাই। যোগ্যতা ও কৃতিত্বের এই শূন্য ইতিহাস

লইয়াই কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইবার জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই লোভ তাহাদিগকে শেষ পর্যন্ত চক্রান্তের পথে লইয়া গিয়াছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট ইহাদের সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা মাত্র। কমিউনিস্ট পার্টি তাহাদের কর্মপন্থা সংশোধন করিবার জন্য বহু সময় ও সুযোগ পাইয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল যে, তাহারা এই সময় ও সুযোগের বরং অপব্যবহার করিয়াছে, কিছুতেই জাতির বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি দায়িত্বপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন করিল না।

কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বাঙলা গভর্নমেন্টের যে বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত পার্টি বস্তুত রাষ্ট্রদ্রোহের উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছে। নাগরিক জীবনের স্বাভাবিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা, পণ্য উৎপাদন ব্যাহত করা, সরকারি কর্মচারীদিগকে কর্তব্য পালনে বাধা দেওয়া এবং কৃষকদিগের মধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহী ক্রিয়াকলাপ প্ররোচিত করা— ইহাই হইল কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বর্তমান অভিযোগ। দেখা যাইতেছে যে, কমিউনিস্ট পার্টির অতীত কুকীর্তিগুলির জন্য গভর্নমেন্ট উক্ত পার্টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই, মাত্র বর্তমান অভিযোগগুলিকেই বিবেচনা করা হইয়াছে। নিকট-অতীতেও কমিউনিস্ট পার্টি যে ব্যাপক প্রচারকার্য দ্বারা রাষ্ট্রাদ্রোহিতার প্ররোচনা দিয়াছিল, তাহাও গভর্নমেন্ট সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর হইতে প্রকাশ্য এবং প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট পার্টি যে সকল জনস্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কোন দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নহে। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর, দেশব্যাপী হিংসার প্ররোচনা দিয়া অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস এই পার্টি করিয়াছে। সর্বশেষে পার্টির সাধারণ অধিবেশনে প্রকাশ্যভাবেই যে সকল প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহা বস্তুত বর্তমান জাতীয় গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষেরই আবেদন।

এক্ষেত্রে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতি দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুত গভর্নমেন্ট যাহা করিতে পারেন, তাহাই করিয়াছেন। আমাদের মতে, গভর্নমেন্টের পক্ষে প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থা বহু পূর্বেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। যাহাই হউক, আমরা চাহি গভর্নমেন্ট অতঃপর তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সম্বন্ধে অধিকতর তৎপর ও সচেতন থাকিবেন। গভর্নমেন্ট কোন বিষয়ে মাত্রাধিক কঠোরতার নীতি গ্রহণ করিবেন, ইহা আমরা যেমন চাহি না, তেমনই জনসাধারণের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির বিঘ্ন দমনে গভর্নমেন্ট তিলমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করিবেন, ইহাও আমরা চাহি না।

বাঙলা গভর্নমেন্টের বিজ্ঞপ্তিতে একটি আবেদন আছে, তৎপ্রতি আমরা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি : "কমিউনিস্ট পার্টি দেশের পক্ষে যেরূপ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ তাহা কখনই উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না।"

ইহা দেশের জনসাধারণের প্রতি সময়োচিত কর্তব্যের আহ্বান। কমিউনিস্ট পার্টি দেশের জনসাধারণের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচার করিয়া দেশের ইষ্টনাশের উদ্যোগ করিয়াছে। এক্ষেত্রে বাঙলার কংগ্রেসের কর্তব্য আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি। জনসাধারণের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া যাহার সম্মান রহিয়াছে, তাহা জনসাধারণের মধ্যে শান্তি, কল্যাণবোধ ও জাতীয় আদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হইবে ইহা আমাদের আবেদন।

প্রাপ্তি স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯-০৩-৪৮

জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য

তাঁকে না জানিয়েই বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি করা হয়েছিল

...The West Bengal Government, as you know, has banned the Communist Party. This was done without any reference to us. Normally this procedure is undesirable because any such action leads to repercussions and is therefore to be considered in its larger context. The Government of India later suggested to provincial governments that any member of the Communist Party suspected of organising trouble, more specially in the security services, might be arrested and detained. There was no intention of banning the Communist Party or indeed of large-scale arrests. I hope your government would bear this in mind and only detain such persons against whom you have some proof that they are indulging in dangerous activities.

তথ্যসূত্র : Jawaharlal Nehru— Letters to Chief Ministers, 1947-1964, 1 April 1948

টিকা : পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি করা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ। (- সম্পাদক)

ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির
১৮ই মে তারিখের বিবৃতি

সারা ভারতের বিশেষ করিয়া পশ্চিমবাংলার ব্যক্তি স্বাধীনতা আজ বিপন্ন! সিকিউরিটি বিল পাস করিয়া সরকারের হাতে যে সকল বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রলোভন জয় করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এ বিল পাশের সময় বর্তমান স্বরাষ্ট্রসচিব (তিনি তখন মন্ত্রী ছিলেন না) বলিয়াছিলেন যে অনেক সময় যাঁহারা মন্ত্রীত্বের গদীতে থাকেন তাঁহারা নিজের স্থায়িত্ব ও দেশের নিরাপত্তা এই দুইটি এক, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিবর্তনের সঙ্গে এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইয়াছে, এমন মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই বিশেষ ক্ষমতার অপব্যবহার দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে মারাত্মক। যে দল যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয় সে দল যদি বিনা বিচারে অন্যান্য দলের কর্মীদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখার ক্ষমতা পায় ও সেই ক্ষমতা প্রায়শই প্রয়োগ করে তবে সব রাষ্ট্র দলের মনে এই ধারণাই দৃঢ়বদ্ধ হয় সে বল প্রয়োগ ছাড়া কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্তন ঘটান অসম্ভব। এই ধারণার ফল দেশের পক্ষে কি রকম নিদারুণ হয় পৃথিবীর অনেক দেশের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত ছড়ান আছে। জনসাধারণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই সব বিশেষ আইন ও তার প্রয়োগের উপর সর্বদা নিবদ্ধ না থাকিলে এদের অপব্যবহার বন্ধ করা অসম্ভব।

প্রেস সম্পর্কিত সাধারণ আইনের রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া বাংলা সরকার "স্বাধীনতা" পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, ও "গণশক্তি প্রেসে" তালাচাবি লাগাইয়াছেন। কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এই হেতুবাদে রাজনৈতিক দলটি বে-আইনি ঘোষিত হইয়াছে ও বহুশত নাগরিককে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অথচ পুলিশ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে কমিউনিস্ট পার্টির লোকজনের কাহারও কাছে একটুকরা ভাঙা বন্দুকও পাওয়া যায় নাই। "স্বাধীনতা" পত্রিকা স্তম্ভেও সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান কোথাও দেখা যায় নাই। এইসব ঘটনার পর দুইমাস চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু বিনা প্রমাণে এই সকল দমন মূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রহিয়াছে। এই ধরপাকড়ের হিড়িকে কৃষকসভা, ছাত্র-ফেডারেশন ও অনেক ট্রেড ইউনিয়নের অফিসও সরকারী তরফ হইতে তালাবন্ধ করা হয়। অথচ এই সকল প্রতিষ্ঠান দলবিশেষের নহে, তাহা সকলেরই জ্ঞাত। কতক কতক অফিস খুলিয়া দিলেও কৃষকসভার অফিস এখনও তালাবন্ধ, বাংলা সরকারের এ সম্বন্ধে নিজের কার্য্যাবলীর বিশেষ বিচার করিয়া দেখার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, বন্দীদের সম্পর্কে সরকারি ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে অমার্জনীয় বলিয়া মনে হয়। বাংলার বাহিরে দুইজন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে (শ্রীযুক্ত ভরদ্বাজ ও শ্রীযুক্ত কুলকর্ণি) গ্রেপ্তার করা হয় ও তাঁহারা কয়েক দিনের মধ্যে বন্দী অবস্থায় মারা যান, একথা সকলেই জানেন। বাংলাদেশেও শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি অসুস্থ লোককে রোগশয্যা হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং মফস্বল জেলে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। দেশবন্ধু, নেতাজী, দেশপ্রিয় প্রভৃতির বিপুল চেষ্টা, ও নিগ্রহভোগ করিয়াও সংগ্রামের ফলে রাজনৈতিক বন্দীদের যে সকল অধিকার পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বর্তমান সরকার অগ্রাহ্য করিতেছেন। অন্য একটি রাজনৈতিক দলের শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি (যখন কিছুদিন পূর্বে গ্রেপ্তার হন) ও বর্তমানে কমিউনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য দলের বন্দিদের প্রতি ব্যবহার হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয়। এই সব বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে জনসাধারণের সজাগতা সবচেয়ে প্রয়োজন। এই সরকারের অবশ্য কর্তব্য জনসাধারণকে এই বন্দীদের প্রতি, ব্যবস্থা সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ দেওয়া এবং সেই বিবরণ যাচাই করিবার সুবিধা দেওয়া।

আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটির তরফ হইতে এই সকল দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। স্বরাষ্ট্র সচিব কমিউনিস্ট পার্টি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা সত্য হইলে সাধারণ আইনে আদালতে বিচার করা চলে। আমরা দাবি করি যে এখনই এই বিষয়ে তাঁহাদের যে তথ্য আছে, সরকার তাহা আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করুন ও দমনমূলক অপর সমস্ত ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দিন। যাঁহারা বিচারাধীন অবস্থায় থাকিবেন, তাঁহাদের সেই হিসাবে পূর্ণ নাগরিক অধিকার দেওয়া হউক। "স্বাধীনতা" পত্রিকা সম্বন্ধে আমাদের দাবি যে পত্রিকা ও প্রেস এখনই পুলিশের কবলমুক্ত করিয়া দেওয়া হউক। যে সকল বন্দী বিশেষ অসুস্থ (যেমন শ্রীপাঁচু গোপাল ভাদুড়ী— ইনি মুমূর্ষ অবস্থায় জেলে বন্দী) তাঁহাদের এখনই মুক্তি দেওয়া হউক।

প্রাপ্তিস্বীকার : 'ব্যক্তি স্বাধীনতা কোথায়'? এটি ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। পৃ. ৩।

ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সমিতির সভাপতির বিবৃতি

এ বিষয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতির বিবৃতি ("পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা" ৬ই জুন)
'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা' সম্পাদক মহাশয়েষু—
মহাশয়,
আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা সমিতির পক্ষ হইতে কিছুদিন পূর্বে আমাদের শাসকগণ কর্তৃক বিনাবিচারে লোকজন গ্রেপ্তার করিয়া রাখা ও সংবাদপত্র বন্ধের প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম। সম্প্রতি কয়েকদিন কলিকাতার বিভিন্ন অংশে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধেও আমরা দুই একটি বিবৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি।

কমিউনিস্ট দলভুক্ত বলিয়া যাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টার কোনও প্রমাণ স্বরাষ্ট্রসচিব দেশের লোকের বা আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই। আজ পর্যন্ত শত শত গৃহ তল্লাশী করিয়াও তাহাদের কাছে কোনও বন্দুক, পিস্তল বা কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে এ কথা পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলিতে পারে নাই। বরং তাহার বিপরীতই বলিয়াছেন; এবং যে ধরনের লোকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ তাহারা যে ইহাদের সহিত সংশ্রবহীন তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। কলিকাতায় গত কয়েক মাসে আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া যেরূপ খুন, জখম, ও ডাকাতি হইয়াছে, তাহার পরও এইরূপ কাজ যাহারা করে বলিয়া সন্দেহ করা হয়, তাহাদের সম্বন্ধে সরকারি ঢিলাভাব দেখিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের বিপদ আপদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নহেন।

খাদ্য সংকট, বস্ত্রসংকট ও আবাসের অভাবের জন্য দেশের লোক নিরতিশয় অসন্তুষ্ট। গত নয় মাসে জীবন যাত্রা নির্বাহের খরচ শতকরা ২৮০ হইতে ৩৫০ অর্থাৎ ৭০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মূল্য বৃদ্ধির জন্য সরকারী নীতি, ও কর্মপদ্ধতি বা অকর্ম্মণ্যতা যে বহু পরিমাণে দায়ি (যথা কাপড় ও চিনির ব্যাপার, এবং বিভিন্ন গুদাম মাল পচানো) এ ধারণা লোকে ভুলিতে পারিতেছে না। খাওয়া-পরা জুটিতেছে না, তাহার উপর মাথা গুজিবার ঠাঁই অনেক সময় কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। কলিকাতার বহু অংশে বস্তীতে যে সকল গরীব ও গৃহস্থগণ অনেককাল ধরিয়া বাস করিতেছেন, তাহাদের উচ্ছেদ করিয়া ঐ সকল জমির মালিকগণ তাড়াইয়া দিতেছেন ও এবিষয়ে লোকে আপত্তি করিলে নানাপ্রকারে ইহাদের উদ্বাস্তুতে পরিণত করিতেছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকমাস পূর্বে দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীভূপেন মজুমদার কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন; আমরাও মহল্লা কমিটির তরফ হইতে সরকারি মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় চাউলের মহাজন ও ব্যাপারীদের

"আইন সঙ্গত অধিকার" সরকারি সমর্থনে অক্ষুণ্ণ ছিল, ও ফলে বহু লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়া গিয়াছিল। বর্তমানেও যখন পূর্ব বঙ্গ হইতে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু আসায় আবাস স্থানের অনুরূপ অভাব ঘটিয়াছে, তখনও প্রতাপশালী জমির মালিকগণের "আইন সঙ্গত অধিকার" সরকারি সমর্থনে অক্ষুণ্ণ রাখায় বহু লক্ষ লোক কোনও রূপে যেখানে পারে মাথা গুজিয়া এই শহরে বাস করিতেছে ও তাহার ফলে শহরের মৃত্যুহার তীব্র ভাবে বাড়াইয়া দিতেছে।

লোকের মনে এই সকল বিক্ষোভ স্বভাবত প্রতিবাদ সভা, ধর্মঘট প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে। সশস্ত্র বিপ্লবের ধূয়া তুলিয়া সমস্ত আন্দোলন ও সমালোচনা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা কূট রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক হইলেও তাহাতে খাদ্য, বস্ত্র, আবাসস্থানের অভাব বা তৎপ্রসূত বিক্ষোভ মিটিবে না। দেশের লোক, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব সমর্থন করে না ও করিবে না। কিন্তু এই অজুহাতে তাহাদের ক্ষুধা ও অভাবের প্রতিকারের চেষ্টা বন্ধ করার প্রয়াসও তাহারা সমর্থন করে না এ বিষয়ে পথে, ক্লাবে, ট্রামে, বাসে, লোকে যে টীকাটিপ্পনী করে তাহা শুনিলেই এই ধারণা যে প্রামাণ্য তাহা বুঝা যাইবে।

স্বরাষ্ট্রসচিব মহাশয় ২৬শে মে তারিখে পঞ্চাশ জন মহিলার একটি ক্ষুদ্র প্রতিবাদ আন্দোলনকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সংগঠিত কার্যকলাপ বলিয়া জানাইয়াছেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় সাড়ে ৬টার সময়, রাইটার্স বিল্ডিং-এর সম্মুখে গোলমালের খবর পাইয়া আমি ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির পক্ষ হইতে কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি হলের একটি সভা হইতে যাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই; এবং মহিলাদেব নিকট এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের ঐ স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করি। সেখানে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারিগণও উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া আন্দোলনকারীদের সশস্ত্র বিপ্লবের কোনও প্রমাণ পাই নাই। মহিলারা কারারুদ্ধ রাজবন্দীদের সম্পর্কে দাবিদাওয়া জানাইবার জন্য স্বরাষ্ট্রসচিবের সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন। অল্প কয়েকজন প্রতিনিধির সহিতও মন্ত্রী মহাশয় দেখা করিতে রাজী হন নাই। তাঁহারা এ বিষয়ে অহিংস ভাবে জিদ্ করায় জোর করিয়া তাঁহাদের সরাইয়া দিবার চেষ্টা হয়। মহিলারা বলেন যে কুখ্যাত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্ট দিয়া ইহাদের জোর করিয়া হটাইয়া দেবার ব্যবস্থা হয়। পুলিশ কর্মচারীদের বলেন যে, মহিলারা তাঁহাদের গালিগালাজ করিয়াছেন; ইহাই কি সশস্ত্র বিপ্লবের নমুনা?

২৭শে মে তারিখে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে ঘটনা ঘটে, সে সম্বন্ধে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে, সভা হইবার পূর্বে কিছুলোক লাঠি সোটা লইয়া সমবেত লোকদের আক্রমণ করে এবং মারধর করে। পুলিশ প্রথমে নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে অপেক্ষা করে ও পরে আক্রান্ত লোকদেরই গ্রেপ্তার করে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বেলেঘাটা অঞ্চলে আমি স্বচক্ষে এইরূপ একটি ঘটনা দেখি এং কর্তৃপক্ষকে জানাই। কিন্তু সেবার এবং বর্তমানে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ব্যাপারেও এই প্রতিবাদে কিছু ফল হয় নাই। এই দুইবারই কর্তৃপক্ষ ইহাকে "জনসাধারণের সহিত সঙ্ঘর্ষ" এই বর্ণনা দিয়াছেন। ২৮শে মে তারিখে আর একটি শোভাযাত্রার উপর বৌবাজার থানার নিকট বোমাবর্ষণ হয় ও "মিছিলে যোগদানকারী কতিপয় ব্যক্তি আহত হন" এই সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ দিন ট্রাম ইউনিয়নের কর্মীদের উপর লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ তাঁহাদের অফিসের কাছে হাত বোমা, ছোরা প্রভৃতি লইয়া আক্রমণ হয়। অন্য ট্রাম কর্মীরা তাহাতে বাধা দিতে যাইলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সংঘর্ষের ফলে লোকজন আহত হওয়ার খবর

কিছু রাত্রে আমাকে আমার বাটীতে টেলিফোনযোগে জানাইলে, আমি এম্বুলেন্স গাড়ী লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই, তখন পুলিশ আসিয়া গিয়াছে ও মারামারি শেষ হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম গ্রেপ্তার হইল ট্রাম কর্মীদেরই জন-পনের লোক, আক্রমণকারীরা ধৃত হইয়াছে এইরূপ কোনও লক্ষণ দেখিলাম না। ক্যাম্বেল হাসপাতালে যাইয়া দেখিলাম একজন ট্রাম কর্মীর মাথা ফাটিয়া গিয়াছে এবং অপর এক ব্যক্তির পায়ে গুলি বা ঐরূপ কিছুর আঘাত লাগিয়াছে। ট্রামের লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া একব্যক্তি বলিলেন যে পুলিশ আক্রমণকারীদের কিছুই বলে নাই। বরং তাহাদের কিছু লোক প্রথম দল পুলিশের সহিত ট্রাম ইউনিয়নের অফিসে ঢুকিয়া কয়েকটি এসিড বাল্ব প্রভৃতি সামনে ফেলিয়া বলে, এই দেখুন ইহারা কি সব রাখিয়াছে। এ বিষয়ে তথ্য নির্দ্ধারণ আমার সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ঐ স্থানে উপস্থিত জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্বীকার করেন যে, ঐ অফিসের বাড়ীতেই সর্বক্ষণ পুলিশ মোতায়েন থাকে। সমস্ত সময় পুলিশ যেখানে বর্তমান, সেখানে নিজেদের বিপন্ন করিবার জন্যই স্বেচ্ছায় ট্রাম কর্মিগণ এসিড বাল্ব রাখিয়া দিবে ইহা বিশ্বাসযোগ্য কি না এবং ইহাদের শত্রুপক্ষ এগুলি ঐ স্থানে রাখিয়া দিতে পারে কিনা এ বিষয় প্রশ্ন করিলে তিনি নিরুত্তর থাকেন।

এই ভাবে সশস্ত্র বাহিরের লোক দ্বারা মারধোর এবং তাহার আক্রান্ত লোকদের গ্রেপ্তার করা পৃথিবীর বর্তমান ইতিহাসে এবং আমাদের দেশেও বিরল নয়। ১৯৩৪ সালে ও তাহার পরে বহুদিন ধরিয়া জার্মানিতে এইভাবে প্রথমে সাম্যবাদীদের, পরে অন্যান্য শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রীদের (সোশ্যালিস্ট) দলন করা হয়।

এই সকল ব্যবস্থা দল বিশেষকে প্রথমে সাফল্য প্রদান করিলেও পরিশেষে সমগ্র দেশকে সর্বনাশের পথেই লইয়া যায়। ভারতের জাতীয় মহাসভা যে আদর্শ দীর্ঘকাল ধরিয়া অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে বর্তমান রাষ্ট্র শাসনে তাহার ব্যত্যয় ঘটিতেছে একথা গভীর খেদের সহিত বলিতে হয়। দেশের লোকের অন্নবস্ত্র, অবস্থান প্রভৃতি সমস্যার সমাধান না করিয়া এই ভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টা করিলে দেশের অমঙ্গলই ঘটিবে। বর্তমান দমন নীতির রূপ দেখিয়া লোকের এইরূপ মনে করিবার সম্ভাবনা আছে, যে বিধিসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা ও ক্ষমতারূঢ় দলের সমালোচনা, এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের গদী হইতে নামাইয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষে দেশের শাসনভার গ্রহণের চেষ্টা করা অসম্ভব। যে অরাজকতা ও বিপ্লবের কথা স্বরাষ্ট্র সচিব বারবার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবলম্বিত রীতিই সেই অরাজকতা সৃষ্টির সবচেয়ে বেশি সহায়তা করিবে।

কংগ্রেসের আদর্শে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাহাদের আমি অনুরোধ করি যে তাঁহারা একযোগে যুক্ত হইয়া ক্ষমতারূঢ় ব্যক্তিগণকে এই ভ্রান্ত পথ হইতে নিবৃত্ত করুন এবং দেশের মঙ্গলের জন্য যে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন সেই পথে লইয়া যাউন। সত্বর এই পরিবর্তন না ঘটিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কবল হইতে অর্দ্ধমুক্ত আমাদের দেশ, দক্ষিণ আমেরিকার তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মত অভাব, অজ্ঞানতা ও অরাজকতার তিমিরে ডুবিয়া যাইবে। — ইতি

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
(ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতি)

প্রাপ্তিস্বীকার : ঐ, পৃ. ২৫-৩০

ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির তদন্তকারী প্রতিনিধিগণের বিবৃতি

হুগলী জেলার বড়া ইউনিয়নে পুলিশ যে চণ্ডনীতি চালাইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে তাহা স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধান করিবার জন্য গত ২১শে জুন (১৯৪৮ —সম্পাদক) আমরা তিনজন ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটির পক্ষ হইতে চক্‌পহলামপুর, কমলাপুর প্রভৃতি গ্রামে গিয়াছিলাম। স্থানীয় বহু কৃষক পুরুষ ও রমণীর সাথে আলাপ করিয়া আমরা বিস্মিত ও আহত মনে ফিরিয়া আসিয়াছি। কংগ্রেসী সরকারের আধিপত্যে একটি বিস্তীর্ণ কৃষক এলাকায় যে এইরূপ পুলিশী জুলুম চলিতে পারে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। গুলি, লাঠি, পাইকারী গ্রেপ্তার, কারফিউ, বিনা পরোয়ানায় তল্লাসী, সম্পত্তি বেদখল ও লুণ্ঠন, কিছুই বাদ যায় নাই। ব্যাপার শুনিয়া মনে হয় যে সরকার বুঝি ব্যাপক গণবিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তাহার সর্বক্ষমতা নিয়োগ করিয়াছে। অথচ সরকারি বিজ্ঞপ্তিই স্পষ্ট বলিতেছে যে সামান্য একটি ডাকাতি মামলার কিছু আসামী গ্রেপ্তার করাই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য।

ঘটনা

শোনা গেল, গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বড়াগ্রামে জমিদারের লোকজন কিছু কৃষক সমিতির কর্মীকে প্রহার করে। সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে কৃষক সমিতির সমর্থকগণ সেখানে আসিয়া জড় হন। তাহাতে জমিদারের লোকেরা তাহাদের একটি বাড়ীতে আশ্রয় লয় ও ছাদের উপর হইতে ইটপাটকেল ছুঁড়িয়ে থাকে। গণ্ডগোল কিছুক্ষণ চলিবার পর কৃষকগণ স্থান পরিত্যাগ করিলে, পুলিশে ডাকাতির অভিযোগ পেশ করা হয়। পুলিশ আসিয়া নাকি দেওয়াল ও জানালা ভাঙা অবস্থায় দেখিতে পায়। কৃষকেরা বলে তাহারা দেওয়াল বা জানালা ভাঙে নাই। তাহাদের বিপক্ষদল এইভাবে মকর্দ্দমা সাজাইয়াছে।

পুলিশী অত্যাচার

কৃষকগণ বলে যে তাহার পর ৪০/৫০ হইতে ১২০ জন পর্যন্ত সশস্ত্র পুলিশ আসিল। তাহাদের রাগ পড়ে বিশেষ করিয়া কমলাপুর গ্রামের অধিবাসীদের উপর। তাহারা প্রথম হইতে প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয়া বয়স্ক পুরুষমাত্রকেই গ্রেপ্তার করিতে থাকে। এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে পুরুষেরা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। তখন পুলিশ বিনা পরোয়ানায় প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয়া বেপরোয়া তল্লাসী চালায়। স্ত্রীলোকেরা উঠানে দাঁড়াইয়া পুলিশের নির্লজ্জ গালাগালি শুনিতে থাকে। স্ত্রীলোক ও বালকদের মধ্যে যদি কেহ প্রতিবাদ করিবার মত সাহস দেখায় তবে তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার

করা হয়। এই তল্লাশীর পরে প্রায় প্রত্যেকের ঘর হইতে খুচরা টাকাপয়সা, গহনা ইত্যাদি, অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

সম্পত্তি বেদখল ও কারফিউ

কৃষক আন্দোলনের নেতাদেরই ডাকাতি মামলার প্রধান আসামী খাড়া করা হইয়াছে। এত তল্লাশীতেও তাঁহারা ধরা না পড়াতে পুলিশ বিভিন্ন নেতার বাড়ী গিয়া যাহা কিছু অস্থাবর সম্পত্তি বাহির করিয়া থানায় টানিয়া লইয়া গেল। জিনিষপত্রের যে লিস্ট রাখিয়া গেল তাহাতে অনেক কিছুরই নাম নাই। স্ত্রীলোকগণকে শিশুদের সহিত রাস্তায় বাহির করিয়া দেওয়া হইল। ইহারপর তাহারা আরম্ভ করিল কারফিউ। রাত ২টায় পুলিশের লোকে ঢেঁরা দিল যে রাত ১২টা হইতে পরদিন ৭টা পর্যন্ত কোন লোক বাড়ীর বাহির হইতে পারিবে না। রাত ২টায় পল্লীগ্রামের সবাই নিদ্রিত। কাজে কাজেই সকালে বাড়ীর বাহির হইতে না হইতে বহুলোক গ্রেপ্তার হইল। ইহার ঠিক ৭দিন পরই দ্বিতীয়বার কারফিউ বসিল ৩৬ ঘন্টার জন্য। কারফিউ এলাকার চতুর্দ্দিক সশস্ত্র পুলিশে ঘেরাও করিয়া ছিল। পল্লীগ্রামে যে বাড়ীর ভিতর কল পায়খানা থাকে না তাহা সকলেই জানেন। কাজে কাজেই মলমূত্র ত্যাগ করিবার জন্য বা পানীয়জল আনিবার জন্যও কাহারও ঘরের বাহির হইবার উপায় রহিল না। হাটের দিন ছিল কারফিউয়ের সময়ের মধ্যেই। হাটের পান, কলা, ছানা, প্রভৃতি ঘরেই পচিল। পুলিশের লোক ডাব, কলা, কাঁঠাল, প্রভৃতি ফল নির্ব্বিবাদে ভক্ষণ করিল, পাড়িল, ছড়াইল বা বেয়োনেটের সঙ্গীন দিয়া ফুটা করিয়া চলিয়া গেল। শতাধিক লোক গ্রেপ্তার হইল। ইহার মধ্যে ১১ বৎসরের একটি বালক এবং ৭২ বৎসরের এক বৃদ্ধকেও ডাকাতি মামলার আসামী করা হইয়াছে। পুলিশ আজ পর্যন্ত গ্রামের লোকদের জানায় নাই যে সবশুদ্ধ কাহাদের নামে ঐ বাড়ীভাঙ্গার বা ডাকাতির অভিযোগ আছে। মোটামাট ঐ একদিনকার গোলযোগের জন্যই মোকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে ও সমস্ত জুলুম চলিয়াছে।

প্রমাণ

বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৪০ জন লোকের সহিত আমরা আলোচনা করিয়াছি; তাহারা প্রত্যেকেই এই সকল অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত। তাহারা বলে চক্‌পহলামপুরের আশু কাঁড়ারের বাড়ী যে ৭দিন তালা বন্ধ ছিল তাহা তো মিথ্যা নয়। আশু কাঁড়ার ধরা দিবার পর পুলিশ তালা খুলিয়া দিয়া যায়। জামিনে খালাস হইবার পর ফের মিথ্যা স্তোক দিয়া আশু কাঁড়ারকে গ্রেপ্তার করা হয় কারফিউ ভঙ্গ করার ওজুহাতে; অপরাধ তাহার যে কারফিউয়ের মধ্যে মামলার দিন থাকায় সে বাধ্য হইয়া কোর্টে যাইতেছিল এবং পুলিশ তাহাকে পূর্বে বলিয়াছিল যে সে কোর্টে যাইতে পারে, যথাসময়ে সম্মতি দেওয়া হইবে। পহলামপুরের শেষ কোণে পঞ্চানন বাগের বাড়ী ঘটনার ৪দিন পরে তালা বন্ধ করা হয় এবং আজ পর্যন্ত খোলা হয় নাই। আশু কাঁড়ারের বাড়ী তল্লাশী হইবার সময় ছোট ছেলের ভর্তি দুধের বাটি পুলিশ লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়; দোলনা হইতে ছোট শিশুকে তুলিয়া বলে লোক ধরিয়া না দিলে, আছাড় মেরে ছেলেকে মেরে ফেলব। বাড়ীর মেয়েরাও উপরোক্ত সাক্ষ্য দেন। সুরেন শীলের স্ত্রী বাড়ীতে জলের অভাবে কারফিউয়ের মধ্যে বাড়ীর নিকটেই পুষ্করিণীতে যায়। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে তাহার স্বামী বাহির হইয়া আসে। তখন স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিয়া স্বামীকেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। কৃষকেরা বলে গুইরাম

মণ্ডল ও কার্তিক ধাড়াকে পুলিশ যে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে তাহাও তো মিথ্যা নয়। সশস্ত্র পুলিশ যখন প্রথম গ্রামে আসে, তখন তাহারা রাস্তায়। দূর হইতে পুলিশ আসিতে দেখিয়া তাহারা রাস্তা হইতে নামিয়া মাঠে ঢোকে এবং তাহাতেই পুলিশ তাহাদের গুলি করে। আহত অবস্থায় তাহারা জলের জন্য চীৎকার করিতে থাকে। রাস্তার উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে মুমূর্ষুকে ব্যঙ্গ করিয়া পুলিশ বলে : জল খাবে-মুখে পেচ্ছাব করে দেব।

পূর্বপাড়ার গঙ্গারাম ধাড়ার স্ত্রীকে পুলিশ গুলিতে আহত করে। গঙ্গারাম দাসের স্ত্রীকে পুলিশ বন্দুকের ফুঁদা দিয়া মারিয়াছে। পুলিশের সঙ্গে অপর লোকের অত্যাচারের কথাও কৃষকেরা বলে। প্রত্যেক বাড়ীতেই পুলিশ এই সব অনুচর সঙ্গে লইয়া যায়। ইহারা পূর্বে গ্রামে গুণ্ডামি করিতেই অভ্যস্ত ছিল। কৃষকেরা বলে বর্তমানে তাহারা অনেকে কংগ্রেসে নাম লিখাইয়াছে। এইরূপ এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ভরত কোলে, পুলিশের সম্মুখেই সাধন কোলে ও তাহার ছেলেকে মারধোর করিয়াছে। পুলিশ সত্যই কংগ্রেস কর্মী বলিয়া পরিচিত নিতাই সোমকেও প্রহার করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। কংগ্রেস কর্মী রূপে নিজের পরিচয় দিলে পুলিশ বলে : "চাষ করিস্ তুই আবার কংগ্রেস কর্মী"।

কৃষকেরা বলে যে এই অত্যাচারের আসল উদ্দেশ্য কৃষক সমিতি ধ্বংস করা। এই কৃষক সমিতি অত্যাচারমূলক হাটতোলা প্রথার বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। এই অঞ্চলের জমিদারদের তরফ হইতে বেআইনি খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। কৃষক সমিতির সভাপতি শ্রীঅজিত বসু গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দীর্ঘদিন কংগ্রেসের কাজ করেন। তিনি ১৯৩০-৩২ সালের কংগ্রেস আন্দোলনে কারারুদ্ধ হইয়া ছিলেন। জমিদার বংশের সন্তান হইয়াও তিনি নিজের জমিদারি ছাড়িয়া কৃষক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বর্তমানও কয়েক বৎসর পূর্বে হইতে তিনি এই ইউনিয়নের নির্বাচিত সভাপতি।

ফণীন্দ্রনাথ শেঠ
প্রমোদ সেনগুপ্ত
শ্যামল চক্রবর্তী

প্রাপ্তিস্বীকার : ঐ, পৃ. ৩১-৩৬

টিকা : অজিত বসু'র পরিচিতি সম্পর্কে এই সহায়ক তথ্যে যা বলা হয়েছে, তারপরেও আরও কিছু বলার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি জমিদার বংশের লোক, এম.এ পাশ করে বড়ার হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন। জমিদারির স্বার্থত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে সিঙ্গুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআই-এর প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। — সম্পাদক

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে

ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতির বিবৃতি

"পাঁচুগোপাল বাবু হুগলী জেলার তথা বাংলাদেশের সুপরিচিত কংগ্রেস কর্মী এবং একসময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেস কর্মী ও পরে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হিসাবে তিনি ইংরাজ শাসনের আমলে বহু বৎসর কারারুদ্ধ ছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। গত বৎসর শীতকালে পলিনিউরাইটিস রোগে পঙ্গু হইয়া তিনি কয়েকমাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার একটি হাত ও পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অক্ষম হইয়া যায়। দীর্ঘদিন মেডিকেল কলেজের খ্যাতনামা ডাক্তার যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিকিৎসার ফলে এই বৎসরের আরম্ভে তিনি অপেক্ষাকৃত বল পাইয়া অল্প-স্বল্প হাটাফেরার সামর্থ লাভ করেন। হাত ও পায়ের বল স্বাভাবিক অবস্থাতে তখনও ফেরে নাই। শুশ্রূষা ও যত্নের আশায় তিনি শ্রীরামপুরে তাঁহার মাতার নিকট যান। সেখানে মার্চ মাসের শেষে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসা বন্ধ হইয়া যায়। ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে এবং জেলের ডাক্তার স্থানীয় সিভিল সার্জেন আশঙ্কা করেন যে সত্বর পূর্বের মত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে পাঁচুগোপাল বাবুর অবস্থা আরও খারাপ হইবে। সিভিল সার্জেন পাঁচুগোপাল বাবুকে তাঁহার চিকিৎসক যোগেশবাবুকে পত্র লিখিবার অনুমতি দেন এবং পুলিশ বিভাগকে এই নির্দেশমত ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে বলেন। কিন্তু সে চিঠি বা সিভিল সার্জেনের নির্দেশ ডাক্তার যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পৌঁছায় নাই। পুলিশ বা ঐ সংশ্লিষ্ট কোনও দপ্তরে রহিয়া যায়। চিকিৎসার অভাবে পাঁচুগোপালবাবু যখন মুমুর্ষু অবস্থায় পৌঁছান, তখনও কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে নাই। ১২ই মে তাঁহারা পাঁচুগোপালকে দমদম জেলে স্থানান্তরিত করিতে বলেন। পাঁচুগোপালবাবুকে ঐ অবস্থায় স্থানান্তরিত করা বিপজ্জনক সিভিল সার্জ্জেনের এই আপত্তিতে উল্লিখিত আদেশ নাকচ হয়। ১৯শে মে তারিখে পাঁচুগোপালবাবুর দৈহিক পক্ষাঘাত ও হৃদযন্ত্রের বৈকল্য এইরূপ বাড়ে যে সেইরাত্রেই বা পরদিন তিনি মারা পড়িবেন এইরূপ আশঙ্কা হয়। পুলিশ দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ তখন তাড়াতাড়ি অর্থাৎ ২০শে মে তারিখে সম্ভবত নিজেদের বদনাম বাঁচাইবার জন্য পাঁচুগোপালবাবুকে কারামুক্ত করেন।

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর নামে পুলিশের লেখা চার্জশীট ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যাকরী সভাপতি হিসাবে আমি পাঁচুগোপালবাবুর মুক্তির পর দেখিয়াছি। ভাদুড়ী মহাশয়ের বিরুদ্ধে

পুলিশের প্রধান অভিযোগ এই যে তিনি সম্প্রতি তাঁহার পার্টি কর্তৃক সামরিক কুচকাওয়াজ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করিবার জন্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

জনশ্রুতি আছে যে দেবতা ও মহাপুরুষদের অলৌকিক শক্তির ফলে মূক ও মৌন লোকে মুখর হইয়া উঠে এবং পঙ্গুজন নৃত্য করিতে পারে। স্বরাষ্ট্রদপ্তরের কোন মহাপুরুষ এইরূপ অলৌকিক শক্তির স্বপ্ন দেখিয়া সাধারণ কাজকর্মে অশক্ত পাঁচুগোপালবাবুকে সশস্ত্র বিপ্লবের সৈনিক জ্ঞান করিলেন তাহা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু নিতান্ত বাতুল বা বর্বর না হইলেও মানুষ যে এইরূপ রুগ্নলোককে— বিশেষত যিনি সরকারি চিকিৎসা কলেজের একজন শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ও যাঁহার শারীরিক অক্ষমতা তাহাদের ভালরূপে জ্ঞাত— এইভাবে কারারুদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দিতে পারে, ইহা আমাদের জানা ছিল না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও অন্য বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদের অসীম নির্যাতন ভোগ ও ত্যাগের ফলেই রাজনৈতিক বন্দীদের মানুষের মত ব্যবহারের দাবি আদায় হইয়াছিল। আজ যখন ক্ষমতা আমাদের নিজেদের দেশবাসীর হাতে আসিয়াছে তখন কি আমরা পুনরায় ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকের পূর্ণ বর্বর যুগে ফিরিয়া যাইব? না কংগ্রেসের সমস্ত লোক মিলিতকণ্ঠে রাজবন্দীদের উপর এই দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া তাহার অবসান করিব?"

ইতি—

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্য্যকরী সভাপতি)

মন্তব্য : এই বিবৃতিটির প্রধান অংশ ২১শে মে তারিখে তথাকথিত একটি জাতীয়তাবাদী ইংরাজী সংবাদপত্রে পাঠানো হয়। বিবৃতিটি তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই।

প্রাপ্তিস্বীকার : ঐ, পৃ. ৪৯-৫০

ছাত্র ফেডারেশনের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির বক্তব্য

ছাত্রফেডারেশন ছাত্রদের একটি আইনসঙ্গত বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ২৬শে মার্চ (১৯৪৮ - সম্পাদক) পুলিশ ইহাদের কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীয় অফিস (যাহার সহিত অন্য কোন অফিসের যোগ নাই) তালা বন্ধ করিয়া তিন সপ্তাহ এইভাবে রাখিয়া দেয়। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই এই প্রতিষ্ঠানের অফিসগুলি ঐ সময়ে এইভাবে বন্ধ করা হয় ও বহুসংখ্যক কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রমাণাভাবে সম্প্রতি অনেককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ছাত্রকর্মীদের উপর নানাবিধ উপদ্রব চলিতেছে। সরকারী নির্দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইহাদের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে। অনেককে কারামুক্ত করিলেও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা গীতা মুখার্জীর কারাবাসকাল ছয়মাস বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ না কি এই যে তিনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া কন্‌ফারেন্সের একজন উদ্যোক্তা ছিলেন এবং বিশ্ব যুবসম্মিলনীর সহিত তাঁহার যোগাযোগ আছে।

কলিকাতায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া কন্‌ফারেন্সের উদ্বোধনের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু তাঁহার প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোক্তাদিগের ও বিশেষ করিয়া বিশ্ব যুব ও ছাত্রসম্মিলনীর প্রতিনিধিগণকে ঘোরাফেরা ও যোগাযোগের সুবিধার জন্য একটি জীপ গাড়ী ও টেলিফোন ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং সরকারী লেক ব্যারাকে প্রতিনিধিদের আবাসের ব্যবস্থা করেন। পুলিশমন্ত্রী কি ইহাদের গ্রেপ্তারেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন? ছাত্রফেডারেশন এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বাংলাদেশে গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের সম্পাদিকা গীতা মুখার্জী, শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে। ২৬শে আগস্ট ও ৩রা সেপ্টেম্বর কলিকাতার রাজপথে ছাত্রসমাজের যে বিরাট দাঙ্গাবিরোধী শান্তি শোভাযাত্রা হয়, তার অন্যতম সংগঠক ছিল ছাত্রফেডারেশন ও গীতা মুখার্জী। তবে হাঁ শৃঙ্খলা তিনি ভঙ্গ করিয়াছিলেন ৪৫-এর নভেম্বরে সাম্রাজ্যবাদের গুলির বিরুদ্ধে... এবং কালা-কানুন বিরোধী অভিযানে।

পরোয়ানা জারি করা হয়েছে প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সারা ভারতীয় সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তারের জন্য।

ইহাদের নামে অভিযোগ যতদূর শোনা যায় এইরূপই অর্থহীন ও হাস্যাস্পদ।

প্রাপ্তিস্বীকার : ঐ, পৃ. ৫৩-৫৫

নিরাপত্তা আইন— কি ও কেন?

ভূপেশ গুপ্ত

কুখ্যাত পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ আরও তিন বৎসর বাড়াইবার জন্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় একটি বিল উত্থাপন করিবেন। এই বিলের নোটিসও ইতিমধ্যেই 'কলিকাতা গেজেট'-এ প্রকাশিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই ধরনের কালাকানুনের রাজত্বের পরও কংগ্রেসী শাসকদের নিকট ইহার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া যায় নাই। ডাঃ রায়ের মতে, 'যে অবস্থার দরুন এই আইন পাস করা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা এখনও বর্তমান।" শুধু তাহাই নহে, তাঁহার হিসাব মত অন্তত আরও তিন বৎসর এই সকল "অবস্থা" বিদ্যমান থাকিবে। অতএব আগামী ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই আইনের মেয়াদ বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

১৯৫৭ সালে বর্তমান আইন সভার মেয়াদ শেষ হইবে এবং তখনই সাধারণ নির্বাচনও হইবে।

সুতরাং, ইহা খুবই স্পষ্ট যে, আজ হইতে আরম্ভ করিয়া আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত প্রায় গোটা সময়ের জন্যই এই নিরাপত্তা আইন বলবৎ থাকিবে। অর্থাৎ, জনতার অধিকাংশের আস্থা হরাইয়া বর্তমান মন্ত্রিসভা যতদিন গদি আঁকড়াইয়া থাকিবেন, নিরাপত্তা আইনের প্রয়োজনীয়তাও ততদিন থাকিয়া যাইবে। নিরাপত্তা আইন তাই প্রয়োজন আসলে এই সর্বজনধিকৃত মন্ত্রিসভার নিরাপত্তারক্ষার জন্য; দেশ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দোহাই নিতান্তই বাজে কথা। বস্তুত দেশের নিরাপত্তা যদি আজ কেহ বিপন্ন করিয়া থাকে, তবে তাহা নিঃসন্দেহে এই মন্ত্রিসভা।

নিরাপত্তা আইনের জন্ম-বৃত্তান্ত

গোড়াতেই বোধ হয় নিরাপত্তা আইনের ইতিহাস একটু উল্লেখ করা দরকার। স্মরণ থাকিতে পারে, যুদ্ধের সময় বৃটিশ শাসকরা 'ভারত-রক্ষা' আইন পাস করে। এই আইনের বলে তাহারা দেশের ওপর পুলিশী সন্ত্রাসরাজ কায়েম করে। যুদ্ধের পর 'বেঙ্গল স্পেশাল পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স" নাম দিয়া ভারত-রক্ষা আইনের অনেকগুলি জঘন্য ধারা জিয়াইয়া রাখা হয়। তদানীন্তন মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভা ভিন্ন নাম দিয়া কালাকানুনকে এইভাবে পাকাপোক্ত করে। তখন কংগ্রেস কিন্তু ইহার বিরোধিতা করে। তারপর ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে আসে মাউন্টব্যাটন সাহেবের আশীর্বাদ। কংগ্রেস বিপ্লবীরা হুড়মুড় করিয়া গিয়া মাউন্টব্যাটনের

দরবারে লুটাইয়া পড়েন। সেখানে নূতন দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহাদের চরিত্র রাতারাতি বদলাইয়া যায়। এ রাজ্যের মন্ত্রিত্বের মসনদে আরোহণ করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' এর মেয়াদবৃদ্ধির জন্য ১৯৪৭ সালেই একটি বিল উত্থাপন করেন। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবাংলার বিক্ষুব্ধ জনতা গর্জন করিয়া উঠে। সূচনা হয় মিলিত প্রতিবাদ আন্দোলন। পশ্চিমবাংলার দিকদিগন্ত মুখরিত করিয়া দাবি উঠে—কালাকানুন প্রত্যাহার কর।

জনগণের এই ন্যায্য দাবিকে এমন কি কংগ্রেসী সংবাদপত্রগুলিও সেদিক উপেক্ষা করিতে পারে নাই। ৩০শে নভেম্বর 'যুগান্তর' পত্রিকা 'ক্ষমতার অপব্যবহার' শিরোনামায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করেন : "সেই কংগ্রেস আজ গভর্ণমেন্টের আসনে, যে কংগ্রেসকে আমরা বুকের রক্ত দিয়া লালন করিয়াছি।... জাতীয় কংগ্রেস দীর্ঘকাল এই সমস্ত 'বেআইনি আইনের' বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়াছেন এবং সেই কংগ্রেসী কর্ণধারগণই আজ জনসাধারণের কান ধরিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার টুপি চাপিয়া ধরিয়াছেন ... এই প্রকার ডিক্টেটারীর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।

"...এই ছিন্নমস্তার রূপ দেখিয়া স্বাধীন বাংলার জনসাধারণ নিশ্চয়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে এবং ভাবিবে, স্যর জন এণ্ডারসনের কুখ্যাত ঐতিহ্য আজ ভূত হইয়া চাপিয়াছে।" 'হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড' ৭ই ডিসেম্বর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সরকারকে উপদেশ দিলেন— "কোন ক্ষেত্রেই ইহা রাজনৈতিক বা দলগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলিবে না। আইনসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংগঠনের বিরুদ্ধে ইহা ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়; ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বা রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে তো নয়ই।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিলেন :

"শাসনকার্য ততক্ষণই সার্থক ও স্বাভাবিক যতক্ষণ উহা সহজভাবে স্বাভাবিক আইনের দ্বারা নির্বাহ করা যায়। শাসকগণ যখন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে উদ্যত হন তখন বুঝিতে হইবে, জনগণের সহিত তাহাদের সহজ সাম্যাবস্থা বিচলিত হইয়াছে।"

সারা ভারতে কংগ্রেসী রাজত্বে নিরাপত্তার বলি

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল হইতে ১লা আগস্ট ১৯৫০ পর্যন্ত

- **গুলি চলিয়াছে— ১,৯৮২ বার**
- **নিহতের সংখ্যা— ৩,৭৮৪ জন**
- **আহত ও পঙ্গু— ১০,০০০ জন**
- **জেলে আটকের সংখ্যা— ৫০,০০০ জন**
- **জেলে নিহতের সংখ্যা— ৮২ জন**
- **নারীহত্যা একমাত্র বাংলাদেশে ৪৭ জন**
- **৪০টি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ**

তদানীন্তন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই বিলের আলোচনা অল্প কয়েক দিনের জন্য স্থগিত রাখেন।

৮ই ডিসেম্বর এক বেতার ভাষণে তিনি বলেন— "কোন রাজনৈতিক দলকে দমন করা অথবা আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দমন করা এই বিলের উদ্দেশ্য নহে। আমি এই আশ্বাস দিতেছি যে, যতদিন পর্যন্ত এই মন্ত্রিসভার হাতে শাসনভার থাকিবে, ততদিন ক্ষমতার কোন অপব্যবহার হইবে না।"

তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই আশ্বাসবাণীর কোন প্রতিফলনই অবশ্য বিলের ধারার মধ্যে পাওয়া যায় না।

সামান্য কিছু রদবদলের পর ইহাকে 'পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন' নাম দিয়া আবার নজির করা হয়। নাম পরিবর্তন হইলেও বিলের চরিত্র আগের মতই থাকিয়া যায়। স্বাধীনতা জয়ী কংগ্রেস নেতাদের তখন এই বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল। কেননা, দেশ ও জাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার পর নিজেদের গদির স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে হইলে শুধু রাজনৈতিক প্রবঞ্চনাই যথেষ্ট নয়, পুলিশী সন্ত্রাসও তাহাদের নিকট অপরিহার্য হইয়া ওঠে। যাই হউক সেদিন পশ্চিমবাংলার মানুষ ঘরে বসিয়া থাকে নাই। নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে যে বিরোধিতা আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে সেই আন্দোলনের মধ্যেই পশ্চিমবাংলারই বীর সন্তান যুবক শিশির মণ্ডল পুলিশের গুলীতে প্রাণ দেন। এই ঘটনায় কমপক্ষে আরও পঞ্চাশ জন নরনারী আহত হন। শহীদ শিশিরের বলিদানের মধ্যে বাংলার নরনারীর নিষ্কলঙ্ক দেশাত্মবোধ সেদিন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। কংগ্রেসী শাসকরা ইহাতে অবশ্য আরও বেশি বিকারগ্রস্ত ও উন্মত্ত হইয়া উঠে। ইহাদের পীড়ন ও ব্যভিচারের আর কোন সীমাপরিসীমা থাকে না। শহিদের রক্তমাখা এই নিরাপত্তা আইন হাতে লইয়া ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়ে জনতার ওপর। জনতার আগুয়ান সৈনিকদের উৎখাত করাই শুধু তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, দেশের সমগ্র জাতীয় ঐতিহ্যকে নির্মূল করাও ছিল তাহাদের লক্ষ্য।

১৯৪৯ সালের ১৩ই মার্চ নিরাপত্তা আইনের মেয়াদ শেষ হইলে ইহার মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। পরে কলিকাতা হাইকোর্টের এক রায়ে এই মেয়াদ বৃদ্ধিকে বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নিরাপত্তা আইনে তখন যে সকল রাজনৈতিক কর্মীরা বিনা বিচারে আটক ছিলেন, তাঁহাদের মুক্তি দিবার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু নির্লজ্জ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইহাতেও সুবুদ্ধির উদয় হয় নাই। হাইকোর্টের আদেশকে এড়াইবার জন্য তৎক্ষণাৎ ১৯৩০ সালের 'বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল এম্যাণ্ডমেন্ট অ্যাক্ট' বা বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধন আইন প্রয়োগ করিয়া রাজবন্দীদের জেলেই রাখিয়া দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্যযোগ্য, পরে ১৯৫০ সালে এই ফৌজদারী সংশোধন আইনও গঠনতন্ত্রসম্মত নয় বলিয়া ২৭শে জানুয়ারী কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে রায় দেন। এই রায়ের ফলে উক্ত অবৈধ আইনের শিকার ৩৭০ জন রাজবন্দীর মুক্তি পাইবার কথা ছিল। কিন্তু বিলাতী জ্যাকসন-এণ্ডারসনের আইন যখন উড়িয়া যাইবার উপক্রম, তখন বল্লভভাই প্যাটেল একটি 'বিনিদ্র রজনীযাপন' করিয়া ২৫শে জানুয়ারি একদিনের মধ্যেই তাঁহার কুখ্যাত নিবর্তনমূলক আটক-আইন পাশ করাইয়া লইলেন। ঐ তারিখেই মধ্যরাত্রিতে ঘুমন্ত বন্দীদের সেলে নূতন আইন অনুযায়ী কতগুলি নয়া আটক আদেশ দেওয়া হয়। পশ্চিমবাংলা, তথা সারা ভারতের কংগ্রেসী শাসকদের নিরাপত্তা রক্ষা হইল! বলা বাহুল্য প্যাটেলের এই আইনের কল্যাণে পশ্চিমবাংলার একটি রাজবন্দীও মুক্ত হইল না। কংগ্রেস রাজত্বের উচ্চ আদালতের বিচার, পুলিশের লাঠি এবং কংগ্রেসী জেলারের নিকট হার মানিল।

ইহার পরও অবশ্য আইনের শাসন বলিয়া বড়াই করিতে কংগ্রেস নেতাদের এতটুকু চক্ষু লজ্জা হয় নাই। নিরাপত্তা আইনের রথচক্রে পশ্চিমবাংলার নরনারীর অতি মৌলিক অধিকার দিনের পর দিন পিষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে পশ্চিমবাংলার দেশপ্রেম এবং ঐতিহ্য এতটুকু নিষ্প্রভ হইয়া যায় নাই। বরং, নির্যাতন ও অত্যাচারের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় ইহা আরও বেশি শক্তিশালী, আরও বেশি অপরাজেয়, আরও বেশি মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। গত সাধারণ নির্বাচনের অভূতপূর্ব গণ-জাগরণের মধ্যে পশ্চিমবাংলার সেই অম্লান ও সতেজ দেশাত্মবোধেরই নির্ভুল পরিচয় আমরা পাইয়াছি।

এখনও কেন এই আইন?

দমননীতি ব্যর্থ হইবার পরও কেন কংগ্রেস শাসকরা আজও এই সকল কালানকানুন আঁকড়াইয়া আছেন, স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার জবাব অতি সহজ। গত সাধারণ নির্বাচনে যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তাহাতে কংগ্রেসের বেশি ভোটার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। ইহার পর মন্ত্রিত্বের গদি জবরদখলে রাখিতে হইলে গণতন্ত্রের চেয়ে পুলিশতন্ত্রেরই প্রয়োজন ঢের বেশি। নিরাপত্তা আইনের ন্যায় কালাআইন বাদ দিয়া পুলিশ রাজত্ব এক মুহূর্তও টিকিতে পারে না। নিরাপত্তা আইনের মেয়াদবৃদ্ধির ইহাই হইল প্রধান কারণ।

পাঁচসালা পরিকল্পনা নামে যে এক প্রচণ্ড ধাপ্পাবাজি এবং শোষণের আয়োজন হইয়াছে, তাহার জন্যও নিবর্তনমূলক আটক এবং নিরাপত্তা আইন দরকার। এই পরিকল্পনা চালু করিতে প্রয়োজন— একদিকে বিদেশী শোষকদের আমন্ত্রণ, অপর দিকে জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া মেহনতি মানুষকে শোষণ। পরিকল্পনার খোরাক জোগাইতে যে কোটি কোটি টাকা ট্যাক্সের দরকার হইবে, 'বিশেষ ক্ষমতা' ছাড়া তাহা আদায় করা সম্ভব নয়।

সৌরাষ্ট্রে বিক্রয়কর-বিরোধী আন্দোলনের ওপর হামলা করিয়া সরকার ইতিমধ্যেই কাজকর্মে ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বিধানবাবুও টাকা জোগাড়ের কাজে নামিয়াছেন। এই পরিকল্পনার কল্যাণে দেশের অর্থনৈতিক সংকট স্বভাবতই তীব্রতর হইয়া উঠিবে এবং ভারতের অর্থনীতিক ব্যবস্থাও ইঙ্গ-মার্কিনের যুদ্ধায়োজনের সঙ্গেই আরও বেশি জড়াইয়া পড়িবে। ইহা জনগণকে বিক্ষুব্ধ না করিয়া পারে না। তাই বেকারি ও ট্যাক্সের বিরুদ্ধে লড়াই, শান্তি, জমি, খাদ্য ও জীবিকার জন্য জনসাধারণের সংগ্রামকে দমন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োজন। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এই অবাধ ক্ষমতাই হাতে লইতেছেন। ইহা দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার নামান্তর মাত্র। প্ররোচনামূলক এবং আক্রমণাত্মক এই কাজের পরিণতির জন্য একমাত্র তিনি এবং তাহার সরকারই দায়ি হইবেন, আর কেহ নয়।

নিরাপত্তা আইনের স্বরূপ

গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া নিরাপত্তা আইনের পরিচয় আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছি। সুতরাং, এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। তবু এই আইনের জঘন্যতম কয়েকটি ধারা এখানে আবার স্মরণ করা আবশ্যক। এই আইনের মুখবন্ধেই ইহার সর্বগ্রাসী ক্ষমতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। মুখবন্ধে বলা হইয়াছে :

"বেআইনিভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা, রাখা অথবা ব্যবহার বন্ধ করিয়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্থায়িত্ব বিপন্ন করিতে পারে— এমন সব ধ্বংসাত্মক আন্দোলন দমন করিয়া; এবং গুণ্ডাদমন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য এবং সমাজজীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও ব্যবস্থাদি বজায় রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে এই আইন।"

'গুণ্ডা দমন', 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' এবং 'বেআইনি' সম্পর্কে নানা মন্তব্য করিয়া লোক ভুলাইবার অবশ্য হাস্যকর চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যেই গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই আইনের দাপট চলিয়াছে। ইহা যে কেহই জানেন যে, গুণ্ডাদের এই আইন বলে সায়েস্তা করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। বরং দেখা গিয়াছে যে, কংগ্রেস-মন্ত্রীরা অনেকেই গুণ্ডা পুষিয়াছেন, গণ-আন্দোলন দমন করিতে এবং এমনকি নিজেদের মধ্যে উপদলীয় হাতাহাতির জন্যও গুণ্ডাদের ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গুণ্ডা-দমনের জন্য গুণ্ডা-আইন রহিয়াছে। স্বচ্ছন্দে এই আইনকে সংশোধন করিয়া আরও বেশি কার্যকরী করা যাইতে পারিত। কিন্তু গুণ্ডামি ছাড়া যাহাদের রাজনীতি অচল তাঁহারা কখনও গুণ্ডার পিছনে লাগিবেন, ইহা কেহই ভাবিতে পারে না।

দাঙ্গার সময় নিরাপত্তার আইন চালু ছিল। কিন্তু আলমবাজার, তেলেনীপাড়া, বাটানগর, হাওড়া প্রভৃতি এলাকার মুসলমান নিধন এবং অগ্নিসংযোগ বন্ধ করিতে এই আইন অতি সামান্যই প্রয়োগ করা হয়। দাঙ্গাবাজদের কার্যকলাপে রাষ্ট্রের 'নিরাপত্তা বা স্থায়িত্ব' কোন কিছুই বিপন্ন হয় নাই! 'ধ্বংসাত্মক কার্যের' সংজ্ঞার মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের কাণ্ডকারখানা তখন প্রায় পড়ে নাই বলিলেই চলে!! শুধু তাহাই নহে, এই সকল দাঙ্গাবাজদের সহিত কোন কোন মন্ত্রী, ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ অফিসারের যোগসাজস তখন ফাঁস হইয়া যায়। বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে ব্যবস্থাগ্রহণ করিবার জন্যও অস্ত্র-আইন রহিয়াছে। ইহার জন্য কালাকানুনের আদৌ দরকার হয় না।

ভাঁওতার কথা বাদ দিয়া এখন নিরাপত্তা আইনের আসল উদ্দেশ্যে আসা যাক।

আসল উদ্দেশ্য

আইনের প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন অপরাধের দীর্ঘ ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে। 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব' এর দোহাই দেওয়া হইলেও এই সকল কথার কোন ব্যখ্যা করা হয় নাই। কখন রাষ্ট্রের 'নিরাপত্তা' অথবা স্থায়িত্ব বিপন্ন হইল, তাহা ঠিক করিবেন কংগ্রেসী শাসকরা নিজেরাই। এমনকি হাইকোর্টকেও এই সকল ব্যাপারে কোন এক্তিয়ার দেওয়া হয় নাই। চিরাচরিত বৃটিশ কায়দায় 'জনসাধারণের শৃঙ্খলা রক্ষা'র কথাও বলা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও বিচার বিবেচনার সব ভার মন্ত্রিসভা এবং পুলিশের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতার পর এই সকল কথার ব্যবহারিক অর্থ লইয়া আর আলোচনার দরকার হয় না। রাষ্ট্রের 'নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব' মানে শাসক ও শোষকদের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব। জনসাধারণের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা মানে জনসাধারণের ওপর অবাধ উৎপীড়ন।

রাষ্ট্রের 'নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব' রক্ষা করিবার নাম করিয়াই পশ্চিমবাংলায় শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মহিলা ও মধ্যবিত্তের সমস্ত আন্দোলনকে দমন করিবার চেষ্টা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি তো বটেই, এমনকি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও পিপ্‌লস রিলিফ কমিটিকেও বেআইনি ঘোষণা করা

হয়। নিরাপত্তা রক্ষার নামে চলে কলিকাতার রাজপথে লতিকা-প্রতিভার ন্যায় মহিলা হত্যা, গ্রামাঞ্চলে অহল্যার ন্যায় গর্ভবতী কৃষক রমণী হত্যা, শিল্প অঞ্চলে রামলক্ষ্মণ নুনিয়ার ন্যায় শ্রমিক হত্যা, পার্কে নিখিল ভাদুড়ীর ন্যায় কিশোর হত্যা, বকুলের ন্যায় শিশু হত্যা।

দৃশ্যত 'ধ্বংসাত্মক' কাজ দমন করাই এই নিরাপত্তা আইনের লক্ষ্য। কিন্তু 'ধ্বংসাত্মক কাজ' যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার ফলে যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই এই আইনের বলে দমন করা চলে। "রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বিপন্ন করিতে পারে" এমন সব কার্যকলাপ ছাড়াও 'ধ্বংসাত্মক কাজ' মানে:

'এমন সব কার্য যাহার উদ্দেশ্য হইল কিংবা সম্ভাব্য পরিণতি হইল কোন অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন, সংগ্রহ, সরবরাহ বা বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয় (১) কোন কোন কাজ বা সক্রিয় ব্যবস্থা (অপারেশন), বা (২) কোন পরিবহন বা ইঞ্জিনচালিত উপায়াদি ব্যাহত করা, দেরি করানো বা সীমাবদ্ধ করা।"

রেল, যানবাহন এবং সিভিল সাপ্লাই দপ্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং দাবিদাওয়া জব্দ করিতেই এই ধারা ব্যবহার করা হয়। ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কলিকাতাস্থ কর্মচারীদের একাংশ জীবিকা ও চাকরীর দাবিদাওয়ার ওপর ধর্মঘট করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা হয়। ১৯৪৯ সালে রেলের শ্রমিক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে চণ্ডনীতি চালু করিতেও এই একই আইন ব্যবহার করা হয়। অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন, বন্টন ইত্যাদি বুলি ছিল নিতান্তই মিথ্যা এবং দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত। এই 'ধ্বংসাত্মক কাজ' করার অপরাধে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডের এবং জরিমানার ব্যবস্থাও রহিয়াছে নিরাপত্তা আইনের একাদশ ধারায়। অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিবহনে নিযুক্ত কোন যানবাহন চালক যদি অতি ন্যায়সঙ্গত কারণেও কাজ করিতে আপত্তি করে তবে তাহাকে পাঁচ বৎসরের জন্য জেলে পাঠানো চলিবে। শ্রমিকের ধর্মঘটের মৌলিক অধিকারের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার অপহরণ

নিরাপত্তা আইনের আক্রমণ শুধু মেহনতি মানুষের ওপরই সীমাবদ্ধ নহে। সংবাদপত্রের ওপর ইহার আক্রমণ অতি সুস্পষ্ট। "আইনসম্মত ভাবে অথবা আইনসম্মত কারণ ছাড়া কেহ কেহ 'হানিকর' (Prejudicial) রিপোর্ট ছাপিতে, প্রকাশ কিংবা বিলি করিতে পরিবে না।" ১১ [ধারা] 'হানিকর রিপোর্ট' মানে 'ধ্বংসাত্মক কাজ' এবং 'ধ্বংসাত্মক কাজের উস্কানি' দেয় এমন যে কোন রিপোর্ট। এক কথায়, সরকারের কোন রিপোর্টে আপত্তি হইলেই নিরাপত্তা আইনের খড়্গ মাথার উপর নামিয়া আসিতে পারে। এখানেও পাঁচ বৎসরের কারাবাস এবং জরিমানার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কোন হকার যদি অজ্ঞাতসারেও এই ধরনের ইস্তাহার বা সংবাদপত্র বিলি করেন, তাঁহারও রেহাই নাই। নিরাপত্তা আইনের ১২ ধারা অনুসারে 'হানিকর রিপোর্ট' সম্বলিত কোন দলিলপত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশ যথেচ্ছ খানাতল্লাস চালাইতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি হুকুমমাফিক দলিলপত্র হাজির না করে, তবে তাহারও তিন বৎসর পর্যন্ত জেল এবং অর্থদণ্ড হইতে পারে। খবরের কাগজকে অবশ্য এই বিশেষ ধারাটি হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অন্য সব প্রকাশকরা কেহই বাদ পড়েন না।

নিরাপত্তা আইনের ১৩ ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্রের সম্পাদকসহ যেকোন প্রেস এবং প্রকাশককে কোন কিছু প্রকাশ করিবার পূর্বে সরকারের অনুমোদন লইতে বাধ্য করা যাইতে পারে। অর্থাৎ যেকোন মুহূর্তে 'সেন্সারশিপ' কায়েম করা যাইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গান্ধীজীর হত্যার প্রতিবাদে সম্পাদকীয় প্রকাশ করার জন্য 'স্বাধীনতা'র ওপর ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই ব্যবস্থাই প্রয়োগ করা হয়। গান্ধীজীর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কিছু লেখা পর্যন্ত গান্ধী-শিষ্যদের নিকট 'হানিকর' বলিয়া গণ্য হয়।

'সেন্সারশিপ' ছাড়া, ইচ্ছা করিলেই সরকার কোন রিপোর্ট প্রকাশ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। এখানে অবশ্যই স্মরণ করা দরকার যে, এই আইনের বলে পশ্চিমবাংলার গোটা কুড়ি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে সরকারি আদেশ অমান্য করিলে শুধু পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডই নয়, খবরের কাগজ এবং ছাপাখানা সব কিছুই বাজেয়াপ্ত হইতে পারে। অতএব নিরাপত্তা আইন নিঃসন্দেহে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

অন্তরীণ ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ

নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপরও এই আইনের আঘাত অত্যন্ত কুৎসিত। যেকোন নাগরিককে খুশিমত যে কোন এলাকা হইতে বহিষ্কার করা কিংবা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় অন্তরীণ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, নাগরিকদের চাকরি, ব্যবসায় এবং গতিবিধির ওপরও নানারকম বাধানিষেধ আরোপ করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কাহারও সহিত মেলামেশা অথবা কোন সংবাদ প্রচারের বেলাও এই বাধানিষেধ আরোপিত হইতে পারে। আদেশ অমান্য করিলে তিন বৎসর জেল ২১ [ধারা]।

সান্ধ্য আইন ও পুলিশী তাণ্ডব

১৭ ধারা অনুযায়ী কলিকাতায় পুলিশ কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইচ্ছা করিলেই সান্ধ্য আইন জারি করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, ১৯ ধারা প্রয়োগ করিয়া সভা-সমিতি শোভাযাত্রা ইত্যাদিও নিয়ন্ত্রণ করিতে অথবা এমনকি একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। এই ধারা অনুসারে যে সকল আদেশ জারি হইবে তাহা কার্যকরী করিবার জন্য যেকোন পুলিশ অফিসার 'যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয়' শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। কথায় কথায় লাঠি-গুলির অবাধ প্রয়োগের মধ্যেই 'যুক্তিসঙ্গত শক্তি প্রয়োগের' নমুনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পুলিশী তাণ্ডবের একটি প্রধান হাতিয়ার হিসাবেই ১৯ ধারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ্য স্থানে সভা-সমিতির অধিকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না করিলেও অন্য উপায়ে তাহার উপর খবরদারি করার ব্যবস্থা আছে। মাইক ব্যবহার সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন [২৩ ধারা]। এমনকি কলিকাতায় পর্যন্ত পুলিশের অনুমতি ছাড়া মাইক ব্যবহার করার উপায় নাই। ২৩ ধারার বাধা-নিষেধ লঙ্ঘন করিলেও তিন বৎসর কারাদণ্ড।

'সংরক্ষিত এলাকা' এবং জোর-দখল সম্পত্তি

যে কোন এলাকাকেই 'সংরক্ষিত এলাকা' ঘোষণা করিয়া সেখানে গমনাগমন সরকার ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। সরকারি এবং বেসরকারি শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন

দমন করিবার জন্য পোর্ট, রেল-ইয়ার্ড, কারখানা অঞ্চল প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকাকে 'সংরক্ষিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করার ঢালাও অধিকার দেওয়া হইয়াছে (৬ ধারা)। উদ্দেশ্য হইল গোটা এলাকাকে বাহিরের জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেখানকার শ্রমিক-কর্মচারীদের ঘায়েল করা। চিত্তরঞ্জন রেল কারখানার গোটা এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেখানে আজও পুলিশী দাপট চালানো হইতেছে।

ধর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়এমন সব বাড়ীঘর বাদ দিয়া উক্ত আইনের ২৯ ধারা অনুযায়ী সরকার যেকোন স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি জোরদখল করিতে পারেন।

সর্বশেষে, নিরাপত্তা আইন পুলিশের হাতে ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসীর অবাধ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। সাদা কথায়, পুলিশের দাপট ও দৌরাত্ম্য যাহাতে কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে-দিকে নিরাপত্তা আইন অতিশয় সচেতন। কারণ ইহা পুলিশ সন্ত্রাস চালানোরই একটি জঘন্য হুকুমনামা।

সম্পত্তি জোর-দখল এবং সংরক্ষিত এলাকা

তাই দেশের মানবিক অধিকার এবং সভ্য সমাজের মর্যাদা ও অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে এই আইনের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম গণ-আন্দোলন আজ একান্ত প্রয়োজন। কংগ্রেসী রাজত্বের শাসকদের হাত হইতে এই মারণাস্ত্র অবশ্যই কাড়িয়া লইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং সংগ্রাম অপরিহার্য। বাজেট অধিবেশনে এই আইন উত্থাপিত হইবার পূর্বেই ইহার বিরুদ্ধে লক্ষ কণ্ঠে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠা একান্ত আবশ্যক। শহিদ শিশিরে রক্ত-স্বাক্ষরিত পথ বাহিয়াই আজিকার গণ-আন্দোলনকে কংগ্রেস শাসকদের সহিত মুকাবিলা করিতে হইবে। ঐক্যবদ্ধভাবে এই পথে আগাইয়া গিয়াই আন্দোলনের মিলিত আঘাতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের মারণাস্ত্র সময় থাকিতে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ইহা আত্মরক্ষার সংগ্রাম, ইহা সভ্যতা ও মানবতার অতি প্রাথমিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে শরিক হওয়া প্রত্যেক সৎ এবং সভ্য নাগরিকেরই পবিত্র কর্তব্য।

টিকা . পুস্তিকাটি পড়ার পর ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এটি ছাপা হয়েছিল ১৯৫২-১৯৫৩ সালে। — সম্পাদক

গণশক্তি প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তৃতীয় অধ্যায়

পার্টির বেআইনি পর্বে পত্র-পত্রিকা এবং কৃষক-মহিলা-ছাত্র আন্দোলন

পত্র-পত্রিকা

কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে বে-আইনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির দপ্তর এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলেও পার্টির বইয়ের দোকান 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সী'র ওপর সরকারের তরফ থেকে তখনও পর্যন্ত কোন আঘাত এসে পড়েনি। তাই এই দোকান থেকেই পার্টির বই বিক্রি ছিল অব্যাহত। তবে তা ছিল মাত্র ১ বছর, তার পরে সরকারের তরফ থেকে এন.বি.এ. বন্ধ করে দেওয়া হল। ফলে, মার্ক্সীয় সাহিত্য প্রচারের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। পার্টির দপ্তর বন্ধ, পাটির পত্রিকা বন্ধ, মার্ক্সীয় সাহিত্য বিক্রির দোকান বন্ধ। এই রকম এক অবস্থায় সকলের ভাবনা মার্ক্সীয় সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে; কিন্তু তা কীভাবে?

এরই ফলশ্রুতিতে 'নিউ পাবলিশার্স' নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা, ৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২ এই ঠিকানায় গড়ে তোলা হল। এ ছাড়াও ছিল সোভিয়েত বইপত্র আমদানির জন্য ম্যাডান ষ্ট্রীটে 'কারেন্ট বুক ডিসট্রিবিউটার্স'। 'নিউ পাবলিশার্স' থেকে 'মার্ক্সবাদী' নামে মাঝে মাঝেই সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি বিষয়ক একটি সংকলন প্রকাশিত হত। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এর ওপর বই প্রকাশ এবং বিক্রিও এই প্রকাশনী সংস্থাই করত[১]। সেই সময়ে বিভিন্ন নামে কয়েকটি পত্রিকা কমিউনিস্ট পার্টির বেনামে প্রকাশিত হত। যেমন— খবর, নূতন খবর, নূতন সংবাদ প্রভৃতি। 'নূতন সংবাদ'-এর শারদীয় সংখ্যার সম্পাদনা করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বিনয় ঘোষ। কবি সুভাষের 'অগ্নিকোণ' কবিতাটি প্রথম ছাপা হয়েছিল এই সংখ্যায়। এখানে উল্লেখ্য, এইসব পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল পার্টির এক বৃহৎ লেখক ও সাংবাদিক গোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে ছিলেন রমেন ব্যানার্জী, সুনীল সেনগুপ্ত, অধীর চক্রবর্তী, সুধাংশু দাশগুপ্ত প্রমুখ[২]।

এছাড়াও আরও কয়েকটি প্রচারপত্র ও পুস্তিকা কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে প্রকাশিত হত। যেমন— 'কমিউনিস্ট বুলেটিন', 'প্রাদেশিক সার্কুলার', 'পি সি সমাচার পত্র', 'প্রোসেক্ট স্পেশাল নোট' ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে আমাদের হস্তগত হয়েছে এমন কয়েকটি সংখ্যা, যা সহায়ক তথ্য হিসাবে দেওয়া হল। এগুলির মূল বক্তব্য ছিল :

(ক) কমিউনিস্ট বুলেটিন (১ জুন ১৯৪৮) — কংগ্রেসী সরকার শ্রমিকদের ওপর যে

ভাবে আঘাত হেনে চলছিল এবং যে সংবাদ 'স্বদেশী' কাগজে ছাপা হত না, সেগুলিকেই এই সংখ্যায় উল্লেখ করে সভ্য ও সমর্থকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ছাঁটাই কর্মচারীরা সরকারের নির্দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, কর্মচারীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে এবং ইউনিয়নকে শক্তিশালী করছে, সেই খবরই প্রকাশিত হয়েছিল কমিউনিস্ট বুলেটিনের এই সংখ্যায়। আর ছিল শ্রী দুর্গা কটন মিলস্-এর মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের হরতালের খবর এবং মালিকদের দাঙ্গা প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য ইউনিয়নের সচেতন প্রয়াস। ছিল স্ট্রাইক ভাঙ্গার জন্য আই এন টি ইউ সি'র প্রচেষ্টা ও ধাপ্পাবাজী। খবর থাকত শ্রমিক-মধ্যবিত্তের যুক্তফ্রন্ট গঠনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সূচনা[৩]।

(খ) কমিউনিস্ট বুলেটিন (১৫ জুন ১৯৪৮) — এই বুলেটিনে ছিল জমির জন্য কৃষকের লড়াই এর ওপর খসড়া প্রস্তাব। পার্টি সেইসময়ে বাংলার গ্রামে জমিদারের অত্যাচার, চোরাবাজার, দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় ব্যাপক সংগ্রাম শুরুর মধ্য দিয়ে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে বলে মনে করেছিল। জনজাগরণের ভিত্তি বিশ্লেষণ করেই রচিত হয়েছিল এই প্রস্তাব। রণধ্বনি ছিল লাঙ্গল যার জমি তার; সাম্রাজ্যবাদ, জমিদারি প্রথা ওচোরাবাজারের উচ্ছেদ; প্রকৃত স্বাধীনতা ও প্রকৃত গণতন্ত্র[৪]।

বে-আইনি পর্বে পার্টিকে গোপন সংগঠনের একটা পরিকাঠামো তৈরি করে নিতে হয়েছিল। পার্টি কমরেডদের অগ্রিম বিপদের খবর পৌঁছে দেওয়া, সংবাদ আদান প্রদানের কাজ করা, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, কমরেডদের সঠিক কাজে নিযুক্ত করা ইত্যাদি ছিল সেই পরিকাঠামোর এক একটা অঙ্গ। এই সময় পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি 'গোপন সংগঠনের কায়দা' এই নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। এটি লিখেছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতা ও. পিয়াটনিট্স্কি ৩০ এর দশকের মধ্যভাগে। এই সময় ফ্যাসিবাদের বিপদ প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও এই রিপোর্ট অনেক আগে লিখিত কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পার্টি এর মূলনীতির নির্ভুলতা বিবেচনা করে এটি ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে পুনঃ প্রকাশ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনি পর্বে 'গোপন পার্টি' চালানোর যে সব কায়দার কথা উক্ত বইয়ে বলা আছে, সেগুলি সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা। তা করতে পারলে, শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনকে রক্ষা করা যাবে এবং গণ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পথে সাহায্য করবে[৫]।

কৃষক আন্দোলন

পার্টির বে-আইনি অবস্থাতেও, কমিউনিস্ট পার্টি তার গণসংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে যে সব আন্দোলন সংগঠিত করেছিল তা অনেক সময়েই ১৯৪৬ সালের মত ছিল না। যদিও তার অনেকগুলির মধ্যেই তীব্রতা ছিল যথেষ্ট। আন্দোলনের ব্যাপকতা ছিল না, কিন্তু তা কখনই স্তিমিত হয়ে পড়েনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—

১৯৪৮ সালের ১২ মার্চ হুগলী জেলার বড়া কমলাপুর গ্রামের কৃষকদের ওপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়েছিল সেদিনের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশবাহিনী। জমিদারদের পক্ষ নিয়ে সেদিন তারা গুলি চালিয়েছিল নিরস্ত্র কৃষক জনতার ওপর। এতে দু'জন কৃষক সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায় এবং নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে অনেকেই সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায়ের মধ্যে এর জন্য কোন অনুশোচনা দেখা যায়নি। বরং সেসময়কার অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইনস্পেকটর জেনারেল অব পুলিশের কাছে তিনি কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন যে আরও বেশি সংখ্যক কৃষককে হত্যা করা হয়নি কেন?

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের নোট—

"নং ৩৬৫৩

এ৪৬১-৪৮

তারিখ ৮-৬-৪৮

১২-৩-৪৮ তারিখে কমলাপুর গ্রামে পুলিশের গুলি চালনা সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করিয়াছেন যে গুলিচালনা অদ্ভুত রকম লক্ষ্যহীন ও অকার্যকারী বলিয়া মনে হয়। এই বড় জনতা সামান্যই দূরে ছিল এবং মোট ২৯ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল। তবুও মাত্র তিনজন হতাহত হইয়াছে। এই গুলি চালনা লক্ষ্যহীন হইয়াছিল কেন এবং ইচ্ছা করিয়াই এরূপ করা হইয়াছিল কিনা তাহা মাননীয় মন্ত্রী জানিতে চাহিয়াছেন[৬]।"

ঐ হুগলী জেলাতেই, এরই ১ বছর পর, আরেকটি কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, অঞ্চলটি হল পোলবা থানার ডুবেরভেড়ি গ্রাম। তেভাগা ও অন্যান্য দাবি নিয়ে ডুবেরভেড়ি অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছিল ১৯৪৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য শুরু হয়েছিল ব্যাপক পুলিশী আক্রমণ। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নিমাই ভট্টাচার্য। এই আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট সক্রিয়। এদের প্রধান কাজ ছিল গ্রামে পুলিশের প্রবেশের পূর্বেই শাঁখ বাজিয়ে কৃষকদের কাছে অগ্রিম সংকেত পৌঁছে দেওয়া। এছাড়া তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া এবং সময়মত পালিয়ে যেতে সাহায্য করা। এরাই প্রথম পুলিশের মুখোমুখি হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলত। ফলে এরাই হয়ে দাঁড়ালো পুলিশী আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য। সেই সময়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন ৬ জন কৃষক রমণী। এঁরা হলেন পাঁচুবালা দাসী, দাসীবালা মাল, পুষ্পবালা দাসী, কালীবালা পাখিরা, মুক্তকেশী মাঝি এবং রাজকৃষ্ণের মা প্রমুখ[৭]।

কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলন পার্টির বে-আইনি অবস্থাতেও তীব্র হয়ে উঠেছিল। পার্টির সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইন কাকদ্বীপ এবং উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কৃষক আন্দোলনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করলেও কাকদ্বীপে এই আন্দোলন যেমন জঙ্গিরূপ ধারণ করেছিল তেমনি আবার কোথাও কোথাও সশস্ত্র আন্দোলনেরও রূপ নিয়েছিল। কাকদ্বীপের যে সমস্ত অঞ্চলে এই আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করেছিল, সেগুলি হল চন্দনপিঁড়ি, বুধাখালি, হরিপুর, লয়ালগঞ্জ, রাজনগর প্রভৃতি। এই সব অঞ্চলের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন কংসারী হালদার, অশোক বসু, বাসবিহারী ঘোষ, মানিক হাজরা, যতীন মাইতি, গজেন মালি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। কাকদ্বীপ এর আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, ভূমিব্যবস্থা আর কীভাবে সেখানকার গণসংগঠন গড়ে উঠেছিল, সে ব্যাপারে মৈত্রেয় ঘটকের ১৯৪৬-৪৮ এবং ১৯৪৮-৫০ এর সময়কালের দুই পর্বের একটি সুচিন্তিত লেখা পাঠক সাধারণকে অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে বলে মনে করি[৮]। কাকদ্বীপের আন্দোলনকে "শিশু তেলেঙ্গানা" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির ২৪ পরগণা জেলা কমিটি 'বাংলার শিশু তেলেঙ্গানা' নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছিল[৯]। এই লেখাগুলির মধ্য দিয়ে সে অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

তেভাগা আন্দোলন স্বাধীনতা প্রাপ্তির দু'বছর আগে থেকে শুরু হয়ে পরবর্তীকালে আরও দু'বছর চলেছিল। প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ছিল প্রচুর যদিও পরের পর্যায়ে কাকদ্বীপ বাদে অন্যত্র তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পূর্বে অবশ্য তেভাগার আইন পাশ করানো সম্ভব হয়নি, কিন্তু আন্দোলনের চাপে স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অর্ডিনান্স জারি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা মেনে নিয়েছিল। যদিও তা কাজে চালু হল না। তাই আন্দোলনও থামল না। সশস্ত্র অভ্যুত্থানও অব্যাহত রইল ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত।

বিভিন্ন জেলায় কী ভাবে তেভাগা আন্দোলনে শুরু হয়েছিল এবং বিস্তার লাভ করেছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের কয়েকটি লেখা আমরা উল্লেখ করতে পারি যেগুলি পাঠকবর্গকে সেই জেলার তেভাগা আন্দোলনের একটা চিত্র পেতে সাহায্য করবে। যেমন— মণিকৃষ্ণ সেন-এর 'রংপুরের তেভাগা সংগ্রামের কথা'[১০], সুশীল কৃষ্ণ সেন-এর 'অবিস্মরণীয় তেভাগা সংগ্রাম ও দিনাজপুর'[১১], ভূপাল পাণ্ডার 'মেদিনীপুরে তেভাগা সংগ্রাম'[১২], আশু দত্ত'র 'ময়মনসিংহে তেভাগা আন্দোলনের এক অধ্যায়'[১৩], বিমল দাশগুপ্তের 'জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে শ্রমিক কৃষকের রক্তের রাখীবন্ধন'[১৪], পলাশ রায়-এর 'যশোরের মুক্ত অঞ্চল'[১৫], সুবল মিত্র'র 'মৌ-ভোগ (খুলনা-সম্পাদক) অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি'[১৬], ভবানী সেন-এর 'বাংলায় তেভাগা আন্দোলন'[১৭] প্রভৃতি। এমনকী তেভাগা আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে সেসময় অনেক কমিউনিস্ট সাহিত্যিক অনেক গল্প-উপন্যাস-রিপোর্টাজও লিখেছিলেন। যেমন— মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ। তেভাগার দাবিতে সারা বাংলা জুড়ে ৬০ লক্ষ ভাগচাষিদের লড়াই যে শ্রমিক শ্রেণিরই এক মিত্র শক্তির লড়াই একথা বোঝানোর জন্য এবং কংগ্রেস ও লীগের ওপর থেকে মধ্যবিত্ত কৃষকের মোহ কাটানোর জন্য 'তেভাগার লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণি ও মধ্যবিত্তের পক্ষ নির্বাচন' শিরোনামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন ভবানী সেন 'রবীন্দ্র গুপ্ত' ছদ্মনামে। এটি লিখিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ৫ জানুয়ারী[১৮]।

তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলাটা হয়ত অসমাপ্ত থেকে যাবে যদি নাচোলের কৃষক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা না হয়। একথা ঠিক যে নাচোলের এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর। নাচোল তখন পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত এবং এই আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য-সমর্থকদের অংশগ্রহণও ছিল, বলা চলে তাঁদেরই নেতৃত্বে এই আন্দোলন চলেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে যখন মালদহের গাজোল, বামুনগোলা প্রভৃতি অঞ্চলে হাটতোলা ও আবওয়াব বিরোধী আন্দোলন চলছিল, তখন তারই মধ্য দিয়ে নাচোল আন্দোলনের জমি তৈরি হতে থাকল। আর এই আন্দোলন প্রকৃত রূপ নিল ১৯৪৯ সালে। নাচোলের এই আন্দোলনে ইলা মিত্রের ভূমিকা ছিল কিংবদন্তীতুল্য। তাঁর এই ভূমিকার কথা বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ সত্যেন সেন 'নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন[১৯]। এপার বাংলার তিন জন প্রথম সারির সাহিত্যিক ইলা মিত্রকে স্মরণীয় করে রেখেছেন তাঁদের লেখায়। কবি গোলাম কুদ্দুস লিখেছেন 'ইলা মিত্র' কবিতা; কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'কেন বোন পারুল ডাকোরে' এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'সূর্যমুখী' ও 'ফুল ফোটার গল্প'। ইলা মিত্র নাচোলের কৃষক আন্দোলনের পর এবার বাংলায়

চলে আসেন। সেই কারণে ঘটনাটি ওপার বাংলার হলেও কিছুটা উল্লেখ হয়তো স্বাভাবিক নিয়মেই এসে পড়েছে।

১৯৪৩ সালে বাংলার মন্বন্তরে গ্রামে জমিদারদের তরফ থেকে খাদ্য মজুত করে রাখার জন্য যে লক্ষ লক্ষ কৃষক অসহায়ভাবে মৃত্যুর শিকার হয়েছিল, তারাই ১৯৪৬-৫০ এর তেভাগা আন্দোলনে জেগে উঠেছিল সেইসব জমিদারদের বিরুদ্ধে। ১৯৪৬ সালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট দাঙ্গায় যে সব হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তের হোলি খেলা খেলেছিল, তারাই লাল ঝাণ্ডার নীচে ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য গঠন করেছিল তেভাগার সংগ্রামী আন্দোলনে। লড়েছিল জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে সেই আন্দোলনের এক নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসাবে। কেবল তেভাগা আন্দোলনেই নয়, এমনকি ধনিকের সৃষ্টি করা বিপর্যয়ের সময় অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, মহামারি, দাঙ্গা প্রভৃতিতেও রিলিফের কাজের সময়ে, তাই আমরা দেখি— সরকার, জমিদার ও মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পাশাপাশি রিলিফের কাজ করার জন্যও স্কোয়াড তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিল বাংলার পার্টি। নির্দেশ দিয়েছিল রিলিফের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, রিলিফ সপ্তাহ পালন করতে হবে এবং প্রত্যেক গণসংগঠনকে রিলিফ স্কোয়াড তৈরি করতে হবে। সর্বোপরি বেআইনি অবস্থায় কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে[২০]।

প্রত্যেক জেলায় ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষিদের সংগঠিত করার জন্য "ক্ষেতমজুর সমিতি" গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পার্টির তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বাংলার পার্টি বলেছিল এই সব ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষিদের নতুন মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। সংগ্রামের ময়দানেই এদের মনুষ্যত্ববোধ জেগে উঠবে। সংগ্রামের ময়দানে নামার জন্য 'উনিশ দফা দাবি'র কথাও বলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে পার্টি তার কর্মীদের অগ্রণী ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হতে বলেছিল[২১]।

'ক্ষেত মজুর' সমিতি গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করার সময় বলা হয়েছিল যে— "... ক্ষেতমজুর সমিতি সরাসরি কৃষক সভার (ইউনিট) অংশ হিসাবেই গণ্য হয়... বর্তমান কৃষক সভার গঠনতন্ত্রে এই নিয়মই আছে।" এর এক মাস পরে পার্টির প্রাদেশিক কমিটি ডিসেম্বর মাসের কমিউনিস্ট বুলেটিন মারফৎ অতীতের কৃষক সংগ্রামে বিশেষত তেভাগা লড়াইয়ে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছিল, সেগুলি তুলে ধরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। বস্তুত এটি ছিল অতীতের ত্রুটি বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করে কৃষক-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বচ্ছতা আনার জন্য প্রাদেশিক পার্টির প্রস্তাব। প্রস্তাবটির শিরোনাম ছিল "কৃষি সংকট ও কৃষকের লড়াই"[২২]।

এই প্রস্তাবে কৃষক সমিতি তৈরি করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, "এই সংগঠনই ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের গ্রামাঞ্চলে সংগ্রাম পরিচালনায় সচেতন নেতৃত্ব তৈরি করিবে।" ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার ওপর এই জোর দিতে গিয়ে তেভাগা আন্দোলনের একটি ত্রুটির দিক পার্টি তুলে ধরেছিল। বলেছিল "বিগত তেভাগা সংগ্রামের মত একটা বিরাট সংগ্রামের নেতৃত্ব গঠনের জন্য তেভাগা কমিটি আমরা তৈরি করিয়াছি ধনী কৃষক এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের লইয়া, অথচ সংগ্রামটা ছিল প্রধানত গরীব কৃষকের, লড়িয়াছেও বেশি তাহারাই।" কথাটা সত্যি এই কারণের জন্য যে সেসময় বাংলার কৃষকদের শতকরা প্রায় ৮৬ জন ছিল গরীব কৃষক।

ক্ষেতমজুরদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনের কার্যবিবরণী সম্বলিত একটি পুস্তিকা "ক্ষেতমজুরের সংগ্রাম ও সংগঠন" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে। এরই দু'মাস আগে অর্থাৎ ২৮ আগস্ট ১৯৪৯ 'মঞ্জিল' পত্রিকায় বলা হয়েছিল, এটিই হল ভারতবর্ষে ক্ষেতমজুরদের প্রথম সম্মেলন। সম্মেলন থেকে গৃহীত 'গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী'তে বলা আছে যে, ট্রেড ইউনিয়নটির নাম হবে— 'পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি'। সমিতির রেজিষ্টার্ড অফিসের ঠিকানা— ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট (চতুর্থ তল), কলকাতা-১২। এর কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে যে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়নের অংশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন গড়ে তোলা হোক। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হল, "পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত সমিতিরূপে কাজ করিবে এবং তাহারই মারফৎ দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সহিত সংযুক্ত থাকিবে"[২৩]।

এখানে 'মেদিনীপুরের কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন' সম্পর্কে একটি রিপোর্টের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও এই রিপোর্টটি ছিল ব্যক্তিগত ধারণার ওপর ভিত্তি করে লেখা। রিপোর্টারের নাম ছিল 'মধু'। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এটি ছিল কোন একজন কমরেডের 'টেক' নাম। লেখাটি ছিল খুবই বিশ্লেষণমূলক, যা পড়লে সেই জেলার জমিদারি অঞ্চল, ভাগচাষ অঞ্চল, সাঁজা অঞ্চল এবং জঙ্গল অঞ্চলের সমস্যা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'পি সি সমাচার পত্র' কাগজে যা প্রকাশিত হত পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি থেকে। বিভিন্ন জেলার, প্রদেশের এবং কেন্দ্রের ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন ও অন্যান্য ফ্রন্টের রিপোর্ট এবং তথ্যমূলক সংবাদ পরিবেশন করার জন্য কেন্দ্রীয় পার্টি "পি সি ইনফরমেশন ডকুমেন্ট" প্রকাশ করত। এরই বঙ্গীয় সংস্করণ বেরোত "পি সি সমাচার পত্র" নামে। উদ্দেশ্য হল আন্দোলন, সংগঠন ও সংগ্রামের সংবাদ সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মেদিনীপুরের "কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে" রিপোর্টটি এই উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিন "পি সি সমাচার পত্র" কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল[২৪]।

মহিলা আন্দোলনের ওপর সরকারের আক্রমণ

পার্টির বে-আইনি অবস্থাতে কাকদ্বীপ ও সুন্দরবনের কৃষক আন্দোলন ছাড়া অন্যান্য স্থানে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন ও অন্যান্য ফ্রন্ট আন্দোলনের তীব্রতা বহু রকমের সীমাবদ্ধতার জন্য কমে গেছিল। তবে সেই সময়কার বাস্তব পরিস্থিতির আপেক্ষিকে তাকে যথেষ্টই বলা চলে। হয়ত ধারাবাহিকতার অভাব ছিল, তবে যখনই কোন আন্দোলন হয়েছে তার মধ্যে আন্তরিকতা ও সংগ্রামী মেজাজটা বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে। এই অর্থে বলা যায় যে, পার্টির বে-আইনি পর্বে বিভিন্ন ধরনের গণ আন্দোলনে পার্টির মহিলা কমরেডদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।

বাংলার মন্বন্তরে, তেভাগার কৃষক আন্দোলনে এবং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দমনপীড়ন নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ ঘরের কমিউনিস্ট মেয়েরাও নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন, এমন কি প্রাণও দিয়ছিলেন। বগুড়ায় তেভাগার সংগ্রামে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পালানু বর্মনের মা, জলপাইগুড়িতে বুড়িমার নেতৃত্বে মেয়েরাই জোতদারের লাঠিয়াল ও পুলিশের মোকাবিলা করেছিলেন। এরও আগে ময়মনসিংহের টংক অঞ্চলের মহিলা রাসমণি, মেদিনীপুরের সত্যবালা বেরা, শিবরানী মিত্র,

বিমলা মাঝি, সিন্ধুবালা ভুইঞা, ব্রজবালা দলুই প্রমুখ মহিলার নাম ছিল সংগ্রামের শিরোনামে।

সে সময়কার বহু আন্দোলনের মধ্য থেকে তৈরি হয়েছেন, পরবর্তীকালের বহু প্রতিষ্ঠিত প্রথম সারির মহিলা নেত্রী। যেমন— রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, কনক মুখার্জী, গীতা মুখার্জী, বিদ্যা মুন্সী, বাণী দাশগুপ্ত প্রমুখ। এঁরা সেই আন্দোলনকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেমন এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বহু দূর তেমনি আজ তা এক শক্তিশালী মহিলা আন্দোলনে পরিণত করেছেন।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালের কয়েকটি সমস্যাকে নিয়ে মহিলা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাস্তুহারা সমস্যা, রাজনৈতিক ও বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির দাবি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর পুলিশী অত্যাচার প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে সংগ্রাম করেছিল 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র সদস্যরা। ১৯৪৮ সালের ২৬ মে উক্ত সব দাবি নিয়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যা ও সমর্থকেরা এক মহিলা মিছিল করে 'রাইটার্স বিল্ডিং' অভিযান করেছিল। একে মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে এসেছিল কংগ্রেস সরকারের পুলিশ বাহিনী। গ্রেপ্তারের আদেশ এল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায়ের কাছ থেকে। বহু মহিলা আক্রান্ত হলেন। অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। রেণু চক্রবর্তীর কথায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'কে বে-আইনি ঘোষণা করা হল।[২৫] আসলে, সংগঠনটি বে-আইনি হয়েছিল ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারী।

তেভাগা আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৪৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গুলি চলেছিল হাওড়ার মাশিলা গ্রামে। এই ঘটনায় চারজন মহিলা মারা যায়। এর মধ্যে ছিল নববিবাহিতা ১৪ বছরের বধু মনোরমা। সাঁকরাইলের হাটাল গ্রামে মারা যায় ১০ জন মহিলা।[২৬] এর এক বছর পর হুগলীর ডুবেরবাড়ি গ্রামের ৬ জন কৃষক রমণীকে গুলি করে হত্যার ঘটনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ডাকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে এবং নেহেরু-বিধান রায়ের জন বিরোধী নীতির প্রতিবাদে ভারতসভা হল-এ এক সভা সংগঠিত হয়েছিল। সভায় একমাত্র বক্তা ছিলেন অনিলা দেবী। সভা শেষে এক শান্তি মিছিল সমিতির ফেস্টুন নিয়ে, স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলেছিল কলেজ স্কোয়ারের দিকে। তখন শহর জুড়ে ১৪৪ ধারা। মিছিলে অংশগ্রহণকারী মহিলারা সেটাকে উপেক্ষা করে স্লোগান দিয়েছিল— গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে হবে, বিনা বিচারে আটক রাখা চলবে না, বিনা শর্তে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই ইত্যাদি। পুলিশ সেই মিছিলের অগ্রগতি রোধ করেছিল বহুবাজার স্ট্রীট ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে। এই মিছিলের উপর পুলিশের গুলি চললো। ৮টি তাজা প্রাণ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। এঁদের মধ্যে ৪ জন ছিলেন মহিলা— লতিকা সেন, গীতা সরকার, অমিয়া দত্ত ও প্রতিভা গাঙ্গুলী। বাকী ৪ জনের মধ্যে একজনের নাম যমুনা দাস মাহাতো, অন্য তিন জনের নাম অজ্ঞাত।

নেত্রী হিসাবে লতিকা সেন ছিলেন এই মিছিলের অগ্রভাগে। রেণু চক্রবর্তীর কথায়, 'কংগ্রেসী পুলিশের গুলিতে মরল ৪টি কাঁচা প্রাণ। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মেয়েদের এমন ঠাণ্ডা রক্তে খুন এর আগে আর হয়নি কলকাতার বুকে। এঁদের অপরাধ এঁরা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চেয়েছিল''।[২৭] বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে কলকাতার রাজপথ। তার মধ্যে এই ৪ জন মহিলার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ইতিহাস সৃষ্টির পথে আরেকটি

সংযোজন। এই ঘটনা বারবার মনে করিয়ে দেয় সেদিনের কংগ্রেস সরকারের দুঃশাসনকে। সেই শাসনের নৃশংসতা ও বর্বরতাকে দেখে কোন কংগ্রেস কর্মীর মধ্যে দেখা গেল না কোন অনুতাপ বা কোন সহানুভূতি বা সেই সব শহিদদের মাতৃহীন শিশুর জন্য একফোঁটা চোখের জল অথচ যাদের "মা— হারিয়ে গেছে, তারা ভরা কান্নার আকাশে"[২৮]। কি করে একটা আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে হয়— এই দৃষ্টান্ত নতুন করে স্থাপন করেছিল সেদিন কমিউনিস্ট মেয়ে লতিকা-প্রতিভা-অমিয়া-গীতার আত্মদান।

মণিকুন্তলা সেন তখন ছিলেন মেদিনীপুর জেলে। পরদিন 'জেলার' তাঁকে সেই দুঃসংবাদ পরিবেশিত সংবাদপত্রটি দিলেন। তিনি দেখলেন তার প্রিয়তম বন্ধু লতিকা এবং অন্যান্য সহকর্মীদের মৃতদেহের ছবি। শোকে মূহ্যমান মণিকুন্তলা সেন কেবল বললেন, 'লতিকাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু এখন হিংসে হতে লাগল। ও কেন জেলে এলো না, আমি কেন বাইরে মিছিলে থাকলাম না। তবে তো ওর বদলে আমিই আজ শহিদ হতে পারতাম"[২৯]। এই যেন একজন কমরেডের প্রতি আরেকজনের গভীর মমত্ববোধ এবং গভীর প্রত্যয়জাত শহিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

নিহত হওয়ার ঐ দিনই বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটি লতিকা'র ছবিসহ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। প্রচ্ছদের ছবির নীচে লেখা ছিল গোপন আস্তানা থেকে ব্যক্ত করা সোমনাথ লাহিড়ীর কয়েকটি কথা : "লতিকা, তোমার তপ্ত শোণিত ধারায় কলকাতার রাজপথ যারা রঞ্জিত করেছে, তাদের আমরা ক্ষমা করবো না। তোমার প্রাণের বিনিময়ে যে আহ্বান তুমি রেখে গেছ আমাদের কাছে, সেই প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যাব আমরা শেষ সংগ্রামের দিকে।" কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে 'মা বোনদের হত্যার প্রতিশোধ লও' এই শিরোনামে একটি প্রচারপত্রও বিলি করা হয়। এর শেষ চার লাইন জুড়ে নির্দেশ দেওয়া হল— "হরতাল কর। ধর্মঘট কর। ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করিয়া মিছিল কর। রাস্তায় বেড়া তুলিয়া পুলিশ ও ফৌজের পথ আটকাও। সরকারী বাস ও বিলাতী ট্রাম জ্বালাইয়া দাও। সারা কলিকাতায়, সারা বাংলায় আগুণ জ্বালাইয়া দাও"[৩০]। প্রসঙ্গত, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সদস্যা ছিলেন লতিকা দাস যিনি রণেন সেনের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে লতিকা সেন হয়েছিলেন। তিনি পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন ১৯৩৬ সালে।

এই পুস্তিকা ও প্রচারপত্রটি কংগ্রেস সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। ২৭ এপ্রিলের ওই নজীর বিহীন মর্মান্তিক ঘটনায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'শোচনীয় ঘটনা' এই শিরোনাম দিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছিল। একদিকে এই সম্পাদকীয়তে বলা হল— "... চারিজন মহিলা সহ সাত ব্যক্তির নিহত হইবার সংবাদে সকলেই বেদনাবোধ করিবে।" অন্যদিকে বলা হল— "হাঙ্গামাকারী রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সতর্ক হইতে হইবে, যেন তাহাদের চিন্তা ও বিচারের ভুলে হাঙ্গামাকারীগণ কোন সহানুভূতি বা প্রশ্রয় না পাইতে পারবে।' এর পাশাপাশি এটাও বলা হয়েছে যে, "পুলিশ কর্তৃপক্ষ শোভাযাত্রা বাহির হইবার পূর্বেই সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাহা হইলে হাঙ্গামার সূত্রপাতের সুযোগও হ্রাস পাইত অথবা হাঙ্গামা আদৌ ঘটিতে পারিত না"[৩১]। এই সম্পাদকীয়টি ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেস সরকার ও পুলিশের পক্ষাবলম্বী।

এই সময়ে ১৯৪৯ সালের ১০-১৫ ডিসেম্বর বেজিং-এ সারা এশিয়ার নারী সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে এই সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল কলকাতায়। কিন্তু নেহেরু সরকার কোন অনুমতি না দেওয়ায় স্থান পরিবর্তন করে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বেজিং-এ। এই সম্মেলনে এশিয়ার ১৪টি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। এই সব দেশ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের এশীয় প্রজাতন্ত্র (কিরখিজিয়া, উজবেকিস্থান, তুর্কমেনিয়া, কাজাখস্থান, তাজাকিস্থান ও আজারবাইজান), মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, বর্মা (বর্তমানে মায়ানমার), কোরিয়া, শ্যাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ, ইরান, সিরিয়া, লেবানন ও ইজরায়েল। মার্কিন অধিকৃত জাপানী কর্তৃপক্ষ জাপানের মহিলা সংগঠনকে উক্ত নারী সম্মেলনে যোগদানের ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করেছিল। আর তারই প্রতিবাদে ঐ মহিলা সংগঠন পৃথকভাবে এশীয় সম্মেলনের দিনেই টোকিও শহরে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেছিল। এছাড়াও এশিয়ার বাইরের কিছু দেশের প্রতিনিধিরাও বেজিং-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, কিউবা প্রভৃতি।

এই সম্মেলন থেকে "এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মা-বোনদের প্রতি সম্মেলনের আবেদন" ঘোষিত হয়েছিল। এর মূল কথা ছিল বিশ্বশান্তি রক্ষা, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন, জনগণের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, নারীদের মুক্তি এবং সন্তান সন্ততিদের সুখী ভবিষ্যৎ[৩২]। এই সম্মেলনের পূর্বে বঙ্গীয় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির ২ অক্টোবরের প্রচার পত্রে "মায়েদের প্রতি ম্যাকসিম গোর্কির আবেদন"টি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল[৩৩]।

ছাত্র আন্দোলন এবং কংগ্রেস সরকারের দমননীতি

পার্টির বে-আইনি পর্বে ছাত্র আন্দোলনের ওপরেও আঘাত এসেছিল। সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যে কটি ছাত্র সংগঠন ছিল, তার মধ্যে নিখিলভারত ছাত্র ফেডারেশনের কমিউনিস্ট ছাত্রদের ওপর সরকারের দমননীতির প্রয়োগ ছিল বেশি। ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল, বিনা বিচারে আটক করা হচ্ছিল। তবুও ছাত্রদের লড়াই, আন্দোলন, বিক্ষোভ সবই জারি ছিল। তবে পার্টির উগ্র বামপন্থী লাইনের প্রভাবও সেগুলির ওপর পড়ায় ব্যর্থতার মুখোমুখিও হতে হয়েছিল। যেমন বলা চলে, ১৯৪৯ সালের সারা ভারত রেল ধর্মঘটের সমর্থনে ছাত্ররা ধর্মঘট করেছিল। আবার রেল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় হঠকারিতার আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিনের ছাত্র আন্দোলন সফল হয়নি। আবার এই ছাত্ররাই নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে যখন আন্দোলন করেছে, তখন তা সফলও হয়েছে। যেমন, ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলেজের বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে দু'লাখ ছাত্রদের ধর্মঘট, ঐ একই কারণে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্কুল ছাত্ররা ধর্মঘট করে। এরপর ছাত্ররা আবার ধর্মঘট করেছিল ঐ বছরই ৮ মার্চ। বাস্তুহারাদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালের ১২ জানুয়ারী কলকাতার ছাত্ররা এক ঐতিহাসিক ধর্মঘট সংগঠিত করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে তখন প্রতিদিনই চলেছিল ছাত্র-পুলিশের সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে বেশ কিছু ছাত্র মারা গিয়েছিল। আহত ছাত্রদের বাঁচানোর জন্য রক্ত দিতেও এগিয়ে এসেছিল বহু ছাত্র। এই ছাত্ররাই ১৯৪৮ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারির মোকাবিলায় সেবা-শুশ্রূষার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল।

প্রেসিডেন্সী এবং দমদম জেলে সশস্ত্র জেল পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবির লড়াইয়ে

শ্রমিক ও কৃষক বন্দীদের সঙ্গে বহু ছাত্রবন্দীও সেদিন লড়াই করেছিল। আবার যখন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রেসিডেন্সি, দমদম, আলিপুর জেল থেকে অন্যত্র সরানোর কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিকল্পনা করছিল তারই প্রতিবাদে ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে বাংলার ছাত্ররা ৮ আগষ্ট ধর্মঘট পালন করেছিল। ৯ আগষ্ট পালন করল 'কমনওয়েলথ বিরোধী দিবস' হিসাবে। তবে অন্য সব ছাত্র সংগঠন যখন 'ভারত ছাড়ো' দিবস পালন করল, সেসময় ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্ররা এরই সঙ্গে যুক্ত করল পার্টির সংকীর্ণতাবাদী লাইনের স্লোগান। ফলে ছাত্র ঐক্যের মধ্যে মাঝে মাঝেই দেখা দিত মতভেদ, ১৫ আগষ্ট ছাত্র ফেডারেশন এবং অন্যান্য সংগঠন যেমন, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা, ক্ষেতমজুর সমিতি প্রভৃতি যুক্ত ভাবে কমলওয়েলথ বিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিল। শ্রমিকশ্রেণির ওপর ব্যাপক ভাবে মারধোর করার প্রতিবাদে ছাত্ররা বহু জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। বেলঘরিয়ার টেক্সম্যাকো কারখানার ইউনিয়নের সম্পাদককে গুলি করে মারার প্রতিবাদে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছিল।

পার্টির বে-আইনি অবস্থায় ছাত্র ফেডারেশনের সভ্যসংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল ১৫ হাজারে। স্বাধীনতার পূর্বে অবিভক্ত বাংলার এই সভ্যসংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। এর সঙ্গে তুলনা করলে বে-আইনি পর্বের ফেডারশেনের সদস্য সংখ্যাকে ভালই বলা চলে। দেশ বিভাগ জনিত কারণ ছাড়াও, সদস্য সংখ্যা কমে যাওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। সেসময় বাংলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। যেমন ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্রব্লক, আর. এস. পি.-র Progressive Sutdents Union (PSU), এস. ইউ. সি.-র Democratic Student's Organisation (DSO) ইত্যাদি। কিছু পরে প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টির Students Associ·tion তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া যেমন করে এ-আই-টি-ইউ-সি থেকে কংগ্রেস বেরিয়ে গিয়ে পৃথক এক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন (INTUC)' গঠন করেছিল, তেমনি তাদের অনুগামী ছাত্ররাও একটি সংগঠন তৈরি করেছিল— 'ছাত্র পরিষদ'।

১৯৪৯ সালের ২৩ থেকে ২৭ জুলাই কলকাতায় সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের দ্বাদশ ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনকে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সম্প্রদায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। কলকাতায় যেখানে জনসাধারণের ওপর, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের ওপর বেপরোয়াভাবে সরকারি নির্যাতন চলছিল এবং যেখানে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'কে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছিল, সেখানে সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রদের মানসিক দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০ জন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনটি ছিল ঐতিহাসিক। সময়টা ছিল পার্টির অতিবাম সংকীর্ণতাবাদী লাইন গ্রহণ করার পরবর্তী কাল এবং কংগ্রেস সরকারের বর্বরোচিত শাসন কাল। এই সম্মেলনের পর ছাত্ররা তাই লাফিয়ে পড়েছিল নতুন লড়াইয়ে— বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আবেগ নিয়ে। সে সময় কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরীতে চলছিল ধর্মঘট। সেখানকার এক শ্রমিক নেতাকে ছাত্র সম্মেলনে এনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন হয়েছিল শহিদ মিনারের (সেসময় বলা হত অক্টারলোনী মনুমেন্ট) পাদদেশে। এই সমাবেশে ৫০০০ হাজার ছাত্রছাত্রী সমেত মোট

১০,০০০ মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। সেদিন সব প্রতিনিধি এবং ছাত্র ফেডারেশনের সভ্যরা কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেছিল— নিজেদের ব্যানার, ফেস্টুন ও ঝাণ্ডা নিয়ে। ছাত্রদের এই বিরাট শক্তি দেখে আতঙ্কিত তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তাই সম্মেলন শেষ হতেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অফিসে আবার কংগ্রেস সরকারের পুলিশি হামলা ও তল্লাসী শুরু হয়ে যায়।

এই সম্মেলনের পর্যালোচনামূলক একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল 'মার্ক্সবাদী' পত্রিকায়। তাতে বলা হয়েছিল, "... ৩০ বৎসর ব্যাপী অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে ভারতের ছাত্র আন্দোলন একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের মোড়ে দাঁড়িয়েছে।" একথার অর্থ ব্যাখ্যা করে সম্মেলনে বলা হয়েছিল, "সারা বছর ধরে শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি নিয়ে যে বিরাট লড়াই চলেছে তা মিশে গেছে কংগ্রেস নেতাদের পুঁজিবাদী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সমগ্র জনসাধারণের রাজনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে। ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্য এখানেই। ছাত্র আন্দোলনের ৩০ বছরের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে এভাবেই তার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে; আর এর থেকেই বোঝা যায় যে, যে ছাত্র সাধারণ এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রভাবে ছিলেন, তাঁরা আজ চূড়ান্ত ভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিপরীত দিকে তাকাচ্ছেন, শ্রমিক শ্রেণি ও মেহনতকারী কৃষকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করছেন পুঁজিবাদ খতম করার জন্য[৩৪]।"

এই সম্মেলন থেকে ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, সেগুলি হল— শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি, রাষ্ট্রভাষা সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট ও বেকার সমস্যা, নেহেরু সরকারের নীতি, কমনওয়েলথ চুক্তি, শান্তির জন্য লড়াই, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি অভিনন্দন, চীন সংক্রান্ত প্রস্তাব, পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনকে অভিনন্দন, খাদ্য সংকট ইত্যাদি।

এইভাবে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী হঠকারী লাইনের ফলে কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্টদের মত প্রকাশে বাধাদান এবং আন্দোলন করার কর্মসূচির ওপর দমন-পীড়ন চাপিয়ে দিয়েছিল। তবে এ সত্ত্বেও কমিউনিস্টদেরকে কেউই থামিয়ে রাখতে পারেনি। পার্টির এই লাইনের ফলে, সাংগঠনিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তবুও বলা যেতে পারে যে সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও লড়াই ছিল অব্যাহত।

পরের অধ্যায়ে শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

তথ্যসূত্র

১. 'মার্কসবাদী', ৪র্থ সংকলন, জুলাই ১৯৪৯, পিছনের কভার পৃষ্ঠার বিজ্ঞপ্তি। (সহায়ক তথ্য-১)
২. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ২৪৫।
৩. কমিউনিস্ট বুলেটিন, বিশেষ সংখ্যা ১জুন ১৯৪৮।
৪. ঐ, ৪নং সংখ্যা, ১৫ জুন, ১৯৪৮।
৫. ও. পিয়াট্‌নিট্‌স্কি— গোপন সংগঠনের কায়দা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি, ১২ জানুয়ারী ১৯৪৯ (সহায়ক তথ্য-২)।
৬. বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন— দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.১৭১, প্রধান সম্পাদক অনিল বিশ্বাস।

৭. আবদুল্লাহ রসুল - কৃষক সভার ইতিহাস। (১৯৪৭-৪৯ এর তেভাগা এবং অন্যান্য কৃষক আন্দোলনের শহিদ' (পুলিশের গুলিতে)। (সহায়ক তথ্য-৩)।

৮. মৈত্রেয় ঘটক— কাকদ্বীপ (১৯৪৬-৫০), বর্তিকা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৩, সম্পাদক মহাশ্বেতা দেবী।

৯. বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির, চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, 'বাংলার শিশু তেলেঙ্গানা', লালগঞ্জ, ৭ নভেম্বর ১৯৪৯ (সহায়ক তথ্য-৪)।

১০. মোতাহার হোসেন সুফী — কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন জীবন ও সংগ্রাম, পৃ.১১৯-১৩৩, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

১১. তেভাগা রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, অবিস্মরণীয় তেভাগা সংগ্রাম ও দিনাজপুর, পৃ. ৩০, সুশীল সেন (সহায়ক তথ্য-৫)।

১২. ঐ, মেদিনীপুরে তেভাগা সংগ্রাম, পৃ. ৬৮, ভূপাল পাণ্ডা (সহায়ক তথ্য-৬)।

১৩. ঐ, ময়মনসিংহে তেভাগা আন্দোলনের এক অধ্যায়, পৃ. ৭২, আশু দত্ত (সহায়ক তথ্য-৭)।

১৪. ঐ, জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে শ্রমিক-কৃষকের রক্তের রাখী বন্ধন, পৃ. ৯৫, বিমল দাশগুপ্ত (সহায়ক তথ্য-৮)।

১৫. ঐ, যশোরে মুক্ত অঞ্চল, পৃ. ৯৮, পলাশ রায় (সহায়ক তথ্য-৯)।

১৬. ঐ, মৌভোগ অঞ্চলে তেভাগা অঞ্চলের স্মৃতি, পৃ. ১০১, সুবল মিত্র (সহায়ক তথ্য-১০)।

১৭. ঐ, বাংলায় তেভাগা আন্দোলন, পৃ. ৫, ভবানী সেন (দ্রঃ চতুর্থ খণ্ড, সহায়ক তথ্য-৩৭)।

১৮. রবীন্দ্র গুপ্ত — 'তেভাগার লড়াইয়ে - শ্রমিকশ্রেণী ও মধ্যবিত্তের পক্ষ নির্বাচন', ৫ জানুয়ারী ১৯৪৯ (সহায়ক তথ্য-১১)।

১৯. সত্যেন সেন — 'নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ', পৃ. ৯৬-৯৭।

টিকা - সত্যেন সেন-এর কথায় — "এই সরল প্রাণ সাঁওতাল জাতিরা (নাচোলের কৃষকেরা - সম্পাদক) তাঁর (ইলা মিত্র - সম্পাদক) মধ্যে কি দেখতে পেয়েছিল তা তারাই জানে, তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে তারা এক নতুন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁর নাম দিয়েছিল "রাণী মা"; ছোট, বড়, নারী-পুরুষ সবাই তাঁকে এই নামেই ডাকত। কে জানে কোন্ গুণে, কোন্ মন্ত্রে তিনি হাজার হাজার মানুষের হৃদয়-রাজ্যের রাণীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই রাণী সিংহাসনের রাণী নন, তিনি সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশে গিয়েছিলেন।...

তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রমের ব্যবধান ছিলনা। কিন্তু নেত্রী হিসাবে তাদের উপর তাঁর অদ্ভুত প্রভাব ছিল। একথা এখনকার দিনে লোকে বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল যারা তাঁর কথায় স্বেচ্ছায় জীবন দিতে পারত। এই শক্তি ও জনপ্রিয়তার উৎস কোথায় প্রশ্নটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমার মনে হয় আন্দোলনের সেই বিশেষ পরিবেশ, এতগুলি মানুষের প্রাণঢালা ভালবাসা, অটল বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভরতা তাঁর নিজস্ব শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।" (- সম্পাদক)

প্রাপ্তি স্বীকার; উদ্ধৃতি প্রাপ্তি : নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সমকালীন রাজনীতি ও ইলা মিত্র। মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, পৃ. ১৭৬।

২০. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি, 'কমিউনিস্ট বুলেটিন', 'সরকার, জমিদার, মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম', ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৮ (সহায়ক তথ্য-১২)।

২১. ঐ, প্রাদেশিক সার্কুলার নং ১২, 'কৃষি মজুরের সংগ্রামে নেমে পড়ুন', ১৭ নভেম্বর ১৯৪৮ (সহায়ক তথ্য-১৩)।

২২. ঐ, 'কমিউনিস্ট বুলেটিন', 'কৃষি সংকট ও কৃষকের লড়াই', ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৮ (সহায়ক তথ্য-১৪)।

২৩. ক্ষেতমজুরের সংগ্রাম ও সংগঠন— প্রথম প্রাদেশিক ক্ষেতমজুর সম্মেলনের কার্যবিবরণী, অক্টোবর ১৯৪৯ (সহায়ক তথ্য-১৫)।

২৪. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি, 'পি-সি-সমাচার পত্র', ৩০ নভেম্বর ১৯৪৮ (সহায়ক তথ্য-১৬)।

২৫. রেণু চক্রবর্তী— ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০), পৃ. ৯২।

টিকা : ১. মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ১৯৪৮-এ নয়, ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে বে-আইনি হয়েছিল। ২. ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নামে এক সভা হয়েছিল ভারত সভা হল-এ। ৩. এই বছরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পঞ্চম সম্মেলন, যেখান থেকে সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিল শ্রীযুক্তা মঞ্জুশ্রী দেবী। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নী। (- সম্পাদক)

২৬. ঐ, পৃ. ৯৬।

২৭. ঐ, পৃ. ৯৩।

২৮. মঙ্গলা চরণ চট্টোপাধ্যায় - 'শান্তি নেই'।

২৯. মণিকুন্তলা সেন - সেদিনের কথা, পৃ. ২০৪।

৩০. কমিউনিস্ট পার্টি - 'মা বোনদের হত্যার প্রতিশোধ লও। শ্রমিক হত্যার জবাব দাও'। (সহায়ক তথ্য-১৭)

৩১. আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদকীয় 'শোচনীয় ঘটনা', ২৯ এপ্রিল ১৯৪৯ (সহায়ক তথ্য-১৮)।

৩২. জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এশিয়ার মা মেয়েদের ভূমিকা। পিকিং, সম্মেলনের আবেদন। (সহায়কত তথ্য-১৯)

৩৩. বঙ্গীয় সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির প্রচারপত্র, ২ অক্টোবর ১৯৪৯, ''মায়েদের প্রতি ম্যাকসিম গোর্কির আবেদন'', (সহায়ক তথ্য-২০)

৩৪. 'মার্কসবাদী', ষষ্ঠ সংকলন, 'ভারতের ছাত্র আন্দোলন'।

সহায়ক তথ্য - ১

'মার্ক্সবাদী', ৪র্থ সংকলন,
জুলাই ১৯৪৯

আমাদের এজেন্সি-প্রাপ্ত বই

সুশীল জানা কর্তৃক শিবির প্রেস, ১৩বি, বেনিয়াটোলা লেন হইতে মুদ্রিত ও নিউ পাবলিশার্স, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত।

সহায়ক তথ্য - ২

গোপন সংগঠনের কায়দা

ও, পিয়াট্‌নিট্‌স্কি
কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের
প্রাক্তন সম্পাদক

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি

দাম দুই আনা　　　　১২/১/৪৯

ভূমিকা

হিটলার জার্মানীতে ফাসিস্ট-শাসন কায়েম করার এগার মাস পর (১৯৩৩ এর ডিসেম্বর মাসে) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বর্ধিত সভায় বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি অবস্থায় কিভাবে কাজ করিবে তাহা লইয়া আলোচনা হয়। ঐ বর্ধিত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ১৯৩৫ সালের জুন মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস ডাকা হয় এবং সেখান হইতে ফাসিজম ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে আহ্বান জানানো হয়।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ঐ বর্ধিত সভায় কমরেড পিয়াট্‌নিট্‌স্কি বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন এবং তাহাতে বে-আইনি কাজ এবং গোপন সংগঠনের কৌশল সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ নীতি বিশ্লেষণ করেন। গোপন কাজে সামান্য ভুলত্রুটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথে কতখানি ক্ষতিকর কমরেড পিয়াট্‌নিট্‌স্কির এই রিপোর্টে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

গোপন সংগঠনের এই সকল মূলনীতি সম্পর্কে পার্টি সভ্যদের সচেতন করিবার জন্য আমরা কমরেড পিয়াট্‌নিট্‌স্কির মূল্যবান রিপোর্টটি প্রকাশ করিতেছি। যদিও উহা বহুদিন আগে লিখিত, যদিও বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তি অনেক বাড়িয়াছে— কিন্তু মূলনীতি হিসাবে এই রিপোর্টে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এখনকার পক্ষেও নির্ভুল।

প্রত্যেকটি বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই সকল মূলনীতি প্রয়োগ করিতে পারিলে আমরা শত্রুর আক্রমণ হইতে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনকে রক্ষা করিতে পারিব। শক্তিশালী বে-আইনি গণ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পথে অগ্রসর হইতে পারিব। —প্রোসেক্ট

১। পার্টি যে-অবস্থার মধ্যে কাজ করিতেছে, তাহার সকল সুযোগ সুবিধা ও সম্ভাবনা কাজে লাগাও

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বুর্জোয়া রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতনের মাত্রা ও প্রাকৃতিক পার্থক্যের হিসাবে আমরা কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করিতে পারি। প্রথমত ১৬টি কমবেশি বৈধ পার্টি (সোভিয়েত চীনের পার্টিকে লইয়া) দ্বিতীয়ত ৭টি অর্ধ-বৈধ এবং তৃতীয়ত ৩৮টি সম্পূর্ণ অবৈধ। সম্প্রতি ঘটনাচক্রের গতি একদিকে তীব্রতর শ্রেণি-সংগ্রাম ও অপরদিকে ফাসিজমের জঘণ্যতম পরিণতির দিকে চলিতেছে। ফলে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা বদলাইয়া যাইবে। যুদ্ধের সূচনায় সকল দেশে কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য অবশ্যই আণ্ডার-গ্রাউণ্ড হইতে বাধ্য হইবে। অবশ্য কোন বিশেষ দেশে গোপন পার্টি ঠিক কি রূপ লইবে, তাহা হুবহু এখন হইতে বলা যায় না।

যে-যে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহাদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়— প্রথমত, যেখানে পার্টি আণ্ডার-গ্রাউণ্ড হইলেও জনগণের ব্যাপক

সংস্কারমূলক সংঘগুলি (যেমন ট্রেড ইউনিয়ান) আজও বৈধ ও প্রকাশ্য রহিয়াছে (যেমন পোল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, বুল্‌গেরিয়া, জাপান প্রভৃতি) এবং দ্বিতীয়ত, যেখানে সমস্ত প্রকাশ্য শ্রমিক সংগঠন ও সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে ও যেখানে কেবল মাত্র ফ্যাসিষ্ট সংগঠনগুলিই আছে।

প্রথম শ্রেণির দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিকে সমস্ত রকমের শ্রমিক সংগঠনগুলিকে কাজে লাগাইতে হইবে; যেমন, শ্রমিক ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, খেলা-ধুলার সমিতি, শ্রমিকদের শিক্ষা সংগঠন, স্বাধীন চিন্তার জন্য সংগঠনগুলি— এবং সর্ব প্রকারের শ্রমিক-সংঘ— তা সে খ্রীশ্চান চালিত হউক, কিংবা সংস্কারকামীই হউক। এই সকল সংগঠনের মধ্যে কমিউনিস্ট ফ্রাক্‌শন গড়িতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্টি কমিটির সঙ্গে এই সব ফ্রাক্‌শনের যোগাযোগ রাখিতে হইবে, যাহাতে পার্টি-কমিটি তাহাদের ঠিক রাস্তায় চালাইতে পারে, যাহাতে তাহারা পার্টি হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া পার্টি-নির্দিষ্ট রাস্তায় চলিতে পারে ও দরকার মত তাহাদের কাজে পার্টির সাহায্য পাইতে পারে। এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকদের অর্ধ-বৈধ ও সম্পূর্ণ অবৈধ বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে জোরদার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণির দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিকে ফ্যাসিস্ট গণ-সংগঠনগুলিকে কাজে লাগাইতে হইবে। ঐ সব সংগঠনগুলিতে শ্রমিক আছে; অফিস কর্মচারী আছে, কৃষক আছে, শ্রমজীবি যুবক এবং স্ত্রীলোক আছে, যেমন, ট্রেড-ইউনিয়ান (শ্রমিক-সংঘ), সমবায়-সমিতি, ক্রীড়া-সমিতি, যুব-সমিতি ও নারী-সংগঠনগুলিতে। কেবল যে, এই সংগঠনগুলির মধ্যে অবিশ্রান্ত কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে, তাহাই নহে— এই সব সংগঠনের অনুষ্ঠিত সাধারণ জনসভায় বক্তৃতা দিবার জন্য জনসাধারণের মধ্য হইতে যোগ্য লোকও স্থির করিতে হইবে।

জার্মানীর ও ইটালীর মত দেশে ট্রেড-ইউনিয়ন, আই-এল্‌-ডি বেকার-সংঘ প্রভৃতি শ্রমিকদের গণ-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। ফাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়িতে ইচ্ছুক আগেকার ক্যাথলিক ও সংস্কারবাদী ট্রেড-ইউনিয়ন এবং ক্যাথলিক ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের পুরানো সভ্যদের এই সব সংগঠনে টানিয়া আনা দরকার।

উভয় শ্রেণির দেশেই কাজের ঝোঁক কারখানা এলাকার উপরই হওয়া দরকার— যদি কৌশল ও সাহসের সঙ্গে কাজ চালান যায় তাহা হইলে এই সব জায়গাতেই কাজের ফল সবচেয়ে বেশি হইবে।

২। ক্যাডার বা পার্টি কর্মী
ক্যাডারদের অপমৃত্যু ও আত্মহত্যা হইতে বাঁচাও

(ক) পার্টিকে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড অবস্থায় লইয়া যাইবার পূর্বে নিজেদের সমস্ত ক্যাডার কাজের ক্ষেত্রে পুনর্বন্টন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জার্মানীতে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড অবস্থায় রূপান্তরের সময় মাঝারী ও নীচের র‍্যাঙ্কের কর্মঠ ক্যাডারদের উপরই সবচেয়ে বড় চোট আসিল। কেন? কারণ কারখানায় কারখানায়, আলোচনা ও তর্কে-বিতর্কে, জেলায় জেলায়, এবং শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য সংঘর্ষের ক্ষেত্রেও এরাই নাৎসীদের মুখোমুখী দাঁড়াইত। ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীদের প্রথম কাজ হইল এই সব কর্মঠ ক্যাডারদের গ্রেপ্তার করা। এই কাজে তাহারা মধ্যবিত্ত

সম্প্রদায়ের সাহায্য পাইয়াছে; নির্বাচনে নাৎসীদের জয়লাভের পর ইহারা তাহাদের দিকেই ভিড়িয়াছিল। ইহারা এখন দেখাইয়া দিতে লাগিল— কোথায় কমিউনিস্টরা থাকে, কাহারা কমিউনিস্টদের কাগজ পড়ে, ইত্যাদি। পার্টি শ্রেষ্ঠ ক্যাডারদের লুকাইয়া রাখিতে পারিল না। ফ্যাসিষ্টরা রাইখস্টাগ্-গৃহে আগুন দিবার পর ২৮শে ফেব্রুয়ারীর রাত্রিতে বিভিন্ন শহরে কমিউনিস্টদের সবচেয়ে বড় ধরপাকড় হইল। এইখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, ইতিপূর্বেই যদিও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে উত্তেজনা তীব্রতম করিয়া তোলা হইয়াছিল, তবুও নেতৃস্থানীয় অনেক কমিউনিস্ট ঐ রাত্রে বাড়িতেই ছিলেন।

জার্মান-পার্টির তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা লও

যদিও খুব তাড়াতাড়ি আমাদের পার্টি নূতন করিয়া সংহত হইয়া উঠিল, তবুও মাঝারী ও নীচের স্তরের কর্মঠ ক্যাডারদের বাঁচান গেল না, অথচ ইহাদের বাঁচান কত দরকারী ছিল। কারণ, ইহারাই ছিল কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে পার্টি কমিটির যোগসূত্র। আমাদের আন্তর্জাতিকের প্রত্যেক অংশের (অর্থাৎ, সকল কমিউনিস্ট পার্টির) এইরূপ ক্ষতি হইতে বাঁচিবার জন্য আগে হইতে ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে-সব পার্টিকে অদূর ভবিষ্যতে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড হইতে হইবে, তাহার নেতাদের তো কথাই নাই, মাঝারী ও নীচের স্তরের ক্যাডাররাও যেন গ্রেপ্তারের দিন নিজের নিজের ঘরের মধ্যে বসিয়া না থাকে। বেশি আগে বাড়ি ছাড়ার ভিতর কোনও ভয়ের কথা নাই, কিন্তু ধরা পড়িয়া বন্দীশিবিরে পচিয়া মরা এবং পার্টির কোনও কাজে না আসার অপেক্ষা ভয়ঙ্কর আর কি হইতে পারে? কমরেড পীক্ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, জার্মান পার্টি বে-আইনি হইবার পরেও অনেক কমিউনিস্ট বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে গিয়ে ফ্যাসিস্টদের হাতে ধরা পড়িয়াছে। এরূপ ঘটনা শুধু যে, জার্মানীতেই ঘটিয়াছে, তাহা নহে।

শ্রেণি-সংগ্রাম যতই তীব্র হইবে, ফ্যাসিস্টরা ততই আমাদের ক্যাডারদের ধরিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিবে এবং আমাদের ক্যাডার নিঃশেষ হইবার বিপদও ততই বাড়িবে।

কাজ একটি কেন্দ্রে সংহত করিও না, কাজ কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভাগ করিয়া দাও।

(খ) কেন্দ্রাপসরণ, অর্থাৎ, কাজ বিভিন্ন কেন্দ্রে ভাগ করিয়া দেওয়া অত্যন্ত জরুরি, প্রথমত, স্থানীয় কর্মীদের কর্মপ্রেরণা জাগাইবার জন্য এবং দ্বিতীয়ত, ধরপাকড় হইতে ক্ষতির পরিমাণ কমাইবার জন্য। এখানে আমাকে বলিতেই হয় যে, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড হইবার আগে জার্মান পার্টি স্থানীয় সংগঠনগুলি কেন্দ্রীকরণের শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল— সেখানে অত্যাধিক কেন্দ্রীকরণ ছিল। আমরা অন্তত বিশ বার এই সম্পর্কে মত জানাইয়াছি। একটা উদাহরণ দেই— ব্যয়-সঙ্কোচের খাতিরে বার্লিনে ইস্তাহার ছাপাইয়া দেশময় বিলি হইত— খেয়াল থাকিত না যে, রাজধানীর পক্ষে যে ইস্তাহার উপযুক্ত, তাহা মফস্বলের উপযোগী নাও হইতে পারে, বিভিন্ন জেলার অবস্থার ও শিল্পাদির পার্থক্যের উপর নজর থাকিত না এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পের শ্রমিকদের বিশেষ সমস্যার উপর লিখিয়া তাহাদের আকৃষ্ট করিবার খেয়ালও থাকিত না। ইহাতে স্থানীয় পার্টি-সংগঠনগুলির কর্মপ্রেরণা নষ্ট হইত। অথচ, যখন এই স্থানীয় কমিটিগুলি ধরপাকড়ের ফলে নেতৃত্ব-বিহীন হইয়া পড়িল, তখন কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগতভাবে

এবং স্থানীয় কমিটিগুলিও উল্লেখযোগ্য ভাবে স্বাধীন কর্মপ্রেরণা দেখাইয়াছে। গতকাল রাত্রে কমরেড পীক্ ঠিকই বলিয়াছেন যে, এই সময়ে স্থানীয় কমিটিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে যে-সব শ্লোগান দিয়াছে, ঐগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির শ্লোগানের সঙ্গে মিলিয়া যায়।

কেন্দ্রে কেন্দ্রে কাজের ভাগ স্থানীয় কর্মীদের কর্মপ্রেরণা জাগ্রত করে

এই স্থানীয় কর্মপ্রেরণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক কমিউনিস্টকে মনে রাখিতে হইবে যে, নিজের দায়িত্বের উপর নির্ভর করিয়া পার্টি-লাইন মত চলিতে হইবে; পার্টি আণ্ডার গ্রাউণ্ড না হওয়া পর্যন্ত এ-কথা বুঝিবনা বলিয়া যেন কেহ বসিয়া না থাকেন। পার্টিকে বে-আইনি অবস্থায় লইবার জন্য যে আয়োজন করিতে হইবে, তাহার শুরুতেই দরকার কেন্দ্রে কেন্দ্রে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া, সুতরাং এ-কাজ এখনই আরম্ভ করিতে হইবে।

জনগণের অসন্তোষ এখন দিনের পর দিন বাড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, তাহাদিগকে সংগ্রামের সঠিক পথ ধরাইয়া দিলে কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব তাহারা অনুসরণ করে; সুতরাং, একথা স্পষ্ট যে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া এখন সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়।

ইহাতে গোপনতা রক্ষার সুবিধা হয়

(গ) অপরদিকে গোপনতার উদ্দেশ্যেও কেন্দ্রাপসরণ দরকার। জার্মানীতে একটা ঘটনা হইয়াছে— এক 'বে-ইমান' আগে পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিত। এখন সে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে জার্মানীর বিভিন্ন শহরে রাস্তায় রাস্তায় কমিউনিস্ট খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহাদের গ্রেপ্তার করাইয়া নিঃশেষ করিবার চেষ্টা করে। কেন্দ্রাপসরণ যত ভাল ভাবে করা যাইবে, ততই বিশ্বাসঘাতকের পক্ষে পার্টির মধ্যে ঢুকিয়া ক্ষতি করার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

কমরেড এরকোলি (ইটালী) একটা ব্যাপার আমাদের ব্যক্তিগতভাবে বলিয়াছেন, বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না। এক জায়গায় মাত্র ছয়জন গ্রেপ্তার হয়— এরা আবার প্রত্যেকে আরও কয়েকজন করিয়া লোকের নাম করে। এই ভাবে গুপ্ত পুলিশ প্রায় ১৫০ জনকে ধরে। পরে এদের অনেকে ছাড়া পায় কিন্তু কেউ জানিতে পারিল না— কে কে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং কারা কারা তারই ফলে গ্রেপ্তার হইয়াছিল। ফলে সমগ্র সংগঠনের মধ্যে পরস্পর সন্দেহের জন্য অধঃপতন আসিল।

গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য চূড়ান্ত সাবধানতা চাই। আমি জার্মানীর আর একটি উদাহরণ দিব। পার্টির আর একজন ভূতপূর্ব কর্মকর্তা ফ্যাসিস্টদের দলে ভিড়িয়া যায়। সে একদিন এক গোপন সভার জায়গায় হাজির হইল। ইতিপূর্বেই তাহার জেলায় অনেক ধরপাকড় হইয়াছে। তবুও কোনও অনুসন্ধান না করিয়া তাহাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারীর গুপ্ত ঠিকানা দেওয়া হয়— সেক্রেটারী তখন আণ্ডার-গ্রাউণ্ড এবং তখন ফ্যাসিস্টরা সেক্রেটারীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। নেহাৎ বরাত জোরে সেক্রেটারী তখন অনুপস্থিত ছিল। এই লোকটি আর একজন কমরেডকে সেখানে পাইল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িলেন। কোনও অবস্থাতেই পার্টির সেক্রেটারীর সহিত প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের সুবিধা কোনও সন্দেহভাজন লোককে দেওয়া চলে না। মধ্যস্থ খাড়া করিয়া এই সব ব্যাপারে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে নিরাপদ হইবার ব্যবস্থা

করিতে হইবে। আমি যে-ঘটনার উল্লেখ করিলাম, ঐ ক্ষেত্রে গোপন আন্দোলনের প্রাথমিক নীতি অমান্য করিবার কোনও যুক্তি ছিল না, কারণ, পূর্বোক্ত গোপন আড্ডায় ইহা জানা ছিল যে, উপরোক্ত ব্যক্তির এলাকায় যথেষ্ট ধরপাকড় হইয়াছে। আমার মনে হয় ইহাও জানা ছিল যে, ঐ ব্যক্তি একবার ধরা পড়িয়া পরে ছাড়া পাইয়াছিল। বস্তুত, ঐ লোকটি ধরা পড়িয়া ফ্যাসিস্টদের মারের চোটে তাহাদের দিকে চলিয়া যায়।

জুন মাসের মাঝামাঝিও জার্মানীতে আবার বড় রকমের ধরপাকড় হয় এবং কয়েকজন কর্মঠ পার্টি-ক্যাডার ধরা পড়ে। চাই গোপন থাকিবার উন্নততর ব্যবস্থা, চাই কাজ করিবার উন্নততর পদ্ধতি।

ধরা পড়িলে কি করিবে

(ঘ) ধরা পড়িবার পর পুলিশের জেরার সামনে একজন কমিউনিস্ট কি ভাবে চলিবে? মনে রাখা দরকার ধৃত ব্যক্তি পুলিশের কাছে একটু কিছু বলিয়া ফেলিলে, তাহার পুরাপুরী বিশ্বাসঘাতক না হওয়া পর্যন্ত রেহাই নাই। আমাদের পার্টি যখন আণ্ডার-গ্রাউণ্ড যায় তখন পুলিশের জেরার সামনে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লেখা হয়। আজ জার্মানীতে যদি কেহ ধরা পড়িয়া মারের ফলে কিছু কিছু বলিতে থাকে, তাহা হইলে ফ্যাসিস্ট গুণ্ডারা সকল কমরেডদের ব্যাপার ফাঁস করিয়া ফ্যাসিস্ট দলে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত তাহাকে মারা বন্ধ করিবে না। যত কম কথা কও, ফ্যাসিস্ট জহ্লাদেরা তোমার কাছ হইতে কথা বাহির করিবার আশা তত কম করিবে এবং তত শীঘ্র তোমাকে জেরা করা বন্ধ করিবে।

পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, জার্মানী, ইটালী, চীন ও জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির অবৈধ কাজের অভিজ্ঞতার বহুল প্রচার অত্যন্ত জরুরি। প্রত্যেক দেশের পার্টির অভিজ্ঞতা অপর সকল দেশকে জানাইতে হইবে। প্রত্যেক কমিউনিস্টকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতে ও শিখিতে হইবে যে, জেরার সামনে কি বলিতে হয় এবং যে কোনও অবস্থায় গ্রেপ্তার হইতে কেমন করিয়া বাঁচিতে হয়।

বে-আইনি লিটারেচার বন্টন— পাকা প্ল্যান ও নিরাপদ ব্যবস্থা চাই

(ঙ) যে সব দেশে কমিউনিস্ট পার্টি অবৈধ, সেই সব জায়গায়ই ব্যক্তিগত ভাবে এবং গ্রুপ গ্রুপ করিয়া মৌখিক প্রচার অত্যন্ত জরুরি (এখানে জনগণের আশু দাবি আদায় করা সম্পর্কে ফ্যাসিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামকে সংযুক্ত করিতে হইবে)। এই প্রচার ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে বাস্তবিক ঘটনার ভিত্তিতে করিতে হইবে। এইভাবে কমিউনিস্ট প্রভাবের ক্ষেত্র বাড়ান সম্ভব হইবে। এই বিষয়ে কারখানা-পত্রিকার স্থান খুব বড়। এক সময়ে জার্মান ফ্যাসিস্টরা ঘোষণা করে যে, কমিউনিস্ট পার্টি নিঃশেষ, নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। তখন আমাদের কমরেডরা ক্ষতির তোয়াক্কা না করিয়া রাস্তায় রাস্তায় কমিউনিস্ট পুস্তিকা বিলি করিতে লাগিল। পুস্তিকা বন্টন করিয়া কমিউনিস্টরা প্রমাণ করিল যে, পার্টি মরে নাই। সেই সময়ে এই কাজের তাৎপর্য অবশ্য খুবই ছিল। বিদেশি সাংবাদিকেরা এই বিষয়ে তাহাদের কাগজে লেখে। এমন কি ফ্যাসিস্ট কাগজগুলিতেও ইহা অস্বীকার করিতে পারে নাই। কিন্তু এইভাবে পুস্তিকা বন্টন এখন বন্ধ করিতেই হইবে। পুস্তিকা বন্টন করিতে হইবে কিন্তু, এমন ভাবে যাহাতে গ্রেপ্তারের পরিমাণ যথা সম্ভব কম হয় এবং

সর্বোপরি ইহার উদ্দেশ্য হইবে, বাঁচিয়া থাকা প্রমাণ করা নহে, শ্রমিকদের হাতে উহা পৌঁছাইয়া দেওয়া। সর্বপ্রথম শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের পুস্তিকা বন্টন করিতে হইবে। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে কারখানায় সংবাদপত্র এই সম্পর্কে অত্যন্ত জরুরি। ইহার উপর বিশেষ নজর দিতে হইবে। শ্রমিকদের মধ্যে কারখানায় সংবাদপত্রগুলির জনপ্রিয়তা কাজে লাগান অত্যন্ত জরুরি। ঐগুলি ব্যাপকভাবে বন্টন করিতে হইবে, উহাতে দেশের সাধারণ রাজনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ কারখানার সমস্যাগুলিও রাখিতে হইবে।

সভা, শোভাযাত্রা এবং গোপন ঘরোয়া বৈঠক

(চ) সবশেষে, প্রতিবাদ আন্দোলন কি ভাবে করিতে হইবে? এই ব্যাপারেও আমাদের দেখিতে হইবে, আমরা বৈধ অবস্থায় না অবৈধ অবস্থার মধ্যে আছি। অষ্ট্রিয়ার কথা ধর। যখন পার্টি সেখানে বৈধ ছিল এবং মিছিলের ব্যবস্থা করিত, তখন কেবলমাত্র পার্টির সভ্যরাই রাস্তায় জড়ো হইত। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, জনগণের সঙ্গে পার্টির সংযোগ ছিল দুর্বল ও কাঁচা এবং পার্টি তাহাদের আন্দোলনে টানিয়া আনিতে পারিত না। বৈধতার যুগে পার্টিও যখন সম্পূর্ণ বৈধ, তখন এরূপ ব্যাপার হজম করা চলে যদিও আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব হইতেছে যে এমনভাবে প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রা করিতে হইবে যাহাতে পার্টি ক্যাডারদের ক্ষয় অতি সামান্যই হয়। ঐ সময় পুলিশ কিছু কমরেডদের উপর মারধর করিত, কিছু গ্রেপ্তার করিত কিন্তু ব্যাপার আর বেশি দূর গড়াইত না কিন্তু অবৈধ অবস্থায় কেবল পার্টিসভ্য লইয়া এইরূপ মিছিল করিলে ক্ষতি অত্যন্ত সাংঘাতিক হইবে।

জার্মানীতে কি হইতেছে? সেখানেও আমরা প্রতিবাদ আন্দোলন চালাই এবং তাহার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কিন্তু সেখানে কাহারা রাস্তায় জড়ো হয়? আমাদের জঙ্গী মজুরেরা। তাহারা যথেষ্ট সংখ্যায় জনসাধারণকে রাস্তায় নামাইতে পারে না এবং ফলে ফ্যাসিস্টরা তাহাদের উপর হামলা করিয়া তাহাদের নিঃশেষ করে। মিছিল বাহির করা, প্রতিবাদ জাহির করা কি দরকারী ও উচিত কাজ? নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই জন্য আমাদের ক্যাডারদের ধ্বংস হইতে দেওয়া অনুচিত ও অনাবশ্যক। প্রতিবাদ-আন্দোলন আমাদিগকে চালাইতেই হইবে। নতুবা মৃত্যুর পরোয়ানা মাথার উপর ঝুলাইয়া আমাদের ক্যাডারদের কাজ করিবার সার্থকতা কোথায়! আসল কথা হইতেছে যে, আমাদের ক্যাডারদের কারখানায় কারখানায় মজুরদের মধ্যে রীতিমত প্রচার চালাইতে হইবে তাহাতে নিজেদের লোক দিয়া বর্তমানের ছোটখাট মিছিল অপেক্ষা বেশ বড় রকমের কিছু করিতে পারিবে।

প্রত্যেকের জন্য কাজ চাই, প্রত্যেক কাজের জন্য উপযুক্ত ক্যাডার বাছাই চাই

(ছ) আমাদের কর্মী ও কাজের বন্টনের মধ্যে অর্ন্তদৃষ্টি চাই। একথা বৈধ, অবৈধ সব পার্টির সম্পর্কে খাটে। আমি আগেই বলিয়াছি যে, পার্টির সব সভ্যই কোথাও না কোথাও কাজে লাগিতে পারে। তাহাদের কর্মক্ষমতা কাজে লাগান কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃত্বের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। যদি একজন কমিউনিস্ট প্রচারকারী হিসাবে সুবিধা করিতে না পারে, তা হইলে সে অল্পবিস্তর টেকনিক্যাল কাজ করিতে পারে— যদি সে বক্তৃতায় পটু না হয়, তাহা হইলেও সে পুস্তিকা ছড়াইতে, পোস্টার মারিতে পারে।

কোন্ ক্যাডার কত পুরানো সভ্য তাহা দেখিলে চলিবে না, যোগ্যতা দেখিতে হইবে

এই সম্পর্কে আমরা অনেক সময় নিম্নোক্ত ভুল করিয়া থাকি। মনে কর, একজন পুরানো পার্টি-সভ্য নেতৃত্বের মধ্যে ছিল— সে কোনও কাজের যোগ্য না হইলেও আমরা মনে করি যে, তাহাকে নেতৃত্বের মধ্যে রাখিতে হইবে। সে জনগণের মধ্যে কাজ করিতে পারে না, সে ট্রেড-ইউনিয়ানের কাজ করিতে পারে না, তবুও তাহাকে নেতাদের মধ্যে রাখিতে হইবে। সে যদি আন্দোলন চুরমার করিতে থাকে, তবুও তাহাকে দায়িত্বের পদে রাখিতে হইবে। কেন? কারণ, সে পার্টির পুরানো সভ্য। অথচ এদিকে ওদিকে নূতন কর্মী দেখা যাইতেছে। তাহাদের মজুরদের সঙ্গে রীতিমত যোগাযোগ আছে তাহারা মজুরদের কাজে টানিবার পদ্ধিতি জানে। অনেক সময় পার্টি সংগঠনের মধ্যে বা কৃষক-শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী নেতৃত্বের কাজে এই সব কর্মীদের টানিয়া তোলা হয় না শুধু এই জন্য যে, নিজেদের দায়িত্বমত কাজ করিতে অক্ষম হইলেও ঐসব পদে পার্টির পুরানো সভ্যরা মোতায়েন আছে। পুরানো কমরেডদের সমাদর আমাদিগকে অতি অবশ্যই করিতে হইবে। বহু বর্ষ ধরিয়া তাহারা বিশ্বাসের সহিত পার্টির কাজ করিয়াছে, পার্টির কাজে সর্বস্ব ত্যাগের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তবুও এই ব্যাপারে আমাদের হিসাবের মাপকাঠি হওয়া উচিত : অমুক পুরানো কমরেড তাঁহার দায়িত্ব মাফিক বরাদ্দ কাজ ঠিকমত করিতে পারিতেছেন কি? যদি তিনি তাহা না পারেন, তাহা হইলে পুরানো সভ্য হইলেও, তাঁহার স্থানে এমন একজন নূতন কর্মী আনিতে হইবে যে কাজ করিতে জানে, শ্রমিকদের সঙ্গে যার যোগাযোগ আছে এবং যে তাহাদের পরিচালনা করিতে পারে।

একজন কর্মীর একটি দায়িত্ব

যে কয়জন কর্মঠ কমরেড নিজেদের কাজ ভালমত করিতে পারে, তাহাদের ঘাড়ে এত কাজ চাপান হয় যাহা আঁটিয়া উঠা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। আমি ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির একটা বিবরণ পড়িব :

ক্যালের কাছাকাছি মার্লে নামক জায়গায় একজন কর্মীর নিম্নলিখিত পদগুলি ছিল।

১। স্থানীয়-ট্রেড-ইউনিয়ান শাখার সেক্রেটারী
২। কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় কেন্দ্রের সেক্রেটারী
৩। স্বাধীন চিন্তা সমিতির সেক্রেটারী
৪। স্বাধীন চিন্তা সমিতির খাজাঞ্চি
৫। কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সভ্য
৬। পরস্পর সাহায্য সমিতির ব্যুরোর সভ্য
৭। খনি-মজুর সংঘের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য
৮। খনি-মজুর সংঘের কার্য্যকরী সমিতির ব্যুরোর সভ্য
৯। খনি-মজুর ইউনিয়নের সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য
১০। খনি-মজুর ফেডারেশনের হিসাব রক্ষক কমিটির সভ্য
১১। পরস্পর সাহায্য তহবিলের ম্যানেজার
১২। বেথুন ট্রেডস্ কাউন্সিলের সভ্য

১৩। কয়েকখানি সংবাদপত্রের বন্টন কর্তা

১৪। অপর জেলার (নিজেদের বাসস্থল নহে) বাড়ি বাড়ি চাঁদা আদায়ের ভার

১৫। প্রাক্তন সৈনিক সংঘের কাজ

এই সব ছাড়াও ঐ কমরেড নিজের জেলায় নিম্নের কাজগুলি করে— (১) সমস্ত ইস্তাহার বিলি, (২) পোস্টার মারা, (৩) পার্টি ট্রেড-ইউনিয়ন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ তহবিলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা।

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে হেনরী শ্রমিকদের ইউনিটি কনফেডারেশনের সম্মিলিত ব্যুরোর রিপোর্টে বলিতেছেন, "খনি-মজুরদের ফেডারেশনে একজন কর্মঠ কমরেডের দশটা দায়িত্ব প্রায়ই দেখা যায়।"

এখানে মুস্কিল শুধু ইহাই নহে যে, একই কমরেড এত কাজ করিতে পারে না এবং ফলে কাজ খারাপ হয়; অপর দিকে একই কমরেডের উপর এতগুলি ভার দেওয়ার ফলে নূতন ক্যাডারের উন্নতি এবং পদোন্নতি বন্ধ হইয়া যায়। যেখানে একজন কমরেড ষোলটা কাজ ভালভাবে করিতেই পারে না, সেখানে ষোলজন কমরেডকে কাজে লাগাইলে কাজগুলি নিশ্চয়ই ভালভাবে উতরাইয়া যাইত। একজন কমরেডের উপর বেশি বোঝা চাপানর বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে হইবে। পার্টির প্রত্যেকটি সভ্যকে কাজে লাগাইতে হইবে। প্রত্যেককে নিজের যোগ্যতা মত কাজ করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

সহায়ক তথ্য - ৩

১৯৪৮-৪৯ এর তেভাগা এবং অন্যান্য কৃষক আন্দোলনের শহিদ (পুলিশের গুলিতে)

টিকা— আমাদের বইয়ের চতুর্থ খণ্ডে পৃ ৪৪৩-এ আমরা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শহিদের একটি তালিকা দিয়েছিলাম। এখানে ১৯৪৮-৪৯-এর কৃষক আন্দোলন ও তে-ভাগা আন্দোলনে শহিদদের নাম দেওয়া হল। (সম্পাদক)

হাওড়া :

১। দেবেন মালিক	জামিরা	৬ই জানুয়ারি, ১৯৪৭
২। গণেশ ভুঁইএ্যা	,,	,,
৩। কানাই বাগ	,,	,,
৪। সাধন বাগ	মাসিলা	২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪:
৫। ফটিক গলুই	,,	,,
৬। গুইরাম মুদী	,,	,,
৭। মন্মথ কয়াল	,,	,,
৮। তারাপদ রায়	,,	,,
৯। মনোরমা রায়	,,	,,
১০। লক্ষ্মীময়ী রায়	,,	,,
১১। হিরণ্ময়ী ব্যানার্জি	,,	,,
১২। যশোদাময়ী সাঁতরা (৯)	হাঁটাল	৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯
১৩। সুধাময়ী সাঁতরা	,,	,,
১৪। পারুলবালা সাঁতরা	,,	,,
১৫। মাখনবালা সাঁতরা	,,	,,
১৬। সত্যবালা দাসী	,,	,,
১৭। অষ্টবালা পন্ডিত	,,	,,
১৮। ননীবালা পাত্র	হাঁটাল	৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯
১৯। বালিকা পাত্র	,,	,,
২০। পাঁচু বেরা	ইসলামপুর	২৪শে জুন, ১৯৪৯

২১। কানাই বাগ (১৫)	ইসলামপুর	২৪শে জুন, ১৯৪৯
২২। বসন্ত রায়	বাগনান	,,

২৪ পরগনা

২৩। অহল্যা দাসী	চন্দনপিঁড়ি	ডিসেম্বর ১৯৪৮
২৪। উত্তমী দাসী	,,	,,
২৫। বাতাসী দাসী	,,	,,
২৬। সরোজিনী দাসী	,,	,,
২৭। নীলকণ্ঠ ঘড়ুই	,,	,,
২৮। সুরেন মন্ডল	,,	,,
২৯। সুধীর ঘড়ুই	,,	,,
৩০। অশ্বিনী দাস	,,	,,
৩১। গজেন ভুইঞা	,,	,,
৩২। দেবেন ধাড়া	,,	,,
৩৩। সুরেন মিস্ত্রি	,,	১৯৪৯
৩৪। অমর মন্ডল	,,	,,
৩৫। পূর্ণ মন্ডল	,,	,,
৩৬। ভবেন নস্কর	,,	,,
৩৭। মতি ধাড়া	,,	ডিসেম্বর, ১৯৪৯
৩৮। দাশু মন্ডল	,,	,,

হুগলী

৩৯। পাঁচুবালা দাসী	ডুবিরভেড়ি	১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯
৪০। দাসীবালা মাল	,,	,,
৪১। পুষ্পবালা দাসী	,,	,,
৪২। কালীবালা পাখীরা	,,	,,
৪৩। মুক্তকেশী মাঝি	,,	,,
৪৪। রাজকৃষ্ণের মা	,,	১৯৪৯
৪৫। কার্তিক ধাড়া	বড়া কমলাপুর	,,
৪৬। গুইরাম মন্ডল	,,	,,

বীরভূম

৪৭। দাশু মাঝি	ডামরা	জুন, ১৯৪৯
৪৮। কুদনো মাঝি	,,	,,

৪৯। হাবুল লেট	ডামরা	জুন, ১৯৪৯
৫০। পানিক লেট	,,	,,

মেদিনীপুর

৫১। চৈতন্য সামন্ত	১৯৪৯
৫২। সুধীর নায়েক	,,
৫৩। সুধীর সর্দার	,,
৫৪। পঞ্চানন কৈদর	,,
৫৫। ভবেশ	,,
৫৬। গোলক	,,

বাঁকুড়া

৫৭-৬১। পাঁচজন কৃষক	জয়পুর থানা	১৫ই আগস্ট, ১৯৪৯

বর্ধমান

৬২। সন্তোষ রায়	মাঝপুর, রায়না	১৯৪৯
৬৩। যুগোল মালিক	,,	,,
৬৪। সুনীল পাল	অগ্রদীপ	,,
৬৫। প্রভাত কুণ্ডু (বর্ধমান)	দমদম জেলে নিহত	১৯৪৯

প্রাপ্তিস্বীকার : কৃষকসভার ইতিহাস, আবদুল্লাহ্ রসুল

সহায়ক তথ্য - ৪

বাংলার শিশু তেলেঙ্গানা

লালগঞ্জ

চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটি
কমিউনিস্ট পার্টি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৫ নভেম্বর, ১৯৪৯

দাম— তিন আনা

দক্ষিণ বাংলার মাটিতে নতুন তেলেঙ্গানা

চব্বিশ পরগণা জেলার একেবারে দক্ষিণ মাথা, কাকদ্বীপ থানার শেষ, নীল মহাসমুদ্রের কোলে ষাট হাজার বিঘার লাট নারায়ণীতলা দ্বীপ, তারই একধারে মৌজা লয়ালগঞ্জ। কয়েক মাস আগেও এখানে বড় বড় জেলখানার মত এই অঞ্চলের বাঘা বাঘা লাটদারের কাছারীগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তার বারান্দার মোটা মোটা শাল সেগুন ও গরাণ কাঠের থামগুলো— যেখানে কয়েক মাস আগেও ক্ষুধার্ত ক্ষেতমজুর আর ভাগচাষিকে যখন তখন ধরে নিয়ে গিয়ে, গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে ইয়া লম্বা চওড়া ভোজপুরী দরওয়ান পিটে পিটে তাদের অজ্ঞান করে দিতো, সে কাছারীর পাশ দিয়ে রাস্তা চলার সময় লোকে ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে হাটতো— আজ তার চিহ্নও নেই। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে লয়ালগঞ্জের ক্ষেতমজুর আর ভাগচাষি— মেয়ে এবং পুরুষ, মায় ৮/৯ বছরের শিশুরা পর্যন্ত শত শত রাইফেল ও পুলিশ, ভাড়াটে লাঠিয়াল ও সেবাদল জোতদারের বন্দুক ও দারোয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে, তাদের বর্বর আক্রমণকে দিনের পর দিন প্রতিরোধ করেছে। বীরের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে তারা ওই মানুষ-খেকো নরপশুদের হাত থেকে নিজেদের মান ইজ্জৎ জীবন রক্ষা করেছে। তারপর ভবিষ্যৎ আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য শত্রুর সব রকম শয়তানি মতলব ও চক্রান্ত ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত সামনা সামনি দাঁড়িয়ে লড়াই করে, শত্রুপক্ষের পাণ্ডাদের জীবনের মত শিক্ষা দিয়ে, বাকী লোকদের একেবারে কুকুর তাড়ানোর মত করে এলাকার বাইরে বার করে দিয়েছে। শত্রুর দাঁড়াবার জায়গা, কাছারীগুলো পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করার জন্য— তা ভেঙ্গে গুড়িয়ে একেবারে শেষ করে দিয়েছে।

এইভাবেই পাঁচ হাজার বিঘা জমির ওপর প্রায় দু'শো ঘর মানুষ কংগ্রেসী রাজত্বের আইন কানুনের বন্ধন ছিঁড়ে কুটে বেরিয়ে এই এলাকাকে পুরানো শোষণ ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছে। এখানকার সংগ্রাম কমিটি এই নতুন মুক্ত এলাকার নাম দিয়েছে "লালগঞ্জ"। আশপাশের দূর দূরান্তরের ক্ষেতমজুর আর ভাগচাষিরা যখন হাটবারের দিন উঁচু গাঁং ভেড়ী দিয়ে যায়, তখন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে এই দৃশ্য দেখে। কেউ যদি তখন জিজ্ঞাসা করে, 'কি দেখছো?' তাহলে সে উত্তর দেয়— "দৃশ্য দেখিটি লালগঞ্জো"। তারপর লালক্যাম্পের মাথায় ওড়ানো লালঝাণ্ডার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে শহিদ মা অহল্যার নামে শপথ নেয় সমস্ত দেশ— তার নিজের এলাকা পর্যন্ত লাল করে ফেলবার।

লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক দ্বারিক সামন্ত, আদিত্য সামন্ত, পুলিন দাস, কৃষ্ণপদ মজুমদারের কাছারী দখল করে— পাঁচ হাজার বিঘা জমিকে কংগ্রেসী ও জোতদারী শাসনের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, সম্পূর্ণভাবে সংগ্রাম কমিটির দখলে এনে নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছে, ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৯ এর কয়েকদিন আগে। অবশ্য এবার মে দিবসের দিন থেকেই এই অঞ্চলে চারিদিকে কাছারী দখল করে ধান বিলি শুরু হয়েছিল এবং তারই কয়েকদিন পরে দ্বারিকের কাছারী দখল করে কিছু মজুত ধান গরীবদের মধ্যে বিলিও হয়েছিল, কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ জয়ের কিছুটা বাকি ছিল। তারপর যেদিন সত্যই একদিন লালগঞ্জের ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষি কাছারীগুলোর শেষ শক্তি ও তাদের সাহায্যকারী পুলিশ ফৌজকে পর্যন্ত একেবারে লাল এলাকার বাইরে তাড়া করে নিয়ে যেতে সক্ষম হল— সেদিন, সংগ্রাম কমিটি ঐ এলাকার সমস্ত মেয়ে পুরুষ শিশুর

মিটিং ডেকে ঘোষণা করলেন—

"গত মে দিবসের সভায় আমরা বলেছিলাম, এবার জমিদার জোতদারের সমস্ত জায়গা জমি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, তা সংগ্রাম কমিটির আইন মত সকলের মধ্যে বিলি করবো....

"গত তিন মাস ধরে আমরা সমস্ত মেয়ে পুরুষ ও শিশু মিলে কংগ্রেসী ফৌজের বাঁকাকাঠ (রাইফেল)— জমিদার, জোতদারের গুণ্ডা এবং নরপশুদের সঙ্গে লড়াই করে, অনেক ক্ষয় ক্ষতি ও অত্যাচার সয়েও শেষ পর্যন্ত জিতেছি। চার চারটে কাছারী আর প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জমি আমরা পুরোপুরি দখল করেছি। দ্বারিকের কাছারী ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছি। ওদের কাছারীর গরু-বাছুর, বাসন, জিনিষপত্তর, শত শত মণ ধান সবই আমরা দখল করেছি।

"এই জমি ও ধান এবং যা কিছু আমরা পেয়েছি সবই এখন সাধারণের সম্পত্তি।....

"সংগ্রাম কমিটি এই সব ধান এবং সম্পত্তি সকলকে হিসাব মত ভাগ করে দিয়েছে এবং দেবে।.....

"আমাদের এলাকায় আজ থেকে কেউ ভাগচাষি বা ক্ষেতমজুর থাকবে না। আমরা ভিটে ও জমিতে স্বাধীনভাবে বাস করবো, চাষ করবো এবং পুরো ফসল নেবো।....

"আমাদের আইন কানুন আদালত সবই নতুন করে হবে। বিচার করবে সংগ্রাম কমিটি। জনসাধারণ নিয়ে বিচার হবে।

"এই নতুন মুক্ত এলাকার নাম হবে... "লালগঞ্জ"।...

এই লালগঞ্জকে লাল রাখতে ও আমাদের জীবন, জমি, সম্পত্তি সব কিছু কংগ্রেসীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে, আমরা সব মেয়ে পুরুষ ভলান্টিয়ার হব। এই এলাকার চারদিকেও ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষিদের সাহায্য করে তাদের এলাকাও লাল করবো।....

"ছোটখাটো জোতদার যারা এই নিয়ম কানুন মেনে নিয়ে, মনেপ্রাণে আমাদের সঙ্গে কাজ করবে ও লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে পুলিশের রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়ে লালগঞ্জ রক্ষার জন্য লড়াই করবে, তাদেরও আমরা সব সুবিধা ও জমি দেবো। যারা এর বিরুদ্ধে যাবে তাদের দ্বারিক সামন্তের পথে পাঠাবো।"

সংগ্রাম কমিটি আরও ঘোষণা করে— "বন্ধুগণ! আমাদের এলাকায় এখনও কিছু ঘাগী জমিদার ও পুরানো শয়তান আছে। কাল থেকে প্রকাশ্য জনসাধারণের আদালতে তাদের বিচার হবে। যার যার এদের বিরুদ্ধে নালিশ আছে তা কাল থেকে জানাবেন।"

'লালগঞ্জের' নতুন মানুষ এই ঘোষণা শোনে। ঘন ঘন শ্লোগান ও জয়ধ্বনিতে মানুষের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। লাল এলাকার বাইরে, দূরে হাজরা কাছারীর পুলিশ ক্যাম্পের ফৌজদের মধ্যে ছুটোছুটি পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি তারা তৈরি হয়ে নিজেদের ক্যাম্প পাহারা শুরু করে দেয়। মনে ভাবে হয়তো এখনই লাল ঝাণ্ডার দল ক্যাম্প আক্রমণ করবে।

সেই দিন থেকেই নতুন করে জমি বিলি শুরু হয়। মানুষের ক্ষেতমজুর, ভাগচাষ ও চাকরান বৃত্তি ঘোঁচে। সর্বহারা মানুষ ভিটে ও জমির মালিক হয়ে বসে। পরিবারের লোকসংখ্যা অনুযায়ী সংগ্রাম কমিটি জমি দেয়। যাদের বাসনপত্র ছিল না, অর্থাৎ সরকারী পেয়াদা, জমিদার জোতদারের দারোয়ান, পুলিশ মিলে কিছুদিন আগেও মাল ক্রোক করে নিয়ে গিয়েছিল, ঐ সব কাছারীর বাজেয়াপ্ত করা বাসন থেকে তাদের অভাব পূর্ণ করা হয়। যে কাছারীর পুকুর ও খালে কেউ কোনও দিন একটা ছিপও ফেলতে পারতো না— সংগ্রাম কমিটি হুকুম দেয়—

'যে যত খুশি মাছ ধরে নিয়ে যাও এবার।' কাছারীর পুকুরের নাম হয় 'লালদিঘী'। দলে দলে মেয়ে পুরুষ দশ সের আধ মণ করে গাদা গাদা মাছ ধরে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে ভোজ শুরু করে।

কাছারীতে অনেক চাষের যন্ত্রপাতি আর লাঙল বলদ ছিল। যে সব ক্ষেতমজুর ও মান্দারের ঐ সব অভাব ছিল, সংগ্রাম কমিটি তাদের এই সব যন্ত্রপাতি ও বলদ ভাগ করে দেয়। কাছারীর বাজেয়াপ্ত করা শত শত মণ ধানের একটা অংশ থেকে বীজ ধানের সমস্যা দূর করা হয়। এ ছাড়াও জরুরি অবস্থার জন্য সংগ্রাম কমিটি আইন করে দেয় যে এই বছর পরস্পর পরস্পরকে বদলা দিয়ে চাষ তুলতে হবে। অর্থাৎ যার গরু লাঙল আছে তাকে কেউ গতরে খেটে দেবে এবং সে তার বদলে গরু লাঙল দিয়ে সাহায্য করবে।

গত সাড়ে তিন মাস রাতদিন পুলিশ ও সেবাদলের সঙ্গে লড়াই করে চাষের কাজ অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। তাছাড়া এমনও কিছু কর্মী আছে, যাদের চাষের কাজ করা চলবেই না। নতুন আইন কানুন, বিচার ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে এবং দরকার মতো আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। সংগ্রাম কমিটি সমস্ত মানুষ নিয়ে মিটিং করে এই সমস্যারও মীমাংসা করার ব্যবস্থা করেন। জনসাধারণের মত নিয়ে ঠিক হয় সাধারণ মানুষ সকলেই চাষে মন দেবে এবং যারা নানা দরকারি কাজের জন্য চাষ করতে পারবে না, তাদের চাষ পর্যন্ত সকলে মিলে তুলে দেবে। এছাড়া যখনই সংগ্রাম কমিটি ডাক দেবে, তখনই সেই প্রয়োজনে সমস্ত মেয়ে পুরুষ শত্রুর আক্রমণ রুখবার জন্য এগিয়ে যাবে।

১৫ই আগস্ট থেকে প্রত্যেক দিন নির্দিষ্ট সময়ে জনসাধারণের আদালত বসে। এই আদালতে কুড়ি পঁচিশ জন থেকে দুই তিন শত পর্যন্ত লোক জমে। মেয়েরাও এই বিচার দেখতে আসেন। যদিও সংগ্রাম কমিটিই এই আদালতের সর্বোচ্চ বিচার কমিটি বলে ঠিক থাকে, তবুও প্রত্যেকটি বিচারেই উপস্থিত সমস্ত মানুষের রায় দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়, এবং প্রত্যেকটি অপরাধের শাস্তি উপস্থিত সমস্ত লোকের মত নিয়েই ঠিক করা হয়। আদালতের কাজ শুরু হলে একে একে দরখাস্ত পড়তে থাকে। বেশির ভাগ দরখাস্তেই দেখা যায় সেই এলাকার জোতদার লাটদার মহাজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং পুরানো অত্যাচারের বিবরণ। ১৫ই থেকে ২৫শের মধ্যে দশদিনে ১১২ নম্বর বিচারের দরখাস্ত পড়ে।

প্রত্যেকটি দরখাস্ত অনুযায়ী গণ-আদালতের বিচার করা হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কোন মহাজনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কারো অর্থ-দণ্ড, কারো নাকমলা-কানমলা, কারো বা জুতাপেটা, ভলান্টিয়ার পাহারায় হাজত বাস— এই ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই অপরাধ স্বীকার করে। লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা নেয় এবং নতুন আইন শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে কাজ শুরু করে। সংগ্রাম কমিটি থেকে এদেরও চাষের জন্য জমি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু কড়া নজরও রাখা হয়।

এমনি করেই নতুন জীবন শুরু হয় লালগঞ্জের মানুষদের। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের পথে কি করে মানুষ ত্ড়াতাড়ি এগিয়ে যায়— কি করে সকল বাধা বিপত্তি চূর্ণ করে তারা নতুন সমাজ, আইন আদালত সবই প্রতিষ্ঠা করে— কি করে মজুর-চাষিরাজ মানুষকে প্রকৃত গণতন্ত্র, মনুষ্যত্বের অধিকার, সুখ শান্তি দিতে পারে তা 'লালগঞ্জে'র মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে।

সমস্ত সংগ্রামী মানুষেরই পাশে— লালগঞ্জ

১৮ই আগষ্ট খবর আসে, পাঁচ মাইল তফাতের রাধানগর মৌজা আক্রান্ত হয়েছে। কংগ্রেসী গুণ্ডা আর সেবাদলেরা পুলিশ ফৌজ নিয়ে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি লুটপাট করছে। সমিতির কর্মী ভাগ্যধর দাসের সত্তর বছরের বুড়ো বাপকে মেরে আধমরা করেছে। ক্ষেতমজুর, ভাগচাষি ও মধ্যবিত্ত যারাই লালঝাণ্ডার পক্ষের লোক তাদেরই অনেকের মেয়েছেলে বৌকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে ঘরের দুয়ারে কাঁটা দিয়েছে। রাধানগরের বিপন্ন মানুষ ছুটে এলো লালগঞ্জের সংগ্রাম কমিটির কাছে। বললে বাঁচাও কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হাত থেকে।

সন্ধ্যা হতে বেশি দেরী নেই। তবুও তখনই সংগ্রাম কমিটির নেতারা চারিদিকে খবর দিলেন— 'যে যেভাবে আছো তৈরি হয়ে এসো'। মাত্র আধঘন্টার নোটিসে দেড়শো লোক নিজেদের হাতিয়ার নিয়ে তৈরি হয়ে এলো। সংগ্রাম কমিটির নেতারাও তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। যাত্রা শুরু হল।

লালগঞ্জের লালফৌজ যে গ্রামের মধ্য দিয়ে গেলো সেই সেই গ্রামের সংগ্রামী মানুষরাই তাদের অভিনন্দন জানালেন এবং সশস্ত্র হয়ে রাধানগরের কংগ্রেসী গুণ্ডাদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য এগিয়ে গেলো। রাজনগর, চন্দ্রনগর, শিবরামপুর প্রভৃতি মৌজা থেকেও অনেক শক্তি সংগ্রহ হল। শুধু তাই নয়, রাধানগরের যেসব দুর্বল মানুষ মেয়েছেলের হাত ধরে কংগ্রেসী দস্যুদের আক্রমণ থেকে জীবন বাঁচাবার জন্য অন্য গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদেরও এই সব মুক্তি ফৌজরা সঙ্গে করে নিলে। কংগ্রেসীদের তাড়িয়ে তাদের নিজের ঘরে বসিয়ে যাওয়ার জন্য।

সেবাদল ও গুণ্ডারা ভেবেছিল তারা একেবারে এলাকার কর্ত্তা হয়ে গেছে। তারা নানা অস্ত্রশস্ত্র এবং বন্দুক নিয়ে এইসব লালফৌজকে বাধা দিতে এলো। সংঘর্ষ বাধলো কিন্তু অপরাজেয় কমিউনিস্ট পার্টির শক্তির কাছে তারা হটে যেতে বাধ্য হল। তাদের ২/৩ জন মারাত্মক জখম হয়ে ফিরে গেলো। একজন আর ফিরলোও না। দারুণ ভয় পেয়ে তারা ছুটে গেলো পাশের পুলিশ ক্যাম্পে রাইফেলের সাহায্য চাইতে, কিন্তু পুলিশরাও প্রাণ বাঁচাবার জন্য বলে দিলে :

"আমাদেরও জীবনের দাম আছে, মরার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে লড়াই করতে যাবো না।"

সেই রাত্রেই মিটিং হল। বিপুল আনন্দে সারা মৌজাতে শোভাযাত্রা হল। যারা বাড়িতে ঢুকতে পারছিল না তারা নির্ভয়ে বাড়িতে বাস করলো। পরের দিন থেকে আর সেবাদল এবং কংগ্রেসী গুণ্ডারা বাড়ি থেকে বারই হল না।

সারা বাংলার লক্ষ লক্ষ কারখানার মজুর আর গ্রামের ক্ষেতমজুররা সম্মেলন ডেকেছে কলকাতায়। সারা বাংলায় মুক্তি আন্দোলনের পথ ঠিক হবে সেখানে। ২৪শে আগষ্ট লালগঞ্জের প্রতিনিধি বার হয়েছে সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য। এমন সময় হঠাৎ খবর এলো কাকদ্বীপ, মথুরাপুর ও সাগর— তিন থানার দারোগা আর পঁয়ষট্টি জন রাইফেলধারী পুলিশ প্রায় দুশো সেবাদল জোগাড় করে রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত রাধানগর গ্রামের বাড়ি চড়াও হয়ে চরম অত্যাচার চালিয়েছে মেয়ে পুরুষ এবং শিশুর ওপর। সকালে তারা

এগিয়ে আসছে রাজনগরের দিকে। সেখানেও জুলুম চালাবে। এইভাবেই তারা এগিয়ে আসবে লালগঞ্জ দখল করার জন্যে।

প্রতিনিধি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। সংগ্রাম কমিটির ডাকে সাজো সাজো রব পড়ে গেলো, 'রাজনগর রাধানগরকে কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের আক্রমণ থেকে বাঁচাও'— এই আওয়াজে চারিদিক গরম হয়ে উঠলো। বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কেউ কেউ তৈরি হয়ে বেরুলেন। 'অহল্যা'র নামে প্রতিজ্ঞা নিলেন তাঁরা। আজকে যদি চোখের ওপর কংগ্রেসীরা মেয়েদের বেইজ্জতি করতে আসে, তাহলে জীবন পণ করে সে বর্বরতা রুখতে হবে।

দেড়শোজন লালফৌজ বেরিয়ে এলো লালগঞ্জ থেকে। শিবরামপুর, চন্দ্রনগর, চন্দনপিড়ী, রাধানগর নিয়ে শক্তি দাঁড়ালো আড়াইশরও বেশি। শোভাযাত্রা রাজনগরে পৌঁছে তিন ভাগ হয়ে পথ আগলে দাঁড়ালো— যেপথ দিয়ে পুলিশ বাহিনী ঢুকছে। দারোগাদের পোষা কুকুর কোকিল খাঁ আর কুঞ্জ গাঁতাও ছুটে আসতে লাগলো ফৌজদের নিয়ে রাইফেল ও বন্দুক উঁচিয়ে— এদের দেখে।

তবুও সমস্ত এলাকার মিলিত লালফৌজরা এক পাও পিছু হটলো না। 'আজকে যদি একশো জনের জীবন দিতে হয় তাও স্বীকার, তবুও কোকিল খাঁ'দের চাই'— বলে দিলে চীৎকার করে আগের ভলান্টিয়াররা।

হাঁক দিয়ে জানিয়ে দিলে সবাই পুলিশ ফৌজদের :

আর এক পাও এগিয়ে এলে জীবন দিতে হবে আমাদের হাতে; তার চেয়ে রাইফেল ঘুরিয়ে ধর দারোগা ও কর্ত্তাদের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলো আগের ভলান্টিয়ার দল সব বিপদকে তুচ্ছ করে, বেপরোয়া ভাবে। চারিদিক থেকে ঘেরোয়া হয়ে গেলো পুলিশ দল।

ব্যাপার সুবিধা নয় দেখে তাড়াতাড়ি পুলিশের বড় কর্ত্তা সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালো এবং অপরাধ স্বীকার করে প্রাণভিক্ষা নিলে।

বললে— 'আমরা কাকদ্বীপ থানা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আপনারা ফিরে যান।'

আওয়াজ উঠলো জনসাধারণের ভেতর থেকে— কোকিল খাঁ'কে দিয়ে যাও আমাদের হাতে, তারপর ফিরবো। খুনে পশুটাকে আজ চাইই।

ক্রমশ আরও উত্তেজনা বাড়তে লাগলো। বেগতিক দেখে পুলিশরা তাড়াতাড়ি কোকিল খাঁ'কে নিয়ে পালালো। সেবাদলেরা কোথায় যে লেজগুটিয়ে ছুটলো তার ঠিক নেই। সাত আট মাইল পর্যন্ত ঘোষণা হল এই জয়ের কথা। শত শত মেয়ে পুরুষ ছুটে এসেছিল এই লড়াই দেখতে, তারাও জয়ধ্বনি দিতে দিতে বাড়ি গেলো।

দুর্বল মানুষরাও এই লড়াইয়ের জয় দেখে সাহস ফিরে পেল। এমনকি সেবাদলের ভেতরও ভাঙন ধরতে লাগলা। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাধানগর থেকে খবর এলো, সেবাদলের বড় একটা অংশ পার্টিতে যোগ দিতে চায়। একেবারে পার্টির নীতি মেনে নিয়ে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। তাই রাধানগরের কমিটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে— এদিন কেন্দ্রীয় জমায়েৎ হবে রাধানগরেই।

৫ই সেপ্টেম্বর সকালে বিভিন্ন মৌজার প্রায় পাঁচ শতাধিক লোক লাঠি ও লালঝাণ্ডা নিয়ে রাধানগরে যায়। প্রচণ্ড উৎসাহের মধ্যে মিটিং হয়। একশতেরও বেশি সেবাদল প্রতিজ্ঞা নেয়

লালঝাণ্ডা হাতে। তারপর সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলে সারা মৌজা প্রদক্ষিণ করতে। হঠাৎ পথ থেকে কয়েকজন নতুন লোক এসে খবর দেয়, 'দুর্গাপুরেও' অনেক লোক অপেক্ষা করছে মিটিং এর জন্য, সুতরাং শোভাযাত্রা সেই দিকে নিয়ে যেতে হবে। তাদের কথায় বিশ্বাস করে জনতার এক অংশ ভুল পথে একেবারে শত্রুদের ফাঁদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কোকিল খাঁ ও কুঞ্জ গাঁতা আগে থেকেই ফাঁদ পেতে তৈরি ছিল এখানে। একটা বাড়িতে কয়েকজন পুলিশও লুকিয়ে ছিল। হঠাৎ তারা শোভাযাত্রীদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে গুলি চালায়। শিবরামপুরের পঁয়তাল্লিশ বছরের ভলান্টিয়ার নগেন দলুই শহিদ হল গুলিতে।

শত্রুর এই ফাঁদের মধ্যে অতর্কিত আক্রমণে বেশ কিছু লোক ধরাও পড়ে। যারা ফিরে আসে তারা দারুণ উত্তেজনার মাঝে রাগে ও ঘৃণায় ফেটে পড়তে থাকে।

প্রত্যেকেরই মুখে মুখে ঘোষণা হয়— 'কোকিল খাঁ ও কুঞ্জ গাঁতার মাথা চাই— নগেন দলুকে হত্যার প্রতিশোধ চাই।'

এই গুলি চালাবার পরে শত্রু কংগ্রেসীরা ভাবলো, শেষ করে দিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টিকে। কদিন আবার চরম অত্যাচার চালালো রাধানগরের ঘরে ঘরে। ক্রমশঃ তাদের আস্পর্দ্ধা আরও বেড়ে গেলো। পরিকল্পনা নিতে লাগলো, 'লালগঞ্জ' আক্রমণ করে তাকেও শেষ করে দেবার।

১৬ই সেপ্টেম্বর পার্টির গুপ্তচররা এসে খবর দিলে, ১৭ই সারা কাকদ্বীপ থানার সেবাদলী গুণ্ডাদের মিটিং হবে। শহর থেকে বড় কংগ্রেসী নেতা, পুলিশের বড়কর্ত্তারা এসে দল ঠিক করবে— তারপর একজনকে সেনাপতি করে চড়াও হবে 'লালগঞ্জে'।

এই খবর পেয়ে লালগঞ্জের সর্বোচ্চ সংগ্রাম কমিটি তৈরি হতে লাগলো এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য। শুধু লালগঞ্জই নয়, যেখানে যত শক্তি আছে তাদের ডাক দেওয়া হল।

লালগঞ্জকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে হবে এই কথা শুনে বহু দূর দূর এলাকা, যেখানে আজও পার্টির সংগঠন দানা বাঁধেনি সেখান থেকেও ২/১ জন করে স্বেচ্ছাসেবকরা লাঠি হাতে আসতে লাগলো। মিটিং ও বৈঠক চলতে লাগলো অনবরতই।

১৭ই আবার একজন এসে খবর দিলে— কংগ্রেসীদের সম্মেলন হয়ে গেছে; ১৮ই সকালে ৫০ জন ফৌজ এবং এছাড়া আরও পঞ্চাশখানা বন্দুক নিয়ে সেবাদল ও গুণ্ডারা লালগঞ্জ আক্রমণ করবে। কুঞ্জ গাঁতা হয়েছে এদের পাণ্ডা। সেই প্রতিজ্ঞা নিয়েছে ধরিয়ে দেবে পার্টির নেতাদের।

এই কথা শুনে আগুন জ্বলে উঠলো প্রত্যেকটি মেয়ে পুরুষের মনে।

গর্জে উঠলো সকলে একসঙ্গে— 'কুঞ্জ গাঁতা ধরাবে নেতাদের? আচ্ছা দেখা যাবে।'

পঁচিশ বছরের একটি ছেলে লাফিয়ে উঠে হাঁক দিল, 'তৈয়ার হও সকলে।' বলে দিল— তৈয়ার থেকো প্রত্যেকেই ঘরে ঘরে কাল সকালের জন্য।

পরদিন সকাল হয়েছে। শেষ রাত থেকে পাহারা দিচ্ছে ভলান্টিয়ার দল। কাজকর্ম সব বন্ধ। মেয়ে পুরুষ তৈরি হয়ে বসে আছে শত্রুর সঙ্গে মোকবিলা করার জন্য। ছোট ছেলেরা পর্যন্ত লাঠি আর লালঝাণ্ডা হাতে ঘোরা ফেরা করছে। বেলা দু'প্রহর হয়ে গেলো কিন্তু তবুও শত্রু এলো না।

....হঠাৎ খবর এলো— 'কংগ্রেসী গুণ্ডা আর সেবাদলেরা পালাচ্ছে। তাদের নেতা কুঞ্জ গাঁতা আর তার দেহরক্ষীর দেহটা পড়ে আছে নদীতে। কিন্তু মাথা দুটো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না

কোথাও। অত পাহারার মাঝে কি করে যে এ অঘটন ঘটলো তা কেউ ভাবতেই পারছে না। পুলিশ আর দারোগারাও দারুণ ভয় পেয়ে মাথাহীন দেহ দুটো চালান দিয়েছে সদরে। লালগঞ্জ আক্রমণ আর হবে না।

এই ঘটনার পর দারুণ আতঙ্ক এলো সেবাদল ও কংগ্রেসী গুণ্ডাদের মনে। তারা বুঝে গেলো সর্বহারাদের শক্তি কতখানি। রাত্রে তাদের চোখের ঘুম বন্ধ হল। প্রত্যেকের ঘরে আলো জ্বেলে পাহারার বন্দোবস্ত করলো। দিনে হাট বাজার যাওয়া বন্ধ হল তাদের। শত্রুপক্ষের সবাই চোখের সামনে মরণের বিভীষিকা দেখতে লাগলো। চারদিকের পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশদের হঠাৎ অকর্মণ্য বলে উপর থেকে বদলীর হুকুম এলো।

নতুন যারা এলো তারাও হালচাল দেখে খুবই ঘাবড়ে গেলো। খবর পাঠালো গোপনে সংগ্রাম কমিটি কাছে— 'আমরা ধর্মঘটী পুলিশ পেটের দায়ে চাকরি করছি, আমরা শত্রুতা করবো না।'

এর আটদিন পরে একবার কংগ্রেসী পাণ্ডারা শেষ চেষ্টা করেছিল একাশী জন লোক বন্দুক ইত্যাদি যোগাড় করে। হঠাৎ একদিন তারা ঢাক ঢোল বাজিয়ে শিবরামপুরে ঢুকলো। মতলবটা হল— যদি একবার সমর্থন পাই তাহলে আবার জেঁকে বসা যাবে। হঠাৎ এই ব্যাপার দেখে আর লোক ডাকারও সময় হল না। রক্ষীবাহিনীর একটি দল মাত্র সাত আট জন তাড়া করলে এদের। এই তাড়া খেয়ে সেবদলেরা পালালো ঢাকঢোল ফেলে। বাঁচাও বাঁচাও, রক্ষা কর— বলে চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললো কিন্তু কে তাদের বাঁচাবে? ছোট ছেলেরা পর্যন্ত তাদের অবস্থা দেখে— লাঠি নিয়ে তাড়া করলো।

হরিপুর মহারাজগঞ্জের দুটো কাছারী। একটা হল সেন বাবুদের যে বর্বরেরা অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল চন্দনপিড়িতে। খোরাক নেই সেখানকার ঘরে ঘরে। কিন্তু কাছারীর গোলায় প্রচুর ধান। প্রচুর ধান; নায়েব দেবে না তা, কিন্তু অত্যাচার চালাবে ঘরে ঘরে। অন্য উপায় না দেখে দুই জায়গারই ক্ষেতমজুর আর গরীব চাষিরা বসে মিটিং করলে। সিদ্ধান্ত হল এ অত্যাচার আর সইবো না— বাঁধন ছিড়ে মুক্ত হব সবাই।

তারা নিজেরাই সংগ্রাম কমিটি তৈরি করলে আর খবর পাঠালে লালগঞ্জে— 'তৈরি হয়েছি আমরা, তোমরাও এসো আমাদের পথ দেখাও, কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে যাও'।

লালগঞ্জের মুক্তিফৌজের একটা অংশ গেলো সেখানে। কাছারী দুটোই দখল হল, ঐ নতুন এলাকাতেও। ধান, চাল, আসবাবপত্র যাবতীয় জিনিষ বিলি করে দিলে 'সংগ্রাম কমিটি' সর্বহারাদের মাঝে। পেট ভরে খেতে পাওয়ার ব্যবস্থা হল সবার।

একজন বুড়ো ক্ষেতমজুর দুদিন উপোসে কাটিয়েছিল সপরিবারে। চাল মাথায় করে ঘরে যাওয়ার সময়ে বলে গোলা— 'মরণ থেকে রক্ষা করলো আমাদের লালগঞ্জের কমিউনিস্ট পার্টি— আজ থেকে আমরা সংসারের সবাই কমিউনিস্ট হলুম।'

পরদিন ঘোষণা করে দিলে ঐ অঞ্চলের মানুষ ঐ এলাকাকে কমিউনিস্ট এলাকা বলে। লালঝাণ্ডার জয়যাত্রা এগিয়ে যেতে লাগলো দিনের পর দিন। কংগ্রেসীদের প্রভাব কমতে লাগলো এমনি করেই। ঘৃণিত সেনদের নায়েব যে কোথায় নিশ্চিহ্ন হল তা কেউই জানতে পারলে না।

....লালগঞ্জের এই নতুন মানুষের চেহারা দু'বছর আগের সঙ্গে তুলনা করলে চেনাই যাবে

না। দারুণ অভাবের তাড়নায়— শিশুসন্তানের মুখে একমুঠো ভাত দেওয়ার জন্য যে মানুষ একদিন মহাজনের ঘরে ঘরে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত বাঁধা দিতে বাধ্য হতো, আজ তারাই হয়েছে পাঁচ হাজার বিঘা জমির মালিক— আজ তারাই হয়েছে আশে পাশের হাজার হাজার মানুষের 'মুক্তিদাতা-অন্নদাতা'।

সাম্রাজ্যবাদী দস্যু আমেরিকার কেনা গোলাম চিয়াং কাইশেকের অত্যাচারে জর্জরিত চীনের কোটি কোটি সর্বহারা যেমন কমিউনিস্ট চীনের মুক্ত এলাকাকেই নিজেদের রাষ্ট্র বলে ভাবতো, আর পথ চেয়ে থাকতো সেই দিনের যেদিন তারাও নিজেদের এলাকাকে চিয়াং এর সাঙ্গোপাঙ্গকে হটিয়ে মুক্ত কমিউনিস্ট এলাকার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে দিতে পারবে, তেমনি লালগঞ্জের কাছাকাছি দশ পনেরো মাইল তফাতের মানুষরাও, যারা আমেরিকার অনুগত গোলাম কংগ্রেসী শাসনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে, তারাও পথ চেয়ে আছে কবে 'লালগঞ্জের' মুক্ত এলাকার সঙ্গে নিজেদের এলাকাকে যুক্ত করে দিয়ে— সমস্ত শোষণের গাছপালা শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারবে। তারাও বুঝতে পেরেছে লালগঞ্জের এই শিশু মজুর চাষির রাষ্ট্র— তা যত ছোটই হোক না কেন— তাদের কতখানি আপনার।

চারদিকের আধমরা মানুষ নতুন জীবনের আস্বাদ পেয়েছে লালগঞ্জের বুকে। নতুন মনুষ্যত্ববোধ ফুটে উঠেছে এখানকার নতুন সমাজ ব্যবস্থায়, চাষিমজুরের নিজেদের তৈরি আইন কানুনে সুস্থ সবল জীবন যাত্রায়। 'বর্ণহিন্দু তফশিলি', 'হিন্দু মুসলমান'— 'ছুৎ অছুতের' ভেদাভেদ এখানে নেই। কমিউনিস্ট পার্টির এলাকায় যেখানে একবার লালঝাণ্ডা উড়েছে, সেখানে পরস্পর মেলামেশা, খাওয়াপরা, কাজকর্ম বিনা বাধায়, বিনা আপত্তিতেই চলে। যে যার ধর্ম মানে তাতে বাধা নেই। হিন্দুদের পূজা পার্বণে মুসলমানদের এবং মুসলমানদের উৎসবেও হিন্দুদের নিমন্ত্রণ হয়। কেউ এখানে এই সব আপত্তি তুললে তাকে সংগ্রাম কমিটি বুঝিয়ে দেয়, কেমন করে কংগ্রেসীরা এইসব প্রশ্ন তুলে গরীবের মধ্যে বিভেদ বাধিয়ে নিজেদের সুবিধা করছিল। যদি কোনও আত্মীয়-স্বজন এই এলাকায় এসে এরপরেও বিভেদের প্রশ্ন তুলতে চায় তাহলে তাকে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হয়, তা সে যত বড় আপনারই হোক না কেন।

সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশ মেয়েরা পর্যন্ত এই নতুন সমাজ গঠনে অংশ নিয়েছেন। শত শত দিন অত্যাচার সয়ে মুক্তি সংগ্রামের ময়দানের পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে তাঁরা প্রমাণ করেছেন শ্রেণিশত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার বেলায় তাঁরা কোনও অংশেই হীন নন। কংগ্রেসী আমলে এদের জীবন মানেই ছিল সারাদিন হাড়ভাঙা সংসারের পরিশ্রম করা, স্বামীদের লাঞ্ছনা তিরস্কার শোনা, মার খাওয়া আর সংসারের মা হওয়া। আজ সে জীবন পাল্টে গেছে। নতুন পথে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা। এটা ঠিকই, এখন তাঁদের কাজ আরও অনেক বেড়ে গেছে। সংসারের কাজ ছাড়া যখন তখন পার্টির কর্মীদের দেখা শোনা, গোপন কর্মীদের রাখা আবার ডাক এলে লড়াইয়ের ময়দানের হাজির হওয়া— এমনি আরও কতকি। কিন্তু তাতে ব্যাজার নেই বরং আনন্দ আছে তাঁদের। তাই দেখা যায় সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে গভীর রাত্রে যখন সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে তখন এই মেয়েদের কেউ না কেউ চারদিকে ঘুরে ঘুরে সতর্ক মায়ের মত বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন। 'ঘরে ক্লান্ত পার্টির কর্মী ঘুমাচ্ছে'— কত বড় দায়িত্ব তাঁর।

লড়াইয়ের ময়দানে কংগ্রেসীদের বর্বর আক্রমণ রুখতে গিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেটবৃষ্টির মাঝেও আশে পাশে সৈনিক হিসাবে পেয়ে পুরুষরাও এই 'মা' 'বোন' 'স্ত্রী'দের নতুন মর্যাদা দিয়েছে। সেই পুরানো জুলুম— 'অন্দরে এক হাত ঘোমটা টেনে থাকতে হবে', 'বেরুতে পারবে না পুরুষদের সামনে' কোন কিছুতেই কথা বলবার অধিকার নেই— এক হুকুম তামিল করা ছাড়া'— একেবারে উঠে যেতে বসেছে। অশিক্ষিত গাঁয়ের মেয়েরাও আজ কমিউনিস্ট এলাকায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছেন। তাঁদের কেউ কেউ বড় বড় বিচার সভা অর্থাৎ জনসাধারণের আদালতে পর্যন্ত যোগ দেন। অনেক সময় লড়াই পরিচালনার যুক্তি পবামর্শে পর্যন্ত তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেন। এই নতুন চাষি-মজুরের রাষ্ট্রে সব সময়ই তাঁদের কথা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে শোনা হয় এবং সব ক্ষেত্রেই কথা বলার অধিকার দেওয়া হয়। তাই লালঝাণ্ডা এতো প্রিয় হয়ে উঠেছে সকলের কাছে। উনিশ বছরের মেয়ে পাখী— নিজে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে নির্যাতিতা। স্বামী জেলখানায় বন্দী। তবুও দমে না একটুও। কর্তব্য করে যায় আর দিন গোনে, কবে মুক্তি পাবে অমিয়।

তারপর হঠাৎ একদিন অমিয় ছাড়া পায়— কত জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসে পাখীর জন্য। এদিক থেকে খবর পৌঁছায় পাখীর কাছে— 'বণ্ড দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অমিয়— লালঝাণ্ডার অবমাননা করেছে সে।'

এক মুহূর্তে পাখীর আনন্দ নিভে যায়। ছুঁড়ে ফেলে দেয় অমিয়র আনা শাঁখা শাড়ী সিঁদুর— সব কিছু।

বলে দেয় অমিয়কে— "স্বামী নও তুমি আমার। যেদিন কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করবে তোমায়, সেই দিন আমিও বিশ্বাস করবো তোমায়— এখন দূরে যাও।" সত্যই পাখী চলে যায় সেখান থেকে।

অমিয় গিয়ে কেঁদে পড়ে পার্টির নেতাদের কাছে। বলে, ভুল করেছি, এবার সবচেয়ে বিপদের কাজ দাও আমায়, 'আমি পরীক্ষা দিয়ে কলঙ্ক মুছে ফেলবো।'

কংগ্রেসী আর জমিদার জোতদাররা প্রাণপণে যথেচ্ছাচার চালিয়েছিল সুন্দরবনের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে। চরিত্রের বালাই তুলে দিতে চেয়েছিল তারা। রাতদিন চেষ্টা করে তারা এখানকার মানুষকে দুর্গন্ধময় জীবন যাপন করতে শেখাতো এবং নানাভাবে এই সব কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদে তাদের উৎসাহিত করতো। অনেক সময় বখশিস হিসাবে মদ গাঁজা তাড়ির পয়সা দিয়ে এইসব শোষণকারীরা হাজার হাজার মানুষের লক্ষ্য ঘুরিয়ে দিতো অন্যদিকে।

আজ লালগঞ্জে, এবং আশেপাশের কমিউনিস্ট এলাকায় যারা লালগঞ্জের পথে চলেছে তাদের মাঝে, এইসব ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। চরিত্রের অধঃপতনকে আজ দারুণ ঘেন্না করতে শুরু করেছে অনেকে। সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজেদের শোধরাবার জন্য। মদ-তাড়ি-গাঁজা ছেড়ে দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচার চলেছে। কর্মী ও লাল ফৌজদের বাধ্যতামূলকভাবে এ বন্ধ করা হয়েছে। তবুও গোপনে বদখেয়াল করতে গেলে— জনসাধারণের প্রকাশ্য বিচারসভা ডেকে তাদের কঠোর সাজা দেওয়া হয়।

কংগ্রেসী আমলে নওজোয়ান ছেলেরা সারাদিন মহাজনের বাড়িতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে আর চাবুক খেয়ে সন্ধ্যাবেলা আধমরা জীবনকে তাজা করতে এইসব নেশাভাঙ করতো,

নয়তো বেশ্যাবাড়ি যেতো— খানিকটা দাসত্বের বোঝা হালকা করার জন্য। কি আইবুড়ো, কি বিবাহিত সকলেই চেষ্টা করতো আরও দু'একটা রক্ষিতা রাখার জন্য।

কিন্তু আজ চাষি মজুরের নিজের হাতে গড়া এই নতুন মুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় এইসব ব্যাপার একেবারে অচল। নওজোয়ান ছেলে মেয়েরাই আজ সবচেয়ে নজর রাখতে শুরু করেছে যাতে এইসব কুৎসিৎ ব্যাপার আমোদ প্রমোদ আর না ঘটে। পরস্পর পরস্পরকে সংশোধন করতে সাহায্য করে তারা।

এখন নিজেদের দখলে আনা ক্ষেত খামারে খেটে, নিজেদের ভবিষ্যৎ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রেখে, প্রয়োজন হলে লড়াই করে এসে যদি অবসর পায় তাহলে তারা হয় একটা হারমনিয়ম নিয়ে বসে লোকনাট্যের গান গায়— নয়তো নিজেদের লড়াইয়ের কথা, নতুন জীবন নিয়ে নিজেরা গান বেঁধে নিজেরাই সুর দেয়— নয়তো পার্টির কাগজপত্র পড়ে, এমন কি সারা পৃথিবীর সর্বহারাদের শক্তি সামর্থ্য ও সংগঠন নিয়েও আলোচনা করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পঁয়ষট্টি বছরের বুড়োও আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে প্রথম ভাগ পড়তে শুরু করেছে। পার্টির কাগজপত্র নিজে পড়বে সে, জীবন সার্থক হবে তার— এই পণ।

সাম্রাজ্যবাদ ও কংগ্রেসীদের আমলে অনেক আমলা মুহুরী খদ্দরধারী পাণ্ডা এবং জমিদার-জোতদারেরা নানা কুৎসিৎ ব্যাধি আমদানি করেছিল এই সুন্দরবনে। বেপরোয়াভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এইসব রোগ ব্যাধি প্রায় ঘরে ঘরেই। ফলে মানুষের জীবনের সুখ শান্তি স্বাস্থ্য চলে গিয়ে একেবারে জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল।

আজ চাষিমজুরের হাতে ক্ষমতা এসে নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদিকেও সকলেব নজর গেছে। নতুন মানুষ প্রাণপণে চেষ্টা করছে এই রোগব্যাধি সারাবার জন্য। সংগ্রাম কমিটির কাছে দরখাস্ত আসছে তাড়াতাড়ি ভাল ডাক্তার আর ওষুধের বন্দোবস্ত কর। আশেপাশের গ্রামের মেয়েরা পর্যন্ত স্বামীদের তাগিদ দিয়ে পাঠচ্ছেন লালগঞ্জের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে— 'শুধু পুরুষ ডাক্তার হলেই হবে না, পার্টির মেয়ে ডাক্তারও চাই।'

কংগ্রেসী সংগঠনে নেতা আর সাধারণ কর্মীদের হল চাকর-মনিবের সম্বন্ধ। দারুণ শীতে, বর্ষায়, নানা বিপদ আপদের মাঝে কংগ্রেসী পাণ্ডারা ঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে রাতের পর রাত ঘুমাবে এবং তাদেরই নিরাপত্তার জন্যে সেবাদল সাধারণ কংগ্রেসী ভলান্টিয়াররা দারুণ দুর্যোগের মাঝে জীবনের মায়া ত্যাগ করে রাতের পর রাত পাহারা দেবে। যারা সেবাদল হয়েছে বা কংগ্রেসী খাতায় নাম লিখিয়েছে এমন সাধারণ মানুষ না খেয়ে মরুক বা তাদের ঘরে কেউ অসুস্থ হয়ে এক ফোঁটা ওষুধের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাক— বড় বড় নেতাদের তাতে কিছু আসে যায় না।

কিন্তু লালঝাণ্ডার লাল এলাকায় নেতাদের ও সাধারণ কর্মীদের ব্যবহারে কেউ ধরতেই পারবে না কে নেতা, কে সামান্য ভলান্টিয়ার। লালগঞ্জের বহু মানুষই আজও কলকাতার জেলখানায়। সংগ্রাম কমিটির নেতাদের যত কাজই থাকনা কেন প্রায় রোজই একবার তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধা দেখেন এবং খাওয়া পরা ঔষধ পথ্যের যথাসাধ্য সাহায্য করেন। শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য লালগঞ্জের চারিদিকে রাত্রেও পাহারা থাকে। অনেক সময় দেখা যায় ক্লান্ত ভলান্টিয়ারদের ছুটি দিয়ে তার জায়গায় সংগ্রাম কমিটির প্রধান

প্রধান নেতারা সারা রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন।

তাই মানুষে মানুষে নতুন সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে এখানে। নতুন জীবন, নতুন আদর্শ, নতুন মনুষ্যত্ববোধ— আশা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে প্রত্যেকেরই মনে।

কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের কাছে সুন্দরবনের মানুষ গল্প শুনেছিল 'সোভিয়েত দেশের'। শুনেছিল, পৃথিবীর সেরা সর্বহারার চালিত রাষ্ট্রে মানুষ কত সুখ শান্তিতে বাস করছে। শুনেছিল, কেমন করে মানুষ ভেদাভেদ, ছোটবড়, হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে তুলেছে। আরও শুনেছিল সেই পথে এগিয়ে যেতে সে দেশের মানুষ কত কঠোর পরিশ্রম করেছে; কত ত্যাগ, কত দুঃখ হাসিমুখে বরণ করেছে।

সেই আদর্শ সামনে রেখেই লালগঞ্জের মানুষ এই ফ্যাসিস্ট কংগ্রেসী শাসক, তার কড়া আইন আদালত, জেল, লাঠি, গুলি, বর্বর আক্রমণ সব কিছু তুচ্ছ করে দিনের পর দিন লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সোভিয়েতের চাষি মজুর নিজেরাই সব কিছু করেছে, এই কথা মনে করে লালগঞ্জের মানুষও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজে নেমেছে এবং সাধারণত লোকে যা অসম্ভব বলে মনে করে, তা সম্ভব এবং বাস্তবে পরিণত করেছে। লালগঞ্জের ক্ষেতমজুর আর সাধারণ মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে কমিউনিস্ট শাসন মানে কি। কত তাড়াতাড়ি সে শাসনে মানুষের জীবন উন্নত হয়ে ওঠে।

লালগঞ্জের সর্বহারা আরও দেখিয়ে দিয়েছে, কেমন করে সাম্রাজ্যবাদী স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হয়— ঠিক যেমন করে বত্রিশ বছর আগে ভেঙ্গে ফেলেছিল সোভিয়েত রাশিয়ার মজুর চাষি সেখানকার জার সাম্রাজ্যবাদী ইমারৎ। ঠিক যেমন করে ধসিয়ে দিচ্ছে আমেরিকার তাঁবেদার চিয়াংয়ের ধনিক রাষ্ট্রকে গোটা চীনের বুক থেকে প্রতিটি ঘন্টায় মহা লালচীনের গণমুক্তি ফৌজরা'।

তাই, অনেক অত্যাচার সয়েও, অনেক বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েও লালগঞ্জের মুক্তিফৌজরা প্রথম আক্রমণ চালালো লালগঞ্জের কংগ্রেসী শাসনের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি দ্বারিকের কাছারী।

জীবনের পরোয়া না রেখে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল বিরাট বিরাট ঘর বাড়ি— তার তোষাখানা, তার দারোয়ান পাইক থাকার কামরাগুলো— অন্ধকূপ হাজত ঘর— যেখানে চাষিদের দিনের পর দিন আটকে রাখত— পুলিশ থাকবার বিরাট দরদালান, যেখানে কংগ্রেসী নেতারা বসে যুক্তি পরামর্শ করতো— আর মোটা মোটা থামগুলো যেখানে চাষিদের বেঁধে নির্মমভাবে পিট্তো।

তারা জ্বালিয়ে দিল দলিল রাখার ঘর— রাশি রাশি দলিল, যা যুগ যুগ ধরে জমানো ছিলো মানুষের সর্বনাশ করার জন্য; যার প্রত্যেকটি পাতায় পাতায় রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা ছিল শত শত পরিবারের শোচনীয় সর্বনাশের কাহিনী— কংগ্রেসী দুঃশাসনের জীবন্ত সাক্ষ্য। এতো আয়োজন করেও টিকতে পারেনি কংগ্রেসী সরকার আর জমিদার গোষ্ঠী এই আক্রমণের সামনে। স্তূপাকার হয়ে আছে ভাঙ্গা কাঠ আর দলিল পোড়া ছাই! ধসে পড়েছে সাম্রাজ্যবাদী স্তম্ভ লালগঞ্জের বুক থেকে। লালগঞ্জের মুক্তি ফৌজ দখল করে নিয়েছে তা— কায়েম করেছে নতুন অধিকার। কার সাধ্য তা আবার কেড়ে নেয়।

মানুষ বুঝেছে 'কমিউনিস্ট রাজ কি'— লালগঞ্জকে দেখে। আস্বাদ পয়েছে নতুন জীবনের

এই এতোটুকু অধিকারের মাঝেই। বুঝতে পেরেছে সারা দেশে এমনিতর পরিবর্তন আনতে পারলে আরও কতখানি হবে। তাই তারা প্রতিজ্ঞা নিয়েছে— লালগঞ্জের ওপর শত সহস্র আক্রমণ হলেও তা রুখবে— তার বিজয়বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবে।

তাই রাজনগরের বুড়ো মা তার দুই ছেলেকেই লালগঞ্জের ডাকে রাইফেলের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই দিন কাটান। একটুও ব্যস্ত হন না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলেন— "টোকা মানে লালগঞ্জ যাইছে— ডর কিস্‌কে?"

তাই ৪৫ বছরের বৃদ্ধ নগেন দলুই রাধানগরের সংগ্রামে কংগ্রেসীদের গুলিতে মারা গেলে তার স্ত্রী কেঁদে বুক ভাসায় না। আগুনের মত জ্বলে ওঠে। কেউ সান্ত্বনা দিতে গেলে উল্টে তাকেই সগর্বে বলে— "রণে জীবন দিছে, সগ্‌গে যাইছে...."

সংসারের ভবিষ্যতের জন্য একটু ভাবনা হয় না তাঁর। মনে বিশ্বাস আছে, লালগঞ্জ বেঁচে থাকলে এক মুঠো ভাত পাবেই। হয়তো ছ'মাসের মধ্যে তাঁর এলাকাও লাল হতে পারে। তখন আর ভাবনা থাকবে না।

এমনি করেই প্রিয় হয়ে উঠেছে লালগঞ্জ প্রত্যেকটি মানুষের কাছে— যারা এর নতুন জীবনের কথা জেনেছে, বুঝেছে। এমনি করেই আরও প্রিয় হয়ে উঠবে লালগঞ্জ, সারা বাংলার মানুষের কাছে যেমনিতর প্রিয় হয়ে আছে "তেলেঙ্গানা" সারা ভারতের সর্বহারা মানুষের কাছে।

চারদিক থেকে লোক আসতে শুরু করেছে লালগঞ্জে— বলছে, 'পথ দেখাও।'

হাজার হাজার মানুষ আওয়াজ ওঠাচ্ছে দিকে দিকে— 'লালগঞ্জ জিন্দাবাদ', 'তেলেঙ্গানা জিন্দাবাদ', 'লাল চীন জিন্দাবাদ', 'সোভিয়েত ইউনিয়ন জিন্দাবাদ'।

সে শ্লোগান শুনে কেঁপে উঠছে— কাকদ্বীপের পরগাছার দল। আতংকিত হচ্ছে কংগ্রেসীরা। চোখের সামনে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছে বিধান মন্ত্রিসভা— নেহেরু সরকার— সারা দুনিয়ার শোষক ও বড়লোক শাসক-গোষ্ঠী। ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে আমেরিকা ও ইংরেজের তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বাধিয়ে বাঁচার পরিকল্পনা— অ্যাটম বোমার হুমকি। সারা দুনিয়ার জনসাধারণের আদালতের সামনে ফাঁসির আসামীর মত দাঁড়িয়ে কাঁপছে তারা।

আর অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও লালঝাণ্ডা আরও প্রিয় হয়ে উঠছে সর্বহারাদের কাছে। তাই, মরার আগেও শত শত মানুষ ঝাণ্ডা বুকে করে ধরেই মরে। তাই, পরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে বীরের মত মাথা উঁচু করেই এগিয়ে যায় তারা।

তারা মরার আগে ডাক দেয় পিছনের সৈনিকদের— 'এগিয়ে এসো, ঝাণ্ডা উঁচুতে তুলে ধর'। শত শত মানুষ এগিয়ে আসে সে ডাক শুনে।

সর্বহারার জয়যাত্রা থামে না— এগিয়েই চলে। এলাকায় এলাকায় শোষণের ভিত ধসে পড়ে। 'মানুষ', 'জমি', 'জীবন', 'শ্রমশক্তি' মুক্ত হয় শোষণের নাগপাশ থেকে। মজুর চাষি ক্ষমতার জোরে দখল করে নেয় এলাকার— সারা দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা।

অতীত ইতিহাস

কাকদ্বীপের শোষক ও শোষিত দুইই বহিরাগত। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তার সাম্রাজ্য রক্ষার পাকা বন্দোবস্ত করার জন্য বাংলার এই সিংহদ্বারটিকে পরিষ্কার চোখের ওপর রাখতে চেয়েছিল।

সে জন্য জঙ্গল পরিষ্কার হওয়া চাই। কিন্তু হঠাৎ কেউ সখ করে এই 'সাপ', 'বাঘ', 'কুমীরের' রাজত্বে গিয়ে অজগর জঙ্গল সাফ করতে রাজি হবে কেন? তাই শেষ পর্যন্ত বিদেশী ইংরেজ আর তাদের এদেশী গোলাম জমিদার গোষ্ঠী অনেক শলাপরামর্শ করে এই জঙ্গল সাফ করার জন্য অনেক নতুন নতুন আইন পাশ করলো। এই আইনে সুন্দরবনের থানার বিরাট বিরাট এলাকা এক একজন জমিদারকে নামমাত্র খাজনায় অর্থাৎ বিঘা পিছু ছ'পয়সা দু'আনাতে, একশো বছরের জন্য পাকা বন্দোবস্ত করে দিলে। এমনকি প্রথম দশ বিশ বছর বিনি খাজনার ব্যবস্থাও রইল। এমনি ধারা আরও কতকি?

এক কথায় এই সব লাটদারেরা ইংরেজ লাটের মতো এক একজন লাট বেলাট হয়ে এইসব এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে বসলো।

এখন জঙ্গল কাটা ও চাষের লোক চাই। কিন্তু তারও অভাব হল না। ইংরেজের আইন ও জমিদারদের অত্যাচারে তখনই মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনায়, অন্যান্য অঞ্চলের চাষি উচ্ছেদ শুরু হয়েছে। জমি হারিয়ে প্রতি বছর শত শত মানুষ ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। এমনকি অনেকেই বেকার, অন্ন জোটেনা এই অবস্থা।

যেসব জমিদার মহাজন এদের এই দারুণ দুর্দ্দশার কারণ, তারাই লাটদার হয়ে এদের আবার নতুন জমির সন্ধান দিল— এই সুন্দরবনে।

জমির জন্য লালায়িত সর্বহারা মানুষ নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখলো। জীবনের সমস্ত রকমের দুর্যোগ ও বাধাকে পরোয়া না করে তারা ছুটে এলো সুন্দরবনে। বাঘ, সাপ, কুমীর ও প্রকৃতির সঙ্গে পর্যন্ত লড়াই করে সুন্দরবনের মাটিকে সুন্দর করে তুললো। সেই মাটিতে ফসল ফললো— রাশি রাশি ধান— সোনার ধান।

কিন্তু দু'পাঁচ বছর যেতে না যেতেই তাদের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। জমিদার মহাজন বা লাটদাররা কারুকেই জমির সত্ত্ব দিলো না। খাজনা প্রথা তুলে দিলে। প্রত্যেকের নামে মিথ্যা দেনার বোঝা চাপিয়ে তাদের মাথার চুল পর্যন্ত কিনে রাখলো। ভিটে পর্যন্ত খাস বলে ঘোষণা করলো। চাষিদের অর্দ্ধেকের বেশি হল ভাগচাষি, আর বাকী ক্ষেতমজুর। তারা পেট ভাতায় মহাজনের খাস জমির ধান চাষ করে দেবে, আর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে স্রোতের খড়ের মত এখানে ওখানে ভেসে বেড়াবে।

শেষে মহাজনরা দেখলে যে এতেও পুরো শোষণ হচ্ছে না। জমির ওপর মুনাফা আরও বাড়ানো চাই। তাই তারা যুক্তি করে সমুদ্রের বাঁধ কাটিয়ে দিলে। নোনা জলের বন্যায় লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি ২|৩ বছর করে ডুবিয়ে রেখে সুন্দরবনের মানুষকে একেবারে ভিখারী করে দিলে। পেটের দায়ে জমি, ঘর, বাড়ি, মা মেয়েদের ইজ্জৎ পর্যন্ত বিক্রি শুরু হল। মহাজনেরা নিলামে এক এক মুঠো ধান দিয়ে তাদের কেনা গোলাম বানালো আর নিজেরা নাম কিনলো, "অন্নদাতা"—"জমিদার"—"গরীবের মা-বাপ"। আবার বাঁধ বাঁধা হল। এবার দেখা গেলো ক্ষেতমজুরের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে, মহাজন আরও বেশি জমি খাসে চাষ করাচ্ছে।

এইবার লাটদারদের ইঙ্গিতে প্রত্যেক বছর জমি নিয়ে জুয়া খেলা শুরু করলো 'নায়েব', 'ম্যানেজার', 'বক্সীরা'। একবিঘে জমি ভাগচাষে বিলির জন্য সেলামী হল দশ বিশ টাকা

থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত। শেষে চাহিদা ভয়ানক বেশি দেখে, ঐ সব পশুর দল যুবতী মেয়ে ও স্ত্রীকেও সেলামী হিসাবে দাবি করলো। স্বামী নিজের স্ত্রীকে এক দুই রাত্তির কাছারীতে দিয়ে এসে জমি পেলে ভাগ চাষ করার জন্য দু'বিঘা কি পাঁচ বিঘা। মানুষ জমি হারালো, ভিটে হারালো, সমাজ হারালো, শেষে পেটের জ্বালা ইজ্জৎ, মনুষ্যত্ববোধ, বিবেক বিবেচনা পর্যন্ত হারালো। নিজের মান ইজ্জৎ রক্ষা করার জন্য কত মা বোনেরা যে আত্মহত্যা করলেন, কত স্বামী যে ইজ্জৎ হারাবার ভয়ে নিজের হাতে তার যুবতী সুন্দরী স্ত্রীকে খতম করে দিলে তার শেষ নেই। কারণ যে বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী সেই পরিবারের ওপরই মহাজনের জুলুম চলবে বেশি। সেই বছরের পর বছর জমি পাবে না, যতক্ষণ না তারা ঐ সব মেয়েদের ঐ পিশাচদের আড্ডায় পৌঁছে দিচ্ছে।

এত অত্যাচার মানুষ মুখ বুজে সয়নি। বিদ্রোহ করেছে। অনেক জমিদার মহাজন খুন জখমও হয়েছিল। ঘুঘুডাঙায় (বুধাখালীর পাশে) এইভাবে একজন ক্ষেতমজুর একজন কামান্ধ পিশাচ নায়েবকে খুনও করেছিল। কিন্তু ইংরাজ আইনের 'সুবিচারে' সেই ক্ষেতমজুরের হয়েছিল কঠোর সাজা— আজীবন কারাদণ্ড।

সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্যরা এই ধরনের ছোটখাটো বিক্ষোভ দেখে বুঝলো শুধু নায়েব আর দারোয়ান দিয়ে এই ধরনের শোষণ বা জুলুম চালানো যায় না। আরও কিছু পারিষদ চাই। তাই তারা এইসব চাষিদের সুবিধাবাদী মোড়ল মাতব্বরদের ডেকে কিছু কিছু জমি ও সুযোগ সুবিধা দিল। কাছারীতে বসার আসন দিয়ে নিজের জাতে তুলে নিল। এই যে নূতন পরগাছার দল সৃষ্টি হল, এরাই 'চকদার', 'গাঁতিদার', 'জোতদার', 'মহাজন' ও 'ধনী চাষি'— এরাই হল বড় লাটদারের পাহারাদার— বিশ্বস্ত কুকুর। এদেরই সাহায্যে তারা লক্ষ লক্ষ মানুষের বিক্ষোভকে বিভক্ত করে দিয়ে, ছত্রিশ রকমের বাজে আদায়, মেয়ে বিয়ে ও ছেলে হওয়ার ট্যাক্স (খাজনা বা নজর) পর্যন্ত আদায় করতে লাগলো।

এরই মাঝে এলো উনপঞ্চাশ সালের বিরাট বন্যা। এই বন্যায় কাকদ্বীপ থানার 'বুধাখালী', 'লালগঞ্জ', 'সিপ্লাট', 'চন্দনপিড়ি' ভেসে গিয়েছিল। বন্যার পরেই এলো দুর্ভিক্ষ। ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনের মত মহাজনরাও এসে পড়লো এই মানুষগুলোর ওপর। হরদম টিপসই দিয়ে দেনা কর্জ চলতে লাগলো।

চন্দনপিড়ির বসন্ত মণ্ডল একমন করে খেসারী দিয়ে পাঁচমণ ধানের দলিল লেখালে চন্দনপিড়ি লয়ালগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার মানুষের কাছে। কেউ বা দশটা টাকা নিয়ে একশো টাকার 'হ্যাণ্ডনোট' দিলে। কোনও মানুষ তিনখানা কাপড়ের বদলে সাত বিঘা জমি রেজেস্ট্রী করে বিক্রি কোবলা করে দিলে। শেষে এই 'হ্যাণ্ডনোট' বা প্রতিশ্রুতিরও কোন দাম রইল না। মানুষের শ্রমশক্তি ও দেহ হাটে বাজারে বিক্রি হতে লাগলো। একমণ ধানের বদলে কোনও মানুষ এক বছরের জন্য ক্রীতদাস খাটতে (মাল্‌দার) রাজী হল। তেমনি একমণ ধানের বিনিময়ে কোনও দুর্ভাগা 'মা' দিনের পর দিন দেহ বিক্রী করে শিশুসন্তানদের বাঁচিয়ে রাখলো। নামকরা ব্যারিস্টার লাটদার দিন্দা, সেন, শাসমল. মহারাজ শ্রীশ নন্দী, শ্রীনাথ ধর, গোপী গিরি, অন্নদা দাস, দ্বারিক সামন্ত, বসন্ত মণ্ডল, সতীশ অগস্তী প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির মালিক প্রত্যেকেরই রামরাজ্যের ইতিহাস একই।

লালঝাণ্ডার ডাক

দুর্ভিক্ষের মাঝে রিলিফ দিতে গিয়েছিল লালঝাণ্ডার কর্মীরা এই অঞ্চলে। কিন্তু এখানকার মানুষ লালঝাণ্ডাকে শ্রেণি-সংগ্রামের নিশানা হিসাবেই তুলে ধরলে।

তখনকার যুগের 'জনযুদ্ধ' আর 'জমির লড়াই' পড়ে এখানকার অত্যাচারিত জনসাধারণ একেবারে কলকাতার পার্টি অফিসে প্রশ্ন করে পাঠালে "জমির লড়াই মানে কি? ... আমরা জমি দখল করতে চাই।"

লড়াই সত্যই শুরু হল গত ১৯৪৬ এর তেভাগার ডাকে। ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষিরাই এর নেতৃত্ব দিল। হাজারে হাজারে লালঝাণ্ডার সভ্য হয়ে লাঠি আর কাস্তে নিয়ে মাঠে নামলো। একেবারে ধান কেটে নিজের খামারে নিয়ে এলো।

কমিউনিস্ট পার্টির আওয়াজ ছিল তেভাগা, কিন্তু ভাগচাষিরা অনেক ক্ষেত্রেই পুরা ফসল আদায় করে নিলে। ক্ষেতমজুরের মজুরি বেড়ে গেলো প্রায় ডবল। ৩৬ রকমের বাজে আদায়, ভাগসেলামী, আর নায়েব কাছারীর বর্বরতা বন্ধ হল। 'বুধাখালী', 'লালগঞ্জ', 'দ্বারিকনগর', 'রাজনগর', 'চন্দনপিড়ি' প্রভৃতি এলাকায় প্রকাশ্যে হাজার হাজার লোকের আদালতে বড় বড় লাটদার মায় 'অতুল শাসমলের' পর্যন্ত বিচার হল। কারুকে জুতো পেটা করা হল। সুন্দরবনের আধমরা, নির্জীব মানুষ নিজে হাতে এই সব করলে।

ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠা সিংহের গর্জনের মত হাজার হাজার মানুষের হুঙ্কারে শ্রেণিশত্রুরা প্রমাদ গুণলো। অনেকে লাট ছেড়ে পালাতে শুরু করলে।

এবার জীবনের মর্যাদা ও মনুষ্যত্ববোধ নতুন পথে এগিয়ে চললো। জমির লড়াই মানে জমি দখল করা তা বাস্তবে পরিণত হল। লালগঞ্জে ও বুধাখালীতে ভিটাচ্যুত ক্ষেতমজুররা জোর করে জমি দখল করে ঘর করে ফেললে।

রাজনগরের এই রকম ঘর অনেক তৈরি হল। যাদের জমি ছিল না, লড়াই কমিটি তাদেরও জমি ভাগ করে দিলে। ক্ষেতমজুরদের বার আনা রকম সমস্যার সমাধান হল। ভাগচাষিদের বছর বছর উচ্ছেদ প্রথা চাষিরা লাঠির বহরে বন্ধ করে জমি নিজ নিজ দখলে রাখলো।

ব্রিটিশের পোষা কুকুরের দল তাড়া খেয়ে ছুটলো ম্যাজিস্ট্রেট, হাকিমের কাছে। 'বাঁচাও' বলে পায়ে লুটিয়ে পড়লো। শ্রেণি সংগ্রামের চেহারা দেখে তখন ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদেরও চোখের ঘুম সরে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি মিলিটারী পাঠিয়ে কাকদ্বীপ থানা ছেয়ে ফেললেন।

লালগঞ্জ, চন্দনপিড়ি, রাজনগর, বুধাখালী, আরও অনেক জায়গায় ক্যাম্প হল। মায় "রেডিও যন্ত্র পর্যন্ত বসালো— লালগঞ্জে"।

এক সঙ্গে শত শত রাইফেলধারী পুলিশ গ্রামে ঢুকে অত্যাচার শুরু করলো। লোকের ঘর বাড়ি তছনছ করে জ্বালিয়ে দিল। টাকা পয়সা, ধান, মায় ছেঁড়া কাঁথা পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গিয়ে হয় নদীর জলে ফেলে দিল, নয়তো পুড়িয়ে দিল। ৮০|৯০ বছরের বুড়োদের পর্যন্ত ধরে নিয়ে গিয়ে কাছারীতে মেরে অজ্ঞান করে ফেললে। যুবকদের ধরে মারতে মারতে দাঁত উপড়ে দিল। ঘরে ঢুকে মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে অজ্ঞান করে ফেলে রাখতে লাগলো। লালগঞ্জের গিরীশ মণ্ডলের ছ'মাসের শিশুকে মার কোল থেকে টেনে আছড়ে ফেলে মেরে ফেললে। প্রায় ৪|৫ শত লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরলো। ২|৩ জায়গায় গুলিও চললো, ৮|১০ জন জীবনও দিলেন।

প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু

ইংরেজ সরকার ভেবেছিল কৃষকদের এই নবজাগরণ বুলেটের ঘায়ে রুখে দেবে, কিন্তু তা হল না। মানুষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলে এই ধান জমি, ঘর বাড়ি, ইজ্জৎ রক্ষা করতে হলে— এই আক্রমণও রুখতে হবে। তার উপযোগী সংগঠন ও শক্তি চাই। তাই তারা নতুন কায়দার সংগঠন গড়লো। গোপন সংকেত হল। সেই সংকেত শুনলে হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ শিশু নানা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এসে পুলিশ বাহিনীকে ঘিরে ফেলে তাড়াতে শুরু করলো। বন্দীদের ছিনিয়ে নিলে। রাইফেলের সঙ্গে মুকাবিলা করার জন্য 'তীর ধনুক' তৈরি হল। শেষে প্রতিরোধ সংগ্রাম আরও এগিয়ে গেলো। লালগঞ্জের হাজরা কাছারী থেকে 'শচীন ঘোষ' রাইফেল পাহারায় ধান পাচার করছিল। পার্টির ভলান্টিয়ার দল খবর পেয়ে তাদের চার দিকে থেকে ঘেরাও করলে। রণোন্মত্ত লালঝাণ্ডাধারীদের চেহারা দেখে সিপাহীরা রাইফেল ফেলে দিয়ে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন। এক হাজার ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষি বোটের ধান কাছারীর নায়েব ম্যানেজারকে দিয়ে বইয়ে ফেরৎ আনালে। এমনি করেই সংগ্রাম উচ্চ থেকে উচ্চস্তরে উঠতে লাগলো। অনেক ক্ষয়ক্ষতি অত্যাচার সয়েও কাকদ্বীপের মানুষ আর মাথা নত করলে না। অচল অটল হয়ে লালঝাণ্ডা উঁচু করে তুলে ধরে রইলো। প্রতিদিনের সংগ্রামে এগিয়েও যেতে লাগলো।

কংগ্রেসীদের রূপ

বর্তমান পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস সম্পাদক চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর নির্বাচনক্ষেত্র এই কাকদ্বীপ অঞ্চল। বহুদিন থেকেই এই ভণ্ডতপস্বীটি ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের বন্ধু সেজে এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে, তার অনেকগুলো আড্ডাও এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল— 'খাদি' নামে। কিন্তু তিনি নিজেও যেমনি একবারও ভুলেও ক্ষেতমজুরের বাড়ি উঠতেন না, তেমনি এই খাদির আড্ডাগুলোও গরীবের কাছ-ঘেঁসা ছিল না। সুন্দরবনে এলে চারুবাবুর নরম বিছানা, ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা হতো মহাজন, লাটদার, জোতদার অথবা ধনীচাষির বাড়ি। তেমনি এই 'খাদি'গুলোও পরিচালিত হতো এইসব শোষণকারী সম্প্রদায়েরই টাকায়। পেশাদার যাত্রাওয়ালার মত চারুবাবু দিব্য আরামে খাওয়া দাওয়া সেরে বড় বড় জনসভায় এসে ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের সামনে খানিকটা কুম্ভীরাশ্রু ফেলে দুঃখে বিগলিতধারা হয়ে যেতেন। জমিদার জোতদারদের দু'একটা গালাগালও করতেন। তাঁর হাতে ক্ষমতা এলে ভাগচাষিদের রাজা করে দেবেন তাও বলতেন। তারপর বক্তৃতার শেষে যখন ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরেরা নানা আশা নিরাশার দোলা খেতে খেতে বাড়ি যেতো তখন চারুবাবুকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতো আরও খাতির করে নতুন নতুন জোতদার মহাজন। সেখানে শুধু খাওয়াই নয়, ভোজনের পর কংগ্রেসের চাঁদার নামে মোটা দক্ষিণাও হতো এবং অনেকে শিষ্যত্বও গ্রহণ করতো। সারা সুন্দরবনের মধ্যে ঘৃণিত জোতদার, গুণ্ডা ডাকাতদের সর্দার— হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রধান পাণ্ডা— চারু ময়রা, চারু ভাণ্ডারীকে আজও গুরুদেব বলে সম্মান করে। এমনিতর প্রত্যেকেই করে। এক কথায় সমস্ত লাটদারদের পরম গুরু বা নিজে লাটদার না হলেও লাটদার সম্রাট হয়ে সকলকে রক্ষা করে এসেছে এই চারু ভাণ্ডারী।

কংগ্রেসের ও চারু ভাণ্ডারীর এই ভণ্ডামির মুখোশ নির্ম্মমভাবে খুলে গেলো তেভাগার

বছর। কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে বাঁচার লড়াইয়ে যখন কাকদ্বীপের হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ শিশু জানের পরোয়া না করে এগিয়ে যেতে লাগলো— যুগ যুগের অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যখন তারা নতুন মনুষ্যত্ববোধ নিয়ে বেঁচে উঠলো— যখন দিনের পর দিন উপোসী কঙ্কালসার মানুষ পেট ভরা খাওয়ার ব্যবস্থা করে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে— যখন নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, মাতার দেহ ও ইজ্জতের বিনিময়ে বেঁচে থাকার নিষ্ঠুর কলঙ্ককে মুছে ফেলে তারা নতুন সমাজ গড়ে তুলতে শুরু করলো, তখন এই কংগ্রেস নেতা ও খাদির পাণ্ডারা তাদের একটু সাহায্য তো করলেই না বরং বিপক্ষেই গেলো। ব্রিটিশের পোষা সিপাহী ও ডালকুত্তা দারোগার দল যখন গিয়ে গ্রামে গ্রামে পিশাচের তাণ্ডব নাচ শুরু করলে, যখন তারা ছয় মাসের শিশুকে আছড়ে মারলে— যুবতী মেয়েদের ধরে পাশবিক অত্যাচার করে অজ্ঞান করে ছাড়লে, তখন এই গরীবের বন্ধু কংগ্রেসীরা তার বিরুদ্ধে একটিও কথা উচ্চারণ করলে না বা একবারও এই পাশবিক অত্যাচারকে নিন্দা করলে না। কিন্তু ক্ষেতমজুর ও কৃষকরা যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে তার প্রতিরোধ করতে গেলো— তখন তাদের আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধ সংগ্রামকে নিন্দা করে চারু ভাণ্ডারীর দল বিবৃতি ও বক্তৃতা ছাড়লেন— "ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুররা অহিংসা নীতি মানছে না অন্যায় করছে, সুতরাং অত্যাচার তো হবেই।" উপদেশ দিলেন "আর কিছুদিন অপেক্ষা কর— কংগ্রেসের হাতে স্বাধীনতা এসে গেলো বলে। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। জমিদার মহাজন পিতার তুল্য, তাদের সঙ্গে মিলেমিশেই থাকতে হবে।"

কংগ্রেসীদের এই নির্লজ্জ আচরণ ও বক্তৃতায় মানুষের আরও চোখ ফুটতে শুরু করলো। কংগ্রেসী স্বাধীনতার আমলে যে আসলে জমিদার জোতদাররাই স্বাধীন হবে তা অনেকেই ধারণা করে নিলে। তাই ১৫ই আগষ্ট কাকদ্বীপ থানায় স্বাধীনতা উৎসব ভাগচাষি বা ক্ষেতমজুররা করে নি। তারা লালঝাণ্ডা তুলে, 'জমি ও বাঁচার লড়াই করারই' প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। কিন্তু সেদিন উৎসব হয়েছে প্রত্যেক কাছারীতে। তার চূড়ায় চূড়ায় কংগ্রেস পতাকা উড়েছে। 'অতুল শাসমল', 'দ্বারিক সামন্ত', 'চারু ময়রা', 'দিন্দা', 'অগস্তী' সবাই খদ্দর পরে, গান্ধী টুপি মাথায়, "বন্দেমাতরম্" বলে চিৎকার করে করে গলা ফাটিয়ে ফেলেছে। তারা শত শত টাকার তোড়া, ফুলের মালা ও অভিনন্দন পাঠিয়েছে চারু ভাণ্ডারী, নেহরু থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেসের ছোট বড় শত শত পাণ্ডা ও হাকিম ম্যাজিস্ট্রেটদের।

এমনি ভাবেই কংগ্রেসের আসল রূপ ফুটে বেরিয়েছে কাকদ্বীপের ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষির সামনে। তারা দারুন ঘৃণায় থুথু ফেলেছে কংগ্রেসের নামে। চারু ভাণ্ডারী ভেবেছিল এবার একবার এলে বুঝি আরও মান ও অভ্যর্থনা পাবে চাষিদের কাছে। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। ৩|৪ হাজার লোকের সভায় সেই বছরই লালগঞ্জের চাষি বীরের মত বলে দিয়েছে তাকে— 'বড় লোকের কুকুর ঘেউ ঘেউ করো না— দূর হও সুন্দরবন থেকে, ফের যদি নামখানার নদী পার হতে দেখি তাহলে ঠ্যাং ভেঙ্গে ছেড়ে দেবো!' কুকুরের মত তাড়া খেয়েই পালিয়েছিল চারু ভাণ্ডারী সেদিন— আর আজও আসতে সাহস করেনি নদী পার হয়ে।

এরপর দেখা গেছে দুটো ছবি। প্রত্যেক কাছারীতে হয়েছে কংগ্রেস অফিস। নায়েব ম্যানেজার থেকে শুরু করে লাটদার, ধনী চাষি ও চোরাকারবারীরা হয়েছে কংগ্রেস নেতা, আর মাঝারী জোতদারদের নিয়ে হয়েছে তাদের কংগ্রেস কমিটি। লাখো লাখো টাকার কারবার চলেছে

তার ভেতর। আর অন্যদিকে ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের সমস্ত দাবি, সুখ সুবিধা অস্বীকার করে এবং নাকচ করে দিয়ে কংগ্রেস সরকার আইন পাস করেছে, ইস্তাহার দিয়েছে 'ভাগচাষিদের উচ্ছেদ করা ন্যায়সঙ্গত বলে'। গোটা কাকদ্বীপ থানায় ১৪৪ ধারা চিরস্থায়ী ভাবে জারি হয়েছে। মহাজন ও কংগ্রেসের সহায়তায় গরীব জনসাধারণের নামে শত শত মিথ্যা দেনার ডিক্রি করে তাদের যথাসর্ব্বস্ব ক্রোক করা হয়েছে। সর্বশেষে কালা কানুন পাস করে শত শত কর্মীকে দিনের পর দিন জেলে আটকে রেখেছে। পাশবিক অত্যাচার যাতে চিরস্থায়ী ভাবে চলতে পারে সেজন্য লালগঞ্জ ও বুধাখালীতে দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়েছে।

কাকদ্বীপের মানুষ আশ্চর্য হয়নি এই ব্যবস্থা দেখে। কাছারীগুলোর নরক ও যমপুরীর অত্যাচার তাদের আগে থেকেই জানা ছিল। আজ তারই ওপর কংগ্রেসী ঝাণ্ডা আর ঐ সব রক্তচোষা জোঁকের মাথায় গান্ধী টুপি দেখে তাদের কংগ্রেস সরকারের সম্বন্ধেও মোহ ঘুচতে শুরু করছে। তাই স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাস পরেই অসংখ্য মিটিং করে তারা জানিয়ে দিল ও বুঝিয়ে দিল সবাইকে যে, এবার আত্মরক্ষার লড়াই জমি দখলের লড়াই এক সাথে চলবে। যে লড়াই শুরু হয়েছিল ইংরেজের আমলে তা দ্বিগুণ জোরদার করতে হবে। কংগ্রেসী ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে জীবন ও ইজ্জৎ রক্ষা করতে গেলে আরও দৃঢ় একতা নিয়ে দাঁড়াতে হবে। জমি ও ধান দখল করতে হবে। তাই, আবার হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ শপথ নিল লালঝাণ্ডা নিয়ে, এই লড়াইয়ের সৈনিক হবার জন্য। তারা বীর সৈনিকের মত পা বাড়ালো। কংগ্রেস সরকারের 'আইন', 'গুণ্ডা', 'সেপাই', '১৪৪' সব অগ্রাহ্য করে তারা হাজার হাজার বিঘা জমি লালঝাণ্ডা উড়িয়ে দখল করে সোনার ফসল ফলালো।

শ্রেণি সংগ্রামের নতুন রূপ

নভেম্বর ১৯৪৮। কাঁচাপাকা ধানে মাঠের নতুন রূপ খুলেছে। কাকদ্বীপের লালঝাণ্ডা এলাকার প্রত্যেকটি মানুষের মন ও মুখের চেহারাও বদলে যাচ্ছে। দৃষ্টিতে কি যেনো এক নতুন চেহারা খুলেছে, চোখের তারা দুটো আগুনের মত জ্বলছে। দেহের পেশীগুলো আরও কঠোর হয়ে উঠছে। লালঝাণ্ডাধারী ক্ষেতমজুর আর ভাগচাষিরা ভালো ভাবেই লক্ষ্য করছে, কেমন করে গাঁয়ের মানুষ দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কাছারী গুলোয় কংগ্রেসী আড্ডা বেশ ভালো করে জমে উঠেছে। প্রত্যেকটি অবস্থাপন্ন ধনী চাষি, জোতদার, মহাজন সেই দিকে ঝুঁকছে মাঝে মাঝে গোপনে দারোগা আর কংগ্রেস নেতারা আসছে, নানা শলা-পরামর্শও চলছে। কখন ও বা গুজব শোনা যাচ্ছে— 'হঠাৎ আক্রমণ হবে—'। 'নেতাদের ধরে নিয়ে যাবে।' তাই এদিকেও মিটিংয়ের বিরাম নেই। নওজোয়ান ছেলেরা সব, গান বাজনা ও দল করা ছেড়ে দিয়েছে। সমস্ত গরীবদের বুঝিয়ে দিন রাত সংঘবদ্ধ করা চলেছে। প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো হচ্ছে। সবাই তৈরি হচ্ছে একটা আসন্ন সংঘর্ষের জন্য— যা ধান কাটার আগে আসবেই।

৬ই নভেম্বর ভোর বেলা একই সঙ্গে ১০|১৫ খানা বোটে করে প্রায় পাঁচ শত সশস্ত্র পুলিশ এসে একই সঙ্গে কাকদ্বীপের সব কটি কমিউনিস্ট এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। নৌকার মাস্তুলে কংগ্রেস পতাকা উড়িয়ে বিধান মন্ত্রিসভায় এই পোষা কুত্তার দল বীর দর্পে এসে নামলো সুন্দরবনের মাটিতে। কাছারীর কংগ্রেসী ডালকুত্তারা তৈরিই ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানালো আর পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

নরপশুদের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্যই হল, কুঁড়ে ঘরের ভেতরগুলো। সেখানে গিয়ে আসামী খোঁজার ছুতো করে তারা হাঁড়ি, কলসী, যা কিছু জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুরে তছনছ করতে লাগলো। কাগজপত্র খোঁজার নাম করে তারা মেয়েদের পরনের কাপড় ধরে টানাটানি করতে লাগলো। কেউ বা অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে তাদের ইজ্জতে পর্যন্ত হাত দিতে গেলো। কংগ্রেসী পাণ্ডা যারা ঐ সব সিপাহীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল তারা তারিফ করতে লাগলো এইসব জঘন্য ব্যবহারকে। ' বেশ হচ্ছে বাহবা' বলে উৎসাহিত করতে লাগলো পিশাচদের।

লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে আগুন জ্বলে উঠলো মেয়েদের মনে। এ অপমানের জবাব দেবার জন্য তৈরি হলেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে শাঁখে 'ফুঁ' পড়লো। একই সঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে এই আওয়াজ ডাক দিল সৈনিকদের। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার ডাক। কাকদ্বীপের প্রত্যেকটি এলাকায় একই সময়ে এই ঘটনা ঘটলো। যেমন একই সঙ্গে একই সময়ে আক্রমণ শুরু হয়েছিল, তেমনি একই সঙ্গে প্রতিরোধেরও ডাক এলো। শত শত মানুষ লাঠি লালঝাণ্ডা হাতে ছুটে এলো সৈনিকের বেশে। সামনে যে যা হাতিয়ার পেল, নিয়ে এলো। তারা চারিদিক থেকে রুখে দাঁড়ালো এই বর্বর পশুদের। মেয়েরাও বেরিয়ে এলো ঘর থেকে— ঝাঁটা আর লালঝাণ্ডা নিয়ে। একসঙ্গে অভিযান শুরু হল সকলের। কাকদ্বীপের বুক থেকে আবর্জ্জনা ঝাঁটা দিয়ে সাফ করার নতুন জয়যাত্রা।

এই মিলিত প্রতিরোধের সামনে কোন এলাকার নরপশুই টিকতে পারলো না— হটলো মৌজা থেকে। নয়তো তাড়াতাড়ি কাছারীতে গিয়ে আশ্রয় নিল প্রাণভয়ে। চন্দনপিড়িতেও তারা প্রথমটা হেরে গেলো। দারোগা ও ১৫জন সিপাই একসঙ্গে রাইফেল সমর্পণ করে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো। বললে, "মাফ্ করো— ফিরো যাবো।" কিন্তু সহজে তারা নিষ্কৃতি পেল না— দারোগাকে মাটিতে নাক ঘসড়ে ক্ষমা চাইতে হল। সমস্ত কাগজপত্র ফেরৎ দিতে হল— কেউবা চড়চাপড়ও খেল। তারপর ছাড়া পেল।

সেদিন চলে গেল। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে আবার শাঁখ বাজলো চন্দনপিড়িতে। সবাই বুঝলে আবার আক্রমণ শুরু হয়েছে। কিন্তু বড় শক্তিটা তখন আর একদিকে পুলিশ হটাতে চলে গেছে। তাই অশ্বিনী দাস ১০|১৫ জন ভলান্টিয়ার নিয়েই ছুটলো। গিয়ে দেখে তারই বাড়িতে বর্বরেরা মেয়েদের অপমান করছে, তাই মেয়েরা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এবার এসেছে পুলিশের আরও একটা নতুন দল। সংখ্যায় তারা ছত্রিশ জন। তাদের পথ চিনিয়ে এনেছে "সেনের কাছারীর" নায়েব ও কংগ্রেসী নেতা, 'পরেশ দাস' আর বক্সী 'বসন্ত মণ্ডল'।

তবুও ১৪|১৫ জন কৃষক মেয়ে কোনঠাসা করে ফেলেছে তাদের। ৭|৮ মাসের গর্ভবতী মা অহল্যা প্রচণ্ড বেগে ঝাঁটা কসিয়ে দিয়েছে পরেশের মুখে। সরোজিনী গিয়ে চেপে ধরেছে একটা গুর্খা ফৌজের রাইফেলের মাথা। ধস্তাধস্তি চলেছে ১৫ জন মেয়ের সাথে ৩৬টি রাইফেলধারী কুকুরের। তবুও পেরে উঠছে না তারা। লালঝাণ্ডার সেরা সৈনিক অশ্বিনী দাস এই দৃশ্য দেখে হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে চললো লাঠি ঘুরিয়ে। তারই সঙ্গে ছুটে চললো সর্বহারারা। জয়ধ্বনি দিতে দিতে ছুটলো বাকী পনেরোটি মানুষ— 'তীর', 'ধনুক', 'লাঠি', 'সড়কী' হাতে।— আর ক্ষমা করবে না এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

মৃত্যুর পরোয়ানা দেখলো শত্রুর দল সম্মুখে। আতংকে পরেশ দাস চিৎকার করে উঠলো—"গুলি কর অশ্বিনীকে.... আর রক্ষে নেই।"....

বুলেটের গুলি গিয়ে বিঁধেছে অশ্বিনীর বুকে। পিঠ দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে সেটা। রক্ত ঝরে কাপড় ভেসে যাচ্ছে, তবুও লক্ষ্য নেই অশ্বিনীর। এক লাঠির ঘায়ে শুইয়ে দিল সেই সিপাহীকে, যে বাতাসীকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল। সারা কাপড়টা লালঝাণ্ডার মত লাল হয়ে গেছে— তবুও এগিয়ে চলেছে সে। 'লালঝাণ্ডা কি জয়' এই আওয়াজ তুলে অশ্বিনী আবার লাঠি চালালো। অহল্যাকে আক্রমণোদ্যত সিপাইটি সেই ঘায়েই শুয়ে পড়লো। এবার ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেটবৃষ্টি শুরু হল। আর একটা বুলেট অশ্বিনীর মাথা ফুটো করে বেরিয়ে গেলো। সে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে একজন ফৌজ লাফিয়ে এসে সঙ্গীন দিয়ে তার বুকখানা চিরে দিলে। মরার আগে একজন পাষণ্ডের টুটি টিপে ধরে মরলো 'গজেন ভুইয়া'। গুলি খেয়েও প্রচণ্ড ঘুসী চালালো 'দেবেন ধর' দারোগার মুখে। এমনি করেই জীবন দিল বাতাসী, উত্তমী। সরোজিনী, ভাই অশ্বিনীর দেহটা দু'হাতে বুকে জড়িয়ে পালাচ্ছিলো— হঠাৎ গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো সে। এবার অশ্বিনীর দেহ কোলে তুলে নিলেন মা অহল্যা। গুলি লাগলো তাঁর তলপেটে। কাছারী ও বড় লোকের রক্ষক আর একটি কংগ্রেসী ফৌজ ছুটে এসে সঙ্গীন দিয়ে চিরে দিলে অহল্যার গর্ভ।

স্বাধীন কংগ্রেসী বাম রাজত্বে গুলি ও সঙ্গীনের খোঁচা খেয়েছে আট মাসের গর্ভবতী ভাগচাষির স্ত্রী। ধারালো সঙ্গীনের খোঁচায় ছিঁড়ে গেছে গর্ভের অজাত শিশু। বুলেটের আগুনে ঝল্‌সে গেছে তার আরক্ত দেহ। জন্মাবার আগেই মরে গেছে সে। তবুও সে বিদ্রোহ করতে চায়। তবুও সে ডাক দিতে চায় দুনিয়ার ভাগচাষি আর সর্বহারাদের।.... ধীরে ধীরে ছাঁচে ঢালা মুঠো করা একটা অস্পষ্ট হাত বেরিয়ে এসেছে ঝলমলে সূর্যের আলোতে সঙ্গীনে চেরা চামড়া ভেদ করে। দুহাতে সেটা চেপে ধরে তবুও এগিয়ে চলেছে মা অহল্যা।

পৈশাচিক হাসি হেসে গান্ধী টুপি মাথায় কংগ্রেসী পাণ্ডা পরেশ দাস বলছে চিৎকার করে— "কেমন, তেভাগা নেবে না?.... সাধ মিটেছে জমির?" তবুও ত্রিশটি মেয়ে পুরুষ শিশু দুর্জয় প্রতিরোধ করে চলেছে চন্দনপিড়ির মাটিতে দাঁড়িয়ে। তারা সবাই বুলেট খেয়েছে, সবাই আহত হয়েছে। ফ্যাসিস্ট দস্যুরা আধমরা ও মরা দেহগুলোকে সঙ্গীনে গেঁথে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবুও এরা পিছু হটছে না। রক্তের স্রোত বয়ে গেছে সেখানে। আধপাকা ধানের শীষ ক্ষেতমজুর ও কৃষকের বুকের রক্তে লাল হয়ে গেছে, তবুও এগিয়ে চলেছে এরা।

ওপার থেকে লালগঞ্জের মেয়েপুরুষ শুনেছে এই গুলির আওয়াজ প্রাণপণে ছুটেছে তারা। নদীতে নৌকা নেই। জয়ধ্বনি দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে নদীতে। এক মাইল চওড়া কুমীরে ভরা নদী সাঁতরাচ্ছে তারা। দাঁত দিয়ে লাঠি ও তীর ধনুক চেপে ধরে প্রচণ্ড জলস্রোত পার হয়ে চলেছে দরদী মানুষ ও ময়দানের সাথীরা। তারা বেপরোয়া, যেতেই হবে ভাইকে বাঁচাতে।

এই জয়ধ্বনি শুনে পালিয়ে গেলো পশুর দল। সব আহতদের তারা নিতে পারলো না। লালগঞ্জের মানুষ যখন পার হয়ে ওপারে গেলো, দেখলো পড়ে আছে মা অহল্যা। দুহাতে চেপে ধরে আছে পেটটা। তখনও মুঠো করা ছোট হাতখানা বাইরে।

"পরেশ দাস— বসন্তকে চাই।" "ঘৃণ্য কুকুরদের রক্ত চাই" আওয়াজ ফেটে পড়লো চারদিকে। পরদিন সকালে আরও পাঁচ শত ফৌজ নিয়ে সরকারের বড় বড় কর্তারা হাজির হল। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কমিশনার ঘোষণা করলো— গুড়িয়ে দেবো কামানের গোলায় চন্দনপিড়ি দ্বীপ। মৃত্যু তাণ্ডব শুরু হল চারদিকে। তবুও অবাক বিস্ময়ে দেখলো সেখানকার

মানুষ— পুলিশ, ফৌজ, হাকিম, ম্যাজিস্ট্রেট সবাই— মা অহল্যার দেহ লাল ঝাণ্ডায় মুড়ে শোভাযাত্রা করেছে কয়েকশো লোক। আরও কিছু পরে খবর এলো— হত্যাকারী "পরেশ দাস ও বসন্তকে" মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে জনসাধারণের আদালত। পাঁচ শত ফৌজ এসেও তাদের লুকিয়ে রাখতে পারেনি, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি।

কংগ্রেসী ফ্যাসিস্টরা কামানের গোলায় চন্দনপিড়ি দ্বীপ গুড়িয়ে দেয়নি বটে, তবে গুড়িয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটি ঘর-বাড়ি, সংসার। প্রত্যেকটি পুরুষকে তারা ধরে নিয়ে গিয়ে মাসের পর মাস আটকে রেখেছে। তার পর শুরু করেছে তারা অত্যাচার। শত শত ফৌজত বটেই কিন্তু তারই সঙ্গে তাদের পাহারাদার একটা ডালকুত্তার দল তৈরি হল। এদের নাম হল "সেবাদল"। গ্রামের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শোষক ধনী, জমিদার, মহাজন, জোতদার এতে যোগ দিলে। আতংক সৃষ্টি করে ২/৫ ঘর দুর্বল চাষিকেও টানলো। কলকাতা থেকে বড় বড় কংগ্রেসী সংগঠকরা গেলো। তারা এর সংগঠনের ভার নিল। নতুন করে কংগ্রেস কমিটি হল। তাদের বড় পাণ্ডা হল রাইচাঁদ, হৃষীকেশ— এরা। এই পাণ্ডাদের নেতৃত্বে রোজ সকাল এবং সন্ধ্যায় শহর ও পাড়াগাঁয়ের সেবাদল এবং বিধান মন্ত্রিসভার ফৌজ একসঙ্গে শান্তি প্রচারে বেরুতে শুরু করলো।

তাদের শান্তি প্রচারের কয়েকটি ধারা ছিল। প্রথমেই দলবল নিয়ে তারা পুরুষশূণ্য ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষিদের বাড়ি ঘেরাও করতো। তারপর নানা অশ্লীল গালিগালাজ করে একদল রাইফেল উঁচিয়ে মেয়েদের ঘিরে রাখতো, অন্য দল লুটপাট করতো। এই লুটপাটের সময় তারা ধানচাল টাকাকড়ি মায় কাঁথা কাপড় কিছুই বাদ দিতো না। জব্দ করবার জন্য শীতকালের ছেঁড়া মাদুরগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়ে যেতো।

এমনি করে পুরো একটি মাস শান্তি প্রচার করে তারা দেড়শো ঘর লোককে একেবারে শেষ করে দিল। ঘরে ঘরে উপবাস শুরু হল।

শান্তিপ্রচারের প্রথম দফা এই ভাবে শেষ হলে, যখন লুটের আর কিছু রইলো না তখন শান্তি প্রচারের দ্বিতীয় দফা আরম্ভ হল। এবার প্রচারকরা বেরুত সন্ধ্যাব পরে। শূণ্য ঘরে সারা দিন না খেয়ে যখন অনাথা মেয়েরা ধুঁকছে আর চোখের জলে মাটি ভেজাচ্ছে, তখন এই শান্তিবাহিনী তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করতো—"তোদের স্বামীরা আর ফিরবে না। কতদিন এইভাবে একা থাকবি? তার চেয়ে আমাদের নিয়ে শান্তিতে বাস কর।" এমনি করেই একদিন রাতে শান্তি প্রচারে গিয়ে অনাথা কুড়ি বছরের দুর্গামণির ওপর পর পর চারজনে পাশবিক অত্যাচার করে অজ্ঞান করে গেলো। কংগ্রেসী পাণ্ডা রাইচাঁদ একদিন এই শান্তি-সেবাদল ও কলকাতার কংগ্রেসী সংগঠক ২/১ জনকে নিয়ে তার ভাইপো কৃত্তিবাস মাইতির বাড়ি ঢুকলো। পুরুষরা কেউ জেলখানায় কেউ ফেরার, চারটি যুবতী বৌ-এর ফাঁকা সংসার। মেজভাই মৃত্যুশয্যায়; তাই পুলিশ তাকে ছেড়ে গেছে। শান্তি সেবাদল বাড়িতে ঢুকে পুকুরের মাছ ধরলো কয়েকটা, ২/১ জন পুলিশ বললে, এতো মাছ বাঁধবো কিসে? একটু হেসে রাইচাঁদ জবাব দিল— "চল যোগাড় করে দিচ্ছি।"— এই বলে দলবল নিয়ে সেই মরণাপন্ন মেজ ছেলের ঘরে গিয়ে তার আঠারো বছরের বৌকে টেনে তুললো। তাদের সামনেই তাকে উলঙ্গ করে তার দেহ থেকে ছেঁড়া শাড়ীখানা খুলে নিলে। তারপর হাসতে হাসতে তারা চলে গেল সে শাড়ীতে মাছ বেঁধে নিয়ে।

এমনি করে রুস্তম সেখ, গোষ্ঠ খাঁটুয়ার ঘর ভাঙলো। এমনি করেই আর একজন অজানার উপর পাশবিক অত্যাচার না করতে পেরে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। শত শত বিদেশী লোক আনিয়ে তাদের মাঠের ফসল— অশ্বিনী, অহল্যার রক্তমাখা ধান তারা কেটে তুলে নিয়ে নৌকা করে চালান দিল। চার পাঁচমাস ধরে চললো এই অত্যাচার ও শান্তি প্রচার। কিন্তু তবুও শান্ত হলো না চন্দনপিড়ির মানুষ।

প্রথম ধরপাকড়ের পর মেয়েরা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু ৮|১০ দিনের মধ্যেই তাঁরা নিজেদের সংগঠন ও সংকেত ঠিক করে নিলেন। অত পাহারার মাঝেও নদী পার হয়ে লালগঞ্জের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। যুক্তি পরামর্শ হল। যাদের খাদ্য কাপড় লুটপাট করেছিল তাদের আবার ঐসব সাহায্য চলতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধও আরম্ভ হল। দাউলি, বঁটি, ভানি এইসব নিয়ে মেয়েরা নিজেদের সশস্ত্র করলেন। তাই দিয়ে তাঁরা বাধা দিতে লাগলেন ঐ শান্তিনামধারী নর-পশুদের। নিজেদের জীবন মান ইজ্জত রক্ষা হতে লাগলো।

এরপর আবার একবার ধরপাকড়ের পালা শুরু হল। পুরুষ নেই, মেয়েদেরই তারা ধরলো। এমন কি দেড় দুই বছরের ছোট ছেলে পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে জেলখানায় চালান হলো।

তবুও শান্তি এলো না। পাড়ার বড় বড় মেয়েরা সবাই জেলখানায়। অবশিষ্ট আছে মাত্র ছোট ছেলেমেয়ে— আর বিশ বাইশ বছরের বৌঝিরা। তারই মাঝে দুর্গামণি অজ্ঞান হলো। তবে কি আমরা হেরে গেলুম? কক্ষনো নয়। অবরোধ থেকে সাহস করে বেরিয়ে এলেন একটি ১৯ বছরের মুসলমান বৌ। স্বামী তাঁর ফেরার। তিনিই গোপনে খবর পাঠালেন লালগঞ্জে, "কি করতে হবে বল?.... আমিই চলবো কাজে।"

আবার কাজ শুরু হল। এবার বঁটির ঘায়ে জখম হল শান্তি সেবাদল। তারা কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করে পালালো; আর এলো না। রাতের শান্তি প্রচার বন্ধ হল। এরপর আবার সংগঠন শুরু হল। ৭০|৭৫ বছরের ২|৪জন বুড়িও এসে যোগ দিলেন, প্রতিজ্ঞা নিলেন সকলে— "একদিন কাস্তে নিয়ে মাঠে নামবো— অহল্যা, অশ্বিনীর রক্তমাখা ধান এক আঁটিও কেটে ঘরে আনবো।"

কাজেও হলো তাই। সব পাহারা পুলিশ ফৌজকে উপেক্ষা করে বিশটি মেয়ে সত্যই একদিন মাঠে নামলো, প্রকাশ্য দিনের আলোতেই। প্রখর সূর্যের আলোয় ধারালো কাস্তেগুলো ঝলমল করে উঠলো। কেউ আসতে সাহস করলো না সেদিকে।

এ বছর চন্দনপিড়িতে মাত্র ঐ একটি দিনেই ধান ঘরে গেল। সবাই মাথায় তুলে নিলে সে ধান। যার জন্য এত জীবন দান, এত কষ্ট স্বীকার তা সার্থক হল। খবর পাঠলেন সেই মেয়েরা চারদিকের এলাকায়-- "ধান নিয়েছি, প্রতিজ্ঞা রেখেছি। এখন শুকিয়ে মলেও দুঃখ নেই।"

চারু ভাণ্ডারী ও খাদীর নেতৃত্বে এমনিতর কংগ্রেস ও সেবাদলের সংগঠন চললো প্রত্যেক গ্রামেই। প্রত্যেক গ্রামে তারা একই কায়দায় কাজ শুরু করতে চাইলে। পুঁজি ও সম্পত্তির স্বার্থে যারা অবস্থাপন্ন তারা এই দলে গিয়ে যোগ দিলে এবং নিজেদের স্বার্থে আত্মীয় বন্ধুকেও নির্মমভাবে উৎপীড়ন করতে লাগলো। চন্দনপিড়ির রাইচাঁদের পাশবিকতা মানুষের চোখ খুলে দিলে। সবাই বুঝলে— শ্রেণিস্বার্থই এখানে বড়। মানুষকে সেই অনুযায়ীই বিচার করতে হবে।

প্রত্যেকটি গ্রাম দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। একটার নাম হল কংগ্রেসী পাড়া, অন্যটার নাম হল কমিউনিস্ট পার্টির পাড়া। আগেকার সমস্ত আত্মীয়তা ভুলে গিয়ে মানুষ নতুন ভাবে

চলতে শুরু করলো। কংগ্রেসী পাড়া ও কমিউনিস্ট পাড়ার মানুষের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহার মায় কথাবার্তা শুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলো; লাল এলাকার বাসিন্দারা দারুণ ঘৃণা করতে শুরু করলো কংগ্রেসীদের। অবস্থা এমনও দাঁড়ালো যে, জামাই কংগ্রেসী হওয়ায় মেয়ের মা বাবা মেয়ে জামাই দুজনের সঙ্গেই সম্পর্ক তুলেদিলে। যুবতী বৌ কংগ্রেসীর মেয়ে এবং কংগ্রেসভাবাপন্ন হওয়ায়, নওজোয়ান ছেলে তাকে আর ঘরে আনলে না— স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধও ত্যাগ করলো।

এক কথায় যারা লালঝাণ্ডার বিরুদ্ধে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করলে, তাদেরও সবাই শ্রেণিশত্রু হিসাবে বিচার করতে লাগলো। শুধু তাই নয়, প্রস্তুত হতে লাগলো সামনের গৃহযুদ্ধের দিনে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য।

শুধু চন্দনপিড়ি নয়, আরও অনেক বর্বরতাই মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করে দিলে। তাদের নিষ্ঠুরতা প্রতিপদে মানুষকে দেখালো ও সাহায্য করলো কঠোর শ্রেণিসংগ্রামের সৈনিক হতে।

১৫ই ডিসেম্বর নিজের মাঠের ধান আনতে গিয়েছিল বুধাখালীর ভাগচাষি। হঠাৎ সেবাদল ও কংগ্রেসীরা তেরঙা ঝাণ্ডা উড়িয়ে তাদের আক্রমণ করলো। পিছন থেকে ১৮জন রাইফেলধারী পুলিশ এসে যোগ দিল সেই আক্রমণে। একটি ১০|১২ বছরের ছেলের মাথা থেকে ধান কেড়ে নিয়ে নির্মমভাবে পিটতে লাগলো তারা। তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। এই দৃশ্য দেখে থাকতে পারলে না আশপাশের মেয়ে পুরুষরা। ছুটে এলো ছেলেটিকে রক্ষা করতে। ১৯ বছরের বৌ 'পাখী' এসে বুক দিয়ে রক্ষা করলো ছেলেটিকে। বর্বর দস্যুর দল এবার যেন আরও উল্লসিত হয়ে উঠলো। পাখী ছিল প্রথমা গর্ভবতী, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করলো তার পেটে। রক্তাক্ত দেহে আর্ত্তনাদ করে উঠলো পাখী— কোন মতে পথটুকু পার হয়েই তার গর্ভপাত হয়ে গেলো। বিজয়গর্বে চলে গেলো কংগ্রেসীরা। ২|১ জন বলে গেলো, "অমন ডবকা বয়সে উঁচু পেটটা ভাল দেখাচ্ছিল না, তাই সমান ফিট করে দিলাম।"

আগুন জ্বলে উঠলো বুধাখালীর প্রত্যেকটি মেয়ে পুরুষের মনে এই ঘটনায়। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠলো তারা। ১০|১১ বছরের ছেলেরা পর্যন্ত না খেয়ে না ঘুমিয়ে পাহারা দিতে লাগলো নিজেদের এলাকা— দালাল বা কংগ্রেসী পেলেই শেষ করে দেবে।

৬|৭ দিন পাহারা দিয়ে ২২শে সকালে তারা দেখলো সেবাদলের পাণ্ডা 'ভূষণপতি' আসছে একটা বড় বর্শা হাতে করে। বেপরোয়া ভাবে ১২|১৩ বছরের দুটি ছেলে ধরলে তাকে। শুধু তাই নয়, হঠাৎ আক্রমণের কৌশলে বেঁধে ফেললে গরুর দড়ি দিয়ে। তারপর নির্মমভাবে পিটলে তাকে— তাদের শক্তিতে যতখানি কুলোয়। হঠাৎ ফস্‌কে পালিয়ে গেলো ভূষণপতি। ফিরে এলো একদল পুলিশ নিয়ে— প্রতিশোধ নেবে এই আশা। কিন্তু কিছুই করতে পারলে না তারা। তাড়া খেয়ে পালাবার পথে মাত্র একজন কর্মীকে একা পেয়ে ধরে নিয়ে গেল।

১৫ জন ফৌজ আর হাবিলদারে মিলে বেলা ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত পিটলো সেই কর্মীটিকে— মারতে মারতে অজ্ঞান করে দিল তাকে। চোখ-মুখ, তলপেট, হাতের তালু রক্তাক্ত হল। আধ ঘন্টা এক ঘন্টা পেটার পর ক্লান্ত হয়ে পড়ল পশুরা— তখন ১৫ মিনিট করে পালা করে মারতে লাগলো। এই সময়ের মধ্যে ৮-১০ বার অজ্ঞান হয়ে গেল সে, কিন্তু তবুও একটিও কথা বেরুল না। সিপাহীরা মাত্র দুটি কথা শুনেছিল তার মুখ থেকে : "জানি না!"

তার পর সন্ধ্যার দিকে মরে যাচ্ছে ভেবে যখন তার মুখে একটু জল দিতে গেল, তখন থু থু করে সেই জল সে ফেলে দিয়ে আরেকবার বললে— "খাবো না!"

আগুন এবার ফেটে বেরুবার উপক্রম হল চারিদিক থেকে। প্রতিজ্ঞা নিলে সব মেয়ে পুরুষ : প্রতিশোধ নেবো— এই অত্যাচারের ধান আনবো এক সঙ্গে শত-হাত মিলিয়ে, সেই জমি থেকেই, যেখানে পাষণ্ডরা পাখীর গর্ভপাত করেছিল।

৩০শে ডিসেম্বর রাত্রে ৬০ জন মেয়ে-পুরুষ ধান আনতে গেল লালঝাণ্ডা উড়িয়ে। পাখীও গেল অসমর্থ দেহ নিয়ে। নিজ হাতে অপমানের কলঙ্ক মুছবে— এই তার পণ। স্বামী তার জেলখানায় বন্দী। তারই কথা স্মরণ করে প্রতিজ্ঞা নিল।.... সেই জমিরই ধান এল ঘরে। বাধা দিতে সাহস করল না কেউ।

৩১শে ডিসেম্বর ৩০০ মেয়ে পুরুষ ধান আনতে গেল। সারাদিন শত শত মণ ধান এল। সন্ধ্যার দিকে চোরের মত লুকিয়ে পথ থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ আর সেবাদলেরা— একজন নেতাকে। তখনই সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে। "ছিনিয়ে আনবো নেতাকে"— প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটলো তারা। মাথার ধান ফেলে ছুটলো। ছুটে পালাচ্ছিল পুলিশ ভয় পেয়ে। কিন্তু ক্যাম্পে ঢোকার আগেই জনতা ঘিরে ফেললো তাদের— ছিনিয়ে নিল নেতাকে। নির্মমভাবে গুলি চালালো পুলিশ আর কংগ্রেসী পাণ্ডা বিজয়মাধব। বহু লোক আহত হল। 'নীলকণ্ঠ', 'সুধীর' ও 'সুরেন'— তিন জনের অবস্থা সংকটাপন্ন। লালঝাণ্ডার শ্রেষ্ঠ সন্তান তারা। নিজেরা ক্যাম্পের দুয়ারে গিয়ে ছিনিয়ে এনেছে নেতাকে। পাঠিয়ে দিয়েছে তাঁকে নিরাপদে— তারপর গুলিতে আহত হয়ে পড়েছে।

বাকি সবাইকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু বৃষ্টির মত বুলেট ভেদ করে এই তিনজনকে নেওয়া গেল না। তখনও শেষ হয়ে যায় নি 'সুধীর', সুরেন' 'নীলকণ্ঠ'। বেঁচে ছিল তখনও। চেষ্টা করতে পারলে বাঁচানো যেত। কিন্তু পিশাচের দল সেই অবস্থায় তাদের কাছে জেরা আরম্ভ করল— গোপন সন্ধান জানবার জন্যে। বুলেটে আহত মানুষকে লাঠি দিয়ে আর লাথি মেরে মেরে তারা মারলো— তবুও একটি কথাও পেল না। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় "জল! জল!" করেছিল 'সুধীর'। এক ঘটি জল এনে বলল পশুর দল : "বল্ কে কোথায় আছে? জল দেবো।" একটা কথাও বললো না— ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে 'সুধীর'। রক্তাক্ত থুথু ফেললো মাটিতে, তারপর সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে জীবন দিলে, তবুও বিশ্বাসঘাতকতা করলো না।

বুধাখালীর লাগ এলাকার মানুষ গভীর আগ্রহে শুনেছে এইসব অত্যাচারের কাহিনী। চোখ ফেটে জল পড়েছে তাদের ঝর্‌ঝর্ করে— কিন্তু দমেনি একটুও। আনন্দ গর্বে ফুলে উঠেছে তাদের বুক— তাদের প্রাণের কর্মীদের বীরত্ব দেখে। তাদের স্মরণ করে শপথ নিয়েছে সবাই। বজ্রমুষ্ঠিতে শপথ নিয়েছে একে একে। অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে তা। তার পরদিন থেকে সব ধানই বাড়ি এসেছে। শুধু তাই নয়, চকদার ঘেরির সেরা দালাল বেহারী জানা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আজও কেউ খোঁজ পায়নি তার।

অন্যদিকে ২৮শে ডিসেম্বরই খবর এলো লালগঞ্জ থেকে। লাটদার গোপী গিরির ছেলেরা ৫/- টাকা করে হাজিরা দিয়ে লাঠিয়াল এনেছে 'চারশো'। ঢাল সড়কী নিয়ে তৈরি তারা। তাছাড়া ১৫ গাছা বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়েছে সেবাদলী গুণ্ডারা। আর পুলিশ ফৌজ তো আছেই। ৩০শে থেকে ধান কেটে নৌকা বোঝাই করবে তারা। একই সঙ্গে হাজরা ঘেরির সেরা

বদমাস ও লম্পট মহারাজ নন্দীদের একচোখ কানা ম্যানেজার শচীন ঘোষ চল্লিশ গাছা রাইফেল নিয়ে তৈরি হয়েছে, সাঁওতাল ভাইদের ধান সব লুটে নেবে বলে। একই সঙ্গে কাজ আরম্ভ করবে তারা এই মতলব করেছে।

'রুখতে হবে দস্যুদের— বাঁচাতে হবে মুখের গ্রাস, রক্ষা করতে হবে বৌ ছেলে'— এই আওয়াজ নিয়ে তৈরি হল শত শত মানুষ।

এগিয়ে চললো লালগঞ্জের বুকে লাঠি আর লালঝাণ্ডা নিয়ে। ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে রইলে হাজরা কাছারীর পুলিশ ক্যাম্প ২|৩ ঘন্টা ধরে। ধান বয়ে নিজেদের বাড়ি তুললে সাঁওতাল ভাইরা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাঁচশো লোকের সামনে পুলিশ, লাঠিয়াল, সেবাদল লেজ গুটিয়ে পালালো। ফেরার পথে গোপী গিরির কাছারী ঘেরাও হল। লাফিয়ে নদী সাঁতরে পালালো লাঠিয়ালরা— আর ফিরলো না। গোপী গিরির সব ধানই চাষিরা বাড়ি নিয়ে এলো। তেমনি হল লাটদার দ্বারিক সামন্তের বেলায়— তার সাতশো বিঘার চকের একটা ধানও নেবার ক্ষমতা হল না তার। সবই চাষিরা পুরো নিয়ে নিল।

শিবরামপুরের ঘুঘু কাঙাল হালদার আর কুঞ্জ গাঁতা জোর করে ধান তুলে নেবে এক চাষির। লাটদার অতুল শাসমল নিজে থেকে মতলব করল গোপনে। লাঠিয়াল দারোয়ান— সেবাদল আর বন্দুক নিয়ে ভোরবেলায় হঠাৎ ধান কাটা শুরু করলো সেই জমিতে। চাষিরা তিন ভাই। সময় পেলে না চারিদিকে খবর দেওয়ার। নিজেরাই লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সত্তরজন শত্রুর মাঝে। দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে ধান দেবে না এই পণ।

ধান নেওয়া হল না সেবাদল কংগ্রেসীদের। কাঙাল হালদারের হাসপাতালে যাওয়ার মত অবস্থা হল। পালিয়ে গেলো বীর অতুল শাসমল সদলবলে।

কংগ্রেসীরা দেখলে ধান নেওয়া অসম্ভব। অহল্যা অশ্বিনীর রক্তমাখা ধান— জীবন দিয়েও রক্ষা করবে সুন্দরবনের মানুষ। তাই তারা অন্য পথ নিল। অত্যাচার শুরু করলো নতুন কায়দায়।

দক্ষিণ চন্দ্রনগরের নিঃস্ব ক্ষেতমজুর বরেন মাইতি। ঘুমিয়ে বৌ ছেলে নিয়ে ঘরের ভিতর। গভীর রাত্রে তার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে কংগ্রেসীরা। চারদিক থেকে আগুন উঠলো একসঙ্গে। মতলব ছিলো পুড়িয়ে মারবে জ্যান্ত। কিন্তু তা হলনা। অল্পের জন্য বেঁচে গেল জীবনে। রক্ষা হল না আর কিছুই। একটা ছেঁড়া গামছাও না।

এমনিতর গভীর রাত্রে আগুন হল চন্দনপিড়ি। আর একটি সংসারও পথে দাঁড়ালো।

সুন্দরবনের সবচেয়ে প্রিয় নেতা গজেন মালী। হঠাৎ একদিন রাত্রে ২৪|২৫ জন পুলিশ নিয়ে কাকদ্বীপ থানার বড় দারোগা তার ঘরের কাঠ ভাঙতে শুরু করলো। ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন গজেনের স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে। অল্পের জন্য চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন তারা।

লালগঞ্জের কয়েক জন সাঁওতাল ও ক্ষেতমজুরের ছেলে। হঠাৎ একদিন বাগে পেয়ে ধরে নিয়ে গেলো পুলিশ ক্যাম্পে। মাঘ মাসের দারুন শীত। বরফ জমে যায় এই অবস্থায়। তাদের উলঙ্গ করে সারা রাত হিমে দাঁড় করিয়ে বেঁধে রাখলো। সারাদিন রৌদ্রে একই ভাবে রইল। জল ছাড়া খেতে দিলে না কিছু। তিন দিন তিন রাত রইল এইভাবে। আরও অত্যাচার ও প্রশ্ন চলতে লাগলো তারই মাঝে— "কোথায় কে আছে বল"।

চন্দনপিড়ির সূর্যমুখী পঞ্চাশ বছরের বেওয়া। ডান হাতে গুলি লেগে ধরা পড়েছিলেন তিনি। জেল হাসপাতালে বাদ দিতে হবে হাতখানা। অপারেশনের দিন— ডাক্তারের সঙ্গে এক

গাদা পুলিশ আই-বি ঘরে ঢুকলো। তারা অজ্ঞান করলে না সূর্যমুখীকে। বড় একটা ছোরা দিয়ে একটু একটু করে কাটলে হাতখানা। যেমন করে জবাই করে জীবজন্তু। আর জিজ্ঞাসা করতে লাগলো নানা প্রশ্ন।

উত্তর দিলেন সূর্যমুখী— "গোলামের বেটা গোলাম অমনি করে কেটে ফেল আমার গলাটা, তবুও বলবো না। আমি জানি কর্মীরা কোথায় থাকে, তবুও বলবো না।"

আবার ঘর তৈরি হল গজেন মালীর। আশ্রয় পেল বরেন মাইতি আর চন্দনপিড়ির সেই অনাথারা। তাদের শেষ করার যে চক্রান্ত করেছিল কংগ্রেসীরা তা ব্যর্থ হল। হিমে জমে অজ্ঞান হয়ে রইল সারা রাত— একজন বুড়ো সাঁওতাল। সবাই ভাবলো মরে গেছে সে। তবুও একটা কথা বেরুলো না তাদের মুখ দিয়ে। বাঁ হাতখানা উঁচু করে কমিউনিস্ট পার্টির জয়ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে এলেন সূর্যমুখী। নব্বই বছরের বুড়ো নীলমণি মাইতিকে ১৫ দিন খেতে দেয়নি জেল হাজতে। জামিনে ছাড়া পেয়ে মাত্র তিন দিন বেঁচে ছিলেন চন্দনপিড়ির বুকে। মরার সময় বলে গেলেন পড়শীদের— "লালঝাণ্ডা ছাড়িসনে তোরা। এই আমার শেষ কথা।" হাজার হাজার বিঘার ধান উঠলো চাষির ঘরে। এতো বাধা বিপত্তির মাঝেও। কংগ্রেসীদের "শান্তি" অভিযান ব্যর্থ হল। তার মর্ম্ম বুঝলো না কাকদ্বীপের মানুষ।

পয়লা মে আসছে। আয়োজন শুরু হল ঘরে ঘরে। মিটিং চললো পাড়ায় পাড়ায়।

সংগ্রাম কমিটিকে চাপ দিতে লাগলো চারদিক থেকে— "সহ্য হয় না আর। বলো শেষ করে দিই সেবাদল আর গুণ্ডার আড্ডাগুলো।" "হুকুম দাও"-- "সত্যিকার শান্তির লড়াই শুরু হোক।"

প্রচণ্ড উৎসাহে শোভাযাত্রা বেরুলো মে দিবসের। লালে লাল হয়ে গেলো মৌজাগুলো। নানা কায়দা কসরৎ খেলাধূলা দেখালে ভলান্টিয়াররা।

তারই মাঝে ঘোষণা করলে সংগ্রাম কমিটি— "জমির সমস্ত পুরানো শর্ত্ত বিলি বন্দোবস্ত বাজেয়াপ্ত করে দিচ্ছে সংগ্রাম কমিটি। আজ থেকে সব জমির মালিকানা সংগ্রাম কমিটির। সেখান থেকেই সবাইকে নতুন করে জমি দেওয়া হবে। চাষি জমির মালিক হবে। তা ভোগ দখল করবে আর রক্ষাও করবে।"

বিশ্বাস করতে পারছিল না অনেকে এ কি করে সম্ভব। কিন্তু তাদের বিশ্বাস করতে হল যখন সত্যই সংগ্রাম কমিটি লোকসংখ্যা অনুযায়ী জমি বিলি করে দিয়ে তা রক্ষা করার দায়িত্ব শুদ্ধ দিয়ে দিলে। বিশ্বাস করল সকলে হাতে কলমে কাজ দেখে। তারা দেখলো কংগ্রেস দু'বছরে যে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করতে পারেনি, কি করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি তা উচ্ছেদ করে।

শত্রুপক্ষও সচেতন হল। ঘাঁটি করলো তারা আরও হিসাব করে। লালগঞ্জের দ্বারিক সামন্তর কাছারীতে প্রধান আড্ডা গড়লে। তৈরি হতে লাগলো আবার জমির ওপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার জন্যে।

১লা জুন মাত্র একশো জন মানুষ দখল করলে দ্বারিকের কাছারী। বাধা দিয়েছিল দারোয়ান লাঠিয়ালরা। তারা হটে গেলো— জীবনও দিতে হল একজনকে। লালঝাণ্ডার মানুষ গোলা ভেঙ্গে ধান পাড়লে। বিলি করে দিলে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ মণ গরীবদের মাঝে।

কংগ্রেসীদের প্রধান ঘাঁটিতে ঘা পড়ছে দেখে তারাও মরিয়া হতে লাগলো। খবর এলো

আলীপুরে। সদর থেকে বাছা বাছা ফৌজ গেলো সত্তর জন, বাছা বাছা দারোগার অধীনে। তারই সঙ্গে যোগ দিলে স্থানীয় সেবাদল, ফৌজ ও গুণ্ডারা।

দেড়শো জন কংগ্রেসী গুণ্ডা পুরো এক মাস ধরে অত্যাচার চালালে একশো ঘর মানুষের ওপর। বর্বর হিটলারী অত্যাচার। তবুও তারা জিততে পারলো না।

বার বছরের একটি ছেলে। একজন কর্মীর ভাই। ধরে নিয়ে গেলো তাকে ক্যাম্পে। মাটিতে শুইয়ে ফেলে বুকে বাঁশ দিয়ে পুরো একটি ঘন্টা দললো তারা। অজ্ঞান হয়ে গেলো ছেলেটি। মুখ দিয়ে রক্ত বেরুলো এক ঝলক, কিন্তু কথা বেরুলো না একটাও।

পঞ্চান্ন বছরের বুড়ী একজন কর্মীর মা, তাকেই নিয়ে গেলো পশুর দল। প্রথমে মেরে থেঁতো করলো। তারপর মাটিতে ফেলে বুট জুতো পরে নাচতে লাগলো তার দেহের ওপর। তবুও সন্ধান পেল না কিছু।

সাধারণ যুবক কয়েকজন ঘুমাচ্ছিলো ঘরে। শেষ রাতে ঘর ঘিরে ধরে নিয়ে গেলো তাদের। তিন দিন কাছারীতে আটকে রেখে অত্যাচার চালালো প্রাণভরে। প্রথমে এক দফা মার দিয়ে, জিজ্ঞাসা করলে নানা প্রশ্ন, কিন্তু উত্তর পেল না কিছুই। একদিন বেঁধে রেখে সিগারেটের আগুন দিয়ে পোড়ালো সারা দেহ। ফোস্কা হল চারদিকে। তারই মাঝে প্রশ্ন করলো বার বার। পেল না উত্তর। রাগে জ্বলে গিয়ে সেই মানুষকে বাঁধলো তৃতীয় দিনে। পাথর আর লাঠি দিয়ে থেঁতো করে দিতে লাগলো অণ্ডকোষগুলো, আর চালাতে লাগলো জেরা। সারা দেহ নীল হয়ে গেলো তাদের যন্ত্রণায়। ঠিকরে পড়তে লাগলো চোখের মণিগুলো। তারা 'এক' 'দুই' 'তিন' করে, হিসেব করতে লাগলো বেঁচে থাকার মুহূর্তগুলো— তবুও বিশ্বাসঘাতকতা করলো না।

একটি তরুণ কর্মীকে ধরতে পেয়ে কাছারীতে নিয়ে গেলো তারা। সারাদিন তাকে মারধর করলো। আর তার মাঝে জুলুম চালাতে লাগলো নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু জবাব পেল না কিছুই। সন্ধ্যার দিকে শুইয়ে ফেললেন তাকে মাটিতে— হাতপা বাঁধলে চারটি খুঁটির সঙ্গে। তারপর লোহা লাগানো জুতো পরে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো সারা দেহের ওপর। মট্ মট্ করে উঠলো পাঁজরগুলো— কিন্তু কথা বেরুলো না মুখ দিয়ে এমন একটাও যাতে বিশ্বাসঘাতকতা হতে পারে। শেষে আরও কঠোর পরীক্ষা দিতে হল তাকে। বড় বড় খেজুর কাঁটা নিয়ে এলো ৭|৮টা। সোজা চালিয়ে দিলে সেই অবস্থায় তার নখের নীচে দিয়ে। দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করলো। কর্মীটি কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করলো না— পার্টির গোপন খবর বলে দিয়ে।

এমনি করেই শিবরামপুরের সুরেন দাসকে জেলখানার ভেতর নির্মম অত্যাচার করে মেরে ফেললে শয়তানেরা। ধরা পড়ার ৮|১০ দিন পরেই মৃত্যু হল তার। যে রক্তপতাকাকে সুরেন দাস একদিন হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল বীরের মত— মরার আগে পর্যন্ত সে তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে দিলে না। বিধান মন্ত্রিসভার রামরাজ্যে, কংগ্রেসী জেলখানার প্রাচীর আর পাহারার অভ্যন্তরে আবদ্ধ থেকেও, সে নিজের বুকের রক্তে রাঙালো সেই রক্ত পতাকা— সেখানকার মাটিকে করে গেলো সংগ্রামী জনতার তীর্থক্ষেত্র।

চরম দুর্দ্দশাগ্রস্তা অনাথা হাসি বেওয়াকে তারা ধরে নিয়ে গেলো কাছারীতে। সারা দিন ধরে বোঝালে তাকে। এক তাড়া দশ টাকার নোট ফেলে দিলে তার কোলে— আরও বল্লে কত কথা— মেয়েকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করার রঙীন ছবি। তবুও আশা পূর্ণ হল না। উত্তর

দিলে লালগঞ্জের মেয়ে— নোটের তাড়া দারোগার মুখে ছুঁড়ে মেরে— "লাজ লজ্জার মাথা যদি খেয়ে থাকিস্ গোলামের বেটা গোলাম, থাক্‌গে যা সুখে তোর মা মাসিকে নিয়ে। লালঝাণ্ডার কর্মী তোদের কোন হদিস দেবে না, মুখে মুড়ো ঝাটা দেবে।"

এতো অত্যাচারের মাঝেও লালঝাণ্ডা নিয়ে শোভাযাত্রা বেরুতে লাগলো লালগঞ্জেতে। শত শত মেয়ে পুরুষ— জঙ্গী মুক্তি ফৌজরা শুনিয়ে যেতে লাগলো ঘরে ঘরে জয়ের নিত্য নতুন কাহিনী। ঘেরাও করতো লাগলো পুলিশের দলকে। নিজেদের সশস্ত্র করার জন্যে পাগল হয়ে উঠলো। ৮|১০ জন মুক্তিফৌজ ৮|১০ জন রাইফেলধারী পুলিশকে কুকুরতাড়া করে দিনের পর দিন হটিয়ে দিতে লাগলো— লাল এলাকা থেকে। একদিন ১৬ জন সশস্ত্র ফৌজ হঠাৎ ঘেরাও করে বন্দী করে ফেললে অনিল ও তার তিন ভাইকে। খবর পেয়ে ছ'জন মুক্তিফৌজ পথ রুখে দাঁড়ালে তাদের। শুধু তাই নয়, সেই ছ'জনেই ঘেরাও করলো ষোলজনকে— ছিনিয়ে নিলে বন্দী ভাইদের। এমনি করেই মুক্তিফৌজরা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে লাগলো সাধারণ সিপাহীদের দারোগাদের থেকে। তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলে পার্টির নীতি। আহ্বান জানালে রাইফেল ঘুরিয়ে ধরার জন্য— বিধান মন্ত্রিসভার দিকে, কংগ্রেসী গুণ্ডাদের দিকে। আর এরই মাঝে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগলো দ্বারিক, অন্নদা, আদিত্য, বৃন্দাবন এদের কাছারীগুলোর ওপর।

হিটলারী কায়দায় অত্যাচার চালিয়ে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে— ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল লালঝাণ্ডাকে লালগঞ্জের মাটি থেকে। কিন্তু ব্যর্থ হল তারা। পালিয়ে গেলো হিটলারের চামুণ্ডারা— জান নিয়ে পালালো 'নায়েব'-'দারোয়ান'-'ম্যানেজার'-'পুলিশ'-'সেবাদল'— জান দিয়েও গেলো কেউ কেউ। দখল করলো সেখানকার মানুষ সেই পাঁচ হাজার বিঘা জমি, কাছারী— সব কিছু। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল শোষণের কারাগারগুলো। জয়ের নিশানা হয়ে উড়তে লাগলো 'লালঝাণ্ডা' লয়ালগঞ্জের মাটিতে। লয়ালগঞ্জ হল লালগঞ্জ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম চাষি মজুর রাজ—বাংলার কোটি কোটি সর্বহারার প্রথম তেলেঙ্গানা।

সার্থক হল অহল্যার রক্ত দেওয়া। সার্থক হল গর্ভের সন্তানের সঙ্গীনের খোঁচা খেয়ে জীবন দেওয়া। সার্থক হল শত শত মেহনতী মানুষের দুর্গম জয়যাত্রা। তাই আওয়াজ উঠেছে 'লালগঞ্জ জিন্দাবাদ'— আওয়াজ উঠেছে, 'গরীবের লড়াই জিন্দাবাদ।'

সে আওয়াজ শুনে কাঁপছে বিধান মন্ত্রিসভা। মরণের বিভীষিকা দেখছে তার আমলা ফয়লা— পাইক বরকন্দাজ—সিপাহী সৈন্য। হাহাকার উঠেছে তার আশ্রিত বড়লোক, জমিদার, জোতদার, পুঁজিপতিদের ঘরে ঘরে। সে হাহাকার ঘোষণা করছে, কেমন করে তারা জমি হারাচ্ছে— শক্তি হারাচ্ছে...। কেমন করে তাদের সাধের ইমারত মেহনতী মানুষের হাতুড়ির ঘায়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

আর— 'চাষিমজুর রাজ প্রতিষ্ঠা'— কমিউনিস্ট পার্টির জয়লাভ চোখের ওপর বাস্তব হতে দেখে হাজার মানুষ এগিয়ে আসছে এদিকে। ভাঙন ধরেছে শত্রুপক্ষের সেবাদলে— পুলিশ ফৌজ পল্টনে। তাদের মোহ ছুটে যাচ্ছে কংগ্রেসের ফাটা ঢাকের বাজনা শুনে। নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে তারা— যে পথে এগিয়ে চলেছে মুক্তিফৌজ— সেই পথ। তাই দিনের পর দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে গণতন্ত্রের শিবির— সোভিয়েত ইউনিয়ন যার নেতা— লালঝাণ্ডা যার নিশানা।

তেলেঙ্গানার পথে সারা ২৪ পরগনা

শুধু কাকদ্বীপেই নয়, গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে এই জেলার কোণায় কোণায়। শত শত মানুষ বেরিয়ে আসছে শিকল ছিঁড়ে— সাচ্চা 'আজাদীর' শেষ সংগ্রামের সৈনিক হয়ে।

সোনারপুর আর ভাঙড় এলাকা

লক্ষ লক্ষ বিঘা ভাসা জমি—। ইচ্ছা করে নদী মজিয়ে দিয়ে ভাসা এলাকা করেছে বড়লোকেরা। হাজার হাজার মানুষ সেজন্য দিনের পর দিন উপোস করে দিন কাটায়, কত লোক না খেয়ে মরে। তাতে কার কি? কংগ্রেসী মন্ত্রী হেম নস্করের মাছের ব্যবসা কিন্তু ক্রমশই ফেঁপে ওঠে। তার আত্মীয় স্বজন আরও নানা বড়লোকের মেছোঘেরি প্রতি বছরেই বেড়ে চলে। তারই সঙ্গে যোগ দেয় চব্বিশ পরগনা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী— ঘৃণিত জমিদার। শত শত মানুষকে দারুন দুর্দশার মধ্যে ফেলে জমি এবং ভিটেচ্যুত করে এইসব এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে বসেছিল এরা। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটিয়ে ভিক্ষের মত ছ'আনা আটআনা মজুরি ফেলে দিত ছুঁড়ে, নয়তো মর্জি হলে তাও দিতো না।

ষাট বছরের বুড়ো রমানাথ মণ্ডল, 'দ্বাড়াগ্রামে' বাড়ি। আট দশ দিন না খেয়ে মরলো উপবাসে। মরার আগে মহাজনের বাড়ি বাড়ি ঘুরলো সে একমুঠো ভাতের জন্য কিন্তু ফিরতে হল তাড়া খেয়ে।

মানুষের চোখ খুললো এই ঘটনায়। পরিষ্কার বুঝলে লড়াই ছাড়া পথ নেই। মনে প্রাণে উপলব্ধি করলে তারা, গায়ের জোরে 'ক্ষমতা', 'ধন' দখল করে কেড়ে নিতে হবে, শোষণকারীদের কব্জা থেকে।

এলাকার কোণা কোণা থেকে শ্লোগান শোনা গেলে কাকদ্বীপের মতই— 'কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ'! আওয়াজ উঠলো পাড়ায় পাড়ায়— গোলা দখল করে ধান বিলির আওয়াজ। 'বেঁওতা', 'বাডাবাড়ি', 'বনগ্রামে' গোলা দখল করলে শত শত মানুষ, বিলি করে দিলে শত শত মণ ধান।

তখনই আদালত বসলো চার পাঁচশো লোকের। ধরে নিয়ে এলো ভলান্টিয়ার বাহিনী অত্যাচারী শ্রেণিশত্রুদের। লালঝাণ্ডার তলায় জনসাধারণের আদালতে চরম শাস্তি হল তাদের, বাজেয়াপ্ত হল তাদের সম্পত্তি, জিনিসপত্র, সম্পদ যা জমা করেছিল শত শত গরীবের পেট কেটে। উৎসাহের চোটে ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা দিতে লাগলো সাধারণ মানুষ।

এমনকি আশী বছরের বুড়ো ক্ষেতমজুর একজন, চিৎকার করে বলতে লাগলো— 'স্বাধীন হয়ে গেছি আমরা, কমিউনিস্টরাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে আমাদের'।

খবর পেয়ে ছুটে এলো ভাঙড়ের দারোগা রাইফেল আর ফৌজ নিয়ে। সঙ্গে এলো ২৪ পরগনা পুলিশের বড়কর্ত্তা। তারা ছিনিয়ে নিতে গেলো আসামীদের— জনসাধারণের আদালত যাদের রায় দিয়েছে জনসাধারণের শত্রু বলে। কিন্তু হটে গেলো তারা। টিকতে পারলো না বিধান মন্ত্রিসভা ও হৃদয় চক্রবর্ত্তীর কংগ্রেসী ফৌজ আর সেবাদল সেই বিপ্লবী জনতার সামনে এক দণ্ডও।

সংগ্রাম কমিটি তৈরি হল গ্রামে গ্রামে—। জমি বিলি শুরু হল মৌজায় মৌজায়।

ক্ষেতমজুর জমি পেল। তারই সঙ্গে আয়োজন চলতে লাগলো মেছোঘেরি দখল করে, নোনা জল বার করে দিয়ে, তা দখল করে নিয়ে ফসল ফলানোর। 'তিউড়ীর' ক্ষেতমজুররা দখল করে বিলি করলে জমি, লাঠির জোরে।

চারদিক থেকে শ্লোগান উঠলো : দখল কর ভেড়ী— ভেঙে চুরমার করে দাও নস্করদের শোষণের যাঁতাকল।

'নয়াবাদ', 'খেয়াদা', 'সাহেবের আবাদ'— চারিদিক থেকে দলে দলে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর নতুন সংগঠন গড়ে তুলতে লাগলো— লালঝাণ্ডা কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন।

কংগ্রেসী মন্ত্রী হেম নস্কর প্রমাদ গুণলো মনে মনে। ডেকে পাঠালে আর একটি বখরাদার ভূপতি নস্করকে। তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিল পঁচিশ জন সশস্ত্র পুলিশ। একদিন সন্ধ্যাবেলা অতর্কিত আক্রমণ করলো এই অহিংস বাহিনী ভেরীমজুরদের। পাকড়াও করলো তাদের নেতা বামাচরণকে।

বিদ্যুতের মত এই খবর ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। দলে দলে জনতা এসে ঘিরে ফেললে এই দস্যুদের। ছিনিয়ে নেবে তাদের নেতাকে এই তাদের পণ। ভূপতি নস্করের হুকুমে গুলি চালালে পুলিশ বাহিনী। প্রথমে শহিদ হলেন মনি ধাড়া— ষাট বছরের বৃদ্ধ। তাই দেখে মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলো 'দাশু', তাকেও গুলি করে হত্যা করলে 'অহিংস' পুলিশ বাহিনী।

চোখের উপর ভাই বন্ধুদের জীবন দিতে দেখে আরো মরিয়া হয়ে গেলো সবাই। জীবন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর ওপর। শুরু হল হাতাহাতি! বামাচরণ দারোগার গালে এক চড় কসিয়ে দিয়ে ছিনিয়ে নিলে তার বন্দুকটা। তারপর জবাব দিলে বীরের মত— 'মতি দাশু' হত্যাকাণ্ডের জবাব।

কুকুরের মত পালাতে শুরু করলো শত্রুর দল। তারা এক দণ্ডও টিকতো পারলো না— ১৫ গাছা রাইফেল হাতে থাকা সত্ত্বেও। সবাই দু' মাইল পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলো তাদের।

পরদিন পাঁচশত ফৌজ গেলো গ্রামে গ্রামে। ঘিরে ফেললে তারা গোটা গ্রাম তিউড়ীকে। বাদ দিলে না মেয়ে পুরুষ শিশু কারুকেও। অত্যাচার চললো— ফ্যাসিস্ট অত্যাচাব, গ্রামের একজন লোককেও আর তারা বিশ্বাস করতে পারে না। শত শত পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো ভাঙড় এলাকায়ও। ঘর বাড়ি ভেঙে লুট করে মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে চাইল তারা। ভাবলে, তাহলেই লোকে কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দেবে।

কিন্তু, দীর্ঘ তিন মাস নির্যাতন চালিয়েও তা সম্ভব হল না। উচ্ছেদ করতে পারেনি লালঝাণ্ডাকে। বরং দিন ঘনিয়ে আসছে সেই সব অত্যাচারীর যারা যুগ যুগ ধরে মানুষ মারার ব্যবসা ফেঁদে, মহাজন সেজে বসে ছিল গ্রামে গ্রামে। কাকদ্বীপ পথ দেখিয়েছে মানুষকে— কি করে উপড়ে ফেলতে হয় পরগাছা। সেই পথেই ভীম বেগে এগিয়ে চলেছে তিউড়ী ও ভাঙড়ের হাজার হাজার নির্যাতীত মানুষ।

এই চব্বিশ পরগনা আর এক দিকে বীরের মত দাঁড়িয়ে আছে অপরাজেয় 'বুড়ুল'— যার নাম শুনলে বিধান মন্ত্রিসভার বড় বড় জানোয়ার পুলিশ বাহিনীরও বুকের পাঁজরাগুলো ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে ওঠে। চব্বিশ গরপনা কংগ্রেসের সবচেয়ে পুরানো ঘাঁটি 'বুড়ুল'। এমন কি জন্মস্থান বললেও চলে। কিন্তু, আজ সেখানকার ক্ষেতমজুররা "১৪৪ ধারা" জারি করে দিয়েছে কংগ্রেসীদের ওপর। হুকুম নেই তাদের ঢোকার ঐ অঞ্চলে।

এখানকার স্কুলে গরীব ক্ষেতমজুর ও চাষির ছেলেরা হতো নির্যাতীত— তারা গরীব বলে। তারই প্রতিবাদের ধর্মঘট করেছিল ছাত্ররা। তারা সমান অধিকার ও ব্যবহার দাবি করেছিল সব ছাত্রদেরই জন্য। কিন্তু ঘৃণিত জমিদার চণ্ডী ঘোষ— সুন্দরবনের চার হাজার বিঘার দুঁদে চকদারের সহ্য হল না তা। রুখে দাঁড়ালো— কংগ্রেসী নেতা মুরারীশরণকে নিয়ে এর বিরুদ্ধে। তালাবন্ধ করে দিলে স্কুলে— যেমন করে কারখানার মালিকরা মজুরদের শুকিয়ে মারবার জন্য তালাবন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলো মন্ত্রী 'বিমল সিংহকে'—'ভদ্রলোকের ছেলে ছাত্র' আর 'চাষার ছেলে ছাত্র' বলে ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ বাধাতে।

সব আশা ভরসা ব্যর্থ হল মুরারীশরণ ও চণ্ডী ঘোষের। ছাত্র ও জনতার কাছে দারুণ লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেলো নারী-হন্তা, শিশু হন্তা মন্ত্রী বিমল সিংহ। এর পরই এলো পুলিশ বাহিনী অনশনকারী ছাত্রদের ধরতে (ছাত্ররা অনশন করেছিল স্কুলে তালাবন্ধের প্রতিবাদে)। এবারও ব্যর্থ হল তারা। কংগ্রেসীরা গোপন ষড়যন্ত্র করেছিল বাছা বাছা সিপাহী নিয়ে ছাত্রনেতাদের গোপনে হত্যা করার। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সেই বাছা বাছা সিপাহীর একজনেরই জীবনান্ত ঘটলো। গ্রামের শতকরা ৮৫ জন মানুষ কাঁটাও বিঁধতে দিলেনা ছাত্র-নেতাদের গায়ে। আওয়াজ উঠলো— ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়— 'মুরারীশরণ, চণ্ডী ঘোষের মাথা চাই।'

মাথা নিয়ে পালালো মুরারীশরণ ও চণ্ডী ঘোষ গামছা মাত্র সম্বল করে। তারই সঙ্গে বিদায় হল তেরঙ্গা ঝাণ্ডা 'বুড়ুল' ও তাব পাশের ৩|৪ খানা গ্রাম থেকে। তারই জায়গায় উড়লো 'লালঝাণ্ডা', 'অগ্নিনী অহল্যার' রক্তে রাঙা ঝাণ্ডা।

নিরুপায় হয়ে বিধান রায় পাঠিয়ে দিলে কয়েকশো গোর্খা ফৌজ বুড়ুলকে ভেঙে চুরমার করতে। ঢালাও হুকুম দিলে তাদের— 'দেখলেই গুলি করে মারবে নেতাদের।' কিন্তু তা কাগজে কলমেই রয়ে গেলো।

পুরো আড়াইটি মাস প্রলয় তাণ্ডব চালালো তারা গ্রামে গ্রামে, ধরে নিয়ে জেলে পুরলো দলে দলে, কিন্তু নেতাদের ধরা সম্ভব হল না। এবার ১৫ই আগষ্ট আসছে। তার দুদিন আগে মুরারীশরণ আর চণ্ডী ঘোষ নিয়ে এলো কংগ্রেসী পাণ্ডা 'বিজয় সিং নাহার'কে। মিটিং শুরু হল বুড়ুল হাটে সশস্ত্র পুলিশ পাহারায়। তারা ভাবলে, যাক্ আবার ফিরিয়ে আনলুম কংগ্রেসকে।

মিটিং সবে শুরু হয়েছে। হঠাৎ মাত্র ১২ জন ভলান্টিয়ার আর লালঝাণ্ডা নিয়ে 'কমিউনিস্ট পার্টির' জয় দিতে দিতে সেইখানে এসে দাঁড়ালো সেই নেতা, যাকে গুলি করে মারতে হুকুম দিয়েছে মন্ত্রীরা।

আওয়াজ শুনে আতঙ্কে কেঁপে উঠলো কংগ্রেসীরা! ছুটোছুটি শুরু করে দিলে সিপাহী দারোগারা— যেনো ভূত দেখেছে সামনে। লেজ গুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালালো বিজয় সিংহ আর ঘোষ-চক্রবর্তীরা। কে একজন চীৎকার করে উঠলো— 'গুলি কর'। কিন্তু কে করবে গুলি?

সেই দিনই ঘোষণা হল সেখানে— এবার ১৫ই আগষ্ট লালঝাণ্ডা উড়বে ঘরে ঘরে। সে দিন থেকে লড়াই শুরু হবে নতুন কায়দায়— 'কমনওয়েলথ'এর দাসত্ব ছিঁড়ে ফেলার লড়াই। ডাক দিল কমিউনিস্ট পার্টি সেদিনের শোভাযাত্রার প্রত্যেকটি মানুষকে যোগ দেবার জন্য।

১৫ই আগষ্ট। প্রায় ৮০ জন অতিরিক্ত ফৌজ এসেছে 'বুড়ুলে'। ঘাঁটি দিয়ে আছে তারা পথে পথে— করতে দেবে না শোভাযাত্রা লালঝাণ্ডা নিয়ে, এই পণ তাদের। চারদিকে কড়া পাহারার মাঝে কংগ্রেসী পতাকা উড়ছে দু'এক বাড়িতে। বেলা প্রায় দুপুর হল—। মিটিং ডেকে

রেখেছে কংগ্রেসীরা হাটখোলায়, কিন্তু লোক নেই একজনও।

এমন সময় 'কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ' জয়ধ্বনিতে ফেটে গেলো দশ দিক। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে পাহারাদার পুলিশের দল— প্রায় পাঁচ ছয় শত মেয়ে পুরুষ এগিয়ে আসছে লালঝাণ্ডা নিয়ে। সকলের আগে তাদের 'রেনে' গ্রামের বৃদ্ধা কৃষক মাতা— 'রেবতী দাসী'।

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল শত্রপক্ষের। গুলি চালালো তারা। আহত হল ২|১ জন কিন্তু তবুও ফেরাতে পারলো না সেই শোভাযাত্রীদের। ফিরে গেলো 'মুরারীশরণ', 'চণ্ডী ঘোষ'। ফিরে গেলো সেদিনের মত কংগ্রেসী ফৌজ— কংগ্রেসী পতাকাগুলো ভয়ে ভয়ে নামিয়ে নিয়ে। জয়যাত্রা শুরু হল লালঝাণ্ডার ওখানেও— লালগঞ্জের পথে।

১৫ই আগষ্ট কংগ্রেসীরা বিরাট আয়োজন করে সভা করলো ডায়মণ্ড-হারবার আর বসিরহাট শহরে। বিরাট হল ঘর। ভরে গেছে শত শত মানুষে। একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী দুজায়গায় দুজনে জবাব দিতে উঠলো বড় বড় কংগ্রেসী নেতাদের ভাঁওতা প্রচারের। বললে— 'আমরা বলতে চাই হাজার হাজার নিপীড়িত মানুষের তরফ থেকে'। চিৎকার করে উঠলো কংগ্রেসীরা— 'কমিউনিস্ট ওরা, বলতে দেবো না ওদের', কিন্তু শত শত মানুষের দুর্জয় প্রতিবাদে চাপা পড়ে গেলো তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে দিলে জনসাধারণ কংগ্রেসীদের— বললে, 'ঢের সয়েছি, আর নয়'। ১৫ই আগষ্টের কংগ্রেসীদের ডাকা সভায় আওয়াজ উঠলো শত শত কণ্ঠে 'কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ—। বিধানমন্ত্রি সভা ধ্বংস হোক।'

জোয়ার লেগে গেছে মথুরাপুর থানায়। ধান বিলি করেছে দখল করে সেখানকার ক্ষেতমজুররা আর টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে দু'শো খানেক পার্টির কেন্দ্রীয় তহবিলে 'লড়াই তহবিল' বলে। 'জি' প্লটের ক্ষেতমজুর ভাগচাষি ও বাস্তুহারা এক সঙ্গে নেমেছে ময়দানে। দখল করছে জমি ধান। এমনিতরই এগিয়ে চলেছে— 'ডোঙ্গাজোড়া', 'বিষ্ণুপুর', 'ধপধপি', 'জয়নগর', 'বসিরহাট', 'বনগাঁর' অগণিত মানুষ। প্রত্যেকটি এলাকা থেকে খসে পড়ছে কংগ্রেসীদের মুখোশ। মাটি সরে যাচ্ছে তাদের পায়ের তলা থেকে।

১লা মে'র পর জনসাধারণের আদালত বসিয়ে বিচার হয়েছে রাধানগরের কংগ্রেসীদের। শত শত টাকা জরিমানা করেছে হারু মাইতির মত সেরা কংগ্রেসী দালালদের। তাড়িয়ে দিয়েছে দালাল ও পুলিশের ধামাধরাদের এলাকা থেকে। শত শত বিঘা জমি বাজেয়াপ্ত করেছে বড় বড় জোতদারের; বিলি করে দিয়েছে তা সাধারণ চাষিদের মাঝে।

ক্ষেতমজুর সম্মেলন থেকে ফিরে গিয়ে রণদামামা বাজিয়ে দিয়েছে 'সন্দেশখালী', 'ক্যানিং' থানার শতকরা নব্বইজন মানুষ— 'ক্ষেতমজুর'। লালগঞ্জের খবর জোয়ার এনে দিয়েছে তাদের মনেপ্রাণে-- রক্ত ধারায়।

হাঁক দিয়ে বলেছে তারা প্রতিটি মৌজায়— "আমরা কমিউনিস্ট পার্টির মুক্তিফৌজ— মুক্ত করবো আমাদের এলাকাকে কংগ্রেসীদের নাগপাশ থেকে।" বলছে তারা— "আমরা খেতে চাই পেট ভরে, বাঁচতে চাই মানুষের মত"— "আমরা আর ঠকতে রাজী নই"। আওয়াজ তুলেছে তারা গৃহযুদ্ধের ময়দানে— 'রণচণ্ডী লালগঞ্জ জিন্দাবাদ'।

শালুক খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল ক্যানিং থানার শত শত ক্ষেতমজুর। মহাজনের কাছে চাইতে গিয়ে লাথি খেয়ে ফিরে এসেছে তারা। লাঠিয়াল বন্দুক দেখিয়ে খেদিয়ে দিয়েছে রমানাথ জোতদার। তাই শেষ পর্যন্ত আওয়াজ উঠল পাড়ায় পাড়ায়— 'দখল কর গোলা,

বিলি করে দাও ধান সকলের ঘরে'—'বাঁচাও ছেলে মেয়েকে অনাহার মৃত্যু থেকে।'

গোলা দখল হল। বিলি হল দুশো মণ ধান। বহু দিন পরে পেট ভরা ভাতের স্বাদ পেলে ক্ষুধার্ত মানুষ। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজে শুরু হল আবার। আবার গোলা দখল হল পরদিন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ জন লোক গিয়ে গোলা দখল করলো রমানাথের। পালিয়ে গেলো রমানাথ তার লাঠিয়াল বন্দুক নিয়ে। পুলিশ এনেছিল পাহারার জন্য, তারাও সাহস করলে না সেই বিপ্লবী জনতার সামনে এগিয়ে রুখতে।

চার পাঁচশো মণ ধান। শত শত লোকের অভাব মিটবে তাতে। তাই সংগ্রাম কমিটি ডাক দিল চারদিকের ৮|১০ খানা লাটের লোকদের— নিয়ে যাও যে যত পারো। দলে দলে ছুটে এলো মেয়ে আর পুরুষ লাঠি আর লালঝাণ্ডা নিয়ে। বস্তা বস্তা ধান নিয়ে গেলো তারা।

মহাজনী কারবার ছিল রমানাথের। পুড়িয়ে দিলে সবাই মিলে সেই কাগজপত্র। শয়তানি করে বন্দী করেছিল রমানাথ দু'জন কর্মীকে। খবর পেয়ে দারুণ বৃষ্টির মাঝেও গভীর রাত্রে ছুটে এলো আঠারো জন মুক্তিফৌজ। বন্দুক বুলেটের পরোয়া না করে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো কর্মীদের— মুক্ত করলো বন্দীশালা থেকে।

কংগ্রেসী পুলিশ গিয়ে দুশোজনকে বন্দী করে আনলে ঐ অঞ্চল থকে। কিন্তু বন্ধ হল না তাতে গোলা দখল করা। সন্দেশখালীর শুকদোয়ানিতে লক্ষ লক্ষ টাকা জমিয়েছে— হাজার মণেরও বেশি ধান রেখেছে গোলা ভরে দ্বারিক শর্মা। এছাড়া আছে কন্ট্রোলের চোরাকারবার— কাপড়, চিনি, তেলের।

দুর্গামণ্ডপ, গাববেড়ে, দাউদপুর, শুকদোয়ানির শত শত ক্ষুধার্ত মানুষ লালঝাণ্ডা নিয়ে ঘেরাও করলে দ্বারিকের বাড়ি, দখল করলে বড় বড় গোলাগুলো— তারপর চললো ধান বিলি। হাজার মণেরও বেশি ধান বিলি হল এক দিনে। চোরাকারবারের জন্য আটশো ধুতি আর চারশো গামছা, টিন টিন কেরোসিন তেল, বস্তা বস্তা চিনি-নুন জমানো ছিল গুদামে । তাও দখল করে নিলে জনসাধারণ, বিলি করে দিলে সেই পাঁচশত মানুষকে যারা এসেছিল বাঁচার লড়াইয়ের সৈনিক হয়ে। মহাজনী কারবারের ক্যাশঘরও দখল করলো বিপ্লবী জনতা ছুটে গিয়ে। লক্ষ টাকার ওপর তেজারতি মহাজনী দলিল, খত, হাতচিটা পুড়িয়ে দিতে লাগলো তারা। পুড়ে ছাই হতে লাগলো সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সাক্ষ্যগুলো। কোনওমতে প্রাণভিক্ষা নিল দ্বারিক সে যাত্রা।

ফেরার পথে সন্দেশখালীর দারোগা বাধা দিতে এলো সশস্ত্র ফৌজ নিয়ে। কেড়ে নেবে সেই ধান-কাপড় এই ভাবটা। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হল তাদের— প্রাণ নিয়ে পালাতে হল কোনও মতে।

একদিন পরে ছুটে গেলো পঁয়তাল্লিশ জন ফৌজ আর তাদের বড় কর্তারা। গিয়েই গুলি চালিয়ে হত্যা করলে দু'জন সর্দার ভাইকে। ভেবেছিল, এমনি করেই ধরে নিয়ে যেতে পারবে সেই পাঁচশো লোককে। কিন্তু, হল তার বিপরীত। ধরা পড়ার অবস্থায় পড়লো সেই সিপাহী পল্টনেরাই। বিপ্লবী জনতার বেড়াজালে ঘেরাও হয়ে গেলো সবাই। অবস্থা খারাপ দেখে হাতজোড় করে মাপ চেয়ে ফিরে গেলো সমস্ত বাহিনী নিয়ে— পুলিশের বড়কর্তারা।

ধান নিতে গিয়ে বুলেট খেয়েছে শুকদোয়ানির চাষি। এখবর শুনেও ঘাবড়ালো না কেউ। বরং আরও মজবুত হয়ে তৈরি হতে লাগলো গৃহযুদ্ধকে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার

জন্য। শ্রেণি—সংগ্রামের ময়দানে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিজ্ঞার ছাপ দেখা গেলো প্রত্যেকেরই মনে।

বসিরহাটের এস.ডি.ও নিজে এসে ধান দেওয়ার মিটিং ডাকলে হাটগাছিতে। কিন্তু ব্যর্থ হল তার ষড়যন্ত্র। মানুষ অনেক ঠকে শিখেছে— চিনেছে, কি আছে ঐ মিঠে বুলির আড়ালে। তাই ভাঁওতায় ভুললেনা এবার— বরং এগিয়ে গেলো লাঠি আর বস্তা নিয়ে ধান দখল করতে। শত শত মণ ধান চাল দখলকরে বিলি হল 'আগরআটী' গ্রামে। খবর পেয়ে হাকিম পাঠালে একদল ফৌজ কিন্তু হটে আসতে বাধ্য হল তারা।

প্রায় তিনশত মেয়ে পুরুষ বন্দী হয়েছে ক্যানিং সন্দেশখালী থানা থেকে। এক মাসের মধ্যে দু'দুবার গুলি চালিয়ে আহত করেছে উপোসী মানুষকে— হত্যা করেছে তাদের দু'জনকে— প্রায় পাঁচশত পুলিশ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে চেয়েছে গরীবের কুঁড়ে ঘরগুলো। কিন্তু, তা পারে নি। হেরে গেছে বিধান মন্ত্রি-সভা। লোপ পেতে বসেছে কংগ্রেসী শাসন, গোটা বসিরহাট মহকুমা থেকেই। হাজার হাজার মুক্তিফৌজ ছুটে চলেছে ঝড়ের বেগে— লালগঞ্জের দিকে। হাত মেলাবে তারা।

গণবিপ্লব এসে গেছে

কারখানার লক্ষ লক্ষ মজুর ও গ্রামের মজুর আজ এগিয়ে চলেছে পাশাপাশি। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে তারা, গৃহযুদ্ধকে সফল করতে। সারা বাংলাকে তেলেঙ্গানায় পরিণত করে— সত্যিকারের মজুররাজ কায়েম করতে।

গত তিন বছরে কংগ্রেসীদের বিশ্বাসঘাতকতা নিদারুণ আঘাত করেছে মজুর শ্রেণির জীবনে। বিধান মন্ত্রিসভার কালাকানুন— ১৪৪ ধারা— লাঠি, গুলি, জেল— হপ্তাবন্দী—রেশন বন্ধ—কারখানায় কারখানায় তালাবন্ধ—প্রতিদিন শত শত ছাঁটাই, শেষ করে দিতে চাইছে তাদের। 'ট্রাইবুন্যাল', 'শালিসী' আর বড় বড় প্রতিশ্রুতির ঢাক বাজিয়ে, কংগ্রেসী পতাকা সামনে রেখে ক্রমাগত পিছন থেকে ছুরি চালিয়ে এসেছে নলিনী-বিধান সরকার আর তাদের অনুগত শ্রমিক নেতারা। আমেরিকার 'অ্যাটম বোমা' আর 'অস্ত্রের' ভরসায় নেহরু নিজে গেছে আমেরিকায়, 'ট্রুম্যান' ও সেখানকার ডলার সম্রাটদের কাছে—। এর বিনিময়ে তাদের বিদেশী মাল রপ্তানীর অধিকার দিয়ে দেশের বাজার তুলে দিয়েছে তাদের হাতে৷ এদিকে বিধান-নলিনী-নেহরুর বন্ধু টাটাবিড়লাদেরও যাতে কম খরচায় একশো গুণ মুনাফা হয় তারও চেষ্টা চলেছে আঠারো আনা। এর মূল্য দিতে হচ্ছে দেশের মজুর শ্রেণিকে— দেশের কোটি কোটি মেহনতী মানুষকে। ঘরে ঘরে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। পথে পথে ভিখারীর ভিড় জমছে। আশ্রয় হারিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে গাছতলায় আশ্রয় নিয়ে নাম কিনছে 'বাস্তুহারা'।

টাটা বিড়লা ও কংগ্রেস সরকারের মাইনে করা দালাল 'জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' আর 'সোশ্যালিষ্টরা' এতোদিন শ্রমিক দরদী সেজে অনেক ভাঁওতা মেরেছিল। প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল প্রতিটি সংগ্রাম পিছেনে টেনে রাখতে— ঠিক যেমন চারু ভাণ্ডারীরা করেছিল কাকদ্বীপে। কিন্তু আজ মুখোশ খুলে গেছে তাদের। সোশ্যালিষ্ট নেতা 'জয়প্রকাশ নারায়ণের' বিশ্বাসঘাতকতা চিনে ফেলেছে আট লক্ষ রেলশ্রমিক। জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের সুরেশ ব্যানার্জী, দত্ত মজুমদার, দেবেন সেন, ফণী ঘোষ আজ চারু ভাণ্ডারীর মতই পদে পদে লাঞ্ছিত

হচ্ছে সাধারণ মজুরদের হাতে। দালাল বলে মার খাচ্ছে তারা প্রতিটি লড়াইয়ের ময়দানে।

তারই মাঝে আগে বাড়ছে নতুন বিপ্লবী নেতৃত্ব। লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছে শ্রমিকের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা— নিজেদের শ্রেণির স্বার্থ বজায় রাখতে সমস্ত বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে।

ঠিক যে সময় কাকদ্বীপের ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুর, ভাঙড়, তিউড়ীর ক্ষেতমজুর লড়াই করে চলেছে দাঁতে দাঁত চেপে বিধান মন্ত্রিসভার সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে— ঠিক যে সময় সন্দেশখালী ক্যানিং থানার শত শত ক্ষেতমজুর দিনের পর দিন ধর্মঘট করে অচল করে দিয়েছে মহাজন জোতদার ধনীচাষির ক্ষেতখামারের কাজ— ঠিক যে সময় সারা চব্বিশ পরগনার বুকে হাজার হাজার ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষি যুক্ত সংগ্রাম কমিটি করে, দখল করে নিচ্ছে হাজার হাজার বিঘা খাস জমি, অধিকার করছে কাছারী, বিলি করছে সব পুঁজিবাদের সম্পত্তি জনসাধারণের মধ্যে— সেই সময়েই কলকাতার আশে পাশে হাজার হাজার মজুর 'জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন', 'সোশ্যালিষ্ট'—'কংগ্রেসী রামরাজ্য' সব কিছুর মোহ ছিঁড়ে ফেলে নেমে গেছে ময়দানে— কসে কোমর বেঁধে।

কারখানায় কারখানায় জ্বলে উঠেছে গৃহযুদ্ধের আগুণ। দাবির লড়াই থেকে ধর্মঘট, ধর্মঘট থেকে সাধারণ ধর্মঘটে লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে ঝড়ের বেগে। নলিনী সরকারের পটারী কারখানার বাহাদুর মজুর এগিয়ে গেছে আরও অনেকখানি। বিধান-নলিনী সরকারের কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, মেশিনগানের বুলেট বৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে ৪৮ ঘন্টা ধরে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছে তারা। জীবন দিয়েছে বাংলার সেরা মজুর রামলক্ষ্মণ, আহত হয়েছে শত শত কিন্তু এক পাও পিছু হটেনি তারা। তবুও আত্মসমর্পণের কথা কল্পনাও করেনি তারা। রক্তের নদী বয়ে গেছে সেখানে। তবুও মন্ত্রী নলিনী সরকার পারেনি সে কারখানা দখল করতে। হটে যেতে বাধ্য হয়েছে বড় বড় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর বড কর্ত্তারাও কোনও রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে দারুণ জখম হয়ে।

এমনিতরই ডালমিয়ার এলেনবেরী কারখানাও দখল করে ফেলেছে মজুর ভাইরা। তাড়িয়ে দিয়েছে সাহেব ম্যানেজারদের, বরখাস্ত করেছে তাদের, লালঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে কারখানার মাথায় দশদিন কারখানা দখলে রেখেছে তারা। শুধু তাই নয়, বুঝতে পেরেছে সবাই কি ভীষণ আক্রমণ করবে সরকার। তাই সে আক্রমণ রুখবার জন্যও প্রস্তুত হয়েছে তারা। মেশিনঘর চালু করে সাঁজোয়া গাড়ী আর অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি করেছে তারা।

সাহস করেনি বিধান মন্ত্রিসভা সহস্র সহস্র মিলিটারীর মালিক হয়েও এই জঙ্গী শ্রমিকদের মোকাবিলা করতে। সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছে ডালিময়ার আরও কারখানায়— কারখানা দখলের সংগ্রাম। টালিগঞ্জের কারখানার ম্যানেজার ধরা পড়েছে মিলিটারীর হাতে কারখানা তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে হাতে নাতে। তারপর আর কেউ দেখেনি তাকে।

এমনি করেই বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে বাংলার কারখানাগুলোয়। ব্যারাকপুর, হাওড়া, হুগলীর তিনলক্ষ চটকল মজুর, লোহাকল, সুতাকল ও আরও নানা কারখানার লক্ষ লক্ষ মজুর, আটলক্ষ রেলমজুর, মধ্যবিত্ত কেরাণী কর্মচারী, এমনকি খাস গভর্ণমেন্টের রাইফেল কামান তৈরির কারখানার মজুর, পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনীর সাধারণ সিপাহীরাও এগিয়ে চলেছে সাধারণ ধর্মঘটের দিকে। কলকাতা কর্পোরেশনের আটাশ হাজার মজুর পা বাড়িয়েছে এই দিকে। সংগ্রাম জয়যুক্ত করতে তারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বাহাদুর ট্রাম শ্রমিকরা— শত সহস্র লড়াইয়ে যাদের ঘৃণা ফেটে পড়েছে, এই ঘৃণ্য কংগ্রেস সরকারের প্রতি।

ব্যারাকপুরের মজুর আক্রমণ করেছে জেলখানা, চড়াও করেছে থানা, ছিনিয়ে নিয়েছে বন্দী ভাইদের। শ্রীরামপুরের শ্রমিকরা পুড়িয়ে দিয়ে কংগ্রেস ও 'আই এন টি ইউ সি'র অফিস আক্রমণ করেছে জেলখানা, পুলিশফাঁড়ি, মোকাবিলা করেছে শত্রুদের সঙ্গে। দখল করেছে নৈহাটীর পাশে শত শত বিঘা পতিত জমি বাস্তুহারার সংগঠিত বাহিনী; পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে ঘর তুলেছে তারা বেহালার পোর্টকমিশনারের কয়েকশো বিঘা খাস জায়গায়। ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ধর্মঘট করেছে স্কুল কলেজে ছাত্র-দাবি নিয়ে, বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে। এমনিতরই ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন। বর্ধমানে, বাঁকুড়ায়, হাওড়ায়, হুগলীতে, বীরভূমে, মালদায়, সারা মেদিনীপুরের বুকজুড়ে, অগ্রদ্বীপের লাল মাটিতে— গলাগলি করে এগিয়ে চলেছে 'মজুর', 'ক্ষেতমজুর', 'চাষি', 'ভাগচাষি', 'বাস্তুহারা', 'গরীব', 'মধ্যবিত্ত' বিরাম বিশ্রামবিহীন গতিতে। শত্রুর হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে সশস্ত্র হচ্ছে তারা। সাধ্য নেই বিধান নলিনী সরকারের, সাধ্য নেই নেহরুর আর আমেরিকার কাছে ধার করা অ্যাটম বোমার— এই বিপ্লবের গতি থামিয়ে দেয়। সারা পৃথিবীর বুকে জনগণের শক্তি আজ অবিচ্ছেদ্য। সারা পৃথিবীর বুকে গণতন্ত্রের শিবিরের শক্তি আজ অ্যাটম বোমার চেয়েও শক্তিশালী।

শুধু লালগঞ্জ নয়, সারা বাংলাকে নিয়ে যেতে হবে তেলেঙ্গানার পথে— এই দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবাংলার মজুর শ্রেণি। তাদেরই উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে ক্ষেতমজুর সম্মেলন হয়েছে কলকাতার বুকের ওপর। সে সম্মেলনে দূর দূরান্তরের লালঝাণ্ডার প্রতিনিধিরা শুনিয়ে গেছে তাদের লড়াইয়ের কাহিনী। পাকিস্তানের ক্ষেতমজুর গরীব মুসলমান চাষিরা শুনিয়ে গেছে তাদের সরকারের অত্যাচারের কাহিনী, শপথ নিয়ে গেছে গোটা পাকিস্তানকে লাল করে দেবার।

এগিয়ে আসছে সমুখে ফসলের ও জমি দখলের লড়াই। তারই প্রস্তুতি চলেছে ঘরে ঘরে। পশ্চিমবাংলার লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর প্রস্তুতি নিচ্ছে সাধারণ ধর্মঘট করে অচল করে দেবার— 'মহাজন', 'ব্যবসায়ী', 'ধনী চাষি'র কাজ কর্ম। তারই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে ভাগচাষি— তেভাগা পুরো ফসল এবং জমি দখল করার জন্য। চটকল, লোহাকল, সুতাকল, রেল, ট্রাম, রাইফেল ফ্যাক্টরীর সংগ্রাম কমিটি ডাক দিয়েছে সাধারণ ধর্মঘটের। দায়িত্ব নিয়েছে তারা ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষির লড়াইকে পরিচালনা করে জয়যুক্ত করার।

দিন ঘনিয়ে আসছে বিধান মন্ত্রিসভার। দিন ঘনিয়ে আসছে পশ্চিমবাংলার ধনিকগোষ্ঠীর। লক্ষ লক্ষ কারখানার মজুর ও ক্ষেতমজুরের মিলিত সাধারণ ধর্মঘট দিন ঘনিয়ে আসছে তাদের। সেদিনের আর দেরি নেই যেদিন লালগঞ্জের মত সারা পশ্চিমবাংলা রাহুমুক্ত হবে, সেদিন আকাশে উঠবে নতুন আরক্ত সূর্য, নতুন লাল আলো ছড়িয়ে দেবে দেশে লাল মহাচীনের মত। সেদিন দখল করবে সারা পশ্চিমবাংলার মজুর, ক্ষেতমজুর ও মেহনতী মানুষ মিলে গোটা পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্র ক্ষমতা। সেদিন নতুন শাসন চালু হবে লালঝাণ্ডার তলায়— প্রতিষ্ঠা হবে সর্বহারার গণতান্ত্রিক সরকার।

অবিস্মরণীয় তেভাগা সংগ্রাম ও দিনাজপুর

সুশীল সেন

সম্প্রতি বালুরঘাটের খাঁপুর গ্রামে তেভাগা সংগ্রামের রজত-জয়ন্তী পালিত হইল। এই খাঁপুর গ্রামে ১৯৪৭ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি সশস্ত্র পুলিশ ঐ সংগ্রাম দমনের জন্য কৃষকদের উপর একদিনে ১২১ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করিয়া ২২ জন কৃষককে হত্যা করে। আহতদের বালুরঘাট হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার মৃত্যুপথযাত্রী একজন কৃষককে তাঁহার শেষ ইচ্ছা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি কী চান?" ক্ষীণকণ্ঠে সংগ্রামী কৃষকটি উত্তর দিলেন— "তেভাগা চাই।" তারপরই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিন তেভাগার দাবি ঐ জিলার নিপীড়িত কৃষকদের মনে কত গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা ঐ উক্তি হইতেই উপলব্ধি করা যায়।

১৯৪৬-৪৭ সালের ধানকাটার মরশুমের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে অবিভক্ত বাঙলার প্রায় ১৯টি জিলার কৃষকরা ঐ তেভাগা সংগ্রামে যোগদান করে। সংগ্রামের প্রধান এলাকা ছিল উত্তরবঙ্গ— দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জিলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ঐ অঞ্চলে বর্গাদাররা আধিয়ার নামে পরিচিত। আর এই আধিয়ার কৃষকদের অধিকাংশই ছিল রাজবংশী বা ক্ষত্রিয় এবং সাঁওতাল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং কৃষক সমিতির পরিচালনায় ঐ সংগ্রাম সংগঠিত হইয়াছিল। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহের যে ব্যাপক বিস্ফোরণ সেদিন ঘটিয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয়। অবিভক্ত দিনাজপুর জিলার ৩০টি থানার মধ্যে ২২টি থানার আধিয়ার কৃষকরা ঐ সংগ্রামে যোগ দেয়। ঐ এক জিলাতেই চারটি অঞ্চলে পুলিশের গুলিতে ৪০ জন কৃষক শহিদ হয়। দুই হাজার কৃষক কারাবরণ করে। শত শত কৃষক কর্মী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা উপেক্ষা করিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করেন ও আত্মগোপন করিয়া থাকেন। কৃষকদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা দায়ের হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ঐ সকল মামলা ও ওয়ারেন্ট প্রত্যাহৃত হয়।

পাঁজিয়া সম্মেলন

১৯৪০ সালের শুরুতে ফজলুল-হক্ মন্ত্রিসভা নিয়োজিত ভূমি রাজস্ব কমিশন (ফ্লাউড কমিশন)-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কমিশন বর্গাদারদের জন্য উৎপন্ন ফসলের ১/৩ অংশ খাজনা দিবার সুপারিশ করে। ঐ বছরই যশোর জিলার পাঁজিয়াতে প্রাদেশিক কিষান সভার যে-বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে আলোচনায় ঐ রিপোর্ট বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

পাঁজিয়া সম্মেলন হইতে বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ পাইবার দাবিতে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফ্লাউড কমিশনের নিকট ইতিপূর্বেই প্রাদেশিক কিযান সভা হইতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হইয়াছিল।

ভবানী সেনের রংপুর মিটিং

তখন যুদ্ধ চলিতেছিল। যুদ্ধের মধ্যেই আসে মন্বন্তর। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কৃষক সমিতিগুলি রিলিফ ও খাদ্য আন্দোলন লইয়াই প্রধানত ব্যস্ত থাকে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি— পার্টির এই তিনটি জিলা কমিটির এক যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করেন। রংপুরের জিলা সম্পাদক কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন তাঁদের পার্টি কম্যুন-এ তিনদিনব্যাপী এই মিটিং-এর ব্যবস্থা করেন। জলপাইগুড়ির জিলা সম্পাদক ছিলেন তখন কমরেড শচীন দাশগুপ্ত। তিনটি জিলাই সেদিন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াছিল। পার্টি ও কৃষক অন্দোলনের তখনকার শক্তিশালী ঘাঁটি এই তিনটি জিলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং তিন জিলায় যুক্তভাবে একই দাবির ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করার বিষয়টিই ঐ সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। কমরেড ভবানী সেন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া তিনদিন ঐ আলোচনা পরিচালনা করেন। সেই আলোচনার ভিত্তিতে কৃষক আন্দোলন প্রসারিত ও সংগঠিত করা হয় এবং জোতদারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারপর ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের সভায় তেভাগা সংগ্রামের সিদ্ধান্তের পর অক্টোবরের শেষে কমরেড ভবানী সেন রংপুরে ঐ তিন জিলার নেতৃস্থানীয় কমরেডদের নিয়ে এক সভায় পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন। সভার শেষে কমরেডদের আলোচনার ভিত্তিতে কমরেড ভবানী সেন যুক্ত আন্দোলনের সাধারণ দাবিগুলি শ্লোগান আকারে সভায় উপস্থিত করেন। উহার মধ্যে এমন তিনটি শ্লোগান ছিল যাহা পরবর্তীকালে তেভাগা সংগ্রামের মূল রণধ্বনি হইয়া উঠিয়াছিল সমগ্র উত্তরবঙ্গে। শ্লোগান তিনটি হইতেছে— (১) নিজ খোলানে ধান তোল; (২) আধি নাই— তেভাগা চাই; (৩) কর্জা ধানের সুদ নাই। কমরেড ভবানী সেন ছিলেন উহার রচয়িতা। এই রণধ্বনি লইয়াই সেদিন আধিয়ার কৃষকরা সমগ্র উত্তরবঙ্গ কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

১৯৩৯ *সালের আধিয়ার আন্দোলন*

কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ১৯৩৯ সালে একবার দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জিলার আধিয়ার কৃষকরা জোতদারের খামারের পরিবর্তে নিজেদের খোলানে ধান তুলিবার দাবিতে আন্দোলন করিয়াছিল। সে-আন্দোলনের সঙ্গে তেভাগার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেদিনের ঐ তিন জিলার তোলাবটি আন্দোলন ও মেলার লেখাই-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে ঐ আধিয়ার আন্দোলনও ছিল মূলতঃ জোতদারদের নানারকম আবওয়াব ও বে-আইনি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম। ধান কাটিয়া জোতদারের খামারে তুলিলে আধিয়াররা তাহাদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশও ঠিক মতো পাইত না। জোতদাররা ছিল খুবই শক্তিশালী ও বিরাট। নিজেদের অর্ধাংশ লইয়াই তাহারা খুশি থাকিত না। আধিয়ারের অংশ হইতে মার্চা, তহুরী,

খোলানচাঁহা, মহলদারী, গোলাপূজা, বরকন্দাজী, মণ্ডপসেলামী, সন্ন্যাসী, হাতি খোয়া (হাতির খোরাকী), মাছ খোয়া, পার্বন, গাজন, থিয়েটার, প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বে-আইনিভাবে দফায় দফায় ধান কাড়িয়া লইত এবং কর্জা ধান পরিশোধ লওয়ার নামে আধিয়ারের অংশ হইতে সুদসহ দ্বিগুণ-তিন গুণ ধান কাটিয়া লইত। ইহারই বিরুদ্ধে আধিয়াররা তখন প্রতিরোধ করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁ মহকুমা শাসকের মধ্যস্থতায় আপস হয় ও 'দশের খোলানে' ধান তোলা সাব্যস্ত হয়। পরবর্তীকালে ঐ চুক্তিও জোতদাররা বাতিল করে।

নির্বাচন ও তেভাগা

রংপুর মিটিং-এর পর ঐ দাবিগুলি প্রচার হইতে থাকে। ১৯৪৬ সালের শুরুতে আইনসভার যে নির্বাচন হয় তাহাতে এই তিনটি জিলাতে, বিশেষ করিয়া তফসিল আসনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনের প্রচার-অভিযানের মধ্য দিয়া ঐ দাবিগুলি জিলাগুলির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপকভাবে কৃষকদের মধ্যে প্রচারিত হয়। দিনাজপুরে কমরেড রূপনারায়ণ রায় জয়লাভ করেন। কমরেড রূপনারায়ণ খুব কম লেখাপড়া জানা গরিব রাজবংশী কৃষক। তিনি কংগ্রেস প্রার্থী ভবেশ সিং-কে পরাজিত করেন। ভবেশ সিং ছিলেন বিরাট এক জোতদার। সমগ্র জিলাব্যাপী ছিল ঐ নির্বাচন কেন্দ্র। সেদিন জিলার সমগ্র নির্বাচনী সংগ্রাম হইয়া উঠিয়াছিল জমিদারি ও জোতদারি প্রথা উচ্ছেদের সংগ্রাম। নির্বাচনে জোতদার ভবেশ সিং-এর পরাজয় জিলার আধিয়ার ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। উহা তেভাগা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে। নির্বাচনের পর জোতদাররাও ব্যাপক আধিয়ার উচ্ছেদ শুরু করে।

মৌভোগ সম্মেলন

১৯৪৬ সালে মৌভোগ কৃষক সম্মেলনে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ" বিষয়ক প্রস্তাবে জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করা হয়। বর্গাদারদের জন্য তেভাগা আইন প্রণয়নের দাবিও করা হয় ঐ সম্মেলন হইতে। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত লয় যে পরবর্তী ফসলের মরশুমেই তেভাগা সংগ্রাম শুরু করিতে হইবে।

অক্টোবর মাসে দিনাজপুরে পার্টির জিলা কমিটি ও জিলা কৃষক সমিতির সভায় নিজ খোলানে ধান তোল; আধি নাই তেভাগা চাই; এবং কর্জা ধানের সুদ নাই— এই তিনটি দাবির ভিত্তিতে জিলায় তেভাগা সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত ও বিস্তৃত পরিকল্পনা লওয়া হয়। পরিকল্পনার সময় নিজ খোলানে ধান তুলিবার উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

'কমরেড, ইনক্লাব'

গ্রামের মাঠে মাঠে তখন পাকা ধানের সোনালী রং-এর সমারোহ। আর হাটবাজার ও পথেঘাটে সমারোহ লাল ঝাণ্ডা ও লাঠিধারী ভলান্টিয়ারের। শ্লোগানে শ্লোগানে সারা গ্রাম কাঁপিয়া উঠিতেছে। পাকা ধানের শীষগুলিও কাঁপিতেছে। সংগ্রামের দামামা বাজিয়া চলিয়াছে। "কমরেড ইনক্লাব"— ঐ ধ্বনিতেই বজ্রমুষ্ঠি উঁচাইয়া কৃষকরা একে অপরকে সংগ্রামী সম্ভাষণ

জানাইতেছে। অন্য গ্রামের প্রস্তুতির খবরাখবর লইতেছে। গ্রামের পর গ্রাম ঐ একই চিত্র। গ্রামগুলি হইয়া উঠিয়াছে জমাট বাঁধা কৃষক ঐক্যের প্রতীক। ক্ষেতমজুর, আধিয়ার, মাঝারি কৃষক, কিছুটা স্বচ্ছল অবস্থায় কৃষক... সকলেই আধিয়ারের পক্ষে লাঠি ধরিয়াছে। ভলান্টিয়ার হইয়াছে।

কমরেড গুরুদাস তালুকদারের এলাকাটি ছিল জিলার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল। ঠাকুরগাঁর ঐ পশ্চিমাঞ্চল ছিল জিলার পার্টি ও কৃষক সমিতির সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। ঐ এলাকা হইতেই ধান কাটা শুরু করার সিদ্ধান্ত হয় এবং উহা শুরু করার দায়িত্ব দিয়া পার্টির জিলা সম্পাদককে ঐ এলাকায় পাঠানো হয়।

মহিলা নেত্রী দীপশ্বরী

ধান কাটা শুরু হইয়াছে। একদল ভলান্টিয়ার লাল ঝাণ্ডা লইয়া স্কোয়াড করিয়া ধান কাটিতেছে। অপরেরা পাহারা দিতেছে। গ্রামের মেয়ে-পুরুষ সকলেই মাঠে নামিয়াছে। ধান কাটিয়া আধিয়ারের বাড়িতে তোলা হইল। পুলিশ কোনো বাধা দিল না। পরদিন সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে হানা দিয়া জিলা সম্পাদকসহ ৩২ জন কৃষক কর্মীকে গ্রেপ্তার করিল। ধান চুরির অভিযোগে সকলকে ঠাকুরগাঁ চালান দিল। কিন্তু ধান কাটা বন্ধ হইল না। পুলিশ এবার মাঠে নামিয়া ভলান্টিয়ারদের ধান কাটায় বাধা দিতে গেল। কৃষক মহিলা কমরেড দীপশ্বরী লাঠি হাতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন। লাঠি উঁচাইয়া তিনি পুলিশের দিকে ছুটিয়া গেলেন। অপর ভলান্টিয়ারা তাঁহাকে অনুসরণ করিল। পুলিশ পিছু হটিল। মাঠ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কমরেড দীপশ্বরীর ঐ সাহসিক ঘটনা ও পুলিশের পিছু হটার কথা বিদ্যুৎ বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সর্বত্র প্রবল উদ্দীপনা। জোর কদমে ধানকাটা সব এলাকাতেই আগাইয়া চলিল। পুলিশ মাঠে নামিয়া ধান কাটায় আর বাধা দিল না বটে, তবে সব এলাকাতেই কর্মীদের নামে মিথ্যা ধান চুরির দায়ে হাজার হাজার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিল। জিলা শাসক ও মহকুমা শাসকদের নিকট জোতদারদের দল বাঁধিয়া ছুটাছুটি, কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক ও সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রচেষ্টা ও ধান কাটা স্থগিত রাখিবার জন্য জোতদারদের আপসের গালভরা প্রস্তাবের প্রচার সত্ত্বেও আধিয়াররা দ্রুত ধান কাটিয়া নিজ খোলানে তুলিতে লাগিল। পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে গ্রামে ঢুকিলে এবার প্রতিরোধের সম্মুখীন হইল।

প্রথম শহিদ শিবরাম-সমিরুদ্দিন

৪ জানুয়ারি, ১৯৪৭ সাল। দিনাজপুর শহরের সন্নিকটে চিরির বন্দর এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ কৃষকদের উপর গুলিচালনা করে। গুলিতে কমরেড শিবরাম ও সমিরুদ্দিন নিহত হন। তেভাগা সংগ্রামের প্রথম শহিদ শিবরাম ও সমিরুদ্দিন। সমিরুদ্দিন ছিলেন ক্ষেতমজুর আর শিবরাম গরিব সাঁওতাল, আধিয়ার। একজন পুলিশও তীরবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

ধান কাটা শেষ হইয়া আসিয়াছে। সংগঠিত এলাকার সর্বত্রই আধিয়াররা ধান কাটিয়া নিজ খোলানে তুলিয়াছে। পুলিশী সন্ত্রাস তাহাদিগকে দমন করিতে পারে নাই। সংকল্পে তাহারা ছিল অটল। তবে অসংগঠিত এলাকাগুলিতে আধিয়াররা প্রথমত জোতদারদের খোলানেই ধান তোলে। নিজ খোলানে ধান তুলিতে সাহস করে না।

জোতদারের উপর আধিয়ারের নোটিশ

ইতিমধ্যে সংগঠিত এলাকায় কিছু কিছু ধান ঝাড়াই ও ধান ভাগ শুরু হইয়াছে। কৃষক সমিতির ছাপ দিয়া জোতদারদের তারিখ ও সময় জানাইয়া ধান ওজন ও ভাগ করিবার সময় উপস্থিত থাকিয়া নিজ অংশ বুঝিয়া লইবার জন্য নোটিশ দেওয়া হইতেছে। জোতদাররা উপস্থিত হইতেছে না। গ্রামের লোকের উপস্থিতিতে সাক্ষী রাখিয়া ধান ওজন ও ভাগ হইতেছে। অনুপস্থিত জোতদারের ১/৩ ভাগ ধান ধর্মগোলায় জমা রাখা হইতেছে তাহাদের নামে নামে। অথবা সকলের আস্থাভাজন কোনো কৃষকের ঘরে মজুত রাখা হইতেছে। দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকরা ঐ সকল ধর্মগোলা তৈরি করিয়াছিল।

ভাগুনীর পুলিশ গ্রেপ্তার

গ্রামে পুলিশের হানা অব্যাহত আছে। পুলিশ গ্রামে ঢুকিলেই ঘন্টাধ্বনি হয়। কাঁসর-শঙ্খ বাজিয়া উঠে, একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। আর ধ্বনিত হয় 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' শ্লোগান। কৃষক রমণীরাই ইহার সংগঠক। সঙ্গে সঙ্গে সকল বাড়ি হইতেই কৃষক মহিলারা লাঠি ও ঝাঁটা ও গাইন হাতে বাড়ির বাহিরে সমবেত হয় এবং পথে নামিয়া পুলিশের গ্রামে ঢুকিবার পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। সর্বত্রই চলিয়াছে এই প্রতিরোধ। রাত দুপুরে ঠুমনিয়া অফিসে খবর আসিল যে রানীশঙ্কাইল-এ একটি বন্দুকধারী পুলিশ মহিলা ভলান্টিয়ারদের প্রতি সম্মানহানিকর উক্তি করায় কমরেড ভাগুনীর নেতৃত্বে মহিলারা পুলিশটিকে 'গ্রেপ্তার' করিয়া একটি ঘরে আটক রাখিয়াছেন। পুলিশটিকে ছাড়িযা দিবার নির্দেশ ঠুমনিয়া হইতে না যাওয়া পর্যন্ত সারারাত কমরেড ভাগুনী বন্দুকটি নিজ কাঁধে তুলিয়া লইয়া ঐ পুলিশকে ঘরে পাহারা দিতে থাকেন অন্যান্য কৃষক মহিলাদের সঙ্গে। বিভিন্ন রকমের বীরত্বের নজির সৃষ্টি করেন এই সকল রাজবংশী কৃষক মহিলারা।

সরকারী ভাঁওতা

এই সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে লীগ সরকার তেভাগা সংক্রান্ত একটি বিল আইনসভায় আনিতেছেন। ঐ বিলের খসড়া ২২ জানুয়ারির গেজেটেও প্রকাশিত হয়। তীব্র সংগ্রামের মুখে সরকার ঐ ঘোষণা করিতে বাধ্য হন।

সংগ্রামের জঙ্গী অধ্যায় খোলান ভাঙা

সংগ্রাম এবার নূতন মোড় লইল। এক নূতন জঙ্গী অধ্যায় শুরু হইল। ইহা খোলান ভাঙা আন্দোলন নামে পরিচিত। তেভাগা সম্পর্কে আইন হইতেছে এই সংবাদ অসংগঠিত এলাকার আধিয়ারদের চঞ্চল করিয়া তুলিল। তাহারা জোতদারের খামারেই ধান তুলিয়াছিল এবং আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিতেছিল। আইন হইলেও জোতদারের খামার হইতে তাহারা তাহাদের ন্যায্য অংশ পাইবে না এই আশঙ্কায় তাহারা দলে দলে কৃষক সমিতির কাছে আসিয়া সাহায্য চাহিল যাহাতে তাহারা জোতদারের খামার হইতে নিজ নিজ ধানের পুঁজ ভাঙিয়া নিজ খোলানে আনিতে পারে।

এক মানুষ, এক লাঠি, এক টাকা

সংগ্রামের জন্য সমিতির সাংগঠনিক শ্লোগান ছিল : এক লাঠি— এক মানুষ—এক টাকা। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি হইতে একজন লাঠিধারী ভলান্টিয়ার, একজন কৃষক সমিতির সভ্য ও এক টাকা সংগ্রাম তহবিলে চাঁদা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঐ কাজ শেষ করিয়াই তাহারা আসিল সমিতির অনুমতির জন্য। এই আধিয়ারদের বিরাট অংশ ছিল মুসলমান কৃষক। জিলার মুসলিম লীগের নেতারা নোয়াখালি হইতে কিছু মৌলভী আমদানি করিয়া ঐ সকল মুসলমান কৃষকদের দিয়া দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টাও করিয়াছিল, কৃষক নেতা হাজী মহম্মদ দানিশকে খুন করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সেই সকল মুসলমান আধিয়ার কৃষকরাই এবার হাজী সাহেবের নিকট জোতদারের খোলান হইতে ধানের পুঁজ ভাঙিয়া নিজ খোলানে আনিবার 'হুকুম' আনিতে যায়। স্বতঃ স্ফূর্তভাবেই পুঁজ ভাঙা আন্দোলন আগুনের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। হাজার হাজার ভলান্টিয়ার দিনের পর দিন লাল ঝাণ্ডা হাতে মিছিল করিয়া জোতদারের খামার হইতে নিজ নিজ ধানের পুঁজ ভাঙিয়া লইয়া আপন বাড়ির খোলানে মজুত করিতে লাগিল। নিজ ধানের পুঁজ ভিন্ন জোতদারের বাড়ির অপর কিছুই তাহারা স্পর্শ করে না। জোতদাররা এবার আতঙ্কিত হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। জিলা শহর ও মহকুমা শহরে তাহারা ভীড় করিল। কেহ বা কলকাতা ছুটিল। জিলা হইতে সহস্র সহস্র টেলিগ্রাম মন্ত্রীদের কাছে— লুঠতরাজ ও ডাকাতির কাল্পনিক অভিযোগ আনা হইল সংগ্রামী কৃষকদের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নেতা শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু জোতদারদের এক প্রতিনিধিদল লইয়া কলকাতা রওনা হইলেন। জোতদারদের চাপে লীগ সরকার পিছু হটিল। গেজেটে প্রকাশিত হইলেও তেভাগা বিলটি আইনসভায় উত্থাপিত হইল না। ইহার পরিবর্তে আসিল নৃশংস দমন-পীড়ন। জিলার বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি পুলিশ ক্যাম্প বসিয়াছিল। সেই সকল ক্যাম্প হইতে শুরু হইল গ্রামে গ্রামে ব্যাপক পুলিশী অভিযান।

রক্তঝরা খাঁপুর

পতিরাম-খাঁপুরেও আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। পতিরামে জোতদারের খোলান হইতে ধানের পুঁজ ভাঙিয়া ভলান্টিয়াররা আধিয়ারদের নিজ খোলানে ধান তুলিয়া দেয়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম খাঁপুরেও আন্দোলন শুরু হয়। খাঁপুরের সিংহকাছারী জোতদার খুব প্রতাপশালী। জোতদারের ধানের খোলান ঘেরা ছিল না। আধিয়ার কৃষকদের গরু গিয়া ঐ ধান খাইলে জোতদার আধিয়ারদের সব গরু ধরিয়া খোঁয়াড়ে পাঠাইবার জন্য বরকন্দাজদের হুকুম দেয়। বরকন্দাজরা গরু খোঁয়াড়ে লইতে গেলে কৃষকরা উহা কাড়িয়া লয়। জোতদার ক্রুদ্ধ হইয়া পুলিশ ডাকে। সতেরোজন আধিয়ার কৃষকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে গিয়া গ্রেপ্তার করে। আগুনের মতো সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ঐ স্থানে ভলান্টিয়ারদের বিরাট সমাবেশ ঘটে। কৃষকরা অন্যায় গ্রেপ্তার প্রতিরোধ করে। বিরাট কৃষকবাহিনীর সম্মুখীন হইয়া পুলিশ ১২১ রাউণ্ড গুলিচালনা এবং ২২ জনকে হত্যা করে। কমরেড কালী সরকার ছিলেন ঐ এলাকার জিলা সংগঠক। ঐ দিনই খাঁপুরের ঐ ঘটনাস্থলে বিরাট কৃষক সমাবেশ হয়। কমরেড অবনী লাহিড়ী ঐ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশের খুনের নেশা

পুলিশ তখন খুনের নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে। পরদিনই ঠাকুরগাঁর পশ্চিম অঞ্চলে ঠুমনিয়ায় গুলি চলিল। কমরেড সুকুরচাঁদ ও তাঁহার স্ত্রীসহ ৪ জন কৃষক গুলিতে নিহত হইলেন। খাঁপুর-ঠুমনিয়ার গুলি চালনার প্রতিবাদে ঠাকুরগাঁ শহরে কৃষকদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইল। শান্তিপূর্ণ সেই মিছিল ও সমাবেশকে হঠাৎ বে-আইনি ঘোষণা করা হইল এবং কোনো রকম সময় বা সতর্কীকরণ ছাড়াই পুলিশ কৃষকদের উপর আবার বেপরোয়া গুলিচালনা করিল। পাঁচ জন কৃষক নিহত হইলেন। কমরেড সৌরি ঘটক ঠাকুরগাঁ শহরে সরকারী চাকুরি করিতেন। গোপন যোগাযোগ কেন্দ্রটির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁহাকে জিলা হইতে বহিষ্কার করা হইল। সারা জিলায় দমননীতির তাণ্ডব চলিল। ঠাকুরগাঁর কৃষক সমাবেশ উপলক্ষে দিনাজপুর শহর হইতে মহিলা নেত্রী কমরেড রানী মিত্র (দাশগুপ্ত) ও বীণা গুহকে ঠাকুরগাঁ পাঠানো হইল। পুলিশ তাহাদিগকে সমাবেশের স্থানে যাইতে দেয় না। ঠাকুরগাঁ শহর হইতে ফেরৎ পাঠাইয়া দেয়। কলিকাতা হইতে ছাত্র, যুবক, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের যে-সকল সৌভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিদল পাঠানো হইত তাহাদিগকে জিলার মহিলা নেত্রীরাই সংগ্রামের এলাকাগুলিতে লইয়া যাইতেন। উহাও পুলিশ বন্ধ করিয়া দিয়া বহির্জগৎ-এর সঙ্গে এলাকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। খাঁপুরেও মেডিক্যাল মিশনকে ঢুকিতে দিল না। এবার শুরু হইল পুলিশের বাড়ি বাড়ি হানা, মারপিট, গ্রেপ্তার ও লুটপাট। পুলিশ আধিয়ার কৃষকদের বাড়ি হইতে ধান লইয়া জোতদারদের বাড়িতে তুলিয়া দিতে লাগিল। কৃষকরা বাড়ি ছাড়িয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইল। পুলিশ জঙ্গলগুলিতেও আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। মেয়েদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাইল। কর্মীদের গ্রেপ্তার করিতে না পারিয়া তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরোয়ানা বাহির করিল। এবার সকল প্রতিরোধ ভাঙিয়া পড়িল। দমন-পীড়নের অন্ধকারময় দিনগুলির মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইল সেই স্মরণীয় দিনটি— ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। আমরাও গ্রামের গোপন কেন্দ্র হইতে প্রকাশ্যে বাহির হইলাম। দেশের সকল মানুষের সঙ্গে আধিয়ার কৃষকদের লইয়া মিছিল করিয়া স্বাধীনতালাভের বিজয়-উৎসব পালন করিলাম।

তেভাগার দাবি সেদিন আদায় করা যায় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কৃষকদের রক্তের বন্যায় ঐ সংগ্রাম ডুবাইয়া দেয়। তবুও নিঃসংশয়ে ইহা বলা চলে যে ঐ সংগ্রাম সেদিন সাম্রাজ্যবাদসৃষ্ট জমিদারি-জোতদারি শোষণ ও ভূমি ব্যবস্থাকে আসামীর কাঠগড়ায় টানিয়া আনিয়া সমগ্র জাতির সম্মুখে হাজির করিয়াছিল। আর ঐ সংগ্রাম ছিল ইদানীংকাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সর্ববৃহৎ সংগঠিত কৃষক সংগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রামী কমিউনিস্ট কর্মীরাই সেদিন দুর্গম গ্রামাঞ্চলে পশ্চাদপদ, দারিদ্র্যপীড়িত, শোষিত ও নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যে দিনের পর দিন পড়িয়া থাকিয়া, অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহাদের সংগঠিত করিয়াছিল। রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়া ঐ কৃষকদের মধ্য হইতেই এক বিরাট সুশিক্ষিত কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করিয়া পার্টি গড়িয়াছিল। ঐ কর্মীবাহিনীই ছিল তেভাগা সংগ্রামের এলাকাভিত্তিক নেতা ও মূল শক্তি।

ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিলির দাবি

অতীতে ছিল প্রধানত কৃষকের দাবি। আজ উহা জরুরি জাতীয় দাবিরূপে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। কারণ ইহা ছাড়া জাতীয় অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় গতিবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সকল মানুষের মধ্যেই উপলব্ধি আজ দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। তেভাগা সংগ্রামের দিনে অবস্থা ছিল বিপরীত।

সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলি আজও বহাল রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে পরাক্রান্ত জোতদার-মহাজনের হাতে আজও গরিব কৃষক ও বর্গাদাররা নিপীড়িত হইতেছে। জোতদারের ভয়ে আজও বর্গাদাররা জরীপের সময় নিজ নাম রেকর্ড করাইতে সাহসী হয় না। আজও বর্গাদার উচ্ছেদ ব্যাপক। শক্তিশালী সংগঠিত কৃষক আন্দোলনই ইহার অবসান ঘটাইতে পারে। তেভাগা সংগ্রামের রজত-জয়ন্তীতে সেই সংকল্পই ঘোষিত হউক সর্বত্র।

পরাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা ও তাহার শোষণকে নির্মমভাবে কায়েম রাখিয়াছিল এদেশে। তেভাগা সংগ্রাম ছিল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। দরিদ্র কৃষকদের ঐ সংগ্রাম প্রকৃতই ছিল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কৃষকের মুক্তি সংগ্রাম। ঐ সংগ্রামে কারাবরণকারী নির্যাতিত কৃষক ও কৃষক শহিদদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা অবশ্যই আমাদের এক জাতীয় কর্তব্য।

প্রাপ্তিস্বীকার : তে-ভাগা রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ। এই উপলক্ষ্যে গঠিত উদযাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা-১৯৭৩

মেদিনীপুরে তেভাগা সংগ্রাম

ভূপাল পাণ্ডা

মেদিনীপুর জেলার কৃষক সমাজ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে ছিল সবচেয়ে আগুয়ান।

১৯২০-২৪ সালে অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯৩০-৩৪ সালে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে, ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে চার-ছয় আনা চৌকিদারী ট্যাক্স না দিয়ে বহুমূল্যের গরু-ছাগল ও তৈজসপত্রাদি পুলিশকে ক্রোক করে নিয়ে যেতে ছেড়ে দিয়েছে, তেমনি আবার এই জেলায় তিন-তিনটি অত্যাচারী সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার ঘটনায় হাসিমুখে অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছে উৎসাহ নিয়ে। ব্রিটিশের অধীনতা মুক্তির সংগ্রামের সাথে ব্রিটিশের শোষণমুক্তির জন্য ব্রিটিশ জমিদারি কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই, খড়্গপুর থানায় ধারেন্দা পরগনার সাঁজাভাঙা আন্দোলন, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল, ময়না থানাগুলিতে আনিশুনি আবওয়াব আদায় বন্ধ ও কর্জা ধানের সুদ কমানোর আন্দোলন এবং জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তমলুক, পাঁশকুড়া, দাসপুর, কেশপুর ও চন্দ্রকোণা প্রভৃতি থানাগুলিতে সংগঠিত কৃষক সংগ্রাম দীর্ঘ বছর ধরে চলেছিল। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ডাকে "ভারত ছাড়" আন্দেলনে তাই এ-জেলার কৃষক সমাজ সারা জেলাতেই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল। তার‌পর যখন এল ১৯৪২-এর ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, মহামারি ও দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যু, তারও বিরুদ্ধে লোন, রিলিফ ও বাঁচার সংগ্রামে কৃষকরা পিছিয়ে পড়ে নি।

এই অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিপুল করভারে জর্জরিত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্য সংকটের চাপে অতিষ্ঠ মেদিনীপুরের কৃষক সমাজ, বিশেষ করে গরিব কৃষক, ভূমিহীন ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুর শ্রেণি জীবনের অভিজ্ঞতায় এক নতুন চেতনা নিয়ে এগিয়ে এল প্রাদেশিক কৃষক সভার তেভাগার জন্য নতুন সংগ্রামের ডাকে। কৃষক সভার ডাক ছিল— "এই ফসলেই তেভাগা চাই", "রসিদ ছাড়া ধান নেই"। সেজন্য "জোতদারের খামার নয়, চাষির হেফাজত খামারে ধান তোল, তেভাগার দাবি আদায় কর"। এই ডাক জেলার সমগ্র ভাগচাষ-প্রধান অঞ্চলে গরিব কৃষক ও ভূমিহীন ভাগচাষিদের সামনে বাঁচার নিশানা হিসেবে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

জেলার কৃষক নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে জেলার ভাগচাষ-প্রধান এলাকাগুলিকে ভিত্তি করে এই আন্দোলনকে দ্রুত সংগঠিত করতে এবং কৃষি মজুরদের মজুরি বাড়ানোর দাবি তুলতে হবে। আবার সংগ্রামী ভাগচাষিদের পাশাপাশি ছোট-মাঝারি রায়ত প্রজাদের সংগ্রামী

ঐক্য রাখার জন্য জমিদারদের বিরুদ্ধে "বাকী-বকেয়া খাজনা মকুব, হাজাশুকায় খাজনা ছাড়, সেচ ও নিকাশীর সুব্যবস্থার" দাবিতে খাজনা বন্ধ আন্দোলনকেও যথাসম্ভব প্রসারিত করা প্রয়োজন, যাতে বৃটিশ সরকার পুলিশ জুলুম চালিয়ে একক ভাগচাষিদের সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করতে ও দমিয়ে দিতে না পারে।

সুতরাং জেলা নেতৃত্বকে সেইমতো বিভক্ত করে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই তেভাগা আন্দোলনের দায়িত্ব পড়ে কমরেড ভূপাল পাণ্ডা, অনন্ত মাজী, সরোজ রায়, রাখাল বাগ, বঙ্কিম গিরি, পতিত জানা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কর্মীদের উপর। আরও সিদ্ধান্ত হয়, যেহেতু তমলুক মহকুমাতে বিশেষ করে নন্দীগ্রাম থানা ব্যাপক ভাগচাষ-প্রধান সেজন্য এখানেই আন্দোলনকে সুসংগঠিত করে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে হবে। ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করার জন্য ছাত্রকর্মীদল পাঠানো হয় গ্রামাঞ্চলে। মহিলা নেত্রী বিমলা মাজীকে পাঠানো হয় মেয়েদের সংগঠিত ও সংগ্রামে সামিল করার জন্য।

যেহেতু এই গরিব ভূমিহীন ভাগচাষিদের উপর সরকারি ও জোতদার-মহাজনদের শোষণের বোঝা ছিল সর্বাধিক এবং সংখ্যাগত দিক থেকে এরাই কৃষক সাধারণের অধিকাংশ, সেজন্য তেভাগার সংগ্রাম তৎকালীন অন্যান্য সব আন্দোলনকে ছাপিয়ে ব্যাপক রূপ নেয়। নন্দীগ্রাম থানায় বড় বড় জোতদার মনুচকের দেওয়ান সাহেব, কেন্দেমারীর জানা পরিবার, মহম্মদপুরের পড়ুয়া ও মাইতি পরিবার, গড়চক্রবেড়্যার খাঁ পরিবার, কালীচরণপুরের সাগরদাস পরিবার, গোপালচকের সিং পরিবার প্রভৃতির বিরুদ্ধে; মহিষাদলের মাইতি পরিবার, সুতাহাটার শ্যামাচরণ ত্রিপাঠী, পাঁশকুড়ার হরিসাধন চক্রবর্তী চৌধুরী, ময়নার আসনামের দাস পরিবার, কেশপুর-আমনপুরে চৌধুরী পরিবার প্রমুখ জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এইসব বড় জোতদারদের অধীনে ভাগচাষি-প্রধান গ্রামগুলিতে কৃষকদের সংগ্রাম কমিটি গঠন করে প্রতি মালিকের বিরুদ্ধে পৃথক আঞ্চলিক সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। আর ঐসব আঞ্চলিক সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধিদের এবং জেলা কৃষক নেতাদের নিয়ে থানা সংগ্রাম কমিটি গড়ে ওঠে, যেখান হতে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্দিষ্ট নির্দেশমতো সংগ্রাম পরিচালিত হয়। প্রতি গ্রামে সংগ্রাম কমিটির অধীনে জঙ্গী কৃষক যুবকদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী ও জঙ্গী মেয়েদের নিয়ে নারী বাহিনী গঠিত হয়।

প্রথমত, তেভাগার দাবির ন্যায্যতা, ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ, রসিদ না দিয়ে জোতদার-মহাজন শ্রেণির নির্মম শোষণের ঘটনাবলী তুলে ধরে এই অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের কৃষকদের প্রতিবাদ ও ভাগচাষিদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে হাটে-বাজারে ব্যাপক প্রচার, পোস্টারিং চলে। মাঝে মাঝে সংগঠিত কৃষক বাহিনীর লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে আন্দোলন এলাকা জুড়ে জঙ্গী কৃষক ভলান্টিয়ার মার্চ সমগ্র এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। জেলার সর্বত্র গরিব ভাগচাষিদের মনে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রামের পর গ্রামে ভূমিহীন ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরেরা এই আন্দোলনের সামিল হয়ে নিজেদের সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলে। সর্বত্রই একই আওয়াজ— "এই ফসলেই তেভাগা চাই; রসিদ ছাড়া ধান নাই; মালিকের খামার নয়, চাষির পঞ্চায়েত খামারে ধান তোল; তেভাগার দাবি আদায় কর"।

এদিকে প্রচণ্ড আতংকিত বড় বড় জোতদার মালিকগোষ্ঠী ব্রিটিশ জেলা ও মহকুমা

ম্যাজিস্ট্রেটদের দরবারে গিয়ে ধর্না দিতে থাকে, তাদের দাবি— সর্বনাশ! গ্রামের ছোটলোকদের ক্ষেপিয়ে তুলছে ঐ লালঝাণ্ডার দল, ধান নিয়ে পালাবে, আমাদের কী হবে? এখুনি পুলিশ চাই, পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করুন। হিংসা, খুনজখম, বে-আইনি লুটপাট, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করছে, দমন করুন।

বৃটিশ সরকারও তার বশংবদদের রক্ষার জন্য ত্বরিতগতিতে থানায় থানায় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠাতে থাকে। সমস্ত আন্দোলন এলাকাগুলিতেই মাঝে মাঝে পুলিশ ক্যাম্প বসে যায়— প্রধানত জোতদারের নিজ বাড়ি কিংবা কাছারিবাড়ি বা গ্রাম্য স্কুলগুলি দখল করে।

এরপর শুরু হয় মাঠের ধান খামারে তোলার সংগ্রাম। আতংকিত বড় জোতদার মালিকগোষ্ঠী এখন সমস্বার্থে ছোট-মাঝারি জমির অ-কৃষক মালিক মধ্যবিত্তদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে দিনরাত পরামর্শ চালায় কী করে এই চাষিদের একতা ভাঙা যায়— ধান নিজ খামারে আনা যায়। সুকৌশলে চলে প্রথমত একদিকে মিথ্যা প্রচার— "মালিকের খামারে যে-ধান তুলবে, সে বাকী-বকেয়া মকুব পাবে। জমি তার কায়েম থাকবে। যে না আনবে— বাকী ধানের নালিশ হবে, পুলিশ দিয়ে জেলে পাঠাব, ঘরবাড়ি লুট হবে সবংশে ধ্বংস হবে।"

অন্যদিকে— টাকা-পয়সা ঘুষ দিয়ে, দালাল ধরে সংগ্রামী কৃষকদের মাঝে আন্দোলন, নেতাদের বিরুদ্ধে প্রচার— "ওরা পালাবে, তোমরা মরবে। মালিক ছাড়া তোমাদের গতি নেই।"

দ্বিতীয়ত, চাষিদের ধান কাটতে বাধা দেওয়া নয়, কাটা ধান পুলিশ দিয়ে মালিকের খামারে তুলতে বাধ্য করা। অন্যথায় মাঠেই ধান ফেলে রাখতে বাধ্য করা।

তৃতীয়ত, মূল মূল জঙ্গী কৃষক ও নেতাদের নামে হাটে-বাজারে প্রচার করা— "ধরে দিলে পুরস্কার পাবে।"

অন্যদিকে সংগ্রাম কমিটির ঘোষণা হল— "জোতদারদের খামারে নয়, চাষির নিয়ন্ত্রণাধীন পঞ্চায়েত খামারে একত্র ধান তোল। এই ফসলেই তেভাগা চাই, রসিদ ছাড়া ধান নেই।

"সুতরাং বরাবরের মতো গ্রামকে গ্রাম একত্র মিলে একধার হতে সমস্ত ধান দিনে কাটতে থাকবে, আবার যেদিন ধান উঠবে— সর্বত্র একই সঙ্গে নিজ নিজ মাঠের ধান তুলবে গ্রাম্য পঞ্চায়েত খামারে।

"ক্যাম্পের পুলিশ এলে ধান নিজ নিজ চাষের ক্ষেতে কাটতে থাকবে— পুলিশ দূরে চলে গেলে কাটা ধান চাষির খামারে তুলে নেবে। কোনো কাটা ধান মাঠে ফেলে রাখবে না।"

এভাবে পুলিশকে এড়িয়ে বিভিন্ন মালিকের প্রায় সারা মাঠের ধান চাষিরা দলবেঁধে নিজেদের পঞ্চায়েত খামারে তুলে নিল। কিন্তু পুলিশ ক্যাম্পের পাশাপাশি কয়েকশো বিঘা জমির ধান তখন মাঠে পড়ে আছে। কীভাবে ঐ ধান তোলা হবে? মিটিং বসল থানা সংগ্রাম কমিটির। কমিটির স্থানীয় নেতারা দাবি তুলল— যে করেই হোক্ ঐ ধান তুলে আনতেই হবে, নচেৎ লালঝাণ্ডার ইজ্জৎ থাকে না। প্রয়োজনে শত শত কৃষকের জঙ্গী মিছিল দিয়ে ক্যাম্প পুলিশদের ঘেরাও করে ঐ ধান তুলে আনা চাই।

জেলা নেতা ও স্থানীয় অভিজ্ঞ কৃষক নেতাদের কয়েকজন প্রশ্ন তুলল— সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মুখোমুখি ফাঁকা মাঠে লড়াই, জয় সম্ভব কী?

কিন্তু তখন অনেকখানি জয়ে উদ্দীপিত কৃষকদের জিদ। ভোটে পাস হয়ে গেল— ঐ ধান পুলিশকে প্রতিরোধ করে তুলে আনতে হবে। স্থির হল— পরের দিন সকালেই চারিদিক থেকে

শত শত কৃষকদের মিছিল এসে পুলিশ ক্যাম্প ঘেরা হবে— ধান তোলা হবে। প্রথম বাহিনীকে পরিচালিত করবে ভূপাল পাণ্ডা। সকাল হতেই চারিদিক হতে কেন্দেমারী অভিমুখে কৃষক বাহিনীদের অভিযান এগিয়ে চলল। প্রথম বাহিনী উত্তর দিক থেকে ক্যাম্পের পাশের মাঠে ধাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোতদারদের ভাড়াটিয়া মজুরেরা দৌড়ে ক্যাম্পে পালাল। সেই সঙ্গে বেরিয়ে এল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সহ জোতদার ও তাদের গুণ্ডাদল দুদিক দিয়ে ঐ প্রথম বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। লাঠিতে লাঠিতে চলে সংঘাত-সংঘর্ষ, ফাটাপাটি-রক্তারক্তি, কয়েকজন জঙ্গী কৃষক যুবক আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

কিন্তু সময়জ্ঞানের ত্রুটির ফলে তখনো অন্যান্য কৃষক বাহিনীগুলি দূর মাঠপ্রান্তে। অবশেষে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী এই জঙ্গী কৃষক দলটিকে ঘিরে বেঁধে ক্যাম্পে আটকে ফেলে, তখন অপরাপর কৃষক বাহিনীগুলি ক্যাম্প ঘেরাও করার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসে— পশ্চিম দিকে এসে জড়ো হতে থাকে। ইতিমধ্যে থানার রিজার্ভ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীও এসে পড়ে এবং আক্রমণমুখী কৃষক বাহিনীকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য গুলী ছোঁড়ে ও এগিয়ে যায়। তখন কৃষকেরা দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়।

এই প্রথম জঙ্গী কৃষক দলটিকে গ্রেপ্তার করে জোতদার ও পুলিশ বাহিনীর মনোবল বেড়ে যায়। তখন তারা চক্রান্ত করে চাষির পঞ্চায়েত খামার ভেঙে ধান মালিকের খামারে তুলে আনার চেষ্টা করে। সেজন্য তারা প্রথম বেছে নেয় মহম্মদপুর দাসপাড়ার পঞ্চায়েত খামার এবং কয়েকদিন পরেই ঐ খামারে পুলিশ সহ জোতদার গুণ্ডাবাহিনী অভিযান করে। কিন্তু কমরেড বিমলা মাঝির নেতৃত্বে জঙ্গী কৃষক নারী বাহিনী দা, বঁটি ও ঝাঁটাসহ কোঁচড়ে ধুলোর সঙ্গে লঙ্কা নুন নিয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে যায়। খামারের মধ্যে শুরু হয়ে যায় প্রথম সংঘাত। নারী বাহিনী কোঁচড় হতে লঙ্কা ধুলো ওড়ালে পুলিশ-গুণ্ডাদল তখন চোখের জ্বালায় আতংক বোধ করে পালাতে শুরু করে— এই সময়ে লাঠিধারী ভলান্টিয়ারদের তিন-চার ব্যাচে শ্লোগান দিয়ে পাড়ার ভিতর থেকে দৌড়ে আসতে দেখে ঐ সশস্ত্র পুলিশ-গুণ্ডাবাহিনী ছুটে পালাতে বাধ্য হয়। এ-খবর ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত সংগ্রামী এলাকাগুলিতে।

এর পরদিন হতে খামারে খামারে চাষিরা প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিয়ে ধান ঝাড়াই-মাড়াই করে নেয় সমস্ত পঞ্চায়েত খামারের।

নন্দীগ্রাম-মহম্মদপুরে কৃষক নারী বাহিনীর সশস্ত্র পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর এই সম্মুখ প্রতিরোধের কৌশল জেলার সমস্ত সংগ্রামী এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র পুলিশ প্রতিরোধে কৃষক রমণীগণ অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছেন। যেমন, পাঁশকুড়ার চকগোপালে চাষিদের খামার ভাঙায় পুলিশ বাহিনীকেও বর্গক্ষত্রিয় মেয়েরা ঐভাবে ঝাঁটা-বঁটি নিয়ে প্রতিরোধ করে। শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী জোতদারকে চাষিদের সঙ্গে আপস করে ৪০ ভাগ নিতে এবং ৬০ ভাগ চাষিদের দিতে বাধ্য করে। মহিষাদল, সুতাহাটা, কেশপুর সর্বত্রই চাষিরা সংগঠন শক্তি অনুযায়ী মোট ফসলের অর্ধেকের বেশি ভাগ ও বাকী-বকেয়া মকুবে জোতদারদের বাধ্য করে।

মেদিনীপুর জেলায় এই ব্যাপক তেভাগার দাবির লড়াইয়ে জয় ঐ বছর কেশপুর থানার পাঁচখুরিতে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে বিশেষভাবে অভিনন্দন লাভ করে।

প্রাপ্তিস্বীকার : ঐ

ময়মনসিংহে তেভাগা আন্দোলনের এক অধ্যায়

আশু দত্ত

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় নীল চাষিদের ঐতিহাসিক বিদ্রোহের পর এই প্রথম এ শতাব্দীর ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগার লড়াই বাঙলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন ও গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে।

১৯৪৬ সালে একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উস্কানি ও ষড়যন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, অন্যদিকে যুদ্ধোত্তর গণ-অভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গস্রোত। এই পটভূমিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে তেভাগার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আওয়াজ ওঠে এবং গ্রাম বাঙলা বিক্ষোভের আগুনে ফেটে পড়ে। এই সংগ্রামের মাধ্যমেই শহরমুখী গণ-আন্দোলনের পরিধি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রসারিত হয়।

অবিভক্ত ভারতের বৃহত্তম জেলা অধুনা বাঙলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার জনসংখ্যার ৬০ লক্ষের মধ্যে শতকরা ৬৭ জন ভাগচাষি। তাই, এ-জেলার তেভাগার সংগ্রাম অধিকাংশ মানুষের বাঁচার লড়াই।

১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে ভিত্তি করে কলকাতায় যে রক্তক্ষয়ী, ভয়াবহ দাঙ্গা ঘটে গেল তারই প্রতিক্রিয়া তখন মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়ে গেছে। ময়মনসিংহেও সেই দাঙ্গা ও বিভেদের শক্তি নানাভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান এবং হাজং, গারো, কোচ, ডালু, বানাই, প্রভৃতি আদিবাসী কৃষকদের জমি ও ফসলের দাবিতে সম্মিলিত অভিযান আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ নেতা খোকা রায় ময়মনসিংহের তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৪৭ সালে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

"তীব্র সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও উত্তেজনার পটভূমিতে ময়মনসিংহের তেভাগা আন্দোলন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উত্তেজনা সত্ত্বেও এখানে তেভাগা সংগ্রামের মাধ্যমে এক অখণ্ড হিন্দু-মুসলিম সংহতি ও ঐক্য গড়ে ওঠে এবং এই সংগ্রাম ময়মনসিংহের চেহারা পাল্টে দেয়।"

সুতরাং সেদিন ময়মনসিংহে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন সংগঠিত করানোর পথে তেভাগার লড়াই এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই জেলায় কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহের নেতৃত্বে ইতিপূর্বেই

১৯৩৭-৩৮ সালে টংক প্রথা (ধানে খাজনা) রহিতের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গঠে ওঠে— টংক চাষিদের এই সংগ্রাম সমগ্রভাবে জেলার কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজকে উদ্দীপিত করে তোলে। টংক আন্দোলনে যেমন প্রধানত আদিবাসী কৃষকদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল তেমনি সেই সঙ্গে প্রধানত মুসলিম কৃষকরা ছিল তেভাগার লড়াই-এর পুরোভাগে। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে এই সংগ্রাম একই তরঙ্গস্রোতে এগিয়ে চলে। এবং এই সংগ্রামী ঐক্য ময়মনসিংহের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা করে।

"তেভাগা চাই, ফসল কেটে ঘরে তোল, দখল রেখে চাষ কর, টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই, জান দেবো তবু ধান দেবো না, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই", প্রভৃতি দাবিতে বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা গর্জে ওঠে এবং ১৯৪৬-এর নভেম্বরে সারা জেলায় তেভাগার লড়াই শুরু হয়ে যায়। পূর্ব-নির্ধারিত ও শুধু সংগঠিত এলাকার মধ্যেই এই সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকে নি।

কিশোরগঞ্জের চাতল ও বাঘাটা এলাকায় মাত্র ১ সপ্তাহ আগে জনৈক মহিলা সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাবাহিনীর হাতে নিহত হয়, কিন্তু ১ সপ্তাহ পরেই এই এলাকারই শতাধিক মুসলিম এবং ৪৭টি হিন্দু ভাগচাষি পরিবার জোতদারের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে স্বল্পবিত্ত জোতদারেরা কৃষক সমিতির সঙ্গে একটা আপস-মীমাংসায় পৌঁছতে বাধ্য হয়।

চাতলের কৃষক সমিতি ভাগচাষি ও জোতদারদের সমস্যা নিয়ে একটি সালিশী বোর্ড গঠন করে। ফলে ছোট ছোট প্রায় ৫০ জন জোতদার ভাগচাষিদের সঙ্গে আপস করে। বড় জোতদারেরা ভাগচাষিদের কোনো দাবি মানতে সম্মত হয় না।

এই এলাকার অন্যতম ধনী জোতদার ললিত বাগচী ও ফটিক বাগচী ভাগচাষিদের বিরুদ্ধে পুলিশের শরণাপন্ন হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমান কৃষকেরা একযোগে জোতদার বাগচীদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে এই ললিত বাগচী জেলা কৃষক সমিতির কাছে এক চিঠিতে বয়কট তুলে নেওয়ার জন্য এক আপস প্রস্তাব পাঠায়।

জেলার কৃষক আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী এলাকা কিশোরগঞ্জের মুসলিম অধ্যুষিত রসিদাবাদ, করিমগঞ্জ, নিয়ামতপুর এবং নীলগঞ্জ, প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকেরা তেভাগার দাবিতে সংগ্রাম শুরু করে এবং জোতদারদের খামারে ধান তোলা বন্ধ করে দেয়। ১৯৪৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তফশিলি সম্প্রদায়ের জনৈক কৃষক কর্মী হরনাথ মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং জোতদার ললিত বর্মনের বাড়িতে আটক রাখে এবং জোতদারদের স্বার্থে পুলিশ এই কৃষক কর্মীর সমস্ত ধান লুঠ করে নিয়ে যায়।

বাণীগ্রামেও পুলিশ অনুরূপ জুলুম চালায়। এখানে পুলিশ দাঙ্গা-বিরোধী শান্তি কমিটির নেতা অমর বাগচী, নরেন্দ্র দাস সহ অন্যান্য কৃষক কর্মীদের গ্রেপ্তার করে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাটে হাটে ঢোল দিয়ে ঘোষণা করে :

যে ভাগচাষিরা প্রচলিত নিয়ম মানবে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোনো কোনো এলাকায় পুলিশেরাই দিনমজুর হিসেবে জোতদারদের ফসল কাটার কাজে সাহায্য করতে লেগে যায়। বিশেষ করে নীলগঞ্জে এ-ঘটনা সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

এই এলাকাতেই যখন ভাগচাষিরা জমির ফসল কাটতে শুরু করে তখন একদল সশস্ত্র

পুলিশ ভাগচাষিদের কাজে বাধা দেয় এবং ফয়েজউদ্দিন, জনাব আলি এবং আর কয়েকজন চাষির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও গুরুতরভাবে তাদেরকে জখম করে।

এই সময় নেত্রকোণায় সিংহের বাংলা, মেদিনী ও বালী প্রভৃতি এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ ও রক্তচোষা জোতদারদের বিরুদ্ধে এই তেভাগার লড়াই সক্রিয় প্রতিরোধ সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। এই সংগ্রামে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরেরাও ভাগচাষিদের সংগ্রামে সামিল হয়।

এই পরিস্থিতি চলার সময় অবিভক্ত বাঙলার তদানীন্তন গভর্নর বারোজ সাহেব ময়মনসিংহ সফরে আসে এবং একটি সভায় তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেও সতর্ক করে দেয়— এই আন্দোলনের পিছনে একদল উস্কানিদাতা রয়েছে। লাট বাহাদুরের এই মন্তব্যের ৯ সপ্তাহের মধ্যেই সারা জেলাব্যাপী জোতদারদের পক্ষে এবং গরিব ভাগচাষিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক পুলিশী সন্ত্রাস শুরু হয়ে যায়। জোতদারদের ফসলের অর্ধেক দিতে অস্বীকার করার অভিযোগে ৩০০ কৃষক ও কমিউনিস্ট কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়।

সিংহের বাংলা, কলিয়াটিতে প্রায় পাঁচশো জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। নেত্রকোণার মহকুমা হাকিম জোতদারদের প্রতিশ্রুতি দেয় : ''আপনারা মামলা দায়ের করুন— আমি কমিউনিস্টদের উচিত শিক্ষা দেবো।''

এর পর ৬ ডিসেম্বর সিংহের বাংলা এলাকা জুড়ে গ্রামের পর গ্রামে পুলিশী তাণ্ডব শুরু হয়। সমস্ত এলাকা অবরোধ করে পুলিশ অত্যাচার চালাতে থাকে। ঘরে ঘরে পুলিশ তল্লাশি চালায়। এই হামলার মুখে নারীদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। নবজাত শিশু সহ জনৈকা কৃষক রমণীকে জোর করে ঘর থেকে টেনে বের করে দেয়। অন্ধ কৃষক কর্মী মহম্মদ একদিশকে প্রচণ্ড প্রহার করা হয়। এই পুলিশী অবরোধের মধ্যে কমিউনিস্ট নেতা পুলিন বক্সী ও কৃষক কর্মী মহম্মদ ফতে আলি গ্রেপ্তার হয়। ধৃত ব্যক্তিদের জামিন দেওয়া হয় নি। এই উপদ্রুত এলাকায় কৃষক নেতা মণি সিং সহ আরও ২০ জন স্থানীয় নেতার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

এই এলাকা সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টে স্থানীয় মহকুমা শাসকের এক নোট উদ্ধৃত করে বলা হয় ঃ

''কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ও উস্কানিতে কলিয়াটি ও সিংহের বাংলায় ভাগচাষিরা প্রতিটি জমির সমুদয় ফসল কেটে জোতদারদের খামারে না তুলে নিজ নিজ ঘরে নিয়ে যায়। এবং এইভাবে তারা প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে চলেছে। জমির মালিকদের অভিযোগক্রমে আমি জামিনের অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেছি।''

এই পুলিশী জুলুম ও দমননীতি সত্ত্বেও সংগঠিত এলাকার আন্দোলনের সংবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রচারিত হওয়ার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষকেরা তেভাগার লড়াই-এ সামিল হতে থাকে। তেভাগার দাবিতে কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে প্রচারিত এক ইস্তাহার পড়েই কোনো কোনো অসংগঠিত এলাকার ভাগচাষিরা তেভাগা কায়েম করে এবং কৃষক সমিতি গড়ে তোলে।

টাঙ্গাইলের গোপালপুর, সাহজানপুর, মধুপুর, নন্দনপুর সহ বহু সংগঠিত-অসংগঠিত এলাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। উল্লেখ্য যে টাঙ্গাইলেই বিশেষভাবে জোতদারেরা ভাগচাষিদের দাবি মেনে নেয়।

জামালপুর মহকুমা শহর সংলগ্ন রসিদপুর, চন্দ্রা, বগাবাইদ প্রভৃতি মুসলিম কৃষক

অধ্যুষিত ৮টি এলাকায় ভাগচাষিরা সভা-মিছিল সহকারে আন্দোলন শুরু করে। কয়েকটি এলাকায় ভাগচাষিদের দাবি স্বীকৃত হয়।

এই জেলার আদিবাসী কৃষক এলাকা নালিতাবাড়িতে তেভাগার লড়াই-এ প্রথম শহিদ হলেন সর্বেশ্বর ডালু। তেভাগার সংগ্রামে এই অগ্রণী জঙ্গী কৃষক কর্মী জোতদারের গুণ্ডার আক্রমণে নিহত হলেন।*

কৃষক নেতা সর্বেশ্বর ডালুর হত্যার প্রতিবাদে এলাকার কৃষকেরা বিক্ষোভের আগুনে জ্বলে ওঠে। জোতদারের শূন্য খামারগুলো তখন সশস্ত্র পুলিশ ঘাঁটি। বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা এই এলাকার ৩টি খামার ভস্মীভূত করে দেয়।

৮ই ডিসেম্বর সুসং-এ তেভাগার সমর্থনে ও টংক উচ্ছেদের দাবিতে ৫ সহস্রাধিক আদিবাসী-কৃষক ১৪৪ ধারা অমান্য করে এক বিরাট সমাবেশে মিলিত হয়। আন্দোলন পরিচালনার জন্য এই সমাবেশ থেকে ১০ হাজার স্বেচ্ছাবাহিনী সংগঠিত করার আহ্বান জানানো হয়।

এই সময় ভিয়েতনাম দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহ শহরে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে ছাত্রনেতা অমলেন্দু নিহত হয় এবং বি. এ. ক্লাশের ছাত্রী শ্রীমতী অনিতা ঘোষ সহ আরও কয়েকজন বুলেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়। এই গুলিচালনার প্রতিবাদে বিপুল জনতার এক স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ সমগ্র ময়মনসিংহের শাসন ব্যবস্থা অচল করে দেয়। সেদিন ময়মনসিংহের মানুষ যেন রাজপথে নেমে এসেছিল। গ্রামাঞ্চলে তেভাগা, টংক লড়াই-এর পাশে শহরের এই গণবিক্ষোভ এই জেলার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা করে।

এই সময় কুখ্যাত ব্যাস্টন সাহেব ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। গ্রাম ও শহরের এই আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ব্যাস্টন নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর মহকুমার সংগঠিত কৃষক এলাকাগুলোতে এক ব্যাপক দমননীতি শুরু করে দেয়। সেই সঙ্গে আদিবাসী এলাকায় যুদ্ধ ঘোষণার মতো নিরীহ নিরস্ত্র কৃষকদের উপর ফ্যাসিস্ট কায়দায় এক ভয়াবহ মিলিটারি ও পলিশী অভিযান চলতে থাকে। ব্যাস্টন সাহেব সমগ্র ময়মনসিংহ জেলাকে বন্দীশিবিরে পরিণত করে। বিশেষভাবে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস-এর সৈন্যবাহিনীকে পাহাড় এলাকার আদিবাসী কৃষক এলাকায় মোতায়েন করা হয়। ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস বাহিনী আর সশস্ত্র পুলিশ এলাকা অবরোধ করে এবং তাদের মিলিত অভিযান চলতে থাকে এলাকার প্রতি প্রান্তে। ফলে এই অঞ্চলে লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ, হত্যা, গ্রেপ্তার, জেল প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।

৩১ জানুয়ারি বহেরাতলী গ্রামে ব্যাস্টনের মিলিটারি-পুলিশের নির্যাতন চরম আকার ধারণ করে। ১৭ বছরের কৃষক বধূ কুমুদিনীকে পুলিশ জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তাকে রক্ষার জন্য সুরেন্দ্র ও রাসমণির নেতৃত্বে প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগ সর্বকালের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অতুলনীয় গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী।

১ ফেব্রুয়ারি ব্যাস্টনের পুলিশ বাহিনী কৃষক আন্দোলনের পীঠস্থান লেঙ্গুরা গ্রামে প্রবেশ করে এবং প্রায় ২০টি কৃষক পরিবারের ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করে দেয়। পুলিশ এখানে কৃষক নেতা ললিত সরকারের সমস্ত ধান লুঠ করে নিয়ে যায়।

৫ ফেব্রুয়ারি সুনন্দ-এ পুলিশ বাহিনী প্রখ্যাত গণনেতা মণি সিং এবং স্থানীয় কৃষক নেতা ফণি গোস্বামীর বাড়ি সম্পূর্ণভাবে তছনছ করে দেয়। এই পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তদানীন্তন অবিভক্ত বাঙলার কমিউনিস্ট প্রখ্যাত নেতা ভবানী সেন নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি দেন :

"ময়মনসিংহ, দিনাজপুর এবং বাঙলাদেশের আরও বিভিন্ন জিলায় ভাগচাষিদের উপর বেপরোয়া পুলিশী হামলা চলছে। এই ভাগচাষিরাই গায়ের রক্ত জল করে ফসল উৎপন্ন করে এবং তারা এই উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ-এর জন্য দাবি উপস্থিত করেছে। এবং সরকার নিযুক্ত ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত ফ্লাউড কমিশনও ১৯৪০ সালে ভাগচাষিদের এই দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে সুপারিশ করে।" অবিভক্ত ভারতের গণপরিষদের সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী ময়মনসিংহে মিলিটারি-পুলিশের জুলুম সম্পর্কে উল্লেখ করে গান্ধীজী, নেহরু, জিন্না ও প্যাটেলের কাছে এক তারবার্তা পাঠান। তিনি লিখেছিলেন :

"ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল গুলি চালিয়ে ময়মনসিংহ জেলার সুসং পরগণার কৃষকদের নিশ্চিহ্ন করছে। বহু নিরস্ত্র কৃষক ও কৃষক রমণীদের খুন করা হয়েছে। দুর্গাপুর, নলিতাবাড়ি, কলমাকান্দা, শেরপুর— এই ৪টি থানার বহু গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গ্রামের খাবার লুঠ করেছে, স্ত্রীলোকদের বেইজ্জত করেছে, আহত করেছে। বহু বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। মেশিনগান, টমি গান, উড়ো জাহাজ— এসব আনা হয়েছে। জনসাধারণ অভুক্ত, আহত, অরক্ষিত। আপনাদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনীয়।" এ-তারবার্তা থেকে পুলিশ ও মিলিটারির হিংস্র বর্বরতার কাহিনী সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এই জেলার মেহনতী মানুষ বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ কোম্পানির আমল থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত অসংখ্য খণ্ড-বিখণ্ড লড়াই-এর ঐতিহ্য বহন করে এনেছে।

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও সামন্ত শোষণ ও জুলুমের প্রতিবাদে এই জেলারই মধুপুরগড়ে ১৭৮১ সাল থেকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের সঙ্গে কোম্পানির সৈন্যদলের সংঘর্ষ, ১৮২৩ সালে পাগলাপন্থী টিপুর নেতৃত্বে মুসলিম ও আদিবাসী কৃষকদের অভিযান, ১৮১২ ও ১৮৬৬ সালে হাজং-গারো বিদ্রোহ এবং পরবর্তী অধ্যায়ে ১৯৩০ সালে মহাজনী জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই জেলার কিশোরগঞ্জে মহাজন-বিরোধী ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ [একটি কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী— ধরণী গোস্বামী] সেদিনের তেভাগা, টংক আন্দোলনেরই পূর্বসূরী।

ঐ তেভাগা-টংক আন্দোলন যখন আরও উচ্চস্তরের সংগ্রামের মাধ্যমে আমূল ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে বৈপ্লবিক পদক্ষেপে এগিয়ে চলছিল তখনই হল দেশভাগ। বিদেশী শাসন-ক্ষমতা আপসে হস্তান্তরিত হল দেশীয় শাসকদের হাতে। কিন্তু গভীর ক্ষোভ ও লজ্জার কথা, আজও চাষিদের মৌলিক দাবি প্রতিষ্ঠিত হল না। সেদিন বাঙলার দিকে দিকে তেভাগার দাবিতে এবং টংক উচ্ছেদের জন্য কৃষক অভ্যুত্থানের সেই স্মরণীয় আগুনঝরা দিনগুলোর কথা বাঙলার মেহনতী সংগ্রামী মানুষ কোনোদিন ভুলবে না।

প্রাপ্তিস্বীকার : ঐ

টিকা : সমগ্র জেলা ব্যাপী তেভাগা লড়াইয়ের প্রথম শহিদ ছিলেন দিনাজপুরের সমিরুদ্দীন ও শিবরাম মাঝি (৪-১-৪৭)। কিন্তু ময়মনসিংহ জেলার প্রথম শহিদ হয়েছিলেন সর্বেশ্বর ডালু (৩১-১-৪৭)। (- সম্পাদক)

জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে শ্রমিক-কৃষকের রক্তের রাখীবন্ধন

বিমল দাশগুপ্ত

১৯৪৬ সালের ৬-৭-৮ ডিসেম্বর আসামের লামডিং-এ 'বেঙ্গল-আসাম রেলরোড ওয়ার্কার্স' ইউনিয়নের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাবে বলা হল : "বাঙলা ও আসামের কৃষকরা ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য তেভাগা আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। এই সম্মেলন মনে করে যে যে-সমস্ত জমির মালিকরা ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থায় তাঁহাদের ন্যায্য অংশগ্রহণ করেন না, তাঁহারা ফসলের এক-তৃতীয়াংশের বেশি পাইবার অধিকারী নহেন।..."

গ্রামের গরিব ভাগচাষিদের সমর্থনে রেল শ্রমিকদের এই প্রস্তাব শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের উৎসমুখ খুলে দিল। শুধু তাই নয়, ভাগচাষিদের দাবির জন্য রেল শ্রমিকরা ও চা-শ্রমিকরা বুকের রক্ত ঢেলে জলপাইগুড়ির ড়য়ার্স অঞ্চলে সেদিন শোষণের বিরুদ্ধে গণবিপ্লবের যে উৎসমুখ খুলেছিল তার কাহিনী চিরস্মরণীয়।

জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা আন্দোলনের একটি বিরাট অঞ্চল ছিল বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ, সুন্দরদীঘি প্রভৃতি যা বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। তিস্তার ওপারে ডুয়ার্স অঞ্চল ছিল তখনো অসংগঠিত। মালবাজারে রেল শ্রমিকদের ইউনিয়ন অফিসে একদিন কয়েকজন ট্রাইবাল এসে বললেন তাঁরা ওদলাবাড়ি থেকে এসেছেন লালঝাণ্ডার ইতিহাস জানবার জন্য। তিস্তার ওপারে তেভাগার সংগ্রামে মাধব দত্তের মাথা ফেটেছে এই সংবাদ তাঁরা পেয়েছেন। আর জেনেছেন তাঁদের সংগ্রামের সমর্থনে আছে রেলরোড শ্রমিক ইউনিয়ন। সুতরাং তাঁদের ঐ আগমন। ইউনিয়ন অফিস থেকে তাঁদের একটি লালঝাণ্ডা দিলেন কমরেড পটল ঘোষ। আর বলা হল ৩ মার্চ দোমহনীতে শ্রমিক ও কৃষকের যুক্ত সভা— সেখানে তাঁদের যেতে হবে।

দোমহনীর সেই সভা শুধু সভা হল না, সারা ডুয়ার্সের রেল শ্রমিক, চা-শ্রমিক এবং ভাগচাষি ও কৃষকদের উত্তাল তরঙ্গ উঠল। লালমণিরহাট থেকে মাদারীহাট এই দুশো মাইল রেলপথের উপর ডুয়ার্সের জনজীবন ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিনা পয়সায় নয়— টিকেট করে। ট্রেন, আরও ট্রেন, স্পেশাল গাড়ির জন্য সে কী চাপ! শেষ পর্যন্ত চা চালান দেবার বগিগুলি কর্তৃপক্ষ দিল। তাতেও ধরে না। পায়ে হেঁটে রওনা হল শত শত। মেয়েরা চলেছে পিঠে বাচ্চা বেঁধে। ছেলেদের কাঁধে তীর-ধনুক, টাঙ্গি, মাথায় চিঁড়ে-মুড়ির পোঁটলা।

ঐ সভার পরই হাতেনাতে তেভাগা। রেলের পয়েন্টম্যান মণি সিং। প্রথমে সাতদিনের

ছুটি নিয়ে তেভাগা করতে বেরোলেন। তাঁর সাথে মূর্তি গ্যাং-এর বুধন, চলসা গ্যাং-এর গুটি, ট্রাফিক জমাদার যদুনাথ সিং এবং আরও অনেকে। মণি সিং চলতেন আধা-মিলিটারি বেশে। পায়ে বুট, মোটা ফুল মোজা, পরনে খাকি হাফ প্যান্ট, গায়ে গরম মোটা ওভারকোট আর টুপি। ওভারকোট ছিল শীতের বিছানা। মাসখানেক পরে একদিন এক গ্যাং কোয়ার্টারে মণি সিং-এর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়েছিল। মণি সিং-এর সেই সাতদিনের ছুটি চাকরি থেকে চিরদিনের ছুটিতে পরিণত হয়েছিল।

বাতাবাড়ি, পাগলা দেউলিয়াবাড়িতে প্রথম তেভাগা হয়েছিল। এখানকার কর্তব্য সম্পাদনের পর বাতাবাড়ি চা-বাগানের মধ্য দিয়ে নদী পার হয়ে বাহিনী প্রবেশ করেছিল নেওড়া মাঝিয়ানাথীতে। এখানে শিবির স্থাপিত হয়েছিল বালগোবিন্দের মাঠে— যার নাম রাখা হয়েছিল পলাশীর মাঠ। ডুয়ার্সের তেভাগা আন্দোলনে প্রথম গুলি চলেছিল এখানে। ৪ জন মারা যান— আহত হন ২২ জন। হতাহতের মধ্যে ছিলেন ওদলাবাড়ি চা-বাগানের একাধিক শ্রমিক— পাতরাস মাঝি, বুধু উরাও, কর্মা খাড়িয়া, লছমন সিং।

মহাবাড়ি গয়ানাথের খোলানে তেভাগা আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। মেটেলি থানার মহাবাড়ি থেকে মাল থানার পানোয়ার বস্তি পর্যন্ত প্রায় আট মাইল রাস্তা জাম করে তেভাগার সংগ্রাম তুঙ্গে উঠেছিল। পুলিশ গুলি চালাল। এখানেও নিহত হলেন ৪ জন— আহত ৭ জন। নিহতদের মধ্যে একজন ছিল ৮ বছরের কিশোর। তার হাতে ছিল লালঝাণ্ডা। বালকটি যখন লুটিয়ে পড়ল তখন কৃষকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশের উপর। তাদের রাইফেল কেড়ে নেওয়া হল, ভেঙে ফেলা এবং কয়েকটা লুকিয়ে ফেলাও হল। গুলিতে আহতদের মধ্যে একজন আজও আছেন ওদলাবাড়িতে। নাম বুনী উরাও। দীর্ঘদিন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে ভুগছেন। গুলি খাওয়া আর এক কমরেড পুরিয়া মানকী মুণ্ডা মারা গেছেন ...। রেলের ট্রাফিক জমাদার যদুনাথ সিং ১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনি হবার পর আত্মগোপন করেন এবং সেই অবস্থার মধ্যেই টি-বি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

আত্মগোপন করে চলার অবস্থায় পটল ঘোষ ও আমি একদিন পল্লীর এক রেললাইনের উপর একজন কৃষককে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের চেনার পর সে আনন্দে আত্মহারা। ঘরে নিয়ে চা দিল, চিঁড়ে দিল। পরে একটি ভাঙা রাইফেল এনে বলল যে তার ছেলেকে পুলিশ খুন করেছিল বলে আজও সে পুলিশের এই রাইফেল লুকিয়ে রেখেছে।

ফসলের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রামে কীভাবে রূপ নিল তার কাহিনী মাল থানা ঘেরাও।

খবর রটেছিল যে তেভাগা সৈনিকদের একজনকে মাল থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় রেখেছে। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুতের মতো। প্রায় হাজার দশেক শ্রমিক-কৃষক মাল থানা ঘেরাও করে মাল-মঙ্গলবাড়ি রোড জাম করে রইল ঘন্টার পর ঘন্টা। জলপাইগুড়ি শহর থেকে এস পি রওনা হলেন মাল থানার দিকে। কিন্তু মাল থানায় আসার প্রধান সড়ক ৫|৬ মাইল পথ তেভাগা সৈনিকগণ জাম করে থাকায় চালসার কাছে এস পি সাহেবের জীপগাড়ি আটক পড়ে গেল। তেভাগা সৈনিকরা এস পি সাহেবকে বলে দিল— প্রবেশ নিষেধ। খবর এল মালবাজারে নেতাদের কাছে। নেতাদের নির্দেশ চাইছে তেভাগা সৈনিকগণ। নির্দেশ গেল, এস পি-র সাথে যদি কোনো সশস্ত্র পুলিশ থাকে, তাদের আটকে রেখে এস পি-কে আসতে দাও। এস পি-র মাথার টুপি খোলা হল এবং পায়ে হেঁটে যেতে বলা হল। জীপগাড়ি খালি

অবস্থায় পিছে পিছে চলেছে। থানায় এসে এস পি সাহেব নেতাদের ডেকে থানার সব ঘর দেখালেন। তেমন কোনো লোক আটক ছিল না। তখনি নেতারা বুঝিয়ে বলায় ঘেরাও তুলে নিয়ে সকলে চলে যায়।

পরের দিন ছিল রবিবার। জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার সাহেব মাল থানায় এসে নেতাদের ডাকলেন আলোচনা করার জন্য। সোমাদা (সমর গাঙ্গুলী) গেলেন না; অনেক সন্দিগ্ধ মনে পটলবাবু ও ননী ভৌমিক গেলেন। কিন্তু তাঁদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হল এবং ১৪৪ ধারা জারি করে পুলিশ ও মিলিটারিতে ছেয়ে ফেলা হল মালবাজার ও তার চতুর্দিক। ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হল। নেতাদের ডেকে নিয়ে এই গ্রেপ্তার কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতারও একটি দৃষ্টান্ত।

প্রাপ্তিস্বীকার : ঐ

সহায়ক তথ্য - ৯

যশোরের মুক্ত অঞ্চল

পলাশ রায়

১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলনের সময় মুক্ত অঞ্চল কথাটি প্রথম প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমান তরুণ সমাজের কাছে কথাটা নতুন মনে হলেও পুরোনোদের কাছে কথাটি পুরোনো। কিন্তু এখনকার মুক্ত অঞ্চলের ধারণার থেকে পুরোনো মুক্ত অঞ্চলের ধারণা ছিল পৃথক। এখন মুক্ত অঞ্চল পার্টিভিত্তিক। তখন ছিল শ্রেণিভিত্তিক। তখনকার মুক্ত অঞ্চলে নিষিদ্ধ ছিল জমিদার, সুদখোর, পুলিশের গতিবিধি। এখন অন্য দলের কর্মীদের চলাফেরা, কথা বলা নিষিদ্ধ।

যশোরে ঐরূপ মুক্ত অঞ্চল ছিল এগারখান, বড়েন্দার, দুর্গাপুর, পাঁজিয়া, কেশবপুর, মণিরামপুর প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে বিরাট এলাকা। লালটুপি পরিহিত স্বেচ্ছাসেবীরা দিন ও রাত সদাসতর্ক প্রহরীর কাজ করত।

১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি কোনো একটি দিন। সকালে উঠে পার্টি অফিসের কাছেই একটি চায়ের দোকানে গেছি। দোকানি ওসমান বলল, "আপনি এখনও এখানে বসে আছেন— ওদিকে ভোরবেলায় কয়েক গাড়ি রাইফেলধারী পুলিশ দুর্গাপুরের দিকে গিয়েছে।" ছুটলাম দুর্গাপুরের দিকে। তিন মাইল রাস্তা ছুটেই চললাম। আমি জানতাম কমরেড নূরজালাল ও অমল সেন জেলা কমিটির গোপন জরুরি সভায় যোগদানের জন্য কোথায় চলে গেছেন। দূর থেকেই শ্লোগান ও জয়ঢাকের আওয়াজ কানে আসছিল। নিয়ম ছিল মুক্ত অঞ্চলে পুলিশ বাহিনী প্রবেশ করলে জয়ঢাক পিটিয়ে সংকেত করা— যাতে সেই আওয়াজ শুনে আশেপাশের গ্রামেও জয়ঢাক পেটাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা অঞ্চল সতর্ক হয়ে যাবে।

জয়ঢাকের আওয়াজ তখন থেমে গেছে— গ্রামের লোকজন মাঠে নেমে এসেছেন। অনেকের হাতে ঢাল-সড়কিও আছে। সকলেই নির্দেশের অপেক্ষা করছে। কিন্তু কে সেই নির্দেশ দেবেন— কী নির্দেশ দেবেন? যাই হোক, যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে এগিয়ে চললাম যেদিকে পুলিশ গিয়েছে। বেশিদূর যেতে হল না। খানিকটা এগিয়ে রাস্তায় বাঁক ফিরতেই দেখলাম পুলিশ মার্চ করে ফিরে আসছে। আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে আশেপাশের গ্রামের মানুষরাও তাঁদের হাতিয়ার নিয়ে জড়ো হতে শুরু করেছেন। পুলিশ বাহিনী আমাদের থেকে মাত্র ৪০|৪৫ হাত দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথা গুনে দেখলাম প্রায় ৭০ জন হবে, তার মধ্যে কয়েকজন পুলিশ অফিসারও আছেন— যাঁদের আগে নড়াইলে দেখিনি। আমাদের বাহিনীতে তখন ক্রমেই লোক বাড়ছে, পুলিশ বাহিনী প্রায় ঘেরাও হয়ে

গেছে। এই বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সামনে আমরা কী করব, কী আমাদের করা উচিত ভেবে স্থির করতে পারছি না— অর্থাৎ সশস্ত্র সংঘাতের মধ্যে যাওয়া উচিত হবে কিনা ভেবে পাচ্ছি না— এমন সময় পিছন থেকে পিঠে হাত রেখে কমরেড নূরজালাল হাসিমুখে বললেন, "কী কমরেড, ভয় পাচ্ছেন নাকি?" কমরেড নূরজালাল কখন যে ভীড়ের মধ্যে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারিনি— তাঁর কথায় হেসে ফেললাম। বললাম, "ভয় করছিল না এমন কথা বলব না, তবে এখন আর ভয় করছে না।" বস্তুতপক্ষে কমরেড নূরজালালকে দেখে আশ্বস্ত হলাম।

কমরেড আমার হাত ধরে একটা তালগাছের কাটা গুঁড়ির উপর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল। একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, "আপনারা রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়াবেন না— পুলিশকে যাবার পথ করে দিন।" কমরেড নূরজালালই জবাব দিলেন, "আগে পুলিশ বাহিনীকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে কেন কৃষকের বাড়িঘর লুঠ করা হয়েছে, কেন তাঁদের বাড়ি তছনছ করা হয়েছে, কেন কৃষক সমিতির অনুমতি না নিয়ে এই অঞ্চলে আপনারা প্রবেশ করেছেন? যতক্ষণ এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব কৃষকরা না পাবেন ততক্ষণ পুলিশ বাহিনীকে তাঁরা যাবার কোনো রাস্তাই দেবেন না।" এরপর আর একজন অফিসার এসে একটু মিষ্টি করে বললেন, 'অযথা রিস্ক নিচ্ছেন কেন? পথ ছেড়ে দিন। দেখছেন তো এতগুলো আর্মড পুলিশ রয়েছে— মাথা ঠাণ্ডা করুন, পথ ছেড়ে দিন।" কিন্তু নূরজালাল সাহেবের এক কথা, "পুলিশকে আগে জবাবদিহি করতে হবে।" অফিসার ফিরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। আমি কমরেডকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি একটা শো অফ্ স্ট্রেংথ চান?" কমরেড নূরজালাল হেসে জবাব দিলেন, "দেখা যাক, ওরা কী করে।" আমাদের চারপাশে তখন বেশ কয়েক শত স্বেচ্ছাসেবক জমা হয়ে গিয়েছেন— হাতে তাঁদের বিভিন্ন হাতিয়ার। এঁদের মধ্যে যাঁদের কাছে ঢাল-সড়কি ছিল তাঁরা সামনের দিকে এগিয়ে এসেছেন। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ অফিসারগণ অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিলেন। দেখা গেল রাইফেলধারী পুলিশরা সামনে-পিছনে করে দুটি সারিতে বসে রাইফেল তুলে নিশানা ঠিক করছে। কমরেড নূরজালাল নির্দেশ দিলেন, "যাঁদের কাছে ঢাল-সড়কি আছে তাঁরা প্রস্তুত হোন।" দেখলাম তাঁরাও পুলিশের মত সুশৃঙ্খলভাবে ঢালের আড়ালে হাঁটু ভেঙে বসে নিশানা ঠিক করছেন। কঃ নূরজালাল, কঃ ভোলানাথ বিশ্বাস এবং আমি সেই কাটা তালগাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। চরম উত্তেজনাময় মুহূর্ত। ভেবে দেখলাম পুলিশ গুলি চালালে প্রথমেই আমরা তিনজন তার শিকার হব। কিন্তু তখন আর পিছিয়ে যাবার কথা কেউ কল্পনায়ও আনতে পারলেন না। পুলিশের একজন অফিসার চিৎকার করে উঠলেন, "ফায়ার!" সাথে সাথে বজ্র নির্ঘোষে কমরেড নূরজালাল হাঁক ছাড়লেন "কমরেডস্, একটা গুলির শব্দ হলে ওদের সবকটাকে আপনারা সড়কি দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবেন— মনে রাখবেন ওদের বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে কিন্তু আপনাদের বড় বড় সড়কিগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।"

ভাবছিলাম এখুনি হয়তো আমরা তিনজন সহ বেশ কয়েকজন রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ব— বাঁচব কি মরব পরের কথা। প্রতিটি সেকেন্ডে মনে হচ্ছে যেন সুদীর্ঘ এক-একটি যুগ। শ্লোগান বন্ধ হয়ে গেছে। সব নিস্তব্ধ। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল, গুলির আওয়াজ হল না। অফিসারটা আবার চিৎকার করে উঠলেন, "ফায়ার!" কিন্তু না, এবারেও গুলির আওয়াজ

হল না। অফিসারটি এবার ক্ষেপে গেলেন— "ফায়ার! ফারার!" করে কয়েকবার চিৎকার করলেন, তবুও গুলি চলল না। দেখা গেল পুলিশ বাহিনী উঠে দাঁড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো হল, তারপর রাস্তার পাশে একটা বড় আম গাছের তলায় আশ্রয় নিল। আমাদের কাছে পুরো ঘটনাটাই যেন অবিশ্বাস্য এবং অপ্রত্যাশিত মনে হল। কিছুটা সময় পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া কেউ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। স্তব্ধতা ভেঙে কঃ নূরজালালের কণ্ঠস্বর শুনলাম, "কমরেডস্, পুলিশ গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। এই সমস্ত গরিব পুলিশ চাকরির জন্য বন্দুক ঘাড়ে করে এখানে এসেছেন সত্য কথা, কিন্তু এঁরাও আপনার আমার মত গরিব চাষির সন্তান— ঘরে খাবারের অভাবের জন্যই পুলিশে চাকরি নিয়েছেন। আজ যখন আমাদের উপর গুলি চালাতে পুলিশ অফিসারটি ওদের হুকুম করছিল— ওঁদের চোখে তখন ভেসে উঠছিল ওঁদের গ্রামের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা, যারা আমাদের মতোই চাষি— তাই বন্দুকের ঘোড়া টিপতে ওঁদের মন রাজী হয় নি...।"

এর দুদিন বাদে "স্বাধীনতা" পত্রিকাতে প্রকাশিত হল "নড়াইলে কৃষক জনতার উপর পুলিশের গুলি চালাতে অস্বীকার" শীর্ষক একটি সংবাদ।

প্রাপ্তিস্বীকার : ঐ

মৌভোগ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি

সুবল মিত্র

তেভাগা আন্দোলনের ইতিকথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে ১৯৩২ সালের সারা বাঙলা তথা ভারতের অর্থনৈতিক সংকট। বিশেষ করে বাঙলাদেশের চাষিদের দুরবস্থা, চাষিদের উৎপন্ন ফসল মূলত পাট ও ধানের মূল্য দারুনভাবে নেমে যায়। ধানের মূল্য প্রতি মণ নয় আনা-দশ আনা ও পাটের মূল্য এক টাকা চার আনা থেকে দেড় টাকার মধ্যে ছিল। তার উপর জমিদারদের নির্মম অত্যাচার, সামান্য খাজনার দায়ে কৃষকের শেষ সম্বল এক বিঘা দুই বিঘা জমি নিলামে হাতছাড়া হয়ে গেল, এমন কি বাস্তুভিটাটুকু পর্যন্ত নিলামে উঠল।

প্রথম কৃষক সম্মেলন

ঠিক এই অবস্থায় খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত ফকিরহাট থানার মৌভোগে ১৯৩৬ সালে কৃষক সভার নেতৃত্বে প্রথম জেলা সম্মেলন হয়।

১৯৩৬ সালের বসন্তকালে মৌভোগের খেলার মাঠে হাজার হাজার কৃষক জড়ো হয়েছেন নেতৃবৃন্দের কথা শোনার জন্যে। চারিদিকে পুলিশ। হাজার হাজার কৃষক মাঠের মধ্যে প্রবেশ করলেন হাতে লালঝাণ্ডা নিয়ে। পুলিশ ২|১ জায়গায় লাঠি চালাল, কিন্তু কৃষকদের রুদ্রমূর্তি দেখে পুলিশ পিকেট তুলে নিল। এমন অবস্থায় কৃষক সম্মেলন শুরু হল। প্রথমে যতদূর মনে পড়ে বঙ্কিমদা (বঙ্কিম মুখার্জি) বক্তৃতা করেন। তাঁর সেই তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা আজও আমার মনে শিহরণ জাগায়। পরে ডঃ ভূপেন দত্ত সোভিয়েতের বিপ্লবের ইতিকথা এবং কৃষক-মজদুর রাজ কায়েম হবার কথা বললেন। তখন সমস্ত কৃষকদের মধ্যে যে আনন্দ ও উৎসাহ দেখেছিলাম এখন তা মনে হয় স্বপ্ন।

সম্মেলন শেষ হলে আমরাও গ্রামে গ্রামে বৈঠক মিটিং শুরু করলাম। আমার জীবনে কৃসকদের ভেতর প্রথম বৈঠকের কথা লিখছি। শচীন বসু আমাকে সাথে করে নিয়ে গেলেন কৃষক পল্লী সিন্দুরডাঙায়। সেখানে গিয়ে পরিচিত হলাম মহেন্দ্র খাঁ (যিনি দীর্ঘদিন বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির সর্বসময়ের কর্মী ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে পাঁচ টাকা ভাতা দিত। তাতে তাঁর পরিবারের সকলকে অধিকাংশ দিন না খেয়ে থাকতে হত কিন্তু পার্টির কাজে তাঁর কোনো দুর্বলতা ছিল না। সব সময় পার্টির কাজ হাসিমুখে করে যেতেন। ১৯৪৯ সালে দারুণ দুরবস্থার মধ্যে বিনা চিকিৎসায় বর্তমান বাংলাদেশে স্বগ্রামে মারা যান।), সহদেব মণ্ডল,মধু মোল্লার (বলোটি গ্রামের বড়দা, যিনি বিখ্যাত লেঠেল ছিলেন, জমিদারদের ভাড়া করা লেঠেল

হিসেবে বহু কৃষকের মাথা ভেঙেছেন খুনও দু-একটা করেছেন। আজ তিনি কৃষক সভার কর্মী। এই এলাকার সমস্ত হিন্দু-মুসলমান লেঠেলদের জড়ো করছেন কৃষক সভার আদর্শে) এই সব ব্যক্তিদের সঙ্গে। এছাড়া আরো অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। আমিও বয়সে তরুণ, লেঠেলদের পরিচয় পেয়ে আনন্দের আর সীমা রইল না। মিটিংয়ে অনেক আলোচনা হল, সব কথা মনে নেই। অনুমান রাত ১২ টায় মিটিং শেষ হল, তখন মহেন্দ্র খাঁ আমাকে খাবার জন্য ডাকলেন। ডাক শুনে আমি চমকে উঠলাম, শচীন বসু (খোকাদা)কে চুপি চুপি বললাম, 'নমশূদ্র ও মুসলমানদের সঙ্গে বসে খাব? এটা কি সম্ভব?' শুনে খোকাদা কড়া ধমক দিলেন এবং চুপি চুপি বললেন, 'বিপ্লবীদের কাছে জাত নেই।' আমি বললাম, 'মা টের পেলে ঘরে ঢুকতে দেবেন না।' খোকাদা জানতেন আমার মা হিন্দুর ঘরের বিধবা, আমাকে বললেন, 'তোর মা জানতে পারবে না।' আমি খেতে বসে চুপ করে বসে আছি এমন সময় মধু মোল্লা বলে উঠলেন, 'কমরেড আজ আপনার জাত গেল। এখন আর আপনি কায়েত নেই অর্থাৎ আপনি এখন আমাদের জাতি, কৃষকের বন্ধু।' হঠাৎ এই কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম, সামলে কলার পাতায় হাত দিলাম। কিন্তু রান্না যে কী বস্তু হয়েছিল তা আজও আমার মনে আছে, তেলছাড়া মাছ যে খাওয়া যায় ঐদিন বুঝলাম। এই দেশে এমন মানুষ আছে, যারা তেল-মশলা ছাড়া মাছ খায়। সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে গেলাম : খোকাদা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? দেশের লোক এত দরিদ্র, কোনো রকমে নুন আর জল দিয়ে মাছ সিদ্ধ করে তাই দিয়ে মোটা ভাত খায়। এরাই তো আমাদের অন্ন জোগাড় করে। হায়রে অদৃষ্ট। এই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়িতে গেলাম। রাত্রের বাকী সময় ঘুম হল না। ভাবলাম মা যদি টের পায় তবে তো আর রক্ষা নেই, বাড়িছাড়া করে ছাড়বে।

যাই হোক, বেশ কিছুদিনের মধ্যে মা জেনে গেলেন, আমি মুসলমান ও নমশূদ্রের বাড়ি খাই। মা আমাকে ঘুরে ঢুকতে দিতেন না, তুলসী জল মাথায় দিতেন। তখন আমি ভাবতাম মাকে যদি এই সংস্কার থেকে মুক্ত করতে না পারি তবে কাজ করা সম্ভব হবে না। পরবর্তীকালে মাকে সংস্কারমুক্ত করেছিলাম শুধু তাই নয়, বহু নমশূদ্র ও মুসলমান কৃষককে মা নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছেন, এমন কি ঘরে শুতেও দিয়েছেন।

হাটে তোলাবন্ধের ডাক

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধার শুরুতে আমাদেরও দায়িত্ব গেল বেড়ে। গোপন পার্টি ঠিক করল যুদ্ধে যাতে সাম্রাজ্যবাদ কোনোরূপ সাহায্য না পায় তার জন্য কৃষকদের ভেতরে প্রচার করতে হবে। শুধু প্রচার নয়, সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাই কৃষক সভা থেকে ঠিক হল, সমস্ত হাটে-বাজারে জমিদারের যে তুলনাহীন অত্যাচার ছিল তার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের অঞ্চল বেছে নিলাম : মানসার হাটে বে-আইনি তোলা ও খাজনা বন্ধ আন্দোলন করব। শুরু হল গ্রামে গ্রামে বৈঠক। মুসলমান-প্রধান গ্রাম ঘোজাডাঙায় সভা হবে সকালবেলায়। আমি আর সুনীল ঘোষ প্রচারে বেরিয়ে পড়লাম। বিখ্যাত লেঠেল পাঞ্জু শেখের বাড়িতে সভা হবে। সবকিছু গোপনে ব্যবস্থা করতে হল কারণ কমিউনিস্ট নেতা শচীন বসু ও

অজিত ঘোষ উপস্থিত থাকবেন। পাঞ্জু শেখ গ্রামে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন। আশ্চর্য হয়ে গেলাম পাঞ্জু শেখের পাহারা দেবার ব্যবস্থা দেখে : ৮|১০ বৎসরের ছোট ছোট কৃষকের সন্তান গ্রামের আশেপাশে ও রেললাইনের পাশে ছোট ছোট বাঁশের লাঠি নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

যাই হোক, মিটিং হল। চাষিরা সবাই মিলে ঠিক করল রবিবার থেকে আর তোলা-খাজনা দেবো না। প্ল্যানও ঠিক হল। কিন্তু জোয়ান কৃষক হাটের আশেপাশে লাঠি নিয়ে পাহারা দেবে। জমিদারের লেঠেল এলে জবাব এরা দেবে। এইসব বন্দোবস্ত করবেন পাঞ্জু শেখ। পাঞ্জু শেখের স্ত্রী মারা গেছেন, তাঁর ছোট মেয়ে রান্না করেছে পেঁয়াজের কলি দিয়ে পুঁটি মাছ। অপূর্ব রান্না, আজও মনে আছে। মনে পড়ে অত দুরন্ত লেঠেল পাঞ্জু শেখ, কিন্তু ছোট মেয়ের কাছে একেবারে শিশু। বার বার আমাদের কাছে বললেন, 'জানেন কমরেড, অনেক মানুষ আমি খুন করেছি, ডাকাতি করেছি। কিন্তু খোকাদার (শচীন বসু) সাথে আলাপ হবার পর এবং এই ছোট্ট মেয়েটার জন্য সব আমি ছেড়ে দিয়েছি। খোকাদার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে আর ঢাল-সড়কি ধরব না। আর মেয়েকে বলেছি, মা, আমি আর অন্যায় করে টাকা আনব না।' তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন অন্যায় করেন নি।

জমিদারদের গুণ্ডার হাতে অন্ধকার রাতে এই পাঞ্জু শেখ একদিন খুন হন।

হাটে তোলাবন্ধ আন্দোলনে আমরা সফল হলাম, কিন্তু বহু মামলা এবং জমিদারদের লাঠির দাগ অনেকের গায়ে বসে গেল।

তেভাগা শুরু

১৯৪০ সাল ধানগাছে ফুল ধরেছে। আমাদের গ্রাম্য বৈঠক শুরু হয়েছে।

গ্রাম্য বৈঠক হচ্ছে বলোটি গ্রামে। উপস্থিত ছিলেন ডোবার বিভূতি রায়, আমিও উপস্থিত ছিলাম। প্রভাত মুখার্জি, মহেন্দ্র খাঁ, সহদেব মণ্ডল, মধু মোল্লা আরও অনেকে এসে ঐ সভায় বললেন, এবার আধাআধি ফসল জমির মালিককে দেবো না। এবার তিন ভাগের দু-ভাগ চাষির, এক ভাগ মালিকের, এই কথা শুনে আমরা চমকে উঠলাম। কথাগুলি বললেন প্রভাতবাবু, সায় দিলেন অন্য যাঁরা এসেছেন তাঁরা। বিভূতিবাবু শুধু বললেন, এত বড় একটা ব্যাপারে এক্ষুণি সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। বিভূতিবাবু নেতা, কৃষকের ঘরের সন্তান। কিন্তু প্রভাতবাবু বললেন, ব্যাপারটা জরুরি। কৃষকদের বাঁচাতে হবে। এই অঞ্চলের সব গ্রাম্য সভা ফসল পাকার আগে শেষ করতে হবে। সভাগুলি হবে গোপনে। সভার অধিকাংশ ছিল কৃষক (৫০জন উপস্থিত ছিলেন)। তাঁরা স্থির করলেন, এক মাসের ভিতর গ্রাম্য সভা শেষ করে সিদ্ধান্ত নেব— তেভাগা হবে কি না।

সাথে সাথে ঠিক হয়ে গেল কোন কোন গ্রামে সভা হবে। খুলনার সদর থানার এলাকায় যথাক্রমে আলাইপুর, পিঠেভোগ, ঘাটভোগ, সিন্দুরডাঙা, কাজদিয়া, সামন্তসেনা, লকপুর, তিলক, প্রভৃতি গ্রামে; ফকিরহাট থানার অন্তর্গত গ্রামগুলি যথাক্রমে মৌভোগ, নলধা, ব্রহ্মডাঙা, লালচন্দ্রপুর, ঘোজাডাঙ্গা, সাতবেড়ে, আরোডাঙা, স্বল্প বাহিরদিয়া, মূলঘর, আটটাকা প্রভৃতি গ্রামে গ্রাম্য বৈঠকের ব্যবস্থা হল। দায়িত্ব পড়ল মণি বসু (পরবর্তীকালে খুলনা জেলার কৃষক সভার সম্পাদক হয়েছিলেন), প্রভাত মুখার্জি, বিমল ঘোষ, সনৎ বসু, সুনু ঘোষ,

অজিত ঘোষ প্রভৃতির উপর। সুষ্ঠুভাবে গ্রামে সভা হল। পুলিশের আনাগোনা বেড়ে গেল, কিছু গ্রেপ্তার হলেন, আর আমরা সব গা-ঢাকা দিয়ে কাজ করতে লাগলাম। সংঘর্ষও কয়েক জায়গায় হল। কিন্তু তেভাগার খবর আগুনের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মধ্যবিত্তরা আতঙ্কিত হলেন, কেউ কেউ পুলিশের আশ্রয় নিলেন, আমাদের নামে থানায় ডায়েরী করলেন। আই বি দফতর সজাগ হয়ে উঠল। ঠিক এই অবস্থায় ঠিক হল, সমস্ত কৃষকদের জড়ো করে প্রথম ধানকাটা হবে বলোটি গ্রামে। কৃষক সভার লেঠেলরা পাহারা দেবার দায়িত্ব নিলেন।

শীতের রাতে মশাল জ্বেলে প্রায় ৫০০ কৃষক মাঠে নেমে পড়লেন ধান কাটতে। জমিদারদের লেঠেল এল, আমরাও তৈরি ছিলাম। হল সংঘর্ষ, জমিদারের লেঠেল পালিয়ে গেল, সড়কি ও লাঠির আঘাতে আহত হলো অনেক কৃষক।

পরের দিন পুলিশ এসে গ্রাম ঘিরে ফেলল। কোনো বয়স্ক পুরুষ বাড়ি না থাকায় কিছু মহিলা ও শিশুকে ধরে নিয়ে গেল।

এরপর আমরা ঠিক করলাম, একসাথে অনেকগুলি গ্রামে ধানকাটা হবে, ধানকাটাও হল। সংঘর্ষ ও গ্রেপ্তার হতে থাকল, কৃষক সভার পক্ষ থেকে খুলনার উকিল সত্যেন সেন, ও বাগেরহাটের উকিল বিভূতি ঘোষ (গোখেলদা) কৃষকদের জামিনের ব্যবস্থা করলেন। এসবকিছু ব্যবস্থা করলেন শহরের কমরেডরা।

একদিন ঘাটভোগ গ্রামে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। ঘাটভোগের বিত্তবান ও অল্পবিত্ত পরিবারের লোকদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সিন্দুরডাঙা ও বলোটির অনুন্নত সম্প্রদায়ের কৃষক ও মুসলমান কৃষকদের সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হল। একদল লোক জোর করে কৃষকদের ধান কেড়ে নিতে গেল। কৃষকরা বাধা দেওয়ায় বহু কৃষক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক আহত হলেন। এমন সময় কৃষক দরদী বাহিরদিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক যতীন ব্যানার্জী (সরকারী হেড-মাস্টার) ছুটে গেলেন ঘটনাস্থলে। কিন্তু কৃষকরা বুঝতে না পেরে তাঁকেও আঘাত করলেন। তিনি আহত অবস্থায় কৃষকদের নিকট আবেদন করলেন, 'তোমরা শান্ত হও, তেভাগা নিয়ে আমরা আজই বসব, আমি তোমাদের শত্রু নই, তোমরা সংঘর্ষ থেকে নিবৃত্ত হও, আর রক্তক্ষয় কর না।'

কৃষকদের মধ্যে অনেকেই যতীনবাবুকে চিনতেন, তাঁরা ছুটে এলেন মাস্টার মহাশয়ের নিকট।

তাঁরা ক্ষমা চাইলেন, তাঁকে শুশ্রূষা করলেন। সমস্ত রণক্ষেত্র শান্ত হল, জমির মালিকরা অধিকাংশ চলে গেলেন, ঠিক হল আজই রাত্রে জমির মালিক ও কৃষকদের মধ্যে বৈঠক হবে।

বৈঠক হল। শেষ হল রাত ১২ টায়। শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশায়ের (যতীন ব্যানার্জী) চেষ্টায় ঠিক হল, তিন বিঘে জমির মালিকেরা যাঁদের অন্য কোনো অর্থের সংস্থান নেই তাঁদের ক্ষেত্রে তেভাগা প্রয়োগ হবে না। দীর্ঘ রাত্রে উভয় পক্ষের সই হল। কৃষক সভার পক্ষে সই করলেন বিভূতি রায় ও শচীন বসু। জমির মালিকদের পক্ষে সই করলেন যতীন ব্যানার্জী। আরো ঠিক হল, যদি কোথাও বিপদ দেখা দেয় তবে কৃষক সমিতি ও জমির মালিকদের যুক্ত কমিটি বিচার করে যা রায় দেবে উভয়পক্ষ তা মেনে নিবেন।

ঘাটভোগের এই মীমাংসার খবর অন্য গ্রামে রটে গেল, কৃষকদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ

দেখা দিল। আমরাও ঠিক এইভাবে গরিব মধ্যবিত্তদের সাহায্য পেলাম। ব্যতিক্রম হল শুধু লালচন্দ্রপুর গ্রামে। সেখানে জমিদারদের লেঠেলের সঙ্গে ঢাল-সড়কি, এমন কি বন্দুক নিয়ে সংঘর্ষ হল, আহত হল অনেকে।

১৯৪১-৪২ সালে এই আন্দোলন নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। বহু দূর দূর গ্রাম থেকে কৃষকরা আসতে লাগলেন আমাদের কাছে তাঁদের ওখানে যাওয়ার জন্য। কর্মীর অভাব বলে সর্বত্র যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের অপেক্ষা না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। কোনো জায়গায় জমির মালিক ও পুলিশ চরম আঘাত হেনে আন্দোলন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, আবার কোনো কোনো জায়গায় কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মাথা তুলে দাঁড়ান এবং মালিকদের নতি স্বীকারে বাধ্য করেন।

১৯৪১ সালে জুন মাসে হিটলার সোভিয়েত আক্রমণ করল। আন্দোলনের রূপ গেল পাল্টে। ১৯৪২-এ কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করল। আমি ঐ সময় গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলাম। আরো অনেকে জেলে গেল।

ছ-মাস পরে আমি জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে, দেশের নেতৃবৃন্দ জেলে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, কৃষক সভার কর্মী ও মহিলা সমিতির কর্মী রিলিফের কাজে নেমে পড়েছেন। আমার গ্রাম মৌভোগের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম নলধার হাজার হাজার দুস্থ কৃষক ও মধ্যবিত্ত লঙ্গরখানায় খিচুড়ি খেতে আসেন। যেসব কৃষকের বাড়িতে রাতের পর রাত বৈঠক করেছি, তেভাগা আন্দোলনের কথা বলেছি তারা সবাই লঙ্গরখানায় লাইন দিয়ে কলাপাতায় খিচুড়ি খাচ্ছে— এই দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল কৃষকের সংগ্রামী চেতনা বুঝি শেষ হয়ে গেল।

কয়েকদিনের মধ্যে আমিও রিলিফের কাজে নেমে পড়লাম। সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মনুষ্যসৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ। কৃষক সভার নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সমস্ত কৃষকবে সঙ্ঘবদ্ধ করে মজুতদারি, চোরাকারবারী এবং দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী আমলাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হলাম। একদিকে ফ্যাসিবাদের চরম আঘাত, অন্যদিকে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকেরা রিলিফের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে বৈঠক শুরু করলেন। কৃষকদের রাজনীতি সচেতন কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রমথদার নেতৃত্বে রাতের পর রাত রাজনৈতিক আলোচনা চলত। সেইসব আলোচনায় দেখেছি মধ্যবিত্ত ঘরের বৃদ্ধা মহিলা, আবার স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর পাশে বসে আছেন কৃষক রমণী ও কৃষক সন্তান, যাঁরা লিখতে জানেন না, পড়তে জানেন না। মনে পড়ে, ভানুদি ও মেজদির কথা। এঁরা সমস্ত কৃষক রমণীদের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মধ্যে জড়ো করেছিলেন। মনে পড়ে মূলঘরের গ্রামের মা (অধুনা মৃত) প্রতিদিন কত হিন্দু-মুসলমান কৃষককে রান্না করে খাইয়েছেন। মনে পড়ে শহরের বড়দি, বিরাট অভিজাত পরিবারের গৃহবধূকে, যাঁর স্বামী মারা গেছেন।

১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত বাঙলায় ফসল বাড়ানো আন্দোলন শুরু হয়।

এই আন্দোলন করতে গিয়ে জমি দখল, খালকাটা, বাঁধ বাধা প্রভৃতি আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হল। ঘাটভোগে বড় জালার একটি বিরাট খাল কাটা হবে ঠিক হল, খাল কমিটি গঠন হল ঃ সম্পাদক শচীন বসু, সভাপতি সত্যেন সেন (উকিল)। খালকাটা শুরু হল, সরকার

এগিয়ে এলেন অর্থ সাহায্য করতে। সারা জেলার মহিলা, ছাত্র ও ছাত্রী, মজুর, গায়ে খেটে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন। মনে পড়ে একদিন খুলনা শহরের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা দল বেঁধে খাল কাটতে আসেন। কিন্তু কিশোর ছাত্র নেতা আনোয়ার হোসেন ট্রেন ফেল করে ট্রেনের সমান তালে দৌড়ে খালকাটার স্থানে উপস্থিত হন। পরবর্তীকালে এই আনোয়ার রাজসাহী জেলে নুরুল আমিনের সরকারের গুলিতে নিহত হন। ইনি ছিলেন জেলা স্কুলের মেধাবী ছাত্র।

সমস্ত দক্ষিণ খুলনায় প্রখ্যাত কৃষক নেতা বিষ্টুদার নেতৃত্বে বড় বড় বাঁধ বাধা ও জমি দখল, এবং সেই জমি কৃষকদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় কৃষক সভার নেতৃত্বে।

সারা বাঙলায় তেভাগা

১৯৪৬ সালে মৌভোগে ঐতিহাসিক প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে সারা বাঙলায় তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয। এর পর শুরু হয় সারা বাঙলাদেশে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ৬০ লক্ষ চাষি এই সংগ্রামে অংশীদার হন। শত শত কৃষক লাঠি ও গুলির আঘাতে নিহত হন। এর পর শুরু হয় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে কৃষকেরাও রুখে দাঁড়ালেন। আমাদের গ্রামের ৬০ বছরের বৃদ্ধ এয়াছিন ফকির (অন্ধ), অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা গিরিধর মণ্ডল স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য সর্বত্র প্রচার শুরু করেন। কৃষক সভা কর্মীরাও সর্বত্র গ্রাম্য বৈঠক করে কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমিত করেন, সে কারণে আমাদের অঞ্চলে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি।

লক্ষ লক্ষ কৃষক লালঝাণ্ডা নিয়ে ধান কাটতে শুরু করলেন। এবার আধি নয়, তেভাগা। খুলনায় মোটামুটি বলা যায়, খুলনা জেলার সদর মহকুমা, বাগেরহাট মহকুমা, এবং সাতক্ষীরা মহকুমার আংশিক অঞ্চলে ব্যাপকভাবে তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল। রূপসা নদীর তীর হইতে বাগেরহাট নদী পার হয়ে চিতলমারি পর্যন্ত এবং দক্ষিণেতে কচুয়া থানা, রামপাল, সরনখোলা, বঠেঘাটা, দাকোন প্রভৃতি থানা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে তেভাগা আন্দোলন হয়।

একটি ঘটনা ঘটে দাকোন থানায়। সেখানকার কৃষক নেতা হিমাংশু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে শুরুতেই প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গুলিতে বহু কৃষক নিহত হন, গুলিতে আহত হন কৃষক নেতা সুরেন বিশ্বাস।

একদিকে প্রচণ্ড কৃষক আন্দোলন, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ কৃষকদের মনে এনে দিল সংশয়। আমরাও চুপ করে বসে রইলাম না। গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা নেমে পড়লেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে। কৃষক ভলান্টিয়াররা দিনরাত পাহারা দিলেন। এরপর অবস্থা শান্ত হল।

আজও মনে পড়ে হরিপদ কুশারীর গান। 'মরণ শিয়রে দলাদলি করে কেমনে বাঁচবি বল' এই গান হিমাংশু চক্রবর্তী উদাত্ত গলায় যখন গাইতেন তখন দেখেছি হাজার হাজার সাধারণ মানুষ চোখের জল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ঐক্যের। আর ঠিক এই সময় যখন প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রাদেশিকতা-সাম্প্রদায়িকতা আমদানি করে সমস্ত কৃষক ও শ্রমিকের ঐক্যকে চুরমার করার চেষ্টা করছে, ঠিক পুরানো দিনের মতো যুবা আর বৃদ্ধেরা মিলিত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছেন না কেন?

প্রাপ্তিস্বীকার : ঐ

টিকা : 'তে-ভাগা'র ওপর আরও কয়েকটি লেখা চতুর্থ খণ্ডে দ্রষ্টব্য, যেমন :

- বাংলায় তে-ভাগা আন্দোলন ভবানী সেন (চতুর্থ খণ্ড, সহায়ক তথ্য ৩৭)
- কৃষকের লড়াইয়ের কায়দা— কৃষ্ণবিনোদ রায় (ঐ, ৩৯)
- তে-ভাগার লড়াই— আবদুল্লাহ রসুল (ঐ, ৪০)
- তে-ভাগার লড়াইয়ে কৃষক মেয়েদের ভূমিকা-রাণী দাশগুপ্তা (ঐ, ৪১)
- তে-ভাগার সংগ্রামে ছাত্র কৃষক এক হও— অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য (ঐ, ৪২)
- তে-ভাগা আন্দোলনের শহিদ (ঐ, ৪৩)
- টংক প্রথার রদ চাই-সুধীন রায় (ঐ, ৪৪)
- তে-ভাগা সংগ্রামের স্মৃতি কথা-মণি সিংহ (ঐ, ৪৫) (- সম্পাদক)

সহায়ক তথ্য - ১১

তে-ভাগার লড়াইয়ে

শ্রমিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্তের
পক্ষ নির্বাচন

রবীন্দ্র গুপ্ত

তে-ভাগার লড়াই

১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী শ্রমিকের ওপর দমননীতির আঘাত বাড়িয়ে দিয়ে ভেবেছিল এই আঘাতে শ্রমিক ঘায়েল হবে। কিন্তু ফল হয়েছে ঠিক উল্‌টো, সে আঘাত উল্‌টে গিয়ে ধনিক শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। গত ৯ মাসে বাংলার শ্রমিক যে লড়াই লড়েছে তাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, ধনিকের চেয়ে শ্রমিক আজ অনেক বেশি শক্তিশালী। একথা প্রমাণ করেছে পোর্টের শ্রমিক, একথা প্রমাণ করেছে ট্রামের শ্রমিক, একথা প্রমাণ করতে আরম্ভ করেছে রেলের শ্রমিক। দমননীতির পরোয়া না করে এগিয়ে চলেছে ইঞ্জিনীয়ারিং চটকল এবং আরও অনেক শিল্পের বাহাদুর মজুর এবং কেরানী।

শহরে শহরে শ্রমিকের এই বিজয়ী অভিযান গ্রামের ক্ষেত মজুর এবং গরীব চাষিদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে নূতন উৎসাহ, নূতন অভিযান। স্বাধীনতা, জীবিকা এবং গণতন্ত্রের সংগ্রামে শ্রমিক যে ধনবাদী-শক্তির বিরুদ্ধে আজ মরিয়া হয়ে লড়ছে, সেই ধনবাদী-শক্তি এবং তার ছায়াগামী জমিদার-জোতদারের বিরুদ্ধে লড়ছে বাংলার গরীব চাষি— সংখ্যায় যারা গ্রামের শতকরা ৮৫ জন। এই ৮৫ জন হল কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিক এবং আধা-শ্রমিক মেহনতকারী। এদের মধ্যে আছে ক্ষেত মজুর, ভাগচাষি এবং অন্যান্য গরীব কৃষক।

জমির লড়াইয়ের মূলে

কেন তারা জমির জন্য মরণপণ সংগ্রামে নেমেছে তার কারণ সংক্ষেপে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় :

"মোটের ওপর যারা নিজ হাতে চাষ করে এমন ছোট ছোট চাষি উচ্ছন্নে যাচ্ছে। ধনতন্ত্রের আবির্ভাব এবং সামন্ততন্ত্রের আধিপত্য এই দুয়ের চাপেই অল্পবিত্ত খোদ খামারের চাষির সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তার বদলে বেড়ে উঠছে দুই শ্রেণির ভূমিহীন চাষি— মজুর এবং ভাগচাষি। বর্তমানে বাংলার সমস্ত চাষের জমির শতকরা ৫৮ ভাগে দিনমজুর এবং ভাগচাষি নিযুক্ত হয়, শতকরা মাত্র ৪২ ভাগ জমি কৃষি পরিবার সম্পূর্ণভাবে নিজহাতে চাষ করে। জমিতে অধিকাংশ কৃষকের স্থায়ীস্বত্ব উঠে যাচ্ছে।" (বাংলার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ, ভবানী সেন-সম্পাদক)

এই জন্যই গরীব কৃষক লড়ছে জমির জন্য। সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শ্রমিক এবং কৃষকের সহযোগিতা অপরিহার্য। কিন্তু সব কৃষকই শ্রমিকের সহযোগী নয়। কৃষক শ্রেণির মধ্যেও আবার শ্রেণিভেদ আছে— কেউ ধনিক, কেউ শ্রমিক, কেউ মধ্যবিত্ত। "১৯৪৪-৪৫ সালের সরকারী বিবরণ অনুসারে সাংলার সমস্ত আবাদী জমির শতকরা ২০.৬ ভাগ অর্থাৎ ৭৮ লক্ষ একর জমি ধনবাদী প্রথার দিনমজুর দিয়ে চাষ করা হয়। এই ৭৮ লক্ষ একর জমির মালিকেরাই হল ক্যাপিটালিষ্ট ভূস্বামি।" (বাংলার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ, ভবানী সেন-সম্পাদক)

গ্রামে ও শহরে লড়াইয়ের ঐক্য

সুতরাং, শহরের শ্রমিকের মত গ্রামেও শ্রমিক আছে, শহরের মালিকের মত গ্রামেও মালিক আছে, শিল্পের মত কৃষিতেও ধনবাদী প্রথা গজিয়েছে। গ্রামের শ্রমিক শহরের শ্রমিকের মতই লড়ছে এবং লড়বে, দুয়ে মিলে ধনবাদের ভিৎ তুলেছে কাঁপিয়ে। সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শহর ও গ্রামের শ্রমিককে দৃঢ়ভাবে নির্ভর করতে হবে গরীব কৃষকের উপর, ধনী কৃষকের বিরুদ্ধেও

লড়াই চালাতে হবে।

ঠিক শ্রমিক নয় কিন্তু শ্রমিকের মতই ভূমিহীন এবং শ্রমজীবী, অথচ গোলামের মত নিষ্পেষিত এমন একটা বিরাট জনসংখ্যা আছে গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে, তাদেরই নাম আধিয়ার বা বর্গাদার। তারাই শুরু করেছে ১৯৪৬ সাল থেকে জানকবুল তে-ভাগার লড়াই। তাদের শোষণ করে জোতদার এবং ধনী কৃষক। সংক্ষেপে বলতে গেলে বর্গাচাষির অবস্থা হল এই—

"বর্গাচাষে ফসলের অর্ধেক পায় জোতদার, আর অর্ধেক পায় চাষি। চাষের মূলধন সমস্তই অধিকাংশ ক্ষেত্রের ভাগচাষিকে বহন করতে হয়, জোতদার বিনা মূলধনে এবং বিনা মেহনতে ফসলের অর্ধেক আদায় করে। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার জোরে বিনা মূলধনে এবং বিনা মেহনতে জোতদার এই অর্ধেক বখরা আদায় করে।"

সংগ্রামের পুরোভাগে ক্ষেত মজুর

এই জোতদারী প্রায় বাংলার কৃষির একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। ১৯৪৪-৪৫ সালের সরকারী বিবরণ অনুসারে সমস্ত আবাদী জমির প্রায় চার ভাগের এক ভাগে ভাগ-চাষ প্রচলিত। ১৯৪০ সালের ফ্লাউড কমিশনের বিবরণ অনুসারে মোট চাষের জমির শতকরা ৩১ ভাগে ছিল ভাগ-চাষ। এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলার কৃষিতে আধা সামন্ত প্রথার অর্থনৈতিক শোষণ খুব ব্যাপকভাবে বর্তমান— এইজন্যই ১৯৪৬ সালের ভাগচাষিদের তে-ভাগা লড়াই সারা বাংলায় এক অভূতপূর্ব কৃষক জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। এই জাগরণে কেবল ভাগচাষিরাই মাতেনি, সামন্ত শোষণে জর্জরিত সমস্ত গরীব চাষিরা মেতে উঠেছিল। ক্ষেত মজুরেরা এই সংগ্রামের সম্মুখভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল, কারণ তারা ধনতান্ত্রিক প্রথায় শোষিত। সুতরাং, সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সংগ্রামী" (ঐ)।

পাশাপাশি জমি ও কারখানা দখলের লড়াই

জোতদারদের আইন অনুসারে ভাগচাষি মাঠের ফসল কেটে জোতদারের খোলানে ওঠাতে বাধ্য, সেখানেই মাড়াই-ঝাড়াই এবং ভাগ-বাটোয়ারা হয়। তাতে ভাগচাষিরা ঠকে। তাই, তাদের আওয়াজ হলো : নিজ খোলানে ফসল তোলো। জোতদারদের আইন অনুসারে ফসলের মাত্র অর্ধেক ভাগ চাষির, তাতে চাষি মারা যায়, তার চাষের খরচও ওঠেনা, মজুরিও পোষায় না। তাই, তাদের দাবি হলো : কমসে কম ৩ ভাগের ২ ভাগ চাই, জোতদারদের দেব মাত্র ১ ভাগ। এই দাবি থেকেই এই আন্দোলনের নাম তে-ভাগা।

ভাগচাষির দাবি শুধু এইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তার আওয়াজ হল, লাঙ্গল যার, জমি তার। আজকাল সে শুধু মেহনতের মালিক, জমির মালিক জোতদার। কারখানায় যেমন মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি শ্রমিককে শোষণ করার যন্ত্র, জমিতেও তেমন জোতদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাগচাষিকে শোষণ করার যন্ত্র। তাই, ভাগচাষি চায় জমির দখল। তে-ভাগার লড়াই জমি দখলেরই প্রথম পর্ব, যেমন মজুরের জীবনধারণের উপযোগী মজুরির লড়াই কারখানা দখলেরই প্রথম পর্ব। শ্রমিক যখন কারখানা দখল করতে পারবে তখনই শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্ভব হবে, তেমনি ভাগচাষি (ও অন্যান্য গরীব চাষি) যখন জমি দখল করতে পারবে তখনই জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্ভব হবে। জমি

জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হলে মেহনতী চাষিকে জমিদার, জোতদার বা ধনী কৃষক জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। তাই, বাংলার সমস্ত গরীব চাষি ভাগচাষিদের তে-ভাগা লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তাই, 'লাঙ্গল যার, জমি তার' এই আওয়াজ উঠেছে ক্ষেতে খামারে লালঝাণ্ডাধারী কৃষকের কণ্ঠে কণ্ঠে।

কৃষকের সংগ্রামে নতুন ইতিহাস

১৯৪৬ সালের তে-ভাগা লড়াই সারা বাংলাদেশটাকে ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়ে তুলেছিল, তাতে সামিল হয়েছিল প্রায় ৬০ লক্ষ চাষি। সে লড়াইতে খানপুরে, ঠুমনিয়াতে ও মালবাজারে চাষির জীবনপণ প্রতিরোধ নূতন ইতিহাস রচনা করেছিল বাংলার কৃষক আন্দোলনে এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামে। লীগ সরকার তাকে নির্মমভাবে দমন করেছিল জেল, লাঠি এবং গুলির ঘায়ে। কংগ্রেস তখন লীগ সরকারের দমননীতি সমর্থন করেছিল, আর বলেছিল- ভাগচাষির তে-ভাগা দাবি যে ন্যায্য দাবি সেকথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু আমরা মহাত্মার নীতিতে বিশ্বাসী আমরা রক্তারক্তি মারামারি পছন্দ করি না, ভাগচাষিরা শান্ত হলে শুধু তে-ভাগা কেন সমস্ত জমিই আমরা তাদের দিয়ে দেব। মহাত্মার শিষ্যেরা এই মহৎ নীতি পালনের জন্য তখন বন্দুকধারী পুলিশদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন কোথায় গুলি চালাতে হবে, আর কোথায় কাকে গ্রেপ্তার করতে হবে— বহুশত চাষির বাড়ি তখন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

"স্বদেশী" কৌশলে বঞ্চনা

কিন্তু চাষি তাতে দমেনি। ১৯৪৭ সালে সরকারী ক্ষমতা এল কংগ্রেসের হাতে, কংগ্রেস নেতারা ভাবলেন, এবার যদি ফসল কাটার সময় আবার গতবারের মত লড়াই হয়, তবে বড় কেলেঙ্কারী হবে, সদ্যসদ্য ক্ষমতা হাতে পেয়েই কৃষকের রক্তে রাজসিংহাসনের অভিষেক করতে হবে। দেখা যাক রক্তের বদলে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা যায় কিনা। তখন তাঁরা মসনদ থেকে হাঁক ছাড়লেন : তে-ভাগার দাবি যে ন্যায্য দাবি সে কথা কি আর আমরা বুঝিনা। কিন্তু আমরা এখন স্বাধীন হয়েছি এখন জোরজবরদস্তি করে দাবি আদায় করতে যেয়োনা, কিছুদিন সবুর কর, আমরা একটা আইন পাস করে তোমাদের সমস্ত দাবি পূরণ করে দেব; আপাতত সালিশী বোর্ড গঠন করে দিচ্ছি তার রায় অনুযায়ী ফসল ভাগ করে নাও। কিন্তু ফসলের ভাগাভাগি এতদিন যেমন চলে আসছে তার যেন ব্যতিক্রম না হয়। অর্থাৎ, জোতদারদের আধিভাগই দিয়ে দাও।

তারপর, শ্রমিকদের দাবি বিচারের জন্য যেমন মালিকদের লোক নিয়েই ট্রাইব্যুনাল এবং এডজুডিকেশন কোর্ট বসে তেমনি জমিদার ও নেতাদের নিয়েই তে-ভাগার সালিশী বোর্ড বসানো হল। এই সালিশী বোর্ডের কাজ হল জোতদারদের আধিভাগ আদায় করে দেওয়া। দুশমনের মন শয়তানের কাছে পড়ে থাকে। এই প্রবাদ বাক্য সালিশীবোর্ডের মারফৎ "স্বরাজের" ধ্বজাধারীরা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করলেন।

১৯৪৮ সাল—দুর্বার প্রতিরোধ

১৯৪৮ সাল। ভাগচাষির সম্মুখে বিগত দুই বারের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা— তাই, ফসল পাকার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষক সমিতি আওয়াজ দিয়েছে— ভণ্ডদের কথায় ভুলোনো, পাষণ্ডদের আক্রমণে ভড়কে যেওনা, নিজ খোলানে ধান তোল, তে-ভাগা কায়েম করো। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের

আওয়াজের জবাব পাওয়া গেল কাকদ্বীপে সহস্র চাষির দুর্বার প্রতিরোধে— মহাত্মার সেবকদের হুকুমে সিপাহীর অগ্নিগোলক থেকে শিশু এবং গর্ভবতী পর্যন্ত কেউই বাদ গেলনা, কাকদ্বীপের মাঠে স্বরাজের তেরঙ্গা পতাকা কৃষকের রক্তে ভিজে লাল পতাকা হয়ে গেল।

কিন্তু ১৯৪৬ সালে এবং ১৯৪৮ সালে অনেক পার্থক্য, সে পার্থক্য কেবল শ্রমিক এবং কৃষকের কঠোর পীড়নে অর্জিত অভিজ্ঞতাই নয়; ১৯৪৮ সালে সারা দুনিয়ার ধনবাদের ভিৎ কেঁপে উঠেছে, ইয়োরোপে ও এশিয়ায় শ্রমিকের দুর্দান্ত অভিযান প্রত্যেক দেশেরই শাসকবর্গের কলজের ভিতর কাঁপুনি তুলেছে, চীনের লালফৌজ বিজয় গৌরবে নানকিং-এর দ্বারদেশে উপস্থিত, তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র এশিয়ায়; আশা, ভরসা এবং আত্মবিশ্বাস জেগে উঠেছে নির্যাতিত জনগণের মনে, তেলেঙ্গানার গরীব কৃষকের প্রতিরোধ প্রমাণ করেছে যে, ভারতও পিছিয়ে থাকবেনা। তাই, বাংলার সর্বত্র ভাগচাষিদের মধ্যে প্রতিজ্ঞা দানা বেঁধে উঠছে, সংগ্রামের মহড়া আরম্ভ হয়েছে।

জোতদারের তে-ভাগা

এই দেখে পশিচমবঙ্গের সরকার আবার এক নূতন ঘোষণা বের করেছেন। এই ঘোষণার সারমর্ম হল এই —

জমির মালিকানার জন্য জোতদার পাবে ৩ ভাগের ১ ভাগ ফসল, মেহনতের জন্য ভাগচাষি পাবে ৩ ভাগের ১ ভাগ; আর বাকি ১ ভাগ সম্পর্কে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম রইল না।

এই শেষোক্ত এক ভাগের কত অংশ কে পাবে তার চূড়ান্ত মীমাংসা করবে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সালিশী বোর্ড।

এই ঘোষণার মানে দাঁড়াল এই—

ভাগচাষির এত দিন অর্ধেক ভাগ প্রাপ্য পাওনা বলে গণ্য ছিল, এখন সরকারি হুকুমে ৩ ভাগের ১ ভাগ মাত্র তার ন্যায্য পাওনা হল। তার বেশি পাওনা ঠিক করতে সরকারি সালিশী বোর্ডের পায়ে তেল মাখাতে হবে। এই ভাবে ভাগ চাষির তে-ভাগা দাবি সরকার উল্টো তে-ভাগায় পরিণত করে দিয়েছে।

যারা জোতদারদের কাছ থেকে লাঙ্গল এবং বলদ পেত তারা পাবে মাত্র ৩ ভাগের এক ভাগ ফসল, অথচ চলতি প্রথায় তারাও অর্ধেক পেত। তাদের চলতি অংশও কমে গেল।

জোতদার এবং ধনী কৃষক আগামী বৎসর থেকে লাঙ্গল, বলদ এবং নামমাত্র সার সরবরাহ করে ফসলের ৩ ভাগের ২ ভাগ আদায় করবে, চাষি পাবে মাত্র ৩ ভাগের ১ ভাগ। এমনি ভাগ ফসলের ওপর জোতদারের দখল আরও বাড়বে।

নূতন পুঁজিবাদী আক্রমণ

ভাগচাষের বাটোয়ারা সম্পর্কে সরকারের এই নীতি হল কৃষিব্যবস্থায় তাদের সাধারণ নীতিরই অঙ্গ, সে নীতিটা হল গ্রাম দেশে ধনিক, জোতদার, ধনীচাষি এই তিন শ্রেণির আসন সুদৃঢ় করা। অর্থাৎ, কৃষিক্ষেত্রে গরীব চাষি ও ক্ষেত মজুরদের ঠকিয়ে জমির উপর ক্যাপিটালিষ্ট জমিদারদের প্রভাব বাড়ানো। ভাগচাষ সম্পর্কে সরকারি ঘোষণার তাৎপর্য্য এই যে, ভবিষ্যতে জোতদার লাঙ্গল বলদ বীজ সরবরাহ করে ভাগচাষি নিযুক্ত করে চাষ চালাবে, তাহলেও তার ফসলের অংশ হবে ৩

ভাগের ২ ভাগ। একাজ তারা সহজেই করতে পারবে; কারণ জমির উপর ভাগচাষিকে কোন স্বত্ব দেওয়া হয়নি। কাজেই আগামী বৎসর জোতদার বলবে, জমি দেব শুধু তাকেই যে আমার লাঙ্গল বলদ নিয়ে মজুরের মত কাজ করবে। পুরুষানুক্রমে যারা নিজেদের লাঙ্গল বলদ নিয়ে ভাগচাষ চালাচ্ছিল তাদের জমি থেকে যে তাড়িয়ে দেওয়া হবে একথা নিশ্চয় করে বলা যায়।

কাজেই ডা: বি. সি. রায়ের ঘোষণায় ভাগচাষির অবস্থা অত্যন্ত বিপদাপন্ন। তাদের ঐক্য বিপন্ন, তাদের জমিভোগ বিপন্ন, তাদের আধা অংশ পর্যন্ত বিপন্ন, তাদের আসল দাবি কিছুই মেটেনি। প্রকারান্তরে তাদের উপর আর একটা নূতন আক্রমণ এসেছে।

তাই, কৃষক সমিতি আওয়াজ দিয়েছে, নিজ খোলানে ধান তোলো, নিজ বলে তে-ভাগা কায়েম করো, জমির পুরো স্বত্বের জন্য লড়ো, ফসল ভাগের লড়াইকে পরিণত করো জমির লড়াইতে।

শ্রমিকনেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের পথে

ভাগচাষিদের এই সংগ্রামে শহর এবং গ্রামের শ্রমিক নিশ্চয়ই আগে কদম বাড়াবে। কারণ, তাদের লক্ষ্য হল ধনবাদের উচ্ছেদ, সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা, যে সমাজ ব্যবস্থায় এক শ্রেণি অন্য শ্রেণিকে শোষণ করে তার আমুল পরিবর্তন। শ্রমিকের লক্ষ্য হল, সমাজ থেকে সমস্ত শোষণ এবং শ্রেণিভেদের বিলোপ। এই লক্ষ্য পুরনের জন্য তাকে শ্রমিকের হুকুমৎ কায়েম করতে হবে। শ্রমিকের হুকুমৎকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকাংশ কৃষকের (গরীব এবং মধ্যবিত্ত) সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জন করতে হবে। কমরেড স্ট্যালিন বলেছেন— "লেনিনিজম নিঃসন্দেহে কৃষকদের অধিকাংশের সঙ্গে স্থায়ী সহযোগিতা স্থাপনের পক্ষপাতী, মধ্যবিত্ত কৃষকের সঙ্গেও। কিন্তু যে কোন ধরনের সহযোগিতা নয়, এমন সহযোগিতা যাতে শ্রমিকের নেতৃত্ব কায়েম হয়, যাতে শ্রেণিভেদ বিলোপের জন্য শ্রমিকের হুকুমৎ শক্তিশালী হয়" (লেনিনিজম, ২৫৮ পৃঃ)। এই সংগ্রামে প্রধান বিপক্ষশক্তি হল ভারতে কংগ্রেসী সরকার এবং পাকিস্তানে লীগ সরকার। এই বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে ভাগচাষির সংগ্রাম হবে, শ্রমিকের হাতে একটা মস্তবড় হাতিয়ার। ডাঃ বি. সি. রায়ের চাতুরীপূর্ণ ভাগচাষিমারা ঘোষণায় ভাগচাষিরা যাতে বিভ্রান্ত না হয় তা দেখতে হবে শ্রমিকের পার্টিকে, এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ভাগচাষিদের লড়াইকে সম্মুখের দিকে। এমনি ভাবে লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে মেহনতী কৃষকদের সমর্থন অর্জন করে শ্রমিক প্রতিষ্ঠা করবে এক নূতন রাষ্ট্র— শ্রমিক এবং কৃষকের গণতান্ত্রিক হুকুমৎ। এই গণতান্ত্রিক হুকুমৎ ধনিকের প্রতিরোধ পরাস্ত করবে, এর ভিতর দিয়ে শ্রমিক গড়ে তুলবে তার সমাজতান্ত্রিক হুকুমৎ। তাই, যে কোন শোষিত গরীব শ্রেণির সংগ্রামে শ্রমিক সবচেয়ে অগ্রণী হবে।

সমস্ত মেহনতী এক হও

তাই, ভাগচাষির লড়াই শ্রমিকেরই এক মিত্র শক্তির লড়াই। এই লড়াইয়ে শহরের শ্রমিক ও ক্ষেত মজুরের সমর্থন, সহযোগিতা ও নেতৃত্ব ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক এবং কৃষকের সহযোগিতা সুদৃঢ় করবে। অবশ্য, গ্রামের লড়াই শুধু ভাগচাষিরই লড়াই নয়, লড়াই সমস্ত মেহনতী কৃষকদের। শ্রমিককে নেতৃত্ব দিতে হবে এই সমস্ত মেহনতী কৃষকদের। শ্রমিক কি ভাবে এই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে? নিজের দাবির জন্য ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ধর্মঘট, কৃষকদের সমর্থনে সংগ্রাম এবং ব্যাপক অভিযান গড়ে তুলে।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৮ এই কয়েক বৎসরে কৃষিব্যবস্থার ধনতান্ত্রিক সম্বন্ধ সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়েছে এবং এই যুগেই সংগ্রামে ক্ষেতমজুর এবং দরিদ্রতম কৃষকেরা এগিয়ে আসছে সবচেয়ে আগে। মধ্যবিত্ত কৃষকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও ইতস্তত করছে এবং ধনী কৃষকেরা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী সরকারের ও পূর্ববঙ্গে লীগ সরকারের দালাল। "রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, দরিদ্রতম কৃষকদের সংগ্রাম যতই জোরালো হবে, ক্ষেতমজুর যতই এগিয়ে যাবে, কৃষকের সংগ্রামে শ্রমিকের নেতৃত্ব যতই প্রতিফলিত হবে ততই মধ্যবিত্ত কৃষকের ইতস্তত ভাব কাটবে" (বাংলার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ)।

মধ্যবিত্ত ও চাষির সংকট

এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত চাষিরও বাঁচার উপায় নেই, সর্বস্ব হারিয়ে তাদের মধ্যেও মিছিল চলেছে নিঃস্ব চাষির দিকে। একথার তাৎপর্য নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারা যায়—

"যে সমস্ত পরিবারে ৫ একরেরও বেশি জমি আছে তাদের সংখ্যা ১৯৪০ সালে (ফ্লাউড্ রিপোর্ট) ছিল শতকরা ২৫.৪ জন, আর ১৯৪৫ সালে (বাংলার সরকারের এছাক্ রিপোর্ট) তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ১৪.৩ জন। এর মানে হল এই যে, মধ্যবিত্ত কৃষকেরা তাদের অস্তিত্ব ও জমির স্বত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না, তারা অনবরত গরীব চাষির দলে এসে ভর্তি হচ্ছে, ওদের জমি অন্যান্য গরীব চাষির জমির মত জমিদার, জোতদার এবং ধনী কৃষকদেরই হাতে চলে যাচ্ছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মধ্যবিত্ত কৃষকের এই অবস্থা অপরিহার্য্য। মধ্যবিত্ত কৃষকের সংখ্যাই যে কমছে শুধু তাই নয়, তাদের স্বত্বাধিকারে জমির পরিমাণও কমে যাচ্ছে; তার প্রমাণ এই যে, গত পাঁচ বছরে খোদখামারের পরিমাণ প্রায় ৪ ভাগের এক ভাগ কমে গেছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, মধ্যবিত্ত চাষি দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।" (ঐ)।

মধ্যবিত্তের মোহ

কিন্তু তবু ব্যক্তিগত সম্পত্তির এমনই মোহ যে, মধ্যবিত্ত কৃষকের ধারণা যে ভাগচাষি এবং ক্ষেতমজুরের সংগ্রামে তার ক্ষতি হবে, কংগ্রেসী সরকার এবং লীগ সরকার তার জন্য এমন সুরাহা করে দেবে যাতে সেও ধনী কৃষক হতে পারে, একটু অপেক্ষা করলে জমিদারি প্রথাটা উঠে যাবে, তখন তার আর কোন কষ্ট থাকবেনা। এই মোহই মধ্যবিত্ত কৃষকের সর্বনাশ ডেকে আনছে। তাকে আজ বুঝতে হবে যে, কঠোর বাস্তব কোনদিকে তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। আজকের মধ্যবিত্ত কৃষক, আগামীকালের গরীব চাষি, পরশুদিনের ভাগচাষি বা ক্ষেত মজুর। কংগ্রেসী রাজ্যে বা লীগরাজ্যে এ ছাড়া তার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই।

ক্ষেত মজুর এবং ভাগচাষির জবরদস্ত লড়াই জমিদারি জোতদারি খতম করে সমস্ত মেহনতী কৃষকদেরেই জমি দখল এবং বাঁচার পথ খোলসা করে দেবে, সরকারী ব্যবস্থায় তাদের ভাগ্যে আছে দারিদ্র্য এবং নিঃস্বতা। তাই, তাকে ক্ষেত মজুর এবং ভাগচাষির সংগ্রামকে নিজেরও ভবিষ্যতের বাঁচার পথ হিসাবে মেনে নিতে হবে।

মধ্যবিত্ত কৃষক যতই ইতস্তত করুক না কেন, গরীব চাষিদের এগিয়ে যেতে হবে, মধ্যবিত্ত কৃষকের দোটানা মনোভাব দেখে ভড়কালে চলবে না; তারা আর ক' জন? গ্রামের শতকরা ৮৫ জনই ক্ষেতমজুর, ভাগচাষি এবং গরীব কৃষক। তাদের দৃপ্ত পদক্ষেপ জুলুমকারীর সমস্ত স্তম্ভ বন্যার বেগে ভেঙেচুরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

তে-ভাগার লড়াই একটা আংশিক পদক্ষেপ মাত্র— সমগ্র লড়াইটা হল দুই শক্তির ভেতর; তার একদিকে ধনবাদের শক্তি, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদের শক্তি, একদিকের নেতা ধনিকশ্রেণি, অন্য দিকের নেতা শ্রমিক শ্রেণি, একদিকে গ্রামের প্রাচীন ফিউডাল জমিদারি প্রথাকে পুষে পুষে রাখছে, অন্য দিকে তাকে আক্রমণ করছে ভীমবেগে, একদিক প্রসব করছে দাসত্ব, দুর্ভিক্ষ, এবং মড়ক, অন্যদিক সৃষ্টি করছে যুক্তি, জীবিকা এবং জীবন, একদিকে ধনিকের স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং অন্য দিকে গরীবের গণতন্ত্র, একদিকে বিদেশীর পরাধীনতা, অন্যদিকে প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা। এই শ্রেণি সংগ্রামের একটি অংশ হল ভাগচাষিদের তে-ভাগা লড়াই।

প্রথম পদক্ষেপ তে-ভাগা

শহরের গরীব মধ্যবিত্ত এই সংগ্রামে কোন্ পক্ষ নেবেন?

দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্যসংকটের আঘাতে তাঁরা সবাই ঘায়েল হয়েছেন। কিন্তু যেহেতু শতকরা ১৩ জন মুনাফাখোরের হাতে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ জমি কেন্দ্রীভূত, তাই খাদ্যের চোরাবাজার এত শক্তিশালী। যেহেতু, শতকরা ৯০ জন চাষিকে নিংড়ে খাওয়াই শতকরা দশজন (জমিদার-জোতদার ধনী কৃষক)-এর একমাত্র ব্যবসায়, তাই জমির উন্নতি নেই, চাষের উন্নতি নেই, জমির ফসল কমে যাচ্ছে। কৃষকের দারিদ্র্য এবং শোষণই এর জন্য দায়ি। এব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই, নতুবা দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যসংকটের কোন সমাধান নাই। জমিদারি-জোতদারি উচ্ছেদ করে গরীব কৃষকদের ও ক্ষেত মজুরদের ভিতর জমি বিলি করে, যৌথচাষ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগুলে, তবেই দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যসংকটের চির সমাধান হবে। ভাগচাষির তে-ভাগা লড়াই এই চূড়ান্ত সমাধানের পথে একটি বাস্তব পদক্ষেপ, একটি মহড়া মাত্র।

গরীব মধ্যবিত্তের বিভ্রান্তি

শাসকবর্গ গরীব মধ্যবিত্তদের বুঝাবার চেষ্টা করছেন এই কথা যে, ভাগচাষির দাবি মেনে নিলে তোমাদের ক্ষতি, তাই তাদের দাবি পুরা করতে আমরা অনেক দিক বিবেচনা করছি, যদিও আমরা মনে করি ভাগচাষির দাবিটা ন্যায্য। অর্থাৎ অলস, কৃপণ পরগাছা জমিদার, জোতদারদের জন্য তাঁদের যেন কোন ভাবনাই নেই, তাদের তাঁরা পরোয়া করেন না, তাঁদের বড় চিন্তা গরীব মধ্যবিত্তের জন্য। গরীব মধ্যবিত্তের ভাত তাঁরা জোতদারদের হাতে দিয়ে রেখেছেন, চাষের জমির অর্ধেকের বেশি তাদের হাতে। তাই, ধান চাউলে খোলাবাজর উঠে গেছে, আছে শুধু চোরাবাজার। গরীব মধ্যবিত্তের কাপড় তাঁরা বিড়লাভাইদের হাতে সঁপে দিয়েছেন, জানিয়ে দিয়েছেন যে, দশ পনরো বছরের ভিতর শিল্প জাতীয়করণের কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং, কাপড় রইল চোরাবাজারে। সরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক, সওদাগরী অফিস, ইনসিওরেন্স কোম্পানি, রেল পোস্ট-অফিস সর্বত্রই গরীব মধ্যবিত্ত শ্রমিকের মতই পাওনা চাইতে গেলে ডাণ্ডা খাচ্ছে। গরীব মধ্যবিত্তের স্থান কোন্ শিবিরে? ধনিক-জোতদারদের শিবিরে নয়, মজুর, গরীব চাষির শিবিরে।

কিন্তু তবু তে-ভাগার নাম শুনলে গরীব কেরাণী-কর্মচারী মধ্যবিত্তেরাও অনেক সময় আঁৎকে ওঠেন— কারো বাপের, কারো মামার অথবা কারো শ্বশুরের হয়ত কয়েক বিঘা জমি আছে, ভাগচাষিতে বর্গা দিয়ে থাকেন। তাঁরা ভাবেন, তে-ভাগা মেনে নিলে তাঁদেরও রুজী মারা যাবে। তাঁদের চিন্তাধারাটা এই যে, জমিদারি-জোতদারি প্রথা বেঁচে থাকলে সর্বনাশ অবশ্য

আমাদের হবে কিন্তু তাতে আগুন লাগালে যে আমাদেরও কাঁথাটা-বালিশটা পুড়ে যাবে। পরিবারের মধ্যে বসন্ত কিংবা প্লেগ দেখা দিলে ডাক্তার বলেন, ঘরের সমস্ত আসবাব পুড়িয়ে দাও, তখন যে মূর্খ কাঁথা-বালিশের মায়ায় আগুন দিতে অস্বীকার করে, সে বোঝে না যে মহামারির হাত থেকে জান বাঁচাতে পারলে কাঁথা-বালিশ অনেক হবে। কিন্তু মহামারিতে জান গেলে কাঁথা-বালিশও শেষ পর্যন্ত শ্মশানেই যাবে।

সরকারের জুজু দেখানো নীতি

সরকারীপক্ষ কৈফিয়ৎ দিয়ে থাকেন যে, তে-ভাগা তো তাঁরা দিতে পারতেন কিন্তু সমস্যা এই যে, বিধবা এবং নাবালকদের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায় তা তাঁরা ভেবে উঠতে পারছেন না। ভাবটা এই যে, বিধবা এবং নাবালকদের জন্য টাটা, বিড়লা, বর্ধমানের মহারাজা, দিনাজপুরের ভবেশ রায় প্রভৃতির শ্রেণি কষ্ট করে শোষণযন্ত্রটা বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা তো বিধবা নন, নাবালকও নন। এঁদের সম্পত্তি কেড়ে নিতে ঠেকছে কিসে? জোতদারি খতম কর, গ্রামের গরীব সমাজ বিধবা ও নাবালকদের ব্যবস্থা করবে। জমিদার-জোতদারের শোষণই তৈরি করছে গরীব চাষির ঘরে হাজার হাজার বিধবা এবং নাবালক। তাদের ব্যবস্থা আগে হোক, জোতদারদের বিধবা ও নাবালকদের ব্যবস্থাও তখন তারাই করে দিতে পারবে।

ভাগচাষি যদি তে-ভাগা পায় তবে অনেক গরীব কর্মচারীর বাপের, মামার কিংবা শ্বশুরের ঘরে কয়েক মণ ধান কম উঠবে সত্য, কিন্তু গ্রামের শতকরা ৮৫ জন যদি জমিদার-জোতদার ঘায়েল করতে পারে তবে শহরের ধনিকও জখম হবে; শ্রমিক এবং গরীব চাষির মিলিত অভিযান যদি সফল হয় তবেই অফিসে, দোকানে, রেলে, পোস্ট-অফিসে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে মালিক চোরাকারবারীর প্রভুত্ব খতম হবে। যে ক'মণ ধান খসে যাবে, তার অনেক বেশি উঠে আসবে শোষণতন্ত্রের জখমে এবং শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুতে।

পক্ষ বেছে নিতে হবে

তার চেয়েও বড় কথা এই যে, ধনতন্ত্রের দিন ফুরিয়ে এসেছে, কোন শোষণ পদ্ধতিই আর টিকে থাকতে পারে না। সারা দুনিয়ার অবস্থার কথা ছেড়েই দিলাম, ভারতের দিকে দিকে ধনিকশ্রেণী আর্তনাদ আরম্ভ করেছে। বেন্থল, মাথাই, শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি সকলেরই মুখে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে একথা— শিল্পে-ব্যবসায়ে লোক আর বেশি মূলধন নিয়োগ করছে না। ভারতীয় মূলধনের নাকি "লজ্জা" বেড়েছে। বুড়ীর যদি লজ্জা বাড়ে নববধূর মত, তা হলে বুঝতে হবে যে, বুড়ীর ভীমরতি হয়েছে। অর্থাৎ, ভারতীয় মূলধন আর নিরাপদে মুনাফাশিকার করার ভরসা পাচ্ছেনা, শ্রমিকের উদ্যত অভিযান দিনে পর দিন তাকে কাবু করে আনছে, ধনবাদী সমাজের চরম সংকটের ভিতর দিয়ে শ্রমিকের চেতনায়, সংগ্রামে ও সংগঠনে দেখা দিয়েছে বিপ্লবী শক্তির "তিমির-বিদায়-উদার অভ্যুদয়।" ধনবাদের দুয়ার ভেঙেছে, পৃথিবীর এক বিরাট অংশে রুশ-সোভিয়েতে উদ্ভাসিত হয়েছে হিরণ্যগর্ভ শ্রেণিহীন সমাজ। ইতিহাসের এই দুর্বার গতি রুখবে এমন সাধ্য আজ কারো নেই, তাই গরীব মধ্যবিত্তকে তাড়াতাড়ি স্থির করে ফেলতে হবে স্রোতের পক্ষে দাঁড়াবে, না বিপক্ষে দাঁড়াবে। যারা পক্ষে দাঁড়াবে তারা নিষ্কৃতি পাবে, যারা বিপক্ষে দাঁড়াবে তাদের পতন ঘটবে শ্রেণিসংগ্রামের কুরুক্ষেত্রে ধনিক মহারথীদের সঙ্গে সঙ্গে। অথবা, তাদেরকে বেহুলার মত লক্ষ্মীন্দরের গলিত শব নিয়ে ভেলায় ভাসতে হবে,

কিন্তু এ যুগে তাকে পুনর্জীবন দেওয়া শিবেরও অসাধ্য। সোভিয়েত রুশিয়ার লাল ফৌজ তা প্রমাণ করেছে, চীনের লাল ফৌজও করবে।

দমননীতির বিরুদ্ধে লড়াই-ই পথ

আজকের দিনে গরীব জনতা যেখানে যে সংগ্রামই করুক না কেন, তার ভিতর থেকে ঠেলে উঠবে সত্যকার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম। তে-ভাগার দাবিকে ন্যায্য দাবি বলে মেনে নিয়েও সে দাবি দাবিয়ে দেবার জন্য কংগ্রেসী এবং লীগ সরকার যে অপকৌশল এবং দমননীতি চালাচ্ছে তা দেখে বুঝুন যে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করা ছাড়া দরিদ্র জনসাধারণের গতি নেই। তে-ভাগার দাবিকে ন্যায্য দাবি বলে মানাতেই ভাগচাষিদের অনেক লড়াই লড়তে হয়েছে। ১৯৩৯ সালে উত্তরবঙ্গে আধিয়ার বিদ্রোহ থেকেই সে লড়াইয়ের আরম্ভ বলা যায়। তারপর, সে দাবি মেনে নিয়েও ১৯৪৬ সালে লীগ সরকার একটা অর্ডিনান্সের খসড়া পর্যন্ত ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তার পর, সে দলিল ফাইল চাপা পড়ে গেল। তার বদলে সক্রিয় হয়ে উঠল ধরপাকড় এবং গুলি চালনার অর্ডিনান্স। ১৯৪৭ সালে হল সরকারী ক্ষমতার রদবদল। পশ্চিমবঙ্গের শাসনকর্তা হলো কংগ্রেস এবং পূর্ববঙ্গের শাসনকর্তা হলো লীগ। কিন্তু ভাগচাষিদের উপর হুকুম এল, একবছর অপেক্ষা করতেই হবে, নতুবা দেশরক্ষা আইনে তাদের শায়েস্তা করা হবে। ১৯৪৮ সাল-- ভাগচাষি আওয়াজ তুলেছে, আর অপেক্ষা করব না। সরকার প্রথমে গুলি চালিয়ে দেখল, ওরা দমে কি না। কাকদ্বীপের প্রতিরোধ দেখে বুঝল, তারা দমবার পাত্র নয়। তাই, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার তাদের ঠকাবার জন্য আবার একটা গণিতের ফরমূলা জারি করেছেন। লীগ সরকার হয়ত বুঝেছেন যে, ও সব ফরমূলা টরমূলাতে কুলবে না, তাই তাঁরা একান্তভাবে দমননীতিরই আশ্রয় নিয়েছেন দমননীতি জোর কদমে পশ্চিমবঙ্গেও চলেছে।

সুতরাং, লড়াই ছাড়া ভাগ চাষির সামনে তার দাবি পূরণের অন্য কোন রাস্তা নেই। এ লড়াই শুধু তে-ভাগাতে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না, লড়তে হবে জমির জন্য ও জমিদারি-জোতদারি খতম করা জন্য। এই লড়াইকে সরকার ডাকাতি, লুঠপাট বলে নিন্দা করে থাকে। এই নিন্দার উদ্দেশ্য, দমননীতির পিছনে সোশ্যালিষ্ট এবং বামপন্থী নেতাদেরই সমর্থন ঘোষণার সুযোগ সৃষ্টি করা। ১৯৪৬ সালে এমনি করেই সরকার সোশ্যালিষ্ট, আর. এস. পি., ফরওয়ার্ড-ব্লক প্রভৃতি দলের নেতাদের সহযোগিতা অর্জন করেছিল। এবারও সেই চেষ্টা চলেছে।

কিন্তু ভাগচাষিকে দমননীতি এবং ধাপ্পাবাজির পরোয়া করলে চলবে না, বীরপদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে।

তাকে সমর্থন করুন, গণতন্ত্রবাদী সমগ্র শোষিত জনসাধারণ, তার সঙ্গে সঙ্গে কদম ফেলুন। তুলুন শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতদের সবার দাবি। এগিয়ে চলুন প্রবল জনশক্তির ঐক্যবদ্ধ অভিযান নিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের দিকে। ঝড়ের আওয়াজ উঠেছে। এ ঝড় জোরসে ছুটুক।

দীপেন মিত্র কর্তৃক ৩নং শম্ভুনাথ পন্ডিত স্ট্রীটস্থ রংমশাল প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫ জানুয়ারি, ১৯৪৯।

কমিউনিস্ট বুলেটিন—৯

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮

এই জানুয়ারী মাসেই রিলিফের জন্য টাকা তুলুন

সরকার, জমিদার, মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

রণক্ষেত্রের প্রয়োজন সকলের আগে

মালদহের বন্যার সময়ে সেখানে রিলিফ স্কোয়াড পাঠাইবার কথা উঠিলে কোন কোন রিলিফ কর্মী প্রশ্ন তোলেন : এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রিলিফ পাঠানোর আজ আর কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে কিনা? তাঁহাদের মতে এই ধরনের ব্যাপারে স্কোয়াড না পাঠাইয়া যেখানে শ্রমিক ও কৃষকেরা সরকার-মালিক-জমিদারের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, রিলিফের কাজকে শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

অতীতে আমরা যেভাবে রিলিফের আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছি তাহাতে আমাদের রিলিফ কর্মীদের মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর। বন্যা ও ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই হোক, আর দুর্ভিক্ষ, মহামারির মত ধনিক শ্রেণির সৃষ্ট বিপর্যয়েই হোক অতীতে কোথাও আমরা রিলিফ আন্দোলনের মধ্যে শ্রেণি বিচারের স্থান দেই নাই; উহাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজ সংস্কারকের মনোভাব লইয়া পরিচালনা করিয়াছি, রিলিফের নাম করিয়া ধনিক নেতারা জনসাধারণের উপর নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, রিলিফের টাকা লইয়া চোরাকারবার করিয়াছে, ব্যাঙ্ক খুলিয়াছে। আমরা তাহাকে আঘাত করি নাই, বরং তাহাতে সাহায্য করিয়াছি; রিলিফে বিড়লার দালাল সারাওগী প্রভৃতির সহিত হাত মিলাইয়াছি। অতীতের এই সংস্কারবাদ হইতে এখন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন স্বীকৃত হইতেছে, রিলিফ কর্মীদের প্রশ্ন হইতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রিলিফ কর্মীদের ঐ মনোভাব স্বাভাবিক হইলেও নির্ভুল নয়। একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিলে তাঁহারা নিজেরাও তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জাপানে সম্প্রতি যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, জাপানের কমিউনিস্ট কর্মীরা সেখানে রিলিফের কাজ করিতে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মার্কিন-প্রভু ম্যাক আর্থার তাঁহাদের সেখানে যাইতে অনুমতি দেন নাই; এমন একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও তাঁহারা কমিউনিস্ট কর্মীদের সেবাকার্য্য চালাইবার অনুমতি দিলেন না কেন?

কারণ যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও আজ শ্রেণিসংগ্রামের চেহারা ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় গরীবদের মধ্যে যেমন আনে সর্বাধিক মৃত্যু ও ধ্বংস, ধনিকশ্রেণির মধ্যে আনে মুনাফার অফুরন্ত সুযোগ। বিহার ভূমিকম্পের কাহিনী যাহারা জানেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুগ্রহে বড়লোক ঠিকাদার-ব্যবসায়ীদের সেদিন

লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা হইয়াছিল, এমন কি, আইন-অমান্য-আন্দোলন চালু থাকা সত্ত্বেও সরকারি সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস নেতারা অনায়াসে এই রিলিফের টাকা লুণ্ঠনের কাজ চালাইয়া গিয়াছিলেন।

আর ধনিকের সৃষ্টি করা বিপর্যয়ে— অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, মহামারি, দাঙ্গা প্রভৃতিতে রিলিফের কাজ কিভাবে চালানো হয় তাহা বাংলা দেশে মন্বন্তরের সময় সকলেই দেখিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সুযোগ লইয়া গরীবের জমি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে; দাঙ্গার সুযোগ লইয়া শ্রমিকের উপর শোষণ বাড়ান হইয়াছে; গরীবের নাম করিয়া অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা চোরাবাজারে বিক্রি করা হইয়াছে, 'আগষ্ট বিপ্লবী' কংগ্রেস নেতারাই তাহার মোটা অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই টাকায় নিজ নিজ উপদল ঠিক রাখিয়া এখন মন্ত্রিসভা ভাঙ্গাগড়া শুরু করিয়াছে।

কমিউনিস্ট রিলিফ কর্মীদের এই জন্যই এই শোষকশ্রেণির এত ভয়। এই জন্যই শুধু জাপানে নয়, এদেশেও তাঁহারা কমিউনিস্ট রিলিফ কর্মীদের গ্রেপ্তার করিতে দ্বিধা করে না, তাঁহাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে ইতস্তত করে না।

বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও দাঙ্গায় বিধ্বস্ত বাস্তুহারা গরীবদের স্থায়ীভাবে জমি দেওয়া, বাড়ি দেওয়া, কাজ দেওয়া ধনিক গভর্নমেন্টের রিলিফের উদ্দেশ্য নয়। তাহারা ইহাদের ইয়োরোপের ইহুদীদের মত শোষণের হাতিয়ার করিয়া রাখিতে চাহে। বাস্তুহারাদের সস্তা মজুর হিসাবে, ক্রীতদাস হিসাবে, বেকারবাহিনী হিসাবেই রাখিতে চাহে। তাঁহাদের রক্ত শোষণ করিয়া বড়লোকরা আরও বড় হইতে চাহে। সুতরাং কোন রিলিফ কর্মীকেই একথা ভুলিলে চলিবে না যে, নিরাশ্রয় ও বিপন্ন গরীবদের এ সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্ব তাঁহাদের। প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই হোক, আর ধনিকের সৃষ্টি করা দুর্ভিক্ষ মহামারিতেই হোক বিপ্লবী রিলিফ কর্মীদের দায়িত্ব হইল বিপন্ন গরীবদের মধ্যে ছুটিয়া যাওয়া, তাহাদের মধ্যে জঙ্গী রিলিফ আন্দোলন গড়িয়া তোলা, অন্যান্য রিলিফ আন্দোলনের ভিতরকার দুর্নীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত করা, বিপন্ন গরীবদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় করা যে এই ধনিক গভর্নমেন্ট তাহাদের সত্যিকারের রিলিফ দিবে না; বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্রের জন্যে এই গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে। তাহার অর্থ এই নয় যে রিলিফ স্কোয়াডের কাজকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রচারকার্য এবং সভা-শোভাযাত্রা-গণ বিক্ষোভ পরিচালনায় সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। রিলিফ কর্মীদের নিশ্চয়ই অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে, অন্ন-বস্ত্র-ঔষধ প্রভৃতি বিলি করিতে হইবে, নিরাশ্রয়দের আশ্রয় দিতে হইবে। কিন্তু তাহা করিতে হইবে বড়লোকদের মানবতার নিকট আবেদন করিয়া নয়, বড়লোক এবং গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে গরীব শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের ঘৃণা জাগাইয়া তুলিয়া, তাহাদের সংগ্রামী ঐক্যবোধের নিকট আবেদন করিয়া। এই কাজ সাফল্যের সহিত করিতে হইলে প্রত্যেক রিলিফ কর্মীকে নিম্নলিখিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে :

(১) যেখানেই কোন বিপর্যয় হইবে কমিউনিস্ট রিলিফ কর্মীর কাজ হইবে বিপর্যয়ে যাহারা সর্বস্বান্ত হইবে প্রথমে তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া যাওয়া। গ্রাম অঞ্চলে ক্ষেত-মজুর, ভাগচাষি, মাঝারী চাষি ও কারিগর প্রভৃতিই যে কোন বিপর্যয়ে সকলের আগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাইয়া তাহাদের সংগঠিত করিয়া, তাহাদের দুর্দশার কথা সর্বত্র প্রচার করিয়া, বিপন্ন অবস্থায় জমিদার এবং গভর্নমেন্টের শোষণ-অত্যাচার কিভাবে অব্যাহত আছে

সে কাহিনী বর্ণনা করিয়া সেবাকার্য্য শুরু করিতে হইবে। শহর অঞ্চল যে কোন বিপর্যয়ে শ্রমিকশ্রেণি এবং বস্তীর গরীব বাসিন্দারাই বিপন্ন হয় সকলের আগে। কলেরা, ম্যালেরিয়া, প্লেগের মহামারির মধ্যে আমরা তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি। আমাদের কাজ হইবে এই শ্রমিক মহল্লাগুলিতে ছুটিয়া যাওয়া, তাহাদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করা, সরকার-মালিক-কায়েমীস্বার্থকে সাহায্যদান করিতে বাধ্য করা।

(২) যেখানেই সরকারের পক্ষ হইতে জনগণের উপর গুলি ও গ্যাসের আক্রমণ আসিবে, মালিকের পক্ষ হইতে শ্রমিকদের লক-আউট বা ধর্মঘটে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে, রিলিফ কর্মীদের কাজ হইবে— সেখানে ছুটিয়া যাওয়া। সেখানে সেই সংগ্রামী জনতার জন্য সাহায্য সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহাদের মেডিক্যাল রিলিফ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে; গ্রামের কৃষকের স্কোয়াডকে শহরে পাঠাইতে হইবে, শহরের শ্রমিকের স্কোয়াডকে গ্রামে পাঠাইতে হইবে, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক দৃঢ় করিতে হইবে।

(৩) সরকারি আক্রমণ এবং গোপন অবস্থার কাজে শ্রমিক ও কৃষক নেতাদের মধ্যে যাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে, যাঁহারা অন্ন-পথ্য-ঔষধের অভাবে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইবেন— রিলিফ কর্মীদের কাজ হইবে তাঁহাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করা তাঁহাদের জন্য পথ্য, ঔষধ ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

(৪) রিলিফের কাজ আজ আর কয়েকজন মুষ্টিমেয় কর্মীর কাজ নয়, শুধু একটা 'ফ্রন্টের' দায়িত্ব নয়। প্রত্যেক গণসংগঠনকে তাহার রিলিফ কর্মী বাছাই করিতে হইবে, রিলিফের কাজ হাতে লইতে হইবে। যেখানেই সংগ্রাম হইবে, যেখানেই শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হইবে, কৃষকদের জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইবে, কর্মীদের জেলে আটক করা হইবে, তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র অনশনের সম্মুখীন হইবেন; দীর্ঘকালের ধর্মঘট বা লক-আউটে শ্রমিকদের মনোবল ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইবে। ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রিলিফের গুরুত্ব অনেকখানি এবং এই জন্যই প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে রিলিফের কাজ প্রতিদিনের কাজ। কৃষক আন্দোলনের পক্ষে ইহা যে কতখানি সত্য তাহা বড়া কমলাপুর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। উহা সাধারণ কৃষকদের সংগ্রামী চেতনা বাড়াইয়াছে, অন্যান্য শ্রেণির সহিত কৃষকদের ঐক্য গড়িতে সাহায্য করিয়াছে।

তাই, প্রত্যেক গণসংগঠনের আজ দায়িত্ব :— নিজেদের রিলিফ স্কোয়াড ও রিলিফ ফাণ্ড তৈরি করা; প্রাদেশিক রিলিফ সংগঠনের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা এবং যে কোন বিপর্যয়, যে কোন আক্রমণে সমস্ত শক্তি লইয়া প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ হইতে গরীব জনসাধারণকে রক্ষা করা। যেখানে যতটুকু আইন সঙ্গত কাজের সুযোগ আছে তাহার পূর্ণ ব্যবহার করিয়া সংগ্রামী জনতার পাশে দাঁড়াইবার জন্যই ডাক্তার, মেডিক্যাল ছাত্র, ক্লাব ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বে-আইনি অবস্থায় কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে।

(৫) রিলিফের কাজ সমাজ সংস্কারের কাজ নয়, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ এবং একমাত্র শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে কঠোর শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়া এই কাজ চালাইতে হইবে; এই কাজের মধ্য দিয়া অন্যান্য গণতান্ত্রিক জনসাধারণকে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে টানিয়া আনিতে হইবে।

বড়া-কমলাপুর, কাকদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, আলমবাজার, পোর্ট সর্বত্র শ্রমিক-কৃষকের উপর

ব্যাপক আক্রমণ চলিয়াছে; রেল ও পোস্ট-অফিস, পোর্ট ও ডকের শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট শুরু করিবার সঙ্গে সঙ্গে, তে-ভাগার সংগ্রামে গ্রামের গরীবরা অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট তাহার শেষ শক্তিটুকু প্রয়োগ করিবে। জমি, রুটি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার এই সংগ্রামকে অপরাজেয় করিয়া তুলিবার জন্য রিলিফের কাজের দিকে এখনই নজর দিতে হইবে। মুক্তি সেনাদের রসদ সংগ্রহ করার কাজে, প্রত্যেকটি সংগ্রাম ক্ষেত্রে ডাক্তার, ঔষধপত্র, অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র লইয়া ছুটিয়া যাইবার জন্য এখনই প্রস্তুত হইতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে জানুয়ারী মাসে আমাদিগকে রিলিফের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। রিলিফ সপ্তাহ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গণ-সংগঠনকে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র ও কর্মচারীদের মধ্যে স্কোয়াড পাঠাইতে হইবে। শ্রেণি-শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জাগ্রত করিয়া অর্থ-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রণক্ষেত্রের প্রয়োজন সকলের আগে।

— প্রোসেক্ট

প্রাদেশিক সারকুলার নং — ১২

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি

১৭ নভেম্বর, ১৯৪৮

কৃষি-মজুরের সংগ্রামে নেমে পড়ুন

গত ১৩-১৫ নভেম্বর বর্ধিত প্রাদেশিক কৃষক ফ্রাকশানের সভায় কৃষকদের সংগ্রাম ও সংগঠনের কতকগুলি মূল প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। তে-ভাগার সংগ্রাম ও ক্ষেত মজুরদের সংগ্রাম এই দুইটি মূল সংগ্রামের প্রস্তাব পার্টি কর্মীদের জন্য গৃহীত হয়েছে। এই প্রস্তাবের আলোচনা গ্রামাঞ্চলের নতুন সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনের সূচনা করবে। এই প্রস্তাব অবিলম্বে ইউনিটে ইউনিটে কৃষক কর্মীদের ভিতর আলোচনা করে সঙ্গে সঙ্গে প্রতি অঞ্চলে আন্দোলন ও সংগ্রামে নেমে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সম্বন্ধে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নোট থেকে কিয়ৎ অংশ তুলে দিলে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হবে—

"বীরভূমের কৃষি-মজুরদের আন্দোলন নতুন বৈপ্লবিক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। একবার যদি তোমরা এই শ্রেণি ও গরীব চাষিদের ওপর নির্ভর করতে পার, তবে তোমরা 'এক প্রচণ্ড শক্তি'কে ময়দানে নামাতে পারবে। দোদুল্যমান কর্মীদের মনে এই উপলব্ধি নাই। তারা এখনো আমাদের খণ্ড খণ্ড স্থানীয় ছোটখাট কৃষক ঘাঁটিগুলির কথাই ভাবে; এগুলোর বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির কথাই তারা চিন্তা করে। তারা বুঝতে পারছে না যে, পার্টি যদি প্রধানত ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষিদের কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ আহ্বান জানায় তাহলে বর্তমানে এই সব কৃষক ঘাঁটির দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতার সীমার বাঁধ ভেঙে যাবে এবং তার দ্বারা পার্টি এক বিরাট কৃষক সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারবে।" —প্রোসেক্ট

১
গ্রামের গরীব

পশ্চিমবাংলার কৃষক সমাজের ঠিক কত অংশ কৃষিমজুর বা ক্ষেতমজুর তা পরিষ্কার করে বলা যায় না। তারা যে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৯৪০ সালের ফ্লাউড কমিশনের মতে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা শতকরা ২৯.২ থেকে কমে ২২ জন দাঁড়িয়েছে।— একথা বলা হলেও বর্তমানে তা সত্য নয়। পাঁচ বছর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় একদিকে খোদখামার ধ্বংস হয়ে ভাগচাষ যেমন বেড়েছে তেমনি ভাগচাষের চেয়েও চাষে দিন মজুর নিয়োগ অনেক বেশি বেড়েছে। মহাজনী ঋণের দায়ে বহু কৃষক জমি হইতে বিতাড়িত হয়েছে— আজও তা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। মহাজন হয় বেশি বেশি জমির মালিক আর কৃষক হয় সর্বস্বান্ত। তার ফলে যন্ত্রপাতি কিনে মজুর নিয়োগ করে ধনতান্ত্রিক চাষ প্রথাও শুরু হয়েছে। এই গতি অবাধে চলতে থাকলে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা হুড়হুড় করে বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু উৎখাতের বিরুদ্ধে কৃষকের তীব্র সংগ্রাম এবং মহাজন-জোতদার প্রভৃতি জমির মালিকদের যন্ত্রক্রয় করে ধনবাদী পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে চালু করার অক্ষমতার দরুণ সে গতি

হবে মন্থর। যাই হোক, ক্ষেতমজুরের সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা শতকরা ৩৬.৪ জন। এক একর জমি আছে বা ভাগে চষে এমন চাষির সংখ্যার তার সাথে জুড়লে শতকরা ৫০ জনেরও বেশি হয়। এরাই প্রকৃতপক্ষে গ্রামের গরীব। শ্রেণিগত বিচারে এই ধরনের সমস্ত কৃষককে সত্যই বলা চলে গ্রামের আধা-সর্বহারা বা ক্ষেতের মজুর। কে ক্ষেতমজুর আর কে গরীব ভাগচাষি তা নির্ণয় করার মত কোন সুনির্দিষ্ট সীমা রেখা নাই। ঘুণধরা আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা অতিশয় অনিশ্চিত অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে। যে কৃষক আজ হয় তো ২|৩ বিঘা জমিতে ভাগচাষ করে কাল সে দিন মজুরে পরিণত হবে। কোন ক্ষেতমজুর না খেয়ে না খেয়ে কিছু জমিয়ে কোন বছর হয়তো একটা হাল কিনে দু বিঘা জমি ভাগে চাষ করলো; আবার কোন গরীব ভাগচাষি কখন হয়তো ঋণ ও পেটের দায়ে হালখানা বিক্রি করে দিয়ে পরিপূর্ণ ক্ষেতমজুর হয়ে পড়ল— এই দুই অবস্থার ভিতর মূলত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। প্রধানত মজুরি করেই যাদের দিনাতিপাত করতে হয় বা দু-দশ দিন পরে তাই করতে হবে তারা সবাই ক্ষেতমজুর। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যারা একেবারে নিঃস্ব অথবা নিঃস্ব হতে চলেছে; যাদের এক কাঠা জমিও নিজের বলতে নাই বা থাকলেও তা যে কোন দিন হাত থেকে সরে যাবে; সারা বছর অপরের ক্ষেতে পরিশ্রম করেও যাদের সংসার অনশনে দিন কাটায়; সত্যই নিজেদের বলতে যাদের জমি বা কৃষি উৎপাদনের কোন যন্ত্রপাতি নাই তারা সবাই কৃষি-মজুর। এরা কেউ বা অপরের ধানের ক্ষেতে, কেউ বা পাটের ক্ষেতে, কেউ বা পানের বরোজে, কেউবা বসত বাড়িতে মজুরি খাটে, কেউ বা জঙ্গলে কাঠ কাটে আবার কেউ বা খালে মাটি কাটে। বিভিন্ন জেলায় এদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়— মজুর, মুনিষ, মাহিন্দার, বোঁটারে, কৃষাণ, কামিন ইত্যাদি। মজুরি ও মেহনতের রকমফের অনুযায়ী এদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। কেউ দৈনিক মজুরি পায়, কেউ সারা বছরের জন্য একটা চুক্তিবদ্ধ বেতন পায়, কেউ কাজের ফুরাণে মজুরি পায়, কারুর খোরাকী বেতনের মধ্যেই ধরা হয় আবার কেউবা খোরাকী ছাড়াই মজুরি পায়।

২

কৃষি-মজুরের দুঃসহ জীবন

অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক সব দিক থেকে ক্ষেতমজুররা গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার ভিতর সবচেয়ে দূরবস্থায় দিন কাটায়। তারা "শিক্ষিত", "সভ্য" ধনীদের কাছে ঘৃণিত জীব মাত্র, তারা অস্পৃশ্য, সমাজে তাদেব স্থান নাই। তাদের কাজের সময়, মজুরির হার, সামাজিক নিয়ম সবকিছুই গ্রামাঞ্চলের মোড়ল ও ধনীদের মর্জিতে তৈরি হয়। কোথাও তাদের ১০|১২ ঘন্টা, কোথাওবা ১৪|১৫ ঘন্টা করে খাটান হয়। তারা নিজেরাই সংগ্রাম করে করে কাজের ঘন্টা কমায়, মজুরি বাড়ায়। এসব নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কোন আইন-কানুন নাই। মজুরির পরিমান আগে ছিল গড়ে ছয় আনা থেকে নয় আনা— বর্তমানে খোরাকী ইত্যাদি ধরে গড়ে দেড় টাকা তারা পায়। মেয়েদের মজুরি পুরুষদের চেয়ে বেশ কিছু কম। মজুরির হার সবচেয়ে কম বীরভূম জেলায়। সব জেলাতেই দেখা যায়— চাষ ও ধানকাটার মরশুমে সাধারণত মজুরি বাড়ে। যে অঞ্চলে মজুর কম সেখানে মজুরির হার কিছুটা বেশি দু'টাকার মত। পনের বছরের

তুলনায় ক্ষেতমজুরের মজুরি বেড়ে হয়েছে দুই থেকে চার গুণ— আর গ্রামদেশে জিনিসপত্রের দর বেড়ে হয়েছে ছয় থেকে আট গুণ। মোট কথা ক্ষেতমজুরদের মজুরির কোন স্থায়ীত্ব নাই, কাজের স্থিরতা নাই। চুক্তিবদ্ধ মাহিনাও নানা ছুতোয় কাটা যায়। তারা প্রতিদিন সকালে নিঃস্ব অবস্থায় জীবন শুরু করে। খাওয়ার চিন্তাতেই তারা শীর্ণ। ঘরবাড়ি, কাপড় চোপড়, ঔষুধপত্র— এ সবের জন্য চিন্তা করার অবসরই পায় না। কোন রকমে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ভাঙ্গা চালার নীচে মাথা গুঁজে দিন কাটায়।

সামাজিক দিক থেকে ক্ষেতমজুর-দিনমজুররা সাধারণত একবারে নিম্নস্তরে। হাড়ি, বাগ্দি, ডোম, বুনো, মুচি, বাউরী, দুলে, বর্গক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, মাঝি, কুর্ম্মী, ওরাও, মুণ্ড আদিবাসী প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে তফশিলিভুক্ত নানা সম্প্রদায়ের লোক এরা। শিক্ষা-দীক্ষা এদের নাগালের বাইরে। গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে ঘৃণিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষ এরা। বিয়ে-সাদির ব্যাপারেও এরা মুনিব বা ধনীদের হাতে বাঁধা। উত্তর বঙ্গের কোন কোন জেলায় ও পশ্চিম বঙ্গের কোথাও কোথাও এদের একটি পরিবার গ্রামের ধনীদের দাস হিসাবেই বসবাস করে। বাবুদের গোলামী করেই এদের দিন কাটাতে হয়। গ্রামাঞ্চলের ধনীদের মর্জিতে যা অন্যায় বলে স্বীকৃত হবে তার জন্য এদের শাস্তি হয়— গরু ছাগলের মত হাত পা বেঁধে মার দেওয়া। ধনীদের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী মত এদের প্রহার খেতে হয়। অথচ এরাই কৃষি-উৎপাদনের প্রধান শ্রমশক্তি।

রাজনৈতিক অধিকার বলতে এদের কিছুই নাই। ফুড কমিটি, সমবায় সমিতি ইত্যাদি ও অন্যান্য ব্যাপারে যেটুকু ভোটাধিকার এদের আছে, চলে আসছে বা ভবিষ্যতে পাবে তার ওপরেও গ্রামের ধনীদের হকই বেশি। তারাই এদের হয়ে সে অধিকার ভোগ করে। মোড়লরাই সাদা কাগজে এদের সই নিয়ে বা টীপ দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে।

৩

কৃষক সভা ও গ্রাম্য মজুরদের সংগ্রাম

কৃষক সভার পক্ষ থেকে এই সব কৃষি মজুর— যারা গরীব ভাগচাষিদের সঙ্গে মিলে সারা বাংলার মোট চাষের জমির শতকরা ৫৮ ভাগে চাষ আবাদ করে— তাদের কথা খুব কমই চিন্তা করা হয়েছে। ১৯৪৬ সালে ভাগচাষিদের তে-ভাগা লড়াই-এ ক্ষেতমজুর সম্পর্কে আমাদের প্রথম সজাগ দৃষ্টি পড়ে। সে বিরাট কৃষক জাগরণে সব রকমের চাষিই মেতে উঠেছিল আর ক্ষেতমজুররা সেই সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়েছিল। তারপর থেকেই বাংলার কৃষক সভায় তারা নিজেদের স্থান করে নিতে পেরেছে। সারা ৪৭ সাল আমরা ক্ষেত মজুরদের কথা ভেবেছি। তাদের দাবি-দাওয়ার কথা আলোচনা করেছি। আবার কোন কোন অঞ্চলে কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছি। সভা এখন এবিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে— কৃষক সমাজের এই বিরাট নিঃস্ব ও বঞ্চিত অংশের দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি না দিলে কৃষক সমস্যা ও ভূমি-ব্যবস্থা কোনটারই কিছু করা যায় না।

সংগ্রামী রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। কৃষক সভার যে মূল কথা— জমিদারি প্রথায় উচ্ছেদ ও কৃষকদের ভিতর জমি বিলি— তার সাফল্যের জন্য

সুতীব্র সংগ্রামের প্রয়োজন। এই সংগ্রামের সুযোগেই আবার দরিদ্রতম কৃষকরা এগিয়ে আসছে সবচেয়ে বেশি। জমিদারি প্রথার শোষণের বিভিন্ন শিকড় থেকেই গজিয়ে উঠেছে কৃষকের বিভিন্ন স্তর— ভাগচাষি, ক্ষেতমজুর প্রভৃতি। অন্যান্য কৃষকদের সঙ্গে ক্ষেতমজুরদেরও শোষণের মূল শিকড় জমিদারি প্রথা। তাদের স্বার্থের সঙ্গে এই প্রথার অবসান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গ্রামাঞ্চলের এই বলিষ্ঠ ও সংগ্রামশীল অংশকে বাদ দিয়ে কৃষক সমাজের কোন সংগ্রামই সাফল্য লাভ করতে পারে না। কৃষি মজুরদের মত যাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু নাই, যাদের হারাবার কিছু নাই তারা প্রাণ দিয়ে লড়ে; আর লড়াই যত তীব্র ও জোরালো হয় কৃষক সমাজের অন্যান্য অংশও তত বেশি ভরসা পায়, নিজশক্তিতে আস্থাবান হয়, ততই আবার মধ্যবিত্তর চাষির ইতস্তত ভাব কাটে। এবছরকার বীরভূমের ক্ষেতমজুর ও কৃষাণদের সংগ্রাম তার প্রমাণ দিয়েছে। ক্ষেতমজুরদের দাবি নিয়ে লড়লে কৃষক সমিতি ভেঙ্গে যাবে— এই সন্দেহ একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। প্রথমদিকে কিছু অংশ সরে গেলেও, নিরপেক্ষ হয়ে গেলেও তারা তাদের গ্রামের সাধারণ শত্রু ও সরকারি নির্যাতন দেখে নিজেদের জমি ও ফসলের লড়াই-এ আবার গ্রামের মজুর ও গরীবদের পাশে এসেই দাঁড়ায়।

এ কথা বুঝলেও আমরা কোন জেলাতেই এখনো ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামে মণপ্রাণ ঢেলে দিই নাই। কৃষক আন্দোলনের প্রদেশ, জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে আসার ফলে পূর্বের শ্রেণিগত দোদুল্যমানতা পরিহার করে এখনো গ্রামাঞ্চলের সর্বহারাদের সাথে আমাদের একাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় নাই; তাই ক্ষেতমজুরদের কোথাও কিছুটা আন্দোলন হলেও তাদের দাবি নিয়ে সংগ্রামের সময় নানা প্রশ্ন ও সংশয় আমাদের মাথায় আসে। আমরা ভুলে যেতে চাই যে মধ্যবিত্ত কৃষকের দ্বিধা সংশয় থাকা সত্ত্বেও তাকে আসতেই হবে গরীব চাষি ও ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে। প্রতি মুহূর্তে সে দেখছে— ধনতান্ত্রিক সমাজ ও জমিদারি প্রথাতে তার টিকে থাকার কোন উপায় নাই। প্রতিনিয়ত এই ব্যবস্থা তাকে ঠেলে দিচ্ছে গ্রামের গরীবদের দিকে। সেই গ্রামের গরীবদের শক্তি ও সংগঠন আমরা যত বাড়াতে পারব তত তাড়াতাড়ি মধ্যবিত্তর চাষিরা আমাদের দিকে আসবে। গতবারের লড়াই-এর অভিজ্ঞতার পরেও আমরা বহু জায়গায় তেভাগা ও ফসলের লড়াই-এ স্থানীয় ক্ষেতমজুরদের দাবি নির্দিষ্ট করে তাদেরও এই অখণ্ড সংগ্রামে আনবার প্রচেষ্টা করছি না। তেভাগার ও ফসলের লড়াই-এর সাথে ক্ষেতমজুরদের লড়াই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাদের দাবি উপেক্ষিত হলে গ্রামের কৃষক-লড়াই কিছুতেই দানা বাঁধবে না— জোরালো হবে না।

৪

ক্ষেত মজুর সমিতি গঠন

"গ্রামাঞ্চলের আমাদের কাজ জমিদার শ্রেণিকে ধ্বংস করা এবং শোষক ও কুলাক— মুনাফাখোরদের প্রতিরোধ পরাস্ত করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা আধা প্রলেতারিয়েত গরীব চাষিদের ওপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করতে পারি। কিন্তু মধ্যবিত্ত আমাদের শত্রু নয়, সে ইতস্তত করছে, আরো করবে।" লেনিনের এই মূল কথা মনে রেখে মধ্যবিত্ত চাষিদের টেনে আনার সংগ্রাম সফল করার দিকে লক্ষ্য রেখে জমিদারি প্রথা ধ্বংস করা ও জমি বিলির সংগ্রামের মূল শক্তি গ্রামের গরীবদের সংগঠিত করার কাজে লেগে যেতে হবে। প্রত্যেক জেলায় ক্ষেতমজুর

ও গরীব চাষিদের সংগঠিত করার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে হবে। ক্ষেতমজুর ও গরীব ভাগচাষিদের (যারা নিজেরাও মজুর খাটে) নিয়ে "ক্ষেতমজুর সমিতি" অবিলম্বে না গড়তে পারলে গ্রামাঞ্চলে কৃষকসভার অস্তিত্ব থাকবে না। কৃষকসভার শত্রুরা যখন সবচেয়ে বেশি অস্ত্র শানাচ্ছে তখন কৃষক সভার নিজের আসল শক্তি ক্ষেতমজুর শ্রেণিকে সুসংগঠিত করতেই হবে, তা না হলে আপাতদৃষ্টিতে কৃষক সমিতি বর্তমান থাকলেও তা অবিলম্বে শুকিয়ে যাবে।

ক্ষেতমজুর সমিতির সভ্য হলেই তার নাম সঙ্গে সঙ্গে কৃষকসমিতির সভ্য তালিকাভুক্ত হল— এজন্য দুবার দুইটি খাতায় সভ্য হওয়ার প্রয়োজন নাই। ইউনিয়ন ক্ষেতমজুর সমিতি সরাসরি কৃষকসভার (ইউনিট) অংশ সিহসাবেই গণ্য হয়— বর্তমান কৃষক সভার গঠনতন্ত্রে এই নিয়মই আছে। প্রাদেশিক অফিস থেকেই ক্ষেতমজুর সমিতির ছাপা রসিদও পাওয়া যায়।

ক্ষেতমজুর সমিতির সভ্য সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি অঞ্চলের তাদের কাজের ঘন্টা, মজুরির নিয়ম, তাদের অবস্থা ও সংখ্যা, মজুর খাটানোর স্থানীয় প্রথা প্রভৃতি বিষয়ের সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্যের ভিতর দিয়েই স্থানীয় সমিতির আশু দাবি স্থির করা সহজ হবে। তার ওপর ইস্তেহার দেওয়া ও পড়ান, বৈঠক করা এবং গরীব চাষি ও ক্ষেতমজুরদের ঘরের যুবকদের নিয়ে বাহিনী তৈরি করার কাজ করতে হবে। গ্রামের ক্ষেতমজুর সমিতি, কৃষক সমিতি সবই কৃষকদের কাছে প্রকাশ্য ও আইনি হলেও তা সরকার ও শত্রুদের কাছে অপ্রকাশ্য ও গোপন। সংগঠনের কাগজপত্র, হিসাব ইত্যাদি সব কিছু শত্রুদের কাছে অজানা রাখতে হবে। সমিতিকে রেজেস্ট্রী করা, শহরের ওপর তার প্রকাশ্য অফিস খোলা— ইত্যাদি ধরনের আইনি মোহ যেন আমাদের না থাকে। কৃষক জনসাধারণের কাছে প্রকাশ্য প্রচার, প্রকাশ্য কাজ এবং শত্রুদের কাছে সংগঠনের প্রকাশ্য রূপ তুলে ধরার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। শত্রুরা সংগঠনের কিছুই জানতে পারবে না— তারা সংগ্রামের ময়দানে তার প্রকাশ্য শক্তির সম্মুখীন হবে। সমিতি সংগঠনের গোপন কায়দা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। তাছাড়া, ক্ষেতমজুর সংগঠন করতে গেলেই দেখা যাবে যে আমাদের কর্মীরা নাম-ধাম লিখে আনতে পারছে না; অগত্যাই আমরা টিপসই ও গ্রামের জন্য নির্দিষ্ট রসিদ বই-এ ১, ২, ৩ নম্বরের সাহায্যে সমিতির সভ্যদের তালিকাভুক্ত করব। ব্যাপক গণসংগঠনের নিরক্ষর সভ্য সংগ্রহের নতুন কায়দা ও অভিজ্ঞতা আমাদের সঞ্চয় করতে হবে।

ক্ষেতমজুরদের সংগঠন ও দাবির কথা উঠলে অনেক কর্মী বলেন— "যেখানে ক্ষেতমজুর নাই সেখানে কি হবে।" এ প্রশ্নের শুধু একটি মাত্র জবাবই আছে— জেলার যেখানে ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষি আছে সেখানে যান, নতুন করে কাজ শুরু করুন। আগে যেখানে সমিতি করেছেন তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্থানীয় কর্মীদের ওপর ভার দিন; দৈনন্দিন রাজনৈতিক প্রচার, সেখানকার স্থানীয় কৃষকদের খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি দাবির জন্য সংগ্রামের প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে সেই সব অঞ্চলের স্থানীয় কর্মীদের সাহায্য করুন। আর আপনারা এইসব কৃষক ঘাঁটিকে সম্বল করে তাদের সাহায্যে জেলার গরীব অঞ্চলে নতুন সংগঠন গড়বার কাজে অগ্রণী হোন। সভার সংগ্রামশীল কর্মীরা গরীব অঞ্চলে নিজেদের কর্মস্থল সরিয়ে নিন। পূর্বের ঘাঁটিতে যদি প্রকৃতপক্ষেই মধ্যবিত্ত কৃষকের সংখ্যা শতকরা ৯০ জনও হয় তবু সেখানকার দশজন ক্ষেতমজুরকে দলে আনুন— স্থানীয় সমিতিতে তাদের দাবি পূরণের ব্যবস্থা করুন।

সঙ্গে সঙ্গে গরীব অঞ্চলের সংগঠন ও সংগ্রাম দানা বাঁধলে এই সব অঞ্চলের সংগঠনও সংগ্রামশীল হয়ে উঠবে। তখন সর্বত্রই গরীব চাষি ও ক্ষেতমজুররা সমিতির কমিটিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। সমিতিগুলির সংগঠন ও চেহারা তখন সংগ্রামশীল ও বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করবে।

প্রতি জেলায় পরিকল্পনা অনুসারে ক্ষেত-মজুরদের সংগঠন তৈরি করতে পারলে অন্যান্য অঞ্চলের বা কৃষকদের অন্যান্য অংশের সংগ্রাম পরিচালনা সহজ হবে। ক্ষেতমজুরদের মধ্যে ... এই কঠিন ও অতি প্রয়োজনীয় কাজে অগ্রণী হতে হবে। এদিকে শ্রেষ্ঠ কর্মীরা এগিয়ে এলে সাধারণ কর্মীদের দৃষ্টিও এদিকে পড়বে। এ কাজে বিলম্ব করলে গ্রামে আমাদের শক্তি পঙ্গু হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই যেখানে আমাদের সংগঠন নাই বা দুর্বল সেখানে আদিবাসী, তফশিলি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা জাতিগত আন্দোলন করে কৃষক সমাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, তাদের ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করছে। ভূমি-বিপ্লবের প্রধান শক্তি কে দুর্বল করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। সুতরাং এদিকে দৃষ্টি দিতে আমরা যেন আর একদিনও দেরি না করি।

৫

ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামে আহ্বান

প্রতি অঞ্চলের ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষিরা জীবনধারনের দুঃসহ জ্বালা আর সহ্য করতে পারছে না। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক লাঞ্ছনা তাদের প্রতিনিয়তই সংগ্রামের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এদের দাবি নিয়ে আমাদের আজই সংগ্রামে নামতে হবে। "জমি চাই" তাদের মূল দাবি— সেই লক্ষ্য রেখে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে প্রতিদিনকার সংগ্রামে। দৈনন্দিন রুজি-রোজগারের সমস্যা, মারধর লাঞ্ছনা অত্যাচার তাদের সর্বত্রই সংগ্রামের আহ্বান জানাচ্ছে। তাদের প্রত্যেকটি দাবি নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সংগ্রামে নামলে ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষিদের এক বিরাট ও ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি হবে।

স্থানীয় চাষের অবস্থা, মজুরের সংখ্যা, স্থানীয় জিনিসপত্রের দাম প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অঞ্চলে এদের আশু দাবি নির্ণয় করতে হবে। ক্ষেতমজুর সমিতির প্ল্যাটফর্ম থেকে ঘোষণা করতে হবে— মজুরি কত হবে, কতক্ষণ কাজ করবে, কোন্ কোন্ অত্যাচারী তাদের শত্রু। কৃষকদের অন্যান্য অংশ যারা স্থানীয় কৃষক সমিতিতে আছে তাদের এই সব সংগ্রামের সমর্থনে দাঁড় করাতে হবে।

হ্যাণ্ডবিল-পোস্টার মারফৎ এদের দাবি সর্বত্র ছড়াতে হবে। কৃষক সমিতি ও ক্ষেতমজুর সমিতির প্রচার বাহিনীর মারফৎ এদের দাবি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই ভাবে প্রদেশের দিকে দিকে এদের সংগ্রাম প্রসারিত করতে হবে। বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষিদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে নীচের আওয়াজ থেকে বেশ কিছু আভাষ পাওয়া যাবে। এই সব আওয়াজ তুলে গ্রামের বিপ্লবী অংশকে সংগঠিত করাই আমাদের প্রধান কাজ। ভাগচাষিদের তে-ভাগার লড়াই, মধ্যবিত্ত চাষির খাজনা ও ট্যাক্স লোন আদায় বন্ধের সংগ্রামের সাথে এদের সংগ্রাম তীব্র করে তুলতে হবে। এ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গ্রামাঞ্চলের এই সব ক্ষেত-মজুর ও গরীব চাষিদের নতুন মানুষ করে তুলতে হবে। সংগ্রামের ময়দানেই এদের নতুনভাবে মনুষ্যত্ববোধ জেগে উঠবে। তখন সে বিরাট শক্তি হয়ে উঠবে দুর্দম, অপরাজেয়। সেই

অপরাজেয় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার সংগ্রামে আমাদের কর্মীদের অগ্রণী হতেই হবে। লালঝাণ্ডার নীচে তারা যে সংগ্রামে নামবে সে সংগ্রামের কতকগুলি দাবি—

১। আট ঘন্টার বেশি, খাটুনী নাই।

২। নিম্নতম মজুরি দৈনিক দুই টাকা।

৩। খাওয়াপরা বাদে মাহিন্দারদের নিম্নতম মাসিক মাহিনা ৩০ টাকা।

৪। বাগালী প্রথা (ছোট ছেলেদের চাকর খাটানো) বন্ধ কর।

৫। কৃষাণের (মালিকের হালগরু, চাষির মেহনত ও খরচ প্রথা) উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ নয় অর্ধেক চাই; বিনা সুদে খোরাকীর ধান ও চাউলের নগদ টাকা, মুনিষ লাগান ও উচ্ছেদ বন্ধ কর।

৬। ভাগচাষে ঠিকা বা অন্য কোন ব্যবস্থা নাই— সব তেভাগা।

৭। জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না।

৮। কৃষাণ ও ভাগচাষিদের দিয়ে মুনিবের ঘরে বেগার খাটান বন্ধ কর।

৯। পুকুরে মাছধরা, জঙ্গলে কাঠ কুড়ান এবং ডাঙ্গার চরে গরু চরান বন্ধ করা চলবে না।

১০। গোলামী-প্রথা— মুনিবের ঘরে বাঁধা রাখার প্রথার অবসান চাই।

১১। মারধর, বেঁধে এনে প্রহার করার প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

১২। গ্রামের অত্যাচারী ধনীর ঘরে কাজ কর্ম সব কিছু বয়কট।

১৩। সস্তায় কাপড়-চোপড়, তেল, নুন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ চাই, চোরাবাজারের উচ্ছেদ চাই।

১৪। অস্পৃশ্যতা ও অত্যাচারমূলক সামাজিক বৈষম্য প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চাই।

১৫। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা চাই।

১৬। সকলের ভোটাধিকার ও সে অধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা, সভা-সমিতি ও সংগঠনের অবাধ অধিকার চাই।

১৭। আগের দেনা-সুদ সব কিছুর রেহাই।

১৮। পতিত জমি দখল ও চাষ করতে দিতে হবে।

১৯। জমিদারি ধ্বংস করে সবাইকে জমি দিতে হবে।

কমিউনিস্ট বুলেটিন—৮

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮

কৃষি-সংকট ও কৃষকের লড়াই

অতীতের বিচ্যুতি ও বর্তমান লড়াই-এর নূতন দৃষ্টি সম্পর্কে প্রস্তাব

প্রাদেশিক পার্টির কৃষক-সাব কমিটির সভার আলোচনায় স্থির হয় যে কৃষক-আন্দোলনের মূল ত্রুটি-বিচ্যুতির বিশ্লেষণ করিয়া বর্তমানের নূতন কৃষক-সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বচ্ছতা আনিবার জন্য একটি মূল প্রস্তাব রচনা করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় কমিটিও নির্দেশ দিয়াছেন— এ বিষয়ে কর্মীদের নূতনভাবে শিক্ষা দিবার জন্য এবং কৃষক আন্দোলনে নূতন বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি আনিবার জন্য অবিলম্বে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই প্রস্তাবটি দেওয়া হইল। এই প্রস্তাবে অতীতের কৃষক সংগ্রামে বিশেষত তেভাগা লড়াই-এ আমরা যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইয়াছি তাহার মূলসূত্রগুলি তুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং বর্তমানের কৃষক আন্দোলনের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোক সম্পাত করা হইয়াছে। এই প্রস্তাব প্রতি ইউনিটে ও স্থানীয় পার্টির কৃষক-নেতৃত্বের ভিতর আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই প্রস্তাবে উল্লিখিত মূল ধারাগুলি অবলম্বন করিয়া প্রতি ইউনিটকে নিজ নিজ অঞ্চলের অতীত কৃষক সংগ্রাম সম্পর্কে বাস্তব বিচার করিতে হইবে এবং বর্তমান আন্দোলনে স্থানীয় পার্টির ভিতরে এখনো যে শক্তি পিছনে টানিতেছে তাহার নিখুঁত বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ইউনিটগুলি এই ভিত্তিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নূতন ধারায় অগ্রগতি সম্পর্কে যে সব কংক্রিট রিপোর্ট পাঠাইবেন তাহা "পার্টি আলোচনা" সিরিজে প্রকাশিত হইবে। একমাত্র এইভাবেই এই প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ও নূতন ধারার ইঙ্গিতগুলিকে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে। আশা করা যায় যে, প্রতি ইউনিট এবিষয়ে অবহিত হইবেন। — প্রোসেক্ট

১
কৃষি বিপ্লবের শক্তি

বাংলার কৃষকদের শতকরা প্রায় ৮৬ জন গরীব কৃষক। জমিদার, জোতদার, মহাজন, ব্যাপারী এবং ধনী কৃষক দ্বারা তাহারা নিত্য শোষিত হয়। পরিবার পিছু ইহাদের ৫ একরেরও কম জমি। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৩৬ জন একেবারেই ভূমিহীন, তাহারা হয় ক্ষেত মজুর অথবা ভাগচাষি। বাংলার সমস্ত আবাদী জমির শতকরা মাত্র ৩৮ ভাগ এই সমস্ত গরীব চাষিদের খাস দখলে আছে।

জমিদার, জোতদার এবং মধ্যবিত্ত কৃষক গ্রাম্য জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৪ জন। কিন্তু ইহাদের খাস দখলে আছে সমস্ত আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ। ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত কৃষকের সংখ্যা (অর্থাৎ যাহারা কিছুটা অবস্থাপন্ন কিন্তু যাহাদের অধিকাংশ সাধারণত মজুর কিংবা ভাগচাষিকে শোষণ করে না) শতকরা ৫ হইতে ১০ জনের বেশি হইবে না। পরিবার

পিছু ইহাদের জমির পরিমাণ ৫ হইতে ১০ একরের মধ্যে।

জমিদার এবং জোতদারেরাই জমির প্রধান মালিক, গরীব এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের প্রধান শোষণকারী। কিন্তু ধনী কৃষকও তাহাদের শোষণের অংশীদার। যাহারা নিজ হাতে কৃষিকাজ করে অথচ বেশির ভাগ জমিতে মজুর কিংবা ভাগচাষি খাটায় অথবা খাজনায় জমি পত্তন দেয় তাহারাই ধনী কৃষক। জমিদার-জোতদারের বিরুদ্ধে গরীব কৃষকের সংগ্রামের সময় তাহারা জমিদার এবং জোতদারের পক্ষই গ্রহণ করিয়া থাকে, গ্রামে কংগ্রেসী এবং লীগ সরকারের ঘাঁটি স্বরূপ জমিদার এবং জোতদারদের দালালি করাই তাহাদের কাজ।

জমির জন্য কৃষকের লড়াইয়ে সর্বাপেক্ষা প্রধান শক্তি ক্ষেতমজুর এবং গরীব চাষি, যাহারা গ্রামবাসীদের শতকরা ৮৬ জন। শ্রমিকের নেতৃত্বে তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে সবচেয়ে অগ্রগামী, কারণ তাহারা কাহাকেও শোষণ করে না, বরং জমিদার, জোতদার, চোরাকারবারী প্রভৃতি সকলের দ্বারাই শোষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী সরকার এবং পূর্ববঙ্গে লীগ সরকার ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে আইনের খসড়া তৈরি করিয়াছে তাহাতে এই কৃষকদের জমি দিবার কোন ব্যবস্থা নাই, তাহাদের উপর হইতে খাজনা এবং দেনার বোঝা লাঘব করিবার কোন প্রতিশ্রুতি নাই, বরং জমিদার, জোতদার এবং ধনী কৃষকেরা যাহাতে তাহাদের জমি ছলে বলে কৌশলে কাড়িয়া লইয়া নিজেরা ক্যাপিটালিষ্ট জমিদার হইয়া বসিতে পারে তাহার সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মধ্যবিত্ত কৃষকও জমিদার এবং জোতদারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ, কারণ এই শ্রেণির কৃষক প্রতিবৎসরই খাজনা এবং দেনার দায়ে ও চোরাকারবারীর শোষণে জমি হারাইয়া গরীব কৃষকের শ্রেণিতে পরিণত হইতেছে। কিন্তু তথাপি গরীব কৃষকের মত তাহারা দৃঢ়ভাবে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয় না, সংগ্রামের সন্ধিক্ষণে ইতস্তত করিতে থাকে এবং সরকারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পন্থা অবলম্বন না করিয়া পলায়নের মনোবৃত্তি বিস্তার করে। কিন্তু কংগ্রেসী শাসন এবং লীগ শাসনে তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার পূর্ণ, কেননা এই সরকার তাহাদের জমিও দিবে না, তাহাদের মাথা হইতে খাজনা এবং দেনার বোঝাও লাঘব করিবে না। তাহাদের ভবিষ্যৎ রহিয়াছে ক্ষেতমজুর এবং গরীব চাষির দিকে, কারণ ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষির কৃষিবিপ্লব জমিদারি এবং জোতদারি প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিবে, তাহাদের জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া খাজনার প্রথা তুলিয়া দিবে, ৫ একর পর্যন্ত জমির উপর কোনই কৃষি কর বসাইবে না।

সুতরাং কৃষি বিপ্লব গ্রামের শতকরা ৫ জনের বিরুদ্ধে শতকরা ৯৫ জনের সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের কারিগর, মৎস্যজীবী, রজক, পরামানিক প্রভৃতি শ্রমজীবীদিগকে গ্রামের ঐ সংগ্রামী ৯৫ জনের সহগামী হইতে হইবে। তাহাদের জীবিকা ও জীবন এই ৯৫ জনের জয়লাভের উপরই নির্ভর করিতেছে।

২

আমাদের ভুল

আমরা এতদিন কৃষক আন্দোলনের ভিতর ধনী কৃষক ও মধ্যবিত্ত কৃষকের উপরই নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। যাহারা সর্বাপেক্ষা সংগ্রামী সেই ক্ষেতমজুরদের আমরা উপেক্ষা করিয়াছি,

অন্যান্য গরীব কৃষকেরা ছিল মাত্র সংগ্রামের ভলান্টিয়ার। বিগত তে-ভাগা সংগ্রামের মত একটা বিরাট সংগ্রামের নেতৃত্ব গঠনের জন্য তেভাগা কমিটি তৈরি করিয়াছি ধনী কৃষক এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের লইয়া, অথচ সংগ্রামটা ছিল প্রধানত গরীব কৃষকের, লড়িয়াছেও বেশি তাহারাই। কৃষক সমিতির সদস্যপদেও আমরা ধনী কৃষক এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের টানিয়া আনিতে যত চেষ্টা করিয়াছি গরীব কৃষকদের সংঘবদ্ধ করিতে তত চেষ্টা করি নাই। ইহার ফল হইয়াছে এই যে মধ্যবিত্ত কৃষকের উপর ধনী কৃষকের তথা জোতদারদের প্রভাব রহিয়া গিয়াছে, কৃষকের ভিতর হইতে সংগ্রামী শক্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পারে নাই, ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আমাদের এই ভুলের মূল কোথায়? আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম যে আমাদের কৃষি ব্যবস্থার সামন্তবাদই প্রধানত, ইহার বিরুদ্ধে সমস্ত কৃষকই ঐক্যবদ্ধ হইবে, ধনী এবং মধ্যবিত্ত কৃষকের উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভুল।

বাংলার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছে। ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ফলে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণিভেদ দেখা দিয়াছে। সমস্ত কৃষকের ঐক্য এখন আকাশকুসুম মাত্র। অবশ্য তাহার অর্থ এই নয় যে বাংলার কৃষি ব্যবস্থায় সামন্তপ্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে; বর্তমান যুগের ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র সামন্তপ্রথার বিলোপ সাধন করিতে অক্ষম। অতিবিক্ত খাজনা, ধানী খাজনা, বর্গাপ্রথা, গুলোপ্রথা, টংকপ্রথা; উঠবন্দী প্রভৃতি নানা আকারে বাংলা কৃষিতে সামন্তপ্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে, সামন্ত প্রথার ঘৃণ্যতম দাসত্বের উপর গজাইয়াছে ধনতান্ত্রিক পণ্যোৎপাদন এবং দিনমজুরি প্রথা। ধনিকের মূলধন মহাজনী, চোরাকারবার, ক্ষেতমজুর নিয়োগ প্রভৃতি নানা কায়দায় সমগ্র কৃষির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। কৃষিক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ফলেই অধিকাংশ কৃষক সর্বহারায় পরিণত হইতেছে এবং মুষ্টিমেয় ধনিক ফাঁপিয়া উঠিতেছে। ১৯৪০ সালে সারা বাংলার খোদ্‌কাস্ত খামারের সংখ্যা ছিল সমস্ত খামারের শতকরা ৬৬ ভাগ, ১৯৪৫ সালে এই সংখ্যা কমিয়া শতকরা ৪২ ভাবে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ শতকরা ২৪ ভাগ জমি (প্রতি চার একরে এক একর) কৃষকের হাতছাড়া হইয়া জোতদার এবং ধনী কৃষকের হাতে গিয়াছে।

যে সমস্ত খামারে বর্গা প্রথায় চাষ হয় তাহার সংখ্যা ছিল ১৯৪০ সালে শতকরা ২১ ভাগ, তাহাদের সংখ্যা ১৯৪৫ সালে হইয়াছে শতকরা ৩০ ভাগ। আর যে সমস্ত খামারে দিন মজুর খাটাইয়া চাষ হয় তাহাদের সংখ্যা ১৯৪০ সালে ছিল শতকরা ১৩ ভাগ, তাহাদের সংখ্যা ১৯৪৫ সালে হইয়াছে শতকরা ২৮ ভাগ।

অর্থাৎ, ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ফলে ক্ষেতমজুর এবং গরীব চাষির সংখ্যা বাড়িয়াছে, তাহাদের শোষণ এবং দারিদ্র বাড়িয়াছে।

কাজেই কৃষকের সংগ্রামে ও কৃষি বিপ্লবে ক্ষেতমজুর এবং গরীব কৃষকের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করিতে হইবে, মধ্যবিত্ত কৃষকের সমর্থন অর্জন করিতে হইবে, জমিদার, জোতদার ও চোরাকারবারীর উচ্ছেদ সাধনের জন্য চূড়ান্ত আঘাত হানিতে হইবে, ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

অনেক মনে করেন যে, ক্ষেত মজুরের সংগ্রাম ও তেভাগা লড়াই অনমনীয়ভাবে

চালাইতে গেলে কৃষকের ঐক্য ভাঙিয়া যাইবে, মধ্যবিত্ত কৃষকের সমর্থন পাওয়া দুরূহ হইয়া উঠিবে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের অনমনীয় সংগ্রামই মধ্যবিত্ত কৃষকের সমর্থন অর্জনের উপায়, মধ্যবিত্ত কৃষকের মন হইতে ধনতন্ত্রের মোহ এবং কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের প্রভাব দূর করিয়াই তাহাদের সমর্থন অর্জন করিতে হইবে। ক্ষেতমজুরদের স্বতন্ত্র সংগঠন এবং তাহাদের দাবির লড়াই ছাড়া মধ্যবিত্ত কৃষকের সমর্থন অর্জন অসম্ভব।

বিগত পার্টি কংগ্রেসের পর আমাদের কমরেডরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে আমাদের গরীব কৃষকের উপর প্রধানত নির্ভর করিতে হইবে, ক্ষেতমজুরদের দাবির জন্য লড়িতে হইবে, ধনী কৃষযকর উপর নির্ভর করা চলিবে না। কারণ পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব এই নূতন দিকটা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ভুল এখনও সূক্ষ্মভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাহা হইতেছে এইঃ—

আমরা স্বীকার করি যে ক্ষেতমজুর, ভাগচাষি ও অন্যান্য গরীব কৃষকের দাবি লইয়া আমাদের অনমনীয় সংগ্রাম চালাইতে হইবে। কিন্তু তথাপি আমাদের সংগঠনের ভিতর এখনও মধ্যবিত্ত কৃষকের প্রাধান্য রহিয়াছে, তাহাদেরই ইতঃস্তত মনোভাব এবং সংগ্রাম বিমুখতার দিকে চাহিয়া আমরাও বলি যে সংগ্রাম এখনও সম্ভব নয়, অথবা বলি যে সংগ্রাম করিব বটে কিন্তু সে সংগ্রাম জোরদার হইবে না। আমরা ভাবি যে, সংগ্রামের ইস্তাহারের মধ্যে ক্ষেতমজুর গরীব কৃষকের দাবি ঢুকাইয়া দিলেই বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন হইল। তাহা নয়। কৃষক সমিতিতে, পার্টিতে ও গ্রাম্য কৃষক কমিটিতে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের প্রাধান্য সৃষ্টি করিতে হইবে, প্রচার আন্দোলন এবং সংগঠনের বিস্তারে তাহাদের মধ্যেই প্রবলভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, আমাদের দৈনন্দিন কাজ পর্যন্ত তাহাদের ভিতরই সবচেয়ে বেশি চালাইতে হইবে, আহ্বান করিতে হইবে প্রধানত তাহাদিগকেই। মধ্যবিত্ত কৃষক শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের পক্ষে আসিবে, কিন্তু তাহাদের আনিবে কে? তাহাদের আনিবে ক্ষেতমজুর এবং গরীব কৃষক।

৩
বিগত তে-ভাগা লড়াই

১৯৪৬ সালের তেভাগা লড়াই বাংলার ইতিহাসে গরীব কৃষকদের সর্বাপেক্ষা সংগঠিত ব্যাপকতম সংগ্রাম। ১৯টি জেলায় ৬০ লক্ষ চাষি এই সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল এবং ৬ মাস ধরিয়া তাঁহারা অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে সরকারের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালাইয়া ধান ধরিয়া রাখিয়াছিল। 'জান দিন তবু ধান দিব না' এই সংকল্পকে তাহারা যতক্ষণ পারিয়াছে ততক্ষণ কার্যে পরিণত করিয়াছে। এই সংগ্রামে ৫০০০ কৃষক গ্রেপ্তার হইয়াছিল এবং ১০০ কৃষক সরকারী বাহিনীর আঘাতে নিহত হইয়াছিল। নিদারুণ অত্যাচার সত্ত্বেও এই সংগ্রামে বাংলার কৃষকেরা লালঝাণ্ডার প্রতি আস্থা হারায় নাই; বরং সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আরও হাজার হাজার কৃষকের মন হইতে কংগ্রেসী ও লীগ নেতৃত্বের প্রভাব দূর করিয়া দিয়াছে। সুতরাং এ সংগ্রামের সাময়িক পরাজয় সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ জয়লাভেরই শক্তি বাড়িয়াছে।

কিন্তু, বিগত তেভাগা লড়াইয়ের সাময়িক পরাজয় কেন ঘটিল? তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে আমাদের 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ'ই (রিফরমিজম্) তাহার মূল কারণ।

বিগত তেভাগা লড়াইকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায়— সংগ্রামের আরম্ভ, ১৯৪৬ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই সময় তেভাগার দাবি লইয়া কৃষক সমিতির প্রধান প্রধান ঘাঁটিতে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রামের প্রথম জোয়ার আরম্ভ হইবার আগে আমাদের পার্টি ইউনিট বহুস্থানে ইতস্তত করিয়াছে, ধান কাটা আরম্ভ করিতে বিলম্ব ঘটাইয়াছে, জোতদারেরা ভয়ে আপসের প্রস্তাব করিয়া সময় লইয়াছে, আমরাও অনেক ক্ষেত্রে সে সময় দিয়াছি। এই সময় লীগ সরকার এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কৃষকদের সচেতন না করিয়া আমরা কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট ঐক্যের মোহ বিস্তার করিয়াছি। সংগ্রাম কমিটিতে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের প্রাধান্য সৃষ্টি না করিয়া গ্রাম্য ঐক্যের মোহবশত ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের লইয়া সংগ্রাম কমিটি গঠন করিয়াছি।

সংগ্রামের পরবর্তী ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে সমস্ত গ্রামে সংগ্রাম কমিটিতে গরীব চাষি ও ক্ষেতমজুরের প্রাধান্য ছিল অথবা কোন সংগ্রাম কমিটি ছিল না, পার্টি সরাসরি গরীব চাষি ও ক্ষেতমজুরদের জমায়েত লইয়া লড়িয়াছে, সেই সমস্ত স্থানেই সংগ্রাম সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। দিনাজপুর জেলার পূর্ব ঠাকুর গাঁর এবং পশ্চিম ঠাকুর গাঁর তুলনা করিলেই এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। পূর্ব ঠাকুরগাঁয়ের নেতৃত্ব ছিল প্রধানত ধনী কৃষক ও মধ্যবিত্ত কৃষকের হাতে। দমননীতি আরম্ভ হইবার পূর্বে এখানে প্রবল জোয়ার দেখা যায় কিন্তু প্রচণ্ড দমননীতি আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জমায়েত ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু পশ্চিম ঠাকুরগাঁর নেতৃত্ব গরীব চাষির হাতে, সেখানকার মনোবল আজও ভাঙ্গে নাই।

চিরির বন্দর এবং খানপুরের অপূর্ব প্রতিরোধের মূলে ছিল সংগ্রামের মধ্যে ক্ষেতমজুর এবং গরীব কৃষকের প্রাধান্য। রংপুর জেলার ডিমলার গরীব কৃষকেরা যতবার আগাইয়াছে, ধনী এবং মধ্যবিত্ত কৃষকেরা ততবার তাহাদের পিছনে টানিয়া নিয়াছে।

এই সমস্ত জায়গায় পার্টি ইউনিট ও যেখানে যেখানে ধনী এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের মনোভাবের উপর নির্ভর করিয়াই সংগ্রামের কৌশল নির্ধারণ করিয়াছে, সেইখানেই সংগ্রামী কৃষকদের পিছনে টানিয়াছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগ্রামের সাময়িক জয়লাভ—

লীগ সরকার ঘোষণা করিল যে, যে তেভাগার আইন পাশ করিয়া দেওয়া হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হইল এই সংগ্রামে যথসম্ভব নিরপেক্ষ অবলম্বন করিতে। জানুয়ারীর মাঝামাঝি হইতে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল।

এই সময় সংগ্রাম স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বর্গাদার আধিয়ারদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, যে সমস্ত আধিয়ার আগে জোতদারদের ঘরে ধান তুলিয়াছিল তাহারাও দল বাঁধিয়া ব্যূহ রচনা করিয়া জোতদারদের পুঁজ ভাঙ্গিয়া নিজ নিজ খোলানে লইয়া আসে।

এই সময়টা ছিল কৃষকদের বিভিন্ন শ্রেণির জন্য সংগ্রাম ছড়াইয়া দিবার সময়। ক্ষেতমজুররা তেভাগার সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল এই আশায় যে তেভাগার জিত হইলে তাহাদেরও লাভ হইবে। এই সময় যদি আমরা সর্বত্র ক্ষেতমজুরদের ডাক দিতাম মজুরি বাড়তির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘটের জন্য তাহা হইলে জোতদারদের বিরুদ্ধে আর একটা দুর্ভেদ্য ফ্রন্ট গড়িয়া উঠিত; যাহারা বর্গাদার নন এমন অনেক গরীব চাষি তেভাগার লড়াই সমর্থন

করিয়াছিল এবং আশা করিতেছিল যে এবার তাহারাও খাজনা বন্ধ এবং জমি দখলের আহ্বান পাইবে। আমরা যদি তখন সে আহ্বান জানাইতাম তবে সংগ্রাম আর ৬০ লক্ষ আধিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত না, দু-তিন কোটি কৃষকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িত। কিন্তু সে আহ্বান তখন আমরা দেই নাই।

আসলে আমরা তেভাগার সংগ্রামকে শুধুমাত্র একটা আংশিক সংগ্রাম হিসাবে দেখিয়াছিলাম, কৃষি বিপ্লবের সূচনা হিসাবে দেখি নাই। তাই আংশিক সংগ্রামকে আংশিক সংগ্রামের স্তরেই রাখিয়া দিয়াছিলাম। অনেক কমরেড প্রচার এবং আন্দোলনের মধ্যে এই সংগ্রামকে বিপ্লবের সূচনা বলিয়া প্রচার করিতেন, পার্টির নেতৃত্ব তাঁহাদেরও এই বলিয়া থামাইয়া দিত যে— আংশিক সংগ্রামকে বিপ্লব বলিয়া প্রচার করা অন্যায়।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি হইতে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত যে দেড়মাস সময় আমরা পাইয়াছিলাম, সেই সময়টা আমরা জয়লাভ করিয়াছি বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, আমরা তখন ভাবিয়াছিলাম যে "প্রগতিশীল" লীগপন্থীগণ লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে কব্জার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে এবং "প্রগতিশীল কংগ্রেস" কৃষকদের বিরুদ্ধে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর দমননীতি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারে না। তাই আমরা এই দেড়মাসের ঐতিহাসিক সুযোগে কৃষকদের ভবিষ্যত প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করি নাই, লীগ ও কংগ্রেস নেতৃত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন না করিয়া বরং তাহাদেরই "প্রগতিশীলতা" সম্পর্কে কৃষকদের মোহ বাড়াইয়াছি। বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রতি পার্টির যে সুবিধাবাদী মোহ ছিল সেই মোহই আমাদের এইরূপ আচরণের কারণ। আমাদের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস এই মোহেরই স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

তৃতীয় পর্যায়: মার্চ মাস হইতে প্রচণ্ড দমননীতির সূত্রপাত। এই সময় দমননীতির মুখে সমগ্র শোষিত জনতাকে প্রতিরোধের জন্য আহ্বান না জানাইয়া বুর্জোয়া নেতাদের লইয়া দমননীতি বিরোধী আন্দোলন চালাইয়াছিলাম। দমননীতি বিরোধী আন্দোলন চালানো নিশ্চয়ই দরকার ছিল এবং সে আন্দোলনে যাহাদের পাওয়া যায় তাহাদের সকলকেই নানাভাবে টানিয়া আনা অন্যায় নয় বরং আবশ্যকীয়। কিন্তু আমাদের মূল কৌশলটাই ছিল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী। খাঁপুরের মত অপূর্ব প্রতিরোধের জন্য বাংলার সমস্ত কৃষকদের আহ্বান না জানাইয়া আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম এই কথাই প্রমাণ করিতে যে কৃষকেরাতো বিদ্রোহ করে নাই, বিপ্লব করে নাই, শুধু সুরাবর্দ্দির আইনের খসড়া অনুযায়ী আইন সঙ্গত কাজ করিয়াছে মাত্র। জোতদারেরা ও কংগ্রেসী-লীগ চাঁইয়েরা যখন টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম ছাড়িয়া প্রমাণ করিতেছিল যে সহস্র সহস্র কমিউনিস্ট লুঠতরাজ করিতেছে, তখন আমাদের উচিত ছিল এই আহ্বান জানানো যে ইহা লুঠ নয়, ইহা কৃষকদের অভিসন্তপ্ত গোলামী প্রথার বিরুদ্ধে জনতার বিদ্রোহ, গরীব জনতা যে যেখানে আছ ইহাতে যোগ দাও, শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট দ্বারা কৃষকের হত্যাকারীদের হাত থামাও। আমরা তখন এ আহ্বান জানাই নাই, সরকারি অত্যাচারে ভীত হইয়া আমরা ঘোষণা করিলাম যে তেভাগার দাবি ন্যায্য দাবি, এদাবি দমন করা সরকারের বড় অন্যায়, জোতদারদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত না হইয়া দেশভক্তেরা তদন্ত কমিটি গঠন কর। ইহা হইতে স্বতঃই বুঝিতে পারা যায় যে আমরা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের নরককুণ্ডে তখন হাবুডবু খাইতেছিলাম, ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের উপর আমাদের ততটা আস্থা ছিল না, যতটা আস্থা ছিল উচ্চশ্রেণির 'দেশভক্তদের' উপর।

ইহাই তেভাগার সংগ্রামে আমাদের ভুলভ্রান্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দেশব্যাপী কৃষি সংকট, কৃষি বিপ্লবের ঘনায়মান অবস্থা বুর্জোয়া নেতাদের আসন্ন বিশ্বাসঘাতকতা, দেশব্যাপী বিপ্লবী শক্তির নবজাগরণ, পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণবিপ্লবের অভিযানে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব— এই ছিল অবস্থা। এই অবস্থার ইঙ্গিত ছিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আগষ্ট (১৯৪৬) মাসের প্রস্তাবে। কিন্তু সে প্রস্তাবেও কংগ্রেস-লীগ নেতৃত্বের প্রতি মোহ ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান ছিল না সংগ্রামে তাহাদের টানিয়া আনিবার ইঙ্গিত ছিল। তাই ঐ প্রস্তাবের সঠিক অংশটুকুও আমাদের মনে ধরে নাই। ঐ প্রস্তাব অনুসারে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াও উহাকে ক্রমাগত নীচের দিকে টানিয়া নামাইয়াছিল। এই জন্যই প্রতিরোধের উপযুক্ত যোদ্ধাবাহিনী তৈয়ারির দিকে নজর না দিয়া নজর দিয়াছি "দেশভক্তদের" সমর্থন অর্জনের দিকে, একটা বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানকে টানিয়া নামাইয়াছিল শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার আন্দোলনে। সরকার জমিদার ও জোতদারেরা, কংগ্রেস এবং লীগ আমাদের এই দুর্বলতার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া কৃষকদের নির্মমভাবে দমন করিয়াছে।

তাহার পর আমরা যখন আন্দোলনের ফলাফল আলোচনা করিয়াছি তখন বলিয়াছি যে আমাদের ভুল ছিল অতিবিপ্লবী উগ্রপন্থা অবলম্বনে। অর্থাৎ আমরা জোতদারদের খোলান হইতে পুঁজ ভাঙ্গিয়া ভুল করিয়াছি, মধ্যবিত্তের মধ্যে সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করি নাই, আংশিক সংগ্রামকে আংশিক সংগ্রাম হিসাবে না দেখিয়া সহজ বিপ্লবের সড়ক হিসাবে ধরিয়াছি। আমাদের এই পর্যালোচনা ছিল সম্পূর্ণ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী মোহগ্রস্ত। আসলে আমরা পুঁজ ভাঙ্গিয়া ভুল করি নাই, ভুল করিয়াছি সেই সঙ্গে ক্ষেতমজুরদের সাধারণ ধর্মঘটে এবং সমস্ত গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের খাজনা বন্ধ ও জমি দখলের আহ্বান না জানাইয়া। আমরা মধ্যবিত্তের মধ্যে সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করি নাই সত্য এবং সে চেষ্টা করাও দরকার, কিন্তু আসল কথা আমরা তখন শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের মধ্যে সংগ্রাম ছড়াইবার চেষ্টা করি নাই। ঐ সংগ্রামটাকে আমরা আংশিক সংগ্রামের গণ্ডীতে রাখিবার প্রানান্ত চেষ্টা করিয়াই ভুল করিয়াছি, উহাকে "সহজ বিপ্লবের সড়ক" হিসাবেও দেখি নাই, দেখাইও নাই। উহাকে "সহজ" বিপ্লবের সড়ক হিসাবে না হইলেও কঠিন বিপ্লবের সড়ক হিসাবে দেখা এবং দেখানো উচিত ছিল।

৪
নূতন সংগ্রাম

সারা বাংলায় নূতন কৃষি সংকট ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষক সংগ্রাম সম্বন্ধে প্রাদেশিক কমিটির প্রথম প্রস্তাবে এই সংকটের মূল চেহারাটা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার সারমর্ম হইল এই যে— কৃষকেরা অধিকাংশ দিনের পর দিন ভূমিচ্যুত হইতেছে, চোরাবাজারের শোষণে অধিকাংশ কৃষক হইতেছে সর্বস্বান্ত। গ্রামের জমিজমা চলিয়া যাইতেছে মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে। এই ভূস্বামীরাই জমির এবং ফসলের একচেটিয়া মালিক। শিল্পের কর্তৃত্বও মুষ্টিমেয় ধনিকের একচেটিয়া, সুতরাং মেহনতী কৃষকদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব গ্রাম অঞ্চলে সমস্ত পণ্যের নিত্য দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। সরকারী কোন ব্যবস্থাই এই সংকটের সমাধান করিতেছে না, বরং এই সংকটকে আরও ঘোরতর করিয়া তুলিতেছে।

এই সংকট আসিয়াছে পৃথিবীব্যাপী ধনতান্ত্রিক সংকটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে।

দুনিয়ার একটি বিরাট অংশ আজ ধনতন্ত্রের আওতা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। আর একটি বিরাট অংশে অনমনীয় সংগ্রাম চলিতেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ, চীন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সমাজতন্ত্র ও নয়া গণতন্ত্রের অভিযান চালাইয়া ধনতন্ত্রের অন্তিম দশা সৃষ্টি করিয়াছে। ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আজ অত্যন্ত বিপদাপন্ন, একে তো পৃথিবীর একটি বিরাট বাজারে ধনতন্ত্রের দ্বার রুদ্ধ, তাহার উপর আবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অন্তিমদশাপন্ন মুমূর্ষু শাসক শ্রেণিকে বাঁচাইবার দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহারা আর একটা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করিতেছে, কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ার শ্রমিক আজ তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুষ্টিবদ্ধ।

ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া তাহাদের আসল মুখ দেখাইতে বাধ্য হইতেছে। যে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের জাহাজে তাহারা তাহাদের জালিবোট বাঁধিয়াছে, সেই জাহাজই প্রায় ডুবুডুবু। পৃথিবীর কোন দেশের কোন ধনিক বা কোন জমিদার শ্রেণির আজ আর নিস্তার নাই। দুনিয়ার দিকে দিকে শোষকশ্রেণির নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। আহত বন্যপশুর মত তাহারা আজ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া শোষিত জনতাকে হিংস্রভাবে দংশন করিতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু অনতিবিলম্বে তাহাকে আতংকে লেজ গুটাইয়া পলাইতে হইবে। পলাইয়াও তাহাদের নিস্তার নাই, শ্রমিকের প্রতিশোধের দিন আসিতেছে।

ইহাই হইল বর্তমান বিপ্লবী সংকটের মূল চেহারা। ঠিক এমনি অবস্থার মধ্যেই আমাদের দেশের জনতা জাগিয়া উঠিতেছে। বিগত ২৬শে মার্চ আমাদের পার্টির উপর দমননীতির প্রচণ্ড আঘাত আরম্ভ হয়। তাহার পর নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়া, মাঝে মাঝে সাময়িক হতাশা এবং সাময়িক বিরতি সত্ত্বেও, গত ৮ মাসে ভারত ও পাকিস্তানের শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষক শাসকশ্রেণিকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া চলিয়াছে। একথা বলিলে ভুল হইবে যে আজ সংগ্রামের একটা হাঁক দিলেই বিপ্লব দেখা দিবে, অথবা শুধু হাতিয়ার বিলি করিলেই ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম ফতে হইয়া যাইবে। বিপ্লবী সংগ্রাম এমন সস্তায় কিস্তিমাত হয় না; কারণ বিপ্লবের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। পেটি বুর্জোয়া "বিপ্লববাদীরা"ই এই সমস্যাটাকে সহজ এবং সরল করিয়া শুধু 'হাঁক দেওয়া' এবং 'হাতিয়ার বিলি' করায় পরিণত করে। এই সংগ্রামকে এখনও অনেক বাধা, অনেক অত্যাচার এবং অনেক উত্থানপতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। প্রাদেশিক কমিটির ৫নং সার্কুলার এই বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অঙ্গুলিপাত করিয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই যে আজ সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শাসকগোষ্ঠির ক্ষমতা শেষ হইয়া আসিতেছে, সংগ্রামী শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকের ক্ষমতাই তাহাদের তুলনায় অনেক বেশি। সংকটের আগামী ক্রমোবিকাশের প্রতিটি অধ্যায়ে সংগ্রামী জনতার শক্তিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, কারণ শোষণী সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, জনতার অভিজ্ঞতা ও বিপ্লবী চেতনা বাড়িতেছে। প্রাদেশিক কমিটির ১নং সার্কুলার, ২নং বুলেটিন এবং ৫নং সার্কুলারের প্রথম ও শেষ অধ্যায় এই দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছে। দিনের পর দিন উহারই সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

যাহারা পরাজয়বাদী তাহারা মনে করে যে ভারত ও পাকিস্তানে অত্যাচারী শাসকশ্রেণিই

আজ ক্ষমতাশালী। আসলে তাহার আজ যত দুর্বল তত দুর্বল তাহারা কোন দিন ছিলনা, কারণ তাহাদের গণভিত্তি খসিয়া পড়িতেছে, তাহারা যে সমাজব্যবস্থার নায়ক, বাহক এবং পোষক, সেই সমাজব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

বর্তমান অবস্থায় আমাদের অগ্রগতির প্রধান শর্ত কি কি?

(১) শ্রমিকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করো। পার্টির প্রচার চালাও, পার্টির প্রসার বাড়াও।

(২) ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র কৃষকের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করো।

(৩) জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের মাত্রা অনুসারে সংগ্রামের পদ্ধতি ও কৌশল উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে তুলিয়া ধরো।

(৪) বুর্জোয়াশ্রেণির সমস্ত আদর্শের বিরুদ্ধে অনমনীয় সংগ্রাম চালাও, তাহাদের দৈন্য, শঠতা, হিংস্রতা প্রভৃতির আবরণ খুলিয়া নগ্ন করিয়া দেখাও।

(৫) গ্রাম অঞ্চলে পার্টির ও কৃষকসভার শ্রেণিচরিত্র বদলাও। অর্থাৎ ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষিদের পার্টি শিক্ষা দাও, তাহাদের মধ্যে সংগঠন বাড়াও। গ্রামে গ্রামে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের উদ্যোগশক্তি জাগাইয়া তোল, নেতৃত্বের পদে তাহাদের সমাসীন করো, তাহাদের পার্টির মধ্যে ও সমিতির নেতৃত্বের মধ্যে টানিয়া আনো। যাহারা সংশয়জড়িত তাহাদের পার্টির দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে সরাও, সচেতন এবং সতেজ কর্মীদের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসাও।

(৬) সরকারি আক্রমণ হইতে পার্টি ইউনিট ও কর্মীদের বাঁচাইয়া রাখো, সরকারি হামলা ব্যর্থ করিয়া পার্টির সঙ্গে জনতার যোগাযোগ সুদৃঢ় করিবার জন্য নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করো। অসংখ্য জনতার মধ্যে পার্টির আদর্শ, কর্মপন্থা ও আহ্বান ছড়াইয়া দাও।

গ্রাম অঞ্চলে আমাদের কর্মকেন্দ্রগুলি বিভিন্ন জেলার কতকগুলি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেজন্য অনেকেই সংগ্রামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। একথা সত্য যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকখানি বিভিন্ন গ্রাম একটা বিরাট জয়লাভ করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের শক্তির উৎস আজ বাংলার সমস্ত গ্রামে, জনতার অধিকাংশের মধ্যে। আমরা যদি শুধুমাত্র পার্টির কয়েকজন কর্মীর উপর র্নিভর করি তাহা হইলে ভরসার কোন হেতু দেখিতে পাই না। আমাদের কর্মকেন্দ্রে যে গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর রহিয়াছে— তাহাদের জাগাইয়া তুলিতে হইবে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সংগ্রামের বাণী বহন করিবার জন্য, সংগ্রামের উদ্যোগশক্তি জাগাইবার জন্য। বড়াকমলাপুর এবং কাকদ্বীপের শহিদদের আহ্বান বাংলার ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষি উপেক্ষা করিবে না।

এই সংগ্রামকে সফল করিবার জন্য গ্রাম অঞ্চলে জঙ্গী কৃষক সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। জঙ্গী কৃষক কমিটি সংগ্রামের ভিতর দিয়া নির্বাচিত বিপ্লবী কৃষক কমিটিতে পরিণত হইবে। পার্টি এবং কৃষক সমিতি তো গড়িতে হইবে, কিন্তু তাহা ছাড়াও জঙ্গী কৃষক কমিটি গঠনের প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া অনিবার্য আবশ্যক। এই সংগঠনই ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের গ্রামাঞ্চলে সংগ্রাম পরিচালনার সচেতন নেতৃত্ব তৈরি করিবে। এই সংগঠন না থাকিলে নিদারুণ দমননীতির সামনে অসংগঠিত জনতা দাঁড়াইতে পারিবে না। এই জঙ্গী কৃষক কমিটিই হইবে গ্রামে আসল গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রাথমিক ভিত্তি। মনে রাখিতে হইবে যে সঠিক রাজনীতি থাকিলে সংগঠনই সংগ্রামের অগ্রগতি ও সাফল্য নির্ধারিত করে।

সহায়ক তথ্য - ১৫

ক্ষেতমজুরের সংগ্রাম ও সংগঠন

প্রথম প্রাদেশিক ক্ষেতমজুর সম্মেলনের কার্যবিবরণী

দাম : পাঁচ আনা

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৪৯

এস এস কর্তৃক ১৯২ আপার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত ও
তৎকর্তৃক ইউনিটি প্রেস লিঃ ১১৫-এ আমহার্স্ট স্ট্রিট হইতে মুদ্রিত

শহিদ স্মরণে

মাত্র তিন বছরের কংগ্রেসী শাসনে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের যে সকল সংগ্রামী ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক পুলিশের গুলি বা জমিদার জোতদারদের গুণ্ডার হাতে নিহত হইয়া শহিদ হইয়াছেন, উহার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল। আহতদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব।

কংগ্রেসী সরকার শোষকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গ্রামে গ্রামে গুলি চালাইয়া যে গরীব মানুষদের হত্যা করিয়াছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ নারী।

তালিকাটি অসম্পূর্ণ; কারণ 'কংগ্রেস-নেহরু-গণতন্ত্র' গরীবদের হত্যা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, গ্রামের পর গ্রাম সশস্ত্র ফৌজের কবলে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যে স্বাধীন দেশের মাটির উপর কৃষকের অধিকার নাই, কৃষক ও ক্ষেতমজুর শহিদদের পরিচয় বাহির করার মত ব্যক্তিস্বাধীনতাও সেদেশে আশা করা বাতুলতা।

ধনিক কংগ্রেসী শাসনের বিভীষিকা অগ্রাহ্য করিয়াই গ্রামের মেহনতী মানুষ দুর্নিবার ভাবে অগ্রসর হইতেছেন। এমন কোন সপ্তাহ নাই ভারতবর্ষের কোন না কোন স্থানে কৃষক ক্ষেতমজুর শহিদেরা রক্তদান না করিতেছেন।

জমি, জীবিকা ও স্বাধীনতার যুদ্ধে নিহত জানা-অজানা সকল কৃষক ও ক্ষেতমজুর শহিদদের স্মরণে আমরা রক্তপতাকা অবনমিত করিতেছি।

মেদিনীপুর

১। চৈতন্য সামন্ত
২। সুধীর নায়েক
৩। সুধীর সদ্দার
৪। পঞ্চানন কৈন্দর
৫। ভবেশ
৬। গোলক

বীরভূম

১ সুবল মাঝি
২ কুন্দবালা মাঝি
৩ হাবলা লেট
৪ পানিক লেট
৫ দাসু মাঝি

হুগলী

১। পুষ্পবালা
২। পাঁচুবালা
৩। দাসীবালা
৪। কালীবালা পাখীরা
৫। মুক্তকেশী মাঝি
৬। রাজকৃষ্ণের মা
৭। কার্ত্তিক ধাড়া
৮। গুঁইরাম মণ্ডল

২৪ পরগণা

১। নীলকণ্ঠ সামন্ত
২। সুধীর ঘোড়ুই
৩। সুরেন মণ্ডল
৪। অশ্বিনী দাস
৫। গজেন ভুঁইয়া
৬। দেবেন ধর
৭। সরোজিনী দাসী
৮। অহল্যা দাস
৯। উত্তমী দাস

হাওড়া

১। দেবেন মালিক
২। পঞ্চু বেরা
৩। গণেশ ভুঁএগ্রা
৪। কানাই বাগ
৫। সাধন বাগ
৬। ফটিক গলুই
৭। গুইরাম মুদী
৮। মন্মথ কয়াল
৯। তারাপদ সর্দ্দার
১০। মনোরমা
১১। লক্ষ্মী
১২। বাঁশরী
১৩। যশোদা
১৪। সুধাময়ী সাঁতরা
১৫। ভাবময়ী দাসী
১৬। সিন্ধুময়ী দাসী
১৭। কালোপণ্ডিতের স্ত্রী
১৮। মন্মথ পণ্ডিতের স্ত্রী
১৯। কুশী পাত্রের স্ত্রী

১০। বাতাসী সিং
১১। সুরেন মিস্ত্রী
১২। অমর মণ্ডল
১৩। পূর্ণ মণ্ডল
১৪। ভবেন নস্কর
১৫। মতি ধাড়া
১৬। দাসু মণ্ডল

বাঁকুড়া

নারী-পুরুষ সমেত পাঁচজন ১৫ই আগষ্ট পুলিসের গুলিতে নিহত হইয়াছেন— নাম এখনো জানা যায় নাই

আরও তিনজন মহিলা এবং একজন ছেলে নিহত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

সভাপতির অভিভাষণ

আমাদের এই প্রথম সম্মেলনে অনেক পরিচিত মুখই আমাদের পাশে আজ দেখিতে পাইতেছি না। যাঁহারা গত এক বছর গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের অধিকার ও দাবি-দাওয়া লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন, ধনিক কংগ্রেসী সরকার এবং জমিদার-জোতদার-ধনী কৃষকদের প্রত্যেকটি আক্রমণ হইতে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষককে রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন, তাহাদের অনেকের পক্ষেই এই প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ ঘটে নাই। তাঁহাদের মধ্যে সুধীর সর্দ্দার, পঞ্চানন কৈদর, সুবল মাঝির মত ক্ষেতমজুরের বীর সন্তানরা শত্রুর হাতে নিহত হইয়াছেন, শত শত ক্ষেতমজুর নেতা ও কর্মী বিনা বিচারে আটক হইয়াছেন, শত শত কর্মীকে মিথ্যা মামলায় জড়াইয়া জেলে পাঠানো হইয়াছে; কংগ্রেসী শাসকরা শত শত ক্ষেতমজুর সন্তানকে "ফেরারী" ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের পিছনে পুলিশ লাগাইয়াছে। এইভাবে বিধান মন্ত্রিসভা এই সম্মেলনে তাঁহাদের যোগদানের পথে অসংখ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

ধনিক কংগ্রেসী সরকার এবং জোতদার-জমিদার-ধনী কৃষকের সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য

করিয়া আজ যাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমাদের মধ্যে এখানে এমন অনেক কর্মীকে দেখিতেছি শত্রুর আক্রমণে যাহাদের সর্বস্ব গিয়াছে; যাঁহাদের বাড়ির বাসনপত্র পর্যন্ত লুঠ হইয়াছে; যাঁহাদের শিশু সন্তানের ভাতের থালা লাথি মারিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া ঘরের দরজায় কাঁটাতারের বেড়া লাগানো হইয়াছে; যাঁহাদের বাড়ির পাশে পুলিশ ও সেবাদলের ক্যাম্প এখনও দাঁড়াইয়া আছে।

নূতন শ্রেণি — নূতন শক্তি

কিন্তু কোন অত্যাচার, কোন বাধাই আমাদের টলাইতে পারে নাই। কারণ গত এক বছরে আমরা গ্রাম অঞ্চলে এক নূতন মানুষ, এক নূতন শক্তি হিসাবে জন্মলাভ করিয়াছি।

ধনিক কংগ্রেসী শাসনে শহরের মত গ্রাম অঞ্চলেও ধনী আরও ধনী হইতেছে, গরীব আরও গরীবে পরিণত হইতেছে। গ্রামের যাহাকিছু জমিজমা, হালবলদ সমস্তই মুষ্টিমেয় জমিদার-জোতদার-ধনী কৃষকের হাতে চলিয়া যাইতেছে। ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বাড়িতেছে। বাংলার গ্রামে একশত লোকের মধ্যে ৩৬ জন আজ একেবারেই ভূমিহীন; ক্ষেতমজুর এবং গরীব কৃষকেরা [যাহাদের বছরে কিছু সময় মজুরির উপর নির্ভর করিতে হয়] একত্রে গ্রামের শতকরা প্রায় ৮০ জন। মোট আবাদী জমির এগার আনা মাত্র ১৪ জন লোকের হাতে; আর পাঁচ আনা হইল ৮৬ জনের হাতে। টাকার জোরে জোতদার ও ব্যবসায়ীরা গ্রাম অঞ্চলে তাহাদের শোষণের ক্ষেত্র বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। তাহারা খোদ-চাষিদের জমি আত্মসাৎ করিতেছে, এবং গ্রামের খাদ্য, ব্যবসায় প্রভৃতি সবকিছুর উপর নিজেদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছে। ইহারা নামমাত্র মজুরি বা ফসলের বিনিময়ে ক্ষেতমজুরদের দিনরাত খাটাইতেছে এবং সেই ফসলই চোরবাজারে দরে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের কাছে [অর্থাৎ শতকরা ৮০ জনের কাছে] বিক্রয় করিতেছে। ইহাদেরই হাতে কংগ্রেসী সরকার। কাজেই কংগ্রেসী সরকারের খাদ্যনীতি এই ধনী কৃষক, জোতদার ও জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করার জন্যই তৈরি হইয়াছে। তাহারা অতি অল্পদরে গরীব ও মাঝারী কৃষকের খাদ্য ক্রয় করিয়া উহা যাহাতে চোরাবাজারে চালান দিতে পারে তাহার জন্যেই সরকারি খাদ্য-সংগ্রহের প্ল্যান তৈরি হইয়াছে। এই সরকারী খাদ্যনীতির ফলেই গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষককে অধিকাংশ জেলায় এখনই ২৫|৩০ টাকা দরে খাদ্য ক্রয় করিতে হইতেছে। শুধু খাদ্যই নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিস তাহাদিগকে যুদ্ধের আগেকার তুলনায় তিন'চার গুণ বেশি দর দিয়া কিনিতে হইতেছে। ধনিকশ্রেণির এই শোষণের মধ্য দিয়াই গ্রাম অঞ্চলে আমাদের সংখ্য দিন দিন বাড়িতেছে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সকল ক্ষেত্রে অমানুষিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আমরা আজ এক নূতন মানুষে পরিণত হইয়াছি। কলকারখানার শ্রমিকদের মতই আমরা সর্বহারা। নিজের শ্রম বিক্রয়ের উপরেই আমাদের জীবনধারণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এবং সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হিসাবেই আজ আমরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের লালঝাণ্ডার তলে একত্রিত হইয়াছি।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একদিনে তৈরি হয় নাই। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রায় ৩০

বছরের জঙ্গী শ্রেণি-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া, অসংখ্য শ্রমিক শহিদের রক্তদানের মধ্য দিয়া ধনিকশ্রেণির ভেদনীতিকে বারবার পরাস্ত করার মধ্য দিয়া এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আজ সারা ভারতের বিপ্লবী নেতা হিসাবে বাহির হইয়া আসিয়াছে। গত ৩০ বছরে এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের লালঝাণ্ডার তলেই শ্রমিকশ্রেণি ছোট বড় অসংখ্য সংগ্রামে মালিকশ্রেণিকে পরাজিত করিয়াছে।

৮ লক্ষ লালঝাণ্ডা শ্রমিকের সংগঠিত শক্তি এবং আরও লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সংগ্রামী সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়াই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আজ দাবি তুলিয়াছে; বাঁচিবার মত মজুরি চাই, ৮০ টাকা বেতন ও ৫০ টাকা ভাতা চাই। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দাবি তুলিয়াছে : দৈনিক ৭ ঘন্টার বেশি কাজ নাই, বছরে এক মাস বেতনসহ ছুটি চাই, বেকারদের জন্য ভাতা চাই, নতুবা কাজ চাই, একমাস বেতনসহ ছুটি চাই। এই সকল মূল দাবির উপর তাহারা সারা ভারতের শ্রমিকশ্রেণিকে সংগ্রাম করিতে ডাক দিয়াছে।

আমরা ইহার পতাকাতলে সমবেত হইবার ফলে ধনিকশ্রেণির বুকে আতংক সৃষ্টি হইয়াছে; গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণি-সংগ্রাম তীব্র করার রাজনীতি এবং রণকৌশল শিক্ষা করিয়া **আমরা এবার ধনিকশ্রেণির প্রত্যেকটি আক্রমণ ব্যর্থ করিব। এই ক্ষেতমজুর সম্মেলনের** ঐতিহাসিক তাৎপর্য এইখানে।

সংগ্রামে সকলের অগ্রণী

সর্বহারা হিসাবে ক্ষেতমজুররা বরাবরই গ্রাম অঞ্চলের প্রতিটি শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িয়া আসিয়াছে। জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে জমিদারি খাজনা বন্ধ এবং তেভাগার সংগ্রামে তাহারা কৃষকসভার জঙ্গী ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করিয়াছে। ১৯৪৬ সালে তেভাগার সংগ্রামে যাহারা 'জান দিব তো ধান দিব না' আওয়াজ তুলিয়া পুলিশের গুলির সামনে বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন, ক্ষেতমজুর চিয়ারশেক ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। মাঝারী কৃষক এবং কোন কোন এলাকায় ধনী কৃষকের এক অংশের নেতৃত্বে কৃষক সমিতি সেই সকল সংগ্রামে যথেষ্ট দোমনাভাব দেখাইয়াছেন, বারবার সংগ্রামকে আপসের পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন; ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক নিজেদের স্বাধীনভাবে সংগঠিত করিতে না পারায় ঐ সকল আপসকে ঠেকাইতে পারে নাই।

১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় এবারকার তেভাগার সংগ্রামে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক কৃষকসমিতির নেতৃত্বের আপস-পন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে অনেক বেশি দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াছে। এবছর তেভাগার সংগ্রামের বিরুদ্ধে গ্রামের ধনী কৃষক-জমিদার-জোতদার এবং তাহাদের কংগ্রেসী সরকার বেপরোয়া আক্রমণে চালায়। ইহাতে মাঝারি কৃষক ভীত হইয়া পড়ে। কোথাও তাহারা মাঠ হইতে ফসল নিজ খামারে আনিতে ভয় পায়; কোথাও নিজ খামারে ধান তুলিয়াও তাহা ঝাড়াই-মাড়াই করিতে ইতস্তত করে; শুধু গাদা আটক করিয়া রাখে, কোথাও জমির দখল রাখিয়া চাষ করার জন্য উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করে না। তেভাগার জন্য যে সকল এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়, সেখানেও ক্ষেতমজুর এবং গরীব কৃষকদের তাহাতে বিশেষ স্থান দেওয়া হয় না। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগ্রাম কমিটির রায় ছাড়াই মাঝারী কৃষকরা জোতদার-ধনী কৃষকের সহিত আপস করিয়া লইতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যেখানেই ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক কিছুটা সংগঠিত হইয়াছে, সেখানেই তাহারা মাঝারী কৃষকের এই দোমনাভাব এবং আপস নীতির বিরোধিতা করিয়াছে। নিজেরা আগাইয়া যাইয়া মাঝারী কৃষকের ঘরে ধান তুলিয়াছে, তাহাদের ধান ঝাড়িয়াছে, তাহাদের জমির দখল কায়েম করিয়াছে, দালালের আক্রমণ ও পুলিশের গ্রেপ্তারের হাত হইতে কর্মীদের রক্ষা করিয়াছে।

মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম

এই তেভাগার সংগ্রামই ক্ষেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রামে উৎসাহিত করিয়াছে। সমিতি ও সংগ্রাম-কমিটিতে ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করার মধ্য দিয়া ক্ষেতমজুররা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়। সমিতি এবং সংগ্রাম-কমিটির সামনে তাহারা প্রশ্ন তোলে : তেভাগার সঙ্গে সঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির দাবিও রাখা হোক।

যে সকল এলাকায় ক্ষেতমজুরদের এই দাবি কৃষক সমিতি এবং সংগ্রাম কমিটি নিজেদের দাবির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, ফসলের অংশ হইতে মজুরদের কিছুটা দিয়াছে, সে সকল এলাকায়ই তেভাগার সংগ্রাম জয়যুক্ত হইয়াছে। ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে প্রচারে বিভ্রান্ত মাঝারী কৃষকের বিরোধিতার ফলে যে সকল এলাকায় ঐ দাবি লড়াইয়ের দাবির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই সেখানে ক্ষেতমজুরদের ভলান্টিয়ার হিসাবে বেশিদিন খাটানো যায় নাই। তেভাগার সংগ্রাম আত্ম-সমর্পণের মধ্যে শেষ হইয়াছে।

এই তেভাগার সংগ্রামের মধ্যে এবং ইহার পাশাপাশিই ক্ষেতমজুররা নিজেদের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম শুরু করিয়াছেন।

কারখানার শ্রমিকরা যে হাতিয়ার মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, বীরভূম এবং মেদিনীপুরের ক্ষেতমজুর সেই ধর্মঘটের অস্ত্রই জোতদার-ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে। ক্ষেতমজুরেরা এই সকল ধর্মঘট সংগ্রামের মধ্যেই নিজেদের স্বতন্ত্র সংগঠনের প্রয়োজন বুঝিতে পারে।

মেদিনীপুর

ক্ষেতমজুরদের ধর্মঘট সংগ্রাম সবচেয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে মেদিনীপুরে। গত দুর্ভিক্ষ, ঝড় ও বন্যার পর হইতে এই জেলায় ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। জমিজমা, হালবলদ কিভাবে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়াছে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

মহিষাদল রাজ এস্টেট— খাসের জমির পরিমাণ তিন হাজার বিঘা।
সুরেন্দ্র মাইতি— খাসের জমির পরিমাণ ৪|৫ হাজার বিঘা।
বসন্ত মণ্ডল— জমির পরিমাণ তিন হাজার বিঘা।
সাগর দাস— জমির পরিমাণ ৭|৮ হাজার বিঘা।
দেওয়ান সাহেব— খাসের জমির পরিমাণ দুই হাজার বিঘা।
হৃষিকেশ জানা— (নন্দীগ্রাম) জমির পরিমাণ তিন হাজার বিঘা।
বৈদ্যনাথ সরকার— (তমলুক) জমির পরিমাণ দুই হাজার বিঘা।
হরেকৃষ্ণ মাইতি— (ময়না) খাসের জমি হাজার বিঘার উপরে।

অটল দাস— (ময়না) জমির পরিমাণ ১২০০ বিঘা।
গোবিন্দ প্রামাণিক— জমির পরিমাণ ৫০০ বিঘা।
মারোয়াড়ী এস্টেট— (ডেবরা) খাসের জমি ২০০০ বিঘা।
নাড়াজোল এস্টেট— (দাসপুর) খাসের জমি ৩০০০ বিঘা।
আশু সিং— (চন্দ্রকোণা) খাসের জমি ৩০০০ বিঘা।
রামমোহন সিং— (চন্দ্রকোণা) জমির পরিমাণ ১৫০০ বিঘা।
কালী রায় (কেশপুর), বটু পাল (খড়্গপুর), হরিপদ আর্য্য (খড়্গপুর), ব্যারিস্টার দিগু (কাঁথি), শাসমল (কাঁথি), সতীশ জানা (কাঁথি) প্রভৃতি প্রত্যেকের হাজার হাজার বিঘা জমি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

ইহারা ক্ষেতমজুরদের মজুরি দেয় কত? খড়্গপুর এলাকায় এখনো মজুরি আট আনার বেশি নয়, জেলার কোন অংশেই দুই টাকার বেশি নয়; অথচ গঠরা প্রভৃতি এলাকায় চাউলের দর ইতিমধ্যেই ২৫ টাকায় উঠিয়াছে। এই সকল জমিদার-জোতদার-ধনিকগোষ্ঠির হাতেই বিধান মন্ত্রিসভা সমস্ত ধান-চাউলের ব্যবসায় ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পারমিট দিয়াছেন।

এই শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয় চন্দ্রকোণা এলাকায়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে পারুলিয়া, উগ্রঘড়া, শশাবনী, মাহবনী, আলিপাড়া, খেতুয়া, শীর্ষা, বাহানা, বিশাবেড়া— এই নয়খানা গ্রামে ক্ষেতমজুরেরা ধর্মঘট করে। পরে ক্ষেতমজুরদের ধর্মঘট এখানকার শতাধিক গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। পারুলিয়া গ্রামের মজুরেরাই প্রথমে দৈনিক দুই টাকা মজুরি আদায় করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের ঐ জয়ের খবর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে অন্যান্য গ্রামেও জমিদার-জোতদার-ধনী চাষিরা মজুরদের দুই টাকা মজুরি দিতে বাধ্য হয়।

ধর্মঘটের শিক্ষা

এই সকল ক্ষেতমজুর ধর্মঘটে আমাদের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা জন্মে।

ধানগেছার ধনী ও মাঝারী কৃষক অধিকাংশ সদ্‌গোপ এবং ক্ষেতমজুরের অধিকাংশ বর্গক্ষত্রিয়। ধর্মঘট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনী কৃষকরা মাঝারী কৃষকদেরই মধ্যে প্রচার করে যে, বর্গক্ষত্রিয়েরা গ্রামে সদ্‌গোপদের সামাজিক মর্যাদা বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষেতমজুরদের পক্ষ হইতে গরীব কৃষক এবং মাঝারী কৃষক সদ্‌গোপদের বিচ্ছিন্ন করার জন্যই ধনী কৃষকরা এই চাল চালে। ক্ষেতমজুরেরা বুঝিতে পারে যে, ধনী কৃষকদের এই চাল ব্যর্থ করার একমাত্র উপায় গরীব এবং ভূমিহীন সদ্‌গোপদের সংগ্রামে টানিয়া নামানো এবং গ্রাম অঞ্চলের শ্রেণিসংগ্রামকে তীব্র করা, সামাজিক মর্যাদার নাম করিয়া ধনী সদ্‌গোপ কৃষকেরা আসলে যে গরীব সদ্‌গোপ কৃষকদের উপরেও শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে তাহা তাহাদের দেখাইয়া দেওয়া।

ধানগেছার জোতদারেরা বাহির হইতে সাঁওতাল মজুর আমদানি করিয়া ধর্মঘট ভাঙিবার চেষ্টা করে। ক্ষেতমজুরেরা বুঝিতে পারে যে, ধর্মঘট ভাঙা দালালদের কাজ। কিন্তু পিছনে পড়া সাঁওতালরা না বুঝিয়া দালালি করিতেছে। সুতরাং তাহাদের কাজ হইতে বিরত করার জন্য ধর্মঘটী মজুরেরা শোভাযাত্রা করিয়া সাঁওতাল শ্রমিকদের কাছে যায়; তাহাদের শোভাযাত্রায় মেয়েরাও দলে দলে যোগদান করে। সাঁওতাল শ্রমিকেরা কাজ ছাড়িয়া মাঠ হইতে চলিয়া

আসে। এইভাবে ধনিকদের সাঁওতাল-ক্ষেতমজুর সংঘর্ষ বাধাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

গ্রামের মাঝারি ও গরীব কৃষকেরা দাবি করে যে, তাহাদের জন্য মজুরির হার কম করা হোক, তাহা হইলে ধনী কৃষক-জোতদারদের কাজের মজুরি বাড়াইবার সংগ্রামকে তাহারাও সমর্থন জানাইবে। অনেক মাঝারি কৃষক ধর্মঘটীদের ভয় দেখায় যে, তাহাদের মুনিষদের মজুরি খুব বেশি বাড়ানো হইলে তাহারা চাষবাসের কাজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। ধর্মঘটী ক্ষেতমজুরদের পক্ষ হইতে তাহাদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে, গরীব কৃষকদের জন্য দরকার হইলে তাহারা বিনা মজুরিতেও খাটিয়া দিবে। জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাহারা গরীব ও মাঝারি কৃষকদের সমর্থন করিবে। কৃষকেরাও তখন ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করে। ধর্মঘটী শ্রমিকেরা বুঝিতে পারে যে, বড় বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট দীর্ঘ দিন চালাইবার প্রয়োজন হয় এবং গ্রামের গরীবদের পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতা না থাকিলে উহা দীর্ঘদিন চালানো কঠিন হয়।

আর দীর্ঘদিন ধর্মঘট চালাইয়া গ্রাম অঞ্চলের জোতদারদের একবার মজুরি বৃদ্ধির দাবি মানিতে বাধ্য করিলে, অন্যান্য ধনী ও মাঝারি কৃষকদের দ্বারা মজুরি বৃদ্ধির দাবি মানাইয়া লওয়া মোটেই কঠিন হয় না।

এই সকল ধর্মঘট সংগ্রামে ক্ষেতমজুররা দেখিয়াছে কিভাবে জোতদার-ধনী কৃষকরা মিথ্যা মামলায় তাহাদের জড়াইবার চেষ্টা করে (ডাকাতি, ধান লুঠ প্রভৃতির মামলা)। কিভাবে কংগ্রেসী গুণ্ডা, সেবাদল ও পুলিশ তাহাদের আক্রমণ ও গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করে, কিভাবে আপসের নামে তাহাদের সংগ্রামী মনোবল ও ঐক্য ভাঙিবার চেষ্টা করে। ধনিকদের এই সকল ফাঁদে পা না দিয়া, ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে পারিলে মজুরি বৃদ্ধির দাবি আদায় করা যায়, মেদিনীপুরের ব্যাপক ধর্মঘট সংগ্রামের মধ্য হইতে সেই অভিজ্ঞতাই লাভ করা গিয়াছে। যে সকল গ্রামে ক্ষেতমজুরের ধর্মঘট সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হয় নাই সেখানেও ক্ষেতমজুরেরা ধর্মঘটের মধ্যে নিজেদের বিপুল শক্তির সন্ধান পাইয়াছে।

কম হোক, বেশি হোক প্রায় প্রত্যেক জেলায় ক্ষেতমজুরেরা গত ছয় মাসে মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক সংগ্রামেই তাহাদের কিছু না কিছু মজুরি বৃদ্ধি করিতে জমিদার-জোতদার-ধনীরা বাধ্য হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষেতমজুরেরা নিজেদের মজুরি ডবল করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলায় ক্ষেতমজুরেরা 'কুদ' ও 'সাঁজা' প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে গরীব কৃষকের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। জেলার অনেক এলাকায় জোতদাররা 'কুদ' প্রথা তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। এই সংগ্রামের পাশাপাশি ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে জয়পুর থানার জগন্নাথপুর এলাকার সমস্ত ক্ষেতমজুর ও দিনমজুর দৈনিক দুই টাকা মজুরি এবং ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে। জমিদাররা গ্রামে পুলিশ আনিলে বিষ্ণুপুর ও জয়পুর থানার প্রায় ২৫ খানা গ্রামের ক্ষেতমজুর ও দিনমজুরেরা ১৬ই ফাল্গুন প্রতিবাদে হরতাল পালন করে। ঐ দিন লাঙল, মুনিষ, কামিনদের সকলের কাজ বন্ধ থাকে। হরতালের খবর আশেপাশের যে গ্রামে পৌঁছায় সেখানকার ক্ষেতমজুরেরাই মাঠ হইতে কাজ ছাড়িয়া উঠিয়া আসে। ঐ দিন ক্ষেতমজুরদের এক

বিরাট মিছিল ৭|৮ খানা গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়া মিটিং করে। পুলিশ ও কংগ্রেসী গুণ্ডারা কোন রকমেই ক্ষেতমজুরদের সভা-শোভাযাত্রার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

জয়পুর থানার ক্ষেতমজুরদের এই সংগ্রামের ঢেউ যাইয়া পৌঁছে মেদিনীপুরে গড়বেতা থানার শক্তিপুর ইউনিয়নে। [এই ইউনিয়নটি জগন্নাথপুর হইতে ৬ মাইল দূরে]। ১৯শে আষাঢ় হইতে সন্ধিপুর, খড়কুওমা, বশকুণ্ডু ইউনিয়নের ১৯|২০ খানা গ্রামের প্রায় ১২০০ ক্ষেতমজুর দৈনিক দুই টাকা মজুরি ও আট ঘন্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে। জমিদার-জোতদাররা প্রথমে ধর্মঘট ভাঙিবার জন্য বাহির হইতে মজুর আমদানি করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাতে সফল হয় না। পরে তাহারা ধর্মঘটী ক্ষেতমজুরদের শায়েস্তা করার জন্য অর্থনৈতিক বয়কট শুরু করে, তাহাদের নিকট দোকানের চাউল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করা বন্ধ করিয়া দেয়। ক্ষেতমজুরেরা যাহাতে কোন পুকুর বা গরু চরাইবার মাঠ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে না পারে, তাহার হুকুম জারি করা হয়। কিন্তু কোনকিছুই ধর্মঘটী ক্ষেতমজুরদের মনোবল ভাঙিতে পারে নাই।

জমিদার-জোতদারেরা তখন গ্রামে পুলিশ ডাকার জন্য ষড়যন্ত্র করে। নিজেরা ধনী জোতদার রাঘব সরকারের বাহিরের ঘরে আগুন লাগাইয়া পুলিশে খবর দেয়। ধনিক কংগ্রেস সরকার তখনই ধর্মঘট ভাঙিবার জন্য গ্রামে পুলিশ পাঠায়। ২৬শে আষাঢ় পুলিশ বাঁশদহ গ্রামে হানা দেয়। কিন্তু ক্ষেতমজুর ছেলে-মেয়েরা সকলেই জানাইয়া দেয় যে, তাহারা যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত। তখন জোতদাররা মিটমাটের ধাপ্পা দিয়া প্রায় ১০০ ক্ষেতমজুরকে নিজেদের বাড়িতে ডাকিয়া আনিয়া পুলিশের হাতে তুলিয়া দেয়। এই জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ সমস্ত গরীব প্রতিবাদ ঘোষণা করিলে পুলিশ নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালায়। ৫ জন ক্ষেতমজুর এবং তাহাদের নেতা সুধীর সর্দ্দার ও পঞ্চানন কৈদর সেখানে নিহত হন। তাহার পর গ্রামে পুলিশ ও কংগ্রেসী গুণ্ডাদল ধর্মঘটী ক্ষেতমজুরদের ঘরে ঘরে যাইয়া হানা দেয়। ক্ষেতমজুরের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রামে আতংকিত কংগ্রেসী সরকারের এই ফ্যাসিস্ট চেহারা গ্রামের গরীবদের নিকট এখন স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

বাঁকুড়ার ক্ষেতমজুররা শুধু মজুরি বৃদ্ধির জন্যই সংগ্রাম করে না; তাহারা বড় বড় পুকুরে নিজেদের মাছ ধরার অধিকার কায়েম করে; খাদ্যের দর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের গরীবদের মধ্যে শত শত মণ চাউল বিলি করে, শহরের বিড়ি শ্রমিকদের সহিত একত্রে গরীব কৃষককে তাহার জমি দখলে রাখার সাহায্য করে।

নিজেদের জঙ্গী জমায়েতের জোরে তাহারা গ্রামের মধ্যে এমন ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম করতে সমর্থ হয় যে জোতদার-জমিদার-ধনী কৃষকের গুণ্ডাদের পক্ষে তাহার বিরুদ্ধে হামলা করিতে গ্রামে ঢোকা কঠিন হয়।

চব্বিশ পরগনা

গত দুর্ভিক্ষে বাংলার যে সকল এলাকায় কৃষক সবচেয়ে বেশি জমিহারা হইয়াছে ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন প্রভৃতি তাহার অন্যতম। এখানকার প্রায় ১৪ আনা জমি জমিদার-জোতদার-লাটদারদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এখানকার জমিদার-জোতদার-লাটদারেরা সমস্ত খাদ্য কলিকাতা ও হাওড়ার চোরাবাজারে চালান করে। ফলে এখানকার ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষককে বছরের অধিকাংশ সময় অর্ধাহারে ও অনাহারে কাটাইতে হয় এবং ভিক্ষা করিবার

জন্য কলিকাতায় আসিতে হয়।

এবারকার তেভাগার সংগ্রামে এবং বিশেষ করিয়া জমি দখলের ব্যাপারে এই জন্যই ক্ষেতমজুররা সবচেয়ে অগ্রণী হয়। কাকদ্বীপের রাধানগর, চন্দ্রনগর, লয়ালগঞ্জ, বুধাখালি প্রভৃতি এলাকায় হাজার হাজার বিঘা জমিতে ভাগচাষিরা জোতদার পুলিশের সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া তেভাগা কায়েম করিয়াছে।

এই সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষেতমজুরদের মধ্য হইতে মজুরি বৃদ্ধির দাবি উঠিয়াছে। অধিকাংশ এলাকায় ক্ষেতমজুরদের মজুরি বাড়িয়াছে। রাজনগরে তাহারা মাঝারি ও গরীব কৃষকদের সহিত ৩০০ বিঘা জমি দখল করিয়া তাহা একত্রে চাষ করিয়াছে এবং ফসল সমানভাবে ভাগ করিয়া লইয়াছে। [যদিও মাঝারি কৃষকরা এই জমি চাষে কম খাটুনি দিয়াছে]। তাহারা শত শত মণ খাদ্য গ্রামের গরীবদের মধ্যে বিলি করিয়াছে। গ্রাম্য সংগ্রাম কমিটির মধ্যে ক্ষেতমজুরদের আধিপত্য অনেকখানি বাড়িয়াছে।

কিন্তু ক্ষেতমজুরদের সংগ্রাম শুধু কাকদ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। উহা এখন প্রায় সমগ্র জেলায় ছড়াইয়া পড়িতেছে।

কংগ্রেসী মন্ত্রী হেম নস্কর প্রভৃতি জমিদারের দল হাড়োয়া থানার প্রায় ৪০ হাজার বিঘা জমিতে জল আটকাইয়া মাছের চাষ করে। জমি হারাইয়া কৃষকরা দৈনিক আট আনা মজুরিতে সেই সকল মেছো ভেড়িতে মজুর হিসাবে কাজ করিতে বাধ্য হয়। তাহাতে আবার অধিকাংশ দিন কোন কাজও থাকে না। এই অবস্থায় তিউড়ির ভেড়ী মজুররা মজুরি বৃদ্ধির দাবি করিতে থাকে। তাহারা ঐ সকল জমিতে ফসল উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত লয়। কংগ্রেসী পুলিশ তাহাদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন দমন করার জন্য গ্রামে যায়। পুলিশের গুলিতে দাশু এবং মতি নিহত হন। ২৫০ জন সশস্ত্র পুলিশ কৃষকদের বাড়ি বাড়ি যাইয়া হানা দেয়।

ভাঙর এলাকায় বনগ্রাম, বাগবাড়ি, বেওতা প্রভৃতি গ্রামে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকরা গ্রামের গরীবদের মধ্যে প্রায় দুইশত মণ ধান বিলি করে। এখানেও ৩৫০ জন সশস্ত্র পুলিশ পাঠানো হয় এই সকল ধান জোতদারদের ঘরে ফিরাইয়া দিবার জন্য। ধানের খোঁজে পুলিশ ঘরে ঘরে হামলা করে।

সন্দেশখালিতে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা খুবই বেশি। এখানে ২রা জুন শুকদোয়ানীর লাটে ক্ষেতমজুররা এক সভা করিয়া ঘোষণা করে যে, ক্ষেতমজুরদের দৈনিক পাঁচ সিকার স্থলে আড়াই টাকা দিতে হইবে, তিন বেলা খোরাকী দিতে হইবে। মাহিন্দারদের মাহিনা ১৮ টাকার স্থলে ৬০ টাকা করিতে হইবে।

মিটিং-এর পরের দিনই গোটা লাটে ধর্মঘট হয়। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়, ধর্মঘট নূতন নূতন এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে। ৬।৭ দিনের মধ্যেই ধনীরা দৈনিক আড়াই টাকা মজুরি ও ৫০ টাকা মাহিনা দিতে স্বীকৃত হয়।

বামুনিয়া এলাকার ক্ষেতমজুররা শুকদোয়ানীর ঐ জয়ের খবর পাইয়া ধর্মঘট শুরু করে। ১০ মাইলের মধ্যে প্রায় ২৫০ জন ক্ষেতমজুর সপ্তাহকাল ধর্মঘট করিয়াই দাবি আদায় করিতে সমর্থ হয়।

হাটগাছি অঞ্চলের মেয়ে মজুরেরা ১ টাকা মজুরির স্থলে পুরুষদের সমান মজুরি দাবি করে। তাহারাও দৈনিক ২ টাকা মজুরি আদায় করে।

হাওড়া

হাওড়া জেলায় ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষককে প্রায় ১২ মাসই ২৫|৩০ টাকা দরে চাউল কিনিয়া খাইতে হয়। কাজেই এখানকার ক্ষেতমজুররা এখন দৈনিক ৪ টাকার দাবির উপর আন্দোলন শুরু করিয়াছে।

এই মজুরি বৃদ্ধির দাবির উপরেই গত ১২ই জুন ডোমজুর এলাকার প্রায় দুই হাজার ক্ষেতমজুর ধর্মঘট করে।

জুন মাসে ইসলামপুরে চাউলের দর ক্রমশই বাড়িয়া যাইতে থাকে। দুর্ভিক্ষের ঘোর সংকট সত্ত্বেও দেখা যায় যে, কংগ্রেস সম্পাদক জোতদার শচীন ঘোষের গোলায় ধান-চাউল বিস্তর মজুত রহিয়াছে। ক্ষেতমজুরেরা তখন ঐ ধান-চাউল গ্রামের গরীবদের মধ্যে বিলি করিয়া দেয়। অমনি সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের দর পড়িতে থাকে। শচীন ঘোষ পুলিশের নিকট সাহায্য চায়। পুলিশ ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের উপর গুলি চালায়। চারজন কৃষক নিহত হন।

হুগলী জেলা

হুগলী জেলার দ্বারবাসিনী অঞ্চলের ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসেও ক্ষেতমজুরদের মজুরি ছিল দৈনিক এক সের চাউল ও আটা এবং দশ আনা নগদ। বাঁধি কিসান ও নাগারী কিসানরা অগ্রিম টাকা লইত বলিয়া মাত্র চার আনা মজুরিতে খাটিতে বাধ্য হইত। ইহাদের ঘরের মেয়েদের প্রতি পর্যন্ত দাসোচিত ব্যবহার করা হইত।

ক্ষেতমজুররা অধিকাংশ বাউরী এবং সাঁওতাল; ধনীদের নিকট ছোটজাত বলিয়া পরিচিত। ধনীরা এই 'ছোটজাত'-এর আন্দোলনের বিরুদ্ধে মাঝারি কৃষকদের মধ্যে প্রচার করে। তবু এখানে মাত্র ১০ দিন প্রচারের ফলে ক্ষেতমজুরদের একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়; দৈনিক আড়াই টাকা মজুরির দাবি লইয়া মজুররা ১০ মাইল ঘোরে। ঠাণ্ডার বাগানে একদিন ধর্মঘট করিয়া দৈনিক মজুরি ১টা: ১২ আনা আদায় করা হয়। প্রায় ৬|৭ খানা গ্রামে ঐ ভাবেই মজুরির রেট বাড়িতে থাকে। মালঞ্চপাড়ায় ৪|৫ দিন ধর্মঘট চলে। দাবড়া গ্রামে এবং রামেশ্বরপুরে ক্ষেতমজুররা জোতদারদের বয়কট করে। ধনেখালি থানারও অনেক গ্রামে (খেজুরদহ প্রভৃতি) সমিতির ইস্তাহার পাইয়াই ক্ষেতমজুররা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে।

জানুয়ারি মাহে ডুবিরভেড়ী অঞ্চলে ৪|৫ খানা গ্রামে তেভাগা কায়েম হয়। জোতদারদের সাহায্য করার জন্য পুলিশ আসে। মেয়েদের উপর গুলি চালায়। ৫ জন মেয়ে শহিদ হন। এখানে ক্ষেতমজুররা সাঁওতাল; তাহাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন ও আলাদা সংগঠন শুরু হয়। প্রথমে ২|৩ খানা গ্রামে কিসানদের দৈনিক আড়াই টাকার রেট মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু পরে কৃষকেরা জোতদারদের সহিত আপস ও শান্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং কিসানদের বিরুদ্ধে যায়।

মার্চ মাসে বাগনানে মুসলমান জোতদার সালিম হিন্দু ক্ষেতমজুর গৌর পাত্রকে খুন করে। বর্গক্ষত্রিয়দের 'জাতীয়' নেতা এবং হিন্দু-মহাসভা কংগ্রেসপন্থীরা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করে। মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মিটিং ডাকে। কিন্তু ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকরা তাঁহাদের মিটিং বয়কট করিয়া চলিয়া আসে। তাহারা জোতদারদের বয়কট করে, ধর্মঘট চালাইতে থাকে।

পাতিপুকুরে ধনীরা দৈনিক এক টাকা মজুরি ও এক সের চাউলের দাবি মানিয়া লয়। বাগডাঙ্গা গ্রামে আন্দোলনের চাপে জোতদারেরা ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের পুকুর ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। ন-পাড়া গ্রামে জোতদারের হাতে একটি ক্ষেতমজুর মেয়ে নিহত হইলে ক্ষেতমজুররা তাহাকে শাস্তি দেয় ও বয়কট করে। বড়াকমলাপুরে দালালদের চার বিঘা জমি ক্ষেতমজুরদের চাষ করিতে দেওয়া হয়।

বীরভূম

ধান পাকার সময় হইতে বীরভূম জেলায় ক্ষেতমজুরেরা দৈনিক দুই টাকা মজুরির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। মোট ১২টি থানার মধ্যে ৮টি থানার বিভিন্ন অংশে ছোটবড় বহু ধর্মঘট হয়। এই সকল ধর্মঘটে গরীব কৃষকদের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়।

নগুরী গ্রামে কংগ্রেসী সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেখানে ব্যাপক ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটে যোগদান করার 'অপরাধে' ধনীরা ক্ষেতমজুর মেয়েদের জঙ্গলে পাতা কুড়াইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েরা সেই অধিকার কায়েম রাখেন।

রামপুরহাট থানার কাষ্ঠগড়া ইউনিয়নের সোয়াসা এবং তেলডা গ্রামের মজুর, মাহিন্দার এবং কৃষকেরা ৯ই মার্চ হইতে ধর্মঘট করে। তাহাদের দাবি ছিল, দুই টাকা দিনমজুরি, খাওয়াপরা বাদে ৩০ টাকা মাস মাহিনা এবং কৃষাণদের জন্য ফসলের অর্ধেক ভাগ। [কৃষাণদের জোতদার ও ধনী কৃষকেরা জমি, হাল-বলদ, বীজধান সরবরাহ করে]। কয়েকদিন ধর্মঘট চালাইবার পরই জোতদাররা দিনমুজরদের দাবি মানিয়া লয়।

২১শে জুন মামুদবাজার থানার গণপুর ইউনিয়নের ডামরা গ্রামে, রামপুরহাট থানার মশরা ও কাষ্ঠগড়া ইউনিয়নের, ভারকাটা ইউনিয়নের এবং ময়ুরেশ্বর থানার মল্লারপুর ইউনিয়নের প্রায় ৬০|৭০ খানা গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের এক জমায়েত হয়। এখান হইতে হাজার লোকের এক মিছিল বাহির হইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করে ঃ দুই টাকা মজুরি চাই, মাহিন্দারের বেতন ৩০ টাকা চাই, ৮ ঘন্টা খাটুনি ও সপ্তাহে একদিন ছুটি চাই, কিসানদের আধাভাগ ও ভাগচাষির তেভাগা চাই, খাদ্য ও ধানের সুদ নাই ইত্যাদি।

পরদিন হইতে ব্যাপক এলাকা জুড়িয়া ধর্মঘট আরম্ভ হয়। ক্ষেতমজুররা জমিদারের ঝি-চাকর পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দেয়। ধর্মঘট ভাঙ্গিবার জন্যে জোতদার-ধনীরা গ্রামে পুলিশ ডাকিয়া আনে। পুলিশ গুলি চালায়। চারজন ক্ষেতমজুর নিহত হন।

বীরভূমে ধানকলের হাজার হাজার শ্রমিকের মধ্যেও এখন মজুরি বৃদ্ধির দাবি ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেখানকার মেয়ে মজুররা পুরুষের সমান মজুরি দাবি করিতেছে।

মালদহ

মালদহে ক্ষেতমজুরদের সংগ্রাম শুরু হয় জলায় মাছ ধরার অধিকার কায়েম করার মধ্য দিয়া। ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা কতকগুলি জলায় বহুদিন হইতে বিনা বাধায় মাছ ধরিয়া যাইত। এখন চাচোলরাজ উহা ধনীদের বন্দোবস্ত দিতে শুরু করিয়াছে। ২৯শে জানুয়ারি প্রথমে ৬০ জন দিনমজুর ও গরীব কৃষক একটি জলায় মাছ ধরার অধিকার কায়েম করে। পরে তাহাদের ২|৩ হাজার দিনমজুর ও গরীব কৃষকের এক একটি জমায়েত যাইয়া আরও ৮|৯টি বিল ও জলায় মাছ ধরে।

৪ঠা মার্চ হইতে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শারি থানার কাজী গ্রাম, অমৃতি ও মিল্কী ইউনিয়নের ক্ষেতমজুরেরা এক সপ্তাহের জন্য ধর্মঘট করেন। এই সময়ে চোরাকারবারীদের জন্য গ্রামের গরীবরা কাপড়-কেরোসিন কিছুই পাইত না। ধর্মঘটী মজুরেরা স্থানীয় চোরাকারবারীর হাত হইতে প্রচুর কাপড়, কেরোসিন প্রভৃতি উদ্ধার করিয়া গরীবদের মধ্যে বিলি করে।

বর্ধমান

বর্ধমান জেলার রায়না ও হাট-গোবিন্দপুরে ক্ষেতমজুর ও মাহিন্দারদের ছোট ও বড় অনেক ধর্মঘট হয়। প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মঘটে ধনীরা মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হয়। হাট-গোবিন্দপুরে প্রথমে তাহারা মাঝারি কৃষকদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে; কংগ্রেস ও মহাসভার নেতারা পুলিশ লইয়া কৃষকদের বাড়ি বাড়ি যায়। কিন্তু তাহাদের ভেদনীতি মজুররা ব্যর্থ করে। গরীব ও মাঝারি কৃষকরা অধিকাংশ ধর্মঘটীদের সমর্থন জানায়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক গণ-চেতনা

এইভাবে গত ৬ মাসে বাঁচার মত মজুরির দাবিতে সারা বাংলায় লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর ধর্মঘট করিয়াছে; গ্রাম অঞ্চলে এক নূতন গণ-জাগরণের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সকল সংগ্রামের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি ক্ষেতমজুরদের কত কম মজুরিতে খাটানো হয়। যেখানেই এই কম মজুরির বিরুদ্ধে সামান্য আন্দোলন করা গিয়াছে সেখানেই ধনীরা মজুরি বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সকল সংগ্রামের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, একই জেলার মধ্যে ধনীরা এখনও কোথাও কম এবং কোথাও বেশি মজুরি দিতেছে, নাবালক ও মেয়ে মজুরদের পুরুষদের তুলনায় অনেক কম মজুরি দেওয়া হইতেছে। এ জন্যেই ক্ষেতমজুর নওজোয়ান ও মেয়েরা সকলের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। এই সকল সংগ্রামের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, যাহারা 'ক্ষেতমজুর নাই' বলিয়া ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করিতে চাহিতেছিল না, তাহারা কতখানি অন্ধ। যেখানেই ক্ষেতমজুরদের দাবি তোলা হইয়াছে, সেখানেই দলে দলে ক্ষেতমজুর আসিয়া সংগ্রামে যোগ দিয়াছে। ধনিকদের শোষণের ফলে প্রতিদিন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়াই আজ যারা গরীব কৃষক তাহাদেরও এই সকল সংগ্রামকে সমর্থন জানাইয়াছে। ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাদের মাসে ১০|১৫ দিন কাজ জুটিতেছে না— তাহার জন্যই তাহারা সংগঠিত হইবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

আমরা দেখিয়াছি, যখনই ক্ষেতমজুরদের কোন স্থানীয় ধর্মঘট হইয়াছে, তাহারা তাহাকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়াইবার জন্যে প্রচার স্কোয়াড পাঠাইয়াছে। এক দিনের জেলা-ব্যাপী ধর্মঘট হইতে তাহারা সাধারণ ধর্মঘটের দিকে অগ্রসর হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, এই সকল ধর্মঘট ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়া ক্ষেতমজুরদের মধ্যে এক নূতন সামাজিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছে।

এতদিন গ্রামে তাহারা ছিল— 'নীচজাত', তাহারা ছিল ধনীদের ক্রীতদাস, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (বিবাহ প্রভৃতির ব্যাপার) হইতে বঞ্চিত। তাহাদের উপর

ধনীরা মারপিট পর্যন্ত করিত, কথায় কথায় জবাব দিত। এই সকল সংগ্রামের মধ্য দিয়া অনেক সামাজিক অত্যাচার বন্ধ হইয়াছে; মানুষের অধিকার পাইবার জন্য ক্ষেতমজুরদের মধ্যে সংগ্রামী আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে।

ক্ষেতমজুরেরা প্রতিটি সংগ্রামে অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, বর্বর দমননীতি তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিবার পরিবর্তে তাহাদের সংগ্রামী চেতনাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কংগ্রেসী সরকার সম্পর্কে তাহাদের মোহ দ্রুত কাটিতেছে। তাহারা দেখিতে পাইতেছে যে, কংগ্রেসী সরকার প্রত্যেক ক্ষেত্রে ধনীদের পক্ষ লইতেছে। তাহারা গ্রাম-অঞ্চলে এখনও সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে বাহির হইয়া আসিতেছে। ৯ই মার্চের রেল ধর্মঘটের সমর্থনে মেদিনীপুর, কেশপুর প্রভৃতি এলাকায় ক্ষেতমজুরেরা ধর্মঘট করে, হাওড়া ডোমজুর এলাকায় তাহারা গ্রাম হইতে রেল লাইনের উপরে আসিয়া দাঁড়ায়; কাকদ্বীপ, হুগলী প্রভৃতি এলাকায় তাহারা সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া সংগ্রামী ঐক্যের পরিচয় দেয়। রেলের সাধারণ ধর্মঘটের জয়ে তাহাদের বাঁচার মত মজুরির সংগ্রাম শক্তিশালী হইবে ইহা তাহারা উপলব্ধি করে।

মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা প্রভৃতি এলাকার ক্ষেতমজুরেরা মে দিবসে বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিয়া শত্রুর প্রাণে আতংক সৃষ্টি করে; মাঝারি ও গরীব কৃষকদের জমির উপর দখল রাখার সংগ্রামে পূর্ণ সমর্থন জানায়। অনশন বন্দীদের মুক্তির সংগ্রামে হাওড়া, মালদহ, ২৪ পরগনা প্রভৃতি এলাকার ক্ষেতমজুররা গণ-বিক্ষোভ সংগঠিত করে, মেদিনীপুরের ক্ষেতমজুররা নানকিং বিজয় উৎসব পালন করে। 'এই স্বাধীনতা ভুয়া স্বাধীনতা'— এই আওয়াজের উপর বাঁকুড়া ও অন্যান্য জেলার ক্ষেতমজুররা ধনিক কংগ্রেসী সরকারের প্রতি বিপ্লবী কায়দায় অনাস্থা প্রকাশ করে। ৫ জন ক্ষেতমজুর পুলিশের গুলিতে নিহত হন। 'জাতীয়' টি-ইউ-সি'র নেতা ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী মালদহে গেলে সেখানকার ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা তাঁহাকে বিরূপ সম্বর্ধনা জানায়। বাঁকুড়ার ক্ষেতমজুররা জমিদার-জোতদারদের হিন্দু-মহাসভা সম্মেলনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। এইভাবে বাংলার ক্ষেতমজুর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সহিত আগাইয়া চলিয়াছে।

সংগঠন দুর্বল কেন?

কিন্তু এত ধর্মঘট, এত সংগ্রাম ও আন্দোলন পরিচালনা করা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষেতমজুরদের নিজস্ব স্বাধীন সংগঠন যতখানি গড়িয়া তোলা সম্ভব ছিল তাহা তোলা হয় নাই। অধিকাংশ জেলায় ক্ষেতমজুরদের অলাদা করিয়া ইউনিয়ন গঠন করার প্রয়োজন, তাহাদের ইউনিয়নের সভ্য করার প্রয়োজন শুধু মৌখিকভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্বীকৃত হয় নাই। এই সম্মেলনের প্রস্তুতি উপলক্ষেই প্রথম জেলায় জেলায় স্বতন্ত্র ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন তৈরি করার কাজ শুরু হইয়াছে, ইউনিয়নের সভ্য সংগ্রহের কাজ কিছু কিছু শুরু হইয়াছে।

এতদিন স্বতন্ত্র সংগঠন গড়িবার কাজকে অবহেলা করা হইয়াছে কেন? কারণ, গ্রাম অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষককর্মী ছিলেন মাঝারি কৃষক [এবং কিছু কিছু কর্মী ছিলেন ধনী কৃষকেরও মুখাপেক্ষী]। তাঁহারা বরাবরই এই কথা বলিতেন যে, এখন মজুরি বৃদ্ধির দাবি

তুলিলে বা ক্ষেতমজুরদের স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিলে "কৃষক ঐক্যে" ভাঙ্গন ধরিবে, মাঝারি কৃষকরা বিরুদ্ধে চলিয়া যাইবে। তাহাদের আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। জমিদার এবং জোতদারের মত ধনী কৃষকও কংগ্রেসী সরকারের অংশ, তাঁহারা কৃষকের সংগ্রামে ভেদ সৃষ্টি করে এবং দমননীতিকে সাহয্য করে সক্রিয়ভাবে। কাজেই তাহাদের লইয়া 'কৃষক ঐক্য' হয় না, গত ছয় মাসে তাহা একেবারেই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ক্ষেতমজুররা সংগঠিত না থাকিলে মাঝারি কৃষকের ভয় ও দোমনাভাব কাটে না— তেভাগা প্রভৃতির সংগ্রামে তাহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। ক্ষেতমজুরদের স্বতন্ত্র সংগঠন তৈরি করার এখনো যে কোন স্থানে যে কোন বাধাই আসুক না কেন তাহা দৃঢ়তার সহিত অতিক্রম করিতে হইবে। গরীব কৃষকদের সহিত ঐক্যকে দৃঢ় করিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই, সংগঠনের ক্ষেত্রে বর্তমান দুর্বলতা কাটাইয়া উঠা যাইবে, গ্রাম অঞ্চলের সংগ্রামে ক্ষেতমজুরদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। ক্ষেতমজুরদের নেতৃত্বে গ্রামের নির্বাচিত সংগ্রাম কমিটির মধ্যে কৃষক সমিতি এবং অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। এই সকল নির্বাচিত সংগ্রাম-কমিটিকে গ্রাম অঞ্চলে সংগ্রামী জনতা জনপ্রিয় নেতা করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার নেতৃত্বে সভা শোভাযাত্রা, গণবিক্ষোভ সংগঠিত করিতে হইবে; ইহার নেতৃত্বে সংগ্রাম চালাইয়া বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে এবং জমিদার ও জোতদারদের জমি গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বিলি করিতে হইবে। তাহাদের অগ্রণী হইতে হইবে প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে।

ধনিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কর

ধনিক কংগ্রেসের শাসনে শুধু ক্ষেতমজুরই নয়, সমগ্র মজুরশ্রেণির শোষণই দিন দিন বাড়িতেছে। খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর বাড়িতেছে। টাটা-বিড়লা ধনিকদের মুনাফা ঠিক রাখার জন্য কারখানায় কারখানায় ব্যাপক মজুর ছাটাই চলিয়াছে, মজুরি কমানো হইতেছে, কাজ বাড়ানো হইতেছে, ধর্মঘটের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইতেছে, কালাকানুন ও ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হইতেছে, মজুরদের নিজস্ব পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু এত বাধা, এত দমননীতি সত্ত্বেও কারখানা শ্রমিকদের ধর্মঘট দিন দিনই বাড়িতেছে, ধনিকশ্রেণির আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহারা অতুলনীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতেছে।

টাটা-বিড়লার স্বার্থে নেহরু সরকার মার্কিন মূলধন আমদানি করিতেছেন। ঐ মূলধন রেল এবং কৃষিতে খাটানো হইবে। ক্ষেতমজুররা এতদিন শুধু ভারতীয় ধনীদের গোলাম ছিল, এখন শীঘ্রই মার্কিন ও ভারতীয় উভয় মনিবের গোলামে পরিণত হইবে। মার্কিন মনিবরা নীলকরদের মত তাহাদের উপর যাহাতে অবাধ শোষণ চালাইতে পারে নেহরু সরকার তাহারও প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। ভারতবর্ষ এখন মার্কিন উপনিবেশে পরিণত হইবে। এখানে দাঁড়াইয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়ার মুক্তিসেনা-বিপ্লবী চীন ও সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবে। তাহার জন্যই কংগ্রেসী শাসকরা এখন মার্কিন প্রভুদের হুকুমে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করিতেছে।

বিধান মন্ত্রিসভার রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করিয়াই জনগণ কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও বর্মা-চীনের উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। আমরা এই ক্ষেতমজুর সম্মেলন হইতে সেই লক্ষ লক্ষ ধর্মঘটী শ্রমিক ও ছাত্রদের অভিনন্দন জানাইতেছি; তাহাদের প্রত্যেকটি সংগ্রামের সহিত ঐক্য প্রকাশ করিতেছি।

যুদ্ধ ধনীদের নিকট লাভজনক ব্যাপার। গত যুদ্ধে তাহারা আমাদের অনাহারে রাখিয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটিয়াছে। আবার এই দেশে আমরা সেই অবস্থা ঘটিতে দেব না— সম্মেলন হইতে সেই সিদ্ধান্তই জানাইয়া দিতেছি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্যে নেহরু সরকার বাজেটে সামরিক ব্যয় বাড়াইয়াছে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়প্রার্থীদের বাসস্থান প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় না করিয়া সৈন্যদের খরচ বাড়াইতেছে। এই সম্মেলন হইতে আমরা তাহার বিরোধিতা করি। আমরা বিনা পয়সায় শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দাবি করি, আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি দাবি করি।

বিড়লা ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দসই বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা ধনী-জমিদারদের স্বার্থে বার বার মজুর-কৃষক জনগণের উপর গুলি চালাইয়াছে। ক্ষেতমজুর বাঁচার মত দৈনিক মজুরি দাবি করিলে যাহারা গ্রামে পুলিশ পাঠাইতেছে, তাহারা নিজেরা গরীবের পকেট হইতে দৈনিক হাজার হাজার টাকা লুঠ করিতেছে। এই লুঠের বখরা লইয়া কংগ্রেসীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগায় এখন মন্ত্রীদের অনেক কথাই ফাঁস হইয়া পড়িতেছে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দফায় দফায় দুর্নীতির অভিযোগ আসিয়াছে; তাহারা কাপড়ের ব্যাপারে, পারমিট ও রেশন শপের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে, আত্মীয়স্বজনকে চাকুরি ও ঠিকাদারী দেওয়ার ব্যাপারে, সরকারি টাকায় নিজেদের ব্যবসা জমাইবার ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করিতেছে। আশ্রয়প্রার্থী শিশু যখন রাস্তার জলে ভিজিতেছে, মন্ত্রীরা তখন নিজামপ্রাসাদ দখল করিয়া তাহা ভোগ করিতেছেন।

এই সকল দুর্নীতি, দমননীতির বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ বারবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিনা বিচারে আটক শ্রমিক-কৃষক বন্দীদের যাহার গুলি করিয়া খুন করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থীর পরাজয়ে। এই পরাজয় প্রমাণ করিয়াছে যে, বাংলার গণতান্ত্রিক নাগরিকরা ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের মা-বোন ও নওজোয়ান ছেলেদের উপর গুলিচালনা সমর্থন করে না। এই পরাজয় প্রমাণ করিয়া দিল যে, মন্ত্রিসভার পিছনে জনগণের সমর্থন নাই, জনগণের সমর্থন আছে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাঁচার মত মজুরির দাবির পিছনে।

কংগ্রেস নেতারা জনগণের ঐ রায় মানেন নাই। বরং ঐ রায় মন্ত্রিসভার পক্ষে জনমত গঠনের আশায় তাহারা বৃটিশ আমলের ভারত শাসন আইন অনুসারে জনগণের শতকরা মাত্র ১৩ জনের ভোটে [যাহাদের মধ্যে ক্ষেতমজুর একজনও থাকিবে না] সাধারণ নির্বাচন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; ঐ ভাবে বাংলায় রায় মন্ত্রিসভাকে স্থায়ী করার কৌশল বাহির করিয়াছেন।

এই সম্মেলন হইতে আমরা জানাইয়া দিতেছি, পণ্ডিত নেহরুর ঐ চাল আমরা ব্যর্থ করিব। নির্বাচনকে আমরা রায় মন্ত্রিসভাকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করিব। কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবি, সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি, বিনা-বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তির উপর দাবিকে ভিত্তি করিয়া আন্দোলন শুরু করিলেই কংগ্রেসীদের "স্বাধীন নির্বাচনের" ধাপ্পাবাজী সকলেব নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

সমগ্র প্রদেশের লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর আজ আমাদের এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তের দিকে তাকাইয়া আছে। এই সম্মেলন হইতে তাহাদের আমরা আহ্বান জানাইতেছি ঃ আসুন আমরা ধনী জমিদার-জোতদারদের প্রত্যেকটি আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করি। বাঁচার মত মজুরির দাবি ও ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে, কাজ অথবা বেকার ভাতার দাবিতে, বিনা খেসারতে জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ, জমি জাতীয়করণ এবং জমি দখলের দাবিতে, তেভাগা এবং সাঁজা-কুদ বন্ধের দাবিতে গ্রাম অঞ্চলে এক ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘটের পথে অগ্রসর হই। আসুন, কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করি, গণতান্ত্রিক অধিকারেব উপর কংগ্রেসী শাসকশ্রেণির আক্রমণকে ব্যর্থ করি, ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করিয়া সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হই। আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

২

পূর্ববাংলার ক্ষেতমজুর

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের দৌলতে পাকিস্তানে দেশীয় ধনিক-জমিদারদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর হইতে পূর্ববঙ্গের গরীব মেহনতী কৃষকদের জীবনের সংকট ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ধান-চাউলের দর ক্রমাগত বাড়িয়া এ বছর প্রতিমণ চাউল ৩৫|৪০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। চাউলের এরূপ দর বাংলার ইতিহাসে আর কোন দিনই হয় নাই।

ধান-চাউলের এই অস্বাভাবিক দাম হেতু আজ পূর্ববঙ্গের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের ঘরে ঘরে অনাহার ও অর্ধাহার। কোন কোন গ্রামে অনাহারে মৃত্যুও ঘটিয়াছে।

অপরদিকে এই ধান-চাউল মজুত করিয়াই ধনী কৃষকগণ জনগণের ক্ষুধার বিনিময়ে বিরাট মুনাফা লুটিতেছে। ধনীর দালাল নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা খাদ্য সংগ্রহের নামে ধনীকৃষক ও জোতদারদের ধান ছাড়িয়া দিয়া মধ্য কৃষক ও গরীব কৃষকদের ধান ফৌজ লাগাইয়া কাড়িয়া নিয়াছে। কিন্তু এই খাদ্য গ্রামের জনগণের ভিতর বিলি হয় নাই। এই খাদ্য দিয়া 'রেশনের' নামে ব্যবসা করিয়া নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা ১৯৪৮-৪৯ সালে ৬৩ লাখ টাকা লাভ করিয়াছে।

নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স বাড়াইয়া গ্রামের গরীবদের কাঁধে সংকটের উপর সংকটের বোঝা চাপাইয়াছে।

খাদ্যের অস্বাভাবিক দাম, লীগ সরকারের 'খাদ্যনীতি', নিত্যনৈমিত্তিক জিনিসের চড়া দাম, ট্যাক্সবৃদ্ধি প্রভৃতি গ্রামের মেহনতী কৃষককুলের জীবন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছে।

এই গভীর সংকটের আঘাত সবচেয়ে বেশি পড়িয়াছে গ্রামের সর্বহারা ক্ষেতমজুর শ্রেণির উপর। চাউলের মণ যখন ৩৫|৪০ টাকা, প্রতিটি জিনিসের দাম যখন ৪|৫ গুণ বাড়িয়াছে, তখন পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে মজুরের দল দৈনিক ১ টাকা, দেড় টাকা মজুরিতেই কাজ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহার ফলে লীগ শাসনের আমলে ধনীকৃষক ও জোতদারদের শোষণে ও অত্যাচারে পূর্ববাংলার গ্রামের এই শ্রমজীবীশ্রেণি অতি দ্রুত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ইহাদের শোষণ করিয়াই অপরদিকে ধনীর দল মুনাফার পাহাড় তৈয়ার করিয়াছে।

পাট-লাইসেন্স বাতিলের লড়াই

ধনিক-জমিদার ও লীগ সরকারের এই প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রামের মেহনতী মানুষ জমি, খাদ্য, বাঁচার মত মজুরির দাবি নিয়া সকল শক্তি দিয়া লড়াই চালাইয়া যাইতেছে।

বাংলার চাষির অমূল্য সম্পদ পাট। এই পাট নিয়া পূর্ববাংলার মুষ্টিমেয় বিদেশী ব্যাপারী কৃষকগণকে ঠকাইয়া ও পশ্চিম বাংলার বিলাতী পাটকলওয়ালাগণ মজুরগণকে শোষণ করিয়া বছরে বছরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে। অথচ বাংলার চাষি এই পাটের ন্যায্য দাম পায় না। লীগ নেতারা চাষিকে ওয়াদা দিয়াছিল যে, তাহারা পাটের দাম বাড়াইয়া দিবে। কিন্তু, সেই ওয়াদা রক্ষা করার বদলে লীগ মন্ত্রিসভা ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে পাট চাষের উপর নূতন করিয়া এক ট্যাক্স ধার্য করিয়া চাষির ঘাড়ে সংকটের বোঝা আরও বাড়াইয়া দিলেন।

ইহার বিরুদ্ধে সারা পূর্ববঙ্গে চাষিদের বিরাট বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার কৃষক এই পাট লাইসেন্স করিতে অস্বীকার করিয়া দাবি তোলেন, 'পাট চাষ ট্যাক্সের প্রত্যাহার চাই'। লালঝাণ্ডার নিচে সংঘবদ্ধ হইয়া ১৯৪৮ সালের জুন-জুলাই মাসে রংপুরের ও ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের চাষিগণ এই লাইসেন্স নিতে অস্বীকার করে। লীগ মন্ত্রিসভা ভয় দেখাইয়া গ্রামে পুলিশ পাঠাইয়া চাষিদের এই হক্ লড়াইকে ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ধনিক সরকারের দমননীতি গরীবদের লড়াইকে ভাঙ্গিতে পারে নাই। জুলুম সত্ত্বেও হাজার হাজার গরীব চাষি পাট লাইসেন্স ফি দেন নাই।

খাদ্যের আন্দোলন

১৯৪৮ সালের জুন-জুলাই মাস হইতেই পূর্ববঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। মজুতদারদের মুনাফার লালসায় চাউলের দাম দাঁড়াইয়া যায় মণ প্রতি ৩০|৩৫ টাকা। লীগ সরকার খাদ্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই করিল না। সরকার মজুত উদ্ধার করিয়া তাহা বিতরণ করিল না।

এই পরিস্থিতিতে ঢাকায়, চট্টগ্রামে, ময়মনসিংহের রাস্তায় রাস্তায় বুভুক্ষু শত শত নরনারী বিক্ষোভ জানাইল, "শস্তা দরে খাদ্য চাই", "খাদ্য দাও নয়ত গদী ছাড়"। চট্টগ্রামে গ্রামের গরীব মেয়ে-পুরুষদের এই ভুখা মিছিলকে ভাঙ্গার জন্য সরকার পাঁচশ পুলিশ ও আনসার নিয়োগ করিয়া এক প্রচণ্ড সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই সময়ে খাদ্যের দাবিতে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে গ্রামের গরীবদের মিছিল, সভা, শোভাযাত্রা পূর্ববাংলার প্রায় সব জেলাতেই হইতে থাকে। জেলায় জেলায় শত শত কণ্ঠে ক্ষেতমজুর-গরীব কৃষক নরনারী আওয়াজ তোলে— 'খাদ্য দাও নয়ত গদি ছাড়'।

যশোহরের নড়াইল মহকুমার নড়াইল, সেনহাটি, দুর্গাপুর ইউনিয়নে এই আন্দোলন বিশেষ করিয়া দানা বাঁধিয়া ওঠে। গরীব জনতার জাগরণে ভীত, ধনীর সমর্থক লীগ মন্ত্রিসভা সশস্ত্র পুলিশ পাঠাইয়া আন্দোলনকে পিষিয়া মারিতে চেষ্টা করে। ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষিগণ সশস্ত্র পুলিশের হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। গ্রামের গরীবদের শক্তির সামনে পুলিশ ২|৩ বার পরাজিত হয়। ইহার পর আরও অধিক সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া গ্রামে গ্রামে অমানুষিক অত্যাচার চালাইতে থাকে।

এই সময়েই খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার গরীব চাষিগণ লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে ধান বীজের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। লীগ মন্ত্রিসভা সশস্ত্র পুলিশ ও আনসার দ্বারা বীভৎস দমননীতি চালাইতে থাকে। শোভনা এলাকায় আনসার ও পুলিশের অত্যাচার চরমে ওঠে। তবুও আন্দোলন চলিতেই থাকে।

আগষ্ট মাসেই রাজশাহীর মান্দা থানায় চাকরান প্রজাগণ লড়াই করিয়া যুগ-যুগের বেগারপ্রথা বন্ধ করিয়া দেন।

মাদারশার লড়াই

২৯শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে মাদারশার গরীব চাষি ও ক্ষেতমজুরগণ বানের জল হইতে নিজেদের ঘরবাড়ি রক্ষা করার জন্য নদীর 'টেক' কাটার লড়াইয়ে আগুয়ান হন। নদীর 'টেক' কাটিয়া দিলে বানের জল বাহির হইয়া মুষ্টিমেয় ধনীর মাছের ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া লীগ সরকার 'টেক' কাটিতে অস্বীকার করে। ধনীর মাছে ব্যবসায় ক্ষেত্র পাহারা দেওয়ার জন্য লীগ সরকার মাদারশার 'টেকে' সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করে।

কিন্তু মাদারশার গরীব চাষি ও ক্ষেতমজুরের দল লীগ সরকারের পুলিশের বন্দুক তুচ্ছ করিয়াই ২৯শে সেপ্টেম্বর 'টেক' কাটিতে অগ্রসর হয়। পুলিশ তখন নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া গুলি চালায়। সেই স্থানেই ১৭ জন বালক, যুবা, বৃদ্ধ নিহত হন। মাদারশার নদীর কালো জল গরীবের খুনে লাল হইয়া যায়। এই হত্যাকাণ্ডে চট্টগ্রামে ও সারা পূর্ববঙ্গে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। সেদিন চট্টগ্রামের জনসাধারণ সারা জেলায় হরতাল করিয়া এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জবাব দেয়।

এই সব সংগঠিত লড়াই ছাড়াও পূর্ববঙ্গের বহু স্থানেই গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই খাদ্যের জন্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে থাকেন। সিলেট, রংপুর, বরিশাল, খুলনা চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ দলবদ্ধ হইয়া চোরাকারবারীদের ধান ধরিয়া তাহা দখল করিয়া নেন।

বিভিন্ন জেলায় লীগ সরকারের 'সীমান্ত রক্ষী' দলের জুলুম, ঘুষ আদায়, মারপিট প্রভৃতি বহুবিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধেও বহু স্থানেই গ্রামের গরীবগণ রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রংপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ জেলার বহুস্থানেই এই অত্যাচারী 'সীমান্ত রক্ষী দল'কে গ্রামের গরীবগণ উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছেন।

আধি ও টংকপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই

জনগণের খাদ্যের দাবি ও তাহার বিরুদ্ধে লীগ মন্ত্রিসভার দমননীতি, মাদারশার ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের উপর সরকারের পুলিশের বেপরোয়া গুলি বর্ষণ ও গুলিতে ১৭ জনের মরণ প্রভৃতি ঘটনা ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক ও গ্রাম্য মেহনতী জনতাকে বুঝাইয়া দিল যে, লীগ মন্ত্রিসভা ধনীকৃষক-জমিদার-জোতদারদের মন্ত্রিসভা।

এই সময়েই লীগ সরকার গণ-জাগরণে ভীত হইয়া জমিদারি ক্রয় বিল দ্বারা কৃষক জনসাধারণকে আবার ধাপ্পা দিতে চেষ্টা করে যে, তাহারা এবার জমিদারি তুলিয়া দিয়া চাষিকে জমি দিবে।

কৃষক সমিতি ইস্তাহার, পুস্তিকা, সভা প্রভৃতি মারফত জনগণের নিকট সরকারের এই ধাপ্পা প্রকাশ করিয়া দিতে থাকে।

জনগণও নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারে যে, নিজেদের খাদ্য, জমি ও বাঁচার মত মজুরি প্রভৃতি দাবি লড়াই করিয়াই কায়েম করিতে হইবে। কাজেই সরকারের দমননীতি তুচ্ছ করিয়াই ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করিতে থাকে।

১৯৪৮ সালের শেষ ভাগ হইতে খুলনা, যশোহর, রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বগুড়া প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে লালঝাণ্ডার হক নেতৃত্বে লাখ লাখ গরীব জনগণ নিজেদের দাবি ঘোষণা করেন, "খোদ চাষির হাতে জমি চাই", "জমিদারিপ্রথা খতম কর", "আধিপ্রথা খতম কর", "টংকপ্রথা খতম কর", "জান দিব তবু ধান দিব না"।

লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে সারা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার লাখ লাখ গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর নরনারী বর্বর শোষণ, আধিপ্রথা ও টংকপ্রথা খতমের প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে নামিয়া পড়েন। গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ নিজেদের শ্রমজাত ধান নিজেদের বাড়িতে আনার জন্য লড়াই শুরু করিল। নুরুল আমীন মন্ত্রিসভাও আরও কঠোর ভাবে দমননীতি চালাইয়া দেয়। গ্রামে গ্রামে ধনী-কৃষক, জোতদার, জমিদারের বর্বর শোষণ বজায় রাখার জন্য শত শত পুলিশ ফৌজের ক্যাম্প বসিয়া গেল। শুরু হইল ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষিদের উপর অত্যাচার, অনাচার, গুলিবর্ষণ, গ্রেপ্তার, মারপিট। তবুও আধিপ্রথা ও টংকপ্রথার শোষণের বিরুদ্ধে খাদ্যের জন্য লড়াই জেলা হইতে জেলায় ছড়াইয়া পড়িল।

অগস্ট মাস হইতে অনবরত চার মাস পাশবিক অত্যাচারের পরও নভেম্বর মাসে নড়াইলের আধিয়ারগণ ধান কাটিয়া নিজ খোলানে তুলিয়া নিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, অত্যাচারে জনতার মনোবল আজ ভাঙিয়া পড়ে না।

সমস্ত দমননীতি তুচ্ছ করিয়াই ডিসেম্বর মাসে খুলনা জেলার নমঃশূদ্র ও মুসলমান আধিয়ারগণ আধিপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। লড়াই প্রথম আরম্ভ হয় দাকোপ থানায়। দেখিতে দেখিতে সেই লড়াই রামপাল ও পাইকগাছা থানার হাজার হাজার আধিয়ারদের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। মাঠ হইতে যখন আধিয়ারগণ ধান নিজ বাড়িতে লইয়া যান তখন জয়মুনির ঘোলে পুলিশ আধিয়ারদের উপর গুলি চালাইয়াছে। পুলিশের গুলি তুচ্ছ করিয়াই শত শত আধিয়ার নিজ বাড়িতে ধান লইয়া যান।

ময়মনসিংহ জেলা হাজং অঞ্চল ১৯৪৬-৪৭ সালে টংকপ্রথার বিরুদ্ধে এক গৌরবময় লড়াই চালাইয়াছিল। তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফৌজ সেখানে চালাইয়াছিল নির্মম অত্যাচার।

সেই হাজং এলাকায় সুসং, কমলাকান্দা, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি এই চারিটি থানায় হাজার হাজার গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে আবার টংকপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক লড়াই শুরু করেন।

শত শত মিছিলে আওয়াজ ওঠে ঃ 'জান দিব তবুও টংক ধান দিব না।' জনতার শক্তি দেখিয়া শোষক জমিদারদের শোষক নায়েবগণ টংক আদায় ছাড়িয়া গ্রাম ছাড়িয়া পালাইতে থাকে।

দিনের পর দিন গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর স্ত্রী-পুরুষ গ্রামে গ্রামে ধনীদের টংক ধান বোঝাই গাড়ীর ধান জনসাধারণের মধ্যে বিলি করিয়া দেন।

১৯৪৬-৪৭ সালে এই আন্দোলন শুধু মাত্র হাজং এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার মুসলমান এলাকাতেও ছড়াইয়া পড়ে। সরকার কর্তৃক কন্‌ট্রোল দরে জোর করিয়া গরীবদের ধান 'কেনার' বিরুদ্ধে গরীব মুসলমানদের বিক্ষোভ জাগিয়া উঠে। হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, নাজিরপুর প্রভৃতি বাজারে গরীবদের ধান জোর করিয়া 'কন্‌ট্রোল' দরে কিনিতে আসিয়া লীগ সরকারের পুলিশ বার বার নাজেহাল হইয়াছে।

বর্বর টংকপ্রথা বিরোধী আন্দোলনকে ধ্বংস করিবার জন্য জোতদার জমিদারের দালাল নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা সেই এলাকায় প্রায় এক হাজার পাঠান ফৌজ ও আনসার পাঠাইয়াছে। ইহারা গরীবদের উপর সকল রকমের বীভৎস অত্যাচার চালাইয়াছে। সমস্ত এলাকাকে ফৌজের বন্দুকের দ্বারা ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। লীগ সরকারের এই দমননীতিকে সাহায্য করিবার জন্য আসামের কংগ্রেস সরকারও গারো পাহাড়ের সীমান্তে পাঠাইয়াছে ফৌজ। সেই এলাকায় গত ৭ মাসে লীগ সরকারের ফৌজ কমসে কম ১৬ বার বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করিয়াছে। তবু জনতা নিজেদের আন্দোলন ছাড়েন নাই। গুলির সামনেও জনতা বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রেবতী, শঙ্খমনি, তপেন্দ্র, দুবরাজ প্রভৃতি ৩১ জন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক নরনারী নিজেদের অধিকারের জন্য গুলির মুখে অকুতোভয়ে নিজেদের প্রাণ বিলাইয়া দিয়াছেন। এত অত্যাচার সত্ত্বেও সেই এলাকার আন্দোলন গত ৭ মাস যাবৎ অবিরতভাবেই চলিয়াছে। এবার জমিদারগণ সেই এলাকা হইতে ট্যাক্স আদায় করিতে পারে নাই। জনগণের দৃঢ়তা ও একতার নিকট লীগ সরকারের বীভৎস দমননীতি ব্যর্থ হইতেছে।

বহু সংগ্রামের অভিজ্ঞতাপূর্ণ রংপুর জেলার আধিয়ারগণও ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে 'আধিপ্রথা খতম কর' আওয়াজ নিয়া লড়াইয়ে আগুয়ান হন। নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা এখানেও ধনীকৃষক ও জোতদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ পাঠাইয়া দেয়। হরিপুর বাজারে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ 'আধিপ্রথা খতম কর' 'খাদ্য চাই' ও 'দমননীতি প্রত্যাহার কর' দাবি নিয়া মিছিল করিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। সেই গুলিতে বালক কছির নিহত হয়।

কিন্তু পুলিশের গুলি সত্ত্বেও আন্দোলন চলে জোয়ারের মত। ডোমারের হরিণচরা ইউনিয়নের সব আধিয়ারগণ মাঠ হইতে ধান কাটিয়া নিজেদের ঘরে নিয়া যান। নেহালীর আধিয়ারগণও নিজেদের শ্রমজাত ধান মাঠ হইতে নিজেদের বাড়ি নিয়া যান।

দিনাজপুর জেলার ২০টি থানার লাখ লাখ আধিয়ারগণ তেভাগার দাবিতে অভূতপূর্ব লড়াই চালাইয়াছিলেন। সেই আন্দোলনে বেরাজ, শিবরাম, সমিরুদ্দীনের ও খাঁপুরে ২১ জন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের জীবন দান সেদিন সারা বাংলার কৃষক আন্দোলনে নূতন ঐতিহ্য স্থাপন করিয়াছিল। সেই দিনাজপুরে গত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে আধিয়ারগণ জোতদারদের গুণ্ডাদের বাধা ও পুলিশের দমননীতি উপেক্ষা করিয়াই সাত হাজার বিঘার জমির ধান নিজ খোলানে তুলিয়া নেন।

রাজসাহীর মন্দা থানায় ও বগুড়াব ধলাহার ইউনিয়নের আধিয়ারগণও দমননীতি সত্ত্বেও মাঠ হইতে ধান নিজ খোলানে নিয়া যান।

সিলেটের নানকার এলাকায় জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গত ২ বছর যাবত সশস্ত্র পুলিশের বন্দুকের সামনা দিয়াই নওগাঁ-মেহরী এলাকার নানকার স্ত্রী-পুরুষ মাঠ হইতে ধান নিজেদের ঘরে তুলিয়া নেন।

চট্টগ্রামের কেলিশহর জোতদারদের গুণ্ডা ও তার সঙ্গে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার সশস্ত্র পুলিশ গরীব আধিয়ারদের হক দাবিকে ঠেকাইতে পারে নাই। সব দমননীতি তুচ্ছ করিয়াই আধিয়ারগণ ধান নিজ খোলানে নিয়া যান।

এই ভাবে সারা পূর্ববঙ্গে ক্ষেতমজুর ও মেহনতী কৃষকগণ আধি, টংকপ্রথার যুগ যুগের শোষণের হাত হইতে নিজেদের খাদ্য রক্ষার জন্য লড়াই চালাইতে থাকেন। জমিদার জোতদার ধনীকৃষক সরকারের জোটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহে ছোট বড় শত লড়াইয়ের মধ্য দিয়া তাঁহারা অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত নিজেদের শ্রমজাত ধান ঘরে তুলিতে থাকেন।

খাদ্য ও জমি দখল

এই সময়ে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা 'খাদ্য সংগ্রহের' নামে গরীব কৃষক ও মধ্য কৃষকদের উপর নূতন আক্রমণ করে। লীগ সরকারের 'খাদ্য সংগ্রহ বিভাগ' গ্রামে গ্রামে ফৌজের সাহায্যে মেহনতী কৃষকদের ঘর হইতে ধান কাড়িয়া নিতে লাগিল। অথচ ভূমির উপর একচেটিয়া অধিকার বলে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের শোষণের বিনিময়ে ধনী কৃষক ও জোতদারদের গোলায় যে বিরাট খাদ্য মজুত হয়— লীগ সরকার সেই মজুর 'সংগ্রহ' করে নাই।

খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর জেলার মেহনতী কৃষকসমাজ ধনীর দালাল নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার এই 'খাদ্য সংগ্রহের' আক্রমণকেও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করিতে থাকেন। জনতার প্রতিরোধে বহু স্থানেই লীগ সরকারের এই বিকট 'খাদ্য নীতি' ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে, ধনী কৃষক ও জোতদারগণ মহা উল্লাসে খাদ্যের দাম বাড়াইয়া প্রচুর মুনাফা করিতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাস হইতে খাদ্যের দর বাড়িতে বাড়িতে প্রতি মণ চালের দাম ৩০|৪০ টাকায় দাঁড়ায়। বাংলার ইতিহাসে খাদ্যের এরূপ দাম আর কোন দিন হয় নাই। এই একটি ঘটনাই লীগ শাসনের সব কদর্য্যতাকে উলঙ্গ করিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়।

খাদ্যের এই সংকটে গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ— বিশেষ করিয়া ক্ষেতমজুরগণ ভীষণ অনাহারের সম্মুখীন হয়।

তখন লালঝাণ্ডার ডাকে গ্রামে গ্রামে শুরু হয় খাদ্যের ও জমির জন্য নূতন ধারায় আন্দোলন। আধি. টংক বিরোধী লড়াই খাদ্য ও জমি দখলের লড়াইয়ে উন্নীত হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলার নেহালীর ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ দলবদ্ধ হইয়া জোতদার কিশোরীর বাড়িতে ধানের জন্য যান। জোতদারগণ তখন এই ভূখা জনতাকে মারপিট করার জন্য একশত লাঠিয়াল পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু গরীবদের আবেদনে বহু লাঠিয়ালই ফিরিয়া যায়। বাকী গুণ্ডারা জনতার সংঘবদ্ধ শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করে। তখন কিশোরীর গোলার ২৫ মণ ধান জনসাধারণের মধ্যে বিলি হয়। ঐ সময়েই ঐ এলাকায় যে সব জমি জোতদারেরা কাড়িয়া নিয়া গিয়াছিল— সেই সব জমি কৃষক ভলান্টিয়াররা পুনর্দখল করিয়া নেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারি আটিয়াবাড়িতে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদল এক জোট হইয়া

জোতদারদের গুণ্ডাদের ও আনসারের আক্রমণকে হঠাইয়া দিয়া ধনী কৃষক সুধ্বন ও নবদ্বীপের গোলার ধান জনতার ভিতর বিতরণ করিয়া দেন।

২৭শে মার্চ খুলনার বঠিয়াঘাটা থানার শত শত ক্ষেতমজুর ও গরীব জনতা খাদ্যের দাবিতে থানা ও সরকারের ধানের গোলা দখল ও ঘেরাও করেন। তাঁহাদের দাবি খাদ্য চাই।

থানার পুলিশ ভয়ে থানার ছাদের উপর গিয়া আশ্রয় নেয়। দারোগা জোড় হাতে মাপ চায় ও বলে যে, জনগণের ভিতর খাদ্য বিলি করা হইবে। ইহা বিশ্বাস করিয়া জনতা চলিয়া যায়।

সেই দিনই আর একদল ক্ষেতমজুর ও গরীব জনতা খাদ্যের দাবিতে ডুমুরিয়া থানা ও সরকারি গোলা ঘেরাও করেন। সেখানে গ্রামের মাতব্বরগণ আসিয়া আপস করে যে প্রতিদিন যিনি আসিবেন তাহাকেই সরকারি গোলা হইতে ৫ সের করিযা ধান দেওয়া হইবে। কিছু কিছু ধান বিক্রিও হয়।

কিন্তু, এই সব আশ্বাস ও আপসের পরই বেইমান নুরুল আমীন মন্ত্রিসভা বঠিয়াঘাটার গরীবদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন মাসে সশস্ত্র পুলিশ ও বেলুচ ফৌজ বার বার ধানিবুনিয়া ও রাধুনিয়া এলাকায় হামলা করে। ভুখা জনগণের উপর চলে অমানুষিক অত্যাচার। বার বার গুলিবর্ষণ চলে। বীর জনগণ অসীম সাহসের সহিত নিজেদের লড়াই চালাইয়া যান। গুলির সামনে দাঁড়াইয়া খাদ্যের জন্য সতীশ, রমাকান্ত ও মাদার এই তিনজন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক বীর নিজেদের প্রাণ কোরবানি দেন।

ময়মনসিংহের উত্তর অংশে ৬ মাস যাবত বীভৎস দমননীতি সত্ত্বেও ২৫শে জুলাই হইতে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকগণ নিজেদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বারা এক সপ্তাহে ধনী কৃষকদের নিকট হইতে এক হাজার মণ ধান আদায় করেন।

এবারও পাঠান ফৌজ চালাইয়াছে বেপরোয়া গুলি। এবারের গুলিবর্ষণে বীরের মত প্রাণদান করিয়াছেন এক দিনেই ৯ জন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক সৈনিক।

ক্ষেতমজুরদের মজুরিবৃদ্ধির ধর্মঘট ও তাঁহাদের জয়

পূর্ববঙ্গে গ্রাম্য গরীবদের খাদ্য ও জমির জন্য এই বিপুল জাগরণের প্রথম কাতারে দাঁড়াইয়া লড়াই করিতেছেন গ্রামের সর্বহারা ক্ষেতমজুরের দল। সভায়, মিছিলে, বিক্ষোভে, ধান জমি দখলে, গুলির সামনে দৃঢ়তায় তাঁহারাই সকলের আগে।

শুধু তাই নয়। নূতন শ্রেণি চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই গ্রাম্য মজুরশ্রেণি বাঁচিবার মত মজুরির দাবি নিয়া ধনী কৃষকদের শোষনের বিরুদ্ধে চালাইয়াছেন সংঘবদ্ধ ধর্মঘট সংগ্রাম। বাংলার গ্রামের আন্দোলনে ইহা অভূতপূর্ব।

চট্টগ্রামে মজুরিবৃদ্ধি

গত জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় ক্ষেতমজুরগণ মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে লড়াই শুরু করেন।

কুতুবদিয়া অঞ্চলের প্রায় শতকরা ৭৫ জনই ক্ষেতমজুর। ইহাদের গ্রামেই মুষ্টিমেয় বড় বড় জোতদারদের গোলায় হাজার হাজার মণ ধান জমা হয়।

লালঝাণ্ডা এই ক্ষেতমজুরদের ভিতর প্রচার করিতে থাকে বাঁচার মত মজুরির জন্য লড়াই চালাও। সেই প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া জানুয়ারি মাসে আলী আকবর ভেইলের চার হাজার ক্ষেতমজুর দৈনিক এক আড়ি ধান এই মজুরির দাবিতে ধর্মঘট করেন। সেই ধর্মঘট মুরালিয়া গ্রামেও ছড়াইয়া পড়ে। সেখানেও ১০০০ ক্ষেতমজুর ঐ দাবিতে ধর্মঘট করেন।

যুগ যুগের অত্যাচারিত ক্ষেতমজুরদের এই জাগরণে ভীত হইয়া ধনী কৃষকগণ ভয়ে কাঁপিতে থাকে। লীগ সরকার ধনীদের সাহায্যে সশস্ত্র ফৌজ পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু ৫০০০ ক্ষেতমজুর ধর্মঘটে অটল থাকেন। তখন ধনী কৃষকদের দল বাধ্য হইয়া তাঁহাদের দাবি মানিয়া নেয়।

রংপুরে মেয়ে-মরদের ধর্মঘট

মার্চ মাসের মাঝামাঝি রংপুরে বদরগঞ্জ থানার মধুপুর এলাকার আশপাশের গ্রামের ক্ষেতমজুরগণ দৈনিক ১ টাকা ৪ আনার স্থলে আড়াই টাকা মজুরির দাবিতে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে ধর্মঘট করেন। ২ দিনের ধর্মঘটের পর ধনীরা বন্দর হইতে হিন্দুস্থানী মজুর আনিয়া ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে। তৃতীয় দিন কিছু হিন্দুস্থানী মজুর কাজ করেন। কিন্তু পরের দিন হিন্দুস্থানী মজুরদের আসার পথে ধর্মঘটী মজুরগণ তাহাদিগকে এই লড়াইয়ের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। ইহার পর হিন্দুস্থানী মজুরগণ চলিয়া যান। তখন ধনীর দল বাধ্য হইয়াই ক্ষেতমজুরদের দৈনিক আড়াই টাকা মজুরির দাবি মানিয়া নেয়।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে রাজেন্দ্রপুর অঞ্চলের দাওয়াদানারপার, জগদীশপুর প্রভৃতি গ্রামের মজুরগণ ধর্মঘট করিয়া ১।০ হইতে ২৷৷০ আনা মজুরি আদায় করেন। কয়েকটি গ্রামে এই ধর্মঘটের ফলে সমস্ত রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়নের ক্ষেতমজুরদের মজুরি ১ টাকা, ২ টাকা, আড়াই টাকায় বাড়িয়া গিয়াছে।

গ্রাম্য মেয়ে মজুররাও পুরুষ মজুরদের সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ে আগুয়ান হন। মধুপুর ইউনিয়নের মেয়েরা ধর্মঘট করিয়া ধানভানার মজুরি মণ প্রতি আধসের চাউল বেশি আদায় করিয়াছেন।

এই ধর্মঘটে ঐ এলাকার সব মেয়ে মজুররা উদ্বুদ্ধ হইয়া দাবি তুলিয়াছেন, 'বাঁচার মত মজুরি চাই'।

বগুড়ায় মজুরিবৃদ্ধি

এপ্রিল মাসের শেষভাগে বগুড়া জেলার গাবতলী থানা, সদর থানা ও ফুলবাড়ি এলাকার ক্ষেতমজুরগণ লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে ৩ টাকা মজুরির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। দুই শতাধিক মজুর মিছিল করিয়া দাবি তোলেন, 'দৈনিক ৩ টাকা মজুরি চাই'।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ফুলবাড়ি হাটে মজুরগণ স্কোয়াড করিয়া মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে প্রচার করিতে থাকেন। এই প্রচারে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়।

গ্রামের সর্বহারাদের এই নূতন জাগরণে ভীত হইয়া ধনী কৃষক ও জোতদাররা মজুরির হার দৈনিক ১।০ হইতে ২ টাকা করিয়া দেয়।

কিন্তু ইহার পর ধনীর দল মজুরদের উপর আবার আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে। পরের

হাটের দিন জোতদারদের দল একজন মজুর-কর্মীকে মারিতে চেষ্টা করে। তখনি ৩|৪ শত ক্ষেতমজুর জোতদারকে তাড়া করে। সেই জোতদার নদী সাঁতরাইয়া প্রাণ বাঁচায়। ইহার পর গ্রাম্য ধনীর দল মজুরির হার ২||০ করিয়া মজুরদের সঙ্গে আপস করে। ফুলবাড়ি এলাকায় মজুরদের এই জয়ের খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ার পর ধুপচাচিয়া থানার চামরুল ইউনিয়ন ও আদমদীঘি থানার বিভিন্ন স্থানে ক্ষেতমজুরগণ নিজেরাই সংঘবদ্ধ হইয়া মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করিয়া দাবি আদায় করেন।

ক্ষেতমজুরদের এই লড়াই তখন বিভিন্ন আকারে জেলার অন্যান্য স্থানেও ছড়াইয়া পড়ে। জুন মাসের শেষের দিকে পশ্চিম বগুড়ার চাঁদপুর, সুন্দরপুর ও বানাই গ্রামের ক্ষেতমজুরগণ লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে দলবদ্ধ হইয়া আয়েতুল্লা, কাজী ও বক্কু মণ্ডল নামে তিনজন ধনীর বাড়ির গোলা হইতে ১৭ মণ ধান দখল করেন।

দিনাজপুরে ধর্মঘটের জের

দিনাজপুর জেলার ক্ষেতমজুরগণ লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে ৯ই মার্চ রেল ধর্মঘটের সময়ে সভা মিছিল করিয়া বিপ্লবের নেতা শহরের মজুরশ্রেণির সঙ্গে তাঁহাদের সহযোগিতা ঘোষণা করেন। তাঁহারা ৯ই মার্চ গাড়ীও থামাইয়া দিয়াছিলেন। লালঝাণ্ডার ডাকেই দিনাজপুরের ক্ষেতমজুরগণ ১লা মে হইতে ৭ই মে পর্যন্ত 'ক্ষেতমজুর সপ্তাহ' পালন করেন। জেলার গ্রামে গ্রামে শত শত কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে : "নগদ তিন টাকা মজুরি ও দেড়-সের চাল খোরাকী চাই"। সভা, বৈঠক, ইস্তাহার মারফত ব্যাপক প্রচার চলে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতমজুর সমিতির সভ্য সংগ্রহও চলিতে থাকে।

ইহার পরই বালিয়াডিঙ্গি থানার দুইটি ইউনিয়নে শত শত ক্ষেতমজুর মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করেন। ধর্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য ধনী কৃষকের দল পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া জেলা হইতে বিহারী ক্ষেতমজুর আমদানি করে। বিহারী মজুরগণ গ্রামে উপস্থিত হইলে স্থানীয় বাঙালি মজুরগণ মিছিল করিয়া গিয়া বিহারী ভাইদের নিকট আবেদন করেন— 'ভাই তোমরা ফিরিয়া যাও।' এই আবেদনে বিহারী-বাঙালি ক্ষেতমজুরের ঐক্য গড়িয়া ওঠে। বিহারী মজুরগণ ফিরিয়া যায়। তখন নিরুপায় হইয়া ধনীর দল ক্ষেতমজুরদের দাবি ৩ টাকা মজুরি ও দেড়-সের চাউল খোরাকী মানিয়া নেয়।

এই এলাকার ক্ষেতমজুরদের এই জয়ের খবর হরিণমারী ও ঠগপাড়ার মুসলমান ক্ষেতমজুরদের মনে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করে। এই এলাকায় এতদিন লীগের প্রভাব ছিল; কিন্তু এখন জামানা বদলাইয়া গিয়াছে। বালিয়াডিঙ্গির ক্ষেতমজুরদের পথ ধরিয়া এখানকার ক্ষেতমজুরগণও তিন টাকা মজুরি ও দেড় সের চাউল খোরাকীর দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেন।

ধনীকৃষক ও জোতদারগণ 'ইসলামের' দোহাই, 'পাকিস্তানের স্বার্থ' প্রভৃতি অনেক বুলি দিয়া ধর্মঘট ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে; কিন্তু ক্ষেতমজুরের শ্রেণি-চেতনার নিকট ঐ সব পঁচা বুলি খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। শত শত ক্ষেতমজুর ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মঘটে অটল থাকেন।

তখন ক্ষেতমজুরদের ভয় দেখানোর জন্য ধনীর দল নিজেরা আত্মীয় স্বজন নিয়া মাঠের কাজে নামিয়া যায়। কিন্তু পরের শ্রমের উপর ভোগবিলাস করাই যাহাদের পেশা তাহারা

করিবে মাঠের কাজ? দু'দিনেই তাহাদের সে সখ শেষ হইয়া যায়। তখন রক্তশোষক ধনীর দল ক্ষেতমজুরদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের নিকট মাথা নত করে। তাহারা ক্ষেতমজুরদের দাবি দৈনিক ৩ টাকা ও দেড় সের চাউল খোরাকী মানিয়া নেয়।

ঢাকার গ্রামে ক্ষেতমজুরদের লড়াই

ঢাকা জেলার গ্রামে এতদিন বিশেষ কোন কৃষক আন্দোলন হয় নাই। আজ সেখানেও ক্ষেতমজুরদের ধর্মঘটের জোয়ার আসিয়াছে।

জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে জয়দেবপুর থানার অন্তর্গত খাইলকুর গ্রামের ৮০ ঘর মুসলমান ক্ষেতমজুর প্রতিদিন ৬ সের ধান মজুরির দাবিতে একদিনের জন্য ধর্মঘট করেন। ধর্মঘটীরা লালঝাণ্ডা হাতে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান।

এই ধর্মঘটের ঢেউ গিয়া লাগে পাচর গ্রামে। সেই গ্রামের সব ক্ষেতমজুরও দৈনিক ৬ সের ধান মজুরির দাবিতে ধর্মঘট করেন। ইহার পর ধর্মঘট মৈরান গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। সেখানকার ক্ষেতমজুরগণও দৈনিক ৬ সের ধান মজুরির দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেন। গ্রামে গ্রামে নূতন জীবনের সাড়া পড়িয়া যায়। গ্রামের সর্বহারাগণ আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়া ধনীর বিরুদ্ধে ধর্মঘটের হাতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে।

ধর্মঘট ক্রমে ক্রমে ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া ধনীর দল আতংকিত হইয়া দৈনিক মজুরির হার চার সের ধানে বাড়াইয়া দেয়।

যশোহরে-ময়মনসিংহে ধর্মঘট

যে যশোহর জেলায় গত এক বৎসর যাবৎ এক নিষ্ঠুর দমননীতি চলিতেছে, সেখানেও ক্ষেতমজুরগণ জুন মাসের প্রথম ভাগে নিজেদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট সংগ্রাম শুরু করেন। কেশবপুর ও মনিরামপুর থানার ডোঙ্গাঘাটা, গড়ভাঙ্গা, শ্যামনগর, হরিণা, মাগুরখালি, ঘাগা প্রভৃতি গ্রামের ক্ষেতমজুরগণ মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করিয়া দৈনিক মজুরি ১|০ হইতে ২||০ টাকায় এবং কোন স্থানে ৫ টাকা পর্যন্ত মজুরি বাড়াইয়া নেন। এই সময়েই ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার সরমসিয়া ইউনিয়নের তিন চারিটি গ্রামে ক্ষেতমজুরগণ মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করেন। ধনী কৃষকগণ মজুরদের সংঘবদ্ধ শক্তির নিকট পরাজয় মানিয়া দৈনিক মজুরির হার ১|০ হইতে ২||০ আনায় বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হয়।

বাঁচার মত মজুরি, খাদ্য ও জমির একটানা রক্তাক্ত লড়াইয়ের ভিতর দিয়া আজ পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে নূতন মানুষ। শত দমননীতিতে আজ আর তাহারা পিছু হটেন না— বরং প্রতিদিন তাঁহারা লীগের ধনিকগণের বিরুদ্ধে আরও প্রবলবেগে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আগাইয়া চলিয়াছেন।

পূর্ববঙ্গে জাগিয়া উঠিয়াছে আজ দুর্জয় শক্তিতে গ্রামের মজুর, শহরের মজুরের নেতৃত্বে এই গ্রামের মজুরের পরিচালনায় গ্রামের মেহনতী কৃষক ভূমি বিপ্লব সমাধা করিবে।

পূর্ববঙ্গের দিকে দিকে আজ তারাই নিশানা।

৩

প্রস্তাবাবলী

বাঁচার মত মজুরি ও মূল দাবির প্রস্তাব

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রস্তাব করিয়াছে যে, জীবনধারণের উপযুক্ত মজুরির নিম্নতম হার প্রতিমাসে ৮০ টাকা মজুরি, ৫০ টাকা মাগ্‌গীভাতা এবং ২০ টাকা বাড়ি ভাড়া আদায় করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে যে যতক্ষণ না ন্যায্য মজুরির এই নিম্নতম হার আদায় হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষেতমজুরেরা অনমনীয় সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুরেরা বাঁচার মত মজুরির নিম্নতম হার হইতেও বঞ্চিত। ধনী ভূস্বামীরা নামমাত্র মজুরিতে মজুর খাটাইয়া ফসল বেঁচিয়া কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটিতেছে এবং সেই মুনাফার জোরে গ্রাম অঞ্চলে টাকার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর বিনিময়ে জোতদার এবং ব্যাপারীরা ১৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিয়াছিল। তাহার পর তাহাদের বাৎসরিক গড় মুনাফার মাত্রা প্রায় সমানই রহিয়াছে কারণ চাউলের দর প্রতি মণ ২০ টাকা হইতে ৩০ টাকার নীচে কখনও নামে না। অথচ ক্ষেতমজুরের মজুরির হার দুই আনা হইতে আরম্ভ করিয়া উর্ধ্বে মাত্র পাঁচ সিকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। কিন্তু দৈনিক মেহনতের সময়ের কোন সীমা নাই। ভূস্বামীদের অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ করিলে চাউলের দর না বাড়াইয়াও ক্ষেতমজুরদের খোরাকীসহ দৈনিক ৪ টাকা মজুরি দেওয়া যায়। এই মজুরি তো দূরের কথা, দৈনিক ২॥০ টাকা ৩ টাকা মজুরির জন্যও ক্ষেতমজুরদের বিপুল সংগ্রাম করিতে হইতেছে। বিনা সংগ্রামে এক সিকি মজুরি বৃদ্ধিও আদায় করা যায় না।

৩০ বছরের ধর্মঘট এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম চালাইয়া কারখানা মজুরেরা যে সামান্য দাবি আদায় করিতে পারিয়াছে তাহার কিছুই ক্ষেতমজুরেরা আদায় করিতে পারে নাই। কারণ ক্ষেতমজুরের নিজস্ব সংগঠন এবং স্বতন্ত্র সংগ্রাম গড়িয়া উঠে নাই। এই জন্যই ক্ষেতমজুরদের শুধু যে নামমাত্র মজুরি দেওয়া হয় তাহাই নয়, তাহাদের খাটুনীর দৈনিক সময় নির্দিষ্ট নাই, অতিরিক্ত মেহনতের জন্য অতিরিক্ত মজুরির ব্যবস্থা নাই, বেতনসহ ছুটির কোন রেওয়াজ নাই, সর্বোপরি— ক্ষেতমজুরদের ইউনিয়ন এবং ধর্মঘটের অধিকার স্বীকৃত হয় না।

ইহার উপরও ক্রীতদাস প্রথার মত বর্বর শোষণ অনেক জায়গায় চালু আছে। ক্ষেতমজুরদের অনেকে মাস মাহিনায় কাজ করেন। তাঁহাদের মাহিন্দার বলা হয়। মাহিন্দারদের বছরে ২০ টাকা হইতে উর্ধ্বে ১২০ টাকা পর্যন্ত মজুরি দেওয়া হইয়া থাকে। মাহিন্দারদের মেহনতের কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। ভৃত্যের মত যে কোন সময় যে কোন কাজ তাঁহাদের দিয়া করানো হয়, প্রহার, নির্যাতন এবং নানাবিধ অত্যাচার তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

ক্ষেতমজুরদের অনেক অংশকে সমাজে "অস্পৃশ্য" করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের লোক দেখানো আন্দোলন আজ ভণ্ডামি বলিয়া ধরা পড়িয়াছে, কার্যত ক্ষেতমজুরদের সামাজিক অধিকার কিছুই অর্জিত হয় নাই।

ক্ষেতমজুরদের আর এক অংশ বর্গা বা কৃষাণী প্রথায় ফসলের ভাগ চুক্তিতে কাজ করিয়া থাকেন। ফসলের অর্ধেকের বেশি তাঁহারা কোথাও পান না। তেভাগা সংগ্রামের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বিধান রায় যে বিধান জারি করিবেন বলিয়াছেন, তাহাতে ক্ষেতমজুরেরা ফসলের ৩ ভাগের ১ ভাগের বেশি কোথাও পাইবেন না। এই প্রতারণার বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করিতেছে।

বেগার খাটানোর মত বর্বর প্রথা এখনও এই সমাজে চালু আছে; দারিদ্র ও দেনার সুযোগ লইয়া বেগার খাটাইয়া মুনাফা অর্জনের ঘৃণ্য ব্যবস্থা বিলুপ্ত করিতে হইবে।

বেকার সমস্যা ক্ষেতমজুরদের জীবনধারণ অনিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যে সমাজে ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য উৎপাদন চালানো হয় এবং জমির উপর ভূস্বামীদের একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠিত, বেকার সমস্যা সে সমাজের নিত্যকার ব্যাধি। ধনিক ব্যবস্থা মজুরদের কেবল অন্যায়ভাবে অল্প মজুরির দাসত্বে বাঁধিয়াই থামে নাই, উপরন্তু তাহাদের বেকার জীবনের নিষ্ঠুরতার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া দুর্ভিক্ষের সহজ শিকার করিয়া রাখিয়াছে।

ক্ষেতমজুররা আজ এই সমস্ত শোষণ, অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছে। সংগ্রামের বিপুল বন্যায় তাঁহাদের মধ্যে নব জীবনের সাড়া জাগিয়াছে। বাঁচার মত মজুরি চাই, ক্রীতদাসত্বের অবসান চাই, বেগার খাটানো বে-আইনি করিয়া দিতে হইবে, সম্বৎসর কাজের গ্যারান্টি চাই, পুরা মজুরিতে ৭ ঘন্টার বেশি কাজ নাই, অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি চাই— এই সমস্ত দাবি লইয়া সারা বাংলায় ক্ষেতমজুরেরা বীরের মত লড়িতেছে। ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন সংগ্রামী মজুরদের অভিনন্দন জানাইয়া ঘোষণা করিতেছে যে, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অংশ হিসাবে পশ্চিম বাংলা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন গড়িয়া তোলা হউক। এই ইউনিয়ন হইবে সংগ্রামী ক্ষেতমজুরদের প্রতিনিধিমূলক গণ প্রতিষ্ঠান। ইহার লক্ষ্য হইবে ক্ষেতমজুরদের দাবিসমূহ আদায় করিবার জন্য— জয়লব্ধ সংগ্রাম। এই সম্মেলন আরও দাবি করিতেছে যে মেয়েদেরও পুরুষের মত সমান খাটুনীর জন্য সমান মজুরি চাই, নাবালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা আইনত দণ্ডনীয় করা, মাহিন্দারদের পুরা বেতনসহ একমাসের ছুটি, অসুখের সময় পুরা মজুরিসহ চিকিৎসার ব্যবস্থা, ভূস্বামীদের খরচায় ক্ষেতমজুরদের জন্য ছাতা ও কম্বল, সরকারি খরচায় বেকারদের জন্য ভাতা কিম্বা মাসোহারা। এই সমস্তই হইল ক্ষেতমজুরদের গণতান্ত্রিক অধিকার।

ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামী উৎসাহে ভীত হইয়া কংগ্রেসী সরকার ও তাহার দালাল "জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" ক্ষেতমজুর সংগঠন সৃষ্টি করিবার কল্পনা ঘোষণা করিয়াছে। ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ সম্পর্কে কংগ্রেসী সরকারের মনোভাব আজ আর অস্পষ্ট কিছুই নাই। বিধান রায়ের মন্ত্রিসভা ফৌজ পাঠাইয়া গুলি চালাইয়া ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের বিরুদ্ধে বর্বর অত্যাচার চালাইতেছে। তাহাদের সামান্যতম দাবির সাধারণতম সংগ্রামকেও রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দেওয়া হইতেছে। শত শত শহিদের রক্তে ভেজা মাটিতে ক্ষেতমজুরদের যে সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে, গুলি-জেল এবং দালালী ভেদনীতিতে তাহাকে হারানো যাইবে না— এ কথা এই সম্মেলন কংগ্রেসী সরকারকে স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মেলন ক্ষেতমজুরদের স্মরণ করাইয়া সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান যে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মজুরদেরই নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। এই

সংগঠনের পতাকাতলে দাঁড়াইয়াই ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামী ঐক্য শক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। ধর্মঘট-সংগ্রাম এবং সংগ্রামী ঐক্য ছাড়া বাঁচার মত মজুরি এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করিবার জন্য কোন রাস্তা নাই। এই ঐক্য ভাঙ্গিবার জন্য কংগ্রেসের "জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস" এবং সোশালিস্ট পার্টির "হিন্দু মজদুর সংঘ" প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। ক্ষেতমজুরেরা এই ভেদনীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ চালাইয়া মজুরের ঐক্য রক্ষা করিবে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য এই সম্মেলন কৃষকদের সংগ্রামে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ঘোষণা করিতেছে। জমি লাভের সংগ্রাম ক্ষেতমজুরদেরও সংগ্রাম। জমিদার এবং জোতদারেরা গরীব কৃষকের জমি কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ক্ষেতমজুরে পরিণত করিয়াছে। ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন দাবি করিতেছে গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরের জন্য জমি চাই, জমিদারি এবং জোতদারি প্রথার আমূল উচ্ছেদ করিয়া জমির মালিকানা শোষিত জনসাধারণকে দিতে হইবে, জমি বন্টনের ভার দিতে হইবে গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের প্রতিনিধিমূলক কমিটির হাতে।

এই সমস্ত দাবি আদায়ের জন্য গ্রামে গ্রামে ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন গঠন করুন, একজন ক্ষেতমজুরও এই ইউনিয়নের বাহিরে থাকিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের উপর প্রস্তাব

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আগামী ছয় মাসের মধ্যে বিশেষভাবে পশ্চিম বাংলায় ১৯৩৫ সালের সাম্রাজ্যবাদী ভারত শাসন আইনের বিধান অনুসারে সাধারণ নির্বাচন করিবার ঘোষণা করিয়াছেন এবং জরুরী রদ-বদলান্তে সে পর্যন্ত রায়-মন্ত্রিসভাই কায়েম থাকিবে এই নির্দেশ দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সম্মেলনের এই প্রথম অধিবেশন এই বিঘোষিত সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং ক্ষেতমজুর ও জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য একটি চালবাজি মাত্র।

এই সম্মেলন তীব্র বিক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থা করিয়া কংগ্রেসী ধনিকরাজ সুকৌশলে সমগ্র ক্ষেতমজুরশ্রেণিকে একেবারে ভোট দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। এই ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সম্পত্তি ও শিক্ষাই হইতেছে ভোটাধিকারের ভিত্তি। অধিকাংশ ক্ষেতমজুরের এককণাও জমি নাই। জমিদারগণ এবং জোতদার ও অন্যান্য ধনী কৃষকেরাই গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের ভিত্তি; তাহারাই এই সব ক্ষেতমজুরদের সর্বস্ব ছলে বলে কৌশলে কাড়িয়া লইয়াছে। কতক ক্ষেতমজুরের নামমাত্র ভূমি আছে। তাহাদেরও ভোট নাই। গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি ক্ষেতমজুর। অথচ তাহাদের একজনও রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বা কংগ্রেসী কু-শাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারিবে না; ভোট দিবে জমিদার ও ধনী কৃষকেরা। সুতরাং এই ভোট হইতে ক্ষেতমজুরদের কোন দাবিই পূর্ণ হইবে না।

শুধু ক্ষেতমজুর নয়, গ্রামের ও শহরের গরীবদেরও ভোট নাই। শহরের মজুরদের

নামমাত্র ভোট আছে। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ জনের ভোট নাই, মাত্র শতকরা ১৩ জনের ভোট আছে। কংগ্রেসী ধনিকরাজ ধনিকের স্বার্থে মজুর, ক্ষেতমজুর ও শোষিত জনসাধারণের উপর তীব্র আক্রমণ ও দমননীতি চালাইয়াছে। শোষিত জনসাধারণেরই বিক্ষোভ রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ফাটিয়া পড়িয়াছে। তাহাদেরই ভয়ে কংগ্রেস এইভাবে ৮৭ জনকে বাদ দিয়া, মাত্র ১৩ জনের ভোটে ঘরোয়া নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই নির্বাচন না চালাইবার অজুহাত হিসাবে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড বলিয়াছেন যে, এত তাড়াতাড়ি সকল সাবালক, স্ত্রী ও পুরুষের ভোটার তালিকা তৈয়ার করা যাইবে না। ইহা একটি যুক্তিহীন অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়। তিন মাসের মধ্যেই সকল সাবালকের ভোটার তালিকা তৈয়ার করা অনায়াসে সম্ভব। এই সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে যে, জনসাধারণকে বাদ দিয়া এইরূপ সাধারণ নির্বাচন জনসাধারণের বিরুদ্ধে ধোকাবাজি ও ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়; এই নির্বাচন আসলে রায় মন্ত্রিসভাকে কায়েম রাখার জন্য ধনিকশ্রেণির কারসাজি ও নির্বাচনের তামাশা মাত্র।

এই সম্মেলন আরও লক্ষ্য করিতেছে যে, জনসাধারণকে— শতকরা ৮৭ জনকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াও কংগ্রেসীদের তাহাদের এই সাধারণ নির্বাচনের চালবাজির সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই। কংগ্রেসী ধনিকরাজ ও রায় মন্ত্রিসভা যে স্বৈরাচার, দমননীতি ও কালাকানুনরাজ চালাইতেছেন তাহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। ফলে দক্ষিণ কলিকাতা উপ-নির্বাচনে মাত্র শতকরা ১৩ জনের ভোট থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। তাই শতকরা ১৩ জনের ভোটের ব্যবস্থাকেও স্বাধীন গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সম্মুখীন হইবার সাহস নেহরু সরকারের বা কংগ্রেসের নাই।

অপরদিকে একটি সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা ব্যতীত কংগ্রেসের গত্যন্তর নাই। দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচনের সময়ে এবং তাহার পরে দেখা গিয়াছে যে, রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ চূড়ান্ত ও তীব্রতম হইয়াছে। জনতার বিরামহীন দাবি হইয়াছে— রায় মন্ত্রিসভাকে খতম কর।

অথচ ডাঃ বিধান রায় ও শ্রী নলিনী সরকার ধনিকশ্রেণির ও নেহরু সরকারের মনোনীত, বিড়লা ও মার্কিন পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত অনুচর। রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ও কংগ্রেসী কু-শাসনের বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ড বিক্ষোভ হইতে রায় মন্ত্রিসভাকে রক্ষা করিবার জন্য নেহরু কলিকাতায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু নেহরুকেও জনসাধারণের বিরূপ সম্বর্দ্ধনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

এই চরম সংকটের মধ্যে উপায়ান্তর না দেখিয়াই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড বাধ্য হইয়া একদিকে এই সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করিয়াছেন ও সার্বজনীন ভোটের অধিকার হরণ করিয়াছেন এবং অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি রাখিয়াছেন, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক ও শ্রমিকদের এবং শ্রমিক নেতাদের জেলে রাখিয়াছেন, কালাকানুন কায়েম রাখিয়াছেন এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার লুপ্ত করিয়াছেন।

এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনে শ্রমিকশ্রেণি ও জনসাধারণের সম্মুখীন হইবার সাহস নাই বলিয়াই কংগ্রেসী সরকার স্বাধীন,

নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা করে নাই। ধনিকশ্রেণি আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শত্রু; শ্রমিকশ্রেণিই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শিবিরের নেতা। তাই রায় মন্ত্রিসভা শ্রমিকশ্রেণির পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি করিয়াছে, সারা প্রদেশে ১৪৪ ধারা ও বুলেটরাজ কায়েম রাখিয়াছে, শ্রমিক নেতাদের আটক রাখিয়াছে, কালাকানুনরাজ চালাইতেছে। তাই শ্রমিক-কৃষকের ২০ খানি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই দমননীতি প্রত্যাহারের ঘোষণা না করিয়া কংগ্রেসী সরকার ফ্যাসিস্ট দমননীতিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও লজ্জা দিয়াছে।

এই সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে যে, কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লইলে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলে ও কালাকানুন প্রত্যাহার করিলে প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

এই সম্মেলন প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং দাবি করিতেছে যে—

ক) এখনই সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের অধিকার ঘোষণা করা হউক;

খ) রায় মন্ত্রিসভাকে এখনই খতম করিতে হইবে;

গ) কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইতে হইবে;

ঘ) শ্রমিক নেতাদের ও সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে;

ঙ) পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম করিতে হইবে; কালাকানুন রদ করিতে হইবে।

কংগ্রেসী সরকার একদিকে এই সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করিয়া ভোটের বাক্স মারফত সকল সমস্যার সমাধান হইবে এই মোহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছে; অপরদিকে চাউলের দর বাড়াইয়া, মজুরি কমাইয়া ক্ষেতমজুরদের বিরুদ্ধে ও সমগ্র শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে নূতন তীব্রতর আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। এই সম্মেলন ক্ষেতমজুরদের সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, কংগ্রেসী সরকারের এই অপকৌশল সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে এবং এই সাধারণ নির্বাচনকে জনতার বিপ্লবী হাতিয়াররূপে ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

এই সম্মেলন ক্ষেতমজুরদিগকে সার্বজনীন ভোটাধিকার, কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, শ্রমিকনেতা ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও স্বাধীন গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইবার নির্দেশ দিতেছে।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্তি

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুরশ্রেণির এই প্রথম সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। এই জন্য এই সম্মেলন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাইতেছে।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ভারতের গৌরবময় শ্রমিক আন্দোলনের সমগ্র ঐতিহ্যের ও সমগ্র শ্রমিকশ্রেণির ঐক্য ও সংগঠনের একমাত্র প্রতীক। শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যকে ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য ধনিকশ্রেণি ও তাহাদের কংগ্রেসী সরকার একদিকে চূড়ান্ত দমননীতি চালাইতেছে আর অপরদিকে সোশালিস্ট পার্টি, আই-এন-টি-ইউ-সি, মৃণালকান্তি বসু প্রভৃতি ধনিকশ্রেণির দালালের সহায়তায় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ

চালাইতেছে। কমরেড ডাঙ্গে ও অন্যান্য শ্রমিক নেতাগণ আজ কারাগারে। যাহারা কারাগারে নহেন, তাহাদেরও প্রায় সকলেরই বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আজ সারা ভারতের মজদুরশ্রেণির প্রত্যেকটি সংগ্রাম অপূর্ব সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিতেছেন।

ভারতের ৭ কোটি ক্ষেতমজুরের সামনে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বাঁচার মত মজুরির যে দাবির সনদ উপস্থিত করিয়াছেন এই সম্মেলন তাহা উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিতেছে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ক্ষেতমজুরদের সংগঠনের কাজে অগ্রসর হওয়ার পরই ক্ষেতমজুরদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য আই-এন-টি-ইউ-সি ইতিমধ্যেই পাল্টা প্রতিষ্ঠান গঠনের তোড়জোড় করিতেছেন। সোশালিস্ট ও অন্যান্য দলও অনতিবিলম্বে এই বিভেদার্থক প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

এই সম্মেলন সমগ্র ক্ষেতমজুরশ্রেণিকে ঐ দালালদের অপচেষ্টা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেছে এবং ঘোষণা করিতেছে যে, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকেই সমগ্র ক্ষেতমজুরশ্রেণি নিজেদের ও সমগ্র মজুরশ্রেণির শ্রেণি-প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিতেছে এবং উহারই মারফত দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনকে আর্ন্তজাতিক শ্রমিকশ্রেণির একমাত্র প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিতেছে।

এই সম্মেলন সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সমিতিরূপে কাজ করিবে এবং তাহারই মারফত দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সহিত সংযুক্ত থাকিবে।

বেকার ক্ষেতমজুরদের দাবি

ক্ষেতমজুরদের বৎসরের অনেক সময়ে বেকার থাকিতে হয়। জমিদার ও ধনী কৃষকদের যখন দরকার হয় তখন তাহারা নামমাত্র মজুরি দিয়া ক্ষেতমজুরদের নিয়োগ করে। কিন্তু অন্য সময়ে তাহাদের কোন কাজ বা আয় থাকে না। বাধ্য হইয়া ক্ষেতমজুরদের সপরিবারে অনাহারে দিন কাটাইতে হয়। সরকার কখনও কখনও টেস্টরিলিফ প্রভৃতি কাজের ব্যবস্থা করিয়া বেকারির সুযোগে মজুরদের ন্যায্য মজুরি হইতে বঞ্চিত করেন।

কাজ পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক ক্ষেতমজুরের মৌলিক অধিকার। কিন্তু ধনিকশ্রেণি ও তাহাদের সরকার নিজেদের শ্রেণি-স্বার্থে লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুরকে বেকার থাকিতে বাধ্য করে। অনাহারে থাকিয়া বেকার ক্ষেতমজুরগণ তিলে তিলে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন বেকার ক্ষেতমজুরদের জন্য কাজ অথবা বাঁচার মতো মজুরি দাবি করিতেছে। যে সময়ে ক্ষেতের কাজ বা গ্রামের অন্যান্য কাজ না থাকে তখন রাস্তাঘাট তৈয়ার, পুকুর বা স্কুলঘর নির্মাণ, বাঁধ তৈয়ার বা মেরামত প্রভৃতি কাজে বেকার ক্ষেতমজুরদের নিয়োগ করিতে হইবে এবং তাহাদের বাঁচার মতো মজুরি দিতে হইবে। গ্রামের ধনিকশ্রেণি বা সরকার এইরূপ জনহিতকর কাজে বেকার ক্ষেতমজুরদের নিয়োগ করিয়া তাহাদের যাহাতে বাঁচার মতো মজুরি দেন তাহার উপযুক্ত বিধান ও ব্যবস্থা এই সম্মেলন দাবি করিতেছে।

কাজ চাই অথবা বাঁচার মতো মজুরি চাই— এই আওয়াজ লইয়া বেকার ক্ষেতমজুরদের

সমস্যা সমাধান কল্পে প্রদেশব্যাপী গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য এই সম্মেলন সমগ্র ক্ষেতমজুরশ্রেণীর নিকট আবেদন করিতেছে।

কালাকানুন ও দমননীতির প্রতিবাদ

কংগ্রেসী ধনিক সরকার ধনিক জমিদারদের স্বার্থে মজুর, ক্ষেতমজুর ও শোষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট দমননীতি চালাইতেছে এবং একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন চালাইবার জন্য কালাকানুন কায়েম করিয়াছে।

প্রদেশের সর্বত্র এখন প্রায় বার মাসই ১৪৪ ধারা জারি রাখিয়া সভা মিছিল বন্ধ রাখা হইয়াছে। ক্ষেতমজুর, মজুর ও গরীব চাষিদের উপর গুলি চালনা প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নারী বা বালকগণও গুলিবর্ষণ হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন না। শ্রমিকদের সাময়িক পত্রিকা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রাথমিক সমিতির অধিকার পর্যন্ত বিলুপ্তপ্রায়। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কৃষক সমিতি প্রভৃতি গণপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের হয় জেলে আটক রাখা হইয়াছে নতুবা তাহাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রহিয়াছে। ক্ষেতমজুর ও গ্রামের গরীবদের বাড়িঘর লুঠপাট হইতেছে। শত শত মজুর, ক্ষেতমজুর, গরীব চাষি, মহিলা ও ছাত্রকে, বিনা বিচারে কালাকানুনের জোরে আটক রাখা হইয়াছে।

ধনিকশ্রেণির সংকট দ্রুত খারাপ হওয়ার সাথে সাথে সংকটের বোঝা মজুর, ক্ষেতমজুর ও জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাইয়া ধনিকেরা মুনাফা বাড়াইয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের পর চাউলের দাম বাড়িয়াছে। মজুর ও ক্ষেতমজুরের মজুরি কমিয়াছে। এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বন্ধ করার জন্যই কংগ্রেসী ধনিক সরকার এই জঘন্য দমননীতি, বুলেটরাজ, ও কালাকানুনরাজ চালাইতেছে।

ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়াছে যে, কংগ্রেসী সরকার আজ জনসাধারণ হইতে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রমিক, ক্ষেতমজুর ও শোষিত জনগণ আজ কংগ্রেসী ধনিকরাজকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে এবং নিত্য নূতন কায়দার দমননীতি ব্যতিরেকে কংগ্রেসের পক্ষে দেশের শাসন কার্য চালানো সুকঠিন হইয়া পড়িতেছে.

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সম্মেলনের এই প্রথম অধিবেশন কংগ্রেসী সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, দমননীতি ও কালাকানুনের পথ, হিটলার, মুসোলিনী, তোজো কাহাকেও শ্রমিকশ্রেণির হাতে পরাজয় হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে, অবিলম্বে কালাকানুন ও দমননীতিমূলক সমস্ত আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং মজুর, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক-মজুর আন্দোলনের সকল কর্মী ও নেতাদের এখনই মুক্তি দিতে হইবে।

ধনিকশ্রেণির সংকট দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে; তাই খুব ছোট দাবি আদায় করিবার জন্যও কংগ্রেসী সরকারের ফ্যাসিস্ট দমননীতির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য জানিয়া পশ্চিমবঙ্গের লক্ষাধিক ক্ষেতমজুর দমননীতির তাণ্ডব অগ্রাহ্য করিয়াই লড়াই চালাইয়াছেন, লড়াইকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। কংগ্রেসী সরকারের দমননীতি ক্ষেতমজুরশ্রেণির অজেয় আন্দোলন রুখিতে পারিতেছে না।

এই সম্মেলন দমননীতি ও কালাকানুনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য সমগ্র ক্ষেতমজুরশ্রেণিকে আহ্বান করিতেছে।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সম্মেলনের এই প্রথম অধিবেশন শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে কংগ্রেসী সরকারের বর্বর নীতির তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দাবি করিতেছে।

কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সরকারি গদি দখল করিয়াছেন এবং ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদাররূপে শাসন ও শোষণ চালাইতেছেন। আর শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন— মজুর, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক, ছাত্র ইহারাই আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য বিরামহীন লড়াই চালাইতেছেন। এই রাজনৈতিক সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য কংগ্রেসী সরকার নিজেদের শ্রেণি-স্বার্থে শহরের ও গ্রামের মজুর আন্দোলনের ও কৃষক সমিতির শ্রেষ্ঠ নেতাদের কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিতেছেন; অথচ সমস্ত আটক বন্দীদের রাজনৈতিক বন্দীরূপে গণ্য করিতেছেন না। মজুর, ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষি বলিয়া ইহাদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিতেছেন না।

বন্দীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য কংগ্রেসী সরকার শুধু শ্রেণি বিভাগ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। বন্দীদের প্রায় সকলেই নিজ নিজ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তাহাদের আটক রাখায় তাহাদের পরিবার অর্ধাহারে অনাহারে থাকিতেছেন; কিন্তু কংগ্রেসী সরকার প্রায় কোন ক্ষেত্রেই পারিবারিক ভাতা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন না।

আমাদের দেশের মজুর আন্দোলনের ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে অনেকে জেলে রহিয়াছেন। কংগ্রেসী সরকার বন্দীদের স্বাস্থ্য, খাদ্য প্রভৃতি সম্পর্কে চরম ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন। বই, কাগজ-পত্র, মাসিকপত্র সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত হইলেও সেগুলি বন্দীদের দেওয়া সম্পর্কে অযথা বিলম্ব ও নানারূপ অন্যায় বাধানিষেধ আরোপ করা হইতেছে। চিঠি-পত্র লেখা বা আত্মীয় বন্ধুদের সহিত সাক্ষাতের সম্পর্কে সম্মানজনক ব্যবস্থা হইতে কংগ্রেসী কারাগারে আটক বন্দীগণ বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহার উপর আবার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব হইতে দূরে রাখিয়া নির্যাতন করিবার জন্য বন্দীদের প্রদেশের বাহিরে স্থানান্তরের চেষ্টা চলিতেছে। এই সকল অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে বন্দীগণ এপ্রিল মাসে ও জুন মাসে দুইবার দীর্ঘস্থায়ী অনশন ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এপ্রিল মাসে ধর্মঘটের শেষের দিকে পশ্চিম বাংলার সরকার বন্দীদের দাবি মানিয়া বন্দীদের সহিত এক চুক্তি করেন। কিন্তু চুক্তির কালির দাগ শুকাইবার আগেই সরকার সেই চুক্তি ভঙ্গ করেন। বন্দীগণ পুনরায় জুন মাসে অনশন ধর্মঘট করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে সরকারের চণ্ডনীতি অতীতের সকল সীমা ছাড়াইয়া যায়। জেলখানার মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা অবিরাম গুলি চালানো হয়। তিন জন বন্দী গুলিতে নিহত হন, আহত হন অগণিত বন্দী। আরও একজন অনশনকালে অত্যাচারের ফলে মারা যান। নারী বন্দীদের উপরও নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বন্দীদের অনশন ধর্মঘট চলিতে থাকে; বাহিরে বন্দীদের সমর্থনে ও বন্দী হত্যার প্রতিবাদে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া উঠে। সরকার পুনরায় বন্দীদের দাবি মানিয়া নেন; কিন্তু এবার জনসাধারণের জন্য কোন সরকারি ইস্তাহার প্রচার করা হয় না। ইহার পরই কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার এক আইন করিয়াছেন যে, বন্দীদের প্রদেশের বাহিরে স্থানান্তরিত

করা যাইবে। পুনরায় বন্দীদের নিকট প্রদত্ত সকল প্রতিশ্রুতি সরকার ভঙ্গ করিতেছেন।

এই সম্মেলন আটক-বন্দীদের সম্পর্কে কংগ্রেসী সরকারের এই জঘন্য নীতির এখনই অবসান দাবি করিতেছে। এই সম্মেলন দাবি করিতেছে যে—

১। ক্ষেতমজুর, মজুর, গরীব কৃষক— শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সকল বন্দীকেই রাজনৈতিক বন্দী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে শ্রেণি বিভাগ বিলুপ্ত করিয়া সকলকেই এখনকার প্রথমশ্রেণির অনুরূপ অধিকার ও সুবিধা দিতে হইবে।

২। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রদেশের বাহিরে স্থানান্তর করা চলিবে না।

৩। বন্দীদের বিনা-বিলম্বে সকল রকম আইনসঙ্গত বই, সংবাদপত্র, মাসিকপত্র প্রভৃতি দিতে হইবে।

৪। বন্দীদের দেখা-সাক্ষাত, চিঠি-পত্র, প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত অধিকার দিতে হইবে।

৫। আটক বন্দীদের পরিবারের জন্য যথেষ্ট ভাতার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভাতা দিতে হইবে।

৬। বন্দীদের সকল দাবি মানিয়া, বন্দীদের সম্পর্কে নূতন নীতি ঘোষণা করিয়া জনসাধারণের নিকট অবিলম্বে সরকারী বিবৃতি প্রচার করিতে হইবে।

এই সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে যে, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের এই সব শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জেলে বন্দী করিয়া রাখার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। এই সম্মেলন সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি দাবি করিতেছে।

গত জুন মাসে রায় মন্ত্রিসভা দমদম, প্রেসিডেন্সী ও আলিপুর জেলে যে অত্যাচার চালাইয়াছেন, তাহার ফলে রায় মন্ত্রিসভা সমগ্র ক্ষেতমজুর-শ্রেণির ও প্রদেশের জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়াছে। এই সম্মেলন অবিলম্বে রায় মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করিতেছে এবং যাহাদের দ্বারা বন্দী হত্যা ও অন্যান্য অপরাধ হইয়াছে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করিতেছে।

শ্রমিকশ্রেণি, ক্ষেতমজুরশ্রেণি ও শোষিত জনসাধারণ বন্দী মুক্তির দাবিতে, বন্দীদের দাবির সমর্থনে, ও বন্দী হত্যার প্রতিবাদের কংগ্রেসী সরকারের লাঠি, গ্রেপ্তার ও গুলি অগ্রাহ্য করিয়া তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। হাওড়া, মালদা ও অন্যান্য অনেক স্থানে ক্ষেতমজুরগণ হাজারে হাজারে হরতাল, সভা মিছিল প্রভৃতি করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনে অনেকে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

এই সম্মেলন ঐ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে, বন্দীদের সমর্থনে ঐ আন্দোলনকে অভিনন্দন জানাইতেছে এবং সরকার যাহাতে বন্দীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে ও বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়, তাহার জন্য দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নকে অভিনন্দন

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন সোভিয়েট ইউনিয়নকে ঐকান্তিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।

শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট ইউনিয়নই আজ সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণির ও শোষিত জনগণের নেতা ও বন্ধু। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ যখন সারা

দুনিয়ায় ঔপনিবেশিক শোষণ ও অর্থনীতি কায়েম করার ও আর এক দুনিয়াব্যাপী যুদ্ধ বাধাইবার চক্রান্ত করিতেছেন সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন সারা দুনিয়ায় জনগণের স্বাধীনতা, জনতার গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিরামহীন লড়াই পরিচালনা করিতেছেন। আমেরিকায় নিগ্রোদের বিরুদ্ধে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ধনিক ও সাম্রাজ্যবাদী সরকার যখন জঘন্য বর্ণবৈষম্য চালাইতেছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন সারা পৃথিবী হইতে বর্ণবৈষম্য অবসানের জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতির স্বার্থে ও মুনাফার খাতিরে মজুরের ও ক্ষেতমজুরের মজুরি কমিতেছে, খরচ বাড়িতেছে ও গরীব জনসাধারণ সর্বস্বান্ত হইতেছে, চাউল ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের দর বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া এই সময়ে উৎপাদন অনেক বাড়াইতে পারিয়াছে, খাদ্যের দর অনেক সস্তা করিয়া দিতে পারিয়াছে এবং মজুরশ্রেণির মজুরি প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ধনতান্ত্রিক শাসনে কবলিত দেশগুলি যখন দ্রুত-বর্ধমান সংকটে আচ্ছন্ন, সোভিয়েটের জনগণের জীবনে তখন সংকটের চিহ্নমাত্র নাই। এই সম্মেলন তাই সোভিয়েট ইউনিয়নকে ও তাহার শ্রমিকশ্রেণিকে অভিবাদন জানাইতেছে।

এদেশের নেহরু সরকার আজ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারির পথ গ্রহণ করিয়াছেন; মুখে নিরপেক্ষতার বুলি আওড়াইলেও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেই পুরাপুরি যোগ দিয়াছেন। নেহরু সরকার তাই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণি ও শোষিত জনসাধারণের স্বার্থ, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সবই সাম্রাজ্যবাদের পায়ে বিসর্জন দিয়াছেন; এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি জঘন্য বর্ণবৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোন দৃঢ় ব্যবস্থা লইতে পারেন নাই; বরঞ্চ বর্মায় অস্ত্র ও মালয়ে সশস্ত্র সৈন্য পাঠাইতেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সফল করিবার কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেছেন।

কিন্তু ঠিক এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি মালান সরকারের জঘন্য বর্ণবৈষম্য ও অকথ্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন-ই ইউ-এন-ও-তে প্রতিবাদ তুলিয়াছেন ও উহার অবসান দাবি করিয়াছেন। গত বৎসর ইউনিকাফে সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধি গ্রেডী যখন এদেশেও মার্শাল প্ল্যানের বিস্তার ও উপনিবেশের গোলামি কায়েম করার ষড়যন্ত্র করিতেছিল, সোভিয়েট প্রতিনিধি তখন ভারতীয় জনগণের সার্বভৌমত্ব ও পূর্ণ স্বাধীনতায় কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না করিয়া ভারতের স্বাধীন অর্থনীতি গঠনের পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভারতের শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে নেহরু সরকার যে দমননীতির তাণ্ডব চালাইতেছেন, সোভিয়েটের জনগণ তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন ও উহা রহিত করার দাবি তুলিয়াছেন। সোভিয়েট শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র; তাই ভারতে শ্রমিক ও শোষিত জনতার প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য ও ঔপনিবেশিক দাসত্ব হইতে মুক্তির জন্য সোভিয়েট এইরূপ বিরামহীন সংগ্রাম চালাইতেছেন।

পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়ায় সোভিয়েটের প্রত্যক্ষ সাহায্যের ফলে জনতার গণতান্ত্রিক রাজ কায়েম হইয়াছে। চীনে মুক্তিফৌজের বিজয় অভিযানের মূলে রহিয়াছে মহান্ সোভিয়েট ইউনিয়নের সহায়তা। গ্রীসে সৈন্য প্রেরণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপনিবেশ কায়েম রাখার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত, ভারতে উপনিবেশের গোলামি কায়েম রাখার ষড়যন্ত্র— এ সবেরই বিরুদ্ধে সোভিয়েট বিরামহীন

লড়াই চালাইতেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন শ্রমিকশ্রেণির সামজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাই সারা দুনিয়ার মজুর ও শোষিতশ্রেণির প্রধান দুর্গ সোভিয়েট।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুরদের এই সম্মেলন মহান্ সোভিয়েট ইউনিয়নের নীতিতে ও নেতৃত্বে সংগ্রামী ক্ষেতমজুরশ্রেণির দৃঢ় আস্থা স্তাপন

চীনের মুক্তি ফৌজের প্রতি অভিনন্দন

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুরদের এই প্রথম সম্মেলন মহাচীনের মুক্তি ফৌজের বিজয় অভিযানকে অভিনন্দন জানাইতেছে।

লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে মজুর-কৃষকের মুক্তি ফৌজ আজ সেখানকার ধনীর রাজত্বকে চুরমার করিয়া দিয়া মহাচীনের জনসাধারণকে যুগ যুগের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ধনিক গোষ্ঠী অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দ্বারা অত্যাচারী চিয়াং কাইশেকের রাজত্বকে বজায় রাখিয়া চীনকে নিজেদের লুঠের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু মজুরশ্রেণির নেতৃত্বে চীনের জনসাধারণ গত ৩২ বছর যাবত এই বিস্ময়কর লড়াই চালাইয়া আমেরিকার দালাল চিয়াং কাইশেকের রাজত্বকে ধুলায় মিশাইয়া দিয়াছে। এই গৌরবময় লড়াইয়ে চীনের জনসাধারণ এক অভূতপূর্ব বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন।

চীনের মুক্তি ফৌজের বিজয় অভিযান প্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বৃহত্তম ঘাঁটিকে চুরমার করিয়া দিয়া সমস্ত প্রাচ্যের নিপীড়িত জনগণের মুক্তি আন্দোলনে নূতন শক্তি ও নূতন প্রেরণা আনিয়া দিয়াছে।

চীনের মুক্তি ফৌজের বিজয় অভিযান দুনিয়া হইতে সাম্রাজ্যবাদের ও ধনিকশ্রেণির উচ্ছেদ এবং শ্রমিকশ্রেণির বিজয়ের কথাই ঘোষণা করিতেছে।

তেলেঙ্গানা সংগ্রামকে অভিনন্দন

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুরদের এই প্রথম সম্মেলন তেলেঙ্গানার সংগ্রামী ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদিগকে— অমর তেলেঙ্গানাকে— অভিনন্দন জানাইতেছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী, হায়দারাবাদের জনগণের ঘৃণিত শত্রু নিজাম যে সময়ে তাহার ফৌজ ও রাজাকার বাহিনীর দ্বারা হায়দরাবাদের জনসাধারণের উপর নিদারুণ অত্যাচার চালাইতেছিল, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দিতেছিল, লুঠ, নারীধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড চালাইয়া হায়দরাবাদের জনসাধারণকে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিতেছিল, তখন তেলেঙ্গানার এই বীর কৃষক-সৈনিকগণ নিজাম ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে গৌরবময় সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন, নিজামের দালাল জমিদার-দেশমুখদের বিতাড়িত করিয়া তেলেঙ্গানার প্রায় দুই হাজার গ্রামে শোষিত জনতার শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং খোদ চাষিদের হাতে বহু লক্ষ একর জমি চাষের জন্য বন্টন করিয়া দিয়াছেন। তেলেঙ্গানার সংগ্রামী জনগণ এইভাবে ভারতের বুকে জনতার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়াছেন।

নেহরু-পরিচালিত কংগ্রেসী ধনিক সরকার এখন এই নিজামের সহিত আপস-চুক্তি করিয়াছেন। রাজাকারদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে না, রাজাকারদের নেতা নরঘাতক কাশেম রিজভী এখন ভারত সরকারের নিকট হইতে মাসে ৭৫০ টাকা ভাতা পাইতেছে; আর

নিজাম ও রাজাকারদের চরম অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাহারা লড়াই করিয়া প্রাণ দিয়াছে তাহাদেরই বিরুদ্ধে আজ ভারত সরকারের ফ্যাসিস্ট দমননীতি চলিয়াছে। চাষির হাত হইতে জমি ছিনাইয়া লইয়া জমিদার ও দেশমুখদের দেওয়া হইতেছে। বিপ্লবী জনতার উপর প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক জমিদার রাজ চালানো হইতেছে। হায়দরাবাদের শোষিত জনতার উপরে ধনিক-রাজ কায়েম করার এই নীতির ফলেই শত শত কৃষকের লম্বা মেয়াদী সাজা হইয়াছে এবং সামরিক আদালতের বিচারে তেলেঙ্গানার ৮ জন তরুণ শ্রেষ্ঠ সন্তানের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কিন্তু কংগ্রেসী শাসকশ্রেণির এই প্রচণ্ড দমননীতি সত্ত্বেও তেলেঙ্গানার অপরাজেয় জনতা পরাস্ত হন নাই; কংগ্রেসী মিলিটারী শাসনের আমলেও মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিরোধ চালাইয়া তাহারা জনতার তেলেঙ্গানাকে অটুট রাখিয়াছেন এবং আরও প্রসারিত করিয়াছেন। দুর্জয় তেলেঙ্গানার অপূর্ব প্রতিরোধ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুরদের এবং সমগ্র মেহনতী জনতাকে শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রেরণা ও উদ্দীপনা জোগাইতেছে।

জমি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য তেলেঙ্গানার জনগণের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি এই সম্মেলন পূর্ণ সমর্থন ও শুভেচ্ছা ঘোষণা করিতেছে।

এই সম্মেলন তেলেঙ্গানায় ভারত সরকারের বর্বর দমননীতির তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং এই নীতির অবিলম্বে অবসান দাবি করিতেছে।

এই সম্মেলন সমগ্র ক্ষেতমজুরশ্রেণির নিকট আবেদন করিতেছে ঃ দ্বিধাহীন চিত্তে, দৃঢ়ভাবে তেলেঙ্গানার অমর জনগণের পাশে দাঁড়াইতে হইবে, তেলেঙ্গানার জনগণের প্রতি হায়দরাবাদের সামরিক সরকারের ও কংগ্রেসী নেতাদের এই নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। ধনিকশ্রেণি তেলেঙ্গানার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করিবে— পশ্চিমবাংলার ক্ষেতমজুর, সারা ভারতের শ্রমিকশ্রেণি ইহা কোনমতে বরদাস্ত করিবে না।

হায়দরাবাদের কৃষক নেতাদের মৃত্যুদণ্ড রদ করিতে হইবে

মুরহরি রাও, ইরাবতী রাম রেড্ডী, কল্লুরি তীরুপথী, গোসী লিঙ্গায়া, পান্টাগী লিঙ্গায়া, পানুগাতি এলমায়া কৃষ্ণায়া, কঙ্কায়া ও পাণ্ডু রেড্ডী নারায়ণ— তেলেঙ্গানার এই আটজন বীর সন্তানকে অত্যাচারী নিজাম ও তাহার দলবলের বিরুদ্ধে অপরাধের কার্য করার অভিযোগে নেহরু সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হায়দরাবাদের বিশেষ আদালত ফাঁসির আদেশ দিয়াছেন। এই সম্মেলন উক্ত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে।

এই ৮ জনের সকলেরই বয়স ৩০ বৎসরের কম। ইরাবতী রাম রেড্ডীর বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। একজন রাজাকার গুণ্ডাকে হত্যার অভিযোগ ইহার বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে।

এই সম্মেলন ভারত সরকারের নিকট দাবি করিতেছে, এই আসামীদের মৃত্যুদণ্ড রহিত করিয়া অবিলম্বে ইহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হউক।

ক্ষেতমজুরশ্রেণির নিকট এই সম্মেলন আবেদন করিতেছে, কারখানার মজুর ও জনসাধারণের সহিত মিলিতভাবে এই মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে এখনই তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন, ভারত ও হায়দরাবাদ সরকার যাহাতে ইহাদের দণ্ডাদেশ রহিত করিয়া অবিলম্বে ইহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন, তাহার জন্য প্রবল জনমত গঠন করুন।

৪
গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী

নাম

ট্রেড ইউনিয়নটির নাম হইবে, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি। নীম্নে এই ট্রেড ইউনিয়নটিকে শুধু 'সমিতি' বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে।

অফিস

সমিতির রেজিস্টার্ড অফিস এখন ২৪৯নং বহুবাজার স্ট্রীট (৪ তলা), কলিকাতা— এই ঠিকানায় অবস্থিত। যদি সমিতির অফিসের ঠিকানা বদল হয় অথবা সমিতির কর্মকর্তা বা কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যের অদল-বদল হয়, তাহা হইলে সে সংবাদ একপক্ষকালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের নিকট জানাইতে হইবে।

উদ্দেশ্য

সমিতির উদ্দেশ্য হইতেছে—

(ক) পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ক্ষেতমজুরগণের কার্যকরী ও সর্বাঙ্গীন সংগঠন গড়িয়া তোলা।

(খ) ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতরে ও বাহিরে এই সমিতির অনুরূপ উদ্দেশ্যে গঠিত অন্যান্য সংগঠনকে এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা এবং ঐরূপ সংগঠনের সহিত এই সমিতিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

(গ) ন্যায্য মজুরির হার, খাটুনির যুক্তিসঙ্গত ঘন্টা, এবং সকল উপায়ে সমিতির সদস্যদের সাধারণভাবে সব রকম সুবিধা আদায় করা এবং উক্ত উদ্দেশ্যকল্পে সম্ভবমত তহবিল বা অন্যান্য সাহায্যমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

(ঘ) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক দিক দিয়া সমস্ত মেহনতকারী জনসাধারণের এবং বিশেষ করিয়া ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

(ঙ) কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও ন্যায্য বন্টন নিয়ন্ত্রণ, মজুরি ও কাজের ঘন্টা নির্ধারণ, প্রত্যেকের কাজ দেওয়া, বৃদ্ধ বয়সের পেন্সন দেওয়া ও অন্যান্য সামাজিক বীমার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সমস্ত কাজের মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা।

(চ) ধর্মঘট যাহাতে উপযুক্তভাবে পরিচালনা হয়, যাহাতে ধর্মঘটের দ্রুত ও সন্তোষজনক অবসান হয়, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সকল রকম ব্যবস্থা করা এবং অনিচ্ছাকৃত বেকারী ও মালিক কর্তৃক 'বেগার' খাটানোর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

(ছ) কোন মালিকের বিরুদ্ধে সমিতির কোন সদস্যের বা সমিতির অধিকার রক্ষার বা আদায়ের জন্য সমিতির বা সমিতির কোন সদস্যের পক্ষ হইতে কোন মামলায় বাদী হিসাবে মামলা চালানো বা আসামী হিসাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করার প্রয়োজন হইলে ঐ মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

সদস্যপদ

(ক) পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মধ্যে জমিদার, জোতদার বা অন্য কোন শ্রেণির কৃষকের অধীনে অথবা সরকারি বা বেসরকারি কোন কৃষি ফার্মের অধীনে আংশিক বা সর্বক্ষণের জন্য যে ব্যক্তি কৃষিতে দিনমজুর হিসাবে কাজ করেন, তিনিই ১৪ বৎসর বয়স্ক হইলে সমিতির সাধারণ সভ্য হইতে পারিবেন। তবে তাহাকে সমিতির গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হইবে। সভ্যপদের জন্য জাতিধর্ম বা স্ত্রীপুরুষ হিসাবে কোন ভেদাভেদ চলিবে না।

(খ) সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অথচ ক্ষেতমজুর হিসাবে কাজ করেন না এরূপ লোককেও অবৈতনিক সদস্যরূপে গ্রহণ করা যাইবে। তবে শুধুমাত্র সমিতির বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটির— তা সে কেন্দ্রীয় বা শাখা সমিতির হউক না কেন— কর্মকর্তার কাজ করার জন্য এইরূপ অবৈতনিক সদস্য গ্রহণ করা যাইবে। কেন্দ্রীয় বা শাখা সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যায় অবৈতনিক সদস্য থাকিতে পারিবে না।

(গ) প্রত্যেক সদস্যকে বার্ষিক ||০ আট আনা চাঁদা দিতে হইবে। এই নিয়মিত চাঁদা ছাড়াও সভ্যদের নিকট অতিরিক্ত চাঁদা আদায়ের অধিকার কার্যনির্বাহক কমিটির থাকিবে। সভ্যের চাঁদা কয়েক কিস্তিতে আদায় করা চলিবে।

(ঘ) কার্যনির্বাহক কমিটির নিজ বিবেচনামত যে কোন ব্যক্তিকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করার অধিকার থাকিবে। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে সদস্যপদের জন্য আবেদনকারী সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভায় আপীল করিবার অধিকার পাইবেন।

(ঙ) ইস্তফা দিলে বা বিতাড়িত হইলে আপনা হইতেই সদস্যপদ শেষ হইয়া যাইবে। তাছাড়া যদি কেহ বাৎসরিক চাঁদা ফেলিয়া রাখেন এবং পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যেও তাহা মিটাইয়া না দেন, তবে তাঁহারও সদস্যপদ খারিজ হইয়া যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ যদি বকেয়া পাওনা অথবা তাহার উপর কার্যনির্বাহক কমিটি দ্বারা ধার্য জরিমানা অথবা পাওনা ও জরিমানা দুই-ই মিটাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কার্যনির্বাহক কমিটি পুনরায় সভ্য হিসাবে ফিরাইয়া লইতে পারেন।

(চ) সভ্যপদ বাতিল হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তির সমিতির সদস্যরূপে প্রাপ্য সুবিধা ও অধিকারও সমস্ত বাতিল হইয়া যাইবে।

(ছ) কার্যনির্বাহক কমিটি সমিতির নিয়মাবলীর যে দাম ধার্য করিবেন এই দাম দিয়া যে কোন সদস্য নিয়মাবলীর একটা নকল লইতে পারেন। না জানিয়া সমিতির নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে— নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য কোন সদস্যের তরফ হইতেই এরূপ অজুহাত গ্রাহ্য হইবে না।

(জ) সমিতি সভ্যদের একটা পুরা তালিকা রাখিবে, তাহাতে সভ্যের কাজ, বয়স ও ঠিকানা লেখা থাকিবে।

(ঝ) সমিতির কোন সভ্য বা কোন কর্মকর্তা যদি সমিতির স্বার্থের বিরোধী কাজ করেন অথবা জ্ঞাতসারে যদি সমিতির নিয়ম ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে কার্যনির্বাহক কমিটির নির্দেশে তাঁহাকে বিতাড়িত করা বা অন্য কোনভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে। অবশ্য ঐ সভ্য বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য বাৎসরিক সাধারণ সভার কাছে আপীল করিতে পারিবেন।

পরিচালনা

(ক) বাৎসরিক সাধারণ সভা—

(১) সমিতির সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকিবে বাৎসরিক সাধারণ সভার হাতে। এই সভা বছরে একবার হইবে। সাধারণভাবে সমস্ত শ্রমজীবী লোকের এবং বিশেষভাবে সমিতির সভ্যদের মঙ্গল বিধান সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা এই সাধারণ সভার কাজ হইবে। তাছাড়াও এই সভা পরবর্তী বৎসরের জন্য সমিতির নীতি ও কার্যধারা ঠিক করিবে।

(২) ধারণানুযায়ী কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্য ও কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করিবে এবং সমিতির বাৎসরিক কার্যবিবরণী ও হিসাবপত্র অনুমোদন করিবে।

(খ) কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচন—

প্রত্যেক শাখার ১০০ জন বা তাহার কম কিন্তু ২৫ জনের কম নহে— এই সভ্যসংখ্যা পিছু একজন করিয়া প্রতিনিধি বাৎসরিক সাধারণ সভার জন্য নির্বাচন করিতে হইবে। শাখা-সম্মেলনে অধিক সংখ্যক ভোটের দ্বারাই এই প্রতিনিধি-নির্বাচন হইবে। বাৎসরিক সাধারণ সভায় যে সমস্ত প্রতিনিধি হাজির থাকিবেন তাঁহারা ভোটের দ্বারা কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচিত করিবেন। ২৯ জনের কম নয় এবং ৩৭ জনের বেশি নয়, এইরূপ সংখ্যার সভ্য লইয়া কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হইবে। কর্মকর্তাদের, অর্থাৎ সভাপতি, তিনজন সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, তিনজন সহ-সম্পাদক এবং একজন কোষাধ্যক্ষ— ইঁহাদের এই সংখ্যার মধ্যে ধরিয়াই হিসাব করিতে হইবে। যত বেশি লোক কার্যনির্বাহক কমিটিতে লওয়া যায় তাহার সমস্ত সংখ্যাই যদি সাধারণ সভা পূরণ করিয়া না ফেলিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বাকী কয়েকজন সভ্যকে মনোনীত করিয়া লইবার অধিকার কার্যনির্বাহক কমিটির থাকিবে। কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্যের বয়স ১৮ বৎসরের বেশি হওয়া চাই।

(গ) কার্যনির্বাহক কমিটির ক্ষমতা—

বাৎসরিক সাধারণ সভার নির্দেশ অনুসারে সমিতির সকল কার্য তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব থাকিবে কার্যনির্বাহক কমিটির উপর। সমিতির স্বার্থের সহিত সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারেই কার্যনির্বাহক কমিটি বাৎসরিক সাধারণ সভার কাছে দায়ী থাকিবে।

(ঘ) সাধারণ সম্পাদকের কাজ এবং ক্ষমতা

কার্যনির্বাহক কমিটির প্রত্যেক প্রস্তাব এবং নির্দেশ সুষ্ঠুরূপে কাজে পরিণত করাই হইতেছে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব এবং এজন্য তিনি কার্যনির্বাহক কমিটির নিকট দায়ী থাকিবেন। তাঁহার কাজ হইবে— প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী লিখিয়া রাখা, অফিসের খাতাপত্র ঠিক রাখা, আয়-ব্যয়ের নিখুঁত হিসাব রাখা এবং সমিতির কার্যকলাপের সাধারণভাবে তদারক করা। চলতি খরচের জন্য তিনি একশত টাকা পর্যন্ত সমিতির তহবিল নিজের কাছে রাখিতে পারিবেন এবং একসঙ্গে নিজের দায়িত্বে ৫০ টাকা পর্যন্ত পাওনা মিটাইতে পারিবেন।

(ঙ) কোষাধ্যক্ষের কাজ ও ক্ষমতা—

কোষাধ্যক্ষের কাছে যে টাকা জমা দেওয়া হইবে সেই সমস্ত টাকার জন্য তিনি দায়ি থাকিবেন। কার্যকরী সমিতির দ্বারা অথবা সাধারণ সম্পাদকের দ্বারা যথারীতি মঞ্জুরীকৃত 'বিল' (হিসাব) তাঁহার কাছে পেশ করিলে তিনি তাহা মিটাইয়া দিবেন। কোষাধ্যক্ষ নিজের

কাছে একসঙ্গে ১০০ টাকা পর্যন্ত রাখিতে পারিবেন।

(চ) শাখা-কমিটি গঠন—

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, যেখানেই দরকার সেইখানেই, কার্যকরী সমিতি শাখা-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন, তবে কোন শাখা কমিটিতে ২৫ জনের কম সভ্য থাকিতে পারিবে না। শাখা-কমিটির যে কার্যনির্বাহক কমিটি হইবে তাহাতে কমপক্ষে ৫ জন ও বেশিপক্ষে ১১ জন সভ্য থাকিবে— ইহার মধ্যে সভাপতি, ১ জন সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষকেও অর্থাৎ কর্মকর্তাদেরও ধরিতে হইবে। এই কর্মকর্তারা নির্বাচিত হইবেন শাখার বাৎসরিক সম্মেলনে। ঐ সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের অধিকসংখ্যক ভোট যাঁহারা পাইবেন তাঁহারাই নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবেন। প্রয়োজন হইলে দুইজন সহকারী সভাপতি ও ১ জন সহকারী সম্পাদকও নির্বাচন করা হইবে। শাখা কমিটি মোট সভ্যের চাঁদা বাবদ যত টাকা আদায় করিবেন তাহার চারভাগের একভাগ দিবেন কেন্দ্রীয় সমিতিকে। শাখা-কমিটি ইচ্ছা করিলে নিজেদের জন্য আলাদা নিয়মাবলী তৈরি করিয়া লইতে পারেন; কিন্তু সেই নিয়মাবলী কেন্দ্রীয় সমিতির নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যের বিরোধী যেন না হয়।

(ছ) শাখা-সম্মেলন ও প্রতিনিধি নির্বাচন—

শাখা-কমিটির বার্ষিক সম্মেলন বৎসরে একবার হইবে। কেন্দ্রীয় সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভার অন্তত একমাস আগে শাখা-সম্মেলন হইয়া যাওয়া চাই। প্রত্যেক সভ্যই শাখা-সম্মেলনের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন। এই শাখা-সম্মেলন হইতে কেন্দ্রীয় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে। ১০০ জন অথবা তাহার কম কিন্তু ২৫ জনের কম নহে— এই সভ্যসংখ্যা পিছু একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে। এইভাবে অধিকসংখ্যক ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন হইবে।

(জ) কার্যনির্বাহক কমিটির সভার জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমিতির সাধারণ সম্পাদক অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাজ করিবার জন্য কার্যনির্বাহক কমিটি যাঁহাকে (বা যাঁহাদের) অধিকার দিয়াছে, তিনি (বা তাঁহারা) লিখিতভাবে এই সভার নোটিশ জারি করিবেন। কার্যনির্বাহক কমিটির সাধারণ সভা হইলে ৭ দিন পূর্বে নোটিশ জারি করিতে হইবে; এবং জরুরি সভা হইলে তিন দিন পূর্বে নোটিশ জারি করিতে হইবে। মোট সভ্যের তিনভাগেব একভাগ সভ্য হাজির থাকিলেই কার্যনির্বাহক কমিটির সভা চলিতে পারিবে। দরকার মত সভ্যসংখ্যা উপস্থিত না হইবার ফলে একবার যদি সভা স্থগিত রাখিতে হয় তবে সেই সভা আবার যখন বসিবে তখন সভ্যসংখ্যার বিচার (কোরাম) দরকার হইবে না। মাসে অন্তত একবার কার্যনির্বাহক কমিটির সভা হওয়া চাই।

সংশোধন

সমিতির নিয়ম কানুনের কোন কিছু প্রত্যাহার বা সংশোধন করিতে হইলে তাহার জন্য বিশেষভাবে কার্যনির্বাহক কমিটির সভা ডাকিতে হইবে। তাহাতে সংখ্যাধিক ভোটের দ্বারা এই রদ-বদল করিতে হইবে এবং অবশ্যই কার্যনির্বাহক কমিটির এই সিদ্ধান্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় মঞ্জুরী সাপেক্ষ হইবে। নিয়মাবলীর যে কোন রদ-বদল হইবে তাহা ১৫ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রারের কাছে জানাইতে হইবে।

তহবিল

(ক) সমিতির তহবিল হইবে নিম্নলিখিত দুইটি তহবিল লইয়া— (১) সাধারণ তহবিল; (২) রাজনৈতিক তহবিল।

(খ) তহবিলের উদ্বৃত্ত টাকা কার্যনির্বাহক কমিটি দ্বারা অনুমোদিত কোন একটি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে (শিডিউল্ড ব্যাঙ্ক) জমা রাখিতে হইবে। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে হইলে চেক-বইয়ে সাধারণ-সম্পদকের একলার বা সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ উভয়ের যুক্ত সংযুক্ত স্বাক্ষর থাকিবে।

(গ) ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্টে ১৯২৬ সালের ১৫ ধারায় উল্লিখিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সমিতির সাধারণ তহবিল খরচ হইতে পারিবে না।

সমিতির রাজনৈতিক তহবিল খরচ হইবে সমিতির সভ্যদের নাগরিক ও রাজনৈতিক দলিল বিধানের জন্য। কিন্তু এই তহবিল খরচের সময় নজর রাখিতে হইবে যে, ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্টের ১৬ ধারায় যে বিশেষ উদ্দেশ্য ও যে পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে ঠিক সেইভাবেই যেন তহবিল তৈয়ার ও খরচকার্য হয়। ইহাও নজর রাখিতে হইবে যাহাতে ঐ ধারায় যে বাধা-নিষেধের কথা আছে তাহাও যেন মানিয়া চলা হয়। সাধারণ তহবিলের সঙ্গে রাজনৈতিক তহবিলের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। কোন সভ্য যদি রাজনৈতিক তহবিলে চাঁদা নাও দেন তাহা হইলেও সমিতির কাছ হইতে প্রাপ্য সমস্ত সুবিধা পাইবার অধিকারী তিনি থাকিবেন।

হিসাব পরিদর্শন ও পরীক্ষা

(ক) সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব বহি এবং সভ্যদের তালিকা যেকোন সভ্য বা যেকোন কর্মকর্তা যেকোন দিন যেকোন সময় দেখিতে পারিবেন।

(খ) প্রতি বৎসরে একবার সমিতির হিসাবপত্র উপযুক্ত একজন বা একজনের বেশি পরীক্ষককে দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন রেগুলেশনস্ (১৯২৭) অনুযায়ী যোগ্যতা যাঁহার বা যাঁহাদের আছে তিনিই বা তাঁহারাই অবশ্য এই পরীক্ষা করিতে পারিবেন। প্রতি বৎসর ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে পরীক্ষিত হিসাবপত্র বাৎসরিক রিটার্ন হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

সাহায্য ও সুবিধা

কোন সভ্যের নাম সভ্য তালিকায় একবছর ধরিয়া থাকিলে এবং তাঁহার বাৎসরিক চাঁদা পুরা জমা পড়িলে তবেই তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত সমিতি করিতে পারিবেন।

সমিতির বিলুপ্তি

পূর্ণ ১৫ দিনের নোটিশ দিয়া সমিতি ভাঙিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই বিশেষ ভাবে আহূত সমিতির সাধারণ সভায় সমিতির মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা অন্তত ৮০ জন সাধারণ সভায় উপস্থিত না থাকিলে এবং তম্মধ্যে অন্তত শতকরা ৭৫ জন সমিতি ভাঙিয়া দেওয়ার পক্ষে

ভোট না দিলে এই সমিতি বিলুপ্ত করা যাইবে না। সমিতির বিলুপ্তির পর সমিতির তহবিল ও অন্যান্য সম্পত্তি কার্যনির্বাহক কমিটি দ্বারা নিয়োজিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর হাতে ন্যস্ত হইবে; উপরোক্ত সাধারণ সভার নির্দেশিত ভাবে ট্রাস্টিগণ ঐ সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিবেন। সমিতি বিলুপ্তির নোটিশ ১৫ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের রেজিস্ট্রারের নিকট হইতে সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত সমিতি বিলুপ্তি কার্যকরী করা হইবে না।

টিকা : ১. এই সম্মেলন থেকে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতিকে সিপিআই-এরই একটা গণ সংগঠন বলে ধরা যেতে পারে। কারণ— (ক) এটি এ-আই-টি-ইউ-সি'র অন্তর্ভুক্ত ছিল আর সেসময় এই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে সি-পি-আই এর প্রভাব ছিল বেশি। (খ) সমিতির অফিসের ঠিকানা ছিল ২৪৯ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা। আর এই ঠিকানাতেই ছিল পার্টির প্রাদেশিক কমিটির অফিস।

২. ১৯৬৪ সালে সিপিআই-এর ভাঙনের পূর্বে, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতির কোন সম্মেলন হয়েছিল কিনা সেটার ভিতর না গিয়ে এইটুকু বলা যায় যে এই সমিতির পরবর্তী কালের সাংগঠনিক অস্তিত্ব উভয় কমিউনিস্ট পার্টির বিবেচনার মধ্যে ছিল না। কারণ— (ক) সিপিআই(এম) এর পৃথক কোন ক্ষেতমজুর সংগঠন পশ্চিমবঙ্গে আজও পর্যন্ত নেই, যদিও তাদের একটা সর্বভারতীয় সংগঠন রয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে তারা কৃষক সভার মধ্যেই ক্ষেতমজুরদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। (খ) সিপিআই-এর ক্ষেতমজুরদের নিয়ে একটি পৃথক সংগঠন রয়েছে। এই সংগঠনের নাম হল ভারতীয় ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯ সালের মে মাসে এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল নদীয়া জেলার ঘেটুগাছিতে। এই তথ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে পূর্বের ক্ষেতমজুর সমিতির অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের সমিতির কোন ধারাবাহিকতা ছিল না। — (সম্পাদক)

পি-সি সমাচার পত্র

পি-সি ইন্‌ফর্মেশন ডকুমেন্ট

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

৩০শে নভেম্বর, ১৯৪৮

কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে (মেদিনীপুর)

রিপোর্টার — মধু

বিঃ দ্রঃ— বিভিন্ন জেলার, প্রদেশের, কেন্দ্রের ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন, পার্টি ও অন্যান্য ফ্রন্টের রিপোর্ট এবং তথ্যমূলক বিষয় নিয়মিতভাবে "পি-সি ইন্‌ফর্মেশন ডকুমেন্ট" অর্থাৎ প্রাদেশিক পার্টি সমাচার পত্রে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আন্দোলন, সংগঠন ও সংগ্রামের মস্‌লা হিসাবে প্রতি ইউনিট ও সভ্যকে এইগুলি পড়ার কথা বলা হয়েছিল। পার্টি সভ্যদের পক্ষে এইগুলি ছিল প্রয়োজনীয় জানার বিষয়। — (সম্পাদক)

অঞ্চল-বিভাগ

আমাদের জেলাটিকে জমিদারি, ভাগচাষ, সাঁজা ও জঙ্গল (প্রধানত দিন মজুর) এই চারপ্রকার সমস্যার ভিত্তিতে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়, তবে সাঁজা ও জঙ্গল এলাকার সমস্যাগুলি বেশির ভাগ মেশামিশি হয়ে আছে।

জমিদারি অঞ্চল— কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর, পটাশপুর— এগরা থানা, তমলুকের— তমলুক, পাঁশকুড়া ও ময়না, ঘাটালের— ঘাটাল ও দাসপুর, সদর মহকুমার— সবং, পিংলা, ডেবরা, মেদিনীপুর, নারাণগড়, দাঁতন এছাড়া খড়্গপুর ও কেশিয়াড়ার পূর্বাংশ। ঝাড়গ্রাম মহকুমার— গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম থানা জমিদারি অঞ্চলে পড়ে।

ভাগচাষ অঞ্চল— কাঁথি মহকুমার— রামনগর, কাঁথি ও খেজুরী থানা এবং তমলুকের— নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা ও মহিষাদল— এই ৬টি থানাতে প্রধানত ভাগচাষ সমস্যা।

সাঁজা অঞ্চল— ঘাটালের— চন্দ্রকোনা থানা, সদরের— কেশপুর, গড়বেতা, কিছুটা শালবনী এবং খড়্গপুর ও কেশিয়াড়া থানার পশ্চিমাংশেও প্রধানত এই সাঁজা সমস্যা। এই অঞ্চলে জঙ্গল সমস্যাও যথেষ্ট আছে, দিন-মজুরের সংখ্যাও এই অঞ্চলে কম নয়।

জঙ্গল অঞ্চল— প্রধানত ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, শালবনী থানা, প্রধানত এই অঞ্চলে দিন-মজুরের সমস্যাই প্রবল।

১

জমিদারি অঞ্চল

সংগঠন— মোট ১৬টি থানার মধ্যে মাত্র ৭টি থানাতে কিছু কিছু সংগঠন আছে। কাঁথি ক ও খ থানার ২।১টি ইউনিয়নের ২।৩টি গ্রাম; সদর— ১, ২ ও ৩নং থানার ২, ৩ ও ১টি

ইউনিয়নের ৩|৪ খানা করে গ্রাম। ঘাঁটাল— গ থানার ৩টি ইউনিয়নের ৮|১০ খানি গ্রাম; তমলুক মহকুমার— তমলুকের ৭টি ইউনিয়নের ২৮ খানি এবং ঘ থানার ৩টি ইউনিয়নের ৯ খানি গ্রাম কৃষক সভার সংগঠন এলাকা। বর্তমানে কিছু কিছু নূতন গ্রামে সংগঠন ক্রমে প্রসারলাভ করেছে, তবে গত বছরের অনুপাতে কৃষকসভার সভ্যসংখ্যা দ্রুত বাড়ানর কাজ হচ্ছে না। এই অঞ্চলে ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষির সংখ্যা খুবই কম। প্রধানত গরীব ও মাঝারী কৃষক।

কৃষকদের অবস্থা— গত বছরের তুলনায় ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। প্রধানত নিম্নলিখিত জিনিসের গত বছরের তুলনায় দাম বেড়েছে— কাপড় (মিল কন্ট্রোল) ২||০—৫ স্থলে টাঃ ৭—৮||০ হয়েছে, কাপড় (তাঁত) টাঃ ৩ স্থলে ৫, ধানের দাম প্রতিমণ টাঃ ৮—১০ স্থলে ৯—১২। সরিষা তেল— প্রতি সের টাঃ ২ স্থলে ৩, ডাল— দশ আনার স্থলে তেরো আনা, মাছ— ২—৩||০, কেরোসিন তেল ||০—১||০ সের, চিনি ||০—১|০, তামাক ২—৩, সুপারী ২—২||০, এছাড়া মসল্লা ও কাঁচা তরকারীর দাম বেড়েছে প্রায় দ্বিগুন।

ট্যাক্স— চৌকীদারী ট্যাক্স বেড়েছে শতকরা ৩০ ভাগ। নূতন পূলবন্দী (৩ খানি এমব্যাঙ্কমেন্ট) ট্যাক্স ধার্য হয়েছে একরে ১টাঃ ১ আনা হিসাবে। জমিদারগণ খাজনা আদায়ের দিকে চেষ্টা না করে ব্যাপকভাবে নালিশ করে জমি খাস করছে।

ফসলের দাম— গত বছর ধানের দাম হয়েছিল— টাঃ ৮ থেকে ১০, বর্তমান বছরে ৯—১২। পাটের দাম— গত বছর ২৫—৩০, বর্তমান বছরে— ২৮—৩২।

ঋণ— গত বছরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বেড়েছে, জমি বিক্রির পরিমাণ ৫% বেড়েছে স্থানীয় জমিদার মহাজনরা কর্জাধান বা দেনা টাকা দেওয়া একেবারেই বন্ধ করেছে। সরকারি ঋণ বা লোন অফিসের (কো-অপারেটিভ ক্রেডিট) থেকে কর্জা নিচ্ছে বেশির ভাগ। কিন্তু সংগঠিত এলাকায় সরকারি ঋণ মকুবের আন্দোলন হওয়াতে ঐ সব অঞ্চলে আর কোন ঋণ দেওয়া হচ্ছে না। তমলুক মহকুমাতেই প্রধানত এইসব অসুবিধা দেখা যাচ্ছে।

আন্দোলন— তমলুক মহকুমার ক থানার ২ নং ইউনিয়নে— ১২ খানি, ১ নং ইউনিয়নে— ২ খানি এবং ৪নং ইউনিয়নে— ১খানি। খ থানার ১৭নং ইউনিয়নে— ৩ খানি, ১৩নং ইউঃ— ২ খানি এবং তমলুক থানার ১১নং ইউঃ— ২ খানি গ্রামে খাজনা বন্ধ আন্দোলন চলছে, এই এলাকা বর্তমানে কিছু কিছু প্রসার করার দিকে, কিন্তু গতি অত্যন্ত মন্থর। কোথাও কোথাও আবার খালকাটা বাঁধ বাধবার আন্দোলন এবং লোনের আন্দোলনও চলছে।

সংঘর্ষ— পাঁশকুড়া ১৭নং ইউঃ জমিদারি খাজনা বন্ধের ব্যাপারে গত ২ মাসের পূর্বে জমিদারের গুণ্ডা ও পুলিশদলকে গ্রামবাসীরা মিলিতভাবে প্রতিরোধ করেছে। গ্রামে ঢোকার পথ কেটে জলময় করে, কাঁটা ডাল পালা দিয়ে ব্যারিকেডের মত করে, তারপর এক এক মুখে দল বেঁধে বাধা অতিক্রম করে এলে সংঘর্ষের জন্যও প্রস্তুত হয়। শত্রুপক্ষ এভাবে প্রবেশে বাঁধা ও দলবেঁধে এক এক জায়গায় থাকতে দেখে সরে পড়তে বাধ্য হয়। পাঁশকুড়া ১৩নং-এ লোন আদায় বন্ধ করায় মাল ক্রোক করার জন্য পুলিশ সহ লোন অফিসার গ্রামে ঢুকলে স্থানীয় গ্রামবাসীদের একতার জোরে কোন লোকের নির্দিষ্ট বাড়ি খুঁজে পেতে পারে নাই, কেউই কাহারও বাড়ি দেখায় নাই। পুলিশের সামনে যায়ও নাই।

লোন আদায়কারীর দলকে কেউই থাকতে খেতে দেয় নাই। এমনকি স্থানীয় জমিদার

গোবর্দ্ধন প্রামানিকও (এম-এল-এ রজনী প্রামানিকের বড় ভাই) গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও লোন অফিসারকে বাড়িতে রাখতে সাহস করে নাই। এই লোন আদায়ে আসার ২ দিন আগে হইতে সমিতি থেকে সারা ইউনিয়নে শোভাযাত্রা করে লোন আদায় প্রতিরোধের জন্য গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করা হয় এবং যে লোন আদায়ে সরকারকে সাহায্য করবে তাকেই দেশের শত্রু বলে সকলে চিনে রাখবে— এইভাবে প্রচার চলে, ফলে লোন আদায়কারী সরকারী বাহিনীকে ফিরে যেতে হয়। এবং এ পর্যন্ত আর কোন সরকারি আক্রমণ ঐ ইউনিয়নের ও পাশের ১২ নং-এ আসে নাই। সংগ্রাম প্রস্তুতি হিসাবে ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন চলেছে;

খাজনা বন্ধ আন্দোলনের এলাকায় সকল কৃষক ও ক্ষেতমজুর (কমসংখ্যক) পর্যন্ত আন্দোলনের পিছনে এক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমতঃ হাজা শুকাতে খাজনা রেহাই ও খাল বাঁধ মেরামতের দাবিতে খাজনা বন্ধ করা হয়। বাকি বকেয়া রেহাই-এর দাবিও ছিল, যে যেখানে সংগঠন শক্ত অর্থাৎ আন্দোলনের উদ্দেশ্য জমিদারি উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে— এভাবে কৃষকদের চেতনা দেওয়া হয়েছে সেখানে আজও কৃষকেরা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে, কিন্তু কতকগুলি এলাকায় আন্দোলনের প্রথম চাপে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ায় আংশিক দাবি বাকি বকেয়া বা কিছু ছাড় বাদ, পেয়েই আপস করে ফেলে কিন্তু যেখানে জমিদার কোন আপস করতে এগিয়ে না এসে কেবল দমনের আশ্রয় নিয়েছে সেখানেই প্রতিরোধ-শক্তি কৃষকদেরও বেড়ে চলেছে।

লোন-আন্দোলন— দুর্ভিক্ষ বছরের লোন মুকুব চাই এই ভিত্তিতে লোনের আন্দোলন শুরু হয়। পরে সকলপ্রকার সরকারি ঋণই কৃষি সাহায্য হিসাবে গণ্য করে রেহাই চাই— এই ভিত্তিতে আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়। সরকারি দমনের সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে জোর করে লোন আদায় করতে গেলে সংগঠিত গ্রামবাসীর সাথে কোন ক্ষেত্রে কিছুটা সংঘর্ষ বাধে। ২টি লোন কেসে আমাদের ১৩|১৪ জন কৃষককর্মীকে জড়িত করে। উহাদের জরিমানা ও জেলের আদেশ হয়, কিন্তু আসামীরা আজও বাহিরে আছে অন্য একটি কেস ডিসমিস্ হয়ে যায়, সাক্ষী জেরাতে অসামঞ্জস্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এখন সংগঠিতভাবে মাল ক্রোক প্রতিরোধের জন্য ভলান্টিয়ার দল ও সাধারণ কৃষকদের লড়াই করতে হবে— এভাবে আন্দোলন চলেছে। সরকার হতে বারো আনা ট্যাক্সদাতাদের লোন সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে— এভাবে প্রথমত বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে ও সংগঠিত অঞ্চলে লোন মোটেই আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে না।

খাজনা বন্ধ— এলাকার সকল কৃষকই প্রথমত যোগদান করে, কিন্তু গরীব ও মাঝারি কৃষকরাই প্রধানত উৎসাহী, ধনী কৃষকরা সর্বত্রই এদের চাপে পড়েই আন্দোলনে রয়েছে, তবে এদের মধ্যে আপসের মনোভাবই প্রধান, কারণ পুলিশ ভীতি। যেখানে যেখানে আপস হয় প্রধানত এরাই আপসের দিকে ঝোক দিয়ে আগেই আপস করে খাজনা মিটিয়ে দিয়েছিল, এরাই বিভেদ সৃষ্টি করে। বর্তমানে তমলুক গঠরা অঞ্চল এবং পাঁশকুড়ার পূর্বচিল্কা কলাগেছিয়া অঞ্চলেই মাত্র ১৯৪০ সাল থেকে ঐ লড়াই চালিয়ে আসছে। অন্য সর্বত্রই আপস হয়ে যায়। এবছরে পুনরায় তমলুক ১১নং পুৎপুতিয়া ও পাঁশকুড়া ১৩ ও ১২ নং এর ৪|৫ খানি গ্রামে নূতন করে আবার খাজনা বন্ধের আন্দোলন শুরু হয়েছে। কারণ ঐ অঞ্চলে এবছরে পোকাতে (প্রথমটা জলের অভাবের জন্য) ধান নষ্ট হয়েছে। সুতরাং দাবি এই খাজনা মকুব এবং জল পাওয়ার জন্য নদীর বাঁধে স্লুইস গেট জমিদারকে করে দিতে হবে। ১৩ ও ১২ নং ইউঃ নদীর

বন্যা জল থেকে ফসল রক্ষার জন্য বড় বাঁধ চাই, নতুবা খাজনা নাই, এইভাবে শুরু করে ইংরাজ সরকার নেই সুতরাং জমিদারি উঠাতে হবে— জমির মালিকানা চাই এইদিকে পরিচালিত করার জন্য প্রচার চলেছে।

জমিদার ও পুলিশ— জমিদারগণ কোথাও আংশিক সুবিধা দিয়া ও কংগ্রেসীদের সাহায্যে পুলিশের ভয় দেখিয়ে আপস করাতে চেষ্টা করে। জমিদারদের খাজনা আদায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য কংগ্রেস নেতারা গ্রামে গ্রামে সভা করে জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। তাতেও ব্যর্থ হয়ে জমি সব খাস করে দখলে নেওয়ার জন্য বর্তমানে পুলিশ নিয়ে অভিযান শুরু হয়েছে।

কিন্তু সংগ্রামী এলাকার কৃষকরা আজও মাথা নত করে নাই বরং প্রতিরোধ করার মনোভাব বাড়ছে। ধনী কৃষকদের দিক থেকে আপসের চেষ্টাও রয়েছে, তবে এখন গ্রামবাসীদের উপর এদের প্রভাব ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

পার্টি ইউনিট সমালোচনা— গ-অঞ্চলের আন্দোলনের চালকদের মধ্যে আইনানুগ ধারায় অত্যাচার প্রতিরোধের মনোভাব থাকার জন্য তারা এক মামলা করে প্রায় ১২|১৩ শত টাকা খরচ করেছে, অথচ তার ফল কিছুই হয় নাই। আর ঐ অঞ্চলে সমবায় প্রথায় ইট ও টালীর কারখানা খোলা এবং ক্রেতা সমবায় সমিতি গঠন ইত্যাদি কয়েকটি ব্যাপারেও গঠনমূলক কর্মপন্থার দিকেই ঝোঁক অত্যন্ত বেশি। সমালোচনা করে এই অবস্থা কাটানর জন্য বর্তমানে মামলার ব্যর্থতা ও টালী কারখানার জন্য কয়লার পারমিট পেতে অসুবিধা ইত্যাদির বিষয় উল্লেখ করে কর্মী ও জনসাধারণকে সংগ্রাম ছাড়া মুক্তির পথ নেই বোঝানর ব্যবস্থা চলেছে এবং যে যে ধনী চাষিদের দিক থেকে আপসের মনোভাব দেখা যাচ্ছে তাদের সমালোচনা করে মুখোশ খোলার জন্য বৈঠকী সভা চলেছে।

পার্টি সমালোচনা গঠরা এলাকার আন্দোলনে অর্থনীতিবাদকে আক্রমণ করা হয়। আন্দোলনের জন্য কেসগুলিতে ব্যক্তিগতভাবে টাকা খরচা করতে বাধ্য হওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগতভাবে খরচ করার জন্য সমালোচনা হয়।

লোন কেস (পুৎপুতিয়া তমলুক ১১নং) অসংগঠিত ভাবে চালনা এবং কেসে কোন কোন পার্টি কর্মীর জরিমানা আদায় দিয়ে দেওয়া নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। আন্দোলন প্রসার করা কাজে কর্মীদের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা হয়েছে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামগুলিকে চালনা করার ব্যাপারে দোষত্রুটিরও সমালোচনা করা হয়।

২

ভাগচাষ অঞ্চল

তমলুক মহকুমার মহিষাদল সুতাহাটা নন্দীগ্রাম, কাঁথির খেজুরী কাঁথি, রামনগর ও ভগবানপুর থানার পূর্ব-দক্ষিণ অংশ।

সংগঠন— ম-থানার ১টি ইউঃ ৩টি গ্রাম, ন-থানার ২টি ইউঃ ২|৩ খানি গ্রাম, ভ-থানার— ৭টি ইউনিয়নের ৫নং ২টি, ৬নং ৩টি, ৭নং ৪|৫টি, ৮নং ১টি, ১২নং ২টি (বিচ্ছিন্ন) ১৩নং ১টি ১৫নং ১টিতে কৃষক সমিতি আছে। খ— ২টি ইউঃ ৩টি গ্রাম, ক ১টি ইউঃ ৪|৫টি গ্রাম (নূতন সংগঠনে আসছে) ভ— ১টি ইউঃ ৪|৫টি গ্রাম নূতন সংগঠনে

এসেছে। এর পাশাপাশি অঞ্চলে কেবল প্রচার আছে।

জীবনধারণের মান— কাপড়, কেরোসিন, চিনি, সুপারি, তামাক, ডাল, মসল্লা ইত্যাদি গত বছরের তুলনায় ২০-২৫% বেড়েছে। চৌকিদারী ট্যাক্স বেড়েছে প্রায় ৩০%।

ফসলের দাম বেড়েছে— ১৬%। ধানের দাম গত বছর ছিল ৬-৭||০, বর্তমান বছরে ৭-৮||০; পাটের দাম গত বছর ছিল ২৫-৩০, বর্তমান বছরে ২৮-৩২।

ঋণ বেড়েছে শতকরা ৫%, জমি হস্তান্তরের পরিমাণ ২-৩% এর বেশি নয়। কারণ— সংসার খরচ বেড়েছে। সরকারি ও মহাজনী ঋণ শোধের চাপে জমি হাত ছাড়া হচ্ছে। বর্তমানে কি সরকারি, কি মহাজনী কোন ঋণই কৃষকরা পেতে পারছে না।

নূতন ঋণের অসুবিধা— দুর্ভিক্ষ বছরের ঋণমুকুব আন্দোলনের প্রচারে সরকারি ঋণ দেওয়া প্রায় বন্ধ। ধানের দাম বাড়ায় ও চোরাকারবারী লাভের জন্য জোতদার মহাজনরা আর ধান কর্জা দিতে চাচ্ছে না। জমি বিক্রি ছাড়া ধান পাওয়া গরীবদের সম্ভব না, তাছাড়া— বাকী বকেয়া রেহাই ও আগামী ফসলে আন্দোলনের ভয়েও মালিকরা কর্জা দাদন একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে।

আন্দোলন— দিন-মজুরদের নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ততা অসংগঠিতভাবে মজুরি বাড়ানর প্রচার করার ফলে গত বছরের তুলনায় ১ টাকার স্থলে ১||০ কোথাও ২ পর্যন্ত হয়েছিল। বর্তমানে সাধারণভাবে ১ টাকা ও একবেলা খোরাক চলেছে। কৃষক সমিতি থেকে মৌখিক সমর্থন ছাড়া আন্দোলনকে কোন সংগঠিত রূপ দেওয়া হয় নাই। বর্তমানে নন্দীগ্রাম থানার ১২ নং ইউনিয়নে একটি কমিটি হয়েছে। অন্যান্য ইউনিয়নেও ক্ষেতমজুর কমিটি গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। দিন মজুরের সংখ্যা প্রায় শতকরা ১৫ জন (প্রধানত মজুরির উপর নির্ভর)।

ভাগচাষি— ভাগচাষিদের সংখ্যা শতকরা ৬০ জনের কম নয়। গত বছরে আপসে তেভাগা আদায়ের নীতি থাকায় ২টি এলাকায় নন্দীগ্রাম ৫নং ও ৬নং ইউঃ কোট খামার করে চাষের খরচা বাড়ার জন্য অর্ধেকের বেশি দাবি করে। অন্যত্র মহাজনের খামার মাড়ান বন্ধ রেখে দাবির জন্য আন্দোলন চলে। আশা ছিল ভাগচাষ কন্ট্রোল বোর্ডের রায় অন্তত ভাগচাষিদের স্বার্থ কিছুটা অন্তত দেখবেই। কিন্তু ঐ রায় সম্পূর্ণ জোতদারদের পক্ষে যাওয়াতে চাষিরা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল; কিন্তু জোর করে ফসলের বেশির ভাগ নেওয়ার সংগঠন শক্তি ছিল না এবং সমিতির নির্দেশও দেওয়া হয় নাই। কেবল মাড়ান বন্ধ রেখে কিছুটা চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কন্ট্রোল বোর্ডের রায় বাহির হওয়ার পূর্বে যে যে ক্ষেত্রে আপস (প্রধানত ছোট জোতদার ৪০-৫০ বিঘা মালিকদের সাথে) হয়েছে, সেখানে চাষিরা খরচা বাবদ কোথাও বীজধান বা মালিকের খড়ের অংশ ছেড়ে দিয়ে আপস হয়েছিল। কিন্তু কন্ট্রোল বোর্ডের রায় বের হওয়ার পর কোন মালিকই কিছুই ছাড়তে রাজী হল না। কৃষকদের ক্রমে অভাব দেখা দিল। জোতদাররা পুলিশের সাহায্যে জোর করে ধান মাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা পেল এবং পার্টি বে-আইনি হওয়ায় দমননীতির আক্রমণও ব্যাপকভাবে দেখা দিল। ফলে প্রায় সর্বত্রই চাষিরা আধাভাগেই ধান মাড়াতে বাধ্য হয়। কোট খামারে পুলিশ মোতায়েন সংগ্রামী কৃষকদেরও এগুনোর পথে বাধা হল। এর ফলে জোতদারদের মনোবল বেড়ে গেল এবং চাষের পূর্বে ব্যাপকভাবে জমি উচ্ছেদ করার মতলব নিল। কিন্তু এলাকার চাষিদের তাড়িয়ে বাহিরের

চাষিদের জমি দিতে কোন জোতদারই সাহস করে নাই। যা কিছু হস্তান্তর করেছে এলাকায় কৃষকদেরই মধ্যে।

সংগ্রাম— কোট খামার হয় ৫নং ইউঃ ২খানি, ৬নং উইঃ ৪ খানি গ্রামে। তাছাড়া অন্যান্য সংগঠিত ও অসংগঠিত গ্রামে মাড়ান বন্ধ রেখেছিল, দাবি— তেভাগা, জমি উচ্ছেদ চলবে না। ৫নং কোট খামারের আন্দোলন— ১জন মালিকের বিরুদ্ধে প্রায় ৬০টা পরিবার লড়াই করে। ৩ মাস ধানের গাদা মাড়ান বন্ধ রাখে। এস-ডি-ও এবং এম-এল-এ-কে চাষের অতিরিক্ত খরচার হিসাব দিয়ে তেভাগার দাবির ভিত্তিতে ধান মাড়ান ও ভাগ করে দেওয়ার জন্য জানান হয়। তারা কিছুই করে না। তখন /৫ সের বীজধান অতিরিক্ত পেয়ে মীমাংসা করে নেয়। ৬নং এর ৪ খানি গ্রামের প্রায় ২৫০ পরিবার কোট খামার করে। এস-ডি-ও ও ভাগচাষ কন্ট্রোল বোর্ডের নিকট চাষের অতিরিক্ত খরচার হিসাব দেখিয়ে দরখাস্ত করা হয়। উহারা কিছুই করে না। ৫ মাস পর্যন্ত ধানের গাদা মাড়ান বন্ধ থাকে। বর্ষা নামাতে মাঠে জল জমে যাওয়ায় কৃষকেরা খামারের গাদা উঁচু জায়গায় পাল্টাতে থাকে। জোতদারগণ (ছোট বড় করে সংখ্যায় ৮ জন) ধান লুঠপাট হয়ে গেছে বলে দরখাস্ত করাতে তদন্ত হয় এবং সার্কেল অফিসার চাষিদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে তদন্তের মধ্য দিয়ে মীমাংসার জন্য জোতদারদের বলে কিন্তু আধা ভাগের বেশিতে জোতদাররা কেউই রাজি হয় না। তদন্তের রিপোর্টে উহাদের লুঠপাটের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে খামারের পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করে। ইতিমধ্যে পার্টি বে-আইনি হওয়ায় কর্মীদের ধরপাকড় শুরু হয়। ফলে কৃষকরা আপাতত আধাভাগের দাবিতে পুলিশ মোতায়েনে ধান ভাগ করে নেয়।

আন্দোলনের বেশ হয়রাণী ও কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করতে হওয়ায় মাঝারি ও বড় বড় ভাগচাষিদের মনে হতাশা দেখা দেয়। কিন্তু গরীব ভাগচাষিদের মধ্যে সংগ্রামের মনোভাব ঠিকই থাকে। তারা অভিজ্ঞতা থেকে বোঝে যে নিজেদের সংগঠন শক্তির জোরেই দাবি আদায় করতে হবে। যে যে গ্রামে আপসের মধ্য দিয়ে কিছুটা বেশি আদায় করে সেখানে উৎসাহ আরও বাড়তে দেখা যায়।

জমি দখল— এরপর এল জোতদারদের থেকে জমি উচ্ছেদের পালা। চাষের মুখেই চাষিদের বণ্ডে বা বীট খাতাতে (জমি বন্দোবস্ত দিবার হিসাব খাতায়) সহি দিলে তবেই জমি পাবে, নচেৎ নয়। ঐসব বণ্ডে আধা ভাগ দিবার শর্ত লিখিত ছিল। সংগঠিত এলাকার ৭নং ও ৬নং ইউঃ এর ২ খানি গ্রাম ছাড়া কোন স্থানেই কৃষকরা বণ্ডে বা বীট খাতাতে সহি দিয়ে জমি চাষ করে নাই। সকল গ্রামবাসী মিলে পুরান জমিতেই চাষের অধিকার কায়েম রেখেছে অথবা জোতদার জমি ছাড়াতে সাহস করে নাই এইভাবে চাষ হয়েছে। কিন্তু ৭নং ইউঃ ১নং গ্রামের কৃষকদের মধ্যে মালিকরা বিভেদ সৃষ্টি করতে সুযোগ পায়। এবং ৬নং ইউঃ-এতেও ঐভাবে বিভেদ সৃষ্টি করে। বিভেদের কারণ বড় বড় ভাগচাষিদের সংগ্রাম বিমুখতা এবং স্বার্থপরতা। এরা এভাবে সংগ্রাম করে ঝামেলা পোয়াতে রাজি নয়, বরং আপসে জমিচাষ করে গোপনে অর্থাৎ চুরি করে অর্ধেকের বেশি নেওয়ার সুযোগ পেতে চায়। আর নিজেরা বেশি বেশি জমি চাষের এবং গরীব চাষিদের কম জমি দিয়ে মাতব্বরী করতে চেয়েছিল। ফলে গরীব চাষি ও বড় বড় ভাগচাষিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। কেন্দেমারীতে ঐসব বড় চাষিরা মালিকের সাথে মিশে গিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বজায় রাখতে চেষ্টা করে। ৬নং-এ এরাই কৃষক

সমিতির মাতব্বরী নিয়ে গরীব চাষিদের চেপে রাখতে চেষ্টা করে। ফলে কেন্দেমারীতে আজও গরীব চাষিদের একাংশ জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েও সমিতিকে ছাড়ছে না এবং ৬নং মনুচকে ঐসব মাতব্বর বড় চাষিদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে মালিকের সাথে আপস করে জমি বিলির জন্য মালিকের কাছে আত্মসমর্পন করে। উভয় স্থানেই মালিকের নির্দেশে জমি বন্টন হয়। এভাবে ঐ ৩টি গ্রামে জমি হস্তান্তর হয়েছে। যারা সমিতির প্রতি অনুগত আছে ৬নং-এ অপেক্ষাকৃত বড় বড় চাষি সংখ্যায় ১০|১২ ঘর এবং ৭নং-এ গরীব চাষি প্রায় ২৮|৩০টি পরিবার জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। তবুও তারা কৃষক সমিতির মধ্যে আজও আছে। এ ছাড়া অন্যত্র জমি ছাড়াতে পারে নি।

জমিদার পুলিশের কৌশল— জমিদার-জোতদাররা কন্ট্রোল বোর্ডের রায় ও দমননীতির ভয় দেখিয়ে প্রথমত দুর্বলচিত্ত কৃষকদের দালাল লাগিয়ে আপসের পক্ষে টানে; তাদের দিয়েই অন্য চাষিদের মনোবল নষ্ট করতে চেষ্টা করে। এভাবে বিভেদ সৃষ্টি করে সংগঠনকে নষ্ট করার কৌশল নেয়। তাছাড়া মিথ্যা মামলা করে অনেক কৃষককে আর্থিক কষ্টে এবং বেশ হয়রানীতে ফেলে। প্রত্যেকটা কেসে জঙ্গী কর্মীদের কমিউনিস্ট পার্টি বলে, কেসকে সাজাতে থাকে।

পুলিশ— এস-ডি-ও ভাগচাষ কন্ট্রোল বোর্ডের রায়কেই কার্যকরী করার অজুহাতে পুলিশ দিয়ে জোতদার-জমিদারদের সাহায্য করে। কোর্টে যে সব মিথ্যা কেস চাষিদের নামে মালিকরা দায়ের করে অকারণে সেগুলিকে দীর্ঘদিন চালু রাখে এবং ঘন ঘন দিন ফেলে চাষিদের হয়রাণী করতে থাকে। মামলার সময় বিচারক সোজাসুজি মালিকদের পক্ষ টেনে কথা বলে। পুলিশের দারোগা থেকে এস-ডি-ও পর্যন্ত কমিউনিস্টরা তোমাদের বিপদে ফেলতে চাচ্ছে। গরীব দুঃখী মিছে ঝামেলাতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ো না। আইনানুগভাবে লড়। মারামারি জবরদস্তি করতে গেহল আমাদের আইন রক্ষা করতে হবে— এই ছিল প্রচারের কৌশল। আর সর্বত্রই কার্যত মালিকের পক্ষ নিয়ে জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করার জন্য মাঠে নেমে চাষিকে জোর করে তুলে দিতে থাকে। আর ধমক দিতে থাকে যে কোন গণ্ডগোল করলেই কমিউনিস্ট বলে সবাইকে জেলে আটকান হবে। কৃষকদের মধ্যেও জেলের ভয় বেড়েছিল পার্টিকে বে-আইনি ও ধরপাকড় দেখে।

প্রতিরোধ— যেখানে সংগঠন জোরাল ও স্থানীয় নেতৃত্ব সবল ছিল তারা পুলিশ আসার আগেই নিজেদের জমিতে দখল চাষ দিয়ে চলে যায়। আবার পুলিশ ফিরে যাওয়ার পর একসাথে দল বেঁধে বীজধানের চারা পুতে সরে পড়ে, এভাবেও দখল কায়েম কোথাও কোথাও করেছে। এছাড়া অনেক অঞ্চলে পুলিশ জুলুমের পূর্বেই কাজ শেষ করে ফেলে।

তবে ৭নং ইউনিয়ানে কমরেড নেমিজ জেলে আটক হওয়ায় তার জমি অন্য চাষিদের (দালাল ও এক জন ছোট জোতদারকে) বন্দোবস্ত দেওয়ায় স্থানীয় কৃষকরা (হিন্দু-মুসলমান) সকলে মিলেএক দিন ৬০|৭০ খানা লাঙ্গল একসাথে নিয়ে এ জমির উপর গিয়ে পড়ে এবং দালাল চাষি ও জোতদারের গুণ্ডাদের জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সব জমি চাষ করে দেয়। ঐখানে প্রায় ২৫০ জনের মত কৃষক জমায়েত হয়েছিল। স্লোগান দিয়ে লাঠি নিয়ে হাজির হতে দেখে দালালরা পালায় এবং থানাতে খবর দেয়। পুলিশ সে দিন ঐখানে আসতে অস্বীকার করে। মনে হয় কিছু মোটামুটি ঘুষের দাবি করে কিন্তু মালিক তাতে রাজি না হওয়ায় এড়িয়ে যায় এবং কৃষকদের জমায়েতের খবরাদি নিয়েও পুলিশ ততটা ভরসা পায় না।

পরে আর একটি মুসলমান চাষির বেলায় ঐরূপ (এর চেয়ে সংখ্যায় কম লোক) জমায়েত হতে দেখে মালিক আর এগুতে সাহস করে নাই। এ ভাবে সংগ্রামী মহড়া দেখে মালিক ও পুলিশ ৩।৪টি ক্ষেত্রে পেছিয়ে গেছে। কৃষকরা চাষ করেছে।

লোন— এছাড়া এই অঞ্চলে সূতাহাটা ১১নং নন্দীগ্রাম ৫, ৬, ৭নং ও ১২নং ইউনিয়নে লোন আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। গ্রামে পুলিশ সহ লোন অফিসার ঢুকলে ১২নং ইউনিয়নের গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়ে বলে বর্তমানে খেতে পাচ্ছি না, লোন দেব কি করে। দুর্ভিক্ষের বছরে সরকার থেকে লোন দিয়েছিল মানুষ বাঁচানোর নাম করে। তার আঘাত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। অবস্থা ভালো হোক তখন লোন শোধ দেব সুদে আসলে। তাছাড়া কংগ্রেস নেতারাই তো লোন শোধ দিতে বাধা দিয়েছিল। আজ গদি নিয়ে তাদের মন পাল্টে গেল? আমরা দিতে পারব না। যদি গরু-বাছুর টান, মাল নিয়ে যেতে চাও তো আমরা শুয়ে পড়ে বাধা দেবো। গুলি করে মার তাও ভাল। এভাবে প্রতিরোধের সংকল্প দেখে সে দিন লোন অফিসার বলে আসে— গ্রামে বসে যুক্তি করে একটা ঠিক কর, লোন দিতেই হবে। তবে বারো আনা পর্যন্ত ট্যাক্স যাদের তাদের এখন না দিলেও চলবে।

সংঘর্ষ— এভাবে সূতাহাটা ১১নং এর প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই লোন আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে। নন্দীগ্রাম ৬নং ইউনিয়নের একটি গ্রামে ক্রোকের মাল কেড়ে নিয়ে লোন অফিসারকে তাড়ান হয়েছে। কৃষকদের এভাবে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরোধ করতে দেখে বর্তমানে সরকাব হতে আদায় স্থগিত রেখেছে। তবে ধান উঠলে পুনরায় লোনের তাড়া শুরু হবে।

ইতিহাস— এই আন্দোলন গত '৪৬ সাল থেকেই শুরু হয়েছে। প্রথমত দাবি ছিল দুর্ভিক্ষের কালীন লোন মকুব চাই, পরে '৪৬ সালে তেভাগার সাথে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সংঘর্ষ, মাল কাড়াকাড়ি এবং দোষীকে পুলিশের হাত হতে কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি করাতে আদায় স্থগিত থাকে। কংগ্রেসীরা তখন ঐ লোন আদায়েরও বিরোধিতা করে। পরে কংগ্রেসী সরকার হওয়াতে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল লোন দিতে হবে না। কিন্তু ব্রিটিশ রাজের আমলের লোন এভাবে আদায় করতে দেখে প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রায় সকল সাধারণ মানুষ (কৃষক বজুর মধ্যবিত্তই) এর সমর্থন করে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটাই প্রধান, বর্তমানে সংগঠনের ধারা নিয়ে সক্রিয় প্রতিরোধের চেষ্টা চলছে।

পুলিশ কংগ্রেস ও জোতদার— শিশুরাষ্ট্র প্রথমে, পরে বারো আনা ট্যাক্স দাতাদের ছাড় দেওয়া হবে বলে বিভেদ নীতি, তাতেও অক্ষম হয়ে এখন দমননীতির আশ্রয় নিয়েছে।

চোরাবাজারের বিরুদ্ধে ও ধানের জন্য আন্দোলন— এই অঞ্চলে গরীব চাষির কর্জা ধান পাচ্ছে না, ধানের দাম বাড়াতে জোতদার, মহাজন সব ধান বিক্রি, প্রধানত চোরাবাজারে চালান দিয়ে মোটা টাকা লুটছে। এর বিরুদ্ধে চাষিরা আজ জমিদারের ধান ঘেরাও করে রেখে চোরাবাজারে গোপনে বিক্রির নৌকা আটকে কন্ট্রোল দামে ধান তুলে বিলি করছে কারণ এছাড়া চাষিদের আজ বাঁচার কোনও উপায় নাই। সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কংগ্রেসী এম-এল এর নিকট জানান হয়েছে কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হয় নাই।

তাই দাবি— চোরাকারবারীদের নৌকা আটক করে ধান তোল, জোতদারদের ধান চালানী বন্ধ কর, কর্জা চাই, কন্ট্রোল দামে ধান চাই।

নন্দীগ্রাম, ৫নং ইউনিয়নের রামচক গ্রামে চোরা বাজারের ধানের নৌকা আটক করে। ১৫০ মণ ধান বিনা দামে কৃষকদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বিলি করা হয়। ঐ থানার ১২নং ইউঃ-এ টাকাপুরা গ্রামে চালের নৌকা আটক করে ১০ টাকা মণ দামে প্রায় ৫০ মণ চাউল কৃষকরা সঙ্গে সঙ্গে কিনে নেয়। ১৩নং ইউঃ তেখালিবাজারে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চালের নৌকা আটক করে। স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা অনুরোধ জানায় যে ১২৷৷০ টাকা মণ দরে চাল দিলে নিয়ে রেহাই দাও। কিন্তু জনসাধারণ ঐ নেতার কথায় কর্ণপাত না করে ১০্ মণ দামে প্রায় ১০ মন চাল উঠিয়ে নেয়। এভাবে বর্তমানে কৃষকদের মধ্যে ধানের জন্য লড়াই-এর মনোভাব ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে। কর্মীদের উৎসাহও সক্রিয়ভাবে জেগেছে।

পুলিশ ও শত্রু— কিন্তু এ অবস্থা দেখে জমিদার-জোতদাররা আতঙ্কিত হচ্ছে। তারা পুলিশের সাহায্যে কর্মীদের গ্রেপ্তার করানর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ৫নং কেসকে একটি মিথ্যা করে সাজিয়ে স্থানীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করেছে। ১২নং ও ১৩নং-এ এখনও কোন কেসের খবর পাওয়া যায় নাই। বাজার বন্ধে পুলিশ টহল বাড়ছে। কংগ্রেসী জোতদার ও পুলিশের প্রচার— কমিউনিস্টরা জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে। ওদের পাল্লায় পড়ে বেআইনি কাজ করলে উচিত সাজা পেতে হবে। কংগ্রেসীরা বলছে বর্তমান সরকার যাতে জনসাধারণের জন্য কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী জমিদারি উচ্ছেদ দেশের অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে না পারে তাই কমিউনিস্টরা চারিদিকে অরাজকতা লুঠতরাজ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করে জনসাধারণের উপর দমননীতি টেনে আনছে। সুতরাং ওদের কথায় ক্ষেপিও না, সাবধান ভাইসব।

স্থানীয় পার্টির সমালোচনা— প্রথমত ধান মাড়ান ও ভাগের ব্যাপারে কোন কেন্দ্রীয় পলিসি ছিল না। ফলে যে যার স্থানীয়ভাবে খেয়াল খুশীমত আপস বা সংগ্রাম করেছে। তাইতে আসলে সংগঠনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। অতঃপর কেন্দ্রীয় পলিসি চাই।

৬নং-এ স্থানীয় নেতা বঙ্কিম গিরির আপস-মুখী মনোভাব কৃষকদের সংগ্রামী মনোভাবকে নষ্ট করেছে। বঙ্কিমবাবুর গ্রেপ্তারের সময় জঙ্গী কর্মীরা ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু স্থানীয় নেতারা থামিয়ে রাখে। এটা কৃষকদের জঙ্গী মনোবলকে নষ্ট করেছে। ৬নং এর জমির উপর দখল রেখে চাষ-কর আন্দোলন নষ্ট হওয়ার মূলে স্থানীয় কর্মীদের সঠিকভাবে পরিচালনা করার কাজে স্থানীয় নেতাদের দোদুল্যমান মনোভাব; ঐখানের নেতা চিত্ত গিরি (ডি-সি-এম) এর এলাকার বাহিরে গিয়া আত্মগোপনের ফলে কংগ্রেস নেতা অজয় মুখার্জীর মিটিংএ জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং ইউঃ কৃষক সমিতির নেতা বড় বড় চাষিদের বিরুদ্ধে গরীব চাষিদের উত্তেজিত করে ভাঙন ধরায়।

লোন আদায়ের বিরুদ্ধে অসংগঠিতভাবে আন্দোলন চলেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কোন স্থানের প্রতিরোধ অধিক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। সংগঠিত ভাবে সংগ্রামের জন্য ভলান্টিয়ার বাহিনী চাই।

ধানের জন্য লড়াইটিও প্রচারমূলক হয়েছে। সংগঠন মূলক হয় নাই, তাই কেবল ২টি স্থানে কর্মীদের চেষ্টায় চোরা বাজার প্রতিরোধ চলছে। জোতদারের গোলা কোথাও ঘেরাও করে ধান নেওয়ার সংগঠন গড়ে উঠছে না।

এবারে তেভাগার সংগ্রামের ক্ষেত্র এখনও বিস্তৃতিলাভ করছে না। দ্রুত বাড়ান চাই।

৩
সাঁজা অঞ্চল

কেশপুর, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা, শালবনী এবং সদর ও খড়্গপুরের কিছু অংশ।

সংগঠন— চ— ৮নং—৪|৫ খানি গ্রাম, ক—৩নং— ৩|৪ খানি, ৪নং— ৬|৭ খানা, ৫নং— ২|৩ খানি, গ—২৪নং ইউঃ ২|৩ খানি, ২২নং— ২|৩ খানি। এছাড়া এই অঞ্চলের চারিদিকে বর্তমান বছরে ব্যাপক প্রচার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একটি বিশেষ আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। যাতে সব গরীব কৃষক সাঁজা চাষিরাই নিজেদের সমিতির লোক বলে মনে করে অথচ সমিতির মধ্যে তারা সংগঠিত নয়। এটার একটা বাহু শালবনী ও মেদিনীপুর সদর থানার ১নং ইউনিয়ন পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে।

অবস্থা— এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যা অতিরিক্ত সাঁজার হার (সাঁজার অর্থাৎ ধানিখাজনা)। ক্ষেতমজুরদের সংখ্যাও কম নয়। সাঁজাচাষি প্রায় ৬০ ভাগ, ক্ষেতমজুর প্রায় ২০ ভাগ বাকি মধ্যবিত্ত পত্তনিদার জমিদার ইত্যাদি যারা জমিকে সাঁজা বিলি দিয়া থাকে, ফলে প্রায় প্রতিটি গ্রামে ২ভাগে বিভক্ত মধ্যবিত্ত ও জমিদার এবং সাঁজাচাষি গরিব কৃষক-মজুর; দাবি— সাঁজাপ্রথা ধ্বংস, জমির উপর অধিকার।

আন্দোলন— গত তেভাগা আন্দোলনের সময়ে এই অঞ্চলের আন্দোলন ছিল সাঁজার পরিবর্তে হারা হারি খাজনা ব্যবস্থা চাই। আন্দোলনে সাধারণভাবে সকল চাষিই যোগ দিয়েছিল দমননীতির আক্রমণে এই অঞ্চলের চাষিদের পিছু হটাতে পারেনি। মালিকরা আপসে কিছু ছাড় বেছাড় দিয়ে মীমাংসা করে। গত সালে সাঁজা ধানের পরিমাণ কমানর জন্য ধান আটকের আওয়াজ উঠে, ভাগচাষ কন্ট্রোল বোর্ড টালবাহানা করে, মালিকগণ একজোট হয়ে সাঁজা না কমান এবং অনাপোষ চ্যালেঞ্জ নিয়ে দমননীতি চালানর জন্য বহুবিধ কেস করে এবং জমি থেকে উচ্ছেদ করতে লাগে। কৃষকরা ধান আদায় না দিয়ে সংগ্রামের পথে জমিতে অধিকার রাখার লড়াই-এর প্রথম মহড়া দেয় মধ্যবিত্ত ও জমিদারদের বয়কট করে। বয়কট আন্দোলনের সাথে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যেখান থেকে মালিকরা মজুর এনে কাজ করাতে চেষ্টা করে সেখানেই গিয়ে মিটিং এবং আন্দোলনের মধ্যে সেই গ্রামকে টেনে নেওয়া— আর যারাই কাজ করতে আসবে তাদের নিকট গিয়ে সমিতির বিরোধিতা না করার জন্য আবেদনে প্রচুর ফল ফলতে থাকে। যারা একেবারে দালাল সেজে কোনমতেই মালিকদের বাড়ি ছাড়তে রাজি হয় না তাদের সন্ধ্যার অন্ধকারে উচিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। ফলে জোতদাররা আর ঘরবাড়ি মেরামত পর্যন্ত করতে পারে না। চাল তৈরি, জ্বালানীর ব্যবস্থা গোয়াল গরুর কাজ সবই বন্ধ হতে থাকে। এই অবস্থায় আসে পার্টির উপর দমননীতি— পুলিশের হামলা ব্যাপকভাবে শুরু হয়, কর্মীদের খোঁজ চলে বাড়ি বাড়ি। জমিদার পত্তনিদারদের রাম রাজত্ব ফিরে আসে। তালিকা করে দলে দলে কৃষকদের কমিউনিস্ট বলে জেলা কর্তৃপক্ষকে জানাতে থাকে। কিন্তু সরকারি দফতর হতে এত লোককে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা যাবে না জানিয়ে ১০৭ ধারা বা অন্যান্য মামলা চালাতে উপদেশ দেয়। ফলে ব্যাপক কেস দায়ের ও ওয়ারেন্ট বাহির হতে থাকে।

বীজ বোনার সময় এলো, অথচ চাষিরা মাঠে লাঙ্গল চষতে পারে না পুলিশের তাড়া ও

স্থানীয় নেতারা বসে ঠিক করেন যে মামলায় কোর্টে হাজির হয়ে জামিন হয়ে এসে চাষে লাগতে হবে তা না হলে চাষ করা যাবে না। চাষ না হলে কৃষকের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। ফলে মামলা পূর্ব হতে যেগুলি চলেছিল তাদের সাথে নূতন নূতন লোক জড়িয়ে কেসগুলি সাজানর জন্য কোর্টেই তাঁদের প্রথম গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে এবং তারা জামিনে বেরিয়ে আসতে দেখে অন্য কৃষকদের মধ্যে জামিন হওয়ার মনোভাব প্রবল হয়। এইভাবে মিথ্যা করে কেসের পর কেস চাপিয়ে ওই এলাকায় আন্দোলনকে কোর্টমুখী করে ফেলছে।

২|৪টি কেস ছাড়া জমিদারগণ কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করতে পারে নাই। তবে কেসের ঝামেলায় মাঝারি কৃষকদের মনোবল কিছুটা দমে গিয়েছে। কিন্তু গরীব কৃষকরা কোনমতে দমে নাই। বয়কট আন্দোলনকে সফল করতে গিয়ে এই আন্দোলনের সাথে ক্ষেতমজুর বা দীনমজুরদের যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। ক্ষেতমজুরদের মজুরির আন্দোলনে এপর্যন্ত কৃষক সভা উদাসীনই ছিল ফলে তাদেরও এই সংগ্রামে কোন উৎসাহ বোধ ছিল না। ক্রমশ সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। ক্ষেতমজুরদের পৃথক সংগঠনের আন্দোলন চলেছে।

জমিদার ও পুলিশ— মারপিট ও জীবন বিপন্ন বলে জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট জমিদার ও মধ্যবিত্ত মালিকরা একজোটে দরখাস্ত করায় ঐ অঞ্চল ২টি স্থানে পুলিশ ফাঁড়ি বসিয়াছে। যুবক ছেলেদের মিথ্যা অজুহাতে গ্রেপ্তার করে। জেলে পুরার ভয় দেখায়। ওয়ারেন্ট-আসামীকে খোঁজার নামে গ্রামে গ্রামে টহল দিয়ে প্রথমত আতংক সৃষ্টি করার চেষ্টা পায়। তাতে কোন ফল না হওয়ায় মিথ্যা বহু কেস দায়ের করছে। জমির উপর পুলিশের সাহায্যে দখল দিয়ে কোন কোন জমিতে চাষ করেছে। আর কংগ্রেস জোতদার ও পুলিশ প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে কমিউনিস্টদের উস্কানিতে যদি কোন গোলযোগের সৃষ্টি কর তবে গ্রামসুদ্ধ লোককে জেলে পোরা হবে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবো। কংগ্রেস থেকে আবার পাল্টা কৃষক সমিতি গড়ার চেষ্টা হচ্ছে। শীঘ্রই একটি সম্মেলন করা হবে। দোদুল্যমান কৃষকদের পক্ষে টেনে নিয়ে কিছু সুবিধা দিয়ে দালাল সৃষ্টি করা হচ্ছে, তাদের দিয়েই এই কংগ্রেস কৃষক সমিতির পক্ষে প্রচার করানোর ও অন্য কৃষকদের টানার চেষ্টা চলেছে।

জঙ্গী মনোভাব— কিন্তু কৃষকদের মনোবল এতে না ভেঙ্গে ববং আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তারা স্থানীয় প্রকাশ্য নেতা ডাঃ যোড়শী চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করিলে, খবর শুনেই পুলিশের হাত থেকে তাকে কেড়ে নেওয়ার জন্য স্থানীয় ও পাশাপাশি গ্রাম থেকে প্রায় ৫|৬ শত কৃষক লাঠি নিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়ে এসে জমা হয়। কিন্তু স্থানীয় নেতারা এই প্রকার কাজকে পুলিশের উস্কানীর ফাঁদে পা দেওয়া হবে ভেবে তাঁদের বুঝিয়ে শুঝিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তখন দল বেঁধে তারা ফিরে যায়। পার্টি বে-আইনি হওয়ার পর গোপন কর্মীদের অনুসন্ধানে রাত্রিতে ব্যাচ ভাগ করে গোয়েন্দার দল সংগঠিত গ্রামগুলির চারপাশে ঘোরা ফিরা করতে দেখে প্রথমত জনসাধারণ একটু ঘাবড়ে যায়, কি করে নেতাদের রক্ষা করবে চিন্তা করে। পরে তারাও গ্রামের ঢোকার রাস্তাগুলিতে পাহারা বসায় এবং দু'একটি ব্যাচকে ঘেরাও করে মার দেওয়ার ব্যবস্থা করায় ঐভাবে গ্রামের চারপাশে গোয়েন্দার ঘোরাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় নেতা কমরেড রবি মিত্রের বাড়ির মাল ক্রোক করে তালাবন্ধ করতে পুলিশ এসেছে খবর শুনে ৫|৬ মাইল দূর থেকেও দলে দলে কৃষক লাঠি নিয়ে রবি মিত্রের গাঁয়ের দিকে দৌড়ে যেতে থাকে। গ্রামের ও আশেপাশের প্রায় ৩|৪ শত মেয়ে-পুরুষ সবে দল বেঁধে পুলিশকে ঘেরাও

করবে বলে তোড়জোড় চলতে দেখে, তাড়াতাড়ি পুলিশ দল একটি নোটিশ টাঙ্গিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। ঐ রবি মিত্রের বাড়িতে দুর্গা পূজাতে রবি মিত্রের একজন জ্ঞাতির নিমন্ত্রিত বন্ধু হিসাবে ৩ জন পুলিশ ছদ্মবেশে ঐ পূজা বাড়িতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে এসে বসে। রবি বাবুর পূজা বাড়ি কৃষকদেরও পূজাবাড়ি, তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ান অসম্ভব। অপরিচিত দেখলেই জিজ্ঞাসা এবং প্রত্যেকের সম্পর্কে যতক্ষণ সঠিক পরিচয় না পাচ্ছে ততক্ষণ তার উপর পাহারা চলে। শেষে ঐ গোয়েন্দারা ধরা পড়ে যায়। তখন তাদের হাত-পা পূজা বাড়ির খুঁটীতে বেঁধে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ কেড়ে নিয়ে অপমান করতে করতে গ্রামের বাহির করে দেওয়া হয়। এছাড়া দালাল সায়েস্তা করার ব্যবস্থাও চলেছে স্থানে স্থানে। অবশ্য এর ফলে পুলিশের ঘোরাফেরা ও টহল বেড়ে গেছে কিন্তু কৃষকদের মধ্যেও প্রধানত গরীব কৃষক ও ক্ষেত-মজুরদের মনোভাব দৃঢ় হইতেছে।

পার্টির সমালোচনা— কোর্টে যাওয়ার মনোভাব বাতিল করে অতঃপর কোর্টকে বয়কট করার মনোভাব নিতে হবে। কোর্টের উপর আস্থা মানে সরকার ও জমিদারের ফাঁদে পা দেওয়া। সংগ্রাম এলাকাকে দ্রুত বাড়াতে হবে। সেজন্য কর্মীদের নিষ্ক্রিয়তা দূর করা চাই। পার্টির সংগ্রামী প্রস্তাব কর্মীদের ভালভাবে বুঝিয়ে রাজনীতিক জ্ঞান বাড়ান চাই। স্থানীয় নেতারা একেবারে ডুবে গেলে জনসাধারণের মনে হতাশা জাগে, সুতরাং নেতাদের নিরাপত্তা ঠিক রেখে জনসাধারণের সংস্পর্শে বেশি করে আসা দরকার। আগামী ফসল ওঠান ও রক্ষার ব্যাপারে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী সুতরাং দ্রুত ভঙ্গী ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করতে হবে। আর ক্ষেত-মজুরদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ ছাড়া আন্দোলন জয়যুক্ত হতে পারে না। তাদের পৃথক সংগঠন ও দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন শীঘ্র শুরু করা।

৪

জঙ্গল অঞ্চল

জঙ্গল অঞ্চল— শালবনী ও গড়বেতার একাংশ এবং বিনসুর ঝাড়গ্রাম থানা প্রধানত এই অঞ্চলে ক্ষেতমজুরের ভাগই বেশি। এই এলাকার জমিদার পত্তনিদার ও তালুকদার প্রভৃতি মালিকরা প্রধানত বাঙালি বর্ণহিন্দু, আর দিনমজুর ও গরীব ভাগচাষি প্রধানত সাঁওতাল, জংলী, মাঝি, বাউরী প্রভৃতি আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণি। এই অঞ্চল প্রধানত জঙ্গলাকীর্ণ। চির দিন এই সব গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুররা দিন মজুরি করে এবং জঙ্গল থেকে পাতা জ্বালানী সংগ্রহ করে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে আসত। বনে জঙ্গলে গরু চরিয়ে বেড়াত।

বর্তমানে জমিদার ও সরকারি ব্যবস্থাতে জঙ্গলের চার পাশে পাহারা বসেছে। কাউকে জঙ্গলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। জঙ্গল রক্ষার নামে পাতা, আকাটা কাঠ সংগ্রহে ট্যাক্স আদায়ের নামে নূতন জুলুম চলছে। ভাগচাষিদের জমি থেকে উচ্ছেদ ব্যাপকভাবে চলছে। জমি হস্তান্তর হচ্ছে।

দিন মজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের (বেশিরভাগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে) ফলে কিছুটা মজুরি বাড়লেও জীবন ধারণের খরচা সেই তুলনায় অনেক বেশি তাই অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে।

এদের প্রধানত কিনে খেতে হয়— ধানের দাম গত বছর ছিল ৫।।০—৬।।০ বর্তমান

বছরে ৭—৯ টাকা পর্যন্ত হয়েছে। গ্রামদেশে কাপড়ের অত্যন্ত দাম। সকল জিনিসই চোরাবাজারের উৎকট দামে বিক্রি হয়। দোকানগুলি প্রধানত ধনী জোতদার পত্তনীদারদেরই একচেটিয়া। তারাই গ্রামের রাজার সামিল হর্তাকর্তা, সুতরাং যথেচ্ছ শোষণ চলছে। কন্ট্রোলের মাল এই সব গরীব সাধারণের জন্য নয়, সবই ঐ বড়লোক ও তাদের পেটোয়া বা আত্মীয় বন্ধুদের জন্য। তুলনামূলক দাম : কাপড় ৮—১০ টাকা, সরিষার তৈল ২—২৷৷০০ (আমদানী কম)। কেরোসিন দশ আনা — ১টা: বারো আনা, শাড়ী ১০—১২, টা: তামাক ২—৩৷০, ডাল— দশ আনা থেকে চোদ্দ আনা, সুপারী— ২—২৷৷০, চিনি— কন্ট্রোলের সময় পেত না, এখন দাম— ১৷৷০, লঙ্কা— ২৷০ সের, তরকারীর দাম দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে।

ট্যাক্স — চৌকিদারী ট্যাক্স অনেক ক্ষেত্রে ছিলই না, চাকরান জমি দেওয়া থাকত। বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ড চালু করার নামে নূতনভাবে চৌকিদারী ট্যাক্স ধার্য আর যেখানে ট্যাক্স ছিল তা বাড়ানর জন্য কংগ্রেস থেকে চেষ্টা হচ্ছে। তবে এ ব্যবস্থা এখনও কার্যকরী হয় নাই।

ঋণ — মজুরির হার কম জীবনধারনের তুলেনায় খরচা অত্যন্ত বেশি কাজেই ঋণ বাড়ছে। তবে এই সব, গরীবদের ঋণ পাওয়ার কোন সুবিধা নাই, জমি নাই, আসবাব নাই, আবার এ বছরে ফসলের দাম তুলনায় অনেক বেশি, সুতরাং ঋণ কর্জা ধান ধানের মালিকরা দিচ্ছে না।

যাদের অল্পসল্প কিছু জমি ছিল তাও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বিক্রির হার শতকরা প্রায় ১০ ভাগ। কৃষক সমিতির 'দখল রেখে চাষ কর' আন্দোলনে কৃষকদের সচেতন হওয়ার পূর্বে এখানকার জমিদার মালিকরা বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছে। তাই মিথ্যা মামলা ও পুলিশের ভয় দেখিয়ে জমি থেকে ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ চালিয়েছে। কৃষক সাঁওতাল জংলী ভূমিজ বাউরীরা প্রায়ই নিরক্ষর।

সংগঠন— এই অঞ্চলের মধ্যে আমাদের সংগঠন— কৃষক সমিতি— যোগাযোগের অভাবে প্রায়ই নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। গত বছর সংগঠন ১৭ নং— ৪৷৫টি গ্রাম (সক্রিয়) ৫২টি গ্রামের উপর কমবেশি প্রভাব পড়েছে; এছাড়া ১১নং ৩ খানা, ৭নং, ৯নং, ২৩নং, ৩নং এবং ৮নং ইউনিয়ানের ২৷৩ খানি করে গ্রামে কৃষক সমিতির সংগঠন ছিল। দমননীতির চাপের ফলে বর্তমানে নিষ্ক্রিয় অবস্থা। কোথাও বা ভয় যে সমিতিতে আছে শুনলেই জমিদাররা পুলিশে খবর দিবে। আর সাথে সাথে সমিতির দিকে ঝোঁক ও সমিতির প্রতি আস্থা আছে।

ঝাড়গ্রাম ১৫নং ইউঃ ২টি গ্রামে সংগঠন আছে, বর্তমানে নিষ্ক্রিয় অবস্থা।

১নং ইউঃ ২৷৩টি গ্রামে সংগঠন আছে। বর্তমানে নিষ্ক্রিয় আছে। এইসব নিষ্ক্রিয়তার কারণ বে-আইনির পর আজ পর্যন্ত ঐ সমিতিগুলির সাথে কোন যোগাযোগ করা যায় নাই। যেসব স্থানীয় নেতারা উঠেছিল দমননীতির ভয়ে স্থানীয় কংগ্রেসী জমিদার বড়লোকদের চাপে নীরব হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে আমাদের ঐ অঞ্চলের জন্য একজন সেকেণ্ড গ্রেড ক্যাডার নিযুক্ত করা হয়েছে এবং অবস্থা ক্রমশ উন্নতির দিকে।

শালবনী থানার ৬নং, ১০-১৬ ও ৯নং ইউনিয়নে কিছু কিছু গ্রামে সমিতি আছে। তবে ৬নং এর সংগঠনটি বিশেষ ভাবে সক্রিয়। এখানেই ২৷৩টি সংঘর্ষ বড়লোকদের সাথে হয়েছে।

অবস্থা ও আন্দোলন— স্থানীয় অবস্থাপন্নদের নিকট প্রথমত মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন হয়। বড়লোকদের বয়কট আন্দোলনে ৭৷৮ খানা গ্রামের দীন-মজুররা এক হয়।

কিন্তু মালিকরা তার বাহির থেকে লোক এনে কাজে লাগালে স্থানীয় মজুররা তাদের ফিরে যেতে অনুরোধ করে না শুনাতে সন্ধ্যার অন্ধকারে একটু শিক্ষা দেয়। পরে জমিদাররা পুলিশ এনে মজুর বাউরী পাড়া খানাতল্লাসী করায়, পুলিশ (মনে হয় ঘুষের পরিমান বাড়ানর জন্য) প্রথমত ৩|৪ জনকে ধরে ধমক টমক দিয়ে ছেড়ে দিয়ে যায়। আন্দোলন তাতে বন্ধ হয় না তবে বর্ণ হিন্দু মজুররা কিছুটা ভয় পায়। মালিকরা বাউরী নেতার বিরুদ্ধে সদ্‌গোপ বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা (জাতিগত) চালিয়ে নিজেদের পক্ষে টেনে নেয়। ফলে সমিতির লোক গিয়ে সভা করার সময়ে বড়লোকেরা গুণ্ডা ও কংগ্রেসীদের সাহায্যে মিটিংএ গণ্ডগোল বাঁধিয়ে মিটিং ভেঙ্গে দিতে এবং বক্তাকে মারপিট করতে চেষ্টা করে, তখন সাঁওতালরা রুখে দাঁড়ায়, বাউরীরা বক্তাকে ঘিরে রাখে। অবস্থা দেখে শত্রুরা তখন চীৎকার করে মিটিং ভেঙ্গে গেল বলে স্লোগান দিতে দিতে ফিরে যায়। এরপর বাউরীপাড়ায় গিয়ে মিটিং করা হয় এবং তাদের উপরই সংগঠনকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে বলা হয়। পরে মজুরি বাড়াতে বাধ্য হয়। ঐখানে মাঝে কন্ট্রোলের কাপড় চোরাবাজারে চালান দেওয়ার সময় স্থানীয় ঐ সমিতির লোকেরা ধরে পুলিশের নিকট রিপোর্ট দেয় কিন্তু পুলিশ ঘুষ নিয়ে কেসকে চাপা দিয়ে দেয়। আবার এবারে আটা ||০ আধমণ চোরাবাজারে বিক্রির সময় ধরে এবং মেদিনীপুর এন্‌ফোর্সমেন্ট বিভাগে গিয়ে জমা দেয়। কিন্তু পুলিশ ও বড়লোক ডিলাররা ষড়যন্ত্র করে ঐসব কর্মীর প্রায় ১৫|১৬ জনের নামে লুঠপাটের কেস দায়ের করেছে।

এছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসংগঠিত ২|১ স্থানে পুলিশ ও ভাগচাষিদের মধ্যে দখল রেখে চাষ করার জন্য (উচ্ছেদের বিরুদ্ধে) সংঘর্ষ হয়েছে বলে শোনা যায়। কিন্তু সঠিক রিপোর্ট সংগ্রহ করা যায় নাই। জমিদার ও মালিকদের সাথে বিরোধ লাঠালাঠি এ খবরও অনেক শুনা যাচ্ছে এবং গরীব ভাগচাষিদের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা মামলা কোর্টে প্রায় হতে শুনা যায়। এই অঞ্চলে ভাগচাষের ভাগাভাগী চাষি পায় ফসলের ও খড়ের ৭ ভাগ, মালিক নয় ভাগ। এর বিরুদ্ধে অন্য কোন দাবি করতে গেলেই জমি থেকে উচ্ছেদ।

... **বর্তমানের আন্দোলন**— দাবি হচ্ছে— ভাগচাষের ফসলে তেভাগা আর মজুরি আন্দোলনে— ২ টাকা নগদ মুড়ি ও একবেলা খাওয়া। এছাড়া জোর করে জঙ্গলে ঢোকা এবং অধিকার (পাতা, পাঠ, গোচারণ) বজায় রাখা এজন্য জঙ্গী ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা ও মেয়ে পুরুষ সকলে মিলে জঙ্গল অভিযান চালান।

প্রজা ও মাঝারি কৃষকদের কাপড় ও লোন মুকুবের এবং জমিদারি উচ্ছেদ ও জমির মালিকানার জন্য জলের জন্য ক্যানাল বা বাধের দাবিতে খাজনা বন্ধ এই সব কৃষকদের মনোভাব এখনো বিরোধী নয়। কেউ কেউ মজুরি ও জঙ্গল আন্দোলনের সমর্থক আছেন।

জঙ্গী মনোভাব কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট দেখা যায় তখন, যখন তাদের শক্তিকে সংগঠিত দেখে। তা না হলে এগুতে সাহস করে না, অথচ অসন্তোষ খুবই তীব্র। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের আধামাধা সাময়িক একজোট হয়ে জমিদার ও পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু সংগঠিত সরকারি, কংগ্রেসী ও বড়লোকদের আক্রমণে আবার ভেঙ্গে পড়ে। এই অবস্থাটাই প্রধান।

পার্টি সমালোচনা— এই অঞ্চলের জন্য ডি-সির স্পেশ্যাল নজর চাই। কারণ সংগঠন অত্যাচারের তীব্রতার জন্য দ্রুত গড়ে উঠবে এবং সংগ্রামও তীব্র আকার নেবে। ঐ অঞ্চলের

ইন্‌চার্জ দেবেন দাস ব্যক্তিগতভাবে এপর্যন্ত এজিটেশনাল প্রচার করে গেছে। সাংগঠনিক ধারাও (সমিতিগতভাবে) কাজ বা যোগাযোগের ব্যবস্থা করে নাই। ফলে স্থানীয় কৃষক ও কর্মীদের ঐ কমরেডের প্রতি একটা আস্থা গড়ে উঠেছে এবং তার ব্যক্তিগত প্রভাবও যথেষ্ট আছে। তার জেলে আটক সকলের মনে হতাশারই সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বর্তমানে ঐ অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত কমরেডকে সমিতিগতভাবে কাজ করা সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ঐ অঞ্চলের জন্য আরও অন্তত ২ জন সংগঠক দেওযা প্রয়োজন। কিন্তু এখনও সেই ব্যবস্থা হয় নাই।

মজুরির আন্দোলন গত বছর থেকেই কৃষক সভার মধ্য দিয়ে চলেছে, তাই কৃষক সভার প্রতি মাঝারি কৃষকদের (যারা মজুর খাটায়) একটা বিরূপ মনোভাব বড়লোকরা গড়ে তোলার চেষ্টা পাচ্ছে কোথাও কোথাও কৃতকার্যও হয়েছে। সুতরাং ক্ষেতমজুর সংগঠনকে আলাদাভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা এবং মাঝারি কৃষকদের সমিতির মধ্যে টানার ব্যবস্থা করা। ক্ষেতমজুরদের লড়াইয়ের সাথে তাদের জমির লড়াইয়ের সম্পর্ক বুঝিয়ে মজুরি আন্দোলনে তাদের সমর্থন লাভের জন্য প্রচার চাই।

৫
কংগ্রেস ও গভর্নমেন্ট সম্পর্কে মনোভাব

(ক) দিন-মজুরদের কথা— কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার সবই ধনীর দালাল। কারণ কংগ্রেসী বলতে স্থানীয়ভাবে দেখছে সবই অবস্থাপন্ন বড়লোকদের, যারাই তাদের বাঁচার মত মজুরি পাওয়ার আন্দোলনের ঘোর বিরোধী এবং তাদের ঐ আন্দোলনকে দমন করার জন্য মিথ্যা মামলা বা ডাইরী করে পুলিশ এনে তাদের উপর নির্যাতন চালায়। বিশেষ করে চন্দ্রকোণা ৮নং এবং দাসপুর ১নং ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে মজুরি আন্দোলন দমন করতে গিয়ে স্থানীয় কংগ্রেসী জমিদার ও বড় লোকেরা মিথ্যা কেসে প্রায় ৩০|৩২ জন দিন মজুরকে জেলে আটক করে পুলিশ জুলুম চালায়। সমিতিগত ভাবে লড়াই করে কৃষকরা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেও ঐ ব্যাপারে প্রায় ২০০০ টাকার মত খরচ হয়ে যায়। তদানীন্তন মন্ত্রী ও ঐ এলাকার এম-এল-এ অন্নদা চৌধুরী আপসে মীমাংসা করতে গিয়ে কংগ্রেসী জমিদার ও বড়লোকদের পক্ষ টেনে কথা বলে এবং আপস না করলে পুলিশ জুলুম দিয়ে তাদের আন্দোলনকে বড় লোকেরা ভেঙ্গে দেবে ও নির্যাতন ভোগ করতে হবে বলে আতংকের সৃষ্টি করতে থাকে। শালবনী ৬নং ও বীনপুব ১৭নং ইউনিয়নেও অনুরূপভাবে মজুরি আন্দোলনের বিরুদ্ধে স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা এ কমিউনিস্টদের উস্কানী বলে বড়লোকদের পক্ষ নেয়। পুলিশী জুলুমে সাহায্য করে। এস-ডি-ও এবং মন্ত্রীদের নিকট দরখাস্ত করেও এর কোনই প্রতিকার হয় নাই। বরং মিথ্যা কেসে জঙ্গী মজুরদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। মজুরদের বয়কট-আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য কংগ্রেসীরা দুর গ্রাম থেকে মজুর সংগ্রহের কাজে বড়লোকদের সাহায্য করে, বর্ণ হিন্দু এবং আদিবাসী ও তপশীলদের (মজুরদের অজ্ঞতাজনিত জাতের দোহাই পেড়ে) মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। আজও সাঁওতাল তপশীলী মজুররা একজোট হয়ে ঐ অঞ্চলে বয়কটকে চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ খানের মিটিংএ সমিতির বক্তাকে আক্রমণ করাতে বড়লোক ও কংগ্রেসী সকলে একজোট হয়েছিল— সেই কথা মজুররা ভুলে নাই।

কেশপুর ৪নং ইউঃ মালিকদের খাটুনী বন্ধ করার আন্দোলন ছিল সাঁজাচাষিদের যাদের অনেকেই আবার গরীব, ক্ষেত মজুরি করে বেশির ভাগ দিন চলে। ঐখানকার বয়কট-আন্দোলনের সাথে দীনমজুরদের সহযোগিতা দেখে কংগ্রেসীরা স্থানীয় জঙ্গী মজুরদের উপরও পুলিশ হামলা চালাতে মালিকদের কম সাহায্য করেনি। মজুরি বাড়ানোর দাবির বিরুদ্ধে এই সব কংগ্রেস নেতারা সবচেয়ে ঘোর বিরোধী কারণ তারা মালিকশ্রেণির লোক। এই প্রকার বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসীদের সংস্পর্কে দীনমজুরদের ধোঁকা সকলের আগেই কেটে গেছে বা যাচ্ছে। আর পুলিশ জুলুম ও বড়লোকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেলা বা মহকুমা হাকিমের কাছে জানিয়ে কোন ফলই হয় না। বরং তদন্তের জন্য সার্কেল অফিসার বা দারোগা এসে বড়লোকদের পক্ষে রিপোর্ট দিয়ে উল্টে দিনমজুরদের ধমক দেয়।

মজুরির আন্দোলন প্রধানত স্থানীয় মজুর কর্মী ও দিন মজুরদের নিজেদের চেষ্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হয়েছে। যখনই কোন ক্ষেত্রে তা সংঘর্ষের পর্যায়ে গেছে, তখনি স্থানীয় সমিতি বা জেলা অফিসে এসে জানার পরে কৃষক সভা থেকে সমর্থন ও সাহায্য করা হয়েছে।

অবশ্য এই অঞ্চলের জন্য পার্টি বে-আইনি হওয়ার ঠিক আগেই জেলা কৃষক সমিতি থেকে মজুরি বৃদ্ধি ও জঙ্গল সমস্যার উপর ৫ হাজারের একটি হ্যাণ্ডবিল ছড়ান হয়। ঐ হ্যাণ্ডবিল পেয়ে বিভিন্ন ইউনিয়নে (স্বতঃস্ফূর্তভাবেই) এই মজুরি আন্দোলন জোর পায়।

(খ) ভাগচাষি ও সাঁজাচাষি— গত বছর ভাগচাষ কন্ট্রোল বোর্ডের রায় বেরুবার পূর্ব পর্যন্ত সাধারণত কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের উপর ভাগচাষিদের অনেকখানি ভরসা ছিল যে এবারে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা গেছে— কাজেই এতকাল কংগ্রেস নেতারা যা কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কাজে কিছু না কিছু করবেই। কিন্তু তমলুকের ভাগচাষ কন্ট্রোল বোর্ডে কংগ্রেস নেতাদের ও এস-ডি-ওর মালিক স্বার্থে রায় দান এবং রায়ের মধ্যে বাজে আবওয়াব ও জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না— এইসব সিদ্ধান্তকেও যখন কংগ্রেস নেতারা কার্যকর করতে চাইল না, তখন হতেই ভাগচাষিদের উপর হতে কংগ্রেসের প্রভাব কমতে শুরু করে।

সদরের কন্ট্রোল বোর্ড সাঁজা চাষিদের দাবিকে অগ্রাহ্য করে এই অজুহাতে যে এ ব্যবস্থা ভাগ ব্যবস্থা নয় চুক্তি কড়ারী, সুতরাং কন্ট্রোল বোর্ডের এ সম্পর্কে করার কিছুই নাই। এভাবে সাঁজা চাষিদের দাবি সম্পর্কেও কোন আলোচনা করা হয় নাই। কৃষকদের প্রতিনিধির বার বার চাপ দেওয়ার ফলে তখন ব্যক্তিগতভাবে আপস মীমাংসা করে নেওয়ার জন্য ঐ প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানাইয়ে কর্তব্য শেষ হয়।

কাঁথি ভাগচাষ কন্ট্রোল বোর্ডের রায়ও তমলুকের অনুরূপ ছিল। এভাবে ভাগচাষি ও সাঁজা চাষিদের দাবিকে অস্বীকার করে কন্ট্রোল বোর্ডের মালিকঘেঁষা রায় কৃষকদের বিশেষভাবে মোহমুক্ত হতে সাহায্য করেছে। তমলুকের মহকুমা কৃষকসভা থেকে ঐ কন্ট্রোল বোর্ডে কংগ্রেসী প্রতিনিধি এম-এল-এ দের জোতদারদের পক্ষে ওকালতীর বিস্তৃত কাহিনী হ্যাণ্ডবিল আকারে ৫ হাজারের মত ছড়ান হয় এবং কৃষকদের সংঘবদ্ধভাবে মালিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের ন্যায্য দাবি স্বীকারের জন্য আহ্বান জানান হয়। এই অবস্থায় সংগঠিত ও অসংগঠিত এলাকায় তমলুক, কেশপুরে কয়েকটি বড় বড় জনসভা ডেকে কন্ট্রোল বোর্ডের রায় পুনর্বিবেচনা করে চাষিদের দাবি মানার জন্য গণদরখাস্ত ও প্রস্তাব পাশ করে এস-ডি-ও ও মহকুমা কংগ্রেস অফিসে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

কিন্তু এতে কোনও ফল হয়না এবং ইতিমধ্যে পার্টি বে-আইনি হয়ে যাওয়ায় দমননীতির চোট বেড়ে যায়, সরকারি আমলা ও পুলিশ সর্বত্রই জোতদারদের পক্ষে ভাগচাষিদের উপর জুলুম করতে সাহায্য করে। কংগ্রেস নেতারাও ভাগচাষিদের আধাভাগের চেয়ে বেশি ফসলের দাবি অন্যায় ও বেআইনি বলে প্রচার চালায়। অসংগঠিত এলাকায় কৃষকদের ঐ আন্দোলনে যোগ দিলে পুলিশ জুলুমে সর্বস্বান্ত হবে বলে ভয় দেখায়।

(গ) প্রজা ও মাঝারি কৃষক— ২১শে জানুয়ারি কলিকাতায় কংগ্রেসী পুলিশের জনতার উপর কাঁদুনে বোমা ও লাঠি প্রথম জমিদারি এলাকার কৃষকদের চোখ ফোটায়। তাছাড়া কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসার পর সাধারণত অসংগঠিত এলাকায় জমিদারদের বেআইনি আদায়, খাজনার উপর চড়াহারে সুদ আদায় ঘুষ ইত্যাদি আদায় নূতন করে শুরু হয়। সর্বত্র জমিদার জোতদার মালিক শ্রেণির হুমকী ও জুলুম ক্রমেই বাড়তে থাকে। কংগ্রেসী নেতারা আর মুখ ফুটে কোন কথাই এসম্পর্কে বলে না বা প্রতিবাদও করে না বরং নীরব সমর্থন জানাতে থাকে। যখন সংগঠিত এলাকায় কৃষকরা এইসব আবার বে-আইনি আদায় প্রতিরোধের জন্য স্থানে স্থানে আন্দোলন ও প্রচার চলতে শুরু করে তখন কংগ্রেসীরা অনর্থক গোলমাল সৃষ্টি করে শিশুরাষ্ট্রকে বিপন্নের ধোয়া তোলে। প্রচারের মধ্যে বলে যে কংগ্রেস সরকার ধীরে ধীরে সবই করে দেবে— জমিদারি উচ্ছেদ ও কৃষকের হাতে জমি সবই আসবে, তবে সময় চাই।

কিন্তু বর্তমানে কৃষক সমিতির প্রচারের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের জমিদারি উচ্ছেদের পরিকল্পনা কি এবং কৃষক সভা কিভাবে জমিদারি উচ্ছেদ চায় তুলনামূলক পরিকল্পনার খসড়া দিয়ে একটি ১০ হাজারের ইস্তাহার সাধারণভাবে কৃষকদের মোহমুক্তিতে সাহায্য করেছে।

বর্তমানে আবার আমাদের সংগঠিত এলাকার (গঠরা অঞ্চলের) ভিতরে ঢুকে খাজনা বন্ধ আন্দোলনকে ভাঙ্গার জন্য অজয় মুখার্জি স্বয়ং এসে হাজির হয়। কিন্তু গরীব কৃষকদের ভাত কাপড় ও জিনিষের দাম কেন বাড়ছে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে "পরে বলে যাব, এখন আপস মীমাংসার কথা বল" বলে এড়িয়ে যায়। কিন্তু কৃষকদের মনোভাব এতে কংগ্রেসের প্রতি এবং ঐসব নেতাদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠছে। অজয় মুখার্জি হতে সকল ছোট বড় কংগ্রেস নেতারাই জমিদারদের সাথে আপস করার জন্য এবং খাজনা বন্ধ করে অন্যায়ভাবে দমননীতিকে ডেকে এনোনা— এভাবে ভয় দেখিয়ে কৃষকদের ক্ষোভকে দাবিয়ে রাখারই চেষ্টা পাচ্ছে। এর ফলে কংগ্রেস ও সরকার ক্রমশই জনসাধারণ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

এভাবে প্রতি এলাকায় কংগ্রেস নেতারা জমিদার জোতদার চোরাকারবারী প্রভৃতি সকল জনশত্রুদের সাথে যতই হাত মিলাচ্ছে জনসাধারণ ততই কংগ্রেস বিরোধী এবং পুলিশের দমননীতি ঘুষখোরীর জন্য সরকার বিরোধী হচ্ছে। এভাবে একদিকে কংগ্রেস নেতাদের জমিদার-জোতদার ও ধনী বড়লোকদের পক্ষে প্রকাশ্যভাবে দালালী, ধান-চাউলের পুরা একচেটিয়া ব্যবসার মালিকানা, কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য কন্ট্রোলের জিনিষের ডিলারসীপ, খাল-বাঁধ তৈরি বা মেরামতের কন্ট্রাক্টরী ও চুরি প্রভৃতি জনস্বার্থের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার কার্যকলাপ এবং জনসাধারণের যে কোন দাবিকেই কমিউনিস্ট উস্কানী বলে প্রচার— কংগ্রেসকে জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

জনশত্রুরা— জমিদার-জোতদার-চোরাকারবারী প্রভৃতিই কেবল আজ কংগ্রেসের জয়গান করছে এবং টুপি লাগিয়ে কংগ্রেসী সেজেছে এবং কংগ্রেস মিটিংএ চেয়ার দখল করে

সামনে গিয়ে বসতে দেখে সাধারণ কংগ্রেসভক্ত কৃষকরাও দ্রুত কংগ্রেসবিরোধী হয়ে উঠছে।

কংগ্রেস নেতারা তমলুকে তাঁতিদের সংগঠনকে, মৎস্যজীবিদের সংগঠনকে ভেঙ্গে দালাল কংগ্রেসীদের দিয়ে পাল্টা সংগঠন খাড়া করছে, ফলে সাধারণ তাঁতি ও মৎস্যজীবিরাও কংগ্রেস বিরোধী হচ্ছে। আর জনসাধারণের যে কোন বাঁচার দাবি নিয়ে কংগ্রেসীদের কাছে গেলেই কর্কশ ও রূঢ় ব্যবহার পেয়ে ফিরে আসছে। এছাড়া পদলোভ ও কংগ্রেস সংগঠনে দলাদলি, পরস্পরের বিরুদ্ধে চুরি. প্রতারণা, আগষ্ট হাঙ্গামার টাকা-কড়ির হিসাব-নিকাশ, চোরাকারবার ইত্যাদি নিয়ে জনসভাতেও প্রশ্নোত্তর— শেষ পর্যন্ত বাকবিতণ্ডায় পর্যবসিত হচ্ছে, কোথাও কোথাও যেমন ১ নং তমলুক থানার রামতারক হাটে হাতাহাতির উপক্রম হয়েছিল, এভাবে জনসাধারণ আজ কংগ্রেসিদের প্রকৃত স্বরূপ ও কংগ্রেসের মধ্যে গলদ সম্পর্কে স্পষ্টতই বুঝতে পারছে। এছাড়া চাকুরি ও পদলোলুপতায় আত্মীয়-বাৎসল্য স্বার্থপরতা ইত্যাদি তো আছেই।

আমাদের দিক থেকে মোহমুক্তির জন্য কংগ্রেসিদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে রাজনীতিগতভাবে যেমন কন্ট্রোল বোর্ডের রায়, তমলুক ২ নং গঠরা অঞ্চলে. ১ নং রামতারক বাজারে কংগ্রেস নেতাদের প্রকাশ্যভাবে জমিদারদের পক্ষে দালালির কথা হ্যাণ্ডবিল ও পোস্টার করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রাম্য মিটিং ও ব্যক্তিগত আলোচনা প্রভৃতিতে প্রচার চলছে।

এর সাথে জিনিষপত্রের দাম বাড়া, জমিদারি উচ্ছেদ, স্থগিত, জনশত্রুদের স্বার্থরক্ষার জন্য পুলিশ সাহায্য. মিথ্যা হামলাতেও ধনী জমিদারদের পক্ষে রায়— তার উপর নিরাপত্তা আইন, বৃটিশ আমলের মত সরকারি কর্তাদের পুলিশের রক্তচক্ষু ঘুষখোরি প্রভৃতি বিষয়গুলি ও জনসাধারণকে সরকার বিরোধী করে তুলছে এখন সাধারণ লোকেই কংগ্রেসী ও সরকারকে ধনী ও জমিদারের সরকার বলেই চিনে ফেলেছে। তবে এর ফলে হতাশার ভাবটাই বাড়ছে।

কংগ্রেসী মিটিং-এ জনসমাবেশ—

তমলুক— কিছুদিন প্রায় ২ মাসের মতো হাটে বাজারে ঢোল, গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস (নন্দীগ্রাম) কর্মীদের বাড়ি বাড়ি আমন্ত্রণ করেও মহম্মদপুর (৭ নং ইউঃ) বাজারে আগষ্ট বিপ্লবীদের নেতা অজয় মুখার্জির মিটিং-এ প্রায় ১৫০ মতো লোক হয়েছিল. এর মধ্যে কংগ্রেসের দালাল ও জোতদারদের বাড়ির লোকই ছিল সংখ্যায় বেশি। ঐ-তেরপেখিয়া (৪ নং ইউঃ) বাজারে আগষ্ট সংগ্রামের বিদ্যুৎ বাহিনীর ডিক্টেটর সুশীল ধাড়ার মিটিং বহু প্রচার ঢোল সহরৎ করে মাত্র ১০০ লোক উপস্থিত হয়েছিল। তার মধ্যে বাজারের দোকানদাররাই ছিল সংখ্যায় বেশি। সুশীলবাবু উঠেই বলেন আমাকে কতক্ষণ বলতে বলেন— আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা, ২ ঘন্টা, ৪ ঘন্টা, ৫ ঘন্টা যতক্ষণ বলবেন বক্তৃতা দিতে পারি। জনসাধারণ থেকে বলে আগে তুমি বলতে শুরু কর যদি শোনার মতো হয় তবে ২/৪ ঘন্টা ধরেও শুনব, আর তা না হলে তোমাকে ৫ মিনিটও বলতে দিতে রাজি নই। শেষ পর্যন্ত আগস্ট আন্দোলনে কত লোক খুন করেছ, কত টাকা মেরেছ ইত্যাদি প্রশ্ন আসতে বিব্রত বোধ করে পাল্‌কি চেপে যে এসেছিলেন, তাও ফেলে দিয়ে নদী পার হয়ে পালাতে বাধ্য হন।

ঐখানে ৫ নং ইউঃ বয়াল গ্রামে (বাজারের পাশের গ্রাম) মৌখিক বলাবলি করে (কারণ পুলিশ ফাঁড়ি ২—২||০ মাইলের মধ্যে) সন্ধ্যায় মিটিং-এ ৫০০ মতো লোক হয়। বিসয় আগামী ফসলে দোরান ফসল ঘরে তোলা, তেভাগা ও জমি দখল রাখা, প্রায় ৩ ঘন্টা মিটিং চলার পর শেষ করা হয়।

৩ নং ইউঃ দুর্গাপুর গ্রামে কংগ্রেস অফিসের সামনে মিটিং হয়— ঐভাবে মৌখিক প্রচার দ্বারা ৭০০ কৃষক উপস্থিত হয়। চারদিকে রাস্তায় গার্ড রেখে গোপন কর্মী বক্তৃতা করে— আগামী ফসলে তেভাগা, জমিতে দখল ইত্যাদি। গত স্বাধীনতা দিবস পালনের দিন কংগ্রেসের সবচেয়ে বড়ো মিটিং-এ ২/৩ শতকের বেশি লোক হয় নাই। আমাদের স্বাধীনতা নয় কংগ্রেসের দেশদ্রোহিতাব দিবস বলে কালো পতাকা দেখিয়ে শোভাযাত্রা ও সভা ৩টি স্থানে করা হয়। ৫নং এর লোক সংখ্যা ছিল ৪০০। ৭ নং প্রায় এক হাজার, ১২ নং-এ ৫০০ লোক উপস্থিত হয়। কংগ্রেসের দেশদ্রোহিতা ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কৃষক মজুর মধ্যবিত্তের একতার ডাক দেওয়া হয়।

পাঁশকুড়া— ১৩ নং (কংগ্রেস এম-এল-এর বাড়ির পাশে) এ পতাকা উত্তোলন হয়েছিল মাত্র। তাতে ৪ জন উপস্থিত হয়, ঐ দেখে মিটিং-এর প্রচার থাকলেও আর মিটিং হয় নাই।

পাশে ১২ নং ও ১৩ নং ইউঃ মিলে আমাদের প্রতিবাদ মিটিং-এ লোক এসেছিল ৪/৫ শত।

ঐ ১৭ নং ইউঃ-এ কংগ্রেসের কোনো পতাকাও উঠে নাই। আমাদের মিটিং-এ লোক হয় ৪/৫ শত। দোবান্দির হাটে তমলুক ও ১৮ নং ইউঃ সহ প্রতিবাদ সভা হয়।

কেশপুর— থানা কংগ্রেসের নেতা কালী রায়ের গ্রামে পতাকা উত্তোলন ও বড়ো মিটিং হয়, লোকসংখ্যা ১৫০ মতো। অন্য বহু ক্ষেত্রে ৩০-৫০ এর মধ্যে লোক হয়েছিল। আমাদের প্রতিবাদ মিটিং হয় ৩ নং ইউঃ খেতুয়া বাজারে— লোকসংখ্যা ছিল ৭/৮ শতক।

জনসাধারণ কোথাও এই স্বাধীনতা দিবসে লাঙল বা কাজ বন্ধ রাখে নাই। তারা এভাবে কংগ্রেসের নির্দেশ উপেক্ষা করে নিজেদের বিক্ষোভ জানিয়েছে।

সাধারণত— ভাত-কাপড়, জমি ও মানুষের মতো বাঁচার সুব্যবস্থা হবে— এটাই ছিল সাধারণ লোকের কংগ্রেস সরকারের থেকে আশা। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর কংগ্রেস নেতাদের উল্টা আচরণ স্বার্থপরতা ও জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি কবেছে আর কংগ্রেস সরকারের আচরণ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য না দেখে অধিকন্তু জিনিষ-পত্রের দাম বাড়া চোরা কারবারের রাজত্ব ও দমননীতি ইত্যাদিতে সরকারের প্রতি অনাস্থা দেখা দিয়েছে।

কংগ্রেস সমর্থক বলতে গ্রাম দেশে কেবল জমিদার ধান ও চোরাকারবারিদের বুঝায়। কৃষকদের মধ্যে আজও যারা কংগ্রেসি বলে নিজেদের জাহির করে তারা প্রধানত ধনী কৃষকের একটি অংশ। তবে এমন অনেক মাঝারি কৃষকও আছে (যারা অবশ্য কোনো খবরাখবর রাখে না) যারা মুখে বলে কংগ্রেস যদি না করে তবে আর করবে কে? কার এ ক্ষমতা হবে? সুতরাং দেখি কী করে, ইত্যাদি। মজুরি আন্দোলনের ফলে ধনী ও মাঝারি কৃষকদের একাংশ কৃষক সমিতির প্রতি বিরূপ হয়ে নিজেদের কংগ্রেস দলের বলে বলছে। কারণ গ্রাম দেশে কংগ্রেস এবং কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট এই দুটি দলেই ক্রমশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

ঘ) কৃষক-সংগঠনের অবস্থা

বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন হার আছে— জমিদারি অঞ্চলে— কেবল দিন মজুরি করে বাঁচে এরূপ সংখ্যা— শতকরা ৫ জনের বেশি নয়। তবে গরিব কৃষক যাদের বছরের বেশিরভাগ

না হলেও দিনমজুরি করে কিছুটা জীবিকার ব্যবস্থা করতে হয়, তাদের সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ হবে।

ভাগচাষির সংখ্যা— শতকরা ২০, মাঝারি কৃষকের সংখ্যা— শতকরা ৪৫। ভাগচাষ অঞ্চলে— কেবল দাস মজুরি করে— শতকরা ১০ জন হবে। আর ভাগচাষ করে (২/১ বিঘা নিজ জমি আছে)— এদের সংখ্যা শতকরা ৮০ জন। অন্যান্য চাষি শতকরা ১০ জন।

সাঁজা অঞ্চল— দিনমজুরি ৪৫%, সাঁজা চাষি ৫০%, অন্যান্য মাঝারি কৃষক ৫%, জঙ্গল অঞ্চল— দিনমজুর ৮০%, ভাগচাষি ১৮%, অন্য ২%। কৃষকসভার সভ্য গত বছর হয়েছিল ২০ হাজারের কিছু বেশি। বর্তমান বছরে এপর্যন্ত ৫ হাজারের বেশি হয় নাই।

সংগঠন— জমিদারি অঞ্চল, তমলুক মহকুমার— পাঁশকুড়া, তমলুক ও ময়না ৩টি থানায় মোট ৩৭টি ইউনিয়ন। পাঁশকুড়ার ১৭ নং, ১২ নং, ১৩ নং এবং তমলুকের ১ নং, ২ নং, ৩, ৪ নং, ৬ নং, ৯ নং, ১০ নং ও ১১ নং ইউনিয়ন— মোট ১২টি ইউনিয়নের সংগঠন আছে, তবে সকল গ্রামে নয়। ২/৩ খানি হতে ১০/১২ খানি পর্যন্ত।

প্রভাব আছে— তমলুক ৫, ৭, ৮ নং ইউঃ পাঁশকুড়া, ২, ৩, ১০, ১১, ১৬, ৬, ৭ নং ইউঃ-এর কিছু কিছু গ্রামে সাধারণত প্রভাব আছে। ময়না ২, ৩ ও ৮ নং ইউঃও প্রভাব আছে। বাকি ১২টি ইউনিয়নে প্রচার বা সংগঠন নাই।

ঘাটাল— কেবল দাসপুর থানার ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ইউঃ-এ কিছু কিছু গ্রামে সংগঠন আছে। প্রভাব আছে— ৩, ১ ও ১০ নং ইউঃ-র কিছু গ্রাম বাকি ৬টি ইউঃ-এ কোনো সংগঠন বা প্রচার নাই।

সদর মহকুমার— দাঁতন থানার ২টি ইউঃ এবং ডেবরার ১টি ইউঃ-এ কয়েকটি গ্রামে কৃষক সভার সংগঠন আছে। খড়্গপুর থানার ৩টি এবং মেদিনীপুর সদর থানার ১টি ইউঃ-এ কিছু সংগঠন আছে। বাকি ১৬০-এর বেশি ইউঃ-এ কোনো সংগঠন বা প্রভাব নাই।

কাঁথি মহকুমার— ৩টি থানার মধ্যে ২টি থানার মধ্যে ২টি ইউঃ-এর ২/৩টি করে গ্রামে মাত্র সংগঠন আছে। তারই পাশাপাশি গ্রাম বা ইউঃ-এ কিছু কিছু প্রচার হয়েছে মাত্র। বাকি প্রায় ৩২টি ইউনিয়নে কিছুই নাই।

ভাগচাষ অঞ্চল— তমলুক মহঃ— ৩টি থানায় প্রায় ৪৮টি ইউনিয়নের মধ্যে নন্দীগ্রাম— ৭টিতে সংগঠন। আরও ৪-৫টিকে প্রচার ও প্রভাব আছে ৪-৫টিতে কিছুই নাই। সুতাহাটা ও মহিষাদলের ২-৩টিতে সংগঠন ও ২-৩টিতে প্রভাব আছে, বাকি ১৭টিতে কিছুই নাই।

কাঁথি মহঃ— ৩টি থানার ২টি থানায় ২/৩টিতে সংগঠন এবং প্রভাব, বাকি ৭২টিতে কিছুই নাই।

সাঁজা অঞ্চল— কেশপুর ৩টি, গড়বেতা ২টি, চন্দ্রকোনা দুটিতে সংগঠন, পাশাপাশি আরও ৫/৬টিতে প্রভাব আছে। বাকি ১৫০-এর বেশি ইউনিয়নে কিছুই নাই।

জঙ্গল অঞ্চলের— বিনপুর ১টি, শালবনি ২টি, ঝাড়গ্রাম ১টিতে সক্রিয় সংগঠন, পাশাপাশি আরও ৪/৫টি ইউনিয়নের কিছুই নাই।

(এই রিপোর্টটি প্রধানত আনুমানিক দেওয়া হল)

পুরানো ও নূতন এলাকার যেখানে যেখানে সংগ্রাম হয়েছে, সেই সেইখানে সক্রিয় ও সংগ্রামী মনোভাব প্রবল আছে। যেখানে কোনো আন্দোলন ও সংগ্রাম হয় নাই সেখানে নিষ্ক্রিয় ভাবটাই

অধিক-কৃষকদের ও কর্মীদের উভয়ের মধ্যেই।

নূতন এলাকায় বর্তমানে উৎসাহ বেশি দেখা যাচ্ছে। সংগ্রামের বা পুলিশ জুলুমের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। জোতদার মালিকের ভয় ততটা নয়, তবে পুলিশ জুলুমের ভয় সাধারণ কৃষকদের মধ্যে আছে। মোটামুটি এগিয়ে যাওয়ায় উৎসাহ আছে।

অসংগঠিত এলাকায় জোতদার-জমিদার ও পুলিশের প্রতি ভয় যথেষ্ট, হতাশার মনোভাব প্রবল। তবে ঘৃণা— কংগ্রেস সরকার ও শোষকদের প্রতি বাড়ছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষক সভা— কংগ্রেস থেকে— কাঁথিতে, কেশপুর (সদর) এবং সুতাহাটা, নন্দীগ্রামে (তমলুক) গড়ার চেষ্টা হচ্ছে। কোথাও কোথাও গড়েছে। তবে সেগুলি সক্রিয়ভাবে কৃষকদের দাবির জন্য কোনো আন্দোলন করছে না বলে তাদের কাগজের কলমের অস্তিত্বটা বেশি।

কাঁথিতে আর-সি-পি-আই থেকে কৃষক পঞ্চায়েত ২/১টি গ্রামে গড়তে শুরু করেছে। তবে তারা এখন কোনো আন্দোলন করছে না। কৃষকদের বলছে এখন পঞ্চায়েত গড়ে রাখো ভবিষ্যতে কাজ দেবে। এতে কৃষকেরা কোনো উৎসাহ পাচ্ছে না। নামে পঞ্চায়েত গড়ছে।

বামপন্থী কর্মী— অন্য কোন দলের বামপন্থী কর্মী কৃষক সভার মধ্যে নাই। কৃষক সভার হ্যাণ্ডবিল (সাধারণ রাজনৈতিক ব্যাপারে) বা মিটিংএ শহরের (মেদিনীপুর) ফরওয়ার্ড ব্লক ও ছাত্র কংগ্রেসের কর্মী কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে বা প্রতিষ্ঠানের তরফে আসে। শহরে তাদের প্রভাবও যথেষ্ট কম।

শহরের ভদ্রলোক— এরা সাধারণত গ্রামের জোতদার, জমিদার প্রভৃতি মালিকশ্রেণির লোক। তাদের মনোভাব কৃষক সভার বিরোধী হবেই। তবে বর্তমানে শহরের শিক্ষক, ছোট দোকানদার, চাকুরিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমর্থন কিছুটা কৃষক সভার প্রতি ভালোই দেখা যাচ্ছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঐ সমর্থন মৌখিক।

শ্রমিকশ্রেণির প্রভাব— শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে গ্রামের সাধারণ কৃষকদের কোনই ধারণা নেই। কেবল আমাদের সংগঠিত এলাকার কৃষকদের মধ্যে আমাদের প্রচার আলোচনার মধ্য দিয়ে কিছুটা আগ্রহ বেড়েছে। কোনো বড়ো ধর্মঘট— যেমন পোর্ট স্ট্রাইক, পুলিশ স্ট্রাইক, ঢাকার পুলিশ বিদ্রোহ, শ্রীদুর্গ শ্রমিকদের উপর গুলি, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘট ইত্যাদির কথা পোস্টার আকারে বা মিটিং-এ শুনে কিছু কিছু উৎসাহ বোধ করে।

৭
পার্টি ও কৃষক আন্দোলন

১. *কৃষক আন্দোলনে পার্টি নেতৃত্ব*	*ডি-সি/ডি-সি-আর*	*জোন্যাল কমিটি*	*সভ্য সংখ্যা*
দিন মজুর—	—	৩০% ভূমিহীন	১০%
সাঁজা চাষি—	১	৫০% সাঁজা	১৫%
ভাগচাষি—	১+২	৬০% ভাগচাষ	১৫%
মাঝারি চাষী—	৬+৪	৬০% জমিদারি	৫০%
অন্যান্য—	৮+১	—	১০%

২. বর্তমানে সক্রিয় ও আধা সক্রিয়	পার্টি সভ্যের সংখ্যা প্রায় ৩০%	প্রায়-নিষ্ক্রিয় বাকী ৭০% অর্থাৎ নিজ উদ্যোগে কাজ করে না— যোগাযোগ করতে পারলেই তারা কাজে নামে।

রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রশ্ন— পার্টি বে-আইনি হওয়ার পর গত ৫ মাসের মধ্যে ডি-সি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে উপযুক্ত সাংগঠনিক ধারা নিয়ে কাজ করতে পারে নাই। জেলার নেতৃস্থানীয় কমরেড বিশেষ করে সেক্রেটারিয়েট সভ্যদের মধ্যে মতভেদ হয়েছিল— ১। কেন্দ্রীভূত পরিচালন— সেক্রেটারিয়েট কিভাবে কাজ চালবে— কি ভাবে কাজ করবে— ডি-সি-এস-এর মত— সেক্রেটারিয়েট সভ্যদের একত্র অর্থাৎ পাশাপাশি থাকতে হবে, যাতে প্রত্যেকটি সমস্যার উপর দ্রুত একসাথে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায়। কেন্দ্রীয়ভাবে নেতৃত্ব ও নির্দেশ ঠিকমত দিতে পারলে, সাংগঠনিক ধারায় কাজ হবে, ক্যাডারদের সক্রিয় করা যাবে।

অন্য ২জন— বর্তমানে সংগঠন একেবারে এলোমেলো, ক্যাডাররা এমন কি মিডল র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত কি করতে হবে বুঝতে পারছে না বা ভীত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি সেক্রেটারিয়েট সভ্যকেই এলাকা ভাগ করে নিয়ে স্থানীয় ক্যাডারদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে দ্রুত সক্রিয় করে তুলতে হবে। তবেই কমিটিগুলি সত্যিকার ফাংশনিং বডি হতে পারবে। তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা নির্দেশ এক জায়গায় থেকে দিলে তা কাজে রূপ পাবে।

ডি-সি-এস— পার্টি প্রিন্সিপল্-এর গোড়ার কথা হল— পার্টি নেতৃত্ব নিজেরা অরগানাইজড্ এণ্ড সেন্ট্রালাইজড্ না হলে পার্টিকে অরগানাইজ এণ্ড সেন্ট্রালি পরিচালনা করা যায় না। সুতরাং বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থেকে কি করে সেন্ট্রালী নেতৃত্ব দেবে বা দ্রুত অরগানাইজ করবে?

অন্যরা— আমাদের এখন যে যে আন্দোলনগুলি চলছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে একটি লাইন অফ একশন, প্রিন্সিপল বা কাজের ধারা ঠিক করে নিতে হবে, সেই মত স্থানীয় অবস্থার ভিত্তিতে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। ক্যাডারদের রাজনীতিক অবস্থা বোঝান ও সাথে থেকে নূতন ধারায় কাজ করানোর মধ্যে দিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয়তা বা ভয় কাটবে। ইতিমধ্যে যে যে নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে নিজের মতামত সহ চিঠি যোগে অন্য সভ্যদের মতামত নিয়ে পলিসি বা কৌশল ঠিক করে নেওয়া, আর যে যে ক্ষেত্রে মতভেদ আসবে সেই সময় সেক্রেটারিয়েট মিটিং বসান।

গত ডি-সি মিটিং-এ পি-সি সেক্ট কমরেড উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে সঠিক সমাধান দিয়ে এসেছেন।

(২) কেশপুর আন্দোলনে কোর্টে যাওয়া এবং কোর্ট বয়কট নিয়ে (লিগালিস্টিক ইলিউশন)— ডি-সি-এস'এর বক্তব্য— মালিকরা ১০৭ ধারা ইত্যাদি যে সব মিথ্যা কেস করেছে— এগুলি টিকবে না। চাষের সময় ওয়ারেন্ট পিছনে নিয়ে চাষ করা যায় না। সুতরাং কোর্টে জামিন হয়ে এসে নির্বিঘ্নে চাষটা সেরে নিক, তারপর ধানের লড়াইয়ের সময় কোর্ট এমনিই বয়কট হয়ে যাবে।

অন্যমত— কোর্টে জামিন হতে যাওয়া ও ধরা দেওয়া মানে পুলিশ ও জমিদারের ফাঁদে পা দেওয়া। একবার কোর্টে টানতে পারলেই কেসের উপর কেস চাপাবে। প্রত্যেক বারে আবার জামিন, আরও টাকা খরচ। এ ভাবে আর্থিক ক্ষতির মধ্য দিয়ে কৃষকদের জব্দ করবে এবং মনোবল ভাঙ্গবে। আর এই মামলায় জড়িয়ে কৃষকদের সংগ্রামের পথ থেকে মামলামুখী করে দেবে। সংগঠন ও আন্দোলনকে বাড়ানোর দিকে তখন লক্ষ্য থাকবে না। সমস্ত লক্ষ্য গিয়ে পড়বে মামলার টাকা সংগ্রহ করতে হবে, মামলায় জিততে হবে। তেভাগার অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়, সুতরাং পুলিশকে এড়িয়ে বা রুখে চাষ করতে থাকবে। নিতান্ত ধরা পড়ে গেলে তার মামলা চালান হবে বা জামিন করান হবে।

সম্পাদক— এভাবে পুলিশ রুখে বা এড়িয়ে চাষ করা সম্ভব নয়, এখানের চাষের বাত (সুযোগ) নষ্ট হয়ে গেলে আর চাষ হবে না। খোলা মাঠে পুলিশ সহজে পিছনে লেগে থাকার সুযোগ পাবেই। সুতরাং জামিন হয়ে আসতে হয়। আর তেভাগার নজির এখানে খাটে না। কারণ সেটা ছিল ধানের লড়াই, পুলিশ ঠেকিয়ে ধান রক্ষা করতে হবে। আর এ হচ্ছে চাষের ব্যাপার সারাদিন মাঠে পড়ে থাকতে হবে। সুতরাং পুলিশকে এড়াবেই বা কি করে? আর এই অবস্থায় পুলিশের সাথে এখুনি সংঘর্ষে নামলে চাষ আর হবে না, কৃষকের মনোবল নষ্ট হয়ে যাবে।

অন্যমত— মামলায় কৃষকরা জড়িত হলে তাদের মনোভাব প্রধানত মামলা-মুখী হয়ে যায়। সংগ্রামী মনোভাব লোপ পেতে থাকে। কৃষকদের মধ্যে এমনিই লিগালিস্টিক ইলিউসান প্রচুর, আমাদের ঐ পলিসি তাদের ইলিউসানকে বাড়াতে বরং সাহায্যই করবে। সুতরাং কোর্টে যাওয়ার পলিসি বাতিল করে পুলিশ প্রতিরোধের প্রস্তুতি ও সংগঠন গড়া সম্ভবপর। এ সম্পর্কে বিস্তৃত রিপোর্ট পরে পাবেন। আরও দু'একটি বিষয়ে মতভেদ ছিল, সুখেনের সাথে নরেশ ও আমার আলোচনার পর এ সম্পর্কে বিস্তৃত রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ আছে।

কিষাণ থিসিস— প্রথমত খসড়া প্রস্তাব গেলে ঐ প্রস্তাবকে বাংলা করে এলাকায় এলাকায় পাঠান হয়। আলোচনা করে মতামত পাঠাতে বলা হয়, কিন্তু কোন মতামত আসে নাই। ডি-সি ও সেক্রেটারিয়েট মিটিং-এ ঐ প্রস্তাব পড়া হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে মতামত পাঠানোর কথা হয়েছিল। প্রশ্ন উঠিয়াছিল— মাঝারি কৃষক ও ধনী কৃষকের জমির মান পরিষ্কার নাই এবং সর্বোচ্চ জমি একজনের হাতে রাখার পরিমাণ বিশ একর না পঁচিশ একর হবে তা স্থানীয় ল্যাণ্ড কমিটির উপর ভার দেওয়া, কোন সীমা নির্দ্ধারিত করে উল্লেখ করে দেওয়া উচিত কিনা? বুলেটিনের আলোচনা থেকে ক্রমে পরিষ্কার হচ্ছিল।

থিসিস যাওয়ার পর সেক্রেটারিয়েট সভ্যদের মধ্যে ২/৩ জন মিলে আলাদা ভাবে আলোচনা হয়েছে। ইতিমধ্যে ডি-সি-এম'দের মধ্যেও গ্রুপে গ্রুপে আলোচনা করেছে। কেউবা ব্যক্তিগতভাবে পড়েছে। জেলা কৃষক সমিতির প্রতিনিধি সম্মেলনে ৫০/৬০ জনের উপস্থিতিতে এবং জোন্যাল কমিটিগুলিতে আলোচনা হয়েছে। তবে অক্টোবরে কিষাণ ক্যাডারদের স্কুল করার কথা ছিল, কার্যকরী হয় নাই। সক্রিয় সেলগুলি ছাড় অন্য সেলগুলিতে বসে এখনও আলোচনা করা হয় নাই।

পার্টি সভ্য— নূতন প্রায় ২৫ খানি দরখাস্ত এসেছে। নিষ্ক্রিয় পার্টি সভ্যদের তালিকা থেকে একেবারে বাদ দেওয়া এখনও হয় নাই। কারণ তাদের মধ্য থেকে আবার কেউ কেউ

সক্রিয় হচ্ছে। তাদের সাথে রাজনীতিক আলোচনা করা চলছে। কেবল যে সকল পার্টি সভ্য ভয়ে পড়ে কিম্বা অন্য কোন কারণে পার্টি নীতির বিরুদ্ধে গেছে, বর্তমানে তাদেরই তালিকা তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে ঐ প্রকাশ ৫/৬টি নাম পাওয়া গেছে।

পার্টি সাহিত্য— সাহিত্য বিক্রয় ব্যবস্থা জেলা কেন্দ্রের দোকানটি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর কেন্দ্রীয়ভাবে কোন সংগঠন এখনো গড়ে উঠে নাই। বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির নির্দেশ মত স্থানীয় ইউনিটগুলি হতে সরাসরি বই নিয়ে গিয়ে কিছু কিছু বিক্রি করছে। তবে আইনি যুগের তুলনায় অনেক কমেছে।

আর্থিক অবস্থা— খুবই খারাপ বলতে হবে। জেলা কমিটির খরচ পত্র পুরোপুরিভাবে চলছে না। নেতৃস্থানীয় কমরেডদের কয়েকজনের প্রচেষ্টায় যেটুকু সংগৃহীত হচ্ছে, তা দিয়েই কোন রকমে চলছে। অনেক জরুরি হ্যাণ্ডবিলও টাকার অভাবে ছাপান যাচ্ছেনা।

৮
আগামী সংগ্রাম ও ভবিষ্যৎ

তেভাগা— আমাদের জেলায় আগামী তেভাগার জন্য সংগ্রাম হবে বটে, তবে শক্তি খুবই কম। গত বারের তেভাগাতে যতগুলি গ্রাম অংশগ্রহণ করেছিল, এবারে এখনো আমাদের শক্তি সেই পর্যন্ত পৌঁছে নাই। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সেদিনের চাইতে কিছুটা অনুকূল— সাধারণত কৃষকদের মনোভাব সমিতির দিকে। পুলিশ জুলুমের ভয় যেমন আছে তেমনি জোতদার কংগ্রেস ও সরকারের প্রতি ঘৃণা অনেক বেড়েছে। বর্তমানে প্রচার ও সংগঠন বাড়তে আরম্ভ করেছে। কর্মীরা কিছুটা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এলাকা বাড়ছে। পুলিশ ফোর্সেরও তোড়জোড় খুব বেশি। ইতিমধ্যে সংগঠিত এলাকাতে ২টি ফাঁড়ি বসেছে। আরও ২টি ফাঁড়ি বসাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ সব খরচ জোতদাররা আগেই সরকারের নিকট জমা দিচ্ছে। এখন থেকেই গ্রামে মাঝে মাঝে পুলিশ টহল শুরু হয়েছে।

ভবিষ্যত— শুরুতেই অত্যধিক পুলিশ জুলুম এলে আন্দোলন ক্ষুদ্র পুরোনো এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম মহড়ায় পুলিশকে ঠেকাতে পারলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সাঁজা— এই এলাকা দ্রুত বাড়ছে। আশা করা যায় বড় এলাকা জুড়েই এবারের লড়াই এ অঞ্চলে শুরু করা যাবে। স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে সক্রিয়ভাব দেখা যাচ্ছে। শিক্ষা ও রাজনীতিক জ্ঞানের স্তর অনেক নিম্নে হলেও, শ্রেণি চেতনা কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জেগেছে। পুলিশ জুলুম বাড়ছে, ২টি ফাঁড়ি বসেছে, আরও ২/৩টি নূতন হবে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এতে করে কৃষকদের মধ্যে যে খুব বেশি ভয় বা আতংকের সৃষ্টি করতে পারছে বলে মনে হয় না, বরং ঘৃণা ও বিদ্বেষ ক্রমেই বাড়ছে।

সুতরাং এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ দ্রুত উন্নতির দিকে যাবে বলেই মনে হয়।

জমিদারি— প্রধানত তমলুকের ২টি এলাকায় এখনো সীমাবদ্ধ। তমলুক উত্তর গঠরা অঞ্চল বর্তমানে ঝিমিয়ে পড়েছে। এই অঞ্চলে পানের চাষ প্রধান, বর্তমান বাজারে পানের দাম যথেষ্ট। সুতরাং ২ বছর পূর্বে যখন প্রথম খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়, সেদিনের অপেক্ষা বর্তমানে পানের পয়সা চাষিদের হাতে বেশি আসছে। যদিও চড়া দর ঐ পয়সা জমাতে দিচ্ছে

না। তবুও কৃষকদের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব যেন চাপা পড়ে গেছে। তাছাড়া এখানকার আন্দোলনের শুরু হতে মামলা দিয়ে আইনের প্যাচে জমিদারদের ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল, তার থেকেই মনোভাব বেশিরভাগ আইনমুখী। কর্মীরা বেশিরভাগ মাঝারি কৃষক, সুতরাং পুলিশ জুলুমে ভেঙ্গে পড়তে পারে।

তমলুক পাঁশকুড়া দক্ষিণ পুৎপুতিয়া কলাগেছিয়া অঞ্চলের কৃষকদের সংগ্রামী মনোভাব সকলের চেয়ে বেশি। এই অঞ্চলের সংগঠন প্রসার লাভ করছে। এই অঞ্চলে সংগ্রাম হচ্ছে এবং যতই অত্যাচার আসুক, ভেঙ্গে যাবে না। সুতরাং এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকেই।

জঙ্গল— জঙ্গল এলাকায় এখনও আমরা যথেষ্ট কর্মী দিতে পারছি না। সকলের চাইতে এই অঞ্চলের উন্নতির দ্রুত সম্ভাবনা আছে। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যাই অধিক। জমিও খুবই কেন্দ্রীভূত। সুতরাং গরীবদের উপর শোষণও জুলুম অত্যাধিক। অসন্তোষ ও ক্ষোভ তাই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ও সংঘর্ষে ফেটে পড়ে। আমাদের জেলাতে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কর্মীর যথেষ্ট অভাব।

এই রিপোর্টটি আমার ব্যক্তিগত ধারণা থেকে লেখা, হিসাবগুলি কিছুটা কমবেশি হতে পারে। সঠিক হিসাব পরে পাঠাব।

টিকা : 'মধু' হলেন এই রিপোর্টটির লেখক। সম্ভবত এটি হল একটি 'টেক্' নাম— আসল নামটি জানা যায় না। তবে 'বর্তিকা' পত্রিকার তে-ভাগা সংখ্যায় (জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৩) সত্যজিৎ দাশগুপ্তের "কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা ও কাকদ্বীপ আন্দোলনের ইতিহাস' প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে কাকদ্বীপ থানার ও.সি জায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসকের আদালতে 'case no. 8 of 1949' এই মামলায় যে ৩৬ জনকে অভিযুক্ত করেছিলেন, তার মধ্যে কংসারি হালদারের 'টেক' নাম 'মধু' বলে উল্লেখ রয়েছে। এই দুই 'মধু' একই ব্যক্তি কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত নই।

— সম্পাদক

মা বোনদের হত্যার প্রতিশোধ লও!
শ্রমিক হত্যার জবাব দাও!

হত্যাকারী কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ কর
নরপিশাচ মন্ত্রীদের টুকরো টুকরো কর

গতকাল কলিকাতার রাজপথে কংগ্রেস সরকার নারীহত্যা করিয়াছে। বালক, ছাত্র ও শ্রমিককে হত্যা করিয়াছে।

নাগরিক, ছাত্র, শ্রমিক! তোমার মা বোনের রক্তে ভেজা কলিকাতার মাটি আজ ডাক দিয়াছে— নারী হত্যার প্রতিশোধ লও!

শ্রমিক ভাইসব! যে শ্রমিকের হাতের মেহনতে কলিকাতার বাঁধানো সড়ক— আজ সেই শ্রমিকের মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া সড়কের উপর টুকরা টুকরা করিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে— কংগ্রেসী সরকারের খুনী বন্দুক!

ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ লও, খুনীর হাত হইতে বন্দুক ছিনাইয়া লও, হরতাল কর, আক্রমণ কর— লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের হাতুড়ি এই জঘন্য সরকারের মাথায় বজ্র হানুক!

সরকারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেসব বীর সৈনিক জেলে বন্দী— অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহারা আজ ৮দিন উপবাস ধর্মঘটে। তাঁহাদের দাবির সমর্থনে নারী ও নাগরিকেরা গতকাল সভা করিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন। শয়তান কংগ্রেস সরকার আগে হইতেই তাহাদিগকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। একদিকে কংগ্রেস "সেবাদলের" পোষা কুকুরেরা গলির ভিতর হইতে সোডার বোতল ও বোমা লইয়া মেয়েদের আক্রমণ করিল আর এক দিক হইতে সশস্ত্র পুলিশের লরী আসিয়া নারী ও পুরুষদের উপর বেপরোয়া গুলি চালাইল। তখনি তিন জন নারী নিহত হইলেন। পরে আরও পাঁচজন নারীপুরুষ মারা গিয়াছেন, আরও অনেকের অবস্থা সংকটাপন্ন।

কংগ্রেসী সরকার লোককে উপবাস রাখে, মজুরি কাড়িয়া লয়, আর নারী হত্যা করিয়া নিজেদের ঘৃণিত অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চায়! এই সরকারের নেতা ব্রিটিশের গোলামী করার জন্য ব্রিটিশ রাজাকে সেলাম বাজাইতে বিলাত ছুটিয়াছে, আর তাহার হত্যাকারীর দল দেশের গরীব শ্রমিক, নারী ও ছাত্রদের হত্যা করিতেছে।

ওঠো, জাগো, এই বিভীষিকাকে ধ্বংস কর! নরপশুদের বিরুদ্ধে আঘাত হানো! মা-

বোনের রক্তের প্রতিশোধ লও!

হরতাল কর! ধর্মঘট কর! ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করিয়া মিছিল কর! রাস্তায় বেড়া তুলিয়া পুলিশ ও ফৌজের পথ আটকাও। সরকারি বাস ও বিলাতী ট্রাম জ্বালাইয়া দাও। সারা কলিকাতায়, সারা বাংলায় আগুন জ্বালাইয়া দাও!

কমিউনিস্ট পার্টি

এখন পর্যন্ত যাহাদের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নাম—

১। প্রতিভা গাঙ্গুলী, ২। লতিকা সেন, ৩। গীতা সরকার, ৪। অমিয়া দত্ত, ৫। জমাদার মাহাতো, ৫। নাম-না-জানা বালক, ৭। অজ্ঞাত স্ত্রীলোক, ৮। অজ্ঞাত পুরুষ।

টিকা : ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের বিধান সরকারের পুলিশ মহিলা মিছিলের ওপর গুলি চালিয়েছিল। — সম্পাদক

সহায়ক তথ্য - ১৮

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়
২৯ এপ্রিল ১৯৪৯

শোচনীয় ঘটনা

গত বুধবার কলিকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নামে কমিউনিস্টদিগের একটি সংঘের উদ্যোগে ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া শোভযাত্রা বাহির হয়। পুলিশ শোভাযাত্রাকে নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিবার ফলে হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে সাতজন নিহত এবং অল্পসংখ্যক কয়েকজন আহত হইয়াছে। নিহত ব্যক্তিদিগের মধ্যে চারিজন হইলেন মহিলা, একজন পুলিশ এবং অপর দুইজন পুরুষ। হাঙ্গামা করিবার জন্য শোভাযাত্রীদিগের সহিত কিছু লোকও আসিয়া— জুটিয়া ছিল। হাঙ্গামাকারীদিগের দ্বারা কয়েকটি সরকারী বাস ও ট্রামগাড়ী আক্রান্ত হয়। দুইটি সরকারী বাস ও তিনটি ট্রামগাড়ীতে আগুন লাগানো হয়। ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ফলে আরও কতগুলি ট্রাম ও বাস ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পুলিশের একটি গাড়ী ও বেতারযুক্ত একটি ভ্যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মোটামুটিভাবে ইহাই হইল হাঙ্গামাজনিত হতাহত ও ক্ষতির বিবরণ। সরকারী ইস্তাহার এবং সবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণে ইহাও দেখা যায় যে, হাঙ্গামাকারীদিগের দ্বারা ইট-পাটকেল, সোডার বোতল এবং কতগুলি হাতবোমা নিক্ষিপ্ত হয়। অপরপক্ষে পুলিশ এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এবং আক্রমণকারী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য কাঁদুনি গ্যাস ও গুলি চালায়।

এই হাঙ্গামার মূল হেতু কি? সংবাদে প্রকাশ, কমিউনিস্ট রাজনৈতিক বন্দীদিগের অনশন ধর্মঘট সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করে। পুলিশ পথিমধ্যে এই শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। সরকারি ইস্তাহারে প্রকাশ, তাহার পরেই নিকটবর্তী কয়েকটি গৃহের ছাদ হইতে হাতবোমা নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ইহাই হইল হাঙ্গামার সূত্রপাত।

ঘটনার হেতু কি, কিভাবে হাঙ্গামার সূত্রপাত হইল এবং হাঙ্গামাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কি হইয়াছে, তাহার পরিচয় যাহা পাওয়া গেল, তাহা হইতে সমগ্র ঘটনার তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে কোন অস্পষ্টতা নাই। কমিউনিস্ট দল তাহাদিগের রাজনৈতিক কর্মপন্থারূপে জনসাধারণের জীবনে অশান্তি সৃষ্টির জন্য এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থাকে উপদ্রুত করিবার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে, এই হাঙ্গামা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। কমিউনিস্ট বন্দীদিগের অনশন ধর্মঘটের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে হইলে মহিলাদিগকে লইয়া আইনবিরুদ্ধ শোভাযাত্রা বাহির করিতে হইবে, ইহারও কোন নীতিসঙ্গত যুক্তি নাই। প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবার বহুবিধ শান্তিপূর্ণ ও সঙ্গত পন্থা থাকা সত্ত্বেও এইভাবে

আইনভঙ্গের উদ্যোগ যাহারা করাইয়াছে, তাহাদের প্রকৃত লক্ষ্যও সহজে বুঝিতে পারা যায়। একটা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই সুপরিকল্পিতভাবে প্রস্তুত হইয়া কমিউনিস্টদিগের দ্বারা এই মহিলা শোভাযাত্রা বাহির করান হইয়াছিল। হাঙ্গামাকারিগণ জানে, পুলিশ শোভাযাত্রাকে বাধা দিলেই একটা সুযোগ পাওয়া যাইবে। পুলিশের উপর আক্রমণমূলক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হয়—ইহাই হইল এই বিচিত্র রাজনৈতিক দলের অদ্ভুত স্ট্র্যাজেডি। উদ্দেশ্য হইল, পুলিশের গুলিচালনার ফলে যদি কেহ হত বা আহত হয়, তাহা হইলেই জনমতকে সরকারবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী করিয়া তুলিবার পক্ষে প্রচারকার্যের ভাল সুযোগ পাওয়া যাইবে। শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের সকলেই স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন মানুষ, কোন ঘটনায় কাহারও প্রাণহানি হইলে স্বভাবত জনসাধারণ বেদনাবোধ করিয়া থাকে এবং প্রাণহানির জন্য (বিশেষ করিয়া মহিলার প্রাণহানি হইলে) যাহারা দায়ি, তাহাদের বিরুদ্ধে মন বিক্ষুব্ধ হয়। গত বুধবারের ঘটনার চারিজন মহিলাসহ সাত ব্যক্তির নিহত হইবার সংবাদে সকলেই বেদনাবোধ করিবে।

কিন্তু অবস্থা এমনই স্তরে পৌঁছিয়াছে যে, জনসাধারণের পক্ষে এই ধরনের হাঙ্গামার মূল কারণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। দায়ী কে? ইহাই জিজ্ঞাসা এবং ইহাই জনসাধারণকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে হইবে, দায়ী তাহারাই যাহারা হাঙ্গামার পরিকল্পনা করিয়াছে এবং হাঙ্গামা বাধাইয়াছে। হাঙ্গামার প্রতিবিধানে পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেই তাহা নিন্দার বিষয় হইবে, এমন মনোভাবের প্রশ্রয় দিলে শান্তিরক্ষার নীতিকেই ছোট করা হয়। মহিলা, শিশু ও আশ্রয়প্রার্থী ইত্যাদি জনসাধারণের মমতাভাজন মানুষকে হাঙ্গামার মূলে ঠেলিয়া দিয়া যাহারা রাজনীতির চর্চা করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক হইবার প্রয়োজন ক্রমেই বেশি করিয়া দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এইরূপ কয়েকটি ঘটনা হইয়াছে। কলিকাতা শহরেও হইতেছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, পথের সাধারণ জনতার মধ্য হইতে কিছু লোক ভুল ক্রমে এই ধরনের শোভাযাত্রার সহিত মিলিত হয় জনসাধারণের এই ভুল অবিলম্বে সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কমিউনিস্টদিগের রাজনৈতিক মতবাদের সহিত সম্পর্ক নাই, এমন অনেক লোকও নিতান্ত দায়িত্ববোধের অভাবে কমিউনিস্ট চালিত শোভাযাত্রার সহিত বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে মাতিয়া উঠে। ইহাও একটি সমস্যার মত হইয়া উঠিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, নিহত দিগের মধ্যে মাত্র দুইজনের দেহে বন্দুকের গুলির আঘাত চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, আর সকলের দেহে হাত বোমার আঘাত চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে সরকারী ইস্তাহারে কোন উল্লেখ নাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে অনুমান করা যায় যে, হাঙ্গামাকারীদিগের নিক্ষিপ্ত বোমার দ্বারাও অনেকে হতাহত হইয়াছে। এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে অবিলম্বে প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

যখন গায়ে পড়িয়া হাঙ্গামা সৃষ্টি করা কমিউনিস্টপন্থীদিগের একটি প্রধান 'রাজনৈতিক' কর্মপন্থা হইয়া উঠিয়াছে, তখন পুলিশ কর্তৃপক্ষেব তাহার প্রতিবিধানের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার প্রয়োজনও হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। যাহাতে এইরূপ ঘটনা আদৌ না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য সুপরিকল্পিত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বার বার দেখা যাইতেছে, একই প্রথায় হাঙ্গামা প্ররোচিত ও সৃষ্ট হইতেছ। একটা বে-আইনি শোভাযাত্রা,

তারপরেই ইটপাটকেল আর হাতবোমা, আর ট্রাম-বাসে অগ্নিসংযোগ। পুলিশও সেই একই প্রথায় হাঙ্গামা দমনের প্রয়াস করিতেছেন। হাঙ্গামাকারীদের আক্রমণে পুলিশ ও জনসাধারণ হতাহত হইতেছে, পুলিশের গুলিতেও হাঙ্গামাকারী এবং জনসাধারণও হতাহত হইয়াছে। যানবাহন বন্ধ হইয়া সাধারণ নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যও বারবার ব্যাহত হইতেছে। এই অবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যাহারা হাঙ্গামা করিবার পথ ধরিয়াছে, তাহারা হাঙ্গামা করিবার সকল সুযোগ খুঁজিবেই। আমাদিগের আবেদন জনসাধারণের কাছে এবং গভর্নমেন্টের কাছেও। হাঙ্গামাকারী রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সতর্ক হইতে হইবে, যেন তাঁহাদের চিন্তা ও বিচারের ভুলে হাঙ্গামাকারিগণ কোন সহানুভূতি বা প্রশ্রয় না পাইতে পারে। গভর্নমেন্টও তাঁহার সকল শক্তি দিয়া আইনের মর্যাদা অবশ্যই রক্ষা করিবেন। কিন্তু হাঙ্গামা ঘটিবার অবকাশ দিয়া তাহার দমন অপেক্ষা আদৌ হাঙ্গামা ঘটিতে না দেওয়াই কর্তৃপক্ষের পক্ষে কৃতিত্বের বিষয়। গত বুধবারের ঘটনার বিবরণ যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে ইহাই মনে হয় যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ শোভাযাত্রা বাহির হইবার পূর্বেই সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাহা হইলে হাঙ্গামার সূত্রপাতের সুযোগও হ্রাস পাইত, অথবা হাঙ্গামা আদৌ ঘটিতে পারিত না।

টিকা : এই সম্পাদকীয়তে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে সংগ্রামরত কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার প্রতি বিরূপ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে যদিও বলা হয়েছে যে "সাত ব্যক্তির নিহত হইবার সংবাদে সকলেই বেদনাবোধ করিবে।" — সম্পাদক

সহায়ক তথ্য - ১৯

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মা-বোনদের প্রতি এশিয়ার নারী সম্মেলনের আবেদন

আমরা এমন একটা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যুগে বাস করছি যখন যুগ যুগান্তরের দাসত্বের শৃঙ্খল একে একে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সারা পৃথিবীর, বিশেষ করে এশিয়ার কোটি কোটি লোক প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের এতদিনের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলেছে, কোটি কোটি লোক আজ লড়ছে তাদের জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্যে।

চীনের জনগণের বিজয় ও গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ফলে বিশ্বের শান্তি আর গণতন্ত্রই আজ শক্তিশালী হয়েছে। চীন বিপ্লবের সাফল্য এশিয়ার জনগণের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

প্রিয় বোনেরা! আমরা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, আজ জনগণের শেষ বিজয়ের দিন উপস্থিত। কিন্তু এই বিজয় লাভ করতে হলে এখন পর্যন্ত এশিয়াতে সাম্রাজ্যবাদের যে বিরাট শক্তি আছে তার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালাতে হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরা আর দেশীয় সামন্ততন্ত্র তাদের বিশেষ বিশেষ সুবিধা এবং শাসন ক্ষমতা স্বেচ্ছায় মোটেই এশিয়ার জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেবে না। তারা জনগণের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের পথে সব রকম বাধা সৃষ্টি করবে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধনীতি

যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে নতুন করে প্রভুত্ব স্থাপন করার জন্য খোলাখুলি ভাবে সোভিয়েট রাশিয়া ও নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি করছে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা আটলান্টিক মহাসাগরীয় চুক্তির পরিপূরক হিসেবে প্রশান্তমহাসাগরীয় চুক্তি ও নিকট প্রাচ্য চুক্তি করতে চাইছে।

চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে তারা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। তারা দক্ষিণ কোরিয়া অধিকার করে এটাকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করেছে। জাপ সাম্রাজ্যবাদের পুনরুত্থানে সাহায্য করে এটাকে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের ঘাঁটি বানাবার স্বপ্ন দেখছে।

শোষিত জনসাধারণের লড়াইয়ের বিরুদ্ধে এরা প্রত্যেক জায়গায়ই ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করছে।

মালয়ের জনসাধারণের আন্দোলন রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য হাজার হাজার ইংরাজ সৈন্য পাঠাচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ায় লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা প্রিয় নাগরিককে ওলন্দাজ শোষকেরা হত্যা করছে।

ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাসী শোষকরা এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু করেছে।

আমেরিকার সমরবিদ ও মূলধনের আধিপত্যের ফলে ইরানের জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফন্দি খাটাচ্ছে

ঔপনিবেশিক জনসাধারণের স্বাধীনতার আন্দোলন দমনের জন্য সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র সৈন্যই নিয়োগ করেনি তারা আরও অনেক রকম ভণ্ডামির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, ফিলিপাইন, বর্মা, ট্রান্সজোর্ডান ও ইন্দোনেশিয়ায় তারা তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

সামন্ততান্ত্রিক শোষক ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের দ্বারা— তাদের শ্রেণিগত বিশেষ সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার চেষ্টা করছে, তাদের উপর নির্ভর করেই এই তাঁবেদার সরকার গড়ে তুলছে। তারা জাতীয়তা বোধ ও ধর্মের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে।

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়ার আর্থিক পশ্চাৎপদ দেশের জনসাধারণকে ট্রুম্যানের 'চার দফা পরিকল্পনার' সাহায্যের নামে ভাঁওতা দিচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে 'আর্থিক' সাহায্যের নামে সাম্রাজ্যবাদীরা এই সমস্ত দেশের গোলাম সরকারদের নিজেদের স্বার্থে মাথা নোয়াতে বাধ্য করছে। এবং এদের দিয়েই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণির উপর প্রচণ্ড দমননীতি চালাচ্ছে, এই সমস্ত দেশকে তারা নূতন বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার দাবি করছে।

এই সমস্ত তথাকথিত 'স্বাধীন' সরকার সুকৌশলে শোষিত জনসাধারণকে আরও বেশি করে ঠকাচ্ছে এবং এই সমস্ত দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদের শোষণ চিরস্থায়ী করছে।

সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের সাহায্যে ভারতবর্ষকে এশিয়ার জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ঘাঁটি ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত করতে চেষ্টা করছে।

সভ্যজাতির অন্যায় কার্যাবলী

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ এবং এদের তাঁবেদারেরা আমাদের দেশে অসংখ্য বিশ্রী রকম অন্যায় কাজ করছে।

ঔপনিবেশিক শোষকেরা আমাদের দেশের অসংখ্য ধনদৌলত শুষে নিয়ে যাচ্ছে। খনিজ মূল্যবান কৃষিজ দ্রব্য ও অতি প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল আমাদের দেশ থেকে নিয়ে তার পরিবর্তে এই লুঠেরা' আমাদের জনসাধারণের জন্য আনছে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, অমানুষিক শোষণ, অজ্ঞানতা এবং অজ্ঞতা।

যখন আমরা কাপড়ের অভাবে লজ্জা নিবারণ করতে পারছি না, যখন খাদ্যাভাবে আমরা শিশু

সন্তান নিয়ে শুকিয়ে মরছি, তখন হাজার হাজার জাহাজ চাল আর তুলো বোঝাই হয়ে চালান যাচ্ছে।

ভারতবর্ষ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং ইরানের কৃষিতে এখনও ক্রীতদাস প্রথা চালু আছে।

নিয়মিত অপুষ্টি, অত্যাধিক কঠোর পরিশ্রম, সাধারণ শিক্ষার অভাব, জীবনধারণের শোচনীয় দুরবস্থা, দীর্ঘকাল স্থায়ী মহামারি, এবং অত্যন্ত বেশি মৃত্যুর হার— এইগুলিই পাশ্চাত্য শোষকদের এতদিনের শোষণের 'ফল'। যে দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার তাঁবেদাররা ক্ষমতায় আসীন, সেই দেশগুলিতে মেয়েদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কোন অধিকারই নেই।

পুরুষ এবং মেয়ে এক কাজ করলেও পুরুষেরা যত কম মজুরিই পাক না কেন মেয়েরা তার থেকেও কম পায়। মেয়েরা এত কম মজুরি পায় যে, তা দিয়ে অর্ধাহারেও দিন কাটান সম্ভব নয়।

আমাদের ছেলে মেয়েরা ৫/৬ বছরের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খনি, কারখানা এবং ক্ষেতে কাজ আরম্ভ করে। অত্যাধিক পরিশ্রমে নিষ্পেষিত হয়ে আনন্দময় বাল্যকাল কি তা এই শিশুরা জানতেও পারে না।

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড এবং এদের তাঁবেদারদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলেই আমাদের দেশে মা এবং শিশুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে এখানে রোগ দ্রুত প্রসার লাভ করছে এবং শিশু মৃত্যুর হার এক ভয়াবহ জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে।

আধুনিক 'সভ্যজাতি'র অন্যায় অত্যাচারের জন্যই আমাদের দেশে এখনও ক্লেশদায়ক শিশু বেশ্যালয় এবং শিশু ব্যবসায় প্রচলিত আছে।

আধুনিক 'উন্নতকারীদের' অন্যায়ের জন্যই উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মেয়েদের সংগ্রাম

এশিয়ার মেয়েরা আর দাসী হয়ে থাকতে রাজি নয়। তারা জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র, রুটি এবং সন্তানদের সুখী জীবনের জন্য অত্যন্ত সচেতন হয়ে লড়াই শুরু করেছেন। যেখানেই সাম্রাজ্যবাদ গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান শুরু করেছে সেখানেই মেয়েরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এবং সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ছেলেদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করছেন। তাঁরা অত্যন্ত ভালভাবে জানেন জাতীয় মুক্তি এবং মেয়েদের মুক্তির এই একমাত্র রাস্তা। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের ছোট ছোট দল যারা এখন পর্যন্ত 'শাসক' সেজে বসে আছে তারা— সাম্রাজ্যবাদের আদেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এবং অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলন এমন কি গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনও অস্বাভাবিক অত্যাচার করে দমন করছে।

আমাদের বোনেরা যারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁরা জেলের মধ্যে অত্যাচারিত হয়ে গুলি খেয়ে মরছেন। যেখানেই সাম্রাজ্যবাদের গোলামেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেখানেই সন্ত্রাসবাদ এবং প্রতিক্রিয়া দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মেয়ে আমরা— ঘোষণা করছি— বিদেশী শোষক এবং তার দালালদের বিরুদ্ধে আমরা দৃঢ়ভাবে লড়াই চালাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও চালাব।

আমরা চাই শান্তি, জাতীয় মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা। চাই সমান অধিকার, চাই আমাদের সন্তানদের সুস্থ এবং সুখী জীবন।

আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার মেয়েদের মহান উদাহরণ থেকে বিশেষ করে সোভিয়েট এশিয়ার মেয়েরা— যারা বহু বছর ধরে সমান ভাবে স্বাধীন নাগরিকের অধিকার ভোগ করছে, ছেলেদের সাথে সমান ভাবে নিজেদের এবং সন্তানদের সুখী এবং আনন্দময় জীবন গড়ে তুলছে তাদের থেকে উৎসাহ পাচ্ছি।

চীন, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া এবং ভিয়েৎনামের মুক্ত অংশের মেয়েরা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমান অধিকার পেয়েছে, এই মেয়েরা জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে বহাল রয়েছে, তারা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা এই সমস্ত উদাহরণ থেকে বিশ্বাস করছি যে, জনসাধারণ যখন নিজেদের হাতে সমান ক্ষমতা পায় কেবলমাত্র তখনই মেয়েদের প্রকৃত মুক্তি আসতে পারে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, মুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ, সন্তানদের সুখী জীবন কেবলমাত্র জনসাধারণের সরকারই দিতে পারে।

এস আমরা সাম্রাজ্যবাদকে এশিয়া থেকে বিতাড়িত করি

এশিয়ার উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশের মেয়েরা, মায়েরা, বোনেরা। পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়ার মেয়েদের সম্মেলন তোমাদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে— জাতীয় মুক্তির জন্য সমস্ত উপায়ই অবলম্বন করতে।

তোমাদের দেশের জনতার ন্যায়সংগত জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে সমস্ত শক্তি সংহত কর। যতক্ষণ পর্যন্ত এই শোষকদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে তাড়াতে না পারছ ততক্ষণ থেমো না। সাম্রাজ্যবাদ তোমাদের দেশে যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করত তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস কর।

সাম্রাজ্যবাদের দালাল সরকার যারা ডলারের পরিবর্তে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের সেই বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে ফেল। মেয়েদের প্রকৃত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারের জন্য লড়।

শ্রমিকের জন্য আইন এবং মা ও শিশুর রক্ষা ব্যবস্থার দাবি কর। বিদ্যালয় হাসপাতাল, কিণ্ডারগার্ডেন এবং শিশুসদন দাবি কর।

এশিয়ার মেয়েরা! শ্রমিক, কৃষক বুদ্ধিজীবিগণ মনে রেখ ঐক্যই আমাদের শক্তি এবং ঐক্যের ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে নিশ্চয় জয় লাভ সম্ভব। জাতি, শ্রেণি রাজনীতি এবং ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হও। সাম্রাজ্যবাদ এবং তার তাঁবেদারদের বিরোধী সমস্ত শক্তির সঙ্গেই ঐক্যবদ্ধ হও। জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য ব্যাপক ও ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোল।

সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার অত্যাচারে নিষ্পেষিত বোনেরা! ঐক্যবদ্ধ হও এবং ঐক্যবদ্ধ কর; তোমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিবেচনা করে লড়াইয়ের সমস্ত রকম কায়দাই গ্রহণ কর।

সংগ্রামী বোনেরা! সাধারণ মেয়েদের সংগঠনে যোগ দাও এবং তাদের শিক্ষিত কর ও তাদের মূল অধিকার রক্ষা কর।

জাপানের বোনেরা! জাপানে প্রকৃত শান্তি, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে এবং ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে লড়াই কর।

ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, মালয় ও ফিলিপাইনের মেয়েরা ও বোনেরা! সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তোমাদের অসীম সাহসিক লড়াই চালিয়ে যাও। মনে রেখ, তোমাদের এই বীরত্বপূর্ণ লড়াই

সমস্ত গণতন্ত্রকামী জনসাধারণের শান্তির লড়াইয়ে অনেকখানি সাহায্য করছে।

ভারতবর্ষ, ইরান, সিরিয়া, লেবানন, ইজরাইল, ইরাক ও মিশরের মা-বোনেরা! জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই কর; শান্তির প্রধান প্রহরী সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাদীরা তোমাদের দেশকে আক্রমণের ঘাঁটি বানাচ্ছে, তাদের এই কাজ বন্ধ কর।

চীনের বোনেরা! আনন্দ এবং উৎসবের সঙ্গে নতুন চীনকে গড়ে তোল! জনতার গণতন্ত্রকে শক্তিশালী কর।

কোরিয়ার মা বোনেরা! সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে পুরিপূর্ণ মুক্তির জন্য ও সংযুক্ত প্রজাতান্ত্রিক কোরিয়ার জন্য নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাও।

সোভিয়েটের মেয়েরা! তোমাদের মাতৃভূমি শান্তি ও গণতন্ত্রের সুরক্ষিত ঘাঁটির শক্তি আরও বাড়াও। মনে রেখ, তোমাদের দেশ যত শক্তিশালী হবে শান্তির শক্তিও ততই দুর্জয় হবে।

এশিয়ার মেয়ে আমরা জানি আমাদের লড়াইয়ে আমরা একা নই! সমস্ত পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মেয়েরা সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংসের জন্য লড়াই করছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব নারী সংঘ এশিয়ার মেয়েদের অধিকার রক্ষার জন্য আরও অনেক বেশি উদ্যমের সঙ্গে লড়ছে।

এস আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্ব নারী সংঘে ও আন্তর্জাতিক শান্তির শিবিরে আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি সংহত করি।

এশিয়ার জনসাধারণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক!

সমস্ত দেশের মেয়েদের নিজস্ব অধিকার, শান্তি এবং সমানাধিকারের লড়াইয়ের সংহতি দীর্ঘজীবী হোক!

সাম্রাজ্যবাদী দেশের মা ও মেয়েদের কাছে আমাদের আবেদন

এশিয়ার মা ও মেয়ে আমরা— আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বোনেদের প্রতিনিধি আমরা— যে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের শাসক শ্রেণি আমাদের উপর নির্মম শোষণ চালাচ্ছে— সেই দেশের নারী জাতির কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

আমরা সমস্ত মেয়েদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এবং আমাদের সন্তানদের দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ও সুখী জীবন গড়ার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য নয়া-চীনের রাজধানী পিকিং নগরীতে সমবেত হয়েছি।

বহু শতাব্দী ধরে তোমাদের শাসকশ্রেণি এশিয়াকে পদানত করে রেখেছে। তারা আমাদের জীবনে এনেছে যুদ্ধ আর দারিদ্র্য। আমাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছে, দেশের সমস্ত উন্নতির পথে অন্তরায় হয়েছে। সামন্ততন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শোষণের জাঁতাকলে আমাদের পিষে মেরেছে।

এশিয়াকে তাদের অস্ত্রের গুদামে পরিণত করেছে। জাপান, ফিলিপাইন, ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, ইন্দোনেশিয়াকে যুদ্ধঘাঁটি বানাতে চেয়েছে।

ঔপনিবেশিক শোষণের আসল চেহারা

ঔপনিবেশিক শোষকেরা মুনাফালোভী ও সাম্রাজ্য লিপ্সু। সর্বজনবিদিত প্রতিক্রিয়াশীল দলের অথবা 'শ্রমিক' দলের চেহারা আর সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ একই। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও

হল্যাণ্ডের শাসকেরা আমাদের দেশের উপর অসংখ্য নির্লজ্জ আক্রমণ চালিয়েছে।

ঔপনিবেশিক শোষকেরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সম্পদ শোষণ করে উদর পূর্ণ করেছে। আমাদের শ্রমজাত দ্রব্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিজাত দ্রব্য, খনিজদ্রব্য শোষণ করে নিয়ে গেছে; আর এর পরিবর্তে আমাদের দিয়েছে— চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ, অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, দুরারোগ্য ব্যাধি, আর বর্বোরোচিত শোষণ।

আমাদের সন্তানেরা উলঙ্গ থেকেছে— না খেয়ে রাস্তায় পড়ে মরেছে— কিন্তু প্রতিদিন হাজার হাজার জাহাজ চাল আর তুলোয় বোঝাই হয়ে স্বদেশে চালান গেছে।

সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন মন নিয়ে আমরা দাসের মত ভারতবর্ষ, মালয় ইন্দোনেশিয়া প্রত্যেকটি জায়গায় ক্ষেতে কাজ করেছি।

শ্রমিক মেয়ে অথবা সাধারণ মেয়ে, মা এবং তাদের শিশুদের কারুরই জীবনরক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত নাই।

একমুঠো ভাতের জন্য অভুক্ত অবস্থায় আমরা দৈনিক ১৫ ঘন্টা একটানা কাজ করে যাই।

আমাদের হতভাগ্য ছেলেরা ৫-৬ বছর বয়স হতেই ক্ষেতে, কারখানায় অথবা খনিতে কাজ শুরু করে। আনন্দময় বাল্যকাল কি, তা তারা জানতেও পারে না।

তোমাদের ছেলেরা যে বয়সে স্কুলে যায়— আমাদের ছেলেরা ঠিক সেই বয়সে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য ও কঙ্কালসার হয়ে মারা যায়।

সেই মেয়েদের কথা মনে কর— যে হতভাগিনী মায়েরা তাদের শিশু সন্তানদের জমির ও কারখানার মালিকের কাছে সাধারণ পণ্যের মত বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এই হচ্ছে তোমাদের 'পাশ্চাত্য সভ্যতার' ফল।

আমরা যখনই সন্তানদের জীবনের জন্য, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করি, তখন আমাদের কারারুদ্ধ করা হয়। আমাদের দেশের সেরা ছেলেদের অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে গুলি করে মারা হয়।

যতদিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস না হয় আমরা এই লড়াই চালিয়ে যাব

এশিয়ার মেয়ে আমরা, দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি— যতদিন সাম্রাজ্যবাদকে দেশ থেকে তাড়াতে না পারছি ততদিন লড়াই চালিয়ে যাব। আমরা শান্তি, স্বাধীনতা এবং জাতীয় মুক্তি চাই, আমাদের সন্তানদের সুস্থ এবং সুখী দেখতে চাই।

এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশেই আমরা ছেলেদের পাশে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে মিলে জাতীয় মুক্তির জন্য লড়াই করছি। যেখানে এই রক্তচোষা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে সেখানেই আমরা ছেলেদের সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করেছি।

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের মা ও মেয়ে তোমরা— আমরা যেমন সস্নেহে আমাদের সন্তানদের লালনপালন করি, তাদের জন্য গর্ব বোধ করি— তোমরাও সন্তানের জন্য ঠিক সেই রকমই কর। চোখের সামনে সন্তানকে খুন করলে কী অব্যক্ত যন্ত্রণায় মাকে ভুগতে হয় তা তোমরা অনুভব করবে।

আমরা কি প্রেরণা নিয়ে খুনে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করি— তাও তোমরা বুঝবে।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায় কাজ রোধের জন্য তোমরা কি পন্থা অবলম্বন করেছ?

যে সাম্রাজ্যবাদ দারিদ্র্য আর যুদ্ধের জন্য দায়ি তার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে আন্দোলন কত তীব্র, কি ভাবে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কোটি কোটি লোক জাতীয় মুক্তির জন্য লড়ছে তা আমরা জানি, আমরা আরও জানি যে গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র আজ বিজয়ের পথে।

যারা আন্তরিকভাবে ন্যায়কে ভালবাসে তারা আজ বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষের সঙ্গে মহান লড়াইয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে সে দেশও মুক্ত থাকতে পারে না

সুখ শান্তি কায়েম করার জন্য জনতার অপ্রতিহত অগ্রগতিতে সাম্রাজ্যবাদ আজ ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। ওয়ালস্ট্রীটের মহারথীদের পৃথিবীকে একটি বড় উপনিবেশে পরিণত করে পদানত করার যে পরিকল্পনা জনসাধারণ তার মুখোশ সম্পূর্ণভাবে খুলে দিয়েছে।

ফ্রান্স, ব্রিটেন ও হল্যাণ্ডের মায়েরা! সাম্রাজ্যবাদীরা তোমাদের সন্তানদের দিয়ে জবরদস্তি করে, অত্যাচার চালিয়ে আমাদের পদানত করছে। আবার আর একটি অভিশপ্ত লড়াই বাধাতে চেষ্টা করছে। এই শোষক শ্রেণি নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য তোমাদের পুত্রদের মৃত্যুমুখে পাঠাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মায়েরা! তোমাদেরই দেশের কারখানায় তৈরি ট্যাঙ্ক, বিমান দিয়ে আমাদের গ্রামে আগুন লাগাচ্ছে, সামান্য ধন সম্পদ যা আমাদের আছে তাকে ধ্বংস করছে, আমাদের ছেলেমেয়েদের হত্যা করছে— আর আমাদের দুরবস্থা আরও অবর্ণনীয় করে তুলছে।

তোমাদের দেশের মজুরদের মাহিনা কমিয়ে টাকা বাঁচিয়ে সেই টাকা দিয়ে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, মালয়, বর্মা ও চীনে তোমাদেরই সরকার যুদ্ধ চালাচ্ছে; আর ইরান, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ও অন্যান্য দেশে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাচ্ছে।

প্রিয় বোনেরা!— ভুলো না যে দেশ অন্য দেশকে দাসত্বে পরিণত করে সে দেশও মুক্ত থাকতে পারে না।

যদি তোমরা তোমাদের সরকারের এই অপরাধজনক নীতির বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াও, তাহলে তোমাদেরই জীবন ধারণের মান আরও নিচু হবে— দোলনায় ঘুমন্ত তোমাদেরই শিশুপুত্রদের মাথার উপর নেমে আসবে যুদ্ধের বিভীষিকা।

প্রিয় বোনেরা! আমাদের দু'জনার আদর্শই এক, তাই আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবেই লড়ব।

সাম্রাজ্যবাদীরা যে সীমাহীন ঘৃণা আর মিথ্যার সাহায্যে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে তাকে তোমরা অস্বীকার কর!

তোমাদের মতই আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের ভালবাসি; তাদের সুখী করতে চাই। এই কারণেই কোন কিছুই আমাদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম আর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করতে পারবে না।

এশিয়াতেই আমাদের লক্ষ লক্ষ বোনেরা মুক্ত হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে আমাদের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা সাফল্যমণ্ডিত দেখতে পাচ্ছি। জারের ভূতপূর্ব উপনিবেশ এখন সমৃদ্ধিশালী সোভিয়েট এশিয়ায় পরিণত হয়েছে। সেখানকার মেয়েরা স্বামীর সহকর্মী রূপে

কাজ করছে, সুখী মা হয়ে সমাজ গড়ার অংশীদার হয়েছে।

এশিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন ও কোরিয়ার গণতন্ত্র এবং ভিয়েৎনামের মুক্ত এলাকায় যে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে সেখানে মেয়েদের সুখের সমস্ত রাস্তাই খোলা। এশিয়ার যে দেশই স্বাধীনতা পেয়েছে— সেইগুলি শান্তির এক একটি শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। চীনের বিপ্লব সাফল্য মণ্ডিত হওয়ায় চীনের জনতা যুদ্ধবাদীদের সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিয়েছে— শান্তি ও গণতন্ত্রের শক্তিশালী দুর্গে পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতা লড়াই-এর এই গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত সচেতন। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের মধ্যে এই একত্ব বোধই আমাদের লড়াইয়ে সাহায্য করবে। আমাদের সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের জীবন্ত প্রমাণ বিশ্ব নারী-সংঘ।

সাম্রাজ্যবাদী দেশের মেয়েদের কর্তব্য

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন ও হল্যাণ্ডের মেয়েরা! আমাদের সংগ্রাম হবে নির্মম— তাই আমরা তোমাদের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি— আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইকে জোরদার করে তোল।

তোমরা নিজেদের খুনীর দুষ্কর্মের সহকারী হয়ো না। খুনীদের অপরাধের বিরুদ্ধে তোমাদের কণ্ঠ গর্জে উঠুক!

কিছুতেই আমাদের পুত্রদের পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করতে দিও না। ঔপনিবেশিক যুদ্ধ বন্ধ কর। তোমাদের সরকারকে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, মালয় আর কোরিয়া থেকে সৈন্য সরাতে বাধ্য কর।

এশিয়ার দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা কর। জাতি সংঘের সমস্ত লোকের মুক্তির প্রস্তাব সমর্থন কর। মারণাস্ত্র কামানের সামরিক কর্ম আর আণবিক বোমা নিষিদ্ধ করার দাবি কর।

তোমাদের দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন কর। তোমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে যে বিজয়ই তুমি লাভ কর তাই আমাদের সাহায্য করবে।

আমাদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে স্থায়ী স্বাধীনতার জন্য, পৃথিবীর সমস্ত লোকের মধ্যে বন্ধুত্বের জন্য, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের— যে ভবিষ্যতে নেই যুদ্ধ, নেই দাসত্ব আছে কেবল স্থায়ী ন্যায় ও শান্তি— তার জন্য লড়াই কর।

সারা পৃথিবীর নারী জাতির ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক!

টীকা : ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত সারা এশিয়ার এই নারী সম্মেলনে ভারত থেকে মহিলা প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন— একথা সম্মেলনের কার্য বিবরণীতে বলা আছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেউ অংশগ্রহণ করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। এ ব্যাপারে প্রবীণা ও বিশিষ্ট দু'জন মহিলা নেত্রী— বিদ্যা মুন্সী ও বাণী দাশগুপ্তও কিছু মনে করতে পারলেন না। তবে দু'জনেই এটুকু জানালেন যে, সে সময় বাংলার পার্টি বে-আইনি ছিল এবং বিভিন্ন গণ সংগঠনের নেতৃবর্গের কাজকর্মের ওপর সরকারের খুবই সজাগ দৃষ্টি ছিল। সম্ভবত, এই কারণে এই রাজ্যের কারো পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি বলে তাঁরা জানান। তাঁদের অনুমানটা সত্য বলে ধরা যেতে পারে এই কারণে যে এই সম্মেলন পূর্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত করার কথা ছিল যার কোন অনুমতি নেহরু সরকার দেন নি। এই কথাটা সম্মেলন রিপোর্টের ভূমিকাতেই লেখা আছে। — সম্পাদক

মায়েদের প্রতি ম্যাকসিম গোর্কীর আবেদন

... ইউরোপীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত কবতে চাইছে যুদ্ধ এবং যে অসংখ্য মানুষের ধ্বংসাবশেষ, যারা আজও নিহত, পঙ্গু কিংবা উন্মাদ হয়নি, তাদের টেনে নামাতে চাইছে সে বন্য জন্তুর স্তরে। এর বিরুদ্ধে উদাত্ত প্রতিবাদ জানাবে কে, এই আশু দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করার শক্তি রাখে কে?

আজ তাই সমগ্র নারীজাতির কাছে সমস্ত মায়েদের কাছে আমার এই আকুল আবেদন। শুধুমাত্র আমেরিকার ২,৭৫,০০০ মহিলার কাছে নয়, বিগত হত্যাকাণ্ডের ফলে স্বজনসন্ততিহারা ইউরোপের লক্ষ লক্ষ মায়েদের কাছেই নয়, সেই সমস্ত মায়েদের কাছেও আজ আমার আবেদন, হয়তো আগামীকাল কিংবা এক বছরের মধ্যেই যাদের সন্তানদের জীবননাশের সম্ভাবনা। কেন তোমরা চুপ করে আছো মা, তোমরা যারা অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে সন্তানবহন করেছো? কেন তোমরা উন্মত্ততার প্রতিবাদে তোমাদের তীব্র কণ্ঠস্বর তুলছো না, এই উন্মত্ততা, যা সমস্ত দুনিয়াকে আর একবার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন করতে উদ্যত হয়েছে? তোমরা, মায়েরাই যে সেই একমাত্র ও চিরকালের প্রাণশক্তি, যারা মৃত্যুআকীর্ণ এই সংসারকে নতুন করে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারো— প্রত্যেক মুহূর্তে মৃত্যু যেমন একেকটি মানুষকে পেড়ে ফেলছে মাটিতে, তেমনি সেই মুহূর্তেই— হয়তো অন্য কোথাও, দুনিয়ার অন্য কোনও কোণে— ধ্বংসের দুর্বার শক্তিকে পরাভূত করছো তুমি, তুমি নারী সেখানে দুনিয়াকে উপহার দিচ্ছো একটি নবজাতক।

শিশুকে তোমরা লালন করেছো মাতৃদুগ্ধে আর হাত ধরে তাকে পৌঁছে দিয়েছো তার বৃহত্তর জীবনে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়— যার শ্রমশক্তির ফল পৃথিবীর ঐহিক সম্পদ সেই কর্মী হিসেবে, বীর হিসেবে, মানবসভ্যতার অগ্রদূত হিসেবে, ঋষি হিসেবে, প্রতিভাবান চিন্তাশীল হিসেবে। সেই তোমরা, কী করে এত মাথা ঠাণ্ডা রেখে আজ তার ধ্বংসের ষড়যন্ত্রকে মেনে নিতে চলেছো?

... তোমাদের অসংখ্য সন্তানদের কাছেই যে বিশ্বের ইতিহাসের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য ও মহত্ত্ব ঋণী। কত কত যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে ওঁরা আমাদের জীবনকে ধন্য করেছেন, ওঁদের সৃজনীপ্রতিভার অসামান্য দ্যুতিতে আমাদের প্রাণধারণকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছেন : তোমাদের এই সব সন্তানদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা মহত্তর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে— মানুষ পশু থেকে মানুষ হয়েছে। আজ সেই মানুষ, যাকে তোমরা নিজের হাতে মানুষ করেছো, সে যখন আবার হিংস্র পশুতে, বন্য জন্তুতে রূপান্তরিত হতে চলেছে, খুনীর

পেশা গ্রহণ করছে, তখন কী করে তা সহ্য করছো মা?

কেন তোমরা হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে চিৎকার করে তোমাদের উন্মাদ সন্তানদের ডেকে বলছো না, "ওরে, তোরা এই নরহত্যা বন্ধ কর! একে অন্যকে খুন করায় ক্ষান্ত দে তোরা! তোদের আমরা যে সংসারে এনেছি শুধু বাঁচার জন্যেই, শ্রমের জন্যে আর সৃষ্টির জন্যে, যাতে তোরা মানুষের জীবনকে মধুময় করে তুলতে পারিস, যাতে জীবন হয়ে ওঠে ন্যায়নিষ্ঠ, বিচক্ষণ, সুন্দর। যথেষ্ট দেখেছি তোদের হাওয়াই যুদ্ধ, পরস্পরকে খুন করার জন্যে বিষের ধোঁয়া আর যত সব শয়তানি আবিষ্কার যথেষ্ট দেখলুম। এবার ক্ষান্ত হও।"

দুনিয়ার ঘরে ঘরে যত সব মা-বোন-বধূরা! এ-বিষয়ে তোমাদেরই কথা বলার অধিকার আছে যে, আইন তৈরির অধিকার আছে তোমাদেরই। তোমরাই যে জীবনের জন্মদাত্রী, তাই মৃত্যুর আক্রমণের বিরুদ্ধে জীবনকে রক্ষার জন্য তোমাদেরই দাঁড়াতে হবে এক হয়ে। তোমরা যে মরণের চিরশত্রু। তোমরাই যে সেই প্রাণশক্তি যা অনবরত সফল সংগ্রাম চালাচ্ছে মরণের সঙ্গে। তোমরা যে চির বিজয়িনী।

তবে কেন, কেন এই আসন্ন উন্মাদ দিনগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখনও সন্তানদের পাশবিক হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসছো না? কেন তোমরা মুখর হয়ে উঠছো না জীবনের স্বপক্ষে? যারা ধ্বংস আর মৃত্যুর জন্যে লালায়িত কেন তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ফেটে পড়ছে না? কেন?

(বঙ্গীয় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির মুখপত্র, ২ অক্টোবর, ১৯৪৯)

টিকা : এই সহায়ক তথ্যটি FSU-এর প্রচারপত্রে পুণর্মুদ্রিত করা হয়েছিল ২ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে। ১৯৩৫ সালের ২১ জুন রোমাঁ রোলাঁ, আঁরি বারব্যুস ও ম্যাকসিম গোর্কি ইউরোপ জুড়ে ফ্যাসিস্ত শক্তির হিংস্র কার্যকলাপ, বীভৎস তাণ্ডব এবং যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতিকে পরাস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সেসময় গোর্কির এই অবেদনটি লিখিত হয়েছিল। তারই প্রাসঙ্গিকতা বুঝে FSU এই আবেদনের পুণর্মুদ্রণ করেছিল সারা এশিয়ার নারী সম্মেলনের প্রাক্কালে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল পিকিংয়ে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রসঙ্গত, ম্যাকসিম গোর্কি মারা গেছিলেন ১৯৩৬ সালের ১৮ জুন। — সম্পাদক

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ ও বিভ্রান্তি

বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা পার্টির বেআইনি পর্বে খুব যে শক্তিশালী ছিল, তা বলা যায় না। যতদিন শ্রমিকরা এক ছাতার তলায় ছিল, অর্থাৎ দেশের সবচাইতে পুরাতন এবং সবচাইতে শক্তিশালী ইউনিয়ন AITUC-র অধীনে ছিল, ততদিন শ্রমিক আন্দোলনে একটা জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দ্রুত সম্ভাবনার মুহুর্ত লক্ষ্য করে এবং কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলনের জোয়ার লক্ষ্য করে কংগ্রেসের অনুগত শ্রমিক নেতারা AITUC থেকে নিজেদের শ্রমিক শ্রেণিকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের জাতীয় টি ইউ সি (INTUC) গঠন করেছিল। এটা ঘটেছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বেই।

স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্য কী এবং সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতির পথ কী হবে, তার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতপার্থক্য প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলো। ফলে AITUC র অভ্যন্তরে থেকে মূল শ্রমিক আন্দোলনে কাজ করতে থাকা অন্য রাজনৈতিক দলের লোকেরা Parent সংগঠনটিকে পরিত্যাগ করে নিজেদের শ্রমিক সংগঠন তৈরি করল। এ থেকে জন্মলাভ করতে থাকল আরও কিছু ইউনিয়নের।

স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে যখন কংগ্রেসের নিপীড়ন নীতির প্রয়োগ ঘটতে থাকল, সে সময় AITUC'র বিভাজনের ফলে এবং কংগ্রেসের INTUC গঠনের দরুন পাল্টা আঘাতের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এটা যে কেবল INTUC সংগঠন তৈরি হওয়ার জন্যই হয়েছিল তা কিন্তু নয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে আরেকটি অংশ AITUC থেকে বেরিয়ে এল। এঁরা রাজনৈতিক দিক থেকে মূলত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী পার্টির অন্তর্ভুক্ত। এরা কংগ্রেস থেকেও বেরিয়ে এসেছিলেন বলে INTUC তে যোগদান না করে গঠন করলেন হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েত। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে পরিচালিত ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার-এর সঙ্গে হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েত যৌথভাবে ১৯৪৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর এক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে গঠন করলেন হিন্দ মজদুর সভা। তবে সভার মধ্যে একদল এই সংগঠনের লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতে না পেরে ৩ দিন পর United Trade Union Commitee স্থাপন করলেন। এরই আবার একটি অংশ মৃণাল কান্তি বসুর সভাপতিত্বে ১৯৪৯ সালের ৩০ এপ্রিল গঠন করলেন United Trade Union Congress। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর.সি.পি.আই প্রভৃতি দলগুলি। পরবর্তীকালে

আর.এস.পি থেকে যখন এস.ইউ.সি তৈরি হল, তখন UTUC ভেঙ্গে দু'টো সংগঠন তৈরি হল— UTUC (লেনিন সরণী) এবং UTUC (বৌবাজার)।

ট্রেড ইউনিয়নের এই ক্রমাগত বিভক্তিকরণ বাংলার শ্রমিক আন্দোলনকে বিশেষভাবে দুর্বল করে তুলেছিল। স্বাধীনতার ঠিক প্রাক্কালে AITUC সংগঠনের বিভক্তিকরণের পিছনে কাজ করেছিল কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী এবং শ্রেণিসংগ্রাম বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি। এটা ছিল AITUC র দক্ষিণদিকের ভাঙ্গন। আর স্বাধীনতার পরে সি.পি.আই এর প্রভাব প্রাধান্য যুক্ত AITUC র বামদিক থেকে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, শ্রমিক আন্দোলনে আরও ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল পরবর্তীকালে। যেমন পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি জনসংঘ, যা পরবর্তীকালে বিজেপি নাম গ্রহণ করেছিল, তৈরি করল নিজেদের শ্রমিক সংগঠন-ভারতীয় মজদুর সংঘ। দেখা যাচ্ছে সবই ছিল রাজনৈতিক দলসৃষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন। এই সব শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে ৩টি ধারা বিদ্যমান ছিল এবং তা আজও রয়েছে। এগুলি হল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ধারা (কংগ্রেস), হিন্দু পুণরুত্থানবাদী ধারা (জনসংঘ) এবং শ্রমিক-কৃষকের ধারা (সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি ইত্যাদি)। এগুলি ছাড়াও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। যেমন পার্টি বে-আইনি থাকাকালীন AITUC থেকে বেরিয়ে মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা গঠন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন। আবার পৃথক ভাবে গঠিত হয়েছিল বামপন্থী মানসিকতাসম্পন্ন নেতৃত্বের উদ্যোগে ফেডারেশন অব মার্কেন্টাইল এম্পলয়িজ ইউনিয়ন।

১৯৪৮ সালের ১৫ অগষ্ট, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারিয়েট "ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে প্রস্তাব"— এ স্বাধীনতার পরবর্তী ১ বছর সময়কালের শ্রমিক আন্দোলনের পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেছিল। তাতে মূল যে বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছিল সেগুলি হল: (১) অর্থনৈতিক সংকটের চাপে পুঁজিপতি ও সরকার উভয়েই শ্রমিকের মজুরির ওপর আঘাত দিয়ে সংকট সমাধানের চেষ্টা করছে। (২) এই অবস্থায় INTUC-র কর্মীরা পর্যন্ত ধর্মঘটে অংশ নিচ্ছে। (৩) সরকার ও পুঁজিপতিরা এর বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ শুরু করেছে। (৪) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট যতই তীব্র হচ্ছে, বুর্জোয়াদের সম্পর্কে মোহ ততই কেটে যাচ্ছে। (৫) ব্যাপক গণজাগরণ ও বিরাট সাধারণ ধর্মঘট দেশের রাজনীতির ওপর দিক-পরিবর্তনের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

পরিস্থিতির এই মূল্যায়ণের পাশে ত্রুটির কথাও পার্টি সেক্রেটারিয়েট উল্লেখ করেছিল। সেগুলি হল: (১) সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তাকে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় নি। (২) সরকারি চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে উপযুক্ত টেক্‌নিক্যাল প্রস্তুতি ছিল না। (৩) জাতীয় সংস্কারপন্থী, INTUC, সোশ্যালিস্ট নেতৃবৃন্দ, কংগ্রেস ও সরকারের মুখোস সঠিকভাবে খুলে ধরতে না পারা। (৪) মৌখিক প্রচারকার্য ও লেখার মধ্যেই প্রতিপক্ষের স্বরূপ উদঘাটনের কাজকে কেন্দ্রীভূত করে রাখা।

এই ত্রুটির দিকে লক্ষ্য রেখেই সেক্রেটারিয়েট মনে করেছিল যে, "পরিবর্তিত অবস্থায় আজ আর পুরাতন পন্থায় ভাবিলে চলিবে না...। চন্ডনীতির রাজত্বে আমাদের কৌশল হইবে দ্রুত আঘাত করিবার কৌশল।"

এরপর ওই প্রস্তাবে "আন্দোলন ও সংগ্রামের বিস্তৃত কর্মকৌশল" নিয়ে আলোচনা করা

হয়েছে। "আগামী দিনে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের গুরুত্ব" নিয়ে আলোচনায়-পার্টি প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ শক্তিই একমাত্র জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাকে জাগ্রত করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পরিচালিত করিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা যে স্তব্ধভাব দেখিতেছি, আমাদের কাজের দ্বারা আমরা উহাকে ঝড়ের পূর্বমুহূর্তের স্তব্ধতায় পরিবর্তিত করিতে পারি।"

এর পর ওই প্রস্তাবে ১৯৪৭এর ১৫ অগস্টের পর বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়। এই সময় কলকাতার মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মধ্যে "ট্রাইব্যুনাল" বিরোধী অভিযান শুরু হয়ে গেছিল। সওদাগরী অফিস, বীমা ও ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির এক কনফেডারেশন গঠিত হয়েছিল— এক যোগে ট্রাইব্যুনালে লড়বার জন্য এবং দরকারে সংগ্রাম করার জন্য। এই সময় শুরু হয়েছিল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘট। সরকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ১৮০০০ কর্মচারীর মধ্যে ১৭৫০০ হরতাল পালন করেছিল। শেষপর্যন্ত হরতালীরা কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাব ভাঙ্গতে সক্ষম হয়েছিল। কর্তৃপক্ষকে মীমাংসার পথে আনতে বাধ্য করেছিল যা বিগত ৬ মাসে কোন ভাবেই সম্ভবপর হয়নি।

পার্টি সেক্রেটারিয়েটের এই প্রস্তাব পার্টি সভ্যদের কাছে কমিউনিষ্ট বুলেটিন মারফৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।[১]

সে সময় কমিউনিষ্টদের ওপর ক্রমাগত দোষারোপ করে চলেছেন জহরলাল নেহরু। ধর্মঘট, উৎপাদন ব্যাহত করা এবং সারা দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিকে দায়ি করতে থাকলেন। ফলে সারা ভারতজুড়ে চলতে থাকে কমিউনিষ্টদের ওপর আক্রমণ। আনুষ্ঠানিক ভাবে না হলেও, সারা দেশে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনি করে রাখা হল। বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়াও, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিন প্রভৃতি অঞ্চলে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে আইনি ঘোষণা করা হয়েছিল।

এই রকম এক অবস্থায় বাংলায় কমিউনিষ্টদের উদ্যোগে ৩টি আন্দোলন উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথমটি ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট। দ্বিতীয়টি কলকাতা কর্পোরেশন শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং তৃতীয়টি হল রেল ধর্মঘট। এই তিনটি ধর্মঘট বিষয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ সেই সময়কার বিদ্যমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই ধর্মঘটগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল প্রচুর।

(ক) ট্রাম ধর্মঘট— ট্রাম শ্রমিকদের এই ধর্মঘটটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর। এটি ছিল বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার আগে এক "প্রতীক ধর্মঘট"। এই ধর্মঘটটি ছিল শ্রমিকদের নিজস্ব অর্থনৈতিক দাবি বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের রায়, ট্রাম শ্রমিকদেব ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং সরকারি নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত। এ ব্যাপারে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির উদ্যোগে একটি নোট কলকাতা ও হাওড়া জেলার সদস্যদের উদ্দেশে প্রচার করা হয়েছিল। এই নোটকে বলা হত "প্রোসেক্ট স্পেশাল নোট"। এই ধরণের নোট সে সময় পার্টি মাঝে মাঝেই প্রকাশ কর্রত। এই নোটের দু'টি উল্লেখযোগ্য অংশ হল: "যাহারা এত দিন পুলিশ পল্টনের ভয়ে সংগ্রামে নামিতে ইতস্তত করিতেছিলেন, বন্দুক-পিস্তল না হইলে ধর্মঘট করা যাইবে না বলিয়া 'থিওরী' তৈরি করিতেছিলেন— ট্রাম শ্রমিকরা তাঁহাদের আতংক দূর করিয়াছেন, 'থিওরী' মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। যাঁহারা এতদিন শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে 'নানা

দল' দেখিয়ে ঐক্যের উপর আস্থা হারাইতেছিলেন, ট্রাম শ্রমিক তাঁহাদের সামনে সংগ্রামী ঐক্যের পথ খুলিয়া দিয়াছেন।" "... পার্টির মধ্যে যাহারা 'দীর্ঘদিনের সংগ্রাম চাই' বলিয়া একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের বিরোধিতা করিয়াছিলেন গত কয়দিনের ঘটনা তাঁহাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, আজিকার বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে একবার সংগ্রামের বাধা চূর্ণ হইলে তাহা আর 'আংশিক সংগ্রামে' বা 'প্রতীক সংগ্রামে' সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহা আরও লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী শ্রমিক ও জনগণের সমর্থন লাভ করে, তাহা আপসহীন সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। একদিনের 'প্রতীক ধর্মঘট' শুধু ট্রাম শ্রমিক নয়, কলিকাতা ও শহরতলীর সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর মনে সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করিয়াছে।" প্রতীক ধর্মঘটের অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে বৃহত্তর আন্দোলন সফল করার জন্য এবং ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘটকে সফল করে তোলার জন্য, অন্যান্য শিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারী কমরেডদের, ছাত্র, মহিলা এবং পার্টির সমস্ত দরদী ও সমর্থকের কাছে পার্টি এই 'প্রোসেক্ট স্পেশাল নোট' প্রকাশ করেছিল।[২]

১৯৪৮ সালের পার্টি কংগ্রেসের পর, পার্টি বেশির ভাগটাই চলত 'কেন্দ্রীকতা'র ভিত্তিতে, 'গণতান্ত্রিকতা' প্রায় লুপ্ত হতে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি থাকলেও, কোন সভা আহ্বান করা হত না। সে সময় পার্টি বে-আইনি থাকার জন্য—, যোগাযোগ করাও সম্ভব ছিল না। এই ভাবে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছিল পলিটব্যুরোর হাতে। এই অবস্থায় ডিসেম্বর মাসে পার্টির গৃহীত দলিলের ভিত্তিতে পার্টি আরও জঙ্গী লাইনের দিকে এগিয়ে গেল।

(খ) রেল ধর্মঘট— এই প্রেক্ষাপটেই সংঘটিত হয়েছিল সারা ভারত রেল ধর্মঘট ১৯৪৯ সালের ৯মার্চে। পার্টির তরফ থেকে গড়ে উঠেছিল অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (AIRWF)। পার্টি এই ফেডারেশন গঠন করতে বাধ্য হয়েছিল যেহেতু সে সময় জয়প্রকাশ নারায়নের নেতৃত্বে রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশন ধর্মঘটের পথে নামতে চায় নি। দাবি ছিল "৫৫ টাকা বাঁচবার মত মজুরির দাবি।"[৩] এছাড়াও ছিল গ্রেনশপের সুযোগ তুলে নিয়ে শ্রমিকদের মজুরি কাটা, কাজের সময় ও ছুটি সম্পর্কে সালিশীর রায় চালু না করা ইত্যাদি। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্টির পলিটব্যুরো 'রেল ধর্মঘট এবং আমাদের কর্তব্য' এই শিরোনামে একটি বিরাট সার্কুলার পার্টির সব ইউনিটের কাছে পাঠিয়েছিল।[৪] রেল ধর্মঘটের পূর্বে প্রচারিত এই সার্কুলারের মূল কয়েকটি অংশ: (১) এই রেল ধর্মঘট ছিল সরকার ও পুজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ। পুঁজিবাদী সংকটের মধ্যে দিয়ে যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভ্যুদয় ঘটেছে এই ধর্মঘট হল তারই একটা প্রধান অংশ। এই লড়াই শ্রমিকশ্রেণির পক্ষে সংকটকে সমাধান করবে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পর্য্যবসিত হবে।[৫] (২) কলকাতা ও মুম্বাইয়ের মতো জায়গায় ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল সংগঠিত করে রেল কলোনিতে গিয়ে সমর্থন জানাতে হবে।[৬] রেল শ্রমিকদের লড়াই আসলে ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক সংঘাতের একটি অংশ। এই লড়াই পূর্ণ শক্তি অর্জন করলে, তা যে কোন উচ্চতায় পৌছতে পারে। এমনকি কলকাতার মতো শহরে স্থানীয়ভাবে এই লড়াই অন্যরকম পরিবেশও সৃষ্টি করতে পারে।[৭] শ্রমিকের ওপর হামলা সশস্ত্র উপায়ে হলেও রুখতে হবে। এমন কী আক্রান্ত হবার আগেই আমরা আক্রমণ চালাব।[৮]

সার্কুলারের এই সব দিক গুলি পড়লেই বোঝা যায় পার্টি সে সময় মনে করেছিল এই রেল

ধর্মঘটের মধ্যে দিয়েই ঘটবে জঙ্গী রণকৌশলের প্রয়োগ এবং বিপ্লবের সূচনা। এই রেল ধর্মঘটকে ভাঙ্গার জন্য গ্রেপ্তার চলল, সামরিক আইন চালু হল, রেল কলোনী গুলিকে সশস্ত্র প্রহরায় রেখে দেওয়া হল। বাংলায় এই রেল ধর্মঘটকে সফল করার জন্য জ্যোতি বসু, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, অজয় দাশগুপ্ত, কুমুদ বিশ্বাস, কমল সরকার, প্রমুখ কমরেড বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু ধর্মঘটের এতো প্রস্তুতি নেওয়া সত্ত্বেও রেলের চাকা বন্ধ হল না, রেল ধর্মঘটের সমর্থনে সাধারণ মানুষ এগিয়েও এল না। আসন্ন বিপ্লবের সূচনাতো দূরের কথা। ৯ মার্চের রেল ধর্মঘট ব্যর্থ হল। এই ব্যর্থতার পিছনে ছিল সরকার, জাতীয় টি ইউ সি এবং সোশ্যালিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

রেল ধর্মঘট প্রসঙ্গে প্রাদেশিক কমিটি ১২নং কমিউনিস্ট বুলেটিনে পার্টিসংগঠনের সংস্কারবাদী চরিত্রকেই দায়ি করেছিল। এমন কী পলিটব্যুরোর মতে বাংলা কমিটিতে দক্ষিণ পন্থী সংস্কারবাদী ঝোঁকের পুণরাবির্ভাবের কথাও তুলে ধরা হল।[৯]

(গ) ঠিক একই রকমভাবে পার্টি আশা করেছিল যে ১৯৪৯ সালের ৮ নভেম্বর তারিখের চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের মধ্যে দিয়েও ঘটবে বিপ্লবী সংগ্রামের সূচনা। কিন্তু তা ঘটলো না। চটকল শ্রমিকদের মধ্যে যে ধরনের সংগঠন হরতালের জন্য প্রয়োজন ছিল, তার কোন চেষ্টাই করা হয় নি।

(ঘ) এরপর উল্লেখ করার দরকার কলকাতা কর্পোরেশনের ২২ হাজার শ্রমিকের ৯ দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক ধর্মঘটের কথা। এই ধর্মঘট প্রথম সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে। এই ধর্মঘট শুধু পার্টি ও লালঝাণ্ডার ডাকে আহূত হলেও, পার্টি কর্মীদের মধ্যে এর তেমন কোন সাড়া পড়েনি। তাছাড়া উচ্চতর নেতৃত্বের বিনা পরামর্শেই তা সংগঠিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই ধর্মঘট তুলে নিয়ে জাতীয় টি ইউ সির নেতাদের সাথে একসঙ্গে মিলে ২২ অক্টোবর থেকে একটানা ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই ধর্মঘট চলেছিল ৯ দিন। তবে ধর্মঘট চলাকালীন জাতীয় টি.ইউ.সি নেতাদের দালালী ও বিশ্বাস-ঘাতকতা, কংগ্রেস সরকারের দমন পীড়ন নীতি এবং এর বিরুদ্ধে পার্টির তরফ থেকে যথেষ্ট প্রচার করতে না পারা—এই সব কারণে ধর্মঘট সফল হল না।

"কলিকাতা কর্পোরেশনের ধর্মঘট হইতে কি শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে?" এই শিরোনামে পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটি একটি সার্কুলার 'কমিউনিষ্ট বুলেটিনে' ছাপিয়েছিল। তাতে এই ধর্মঘটের ব্যর্থতা সম্পর্কে বলা হয়েছিল: "শুধু পুলিশ-মিলিটারী নয়, ছাঁটাই এর হুকুম নয়, 'জাতীয়' টি.ইউ.সি'র দালালীও নয়—পার্টির ...দুর্বলতার জন্যে ২২ হাজার শ্রমিককে ৯দিন পব কাজে ফিরিয়ে যাইতে হইয়াছে।" দুর্বলতার মধ্যে প্রধান ছিল "বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বিপ্লবী তাৎপর্য " কে বুঝতে না পারা। সার্কুলারে বলা হয়েছে, "ধর্মঘট ৪/৫ দিন চলিবার পরও সমস্ত পার্টি সভ্য-এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছে। তাহারা তর্ক করিয়াছে: শান্তি সম্মেলনের কাজ করিব, না কর্পোরেশন ধর্মঘটে সাহায্য করিব, কর্পোরেশন ধর্মঘটে সাহায্য করিব, না চটকল ধর্মঘটের জন্যে প্রস্তুত হইব। এই প্রশ্ন তখনই আসে যখন পার্টিসভ্যদের সামনে আমরা একথা পরিষ্কার করিয়া বলি না যে, বিপ্লব এখন আর দূরে নয়, আমরা ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে প্রবেশ করিয়াছি। ... "শান্তি সম্মেলন, কর্পোরেশন ধর্মঘট, চটকলের সাধারণ ধর্মঘট, ছাত্রদের ধর্মঘট এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন—দশটা দশরকমের কাজ নয়, দশটা স্রোত আসিয়া

বিপ্লবের সমুদ্রে মিশিয়াছে।''[১০]

'মার্ক্সবাদী' পত্রিকার ষষ্ঠ সংকলনে ভারতের ছাত্র আন্দোলন শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে সে সময় ''এ আই এস এফ এর প্রায় এক হাজার ছাত্রসভা ছিল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।'' এইভাবে ১৯৪৯ সালের মে মাস নাগাদ সারা ভারতে কারারুদ্ধ কমিউনিস্ট ও তার সহযোদ্ধা ২৫০০০ এবং তা ছাড়া বিচারাধীন বন্দির সংখ্যা ছিল ৫০০০০ এর কাছাকাছি। বাংলার প্রাদেশিক কমিটি এক বুলেটিনে এই সব কমরেডদের উদ্দেশে বলে যে ''জেলের মধ্যে আমাদের বন্দী কমরেডগণ অতুলনীয় ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালাইয়াছেন। ... জেলখানার এই সংগ্রাম জনতার বিপ্লবী শক্তিকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে, বিপ্লবী সংগ্রামের নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে।''[১১]

হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ডাক

এই পর্বে বাংলায় আবার দাঙ্গার আশংকা দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেসী নেতারা পিছন থেকে হিন্দু মহাসেবা— আর এস এস গুন্ডাদের দিয়ে ভারতের মুসলমানদের বিতাড়নের কাজ করেছিল। পদ্ধতিটা ছিল অদ্ভুত। প্রতিদিন যে সমস্ত হিন্দুরা হাজার হাজার বাস্তুহারা হয়ে ভারতে আসছিল, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ত দূরের কথা, বরং কংগ্রেসী নেতারা গুন্ডাদের সামনে রেখে দাঙ্গার ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছিল, যেমন: মুসলিমদের বস্তীতে নিয়ে যাওয়া, তাদেরকে উচ্ছেদ করা, মুসলিম শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ করা ইত্যাদি। সে সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল ''এখন প্রয়োজন উভয় বাংলায় সংখ্যাল্পদের 'বাচানোর' জন্যে কাশ্মীর কমিশনের মতো একটি কমিশন বাংলায় পাঠানো।'' সেদিন সিপি আই এই দাবির-বিরোধিতা করেছিল। কারণ এর অর্থ হল বাংলার বুকে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বসানো এবং দাঙ্গাবাজদের মদৎ দেওয়া। পার্টি আবেদন করেছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকলে জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিন এবং সোচ্চারে দাবি তুলেছিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথের শৃঙ্খল ধ্বংস হোক। শুধু তাই নয়, বাস্তুহারাদের বাসস্থান, জমি ও ভাতার জন্যে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছিল কমিউনিস্টরা। বাস্তুহারা ও তাদের সমস্যা সমাধানে সি. পি. আই এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রচেষ্টাই দাঙ্গার আবহাওয়াকে দূর করার বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।[১২]

দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচন

১৯৪৯ সালের ১২ জুন দক্ষিণ কলকাতায় একটি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই নির্বাচনের পটভূমিতে ছিল কংগ্রেস সরকার কতৃক কালা কানুনের প্রবর্তন, ব্যক্তি স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ, বন্দী নির্যাতন, কমনওয়েলথে যোগদান, দূর্ভিক্ষ ও বেকারির সৃষ্টি, নির্বিচারে শিশু ও নারী হত্যা প্রভৃতি। ফলে জনতার মধ্যে ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। এই অবস্থায় ব্যাপকভাবে কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে মোহমুক্তি ঘটতে থাকে।[১৩]

কমিউনিষ্ট পার্টি তখন বে-আইনি। তাই পার্টির কোন প্রার্থী ছিল না। নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন কংগ্রেসের তরফ থেকে সুরেশ দাস এবং অপর প্রার্থী ছিলেন শরৎ বসু। কমিউনিস্ট

পার্টি এই নির্বাচনে শরৎ বসুকে সমর্থন করেছিল। কংগ্রেসকে হারানোর জন্য এই সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। আর তা সম্ভবও হয়েছিল। নির্বাচনী পর্যালোচনায় কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল— এ নির্বাচন কোন মামুলি নির্বাচন নয়, এ হল ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শ্রেণিসংগ্রাম আরও তীব্র হয়ে উঠবে।[১৪]

'কমিউনিস্ট ভায়োলেন্স ইন ইন্ডিয়া'— একটি সরকারি শ্বেতপত্র

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রকাশিত এই শ্বেতপত্রটি হল আসলে কমিউনিস্টদের ওপর হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ তুলে কমিউনিস্ট নিধনের সরকারি দমন পীড়নকে সমর্থন দানের প্রয়াস।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর অতিবামপন্থী হঠকারী লাইন অনুসরণ করার মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি জঙ্গী লাইন নিয়ে এগিয়েছিল। তবে তা এমন ছিল না যাকে বলা যেতে পারে যে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের দিনগুলিতে কমিউনিস্টদের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল: মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সভা-সমাবেশ সংগঠিত করা, সরকারি পরিবহনকে বানচাল করা, কোথাও কোথাও বোমা ছোঁড়া ও আগুন লাগানো, পুলিশের গাড়ীর ওপর আক্রমণ ইত্যাদি। তবে এই কার্যক্রমের জন্য কংগ্রেস সরকার যে ধরনের প্রতিহিংসার আশ্রয় নিয়েছিল, সেটার আসল কারণ ছিল কমিউনিস্টদের কর্মসূচির মধ্যে আন্দোলনমুখী ব্যাপকতা ও জঙ্গীত্ব। আর এই কর্মসূচির দাবির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল: শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি, বর্গাদারদের-তে-ভাগার আন্দোলন, নাগরিক অধিকারের দাবি, বন্দীমুক্তির দাবি, বাস্তুহারাদের সমস্যা, মহিলাদেব অধিকার ইত্যাদি। এতেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল সরকারি যন্ত্র। একথাও সত্য যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর সরকারের দমন পীড়ন নীতির নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রয়োগের প্রতিক্রিয়ায় এটা স্বাভাবিক যে পার্টি লাইন প্রয়োগের জঙ্গীত্ব মনোভাব আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আমরা স্মরণ করতে পারি ১৯৪৬ সালের সারাদেশব্যাপী আন্দোলনের পুরোভাগে কমিউনিস্টদের ভূমিকার কথা। তাঁদের এই ভূমিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ব্রিটিশ হেড কোয়ার্টার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দিয়ে Operation Asylum এই কোড নামে কমিউনিস্টদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করে দিয়েছিল। ব্যাপক ধরপাকড় খানাতল্লাশী শুরু হয়েগেল ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে। উদ্দেশ্য ছিল সে সময়কার আন্দোলনের রাশ টেনে ধরা এবং ব্রিটিশের সাথে আপস করে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করা। স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও তেলেঙ্গানা, তে-ভাগা ও বাস্তুহারাদের পুণর্বাসনের দাবি নিয়ে কমিউনিস্টরা আন্দোলন চালিয়েছিল। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা ছিল অব্যাহত। তবে ভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইনের ভ্রান্ত পদ্ধতিও ছিল। সরকার এবারে এগিয়ে এল কমিউনিস্ট নিধনের কাজে এবং তার জন্য একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হল। এটির নাম দেওয়া হল Communist violence in India। এটি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত হয়েছিল। ভারতের বুকে 'কমিউনিস্ট তান্ডব' উল্লেখের মধ্যে সরকারের তরফ থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনোভাব ছিল, আবার কমিউনিস্টদের তরফ থেকে হঠকারী লাইনের বাড়াবাড়িটাও কম ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণি কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আর কংগ্রেস পার্টি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় কমিউনিস্টদের ওপর শ্বেত সন্ত্রাস সৃষ্টি করার সমর্থনে শ্বেতপত্রে উল্লেখ্য ঘটনার বিবরণেও বাড়াবাড়ি করেছে।

ভারতের বুকে 'কমিউনিস্ট তান্ডব' এর এই শ্বেতপত্রটি ১৯৪৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি

গণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী নেহরু পেশ করেছিলেন। এই শ্বেত পত্রের প্রথম অধ্যায় হল "সরকার এবং কমিউনিস্টরা"। নেহেরুর বক্তব্য হল কমিউনিস্টদের "নাগরিক অধিকার রক্ষা করার দাবি আসলে জঘন্য সমাজবিরোধী কাজ করার অবাধ স্বাধীনতার দাবি, এটা এদের কৌশলের অঙ্গ।" তিনি আরও বলেছেন কমিউনিস্টরা ব্যাপক হিংসার সাহায্যে ধর্মঘট সংগঠিত করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য হল দেশব্যাপী একটা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় অধ্যায়টি হল "হিংসার প্রচারক কমিউনিস্টরা।" এতে বলা হয়েছে ভারতের কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য 'শক ব্রিগেড' পাঠক্রম তৈরি করেছে। এতে গেরিলা কার্যকলাপের কথাও বলা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে "কমিউনিস্ট হিংসার কিছু নমুনা।" চতুর্থ অধ্যায়টি হল "জনগনের প্রতিরোধ " সংক্রান্ত। পঞ্চম অধ্যায়টি হল সরকার কী সিদ্ধান্ত নিতে চায়। এই শ্বেত পত্রের পরিশিষ্টে ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ অগষ্ট পর্যন্ত ঘটে যাওয়া 'কমিউনিস্ট দুষ্কর্মের' একটি তালিকা দেওয়া হয়েছিল।[১৫]

পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া এবং আত্মসমালোচনা

বাস্তব পরিস্থিতি এবং নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে আমল না দিয়ে ভ্রান্ত রাজনৈতিক হঠকারিতার লাইন অনুসরণ করার মধ্যে দিয়ে কোথাও কোন সফলতা দেখা গেল না। পার্টির অভ্যন্তরে তখন বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে। এই রকম এক অবস্থায় রেল ধর্মঘটের ব্যর্থতার পরেই শুরু হয়ে গেল ভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইন অনুসারে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে হঠকারী সংস্কারের কাজ। অর্থাৎ পার্টি সংগঠনের পুণর্গঠনের প্রক্রিয়া চালু হল 'উপর থেকে নীচে'। অতিবামপন্থী হঠকারিতার প্রথম বলি যদি হয়ে থাকে বিপ্লবের স্তর ও বিপ্লবের পরিস্থিতি নির্ণয়ের মার্ক্সবাদী বিচার বিশ্লেষনের পদ্ধতি, এর দ্বিতীয় বলি হল কমিউনিস্ট সংগঠন চালাবার লেনিনীয় সাংগঠনিক রীতিনীতি। রাজ্যসম্মেলন থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক কমিটিকে বাতিল করার সুপারিশ জানিয়ে ভবানী সেন পলিটব্যুরোর কাছে আবেদন করলেন। পলিটব্যুরো ৭ জনকে নিয়ে এক সম্পাদক মন্ডলী গঠন করে দিল। সে সময় ডা: রণেন সেন ছিলেন রাজ্যসম্পাদক। তাঁকে সম্পাদকমন্ডলীতেও রাখা হল না। নতুন রাজ্যসম্পাদক হলেন মহম্মদ ইসমাইল। সম্পাদকমন্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা হলেন নৃপেন চক্রবর্তী, গোপেন চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, ধীরেন মজুমদার, রেজ্জাক খাঁ ও অন্নদা শঙ্কর ভট্টাচার্য। এই ভাবে নীচের কমিটি গুলিও, উপরের কমিটির দ্বারা মনোনীত হতে থাকল।[১৬] একটি নীতি ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল যে কমিটিতে সম্পাদক হবেন শ্রমিক অথবা কৃষক।

এমনি করেই পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি কলকাতা জেলা কমিটিকে পুণর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে সময় জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন কুমুদ বিশ্বাস। তাঁকে পার্টি সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। কলকাতা জেলার সাধারণ পার্টি সভ্যদের ইচ্ছা অনুসারে এবং পলিটব্যুরোর প্রস্তাবে যে সকল বৈপ্লবিক সাংগঠনিক মূলনীতি লিপিবদ্ধ ছিল তার ভিত্তিতে প্রাদেশিক কমিটি নিম্নলিখিত সভ্যদের নিয়ে জেলা কমিটি পুণর্গঠন করল। এঁরা হলেন (১) হরেন, (২) কালীপদ (মালাকার), (৩) মালেক, (৪) ইরসাদ, (৫) সীতারাম, (৬) প্রভাত দাশগুপ্ত, (৭) কমলাপতি রায়। এই ৭ জনের মধ্যে প্রভাত দাশগুপ্ত ও কমলাপতি রায় বাদে পাঁচজনই ছিলেন শ্রমিক কমরেড। যেমন হরেন ছিলেন ট্রামের শ্রমিক কমরেড তফশিলি পরিবারের সন্তান। কালীপদ'র আসল নাম হরিদাস। তিনি জয়া ও অন্যান্য

কারখানার শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন। মালেক ছিলেন ইন্ডিয়া ফ্যান কাখানার একজন শ্রমিক নেতা। ইরসাদ ছিলেন গরীব বস্তিবাসীর সন্তান একজন রাজমজুর। সীতারাম ছিলেন পোর্টের একজন শ্রমিক নেতা। কমিটি পুণর্গঠিত করার পিছনে যুক্তি ছিল: শ্রমিক সংগ্রামগুলির কার্যত বিরোধিতা প্রদর্শন, শ্রমিকশ্রেণির যোগ্যব্যক্তিদের পার্টিতে স্থান না দেওয়া, মধ্যবিত্তসুলভ সন্ত্রাসবাদের দিকে আসক্তি, আমলাতান্ত্রিক ও উপদলীয় মনোভাবে লিপ্ত থাকা ইত্যাদি।[১৭] জেলা কমিটিকে এইভাবে পুণর্গঠিত করার প্রাদেশিক কমিটির প্রস্তাবকে তদানীন্তন কলকাতা পার্টির জেলা সম্পাদক কুমুদ বিশ্বাস বলেছিলেন এক "ugly document"।[১৮] সে সময় মধ্যবিত্তদের মধ্যে থেকে উঠে আসা কমরেডদেরই প্রধানত বাদ দেওয়া হচ্ছিল। যেমন কলকাতা জেলা থেকে বাদ দেওয়া হল গোপাল আচার্য ও বীরেন রায়কে এবং হাওড়া জেলার সম্পাদক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল সমর মুখার্জিকে।

১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সাল জুড়ে পার্টির লাইনকে কেন্দ্র করে যে সব কাজ চলছিল, সেগুলিই পার্টির অভ্যন্তরে তীব্র মতপার্থক্যের সৃষ্টি করেছিল এবং 'অভ্যুত্থান বা বিপ্লব' এর সম্ভাবনার ব্যর্থতা দেখা দিতে থাকল। এগুলির ফলে পার্টির অভ্যন্তরে অনেকের মধ্যে আত্মসমালোচনার সদিচ্ছা দেখা দিতে থাকে।

যেমন, উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা[১৯] এবং তারই কিছুকাল পর কলকাতা জেলা কমিটির আত্মসমালোচনামূলক বিবৃতি।[২০] যদিও পরের বিবৃতিতে কোন তারিখের উল্লেখ নেই, তবুও কয়েকটি জায়গায় তারিখ দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে এটি অর্থাৎ কলকাতা জেলা কমিটির বিবৃতিটি প্রাদেশিক কমিটির বিবৃতির পরেই প্রচারিত হয়েছিল। এই দুই বিবৃতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

প্রথম বিবৃতিটিতে জোর দেওয়া হয়েছিল "সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের" ওপর। এই সংস্কারবাদের দু'টি রূপের কথা এই দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হল যোশীপন্থী সংস্কারবাদ। এই সংস্কারবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে এটি পার্টির ভীতর খুব গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল। এটি হল যা "সংস্কারবাদের বিশ্বাসঘাতক রূপ। ইহা সবসময়ই পার্টিকে পিছনে টেনে রাখে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার নীতি প্রচার করে এবং চরম মুহূর্তে শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করে।" এই দলিলে আরেক ধরনের সংস্কারবাদের কথাও বলা হয়েছে। এটি হল পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ। এটাও "পার্টির ভিতর খুব গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে।" এটি হল "পরিস্থিতির বাস্তব রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে ও যে-সব প্রত্যক্ষ শ্লোগান জনতাকে সমাবেশ করতে পারে সেগুলি ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবী বুলি কপচানো।" এই বিবৃতিতে রণদীভের অতিবামপন্থী হঠকারী লাইনের কথার উল্লেখ নেই। তাই মনে হওয়াটা স্বাভাবিক যে, যোশীপন্থী সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটার ওপরই জোরটা মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর অতিবামপন্থী লাইনের হঠকারিতাকে গৌণ করে দেখা হয়েছিল।

এবার দ্বিতীয় দলিলটির বিষয়ে আসি। এটার শিরোনাম ছিল "কলিকাতা জিলা কমিটির আত্মসমালোচনা মূলক বিবৃতি।" এই বিবৃতির মধ্যে রয়েছে "দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর আমরা দক্ষিণ থেকে সঠিক রাস্তায় যাওয়ার পথে বামে ঘুরিলাম। টিটোবাদী পলিটব্যুরোর নেতৃত্বে বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদের উন্মুক্ত অভিযান শুরু হল।" এই লাইনের সম্পর্কে বলা হল এ হল "একদিকে ট্রটস্কিবাদী নীতি অন্যদিকে টিটোবাদী ও সাংগঠনিক পদ্ধতি।"

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হল "শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম" শিরোনামে একটি পুস্তিকা। তবে এটিতে লেখকের কোন নাম নেই। কিন্তু এটির অনুবাদ করেছিলেন 'মার্কসবাদী' পত্রিকার পরিচালকবৃন্দ। এতে প্রথমদিকে লেনিন ও স্ট্যালিন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে সংশোধনবাদের স্বাভাবিক পরিণতি হল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও সোভিয়েত বিরোধিতা।[২১]

শান্তি আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি

বাংলায় মৈত্রী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪১ সালে গঠিত সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির (Friends of the Soviet Union) মধ্যে দিয়ে। ভারতে এই সংগঠন তৈরি হয়েছিল ১৯৪১ সালে বাংলায় তৈরি হওয়ার পরে। FSU এর নাম পরিবর্তিত হয়ে ১৯৫২ সালে হয়েছিল ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি (ISCUS)। এই নামটাও পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পর পরিবর্তিত হয়েছে— ভারতের সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ও মৈত্রী সমিতি (ISCUF) নামে। শান্তি আন্দোলনের সংগঠন তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে ঘটনাটি ছিল বিপরীত। প্রথমে তৈরি হয়েছিল সারা ভারত শান্তি সংসদ ১৯৫২ সালে পাঞ্জাবে এবং ১৯৫৩ সালে মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে গঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ।

শান্তি সংগঠন তৈরি হওয়ার পূর্বে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হত অন্যান্য গণসংগঠনের উদ্যোগে। ১৯৪৯ সালের ১০ অগস্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বানে এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রভৃতি ৭০টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এর পূর্বে এপ্রিল মাসে 'শান্তির জন্য বিশ্ব মহাসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্যারিস ও প্রাগে। এতে কোটি কোটি নরনারীর মজবুত জঙ্গী ১৬টি আন্তর্জাতিক সংগঠন ছিল। যেমন— বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রী নারী ফেডারেশন, বিশ্ব গণতন্ত্রী যুব ফেডারেশন, আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশের ৫৬১টি দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন দুই হাজারের বেশি প্রতিনিধি।

আসলে সম্মেলনটি হওয়ার কথা ছিল প্যারিসে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বাধা সৃষ্টির ফলে অনেক দেশের প্রতিনিধিবৃন্দকে প্যারিসে আসতে দেওয়া হল না। এই দেশগুলি হল, চীন, গ্রীস, ইরান, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, জার্মানী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি। এই সব দেশেব ৩৮৪ জন প্রতিনিধির মহাসম্মেলন বসেছিল প্রাগে। একই সঙ্গে, একই লক্ষ্য নিয়ে একই দিনে চলল প্যারিস ও প্রাগে বিশ্ব শান্তি মহাসম্মেলন। সে লক্ষ্য হল "শান্তি আমরা লড়াই করে জিতে নেবো। ভিক্ষা করে পাবার জিনিষ তো নয়— শান্তি। মহাসম্মেলনের শেষ দিনে একটি ইস্তাহার গৃহীত হয়েছিল। বাংলার শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি সমাবেশ থেকে প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনের জন্য বিশ্বশান্তি সম্মেলনের ইস্তাহারের মর্মবস্তু নিয়ে একটি ইস্তাহার গৃহীত হয়েছিল। এই ইস্তাহারে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অনমনীয় শান্তিনীতিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। চীন,

বর্মা, (বর্তমানে মায়ানমার), ভিয়েতনাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী-বিপ্লবী জনতার শক্তিকে স্বাগত জানানো হয়। নেহেরুর পররাষ্ট্রনীতি যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই লেজুড়, তার স্বরূপ উন্মোচন করে ইস্তাহার এই পররাষ্ট্রনীতিকে পরাস্ত করার আহ্বান জানিয়েছিল।[২২]

এই প্রস্তুতি সমাবেশ থেকে একটি বৃহৎ প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন নরহরি কবিরাজ ও ডাঃ নরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি। আর দপ্তরটি ছিল ৪৬নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট (বর্তমানে লেনিন সরণী-সম্পাদক)। প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনের আয়োজনকে সফল করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটি সমস্ত পার্টি ইউনিটের কাছে এক সার্কুলার পাঠিয়ে ছিল। জেলায় জেলায় শান্তি সম্মেলন করার নির্দেশ দিয়েছিল।[২৩]

প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনকে সফল করার জন্য-বহু স্থানে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন: কলকাতা ময়দানে, হাজরা পার্কে, খিদিরপুরে, টালিগঞ্জে, ক্ষেত মজুর সম্মেলনে, রেল মজুর সম্মেলনে, চটকলে মজদুর ইউনিয়নের সম্মেলনে, রেশনিং এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনে প্রভৃতি স্থানে। এর পাশাপাশি চলেছিল আগামী সম্মেলনকে সফল করার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্র-সিনেমা-সঙ্গীত শিল্পী, অধ্যাপক, শিক্ষক, বিজ্ঞান কর্মী, আইনজীবী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল: হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সীতারাম ব্যানার্জি, ট্যাগোর ল-লেক্‌চারার বলাই লাল পাল, সাহিত্যিক রমেশ সেন, পবিত্র গাঙ্গুলী, নারায়ন গাঙ্গুলী, নবেন্দু ঘোষ, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিমল চন্দ্র ঘোষ, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ।[২৪]

শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি যে নির্বিবাদে চলেছিল, এমন নয়: সরকার ও সরকারি দলের তরফ থেকে চলেছিল শান্তি জমায়েতের ওপর দমন নীতি। নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সোভিয়েত মুহৃদ সমিতির কার্যালয়ে পুলিশ হানা দিয়েছিল।[২৫]

এরই কয়েকদিন পর প্রাদেশিক প্রস্তুতি কমিটি বিশ্বশান্তি দিবস (২ অক্টোবর) উদযাপনের জন্য সারাদিন ব্যাপী শান্তি অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল এবং ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করেছিল। বিশ্বশান্তি দিবস উদযাপনের নির্দেশ এসেছিল প্যারিসে অবস্থিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনের স্থায়ী কমিটির কাছ থেকে। এই প্রস্তাবের প্রথম উদ্যোগ এসেছিল বিশ্বট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন থেকে। একে সমর্থন জানিয়েছিল আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা সংঘ এবং বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব-সংঘ। ২ অক্টোবর শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক দিবস পালনের কতগুলি স্লোগান এবং বিশ্বশান্তির সংগ্রামে ২ অক্টোবরের তাৎপর্য-সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির প্রচার পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৬]

প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৪-৭ নভেম্বর এবং সারা ভারতের সম্মেলন হয়েছিল ২৪-২৭ নভেম্বর কলকাতায়। এই সম্মেলনের মূল প্রস্তাবটি ছিল সম্মেলনের আহ্বান বা ঘোষণাপত্র।[২৭]

এর মধ্যে ১৯৪৯ সালের ১অক্টোবর চীনের বিপ্লব সাফল্য লাভ করেছে। চীনের নয়া গণরাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানানোর জন্য বিপিটি ইউ সি'র আবেদনে ১৫ অক্টোবর কলকাতার ময়দান থেকে ৪ সহস্রাধিক নরনারীর এক মিছিল সংগঠিত হয়েছিল। এই মিছিল রাস্তার দুই

পার্শ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক অভিবাদন লাভ করেছিল। শ্লোগান উঠেছিল: 'কমরেড ষ্ট্যালিন জিন্দাবাদ', 'কমরেড মাও-সে-তুং জিন্দাবাদ', 'চীনের গণরাষ্ট্রকে মানতে হবে,' 'ভারতকা নওজোয়ান সোভিয়েত কা সাথ হ্যায়।' আরও শ্লোগান উঠেছিল 'নেহেরু বিধান কংগ্রেসী শাসনের অবসান চাই, কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ কর, কমরেড রণদীভে জিন্দাবাদ।

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাম-সংকীর্ণতাবাদী লাইনের প্রভাব

বাংলার শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা প্রভৃতি আন্দোলনে যেমন বাম-সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইনের প্রভাব পড়েছিল এবং এর বিরোধিতা বিদ্যমান ছিল, তেমনি এর প্রভাব পড়েছিল বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, যদিও সেখানেও তার বিরোধিতাও লক্ষ্য করার বিষয়। প্রথম ক্ষেত্রে যে সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ্‌দের মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক কিছু ঘটনাবলী পার্টিকে ভ্রান্ত লাইন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে চালিত করেছিল। তেমনি দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও কাজ করেছিল সোভিয়েত নেতা ও দার্শনিক ঝানভের বক্তব্য।

১৯৪৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় ঝানভ্ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর প্রভাব পড়েছিল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। যেমন: তাঁর বক্তৃতার একটি অংশ ছিল: "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সমাজবাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। ইওরোপের অনেকগুলি দেশেই সমাজবাদ-প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আশু কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। নানা জাতের সাম্রাজ্যবাদীদের এটা মনঃপূত নয়। তারা সমাজবাদকে ভয় করে। আমাদের সমাজবাদী দেশ সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের আশ্রয়স্থল-তাকে তারা ভয় করে। সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের দার্শনিক ভৃত্যেরা, তাদের বশংবদ সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক, তাদের রাজনীতিক এবং কূটনীতিকেরা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কুৎসা, সমাজবাদ সম্পর্কে ভুলধারনা সৃষ্টি করতে, সমাজবাদের কুৎসা গাইতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। এই অবস্থায় সোভিয়েত লেখকের কর্তব্য শুধু যে প্রত্যেকটি আঘাতের প্রত্যাঘাত করা তাই নয়, পরন্তু সাহসের সঙ্গে গলিত বিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে অস্বীকার করা। তাকে আক্রমণ করাও তাদেব কর্তব্য।[২৮]

এই বক্তব্যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির সবটাকেই আঘাত করার কথা বলা হয়েছে। এই অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পরিবর্তিত রণনীতি ও রণকৌশল যার প্রভাব পড়েছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ভবানী সেন এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক প্রদ্যোৎ গুহ যথাক্রমে রবীন্দ্র গুপ্ত ও প্রকাশ রায় ছদ্মনামে দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দু'টি প্রবন্ধই ছিল একই শিরোনাম দিয়ে—"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা"।[২৯] ভবানী সেন তাঁর প্রবন্ধে (১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর) পার্টির তৎকালীন অতি-বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী লাইনকে অনুসরণ করে-রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের অবদানকে ছোট কেবল নয়, বলা চলে, অস্বীকার করেছিলেন। ভবানী সেনের মতে "ভারতের ইতিহাসে রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে ধারাকে পুষ্ট করেছেন, তা প্রগতিশীল ধারা নয়, বরং তার উল্টো ধারা।"[৩০] আবার বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন "বিবেকানন্দকে উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি বলা ভুল। তিনি ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ফিউডাল শ্রেণির প্রতিনিধি।"[৩১]

আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্র গুপ্ত'র কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

যেমন: (ক) "ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ভারত যে ভাবে আবদ্ধ আছে এই বন্ধনই রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাধীনতা। ... রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের (বাংলার বিপ্লবী দলের-সম্পাদক) বিরোধী, তাঁর নীতি ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা ইংরেজরই থাক, আমরা লোক হিতকর কাজের স্বাধীনতা গ্রহণ করি।"[৩২]

(খ) "রবীন্দ্রনাথ ফিউডাল ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত। তিনি বিশুদ্ধ বুর্জোয়া ধর্মমতাবলম্বী।"[৩৩] (গ) "রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমানের ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত না দেখে তিনি দেখেছিলেন এই যে মুসলমানেরা মারতে পারে এবং হিন্দুরা শুধু পড়ে পড়ে মার খায়। তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলন হয় না।"[৩৪]

এই সব কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে কীভাবে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যোশীর লাইনের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম ক'রে বামসংকীর্ণতাবাদের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই কেবল লাইনের পরিবর্তন নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও চেষ্টা চালানো হয়েছিল নতুন লাইন প্রবর্তনের। একথাত' স্বীকার করতেই হবে যে যোশীর আমলে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রের ওপর তাঁর নিজের একটা আগ্রহ, দক্ষতা ও সমঝদার মনোভাব ছিল। সে সময় পি সি যোশী রাজনীতি এবং সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলিতে সমান অবদান রেখেছিলেন। যোশীরই ইচ্ছা ও অনুরোধক্রমে ১৯৪৬ সালে সুশোভন সরকার অমিত 'সেন ছদ্মনামে Notes on Bengal Renaissance শিরোনামে ইংরাজীতে একটা পুস্তিকা লিখেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীর অবদানকে মার্ক্সবাদীদের মধ্যে সঠিক ভাবে তুলে ধরা। একই ভাবে যোশীর ঐকান্তিক আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে নরহরি কবিরাজ ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে (কার্তিক, ১৩৫৫) 'বিবেকানন্দের মত ও পথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিবেকানন্দর চিন্তার ইতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরেছিলেন। এই প্রবন্ধের আগে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত ক'রে অনেক গুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[৩৫]

এছাড়াও আমরা এখানে প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ সম্মেলনের ঘোষনাপত্রটির কথাও উল্লেখ করতে পারি। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায় ১৯৪৯ সালের ২২-২৪ এপ্রিল। এই ঘোষনাপত্রটির রচনায় অবদান রেখেছিলেন অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ রায়, 'চিন্মোহন সেহানবীশ, শীতাংশু মৈত্র, নিরঞ্জন সেন ও জগন্নাথ চক্রবর্তী।[৩৬] গোপাল হালদার 'সংস্কৃতির সংকট' প্রবন্ধ লিখেছিলেন ঐ সময়েই। চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছিলেন 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম'।[৩৭]

রবীন্দ্র গুপ্ত, প্রকাশ রায় প্রমুখের উনবিংশ শতাব্দী এবং রবীন্দ্রনাথ -বিবেকানন্দ বিষয়ে মূল্যায়ন নিয়ে যে বিতর্ক বাংলার সাহিত্য-জগতে চলছিল, সেটা শেষ পর্যন্ত পার্টির লেখক ও শিল্পীদের নিয়ে গঠিত একটি পার্টি সেল'এর সভায় আলোচনা হয়েছিল। এঁর সদস্যরা ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র, মঙ্গলা চরণ চট্টোপাধ্যায়, মনি রায়, নরহরি কবিরাজ প্রমুখেরা। উনবিংশ শতাব্দী এবং রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্র গুপ্তের (ভবানী সেন) মূল্যায়নটিকে পার্টির বক্তব্য হিসাবে গণ্য করার জন্য একবার 'পার্টি সেল' এর-এক সভায় পার্টি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন নিরঞ্জন সেন, নৃপেন চক্রবর্তী এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত। 'সেল'এর কোন সদস্যই ঐ ৩ জন নেতার বক্তব্য মেনে নিতে

পারেন নি। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পার্টিগত দিক থেকে অমীমাংসিত রয়ে গেল। এর পাশাপাশি বিতর্কও চলতে থাকল। তবে এ ব্যাপারে আরও মতপ্রকাশের সুযোগ সকলকে দেওয়া হল। অনেকেই তখন পৃথকভাবে 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁদের মত ব্যক্ত করেন। সেল সদস্যদের অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্র গুপ্তর প্রবন্ধের সমালোচনা করে নরহরি কবিরাজ একটি পর্যালোচনা মূলক প্রবন্ধ পার্টির পলিটব্যুরোর কাছে পাঠিয়েছিলেন ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে। এই লেখায় দু'টি অংশ ছিল। এর প্রথম অংশে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের রণদীভের লাইনকে সমালোচনা ক'রে এবং অতিবামপন্থার বিচ্যুতিকে 'টিটোপন্থী' বিচ্যুতি বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় অংশে ছিল উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিবাচক দিক।[৩৮]

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভবানী সেন-এর মধ্যে ছিল মার্ক্সবাদের আদর্শ অনুসারী এক বিজ্ঞান-মনস্কতা ও চেতনা এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ও শ্রেণি চরিত্র মূল্যায়নে ছিল এক চারিত্রিক সততা। তাই তিনি ক্রমাগত নিবিড় পাঠ্যানুশীলন ও আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়ায় এবং নিজের অবস্থান ও মূল্যায়নের পূণর্বিচারের মধ্য দিয়ে নিজেই নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন। ভারতের পরিস্থিতির সঠিক বিচার বিশ্লেষণ এবং উনবিংশ শতাব্দীর সামগ্রিক মূল্যায়নের কাজে সততার সঙ্গে মনোনিবেশ করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ার ফলেই ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে ভবানী সেন রবীন্দ্রনাথের পূর্ণমূল্যায়ন ক'রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[৩৯] এই সব প্রবন্ধের মধ্যে থেকে কেবল কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতির উল্লেখ করে বোঝাতে চাইছি যে কীভাবে ভবানী সেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন :

—রবীন্দ্রনাথের "জীবন দর্শনের ভিতরই ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব বর্তমান। এই দ্বন্দ্বই রাবীন্দ্রিক শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর সৃজনশীলতার প্রধান উপাদান। এই জীবন দর্শন অনুসরণ করেই তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবন ধরে যুগ থেকে যুগান্তরে অতিক্রম করার সময় নিত্য নবযুগের উপযোগী-প্রগতিশীল ভাবধারাকেই অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন।" (একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী)

—"ইওরোপের জাতীয়তাবাদ ধনতন্ত্রের উদীয়মান যুগের সংস্কৃতি, তাই তা জনগণমনে সৃষ্টি করেছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর প্রভাবিত, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রমূলক সমাজের প্রতি এক দীর্ঘস্থায়ী মোহ। কিন্তু ভারতের জনমনে সমাজতন্ত্রের প্রভাব আজ সুস্পষ্ট। এর সূচনায় আছে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ অবদান।" (রবীন্দ্রনাথের একটি অমর অবদান)

—রবীন্দ্রনাথকে "শুধু দার্শনিক কবি বললে ভুল হবে, তিনি ছিলেন বিজ্ঞান বিশ্বাসী দার্শনিক।...শেষ জীবনে তিনি সৃষ্টি করে গেছেন অনাগত যুগের দু'টি অবিস্মরণীয় উপাদান—একটি প্রবন্ধে এবং একটি কাব্যে। প্রবন্ধটি "সভ্যতার সংকট" নামে পরিচিত এবং কাব্যটির নাম "প্রশ্ন"। এই দুইটি সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি জানিয়ে গেছেন যে ধনবাদী সভ্যতার চিরন্তন সমাধি আসন্ন, কারণ মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী।" (রবীন্দ্রমানসের দু'একটি বৈশিষ্ট্য)।

কমিউনিস্ট বিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলি আজও উল্লেখ করে চলেছেন যে কমিউস্টিরা রবীন্দ্রনাথকে 'বুর্জোয়া কবি' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁরা জানেন না যে পরবর্তীকালে এই কমিউনিস্টরাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে কী অপরিসীম শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। আত্মসমালোচনা করার পরের অবস্থানকে স্বীকার না করে পূর্বের অবস্থানের ওপর সমালোচনা করে যাওয়াটা জাতীয়তাবাদী শক্তির তরফে একটা নিকৃষ্ট ধরনের সংস্কৃতির

প্রদর্শন। এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি যে সমস্ত রাজনৈতিক দল প্রদর্শন করে তাঁদের ইতিহাস-জ্ঞানের অজ্ঞতা এবং ইতিহাসবোধের যুক্তিহীনতা কখনই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ইতিহাসের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেনা। তাছাড়া, এই বিরুদ্ধবাদী শক্তিরা ভুলে যান যে এই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে রবীন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের ভাবনার পাশাপাশি বিরোধী একটা প্রবণতা কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে দৃঢ়ভাবে এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও উনবিংশ শতাব্দীর মূল্যায়নে নিয়োজিত ছিলেন। পার্টি সেদিন অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সঠিক পথ সন্ধানে নিজেদেরকে যে ব্যাপৃত রেখেছিল, সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ধারকেরা সেই সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল।

এইভাবে আমরা দেখি দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম তীব্ররূপ ধারণ করে ছিল। এইরকম এক অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছিল কমিনফর্মের মুখপত্র 'LPPD'তে একটি সম্পাদকীয় যার ফলেই ১৯৫০ সালের গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির অতিবামপন্থী লাইনের ভুল সিদ্ধান্ত সংশোধনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। এখান থেকেই শুরু হবে পরের খন্ডের অর্থাৎ ষষ্ঠ খন্ডের কাজ।

তথ্যসূত্র :

১. কমিউনিস্ট বুলেটিন, সংখ্যা ৬, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে প্রস্তাব (সহায়ক তথ্য - ১)
২. প্রোসেক্ট স্পেশাল নোট, ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি, ২০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ (সহায়ক তথ্য- ২)
৩. সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য বিবরণী (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ থেকে ৩১ - ১ ১৯৪৯), পৃ. ১৭ টিকা· অমলেন্দু সেনগুপ্তের 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব' বইয়ের ২৬১ পৃষ্ঠায় সেদিনের রেল শ্রমিকের নেতা সত্যেন গাঙ্গুলীর জবানীতে বলা আছে। "রেল শ্রমিকদের দাবি একশ টাকা মূল বেতন।"
৪. Documents of the History of the Communist Panty of India, vol VII (Doc-CPI). Ed, by M B.Rao. P 513-541
৫. ঐ, পৃ. ৫১৬
৬. ঐ, পৃ. ৫৩৩
৭. ঐ, পৃ. ৫৩৫
৮. ঐ, পৃ. ৫৩৬
৯. কমিউনিস্ট বুলেটিন, সংখ্যা ১২, রেল ধর্মঘট প্রসঙ্গে (সহায়ক তথ্য - ৩)
১০. কমিউনিস্ট বুলেটিন, সংখ্যা ১৬, কলকাতা কর্পোরেশনের ধর্মঘট হইতে কি শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে? ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি ১৪ নভেম্বর ১৯৪৯ (সহায়ক তথ্য - ৪)
১১. অমলেন্দু সেনগুপ্ত· উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ. ২৭৮
১২. কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ কমিটি, পশ্চিমবাংলায়, মুসলিম বিতাড়নে কার স্বার্থ, কার গোপন হস্ত কাজ করছে, ২৯ মার্চ, ১৯৪৯ (সহায়ক তথ্য - ৫)
১৩. বিভিন্ন আন্দোলনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে কলকাতা জেলা কমিটির বিবৃতি, দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচন। (সহায়ক তথ্য - ৬)
১৪. 'মঞ্জিল', ১ম সংখ্যা দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচন পর্যালোচনায় কমিউনিষ্ট পার্টি, ১৯ জুন ১৯৪৯, উদ্ধৃতি— অমলেন্দু সেনগুপ্ত, উত্তাল চল্লিশ, অসমাপ্ত বিপ্লব, পৃ ২৯২ (সহায়ক তথ্য - ৭)
১৫. 'ভারতের বুকে কমিউনিস্ট তান্ডব', ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত একটি শ্বেতপত্র, ১৯৪৯। (সহায়ক তথ্য - ৮)

১৬. তথ্যসূত্র-১১, পৃ. ২৭১
১৭. পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত, কলিকাতা জেলা কমিটির পুণর্গঠন, ৮ এপ্রিল ১৯৪৯, (সহায়ক তথ্য - ৯)
১৮. তথ্যসূত্র-১১, পৃ. ২৭২
১৯. পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি, সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা, ১৯-১০-৪৯. (সহায়ক তথ্য - ১০)
২০. কলকাতা জিলা কমিটির আত্মসমালোচনা মূলক বিবৃতি, (সহায়ক তথ্য - ১১)
২১. শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, 'মার্কসবাদী' পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক অনূদিত, পৃ. ২৪-২৭
২২. বঙ্গীয় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির প্রচারপত্র, ২ অক্টোবর ১৯৪৯।
২৩. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সার্কুলার, প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনের আয়োজন। ২০ অগষ্ট ১৯৪৯, (সহায়ক তথ্য - ১২)
২৪. তথ্যসূত্র ২২
২৫. ঐ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির কার্যালয়ে পুলিশী হানা। (সহায়ক তথ্য - ১৩)
২৬. ঐ, বিশ্বশান্তির সংগ্রাম, ২ অক্টোবরের তাৎপর্য এবং কয়েকটি শ্লোগান (সহায়ক তথ্য - ১৪)
২৭. 'মার্কসবাদী' (৬), পৃ. ১৩, সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের আহ্বান, কলকাতা অধিবেশনের মূল প্রস্তাব। (সহায়ক তথ্য - ১৫)
২৮. 'মার্কসবাদী' (৪), পৃ ১০৯
২৯. মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (প্রথম খন্ড) সম্পাদক-ধনঞ্জয় দাশ, রবীন্দ্র গুপ্ত (ভবানী সেন) —বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা, এবং প্রকাশ রায় (প্রদ্যোৎগুহ)-একই শিরোনামের প্রবন্ধ।
টিকা: এ দু'টি প্রবন্ধ ধনঞ্জয় দাশ যথাক্রমে 'মার্কসবাদী' (৫) এবং মার্কসবাদী' (৪) থেকে সংগ্রহ করেছেন। (-সম্পাদক)
৩০. ঐ, পৃ. ১০১
৩১. ঐ পৃ. ৮১
৩২. ঐ পৃ. ৮৮
৩৩. ঐ পৃ. ৮৯
৩৪. ঐ পৃ. ৯০
৩৫. নরহরি কবিরাজ — উনবিংশ শতকের শ্রেণিবিন্যাস, 'পরিচয়', বৈশাখ ১৩৫৩
— উনিশ শতকে ইয়ংবেঙ্গল, ঐ, পৌষ, ১৩৫৩
— স্বদেশ প্রেমিক শিবনাথ, ঐ, ফাল্গুন, ১৩৫৩
— বাংলায় রেনেশাঁস আন্দোলন ও মুসলমান, ঐ, ভাদ্র, ১৩৫৪
— বাঙালী রাজনীতির গোড়ার কথা, ঐ, কার্তিক, ১৩৫৪
৩৬. মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, দ্বিতীয় খন্ড, সম্পাদক ধনঞ্জয় দাশ, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে গৃহীত 'ঘোষণাপত্র', পৃ. ২৫০-৫৫ (সহায়ক তথ্য - ১৬)
৩৭. চিন্মোহন সেহানবীশ— সাহিত্য ও গণসংগ্রাম, 'পরিচয়', জ্যৈষ্ঠ— আষাঢ়, ১৩৫৬ (সহায়ক তথ্য - ১৭)
৩৮. নরহরি কবিরাজ—Fight Against Bourgeois Nationalism on Cultural Front, A critical & Self Critical Review, 1. 3. 1951 (সহায়ক তথ্য - ১৮)
৩৯. ভবানী সেন— একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী ১৩৬৮, ভবানী সেন নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খন্ড। (সহায়ক তথ্য - ১৯)
—রবীন্দ্রনাথের একটি অমর অবদান (১৩৬৮), ঐ।
—রবীন্দ্রমানসের দু'একটি বৈশিষ্ট্য (১৯৬১), ঐ।

সহায়ক তথ্য ১

শুধু পার্টিসভ্যদের জন্য

কমিউনিস্ট বুলেটিন

সংখ্যা ৬

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

দাম দুই আনা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি

ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে

প্রস্তাব

[১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৮, প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারিয়েটে গৃহীত]

অর্থনীতিক সংকটের চাপে পুঁজিপতি ও সরকার উভয়েই আজ শ্রমিকের মজুরি কমাইবার জন্য মরীয়া হইয়া চেষ্টা শুরু করিয়াছে,—শ্রমিকের ঘাড় দিয়া তাহারা এই সংকট সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। র‍্যাশানালাইজেশন, লক আউট, ছাঁটাই, বেকারী, মাগ্‌গী ভাতা ও আসল মজুরি হ্রাস, খাটুনীর সময় বৃদ্ধির চেষ্টা এবং বেশি শিফ্‌টে কাজ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা পুঁজিপতি এবং সরকার একযোগে মালিকের মুনাফা অক্ষুন্ন রাখিয়া সংকটের সমস্ত বোঝা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে।

'শিল্প চুক্তি' নীতি দ্বারা সরকার মালিকদের আবদার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আশা করিতেছে যে, শ্রমিকশ্রেণির উপর কংগ্রেসের আজও যে ব্যাপক প্রভাব আছে তাহাকে কাজে লাগাইয়া এবং স্বাধীনতার ফাঁকা বুলি আওড়াইয়া জাতীয় টি, ইউ, ট্রাইব্যুনাল ও ওয়ার্কস কমিটি মারফৎ অধিকাংশ শ্রমিককে তাহাদের নীতির পিছনে টানিয়া আনা যাইবে।

কিন্তু তাহাদের প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। শ্রমিকশ্রেণির বিরাট অংশ আজ প্রতিদিন সরকারি শিল্পনীতি, ট্রাইব্যুনাল, সালিসী প্রভৃতি সম্পর্কে মোহমুক্ত হইতেছে। এই নীতি কার্যকরী করিবার জন্য পুঁজিপতিদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্ত্ত প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিতেছে। শ্রমিক জীবনের ক্রমাবনতির বিরুদ্ধে আজ জাতীয় টি, ইউ, সি'র কর্ম্মীরা পর্যন্ত ধর্ম্মঘট করিতেছে অথবা মুখে ধর্ম্মঘটের কথা বলিতেছে। এই অবস্থা যদি স্বাভাবিক গতিতে চলিতে পারিত তাহা হইলে এতদিনে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণির বৃহত্তম গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি হইত।

তাই সরকার ও পুঁজিপতিরা ইহার বিরুদ্ধে বর্বর ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ শুরু করিয়াছে। ধর্ম্মঘট কার্যত বে-আইনি করা হইয়াছে; জঙ্গী ইউনিয়নগুলির আইনগত কার্যকলাপ পরিচালনা প্রায় অসম্ভব করিয়া তোলা হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীদের হাজারো হাজারো গ্রেপ্তার ও তাহাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে; সক্রিয় কর্ম্মীদের বিনাবিচারে আটক রাখা হইয়াছে। পুলিশ, জাতীয় টি, ইউ-র গুন্ডা এবং মালিকের সশস্ত্র দালাল একত্রে মিলিয়া শ্রমিকদের খুন জখম করিতেছে, তাহাদের গৃহ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিতেছে।

সরকারের মূল কর্ম্মকৌশল হইল শ্রমিকশ্রেণিকে তাহার অগ্রগামী অংশ অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টি হইতে বিচ্ছিন্ন করা। এই নীতির দ্বারা তাহারা মালিকের আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির জঙ্গী আন্দোলনকে বন্ধ করিতে চাহে, সর্বপ্রকার অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে দমন করিতে চাহে, এবং শ্রমিকশ্রেণিকে ধোঁকা দিয়া তাহাদের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে চাহে। সরকারের আর এক কৌশল হইল জনসাধারণের নিকট শ্রমিকশ্রেণিকে হেয় প্রতিপন্ন করা; শ্রমিকের সংগ্রামই যে জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশার জন্য দায়ি এই কথা বুঝাইয়া সরকার গণতান্ত্রিক জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করিতে চাহে।

শুধুমাত্র কংগ্রেস বা জাতীয় টি-ইউ নয়, অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী নেতারা পর্যন্ত এতদিন

জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারি বিভেদ প্রচেষ্টা ও সন্ত্রাসবাদী নীতিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

যাই হোক সরকার ও মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ দ্রুত বাড়িয়াই চলিয়াছে। মালিকের আক্রমণের বিরুদ্ধে কিংবা নুতন দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য শ্রমিকদের অসংখ্য ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হইতেছে। স্বতঃস্ফুর্ত্ত আন্দোলন, সংগঠিত অথবা অর্ধ-সংগঠিত আন্দোলন ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

শ্রমিকশ্রেণি আজ ক্রমশ মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধের পর্যায়ে আসিয়া হাজির হইতেছে। অতীতের কয়েকটা সংগ্রাম এই কথাই স্পষ্ট প্রমাণ করে। অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সংকট যতই তীব্র হইতেছে, বুর্জোয়াদের সম্পর্কে মোহ যত দ্রুত কাটিয়া যাইতেছে, পরিস্থিতিও সেই পরিমাণে পরিবর্তিত হইতেছে। ট্রাইব্যুনালের ধাপ্পা ক্রমশই পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে; বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের রায়ের ফলে সবকারি শ্রমনীতি ও শ্রমিক আইনের স্বরূপ দ্রুত উদঘাটিত হইতেছে।

সমস্ত মিলিয়া শ্রমিকশ্রেণি আজ ব্যাপক গণজাগরণ ও বিরাট সাধারণ ধর্ম্মঘটের পথে চলিয়াছে;—ইহার ফলে দেশের রাজনীতির মোড় ঘুরিতে বাধ্য। এইরূপ গণ অভুত্থান ঘটিতে পারে, কিন্তু এই সময় আমরা যদি তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকি তাহা হইলে ব্যাপক হতাশার মধ্যে এই গণ-অভ্যুত্থান শেষ হইবে। কিভাবে আমরা এই গণজাগরণের প্রস্তুতি ও সংগঠন করিব তাহার উপরই সব কিছু নির্ভর করিতেছে। গণ-অভ্যুত্থান ঘটিলে কি সরকার ইহাকে দমন করিয়া দিবে, গনজাগরণ আরও উন্নতস্তরে উঠিবে কি শ্রমিকশ্রেণির চরম হতাশার মধ্যেই ইহার অবসান ঘটিবে, তাহা আমাদের উপরই নির্ভর করিতেছে।

জাতীয় সংস্কারপন্থী নীতি সম্পর্কে যদিও শ্রমিকরা দ্রুত মোহমুক্ত হইতেছে, জীবনধারণের অবস্থার ক্রমাবণতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধস্পৃহা যদিও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তবু এখনও শ্রমিকশ্রেণির ব্যাপক গন-অভ্যুত্থান আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ইহার কারণ শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে অধিকাংশ আজও সম্মিলিত আক্রমণের প্রয়োজন বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, সংগ্রামের শক্তি সম্পর্কে আজও তাঁহাদের নিশ্চিত বিশ্বাস গড়িয়া উঠে নাই।

ইহার কারণ এই নয় যে সরকারি চন্ডনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে উপযুক্ত টেক্‌নিক্যাল প্রস্তুতি হয় নাই। ইহার মূল কারণ হইল আজও অধিকাংশ শ্রমিককে পার্টির নীতির পক্ষে এবং সরকারি নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে টানিয়া আনা যায় নাই। অতীতে যখন সমস্ত শ্রমিকই বুর্জোয়া রাজনীতি অনুসরণ করিয়া চলিত, যখন বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক ধর্ম্মঘটকে একেবারে বর্জন করে নাই (ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চাপ হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য বুর্জোয়ারা অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ধর্ম্মঘট করিয়াছে), তখন কোন কোন সীমাবদ্ধ অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে স্বতস্ফুর্ত্তভাবে সর্ব-ব্যাপক ঐক্য গঠন করা সহজ ছিল। আজ বুর্জোয়াশ্রেণি, তাহাদের সরকার ও রাজনৈতিক দালালরা শ্রমিকদের দাবিদাওয়া, ধর্ম্মঘট ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে দৃঢ় নীতি গ্রহণ করিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণির এক ব্যাপক অংশের মধ্যে তাহাদের এই নীতির প্রভাবের ফলে, অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তাহারা শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। যতদিন পর্যন্ত না শ্রমিকশ্রেণির নিকট বুর্জোয়া রাজনীতির স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, যতদিন পর্যন্ত না তাহাদের অধিকাংশকে বুর্জোয়া রাজনীতি এবং সরকারের বিরুদ্ধে

টানিয়া আনা যাইতেছে, ততদিন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও কোন বিরাট সফল সংগ্রাম পরিচালনা করা খুবই কঠিন।

আমাদের প্রধান দুর্বলতা হইতেছে আমরা জাতীয় সংস্কারপন্থী, জাতীয় টি-ইউ, সোশ্যালিষ্ট নেতৃবৃন্দ, কংগ্রেস ও সরকারের মুখোস সঠিকভাবে খুলিয়া দিতে পারি নাই। শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে আমরা ব্যাপকভাবে পার্টি পত্রিকা প্রচার করি নাই, ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইব্যুনালের রায় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আমরা পোষ্টার ও ইস্তাহার দিই নাই, শ্রমিক মহল্লায় আমরা কাপড়, খাদ্য, দুর্নীতি, শ্রমিকের মজুরি, ব্যাক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সব দিক দিয়া সরকারি নীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হই নাই। যেখানে আমরা ইহাদের মুখোস খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি সেখানে হয় আমরা জনতার চেতনার চেয়ে বহুদূর আগাইয়া গিয়াছি (যেমন, নেহেরু গুন্ডা, কিরণশঙ্কর কুকুর প্রভৃতি স্লোগান) নতুবা শ্রমিকদের সংস্কারের সামনে আমরা ভীত হইয়া সংস্কারপন্থীদের মত প্রচার করিয়াছি (যেমন রেল ইউনিয়নগুলি সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবি করে নাই, অমৃতবাজার পত্রিকা ধর্ম্মঘটে জাতীয় টি-ইউ নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা এবং বিশ্বাসঘাতক প্রচেষ্টা সম্পর্কে সাহসের সহিত প্রচার করা হয় নাই)।

দ্বিতীয়ত মৌখিক প্রচারকার্য্য ও লেখার মধ্যেই আমাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের কাজকে কেন্দ্রীভূত করিবার ঝোঁক দেখা গিয়াছে। আমরা ভাবিয়াছি শ্রমিকদের অবস্থা যতই খারাপ হইবে তত দ্রুত শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে স্বতস্ফুর্ত্তভাবে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি হইবে; সুতরাং আমাদের একমাত্র কাজ হইতেছে এই অবস্থার জন্য অপেক্ষা করা।

এই ধরনের চিন্তা আমাদের ভয় ও সংস্কারবাদকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা মাত্র। ইহার দ্বারা আমরা শ্রমিকদের আন্দোলন হইতে টানিয়া রাখিয়াছি, সরকার ও মালিকের আক্রমণের সামনে পিছু হটিয়াছি এবং শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান্ ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ স্পৃহাকে বুঝিতে অস্বীকার করিয়াছি। এই মারাত্মক ভ্রান্তি সম্পর্কে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে:

১। নোনাপুকুরে ট্রাম শ্রমিকদের উপর কোম্পানীর জুলুমের বিরুদ্ধে পর দিনই সমস্ত শ্রমিকের প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন আমরা বুঝিতে পারি নাই। এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পরও নেতাদের অনেকে ভাবিলেন যে ধর্ম্মঘট করা ভুল হইবে, কারণ ইহার অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হইবে এবং ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া যাইবে; বরং বিপরীত ফলই ফলিয়াছে।

২। লিপটন কারখানায় যখন প্রায় এক তৃতীয়াংশ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইয়াছে, তখনও আমরা শ্রমিকদের ইহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক দিই নাই।

৩। জাতীয় টি-ইউ ফেডারেশন চটকলে ছাঁটাইএর বিরুদ্ধে একদিনের সাধারণ ধর্ম্মঘট সম্পর্কে যে বাগাড়ম্বর করিতেছিল, তাহাও আমরা কাজে লাগাই নাই। আমাদের যুক্তি ছিল, জাতীয় টি-ইউ কর্ম্মীরা এই ধর্ম্মঘট সম্পর্কে কোন গুরুত্ব দিতেছে না এবং শ্রমিকদের নিকট এ সম্পর্কে কোন প্রচারই করিতেছে না। আমরা এ কথা বুঝি নাই যে তাহাদের সিদ্ধান্তের কথা শ্রমিকদের নিকট পৌছাইয়া দিবার দায়িত্ব আমাদেরই এবং দাবি-দাওয়া প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন একদিনে যুক্তভাবে সাধারণ নমুনা ধর্ম্মঘট পালন সম্পর্কে আমাদের আন্দোলন করা উচিত ছিল। ইহার ফলে একদিকে শ্রমিকদের মধ্যে ধর্ম্মঘটের পক্ষে আন্দোলন

গড়িয়া তোলা যাইত, অপর দিকে জাতীয় টি-ইউ'র ফাঁকা আওয়াজের মুখোস শ্রমিকদের নিকট খুলিয়া দেওয়া যাইত। আমাদের কমরেডরা ভাবিয়াছেন অদূর ভবিষ্যতে স্বতস্ফূর্ত্তভাবে বিরাট চটকল ধর্ম্মঘট হইবে; কিন্তু তাঁহারা একথা ভাবেন নাই যে জাতীয় টি-ইউ'র প্রস্তাব প্রভৃতির উপর আন্দোলন ও সক্রিয় কর্ম্মপন্থা গ্রহণের ফলেই ভবিষ্যতে বিরাট ধর্ম্মঘট সংগঠিত হইতে পারে।

৪। ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সোশ্যালিষ্ট পার্টি হাওড়ায় একদিন সাধারণ ধর্ম্মঘটের আহ্বান জানাইয়াছিল। সোশ্যালিষ্ট প্রভাবিত শ্রমিকদের সহিত সংগ্রামী ঐক্য গড়িবার বিরাট সুযোগ হিসাবে আমরা ইহাকে গ্রহণ করি নাই। চোখের সামনে আমরা কেবল সোশ্যালিষ্ট নেতাদেরই দেখিয়া ভাবিয়াছি তাহারা কখনও ধর্ম্মঘট সম্পর্কে গুরুত্ব দিতে পারে না। শ্রমিকদের প্রয়োজন ও মনোভাব সম্পর্কে আমরাও সোশ্যালিষ্ট নেতাদের মতই অন্ধ ছিলাম—তাই শ্রমিকশ্রেণির বিরাট আলোড়নই যে সোশ্যালিষ্ট নেতাদের ধর্ম্মঘট আহ্বান করিতে বাধ্য করিয়াছে, একথা আমরা বুঝি নাই। ধর্ম্মঘটে আমরা নিরপেক্ষ ছিলাম, আড়ালে আমরা ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। যদি আমরা এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিতাম তাহা হইলে হাওড়ার অধিকাংশ শ্রমিকের এক দিনের শক্তিশালী সংগ্রামের দ্বারা আমরা হাওড়ার শ্রমিক আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া দিতে পারিতাম এবং ভবিষ্যৎ গণ-অভ্যুত্থানের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমরা এই সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। শ্রমিকশ্রেণি একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছি। তাই বার্ন কোম্পানীর যে সমস্ত কর্ম্মচারীর উপর আমাদের ভালো প্রভাব ছিল, তাহারা যখন ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য পুলিশ ডাকিয়াছিল, তখনও আমরা তাহাদের নিরস্ত হইতে রাজি করাইতে পারি নাই।

৫। পত্রিকা ধর্ম্মঘটে জাতীয় টি, ইউ. নেতারা যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, একথা প্রথম হইতেই আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাই সাধারণ কর্মীদের তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম হইতে পিকেটিং, বয়কট প্রভৃতি কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিবার জন্য আমরা জোর করি নাই। কিন্তু ইহার দ্বারা ধর্ম্মঘটে জয়লাভ এবং জাতীয় টি, ইউ নেতাদের স্বরূপ উদঘাটন, উভয় কাজেই সুবিধা হইত।

৬। খড়্গপুরে, যেখানে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ইচ্ছা স্বতস্ফূর্ত্ত ধর্ম্মঘটে রূপান্তরিত হইল, সেখানেও আমাদের কর্ম্মীরা ইহার সম্ভাবনার কথাও ভাবিতে পারে নাই।

কাজের মধ্য দিয়া মুখোশ না খুলিয়া শুধু কথায় মুখোশ খুলিবার চেষ্টা করিলে তাহা কার্য্যকরী হয় না। কারণ ইহার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণির সমস্ত অংশ জীবন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না, পুঁজিপতি ও সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের মনে এমন ঘৃণার আগুন জ্বালিয়া ওঠে না যাহার ফলে তাহারা বর্বর দমননীতির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিবার প্রেরণা লাভ করে। আজিকার দিনে প্রত্যেকটি শ্রমিক সংগ্রাম ও ধর্ম্মঘটে সরকার যখন নিরঙ্কুশ দমননীতি ও নির্যাতন চালায় এবং শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে তাহার দালালেরা এই কাজে সাহায্য করে, তখনই শ্রমিকরা তাহাদের আসল শত্রু ও বন্ধুকে ভালভাবে চিনিয়া লয়, জাতীয় সরকার ও উহার নীতির মুখোস শ্রমিকের নিকট খসিয়া যায়—ইহারই মধ্য দিয়া শ্রমিকের রাজনৈতিক চেতনা হাজারগুণ বাড়িয়া যায়। যেখানে শ্রমিকদের আন্দোলন ও প্রতিরোধের পথে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব, সেখানে যদি নিষ্ক্রিয় নীতি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে শ্রমিকদের মধ্যে হতাশারই সৃষ্টি হয়, তাই অবস্থা আরও শোচনীয় হইলেও সেখানে গণজাগরণ সৃষ্টি হয় না।

পরিবর্তিত অবস্থায় আজ আর পুরাতন পন্থায় ভাবিলে চলিবে না যে ধর্ম্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হইবে ও মোটামুটি শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের পথে চলিবে এবং আংশিক দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সযত্নে ইহার প্রস্তুতি ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। যেখানে এইরূপ সম্ভাবনা আছে, সেখানে নিশ্চই ইহা করিতে হইবে; কিন্তু বর্তমানে এইরূপ সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে। চন্ডনীতির রাজত্বে আমাদের কৌশল হইবে দ্রুত আঘাত করিবার কৌশল। যখনই আমরা দেখিব শ্রমিকদের উপর আঘাত আসিতেছে এবং ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের বিক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছে, তখনই তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং শ্রমিকরা সাড়া দিবে বুঝিতে পারা মাত্র সংগ্রামের ডাক দিতে হইবে, সংগ্রামের সময় সাধারণ শ্রমিকদের গ্রহণযোগ্য সকল প্রকার লড়াইএর পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে—শত্রুর উপর চরম আঘাত হানিতে হইবে। যখনই দেখা যাইবে শ্রমিকদের মনোবল পড়িয়া যাইতেছে তখনই শ্রমিকদের শক্তি যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখিয়া পিছু হটিতে হইবে অথবা সংগ্রামের অন্য কায়দা গ্রহণ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সমস্ত সময় সরকার এবং উহার দালালদের মুখোশ খুলিয়া দিয়া তীব্র প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে।

এইরূপ বহু সংগ্রামে দাবি আদায় হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম পরিচালনা হয়তো সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ সাময়িকভাবে শ্রমিকরা হয়তো পরাজিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রমিকরা যদি প্রতিরোধ সংগ্রামে না নামে তাহা হইলে তাহাদের মনোবল একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং মালিকরা সাহস পাইয়া আরও প্রচন্ড আঘাত হানিবে। প্রতিরোধ আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হইলেও ইহা শ্রমিকদের নূতন শিক্ষা দিবে, শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে তাহাদের ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইবে এবং বিভিন্ন শক্তির পরিষ্কার শ্রেণীবিন্যাস ঘটিবে। তখন শ্রমিকরা আরও দৃঢ় রাজনৈতিক চেতনা লইয়া আরও খারাপ অবস্থার মধ্যেও বিনাদ্বিধায় সংগ্রামে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। আজিকার দিনে এই পথেই একমাত্র শ্রমিকশ্রেণি অধিকাংশকে তাহার অর্থনৈতিক দাবির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামে সমবেত করা সম্ভব,—যদিও এই অর্থনৈতিক সংগ্রাম ক্রমশ রাজনৈতিক সংগ্রামের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এই নীতির ফলে আমাদের কর্ম্মীদের অনেকের চাকুরী যাইবে, জেলে যাইতে হইবে, ও তাহাদের উপর নানাপ্রকারের আক্রমণ আসিবে। কিন্তু সাহসের সহিত এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য সম্ভবপর সমস্তরকম গেরিলা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। দাবি আদায় হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালানো যাইবে না, এই অজুহাতে সংগ্রাম না করিবার অর্থ হইল নিজেদের সংস্কারবাদ ও ভয়কে ঢাকিয়া রাখা। অপরদিকে আবার সংগ্রাম সুরু করিবার পর দাবি আদায়ের মিথ্যা আশায় মিছামিছি ইহা দীর্ঘস্থায়ী করার (যেমন ট্রাম) অর্থ হইল দুঃসাহসিক ঝুঁকির পথ গ্রহণ করিয়া শত্রুর নিকট নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করা।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল সংগ্রামের জন্য সকলশ্রেণির শ্রমিকের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে উদ্যোগী হওয়া। অবস্থা ক্রমশ যতই খারাপ হইতে থাকিবে, সোশ্যালিষ্ট পার্টি এমন কি জাতীয় টি, ইউ'র এর প্রভাবাধীন শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়িবার ফলে যতই তাহারা মোহমুক্ত হইবে, ততই সংগ্রামের জন্য তাহাদের নেতৃবৃন্দের উপর চাপ পড়িবে। তখন এই সমস্ত নেতারা সংগ্রামের স্লোগান দিতে অথবা সংগ্রাম করিবার ভান করিতে বাধ্য হইবে। নেতাদের মুখোশ খুলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজ হইবে শ্রমিকদের নিকট সম্মিলিত ফ্রন্টের আবেদন জানানো, যেখানে সম্ভব সেখানে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করা,

সম্মিলিত ফ্রন্টগঠনের জন্য বারবার চেষ্টা করা, ধর্ম্মঘটের সমর্থনে এবং ইহার প্রস্তুতিতে সাহায্য করা এবং যেখানে সম্ভব সেখানে ইহা বিস্তৃত ও ব্যাপক করিবার চেষ্টা করা। অবশ্য সবসময় আমাদের স্বাধীন সংগঠন ও কর্ম্মপন্থাকে অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে।

আন্দোলন ও সংগ্রামের বিস্তৃত কর্ম্মকৌশল

১। আমাদের ঘাঁটিতে শ্রমিকদের অধিকার সংকোচ করিতে দেওয়া চলিবে না। শ্রমিকদের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ বিচার করিতে হইবে। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে এইরূপ দাবির উপর ভিত্তি করিয়া আন্দোলন করিতে হইবে।

ধর্ম্মঘটকে আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। প্রতিবাদ ধর্ম্মঘট একঘন্টা, একদিন বা কয়েকদিন ধরিয়া চলিবে, এই প্রশ্ন স্থানীয় অবস্থার ভিত্তিতে স্থির করিতে হইবে। শ্রমিকরা কতদূর পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত, মালিকদের মনোভাব প্রভৃতি প্রশ্ন বিচার করিতে হইবে। দীর্ঘস্থায়ী ধর্ম্মঘট কিংবা একদিন বা এক ঘন্টার ধর্ম্মঘটের সংবাদও স্থানীয় অন্যান্য শ্রমিক এলাকা ও ফ্যাক্টরীতে পৌঁছিয়া দিতে হইবে।

২। যেখানে আমাদের কোন প্রভাব নাই অথচ শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ কিংবা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, সেখানেও হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং ধর্ম্মঘটে নেতৃত্ব করিতে হইবে।

৩। প্রতিক্ষেত্রেই, কিভাবে কখন আঘাত করা প্রয়োজন তাহা জানিতে হইবে। যথাসম্ভব শত্রুর অসতর্ক মুহূর্তে আঘাত করিতে হইবে। কোন বাঁধা-ধরা কর্মকৌশল গ্রহণ করিলে চলিবে না— অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে কর্মকৌশল স্থির করিতে হইবে। দ্রুত আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিবার কৌশল গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ ধর্ম্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসার কথা, জঙ্গী কার্যকলাপের পর সমর্থন আন্দোলন ও ব্যাপকভাবে স্বরূপ উদঘাটনের নীতি, ইহার পর আবার সক্রিয় কর্ম্মপন্থা প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। ছোট ছোট কারখানার ধর্ম্মঘটগুলিকেও পূর্ণ পরিণতির দিকে লইয়া যাইতে হইবে। পাশাপাশি এলাকা ও মিলের শ্রমিকদের সমর্থন যে কোন সংগ্রামের পক্ষে অপরিহার্য।

৪। সোশ্যালিষ্ট পার্টি বা জাতীয় টি-ইউ'এর প্রভাবাধীনে এলাকার বা তাহাদের সংগঠনের পরিচালনায় ধর্ম্মঘটগুলিতে ধর্ম্মঘটীদের সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং নেতাদের দোদুল্যমান মনোভাব ও বিশ্বাসঘাতকতা শ্রমিকদের নিকট তুলিয়া ধরিতে হইবে।

৫। রাজনৈতিকভাবে মুখোস খুলিয়া দিবার কাজ সর্বত্র অত্যন্ত সাহসের সহিত চালাইতে হইবে। দেশের নানা ঘটনা বিশেষ করিয়া শ্রমিকদের জীবন, তাহাদের ক্রমবর্ধমান দুঃখদুর্দ্দশা এবং সংকটের কথা শ্রমিকদের বুঝাইতে হইবে। কেন এবং কিভাবে এই সমস্ত ঘটিতেছে, ইহার জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ি একথাও তাহাদের নিকট ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

৬। বিরোধীপক্ষ যাহাতে টি-ইউ বনাম জাতীয় টি-ইউ কিংবা সোশ্যালিষ্ট পার্টি, কমিউনিষ্ট পার্টি বনাম কংগ্রেস কিংবা সোশ্যালিষ্ট পার্টি—এই ধরণের সমস্যা তুলিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় সব সময়ে শ্রমিকদের দাবি দাওয়া ও সমস্যাকে সামনে রাখিতে হইবে, এবং রাজনৈতিক মত বা ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালাইতে হইবে। ইহার অর্থ এই নয় যে আমরা এই সমস্ত প্রশ্ন এড়াইয়া যাইব। বরং আমরা শ্রমিকদের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ ও দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সোশ্যালিষ্ট ও জাতীয়

টি-ইউ নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া আন্দোলন চালাইয়া যাইব।

একটি ইউনিয়নের সাধারণ প্ল্যাটফর্ম্মে আমরা এই সমস্ত প্রশ্ন না তুলিতে পারি। কিন্তু পার্টি বা অন্যান্য প্রচারকার্য্যের মধ্যে আমাদের এই কাজ করিতে হইবে।

৭। যেখানে জাতীয় টি-ইউ বা সোশ্যালিষ্ট পার্টির প্রভাব কিংবা সংগঠন আছে সেখানে আমাদের একদিকে সাধারণ কর্ম্মীদের নিকট ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানাইতে হইবে, অপর দিকে নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকনীতির মুখোস খুলিয়া দিতে হইবে।

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য জাতীয় টি-ইউ এবং সোশ্যালিষ্ট পার্টির সমর্থকদের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রমিকশ্রেণির ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য, সংগ্রামে রূপান্তরিত হইতে পারে এইরূপ যে কোন ধর্ম্মঘটের আহ্বান বা শোভাযাত্রার আহ্বানকে কাজে লাগাইতে হইবে। সংগ্রামে রূপান্তরিত হইতে পারে কিংবা সরকার, জাতীয় টি-ইউ বা সোশ্যালিস্ট পার্টির মুখোশ খুলিয়া দিতে পারে, এইরূপ যে কোন ধর্মঘটের আহ্বান বা শোভাযাত্রার আহ্বানকে সমর্থন করিতে হইবে এবং আন্দোলন চালাইতে হইবে। সোশ্যালিষ্ট পার্টি এবং জাতীয় টি-ইউ নেতারা আন্তরিকভাবে এই আহ্বান দিয়াছেন কিংবা তাহারা সমর্থন চাহেন কিনা, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যতই আমরা ইহা করিব ততই আমাদের লাভ হইবে, কারণ ইহাতে শ্রমিকশ্রেণি ঐক্যবদ্ধ হইবে এবং বিভেদকারীরা কোনঠাঁসা ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

৮। কোন কোন ক্ষেত্রে সংগঠনের ঐক্যের খাতিরে আমরা ইউনিয়নকে যে কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের বাহিরে রাখিতে পারি। ইহার অর্থ রাজনীতি ত্যাগ করা নয়—ইহা সময় লইবার, শ্রমিকশ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ রাখিবার, শ্রমিকদের দাবি-দাওয়াকে জোরালো করিবার এবং সংগ্রাম সুরু করিয়া জাতীয় টি, ইউ, এবং সোশ্যালিষ্টদের পরাজিত করিবার পদ্ধতিমাত্র।

৯। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যার উপর শ্রমিকদের আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। রাজনৈতিক প্রতিবাদ ধর্মঘট, শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতির মধ্য দিয়া শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াইতে হইবে। এই সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও কাপড়, কয়লা, গৃহসমস্যা প্রভৃতি সকল শ্রেণির জনসাধারণের সমস্যা লইয়া শ্রমিকদের আন্দোলন করিতে হইবে।

চটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, চা-বাগান, খনি এবং রেলওয়ে, এই পাঁচটি শিল্পে শ্রমিকদের বিক্ষোভ যে কোন সময়ে ফাটিয়া পড়িতে পারে;—সুতরাং এইখানে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। সংখ্যা এবং অবস্থার গুরুত্ব বিচার করিলে, অদুর ভবিষ্যতে তাহারা শ্রমিক আন্দোলনে অত্যন্ত বৃহৎ অংশ গ্রহণ করিবে বলিয়া মনে হয়।

এই সমস্ত শিল্পে আরও বেশি সংখ্যক কর্ম্মী ও নেতা পাঠাইতে হইবে। ভাল বেকার শ্রমিক নেতাদের এখানে নিয়োগ করিতে হইবে। শ্রমিকনেতা ও কর্ম্মীদের শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পুরাতন কায়দায় আজ আর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিলে চলিবে না। খাদ্য, বস্ত্র, মজুরি, চাকুরীর স্থায়ীত্ব, জীবন ধারণের মান উন্নয়ন প্রভৃতি যে কোন আংশিক সংগ্রাম আজ সরকারের বর্ত্তমান শ্রেণি চরিত্রের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, শ্রমিকশ্রেণির তথাকথিত 'শ্রেণিগত' 'আংশিক' দাবিসমুহই আজ জনসাধারণের সাধারণ দাবি।

১০। 'ট্রাইব্যুনাল' ও 'শিল্প-চুক্তি'র বিরুদ্ধে ক্রমশ বেশি পরিমাণে আওয়াজ তুলিতে

হইবে। ইহা যে শ্রমিকশ্রেণিকে ধাপ্পা দিবার জন্য এবং তাহাদের সংগ্রামী মনোভাবকে ভাঙ্গিবার জন্য একথা শ্রমিকদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝাইতে হইবে। আমাদের আন্দোলন ও প্রচারে ব্যাঙ্ক এবং মুল ও ভারী শিল্পের জাতীয়করণের দাবি হইবে মুল শ্লোগান।

১১। সমস্ত ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে সরকার ফ্যাসিষ্ট নীতি প্রয়োগ করিবে। ইহার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং এই আঘাত ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রতিরোধের রূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হইবে। পার্টি এবং শ্রমিকদের ঐক্য, সংগঠন ও প্রস্তুতির উপরই ইহা নির্ভর করে। পুলিশ ও গুন্ডার বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ হইতে ক্রমশ ইহা উন্নতরূপ গ্রহণ করিবে। শ্রমিকদের সংখ্যা যতই বেশি হইবে, প্রতিরোধ সংগ্রামে ততই সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি হইবে। জঙ্গী শ্রমিকবাহিনী গঠন এবং ইহার কার্য্যকলাপকে ছোট করিয়া দেখিলে চলিবে না। এই ব্যাপারে সমস্ত ইউনিয়নের তরফ হইতে এখনই আন্তরিক প্রচেষ্টা সুরু করিতে হইবে।

কিন্তু শ্রমিকদের সমর্থন ছাড়া খাপছাড়াভাবে কোন কাজ করা চলিবে না। কোন কোন সময়ে এই ধরনের কাজ শ্রমিকদের পরাজয়ের মনোভাব হইতে উদ্ধার করিয়া সক্রিয়কর্ম্মপন্থার দিকে চালিত করিলেও ইহা শ্রমিকশ্রেণি হইতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া শত্রুকে শক্তিশালী করিতে পারে। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে যথাযথভাবে বিচার করিতে হইবে।

১২। প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের গোপন গ্রুপ ও কমিটি গঠন করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রমিকদের ক্লাব ও লাইব্রেরী আন্দোলনের অত্যন্ত মূল্যবান হাতিয়ার।

১৩। ফ্যাক্টরী ভিত্তিতে এবং এলাকা ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে শ্রমিকদের রিলিফ ও ডিফেন্স আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে; ক্রমশ ইহাকে বিস্তৃত করিতে হইবে। ইহার মধ্য দিয়া শত্রুর মুখোস খুলিবার কাজ চালাইতে হইবে এবং চাঁদা তুলিতে হইবে।

১৪। জাতীয় টি, ইউ, সোশ্যালিষ্ট পার্টি কিংবা মিলিত ইউনিয়নের মধ্যে ফ্রাকশন গঠন করিয়া কাজ পরিচালনা করা আজ অত্যন্ত জরুরি। সব সময় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বাছিয়া লইয়া আন্দোলন করিতে হইবে ও শ্রমিকদের অসন্তোষকে ভাষা দিতে হইবে। ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিতে হইবে ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের নীতি পরিবর্ত্তনের দাবিতে প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে ইউনিয়নের কাজ পরিচালনার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং নেতৃত্বের সমস্ত দোষত্রুটির স্বরূপ খুলিয়া ধরিতে হইবে। উদ্দেশ্য হইবে নেতৃত্বকে কোনঠাসা করা, ইউনিয়নের নীতির পরিবর্ত্তন করা এবং সংগ্রাম ও ঐক্যের পথে শ্রমিক সাধারণকে টানিয়া আনা।

কয়েকটি পুরাতন সংস্কারপন্থী ইউনিয়নের মধ্যে আমাদের কাজের ধাপ অত্যন্ত সাবধান ও সতর্কতার সহিত পরিচালিত করিতে হইবে। যদিও অবস্থা অতিদ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তথাপি বর্তমানে আমাদের কর্ম্মীদের কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত কোন সম্পর্কের কথা অস্বীকার করিবার পরামর্শ দিতে হইতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে ইউনিয়ানের মধ্যে আমাদের শক্তি আছে অথচ ইউনিয়নে এখনও সংস্কারপন্থী ঐতিহ্য বজায়-আছে, সেখানে বর্ত্তমানে ট্রেড ইউনিয়নবাদের চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের কার্য্য কলাপকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

উপরোক্ত উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের কাজকর্ম ও আন্দোলন সম্পর্কে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫। যে সমস্ত মূল দাবি ও স্লোগান শ্রমিকশ্রেণিকে উদ্বুদ্ধ করিবে, ঐক্যবদ্ধ করিবে এবং আন্দোলনের পথে পরিচালিত করিবে, তাহা কেবলমাত্র শ্রমিকদের মধ্যেই ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করিলে চলিবে না, সমস্ত মেহনতকারী জনগণের মধ্যে তাহা প্রচার করিতে হইবে। স্লোগানগুলি নিম্নরূপ:

(ক) সমস্ত মূল ও বৃহৎ শিল্প, ব্যাংক, ইন্‌সিওরেন্স, খনি, চা বাগান, প্রভৃতির জাতীয়করণ এবং উহার উপর শ্রমিকদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

(খ) ফ্যাক্টরী, খনি, চা-বাগান, ব্যাংক, ইনসিওরেন্স প্রভৃতিতে নিয়োজিত সমস্ত ব্রিটিশ ও বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত।

(গ) মুনাফা নিয়ন্ত্রণ এবং বাকি শিল্পের উপর শ্রমিকদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) জীবনধারণের উপযোগী মজুরি ও মাগ্‌গীভাতা (জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধিব অনুপাতে পুর্ণ ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা)।

(ঙ) মূল্যের অনুপাতে মজুরি বৃদ্ধি, ছাঁটাই বন্ধ ও বেকার সমস্যার সমাধান।

(চ) সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা খাটুনী, অসুস্থতার ছুটি, বৃদ্ধ বয়সে পেনসন এবং উপযুক্ত ছুটির সুবিধা।

(ছ) কাজ করিবার এবং ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার; বেকারকে কাজ দিবার কিংবা খাদ্য দিবার জন্য সরকার ও মালিকের দায়িত্ব।

(জ) বক্তৃতা, সংবাদপত্র ও সংগঠনের স্বাধীনতা।

(ঝ) শ্রমিক ও তাহার পরিবারবর্গের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা।

(ঞ) ট্রেড ইউনিয়নের বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি।

এই সমস্ত মূল দাবি কেবলমাত্র কোন শ্রেণির মূলদাবি বা স্লোগান নয়, ইহা সমস্ত মেহনতকারী জনগণের দাবি। ইহা ভবিষ্যতের নয়, আজিকার দিনেরই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মূল স্লোগান।

১৬। এই সমস্ত মূল দাবি ও অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করার অর্থ এই নয় যে, কোন একটি ফ্যাক্টরী ও অফিসের স্থানীয় ছোট দাবি বা আংশিক সংগ্রামকে ছোট করিয়া দেখা। শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান ক্রোধ ও অসন্তোষ আজ এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে তাহারা স্থানীয় বা আংশিক দাবির উপর প্রায়ই স্বতস্ফুর্ত্তভাবে বিরাট আন্দোলন করে। সুতরাং যে সমস্ত সমস্যার উপর শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে টানিয়া আনা যায় সেই সমস্ত দৈনন্দিন সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকিতে হইবে। আংশিক সংগ্রামকে কখনও মূল দাবির বিরোধী ভাবিলে চলিবে না, কারণ ইহারা পরস্পরবিরোধী নহে। অপর পক্ষে, আংশিক দাবির উপর সফল আন্দোলন ও কাজ শ্রমিকদের মূল দাবির তাৎপর্য্য বুঝিতে সাহায্য করিবে। প্রত্যেকটি আংশিক সংগ্রাম শ্রমিকদের ভবিষ্যতের বিরাট সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিবে।

আগামী দিনে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের গুরুত্ব

পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ শক্তিই একমাত্র জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাকে জাগ্রত করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পরিচালিত করিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে

আমরা যে স্তব্ধভাব দেখিয়েছি, আমাদের কাজের দ্বারা আমরা উহাকে ঝড়ের পূর্বমুহূর্তের স্তব্ধতায় পরিবর্তিত করিতে পারি।

শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম সমস্ত মেহনতকারী জনগণের মনে প্রেরণা যোগাইবে। এই সমস্ত সংগ্রামে পার্টির নেতৃত্ব সমস্ত বামপন্থী শক্তিকে আমাদের পিছনে সমবেত করিবে,—পেটিবুর্জোয়া বামপন্থী পার্টিগুলির আদর্শগত বিভ্রান্তির অবসান ঘটিবে। পার্টির নেতৃত্বে এই সমস্ত সংগ্রাম এবং শ্রমিকশ্রেণির ব্যাপক গণসমর্থন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করিবে।

ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে

১৯৪৭ এর ১৫ই অগষ্টের পর বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নিম্নলিখিত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়:

১। 'পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছি, নিজের দেশকে গড়িয়া তুলিতে হইবে'—এই মনোভাব শ্রমিক ও চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবল থাকিলেও 'নেতাদের পিছনে দাঁড়াইতে হইবে' মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর দল নিজ নিজ ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়েন। দাবি সংক্রান্ত ব্যাপার ধামাচাপা পড়ে।

২। এই সময়ই জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিবার বিশেষ চেষ্টা করে এবং কিয়দাংশে সফলও হয়। বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস ও '১৫ই অগষ্টের' গৌরব বহন করিত বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে বেশ কিছু সাড়াও জাতীয় টি-ইউ-সি জাগাইতে পারে, নিজের ঘাঁটি বাঁধিতে সচেষ্ট হয়। বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভেদ সৃষ্টি হয়, বহুস্থলে নূতন ইউনিয়ন জাতীয় টি-ইউ-সি'র নেতৃত্বে গঠিত হয়। বহু মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের ইউনিয়ন এ-আই-টি-ইউ-সি হইতে বাহির হইয়া আসে (যথা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্ম্মচারী ইউনিয়ন) বা তাহার সংশ্রব ত্যাগ করে (যথা ফেডারেশন অফ মার্কেন্টাইল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন)।

৩। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিস্‌পুট এ্যাক্ট চালু হওয়ার ফলে এবং কংগ্রেস সম্পর্কে যথেষ্ট মোহ থাকায় শ্রমিক ও কর্ম্মচারীগণ 'আদালতে'র মারফৎ ন্যায্য দাবি আদায়ের কথঞ্চিত বিশ্বাসবান হন। শ্রমবিরোধ আইনের 'উপকারিতা' বিষয়ে এত ঢক্কানিনাদ হয় যে সাধারণভাবে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মনে সালিশীতে বিশ্বাস সৃষ্টি হয় বিশেষত যখন কংগ্রেসী রাজত্বে সালিশীর ব্যবস্থা হইতেছে। গোলমাল বা অসন্তোষ দেখা দিলে সালিশীর দাবি করাটাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৪৭ এর শেষ দিকে বাংলায় কোন উল্লেখযোগ্য ষ্ট্রাইক হয় নাই বলিলেই চলে। ২। ১টি হরতাল যাহা হইয়াছে বেশিরভাগই শ্রমিকদের দলাদলির ফলে নষ্ট হইয়া যায়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে প্রধান শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাট কারখানায়ও ট্রাইব্যুনাল বসে।

৪। আই-এন-টি-ইউ-সির সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যালিষ্ট পার্টিও শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে আসর জমাইতে চেষ্টা করে। উভয়ই কংগ্রেসের নাম ভাঙ্গান ও আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির কাজে তৎপর হইয়া উঠে।

১৯৪৭এর ডিসেম্বর মাসে যে কয়েকটি ধর্ম্মঘট হয় (যথা ব্রুকবন্ড) তাহাতে শ্রমিকদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করিয়া তাহাতে সোশ্যালিষ্ট বা আই-এন-টি-ইউ-সি, মালিক, গুন্ডা ও পুলিসের

সাহায্যে হরতাল ভাঙ্গিতে সক্ষম হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলির সহিত গুন্ডাদলের যোগাযোগ কায়েম হয়। সর্বত্র ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ ব্যাপক গুন্ডামী চলিতে শুরু করে। ১৯৪৮এর ৫ই জানুয়ারীর নিরাপত্তা বিরোধী সাধারণ ধর্ম্মঘটে এই মালিক, সরকার, আই-এন-টি-ইউ-সি সোশ্যালিষ্ট পার্টি ও গুন্ডাদলের অপূর্ব সংযোগ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

৫। যতইদিন যাইতে লাগিল ততই কংগ্রেসী রাজের স্বরূপ জনসাধারণের চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং ততই সরকারি দমন নীতি ও আই-এন-টি-ইউ-সি ও সোশ্যালিষ্ট পার্টির ভেদসৃষ্টির প্রয়াস তীব্র আকার ধারণ করে। কংগ্রেসী রাজে শ্রমিক সাধারণের দুঃখ-দারিদ্রও প্রবল আকার ধারণ করিতে থাকে, ফলে সরকারি বিচার, আদালত, সালিশী বা প্রতিশ্রুতিতে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর দল আস্থা হারাইতে থাকে। জুলুম, দারিদ্র্য ও বেকারীর বিরুদ্ধে পুনরায় কারখানায় কারখানায় ঘেরাও (ট্রাম, চটকল, সুতাকল) সভা শোভাযাত্রা ও হরতালের বন্যা শুরু হয়। স্বভাবতই শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে সর্বাধিক সংঘবদ্ধ, সংগ্রামশীল ও সচেতন অংশই লড়াই শুরু করে। বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা বুঝিতে পারে যে ভেদনীতি ও সরকারি দমননীতির মোকাবিলা করিতে হইবে। তাহার জন্য তাহারাও প্রস্তুত হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় ও নুতন কৌশল অবলম্বন করে (বাসন্তী)। অপেক্ষাকৃত কম সচেতন অংশের মধ্যে 'সরকারি নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচার সম্পর্কে মিথ্যা মোহ বিদ্যমান থাকার ফলে লড়াইয়ের পদ্ধতিতে পুরাতন দিনেরই জের থাকিয়া যায়। (কেন্দ্রীয় সরকারি কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘটে অভূতপুর্ব সংগঠন ও সাহস দেখান সত্ত্বেও সাধারণ কর্ম্মচারীর দল এমন কি পার্টি কর্ম্মীরাও সংগ্রামের নুতন পদ্ধতি বুঝিতে পারেন নাই। কংগ্রেসী প্রচারে তাঁহারাও অভিভূত হইয়া পড়েন, 'শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কার' মিছিল প্রভৃতির প্ল্যান করেন না, পিকেটিং সফল করিবার জন্য আরও জঙ্গী পন্থা অবলম্বন করেন না ইত্যাদি)। বাসন্তীর ও পরে শ্রীদুর্গার অভূতপুর্ব গৌরবময় সংগ্রাম কাহিনী স্থানীয় গন্ডী ভেদ করিয়া শ্রমিক কর্ম্মচারীর সম্মুখে নুতন আলো জ্বালাইয়া তুলিতে পারিল না। হাওড়া শালিমার ওয়ার্কসের শ্রমিক হরতাল প্রায় দীর্ঘ তিন মাস ব্যাপী চলে কিন্তু শ্রমিকগণ নুতন কোন রাস্তা ধরিতে সক্ষম হয় না।

৬। পুর্বোক্ত শ্রমিক বিক্ষোভ ও সংগ্রামে পশ্চিম বাংলা সরকার ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। ঐ সংগ্রাম ও বিক্ষোভগুলিই কমিউনিষ্ট পার্টি কর্ত্তৃক সংগঠিত ও পরিচালিত হইতেছিল বলিয়া পার্টি বে-আইনী হয়।

১৯৪৮এর ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসে যে শ্রমিক অসন্তোষ ও সংগ্রাম দেখা দেয় তাহা বৃহত্তর সংগ্রামের সূচনা করে। সরকার দমননীতির সাহায্যে অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও সংগ্রামের মূলোৎপাটনে প্রয়াসী হইল। শুরু হইল ফ্যাসিষ্ট দমননীতি। ছোট বড় বহু হরতাল মালিক, সরকার, আই-এন-টি-ইউ-সি, সোশ্যালিষ্ট ও গুন্ডাদলের সম্মিলিত অত্যাচারে বিনষ্ট হয়। শ্রমিক সাধারণের মধ্যে কংগ্রেস সম্পর্কে মোহমুক্তি ও সংগ্রামী ঐক্য তখনও গড়িয়া উঠে নাই— গড়িয়া উঠিবার মুখেই এই আক্রমণ আসিয়া পড়ে। শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামী সচেতন অংশ আর একবার নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

সাধারণ শ্রমিক পথ খুঁজিয়া পায় না, বুঝিতে পারে না কি করিয়া ঐ প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হইতে পারা যায়। একতাও সংগ্রামের ইচ্ছা থাকিলেও বহির্প্রকাশ পায় না। আই-এন-টি-ইউ-সি'র প্রচারে এক অংশ বিভ্রান্ত হইয়া মনে করে যে ঐ দলে যোগদিলে হয়তো সুরাহা হইবে,

পুলিশ ও মালিকের জুলুম আসিবে না, দাবিও পাওয়া যাইবে। এই জুলুমে কংগ্রেস ভক্তি সৃষ্টি হইল না বরং নষ্ট হইল কিন্তু লোক হতাশায় ও বিভ্রান্তিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল।

কর্মচারি মহলেও ঐ একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। যাহারা এতদিন কংগ্রেসের স্তাবক, ধারক ও বাহক ছিলেন সেই মধ্যবিত্তের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী হরতালে সরকারি তান্ডবলীলা অনেকখানি জ্ঞানাঞ্জন শলাকার কাজ করে। কংগ্রেস, নেহরু ও সরকার সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটিতে থাকে। উভয় স্থলেই (শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত) জুন-জুলাই মাস হইতে আই-এন-টি-ইউ-সি একটু একটু করিয়া হটিতে থাকে।

৫। জুন জুলাই হইতেই জীবনযাত্রার খরচ অভুতপুর্ব ভাবে বাড়িতে থাকে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাব তীব্র আকার ধারণ করে। অসন্তোষ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। ট্রাইব্যুনাল ও সরকারি শ্রমনীতিতে শ্রমিক কর্মচারি দ্রুত আস্থা হারাইতে থাকে। আগামী সংগ্রামের পদধ্বনি আবার শুনিতে পাওয়া যায়—কলিকাতার জন পথে, শিল্পাঞ্চলের বস্তিতে, কারখানায়।

পার্টিও ইতিমধ্যে কতকটা ধাক্কা সামলাইয়া উঠে। কর্ম্মীরা আবার কাজে অগ্রসর হইতে থাকেন। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে হরতাল ও ঘেরাও শুরু হয়,—মোহিনী মিলস্, ট্রাম, ম্যান্সফিল্ড, বিভিন্ন চটকল ইহার সাক্ষ্য দেয়। অসন্তোষ এত পুঞ্জীভূত হয় যে, সব বাধা, অত্যাচার, নিপীড়ন সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণি লড়াই শুরু করিয়াছে, মালিক ও সরকারের কোন আক্রমণ মানিয়া লয় না। অন্যত্র পরাজিত হইতেছে দেখিয়াও শ্রমিক লড়াইতে নামিতেছে—না নামিয়া তাহার উপায় নাই।

কলিকাতার মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারী অঞ্চলেও ট্রাইব্যুনাল বিরোধী অভিযান শুরু হইল। হতাশার ধাক্কা কাটাইয়া আবার চাকুরীজীবীর দল কোমর বাঁধিল। সওদাগরী অফিস বীমা ও ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমিতির এক কনফেডারেশন গঠিত হইল—একযোগে ট্রাইব্যুনাল লড়িবার জন্য, দরকার হইলে সংগ্রাম করিবার জন্য। ২৯শে জুলাই আবার কলিকাতার আকাশ বাতাশ মুখর করিয়া তুলিল।

এই সময় প্রধান বিশেষত্ব দেখা যায়—

(ক) কংগ্রেসী, কমিউনিষ্ট, সোশ্যালিষ্টপন্থী শ্রমিক কর্ম্মচারীব মিলন। কমিউনিষ্ট বিরোধিতার আরও হ্রাস।

(খ) কংগ্রেস, আই-এন-টি-ইউ-সি ও বিভেদকারী কংগ্রেসী বা আই-এন-টি-ইউ-সি'র কর্ম্মীদের সম্বন্ধে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর চৈতন্য।

(গ) আই-এন-টি-ইউ-সি ও সোশ্যালিষ্ট পার্টি নেতৃত্বাধীনে অনেক ইউনিয়নে স্বতস্ফুর্ত্ত ধর্ম্মঘট। আসরে স্থান রাখিবার জন্য উক্ত সংগঠনের নেতাদের গরম বুলি, ষ্ট্রাইকের ধমকি এমন কি ষ্ট্রাইক আহ্বান।

এইগুলি হইতেই প্রমাণ হইতে থাকে অবস্থা আবার তীব্র আকার ধারণ করিতেছে এবং দ্রুত সংগ্রামের দিকে চলিতেছে। আবার এ-আই-টি-ইউ-সির নেতা ও কর্ম্মীরা সাধারণ শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর মধ্যে প্রিয় হইয়া পড়িতেছেন। সংগ্রামের আহ্বানে সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

এই সময় আসে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্ম্মঘট। এই হরতালের প্রধান বিশেষত্ব:

(ক) সরকার ও কংগ্রেস সম্বন্ধে কর্মচারীগণ এতই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে

কংগ্রেস বা সরকারি ভেদনীতি সফল হইতে পারে নাই। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ও জাতীয় টি-ইউ-সি'র সভাপতি হরতালের বিপক্ষতা করা সত্ত্বেও সাধারণ হরতাল অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে।

সরকারি ভ্রুকুটি উপেক্ষা করিয়া, প্রচণ্ড নিপীড়ন হইবে জানিয়াও, সরকারি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া ১৮,০০০ কর্ম্মচারীর মধ্যে কমপক্ষে ১৭,৫০০ হরতাল পালন করেন। পিকেটিং একেবারেই করিতে হয় নাই বলিলেই চলে।

(খ) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীগণ এমন দাবি উপস্থিত করেন যাহাতে সমস্ত কর্ম্মচারী এবং আরও নিম্নপদস্থ শ্রমিকগণ সাড়া দেন, একসূত্রে গ্রথিত হন।

(গ) বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের লোক থাকা সত্ত্বেও বিভেদ সৃষ্টি হইতে পারে নাই। মোটামুটিভাবে কংগ্রেস সরকারের শ্রমনীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসপন্থী হইতে কমিউনিস্ট কর্ম্মচারী কাঁধে কাঁধ লাগাইয়া কাজ করিয়াছেন। অত্যন্ত পরিচিত কমিউনিস্ট কর্ম্মীর সহিত কিছুদিন পূর্বেকার কমিউনিস্ট সরকারি কর্ম্মচারী সহযোগিতা করিয়াছেন। অধিকসংখ্যক লোক অ-কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম্মঘটে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবে তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন।

প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সমিতিতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কমিউনিস্ট আছেন। অন্যমতাবলম্বী বা অদলীয় কর্ম্মচারীগণও তাঁহাদের দ্বিধাহীন সমর্থন জানাইয়াছেন। অনেক অদলীয় ও অন্যমতাবলম্বী কর্ম্মচারী, যাঁহারা কমিউনিস্ট কর্ম্মীদের সহিত একযোগে ধর্ম্মঘটে নেতৃত্ব করিয়াছেন। কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারকার্য্যের টুঁটি প্রথম হইতেই চাপিয়া রাখেন। আন্দোলনের কোন স্তরেই কমিউনিস্ট বিরোধিতা মাথা চাড়া দিতে পারে না। বহু দিনের অভিজ্ঞতার মধ্যেদিয়া অ-কমিউনিস্ট নেতা ও কর্ম্মীগণ বুঝিয়াছেন, কমিউনিস্ট বিরোধিতার জিগির তুলিয়া স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল দল কিভাবে ভেদ সৃষ্টি করে।

(ঘ) উপরোক্ত সমস্ত আন্দোলনে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কমিউনিস্ট নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং ইহাতে কোন শ্রেণিরই কর্ম্মচারী ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হন নাই। সকলে স্বাভাবিকভাবে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। আই-এন-টি-ইউ-সি'র ভক্ত কয়েকজন ইউনিয়ন নেতাও ইহা মানিয়া লইয়াছেন। বিভেদকামী প্রতিক্রিয়াশীল অংশ সর্ব্বত্রই কোণঠাসা হইয়াছেন এবং আন্দোলনে বিরোধিতা করিতে সাহস পান নাই। জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ভয়ে তাঁহারাও তাঁহাদের নেতৃত্বের নির্দেশের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সহিত চলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

(ঙ) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের হরতালীদের পিছনে সমস্ত কলিকাতার মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারীর অকুণ্ঠ ও সক্রিয় সমর্থন থাকে। ১৪ই আগষ্টের সভা এবং সাধারণ ধর্ম্মঘটের পর যে সভা হয় তাহা হইতে প্রমাণিত হয়, সর্বশ্রেণির মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী মনেপ্রাণে বুঝিতে পারেন ঐ ধর্ম্মঘটের জয়-পরাজয়ের উপর আগামী সংগ্রামের জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ভাইদের দাবি খুব বড় ছিল না, তথাপি প্রত্যেকটি মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী অনুভব করেন যে ঐ ধর্ম্মঘটকে জয়ী করাইতেই হইবে। প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী ও অন্যান্য অফিসের লোক নিজ নিজ নেতৃত্ব সংযুক্ত সংগ্রামপরিষদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ব্যাঙ্কের সাধারণ ধর্ম্মঘটের পর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের হরতালীদের জন্য আর কি করিবার প্রয়োজন। এই প্রচণ্ড সংগ্রামমুখী মনোভাব আঁচ করিয়াই মালিকশ্রেণি শঙ্কিত হয়, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ মিটমাট করিতে বাধ্য

হয়। শোষিত জনসাধারণের সংগ্রামশীল এমন ঐক্য ১০ই জানুয়ারী ১৯৪৭ সালের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্ম্মচারীদের সাধারণ ধর্ম্মঘটের পর আর দেখা যায় নাই।

(চ) এই এক হরতাল ও পরবর্ত্তী সাধারণ হরতালের মধ্য দিয়া কংগ্রেস ও সরকারের মুখোশ আরও শতগুণে উন্মোচিত হইয়াছে, সংস্কারপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী শক্তিও অনেক পরিমাণে দুর্বল হইয়াছে, তাহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, জনসাধারণ দ্রুত মোহমুক্ত হইতেছে, সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতেছে।

সর্বশেষ এই সংগ্রামের মধ্যদিয়া শোষিত মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরিয়া পাইতেছে। সরকারি দুর্বলতা কোথায় খুঁজিতে পারিয়াছে, ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও শক্তি অনুভব করিয়াছে। পুরাতন বহু পরাজয়ের গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। এই দিক দিয়াই শ্রমিক আন্দোলনে ইহা এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে, সংগ্রামের নতুন অধ্যায় শুরু করিয়াছে।

এই সংগ্রামের প্রধান ও বোধ হয় একমাত্র দুর্বলতা ছিল—শ্রমিকশ্রেণির কাছে এই সংগ্রামের বার্ত্তা বহন করা হয় নাই, শ্রেণির সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হয় নাই, শ্রমিক শ্রেণীকে ইহার আঁওতায় আনা হয় নাই।

অবশ্য কখনও ইহা বলা সমীচীন হইবে না যে, আর কোন বাধা আমাদের সামনে দাঁড়াইতে পারিবে না. এবার আমরা প্রত্যেক সংগ্রামেই জয়ী হইব, বিভেদ কর্মীদের মুখোশ খুলিয়া গিয়াছে, জনসাধারণের চক্ষে কংগ্রেস ও সরকার চিরকালের মত নামিয়া গিয়াছে ইত্যাদি। বরং জানিতে হইবে এইরূপ আরও অনেক লড়াই করিতে হইবে। পরাজিতও হইতে পারি—হয়ত সংগ্রামের ফলে কিছুদিনের মত সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারি, কিন্তু শেষ জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ জয়-পরাজয়ের মধ্যে দিয়াই ভবিষ্যৎ শেষ সংগ্রামের জন্য জনতা প্রস্তুত হইতেছে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক হরতাল ও পরবর্ত্তী সাধারণ ব্যাঙ্ক হরতাল হইতে এই শিক্ষাই গ্রহণ করিতে হইবে যে—বৈপ্লবিক সংকট গভীর হইতেছে। সঠিক কর্মপদ্ধতি উপস্থিত করিতে পারিলে সর্বস্তরের কর্ম্মচারীকেই ঐক্যবদ্ধ করা যায় ও সংগ্রামে উত্তীর্ণ করানো যায়।

- অর্থনৈতিক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ সরকার বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হইতেছে।
- কমিউনিস্ট বিরোধিতা পিছনে হটিতেছে, সংগ্রামী মনোভাব বাড়িতেছে, সংগ্রামের আহ্বান জানাইলে লোকের মনে স্পন্দন জাগানো যায়। জনসাধারণ সংগ্রাম চায়, সংগ্রামী নেতৃত্ব চায়।
- সংগ্রামের প্রস্তুতি দরকার। কোন ছোট খাট জুলুম এখন মানিয়া লইয়া ভবিষ্যতে বড় সংগ্রাম করিব এ মনোভাব সংগ্রামের পরিপন্থী। দৈনন্দিন ছোট ছোট সংগ্রামের মারফত বৃহৎ সংগ্রামে উপনীত হওয়া যায়—অর্থনৈতিক গণ্ডী পার হইয়া রাজনৈতিক পর্যায়ে আসা যায়।
- সংগ্রাম ব্যাপক ও গভীর করিতে পারার উপর সাফল্য নির্ভর করে। কি পরিমাণে সংগ্রামের দাবি ও উদ্দেশ্য অন্যান্য শোষিত জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে তাহার উপর জয়-পরাজয় নির্ভর করে। জনগণের মধ্যে ভালভাবে প্রচার করিলে অকুণ্ঠ সমর্থনও পাওয়া যায়।

- জঙ্গী ঐক্যের জোরে জনগণের সমর্থন লাভ করিতে পারিলে কংগ্রেস-মালিক-সরকারের মিলিত আক্রমণ পরাস্ত করা যায়।
- সংগ্রামের মধ্য দিয়াই জনগণ সংকটের কারণ সর্ব্বাপেক্ষা সহজে বুঝিতে পারে, শাসক ও শোষকের প্রকৃত স্বরূপ দ্রুত বুঝিতে পারে, রাজনৈতিক জ্ঞানলাভ সহজে ও দ্রুত করিতে পারে।

ধর্ম্মঘটে সাফল্যের পর

ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ যখন হরতালীদের সহিত একটা মিটমাট করিতে প্রস্তুত হয় তখন ধর্মঘট পরিচালক কমিটি একটি প্রধান ও মারাত্মক ভুল করে। মৌখিক চুক্তি হয়, কোন লিখিত চুক্তি করা হয় না। যাহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষ পরাজয়ের পরও অন্য প্রকার বিবৃতির মারফৎ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে ধর্মঘটিরাই বিনাশর্ত্তে হরতাল প্রত্যাহার করিয়াছে। ইহার ফলে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতেছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির কর্ত্তব্য সর্বসমক্ষে প্রকৃত তথ্য উপস্থিত করা।

ধর্ম্মঘটে অর্থনৈতিক দাবির সুরাহা যত না হইয়াছে তাহা অপেক্ষা হইয়াছে নৈতিক জয়। ট্রাইবুনালের রায় ও প্রত্যেকের কিছু বেতন বৃদ্ধি করিতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছে কিন্তু অন্যদিকে হরতালীরা কর্ত্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাব ভাঙ্গিতে পারিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ মীমাংসার পথে আসিতে বাধ্য হইয়াছে যাহাতে তাহারা গত ৬ মাস কিছুতেই রাজি হয় নাই।

কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে মীমাংসার চেষ্টা হওয়ার পর ধর্ম্মঘটি কর্ম্মচারীদের অগ্রগামী অংশ যদি তখনও মনে করিতেন সব না পাইলে যাইব না তা হইলে ভুল হইত। কেননা তাহাতে সমস্ত কর্মচারী রাজি হইত না, বিভেদ সৃষ্টি হইত। দ্বিতীয়ত তাহারই সুযোগে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে, অন্যান্য ব্যাঙ্কে ও অফিসে সুবিধাবাদী আই-এন-টি-ইউ-সি ও সোশ্যালিষ্ট দল দলাদলি পাকাইতে পারিত, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন নষ্ট করিবার সুযোগ পাইত।

অন্যান্য কয়েকটি ব্যাঙ্কে সাধারণ ধর্ম্মঘটের পর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করায় বিভেদ সৃষ্টিকারীরা প্রচার করিতেছে যে ঐ অবস্থায় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করা উচিত হয় নাই বরং চালাইয়া যাওয়াই উচিত ছিল। এই বীরত্ব-ব্যাঞ্জক পরামর্শের পিছনে প্রকৃত সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা নাই, আছে ঐক্য নষ্ট করার প্রচেষ্টা। অন্য ব্যাঙ্কে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার না করা হইলে হরতাল জারি রাখা হইবে—এইরূপ অবস্থা ছিল না। এই ধ্বনি উঠাইলে হরতাল বাঁচান যাইত না। বরং এখন হরতাল বিজয়ের পর লয়েডস্ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ব্যাঙ্কের সহকর্ম্মীদের জন্য প্রবল আন্দোলন করা সম্ভব ও উচিত এবং সেই আন্দোলনকে আর একটি সাধারণ ধর্ম্মঘটের (এক বা ততোধিক দিনের জন্য) দিকে নিতে হইবে এবং সে অবস্থা সৃষ্টি করা এখন সম্ভব ও উচিত।

বস্তুত এখন বিজয়ের উল্লাস দেখাইবার সময় নয়। নিজেদের সংগঠন মজবুত করা, প্রাদেশিক কর্ম্মচারী সমিতিকে শক্তিশালী করা, অন্যান্য ব্যাঙ্কের ভাইদের জন্য আন্দোলন, শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার করাবার আন্দোলন চালান—ইহাই আশু জরুরি কর্তব্য।

ইহার মধ্য দিয়াই ভবিষ্যতে আরও বিজয়লাভ করা যাইবে।

সহায়ক তথ্য - ২

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

প্রোসেক্ট স্পেশাল নোট
নং ৪৩

কলিকাতা ও হাওড়া জেলার কমরেডদের প্রতি

ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘটকে সফল করিয়া তুলুন

কমরেডগণ,

ট্রাইব্যুনালের রায়, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে নিজেদের মূল দাবির জন্য ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের সামনে এক বৈপ্লবিক সম্ভাবনা উপস্থিত করিয়াছে।

দেশের সংকট তীব্রতর হইতেছে। মূল্য বৃদ্ধি রোখা যাইবে না— অর্থমন্ত্রী মাথাই কলিকাতা বণিক সম্মেলনে তাহা স্বীকার করিয়াছেন— মালিকদের হাতে অবাধ শোষণের সনদ লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ দিন দিনই ফাটিয়া পড়িতেছে। পুলিশ ও ফৌজের জোরে সে বিক্ষোভ ঠেকানো যায় না, ধর্মঘট বন্ধ করা যায় না— কলিকাতার বাহাদুর ট্রাম শ্রমিক তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

যাঁহারা এতদিন পুলিশ-পল্টনের ভয়ে সংগ্রামে নামিতে ইতস্তত করিতেছিলেন, বন্দুক-পিস্তল না হইলে ধর্মঘট করা যাইবে না বলিয়া 'থিওরী' তৈরি করিতেছিলেন— ট্রাম শ্রমিকরা তাঁহাদের আতংক দূর করিয়াছেন, 'থিওরী' মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। যাঁহারা এতদিন শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে "নানা দল" দেখিয়া ঐক্যের উপর আস্থা হারাইতেছিলেন ট্রাম শ্রমিক তাঁহাদের সামনে সংগ্রামী ঐক্যের পথ খুলিয়া দিয়াছেন।

ট্রাম শ্রমিকরা একাই কি সাহসী, তাঁহারা একাই কি ঐক্য গড়িবার ক্ষমতা রাখেন? তাহা নয়। একথা আজ সকল শ্রমিকের নিকট স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে গভর্ণমেন্ট এবং মালিক তাঁহাদের আর সামান্য দাবিও পূরণ করিতে পারে না। বরং রেশনের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া এবং কাজের বোঝা বাড়াইয়া তাহারা শোষণের মাত্রা চরমে তুলিতেছে। এই জন্যই 'জাতীয়' টি-ইউ-সি এবং সমাজতন্ত্রী নেতারা— যাঁহারা আপসে দাবি আদায় করিয়া দিবেন বলিয়া এতদিন প্রচার করিতেছিলেন— এখন তাঁহারা সাধারণ শ্রমিকদের সামনে আসিতে ভয় পাইতেছে, সাধারণ শ্রমিকরা তাঁহাদের উপর আস্থা হারাইতেছেন; রেল, পোষ্ট অফিস, পোর্ট ও ডক শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘটের পথে অগ্রসর হইতেছেন। সর্দার প্যাটেল শুধু কমিউনিস্ট নয়, সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদেরও "দেশের শত্রু" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, অর্থাৎ সমগ্র শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন। ট্রাম শ্রমিকরা যে এই সমস্ত সংগ্রামী শ্রমিকের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছেন— তাহার কারণ সেখানে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব শক্তিশালী। ভেদপন্থী সমাজতন্ত্রীদের পরাস্ত করিয়া কমিউনিস্ট নেতৃত্ব শ্রমিকদের সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষাকেই রূপ দিতে পারিয়াছেন।

পার্টির মধ্যে যাঁহারা "দীর্ঘদিনের সংগ্রাম চাই" বলিয়া "একদিনের প্রতীক" ধর্মঘটের বিরোধিতা করিয়াছিলেন গত কয়দিনের ঘটনা তাঁহাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, আজিকার বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে একবার সংগ্রামের বাধা চূর্ণ হইলে তাহা আর 'আংশিক সংগ্রামে' বা 'প্রতীক সংগ্রামে' সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহা আরও লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী শ্রমিক ও জনগণে সমর্থন লাভ করে, তাহা আপসহীন সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। একদিনের 'প্রতীক ধর্মঘট' শুধু ট্রাম শ্রমিক নয়, কলিকাতা ও শহরতলীর সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর মনে সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করিয়াছে। দমননীতির বিরুদ্ধে ১৯শে ডিসেম্বরের ধর্মঘট শুধু রেল, পোষ্ট অফিস, পোর্ট ও ডকের শ্রমিকদের ধর্মঘটের শপথকেই দৃঢ় করে নাই, কাকদ্বীপ, মেদিনীপুর প্রভৃতি এলাকার লক্ষ লক্ষ ভাগচাষীর তে-ভাগা সংগ্রামকে শক্তিশালী করিয়াছে।

ট্রাম ধর্মঘটের বৈপ্লবিক তাৎপর্য্য এইখানে। এই বৈপ্লবিক তাৎপর্য মনে রাখিলে তবেই ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রত্যেক পার্টিসভ্য তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন। গত কয়দিনের ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখা গিয়াছে, পার্টির অধিকাংশ সভ্য, এমনকি ট্রামের কিছু কিছু পার্টিসভ্য বা পার্টিনেতা পর্যন্ত এই সম্পর্কে এখনো মোটেই সচেতন নন। ১৫ই ডিসেম্বর যখন "নমুনা" ধর্মঘটের" সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন তাঁহারা মনে করেন সমাজতন্ত্রী-কমিউনিস্ট ঐক্য যখন হইয়াছে তখন চুপচাপ বসিয়া থাকিলেও ধর্মঘট সফল হইবে। এই সকল কমরেড "নমুনা ধর্মঘট"কে সমাজতন্ত্রী নেতাদের সংস্কারবাদী দৃষ্টি লইয়া দেখিয়াছেন। তাহার জন্যই প্রথমে উহার বিরোধিতা এবং পরে 'নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা শ্রমিকশ্রেণির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। ঘটনার গতি প্রমাণ করিয়াছে যে, মালিক এবং গভর্ণমেন্ট তাহাদের আক্রমণ স্থগিত রাখিতে প্রস্তুত নয়, তাহারা সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। তাই "একদিনের ধর্মঘট" ভাঙ্গিবার জন্য দালাল নিযুক্ত করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাদের অবাধ শোষণের পথে যে সকল কমিউনিস্ট-সোশ্যালিস্ট কর্মী বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাদের ছাঁটাই করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গভর্ণমেন্ট শুধু একদিনের বর্বর লাঠি চালনার মধ্যেই ক্ষান্ত থাকে নাই, ট্রামের মেসে যাইয়া জঙ্গী শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করিবার জন্য ক্ষেপা কুকুরের মত ফিরিতেছে।

আবার ঘটনার গতি ইহাও প্রমাণ করিয়াছে যে, পার্টির কোন কোন কর্মী বা নেতা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও সাধারণ জঙ্গী কর্মী পুলিশে ও দালালের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সমাজতন্ত্রী সাধারণ শ্রমিক কমিউনিস্ট সাধারণ শ্রমিকের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া নতুন ইতিহাস তৈরি করিয়াছেন। পার্টির একজন দুইজন নেতা বা কর্মীর নিষ্ক্রিয়তা সমাজতন্ত্রী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা এই জঙ্গী শ্রমিকদের অভিযানকে কখনো রুখিতে পারিবে না। ট্রাম ধর্মঘট সেই শিক্ষাই আমাদের সামনে উপস্থিত করিয়াছে।

একজন ট্রামপার্টি সভ্য বা একজন ট্রাম শ্রমিক নেতাকেও এখন আর নিষ্ক্রিয় থাকিলে চলিবে না। তাঁহাদের প্রত্যেকের স্থান জঙ্গী শ্রমিকদের মধ্যে।

মূল দাবির উপর সংগ্রাম পরিচালনায় ধর্মঘটি শ্রমিকদের প্রত্যেককে সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। ধর্মঘটের দাবি ও লক্ষ্য সম্পর্কে সমাজতন্ত্রী ও 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতারা শ্রমিকদের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা সংগ্রামকে স্থগিত

করিয়া আপসের কথাবার্তা চালাইতেছেন। ইহার একমাত্র জবাব হইল : প্রত্যেক এলাকা ও কেন্দ্রে সম্মিলিত স্ট্রাইক কমিটি গঠন করা, প্রত্যেকটি জঙ্গী কর্মীকে প্রচার, স্ট্রাইক ফাণ্ডের অর্থ সংগ্রহ এবং পিকেটিং-এর কাজে নিযুক্ত করা, ট্রাম শ্রমিক ও জনসাধারণ এবং ট্রাম শ্রমিক ও কলিকাতা হাওড়ার অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া তোলা। ট্রামের মেস প্রভৃতিকে এমন শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করা যাহাতে শ্রমিকদের সেখান হইতে তাড়াইবার চেষ্টা হইলে, কোন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা হইলে শ্রমিক ও জনগণের মিলিত প্রতিরোধ সম্ভব হইতে পারে।

অন্যান্য শিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারী কমরেডদের দায়িত্ব, ট্রাম শ্রমিকদের অপেক্ষা মোটেই কম নয়। তাঁহারা এখনই ট্রাম শ্রমিকদের উপর লাঠি চালনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করুন, তাহাদের মূল দাবির সংগ্রাম সমর্থন করুন যেখানে সম্ভব ধর্মঘট করুন, অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে পোষ্টার প্রভৃতি মারফৎ প্রচার কার্য্য চালান।

ছাত্র কমরেডরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রেল ও অন্যান্য শ্রমিকরা ধর্মঘটের পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, কোথাও বেতন বৃদ্ধি এবং শিল্প-সংকোচের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধর্মঘটের আকার গ্রহণ করিয়াছে।

কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণার ছাত্র সমাজ বরাবরই ট্রাম শ্রমিকদের সংগ্রাম সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। আজ ভাড়া-বৃদ্ধি, গ্রেপ্তার ও লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে ট্রাম শ্রমিকের মূল দাবির সমর্থনে সকল দল ও সকল মতের সাধারণ ছাত্রকে সাধারণ ধর্মঘটে টানা মোটেই শক্ত নয়। এখনই ছাত্রদের মধ্যে প্রচার সুরু করিয়া ছাত্রসমাজকে ট্রাম ধর্মঘটের সক্রিয় সমর্থনে টানিতে হইবে।

মহিলা কমরেডরা ট্রাম শ্রমিকদের মা-বোনদের একত্রিত করিয়া পিকেট লাইনে আসিয়া দাঁড়ান। অমৃত বাজার যুগান্তর ধর্মঘটে তাঁহারা যে বিপ্লবী পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবার ট্রামের ধর্মঘটে তাহাদিগকে সে পথে আরো দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হোন।

পার্টির সমস্ত দরদী ও সমর্থক এখনই ট্রাম ধর্মঘটকে সফল করার জন্য কাজে নামুন; প্রচার, পিকেটিং ও অর্থ সংগ্রহের কাজে ঝাপাইয়া পড়ুন; পাড়া ও ক্লাবে সংগ্রামী ট্রাম শ্রমিকদের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করুন। পুলিশের ঘাঁটিতে যাইয়া তাঁহাদের সাধারণ পুলিশকে পক্ষে টানিবার চেষ্টা করুন। হাতে লেখা পোষ্টার, ইস্তাহার প্রভৃতিতে শহর ছাইয়া ফেলুন। প্রত্যেক এলাকায় ট্রাম শ্রমিক কর্মী ও নেতাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের নেতৃত্বে এলাকার ভিত্তিতে কর্মপন্থা গ্রহণ করুন।

দাবি তুলুন :

• ট্রাম শ্রমিকদের মূল দাবি মানতে হবে; • সমস্ত ট্রাম শ্রমিক নেতাকে ছাড়তে হবে; • ট্রামের ভাড়া বাড়ানো চলবে না; • কালাকানুন তুলে নাও, ১৪৪ ধারা তুলে নাও; • পুলিশ রাজ ধ্বংস হোক; • বিদেশি ট্রাম কোম্পানি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত কর; • আপসপন্থী ও ভেদপন্থী দালালদের ধর্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা ব্যর্থ কর; • ট্রামের কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্ট বিপ্লবী শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। — প্রোসেক্ট, ২০/১২/৪৮

সহায়ক তথ্য - ৩

কমিউনিস্ট বুলেটিন (১২)

রেল ধর্মঘট প্রসঙ্গে পার্টির প্রাদেশিক কমিটির মন্তব্য

'... সাময়িক পরাজয়ে পার্টির মধ্যবিত্ত কমরেডদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই আতঙ্কের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শ্রেণি শত্রুরা তাহাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। যাহারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বলিয়া স্বীকার করে না, যাহারা শ্রমিক কৃষক ছাত্রের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও অভ্যুত্থানকে দেখিতে পান না, যাহারা দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সংগ্রাম-নীতিকে এখনো গ্রহণ করে নাই, তাহারা এতদিন কোণঠাসা ছিল। ধর্মঘট সফল না হওয়ার ফলে এখন তাহারা মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহারা 'প্রমাণ' করিবার চেষ্টা করিতেছে যে ৯ মার্চ রেলের সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 'হঠকারিতা' বা 'এ্যাডভেঞ্চারিজম' হইয়াছে; তাহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণি এখনো 'প্রস্তুত' নয়।'

তথ্যসূত্র : অমলেন্দু সেনগুপ্ত— উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব পৃ. ২৬৯

কমিউনিস্ট বুলেটিন (১৬)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি

১৪ নভেম্বর ১৯৪৯

কলিকাতা কর্পোরেশনের ধর্ম্মঘট হইতে কি শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে?

[ক]

কলিকাতা কর্পোরেশনের ২২ হাজার শ্রমিকের ৯ দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট সারা বাংলার শ্রমিক সংগ্রামে নূতন জোয়ার আনিয়াছে।

নেহরু-বিধান সরকার ভাবিয়াছিল ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের হুকুমে টাকার দাম কমাইলে শ্রমিকরা তাহা মুখ বুজিয়া মানিয়া লইবে; চিনি-নুন বাজার হইতে উধাও হইলেও, জীবনধারণের খরচ দিনের পর দিন বাড়িলেও মজুররা তাহার কোন প্রতিবাদ করিবে না, সর্দার প্যাটেলের উপদেশ মত মজুরি বৃদ্ধির জন্যে সংগ্রাম না করিয়া তাহারা বুকে হাঁটিতে থাকিবে। কংগ্রেসী শাসক শ্রেণির সেই আশা কর্পোরেশনের ২২ হাজার সংগ্রামী শ্রমিক চুরমার করিয়া দিয়াছে। সারা বাংলার শ্রমিকদের পক্ষ হইতে তাহারা কংগ্রেসী সরকারকে জানাইয়া দিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটি আক্রমণকে রুখিবার শক্তি তাহাদের আছে। কর্পোরেশনের অধিকাংশ শ্রমিক পেছনে-পরা ঝাড়ুদার-মেথর। তাহারা সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া প্রমাণ করিয়াছে অবস্থা কতখানি বিপ্লবী সম্ভাবনাপূর্ণ।

নেহরু-বিধান কংগ্রেসী শাসকের দল আশা করিয়াছিল, 'জাতীয়' টি-ইউ-সির পোষা দালাল ও গুণ্ডারা চিরদিনই শিল্পে শান্তিরক্ষা করিতে পারিবে। তাহাদের সেই আশাও ২২ হাজার কর্পোরেশন শ্রমিক চুরমার করিয়া দিয়াছে। তাহারা দেখাইয়া দিয়াছে কত তাড়াতাড়ি শ্রমিকরা আজ দালাল নেতাদের শায়েস্তা করিয়া লড়াইয়ের ময়দানে সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারে। 'ধর্মঘট নয়-আপস' দালালদের এই প্রচারকে কত অল্পসময়ের মধ্যে তাহারা খতম করিতে পারে। শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালাল ও গুণ্ডাদের এই কোণঠাসা অবস্থা হইতেই বুঝা যাইতেছে অবস্থা কতখানি বিপ্লবী সম্ভাবনাপূর্ণ। কর্পোরেশনের ২২ হাজার শ্রমিক সংগ্রামের শেষ বাধাগুলি চূর্ণ করিবার ফলেই সারা বাংলায় শ্রমিক সংগ্রামের জোয়ার আসিয়াছে।

[খ]

একহাতে ছাঁটাইয়ের নোটিশ এবং অপর হাতে বন্দুক এবং ১৪৪ ধারা লইয়া বিধান মন্ত্রিসভা এবং তাহাদের দালাল 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতারা কর্পোরেশন শ্রমিকদের কাজে পাঠাইয়াছে।

৯ দিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়া কর্পোরেশন শ্রমিক কংগ্রেসী সরকার এবং তাহার দালাল 'জাতীয়' টি-ইউ-সির চেহারা ভালভাবেই দেখিতে পাইয়াছে। তাহারা আরো অসংখ্য নূতন নূতন সংঘর্ষ ও সংগ্রামের পথই খুঁজিয়া পাইয়াছে—কারণ এখনো তাহাদের কোন দাবিই মিটে নাই। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, বাঁচার দাবির জন্যে সংগ্রাম বিধান-নলিনী সরকার এবং তাহাদের দালালদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত করিতে হইবে এবং কংগ্রেসের হাত হইতে ক্ষমতা দখল করিয়াই বাঁচার দাবি আদায় করিতে হইবে।

৯ দিনের ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া কর্পোরেশন শ্রমিক নিজেদের শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, ঐক্যের পথ দেখিতে পাইয়াছে, আশেপাশে শ্রমিক ও মেহনতী জনতার মধ্যে সংগ্রামের প্রতি জঙ্গী সমর্থন দেখিতে পাইয়াছে। তাহার জন্যেই কাজে যোগদানের পরও মালিকের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ একদিনের জন্যেও থামে নাই। ওভারশিয়ারেরা ধর্মঘটের সময়ের মজুরি দাবি করিয়া বেতন ধর্মঘট করিয়াছে; তাহার ফলে কর্তৃপক্ষ এমাসের বেতন হইতে ধর্মঘটের দিনের মজুরি কাটিয়া লওয়া স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। কেরাণী ও ধাঙ্গররা ছাঁটাই রুখিবার জন্য তৈরি হইতেছে। বিধান-এস-এন রায় গোষ্ঠী 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালদের সাহায্যে শ্রমিকদের গলা কাটার জন্যে যে নূতন ষড়যন্ত্র করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্যে তাহারা প্রচুর আগ্রহ দেখাইতেছে। এইভাবেই কর্পোরেশনের ২২ হাজার শ্রমিক নিশ্চিতভাবে আবার নূতন সংঘর্ষ ও সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতেছে।

[গ]

কিন্তু শ্রমিক শ্রেণির এই সংগ্রামী জোয়ারের সহিত পার্টি এখনো তাল রাখিতে পারিতেছে না। তাহার জন্যেই কর্পোরেশনের ২২ হাজার শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘটকে আরো দীর্ঘদিন পরিচালিত করা সম্ভব হয় নাই, উহাকে আরো উচ্চস্তরে তোলা যায় নাই; উহার মধ্য দিয়া বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভা এবং তাহাদের ডালকুত্তাদের আরো বেশি আঘাত করা যায় নাই; শ্রমিক আন্দোলন হইতে 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যায় নাই।

গত বছর জলকল এবং পামার বাজার পাম্পিং ষ্টেশনে ধর্মঘট হয়। বিধান মন্ত্রিসভা তাহাকে বন্দুকের জোরে খতম করে। শ্রমিকদের শ্রেষ্ঠ নেতারা কারাগারে বন্দী হন। পার্টির কর্ম্মীদের মধ্যে ধারণা হয় এখন বহুদিন পর্যন্ত শ্রমিকরা মাথা তুলিতে সাহস করিবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জেলা কমিটি কর্পোরেশন শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ অবহেলা করিতে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসে দেখা যায় কর্পোরেশনে পার্টির সারাক্ষণের কর্ম্মী একজনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক সংকট চরমে উঠিয়াছে। ২২ হাজার শ্রমিকের মধ্যে বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িতে শুরু করিয়াছে; 'জাতীয়' টি-ইউ-সি পরিচালিত শোভাযাত্রায় হাজার শ্রমিক সমবেত হইতেছে। সরকারি দপ্তরে যে হারে মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হইত, কর্পোরেশনেও এতদিন সেই হারে ভাতা দেওয়া হইতেছিল; কিন্তু এবার সরকারি দপ্তরে ১০ টাকা মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি হইলে গভর্নমেণ্ট কর্পোরেশনে লাল ঝাণ্ডার দুর্বলতা দেখিয়া কর্পোরেশন শ্রমিকদের তাহা দিতে অস্বীকার করিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা আওয়াজ তুলিল, লড়াই করিয়া ঐ ভাতা আদায় করিব।

এই অবস্থায় পার্টি আবার কর্পোরেশনের কাজে কিছুটা দৃষ্টি দেয়। ট্রাম এবং অন্যত্র যেসকল অর্গানাইজার সংস্কারবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে তাহাদের কয়েকজনকে কর্পোরেশনে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের এক অংশ বলিতে থাকে, পূজার পূর্বেই ধর্মঘট করিতে হইবে। কিন্তু অর্গানাইজাররা উহাতে আপত্তি করে। সংগঠন নাই, পূজার সময় ধর্মঘট করিলে পাবলিক বিগড়াইয়া যাইবে,—এই ধরনের যোশীবাদী যুক্তি তাহারা উপস্থিত করিতে থাকে। তাহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ৫০০ শ্রমিকের সভায় একবাক্যে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর শুধু পার্টি এবং লালঝাণ্ডার ডাকেই দক্ষিণ কলকাতায় এবং কাশীপুরে প্রায় ৪০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে। 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালরা শ্রমিকদের হাতে মার খাইতে থাকে। শ্রমিকদের এই জঙ্গী মনোভাব লক্ষ্য করিয়া 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালরা সরাসরি ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইতে সাহস করে না। তাহারা শ্রমিকদের বুঝাইতে থাকে পূজার পরে ২২শে অক্টোবর হইতে তাহারা ধর্মঘট করিবে।

পার্টির কর্ম্মীরা ২৫শে সেপ্টেম্বরের ৪০০০ শ্রমিকের ধর্মঘটের মধ্যে নিজেদের শক্তি দেখিতে পায় নাই, শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনা দেখিতে পায় নাই। তাহারা জেলা কমিটিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, ধর্মঘটের সিদ্ধান্তই ভুল ছিল। তাহার জন্যেই জেলা কমিটির পরামর্শ না লইয়াই তাহারা ২৫শে সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট তুলিয়া লইল; শ্রমিকদের মধ্যে ২৫শে সেপ্টেম্বরের সংগ্রামের সাফল্য না দেখাইয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, ২২শে অক্টোবর 'জাতীয়' টি-ইউ-সির সহিত একসঙ্গে ধর্মঘট হইবে। এই প্রচারের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে 'জাতীয়' টি-ইউ-সি সম্পর্কে নূতন করিয়া মোহ সৃষ্টি হইল। এক কথায়, এই সময় হইতেই কর্পোরেশন শ্রমিকদের সংগ্রামের উদ্যোগ 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

[ঘ]

২৫শে সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটের পর হইতে প্রায় বরাবরই আমরা 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতাদের লেজ ধরিয়া চলিয়াছি। প্রায় তিন সপ্তাহ পর্যন্ত শ্রমিকদের ধর্মঘটের জন্যে প্রস্তুত করার কাজ অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতাদের ভেদ-নীতি অগ্রাহ্য করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘটে নামিবে তাহা ২১শে অক্টোবরের আগে জেলা কমিটিও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। অথচ ২১শে অক্টোবর 'জাতীয়' টি-ইউ-সির ডাকা সভায়ও দেখা গেল, বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ক্রোধ ফাটিয়া পড়িতেছে; 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালাল ফনি ঘোষ শ্রমিকদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে—তাহারাও বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে; বিধান মন্ত্রিসভাকে তাহারা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বলিয়া পরিচয় দিতে চাহিতেছে না।

২২শে অক্টোবরের আগে হইতেই শ্রমিকরা 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল; ২২শে সেপ্টেম্বর তাহারা দক্ষিণ কলিকাতায় 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নামকরা দালালকে পিটাইয়া হাসপাতালে পাঠাইয়াছিল; তাহার পরও তিন সপ্তাহ ধরিয়া তাহারা 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালদের বস্তিতে বস্তিতে নাজেহাল করিয়া আসিতেছিল; শ্রমিকদের পেছনে সরকারের সহিত আপস আলোচনা চালাইবার জন্যে তাহারা ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জী ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গদের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। গরচা বস্তিতে কাঁদাকাটি করিয়াও

তাহারা শ্রমিকদের নিকট হইতে কোন সমর্থন পায় নাই।

ধর্মঘট যতই দীর্ঘস্থায়ী হইতেছিল, ততই 'জাতীয়' টি-ইউ-সির সভা হইতে আমাদের সভায় বেশি শ্রমিক হইতেছিল; শ্রমিকরা শোভাযাত্রা করিয়া ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জীর সভায় যাইয়া তাহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছিল। পুলিশ পাহারা ছাড়া তাহাদের পক্ষে সভা করাই কঠিন হইয়া পড়িতেছিল।

কিন্তু এতখানি বিক্ষোভ, 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালদের প্রতি এতখানি অনাস্থা সত্ত্বেও আমরা তাহাদের হাত হইতে ধর্মঘটের উদ্যোগ কাড়িয়া লইতে পারিলাম না কেন?

'জাতীয়' টি-ইউ-সির বিশ্বাসঘাতক নেতারা যে সকল কথা প্রচার করিয়া সাধারণ শ্রমিকদের কর্ম্মোদ্যোগ ও জঙ্গী মনোভাব নষ্ট করিতেছিল, আমরা তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সার্থকভাবে প্রচার করিতে পারি নাই। 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতারা প্রচার করিতেছিল, সরকার ১৫ লক্ষ টাকা দিতে রাজী, আর ৫ লক্ষ টাকা দিলেই দাবি পূরণ করা হইবে। ২০ লক্ষ টাকার অর্থ যে মাসে ৫ টাকা মাত্র এবং ধর্মঘটের সময়কার বেতন কাটিয়া লইলে যে উহার কিছুই থাকিবে না—আমরা প্রথম হইতে ইহা শ্রমিকদের বুঝাইয়া দিতে পারি নাই। হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের মধ্যে হিন্দী ইস্তাহার, পোষ্টার দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয়।

'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতারা প্রচার করে যে, ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ থাকার জন্যেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করিতেছে না। এই প্রচারের বিরুদ্ধে আমরা শ্রমিকদের দেখাইয়া দিতে পারি না যে, শ্রমিকদের ঐক্য এবং জঙ্গী মনোভাব দেখিয়াই গভর্নমেণ্ট ধর্মঘটের উপর হামলা করিতে সাহস করিতেছে না। বিধান মন্ত্রিসভার রাজত্ব টলমল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই যে তাহারা রাস্তায় মিলিটারী নামাইয়াছিল, উহা যে তাহার শক্তির পরিচায়ক নয়, দুর্বলতারই চিহ্ন—তাহা দেখাইতে পারিলে শ্রমিকরা আরো বেশি জঙ্গী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইত। 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিলিটারী পুলিশের দুর্বলতা সম্পর্কে সাধারণ শ্রমিককে যথেষ্ট সচেতন করিতে না পারার ফলেই ধর্মঘটে সাধারণ জঙ্গী শ্রমিককে আরো বেশি সক্রিয় করা যায় নাই। ধর্মঘটের কোন অবস্থায়ই তাহার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

ধর্মঘটের উদ্যোগ কাড়িয়া লইবার আর একটি পথ ছিল, ধর্মঘটকে কর্পোরেশনের শ্রমিকদের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া দেওয়া। কর্পোরেশনের পেছনে-পড়া শ্রমিক চিরদিনই জলকল ও পাম্পিং ষ্টেশনের অগ্রণী শ্রমিকদের দিকে তাকাইয়া থাকিত। এবার জলকল ও পাম্পিং ষ্টেশনকে বিধান সরকার শত শত সৈন্য দ্বারা মোতায়েন করিয়া কারাগারে পরিণত করিয়াছিল। প্রয়োজন ছিল বাহির হইতে বিরাট শোভাযাত্রা লইয়া জলকল ও পাম্পিং ষ্টেশনে হামলা করা এবং সেখানকার শ্রমিকদের যুক্ত করিয়া ধর্মঘটে সামিল করা। আমরা তাহা করিতে ইতস্তত করিয়াছি। মিলিটারী-পুলিশের শক্তিকে বড় করিয়া দেখিয়াছি। বিপ্লবী শ্রমিক ঐক্যকে ছোট করিয়া দেখিয়াছি।

কর্পোরেশনের শ্রমিকদের সমর্থনে অন্যান্য শ্রমিকদের ধর্মঘটে ডাক দিবার কাজকেও আমরা কম অবহেলা করি নাই। কর্পোরেশনের ধর্মঘট শুরু হইতে না হইতে গ্যাস কারখানার এতদিনের ফ্যাসিস্ট রাজত্ব অগ্রাহ্য করিয়া অবস্থান ধর্মঘট শুরু হইয়াছে; হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে ধর্মঘট শুরু হইয়াছে, বেহালা প্রভৃতি মিউনিসিপ্যালিটির শ্রমিকরা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়াছে। ট্রামের 'জাতীয়' টি-ইউ-সি পন্থী শ্রমিকরা পর্যন্ত ধর্মঘটের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছে। এই অবস্থায় দরকার

ছিল, কর্পোরেশনের শ্রমিকদের সমর্থনে অন্যান্য কারখানায় ধর্মঘট করা, যত শীঘ্র সম্ভব সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া। সরকারি ১৪৪ ধারা মিলিটারী-পুলিশের বিরুদ্ধে উহা কর্পোরেশন শ্রমিককে আরো দৃঢ়তার সহিত লড়াই করিতে উৎসাহিত করিত।

আসলে, কর্পোরেশনের সাধারণ শ্রমিক এবং জঙ্গীদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্যেই আমরা বরাবর শ্রমিকদের বিপ্লবী চেতনাকে বুঝিতে ভুল করিয়াছি। শ্রমিকদের সহিত যোগাযোগ ছিল মুষ্টিমেয় অর্গানাইজারের মারফৎ। ধর্মঘট শুরু হইতে না হইতেই তাহাদের অধিকাংশ গ্রেপ্তার হইল। তাহার ফলে জঙ্গীদের সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইল। যে সকল এলাকার (মধ্য ও উত্তর কলিকাতায়) শ্রমিকদের মধ্যে 'জাতীয়' টি-ইউ-সির 'প্রভাব' ছিল যেখানে যখন তাহাদের প্রভাব দ্রুত নষ্ট হইতেছিল তখনও আমরা দালালদের বিরোধিতার ভয়ে সেখানে যাইতে ইতস্তত করিয়াছি। ২৫শে অক্টোবর বা তাহার পর ঐ সকল এলাকায় যখন পার্টি কর্ম্মীরা স্কোয়াড লইয়া উপস্থিত হইল তখন দেখা গেল, সাধারণ শ্রমিকরা লালঝাণ্ডার দিকে বিরাটভাবে ঝুঁকিয়াছে; দালালরা কোনঠাসা হইয়াছে। বুঝা গেল যে, কয়েকদিন আগে পৌঁছিতে পারিলে প্রত্যেক বস্তিতেই জঙ্গীদের লইয়া শক্তিশালী ষ্ট্রাইক কমিটি গঠন করা সম্ভব হইত। প্রত্যেক এলাকায় জঙ্গীদের নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতে পারিত। কি স্থানীয় ভাবে, কি কেন্দ্রীয়ভাবে কোথাও শক্তিশালী ষ্ট্রাইক কমিটি গঠিত না হইবার ফলে সাধারণ ধর্মঘটী শ্রমিকদের সহিত আমাদের সম্পর্ক বরাবরই দুর্বল ছিল; ধর্মঘটী সাধারণ শ্রমিকদের আরো জঙ্গী কার্যক্রমে অংশীদার করা ক্রমশই কঠিন হইয়া পড়িতেছিল।

ধর্মঘট শুরু হওয়ার আগে যে সকল এলাকায় দু'একটি ষ্ট্রাইক কমিটি গঠিত হইয়াছিল, অর্গানাইজাররা ষ্ট্রাইক কমিটির বৈপ্লবিক তাৎপর্য্য সম্পর্কে সচেতন না থাকায় ধর্মঘটের পর তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অর্গানাইজাররা সাধারণ জঙ্গীদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই, তাহার জন্যেই উহাকে সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে জনপ্রিয় করার কোন চেষ্টা করে নাই। কেন্দ্রীয় ষ্ট্রাইক কমিটি গঠিত হইবার পরও তাহার নাম সমস্ত এলাকায় সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। কি জেলা কমিটি, কি অর্গানাইজার কেহই ধর্মঘটের আগে ষ্ট্রাইক কমিটির সভ্যদের দায়িত্ব বুঝাইয়া দেয় নাই। বর্ত্তমান যুগে যে কোন ধর্মঘটে ষ্ট্রাইক কমিটি গঠন না করিয়া সাধারণ শ্রমিকদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়, ষ্ট্রাইক কমিটি মারফৎ ছাড়া শ্রমিক-ঐক্য দৃঢ় করা সম্ভব নয়, ধর্মঘটে জঙ্গী নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। ষ্ট্রাইক কমিটির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে দালাল নেতাদের পক্ষে আর বিশ্বাসঘাতক ভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা সম্ভব হইবে না। ষ্ট্রাইক কমিটিই পুলিশ ও দালালদের পরাস্ত করার গ্যারান্টি; আর এইভাবে সংগ্রাম করিতে করিতে ষ্ট্রাইক কমিটিই ক্ষমতা দখলের মন্ত্রে পরিণত হইবে। ইহা ভুলিয়া যাওয়ার জন্যেই সংগঠনের এই দুর্বলতা সংগ্রামকে পিছনে টানে।

[৬]

কর্পোরেশন শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির এইসকল দুর্বলতার জন্যেই 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতাদের পক্ষে ৯ দিনের মধ্যে এতবড় ধর্মঘট খতম করা সম্ভব হইয়াছে। ধর্মঘটের সময়ে কলিকাতার নাগরিকদের মনে বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখা যায়, পার্টির দুর্বলতার জন্যেই তাহাকে আরো বেশি সংগঠিত করা যায় নাই। সুরজমল-নাগরমলের বাড়ি আক্রমণের মধ্য দিয়া

বিধান মন্ত্রিসভা মাড়োয়ারী-গুজরাটি বানিয়াদের রক্ষক হিসাবে সমস্ত জনগণের ঘৃণ্য হইয়া উঠিবার পরও আমরা বিধান-নলিনী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জনগণকে পরিচালিত করিতে পারি নাই।

শুধু পুলিশ-মিলিটারী নয়, ছাঁটাই-এর হুকুম নয়, 'জাতীয়' টি-ইউ-সির দালালীও নয়— পার্টির এই দুর্বলতার জন্যে ২২ হাজার শ্রমিককে ৯ দিন পরে কাজে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। ৩০শে অক্টোবর ভোরে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জী ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্যে যখন সভা ডাকে, যখন সভায় ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়, তখন শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হইয়া ডাঃ ব্যানার্জ্জীর জন্যে আনীত ফুলের মালা ছিঁড়িয়া ফেলে, দালালদের আক্রমণ করিতে যায়। দালাল নেতারা পুলিশ পাহারায় সেদিন সভা হইতে যে পলায়ন করিয়াছে তাহার পর আজ পর্যন্ত আর শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের সামনে মুখ দেখাইতে সাহস করে নাই। শুধু নিজেদের দুর্বলতার জন্যেই ৩০শে অক্টোবর ভোরের সভায় 'জাতীয়' টি-ইউ-সির নেতাদের মুখ দেখানো অসম্ভব করিয়া তোলা যায় নাই। ঐ সভায় তাহাদের চিরদিনের জন্যে শ্রমিক আন্দোলন হইতে নির্বাসন দেওয়া যায় নাই।

৩০শে এবং ৩১শে অক্টোবর দুইদিন শতকরা প্রায় ৪০ জন শ্রমিক লালঝাণ্ডার কাছ হইতে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্যে অপেক্ষা করিয়াছে। ৩০শে অক্টোবর বিকালের সভায়ও প্রায় ৪০০০ শ্রমিক আমাদের সভায় যোগদান করে; দক্ষিণ কলিকাতায় টালীগঞ্জ, গরচা প্রভৃতি এলাকায় শ্রমিকরা কাজে যোগদান করে না; উত্তর কলিকাতায় একজন ওয়ার্কস সরকার ধর্মঘট প্রত্যাহার করার কথা বলিতে আসিলে শ্রমিকরা তাহার উপর হামলা করে, তিনজন শ্রমিক গ্রেপ্তার হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় 'জাতীয়' টি-ইউ-সির পেছনে পেছনে না চলিলে, মুষ্টিমেয় সংস্কারপন্থী অর্গানাইজারের উপর নির্ভর না করিয়া শ্রমিকদের জঙ্গী ঐক্যের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে পারিলে, ২৫শে সেপ্টেম্বরের বিরাট সাফল্যকে ভিত্তি করিয়া 'জাতীয়' টি-ইউ-সির ঘাঁটিগুলি আগে হইতে দখল করিয়া ধর্মঘটের সমস্ত উদ্যোগ নিজেদের হাতে গ্রহণ করিতে পারিলে, ধর্মঘটকে জলকল ও পাম্পিং ষ্টেশন প্রভৃতির শ্রমিকদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারিলে, জঙ্গী ধর্ম্মঘটিদের লইয়া ষ্ট্রাইক-কমিটি গঠনের জন্যে আরো আগে হইতে উদ্যোগী হইতে পারিলে কেন্দ্রীয় ষ্ট্রাইক কমিটিকে নেতা হিসাবে জনপ্রিয় করিতে পারিলে ৯ দিনে এই সংগ্রাম শেষ হইত না। ইহা আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামে মোড় ঘুরাইয়া দিতে পারিত।

[চ]

বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বিপ্লবী তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারার জন্যেই পার্টি পিছনে পড়িয়া থাকিয়াছে। ধর্মঘট ৪/৫ দিন চলিবার পরও সমস্ত পার্টিসভ্য এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্যে নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে ইতস্তত করিয়াছে। তাহারা তর্ক করিয়াছে : শান্তি সম্মেলনের কাজ করিব, না কর্পোরেশন ধর্মঘটে সাহায্য করিব, কর্পোরেশন ধর্মঘটে সাহায্য করিব, না চটকল ধর্মঘটের জন্যে প্রস্তুত হইব। এই প্রশ্ন তখনই আসে যখন পার্টি সভ্যদের সামনে আমরা একথা পরিষ্কার করিয়া বলিনা যে, বিপ্লব এখন আর দূরে নয়, আমরা ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে প্রবেশ করিয়াছি। বিপ্লবের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়াই এখানে ঘটনা আমাদের প্ল্যান মতো ঘটে না; বিপ্লবী শক্তি প্রতি মুহূর্তে নূতন দায়িত্ব আনিয়া উপস্থিত করে;

একজন কর্ম্মীর সামনে দশজনের কাজ আনিয়া উপস্থিত করে। কিন্তু এই বিপ্লবের মধ্যেই আমাদের এই দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা বাড়িতেছে; একজন কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইলে দশজন জঙ্গী তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে আগাইয়া আসিতেছে; কালও যে নূতন জঙ্গী ছিল, অনভিজ্ঞ নওজোয়ান ছিল—আজই সে সংগ্রামের নেতা হিসাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করিতেছে; কালও যে নিষ্ক্রিয় ছিল, আজ সে সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

কর্পোরেশন ধর্মঘটের রাজনৈতিক তাৎপর্য ঠিক সময়ে সমস্ত পার্টি সভ্যকে বুঝাইতে পারিলে ইহাই দেখা যাইত। সমস্ত পার্টি সভ্য দেখিতে পাইত শান্তি সম্মেলন, কর্পোরেশন ধর্মঘট, চটকলের সাধারণ ধর্মঘট, ছাত্রদের ধর্মঘট এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন—দশটা দশ রকমের কাজ নয়; দশটা স্রোত আসিয়া বিপ্লবের সমুদ্রে মিশিয়াছে।

স্থানীয় এবং আংশিক সংগ্রাম নয়—বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ সংগঠিত করার দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সেই দৃষ্টি লইয়া কর্পোরেশনের ২২ হাজার শ্রমিকের ৯ দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক ধর্মঘটকে দেখিতে হইবে। কর্পোরেশন শ্রমিক বিপ্লবের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে এখন পরিচালিত করিতে হইবে; ধর্মঘটের মধ্য দিয়া তাহার রাজনৈতিক চেতনা বাড়িয়াছে, কংগ্রেসী শাসক শ্রেণি এবং তাহাদের দালাল 'জাতীয়' টি-ইউ-সি নেতাদের খুনী বিশ্বাসঘাতক চেহারা সে দেখিতে পাইয়াছে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার প্রয়োজন সে উপলব্ধি করিয়াছে। তাহার এই চেতনা আরো বাড়াইতে হইবে প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন সংঘর্ষে তাহাকে পরিচালিত করিয়া, নূতন নূতন কৌশলে তাহাদের সামনে কংগ্রেসী সরকার ও তাহাদের দালালদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া।

ধর্মঘটের মধ্য দিয়া শত শত জঙ্গী শ্রমিক বাহির হইয়াছে যাহারা এখনই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হইতে চায়, লালঝাণ্ডা ইউনিয়নকে কর্পোরেশনে শক্তিশালী করিতে চায়। তাহাদের সাহসের সহিত পার্টিতে আনিতে হইবে; দুর্বলচিত্ত অর্গানাইজারদের সরাইয়া সাহসের সহিত এই নূতন জঙ্গীদের উপর দায়িত্ব দিতে হইবে। সাধারণ জঙ্গী শ্রমিকদের লইয়া যে সকল স্ট্রাইক কমিটি, বস্তি কমিটি প্রভৃতি গঠিত হইয়াছিল সেগুলিকে আরো শক্তিশালী করিতে হইবে, শ্রমিকদের মধ্যে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে প্রতিদিনের দাবি পাওয়ার উপর সংগ্রাম পরিচালনায় হাতিয়ার হিসাবে ধারালো করিতে হইবে। সমস্ত সাধারণ শ্রমিকদের লালঝাণ্ডার সভ্য করিতে হইবে; বড় বড় সভা ডাকিয়া সাধারণ ধর্মঘটের শিক্ষা তাহাদের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে।

সামনে বিরাট বিরাট সংঘর্ষ আসিতেছে। নেহরু সরকার কর্পোরেশনের জন্যে বরাদ্দ টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতেছে। তাই শ্রমিক ছাঁটাই ও বেতন কাটার নূতন প্ল্যান তৈরি হইতেছে, তাহার জন্যেই ট্রাইব্যুনাল বসিয়াছে। বিধান মন্ত্রিসভা এবং কংগ্রেসী দালালরা বুঝিতে পারিয়াছে, কর্পোরেশন শ্রমিকের উপর হামলা করা এখন আর এত সহজ নয়; তাই তাহারা এমাসের বেতন হইতে হরতালের সময়ের মজুরি-কাটা স্থগিত রাখিয়াছে। কর্পোরেশন শ্রমিক যদি দৃঢ় থাকে, যদি দৃঢ়তার সহিত সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়, যদি সরকারের আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা না করিয়া আগে বাড়িয়া তাহাদের আক্রমণ করে তবে কংগ্রেসীদের সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কর্পোরেশনের ২২ হাজার শ্রমিককে সেই আক্রমণাত্মক সংগ্রামে পরিচালিত করার দায়িত্বই পার্টিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

পশ্চিমবাংলায় মুসলিম বিতাড়নে কার স্বার্থ— কার গোপন হস্ত কাজ করছে?

বাংলার বুকে সাম্রাজ্যবাদী কমিশন ডাকার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন!

বাস্তুহারাদের বাসস্থান, জমি ও ভাতার জন্যে কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করুন!

আইনসভায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু দাঙ্গা ও যুদ্ধ সম্পর্কে বক্তৃতা করার পর থেকে পশ্চিমবাংলায় নূতন করে দাঙ্গা শুরু হয়েছে।

নেহরু সরকার জানিয়ে দিয়েছেন যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করার অসুবিধা রয়েছে। তার জন্যেই কংগ্রেসী-নেতারা মহাসভা-আর-এস-এস গুণ্ডাদের নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এখন বে-সরকারি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পশ্চিমবাংলা থেকে মুসলিম বিতাড়নের সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে।

তাদের মুসলিম বিতাড়নের পদ্ধতিটি কি? কংগ্রেসী পত্রিকাসমূহ দিনের পর দিন প্রচার করে যাচ্ছে যে, পশ্চিমবাংলায় সব মুসলমানই পাকিস্তানী আনসার হয়ে গেছে, তারাই হিন্দুদের উপর বোমা ফেলছে, হিন্দুদের দোকান-পাট লুঠ করছে, হিন্দুদের ছোরা মারছে। তারপর, বস্তীর পর বস্তী ঘেরাও করে খুনী বিধানের পুলিশ মুসলিমদের গ্রেপ্তার করছে, তাদের বাড়ীঘর থেকে নির্মমভাবে তাড়াচ্ছে।

এই দস্যুতার কাজে জনসাধারণের কাছ থেকে সমর্থন পাবার আশায় দাঙ্গাকারীরা সামনে রাখছে বাস্তুহারাদের। প্রতিদিন যে হাজার হাজার বাস্তুহারা পশ্চিমবাংলায় আসছে তাদের বাসস্থান, খাদ্য ও কাজ দিবার কোন দায়িত্ব নেহরু সরকার নিতে প্রস্তুত নয়। কারণ তাতে বড়লোকদের প্রাসাদ-বাড়ি দখল করতে হবে, জমিদারদের জমি বিলি করতে হবে, বৃটিশ ও টাটা-বিড়লার কলকারখানার মুনাফায় হাত দিতে হবে। সে দায়িত্ব থেকে বাঁচবার জন্যই তারা বাস্তুহারাদের নিয়ে যাচ্ছে মুসলিম বস্তীতে, বস্তী থেকে উচ্ছেদ করতে গরীব মুসলমানদের। তারা বাস্তুহারাদের চাকুরী দিবার নাম করে কলকারখানা থেকে বে-পরোয়া ছাঁটাই করে যাচ্ছে মুসলিম শ্রমিকদের, তাদের জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছে পাকিস্তানে। বজবজ থেকে শুরু করে তেলিনীপাড়া-জগদ্দল-গৌরীপুর পর্যন্ত সমগ্র শিল্প-এলাকায় জাতীয় টি-ইউ-সি'র গুণ্ডা নেতারা পুলিশের সাহায্যে মুসলিম শ্রমিকদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং সে কথা জাতীয় টি-ইউ-সি'র নামজাদা নেতা বিপিন গাঙ্গুলী গত বৃহস্পতিবার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে

প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন।

পশ্চিমবাংলার এই মুসলিম বিতাড়নের সাথে পূর্ব বাংলার হিন্দু বিতাড়নের পার্থক্য কোথায়? পূর্ব বাংলা থেকে আগত যে কোন হিন্দু বাস্তুহারাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন— সেখানেও মুসলিম লীগের পত্রিকাগুলি দিনের পর দিন সমস্ত হিন্দুদের 'হিন্দুস্থানের চর' বলে ঘোষণা করছে, সেখানেও খুনী নুরুল আমীন সরকারের পুলিশ ও আনসার গুণ্ডাদল হাজার হাজার হিন্দুকে তাদের জমি ও বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করছে, সেখানেও বাস্তুহারাদের জমিবাসস্থান-কাজ দেবার নাম করে হিন্দু-বিতাড়ন চলেছে অবাধে।

উভয় বাংলায় এই সংখ্যালঘুদের বিতাড়নের মধ্য দিয়ে বাংলাকে ধ্বংস করছে কারা? কারা আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে বাস্তুহারায় পরিণত করছে? কারা আজ বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে চুরমার করে দিচ্ছে— বাঙ্গালীর সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত করছে? কারা আজ বাংলাকে পঙ্গু করে বাংলার উপর নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করতে চাচ্ছে?

এ প্রশ্নের সহজ জবাব রয়েছে গত রবিবারের "স্টেটসম্যান পত্রিকা"র সম্পাদকীয় মন্তব্যে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এ মুখপত্রটি খোলাখুলি বলেছে যে, এখন প্রয়োজন উভয় বাংলার সংখ্যাল্পদের 'বাঁচানোর' জন্যে কাশ্মীর কমিশনের মতো একটি কমিশন বাংলায় পাঠানো। 'স্টেটসম্যানে'র প্রবন্ধ থেকে বুঝা যাচ্ছে নেহরু-লিয়াকতের মধ্যে তাই নিয়েই এখন আলাপ আলোচনা চলছে। এ আলোচনা পাকা করার জন্য লণ্ডনে আর একটি কমনওলেথ সম্মেলন ডাকা হয়েছে। বাংলাকে কাশ্মীরে পরিণত করতে হবে, জাতিসংঘ মারফৎ বাংলার উপর ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে হবে উভয় বাংলাকে পঙ্গু করে তার উপর প্রভুত্ব করতে হবে, তার জন্যেই পূর্ব বাংলায় ব্রিটিশ লাট দাঙ্গাবাজদের নেতৃত্ব করছে, ব্রিটিশ-পুষ্ট লীগ-আনসার নেতারা দাঙ্গায় আগুন ছড়াচ্ছে। তার জন্যেই ব্রিটিশ এজেন্ট লেডী মাউন্টব্যাটেন নিজে কলকাতায় এসেছে, ব্রিটিশ-পুষ্ট মহাসভা নেতা এন-বি খারে কলকাতায় গুণ্ডাদের নিয়ে গোপন বৈঠক করে বেড়াচ্ছে ব্রিটিশ সংবাদ সরবরাহকারী গোয়েন্দ' ম্যাজেরাস কলকাতায় বসে দাঙ্গার উত্তেজনার বীজ ছড়াচ্ছে। বাংলাকে যুক্ত চীন ও বর্মার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-ঘাঁটি বানানোর উদ্দেশ্য নিয়ে, বাংলার উপর চটকল-চা-বাগান শ্বেতাঙ্গ বণিকদের রাজত্ব বাঁচিয়ে রাখার-উদ্দেশ্য নিয়েই সাম্রাজ্যবাদীরা দাঙ্গার এ নূতন পর্যায় শুরু করেছে, বাংলাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এ সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র থেকে বাংলাকে বাঁচাতেই হবে। যারা একথা বলছে যে পশ্চিমবাংলায় মুসলিম নিধন করলে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের বাঁচানো যাবে— তারা ব্রিটিশ ও নুরুল আমীনদের দালাল। পূর্ব বাংলায় এখনো এক কোটি ১৫ লক্ষ হিন্দু রয়েছে। এখানকার মুসলিম বিতাড়ন এখানকার হিন্দু বিতাড়নে গুণ্ডাদেরই সাহায্য করবে। যারা বলছে যে, বাস্তুহারাদের চাকুরী দেবার জন্যেই মুসলিমদের তাড়ানো হচ্ছে— তারা মিথ্যা কথা বলছে। এখানকার টাটা-বিড়লা-ওয়াকার সাহেবরা গত দু'বছরে কয়জন বাস্তুহারাকে চাকুরী দিয়েছে। মুসলিমদের চাকুরী থেকে তাড়িয়ে তারা তাদের ছাঁটাই-এর প্ল্যানই কার্যকরী করছে। কায়েমীস্বার্থ যেমন আছে তেমন রেখে আজকার দিনে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কাজ ও জমি দেওয়া যায় না। কাজেই নূতন করে দাঙ্গা বাধিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও টাটা-বিড়লা-বাড়ীওয়ালা-জমিদারের

দল তাদের অবাধ শোষণের রাজত্বকেই বাঁচাচ্ছে। আই-এন টি-ইউ-সি ও আর-এস-এস গুণ্ডাদের এই ঘৃণ্য কাজের জন্যেই মালিকরা এতদিন এত পয়সা খরচ করে পুষেছে। এখন এই গুণ্ডার দল দেশি-বিদেশি মালিকদের হুকুম অনুসারেই শ্রমিক এলাকার ব্যাপক দাঙ্গা বাধাচ্ছে।

যে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলিম শ্রমিকের ভয়ে মালিকরা এতদিন ব্যাপক মজুর ছাঁটাই করতে সাহস করেনি, এখন দাঙ্গার নাম করে দলে দলে তাদের ছাঁটাই করার সুযোগ পাচ্ছে। যে ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলিম ভাড়াটিয়াদের ভয়ে বাড়ীওয়ালা-জমিদাররা একটি বস্তী থেকে কাকেও উচ্ছেদ করতে সাহস করেনি, এখন দলে দলে তাদেরই উচ্ছেদ করা হচ্ছে। যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভয়ে কংগ্রেস সরকার এতদিন শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করেনি, এখন নয়া কালা-কানুন তৈরি করে তাদের ধর্মঘট করার অধিকার, ইউনিয়ন গড়ার অধিকারটুকুও কেড়ে নিচ্ছে। এভাবে দাঙ্গা ও মুসলিম-নিধন পশ্চিমবাংলার শ্রমিক-জনগণের শোষণ ও দাসত্বকেই স্থায়ী করছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমীস্বার্থের এই দাঙ্গাবাজির বিরুদ্ধে আসুন আমরা সকলে একসাথে দাঁড়াই। বাস্তুহারা হয়ে যারা পূর্ব বাংলা থেকে এখানে আসছেন— তাদের খুনী বিধান সরকার বন্দী করে রাখছে— আশ্রয় শিবিরের মৃত্যু-কুঠুরীতে, পাঠাতে চাচ্ছে আসামের জঙ্গলে, বিহারের বাঙ্গালী-বিহারী দাঙ্গায়, আন্দামানের দ্বীপান্তরে। কলেরা-বসন্ত ও অনাহারে তারা কুকুর-বিড়ালের মতো মরছে— পথেঘাটে-স্টেশনে। আসুন— তাদের জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করি— লাট-প্রাসাদের মতো সাহেব-মাড়োয়ারী-বড়লোকদের প্রাসাদ .....গুলিকে দখল করে। আসনু— তাদের জন্যে জমির ব্যবস্থা করি, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে। আসুন— তাদের জন্যে কাজের ব্যবস্থা করি— বিলাতী কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। আসুন— তাদের জন্যে ভাতার ব্যবস্থা করি— যুদ্ধের খরচ, পুলিশ-পল্টনের খরচ কমানোর দাবি তুলে— বিধান মন্ত্রিসভাকে ঘেরাও করে। আসুন— সরকারি হাত থেকে রিলিফের কাজ পরিচালনার ব্যবস্থা করি সকল দলের মিলিত গণতান্ত্রিক রিলিফ সংগঠনের হাতে।

পশ্চিমবাংলায় যেসকল মুসলিম নরনারী বাস্তুহারা হয়েছেন— আসুন— আমরা তাদের আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করি তাদের ঘরবাড়িতে, তাদের রক্ষা করি গুণ্ডা-পুলিশের আক্রমণ থেকে। প্রত্যেক কারখানা ও বস্তীতে আসুন আমরা শপথ গ্রহণ করি, একজন মুসলমানকেও বাস্তুহারা হতে দেবো না, কারখানা থেকে ছাঁটাই করতে দেবো না। একজন মুসলিম শ্রমিককেও গুণ্ডার হাতে লাঞ্ছিত হতে দেবো না।

— বাংলাকে দু'ভাগ করে যারা ধ্বংস করেছে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন— আমাদের সংগ্রাম সে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের বিরুদ্ধে। তার জন্যেই কমিউনিস্ট পার্টি আপনাদের ডাক দিচ্ছে— সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিন, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর শৃঙ্খল ধ্বংস হোক।

— পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার সংখ্যাল্পদের হত্যা করে— তাদের বাস্তুহারা করে বাইরে যারা 'সাধু' সাজবার চেষ্টা করছে— আমাদের সংগ্রাম সেই নেহরু-লিয়াকত গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে। সে সংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে উঠছে কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ, মেদিনীপুর ও ময়মনসিংহের যুক্ত এলাকায়। কমিউনিস্ট পার্টি আপনাদের ডাক দিচ্ছে— সেখানকার জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে মুক্তি-সেনাদের যোগ দিতে।

— হিন্দু-মুসলিম গরীবের ঐক্যকে আঘাত করে যারা শোষণের রাজত্ব চালাচ্ছে— উভয় বাংলায় আমাদের সংগ্রাম সে টাটা-বিড়লা-ইস্পাহানী-ওয়াকার সাহেবদের বিরুদ্ধে। কমিউনিস্ট পার্টি আপনাদের ডাক দিচ্ছে— শ্রমিক-কৃষক গণ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে।

উভয় বাংলার সংখ্যাল্পদের জান দিয়ে রক্ষা করুন। উভয় বাংলার বাস্তুহারাদের জমি-বাসস্থান-কাজ ও ভাতার জন্যে হিন্দু-মুসলিম একসাথে সংগ্রাম করুন। সাম্রাজ্যবাদ ও বিধান-নুরুল আমীনের দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা-পুলিশের বিরুদ্ধে আর-এস-এস, আনসারের বিরুদ্ধে— জনগণের ক্রোধ জাগ্রত করে বাংলাকে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচাও। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করে বাংলাকে স্বাধীন, সুখী ও ঐক্যবদ্ধ করুন।

২৯ মার্চ, ১৯৪৯

কমিউনিস্ট পার্টি
পশ্চিমবঙ্গ কমিটি

দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচন সম্পর্কে

কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটি

কলকাতা ও সমগ্র বাংলা দেশব্যাপী জনতার বিভিন্ন সংগ্রাম ও তার উপর কংগ্রেসী বিধান সরকারের দমননীতি সাংঘাতিকভাবে চলতে থাকে। এই সব সংগ্রামে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মহিলাদের অজস্র প্রাণ দানের ফলে জনতার বিরাট অংশের মধ্যে দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে কংগ্রেসী সরকার সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটতে থাকে। কংগ্রেস সরকার কর্তৃক কালাকানুনের প্রবর্তন, ব্যক্তি স্বাধীনতার কণ্ঠ রোধ, বন্দী নির্যাতন, কমনওয়েলথে যোগদান, দুর্ভিক্ষ ও বেকারির সৃষ্টি, নির্বিচারে শিশু ও নারী হত্যা, জনতার মধ্যে ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ঠিক এই সময় জুনমাসেই আসে দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচন।

এই নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের নীতি নির্ধারণে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। তারপর পি.সি. যখন নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেন তখন বহু কমরেডদের মনে বহু প্রশ্ন দেখা দেয়। শরৎ বসুকে সমর্থনের ব্যাপার নিয়ে ও নির্বাচনের অংশগ্রহণ সম্পর্কে ডি সিরও কিছুটা বোঝার অসুবিধা হয়। প্রশ্নটা আসে যে শরৎ বসু সুবিধাবাদী অথচ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কিন্তু তাই বলে শরৎ বসুকে সমর্থন করা যায় কি করে! যাই হোক, শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি ও ঠিক হয় যে কংগ্রেসকে হারাবার জন্য কলকাতায় আমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করব। ৫ই জুন তারিখে কংগ্রেসের তরফ থেকে দেশপ্রিয় পার্কে প্রথম নির্বাচনী সভা ডাকা হয়। আমরা স্থির করি যে সেই মিটিং ভাঙতে হবে। সেই অনুযায়ী ডি.সি সভ্যরা প্রত্যেক এলাকায় বেরিয়ে পড়েন। এলাকার সংগঠকদের মিটিং করা হয় ও মিটিং ভাঙার সব ব্যবস্থা পাকা করা হয়। বিকালে মিটিং শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের কমরেডরা অত্যন্ত সহজে সেই মিটিং ভেঙে দিলেন। অবশ্য জনতা এই ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেন। মিটিং-এর উদ্যোক্তা সুরেশ দাস, বিজয় সিং নাহার ইত্যাদি প্রচণ্ড মার খায়। সেখান থেকে একটি বিরাট শোভা যাত্রা কংগ্রেস প্রার্থী সুরেশ দাসের দোকান চড়াও করে ও প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। রাস্তায় কংগ্রেসী টুপি ও পতাকার বহ্নি উৎসব হতে থাকে। সেদিনের শোভাযাত্রায় পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়, আমাদের একজন বিশিষ্ট কর্মী কমরেড পুর্ণেন্দু শহিদ হন ও কমরেড বাহাদুর আহত হন। কিন্তু তার পর থেকে নির্বাচনের তারিখ অবধি কংগ্রেসীরা আর কোন মিটিং করতে পর্যন্ত সাহস করেনি। নির্বাচন পরিচালনার জন্য আমরা পিপলস্ ইলেকশন কমিটি গঠন করি। এ কমিটিতে আমরা শুধু আমাদের পার্টির সমর্থকদের নিয়েই

আমাদের কর্তব্য শেষ করি। অথচ সেই সময় কলকাতা শহরে জুনের প্রথমেই এলেনবেরী ও পটারী শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য লড়াই চলে এবং ৮ই ও ৯ই জুন বন্দীদের উপর গুলি চালনা হয়। ফলে বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জনতার ঘৃণা এক প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। আমরা এ অবস্থায় পুরো সুযোগ গ্রহণ করতে পারতাম। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কথা তখন আমাদের মাথায়ই ছিল না। সাধারণ প্রগতিশীল নাগরিক ও বিভিন্ন বামপন্থীদের নিয়ে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলতে পারতাম। বামপন্থী বিচ্যুতির ফলে আমরা তা পারলাম না।

জনসাধারণ কংগ্রেসী সরকারের চ্যালেঞ্জ সাহসের সাথে গ্রহণ করলেন এবং তার জবাব তারা উপযুক্তভাবেই দিলেন, কংগ্রেসী প্রার্থী সুরেশ দাসকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে।

নির্বাচনের দিনে কংগ্রেসী বিধান সরকারের বিরাট পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনীকে দক্ষিণ কলিকাতায় মজুত করা হলো। কিন্তু জনতার অভ্যুত্থানের সামনে তারা কিছুই করতে সাহস পেল না।

এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের ফলে কলকাতার জনসাধারণের কাছে পার্টির প্রতিপত্তি বিরাটভাবে বৃদ্ধি পেল। কারণ প্রথমত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনতাকে বিপ্লবী নেতৃত্ব দিতে পারে এরূপ সংগঠিত দল হিসাবে জনসাধারণ আমাদেরই জানতেন। দ্বিতীয়ত কংগ্রেসী শাসনে নির্যাতিত জনসাধারণের মনের কথাকেই আমরা এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছিলাম। কিন্তু আমাদের কুনো দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সে সাফল্যকে আমরা বিশেষ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারলাম না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ সময়ের বন্দীমুক্তি আন্দোলনের মধ্যে। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে বামপন্থী যুগে যখন আমরা সমস্ত প্রকার আইনি সুযোগকে উপেক্ষা করছিলাম ও একমাত্র মিলিট্যান্ট এক্সান্ মারফত শহরে সংগ্রামের বিস্তৃতি ও ক্ষমতা দখলের কথা চিন্তা করছিলাম— তখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ আমাদের খুবই উচিত হয়েছিল। এবং এ থেকে এটা বোঝা যায় যে কোন বিশেষ অবস্থাকে নজরে রেখে তাকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে জনতার অবস্থা বুঝে যদি ঠিক কৌশল প্রয়োগ করা যায়, ঠিক দাবি ও শ্লোগান রাখা যায়—তবেই সংগ্রাম তার সঠিক পরিণতি লাভ করে, নচেৎ নয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছিল সেই মুহূর্তে আমাদের সঠিক কাজ। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য আমরা শরৎ বসুকে সমর্থন করেছিলাম তাও সঠিকই ছিল। নতুবা আমাদের একার প্রচেষ্টায় বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ভোটারদের সমর্থনের জোরে কংগ্রেসকে পরাজিত করাও সম্ভব ছিল না। কংগ্রেসী শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনতার রায়কে সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ শক্তি না হলে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো না। এ নির্বাচনের মধ্যে আমরা কিছু সংখ্যক বামপন্থী যুবককে পার্টির দরদী হিসাবেও পেয়েছি।

(বিভিন্ন আন্দোলনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে কলকাতা জেলা কমিটির বিবৃতি)

টিকা : ● এই উপনির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ১২ জুন।

● ১৪ জুন নির্বাচনী ফলাফল থেকে জানা যায় যে, শরৎচন্দ্র বসু পেয়েছিলেন ১৯৩০০ ভোট এবং কংগ্রেস প্রার্থী সুরেশ দাস পেয়েছিলেন ৫৭৫০টি ভোট। (- সম্পাদক)

সহায়ক তথ্য - ৭

দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচন পর্যালোচনায় কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণ

(প্রাসঙ্গিক অংশ)

'দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় শ্রেণি সংগ্রামকে তীব্রতর করিয়াছে। এই উপনির্বাচন কোন সাধারণ নির্বাচন নয়— ইহা ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম। এই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় শ্রমিকশ্রেণির সামনে সেই ক্ষমতা দখলের প্রশ্নকেই উপস্থিত করিয়াছে। ... উপনির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনগণের যে বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িয়াছে তাহা ক্রমশ রূপ পাইবে আরো অসংখ্য শ্রেণি-সংগ্রামে কারখানায় ও ক্ষেত-খামারে। শ্রমিকশ্রেণির হাতে ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত এই বিক্ষোভ থামিবে না। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস করার কাজে লাল ঝাণ্ডা যেপথ দেখাইয়াছে, নির্বাচনী সংগ্রামকে যেভাবে শ্রেণি সংগ্রামের স্বার্থে পরিচালিত করিয়াছে, তাহাই বামপন্থী সাধারণ কর্মীদের আকৃষ্ট করিয়াছে। তাহারা দলে দলে লাল ঝাণ্ডার কার্যক্রমে সমর্থন জানাইয়াছে।'

তথ্যসূত্র : মঞ্জিল, ১ম সংখ্যা, ১৯.৬.৪৯

উদ্ধৃতি : অমলেন্দু সেনগুপ্ত— উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব। পৃ. ২৯২

শ্বেতপত্র
১৯৪৯

ভারতের বুকে কমিউনিস্ট তাণ্ডব

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ প্রচারিত

অধ্যায় এক

সরকার এবং কমিউনিস্টরা

১৯৪৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিধিবদ্ধ আইনসভায় বিবৃতি প্রদান কালে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত বক্তব্যটি রাখেন :

"বিগত বছর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারত সরকারের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে সেটা কেবলমাত্র খোলাখুলি শত্রুতাই নয়, বরং তাকে সরাসরি বিদ্রোহের সূচনা হিসাবেই বর্ণনা করা যায়। তাদের নীতি হলো কতগুলি বাছাই করা এলাকায় এমন সব কার্যকলাপ শুরু করা, যার পরিণতি সশস্ত্র বিদ্রোহে; মানুষজনকে খুন করতে উৎসাহিত করা, লুটতরাজ করা, এবং অন্তর্ঘাত চালানো। এই সভা এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ খুব ভালোভাবেই জানেন—বিদ্রোহের জন্য কমিউনিস্টরা এমন সব এলাকা বেছে নিয়েছেন যেগুলি বিদেশের সাথে আমাদের সীমান্তবর্তী অঞ্চল।

তাদের এই একই নীতির কার্যকরী রূপ হিসাবে তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণকে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহী উস্কানি দিচ্ছে। সৌভাগ্যের বিষয়—তাদের এই প্রচেষ্টা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিশালী ইচ্ছার দ্বারা প্রতিহত হয়েছে। এবং এর ফলেই সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষের কিছু কিছু অংশে তারা অশেষ দুর্দশা নামিয়ে এনেছে; সীমাহীন ক্ষতি সাধন করেছে।

এই সভা খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন যে বিগত কয়েক মাস ধরে নানান ধরনের দুর্দশাগ্রস্ত লোকেদের জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের অর্থনৈতিক সমস্যায় আগে থেকেই ব্যতিব্যস্ত। এই সময় এটা না বললেও বোঝা যায়, দেশের সমস্ত প্রান্তে দ্রুত পণ্যসামগ্রী সরবরাহ আমাদের প্রধান কর্মসূচী।

গত বছরের নভেম্বরের শেষে সারা ভারত রেলওয়ে মেনস ফেডারেশন-এর কার্যকরী কমিটি নাগপুরের এক সভায় তার সাথে যুক্ত ইউনিয়নগুলিকে ধর্মঘট করার নির্দেশ দেন। এই সময়েই আমাদের কাছে নিশ্চিতভাবে খবর আসতে থাকে যে, রেলওয়ে ওয়ার্কার্স' ইউনিয়নের মধ্যে কার্যকলাপরত কমিউনিস্টরা সাধারণভাবে ডাকা এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত থেকে রাজনৈতিক

উদ্দেশ্য সিদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করবে, বিশেষ করে তারা হিংস্রতা আর অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ দিয়ে বিশেষ ফায়দা তোলার চেষ্টা করবে।

তখন আমার সহকর্মী পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীহরপ্রকাশ নারায়ণের আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো এই সম্ভাব্য ধর্মঘট বন্ধ করা। কারণ সরকার জানতো দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে রেল ধর্মঘট দেশের বুকে এক বিপর্যয় ডেকে আনবে। কারণ এই সময় রেল ধর্মঘট মানে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষতিই নয়, যখন গুজরাট এবং কচ্ছে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারিতে হাজার হাজার মানুষ এবং গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন পরিবহণ ব্যবস্থার গণ্ডগোল এবং বিচ্ছিন্নতা একেবারেই অসহ্য। এই আলোচনাসভা চলে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে। এবং আমরা কতগুলি বিষয়ে একমতও হই। এর ফলেই রেলওয়ে মেনস ফেডারেশন ধর্মঘট না করার সিদ্ধান্ত নেন।

এত কিছু সত্ত্বেও ফেডারেশনের মধ্যে কার্যরত কমিউনিস্টরা কিন্তু ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অটল থাকে এবং তাদের কর্মসূচী কার্যকরী করার পদক্ষেপ নেয়। এ ব্যাপারে সরকারের কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে নিয়মিত রিপোর্ট আসতে থাকে।

সরকার খবর পায় কমিউনিস্টরা ব্যাপক হিংসার সাহায্যে আসন্ন ধর্মঘটকে সংগঠিত করবেই। বস্তুতপক্ষে এ ধরনের অন্তর্ঘাত তখন ঘটতে শুরু করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্প্রতি ছাত্র-জনতা এবং জনগণের অন্যান্য কিছু অংশের সাথে কলকাতায় পুলিশের একটা সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে গেছে। এই সংঘর্ষের সময় পুলিশ এবং জনগণের সম্পত্তি লক্ষ করে 'হ্যান্ড গ্রেনেড' এবং 'বোমা' ছোঁড়া হয়। আমাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, যার উপর ভিত্তি করে আমি বলতে পারি যে চক্র কলকাতার এই সংঘর্ষে ছাত্রদের হাতে 'হ্যান্ড গ্রেনেড' এবং 'বোমা' তুলে দিয়েছিলো, তারা আসন্ন রেল ধর্মঘটেও ছাত্রদের একইরকম ভাবে ব্যবহার করবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ইদানীংকালে জাতির সব থেকে বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রেল ধর্মঘটের মত হরতাল সংগঠিত করার দিকে নিজেদের কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত করেছে। এই যে সমস্ত ধর্মঘট, এগুলিকে শ্রমিকদের অবস্থা ভালো করার জন্য, বা তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে ডাকা অর্থনৈতিক আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা যায় না। তারা এগুলিকে দেশের মধ্যে এক বিশৃংখলা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করতে চায়। অবশ্যই নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা তা করছে, সে উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন!

খুবই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদ্ধতিতে এরা রেল-ধর্মঘটের মাধ্যমে গোটা রেল-ব্যবস্থাটাকে অচল করে দিয়ে দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করতে চায়। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছুতে পারবে না। ফলে দেশব্যাপী দেখা দেবে এক চরম বিশৃঙ্খলা। প্রশাসন ভেঙে পড়বে, এর ফলে শুরু হবে গণ-অভ্যুত্থান। নামী-দামী কমিউনিস্ট নেতাদের একটা বড় অংশ ইতিমধ্যেই আত্মগোপন করেছেন। সরকারের কাছে গাদা গাদা এমন সব তথ্য আছে যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, অন্তর্ঘাতের একটা সুসংগঠিত প্রয়াস চলছে। বিশেষ করে রেলওয়ে ব্যবস্থায়। চিরাচরিত পদ্ধতি হলো—ক্ষতি সাধন করা। ইঞ্জিন-ব্যবস্থা এবং লাইন উপড়ে ফেলা, গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের গুদামগুলি ধ্বংস করা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং বৈদ্যুতিক কেন্দ্রগুলিও এদের লক্ষ্য বস্তু। মাননীয় সদস্যবৃন্দ! স্মরণ করুন, এই কিছুদিন আগে কলকাতার টেলিফোন-

এক্সচেঞ্জে এরা কিভাবে ক্ষতিসাধন করেছে!

আমাদের সৌভাগ্য, রেলওয়ে কর্মচারীদের ব্যাপক অংশ এবং শ্রমিকশ্রেণি এই ধরনের ধর্মঘটের এবং এই পথের বিরোধিতা করেছেন। অন্যদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কি করছে? জিদ ধরে তারা ব্যাপক শ্রমিকদের ইচ্ছাকে নস্যাৎ করছে। সাথে সাথে, যারা তাদের সঙ্গে একমত হতে পারছেন না, তাঁদের আতংকিত করে তোলার পথ গ্রহণ করেছে।

অদ্ভুত ব্যাপার! এরা নিজেরা অন্যের কাজের স্বাধীনতাকে খর্ব করছে, আবার দাবি তুলছে—ওদের (এই সমস্ত) সমাজবিরোধী-গুণ্ডামিগুলি সংঘটিত করার স্বাধীনতা দিতে হবে! যখনই এই সমস্ত গুণ্ডামিগুলির বিরুদ্ধে কোন সরকারি হস্তক্ষেপ হয়, তখনই নাগরিক-অধিকার খর্ব করা হচ্ছে এই অজুহাতে বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জানানো হয়। ওদের নাগরিক অধিকার রক্ষা করার দাবি আসলে জঘণ্য সমাজবিরোধী কাজ করার অবাধ স্বাধীনতার দাবি, এটা ওদের কৌশলেরই অঙ্গ।

সরকার জনগণের নাগরিক অধিকার রক্ষা করার জন্য সর্বদা ব্যগ্র, তাঁরা চান নাগরিকদের অধিকারগুলি সুরক্ষিত থাকুক। কিন্তু 'জাতির বিরুদ্ধে সাধারণভাবে সন্ত্রাসমূলক কাজ, কিংবা তাদের ওপর জোরজুলুম চলতে দেওয়াটা নাগরিক অধিকার? সরকার এরকম ধারণায় বিশ্বাস করে না। এইরকম সন্ত্রাসমূলক সহিংস কাজের বিরুদ্ধে জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়াটা সরকারের পবিত্র কর্তব্য। যদি এইরকম সন্ত্রাস এবং হিংসা চলতে দেওয়া হয়, ... কোনো সরকার বা কোনো সামাজিক জীবনই সেখানে অসম্ভব। এ রকম অবস্থা সহ্য করা যায় না। সুতরাং সরকার এইরকম অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য।

যদি রেল শ্রমিকদের একাংশ ধর্মঘট করবেন বলে ঠিকই করে থাকেন,—দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করা হবে।

এই সন্ধিক্ষণ সময়ে, এটা মনে রাখতে হবে, এ ধরনের ধর্মঘট কোনমতেই সাধারণ ট্রেড-ইউনিয়নের বা তার সমপর্যায়ের কাজ নয়।

সরকার শ্রমিক কর্মচারী ও অন্যান্য অংশের কর্মচারীদের আইনি দাবিগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল, এবং সেগুলি মেটানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সরকার তার কর্মচারীদের যে কোন সমস্যার মোকাবিলা করতে এবং সেগুলি দূর করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোনমতেই কোন চক্রের সহিংস হুমকি কিংবা কার্যকর সশস্ত্র বিদ্রোহের কাছে মাথা নিচু করতে সরকার রাজী নয়।

এই কারণে, ওদের এই নীতির জন্যই, কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কিছু সভ্যকে সরকার গ্রেপ্তার করেছে। তাদের জন্য যা নির্দ্ধারিত এবং অনিবার্য বরাদ্দ, সে রকম অনেক নিবর্তনমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। সমস্ত প্রাদেশিক সরকারগুলিকেও এই ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। যাতে জরুরি প্রতিষ্ঠানগুলি কমিউনিস্টদের অন্তর্ঘাতের হাত থেকে রক্ষা পায়। সরকার মনে করে তার এই কাজের পেছনে নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশের এবং এই সভার সমর্থন আছে, এটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, আর এ পদ্ধতি সহিংস-পন্থার বিরোধী।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক এবং বিস্তৃতভাবে সহিংস-পথের প্রচার চালাচ্ছে এবং পরিকল্পনা করছে, তারা সমস্ত আচরণ বিধি, সমস্ত শিষ্টতা বোধ বিসর্জন দিয়ে মহান জাতীয়

প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা দেখিয়েছে এবং এখনও দেখিয়ে চলেছে। মানুষের জীবনের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পাঠকেরা দেখবেন, কী রকম জঘন্য, ডাহা-মিথ্যা কথা বলে চলেছে তারা। কেমনভাবে সরল, সাদাসিধে মানুষগুলিকে তারা ভুল পথে চালিত করছে—উত্তেজিত করছে। এইরকমভাবে মিথ্যা আর অতিরঞ্জনের ওপর ভিত গেড়েই তারা আইনের শাসনকে উপেক্ষা করে চলেছে। উদ্দেশ্য সমগ্র দেশব্যাপী একটা বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করা।

অধ্যায় দুই

হিংসার প্রচারক কমিউনিস্টরা

আচমকা আক্রমণের জন্য ব্রিগেড

''ভারতের কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সরকারের সশস্ত্র বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য এবং তাদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের লোকদের বিস্তারিতভাবে গেরিলাদল ও শক ব্রিগেড তৈরির প্রশিক্ষণ দেবার জন্য সর্বত্র নির্দেশ দিয়েছে। তাদের পুস্তিকা—'কর্মীদের এবং শক ব্রিগেডের জন্য পাঠ্যক্রম' থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি তুলে দেওয়া হলো :

'শক ব্রিগ্রেডের ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম'/ভূমিকা—

(১) 'এই পাঠ্যক্রম শক ব্রিগেড ক্যাডারদের জন্যই কেবলমাত্র নির্ধারিত', আরও দুটো পাঠ্যক্রম আছে, একটা হলো 'ব্রিগেডের কমান্ডারদের জন্য'। অন্যটা হলো 'জেলা অথবা আঞ্চলিক কমান্ডারদের জন্য'।

(২) 'এই পাঠ্যক্রম মাও নির্ধারিত গেরিলানীতি এবং কৌশলের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে'—

এই অধ্যায়ে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে শক্ ব্রিগেডের কর্মীরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং তার সমাধান কী করে করতে হয় সেগুলিও দেখানো হয়েছে।

এই পুস্তিকার ভূমিকা খুবই সংক্ষিপ্ত। তাতে শুধু দেখানো হয়েছে 'কে শত্রু? কেন আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হয়েছে?' আর বলা হয়েছে 'সংগ্রামের দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির কথা।'

(৩) ক্যাডারদের উদ্যোগ বাড়ানোর জন্য সাংগঠনিক অংশে বলা হয়েছে : 'এই পাঠক্রম তিন দিনের মাত্র। অর্ধেক সময় তত্ত্বগত শিক্ষার জন্য, অর্ধেক সময় প্রয়োগের জন্য।' প্রত্যেকটা প্রয়োগভিত্তিক প্রশিক্ষণের সময় তাদের গোপনে খুন করার পদ্ধতি অন্তত দুদিন শিক্ষা দেওয়া হয়। এর মধ্যে নিশাচর বৃত্তিও আয়ত্ত করতে হয় তাদের।

দুটি দিন তারা দুদলে ভাগ হয়ে একদল 'সরকারি বাহিনী'র ভূমিকায় এবং অন্য দল 'নিজেদের সুরক্ষিত রেখে পুলিশ, থানা আক্রমণকারীর ভূমিকায় এ ট্রেনিং নেয়।

দিন এবং রাত সব সময় ক্যামোফ্লেজ (শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া) পদ্ধতি, ক্রলিং (কনুইয়ে ভর দিয়ে চলা) পদ্ধতিগুলিও তারা এ সময়ে শেখে। এই যে বাস্তব দৈনন্দিন পরিশ্রম এবং

প্রশিক্ষণ, এতে কর্মীদের প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

(৪) "যাঁরা প্রশিক্ষণ দেবেন তাঁরা যেন কখনই সমস্ত কর্মীকে সব কিছুর ট্রেনিং না দেন, কারণ কলকাতার কর্মীদের জঙ্গলের লড়াইয়ের ট্রেনিং দেওয়ার কোনো মানেই হয় না। কিংবা দার্জিলিং-এর কর্মীদের নদীপথে শত্রুকে আক্রমণ করার ট্রেনিং দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাই বা কী? যাদের অঞ্চলের যে সমস্যা, সেই সমস্যাগুলির দিকে নজর রেখে সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তা না হলে পাঠক্রম অত্যন্ত বেশি হয়ে যাবে। বাহুল্যের পরিমাণ বাড়বে।'

(৫) 'যে সব অস্ত্র ব্যবহার করা হয়—তাদের মধ্যে রাইফেল, শটগান, হাত বোমাই প্রধান, কারণ এগুলি জোগাড় করার জন্য বেশি প্রচেষ্টা চালাতে হয় না। টমিগান, স্টেনগান, রিভলভার এ সব উচ্চ স্তরের পাঠ্যক্রম।'

এই পুস্তিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'সংগঠন'।

'গেরিলা কার্যকলাপ বলতে কী বোঝায়'—

এই শিরোনামে এখানে বলা আছে,

'গেরিলা কার্যকলাপ বলতে আমরা বুঝি (আচমকা) থানা আক্রমণ, জমিদার, জোতদারদের উপর আক্রমণ চালানো। ওঁত পেতে বসে থেকে আগুয়ান পুলিশ দলকে ধ্বংস করা, খতম করা এবং তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া। শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অন্তর্ঘাত করে নষ্ট করা এবং এই উদ্দেশ্যে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ছিন্ন করা, টেলিগ্রাফ লাইন উপড়ে দেওয়া, যাতে শত্রু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর আচমকা পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া, যার ফলে তারা হতভম্ব হয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে না। দুর্বল জায়গা বাছা, যাতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে তাদের সময় লাগে। এই উপায়ে তাদের ধ্বংস সাধন করা। শেষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সশস্ত্র কার্যকলাপ চালানোর মতো স্বাধীন এলাকা গড়ে তোলা। 'ছোট থেকে শুরু কর, আস্তে আস্তে নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি কর'—চীনের এই যুদ্ধ কৌশল আপাতত এখানে চলবে না।' ভেবে দেখুন! শত্রুর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করার শক্তি অর্জন করতে তাদের কী দীর্ঘ সময় লেগেছে!

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

'এর প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হ'লো দেশব্যাপী গণআন্দোলনগুলির বিকাশ সাধন করা, সেগুলিকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা। তখন সমগ্র জনতা সাধারণভাবে এক বিশাল অভ্যুত্থানে জেগে উঠবেন এবং হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন।'

ব্রিগেড গঠন

'প্রাথমিক গেরিলা ইউনিট বা আমরা যেটাকে 'শক-ব্রিগেড' বলছি, সেটা হবে তাদের নেতা সমেত পাঁচ থেকে দশ জনের। আক্রমণের ধরন এবং চরিত্রটা মাথায় রেখে, নিজেদের অস্ত্র শক্তির কথা ভেবে সব থেকে ভালো 'শক ব্রিগ্রেডে'র সদস্য সংখ্যা (নেতা সহ) দশের মধ্যে রাখা গেলে।'

'যদি কোথাও স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দ্রুত জমায়েত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন স্থানিক সমস্যা থাকে, দলের সদস্য সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ, যে কোন সংখ্যা হতে বাধা নেই।'

'...যে কোনো একটি গ্রাম থেকেও এই লোকদের নেওয়া যেতে পারে অথবা দুই বা ততোধিক গ্রাম থেকেও। প্রথম দিকে ব্রিগেডের কমান্ডার, জেলার পার্টি সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে জেলার নেতৃবৃন্দের দ্বারা নিয়োজিত ব্যক্তিই হবেন।'

'এখন ব্রিগেডগুলিকে লোকাল কমিটিগুলির নেতৃত্বেই কাজ করতে হবে। এমন একটা সময় আসতে পারে যখন গ্রামে কিম্বা ছোট একটা অঞ্চলেই একাধিক ইউনিট গড়ে উঠতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইউনিটগুলিকে যোগাযোগ রক্ষা করেই কাজ করা উচিত।'

অস্ত্র

'কর্মীদের কোন বিশেষ ব্যাজ বা ইউনিফর্ম থাকা উচিত নয়। কারণ এর ফলে শত্রুরা তাদের চিহ্নিত করার সুযোগ পাবে। প্রত্যেকের কাছে একটা খুক্‌রি (ভোজালি জাতীয় অস্ত্র), টাঙ্গি, অথবা ছোট দা রাখতে হবে। ছোট ছুরি এবং শক্ত দড়ি কাছে রাখা উচিত, কারণ প্রয়োজনে এগুলি নিজেদের ব্যবহারে লাগাতে পারবেন; নিজেদের আসল (প্রধান) অস্ত্রের সাথে অতিরিক্ত হিসাবে এগুলি রাখতেই হবে। জমায়েত হওয়ার সময়, 'এ্যাকশনে'র সময় এইগুলি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

তিন নম্বর অধ্যায়ে 'শক ব্রিগেডের কর্তব্য' বর্ণনা করা হয়েছে :

'শক ব্রিগেডের কর্মী হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব হলো আক্রমণ করা, ধ্বংসের উদ্দেশ্য মাথায় রেখে শত্রুর পথে ওঁত পেতে বসে থাকা, এবং এই সমস্ত জায়গায় অন্তর্ঘাত চালানো, যেখানে শত্রু জমায়েত হতে পারে। এগুলিই আপনাদের অ[illegible]তত কাজ। ব্রিগেড কমান্ডারের নেতৃত্বে এইসব কাজ করতে হবে।

হানা

'রেইড বা হানা কথাটির মানে হলো অবস্থানরত অচল শত্রুর ওপর ছোটখাট আক্রমণ, নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাথায় রেখেই এই দ্রুত নিষ্পত্তিমূলক আক্রমণ।

একটি 'হানা' সংগঠিত করতে গেলে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির দিকে ব্যাতিক্রমহীনভাবে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে এবং পালন করতে হবে। এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি (তথ্য) সংগ্রহ করা শক ব্রিগেড কমান্ডারের দায়িত্ব।

অস্ত্র 'হানা' বা জ্ঞাতব্য—

(১) বস্তুর এলাকা এবং অবস্থান

(২) শত্রুর শক্তি (মানুষ এবং বস্তুগত);

(৩) যাওয়ায় রাস্তা এবং উপায়; পরে ফিরে আসার পথ (যে পথে শত্রুর অবস্থানের দিকে পৌঁছানো হবে, কমান্ডার লক্ষ্য রাখবেন যেন ফেরার পথ তার থেকে ভিন্ন হয়)

(৪) শত্রুকে হতচকিত করে দেবার জন্য, তাদের হিসেবের বাইরে যে সময়, (হানার জন্য) সেই সময় বেছে নেওয়া, যে পথে তারা আক্রমণ আশংকা করতেই পারে না সেই পথ নির্ধারণ করা;

(৫) নিজেদের শক্তি (সংখ্যা এবং অস্ত্র-শস্ত্র);

(৬) শত্রুর শক্তি বৃদ্ধির পথ বিচ্ছিন্ন করা (নতুন শত্রু যাতে সে পথে এসে শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি না ঘটাতে পারে); পরিকল্পনার সময় যখন শত্রুকে হতচকিত করে দিতে হয়, তখন একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে পাকড়াও করার নীতি গ্রহণ করা, এবং শত্রুর চেয়ে সংখ্যায়

বেশি লোক জমায়েত করার নীতি অবলম্বন করা; যেখানে শত্রুকে 'হক-চকিয়ে দেবার সম্ভাবনাটা ভালো এবং বিশাল গুরুত্বপূর্ণ, অথচ শত্রুর সংখ্যার চেয়ে বেশি লোক জমায়েত করা সম্ভব নয়, সেখানে 'হানাদার বাহিনীর সংখ্যা কম হলেও চলবে। সে সব ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে।

...

গ্রামের দিকে বর্তমানে 'শক ব্রিগেড নিম্নবর্ণিত বস্তুগুলির ওপরই আক্রমণটা নিবদ্ধ রাখবেন : (১) থানা, (২) পুলিশ ফাঁড়ি বা ক্যাম্প (৩) জমিদার, জোতদারদের বাড়ী, (৪) রেল স্টেশন।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে (ঐ সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে—অনুবাদক) কমিউনিস্টদের 'হানার' পরিকল্পনা কী এবং কীভাবে সেগুলি ওরা করবে।

এর পরে সংক্ষেপে কিভাবে থানা এবং অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে হ'বে তার নির্দেশ আছে।

পশ্চিমবাংলা

যদিও কমিউনিস্টরা তাদের এই নীতি এবং কার্যপদ্ধতি সারা ভারতবর্ষব্যাপী প্রচারের চেষ্টা করছে তথাপি তাদের কাজের মূলকেন্দ্র হলো পশ্চিমবাংলা এবং হায়দ্রাবাদ (বর্তমানের অন্ধ্রপ্রদেশ—অনুবাদক)। তাদের এই হিংস কার্যকলাপ যে ইচ্ছাপ্রণোদিত ব্যাপার, এটা শুধু উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকেই ফুটে ওঠে না, তাদের প্রচারিত সার্কুলারগুলি থেকে এটা আরও বেশি পরিস্ফুট যে, সেগুলি পরিকল্পনামাফিক দৃঢ়-প্রত্যয়জাত। (সার্কুলার, প্রচারপত্র এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা থেকে) এটা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় কমিউনিস্টরা বিভিন্ন সময়ে তাদের কর্মী, দরদী এবং জনগণের মধ্যে এগুলি প্রচার করছে।

১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চে নির্ধারিত রেল ধর্মঘটের ব্যর্থতা তাদের ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এই প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য দলিল নং ৩/৪৯ (বোম্বাই থেকে প্রচারিত—এপ্রিল ৯, '৪৯)-এ কমিউনিস্ট পার্টি বলেছে—

'৯ই মার্চের ধর্মঘট যেভাবে হবার কথা ছিল, যদি সেইরকমভাবে বিকাশলাভ করত, যদি রেল শ্রমিকরা নিজেদের প্রচণ্ড শক্তি এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতেন, তাহলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে নেহরু সরকার তাঁদের ওপর যে বর্বর নিপীড়ন নামিয়ে এনেছিল, তাঁরা সেটার মুখের মত জবাব দিতে পারতেন, 'সমাজতন্ত্রী-বেইমান'গুলিরও সাহস হতো না—তাঁদের পিছন থেকে ছুরি মারার...'

'৯ই মার্চের নিপীড়ন শ্রমিকশ্রেণির কাছে আর একটা শিক্ষা বয়ে এনেছে সেটা হলো—'যদি তোমরা তোমাদের দাবি আদায়ের সংগ্রামে জয়লাভ করতে চাও—তাহলে নিপীড়নকে প্রত্যাঘাত করে পরাজিত করার জন্য, বেইমানির মোকাবিলা করার জন্য, তোমাদের অবশ্যই একটা ইস্পাত-দৃঢ় বিপ্লবী সংগঠনে সংগঠিত হতে হবে—এমন একটা সংগঠন, ব্যাপক গ্রেপ্তারেও যাকে নতিস্বীকার করানো যায় না, এমনকি রাইফেল আর বুলেট দিয়েও তাকে আতংকিত করা যায় না। তা হ'লেই, এবং কেবলমাত্র তখনই, শ্রমিকশ্রেণি নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করতে পারে, সংগ্রামগুলিকেও রক্ষা করতে পারে এবং বিজয়ের দিকে যেতে পারে...।'

এই সার্কুলার অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক কমিটি, ১৯৪৯ সালের ২৬শে এপ্রিল একটা সার্কুলার প্রচার করে, তাতে 'সমস্ত পার্টি কর্মীদের', 'জনগণের মেজাজকে তুঙ্গে তোলার চেষ্টা' হিসাবে 'সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই' করার শপথ গ্রহণ করা হয়েছে, তারা এমনকি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্রতিও আহ্বান জানিয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে এই সময়ের একটা বাংলা প্রচার-পত্র যার শিরোনাম ঃ 'সিপাহী ভাইসব! তোমাদের বন্দুক আর বেয়নেট মন্ত্রী এবং অফিসারদের দিকে ঘুরিয়ে দাও।' এতে বলা হয়েছে—'নেহরু সরকারের নির্দেশ কার্যকরী করতে অস্বীকার কর...কারণ আর কতদিন তোমরা, টাটা-বিড়লা-নলিনী-বিধানের সরকারের হয়ে তোমার মা-বোন, তোমার ভাই শ্রমিক-কৃষকদের জবাই করতে থাকবে? তোমাদের হাতের বন্দুক এবং বেয়নেট ঘুরিয়ে ধর। নারীঘাতী, শিশুঘাতী ফ্যাসিস্ট কংগ্রেসীদের ওপর সেগুলি চালাও! ঘৃণিত অফিসারদের গ্রেপ্তার কর। কলকারখানায় বিপ্লবী শ্রমিক আর রাস্তায় বিপ্লবী ছাত্রদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলো। কারাগারগুলির দরজা খুলে দাও। যে-সব বন্দীরা আজ অনশনে মৃত্যু-পথযাত্রী তাদের মুক্ত করো।'

১৯৪৯ সালের ৮ই জুন, একটি পুলিশবাহিনী বেঙ্গল-পটারি এলাকায় একটা গণ্ডগোল থামাতে গেলে কমিউনিস্ট কর্মীরা তাদের মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে। এরপর আরও শ্রমিক সেখানে উপস্থিত হলে শ্রমিকরা কারখানা দখল করে নেয়। ইট, লোহার রড, এ্যাসিড বাল্ব প্রভৃতি দিয়ে পুলিশকে প্রতিহত করে। একজন ডেপুটি কমিশনার, একজন এ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার, দুজন সাব-ইন্‌সপেক্টর এবং অনেক পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। অবশেষে কারখানা অঞ্চলকে মুক্ত করার জন্য পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। ঠিক একইরকমভাবে হাওড়ার মেসার্স এ্যালানবেরি কারখানাটি কমিউনিস্টরা বেশ কয়েকদিন দখল করে রাখে। শেষ পর্যন্ত একটা বিশাল পুলিশবাহিনী শ্রমিকদের হাত থেকে কারখানাটা মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে সেখানে পৌঁছলে, তারা কারখানা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানেরই টালিগঞ্জ ডিপোর ঘটনার প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করছি (তৃতীয় অধ্যায় দেখুন)।

জুন মাসের ২২ তারিখে ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে শ্রীরামপুরে মাহেশের রথতলাতে একটা শ্রমিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কমিউনিস্টকর্মীরা বলপূর্বক মিলগুলি দখল করে নেওয়ার জন্য শ্রমিকদের উত্তেজিত করে। পুলিশের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে, সেই অস্ত্র তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়। এই সভার শেষে কমিউনিস্টরা শ্রীরামপুর অভিমুখে একটা মিছিল বার করে। মিছিল হঠাৎ মাঝপথে তিনভাগ হয়ে যায়। একই সাথে এই তিনটি দল তিনটি আক্রমণ স্থল বেছে নিয়ে আক্রমণ করে, একটা দল মাহেশ পুলিশ থানা, অন্য একটা দল আই-এন-টি-ইউ-সি অফিস এবং তৃতীয় দলটি শ্রীরামপুর সাব-জেল আক্রমণ করে। প্রায় ২৫০ জন লোক পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে, কিন্তু যেই পুলিশবাহিনী এসে উপস্থিত হয় আক্রমণকারীরা চেয়ার টেবিল এবং অন্যান্য আসবাবপত্র ভাঙচুর করে সরে পড়ে। শ্রমিক সংগঠনের অফিসটাতে দ্বিতীয় দল আগুন ধরিয়ে দেয়। তৃতীয় দলটা জেলের পাঁচিলের গায়ে এ্যাসিড বাল্ব এবং বোমা ছোড়ে, কিন্তু যেই জেলের পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠলো এবং জেল সিপাহীরা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলো, গুণ্ডাগুলি চম্পট দেয়!

অবশ্য এই ঘটনাগুলিই কমিউনিস্টদের প্রচারপত্রে অতিরঞ্জিত হলো। আবার সার্কুলার দিয়ে প্রচার করাও হলো। নিদর্শন হিসাবে আমরা ওদেরই প্রচারিত 'বিপ্লবী জনগণের প্রতি

কমিউনিস্টদের আহ্বান' নামক একটা প্রচারপত্রের অংশবিশেষ তুলে দিলাম—

'পটারির শ্রমিকরা যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সূচনা করেছেন সেই পথে অগ্রসর হন। খুনে বিধানের গুলি চালাবার প্রতিবাদে প্রত্যেকটা কারখানায় ধর্মঘট সংগঠিত করুন। পুঁজিবাদীদের ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা সংগঠিত এই বিধান-সরকারকে ধ্বংস করুন। সমস্ত কারখানার শ্রমিক ভাই সব! আপনার ভাই 'বেঙ্গল পটারির' শ্রমিকরা যে রাস্তা দেখিয়েছেন সেই পথে এগিয়ে চলুন! পটারি শ্রমিকদের রক্তের বদলা নিন। প্রত্যেকটা কারখানায় ধর্মঘট সংগঠিত করুন। সশস্ত্র মিছিল নিয়ে কংগ্রেসী নেতা এবং মন্ত্রীদের আক্রমণ করুন। কংগ্রেস সেবাদল এবং পুলিশের সাথে লড়াই করুন।'

(এই প্রচারপত্রটা মনে হচ্ছে নেহেরুর গোয়েন্দা দপ্তরের বানানো; কারণ, (১) এটা কোথাও জোগাড় করতে পারলাম না। (২) ভাষা একেবারে পুলিশী!—অনুবাদক)

জেলের ভেতরের বন্দীদের ঘটনাগুলি কমিউনিস্টদের অস্ত্রাগারে (প্রচারের—অনুবাদক) ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাস থেকেই আরও একটা নতুন অস্ত্র যোগ করেছে। তারা মনে করছে দেশের শান্তিভঙ্গ করার এবং জনগণের সমবেদনা আদায় করার এটা (জেল বিদ্রোহ—অনুবাদক) একটা কার্যকরী উপায়। এরই জন্য তারা জেলে জেলে কমিউনিস্ট এবং কয়েদী 'ডেটিনিউ'দের আক্রমণ করতে উৎসাহিত করছে। জেলের ভিতরে কমিউনিস্ট কয়েদী এবং 'ডেটিনিউ'দের আচরণবিধির সংবিধান অনুসরণ করে উত্তরপ্রদেশ প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক প্রচারিত—'বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্য কমিটির মূল্যায়ন' নামক প্রচারপত্রে বলা হয়েছে—

'এই সময় কমরেডদের বাইরে (জামিনে—অনুবাদক) বেরিয়ে আসা উচিত নয়। বরং জেলের মধ্যেই সবকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা অবশ্যকর্তব্য।'

গত ২১শে এপ্রিল পশ্চিম বাংলায় সাড়ে তিনশ বন্দী অনশন করতে শুরু করবে। সাথে সাথেই 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' নামে কমিউনিস্ট প্রভাবিত একটা গণ সংগঠনের প্রচার পত্র বিলি করা হয়। তার শিরোনাম—

'৬০০ রাজবন্দীর জীবন রক্ষার জন্য বিশাল অভ্যুত্থান সংগঠিত করো।' সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষের কাছে এই আবেদনপত্রে বলা হয়েছে—'ছাত্র-শ্রমিক মধ্যবিত্ত নাগরিকগণ, বিশেষ করে মহিলারা এগিয়ে আসুন! আসুন আমরা দেশব্যাপী একটা বিপ্লব ঘটাই—যার দ্বারা পুঁজিবাদী এই সরকারের ভিতটাই নড়িয়ে দেওয়া যাবে।...'

অনশনরত বন্দীদের ওপর অকথ্য নিপীড়নের অভিযোগের একটা ধারাবাহিক প্রচার চালানো হয়। কোনো সন্দেহই নেই কমিউনিস্টদের এই অভিযোগগুলি ডাহা মিথ্যা কথা। যাই হোক না কেন সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় দৃঢ়ভাবে তাদের মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর। কোথাও কোথাও সরকার অনশনরত বন্দীদের সাথে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। তাদের কিছু কিছু দাবি মেনেও নেওয়া হয়েছে। আসল কথা হলো, দাবিগুলি অজুহাত মাত্র। জেলের মধ্যে এবং-বাইরে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত করার উদ্দেশ্যেই তারা এই পথ গ্রহণ করেছে। জেলের বন্দীদের দাবিগুলির সমর্থনে তারা বিভিন্ন জায়গায় অনেক সভা এবং মিছিল সংগঠিত করছে।

এবং ইতিমধ্যে গত ২৭শে এপ্রিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দুটি স্থানে তারা খুব উদ্বেগ এবং

বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' একটা হল-এ জমায়েত হয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত করে। তারপর তারা একটি মিছিল বার করে। যেহেতু মিছিল ১৪৪ ধারার এলাকা দিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে চলেছিল, তাই পুলিশ তাদের গতি রোধ করে। তখন পুলিশের গাড়ি লক্ষ করে কয়েকটি বোমা ছোঁড়া হয় এবং কিছু পুলিশ কর্মী আহত হয়। ফলে আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে কিছু গুলি চালাতে হয়। এই ঘটনায় মোট ৮ জন নিহত হয়। ২৭শে ৬ জন, ২৮শে ১ জন। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে, এদের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু বোমার আঘাতে, ১ জনের মাত্র গুলিতে এবং বাকি ২ জনের মৃত্যু বোমা এবং গুলি দুটিতেই। ৫ জন পুলিশ কর্মচারী বোমার টুকরোতে আঘাত পান। সরকারি বাস এবং ট্রামও ওদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ২৭ তারিখের ঘটনার জের ২৮ তারিখেও চলে। পুলিশ গাড়ী এবং পুলিশ দল লক্ষ করে অনেক বেশি পরিমাণ বোমা ছোঁড়া হতে থাকে। এর ফলে একাধিক পুলিশ নিহত হন। কয়েকটি ক্ষেত্রে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু কোন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। ৩০ তারিখের মধ্যে সব কিছু শান্ত হয়ে যায়। ২৭ তারিখের নিহতদের মধ্যে ৫ জন ছিলেন মহিলা।

আবার ছ' সপ্তাহ পর জুন মাসের ৮ তারিখে প্রেসিডেন্সী জেলে নিরাপত্তা আইনে ধৃত আটক বন্দীরা তাদের প্রাতঃকালীন ক্রিয়াকর্ম সারার পর হঠাৎ ঘোষণা করে কমিউনিস্টদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তারা লক্-আপে ঢুকবেন না। বিপথে চালিত তাদের এই অন্যায় আবদার পরিত্যাগ করানোর জন্য দফায় দফায় তাদের সাথে সারা দিন ধরে আলোচনা হতে থাকে। অনেক রকমভাবে তাদের বোঝানো হয়। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ঠিক হয়, যদি কমিউনিস্টরা নির্ধারিত সময় রাত্রি ৯টার পরেও লক-আপে না ঢোকেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করা হবে।

সেই মত সন্ধ্যাবেলা জেল কর্মচারীরা প্রথমে তাঁদের অনুরোধ করেন, পরে হুমকিতেও যখন কাজ হয় না, তখন বাইরের সশস্ত্র পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়। কমিউনিস্ট বন্দীরা সমস্ত আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দিয়ে এবং খাটিয়া ইত্যাদির সাহায্যে ব্যারিকেড তৈরি করে। প্রথমে একদল পুলিশ জেলে ঢোকেন এবং তাঁরাও বন্দীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। এই দলটাকে গালাগালি করা হয় এবং সশস্ত্রভাবে আক্রমণ করা হয়। তখন পুলিশ লাঠি চালায়। যখন পুলিশরা তাদের তালা বন্ধ করানোর জন্য ওয়ার্ডের মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করছিলেন তখন নানান বস্তু ছুঁড়ে তাঁদের আক্রমণ করা হয়। এ রকম অবস্থায় 'লক-আপ' করানোর জন্য নিরাপত্তার খাতিরে গুলি চালানো ছাড়া আর উপায় ছিলো না। এই ঘটনায় একজন ডি-সি, একজন এ-সি এবং ৩৫ জন পুলিশ কর্মী আঘাত পান। নিরাপত্তা আইনে ধৃত একজন বন্দী পরে হাসপাতালে মারা যান এবং ১২ জন আহত হন।

দমদম জেলের কমিউনিস্ট বন্দীরা ১০ জুন জানান যে, যেহেতু তাঁদের কিছু দাবির প্রতি সরকার কর্ণপাত করছেন না, সেই কারণে তাঁরা অনশন করবেন। প্রেসিডেন্সী জেলের ঘটনার কথা শুনে তাঁরাও নির্দ্ধারিত সময়ে 'লক-আপ' হতে অস্বীকার করেন। এ ক্ষেত্রেও প্রেসিডেন্সী জেলের মতই ঘটনা ঘটলো। যখন সমস্ত শান্তিপূর্ণ উপায় এবং সদিচ্ছার জবাব গালাগালি আর ইঁট-পাটকেল দিয়ে দেওয়া হতে লাগলো, তখন তাঁদের জেলে ঢোকানোর জন্য পুলিশকে বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হলো।

এই 'অপারেশন' ভোর তিনটে পর্যন্ত চলে। শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট বন্দীরা নিজেরাই আত্মসমর্পণ করেন। জেল কর্তৃপক্ষও তাঁদের সেলে বন্দী করতে সক্ষম হন। ঘটনার পর দেখা গেল, নিরাপত্তা আইনে ধৃত ৩ জন মরে পড়ে আছে, ৩২ জন গুরুতর আহত। অন্যদিকে ৯ জন পুলিশ এবং ৩ জন জেল ওয়ার্ডারও আহত হয়। এটাই হলো অনশন, বন্দী নির্যাতন, 'বন্দীহত্যা' সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য।

এই সোজা সত্য ঘটনাগুলিকেই কমিউনিস্টরা কেমনভাবে বিকৃত করেছে, সেটা তাদের প্রচারিত প্রচারপত্র সার্কুলার ইত্যাদির ভাষা থেকেই বোঝা যায় :

'রাজনৈতিক বন্দীদের সমর্থনে (রাজবন্দী দিবস হিসাবে ঘোষিত) ২৭শে জুন সমগ্র বাংলায় আগুন জ্বালাও'—এই শিরোনামে প্রচারিত এক প্রচারপত্রে বলা হয়েছে :

'খুনী বিধান সরকারকে রাজবন্দীদের দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য করুন। শ্রীরামপুর ও দক্ষিণ কলকাতার পথে এগিয়ে চলুন। এই সমস্ত বীর যে পথ দেখালেন তাকে অনুসরণ করুন! এই পথে পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটা গ্রামে, গঞ্জে, শহরে এই খুনী সরকারকে বিড়ম্বিত করে তুলুন। বর্বর নৃশংস কংগ্রেসীদের প্রতি কোন দয়া-মায়া দেখানো নয়। এরা তিলে তিলে বন্দীদের হত্যা করছে। তাদের প্রতি দয়া দেখানোর অর্থ, বন্দী হত্যাকে সমর্থন করা। শ্রমিক, কৃষক এবং বাংলার সাধারণ মানুষ! বিরাট অভ্যুত্থানে ফেটে পড়ুন! সমগ্র দেশ ধর্মঘট'আর মিছিলে ভরিয়ে দিন? কংগ্রেসী খুনীদের স্তব্ধ করে দেবার জন্য আই-এন-টি-ইউ-সি অফিস এবং কংগ্রেস সেবাদলের ওপর আক্রমণ সংগঠিত করুন! জেল গেট আক্রমণ করে বন্দীদের ছিনিয়ে আনুন!

এ-আই-টি-ইউ-সি এবং কৃষক সভা আগামী ২০শে জুন 'বন্দী দিবস' পালনের ডাক দিয়েছে। ঐ দিন সমগ্র বাংলা দেশে আগুন জ্বালান। চারদিক দিয়ে এই বর্বর কংগ্রেসীদের আক্রমণ করুন! বিভিন্ন জায়গায়, তাদের বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ সংগঠিত করুন! আতঙ্কে এই সরকার থর-থর করে কাঁপছে। কত জায়গায় তারা পুলিশ পাঠাবে?

আজ এই ২৭শে জুন শপথ নিন। আজ থেকেই শপথ নিন—আজ থেকেই এগিয়ে চলার দিন। অত্যাচারী সরকারের সাধের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিন। রাজনৈতিক বন্দীদের দাবিগুলি মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করুন।

দাবি তুলুন—'রাজবন্দীদের মুক্তি দাও! খুনী, অত্যাচারী মন্ত্রিসভা এবং দালালদের শাস্তি দাও!'

বাংলায় প্রচারিত আর একটি প্রচারপত্র 'এই খুনের বদলা নাও।' তাতে বলা হয়েছে :

'কলকাতার বীর শ্রমিক, ছাত্র, নাগরিক এবং মা-বোনেরা! আজ ৯ দিন হতে চললো খুনী কংগ্রেস সরকারের কারাগারে রাজবন্দীরা অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তথাপি তাঁরা এই ফ্যাসিস্ট খুনী সরকারের কাছে মাথা নত করতে রাজী নন। বন্দীদের জীবন নিয়ে রায়-মন্ত্রিসভার এই ছিনিমিনি খেলা আমরা আর বরদাস্ত করবো না। কলকাতার বিপ্লবী মা-বোনেরা ২৭শে এপ্রিল রাস্তায় নেমে অত্যাচারী সরকারের হাত থেকে বন্দীদের বাঁচানোর জন্য তাঁদের দাবিগুলি সরকারকে মেনে নেওয়ার আওয়াজ তোলেন! সাথে সাথেই এই কংগ্রেস সরকার গুলি চালিয়ে ৪ জন মহিলা এবং ২ জন নাগরিককে হত্যা করেছে। ফলে কলকাতার বীর জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

তাঁরা হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই নিয়ে কংগ্রেস সেবাদলের গুণ্ডা এবং পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এইরকমভাবে কলকাতার ছাত্র এবং নাগরিকগণ এই অত্যাচারের বদলা নিতে শুরু করেছেন। জনগণের এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রতিরোধের মুখে পড়ে রায়-মন্ত্রিসভা ক্ষ্যাপা কুত্তার মত ব্যবহার শুরু করেছে।...

গোটা বউবাজার কলেজ স্ট্রীট এলাকায় তারা হাজার হাজার পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলে। যতই যাই হোক, জনগণের প্রতিরোধ আরও বেড়ে যায়। হাজার হাজার নির্যাতিত জঙ্গী মানুষ পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তুলছেন। সরকারি ট্রাম-বাসে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। এইরকমভাবেই এই খুনগুলির বদলা নেওয়া যায় এবং এই খুনী সরকারের প্রশাসনকে অচল করে দেওয়া যায়।

কলকাতার বীর শ্রমিকরাও এই সংগ্রামে এগিয়ে আসছেন। ট্রাম শ্রমিকরা পার্কসার্কাস ট্রাম ডিপোতে তাদের প্রিয় নেতা কমরেড ধীরেন মজুমদারকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার শ্রমিক একটি সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে খুনী রায়-মন্ত্রিসভার দমন পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং পদত্যাগ দাবি করেন। ন্যাশনাল কার্বন কোম্পানীর জঙ্গী শ্রমিকরা পুলিশ লক-আপ থেকে এক ছাত্র কমরেডকে ছিনিয়ে আনেন।

...এই সমস্ত দাবিগুলির ভিত্তিতে সমাজের প্রত্যেকটি অংশের মানুষের উচিত, পুলিশ এবং কংগ্রেসী দালালদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি করা। গতকাল থেকে কলকাতায় যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে (২৭শে এপ্রিল) সেটাকে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। পুলিশ আক্রমণ করার আগেই তাদের আক্রমণ করুন। এই কসাইগুলি সরকারের দালাল বৈ তো কিছুই নয়! '১৪৪ ধারা তুলে নাও' 'সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দাও' 'বিধান মন্ত্রিসভা ধ্বংস হোক—এই আওয়াজ তুলে কল-কারখানা স্কুলে ধর্মঘট সংগঠিত করুন। কারখানার ম্যানেজারদের ঘেরাও করুন। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল সংঘটিত করুন! স্তব্ধ করে দিন ফ্যাসিস্ট কংগ্রেসী গুণ্ডাদের সমস্ত কার্যকলাপ!'

'খুনীদের মুখের মত জবাব দাও' শীর্ষক অন্য এক প্রচারপত্রে বলা হয়েছে—'কলকাতার বীর মজদুর, ছাত্র, জনগণ এবং মা-বোনেরা! বন্দীদের অনশনের আজ নবম দিন! এই সমস্ত বীরেরা খুনী সংগ্রেসী সরকারের জেলখানা গুলিতে ন' দিন অনশন করে আছেন। তাঁরা ক্রমশ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছেন। তবুও তাঁরা ফ্যাসিস্ট নির্যাতনের সামনে মাথা নত করতে রাজি নন। এই সমস্ত বীরেরা আমাদের জীবনমনের উন্নতির এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর নেতা, আমরা আমাদের এই বীর নেতাদের জীবন নিয়ে বিধান রায়কে ছেলেখেলা করতে দেবো না। এটা অসহ্য।

তাদের দাবির সমর্থনে কলকাতায় বীরাঙ্গনা মা-বোনেরা গত ২৭শে এপ্রিল রাস্তায় নামেন এবং সাথে সাথেই কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ তাঁদের ওপর গুলি বর্ষণ করে। চারজন মহিলা এবং দুজন সাধারণ নাগরিকের মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকে। এই গুলিবর্ষণ কলকাতার মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণার জন্ম দেয়। তাঁদের হৃদয় ঘৃণার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তাঁরা হাতের কাছে যা পান, তাই নিয়েই শয়তান পুলিশ, আর কংগ্রেস সেবাদলের গুণ্ডাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এইরকমভাবে কলকাতার ছাত্র এবং জনগণ খুনের জবাব

দিতে শুরু করেছেন। জনগণের এইরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিরোধের মুখোমুখি পড়ে বিধান রায়ের পা-চাটা এই সমস্ত ঘেয়ো কুত্তাগুলি মেডিকেল কলেজ কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়ে, এবং সেখান থেকে ২৮ তারিখে (এপ্রিল—অনুবাদক) কলেজের ছাত্র এবং পথচারীদের ওপর অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ করতে থাকে। সমগ্র বউবাজার, কলেজ স্ট্রীট এলাকা হাজার হাজার পুলিশ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়। এতে কিন্তু জনগণের প্রতিরোধ আরও মজবুত, আরও শক্তিশালী হয়েছে। হাজার হাজার নির্যাতিত মানুষ পুলিশকে আক্রমণ করছেন, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তুলছেন, সরকারি বাস-ট্রামে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন।

এই জঘন্য খুনের জবাব এইরকমভাবেই দিতে হবে। একমাত্র এই পথেই খুনী সরকারকে অচল করে দেওয়া যায়। কলকাতার বীর মজুরেরা এই সংগ্রামে এগিয়ে এসেছেন। শ্রমিকভাইরা তাঁদের প্রিয় নেতা কমরেড ধীরেন মজুমদারকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। ন্যাশনাল-কার্বনের শ্রমিকরা একজন ছাত্রকে সেখান থেকে ছিনিয়ে এনেছেন।

গতকাল কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হাজার হাজার শ্রমিক খুনী বিধান-মন্ত্রিসভার ধ্বংসের দাবিতে এবং কংগ্রেসী পুঁজিপতিদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে হরতাল পালন করেন। এই দাবি আদায়ের জন্য আমাদের হাতের কাছে যা মজুত আছে, সেই শক্তি নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কংগ্রেসী পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। গতকালের সংগ্রামকে আজ সর্বত্র ছড়িয়ে দিন। পুলিশ আক্রমণ করার আগেই, কংগ্রেসীদের এই দালাল খুনী কসাইগুলিকে আক্রমণ করুন। প্রত্যেকটা কলে-কারখানায়-স্কুলে ধর্মঘট সংগঠিত করুন! ম্যানেজারদের ঘেরাও করুন! প্রত্যেকটা রাস্তায় মিছিল করুন!'

কলকাতায় ২৭শে এপ্রিল মহিলা মিছিলে গুলি চালানোর ওপর কমিউনিস্ট পার্টি 'মা-বোনেদের হত্যার বদলা নাও' শীর্ষক এক প্রচারপত্রে বলেছে—

'মা-বোনেদের হত্যার বদলা নাও।
শ্রমিক-হত্যার মুখের মত জবাব দাও!
খুনী কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করো!
শয়তান মন্ত্রীদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো!'

সমগ্র প্রচারপত্রটি এইরকম—

'গতকাল কলকাতার রাস্তায় কংগ্রেস সরকার মহিলাদের খুন করেছে। তারা কিশোর, ছাত্র যুবক এবং শ্রমিকদেরও খুন করেছে। জনগণ, ছাত্র এবং মজদুর ভাইরা! কলকাতার মাটি তোমাদের মা-বোনেদের রক্তে আজ সিক্ত! সে রক্ত আহ্বান জানাচ্ছে—'নারী-হত্যার বদলা নাও!' শ্রমিক ভাইরা! আপনাদের রক্ত-ঘামে, আপনাদেরই হাতে তৈরি রাইফেল আজ আপনারই পাশের বাড়ির আপনারই ভাইএর মাথার খুলি চৌচির করে দিচ্ছে এই কলকাতার রাস্তায়!

আপনার ভাইদের সেই রক্তের বদলা নেবেন না? রক্তের বদলা নিন। খুনীদের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিন, হরতাল করুন। হাজার হাজার পেশীবহুল হাতের হাতুড়ি রক্তপিপাসু সরকারের মাথার ওপর বজ্রপাতের মতো আঘাত করুক! এই সংগ্রামের নেতারা নির্যাতনের বিরুদ্ধে আজ আটদিন জেলে অনশন করছেন। এইসমস্ত দাবির সমর্থনে কলকাতার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনগণ সভার পর সভা এবং মিছিলের পর মিছিল করে চলেছেন। আজ কয়েকদিন ধরেই তাঁরা এগুলি করছেন। শয়তান কংগ্রেস সরকার এই সংগ্রামের শুরু থেকে

এবং তার আগে থেকেই এঁদের খুন করার পরিকল্পনা করেছে। কংগ্রেসী সেবাদলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুণ্ডারা একটা গলির ভেতর থেকে সোডার বোতল, বোমা প্রভৃতি নিয়ে মহিলা শোভাযাত্রার ওপর একদিক থেকে আক্রমণ করতে থাকে, অন্যদিক থেকে এক লরি-ভর্তি সশস্ত্র পুলিশ তাঁদের গতিরোধ করে গুলি চালাতে শুরু করে। নারী-পুরুষ-শিশু-নির্বিশেষে তারা গুলি চালায়। এই বেপরোয়া গুলি চালানোর ফলে সাথে সাথেই তিনজন মহিলা প্রাণ হারান। পরে আরও পাঁচজন নারী ও পুরুষ মারা যান। অসংখ্য মানুষ গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালগুলিতে মৃত্যুর দিন গুণছেন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই কংগ্রেস সরকার মানুষকে না খেতে দিয়ে হত্যা করছে, তাঁদের বেঁচে থাকার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। নারী-রক্তে হাত রাঙিয়ে হলেও এরা নিজেদের ঘৃণ্য অস্তিত্বটাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এই সরকারের প্রধান ঠিক এই সময়েই গ্রেট ব্রিটেনে মহারাজের পা চাটার জন্য গেছে, সেই সময়েই তার খুনীর দল, ঠ্যাঙাড়েবাহিনী সমগ্র দেশজুড়ে গরীব মজুর, ছাত্র যুবক এবং নারী হত্যা করে চলেছে। জেগে উঠুন, বিশাল অভ্যুত্থানে ফেটে পড়ে এখনই এই বিপদকে প্রতিহত করুন। মানুষের মুখোশধারী এই নর-পশুদের বর্বরতাকে প্রত্যাঘাত করুন। আপনাদের মা-বোনেদের রক্তের পদলা নিন। কলে কারখানায় ধর্মঘট করুন, শোভাযাত্রা করে ১৪৪ ধারা ভেঙে ফেলুন! রাস্তায় রাস্তায় ব্যূহ এবং বাধা সৃষ্টি করে পুলিশ-মিলিটারির যাতায়াতের পথ অবরোধ করুন! সরকারি বাস এবং ব্রিটিশ মালিকানাধীন ট্রামগুলিতে আগুন ধরান! গোটা কলকাতা এই আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকুক!'

আর একটা সার্কুলারে বলা হয়েছে : 'রাজবন্দীদের অনশনের সমর্থনে বিশাল অভ্যুত্থান সংগঠিত করুন', 'বন্দীদের ছিনিয়ে আনার জন্য জেল-গেটে ঝড়ের মত আছড়ে পড়ুন।' এই সার্কুলারে পটারি-শ্রমিকদের বেআইনি কার্যকলাপ অর্থাৎ তাদের এক সদ্যমুক্ত কমরেডকে পুনর্বহালের জন্য ম্যানেজার ঘেরাও প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'এই শ্রমিকরা হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই নিয়েই বিশাল পুলিশবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মালিকের প্রায় ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি ধ্বংস করেন। জেলে জেলে, কলে কারখানায়, রাস্তায়, মাঠে-ঘাটে এই নতুন উচ্চস্তরের প্রতিরোধের ফলে খুনী কংগ্রেসী সরকারের মৃত্যুঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। সমস্ত কলকারখানায় শ্রমিক, মাঠের কৃষক, স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং অফিস কাছারির কর্মচারী কমরেডদের কাছে পার্টির ডাক : 'ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কারখানায় কারখানায়, শ্রমিক-বস্তিতে যান। ...এই প্রতিরোধকে আরও উচ্চস্তরে তুলুন। মজুর, কৃষাণ, ছাত্র, যুবক এবং মা-বোনেদের বলুন : এই ফ্যাসিস্ট পুঁজিবাদের সেবাদাস কংগ্রেস সরকার আপনাদের মজুরি কমিয়ে দিয়েছে, শ্রমিক-ছাঁটাই করেছে, আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করত যারা সেই সমস্ত সাথীদের জেলে পুরেছে, এমনকি জেলের মধ্যেও আপনাদের শ্রেণি-ভাইদের এবং নেতাদের গুলি করে মারছে। জেলের মধ্যে এইসমস্ত বন্দী কমরেডদের ওপর আক্রমণ, সরাসরি আপনাদের জীবন এবং রুটি রোজগারের উপর আক্রমণ। আপনাদের কারখানা দখল এবং রাষ্ট্র-যন্ত্র দখলের ওপর আক্রমণ। এই কংগ্রেস সরকার শ্রমিক শ্রেণির শত্রু। একে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে।

'মজদুর ভাইসব! ধর্মঘট করুন! সভা-শোভাযাত্রা করুন। পটারির শ্রমিকদের মত রাস্তায় নেমে সংগ্রাম করুন। এ্যালানবেরির শ্রমিকদের মতো কারখানা দখল করুন! শ্রীরামপুর এবং

দক্ষিণ কলকাতার মানুষের মতো কংগ্রেসী সংগঠনগুলির মূলে আক্রমণ করুন! ঝড়ের গতিতে জেল-গেটে আছড়ে পড়ুন! আপনাদের নেতাদের ছিনিয়ে নিন! এই সরকারকে ধ্বংস করুন! পুলিশ-থানা ঘেরাও করুন। সাব-জেল এবং জেলা-জেলাগুলির গেট ভেঙে সব বন্দীদের মুক্ত করে দিন। বিরোধিতা করলেই বিনা বিচারে আটকে রাখার সরকারি ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলুন! বন্দী বীরদের মুক্তি নিশ্চিত করুন। কংগ্রেসী এম. এল. এ. এবং নেতাদের ঘেরাও করুন! পুলিশ অফিসারদের বাংলোগুলি আক্রমণ করে তাদের জীবন বিপন্ন করে তুলুন। জীবন সম্পর্কে তাদের উচিত শিক্ষা দিন।

'আমাদের শহীদদের রক্ত বদলা চাইছে। আমাদের বন্দী বীরদের ক্ষতবিক্ষত হৃদয় বিচার চাইছে। অভূতপূর্ব জঙ্গী সংগ্রামের নজির সৃষ্টি করে এগিয়ে যান। কংগ্রেসী-বাস্তিলগুলিকে ঝটিকাঘাতে প্রকম্পিত করে তোলার পথে অগ্রসর হ'ন।'

নিরাপত্তা আইনে ধৃত বন্দীদের দ্বিতীয় দফা অনশন প্রসঙ্গে তাঁরা আরও একটি প্রচারপত্র বিলি করেন। তার শিরোনাম :

'খুনী-মন্ত্রী এবং সরকারি অফিসারদের ওপর মৃত্যু পরওয়ানা জারি করুন।'

"নিরস্ত্র রাজবন্দীদের তিলে তিলে মেরে ফেলার চক্রান্তকে ধ্বংস করার জন্য কলে কারখানায় ধর্মঘট করুন, প্রত্যেকটা রাস্তা মিছিলে মিছিলে উদ্বেল করে তুলুন। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী নেতাদের শাস্তি দিন।"

'এইসমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারা খুন করছেন?' এ প্রশ্ন তুলে প্রচারপত্রে বলা হয়েছে: 'বিধান রায় তাদের খুন করছে। আর. গুপ্ত (স্বরাষ্ট্র সচিব) তাদের হত্যাকারী। সি হায়দার ডেপুটি কমিশনার এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা তাদের খুন করছে। বিধান-নলিনী-দত্ত-মজুমদারের মন্ত্রীসভা এই খুনের আয়োজন সম্পন্ন করেছে। কংগ্রেসী নেতারা, কালোবাজারীদের দল, আর পুঁজিবাদী কংগ্রেস দলের তোষামোদকারীরা খুন করার জন্য যুক্তি সরবরাহ করছে এবং খুনের বাতাবরণ তৈরি করেছে।' প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ভাষায় এতে এই বলে শেষ করা হয়েছে—

'শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং জনগণ! সমগ্র বাংলা জুড়ে এই খুনের বদলা নিন। খুনীদের খুঁজে ফাঁসিতে লটকান. এই মন্ত্রীসভা ধ্বংস করুন! হত্যাকারীদের বাঁচার কোনও অধিকার নেই। জনগণের উচিত তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলা। বিধান-নলিনী-দত্ত-মজুমদার এবং তার সহযোগীদের যেখানেই দেখবেন আক্রমণ করুন! শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র এবং জনগণ!' এই খুনীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করুন! ধর্মঘট ও মিছিল সংগঠিত করে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কংগ্রেসী নেতাদের মারাত্মকভাবে আক্রমণ করুন! কালোবাজারীদের ঘাঁটি কংগ্রেসী অফিস-গুলিতে আগুন ধরিয়ে দিন। মন্ত্রীদের বাড়িগুলি আক্রমণ করে তছনছ করে দিন।

রক্ত ঝরিয়ে ঝরিয়ে রক্তহীনতায় মুমূর্ষু আপনার বন্দীভাইদের ছিনিয়ে আনুন! আপনার কর্মস্থল যেখানেই হোক না কেন, আপনার পেশা যাই হোক না কেন, কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। সভা, শোভাযাত্রা করুন। এই খুনীদের আক্রমণ করুন। বীর শহীদদের দৃঢ় মনোবল এবং রক্তের স্মৃতি আপনাদের সাহস এবং উদ্দীপনা দিক! মৃত্যুকে অস্বীকার করে খুনীদের শাস্তি দিন।' এই প্রসঙ্গে 'নিরাপত্তা আইনে ধৃত বন্দীদের হত্যার বদলা চাই! মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে বন্দীদের ছিনিয়ে আনুন, নামক আরও একটা সচিত্র প্রচার-পুস্তিকার শেষে বলা হয়েছে—

'জনগণ! খুনীদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসুন! খুনীদের থাবা থেকে বন্দীদের মুক্ত করুন। আপনি যেখানেই থাকুন, এই খুনীদের বিরুদ্ধে মিছিল করে প্রতিবাদ করুন। প্রেসিডেন্সি জেলে ১৫০ জন বন্দী এক হাজার রাইফেলের বিরুদ্ধে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত লড়ে গেছেন। তাঁদের এই অসীম সাহস আপনাদের মনোবল দিক! এই সমস্ত খুনী মন্ত্রী এবং অফিসারদের ওপরে মৃত্যু-পরওয়ানা জারি করুন। শ্রমিক ভাইসব! কারাগারগুলিতে অনশনরত আপনাদের সংগ্রামী সাথীদের মুক্ত করুন! ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা এবং শোভাযাত্রা করুন। পটারির শ্রমিকদের মতো মালিক আর তার দালাল পুলিশদের ওপর আক্রমণ করুন!

এ্যালানবেরির শ্রমিকদের মতো কারখানা দখল করে লাল ঝাণ্ডা ওঠান। শ্রীরামপুরের শ্রমিকদের মতো, দক্ষিণ কলকাতার নাগরিকদের মতো কংগ্রেস অফিস ধ্বংস করুন। মাহেশের শ্রমিকদের মতো পুলিশফাঁড়ি এবং জেল আক্রমণ করে আপনাদের বন্দী-ভাই এবং অন্যান্য বন্দীদের মুক্ত করুন।

'কৃষক ভাই সব! থানা, সাব-জেল এবং জেলা কারাগারগুলিতে আক্রমণ করুন। জমিদারের, জোতদারের এবং কালোবাজারীদের গোলার শস্য লুট করুন এবং সেগুলি বুভুক্ষু মানুষের মধ্যে বন্টন করুন। জেল গেট ভেঙে আপনার সংগ্রামের সাথীদের ছিনিয়ে আনুন!

'ছাত্র এবং মহিলারা ১৪৪ ধারা ভেঙে আইন অমান্য করুন! কংগ্রেসী নেতা এবং অফিসারদের আক্রমণ করার সাথে সাথে নিম্ন শ্রেণির পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর লোকদের স্বপক্ষে টানার চেষ্টা করুন। বন্দীদের জীবন রক্ষার জন্য আপনারা বহুবার মৃত্যুকে অস্বীকার করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আবার একবার এগিয়ে আসুন!'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই সমস্ত অনশনগুলিকে হিংসা এবং ঘৃণা জাগানোর প্রচার-অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এ রকম অসংখ্য প্রচারপত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। এ রকম আরো অনেক আছে। তাদের মধ্যে থেকে এবং কমিউনিস্টদের সংবাদপত্র থেকে একটির সংক্ষিপ্তসার নিচে তুলে দেওয়া হচ্ছে : 'হরতাল পালন করুন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, শয়তানগুলিকে হুমকি দিয়ে বন্দীদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করুন।

শ্রমিক শ্রেণি এগিয়ে এসে নিজেদের এই বীর সন্তানদের পাশে দাঁড়ান। প্রত্যেক কারখানায় হরতাল করুন। বন্দীদের দাবি মেনে নিতে এই পশু সরকারকে বাধ্য করুন। বন্দীদের সমর্থনে কোনো আন্দোলন যাতে সংগঠিত না হয় সেই জন্য এই সরকার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। এ আইন ভেঙে ফেলুন। মিছিল, মিটিং করুন। জেল গেটগুলি আক্রমণ করুন। সমস্ত ভয় ভীতি জয় করে এই সরকারের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসুন। বন্দীদের ছিনিয়ে আনুন!

'কারাগারের অন্ধকারে দিনের পর দিন রক্ত ঝরিয়ে আপনাদের সংগ্রামের সাথী ভাইরা অনশনে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছেন। এই সরকারের হাত থেকে তাদের জোর করে ছিনিয়ে আনুন।

'এই সরকার শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের নেতাদের বিনা বিচারে আটক এখনও বন্ধ করেনি... তাদের সাধারণ সশস্ত্র শত্রুর মতো হত্যা করতে বদ্ধপরিকর। প্রেসিডেন্সি জেলে একহাজার পুলিশ এবং রাইফেলের বিরুদ্ধে ১২০ জন বন্দী অসীম সাহসে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত লড়াই করেছেন। কংগ্রেসী বর্বরতা অতীতের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে আজ সভ্যতার সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে।'

'ট্রামের মজদুর ভাইসব। মিটিং, মিছিল, হরতাল এবং খুনী মন্ত্রী আর অফিসারদের ওপর আক্রমণের মাধ্যমেই আপনাদের সমস্ত ঘৃণা আর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। বন্দী মুক্তির আন্দোলনকে আরও জোরদার করুন। 'কংগ্রেস সরকার হলো শ্রমিক শ্রেণির শত্রু। এদের টিকে থাকার কোন অধিকার নেই। একে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। ...পটারি শ্রমিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। এ্যালানবেরির শ্রমিকদের মতো কারখানা দখল করে লাল ঝাণ্ডা তুলে দিন। ...শ্রীরামপুরের শ্রমিকদের মতো কংগ্রেসী নেতাদের বাড়ী আক্রমণ করুন। আই. এন. টি. ইউ. সি. অফিস দখল করুন। কংগ্রেসী সরকারের রক্ষিতা সংবাদপত্র অফিসগুলিও আক্রমণ করুন। ...রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই আক্রমণগুলি সংগঠিত করুন। গ্রাম থেকে গ্রামে প্রচাব অভিযান চালান। গরীব কৃষকদের জাগিয়ে তুলুন; তাঁদের বলুন 'এই সরকার আপনাদের জমি, রুটি সব কেড়ে নিচ্ছে, এমন কি আপনাদের বেঁচে থাকার মজুরি থেকেও বঞ্চিত করছে। আপনাদের ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোনদের জেলে পুরেছে এবং সেখানেও তাঁদের হত্যা করছে। আপনাদের কমরেডদের মুক্ত করে আনার জন্য কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করুন। জেল ও থানাগুলি ঘেরাও করুন। বন্দীদের মুক্ত করুন। জোতদার জমিদারদের গোলা থেকে শস্য কেড়ে নিয়ে গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিন। জমির ওপর দখল রেখে সেই জমি চাষ করুন।'

'কংগ্রেসী কারাগারে মহিলা বন্দীদের উলঙ্গ করে অপমান করা হচ্ছে'—এই শিরোনামে এক প্রচারপত্রে বলা হয়েছে : 'অনশনরত মৃতপ্রায় মহিলা বন্দীদের চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে পুলিশ তাদের সেলে বন্দী করে। কনষ্টেবলরা তাদের মাটিতে শুইয়ে মেঝের ওপর চেপে ধরে থাকে। ... আর. গুপ্তের নেতৃত্বে হায়দারের বাহিনী অনশনকারী মহিলা বন্দীদের ব্লকে জোর করে প্রবেশ করে এবং হুমকি দেয় যে তারা যদি অনশন প্রত্যাহার না করে, তাদের জঘন্য ভাবে লাঞ্ছনা করা হবে। মহিলাদের সাথে তারা জঘন্য ক্রিমিনালদের মতো আচরণ করে এবং লাঞ্ছনা করে। পুলিশ এবং জেল অফিসাররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সস্তায় মজা লুটতে থাকে। সাধারণ জেল এবং পুলিশ কর্মচারীরা এ কাজ করতে অস্বীকার করায় বিশেষ গুণ্ডাবাহিনী আনা হয়। কংগ্রেসী অত্যাচার বৃটিশ আমলের অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে গেছে। দিল্লী থেকে নেহেরু সরকার বন্দীদের কোন দাবি না মানার নির্দেশ পাঠিয়েছে, হুমকি আর বল প্রয়োগ করে বন্দীদের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে।'

সমগ্র প্রচারপত্রটাই এইরকম অত্যাচারের গল্পে ভর্তি। যে ধরনের ঘটনার কথা বলা হয়েছে সে রকম ঘটনা আদৌ ঘটেনি। দিল্লীর নির্দেশের গল্প একেবারে কল্পনাপ্রসূত। কমিউনিস্টরা মহিলাদের ওপর এই অত্যাচারের গল্প ফেঁদে শ্রমিক শ্রেণিকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করছে। তার প্রমাণ : 'মজদুর ভাইসব! আপনাদের বীর ভাইরা কারাগারের অন্ধকারে মৃত্যু-পথযাত্রী। আপনাদের হাতুড়ি তুলে এই নির্যাতনকারীদের কোমরে আঘাত করুন। বন্দীদের জীবন রক্ষা করুন। এই সংগ্রামে আগুয়ান হোন। একটা কারখানায় ধর্মঘট করেই পার্শ্ববর্তী কারখানার মালিক এবং দালালদের বাড়ি আক্রমণ করুন। ১৪৪ ধারা অমান্য করে নিজ নিজ এলাকায় জমায়েত করুন। শোভাযাত্রা নিয়ে আই এন টি ইউ সি অফিস আক্রমণ করুন। সেখানে আগুন ধরিয়ে দিন। আরও ব্যাপক মানুষকে সামিল করে শ্রীরামপুর ও ব্যারাকপুরের শ্রমিকদের নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলুন। এলাকার জেল এবং পুলিশ ফাঁড়িগুলি

আক্রমণ করুন। কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং নেতাদের বাড়িগুলি আক্রমণ করুন। শহরে শহরে কংগ্রেসী অফিসে আগুন ধরিয়ে দিন। শোভাযাত্রা করে সেক্রেটারিয়েট এবং রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে যাত্রা করুন। জেল গেটগুলি আক্রমণ করুন। সরকারকে বন্দীদের দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য করুন। আপনাদের মা-বোনেদের ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছে তার যোগ্য জবাব দিন। বন্দী হত্যার বদলা নিন।

অধ্যায় তিন

কমিউনিস্ট হিংস্রতার কিছু নমুনা

কেবলমাত্র পরিকল্পনা করেই বা প্রচার করেই কমিউনিস্টেরা ক্ষান্ত থাকছে না। ঘৃণা ও হিংস্রতার এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য তারা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টাও করছে। হায়দ্রাবাদে সশস্ত্র কমিউনিস্টদের সাথে পুলিশ এবং মিলিটারির বেশ কয়েকটা সংঘর্ষও ঘটে গেছে। সামান্যতম অনুশোচনাগ্রস্ত না হয়েই কমিউনিস্টরা এই সংঘর্ষগুলি অত্যন্ত নৃশংসভাবে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চালিয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর অধিগ্রহণের পর তারা গ্রাম্য অফিসার ৪০০ জনকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। এটা হলো ১৯৪৯ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত হিসাব। স্বামী এবং পুত্রদের, তাদের স্ত্রী কিম্বা মায়ের সামনে বা কোল থেকে টেনে এনে খুন করা হয়েছে। মহিলাদের ওপর তাদের মানুষগুলির হদিশ জানানোর জন্য অত্যাচার করা হয়েছে, বাড়িগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ গুণ্ডামি করে তারা জনগণকে নিজেদের প্রভাবে রাখার চেষ্টা করছে।

কলকাতা এবং অন্যান্য স্থানেও তারা নৃশংস হিংস্রপথ গ্রহণ করেছে। তাদের অনেক অনেক গুণ্ডামির ঘটনার মধ্যে মাত্র দুটোর উদাহরণ এখানে তুলে দেওয়া হল। প্রথমটা হল ১৯৪৯ সালের ১৬ই জুন তারিখে টালিগঞ্জে অবস্থিত এ্যালনবেরি কারখানার ঘটনা। কারখানার মালিক বেশ কিছুদিন ধরেই ওই কারখানা বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছিলেন, কারণ কারখানাটা লোকসানে চলছিল। এর উপর শ্রমিকরা অনবরত মাইনে এবং ভাতা বাড়ানোর জন্য জিদ ধরে আসছে। ১৯৪৯ সালের জুন মাসের ১৬ তারিখে মালিক লক-আউট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আগে থেকেই আশংকা ছিল শ্রমিকরা কারখানা দখল করে নিতে পারে। সেইজন্য মালিক কলকাতা পুলিশের সাহায্য চান। লকআউট ঘোষণার জন্য ১৫ তারিখ এস. সি. চ্যাটার্জি নামে এক নিরাপত্তা অফিসার নিয়োগ করা হয়।

যে-করেই হোক নিরাপত্তা অফিসারের উপস্থিতি শ্রমিকরা টের পেয়ে যান। এক হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৫০০ জনেরও বেশি কমিউনিস্ট প্রভাবিত শ্রমিক মধ্যরাত্রে কারখানায় অনুপ্রবেশ করেন। ১৬ তারিখ পুলিশ যখন ঘটনাস্থলে আসে, তারা লরি, ট্রাক এবং অন্যান্য যানবাহন দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে। কী ঘটে দেখার জন্য পুলিশ অপেক্ষা করতে থাকে। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ কারখানা কর্তৃপক্ষ টালিগঞ্জ থানায় ফোন করে জানান তাঁদের নিরাপত্তা অফিসারকে পাওয়া যাচ্ছে না, পুলিশ তদন্তে নামে। ১৭ই জুন পুলিশ কারখানায় ঢোকে, কিন্তু দরওয়ান ছাড়া

আর কোনও শ্রমিককে দেখতে পায় না। একটা ট্রাকের নিচে মাটির তলা থেকে মিঃ ট্যাটার্জির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। খুব ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। একজন শ্রমিকের দেওয়া সেই কবর থেকে তাঁকে তুলে পোস্ট-মর্টেমে পাঠানো হয়। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে দেখা যায় অসংখ্য ক্ষত। এটা পরিষ্কার যে নৃশংসভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি একই সাথে একই সময়ে কমিউনিস্টরা দমদম বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত গানশেল কারখানা, জেসপ কারখানা, দমদম পুলিশ ফাঁড়ি এবং পশ্চিমবাংলার বসিরহাট থানা আক্রমণ করে। এইসব আক্রমণে বোমা, স্টেনগান, রিভলভার প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। আক্রমণকারীরা ট্যাক্সিতে এবং গাড়িতে আসে। বিমানবন্দরে একজন পুলিশ আহত হয়। বেয়নেট সমেত সাতটা রাইফেল ছিনতাই হয়। বোমা পটকা ছোঁড়া হয়। মাটিতে রাখা একটি বিমানেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সোনা মজুত ভল্টের পাহারারত কনস্টেবল আহত হয়। পরে বিমানবন্দরের অফিসারেরা ১৫টি বোমা সহ একটা থলে উদ্ধার করেন, আক্রমণকারীরা এটা ফেলে গিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে নৃশংস ঘটনা ঘটে 'জেসপ' নামে একটি অন্যতম বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায়। এখানে তারা কর্তব্যরত অফিসারদের আক্রমণ করে। একজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ফোরম্যানকে মারাত্মকভাবে জখম করে। তিনজন ইউরোপীয় অফিসারকে জ্বলন্ত চুল্লি (ফার্নেস)-তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে পরে তাদের পোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এই সমস্ত ঘটনা একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ (আর. সি. পি. আই. পান্নালাল দাশগুপ্ত গোষ্ঠী—অনুবাদক) এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে।

যেখানেই তারা বুঝিয়ে সুঝিয়ে লোকজনকে নিজেদের পক্ষে টানতে ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানেই তারা আতঙ্ক সৃষ্টির পথ নিয়েছে। এ ধরনের ঘটনার পরিমাণ এত বহুল যে সব লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। পরিশিষ্টে কয়েকটি তুলে ধরা হয়েছে।"

অধ্যায় চার

জনগণের প্রতিরোধ

খুবই সম্প্রতি ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় যান এবং ময়দানে একটি জনসভায় ভাষণ দেন। কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী দল এই মিটিং বয়কট করার আহ্বান জানায়। যাইহোক, প্রায় দশলক্ষ মানুষ প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ শুনতে আসেন। এই সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত জোর দিয়ে জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, তাঁরা যেন বিশৃংখলা সৃষ্টিকে একদম বরদাস্ত না করেন। আইনভঙ্গকারীদের সম্পর্কে ভীত না হওয়ার জন্য তিনি আবেদন করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। যখন প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন, জনগণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির জন্য সমাবেশে একটি বোমা ফাটানো হয়। জনগণ মোটেই আতংকিত না হয়ে, শান্ত থেকে এবং সুশৃঙ্খলভাবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনে যান। হিংসার রাস্তায় আতঙ্ক সৃষ্টির বিরুদ্ধে জনগণের এই মেজাজ ষড়যন্ত্রীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। ময়দানে যা ঘটেছে তার মর্ম হলো হিংসার পথের পথিক কমিউনিস্টদের প্রতি

জনগণের বীতরাগ এবং প্রতিরোধ। ১৯৪৮ সালের ১৮ই জুন, উত্তর কলকাতায় কমিউনিস্টদের একটা মিছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার একজন সাব-ইনস্‌পেক্টরের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, স্থানীয় জনসাধারণ দুষ্কৃতকারীদের তাড়া করেন।

১৯৪৯ সালের ১৯শে জুন, পুলিশ এবং দমকলবাহিনীর সাথে এক বিশাল জনতা সহযোগিতা করে ট্রাম কোম্পানিকে একটা বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

... ১৯৪৯ সালের ১১ই আগস্ট পশ্চিমবাংলার বালুরহাটি স্টেশনে জনগণ একদল কমিউনিস্টকে ডাকাত বলে আটক করেন এবং পরে পুলিশের হাতে দেন। পুলিশকে তাদের উপস্থিতি জানানো হলে পুলিশ আসে, এবং তারা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে, পুলিশও প্রত্যুত্তরে রাইফেল ও রিভলভার থেকে গুলি ছোঁড়ে। সামনাসামনি এ লড়াইয়ে দুজন দুষ্কৃতকারী ধরা পড়ে। একজনকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর দুপুর নাগাদ স্টেনগান সহ একদল সশস্ত্র কমিউনিস্ট হাওড়ার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখায় ডাকাতির পর যখন চলে যাচ্ছিল, স্থানীয় মানুষ তাদের তাড়া করে দুজনকে ধরে ফেলে। এই দলের নেতা দমদম মামলার আসামী, আত্মগোপনকারী এক ব্যক্তি। সেও ধরা পড়ে। তার কাছ থেকে একটা গুলিভরা পিস্তল এবং কিছু টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। আরও তিনজনকে পুলিশ এবং জনাতা তাড়া করে ধরে ফেলে। (নেহরু তাঁর ভাষণে এটা কমিউনিস্ট পার্টির ঘাড়ে চাপালেও আসলে এটা আর. সি. পি. আই.-এর কাজ, ব্যাঙ্ক লুঠের পর ধরা পড়ে যান পান্নালাল দাশগুপ্ত—অনুবাদক)।

... ২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে কলকাতার স্টুডেন্টস্‌ হলে এক সভার পর ছাত্র ফেডারেশনের ২০০ জন কর্মী একটি মিছিল বার করে। বউবাজার স্ট্রিট ধরে এগোতে থাকে। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে পৌঁছলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সেই সময় তারা ছোট ছোট দলে পুলিশকে লক্ষ করে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকলে একদল মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে মিছিলকারীদের মোকাবিলা করে। জনগণের বক্তব্য—এদের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকর্মের ফলে পুলিশ গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হবে। যার ফল সাধারণ মানুষের ক্ষতি আর হয়রানি। জনতা এবং ছাত্রদের মধ্যে বচসা উত্তেজনাকর অবস্থায় পৌঁছলে পুলিশ ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

১৯৪৯ সালের ২৯শে মে, কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠন, ছাত্রফেডারেশনের কর্মীরা কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে সাদা পোযাকের এক গোয়েন্দা পুলিশকে আক্রমণ করার চেষ্টা করলে জনগণ পুলিশটিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১৮ জন দাঙ্গাবাজকে গ্রেপ্তার করে। জনগণের মধ্যে আটজন সোডাবোতল, ইট, বোমা, এ্যাসিড বাল্ব প্রভৃতির ঘায়ে গুরুতরভাবে জখম হন। বেশ ভালো সংখ্যায় জমায়েত হয়ে জনগণ কমিউনিস্ট বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন এবং সন্দেহভাজন কমিউনিস্টদের আক্রমণ করেন।...

অধ্যায় পাঁচ

সিদ্ধান্ত

বর্ণিত ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে এটা প্রমাণ করে এবং আমরা আশাও করতে পারি যে, কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জনগণ একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলছেন এবং প্রতিরোধে

এগিয়ে আসছেন। কোন দলকে তাদের মত এবং পথ সম্পর্কে প্রচার করতে দিতে, কিংবা কেউ যদি মনে করেন তাঁরা এই সরকারের পরিবর্তে অন্য ধরনের সরকার দ্বারা সমস্যার সমাধান চান, তাতেও সরকারের কোন আপত্তি নেই। কোনরকম রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ধারণা প্রচারে বাধা দেবার ইচ্ছাও সরকারের নেই। ভারত সরকার কোন মত ও পথের শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক প্রচার রোধ করতে চান না। বরং তাঁরা ব্যাপক সুযোগ এবং সুপ্রশস্ত পথ খোলাই রেখেছেন। কিন্তু কোনমতেই কোন দলের বা অংশের (তা তার রঙ যাই হোক না কেন) অন্তর্ঘাতী এবং হিংস্র কার্যকলাপকে সরকার বরদাস্ত করতে পারে না।

যে কমিউনিস্ট পার্টি ক্লান্তিহীনভাবে 'নাগরিক অধিকার' এবং 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' ধ্বংস করে দিচ্ছে বলে সরকারের সমালোচনা করছে, তারাই অন্যদিকে পোস্টারে, প্রচারপত্রে, দেওয়াল লিখনেও মুখে খুন, অন্তর্ঘাত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলার অধিকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং এগুলির জন্য ওকালতি করছে। তারা, তাদের নিজেদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের এবং জনগণের উচিত এবং ন্যায্য কাজ করার অধিকারকেই স্বীকার করে না। এরকম একটা অবস্থা কোনো ক্ষমতাসীন দলই চলতে দিতে পারে না। নিজেদের এবং জনগণের ধনপ্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তিশালী হওয়া ব্যতীত কোন উপায় নেই। হয় নিজেদের ধ্বংস হতে দেওয়ার অধিকারকে স্বীকার করে নিতে হয়, না হয় এগুলি সম্পর্কে নির্বিকার থাকাটা বন্ধ করতে হয়। সুতরাং নির্বিকার থাকা যায় না। সরকারের যা আছে, তাই নিয়েই তারা এই বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর, এবং এ ব্যাপারে আমাদের সরকার নিশ্চিত যে জনগণের সমস্ত অংশ থেকে ক্রমবর্দ্ধমান সহযোগিতা এবং সমর্থন সে পাবে।

আরও উন্নত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলার জন্য আইনের রাজত্ব ফিরিয়ে আনতেই হবে।

পরিশিষ্ট

১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত ঘটে যাওয়া কমিউনিস্ট দুষ্কর্মের একটা তালিকা পেশ করা হলো :

...

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ

স্থান : সন্তোষপুর, খানা জগৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া
সময় : ৬.৪.৪৯
বিবরণ : মিশ্রী মান্না নামে ডোমজুড়ের সন্তোষপুর গ্রামের জনৈক গ্রামবাসী গত কৃষক আন্দোলনের সময় পুলিশকে সাহায্য করার অপরাধে ৬ এপ্রিল তারিখে রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে একদল কমিউনিস্টের হাতে আক্রান্ত হয়। তাকে কুপিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে তার দেহ রেল লাইনে ফেলে রাখা হয়।

স্থান : লয়ালগঞ্জ, থানা কাকদ্বীপ, জেলা ২৪ পরগণা
সময় : ২-৩.৬.৪৯
বিবরণ : ১৯৪৯ সালের ২রা/৩রা জুন কৃষক সমিতির শতাধিক ব্যক্তি লাঠি, বল্লম প্রভৃতি

মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দ্বারিকনাথ সামন্তের কাছারীবাড়ি এবং দেবেন জানার বাড়ি চড়াও হয়। দেবেন জানা এবং তার স্ত্রী পুঁটি জানাকে টেনে বার করে আনা হয়, দরওয়ান কোনরকমে পালিয়ে যেতে পারে। পরে আক্রমণকারীরা পুঁটি জানা এবং মন্মথ জানাকে ঘরে ফিরে আসতে দেয়। দেবেন জানার মাকে হত্যা করা হয়। তার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

স্থান : ডামরা, থানা মহম্মদ বাজার, জেলা বীরভূম

সময় : ২১.৬.৪৯

বিবরণ : বীরভূম জেলার মহম্মদ বাজার থানার ডামরা গ্রামে কিছু কমিউনিস্ট সাঁওতালদের নিয়ে একটা সভা করে। তাতে বড়লোকদের খুন করতে এবং সম্পত্তি লুট করতে তাদের উত্তেজিত করা হতে থাকে। সভায় উপস্থিত এক ধনী কৃষক এর প্রতিবাদ করলে কমিউনিস্টরা তাকে ধাওয়া করে এবং খুন করে।

স্থান : নামাজাবা, থানা গড়বেতা, জিলা মেদিনীপুর

সময় : ২৪.৭.৪৯

বিবরণ : ১৯৪৯ সালের ২৪শে জুলাই মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার নামাজাদা গ্রামের আবেন খানের বাড়িতে বিশজন কমিউনিস্টের একটা দল ডাকাতি করে। সে, তার ভাই হাবিব খান এবং তার স্ত্রী মারাত্মকভাবে জখম হয়। সমস্ত অস্থাবর মূল্যবান সম্পত্তি লুট করা হয়।

স্থান : শিবপুর, জেলা হাওড়া

সময় : ১২.৯.৪৯

বিবরণ : সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখ দুপুর ১২টা নাগাদ স্টেনগান, রিভলভার, বোমা, পিস্তল নিয়ে চারজন কমিউনিস্ট একটি ট্যাক্সির চালককে বাধ্য করে, তার ট্যাক্সিতে চড়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সামনে নামে এবং আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কর্মচারীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে। কাউন্টার থেকে টাকা লুঠ করে। ব্যাঙ্কে ঢোকার আগে তারা দরওয়ানকে কাবু করে তার অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সব নিয়ে চম্পট দেয়। (নেহরু একে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ বললেও, আসলে এটিও আর. সি. পি. আই. তথা পান্নালাল দাশগুপ্তের কাজ, তিনি ফেরার পথে ঐ দিনই গ্রেপ্তার হয়ে যান—অনুবাদক)

কলকাতা

স্থান : মধ্য কলকাতা

সময় : ১৮.১.৪৯

বিবরণ : কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একদল ছাত্র জনসাধারণকে উত্তেজিত করে। রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে। প্রায় আধ ডজন ট্রাম এবং সরকারি বাসে আগুন ধরায়। অনুগত ট্রাম কর্মচারীদের আক্রমণ করে। বোমা এবং অন্যান্য ক্ষেপণযোগ্য বস্তু দিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে।

স্থান : বিজ্ঞান কলেজের উল্টো দিকে সার্কুলার রোড

শেয়ালদহ স্টেশনের উল্টো দিকে আপার সার্কুলার রোড

আশুতোষ ভবনের সামনে, কলেজ স্ট্রীট

সময় : ২৮.৪.৪৯

বিবরণ : কমিউনিস্টরা বোমা, সোডার বোতল প্রভৃতি নিয়ে ট্রামে বাসে আগুন ধরিয়ে আবার

পরিবহণ ব্যবস্থা বানচাল করার চেষ্টা করে। বেশ কিছু যাত্রীকে তারা খতম করে।

স্থান : মিশন রো

সময় : ১২.৫.৪৯

বিবরণ : লিপটন কোম্পানির শ্রমিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে দুই দল শ্রমিকের বচসা শুরু হয়। তারা বোমা, সোডার বোতল প্রভৃতি নিয়ে আক্রমণ করে।

বেশ কিছু শ্রমিক আহত হয়। একটি লরিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্থান : বেঙ্গল পটারি

সময় : ৩.৬.৪৯

বিবরণ : কমিউনিস্টদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বেঙ্গল পটারির শ্রমিকরা অত্যন্ত বেআইনি ভাবে কারখানা চত্বর দখল করে নেয়। মেশিন পত্র ধ্বংস করে। গুদাম ভাঙচুর করে এবং অন্যান্য আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। অফিসারদের লাঞ্ছিত করতে থাকে। অফিসারদের উদ্ধারের জন্য পুলিশ বাহিনী গেলে তাদের ওপর ইট-পাথর-বোমা প্রভৃতি নিয়ে আক্রমণ করে।

স্থান : দেশপ্রিয় পার্ক

সময় : ৫.৬.৪৯

বিবরণ : ৪০০ জনেরও বেশি কমিউনিস্ট নির্বাচন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সভা পণ্ড করে দেখার জন্য ঐ এলাকায় গণ্ডগোল করে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক এবং সভার নেতাদের জঘন্যভাবে লাঞ্ছিত করে। বাছবিচার না করেই ইট-পাথর-বোমা-সোডার বোতল ছুঁড়তে থাকে। জাতীয় পতাকাও পুড়িয়ে দেয়। তারপর কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ি এবং কারখানা আক্রমণ করে।

স্থান : ব্রিগেড প্যারেড ময়দান

সময় : ১৪.৭.৪৯

বিবরণ : মহামান্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভা পণ্ড করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্টরা সভা লক্ষ্য করে ইট-পাথর-বোমা ছোঁড়ে। পুলিশকে লক্ষ করে একটা শক্তিশালী বোমা ছোঁড়া হয়—এর ফলে একজন কনস্টেবল নিহত এবং তিনজন আহত হয়। একজন কমিউনিস্ট প্রধানমন্ত্রীর পাহারাদার পুলিশের দিকে তাক করে পিস্তল দিয়ে গুলি ছুঁড়তে থাকে। আমাদের সৌভাগ্য তাঁর নিশানা ব্যর্থ হয়েছে।

টিকা: ক. এই দলিলটি আজিজুল হক কর্তৃক অনূদিত এবং এটি 'Communist Violence in India'র মূলভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

খ. এটি "নেহরুর চোখে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-একটি বিস্মৃতপ্রায় দলিল" শিরোনাম দিয়ে এবং অনুষঙ্গ হিসাবে অনুবাদক কর্তৃক একটি প্রাক-কথন সংযোজিত করে ১৯৮৯ সালে 'একুশে' প্রকাশনী সংস্থা প্রকাশ করেছিল। আমরা কেবল মূল দলিলটি পুণঃ প্রকাশ করলাম।

গ. সহায়ক তথ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের জায়গাগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। (-সম্পাদক)

কলিকাতা জেলা কমিটির পুনর্গঠন

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত

১। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির উপর পলিটব্যুরোর প্রস্তাব, কমরেড মল্লিকের বিবৃতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি পুনর্গঠন সম্পর্কে পলিটব্যুরোর সাম্প্রতিক প্রস্তাব প্রভৃতি পড়িবার পর কলিকাতা জেলার প্রত্যেকটি সভ্যই জেলা কমিটির পুনর্গঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেছিলেন। ১৮ই জানুয়ারীর ছাত্র ও নাগরিকদের গণঅভ্যুত্থানের সময় প্রোসেক্ট-এর পক্ষ হইতে "র‍্যাঙ্ক এণ্ড ফাইল কর্ম্মোদ্যোগ চাই" বলিয়া যে বিবৃতি দেওয়া হয় পার্টি সভ্যরা তাহাকে জেলা কমিটি পুনর্গঠনের প্রস্তুতি হিসাবে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তাহার পর রেল ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার সময় সাধারণ পার্টি সভ্যরা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে, জেলা কমিটির আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত বর্ত্তমান বিপ্লবী যুগের কোন শ্রেণি-যুদ্ধই সাফল্যের সহিত পরিচালনা করা সম্ভব নয়। **প্রাদেশিক কমিটি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রত্যেকটি শ্রমিক সংগ্রামের কার্যত বিরোধিতা করিবার ফলে, শ্রমিকশ্রেণির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পার্টিতে স্থান না দিবার ফলে, গণ-সংগ্রামের পথ ত্যাগ করিয়া মধ্যবিত্ত সুলভ সন্ত্রাসবাদের [পেটিবুর্জোয়া রিভলিউশনিজম-এর] দিকে ঝুঁকিবার ফলে, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব এবং উপদলীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়া সংগঠনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সংস্কারবাদকে আঁকড়াইয়া থাকিবার ফলে জেলা কমিটি এবং জেলা সেক্রেটারিয়েট সাধারণ সভ্যদের আস্থা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছেন। জেলা কমিটির পুনর্গঠনের দাবি সাধারণ সভ্যদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।**

কলিকাতা জেলার সাধারণ পার্টি-সভ্যদের ইচ্ছা অনুসারে এবং পলিটব্যুরোর প্রস্তাবে যে সকল বৈপ্লবিক সাংগঠনিক মূলনীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে প্রাদেশিক কমিটি নিম্নলিখিত সভ্যদের লইয়া নূতন জেলা কমিটি গঠন করিয়াছেন :

(১) হরেন, (২) কালীপদ (মালাকার), (৩) মালেক, (৪) ইরসাদ, (৫) সীতারাম, (৬) প্রভাত দাশগুপ্ত, (৭) কমলাপতি রায়।

২। এই লিষ্ট পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে দুইজন শ্রমিক কমরেড ছাড়া [কালীপদ ও সীতারাম] আগেকার কমিটির কেহই নূতন কমিটিতে স্থান পান নাই। এই ধরনের আমূল পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

কারণ, কলিকাতা জেলা কমিটি এবং জেলা সেক্রেটারিয়েট—গত এক বছরে প্রত্যেকটি সংগ্রামে শ্রমিকদের নেতৃত্ব করিবার পরিবর্তে পিছনে টানিয়াছেন, সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

পার্টি বে-আইনি হইবার পর কলিকাতার অপরাজেয় শ্রমিক শ্রেণি অসংখ্য সংগ্রাম চালাইয়াছেন। সরকারি কর্ম্মচারীদের ধর্মঘট, বিড়ি শ্রমিকের ধর্মঘট, পোর্ট শ্রমিকদের ধর্মঘট, অমৃতবাজার-যুগান্তর শ্রমিকদের ধর্মঘট, ট্রাম ধর্মঘট, লয়েডস্ ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের ধর্মঘট, ভারতীয়া এবং ইণ্ডিয়া ফ্যান শ্রমিকদের ধর্মঘট, ম্যাকফিল্ড ও ম্যাকফারলেন শ্রমিকদের ধর্মঘট কলিকাতার শ্রমিক আন্দোলনে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুত গত অক্টোবরে সরকারি ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে শ্রমিকদের মোহ কাটিবার পর বোনাস, মাগগীভাতা-মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে এবং শ্রমিক ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে এমন কারখানা নাই যেখানে কোন ঘেরাও বা বিক্ষোভ হইতে মালিক শ্রেণি রেহাই পাইয়াছে। সমাজতন্ত্রী এবং জাতীয় টি-ইউ-সির ভেদনীতি ও দালালী এবং সরকারি দমননীতি কিভাবে অগ্রাহ্য করিতে হয়, কিভাবে পুলিশ ও দালালদের উপর ইঁট পাটকেল ও বোমা নিক্ষেপ করিয়া ধর্মঘটের অধিকার রক্ষা করিতে হয়, কিভাবে একটি সেক্শনের ধর্মঘটকে সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত করিতে হয় (পোর্ট)—শ্রমিকশ্রেণি তাহার পথ দেখাইয়াছেন, তাহারা সর্ব্বত্র লালঝাণ্ডার সংগ্রামী ঐতিহ্য বহন করিয়াছেন।

কিন্তু এইসকল সংগ্রামে কলিকাতা জেলা কমিটি এবং জেলা সেক্রেটারিয়েট চরম সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সরকারি কর্ম্মচারী ও যুগান্তর-অমৃতবাজার পত্রিকার ধর্মঘটে তাহারা সর্ব্বতোভাবে নিজেদের দায়িত্ব এড়াইয়া চলিয়াছেন। পোর্ট শ্রমিকদের এবং ডিপার্টের উপর আক্রমণ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পোর্ট শ্রমিককে ধর্মঘটে আহ্বান করিতে ইতস্তত করিয়াছেন; ট্রামের নোনাপুকুর শ্রমিকরা যখন জেলা নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করিয়াই ধর্মঘট করেন তখন তাহাকে ট্রাফিক ও অন্যান্য ডিপার্টে বিস্তৃত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ভারতীয়ার ধর্মঘটের সময় উহাকে অন্যান্য লোহাকারখানায় ছড়াইয়া দিতে ইতস্তত করিয়াছেন, আপসের সম্ভাবনা সম্পর্কে শ্রমিকদের মধ্যে মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করিয়াছেন। ট্রামের এডজুডিকেশনের রায় বাহির হইলে শ্রমিকরা তাহা মানিয়া লইবে না—ইহা বুঝিতে না পারায় ট্রাম ধর্মঘটের প্রস্তুতির ব্যাপারে বরাবরই সমাজতন্ত্রী দালালদের পিছনে ছুটিয়াছেন; পূজা বোনাসের দাবির উপর শ্রমিকদের মধ্যে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহাকে ব্যাপক সংগ্রামের পথে পরিচালিত করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।

গণ-সংগ্রাম পরিচালনায় এই দুর্বলতারই চরম প্রকাশ হয় রেল ধর্মঘটের মধ্যে। কলিকাতা জেলা চীৎপুর রেল কেন্দ্রকে বরাবরই লালঝাণ্ডার ঘাঁটি হিসাবে দেখিয়াছেন। কিন্তু সেখানকার শ্রমিক নেতারা যখন গ্রেপ্তার হন শ্রমিকরা তখন ধর্মঘট করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাহাদিগকে কোন নেতৃত্ব দেওয়া হয় না। গত তিন চার মাসের মধ্যে সেখানে কোন রকমের সংগ্রামী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না। এইভাবে চটকলে, রেলে, ট্রামে, লোহা কারখানায়, পোর্টে, ইলেকট্রিকে বারবার শ্রমিকরা সংগ্রামের পথে পা বাড়াইয়াছেন, দালাল ও ফ্যাসিস্ট সরকারের অত্যাচার অগ্রাহ্য করিয়া লড়িয়াছেন। জেলা নেতৃত্ব তাহার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণির শক্তি দেখিতে পান নাই, শিক্ষালাভ করার মত কিছু পান নাই, তাহাকে পিছু টানিয়াছেন, তাহাকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে ইতস্তত করিয়াছেন।

৩। জেলা নেতৃত্ব শুধু সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাবই প্রকাশ করেন নাই; এই সকল সংগ্রামের মধ্যে যে জঙ্গী শ্রমিকরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, মালিক ও গভর্নমেন্টের হাতে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন জেলা নেতৃত্ব তাঁহাদের খোঁজ খবরও রাখেন নাই। বে-

আইনি যুগের প্রথম ৫/৬ মাস বা তাহার বেশি কোন নূতন জঙ্গী শ্রমিককে পার্টির সাধারণ সভ্য হিসাবেও গ্রহণ করা হয় নাই।

বে-আইনি অবস্থার জন্য সেক্রেটারিয়েটের সভ্যসংখ্যা কমাইয়া যখন কমিটিকে ছোট করার প্রস্তাব হয় তখন একজন শ্রমিক কমরেডও সেক্রেটারিয়েটে নির্বাচিত হন না। [৭ জন সভ্যের মধ্যে]; জেলা কমিটির শ্রমিক সভ্য কমরেড মণ্ডল প্রভৃতি কাজের কোনই সুযোগ পান না। জেলার ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য ফ্রণ্টের কাজ চালাইবার জন্য যখন "প্রকাশ্য টীম" গঠন করা হয় তখন তাহাতেও শ্রমিক কমরেডদের উপর বিশেষ কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় না। বরং প্রোসেক্ট 'ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি'তে শ্রমিক সভ্য গ্রহণ করায় জেলা সেক্রেটারিয়েটের নেতারা আপত্তি জানান। এইভাবে জেলা কমিটি ও সেক্রেটারিয়েট নেতারা আপত্তি জানান। এইভাবে জেলা কমিটি ও সেক্রেটারিয়েট শ্রমিকশ্রেণির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পার্টিতে প্রবেশ করার পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, পার্টি নেতৃত্বে স্থান দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। পার্টি কংগ্রেস যোশীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া বলিয়াছিলেন : নেতৃত্ব হইতে সর্বত্র পার্টিতে শ্রমিকদের জন্য স্থান করিয়া দাও। জেলা কমিটির নেতারা তাহার বিপরীত পথেই অগ্রসর হইয়াছেন।

৪। শ্রমিকশ্রেণিকে বিপ্লবী গণ-সংগ্রামে পরিচালিত করিতে অস্বীকার করিয়া শ্রমিকশ্রেণির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পার্টিতে স্থান দিতে অস্বীকার করিয়া জেলা নেতৃত্ব ক্রমশ পেটিবুর্জোয়া রিভলিউশনিজম্-এর দিকে ঝুঁকিয়াছেন। ইহার সবচেয়ে বেশি পরিচয় পাওয়া গিয়াছে,—৯ই মার্চের রেল ধর্মঘটের প্রস্তুতির মধ্যে।

৯ই মার্চের রেল ধর্মঘটের ব্যর্থতার পর জেলা সেক্রেটারিয়েট যখন প্রথম মিটিং করেন [১৪-৩-৪৯] তখন তাহাতে একবারের জন্যও ইহা আলোচিত হইল না—রেল শ্রমিকদের সংগ্রামে টানা গেল না কেন, সমাজতন্ত্রী দালালদের বিরুদ্ধে প্রচারে দুর্বলতা ছিল কোথায়, সমগ্র পার্টিকে ধর্মঘটের কাজে লাগাইতে দ্বিধা ছিল কোথায়। পার্টির সার্কুলার-ইস্তাহার প্রভৃতি বিলি করার ব্যাপারে, মিটিং করা, স্কোয়াড করা প্রভৃতিতে দুর্বলতা ছিল কোথায়, গণ-সমাবেশ ও গণ-সংগ্রাম সংগঠনের কাজে ত্রুটি ছিল কোথায়—তাহা একবারের জন্যও আলোচিত হইল না। গরম সার্কুলার [৫ই মার্চ] সত্ত্বেও র‍্যালীতে লোক হয় না কেন, ভাল লাগিল না বলিয়া এ-জি সেলের পার্টিসভ্যরা ইস্তাহার বিলি করা বন্ধ করেন কেন, ধর্মঘটের দুইদিন আগে জেলা নেতৃত্ব সমস্ত ইস্তাহার-পুস্তিকা বিলির কাজ বন্ধ করিয়া দেন কেন তাহা আলোচিত হয় না। একমাত্র আলোচনার বিষয়বস্তু হয় "স্পেশালে"র কাজ; এবং সেই কাজে ত্রুটির জন্য প্রাদেশিক কমিটির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করা হইল। প্রাদেশিক কমিটি কেন "স্পেশালে"র কাজকে গোপন রাখিয়াছেন, কেন উহা সমস্ত পার্টিসভ্যকে জানান নাই তাহার জন্য জেলা সেক্রেটারিয়েট ক্ষিপ্ত হইয়াছেন; প্রাদেশিক কমিটি জেলা নেতৃত্বের মধ্যবিত্ত-সুলভ সন্ত্রাসবাদী ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের আক্রমণের পাত্র হইয়াছেন। ৯ই মার্চ সম্পর্কে জেলা সেক্রেটারিয়েটের ১৪-৩-৪৯ তাং এর আলোচনায় [যাহা শেখরের তৈরী মিনিটস্ হইতে দেখা যায়] আত্মসমালোচনার স্থান নাই, গণ-সংগ্রাম ও গণ-সংযোগের ক্ষেত্রে দুর্বলতা কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা নাই। একদিকে প্রাদেশিক নেতৃত্ব অপরদিকে সাধারণ পার্টিসভ্যের উপর আক্রমণ ও দোষারোপ ছাড়া ৯ই মার্চ জেলা নেতৃত্ব আর কিছুই শিক্ষালাভ করেন নাই।

৫। মধ্যবিত্ত-প্রধান জেলা কমিটি নিজেদের হাতে সমস্ত চাবি-কাঠি রাখিবার ফলে, শ্রমিক শ্রেণি এবং সাধারণ পার্টিসভ্যদের নিকট হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিবার ফলে অধিকাংশ সংগ্রামই স্থানীয় সংগ্রাম হইতে সাধারণ সংগ্রামে পরিণত হইতে পারে নাই, উচ্চস্তরে উঠিতে পারে না, পার্টির মধ্যে বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ঐক্যও অবশিষ্ট থাকে নাই। জেলা সেক্রেটারিয়েট কলিকাতা জেলাকে যেমন "নিজেদের জমিদারি" বলিয়া মনে করেন এবং প্রাদেশিক কমিটির অধিকাংশ নির্দেশকে 'অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ' বলিয়া মনে করেন তেমনই এলাকার ডি-সি-এমরা [জেলা কমিটি সভ্যরা] নিজ নিজ এলাকাকে নিজেদের জমিদারি হিসাবে দেখেন এবং সেখানে জেলা কমিটি বা প্রাদেশিক কমিটির কোন 'হস্তক্ষেপ' পছন্দ করেন না। সম্প্রতি এই অবস্থা কতখানি চরমে উঠে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে।

- ৪/৫ মাস অপেক্ষা করিয়াও কলিকাতা জেলা কমিটির নিকট হইতে 'স্পেশালে'র কাজের জন্য যখন কোন কর্ম্মী পাওয়া যায় না—তখন প্রোসেক্টে দুইজন কর্ম্মীকে "রিকুইজিশন" করেন। প্রোসেক্ট-এর ঐ "হস্তক্ষেপে" জেলা সেক্রেটারিয়েট নিজেই শুধু "বিক্ষোভ" প্রকাশ করেন না, বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিবাদ পত্র পাঠাইতে থাকেন। ঐ দুইজন কমরেড যে 'স্পেশাল' কাজে নিযুক্ত আছেন তাহা শত্রু পক্ষের নিকট পৌঁছিবার বিপদ উপস্থিত হয়।
- ১৮ই জানুয়ারীর ছাত্র ও নাগরিকদের গণ-অভ্যুত্থানের সময় প্রাদেশিক কমিটির তৎকালীন সম্পাদক পূর্ব কলিকাতার জঙ্গী শ্রমিক কর্ম্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। জেলা কমিটির সম্পাদক তাহাকে জানান যে পূর্ব কলিকাতায় বাহিরের কাহারো পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তিনদিনের মধ্যে জঙ্গী শ্রমিকদের সভা ডাকা না হইলে প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক নিজের উদ্যোগে সেখানে সভা ডাকিবেন। এই জরুরি নির্দেশের পর সেখানে সভা করা সম্ভব হয়।
- ৯ই মার্চের রেল ধর্মঘটের দুইদিন আগে প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটের একজন সভ্য শ্রমিক এলাকায় থাকিয়া স্থানীয় পার্টি কমরেডদের কাজে সাহায্য করিবার জন্য টালিগঞ্জে যান তাহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া কমরেড মলয় লেখেন : আমাদের উপর এই 'বোঝা' চাপাইয়া দেওয়া হইল কেন তাহার কৈফিয়ৎ চাই।
- জেলা সেক্রেটারিয়েটে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে কমরেড সূর্য্যের প্রস্তাব এবং পার্টি সংগঠন সম্পর্কে কমরেড নিতাইয়ের প্রস্তাব আলোচনার সময় জেলা সম্পাদককে বলা হয় যে, কমরেড মল্লিককে যেন সেই মিটিং-এ ডাকা হয়। কিন্তু জেলা সম্পাদককে কোন প্রকারেই তাহাতে রাজী করানো যায় না, কমরেড মল্লিক তাহাদের আলোচনায় কোন সাহায্য করিতে পারেন, শেখর তাহা বিশ্বাস করেন না।

এলাকা এবং জেলায় এইভাবে এক ধরনের কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি হইবার ফলেই এক এলাকার সংগ্রাম অপর এলাকার সমর্থন পায় নাই। ভারতীয়ার বাহাদুর শ্রমিকরা তিন মাস সংগ্রাম চালাইয়াছেন কিন্তু জেলা কমিটি তাহাদের সেই সংগ্রামের পিছনে অপর এলাকার পার্টিকে কাজে নামান নাই; ম্যাকফারলেন-ম্যান্সফিল্ডের শ্রমিকরা দাঁতে দাঁত চাপিয়া লড়িয়াছেন তাহাতে জেলা কমিটির নিকট হইতে একটি সমবেদনার কথাও শুনিতে পান নাই। সর্বোপরি, ৯ই মার্চের রেল ধর্মঘটের প্রস্তুতির সময় কোন এলাকার জেলা কমিটি সভ্যরাই রেলের কাজের জন্য

এলাকা ছাড়িয়া আসিবার কথা চিন্তা করিতে পারেন নাই, নিজেদের ক্যাডারদের রেলের কাজে পাঠাইবার জন্য উদ্যোগী হন নাই। তাই এতবড় সংগ্রামের দায়িত্ব পড়ে জেলা কমিটির এমন একজন সভ্যের উপর [কমরেড শরত] যাহার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামান্য অভিজ্ঞতাও নাই, যিনি এত দিন শুধু জেলা কমিটির অফিস সম্পাদকের কাজ করিয়া আসিয়াছেন। যে সংগ্রামের জন্য পলিটব্যুরো সমগ্র পার্টিকে নিযুক্ত করার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন সেই সংগ্রামের দায়িত্ব কমরেড শরতের উপর অর্পণ করার অর্থ সংগ্রামকে পণ্ড করা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

৬। সবচেয়ে বেশি শ্রমিক-বিরোধী মনোভাব, সবচেয়ে বেশি আমলাতান্ত্রিক চরিত্র, সবচেয়ে বেশি জমিদারি মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে জেলা পার্টির সম্পাদক কমরেড শেখরের কাজের মধ্যে। বে-আইনি যুগের প্রথম অবস্থায় তিনি একবারের জন্যও জেলা কমিটির সভা ডাকা প্রয়োজন মনে করেন নাই, জেলা কমিটির শ্রমিক সভ্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। ভারতীয়া ম্যান্সফিল্ড, ইণ্ডিয়া ফ্যান প্রভৃতি কারখানার ধর্মঘটে বারবার অনুরোধ জানাইয়াও শ্রমিকরা তাঁহার নিকট হইতে সামান্য সাহায্য পায় নাই; বিভিন্ন এলাকার শ্রমিক কমরেডদের সহিত সাক্ষাৎ করার মত সময় তিনি গত এক বছরে পান নাই। কলিকাতা জেলার প্রধান প্রধান শ্রমিক সংগ্রামে কোন্ কমরেড কতখানি যোগ্যতা দেখাইয়াছেন তাহার উপর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট চাহিয়া গত দুই মাসের মধ্যে তাহা পাওয়া যায় নাই। শ্রমিক ক্যাডারদের যত্ন নেওয়া, তাঁহাদের বাছাই করা, তাহাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা হাল করিতে সাহায্য করা—এই সকল ব্যাপারে কমরেড শেখর অমার্জনীয় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি সমস্ত কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছিল। আজ একজন কর্ম্মীকে কাশীপুর, কাল তাহাকে মেটিয়াবুরুজ, আজ একজনকে ট্রামে, কাল পাড়ার কাজে—এইভাবে কর্ম্মীদের সরকারি চাকুরিয়ার মত ২৪ ঘণ্টার নোটিশে এখান হইতে সেখানে ট্রান্সফার করা হইতেছিল; সর্বক্ষণের শ্রমিক কর্ম্মী কমরেড আমানুল্লা এবং ইরসাদ পর্যন্ত মন্তব্য করেন যে তাহারা নিজেদের অনেক সময় কমিউনিস্ট পার্টির চাকুরিয়া হিসাবে দেখিতে পাইতেন। র‍্যাঙ্ক-এণ্ড-ফাইলের মধ্যে স্বাধীন কর্ম্মোদ্যোগের সুযোগ সৃষ্টি করার পরিবর্তে এইভাবে র‍্যাঙ্ক-এণ্ড-ফাইল কর্ম্মীদের কর্ম্মোদ্যোগকে নষ্ট করা হইত।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির উপর পলিটব্যুরোর প্রস্তাব কমরেড শেখরের সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করিয়াছে; কমরেড শেখর শ্রেণি-শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে কিভাবে দুর্বলতা দেখাইয়াছেন, মামুলী গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া কিভাবে পার্টি হইতে শত্রুপক্ষের লোকদের বিতাড়নে আপত্তি করিয়াছেন; এমন কি, প্রাদেশিক কমিটি অনন্ত সিং-এর বহিষ্কার সম্পর্কে যে সার্কুলার দিয়া ছিলেন শেখর সেই সার্কুলার পার্টিসভ্যদের মধ্যে প্রচার করিতেও অস্বীকার করিয়াছিলেন—ইহাও পলিটব্যুরোর প্রস্তাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু পলিটব্যুরোর সমালোচনার পরও শেখরের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয় নাই। কমরেড শেখর পলিটব্যুরো এবং মল্লিকের রিপোর্টের সমালোচনা মানিয়া লইয়াছেন কিনা তাহাও আজ পর্যন্ত জানা যায় নাই।

৭। রাজনীতি ক্ষেত্রে সংগ্রাম বিরোধী মনোভাবই সংগঠনের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক বাধা সৃষ্টি করে। উহা সংগঠনের ক্ষেত্রে সংস্কারবাদ ছাড়া কিছু নয়। যে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম

বিরোধী রাজনীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সেখানে সংগঠনের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক বাধা সৃষ্টি করিয়া সংগ্রাম পণ্ড করা হয়। এই জন্যই সংগঠনের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আসলে বুর্জোয়া সংস্কারবাদ বা যোশীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া কিছু নয়।

এই সংগ্রামে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ না করিলে, এই সংগ্রাম চালাইতে বিলম্ব হইলে পার্টির ঐক্য বিপন্ন হয়, পার্টিতে উপদল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কলিকাতা জেলা নেতৃত্বের মধ্যেও সেই সম্ভাবনা দেখা দিতে ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির উপর পলিটব্যুরোর প্রস্তাব এবং নূতন প্রাদেশিক কমিটির উপর জেলা নেতৃত্ব আজও কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। কমরেড শেখর নূতন প্রাদেশিক কমিটির জন্য যে নামের তালিকা পলিটব্যুরোর নিকটে পেশ করেন তাহাতে তিনি নিজের নাম রাখেন, কমরেড মল্লিকের নাম উল্লেখ করেন না। আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহাকে কতখানি অন্ধ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন—উহা হইতেই তাহা অনুমান করা যায়।

নূতন প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হইবার পর কমরেড মলয় প্রাদেশিক কমিটির বিরুদ্ধে এক প্রকার "প্রকাশ্য জেহাদ" ঘোষণা করিয়াছেন। টালিগঞ্জ এলাকার সাধারণ পার্টি সভ্যদের মধ্যে তিনি প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটের সভ্য কমরেড বিরাটের বিরুদ্ধে "মিথ্যা কুৎসা" রটনা করিতে শুরু করিয়াছেন।

নূতন প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হইবার ৭ দিনের মধ্যেই কমরেড প্রাণেশকে ট্রাম হইতে সরাইয়া ট্রামের সমস্ত দায়িত্ব প্রাদেশিক কমিটির সভ্য কমরেড সাধুর উপর চাপানো হয়।

সর্বোপরি, ১৪-৩-৪৯ তারিখের সভায় জেলা সেক্রেটারিয়েট নূতন প্রাদেশিক কমিটিকে "চরমপত্র" দেন যে যদি অবিলম্বে তাঁহারা জেলা কমিটি পুনর্গঠিত না করেন, তবে তাহারা নিজেরাই নিজেদের পুনর্গঠিত করিবেন। এইভাবে জেলা নেতৃত্ব নূতন প্রাদেশিক কমিটি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন; নূতন প্রাদেশিক কমিটি সম্পর্কে 'কুৎসা রটনা' করিয়া, সাধারণ পার্টিসভ্যদের মনকে বিষাক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৯ই মার্চ উপলক্ষে জেলা কমিটি, বিশেষ করিয়া জেলা সেক্রেটারিয়েট ও শেখরের বিরুদ্ধে পার্টির সাধারণ সভ্যদের মধ্যে যে বিক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে নূতন প্রাদেশিক কমিটির বিরুদ্ধে পরিচালিত করাই এই 'কুৎসা' রটনার উদ্দেশ্য। জেলা নেতৃত্ব ১৪-৩-৪৯ তারিখের সভায় প্রস্তাব করেন যে, অবিলম্বে "অন্তত চারজন শ্রমিক কমরেড" লইয়া নূতন জেলা কমিটি গঠন করিতে পারিলেই সাধারণ সভ্যদের সমালোচনা ও বিক্ষোভকে ঠাণ্ডা করা যাইবে। পলিটব্যুরোর প্রস্তাব সাধারণ পার্টি সভ্যদের মধ্যে যে সুস্থ শ্রেণি চেতনা জাগ্রত করিয়াছে, পার্টিতে শ্রমিকশ্রেণির জন্য স্থান করিবার আগ্রহ বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে লোক দেখানোভাবে মানিয়া লইয়া চারজন শ্রমিক সভ্যকে পাশে দাঁড় করাইতে পারিলেই আজিকার আমলাতন্ত্রকে আরও কিছু দিনের জন্য বাঁচাইয়া রাখা যাইবে; আরও কিছুদিনের জন্য সমগ্র পার্টির চাবি-কাঠি কমরেড শেখর পরিচালিত জেলানেতৃত্বের হাতেই থাকিয়া যাইবে ১৪-৩-৪৯ তাং এর প্রস্তাবে তাই আশা করা হইয়াছে।

সমস্ত চাবিকাঠি শেখরের হাতে থাকিবার ফলে জেলা কমিটির সভ্যরা কিরকম আতংকিত, শেখরের কাজের প্রকাশ্য সমালোচনা করিতে তাঁহারা কতখানি ইতস্তত করেন

তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া ভাল। সেক্রেটারিয়েটের প্রস্তাব অনুসারে জেলা কমিটির সভ্যরা নূতন জেলা কমিটির জন্য যে সকল নাম প্রস্তাব করেন তাহার অধিকাংশের মধ্যেই শেখরের নাম রাখা হয়। কিন্তু তাঁহাদের কাহারো কাহারো সহিত ব্যক্তিগত আলোচনার সময় দেখা যায়, তাঁহারা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, শেখরকে জেলা কমিটিতে রাখিলে জেলা কমিটির কোন গুণগত পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

৮। এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়াই প্রাদেশিক কমিটি কলিকাতা জেলা কমিটির আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। পার্টির চাবিকাঠি শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী সন্তানদের হাতে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, যোশীবাদকে চিরদিনের জন্য নির্বাসন দিবার সংগ্রাম শুরু করিয়াছেন, বিপ্লবী পার্টির মধ্যে শ্রমিকশ্রেণির বৈপ্লবিক নিয়ম শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের কাজে অগ্রণী হইয়াছেন, নূতন নূতন জঙ্গী শ্রমিকদের জন্য পার্টির দুয়ার খুলিয়া দিতেছেন।

এই আমূল পরিবর্তনের মূলনীতি কি? নূতন সভ্যদের কোন কোন দোষগুণ বিচার করিয়া কমিটিতে আনা হইয়াছে?

এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে, নূতন কমিটিতে শ্রমিক কমরেডরা সংখ্যায় বেশি থাকিবেন ইহাই প্রথম মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহাই লেনিনের নীতি। লেনিন বরাবরই বলিতেন যে, উচ্চ কমিটিতে দুইজন যদি থাকে মধ্যবিত্ত, আটজন থাকিবে মজুর। মজুরদের সুবিধা এই যে শ্রেণি-সংগ্রামের তালিম তাহাদের নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে হয় না। কারখানায় ঢুকিবার পরদিন হইতেই তাহাদের শ্রেণি-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়' তাহাদের যদি পার্টি কমিটির আলোচনায় অংশ লইতে দেওয়া হয় তবে তাহাদের রাজনৈতিক শিক্ষার পক্ষে তাহাই হয় উপযুক্ত ক্ষেত্র। সমষ্টিগত ভাবে কাজ করা, বুর্জোয়াদের প্রচারকে "জনমত" বলিয়া ভুল না করা, শ্রমিকদের শ্রেণি-সংগ্রামকে "কুনো মনোভাব" বলিয়া নিন্দা না করা—তাহার গ্যারাণ্টি হিসাবেই শ্রমিকদের সংখ্যায় ভারী করিতে হইবে।

কিন্তু শুধু লোক দেখানো ভাবে কমিটিতে শ্রমিক মেজরিটি রাখা হয় নাই। শ্রমিক-মেজরিটি করিলেই উহা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

নূতন কমিটিতে একমাত্র সেইসকল শ্রমিক কমরেডকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে যাঁহারা জেলা কমিটির এই আমলাতান্ত্রিক বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়াই গত একবছর প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণি-সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন, যাঁহারা 'আপসার্জ' আছে কি নাই তাহা লইয়া শুষ্ক বিতর্ক করিবার পরিবর্তে 'আপসার্জের' পুরোভাগে থাকিয়া লড়িয়াছেন। যাঁহারা বে-আইনী অবস্থার মধ্যে আত্মগোপন করিয়াও শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন, শ্রমিকদের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছেন, যাঁহারা শ্রমিকদের সংগ্রামে নেতৃত্ব করিয়া, সাহস ও কর্মোদ্যোগের পরিচয় দিয়া নিজ নিজ এলাকায় সাধারণ পার্টিসভ্য এবং সাধারণ শ্রমিকদের আস্থা অর্জন করিয়াছেন, যাঁহারা এইসকল সংগ্রামের সময়ে জেলা কমিটির আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আমলাতান্ত্রিক বাধা দূর করার সংগ্রামে কম-বেশি কিছুটা অগ্রণী হইয়াছেন, জেলা বা এলাকায় যাহাদের কোন কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি হয় নাই, যাহারা নিজেদের হাতে চাবিকাঠি রাখিয়া এলাকার সংগ্রামকে জেলার সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দুষমণী করিবেন না।

কলিকাতা জেলায় সত্যসত্যই কি এই ধরনের কোন শ্রমিক কমরেড আছেন? দুঃখের

বিষয়, জেলা পার্টিতে এমন অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে জেলার শ্রমিক কমরেডদের পরিচয় প্রায় কোন সাধারণ সভ্যেরই জানা নাই। একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত কমরেড যিনি পাড়ায় ভদ্রলোকদের মধ্যে কাজ করিয়া, কংগ্রেস এবং লীগ নেতাদের পিছনে পিছনে ছুটিয়া 'জেলা নেতা'র দায়িত্ব পালন করিয়াছেন তাহার নাম প্রত্যেক কমরেড জানেন। কিন্তু ইণ্ডিয়া ফ্যানের যে কমরেড পুলিশের হাত হইতে কমরেডকে ছিনাইয়া আনিয়াছেন, বাজারে এক হাজার লোকের মধ্যে দালাল ঠেঙ্গাইয়াছেন, আজও ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঐতিহাসিক ধর্মঘট পরিচালনা করিতেছেন তাহার নাম কেহ জানে না, পার্টি নেতার প্যানেলে তাহার নাম স্থান পায় না।

কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে নেতৃত্ব করার উপযুক্ত কমরেড আছেন, কলিকাতার সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণিই তাহাদের জন্ম দিয়াছেন, তাঁহারা এতদিন আমাদের মধ্যেই ছিলেন, আমাদের নিকটেই ছিলেন। আজ ইতিহাসে তাহাদেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য ডাক দিয়াছে। ইহা বিপ্লবের ডাক। এই শ্রমিক কমরেডরা অনেকে নূতন হইতে পারেন, অশিক্ষিত হইতে পারেন, অনেকে কাজের পক্ষে অনভিজ্ঞ হইতে পারেন, কিন্তু গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবের সময় সকল যোগ্যতার উপরে স্থান পায় শ্রেণি সংগ্রামের শিক্ষা। এই শ্রেণি সংগ্রামের শিক্ষাই তাঁহাদের নূতন নেতৃত্ব গড়িবার যোগ্য করিয়াছে।

নূতন জেলা কমিটির সভ্যদের এখানে যে পরিচয় দিতেছি তাহাই ইহাদের পূর্ণ পরিচয় নয়। তবু এই সামান্য পরিচয়ের মধ্যেই বুঝা যাইবে ইহারা বর্ত্তমান যুগের বিপ্লবী দায়িত্ব গ্রহণের পক্ষে কতখানি উপযুক্ত।

নূতন জেলা কমিটিতে আছেন হরিদাস মালাকার। তিনি পুরানো জেলা কমিটির সভ্য ছিলেন; জেলা পার্টির কোন সাহায্য না পাইয়াও টালিগঞ্জে তিনি লালঝাণ্ডার প্রভাব বাড়াইতে পারিয়াছেন; জয়া এবং অন্যান্য কারখানায় শ্রমিকদের জঙ্গী আন্দোলন পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আত্মগোপন করা সত্ত্বেও তিনি জয়া কারখানার এক হাজার শ্রমিকের সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন, রেডগার্ডেরা তাহার সভাকে রক্ষা করিয়াছে। হরিদাস একাই পার্টিতে আসেন নাই, তাহার ভাই পার্টিতে একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী, বাপ-মা-স্ত্রী সকলেই পার্টির ভক্ত, এইভাবে সমগ্র পরিবারকে পার্টির পরিবার হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

নূতন জেলা কমিটিতে আছে ট্রামের শ্রমিক কমরেড হরেন। গরীব তফশিলি পরিবারের সন্তান হিসাবে তিনি ট্রামে কাজ নেন এবং লালঝাণ্ডা ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়ান। সম্প্রতি ট্রামে যে সকল সংগ্রাম হইয়াছে তিনি তাহার পুরোভাগে থাকিয়া দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়াছেন; কোম্পানীর দালালদের নিকট তিনি আতংকের কারণ হইয়া উঠিয়াছেন, ইউনিয়ন গঠনের কাজে, ধর্মঘট পরিচালনার কাজে এবং যে কোন সংগ্রামকে উচ্চস্তরে লইয়া যাইবার কাজে তাহার বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

নূতন কমিটিতে আছেন শ্রমিক কমরেড মালেক। ইণ্ডিয়া ফ্যান কারখানার প্রত্যেকটি সংগ্রামে ইনি নেতৃত্ব করিয়াছেন, বর্ত্তমানে ফ্যাসিস্ট দমননীতি অগ্রাহ্য করিয়া সেখানে ঐতিহাসিক ধর্মঘট পরিচালনা করিতেছেন। এই ধর্মঘট আইনি যুগের ধর্মঘট নয়—ইহা গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করিতেছে, প্রত্যহ দালাল ও পুলিশকে পিটাইয়া ধর্মঘট চালু রাখিতে হইতেছে।

কমরেড মালেক শুধু ইণ্ডিয়া ফ্যানের শ্রমিকদেরই সাহায্য করিতেছেন না; ভারতীয়ার শ্রমিকরা যখন দীর্ঘ দিন ধর্মঘট চালাইতেছিলেন তখন কমরেড মালেক নিজের উদ্যোগেই ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করিতে আগাইয়া আসেন, দালালদের হালাল করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইণ্ডিয়া ফ্যানের শ্রমিকদের নিকট হইতে ভারতীয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।

নূতন জেলা কমিটিতে আছেন শ্রমিক কমরেড ইরসাদ। ইনি একজন রাজমজুর। কিভাবে একজন যোগ্য শ্রমিক নেতাকে অবহেলা করা হয়—জগদ্দল হইতে মেটিয়াবুরুজ খামখেয়ালী মতন যখন যেখানে খুশী বদলি করা হয়, কখনো সর্বক্ষণের কর্ম্মী করিয়া আবার পরক্ষণে চাকুরী লইতে নির্দেশ দেওয়া হয়, জেলা কমিটির সভ্য (২৪ পরগণা) পদ হইতে ধীরে ধীরে পার্টির বাহিরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়—আবার পার্টির বাহিরে রাখিয়াই পার্টির গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা হয় তাহার দৃষ্টান্ত কমরেড ইরসাদ। ইরসাদ নিজের ভাষায় বলেন : আমি পার্টির লাঠি, কখনো ডি-সি, কখনো পি-সি যে যেভাবে প্রয়োজন আমাকে ব্যবহার করে।

কমরেড ইরসাদ এমন একজন শ্রমিকনেতা যিনি সংস্কারবাদের যুগে পার্টি নীতির তীব্র বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন, যোশীবাদকে অনেক সময়ে পার্টি ডিসিপ্লিন অমান্য করিয়াও আক্রমণ করিয়াছেন, কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের পিছনে ছুটিতে ঘৃণাবোধ করিয়াছেন। এই তীব্র শ্রেণিচেতনাই এত অবহেলা সত্ত্বেও তাহাকে পার্টির প্রতি অনুরক্ত এবং সক্রিয় রাখিয়াছে।

ইরসাদ কলিকাতার গরীব বস্তির নিজস্ব সন্তান। তিনি বিড়ি শ্রমিকদের ধর্মঘটে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন, পার্টি সাহিত্য বিক্রয় ও পার্টির জন্য গরীবদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

নূতন কমিটিতে আছেন কমরেড সীতারাম। পোর্টে আজ পর্যন্ত যে কয়টি সংগ্রাম হইয়াছে, তিনি তাহার প্রত্যেকটির পুরোভাগে থাকিয়া লড়িয়াছেন, ধর্মঘটে তাঁহার চাকুরী গিয়াছে; তিনি পার্টির একজন পুরাতন শ্রমিক সভ্য; জাতীয় কংগ্রেস, সোশ্যালিস্ট ও নেপাল ভট্টাচার্য্যের ভেদনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তিনি পোর্টে লালঝাণ্ডার প্রভাব বাড়াইয়াছেন। কলিকাতার সমস্ত শ্রমিকের নিকট যে মুষ্টিমেয় শ্রমিক কমরেডের নাম সুপরিচিত কমরেড সীতারাম তাঁহাদেরই একজন।

নূতন কমিটিতে আছেন কমরেড প্রভাত দাশগুপ্ত। ইনি এক সময়ে ছাত্র নেতা ছিলেন; গত ২/৩ বছর শ্রমিকশ্রেণির সংবাদদাতা হিসাবে শ্রমিকদের মধ্যে থাকিয়াছেন, তাহাদের বিভিন্ন সমস্যা বুঝিবার কিছুটা যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। বে-আইনি যুগের অধিকাংশ শ্রমিক পত্রিকায় সম্পাদনা করার মধ্য দিয়া তিনি সংগ্রামী নীতির উপর গভীর আস্থা অর্জন করিয়াছেন।

শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনায় অভিজ্ঞতা কম থাকিলেও তাঁহার মধ্যে শিখিবার আগ্রহ আছে, মার্কসবাদ-লেলিনবাদের শক্ত বুনিয়াদ আছে, মধ্যবিত্ত দোমনাভাব কাটাইয়া সংগ্রামী নীতিতে দৃঢ় থাকিবার চেষ্টা আছে।

নূতন কমিটিতে আছেন কমরেড কমলাপতি। ইনিও ছাত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন। পার্টি বেআইনি হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রমিক আন্দোলনে কাজ করিতে যান। কলিকাতার যে ছাত্র আন্দোলন ভারতের ছাত্র-সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে গড়িয়া তোলায় এই কমরেডের কৃতিত্ব অনেকখানি। শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী নেতৃত্বে ছাত্রসমাজকে

সংগঠিত করা, যে কোন সংগ্রামে সাহসের পরিচয় দেওয়া এবং সংগ্রাম হইতে শিক্ষা লাভ করিবার আগ্রহই ইহাকে নেতৃত্বের যোগ্যতা দিয়াছে।

প্রাদেশিক কমিটি জানেন যে এই সকল কমরেডের মধ্যে অনেকেরই মার্কসবাদ সম্পর্কে জ্ঞান কম, পড়াশুনা কম। তাহার জন্য দায়ি আমরাই। এই নূতন কমিটি সচেতনভাবে আত্মশিক্ষার চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে শুধু নিজেদেরই মার্কসবাদে শিক্ষিত করিবে না, সমস্ত জঙ্গী শ্রমিক ক্যাডারের জন্য পার্টি স্কুল ও মার্কসবাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে, মার্কসবাদকে শ্রমিকের শ্রেণি সংগ্রামের কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে।

প্রাদেশিক কমিটির এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে এই নূতন কমিটিই বর্ত্তমান বৈপ্লবিক অবস্থায় কঠোর শ্রেণি সংগ্রাম চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার যোগ্য। প্রাদেশিক কমিটির এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে কলিকাতা জেলার প্রত্যেকটি সাধারণ সভ্য এই কমিটিকে তাহার দায়িত্ব পালন করিতে সাহায্য করিবেন, এই কমিটির সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সাহায্যে, নিজ নিজ স্বাধীন কর্ম্মোদ্যোগের মধ্য দিয়া কলিকাতা জেলা পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণির সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ারে পরিণত করিবেন।

পুরানো জেলা কমিটির যে সকল সভ্য নূতন কমিটিতে স্থান পান নাই প্রাদেশিক কমিটি আশা করেন যে তাঁহারা এখনই শ্রেণি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিয়া নিজেদের দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন। তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমান মধ্যবিত্তসুলভ দুর্বলতা কাটানো তখনই সম্ভব হইবে যখন তাঁহারা নিজেদের 'নেতা' না ভাবিয়া 'সাধারণ কর্ম্মী' হিসাবে ভাবিতে পারিবেন, যখন সমালোচনা ও আত্মসমালোচনাকে "সেন্সর" মনে না করিয়া নিজেদের শিক্ষার উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন, যখন নিজেদের জনগণের শিক্ষক মনে না করিয়া তাহারা জনগণের সংগ্রাম হইতে শিক্ষালাভ করার চেষ্টা করিবেন, যখন শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে থাকিয়া, প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের সংগ্রামে পুরোভাগে থাকিয়া পার্টির বর্তমান নীতির উপর নিজেদের আস্থাকে দৃঢ় করিতে পারিবেন, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

পশ্চিমবাংলা পার্টি—বিশেষভাবে কলিকাতা জেলা পার্টির সামনে এক বিরাট দায়িত্ব উপস্থিত। বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গণ-অভ্যুত্থানে আজ শ্রমিকশ্রেণির এক গুরুত্বপূর্ণ ফ্রণ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের আঘাতে, সাম্রাজ্যবাদী দেশ-বিভাগে ও দুর্ভিক্ষে বাংলার অর্থনীতি চুরমার হইয়াছে, শাসক শ্রেণির সংকট চরমে উঠিয়াছে; তাহারা জনগণের কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারে না, কংগ্রেস অথবা সোশ্যালিস্ট দালালরা শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে কোন সমর্থনই খুঁজিয়া পায় না। বাংলার বিশেষ ভাবে কলিকাতার সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বের দিকে সমগ্র জনগণ তাকাইয়া আছে; কৃষক ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষী জমি, মজুরি ও তেভাগার দাবিতে সংগ্রাম করিতেছে, ছাত্ররা ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করিতেছে, কারখানার শ্রমিক বিনা প্রতিবাদে ছাঁটাইয়ের হুকুম মানিয়া লইতে অস্বীকার করিতেছে, আশ্রয়প্রার্থী বাসস্থানের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিতেছে, এমন কি পুলিশ ফৌজের মধ্যে পর্যন্ত অসন্তোষ ধুমায়িত হইতেছে এই বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানকে নেতৃত্ব দিতে হইবে ইহাকে সংগঠিত করিতে হইবে; শাসক শ্রেণির সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দিতে

হইবে। শাসক শ্রেণি আতংকিত ৯ই মার্চ তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাকে আঘাত করার কাজে কলিকাতা জেলা পার্টিকেই অগ্রণী হইতে হইবে, সারা ভারতের শ্রমিকশ্রেণিকে পরিচালিত করিতে হইবে। এই দায়িত্বের কথা স্মরণ কবিয়াই প্রত্যেক পার্টি সভ্যকে সংগ্রামে নামিতে হইবে, পার্টির সমস্ত সংস্কারবাদী দুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতে হইবে। নূতন জেলা কমিটিই এই সংগ্রামে নেতৃত্ব করিবে—পথ দেখাইবে।

৮ এপ্রিল, ১৯৪৯

পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

টিকা : এই সহায়ক তথ্যে অনেকের 'টেকনাম' ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : সূর্য, নিতাই, মলয়, মল্লিক, শেখর, শরত, আমানুল্লা, বিরাট, প্রাণেশ, সাধু, হরেন, কালিপদ, প্রমুখ। তবে যে কয়েকজনের আসল নাম উদ্ধার করা গেছে তাঁরা হলেন : মল্লিক—মহম্মদ ইসমাইল, সূর্য—ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, এবং নিতাই—নৃপেন চক্রবর্তী। (- সম্পাদক)

পশ্চিমবঙ্গের পার্টির ভিতরে

সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই!

(প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা)

১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ বিধান রায়ের সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করে এবং কমিউনিস্ট ও ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের বিনা বিচারে বন্দী করতে শুরু করে।

মেহনতি জনগণের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর এই আক্রমণ বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণির উপর এই আক্রমণ ছিল বৈপ্লবিক সংকট ঘনায়মান হয়ে ওঠায় সরকারের ভীতির পরিচয়।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৭ সালেই এসেছিল সবচেয়ে বড় বড় ধর্মঘটের জোয়ার। সরকারি হিসাব মতেই ধর্মঘট ও লক আউটের ফলে মোট এক কোটি সাড়ে ষাট লাখ কাজের দিন নষ্ট হয়। এর ভিতর বাংলাদেশের সংখ্যাই ছিল প্রায় ৬০ লাখ। অর্থনৈতিক ধর্মঘট ছাড়াও ১৯৪৭ সালে সারা ভারতে ২১৬টি রাজনৈতিক ধর্মঘট হয়েছিল— তাতে অংশগ্রহণ করেছিল ২,৬৮,০০০ হাজার শ্রমিক ও কাজের দিন নষ্ট হয়েছিল প্রায় ৬ লাখ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, ১৯৪৮ সালে গণ আন্দোলনের জোয়ার আরো বিরাট আকার ধারণ করবেই—কেন না বছরের প্রথম তিন মাসেই অর্থনৈতিক কারণে ৪১৪টি ধর্মঘট হয় এবং তাতে ৪০ লাখ কাজের দিন নষ্ট হয়। এতে বাংলাদেশের অংশ ছিল আগের বছরের তুলনায় আরও বেশি।

ধর্মঘট-আন্দোলনের এই ক্রমবর্ধমান জোয়ারে সরকার আতংকিত হয়ে ওঠে ও বিরাট প্রতিবাদ আন্দোলন সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন পাশ করে। শ্রমিক আন্দোলন ও অন্যান্য সবরকমের গণতান্ত্রিক লড়াইকে পিষে মারার জন্য পুঁজিপতিদের এই চক্রান্তের প্রতিবাদে কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে ১৯৪৮ সালের ৫ই জানুয়ারি কলিকাতায় ও শহরতলীতে ১ লাখ শ্রমিক একদিনেক জন্য ধর্মঘট করে। পুঁজিপতিদের আক্রমণ বেড়ে ওঠার আগেই বাসন্তী ও শ্রীদুর্গা সুতাকলের শ্রমিকরা বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘট ও গৌরবময় প্রতিরোধ চালিয়েছিল এবং সমস্ত শ্রেণির শ্রমজীবী জনসাধারণের সামনে একটা উদ্দীপনাময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। বিষম ভয় পেয়ে শাসকশ্রেণি তার সমস্ত শক্তি দিয়েই পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর আঘাত হানে।

যখন এই আক্রমণকে পার্টির অনেক নেতৃস্থানীয় কর্মীও প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধির নিদর্শন বলেই ব্যাখ্যা করতে লাগলো তখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে যোশীপন্থী সংস্কারবাদ কমিউনিস্ট

পার্টির ভিতর অত্যন্ত গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। সাময়িকভাবে পার্টি সংগঠনের বিশৃঙ্খলা ও জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ ভেঙ্গে যাওয়াটাকেই তারা জনগণ পিছু হটছে ও পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে অভিহিত করতে লাগলো। এই নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তারা লড়াই ছেড়ে পালাবার এক "রণকৌশল" বাৎলাতে লাগলো। তারা শুধু থিওরীতেই এই "রণকৌশল" প্রচার করে ক্ষান্ত হল না। বাস্তবক্ষেত্রেও লড়াই ছেড়ে পালাতে ও শ্রমিকদের পিছু টেনে রাখতে লাগলো। বিশ্বাসঘাতকতার এই নীতিকেই পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি অত্যন্ত জঘন্যভাবে "হঠাৎ মেরে সরে পড়ার রণকৌশল" হিসাবে দাঁড় করায়। এর অর্থ ছিলো : "দমন নীতির সম্মুখীন হয়ো না, হামলাকে প্রতিরোধ করো না—কিন্তু সুবিধা পেলেই লড়াই ছেড়ে পালিয়ে যাবে।" পলিটব্যুরোর রণকৌশল সম্পর্কে প্রস্তাব এই মতবাদের বিশ্বাসঘাতক চরিত্রকে তীব্রভাবে কশাঘাত করা হয়েছে।

পাঁচ বছর ধরে যোশীবাদ শিখিয়েছে, সরকারের দমন নীতির প্রতিটি আঘাতও পার্টি সংগঠনের প্রতিটি বিশৃঙ্খলাই যেন শাসক শ্রেণির শক্তিমত্তা ও জনগণ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বিচ্ছিন্নতার নিদর্শন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমস্ত লড়াই পরিহার করা হয়েছে—যতক্ষণ লড়াইতে কোন দমননীতির ভয় বা সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকে। এ জন্যই আসাম সম্পর্কে পলিটব্যুরোর নোটে যোশীবাদকে সঠিকভাবেই অভিহিত করা হয়েছে যে, যোশীবাদ হলো "ভারতীয় ব্রাউডরবাদ অর্থাৎ যখন পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের জন্য ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণি জাতীয়ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে অথচ পার্টির ভিতর পেটি বুর্জোয়া শ্রেণির সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এই পেটি বুর্জোয়ারাই বুর্জোয়া র‍্যাডিক্যাল মতবাদকে ও পেটি বুর্জোয়া বামপন্থাকে মার্কসবাদ বলে ভুল করে।"

কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করেও যে গণ-সংগ্রামের জোয়ার থামানো সম্ভব হয়নি, ১৯৪৮ সালের ১লা মে তা প্রমাণিত হয়ে গেল। সে-দিনই প্রকাশিত হলো বে-আইনি ও প্রকাশ্য পত্রিকা। সাফল্যজনক গণ-সমাবেশে সরকারি দমননীতির দেউলিয়াপনাকে উলঙ্গ করে দেখিয়ে দিল। প্রতিক্রিয়ার শক্তি এগিয়ে যাচ্ছে ও জনগণ পিছু হটছে এই মতের অসারতা প্রকাশ হয়ে পড়লো ১৯৪৮ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে। ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই'র সাধারণ ধর্মঘটের স্মৃতি দিবস উদ্‌যাপন-এ ঐদিন বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির এবং কার্যত বে-আইনি বি-পি-টি-ইউ-সি'র ডাকে ময়দানে লক্ষ জনতার সমাবেশ হয়। ঐ সমাবেশ সন্দেহবাদীদের হতাশাপূর্ণ মতবাদকে পরিষ্কারভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দেয়। সে-দিন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত ছিল যে, বিক্ষুব্ধ জনতা অন্তরের সহিত কামনা করছে এমন একটা বৈপ্লবিক নেতৃত্ব যারা এগিয়ে এসে তাদের সংগঠিত করবে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত করা হয়নি। "হঠাৎ মেরে সরে পড়ার রণকৌশলই কর্মনীতি বলে চলতে থাকে।"

হঠাৎ মেরে সরে পড়ার রণকৌশলের বিশ্বাসঘাতক রূপ সেপ্টেম্বরে পোর্ট শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় প্রকট হয়ে ওঠে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড বিভাগের গোর্খা প্রহরীরা ধর্মঘট করে। ইউনিয়ন এই হরতালকে গুরুত্ব দেয়নি। সশস্ত্র গোর্খা প্রহরীদের হরতালের বিরাট বৈপ্লবিক তাৎপর্য তারা বুঝতেই পারেনি। ধর্মঘটীরা নিজেদের ধর্মঘট কমিটি তৈরী করে ও ধর্মঘট চালিয়ে যায়। ধর্মঘটে ভয় পেয়ে সরকার ব্যারাক থেকে ধর্মঘটীদের বার করে দেবার জন্য সশস্ত্র গোর্খা ফৌজ আমদানি করে। ফৌজের দল গুলি চালাতে তিন তিন

বার অস্বীকার করে। এই পরিস্থিতিতে অফিসাররা নিজেরাই কয়েক রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে ও ফৌজকে সরিয়ে নেয়। ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের প্রহরীগণকে ব্যারাক থেকে তাড়ানো সম্ভব হলো না। এই অবস্থায় পার্টি বিক্ষোভের আহ্বান জানায়। পোর্টের শ্রমিকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই রাস্তায় বেরিয়ে আসে ধর্মঘটীদের সঙ্গে তাদের সমর্থন জানাবার জন্যে। কিন্তু তখনই সমস্ত পোর্ট শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিতে পার্টি ইতস্তত করতে থাকে। কয়েকদিন পর অত্যন্ত দোদুল্যমান মনোভাব নিয়ে ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। তখনও সেই ধর্মঘটের ডাকে শতকরা ৬০ জন মজুরই সাড়া দেয়। সেদিন পুলিশ শ্রমিকদেব উপর হামলা করতে সাহস করেনি। ১০ই সেপ্টেম্বর ৫০ হাজার ছাত্র ধর্মঘট করে পোর্টের শ্রমিক ও অমৃতবাজার পত্রিকার ধর্মঘটী কর্মচারীদের প্রতি তাদের সমর্থন ও ঐক্যবোধ চমৎকারভাবে জানিয়ে দেয়। কিন্তু সমর্থনসূচক গৌরবময় এই আন্দোলনের পরেও লড়াইকে আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। পোর্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্তে ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের সব প্রহরীকে বরখাস্ত করে দেয়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠন করে নি।

২৯শে জুলাই-এর গণ সমাবেশ বা পোর্ট প্রহরীদের বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘট, এমনকি গোর্খা ফৌজদের গুলি চালাতে অস্বীকার— এ ঘটনাগুলি সত্ত্বেও পরিস্থিতি যে বারুদ স্তূপের মত হয়ে আসছে তা আমাদের কমরেডরা উপলব্ধি করতে পারলো না। সংস্কারবাদের প্রভাব ছিল এতই প্রবল।

১৯৪৮ সাল শেষ হল আর একটি গৌরবময় লড়াই-এ। সেটা হল কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের বিবরণ থেকেই বোঝা যাবে যে, সংস্কারবাদ ও সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র ধর্মঘটের পক্ষে বা ধর্মঘটের বিরোধী মনোভাবের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে না, আরও বহু সূক্ষ্মতর ধরনে সংস্কারবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যখন ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন দীর্ঘমেয়াদী ধর্মঘটের জন্য প্রচার অভিযান চালাচ্ছিল তখন সরকার ও কোম্পানির সোস্যালিস্ট দালালরা বুঝতে পারলো যে এ্যাডজুডিকেশ্‌ন্ ও আরবিট্রেশ্‌ন্ মারফৎই দাবি আদায় করা যাবে—এই পুরানো বাক্‌চাতুরীতে নিজেদের স্বরূপ ঢেকে রাখা কঠিন। মজুরদের জঙ্গী মনোভাবকে নষ্ট করে দেবার জন্য তারা তখনই আর এক নয়া পথ আবিষ্কার করলো। তারা হঠাৎ একদিনের জন্য প্রতিবাদ সূচক ধর্মঘট ঘোষণা করে দেয়। ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বহু নেতা প্রথম প্রথম এই ঘোষণাকে আমল দিতে বা সোস্যালিস্ট পঞ্চায়েতের সাধারণ শ্রমিকদের নিকট যেতে অস্বীকার করেন। তাঁরা দীর্ঘ মেয়াদী ধর্মঘটের জন্য নিজেদের প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন। এমনকি তাঁরাও একদিনের জন্য একটি বিক্ষোভমূলক ধর্মঘটের তারিখও ঠিক করে ফেললেন। কিন্তু প্রথমে তাঁরা সোস্যালিস্ট পঞ্চায়েত কর্তৃক ঘোষিত তারিখের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে রাজি হলেন না। সোস্যালিস্ট পঞ্চায়েতের সাধারণ শ্রমিকরাই পঞ্চায়েতের নেতাদের উপর চাপ দিয়ে নমুনা ধর্মঘটের দিন ঠিক করিয়েছিলেন। সোস্যালিস্ট নেতাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার একমাত্র পথ ছিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফ থেকেও সেই একই দিনের নমুনা ধর্মঘটের আহ্বান জানানো এবং ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ও সব শ্রমিকদের সংগ্রামী একতার জন্য চাপ দেওয়া। কিন্তু ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কয়েকজন নেতা এই রণকৌশল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা এই অজুহাত তুললেন যে—"পঞ্চায়েত দালালদের নিকট মাথা নোওয়াবে না।" তাঁরা একথা বুঝলেন না যে পঞ্চায়েতের নেতা আর পঞ্চায়েতের

সদস্য সাধারণ শ্রমিক দুই সমান নয়; নেতারা দালাল, কিন্তু শ্রমিকরা দালাল নয়। একথা ভুলে পঞ্চায়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবো না—এমন কি ধর্মঘটের জন্যও নয়—একথা বলার অর্থ দাঁড়ালো শ্রমিকদের উপর থেকে সংস্কারপন্থীদের প্রভাবকে দূর করার জন্য বাস্তব লড়াই চালাতে অস্বীকার করা। সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সমস্ত শ্রমিকদের শ্রেণি একতা গড়ে তোলার জন্য লড়াই চালাতেও অস্বীকার করা হ'ল।

পরিশেষে তারিখ বদলে সোস্যালিস্ট পঞ্চায়েতের সঙ্গে একই দিনে ধর্মঘট করতে ও সঙ্গে সঙ্গে একটি বিবৃতি দিয়ে পঞ্চায়েত নেতাদের বিভেদমূলক ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দিতে আমাদের কমরেডদের বুঝিয়ে রাজি করানো হ'ল। এই সিদ্ধান্তে ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন আবার সকল অংশের শ্রমিকদের আস্থাভাজন নেতা বলে স্বীকৃত হয় এবং পঞ্চায়েত নেতাদের কারসাজি ভেঙ্গে যায়। এই রণকৌশলে চমৎকার ফল পাওয়া গেল। ধর্মঘটের দিনে সমস্ত শ্রমিকদের সামনে ফুটে উঠলো এই সত্য যে, কি সাহসে, কি শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বস্ততার ব্যাপারে পঞ্চায়েত নেতাদের থেকে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতাদের পার্থক্য কতখানি। সবাই দেখল যে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতারাই পুলিশের হামলার চোট সহ্য করলো। তাই সোস্যালিস্ট পঞ্চায়েতের সাধারণ শ্রমিকেরাও ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতাদের পুলিশের হামলা থেকে সাহসের সহিত রক্ষা করেছে।

নমুনা ধর্মঘট শেষ হওয়া মাত্রই কোম্পানি ধর্মঘটের নেতাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে। তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট হয়—তাতে সব শ্রমিক যোগ দেয় এবং চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামী একতা। ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তৎক্ষণাৎ ধর্মঘটকে সমর্থন জানায় ও ধর্মঘটকে সংগঠন করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে থাকে। এতে পঞ্চায়েত নেতারা বিষম ভয় পেয়ে গেল। তারা শ্রমিকদের শান্ত করতে ও ধর্মঘট ভাঙ্গতে চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু তাদের অনুগামী সাধারণ শ্রমিকরাই ক্রুদ্ধ জবাব দিয়ে তাদের চুপ করিয়ে দেয়। সরকার ও কোম্পানির ঐ বিশ্বাসঘাতক দালালদের সব শয়তানী ফাঁস করে দেওয়ার এই ছিল উপযুক্ত সময়। কিন্তু সেই সব কমরেডরা যারা "পঞ্চায়েতের দালালদের নিকট মাথা নোয়াবো না" বলে প্রথমে সম্মিলিত ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা এখন এ বিশ্বাসঘাতকদের দালালীর কথা ভুলে গেলেন। তাঁরা এখন "ঐক্যের" ধুয়া তুলে নিজেদের প্রভাব দ্বারা শ্রমিকদের আক্রমণ থেকে ঐ বিশ্বাসঘাতক পঞ্চায়েত নেতাদের বাঁচিয়ে দিলেন। সংস্কারবাদীদের প্রভাবের বিরুদ্ধে শ্রমিক ঐক্যদ্বারা বাস্তব লড়াই চালাতে অস্বীকার করা এবং চরম সুযোগের মুহূর্তে শ্রমিকশ্রেণির শত্রুদের মুখোশ ছিঁড়ে না ফেলা—এ দুই হল একই সংস্কারবাদের এপিঠ আর ওপিঠ। নেতাদের উপর আস্থা এবং সাধারণ শ্রমিকদের উপর অনাস্থা এই হল এই সংস্কারবাদের উৎস।

পূর্ণ ধর্মঘট হল। শ্রমিকেরা বাহাদুরীর সঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়ালো—কিন্তু আমাদের কমরেডদের সংস্কারবাদী বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই পঞ্চায়েত নেতারা নেতৃত্বের পদে থেকে গেল। অবশেষে সোস্যালিস্ট পঞ্চায়েতের নেতাদের সঙ্গে কোম্পানির আপস রফায় ধর্মঘট শেষ হয়।

সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে স্ট্রাইক কমিটি গঠন করে ও শ্রমিকদের সামনে সোস্যালিস্ট নেতাদের মুখোস খুলে দিয়ে ঐ বেইমান সোস্যালিস্ট নেতাদের মরণ আঘাত দেবার একটা

অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। সোস্যালিস্ট নেতাদের অনুগামী সাধারণ শ্রমিকেরা তাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষে পরিস্থিতি ছিল খুবই সুবিধাজনক। তাঁরা তখন 'সাধারণ শ্রমিকদের নেতৃত্ব চাই ও স্ট্রাইক কমিটি ছাড়া আর কারো মীমাংসা মানবো না' এই দাবিতে অটল থেকে আন্দোলনের উদ্যোগ নিজেদের হাতে আনতে পারতেন। কিন্তু তা করা হল না। সুতরাং সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। এইভাবেই ট্রেড ইউনিয়নের ভিতরে সংস্কারবাদীদের প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার পথে সংস্কারবাদই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি আমাদের এ শিক্ষাই দেয় যে, সাধারণ শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত স্ট্রাইক কমিটি, মিল কমিটি, ফ্যাক্টরী কমিটি, লাইন কমিটি প্রভৃতির মারফৎ সাধারণ জঙ্গী শ্রমিকদের নেতৃত্বের আওয়াজকে কার্যকরী করাই পুঁজিপতি ও সরকারের সংস্কারবাদী দালালদের মুখোশ খুলে দেওয়ার ও তাদের শ্রমিক আন্দোলন থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সবচেয়ে জবরদস্ত হাতিয়ার। যারা ধর্মঘটের নেতৃত্ব ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির হাতেই রেখে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারবাদীদের ইউনিয়নের সাথে একত্রে ধর্মঘট করতে অস্বীকার করে বা সুযোগের সময়ে ঐ সংস্কারবাদীদের মুখোশ খুলে দিতে গররাজী হয় তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ঐ নীতিকে পরিহার করে। পার্টির ভিতর এরূপ বচনবাগীস রয়ে গেছেন—যারা ক্ষমতা দখলের ও শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বের বুলি আওড়ায় কিন্তু ফ্যাক্টরীতে ও মিলে সাধারণ জঙ্গী মজুরদের নেতৃত্বের সংগঠন গড়ে তুলতেই অস্বীকার করে।

(২)

১৯৪৯ সালে শ্রমিকশ্রেণির বিরাট বিরাট অভ্যুত্থান ঘটছে এবং লালঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে মেহনতি জনতার সকল অংশই সরকারি হামলার বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ চালাচ্ছে। যে পেটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরা এতদিন নাকি সুরে ঘ্যান ঘ্যান করছিল ও ব্যাপক বিরাট লড়াই-এর সম্ভাবনা সম্বন্ধেই হতাশাপূর্ণ নানা প্রকার সন্দেহ ছড়িয়ে দিচ্ছিল তারা এখন আতংকে চিৎকার করে উঠলো—"দোহাই তোমাদের—থামো। ওসব হচ্ছে দুঃসাহসিক অতি-বিপ্লবী কাজ।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের হিসাব মতেই এ বছর জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত শুধু এই ছয় মাসে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ১৪২টি ধর্মঘট ও লক আউট হয়েছে। তাতে ১.৩৯,৫৮৫ জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছে ও কাজের দিন নষ্ট হয়েছে ১৪,৮৫,০০০। এই সংখ্যার ভিতর রাজনৈতিক ধর্মঘট, মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের ধর্মঘট, কয়লা খনি মজুরদের ধর্মঘট ও যানবাহন শ্রমিকদের ধর্মঘটকে ধরা হয়নি। বি-পি-টি-ইউ-সির অফিস থেকে যেসব খবরাখবর সরবরাহ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে এরূপ অন্তত ৫টি ধর্মঘট হয়েছে এবং তাতে অংশগ্রহণ করেছে ৮১৫০ জন শ্রমিক ও ৮৮৬৫০টি কাজের দিন নষ্ট হয়েছে। এ ছাড়াও অফিসের কেরানীরা বার কয়েক কলম ধর্মঘট করেছে, ধর্মঘট করেছে শীতলপুর, চরণপুর কয়লাখনির, জে. কে. নগর এ্যালুমিনিয়াম কারখানার শ্রমিকগণ এবং ডুয়ার্সের ও দার্জিলিং-এর চা-বাগানের মজুররা। এগুলির কোন সংখ্যা পাওয়া যায়নি। বি-পি-টি-ইউ-সির সম্পাদকের রিপোর্ট মতে জুন থেকে আগস্ট এই তিনমাসে "বেশি না হলেও কমপক্ষে এক লাখ শ্রমিক ধর্মঘট, লক আউট, জঙ্গী ঘেরাও ও জঙ্গী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছে এবং তাতে নষ্ট হয়েছে কয়েক লাখ কাজের দিন।"

জানুয়ারি থেকে জুন এই ছ'মাসে অর্থনৈতিক ধর্মঘট ছাড়া, রাজনৈতিক ধর্মঘট হয়েছে একুশটি ও তাতে যোগদান করেছে ৯০,০০০ শ্রমিক। এইসব ধর্মঘট চালাতে হয়েছিল এমন সময় যখন একদিকে সরকারের সর্বাত্মক সশস্ত্র সমাবেশ, পাইকারি গ্রেপ্তার ও প্রচণ্ড দমননীতি চলছে, আর অন্যদিকে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া সমস্ত দল এবং উপদলই ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য চেষ্টা করছে। এই আমলের নূতন বৈশিষ্ট্য হল লক্ষ লক্ষ ক্ষেত মুজরদের অসংখ্য ধর্মঘট গ্রামের জড়তাকে ভেঙ্গে দিয়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ও কৃষি বিপ্লবের শক্তির বিকাশের নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে বৈপ্লবিক সংকট যে অভূতপূর্বভাবে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে তা বোঝা যায় শ্রেণি সংগ্রামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংঘবদ্ধভাবে এই অনগ্রসর শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাবে এবং তাদের লড়াই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ার ভিতর।

এসব লড়াই-এ গরীব কৃষকরা ক্ষেতমজুরদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছে এবং মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মালদহ ও বীরভূমে বর্গা প্রথার জোতদারদের উগ্র দাবির বিরুদ্ধে মঞ্চ দখলে এই দুই শ্রেণি সম্মিলিতভাবে লড়াই চালিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, কাকদ্বীপে কৃষকগণ ১১ হাজার বিঘার ধান দখল করেছে এবং মেদিনীপুরের কেশপুর থানায় দখল করেছে ১২ শত বিঘার ধান। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ২৪ পরগনা ও মালদহের কোন কোন অংশে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের সংগ্রামী শক্তি জঙ্গী সমাবেশের খুব উঁচু পর্যায়ে উঠে গিয়েছে। মেয়ে মজুর, কৃষক মেয়েরা ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এই সংগ্রামে যেরূপ গৌরবময় অংশগ্রহণ করেছে তাতে আমাদের গণতান্ত্রিক লড়াই-এর ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে তারা অদ্ভুত সাহসে এবং উদ্যোগ নিয়ে বারবার পুলিশের বর্বর হামলাকে প্রতিরোধ করেছে। যুগান্তকারী এইসব সংগ্রাম যা নারী শহিদদের রক্তে আরো মহিমাময় হয়ে উঠেছে—এগুলি ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লেখা থাকবে।

১৯৪৯ সালেই ছাত্রদের বিরাট বিরাট অভ্যুত্থানও ঘটেছে। সারা ছাত্র সমাজই তথাকথিত "জাতীয়" বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষে নেমে পড়েছে এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছাত্ররাও ধর্মঘট ও সংঘর্ষ—শ্রমিকশ্রেণির লড়াই-এর এই পথ গ্রহণ করে নিয়েছে। জানুয়ারি থেকে জুলাই এই সাত মাসে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ধর্মঘটে ৪,৪৮,৫০০ ছাত্র যোগ দিয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কীয় দাবির জন্য ধর্মঘট হয়েছে আরও বেশি—তাতে যোগ দিয়েছে ৩০,০০,০০০ ছাত্র। কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সভ্য এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের রূপকে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন নীচের কথাগুলি দ্বারা :

"ছাত্র আন্দোলনের এই জোয়ার তার গতিবেগে অতিদ্রুত ১৯২০ ও ১৯৪২-এর আন্দোলনের পর্যায়ে উঠে যাচ্ছে। এমনকি ছাত্র আন্দোলনের এই জোয়ার ১৯২০ ও ১৯৪২-কে ছাপিয়েও যাচ্ছে—লড়াই-এর জঙ্গীপনায় ও বেপরোয়া সাহসে, রাজনৈতিক জ্ঞানের গভীরতায় যা প্রকাশ পেয়েছে অগ্রগামী কেন্দ্রগুলিতে ছাত্রদের সোজাসুজি ধর্মঘটে। একদিকে ব্যাপক কংগ্রেস-বিরোধী ও পুঁজিবাদ-বিরোধী মনোভাব এবং অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণির লড়াই-এর কৌশল ও সংগঠনের প্রতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির দুনিয়া জোড়া ঐতিহাসিক শক্তির প্রতি অনুকূল মনোভাবে এই ছাত্র আন্দোলন উদ্বুদ্ধ।"

এ বছর কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ এলাকা বারবার জনগণের

প্রতিরোধ ও ব্যারিকেড যুদ্ধের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এসব লড়াই-এ ছাত্ররা অসীম বীরত্ব দেখিয়েছেন। জানুয়ারিতে একবার এবং এপ্রিল মাসে আর একবার এই এলাকায় গড়ে উঠেছিল ব্যারিকেড এবং সেটা ছোটখাটো একটা গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রের রূপ ধারণ করেছিল। বাস্তুহারাদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও তার প্রতিবাদে ছাত্রদের ধর্মঘট হতেই প্রথমবারের ঘটনাবলীর উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়বারের ঘটনাবলীর সূত্রপাত হয় অনশনী রাজবন্দীদের সমর্থনে বিক্ষোভকারী মেয়েদের উপর বর্বর গুলি চালনা ও হত্যাকাণ্ড থেকে।

গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণও তাদের আন্দোলনে নূতন ও উচ্চতর লড়াই-এর ধরন গ্রহণ করে। সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে, বন্দীদের ছিনিয়ে নিতে, আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট সংগঠকদের রক্ষা করতে ও জমিদারদের জমি ও খাদ্য দখল করতে নিরস্ত্র কৃষক জনতা মৃত্যুভয়হীন বেপরোয়া মনোভাব দেখিয়েছে। বাঁকুড়া, ২৪ পরগনা, হাওড়া ও মেদিনীপুরের শত শত গ্রামে "তেলেঙ্গানার পথে" এই আওয়াজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ক্ষেতমজুরেরা এগিয়ে এসে কৃষক আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছে বলেই এগুলি সম্ভব হয়েছে।

সরকারি পুলিশের পাশবিকতার ফলে রাগে ঘৃণায় জ্বলে উঠে কলিকাতায় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিন তিন বার নতুন ও উচ্চতর লড়াই-এর ধরন গ্রহণ করেছে। অথচ সে সময় পার্টি নেতৃত্ব প্রস্তুত ছিল না, সব ঘটনাগুলিই তাদের সামনে আচমকা এসে পড়ে। প্রথমবারের ঘটনা ঘটে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে—ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময়ে। দ্বিতীয়বারের ঘটনা হয় জানুয়ারি মাসে যখন ছাত্ররা ব্যারিকেড রচনা করে মর্গ অবরোধ করেছিল ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গড়ে তুলেছিল বহু ব্যারিকেড। তৃতীয়বারের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় ২৭শে এপ্রিলের পর—যখন পুলিশ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর গুলি বর্ষণ করে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিধান রায়ের গুণ্ডাবাহিনী সশস্ত্র পুলিশের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে শোভাযাত্রাকারীদের উপর তাজা বোমা নিক্ষেপ করে। নিরস্ত্র মেয়েরা এই কশাইদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সহিত রুখে দাঁড়ায়—পাঁচজন মেয়ে ও দু'জন পুরুষ নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দেয়।

২৭শে এপ্রিলের এই হিংস্র অত্যাচারে বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায় এবং মেডিকেল কলেজ-বৌবাজার এলাকার (যেখানে ঘটনা ঘটেছিল) সমগ্র জনতা ক্রোধে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ও রাস্তায় রাস্তায় তৈরি করে ব্যারিকেড। তিনদিন ধরে চলে অসম সাহসিক লড়াই। কমিউনিস্ট পার্টির ইউনিটগুলি অপ্রস্তুত অবস্থায় এই পরিস্থিতিতে পড়েও দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রামী জনতার পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়। জনতাও বুঝতে পারেন যে গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই-এ কমিউনিস্টরাই সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা। "কংগ্রেসী রাজ ধ্বংস হোক"—এই আওয়াজ সারা কলকাতা জুড়ে জনগণের কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গর্জে উঠলো। পর পর তিনদিন গণ-প্রতিরোধের সামনে সরকারের অত্যাচারের যন্ত্র হয়ে গিয়েছিল অকেজো এবং অচল।

এ সব লড়াই ও কমিউনিস্ট মেয়েদের প্রাণদানের ফলে সরকার অনশনী রাজবন্দীদের প্রধান প্রধান দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য হল। জয়লাভের মধ্য দিয়েই অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল এবং জনগণও বিজয় গর্বে ব্যারিকেড থেকে ফিরে গেল।

কিন্তু নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন করার আদৌ কোন ইচ্ছা রায় মন্ত্রিসভার ছিল না। এত তাড়াতাড়ি আপস করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তাদের ধমক খেতে হয়।

এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে ৮ই জুন প্রেসিডেন্সী জেলের সব নিরাপত্তা বন্দীরা সরকারের প্রতিশ্রুতি পালন না হওয়া পর্যন্ত তালাবন্ধ হতে অস্বীকার করে। এর জবাবে পুলিশ বন্দীদের উপর গুলি চালিয়ে একজনকে খুন করে ও পাঁচজনকে আহত করে। বন্দীরাও বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ চালায় ও তার ফলে দুজন পুলিশ অফিসার আহত হয়। নিরাপত্তা বন্দীদের বিরুদ্ধে চারশ'র উপর সশস্ত্র পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছিল। বন্দীরা যে ব্যারিকেড গড়ছিল তা অতিক্রম করার জন্য পুলিশ আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে দমদম সেন্ট্রাল জেলের নিরাপত্তা বন্দীরা পরের দিন সকালে তালাবন্ধ হতে অস্বীকার করে। রাত্রে সশস্ত্র পুলিশ তাদের আক্রমণ করে। একদিকে তিন শতাধিক নিরাপত্তা বন্দী ও অন্যদিকে সশস্ত্র পুলিশের বিরাট বাহিনী এই দুইয়ের ভিতর দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাপী এক খণ্ডযুদ্ধ শেষ হয় নিহত ও আহতগণের রক্ত বন্যায়। তিনজন বন্দী সেই স্থানেই নিহত হয় ও ৮ জন গুরুতররূপে আহত হয়। জেলের ভিতর গুলিচালনায় জনগণের ভিতর যে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল, তাই একজন ভূতপূর্ব বিপ্লবী ও কংগ্রেস কর্মীর চিঠিতেই প্রকাশ পেয়েছিল। সেই বিপ্লবী ২০ বছর জেল খেটে পরিশেষে ১৯৪৬ সালে মুক্তি পেয়েছিলেন। সরকারের নিকট লেখা সেই চিঠি ১৯৪৬ সালের ১৩ই জুন তারিখের 'নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল :

"কলিকাতা ও তার আশপাশের তিনটি সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ কমিউনিস্টদের উপর পর পর তিনদিন আপনাদের বুলেট চলেছে। সেই বুলেটে ইতিমধ্যেই আর আধ ডজন বন্দী মারা গেছেন এবং আহতদের তালিকা খুবই বড়—এঁদের অনেকেও মারা যেতে পারেন। ... ঢাকা জেলে সাধারণ কয়েদীদের উপর যে গুলি চালনা করা হয়েছিল কলিকাতার জেলগুলিতে কমিউনিস্ট বন্দীদের উপর গুলি চালনা প্রায় তারই অনুরূপ। বিপ্লবী যুগের আমাদের পুরনো বন্ধুদের অনেকেই আজ মন্ত্রীত্বের গদীতে কিংবা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির পদে আসীন আছেন। তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাই, কমিউনিস্ট বন্দীদের প্রতি যা করা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা যদি আগে তাঁদের পোহাতে হত তাহলে সেটা তাঁদের কেমন লাগত।"

আর একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছিল—"এতে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে ফ্যাসিস্ট কন্‌সেন্ট্রেশ্‌ন্‌ ক্যাম্পগুলির কথা। মনে হয়, ফ্যাসিস্টদের মতই কংগ্রেস সরকারও বিরোধী শক্তিগুলিকে যে-কোন উপায়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

এই নরমেধ যজ্ঞের পর, বন্দীরা অনশন ধর্মঘট শুরু করে—বাইরের জনগণও লড়াই-এ নেমে পড়লো। এই সময়ে পার্টি নেতৃত্ব সংগ্রাম পরিচালনায় আগের চেয়ে ভালভাবে প্রস্তুত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই রাজনৈতিক ধর্মঘট ও গণ-বিক্ষোভের মারফৎ জনগণের ঘৃণাকে তারা সংঘবদ্ধরূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল।

ঠিক এই সময়েই দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনের প্রচার চলছিল। কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়ে এসে সেই নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নির্বাচন যুদ্ধ পরিণত হল রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য জনতার লড়াই-এ। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত গণ-সংগ্রামের ফলে পুলিশ ও সরকার কর্তৃক অস্ত্রে সুসজ্জিত গুণ্ডা বাহিনী হয়ে গেল অকেজো এবং স্বাধীন নির্বাচন নিশ্চিত হল। তারই ফলে কংগ্রেস হল ভীষণভাবে পরাজিত।

উপনির্বাচন শেষ হওয়া মাত্রই পার্টি অনশনী বন্দীদের দাবি নিয়ে সংগ্রামে নেমে পড়ে। ২১ দিন অনশন ও জনগণের অপূর্ব প্রতিরোধের ফলে সরকার নতি স্বীকার করে, বন্দীদের প্রায় সব দাবিই মেনে নেয় এবং বিজয় গর্বেই অনশন তুলে নেওয়া হয়।

দোদুল্যমানচিত্ত যেসব লোকেরা ৯ই মার্চের রেল শ্রমিকদের লড়াই-এর সময় পিছু হটেছিল—এপ্রিল থেকে জুনের ঘটনাবলী তাদের চোখ খুলে দেয়। পার্টি এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত যা করেছিল এই মার্চেও তাই করতে পারতো যদি তখন এরূপ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতো। ৯ই মার্চের রেল ধর্মঘট হল না—কারণ পার্টি ইউনিটগুলি সময়োপযোগী কর্তব্য পালন করতে পারেনি। তারা এমনভাবে কাজ করেছিল যেন ওটা একটা আংশিক সংগ্রাম যা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে উঠবে। যখন পুলিশ রেল শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করে তখন যদি প্রত্যেক এলাকায় তার প্রতিরোধ করা হত, যদি ৯ই মার্চ সকালবেলা "ইঞ্জিন এগোতে দেব না" এই রণধ্বনি নিয়ে লাইনের স্থানে স্থানে সংগ্রামী শক্তিকে সমাবেশ করা হত, যদি সারা লাইনের ধারে ধারে কৃষকদের সমাবেশ করা হত (মেদিনীপুরে সফলতার সঙ্গে যা করা হয়েছিল) তা হলে ৯ই মার্চের ইতিহাস অন্যরূপ হত। ৯ই মার্চের সংগ্রামের প্রতি আমরাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

তবুও, ৯ই মার্চ বিরাট অগ্রগতি এনে দিয়েছে—কেননা ৯ই সরকারেরই নৈতিক পরাজয় হয়েছে। ধর্মঘট বন্ধ করতে সরকারকে এক প্রকার সামরিক আইন জারি করতে হয়েছিল। শুধু এই কারণেই সরকারের সম্মান সেদিন ধূলিসাৎ হয়ে যায়, সোস্যালিস্ট বিভেদকারীদের স্বরূপ সেদিন উলঙ্গভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে ও সরকারের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ বেড়ে যায় শতগুণ। ৯ই মার্চ পার্টি ইউনিটগুলিকেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, শুধুমাত্র নূতন উচ্চতর ধরনের সমাবেশ ও লড়াই-এর পথেই আজ অগ্রসর হওয়া সম্ভব। মেহনতি জনগণের চোখে প্রতীয়মান হল যে, একমাত্র এই পার্টিই জনগণের জন্য লড়াই করে।

এ বছর এই সময়েই (জুন মাসে) শ্রমিকশ্রেণির ধর্মঘটের লড়াই সবচেয়ে উঁচু পর্দায় ওঠে এবং লড়াই-এর ধারাও সবচেয়ে জঙ্গী হয়ে ওঠে।

নিরাপত্তা আইনে বিনা বিচারে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ট্যাংরা রোডের পটারি কারখানার দুজন শ্রমিক আবার কাজে যোগদানের জন্য ৮ই জুন তারিখে কারখানার গেটে উপস্থিত হয়। ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ তাদের কাজে নিতে অস্বীকার করে। কারখানার শ্রমিকগণ গেটে জমা হয়ে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই দাবি জানায় যে, তাদের ঐ দুজন কমরেডকে আবার কাজে নিতেই হবে। কর্তৃপক্ষ তখনই রাইফেলধারী পুলিশ ডেকে পাঠায়। কর্তৃপক্ষের এই প্ররোচনামূলক কাজে শ্রমিকেরা বিক্ষোভে জ্বলে ওঠে, পুলিশদের ঘেরাও করে ও কারখানা দখল করে নেয়। পুলিশ গুলি চালায়, শ্রমিকেরাও ইট-পাথর, মাটির ছাঁচ, এসিড টিন ছুঁড়ে পাল্টা জবাব দেয়। দুঘণ্টা ধরে হামলা চালিয়ে পুলিশ ৬০ রাউণ্ড গুলি চালায়, একজন শ্রমিককে সেই স্থানেই খুন করে ও ১৪ জনকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে। তখন থেকেই পটারীর শ্রমিকেরা ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে এবং পাশবিক অত্যাচার ও দমননীতি সত্ত্বেও ধর্মঘটের ১০০ দিন পার হয়ে গেছে।

ঠিক এই সময়েই, পটারীর শ্রমিকদের মতই অপূর্ব বীরত্ব সহকারে হাওড়ার ও টালিগঞ্জের এলেনবেরী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকগণ ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিলো। তারা বেশ কিছুদিন

ধরে দুটো কারখানাকে নিজেদের দখলে রেখে দেয় এবং কারখানার আশপাশেও পুলিশকে আসতে দেয়নি। কারখানার ইমারতের উপরে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে শ্রমিকগণ কারখানাকে পরিণত করেছিল যুদ্ধ শিবিরে। ৮ই থেকে ১৭ই মে পর্যন্ত হাওড়ার কারখানা শ্রমিকদের দখলেই ছিল ও কারখানার মাথায় সগর্বে পত পত করে উঠছিল লালঝাণ্ডা।

অনশনী রাজবন্দীদের দাবির সমর্থনে রাজনৈতিক ধর্মঘট করার জন্য ন্যাশনাল কার্বন ফ্যাক্টরীর শ্রমিকগণ ২৭শে জুন তারিখে প্রশংসনীয়ভাবে লড়াই চালায় ও বীরত্বের সহিত পুলিশের হিংস্র হামলার প্রতিরোধ করে।

জেলের ভিতরে গুলিচালনার প্রতিবাদে জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ৩০০০ ও বেঙ্গল জুট মিলের ৬০০০ শ্রমিক ১৪ই জুন ধর্মঘট করে। অনশনী রাজবন্দীদের দাবির সমর্থনে টেক্সম্যাকোর ১২ শত ও ইণ্ডিয়ান মেলিএবেল কাস্টিং কারখানার ৬ শত শ্রমিক ২৭শে জুন ধর্মঘট করে। ইতিপূর্বে জানুয়ারি মাসে ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ১০ হাজার শ্রমিক একদিনের জন্য ধর্মঘট করেছিল।

রাজনৈতিক ধর্মঘটের ক্ষেত্রে সোজাসুজি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাবই এই সময়ের সবচেয়ে বড় ঘটনা। সমস্ত শ্রমিকশ্রেণির ভিতরে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু শিল্পের শ্রমিকগণই এইসব রাজনৈতিক ধর্মঘটে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত যে ৩০ হাজার শ্রমিক রাজনৈতিক ধর্মঘট করেছিল, তার ভিতর শতকরা ৫০ জনই ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু শিল্পের।

ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলেও, যেমন দেখা যায় রুশ দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে, ধাতু শিল্পের ও ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকগণই প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘটে এগিয়ে আসে—কেন না শ্রমিকশ্রেণির ভিতর তারাই হল সবচেয়ে অগ্রণী। এখানে অর্থনৈতিক ধর্মঘটের তুলনায় রাজনৈতিক ধর্মঘটের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার কারণ হল পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত ৬.৭ লাখ শ্রমিকদের ভেতর ধাতুশিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের সংখ্যা মাত্র ১.৫ লাখের মত অর্থাৎ শতকরা ২৫ জনেরও কম। এর ভেতর আবার, শুধু এক অংশ কলকাতার ও শহরতলীর—বাকি সব হল আসানসোল-কুলটি এলাকায়।

শ্রমিকেরা রাজনৈতিক লড়াই-এ এগিয়ে আসছে না বলে হতাশাবাদী ও সন্দেহবাদীরা যে প্রচার চালাচ্ছিল উপরে বর্ণিত ঘটনাবলী তাদের সে-সব থিওরীকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দিয়েছে।

গণ-সংগ্রামের এই উত্তাল তরঙ্গ—যাতে লাখ লাখ জনতা অপূর্ব গতিবেগে এগিয়ে এসেছে—তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পাঁচটি :

(১) কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বে এইসব লড়াই হয়েছে (২) শ্রমিকশ্রেণি অগ্রণী হিসাবে কাজ করেছে (৩) পেটি বুর্জোয়া জনসাধারণ সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমশই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে (৪) পুলিশ ও জনতার ভিতর বারবার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে এবং (৫) মেহনতী কৃষক জনতা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে লড়াই করেছে এবং কারখানার শ্রমিকদের পরই সবচেয়ে জঙ্গী শক্তি হিসাবে ক্ষেতমজুরগণ কৃষক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের জন্যই পেটি বুর্জোয়া বামপন্থী দলগুলি পর্যন্ত আতংকিত হয়ে পড়েছে ও তারা তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করেছে : "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অতি

বিপ্লবী, লোক দেখানো বাহাদুরি ও সন্ত্রাসবাদী নীতি অনুসরণ করছে,'' ''কমিউনিস্ট পার্টি ইচ্ছা করেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে উস্কানী দেয়'' ইত্যাদি ইত্যাদি। সোস্যালিস্ট পার্টি, আর-এস-পি-আই, আর-সি-পি-আই প্রভৃতি কমিউনিস্ট বিরোধী দলগুলির প্রচারকেরা সংবাদপত্রের স্তম্ভে লিখছে যে, জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে সাড়া দেয় না, কমিউনিস্ট পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ও কমিউনিস্ট পার্টি এখন মরিয়া হয়েই সন্ত্রাসবাদী নীতি চালাচ্ছে। এইসব মিথ্যা প্রচারকে একমাত্র ঘৃণাভরে উপেক্ষা করতে হয়। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম লাখ লাখ মেহনতী জনতা যে, কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বের নীচে সমবেত হচ্ছে—সে দৃশ্য দেখেই এই বামপন্থীদলগুলি আসলে ভয় পেয়ে গেছে। তারা ভেবেছিল কমিউনিস্ট পার্টি যখন বে-আইনি, সেই সুযোগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিছুটা লোক দেখানো হৈচৈ করে ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে তারা জনগণের মন দখল করে নেবে। তারা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে হতাশ হয়েছে।

(৩)

পার্টির ভিতরকার সংস্কারবাদীরাও এই পেটি বুর্জোয়া বামপন্থীদের মতের প্রতিধ্বনি করছে। সংস্কারবাদীরা ভীতিগ্রস্তভাবে আওয়াজ তুলেছে যে, এই সময়ে যেসব জঙ্গী কাজ করা হয়েছে তা হল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসমূলক কাজ। তারা এই উপকথাও তৈরি করেছে যে, একমাত্র ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া আর সব সশস্ত্র কাজ (এ্যাক্‌শন্‌) লেনিন নিষেধ করেছেন। ১৯৪৯ সালের কলিকাতার ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের বিশ্লেষণ যেমন ভুল, লেনিনবাদ সম্পর্কে তাদের ধারণাও ঠিক তেমনিই ভুল। তারা বলে, ''এটা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় নয়—এটা হ'ল গণ-সমাবেশ ও বিক্ষোভের সময়।'' একথা বলে আসলে তারা এই মত প্রচার করে যে, গণ-সমাবেশকে শান্তিপূর্ণ সভা শোভাযাত্রার ভিতর আবদ্ধ রাখতে হবে। ১৯০৪ সালে নূতন ইস্‌ক্রার (নিউ ইস্‌ক্রা) মেন্‌শেভিক সম্পাদকীয় বোর্ডও ঠিক এই মতই প্রচার করেছিল। পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের বদলে জেমস্‌ট্‌ভো এসেম্বলী প্রভৃতির সামনে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার কথা বলেছিল। লেনিন তাদের তীব্রভাবে নিন্দা করেন ও নিম্নলিখিত নীতি নির্ধারণ করেন :

''যদি আমাদের পিছনে শক্তি না থাকে, তাহলে বড় বড় প্ল্যানের কথা না ওঠানোই ভাল। কিন্তু যদি সেই শক্তি আমাদের থাকে তবে তাকে আমরা কশাক বাহিনী ও পুলিশের বিরুদ্ধে সমাবেশ করবোই। আমরা এমন আকারে ও এমন স্থানে জনতাকে সমাবেশ করতে চেষ্টা করবো যাতে কশাক বাহিনী ও পুলিশের হামলাকে হটিয়ে দেওয়া যায় কিংবা অন্তত প্রতিরোধ করা যায়। কথায় নয়—যদি ঐ কাজগুলি করতে আমরা সমর্থ হই—'বুর্জোয়া-বিরোধী শক্তিগুলির উপর চিত্তাকর্ষক সংগঠিত প্রভাব' সম্ভব হতে পারে। তবে বুর্জোয়াদের ভয় না দেখিয়ে নির্বোধ 'আপসে আলোচনা দ্বারা তা হবে না—সেটা করতে হবে শক্তির দ্বারা। সেই শক্তি হল কশাক বাহিনী ও জারের পুলিশের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধের শক্তি এবং জনতার এই আক্রমণাত্মক শক্তিই সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হতে পারে।''' লেনিনের *সিলেক্টেড ওয়ার্কশ্‌ (লরেন্স উইসার্ট) ২ নং খণ্ড পৃ. ৪৮৪।*

যে সংস্কারবাদীরা বলেছিল যে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় ছাড়া, লেনিন আর সব সশস্ত্র

সংঘর্ষ ও জঙ্গী বিক্ষোভের বিরোধী ছিলেন, তারা লেনিনের এই নির্দেশে নিশ্চয়ই চুপ করে যাবে। অপরদিকে লেনিন এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, "গণ প্রতিরোধের" শক্তি এবং "গণ আক্রমণের" শক্তি দ্বারাই পরিস্থিতি "সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হতে পারে"।

২৭শে এপ্রিলের হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় ব্যারিকেড লড়াই এবং জনতা ও পুলিশের ভিতর সশস্ত্র সংঘর্ষ, পটারী ও এলেনবেরী শ্রমিকদের প্রতিরোধ, দেশপ্রিয় পার্কে কংগ্রেসের নির্বাচনী সভায় ও ময়দানে নেহরুর সভায় আক্রমণ, শ্রীরামপুরে জেল ফটকের সামনে বিক্ষোভ, রিষড়া রেল স্টেশনে শ্রমিকদের হামলা—এসবই হল গণ-আক্রমণ। সরকারের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ যখন জেগে উঠেছে, সেই মুহূর্তে এসব আক্রমণ শত্রুর ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেয়। সে কারণেই জঙ্গী ধরনের এসব সমাবেশ জনতার সমর্থন পেয়েছিল। শুধু মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীই ঘ্যান ঘ্যানানি শুরু করেছিল।

এমন কতক ধরনের এ্যাক্‌শন্‌ও আছে যা সত্যই সন্ত্রাসমূলক ও সেইজন্য কোন কোন অবস্থায় অসুবিধাজনক। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। কিন্তু একমাত্র সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের সময়ই বলপ্রয়োগ করা যায় এবং অন্যান্য সকল সময় কমিউনিস্টরা শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ সভা-শোভাযাত্রার ভেতরই তাদের কার্যপন্থা সীমাবদ্ধ রাখবে—এই ধারণা আমাদের কমরেডদের ছাড়তে হবে। এমন পরিস্থিতি এসে যায় যখন শ্রেণিসংগ্রাম খুব উঁচু পর্দায় ওঠে, যখন শাসকশ্রেণিই শান্তিপূর্ণ লড়াই-এর সব পথ রুদ্ধ করে দেয়, যখন জনগণকে বাধ্য হয়েই গৃহযুদ্ধ (সিভিল ওয়ার) চালাতে হয়। ঐ সকল পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ অহিংসার অচলায়তন আবদ্ধ থাকার অর্থই হল জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। লেনিন বলেছেন :

"যে সময়ে শ্রেণি-সংগ্রাম তীব্র হয়ে গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছে, তখন সেই গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেই হবে না, তাতে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করা সোস্যাল ডেমোক্রাটদের অবশ্য কর্তব্য। সোস্যাল ডেমোক্রাটরা তাদের সংগঠনগুলিকে অবশ্যই এমনভাবে শিক্ষিত ও প্রস্তুত করবে যাতে তখন তারা যুদ্ধরত দল হিসাবে লড়তে পারে এবং শত্রুর শক্তির উপর আঘাত হেনে তাকে ঘায়েল করার কোন সুযোগই ছেড়ে না দেয়।" (মার্কস-এঙ্গেলস-মার্কসইজম্, ১৭৪ পৃ.)

ব্ল্যাঙ্কুইজম্, সন্ত্রাসবাদ প্রভৃতির সঙ্গে বৈপ্লবিক ধরনের সংগ্রাম, পার্টিজান যুদ্ধ প্রভৃতির পার্থক্যও লেনিন পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন। লেনিন বলেছেন :

"পুরানো দিনের রুশীয় সন্ত্রাসবাদ ছিল বুদ্ধিজীবী ষড়যন্ত্রকারীদের কাজ। বর্তমানে সাধারণ নিয়ম হিসাবেই সংগ্রামী শ্রমিক কিংবা বেকার শ্রমিক 'পার্টিজান' লড়াই চালাচ্ছে। এতে গতানুগতিক পন্থার প্রতি যাদের মোহ আছে তাদের মনে সহজেই ব্ল্যাঙ্কুইজম্ ও সন্ত্রাসবাদের কথা জাগে। কিন্তু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিস্থিতিতে যে পরিস্থিতি লেটদের দেশে খুবই স্পষ্ট তাতে ঐসব ছেঁদো কথার লেবেল যে খাটেনা তা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয়।" *(ঐ পুস্তক পৃ. ১৬৮, ১৬৯)*

লেনিন এখানে 'সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিস্থিতির' উল্লেখ করেছেন। এ থেকেই কোন কোন কমরেড বলেছেন যে সশস্ত্র-বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখলের সময়েই কেবলমাত্র লড়াই-এর এসব ধরনের কথা বলা হয়েছে। লেনিন নিজে ঐ কথাগুলি কি অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা বুঝতে চেষ্টা না করে শুধুমাত্র কয়েকটি "শব্দের" ভিতর ঘুরপাক খাওয়ার জন্যই ঐ সব ব্যাখ্যার

উদ্ভব হয়েছে। "সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিস্থিতি" কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করে লেনিন নিম্নলিখিত বহুবিধ পরিস্থিতির কথা বলেছেন, যেমন—(১) ডিসেম্বর মাসের লেট দেশের পরিস্থিতি—"ডিসেম্বর মাসে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়েছিল তার সঙ্গে লড়াই-এর নূতন ধরনের সম্পর্ক আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই" (২) এমন পরিস্থিতি—যখন প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘটেনি বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট বিরাজমান—"সমগ্র রুশ দেশের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক এত স্পষ্ট নয়, কিন্তু এ অবস্থা যে বর্তমান তা নিঃসন্দেহ। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, ঠিক ডিসেম্বর মাসের পরই 'পার্টিজান' লড়াই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং শুধু অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা নয়—রাজনৈতিক সংকটের তীব্রতার সঙ্গেও এর সম্পর্ক ছিল।" (৩) সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতগুলির মধ্যকালীন সময় এবং (৪) গৃহযুদ্ধ।

লড়াই-এর ধরন সম্পর্কে লেনিন যে মূলগত নীতি নির্ধারণ করেছেন তা নীচের প্যারাতে দেওয়া হল :

"গৃহযুদ্ধের সময়ে শ্রমিকশ্রেণির আদর্শ পার্টি হল সংগ্রামী পার্টি। এতে আর কোন সন্দেহই নেই। গৃহযুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করে কোন একটি বিশেষ সময়ে গৃহযুদ্ধের কোন একটি বিশেষ ধরনকে অসুবিধাজনক বলে প্রশ্ন তোলা ও তা প্রমাণ করা যে সম্ভব—একথা মেনে নিতে আমরা প্রস্তুত। সামরিক সুবিধার দিক থেকে গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে সমালোচনা গ্রহণ করতে আমরা পুরোপুরি রাজি। আমরা একথা সম্পূর্ণভাবেই স্বীকার করি, বিভিন্ন এলাকায় যে-সব সোস্যাল ডেমোক্রাটরা হাতেনাতে কাজ করছে তারাই এই প্রশ্ন সম্পর্কে চূড়ান্ত মত দেবার অধিকারী। কিন্তু মার্ক্সবাদী নীতির নামে আমরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই এই দাবি করি—নৈরাজ্যবাদ, ব্ল্যাঙ্কুইজম্ ও সন্ত্রাসবাদের একঘেয়ে ও গতানুগতিক বুলির অজুহাতে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতির বিশ্লেষণকে এড়িয়ে যেতে দেওয়া হবে না। আমরা এও দাবি করি যে, সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি সাধারণত পার্টিজান লড়াই-এ অংশগ্রহণ করবে এই আলোচনার সময়ে যেন পোল দেশের সোস্যালিস্ট পার্টির কোন্ কোন্ সংগঠন কখন কোন সময়ে অর্থহীন ধরনে 'পার্টিজান' লড়াই করেছিল—এই জুজু দেখিয়ে বাধা সৃষ্টি করা না হয়।" *(মার্কস-এঙ্গেলস-মার্কসইজম্, পৃ. ১৭১)*

১৯৪৯ সালের এপ্রিল থেকে জুন অবধি কলকাতায় যে বাস্তব অবস্থা বিরাজ করছিল এখন আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব। রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট করেছে। মেয়েদের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর গুলি চলেছে এবং এই হত্যাকাণ্ড লোকের মনে এনে দিয়েছে বিক্ষোভের আগুন। শ্রমিকদের প্রত্যেকটি ধর্মঘট আপনা থেকেই সংঘর্ষে পরিণত হচ্ছে। সরকার একরকম সামরিক আইনই জারি করেছে (যদিও সেটা ঘোষণা করা হয়নি) ফলে সংঘর্ষ ছাড়া কোন ধর্মঘট, সংঘর্ষ ছাড়া কোন শোভাযাত্রা করা যায় না। এই হল তখনকার নিয়ম। জনগণের বিক্ষোভমূলক সভা-শোভাযাত্রার উপর শুধু রাষ্ট্রের পুলিশই আক্রমণ চালাচ্ছে না, পুঁজিপতি ও মন্ত্রীদের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত গুণ্ডাবাহিনীও তার উপর হামলা চালাচ্ছে। রায় মন্ত্রিসভাকে কেন্দ্র করেই জনগণের ঘৃণা ও বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। জনগণ রাগে জ্বলছে, তারা কামনা করছে কেউ এই সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক ও আঘাত দিয়ে সরকারের ক্ষতি করুক—যাতে জনগণ সভা-শোভাযাত্রা বিক্ষোভ করার স্বাধীনতা পায়। এপ্রিল থেকে জুনের ভিতর ঠিক এই পরিস্থিতিই হয়েছিল এবং ঠিক এরূপ পরিস্থিতিই বারবার হয় ও হবেও।

এরকম পরিস্থিতিতে সরকারের বাহিনী, সরকারের প্রতিষ্ঠান, সরকারি ঘাঁটি, তাদের সমাবেশ ও জৌলুষের উপর সশস্ত্র আক্রমণ শুধু যে ফলপ্রসূ তাই নয়, জনগণও তাকে উল্লাসের সঙ্গে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। শুধুমাত্র অতি পণ্ডিত নীতিকপ্‌চানোওয়ালা ও বচন বাগীশেরা পূর্বাপর অর্থ থেকে লেনিনের উদ্ধৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়ে ও জ্বলন্ত বাস্তবতাকে অস্বীকার করে ঐ সব কাজকে নিন্দা করতে পারে। "মার্কসবাদ শুধু একটি সূত্র নয়—মার্কসবাদ কাজের নির্দেশক"—এই কথাটি লেনিন শুধু শুধুই বারে বারে বলে যাননি।

এক্ষেত্রে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি লেনিনের পরিচালনায় নিম্নলিখিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি নির্ধারণ করেছে :

"বর্বর সরকারি কর্মচারি ও ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডের সক্রিয় সভ্যদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী ধরনের 'পার্টিজান' কাজ অনুমোদন করা হয়েছিল। কিন্তু তা এই শর্তে যে— (১) জনসাধারণের মনোভাব বিচার করতে হবে (২) সেই বিশেষ এলাকার শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থানকে বিচার করে দেখতে হবে এবং (৩) শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি যাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে না যায় সে দিকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।" (মার্কস-এঙ্গেলস-মার্কসইজম্, পৃঃ ১৭৩ ফুটনোট)

পটারীতে, এলেনবেরী কারখানায়, দেশপ্রিয় পার্কের সভায়, নেহরুর সভায় ও অগণিত গ্রামে পুলিশ ও জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধ কিন্তু 'পার্টিজান' কাজ নয়— এগুলি হল জনগণের প্রতিরোধ। কিন্তু উল্লিখিত নীতিগুলিও এ ধরনের প্রতিরোধের বেলায় প্রযোজ্য। দমদম ও রিষড়ার ঘটনাবলীই ঠিক 'পার্টিজান' কাজ। একটি হল ভুল, অন্যটি হল সঠিক 'পার্টিজান' কাজের উদাহরণ।

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে দমদমে যে ঘটনা ঘটে তাকে পেটি বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদ বলে সঠিকভাবেই নিন্দা করা হয় ও পার্টির সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই বলে ঘোষণা করা হয়। সমগ্র জনসাধারণ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে ও জনসাধারণের আবেগ খুব উঁচু পর্দায় উঠেছে—এমন কোন পরিস্থিতির সঙ্গে ঐ কাজের কোন সম্পর্ক ছিল না। রেল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের তারিখের কয়েকদিন আগে ঐ ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। দমদমের ঘটনা হওয়ার ফলে রেল শ্রমিকগণ ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই সরকার রেল শ্রমিকদের উপর ব্যাপক হামলা চালানোর সুবিধা পেয়ে যায়। যারা ঐ কাজ করেছিল তারা তখন ধর্মঘট সংগঠিত করার জন্য কিছুই করেনি—কিন্তু দমদম বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ ও বসিরহাটে স্বাধীনতা ঘোষণার মত অর্থহীন কাজে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করে দেয়। এই হল ঠিক ঠিক পেটি বুর্জোয়া ক্যুপ্‌ (coup)। পেটি বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদীরা ঠিক এই ধরনের কাজকেই রেল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের চেয়ে উন্নত ধরনের বৈপ্লবিক কাজ বলে মনে করে। সবদিক দিয়ে বিচার করেই বলা যায় ঐ ধরনের কাজ হল প্ররোচনা মূলক।

রিষড়ার ঘটনা হয় এমন সময়ে যখন মেয়েদের উপর ও জেলে গুলি চলার পর সমস্ত প্রদেশ দাবানলের মত জ্বলে উঠেছিল। সরকারের ক্ষমতার প্রতিটি নিদর্শনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল জনগণের জ্বলন্ত ঘৃণার কেন্দ্র, তখন একটা ছোটখাটো গৃহযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। রিষড়ার ঘটনা দমদমের মত সরকারের হামলাকে আরো শক্তি জুগিয়ে দেয়নি—বরং তখন জনতার একটানা আক্রমণের ফলে সরকারের হামলার শক্তি ধসে যাচ্ছিল। দমদমের ব্যাপার ছিল একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা আর রিষড়ার ছিল বহু ঘটনাবলীর একটি গ্রন্থি। ঐ ঘটনাবলী হল জনতার বিরাট

অভিযান—যাতে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের সুর বদলাতে বাধ্য হয় ও ঘোষণা করে যে, সাধারণ নির্বাচনই হ'ল একমাত্র প্রতিকার। জনতার ঐ অভিযানে বিপক্ষে যুদ্ধরত বুর্জোয়াদের কোন কোন অংশও খরচের কাগজে ও বক্তৃতামঞ্চ থেকে ঘোষণা করতে বাধ্য হয় যে, দমননীতিতে অবস্থার প্রতিকার হবে না। দারিদ্র্যের সমস্যা দূর করার জন্য একটা কিছু করতেই হবে। এইভাবে রিষড়ার ঘটনা ছিল দমদমের ঘটনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

১৯৪৮ সালের মার্চ থেকে ১৯৪৯ সালের জুন পর্যন্ত সংস্কারপন্থার প্রধান ধরন ছিল সমস্ত আংশিক লড়াই এমনকি শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটকে পর্যন্ত বাধা দেওয়া। তখন যুক্তি দেখানো হত ধর্মঘট সম্ভব নয়—কেননা প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী, আন্দোলনের জোয়ারও আর নেই। ব্যাপক বৈপ্লবিক লড়াই-এর সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও বর্তমানের জন্য 'হঠাৎ মেরে সরে পড়ার' নীতি অনুসরণ কর—এইভাবে পার্টির ভিতরে সংস্কারবাদ চালানো হত। বৈপ্লবিক লড়াই-এর উদ্দীপনা নেই এই কথা বলে সাধারণ রেল ধর্মঘটের আহ্বানকে অতি দুঃসাহসিক কাজ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে সংস্কারবাদীরা শ্লোগান বদলে নেয়। এখন জঙ্গী কাজ ও বিক্ষোভের বৈপ্লবিক ধরনকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ ও অতিবামপন্থা এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও আংশিক লড়াইকে বাতলানো হচ্ছে সঠিক কর্তব্য বলে। এখন আংশিক লড়াই-এর ধুয়া তুলে বৈপ্লবিক লড়াইকে নিন্দা করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে যেখানেই সংস্কারবাদীরা নেতৃত্বের পদে রয়ে গেছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই আংশিক লড়াই-এর সাবোতাজও চলেছে।

এই হল সংস্কারবাদের বিশ্বাসঘাতক রূপ। ইহা সব সময়ই পার্টিকে পিছনে টেনে রাখে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার নীতি প্রচার করে এবং চরম মুহূর্তে শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

(৪)

লড়াই পরিত্যাগ করা বা লড়াই-এর উঁচু ধরনকে পরিত্যাগ করা ছাড়াও আরও বহু ধরনে সংস্কারবাদ আত্মপ্রকাশ করে। পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদও সংস্কারবাদের একটি বিশেষ ধরন এবং ইহা পশ্চিমবঙ্গের পার্টির ভিতর খুব গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। এই ভাবধারা বিভিন্ন ধরনে প্রকাশ পায় এবং এর প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক শক্তির গতিবেগ আটকে দেয় ও জনগণকে সুবিধাবাদীদের কবলে সঁপে দিয়ে বুর্জোয়ার শাসনকেই করে দীর্ঘস্থায়ী।

প্রথমত শ্রমিকদের জঙ্গী গণ প্রতিষ্ঠান—ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তুলে দেওয়ার ভিতর দিয়ে এই ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে। দমননীতি সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়নগুলির বৈধ কাজ চালিয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টা হয় না। অফিস না খোলা, শ্রমিকদের দৈনন্দিন চাহিদার প্রতি নজর না দেওয়া, সভ্যদের চাঁদা, ফাণ্ড তোলা প্রভৃতি অভিযান না চালানো, বি-পি-টি-ইউ-সি ও এ-আই-টি-ইউ-সি'র অফিসে রিপোর্ট না পাঠানো, এ-আই-টি-ইউ-সি'র অফিসের চিঠিপত্রের জবাব না দেওয়া—এগুলি হল শ্রেণি সংগ্রামের অতি প্রাথমিক নিয়মের ব্যতিক্রম। এমনকি, ইউনিয়নগুলির কার্যকরী সমিতির স্বাভাবিক কাজকর্ম পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। ইউনিয়নগুলির সভ্য সংগ্রহের অভিযান ত হয়-ই না। এইভাবে বুদ্ধিজীবীদের চক্র শ্রেণি সংগঠনের স্থান জুড়ে বসেছে। বহুবারই বি-পি-টি-ইউ-সি থেকে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছে—কিন্তু

শ্রমিকদের ভিতর প্রবল বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ধর্মঘট হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ২৭শে এপ্রিল মেয়েদের হত্যাকাণ্ডের পরের অবস্থার কথা। এ সব ব্যর্থতার একটি কারণ হল, আমাদের টি-ইউ নেতারা শ্রমিকদের নিকট যায় না—শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করে না। ইহা অতি বাস্তব ঘটনা। তাদের কেউ কেউ এমন হতাশাবাদী যে এদের সংশোধনের কোন আশা নেই এবং শ্রমিকশ্রেণির উপর কোনও আস্থাও এদের নেই। অন্যান্যরাও হতাশ হয়ে পড়ে—কারণ তারাও ইউনিয়নের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করে না। ট্রেড ইউনিয়নগুলির বৈধ কাজ পরিচালনার পক্ষে অপরিহার্য এরূপ বহু ভাল ভাল কর্মী আমরা হারিয়েছি। এর কারণ হল ঐসব কাজের গুরুত্ব খুব কম দেওয়া হয়। যেমন বলা যায় শ্রমিকদের সমাবেশ ছাড়াই মিছিল করে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করার চেয়েও এইসব কাজের গুরুত্ব খুব কম দেওয়া হয় (বোম্বাই এ-আই-টি-ইউ-সি অধিবেশনে বাংলার কমরেডদের মনোভাব)। অনেক ক্ষেত্রে পাইকারী গ্রেপ্তার প্রভৃতির ফলে কর্মীদের হারানোটা অবশ্যম্ভাবী হয়েছে বটে। কিন্তু, এভাবে যে সব পদ খালি হয়ে যায় তাকে আবার পূরণ করার জন্য ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতিকে অনবরত চেষ্টা করতে হবে। এভাবে চেষ্টা না করার অর্থই হল সরকারি শ্রমিকগণ যখন নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই সংস্কারবাদী ইউনিয়নগুলির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে তখন, ইউনিয়নের দৈনন্দিন কাজ, শ্রমিকদের ভালমন্দ জড়িত এমনসব ব্যাপারে ইউনিয়নের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ইউনিয়নের এগিয়ে এসে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের সমাবেশ করা ইত্যাদি অতি জরুরি। কোন কোন ফ্যাক্টরী ও মিলে সংস্কারবাদীদের ইউনিয়নের প্রভাব যদি এখনো থেকে থাকে, তার কারণ হল, আমাদের কমরেডরা শুধু নামে ছাড়া বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নের কাজের আর সবই তুলে দিয়েছে। সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রভাবকে মুছে ফেলা ও শ্রমিকশ্রেণির ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নের দৈনন্দিন কাজ অপরিহার্য। যে-কোন অজুহাতেই হোক না কেন ট্রেড ইউনিয়নের কাজ সাবোতাজ করলে তা গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হবে। আর তার শাস্তি হবে পার্টি থেকে বহিষ্কার।

গণ সংগঠন তুলে দেওয়ার (লিকুইডেশনিস্ট) নীতি শুধু ট্রেড ইউনিয়নেই অনুসৃত হয়নি—সমস্ত গণ সংগঠনেই হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদীরা ক্ষমতা দখল, লড়াই-এর উচ্চতর ধরন প্রভৃতি সম্পর্কে বড় বড় বুলি আওড়ায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে, কারখানায়, মিলে আই-এন-টি-ইউ-সি ও সোস্যালিস্ট পঞ্চায়েত নেতাদের মুখোশ খুলে দেয় না, সাধারণ শ্রমিকদের নেতৃত্বের বৈপ্লবিক হাতিয়ার গড়তে অস্বীকার করে ও শ্রমিক সাধারণকে সমাবেশও করে না। এটাও অত্যন্ত প্রাথমিক ধরনের সংস্কারবাদী।

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে হাওড়ার ২ নং রাধাকৃষ্ণ মিলে 'বি' শিফ্ট্ বন্ধ করা প্রতিরোধ করতে আমাদের কমরেডরা খুব সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেছিল। একজন শ্রমিক গ্রেপ্তার হয়—৩০০ শ্রমিক থানায় ছুটে যায় ও ধৃত শ্রমিকের মুক্তি আদায় করে। কোম্পানি লক-আউট ঘোষণা করে, ফলে শ্রমিকদের ভিতর প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়। কিন্তু এই ঘটনার পরে এক জনসভায় সোস্যালিস্টরা প্রস্তাব করে যে লক-আউট তুলে নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশন পাঠানো হোক। আমাদের কমরেডরা সোস্যালিস্টদের এই কারসাজি ফাঁস করে না দিয়ে সেই প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। কিন্তু সোস্যালিস্টদের আপস প্রস্তাব (অর্থাৎ 'বি' শিফ্টের প্রশ্ন

ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করা হোক) মেনে নিয়ে মিল চালু হতে দিতে শ্রমিকগণ নিজেরাই রাজি হল না এবং ধর্মঘটও চলতে থাকে। অথচ আমাদের কমরেডরা সবরকম সম্ভাব্য উপায়ে সোস্যালিস্ট নেতাদের মুখোশ খুলে দিতে কোন প্রকার সংগঠিত চেষ্টা করল না।

হাওড়ার রাধেশ্যাম মিল আই-এন-টি-ইউ-সির শক্ত ঘাঁটি। তারা দাস ও বীণা ভৌমিক হল ওদের নেতা। এই মিলে ২৫০ জন শ্রমিক ছাঁটাই হয়। আমাদের কমরেডরা বেশ ভালভাবেই প্রচার আন্দোলন করে, যার ফলে তারা দাস ধর্মঘটের আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে বীণা ভৌমিক ও তারা দাসের ধর্মঘট-বিরোধী মনোভাব ফাঁস করে দেওয়ার জন্য কোন প্রচার হয়নি। কর্তৃপক্ষ লক-আউট ঘোষণা করে দেয়। আমাদের কমরেডরা তৎক্ষণাৎ জোর করে কারখানা দখল করার শ্লোগান দেয়। তারা দাস সফলভাবেই এই শ্লোগানের সুযোগ নেয় ও বলতে থাকে যে ওটা হল স্ট্রাইক ভাঙ্গার শ্লোগান। এক্ষেত্রে আমাদের কমরেডরা শ্রমিকদের মনোভাব বুঝতে পারেনি। আমাদের কমরেডদের তখন কর্তব্য ছিল, শ্রমিকদের ধর্মঘটে অটল থাকতে ও নেতাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে আহ্বান করা। কারখানা দখলের শ্লোগানের বদলে র‍্যাঙ্ক এ্যাণ্ড ফাইল স্ট্রাইক কমিটি গঠনের শ্লোগান দেওয়া উচিত ছিল। সংস্কারবাদীদের প্রভাব দুর করার জন্য এটাই হত বাস্তব লড়াই। র‍্যাঙ্ক এ্যাণ্ড ফাইল স্ট্রাইক কমিটির জন্য প্রচার—এই বাস্তব বৈপ্লবিক পথ গ্রহণ না করে আমাদের কমরেডরা খুব গরম বুলি ছেড়ে দিল—"কারখানা দখল কর।" ফলে, আমরা বেইমান আই-এন-টি-ইউ-সি নেতাদের হাতের পুতুল হয়ে গেলাম। র‍্যাঙ্ক এ্যাণ্ড ফাইল স্ট্রাইক কমিটি ছাড়া কারখানা দখল—শ্রমিকশ্রেণিকে বাদ দিয়ে শ্রমিক বিপ্লব করতে যাওয়ার সামিল।

২৭শে জুন ন্যাশনাল কার্বন ফ্যাক্টরীর শ্রমিকগণ লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে বাহাদুরীর সাথে লড়াই চালায়। কারখানার দরজায় সংঘর্ষ ঘটে। কিন্তু, গুরুতর লড়াই-এর সময়ে অধিকাংশ শ্রমিকই দর্শকের মত দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশ কারখানা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম দিলে তারা বিনা প্রতিবাদেই বেরিয়ে আসে। এই কারখানাতেই ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে সব শ্রমিকরা একযোগে ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সংস্কারবাদীদের প্রভাবের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালানো হয়। কিন্তু ঐ দিন আশু প্রশ্ন যা ছিল—অর্থাৎ অনশনী বন্দীদের সমর্থনে বিক্ষোভ করা তা শ্রমিকদের কাছে মোটেই ব্যাখ্যা করা হয়নি। সাধারণ শ্রমিকদের অজ্ঞাতে মুষ্টিমেয় শ্রমিকদের নিয়ে এক ষড়যন্ত্রমূলক প্ল্যান করা হয়। শ্রমিকগণ কিছু জানতো না—কিছু বুঝতেও পারেনি। এরকম হবার কারণ এই যে, আমাদের কমরেডরা প্রায়ই ধারণা করে যে, অধিকাংশ শ্রমিকের ধর্মঘটের চেয়েও অল্প সংখ্যক শ্রমিক নিয়ে 'ঘেরাও' বা 'পিটাও' উঁচু দরের লড়াই। এ হল পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদী ধারণা ও মার্কসবাদকে অস্বীকার করা। মার্কস-লেনিনবাদীদের নিকট মুষ্টিমেয় শ্রমিক নিয়ে 'ঘেরাও' কিংবা 'পিটানোর' চেয়ে ধর্মঘট সব সময়ই লড়াই-এর উঁচু ধরন। 'ঘেরাও', 'পিটাও' লড়াই-এর উঁচু ধরন হয় তখুনি—যখন এগুলি বহু সংখ্যক শ্রমিকের ধর্মঘট বা গণ-বিক্ষোভ থেকে উদ্ভুত হয়।

এলেনবেরী শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই আমরা যে-ভাবে পরিচালনা করেছি সেটা হল পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদ—অর্থাৎ বিপ্লববাদের ছদ্মবেশে সংস্কারবাদের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কারখানা শ্রমিকদের দখলে ছিল ১০ দিন ও কারখানার উপরে লাল পতাকা পত্ পত্

করে উড়ছিল। দাবি পূরণ না হলে কারখানা ছেড়ে যেতে শ্রমিকগণ অস্বীকার করে। পুলিশ ১০ দিন কারখানার কাছে ঘেঁসতে সাহস পায়নি। এলেনবেরী সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণির ভিতর যতটুকু প্রচার হয়েছিল অতে প্রচুর সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু, "এলেনবেরী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াও" এই আওয়াজ নিয়ে একটি সংঘবদ্ধ অভিযান চালানো হল না—এমনকি সকল অংশের ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের ভিতরও এই আওয়াজ তোলা হয়নি। যদি ঐ আওয়াজকে একটা মূল বিষয় বলে ধরে—কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল—হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা হতে শ্রমিকদের জৌলুস (মিছিল) এলেনবেরী কারখানায় নিয়ে আসা হত, যদি সেই শ্রমিকদের সামনে এলেনবেরীর শ্রমিকগণ আই-এন-টি-ইউ-সি ও সোস্যালিস্ট নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা, সরকারের ছাঁটাই ও মজুরি কাটার নীতি এবং শ্রমিকশ্রেণির একতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারতো এবং তারপর যদি সেই শ্রমিকেরা নিজেদের ফ্যাক্টরীতে মিলে ফিরে গিয়ে এগুলি আবার বলতো—তাহলে যেদিন পুলিশ জোর করে কারখানা থেকে এলেনবেরী শ্রমিকদের বের করে দেয় সেদিন সাধারণ হরতাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এগুলি করার বদলে এলেনবেরী শ্রমিকদের সামনে আওয়াজ তোলা হল—"উৎপাদন চালু কর"—যেন, সরকার উচ্ছেদ হয়ে গেছে, কারখানাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে এবং বাকি আছে শুধু উৎপাদন চালু করা। এই হল বিপ্লবের ছদ্মবেশে পুরোপুরি যোশীবাদ।

ঠিক এই বিষয়টাকেই পি-সি সেক্রেটারীয়েটের এক সভায় বাতিল করে দেওয়া হয়—যদিও কোন কোন কমরেড বার বার এই কথা বলেন যে, "উৎপাদন চালু করার শ্লোগান খুবই বিপ্লবী—কেননা এর অর্থ কারখানা বাজেয়াপ্ত করা। সঙ্গে সঙ্গে এই রিপোর্টও পাওয়া যায় যে, কোন একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার আমাদের কোন কমরেড এলেনবেরী শ্রমিকদের সমর্থনে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকের সাধারণ হরতালের বিরোধিতা করে। সে এই ভূয়া যুক্তি দেয় যে, সেই কারখানায় অর্থনৈতিক সংকট যাচ্ছে—কাজেই ধর্মঘট ক্ষতিকর হবে। তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দেখিয়ে দেন যে, কারখানা বাজেয়াপ্ত করার কথা নিজেদের ফাঁকি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, এলেনবেরীর শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধভাবে ধর্মঘট চালাচ্ছে—উৎপাদন চালু করার অর্থ হবে ধর্মঘট ভেঙ্গে দেওয়া; অন্তত সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের এলেনবেরীর সমর্থনে জমায়েত করতেই হবে।"

টালিগঞ্জ এলেনবেরী ফ্যাক্টরীতে এই প্রচেষ্টা করা হলে চমৎকার সাড়া পাওয়া যায়—ফলও হাতে নাতে পাওয়া গেল। এলেনবেরীর এই ফ্যাক্টরীর শ্রমিকগণও তৎক্ষণাৎ কারখানা দখল করে নেয়। কিন্তু এলেনবেরী শ্রমিকদের স্কোয়াড অন্যান্য শ্রমিকদের কাছে নিয়ে যাওয়া বা অন্যান্য শ্রমিকদের স্কোয়াড এলেনবেরী শ্রমিকদের কাছে নিয়ে আসা—এ বিষয়ে ভাল করে কোন প্রচেষ্টাই হল না। এলেনবেরী শ্রমিকদের উৎপাদন চালু করতে বলে কেন্দ্রের নির্দেশ অমান্য করা হল। শ্রমিকদের শক্তি গেল ক্ষুণ্ণ হয়ে, তাদের লড়াই একটা স্থানে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলো এবং শ্রমিকদের সতর্কতাও নষ্ট করে দেওয়া হল। বিপ্লবী বুলি আউড়ে, কিভাবে সংস্কারবাদ দ্বারা শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রতি বেইমানী করা হয়—এ হ'ল তারই একটি দৃষ্টান্ত।

জুলাই মাসে, নেহরুর কলিকাতায় আগমনের কিছুদিন আগে দক্ষিণ কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকগণ বোনাস আদায়ের জন্য ধর্মঘট করে ট্রাম চলাচল অচল করে দেয়। সাধারণ শ্রমিকদের একতা গড়ে তুলে সারা কলিকাতার ট্রাম চলাচল অচল করে দেওয়ার চমৎকার

সুযোগ এসেছিল। কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্শনে তা করা গেল না, কারণ আমাদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ট্রাম শ্রমিক সোস্যালিস্ট পঞ্চায়েতের সাথে একযোগে ধর্মঘট করতে অস্বীকার করে, ধর্মঘটের বিরোধিতা করে। এটা ধর্মঘটের প্রতি পরিষ্কার বিশ্বাসঘাতকতা এবং পার্টির নির্দেশ অমান্য করেই তারা এই কাজ করেছিল। কিন্তু তবুও সাধারণ কর্মীদের সামনে সেই নেতাদের মুখোশ খুলে তো দেওয়াই হল না—বরং তাদের প্রধান প্রধান পদে বহাল রাখা হল।

ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট হল না। কারণ, কোম্পানি কৌশল করে সোজাসুজি ছাঁটাই না করে মাসে এক হপ্তা করে কল বন্ধ রাখলো ও বন্দী হওয়ার জন্য আধা বেতন দিতে লাগলো। কোন কোন মিলে ধর্মঘট হল বটে—কিন্তু সেগুলিকে অন্যান্য মিলে ছড়িয়ে দেওয়া গেল না বলে সেগুলি আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যায়। ব্যাপারটা হল এইরূপ—কোন কোন পার্টি নেতা বলতে লাগলো "স্ট্রাইক ছড়িয়ে দাও", কোন কোন স্থানীয় নেতা ফিরে জবাব দিল "ধর্মঘট করার মনোভাব শ্রমিকদের নাই" এবং তখন "ছাঁটাই হোগী ত পিটাই হোগী" এই আওয়াজ দিয়ে একটা মাঝামাঝি পথ বের করা হল। এই আওয়াজ অগ্রসর শ্রমিকদের শক্তি ও উৎসাহ বিক্ষিপ্ত করে দিল এবং অনগ্রসর শ্রমিকদের মানসিক উত্তেজনা দিল কমিয়ে। যখন কামারহাটি ও বজবজের কোন কোন মিলে ধর্মঘট হয় তখন তাকে আশেপাশের মিলগুলিতে ছড়িয়ে দেবার জন্য গভীরভাবে কোন চেষ্টাই হলনা। মিল মালিকদের কৌশলকে শ্রমিকদের সামনে প্রত্যক্ষভাবে ফাঁস করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোম্পানি যখন এরূপ কৌশল অবলম্বন করে তখন অনগ্রসর শ্রমিকগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই সময়ে পরিষ্কার ভাষায় সমস্ত জিনিসটি বলে না দিলে তারা লড়াই করার উৎসাহ পায় না। আই-এন-টি-ইউ-সি ও সোস্যালিস্ট নেতারা শ্রমিকদের বলেছিল আধা তলবে বন্দী হপ্তা মেনে নিতে। প্রয়োজন ছিল ঐ বেইমানদের মুখোশ খুলে দিয়ে নিরলস একটানা প্রচার। মালিকদের নতুন চালকে প্রচার আন্দোলনে সোজাসুজি আক্রমণ করা প্রয়োজন ছিল—দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যে ওটা হল "পেছনের দরজা দিয়ে ছাঁটাই", "শ্রমিকদের পকেট মেরে সব দুর্দশাই সমানভাবে বাড়ানো", "শ্রমিকদের মজুরি চুরি"। আই-এন-টি-ইউ-সি যেসব শ্লোগান দিয়েছিল, যেমন—"বেকারির চেয়ে বিনা কাজে আধা তলব ভাল", "মালিকদের দুর্দশার ভাগ শ্রমিকদের নেওয়া উচিত?" "আধা তলবে বন্দী হপ্তা হল সব শ্রমিকদের ভিতর দুর্দশাকে সমানভাবে বিতরণ করে দেওয়া"—এগুলির সঙ্গে আমাদের শ্লোগানগুলির তফাৎ দেখিয়ে—এগুলিকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা উচিত ছিল। ঐ প্রত্যেকটি শ্লোগানকে ধরে ধরে ওগুলির শঠতা ফাঁস করে দিয়ে, যে বেইমানরা ঐ সব শ্লোগান দিয়েছিল তাদের নাম করে করে প্রবল প্রচার আন্দোলন চালানো ছিল প্রয়োজন। চটকল ইউনিয়নগুলির ইস্তাহারে ওরূপ প্রত্যক্ষভাবে মুখোশ খোলা হয়নি। তাতে ছিল, 'জ্বালাও', 'পিটাও', 'ফাটাও' সম্পর্কে সাধারণ বুলি ও শ্লোগান।

মুখোশ খোলার প্রত্যক্ষ প্রচার এবং আন্দোলনই আই-এন-টি-ইউ-সি'র শঠতাপূর্ণ শ্লোগানগুলি সম্পর্কে শ্রমিকদের চোখ খুলে দেয়, পেছনে পড়া শ্রমিকদের মনে জাগিয়ে তোলে বিক্ষোভ এবং শ্রেণি সচেতন অগ্রণী অংশকে উদ্যোগী করে তোলে। কারখানার ভিতরে, শুধু ইস্তাহারে নয়, সমস্ত দিক দিয়ে এইভাবে দালালদের চাল ফাঁস করে দিতে পারলে শ্রমিকগণ

চমকপ্রদ সব কাজ করতে পারে। পার্টির তরফ থেকে নিরলসভাবে ছাঁটাই নীতির স্বরূপ খুলে দিয়ে এবং ছাঁটাই প্রতিরোধ করার একমাত্র পথই হল সাধারণ ধর্মঘট—এই আন্দোলন চালিয়ে চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। এভাবে পুরো এক বছর আন্দোলন চালানোর পর মালিকদের পক্ষে চটকলে ছাঁটাই করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ছাঁটাই হলেই ধর্মঘট হয়। সাধারণ ধর্মঘটের আওয়াজ কত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা দেখা যায় যখন ৯ই আগস্টের ময়দানে আই-এন-টি-ইউ-সি ও বি-পি-সি-সি'র আহূত সভায়ও নেতারা বাগাড়ম্বর করতে বাধ্য হয় যে, ছাঁটাই হলে সাধারণ ধর্মঘট করা হবে। সাধারণ ধর্মঘটের একমাত্র উল্লেখেই জনতা প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনি করে। কিন্তু যখন ঐ নেতারাই আবার বলে যে, হপ্তাবন্দী ছাঁটাই নয়, তখন শ্রমিকগণ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। পার্টির কর্তব্য হল, কারখানায় ও বস্তিতে দিনের পর দিন প্রচার করে যাওয়া, দালালদের মুখোশ খুলে ধরা—তা হলেই শ্রমিকগণ ওদের বিশ্বাসঘাতকতাটা বুঝতে পারবে।

সাধারণ মজুরদের নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য মিল কমিটি ও কারখানা কমিটি সংগঠিত করা হয় না। যেখানে লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন শক্তিশালী এমনকি সেখানেও ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতি বা ইউনিয়ন নেতাদের পাঁচমেশালী একটা দলই ধর্মঘট পরিচালনা করে। যদি এইসব কারখানাতে সাধারণ মজুর নেতৃত্বের জন্য আমরা নিজেরা হরতাল কমিটি ও মিল কমিটির ঐতিহ্য সৃষ্টি করে দিই—তা হলে সে ভাবধারা ছড়িয়ে পড়বে ও শ্রমিকেরা সেটা গ্রহণ করবে এবং তার ফলেই বেইমান সংস্কারবাদী নেতাদের কবর হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা নিজেরাই শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারপন্থী নীতি অনুসরণ করি এবং সেই জন্যই শ্রমিকদের জঙ্গীপনা খুব জেগে উঠলেও আমরা সংস্কারবাদীদের হটাতে পারিনা। "সাধারণ মজুরদের নেতৃত্ব চাই" এই আওয়াজ নিয়ে সমস্ত শ্রমিকদের স্বপক্ষে টেনে আনার জন্য কারখানায় ও বস্তিতে প্রচণ্ড অভিযান চালাতেই হবে। ছোট বড় সব ব্যাপার—রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক, ধর্মঘট বা বিক্ষোভ প্রদর্শন এমনকি দরখাস্ত বা ডেপুটেশন সম্পর্কে হলেও তা 'র‍্যাঙ্ক এ্যাণ্ড ফাইল' মিল কমিটির সামনে পেশ করতে হবে ও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারখানা কমিটিতে আই-এন-টি-ইউ-সি, সোস্যালিস্ট ও অন্যান্য সুবিধাবাদী নেতাদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। যদি আমরা আমাদের কারখানায় কারখানায় এ কাজ শুরু করে দিই তা হলে 'র‍্যাঙ্ক এ্যাণ্ড ফাইল নেতৃত্বের' দাবি সমস্ত ধরনের সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের শ্লোগান হয়ে দাঁড়াবে।

(৫)

প্রাদেশিক কমিটি যে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলন চালিয়েছে তাতে পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদের চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ পরিস্থিতির বাস্তব রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে ও যে-সব প্রত্যক্ষ শ্লোগান জনতাকে সমাবেশ করতে পারে সেগুলি ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবী বুলি কপচানো হয়েছে।

রাজবন্দীদের অনশন সম্পর্কে ১৪/৬/৪৯, ১৯/৬/৪৯ ও ২৪/৬/৪৯ তারিখে যে তিনটি ইস্তাহার দেওয়া হয়েছে তাতে ইহা দেখা যায়। এই তিনটি ইস্তাহারে একটি সমগ্র বিপ্লবী যুগের বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী সব শ্লোগানই দেওয়া হয়েছে এবং এরপর আর কোন শ্লোগানই বাকি থাকে না। ঐ সব ইস্তাহারে 'কংগ্রেসীদের পিটাও', 'তাদের বাড়িতে আগুন লাগাও' প্রভৃতি নানা প্রকার আপত্তিকর শ্লোগান দেওয়া হয়েছে। যেসব শ্লোগান এখন কার্যকরী

করা সম্ভব নয়, তাও দেওয়া হয়েছে—যেমন জেল আক্রমণ কর, জেল গেট ভাঙ্গো ও বন্দীদের ছিনিয়ে আন। মন্ত্রীদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণারও আওয়াজ তোলা হয়েছে। কিন্তু 'সরকারকে নিন্দা করে প্রস্তাব পাশ কর', 'মন্ত্রীদের অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি কর' ও 'রাজবন্দীদের বিনা শর্তে আশু মুক্তির দাবিতে প্রস্তাব পাশ' ইত্যাদি যেসব শ্লোগানকে এখনই কার্যকরী করা যেতে পারে এরূপ শ্লোগান সেসব ইস্তাহারে দেখতে পাওয়া যায় না। এসব শ্লোগানকে খুবই ভালো মনে করে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক কমিটির এই মনোভাব জনগণ হতে বিচ্ছিন্নতা ও প্রচার আন্দোলন সম্পর্কে মার্কস-লেনিনবাদী নীতির অজ্ঞতার পরিচায়ক।

জেল গেট ভাঙ্গো ও জেল থেকে জোর করে বন্দীদের ছিনিয়ে নাও—বর্তমান অবস্থায় এসব শ্লোগান কার্যকরী করা যায় না। ওগুলি যখন করা যাবে তখন ক্ষমতা দখল করা যাবে। সশস্ত্র বিদ্রোহের সময়েই ঐসব শ্লোগান দেওয়া হয়। এবং সেগুলি কার্যকরীও করা যায়। যেসব শ্লোগান স্বতঃসিদ্ধভাবেই কাজে পরিণত করা যাবে না সেসব শ্লোগানে কখনও জনগণ এগিয়ে আসে না। প্রচার আন্দোলনের (এজিটেশন্যাল) ইস্তাহারে এরূপ শ্লোগান দিলে পার্টির রণধ্বনির প্রতি জনগণের বিশ্বাস কমে যায় এবং তারা বিরক্তও হয়ে ওঠে। এতে আমাদের জনসমাবেশের ক্ষমতা কমে যায় এবং যে পরিস্থিতিতে ঐসব শ্লোগান কার্যকরী করা সম্ভব—সেই পরিস্থিতি বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জুন মাসের দিনগুলিতে, অনশনী বন্দীদের দাবিপূরণ ও বিনা শর্তে তাদের আশু মুক্তির দাবি নিয়ে জেলের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনের শ্লোগান হত সঠিক। এরূপ শ্লোগানই তখনকার পরিস্থিতির চাহিদা ও জনগণের মনোভাবের উপযোগী ছিল। এরূপ রণধ্বনি কাজে পরিণত করার জন্যই জনতা এগিয়ে এসে সমবেত হয়েছিল—এইসব সমাবেশে তাদের এইভাবে আরও বেশি সংগঠিত করা যেত। এবং পুলিশ হামলা করলে জনতা তা রুখতেও এগিয়ে যেত। কিন্তু জেলের উপর আক্রমণ চালিয়ে গেট ভেঙ্গে বন্দীদের ছিনিয়ে আনার শক্তি পার্টির ছিল না। এসব শ্লোগান কাজে পরিণত করার জন্য জনগণকে সমাবেশ করতে পার্টি পারে নাই। পার্টি বিশ্বাসও করে নাই যে ঐ পরিস্থিতিতে এরূপভাবে জনগণকে সমাবেশ করা যাবে। কাজেই ওরকম আওয়াজ তোলা পেটি বুর্জোয়া ছেলেমানুষি। একেই বলে ফাঁকা বুলি আওড়ানো।

'কংগ্রেসীদের পিটাও', 'তাদের বাড়িতে আগুন লাগাও' প্রভৃতি শ্লোগানগুলি হল উস্কানীদাতাদের শ্লোগান। এগুলিতে শত্রুর লাভ হয় এবং জনগণের সংগ্রামী উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

বিপ্লবী লড়াই-এ, জনগণের রূপ ও ঘৃণা পুলিশ-অত্যাচারী জমিদার, কারখানার ম্যানেজার প্রভৃতি সুপরিচিত দুষমণদের বিরুদ্ধেই কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। যখন কোন একটি সমগ্র এলাকায় জনগণের ঘৃণা ও বিক্ষোভ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন ক্ষমাহীনভাবে শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার শ্লোগান দেওয়া কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সঠিক। কিন্তু এখনো কংগ্রেসীগণ কিংবা কংগ্রেসী নেতারাও অধিকাংশ জনগণের চোখে একেবারে এত জঘন্য শত্রু বলে গণ্য হয়ে পড়েননি যাতে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার আওয়াজ দেওয়া যায়। এখনও জনগণের শোভাযাত্রা প্রভৃতির উপর পুলিশ হামলা না করলে, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুলিশকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে যায় না। এই সময় ব্যক্তিগত কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কাজের শ্লোগান দিলে সেটা প্ররোচনামূলক হয়ে দাঁড়ায়। শ্লোগানগুলি হল বৈপ্লবিক

শক্তি—যার দ্বারা লাখ লাখ লোক সমাবেশ হবে, তাদের উদ্যোগ জাগিয়ে তুলবে, ঢিলে-পেছনে-পড়া লোকদেরও জাগিয়ে তুলবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে। কমিউনিস্টরা শ্লোগান নিয়ে খেলা করে না। বাস্তব পরিস্থিতির অনুপযোগী প্ররোচনামূলক শ্লোগানে পার্টি শত্রুর ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়ায় এবং লাখ লাখ পেছনে পড়া জনসাধারণকে বুর্জোয়াদের কবলে ঠেলে দেওয়া হয়।

ঐ ইস্তাহারগুলিতে ঐ সব শ্লোগান দেওয়া হল বটে অথচ রাজনৈতিক গণ ধর্মঘটের আওয়াজ অন্যান্য শ্লোগানগুলির সঙ্গে একযোগে বাতকে বাত দেওয়া হয়েছে মাত্র। জনগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ইস্তাহার মারফৎ পুলিশী জুলুম অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক ধর্মঘট ও গণ বিক্ষোভ করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। এটাই ছিল তখনকার পরিস্থিতির চাহিদা। কিন্তু ঐ ইস্তাহারগুলিতে তা করা হয়নি। কারণ হল রাজনৈতিক গণ আন্দোলনের (মাস *এ্যাকশনের) উপর পেটি বুর্জোয়াসুলভ অনাস্থা।*

মনে করা হয়েছিল যে, "মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি কর" এ শ্লোগান অ-বিপ্লবী ও এতে নিয়মতান্ত্রিক মোহ সৃষ্টি করা হবে।

অক্টোবর বিপ্লবের একমাস আগে, সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখে কমরেড স্ট্যালিন 'রবোট্‌চি পুট'-এ নীচের সম্পাদকীয় লিখেছিলেন :

"রুশ বিপ্লবের নেতা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণির কর্তব্য হল সরকারের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলা ও সরকারের নূতন প্রতিক্রিয়াশীল চেহারা জনগণের সামনে খুলে দেওয়া ... শ্রমিকশ্রেণির কর্তব্য হল ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো এবং আসন্ন লড়াই-এর জন্য নিরলসভাবে প্রস্তুতি করা। রাজধানীর শ্রমিক ও সৈন্যগণ ইতিমধ্যেই কেরেনেস্কি—কোনোভালভ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করে এক কদম এগিয়ে গেছে। ... এখন প্রদেশগুলির নিজেদের মত জানিয়ে দিতে হবে।" ('সিভিল ওয়ারের ইতিহাস' ২ নং ভল্যুম, পৃ. ৩৩)

একেই বলে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব এবং অবাস্তব বুলি কপচানো থেকে এর তফাৎটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

অক্টোবর বিপ্লবের একমাস আগেও কমরেড স্ট্যালিন রুশ জনগণকে কেরেনেস্কি সরকারের সভ্যদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে বলেননি। তিনি জনগণকে বলেছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করার জন্য। কারণ, সরকারের বৈপ্লবিক উচ্ছেদ সাধনের প্রস্তুতির সময়ে সরকারের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আদালতের রায়ের মত মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার চেয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অনাস্থাসূচক রাজনৈতিক রায়ের বৈপ্লবিক শক্তি ও তাৎপর্য অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির কমরেডরা মনে করেছিল মন্ত্রিসভার এক একজন সদস্যের বিরুদ্ধে আদালতের রায়ের মত মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করাটাই সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক গণমত ঘোষণা করার চেয়ে বেশি বিপ্লবী। কারণ তাদের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই হল পেটি বুর্জোয়ার অ-শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তির স্থান শ্রেণির উপরে এবং কোন ব্যক্তির বা গ্রুপের কাজ বা বিচারের রায়কে শ্রেণির রাজনৈতিক কার্যক্রমের (এ্যাকশনের) চেয়েও বড় মনে করা হয়। কাজেই যদিও আমাদের কমরেডরা ভেবেছিল যে, তারা নিয়মতান্ত্রিক মোহের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। কিন্তু, তাদের আওয়াজ যতই বীরত্বপূর্ণ মনে হোক না কেন—আসলে তারা সেই মোহই ছড়িয়ে দিচ্ছিল। একেই বলে পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদ—যা হল মার্কস-লেনিনবাদের ঘোরতর শত্রু। পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদ

সংস্কারবাদেরই একটা বিশেষ ধরন এবং বিপ্লবের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই।

নেহরুর কলিকাতা আগমন উপলক্ষে যে তিনটি ইস্তাহার দেওয়া হয়েছিল—সেগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল। সেগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল এইজন্য যে, তাতে অবাস্তব শ্লোগান না দিয়ে নেহরু ও তার কলিকাতা আগমনের উদ্দেশ্যের মুখোশ খোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। "নেহরু ফিরে যাও—জনগণ তোমার মিথ্যা কথা শুনবে না।" প্রভৃতি শ্লোগান বোধগম্য, বাস্তব ও উদ্দীপনাময়। এতে বোঝা যায়, পূর্বেকার ইস্তাহাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে সমালোচনা করেছিল—সে সমালোচনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে-সম্পর্কে কেন্দ্রের নির্দেশ কার্যকরী করার জন্যও আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল। এই ইস্তাহারগুলির চমৎকার ফল থেকেই বোঝা যায় তার কার্যকারিতা। অনশনী রাজবন্দীদের সমর্থনে প্রচার আন্দোলনে যতটা সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, এবার নেহরুর বিরুদ্ধে পার্টির ডাকে সাড়া পাওয়া গেল তার চেয়ে বেশি—যদিও এবারের কাজ আগের বারের চেয়ে রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল অনেক জটিল। এতে লেনিনবাদের এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হয় যে, কোন একটা শ্লোগান যখন লোকের মনে গেঁথে যায়—তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় একটা প্রচণ্ড শক্তি। সুতরাং কোন এক বিশেষ অবস্থাতে শ্লোগানগুলি এমনভাবে ঠিক করতে হবে—যাতে তা জনগণকে আকর্ষণ করে।

নেহরুর কলিকাতা আগমন উপলক্ষে যেসব ইস্তাহার বিলি হয়েছিল, তারও একটা গুরুতর ত্রুটি ছিল। তাতে, হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের সম্পর্কে—তাদের সন্দেহ, ভয়, তাদের অসুবিধা ও সংশয়—এসব সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। ইস্তাহারগুলি দেখলে মনে হয়,—হিন্দুস্থানী শ্রমিকের কোন অস্তিত্বই নেই। তাদের সন্দেহের কোন জবাব দেওয়া হয়নি—তাদের মোহের বিরুদ্ধে কোন লড়াই-ই চালানো হয়নি। ইস্তাহারে কোথাও একথা উল্লেখই করা হয়নি, যে-নেহরু নিজেকে হিন্দী কৃষ্টির রক্ষক বলে জাহির করছে—সেই নেহরুই ইউ-পি'তে ৪০ হাজার হিন্দী শিক্ষকের ধর্মঘটকে দমন করেছে এবং মারোয়াড়ী ধনিক গোষ্ঠীর মুনাফার জন্য, তাদের দারিদ্র্যের অতল গর্ভে নিক্ষেপ করেছে। ইস্তাহারে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী মজুরদের পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে নেহরু বিড়লার স্বার্থই রক্ষা করেছে এবং শ্রমিকদের কর্তব্য হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ও বিড়লা কোম্পানির সরকারের সর্দার নেহরুকে বলা—"ফিরে যাও"।

পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদ যে কত দেউলিয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ১৫ নং কমিউনিস্ট বুলেটিন (যেটা পরে প্রত্যাহার করা হয়েছে) তার প্রমাণ।

এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই, দক্ষিণ কলিকাতা উপ-নির্বাচনের রায়কে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, জনগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য। এই দলিলের প্রণেতা বোধহয় ভেবেছিলেন যে, এটা খুব বৈপ্লবিক কথা। আসলে এটা হল পুরা সংস্কারবাদ। জনগণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জানানোর জন্যই শরৎ বসুকে ভোট দিয়েছে—এ কথা বলার অর্থ হল সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই-এর ধারণাকে অপমান করা। দক্ষিণ কলিকাতা উপ-নির্বাচন সম্পর্কে পলিটব্যুরোর বিবৃতিতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, এই উপ-নির্বাচনে প্রশ্ন হ'ল রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জনগণের রায় ঘোষণা করা। সম্ভবতঃ পলিটব্যুরোর বিবৃতিকে খুবই একটা নরম মত বলে মনে করা হয়েছিল। এবং সেইজন্যই সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

এর আগে একবার পি-সি কর্তৃক প্রচারিত কোন কোন ইস্তাহারে—"রায় মন্ত্রিসভা ধ্বংস হোক" এই শ্লোগান ছিল না। তখন তারা এই শ্লোগানকে অ-বিপ্লবী শ্লোগান মনে করেছিল। তখন পলিটব্যুরো বুঝিয়ে দেয় যে, জনগণের ঘৃণা ও বিক্ষোভ রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেই পুঞ্জীভূত হয়েছে। কাজেই লড়াই-এর রণধ্বনি হিসাবে "রায় মন্ত্রিসভা ধ্বংস হোক" শ্লোগান বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতির উপযোগী। এই শ্লোগানে রায় মন্ত্রিসভার বদলে অন্য আর একটি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করা হবে—এমন কিছুই বোঝায় না। এ শ্লোগান হল—একটি বিশেষ অবস্থায় কংগ্রেসী রাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রত্যক্ষ উপায়। কিন্তু ১৫ নং কমিউনিস্ট বুলেটিন ঐ সমালোচনাকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রের রাজনৈতিক নির্দেশের বিরুদ্ধে পি-সি'র মতকেই পেশ করা হল।

বুলেটিনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এবং প্রথম পৃষ্ঠার শেষ প্যারায় কোন রাজনৈতিক শ্লোগান কিংবা শ্রেণি সংগ্রামের কোন শ্লোগানই নাই। ব্যক্তিগত বা গ্রুপগত কাজ এবং সামরিক বা আদালতের বিচারের রায়ের মত কাজের সেই পুরানো শ্লোগানগুলির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে—যদিও ঐ বুলেটিন বের হওয়ার অনেক আগেই পলিটব্যুরো এগুলির নিন্দা করে ও এগুলি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারায় দাবি করা হয়েছে যে, কংগ্রেসী শাসকদের খতম কর, প্রতিশোধ নাও প্রভৃতি শ্লোগান কলিকাতার সমস্ত গণতন্ত্রকামী নাগরিকে শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। এ দাবি শঠতাপূর্ণ। এ দাবি সত্যি হলে কংগ্রেসী-শাসকগণ এতক্ষণে খতম হয়ে যেত।

জুন-জুলাই-এর দিনগুলির জঙ্গী কাজগুলিকে "সন্ত্রাসবাদী", "নৈরাজ্যবাদী" প্রভৃতি আখ্যায় নিন্দা করে যে-সব সংস্কারপন্থী সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল সেগুলির জবাব দিতে বুলেটিন ৮ পাতা ভরে (৩ থেকে ১০ পৃ.) লেখা হয়েছে। কিন্তু সব জবাবটাই অত্যন্ত আত্মরক্ষামূলক—যেন, বুলেটিনের প্রণেতা যে মত সমর্থন করছে তার সত্যতা সম্পর্কে তারই সন্দেহ আছে। ঘুরে ফিরে একই কথা বলা হয়েছে—অথচ আসল কথাটাই বলা হয়নি যে, জুন-জুলাই মাসের জঙ্গী কাজগুলিকে যারা নিন্দা করেছিল, সেই সমালোচকের দল গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে যখন সারা প্রদেশ দুটো বিবদমান শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে তখন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মতবাদ প্রচার করেছে। বুলেটিনে এ কথাটাও বলা হয়নি যে, যখন সরকার জনগণকে আঘাত হানছে ও জনগণও পাল্টা আঘাত দিতে চাইছে—সেই গৃহযুদ্ধের সময়ে শান্তির কথা বলা মানে জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

তারপর, বুলেটিনে হুঁশিয়ারি দেওয়া প্রয়োজন ছিল, লড়াই-এর যে-ধরন এক রকম পরিস্থিতিতে গ্রহণ করা হয়েছে—সেটা যেন আবার ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা না হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—১৫ই আগস্টের অবস্থা জুন-জুলাই-এর অবস্থার মত ছিল না। নেহরুকে কলিকাতার জনগণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তারপর বুর্জোয়াদের নূতন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তারা ১৪৪ ধারা তুলে নিয়ে ও ছ'মাসের ভিতর পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দু'কদম পিছু হটে যায়। ছল-চাতুরী দিয়ে জনগণের বিক্ষোভ কিছুটা শান্ত করে জনগণকে চোরাগোপ্তা আঘাত করার জন্যই শাসকশ্রেণী এই কৌশল নেয়—অথচ কমিউনিস্ট পার্টির উপর হামলাকে বিন্দুমাত্রও কমানো হয়নি। এই পরিস্থিতিতে জরুরি প্রয়োজন ছিল এই কারসাজিকে ফাঁস করে দেওয়া। কাজেই, ১৫ই অগস্টের ঠিক ঠিক রণকৌশল ছিল,

ময়দানে কংগ্রেসের সভায় আমাদের বিক্ষোভমূলক শোভাযাত্রা না নিয়ে গিয়ে অন্যত্র আমাদের গণ-জমায়েত করা ও সরকারের চক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ জনতার সামনে পেশ করা। ময়দানে কংগ্রেসের সভায় বিক্ষোভ দেখাতে গেলে তা ব্যর্থ হত। কেননা, ১৫ই অগস্টে সরকার হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালী সংঘর্ষ বাধাতে প্রস্তুত হয়েছিল এবং শ্রমিকশ্রেণি সে-সম্পর্কে সচেতন ছিল না। জনগণের ক্রোধও সে সময়ে অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

(৬)

সংস্কারবাদের এই বিশেষ ধরন—পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদ—যা পশ্চিমবঙ্গে এত স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠেছে ও বিপ্লবকে পিছু টানছে—সেটার উৎস কোথায়?

এর প্রধান প্রধান বিশেষত্বগুলি কি কি? এর প্রধান প্রধান বিশেষত্ব হল এইগুলি :

(১) **গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রামে বিশ্বাসের অভাব।** সংগ্রাম সম্পর্কে ধারণা হল—কয়েকজন ব্যক্তির, গ্রুপের বা জঙ্গী দলের শারীরিক যুদ্ধ। সভা, জৌলুস, গণ জমায়েত—এতে হাজার হাজার লোক যোগ দিলেও—এগুলি যেন লড়াই নয়—এগুলি হল শুধু বক্তৃতা দেওয়া। অন্যদিকে মুষ্টিমেয় জনতা ও পুলিশের ভিতর সংঘর্ষকে মনে করা হয় একটা বড় সংগ্রাম। কিন্তু, সত্যিই যখন পুলিশ ও জনতার ভিতর বিরাট সংঘর্ষ শুরু হয়—যেমন জুন-জুলাইতে হয়েছিল—তখন আসে ভয়। সশস্ত্র বিদ্রোহের নীতি ও কানুন সম্পর্কে কিছু না বুঝেই সেগুলি আওড়ানো হয়। যখন এলেনবেরীর শ্রমিকগণ কারখানা দখল করলো ও ১০ দিন পুলিশ আসতে সাহস করলো না, তখন কোন সংঘর্ষ হল না বলে আমাদের কমরেডদের মনে এলো হতাশা। আবার যখন পুলিশ এসে জোর করে শ্রমিকদের কারখানা থেকে বের করে দিল, তখন প্রতিক্রিয়ার শক্তি বেশি মনে করে তাদের মনোবল ভেঙ্গে গেল।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের বামপন্থী দেশপ্রেম গণ-আন্দোলন বিমুখী ও কাজেই গণ-সংগঠনের প্রতিও একেবারেই উদাসীন। তারা 'হরতাল' 'হরতাল' 'আরো হরতাল' বলে চিৎকার করে অথচ গণ-সংগঠনগুলিকে তুলে দেয়—কেননা গণ-সংগঠনগুলিকে জমিদারি কাছারীর চেয়ে বেশি কিছু মনে করা হয় না। ধর্মঘটের নেতৃত্বের হাতিয়ার না গড়ে ধর্মঘট সাবোতাজ করা হয় এবং শ্রেণি সংগ্রামের সংগঠন গড়ে না তুলি শ্রেণি সংগ্রামকে বানচাল করা হয়।

আমাদের কমরেডরা এ-আই-টি-ইউ-সি'র অধিবেশনে যোগ দিতে বোম্বাই গেলেন। সেখানে কয়েকজন কমরেড গ্রেপ্তার হন ও তারা খুব উত্তেজিত হয়ে দাবি তোলেন যে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধানো হোক—তাতে যদি এ-আই-টি-ইউ-সি'র অধিবেশন চুলোয় যায়—যাক্, না হলে আমাদের আত্মসম্মান থাকে না। শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী সংগঠনের উপরে স্থান দেওয়া হল আত্মসম্মানের।

এটা হল গণ-সংগঠনের বিপ্লবী ভূমিকাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা এবং বৈপ্লবিক সংগ্রাম বাদ দিয়ে আংশিক সংগ্রামের পথ গ্রহণ করা। বামপন্থী দেশপ্রেমিকগণ শুধু আংশিক সংগ্রামের কথাই ভাবে ও সেইজন্যই গণ-সংগঠনকে বাদ দিয়ে দেয়। তাদের নিকট বিপ্লবী সংগ্রাম শুধুমাত্র কতগুলি কথা। তারা সেই কথার ভূষণে আংশিক সংগ্রামকে সাজিয়ে দেয়—যাতে আংশিক সংগ্রামের বহিরাবরণটা খুব চকচকে দেখায়।

(২) **বিপ্লবের সমস্যাগুলির প্রতি অ-শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গী।** সেই হেতু ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট হল

শুধুমাত্র একটা ফ্রন্ট। শ্রমিক আন্দোলনও হল অন্যান্য শ্রেণির আন্দোলনের মতই একটা আন্দোলন। কাজেই কারখানা ও মিল পার্টির রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজের কেন্দ্র করা হয় না। অতীতে তা কখনও করা হয়নি বর্তমানেও হচ্ছে না। কাজেই যে-কোন রাজনৈতিক আন্দোলন এমনকি শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব বিশেষ কোন আন্দোলনেও আমাদের কাজকর্মের (সভা, সমাবেশ ইত্যাদির) কেন্দ্র হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহল্লাতে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাতেও পার্টি সভ্যগণ কদাচিৎই শ্রমিক বস্তিতে যায়।

মিল কমিটি বাদ দিয়ে, হরতাল কমিটি না গড়ে ও র‍্যাঙ্ক এ্যাণ্ড ফাইল নেতৃত্ব গড়ে না তুলে শ্রমিক আন্দোলন ঠিক ঠিক বুর্জোয়া-মধ্যবিত্ত শ্রেণিসুলভ কায়দায় পরিচালিত হয়। জনাকয়েক সক্রিয় বিপ্লবী ও নিষ্ক্রিয় জনসাধারণ এই হল মধ্যবিত্ত সন্ত্রাসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের কমরেডদের ভিতর বহু পরিমাণে আছে।

প্রত্যক্ষভাবে মুখোশ খোলা একটা বিশেষ অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ ও আন্দোলনের বাস্তব শ্লোগান—মধ্যবিত্ত টেররিস্ট আদর্শ এগুলির ধার ধারে না। কেননা, শ্রেণিসমূহকে বৈপ্লবিক আন্দোলনে জাগিয়ে তোলার কোন প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। 'শত্রু আমাদের মারছে—আমরাও ফিরে মার লাগাবো'—এটাই শুধু তাদের নীতি। কাজেই—কংগ্রেসীদের পিটাও, পুলিশকে গুলি কর, মন্ত্রীদের হত্যা কর প্রভৃতি শ্লোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ধর্মঘট ছেড়ে পালানো হচ্ছে। কোন কোন সময়ে, বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে—কেউ বলছে ধর্মঘট সম্ভব নয়; আবার কেউ বলছে—পিটাও, গুলি কর ইত্যাদি। তখন পার্টি কমিটি এমন একটা আন্দোলনের পথ ঠিক করে দিয়েছে যাতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট থাকে। এটা চূড়ান্ত সুবিধাবাদ।

(৩) **অবাঙ্গালীদের প্রতি উগ্র জাতীয়তাবাদসুলভ (স্যাভনিস্ট) বিমুখতা।** হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের নিকট পার্টি নীতি ব্যাখ্যা করার কোন প্রচেষ্টাই হয় না। বাংলা ইস্তাহারগুলিতেও হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের বিশেষ বিশেষ সংশয়গুলিকে উল্লেখও করা হয় না। হিন্দী শেখা কিংবা হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার উদ্যোগ একেবারেই নাই। এটা খুব সাংঘাতিক—কেননা পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের ভিতর হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের সংখ্যা বিরাট। এই উগ্র জাতীয়তাবাদী অহংকারের জন্যই পার্টি হিন্দুস্থানী শ্রমিকদের উপেক্ষা করেও শ্রমিক আন্দোলনের নেতা বলে গর্ব প্রকাশ করে।

(৪) **বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণি পুঁজিপতি-বিরোধী ও জঙ্গী মনোভাবে ভরপুর ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াই-এর ঐতিহ্য তাদের আছে।** সেজন্যই অন্যান্য জাতির (ন্যাশন্যালিটি) মধ্যবিত্তের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্রুতগতিতে কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে। এতে শ্রমিকশ্রেণির পার্টি পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির সামনে একটা চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এটা প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয়। ফলে ছাত্র ফ্রন্টের কাজে হয় গাফিলতি এবং ছাত্র-আন্দোলনের গৌরবময় সাফল্যগুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শ্রমিকশ্রেণির প্রতি পার্টি ঘুরে দাঁড়িয়েছে—এটা ভেবে ঐ গাফিলতির পিছনে আসে নৈতিক সমর্থন। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির সহযোগীর চমৎকার সাফল্যগুলিকে উপেক্ষা করে শ্রমিকশ্রেণির দিকে "ঘুরে দাঁড়ানো"-টা মেকী কথা। এরূপ 'ঘুরে দাঁড়ানো' আসে দেশপ্রেমিকের নীতিবাগীশতা হতে—যারা বলে "আমার দুঃখ-দুর্দশা আমারই থাক—বাইরের লোকের সাহায্য আমি চাই না।" বামপন্থী

দেশপ্রেমিক যখন শ্রমিকশ্রেণির দিকে মোড় নেয় তখন তারা বুর্জোয়া দেশপ্রেমের এইসব আত্মকেন্দ্রিক মহানুভবতা শ্রমিকশ্রেণিকে শেখায়।

এই মনোভাবের আর একটা দিক হল শ্রমিকশ্রেণির নিন্দা করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯৪৯ সালে জানুয়ারি মাসে পুলিশ ও ছাত্রদের ভিতর সংঘর্ষের সময়ে অনেকেই ঐরূপ নিন্দাবাদ করেছে। আমাদের কমরেডরা শ্রমিকদের কাছে যায়নি এবং কি ঘটেছে ও শ্রমিকদের কি করা উচিত সে কথাও বলেনি। কিন্তু তারা থিওরী বাতলাতে লাগলো যে, ছাত্ররা এগিয়ে যাচ্ছে—অথচ শ্রমিকশ্রেণি এগিয়ে এলো না।

(৫) উগ্রপন্থী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীর নিকট সমাজ হল স্থিতিশীল, এর কোন পরিবর্তন নেই—এর ভিন্ন অধ্যায়ও নেই এবং বিপ্লবী সংগ্রাম হল শুধুমাত্র একটা ন্যায় ও অন্যায়ের ভিতর সংগ্রাম। কাজেই এরা আন্দোলনের পথ হিসাবে বিভিন্ন অবস্থাতেও একই শ্লোগান, লড়াই-এর একই ধরন, আক্রমণের একই ধারার নির্দেশ দেয়। যদি, দক্ষিণ কলিকাতা উপ-নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেসের সভা ভাঙ্গাটা যুক্তিসঙ্গত হয়ে থাকে, তা'হলে ১৫ই অগস্টের কংগ্রেসের জনসমাবেশে বিক্ষোভ দেখানো যুক্তিসঙ্গত হবে না কেন? যদি "বামপন্থীদের" মুখোশ খুলে দেওয়া ও তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করাই আমাদের কৌশল হয়ে থাকে, তা হলে উপ-নির্বাচনে কিভাবে আমরা শরৎ বসুকে সমর্থন করতে পারি? যদি দমদমের হানা ভুল্ ও অতি-বিপ্লবী কাজ হয়ে থাকে, তাহলে রিষড়া রেল স্টেশন আক্রমণ যুক্তিসঙ্গত হবে কেন? এমন একটা সাধারণ কর্মপন্থা বাৎলে দিতে হবে যা সকল পরিস্থিতিতেই "অন্যায়ের" বিরুদ্ধে "ন্যায়" বলে গণ্য হবে—শুধু এই নীতিই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের নিকট বোধগম্য।

১৯৪৯ সালের জানুয়ারি হতে পশ্চিমবঙ্গের পার্টি জোর কদমে এগিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের পার্টিকে পলিটব্যুরোর তরফ থেকে নতুন নেতৃত্ব দেওয়ার ছ'মাসের মধ্যে পার্টি ক্রমবর্ধমান গণ অভ্যুত্থানের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকশ্রেণির ভিতর পার্টি দুর্বলতার কারণ হল ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে সংস্কারবাদ। সেখানে এখনো সংগ্রাম-বিরোধী, শ্রমিকশ্রেণি বিরোধী লোক প্রধান প্রধান পদে রয়ে গেছে। পুরানো সংস্কারবাদের জড় ঝেঁটিয়ে দূর করলে ও পেটি বুর্জোয়া বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালালে পার্টি তার ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। গত ছ'মাসে আমাদের সাধারণ কমরেডরা তাদের সাহস, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা দ্বারা প্রমাণ করেছে যে পার্টি তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। পার্টির এই ক্ষমতা আরো প্রমাণিত হয়েছে এর থেকে যে, নূতন প্রাদেশিক কমিটি যোশীপন্থী সংস্কারবাদের বহু আবর্জনা স্তূপ সাফ করতে পেরেছে—নইলে, জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্য্যন্ত সমস্ত লড়াই বিশ্বাসঘাতকতায় বানচাল হত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমাদের পার্টি এখনও সম্পূর্ণ মোড় ঘোরাতে সমর্থ হয়নি। কারণ, পলিটব্যুরোর রণ-কৌশলের প্রস্তাবের পুরো শিক্ষা তারা এখনো গ্রহণ করতে পারেনি। তবে এটা প্রমাণ হয়েছে যে, তারা ঐ শিক্ষা কতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছে ও যতটুকু কার্যকরী করতে পেরেছে—পার্টি ততটুকু মোড় ঘোরাতে সক্ষম হয়েছে। কমরেডদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার মূল দুর্বলতাই পলিটব্যুরোর রণ-কৌশল সম্পর্কে প্রস্তাবের সম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্রমবর্ধমান গণ অভ্যুত্থান ও পার্টি নেতৃত্বের ভিতর এখনো রয়ে গেছে প্রচণ্ড ব্যবধান। সংস্কারবাদের সব রেশ এখনো প্রাদেশিক কমিটি নিঃশেষ করতে পারেনি ও সেগুলিই তাদের

পিছু টেনে রাখছে। কারণ, নিম্নলিখিতভাবে সংস্কারবাদ বারবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে :

(১) দুর্বল চিত্ত ও দোদুল্যচিত্ত লোকদের প্রতি নরম মনোভাব—গণ ফ্রন্টের বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে এখনো পুরোনো সংস্কারবাদীদের তাড়ানো হয়নি এবং শ্রমিক, জঙ্গী ছাত্র ও ক্ষেতমজুর জঙ্গীদের সাহসের সহিত নেতৃত্বে উন্নীত করার নীতি এখনো কার্যকরী করা হচ্ছে না। ক্ষেতমজুর সম্মেলন, রেল শ্রমিক সম্মেলন ও এ-আই-এস-এফ সম্মেলনের বিরাট সাফল্যের পর নিচু থেকে নূতন কর্মীদের উঁচু পদে উন্নীত করা সম্পর্কে সব ইতঃস্ততভাব ও ভয় দূর হয়ে যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন।

(২) প্রাদেশিক কমিটির রাজনৈতিক জ্ঞান আরো উন্নত করার ব্যর্থতা। অবস্থার গতিবেগ আগে থেকেই সমষ্টিগতভাবে বিচার করা, জনগণের লড়াই-এ দেরি না করে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ প্রস্তুতি এবং প্রত্যেকটি সংগ্রাম ও ক্যাম্পেনের আত্মসমালোচনামূলক পর্যোলোচনা—এগুলি করা হয় না। কাজেই পি-সি'র প্রত্যেক সভ্যই যেখানে ছিল সেখানেই আছে এবং সমগ্রভাবে পার্টি উৎকৃষ্টের চেয়ে উৎকৃষ্টতর নেতৃত্ব পাচ্ছে না। এর ফলে উদ্যোগ যেন এক ধরনে পঙ্গু হয়ে আছে এবং মতগত ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) পার্টি কেন্দ্রের নির্দেশ ও দলিলপত্র গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয় না। কেন্দ্রের রণকৌশল সম্পর্কে প্রস্তাব ও সমালোচনামূলক অন্যান্য নোটের পরও, ৩ নং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠককে ভ্যানগার্ডিস্ট বিচ্যুতির কথা বলা হয়েছিল। পলিটব্যুরো কর্তৃক পি-সি মিটিং-এর কার্যবিবরণীর পর্যালোচনা করার পরও ঐ দলিল (৩ নং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক) প্রেস থেকে ফিরিয়ে আনা হয়নি। এবং অনেক পি-সি সভ্য জানতোই না যে ঐ ভুল দলিল পার্টির ভিতর প্রচার করা হচ্ছে। পলিটব্যুরোর এতগুলি দলিলের পরও ১৫ নং কমিউনিস্ট বুলেটিন (যা পরে প্রত্যাহার করা হয়) প্রকাশ করা হয়েছিল। এ থেকে দেখা যায়, পি-সি কেন্দ্রের দলিলপত্র ভাল করে আলোচনা করেনা এবং কেন্দ্রের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদের কার্যক্রম নির্ধারিত করেনা। এতে সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই বহু পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৪) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা (ডেমোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজম্) চালু নেই। প্রথমত নেতৃত্বের কাজে ইউনিটগুলির অংশগ্রহণই হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এর অর্থ হল পার্টি ইউনিটগুলি তৎপরতার সঙ্গে উচ্চতর কমিটির দলিল ও রিপোর্ট আলোচনা করবে, সে সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করবে ও অভিজ্ঞতা পেশ করবে। পি-সি নিজের ইউনিটগুলির দলিল ও কাজকর্ম পর্যালোচনা করবে এবং নিয়মিতভাবে তাদের কাজ ও মতামত চেক্আপ্ করবে। কিন্তু বর্তমানে যে পদ্ধতি চালু আছে তাতে এই কাজের বদলে প্রধানত চিরকুট পাঠিয়ে বা মৌখিক নির্দেশ দিয়ে কাজ সারা হয়। চিরকুট পাঠানো বা মৌখিক নির্দেশ অপ্রয়োজনীয় নয়—কিন্তু এগুলি অবশ্যই রাজনৈতিক আলোচনা এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনামূলক পর্যালোচনার স্থান অধিকার করবে না।

(৫) সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার ব্যাপারে প্রচুর গাফিলতি আছে। সমষ্টিগতভাবে প্ল্যান করা ও কাজের ভাগাভাগি করে নেওয়ার বদলে পি-সি সভ্যগণ ব্যক্তিগতভাবে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে। এর ফলে, কোন কোন পি-সি সভ্য সব কাজই করে কিন্তু কাজে দক্ষতা অর্জন করে না— আবার কোন কোন পি-সি সভ্য নিজের ফ্রন্ট বা নিজের এলাকার চৌহদ্দির ভিতর ডুবে থাকে। পার্টি সংগঠন সম্পর্কে পেটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হতেই কাজের এই

বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব হয়। এতে পার্টির ভিতরকার লৌহদৃঢ় ঐক্যকে অস্বীকার করা হয়।

(৬) লড়াই-এর মধ্য দিয়ে নূতন নূতন বাহাদুর জঙ্গীদের থেকে যেসব নূতন কর্মী বেরিয়ে আসছে—তাদের পার্টিতে ভর্তি করা হচ্ছে না। এই ব্যর্থতার মানে হল পার্টির অগ্রগামী ভূমিকাকে অস্বীকার করা অর্থাৎ সংগ্রাম থেকে বেরিয়ে আসা, প্রকৃত অগ্রগামী কর্মীদের পার্টির ভিতর সংঘবদ্ধ করতে অস্বীকার করা।

এগুলি হল প্রধান প্রধান বিচ্যুতি যা থেকে পি-সি'কে অবশ্যই এখনই তার রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজ উন্নত করতে হবে। পি-সি যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাংগঠনিক নীতি অনুসারে কাজ না করে তাহলে সংস্কারবাদকে নির্মূল করা যাবে না।

সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এত সোজা নয়। যোশীপন্থী সংস্কারবাদ শুধুমাত্র একটা সংগ্রাম-বিরোধী ধার নয়। বিভিন্ন প্রশ্ন, ঘটনাবলী পার্টি ও রাজনীতি বিচার করার ভিন্ন একটা পদ্ধতি যোশীবাদ প্রত্যেক কমরেডের মনে গেঁথে দিয়েছে। এটা হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের নীতি। যোশীপন্থী সুবিধাবাদের শক্তির উৎস ছিল প্রত্যেকটি জাতির (ন্যাশন্যালিটির) বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ। পার্টির ভিতর বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের বামপন্থী স্বাদেশিকতার জড় থেকে যাচ্ছে এই জন্য যে, যোশীবাদের বিরুদ্ধে এখনও সর্বাত্মক লড়াই চালানো হয়নি। এই লড়াই এখনই চালাও ও জয়লাভে এই লড়াই শেষ কর। এ কাজ করার সঠিক পন্থা হল প্রথমত র‍্যাঙ্ক এ্যাণ্ড ফাইল নেতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণির গণ-আন্দোলনের (এ্যাকশান্) নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করা। কারখানা ও মিল থেকে আই-এন-টি-ইউ-সি ও সোস্যালিস্ট নেতাদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিযান চালাতেই হবে। এরই উপর নির্ভর করছে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ। লাখ লাখ জনতার উদ্যোগ জাগিয়ে তোলার জন্য রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে লড়াই চালাতে হবে। আজ আমাদের পার্টিই পশ্চিমবঙ্গে অবিসংবাদীভাবে সবচেয়ে জনপ্রিয় পার্টি। স্বেচ্ছাচারী এই সরকারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামে পার্টিকে হতে হবে জনতার অবিসংবাদী নেতা।

১৯/১০/৪৯

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

প্রাপ্তিস্বীকার : অনিল বিশ্বাস সম্পাদিত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন (২য় খণ্ড) পৃ. ৬৬-৯২

সহায়ক তথ্য - ১১

কলিকাতা জেলা কমিটির আত্মসমালোচনামূলক বিবৃতিতে কয়েকটি আন্দোলনের পর্যালোচনা

আমাদের এই আত্মসমালোচনা ও বিভিন্ন সংগ্রামের পর্যালোচনামূলক রিপোর্টটি আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে। এই দীর্ঘ ৮/৯ মাসের মধ্যে আত্মসমালোচনা পেশ করতে না পারার পেছনে ও আমাদের যে অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে তা আমরা স্বীকার করছি। এক কথায় বলতে গেলে এর গুরুত্ব বোধের অভাব আমাদের মধ্যে রয়েছে, যার জন্য এই দীর্ঘসূত্রতা। ডি. সি'র মধ্যে যারা অবিলম্বে আত্মসমালোচনা পেশ করার পক্ষে, তাদের শিক্ষা দীক্ষার অভাবের জন্য তারা লিখতে ভয় পেয়েছেন। আর যারা সক্ষম ও ভালভাবে লিখতে পারেন, পার্টিনীতি সঠিকভাবে স্থিরীকৃত না হলে আত্মসমালোচনা অর্থহীন— তাদের মধ্যে এই মনোভাব থাকার জন্য অযথা দেরী হলো।

তা ছাড়া গত ১৯ মাস যাবত (১৯৪৯-মে মাস-সম্পাদক) এই ডি. সি. গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বামপন্থী বিচ্যুতির বলি হিসাবে আমরা কমরেড প্রদীপকে হারিয়েছি, কমরেড দোবে ডি. সি. ছেড়েছেন, কম্ সমীরণ ও যমুনা গ্রেপ্তার হয়েছেন। বহু সংগ্রাম পরিচালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এ রিভিউ বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত দীর্ঘ দিনের বামপন্থী বিচ্যুতি ও টিটোবাদী সাংগঠনিক কায়দার ফলে পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতার বিনিময় না হওয়াতেও ডি. সি. সমগ্র আন্দোলনের রিভিউ করতে অক্ষম হয়েছে যার জন্য বহু জিনিষ এ থেকে বাদও পড়েছে। তাই এ রিভিউ যে সম্পূর্ণ নির্ভুল হবে এ দাবি আমরা করছি না। তবে আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনায় যতদূর সম্ভব আমরা এই সর্বনাশা ভুলের মূলকে বিভিন্ন ঘটনার ভেতর থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। আমরা আশা করি সমস্ত কমরেডরা তাদের আলোচনা ও সমালোচনা দ্বারাও এই ভুলকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে, পার্টির মধ্যে সঠিক নীতি ও নেতৃত্ব গঠনে প্রয়াসী হবেন।

অভিনন্দন সহ

কলিকাতা জেলা কমিটি

বন্দীমুক্তি আন্দোলন ও ২৭শে এপ্রিল

ডি. সি. তৈরি হবার পর আমরা এপ্রিল মাসে প্রথমেই বন্দীমুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করি। প্রথম দিকে জনমত, সংগঠিত করার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় সভা শোভাযাত্রা ইত্যাদির

প্রোগ্রাম নেই। কিছু কিছু লোকজন আসতে থাকেন। তারপর সেই আন্দোলনকে, বন্ধ করার জন্য কংগ্রেসী বিধান সরকার ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করে এবং আমাদের মিটিংএ হামলা চালায় ও প্রচুর পরিমাণে গ্রেপ্তার করতে থাকে। আমাদের তরফ থেকে তখন চেষ্টা করা হয় যাতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা যায় ও সংগ্রামকে উচ্চতর পর্য্যায়ে তোলা যায়। ২৭শে মহিলারা একটি সভা ডাকেন ও তারপর ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে শোভাযাত্রা বার করেন। তখনও আমরা কল্পনা করিনি যে ফ্যাসিষ্ট জলুম চালাবার জন্য বিধান সরকার কতখানি প্রস্তুত এবং তা কতদূর ভয়ানক হতে পারে! ২৭শে এপ্রিল— সভার পরেই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হল্ থেকে শোভাযাত্রা বার করা হয়, শোভাযাত্রা বেরুতে না বেরুতেই নিরস্ত্র মহিলাদের উপর পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে চারজন নেত্রীস্থানীয়া কমরেড আমরা হারাই। সেইদিন সাম্রাজ্যবাদী দালাল বিধান সরকার তার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সাথে আরও আমদানি করেছিল সেবাদল গুণ্ডা আর মেটিয়াবুরুজ ও অন্যান্য এলাকা থেকে কিছু মালিকের গুণ্ডা। তারপর দিন আমরা 'আম হরতালের' আহ্বান জানাই। আহ্বান অবশ্য জানান হয় টি. ইউ. সি'র তরফ থেকে। ২৭শে তারিখ ঘটনার অব্যবহিত পরেই বৌবাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকাতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় বিরাট উত্তেজনা দেখা দেয়। আমরা খুব ভরসা নিয়ে শ্রমিকদের কাছে যাই। মোটামুটি ভাবে তাদের কাছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পরদিন খবরের কাগজগুলিও ছাপাতে বাধ্য হয়। কিন্তু কোথাও কোন ধর্ম্মঘট করান সম্ভব হয় না, টালিগঞ্জ এবং আর ২/১টা এলাকার ছোট খাট ২/৪টা কারখানা ছাড়া। সমগ্র ছাত্ররা এই ধর্ম্মঘটে যোগ না দিলেও ছাত্রদের এক অংশ যোগ দেন। ছাত্রদের এক শোভাযাত্রা বের হয় ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়। বহু ছাত্র আহত হন। হরতাল করাতে গিয়ে কোথাও কোথাও আমরা মার খেয়ে ফিরি। পটারীর দালাল ও গুণ্ডারা আমাদের কমরেডদের প্রচুর পরিমাণে শ্রমিকদের সামনেই মার দেয়।

পরে যখন আমরা নিজেরা রিভিউ করলাম তখন এই সিদ্ধান্তেই আসা হল যে যেহেতু আমরা শ্রমিক শ্রেণির কাছে তাদের বন্দী ভাইদের কথা পরিষ্কার করে তুলে ধরতে পারিনি সেই হেতু তারা কোন সাড়া দেননি। আর ২৭শে তারিখ আমরা যে অমূল্য প্রাণ হারালাম তাতে কোন দুঃখ নেই দুঃখ হল যে আমরা প্রস্তুত হয়ে যেতে পারিনি এবং কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারিনি। শ্রমিক ও জনতা সরকারি দমন নীতিকে অগ্রাহ্য করেও কেন আর এগিয়ে আসছেন না তার কারণ হিসাবে আমাদের বোঝান হল এবং আমরাও ব্যাঙ্ককে বোঝালাম যে পুলিশ আজ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সব আন্দোলন দমাতে চাইছে। সুতরাং তার জন্যই লোক আর ভয়ে এগিয়ে আসছে না। লোককে আনতে হলে তাদের ভরসা জোগাতে হবে, এবং একমাত্র সে ভরসা আসতে পারে তখনি যদি আমরা সশাস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করতে পারি— "মিলিট্যান্ট অ্যাকশন করতে পারি।" সুতরাং আমাদের আরও দৃঢ় হতে হবে এবং এবার প্রতিশোধ নিতে হবে। জনতার রাগকে বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে পরিচালনা করে সোজা রাজনৈতিক পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

২৯/৪/৪৯ তারিখে প্রাদেশিক কমিটি যে সার্কুলার দেন তা থেকেও এ কথা পরিষ্কার হয় যে আমাদের প্রধান কাজ হিসাবে শ্রমিকদের জমায়েৎ করার চেয়ে কোন রকমে একটা সংঘর্ষ যাতে হয় অর্থাৎ যে কোন সংঘর্ষই বিপ্লবের আকার নিতে পারে এই ছিল ধারণা। তাতে লেখা হয়, "স্থানীয় জাতীয় টি. ইউ. দালাল, সোস্যালিষ্ট দালাল, কংগ্রেসী সেবাদলের গুণ্ডা,

প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী নেতা—দল বাঁধিয়া উহাদের বাড়ি চড়াও করুন। নারী হত্যাকারী, শ্রমিক হত্যাকারী বলিয়া উহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করুন, পিটান শুরু করুন, ইট, পাথর, লাঠি যাহা পান তাহা দিয়া পিটাইতে থাকুন।"

শ্রমিকদের চেতনা ও পরিস্থিতিকে ভালোভাবে না বুঝে যে প্রোগ্রাম আমরা গ্রহণ করি অর্থাৎ সাধারণ হরতালের মারফৎ কারখানায় কারখানায় "আগুন ছড়াইবার" যে প্রোগ্রাম নেই তাহা ব্যর্থ হয়। কারণ শ্রমিকদের মধ্যে তখনও ঐ ধরণের প্রোগ্রাম কার্য্যকরী করার মত ঘৃণ্য ও শ্রমিকদের ঐক্য আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি। সুতরাং তাদের সংগঠনকে উপেক্ষা করে তাদের একতার দিকে নজর না রেখে আমরা যে শ্লোগান দিলাম তা ব্যর্থ হতে বাধ্য হল, কমরেডদের মধ্যে প্রশ্ন এলো যে প্রস্তুতি না হয়ে কেন এই ধরণের হঠকারিতা করা হল, আমরা জানালাম যে বিপ্লবের জন্য বহু প্রাণ দিতে হবে, ওতে ঘাবড়ালে চলবে কেন? এক কিছুদিনের মধ্যে জেলা কমিটির সাথে আপস আলোচনার ফলে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। আমরা বহু কমরেডকে এবার হারাই কারণ পুলিশী হামলার দরুণ তারা গ্রেপ্তার হয়ে যান। শ্রমিকদের মধ্যে লালঝাণ্ডার দুর্বলতা ধরা পড়ায় হতাশা বাড়ে, ২৭শে এপ্রিলের ঘটনার ভিতর দিয়ে এভাবেই উল্টো শিক্ষা আমরা গ্রহণ করলাম।

পটারী হরতাল

এপ্রিলের অনশন ধর্ম্মঘটের মীমাংসার শর্ত্তকে উপেক্ষা করতে জুনে আবার রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘট শুরু হয়। এ সময় ৮ই জুন পটারীর লড়াই শুরু হয়।

এই লড়াই শুরু হবার সময় পটারীর সাংগঠনিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। তবে শ্রমিকদের লড়াইয়ের মনোভাব ও তার অতীত ঐতিহ্য তখনও বর্তমান। ঐ পটারীতেই শ্রমিকরা বড় বড় ধর্মঘট করেছেন। প্রতিটি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী দালাল কংগ্রেসী সরকারের রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে তাদের চোখে ধরা পড়েছে।

পটারী শ্রমিকদের প্রিয় নেতা কমরেড রামধনী জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তার চাকুরীর দাবিতে পটারীতে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ৭ দিনের মধ্যে এই আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয়। লড়াই সম্পর্কে স্থানীয় কমরেডদের ও ডি.সি'র ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। শ্রমিকরা প্রত্যহই ডেপুটেশন নিয়ে যেতেন। ৭ই মিটিংএ এলাকা সংগঠকদের নেতৃত্বে শ্রমিকরা প্রতিজ্ঞা করেন যে ৮ই তারা তাদের দাবি না মানলে ফাটাফাটি করবেনই। তখন আমাদের প্রোগ্রামই ছিল ঐ ধরনের, যে কোন রকমে একটা ফাটাফাটি শুরু করতে পারলেই হয় এবং হলোও তাই। ফাটাফাটি তার পর দিন শুরু হলো। কিন্তু আমরা সে খবর পেলাম 'অ্যাড্ভান্স' খবরের কাগজে। তখন এলাকা কমরেডরাও সেখানে ছিলেন না কারণ সেদিন লড়াই হবেই—এ ধারণা পরিষ্কার ছিল না। ৫০০ শত শ্রমিক ৮ই জুন ডেপুটেশনে গেলে কোম্পানীর ম্যানেজার তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলো এবং সেখানেই মারামারি শুরু হলো, ফলে শত শত সশস্ত্র পুলিশের সাথে নিরস্ত্র শ্রমিকদের প্রতিরোধ সংগ্রাম চলে প্রায় তিন ঘন্টা যাবত। শ্রমিকরা নাট বল্টু ইত্যাদি দিয়ে বন্দুকের বিরুদ্ধে লড়েন কিন্তু শত্রুর মারণাস্ত্রের মুখে বেশিক্ষণ টিকতে পারেন না। রামলক্ষ্মণ প্রাণ দেন, বহু শ্রমিক সাঘাতিক ভাবে আহত হন এবং ২০০ শত শ্রমিক গ্রেপ্তার হন। এসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার পঞ্চানন ঘোষাল ও আরও অনেক পুলিশ

শ্রমিকদের হাতে ঘায়েল হয়।

৮ই রাত্রে কমরেড চন্দ্রনাথ ও ভাস্কর পটারী সংগঠকদের সাথে আলোচনা করেন। উপস্থিত সংগঠক কমরেডরা চেয়েছিলেন যে তারপর দিন মর্গে গিয়ে রামলক্ষ্মণের মৃতদেহ দাবি করবেন ও তা নিয়ে শোভাযাত্রা বার করা হবে। কিন্তু ডি.সি.এম. কমরেডরা তাদের বলেন যে ৯ তারিখ অর্থাৎ তার পরদিন শ্রমিকরা যেহেতু বিক্ষুব্ধ আছেন তাই তাদের দিয়ে বিভিন্ন কারখানার গেটে হামলা করে বা বুঝিয়ে যেমন করে হোক হরতাল করতে হবে। তাছাড়াও তারা বলেন যে তিন ঘন্টা পর যখন শ্রমিকদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল তখনই ঐ শ্রমিকদের নিয়ে অন্যান্য কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়া দরকার ছিল। কংগ্রেসী নেতাদের বাড়ি আক্রমণ করে এবং স্থানীয় গুণ্ডাদের হামলা করে তাদের শায়েস্তা করা উচিত ছিল। তা না করা অত্যন্ত ভুল হয়েছে, কারণ তারা উত্তেজিত ছিলেন। আসলে তখন অবস্থা কি? গুলি, টিয়ার গ্যাস ও পাইকারী ভাবে ২০০ শত শ্রমিককে গ্রেপ্তার এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলে শ্রমিকরা ঠিক ঐ সশস্ত্র হাঙ্গামার সম্মুখীন হতে রাজি কিনা সেটা আমরা বিচার করলাম না তখন অবশ্য এলাকাতে পুলিশ পাগলের মত শ্রমিকদের বস্তিগুলি আক্রমণ করছে ও যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ঐ সিদ্ধান্ত নিলাম কেন? কারণ আমাদের যেটা তখন মাথায় ছিল তাহলো "যে কোন সংঘর্ষই আজ রাজনৈতিক সংঘর্ষে পরিণত হবে ও ক্ষমতা দখলের দিকে যাবে।" তাই আমরা আরও বড় সংঘর্ষের পরিকল্পনা তখন মনে করছিলাম। কমরেডরা তারপর দিন ৯ই ম্যাকফারলেনের গেটে গিয়ে প্রচার করার ফলে সেখানে হরতাল হয়ে গেল। কারণ তারা আগের দিন প্রত্যক্ষ ভাবে সেই সংগ্রামকে লক্ষ্য করে ছিলেন এবং তাদের কিছুটা সংগঠনও ছিল। কিন্তু ট্রামের গেটে বা অন্যান্য জায়গায় চেষ্টা সত্যেও কিছু হলোনা। তৃতীয় দিনে পটারী ময়দানে মিটিং ডাকা হলে, শ্রমিকরা গা ছাড়া গা-ছাড়া ভাবে এদিকে সেদিকে ভীড় করতে থাকলেন কিন্তু মিটিং-এ ভালোভাবে জমায়েত হতে চাইলেন না। কারণ প্রতি মুহূর্তেই হামলার আশংকা ছিল। প্রচুর পুলিশ জমায়েত করা হয়েছিল। সত্যিই তারপর আই. এন. টি. ইউ. সি. ও পুলিশের হামলার ফলে এবং ওখানে মিটিং করতে শ্রমিকদের এক অংশের আপত্তির ফলে ওখানে মিটিং করা হয় না। ওখানে মিটিং করা উচিত ছিল কিনা তা নিয়ে কমরেডদের মধ্যে মতভেদ হয়। কিছু কিছু কমরেড যেমন সুকর্ণ প্রভৃতি তারা এখানে মিটিং করে একটা সংঘর্ষের মধ্যে যাওয়ার বিরোধিতা করেন। আমরা তাদের সমালোচনা করি এবং তখন থেকে তাদের দায়ি করতে থাকি। তারপর থেকে দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে তাদের সরিয়ে দেবার প্ল্যানও করা হলো। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে আমরা তাদের সমালোচনা করলাম যে শ্রমিকরা যেখানে ঐ ধরনের লড়াই পুলিশের সাথে করতে পারে সেখানে কয়েক লরি পুলিশ ও আই. এন. টি. ইউ. সি'র ধমকে শ্রমিকরা চলে আসতে পারেন না। একবার যদি একথা ভাবি তবে আর কি করে সরকারের এই সৈন্যবল ও রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করব? আমরা এক্ষত্রে দেখলাম না যে—যে শ্রমিকদের দিয়ে আমরা সংগ্রামকে বৃহত্তর পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই তাদের মনোভাব কি। মনে করলাম জোর করে আমাদেব জঙ্গিরা বা কমরেডরা অথবা শ্রমিকদের এক অংশ যদি এগিয়ে যান তো সমস্ত শ্রমিক লড়াইএ অংশ নেবেন। যেহেতু এটা বিপ্লবী যুগ সেই হেতু কোথাও একটা লড়াই হলেই তা বিরাট ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আমরা মনে করলাম যে শ্রমিকরা আমাদের হুকুম তামিল করতে

বাধ্য। কিন্তু আসলে শ্রমিকদের অবস্থা তখন অন্যরকম। তারা তখনই আবার একটা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের মধ্যে জড়াতে চাননি। তারা চেয়েছেন যে হরতালটাকে যাতে চালু রাখা যায় ও শ্রমিকদের যাতে ঐক্যবদ্ধ রাখা যায়। কারণ তারা ৮ই জুনের রক্তস্নান ও প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের ভেতর থেকে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন যে সশস্ত্র বর্বর কংগ্রেসী পুলিশের মারণাস্ত্রের সামনে নিরস্ত্র শ্রমিকের ঐ ধরণের লড়াই জয়যুক্ত হয় না। তাতে শত্রুর চেয়ে নিজেদের ক্ষতিই বেশি হয়। কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারলাম না। তাই কমরেডদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলাম এবং কি ভাবে ফাটা ফাটির মধ্য দিয়ে সংগ্রামকে উচ্চস্তরে তোলা যায় তাই ভাবলাম। দেখতে দেখতে প্রায় ১মাস হয়ে এল। এই সময় পটারী শ্রমিকদের সমর্থনে টি. ইউ. সি. চিলড্রেন্স পার্কে এক সভা ডাকেন। এ সময় আমরা একদিকে দালাদের ও কংগ্রেসী নেতাদের মারার জন্য প্রকাশ্যে এলান দিচ্ছি ও রোজ দালাল ও পুলিশদের সাথে গেটে মারামারি করছি। অথচ যারা পটারী হরতালের পরিচালক ও সংগঠক তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আমরা তখনও সম্পূর্ণ অন্ধ এবং অত্যন্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীন ও তাচ্ছিল্য পূর্ণ মনোভাব পোষণ করেছি। আমরা সমস্ত বিশিষ্ট কমরেড শুদ্ধ সবাইকে সেই সভাতে হাজির থাকতে বলেছি। ফলে সভা শুরু হবার আগেই আমাদের ৬০জন কমরেড ধরা পড়েন এবং তার মধ্যে পটারী ও সমগ্র পূর্ব কলিকাতা অঞ্চলের বিশিষ্ট কমরেডরাও ছিলেন। আমাদের খেয়াল হয়নি যে এই ধরণের বে-আইনি কার্য্যকলাপ, সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং দৈনন্দিন আইনি কাজকে একসঙ্গে চালানো সম্ভব নয়। অন্তত তার জন্য আলাদা সংগঠনও দরকার। নতুবা আইনসঙ্গত কাজের সামান্য সুযোগও অত্যাচারীরা কেড়ে নেয়। হরতাল চলতে থাকে। জুন, জুলাই দু'মাস কাবার হয়ে গেল। যে সব দালালরা কাজে ঢোকার চেষ্টা করছিল এবং আমাদের কমরেডদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করছিল তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে দালাল ছাড়া ও কিছু কিছু সাধারণ শ্রমিক কাজে যোগ দিতে থাকেন। মালিক কিছুটা ভরসা পেয়ে আই. এন. টি. ইউ. সি. নেতা ও পুলিশের সাহায্যে কারখানা চালু করার চেষ্টা করে। ১লা আগষ্ট তারিখ ৫০০ শত শ্রমিক ছাঁটাই করে কারখানা চালু করবে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। হাজার বার'শ মত শ্রমিক গেটে আসেন কিন্তু তাদের বোঝাতেই এক অংশ ছাড়া বাকিরা বাড়ি ফিরে যান। দু মাসের মধ্যে শ্রমিকদের জন্য রিলিফের বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করা হলো না। যাও বা সার্কুলার ডি. সি. থেকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সংগঠিত ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে পটারী শ্রমিকদের সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা করা হলো না। অথচ মালিক একদিকে বীভৎস পুলিশি অত্যাচার চালিয়ে এবং অন্যদিকে আই. এন. টি. ইউ. সি. মারফৎ রিলিফ বন্টন করে লালঝাণ্ডার প্রভাব থেকে শ্রমিকদের আলাদা করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকলো। কিন্তু খুব বেশি কার্যকরী হতে পারলো না। কারণ শ্রমিকরা তখনও লালঝাণ্ডা সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

আমরা কোন রিলিফের ব্যবস্থা না করতে পারায় পেছনে কি কারণ ছিল? আমরা মনে করতাম এবং যে চিন্তাধারা আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল তাহলো এই যে— এই গৃহ যুদ্ধের যুগে কোন রিলিফ দিয়ে সংগ্রাম চালানো সম্ভব নয়। বরং শ্রমিকদের মনোবল বজায় রাখার পক্ষে তাদের লড়াইকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং ফাটাফাটির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর পর্য্যায়ে তোলাই হলো সঠিক পথ। তাই রিলিফের চেয়ে সংঘর্ষ বাধানোই হলো আমাদের কাছে মুখ্য ব্যাপার। সুতরাং রিলিফের প্রশ্ন আমাদের কার্যসুচিতে বিশেষ স্থান পেল না। কমরেড বিলাসের

এক চিঠির জবাবে লাল তাকে এ কথাই জানিয়ে ছিলেন। এই সময় অধিকাংশ শ্রমিকের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে। নেতৃস্থানীয় শ্রমিক ক্যাডাররা গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন এবং বাদ বাকি বসে পড়েছেন। এমন লোক বিশেষ কেউ আর নেই যারা সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ভরসা জাগাতে পারেন। আমরা বাইরে থেকে কিছু কমরেড জোগাড় করে শ্রমিকদের কাছে পাঠাবার চেষ্টা করলাম যাদের তারা কোন দিনই দেখেননি। যারা দালাল নন অথচ কাজে যাবার জন্য চেষ্টা করলেন আমরা তাদের রুখতে চেষ্টা করলাম; এমনকি তাদের উপর সময় সময় বোমা ও এসিড বাল্ব ছাড়া হলো। ১৩ই আগষ্ট তারিখে ২০০ শত মহিলা শ্রমিক পিকেটিং লাইনে দাঁড়ালেন। মহিলা শ্রমিকদের জঙ্গি প্রতিরোধ বর্বর পুলিশ বাহিনী ও কংগ্রেসী গুণ্ডাদের অত্যাচারের সামনে পড়ল। ৯ জন মহিলা শ্রমিকের জীবন বিপন্ন হলো, অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। তারপর পুলিশ জুলুমের মাত্রা শেষ সীমায় এসে পৌছালো। এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বসলো, সাধারণ শ্রমিকদের পর্য্যন্ত বস্তিতে বস্তিতে খুঁজে বেড়াতে লাগলো এই পাগলা কুকুরের দল। ভয়ে শ্রমিকরা বস্তি ছেড়ে পালাতে লাগলেন। যারা অবশিষ্ট ছিলেন তাদের কাছে আমাদের কমরেডরা গেলে, জোড় হাত করে শ্রমিকরা কেঁদে ফেলতেন ও অনুরোধ করতেন তাদের কাছে না আসতে। কারণ কোন প্রকার খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হামলা করে গুঁড়িয়ে দেবে সব, গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে নির্বিচারে। তারা আমাদের মিটিংগুলিতেও আর আসতেন না। আস্তে আস্তে তারা আই. এন. টি. ইউ. সি'র নেতা অমিয় দাসগুপ্তের নেতৃত্বে যে সব মিটিং হতো তাতে যোগ দিতে লাগলেন। কিন্তু তাদের দাবি ও তাদের ঐতিহ্য তারা ভুললেন না। কংগ্রেসী ঝাণ্ডা কাধে চাপিয়ে দিয়ে যখন ঐ কংগ্রেসী নেতারা শ্রমিকদের দিয়ে শোভাযাত্রা বার করতো তখনও শ্রমিকরা "লালঝাণ্ডা কি জয়"— এই শ্লোগানই দিতেন। তারা ভোলেননি যে তাদের জন্য লালঝাণ্ডাই লড়ছে, মরেছে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করেছে অতীতে এবং আজও করছে। কিন্তু তবুও তারা— আমাদের ছেড়ে কংগ্রেসী সভায় কেন যেতেন, কেন আমরা বস্তিতে গেলে কেঁদে কেঁদে অনুরোধ করতেন তাদের বস্তিতে না যাওয়ার জন্য— তা আমরা অনুভব করতে পারলাম না। আমরা কল্পনা করতে পারলাম না যে ঐ শ্রমিকদের লালঝাণ্ডার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হচ্ছিলেন পুলিশের অত্যাচারের চোটে আমাদের বারণ করতো তাদের কাছে না যাবার জন্য। কংগ্রেসী মিটিংএ গিয়েও যদি কিছু প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়, এবং অত্যাচারের থেকে বাঁচা যায় তার জন্যই তারা যেতেন সেই মিটিংএ। কিন্তু দালালকে রোখা বা দাবি আদায়ের জন্য সংকল্প তাদের তখনও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। ২৮শে তারিখ সমস্ত কলকাতা শহরে পটারী দিবস পালন করার জন্য টি. ইউ. সি থেকে আহ্বান জানানো হয়। পি. সি. ও অন্যান্য জেলাগুলিকে পটারী দিবস পালন ও তাদের সাহায্যে জন্য আবেদন জানান। বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায় না, ২৮শে তারিখ ময়দানের মিটিংএ ৩/৪ হাজার লোক হলেও তাতে পটারীর শ্রমিকই বেশি ছিলেন। এলাকায় শোভাযাত্রা নেওয়া হয়, কিন্তু শ্রমিকদের দীর্ঘকাল ধর্ম্মঘটের পর আর তাদের মনোবলকে উন্নত করা সম্ভব হয় না। এভাবে চলতে চলতে গোটা সেপ্টেম্বর মাসও যখন চলে গেল তখন হরতাল ভেঙ্গে গেছে, শ্রমিকরা বহু সংখ্যক কাজে যাচ্ছেন। কেউ আর বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে হরতাল চালু আছে। হরতাল শুরু হওয়ার প্রায় দেড় মাস পরে কমরেড চন্দ্রনাথ অবশ্য হরতালের অবস্থা দেখে এটাকে প্রত্যাহারের কথা বলেছিলেন। এই হরতাল পরিচালনার

ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব ডি. সি. থেকে তারই ছিল। কিন্তু তৎকালীন অবস্থায় পি. সি'র তরফ থেকে কমরেড নিতাই তার বিরোধিতা করে বলেন যে বিপ্লবী জামানায় আপসহীন সংগ্রামই আমাদের প্রোগ্রাম। হরতাল ওঠানো হবে না। এ হরতালে হারলেও কিছু ক্ষতি হবেনা। বরং শ্রমিকরা তার ভিতর দিয়ে রাজনীতিগত ভাবে সচেতনই হবে। শেষ পয্যন্ত ডি. সি'র সকলেই অবশ্য সে প্রস্তাবে সমর্থন জানান। যাই হোক সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এলাকার কমরেডদের সাথে কমরেড সূর্য্যও পি. সি. থেকে দেখা করেন। কিন্তু তখনও আমাদের প্রোগ্রাম থাকে যারা কাজে যাচ্ছেন যদিও তারা ৮ই জুন আমাদের কথায় বুকের রক্ত দিয়েছিলেন আজ আর তারা আমাদের বন্ধু নন— তাদের রুখতেই হবে। সেই অনুযায়ী কাজও হতে থাকে। আমরা তখন সাধারণ শ্রমিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে হরতালের জোয়াল চাপিয়ে তাদের ঠেলে নিয়ে চলার চেষ্টা করেছি ৪ মাস পর্য্যন্ত। এমনকি এসময় পি. বি. সভ্য কমরেড গৌরও এই হরতাল সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখতেন এবং বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শও দিয়ে থাকতেন। তিনি একসময় কমরেড চন্দ্রনাথকে পরামর্শ দেন যে কারখানা ও বস্তির আশে পাশে যে সমস্ত সশস্ত্র পুলিশ লরি ঘুড়ে বেড়ায় তাদের উপর একটু বড় ও বিশেষ ধরণের আক্রমণ পরিচালনা করতে। যাই হোক অবস্থা বিবেচনায় আমরা শেষ পর্য্যন্ত আর তা করিনি। তবে ঐ এলাকার বিখ্যাত দালাল মহাদেব গুণ্ডা মার খায় ও কোন গতিকে তার প্রাণ রক্ষা পায়। এবার আমরা দেখলাম যে হরতাল ভেঙ্গে গিয়েছে, কিন্তু তাকে তবুও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করলাম না। এই হরতালকে কেন্দ্র করে যত রকমের বিচ্যুতি তা প্রায় সবগুলিই হয়েছে বলা চলতে পারে।

এই সময়ে ক্যাডারদের সম্পর্কে অমার্জনীয় গাফিলতি দেখানো হয়েছে। নেতৃস্থানীয় কমরেড যাদের শ্রমিকরা ভালোবাসতেন ও যারা প্রচুর প্রভাবশালী ছিলেন তাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা আমরা করিনি। আমরা জানতাম পটারী গেটে যে সমস্ত কমরেডদের পিকেটিং করার জন্য পুলিশের সামনা সামনি পাঠানো হচ্ছে তারা আর ফিরে আসবেন না। যুবসভা সেলের কমরেডদের প্রচুর আপত্তি সত্ত্বেও আমরা তাদের জোর করে পাঠিয়েছি।

একমাত্র হরতালকে দীর্ঘস্থায়ী করার যুক্তিতে কোন দিকেই আমরা তাকাইনি। ফলে যুব সভা সেলটির প্রচুর ক্ষতি আমরা করেছি। শুধু তাই নয়—এই সময়ে বামপন্থী বিচ্যুতির সুযোগ কিভাবে পার্টির শত্রুরা পার্টির গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ও শেষ পর্য্যন্ত ভুল পথে সংগ্রামকে পরিচালনা করে শ্রমিকশ্রেণির ও পার্টির সর্বনাশ করে— তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যাবে। খুলনা থেকে আগত এক পার্টি সভ্যকে কাজ করতে দেওয়া হয়। তার নাম সুধাকর দাস (সতু)। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে কাজ করে ডি. সি'র বিশ্বাস অর্জন করেন এবং তিনি নেতৃস্থানীয় ও বিশ্বাসভাজন কমবেড হিসাবে পরিগণিত হন। আমরা ইতিমধ্যে জানতে পারি যে তিনি খুলনার একজন বহিস্কৃত পার্টি সভ্য, এবং তার সাথে পুলিশের যোগাযোগও আছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা তা পরোয়া না করে তাকেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দায়িত্ব দিতাম ও বিশ্বাস করতাম। পরবর্ত্তী সময়ে প্রমাণ হয় যে তিনি আমাদের অনেক মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছেন যার ফলে বহু সময়েই আমরা এলাকার কমরেডদের সাথে একমত হয়ে ঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি এবং তাদের সন্দেহ করেছি। পরে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সেই সতু একজন পুলিশের গুপ্তচর। তিনি ডি.সি.র আস্থা অর্জন করেছিলেন আমাদের বামপন্থী হঠকারী যে নীতি—একমাত্র সেই নীতির একজন শ্রেষ্ঠ সমর্থক হিসাবে নিজেকে

আমাদের কাছে জাহির করে। এমনি করে দিনের পর দিন আমরা পটারী শ্রমিকদের এই সংগ্রামকে দীর্ঘস্থায়ী করেছি। বৃহত্তর সংগ্রামের পর্য্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য শ্রমিকদের তৎকালীন চেতনা ও অবস্থাকে বিচার করিনি। আমরা ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের সামনে শ্রমিকদের বিনা দ্বিধায় ঠেলে দিয়েছি। সময় উপযোগী কোন কৌশলের কথা চিন্তাও করিনি। ফলে আজ আমরা শুধু পটারীতেই নয় সমগ্র এলাকা থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। কারণ পটারী সংগঠন ও পটারী শ্রমিকরাই ছিলেন ঐ এলাকার প্রকৃত নেতা। তাদের উপর নির্ভর করতো অন্যান্য শ্রমিকদের আশা ভরসা। আমরা তাকে ডুবিয়েছি। আজও পটারীতে শ্রমিকদের সাধারণ সংগঠন অর্থাৎ ইউনিয়ন পর্য্যন্ত ভাল ভাবে গড়ে ওঠেনি। একাধিক সেল ও অসংখ্য শ্রমিক সভ্য ও মিলিট্যান্ট আজ আর পটারীতে নেই। কয়েকজন মধ্যবিত্ত কমরেডদের নিয়ে গঠিত সেল সেখানে কোন রকম শ্রমিকদের সাথে সেই হারানো যোগসূত্রকে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছেন।

জুন অনশন ধর্মঘট

এপ্রিলের অনশন ধর্ম্মঘটের শর্তসমূহ কার্যকরী করতে বিধান সরকার অস্বীকার করায় আবার জুন মাসে আমাদের জেল কমরেডরা অনশন শুরু করেন। এই অনশন ধর্মঘট অর্থাৎ জেলের লড়াই পরিচালনার দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে পি. সি. এবং জেল কমিটির ছিল। আমরা টি. ইউ. ছাত্র ও অন্যান্য আরও ৫টা ফ্রন্টের মতই জেলকে একটা ফ্রন্ট হিসাবে চিন্তা করেছি। জেলের বন্দীদের উপর জনগণের যে শ্রদ্ধা ও মমতাবোধ ছিল, তাকে কাজে লাগাবার জন্য তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলেছি। আমরা যে, অমূল্য জীবনগুলি হারিয়েছি, তার জন্য দায়ি আমাদের এই সংকীর্ণতাবাদ। আজ আমরা অনেক দেরিতে সেকথা উপলব্ধি করেছি।

৮ই জুন, প্রেসিডেন্সি জেলে, ৯ই দমদম জেলে গুলি চালনা করা হয়। বন্দুকের মুখামুখি দাঁড়িয়ে আমাদের কমরেডরা সেদিন প্রায় খালি হাতে যে প্রতিরোধ চালিয়েছিলেন তা কেউ কোন দিন ভুলতে পারবে না। রক্তের স্বাক্ষরে তা প্রত্যেকের মনে দাগ কেটে থাকবে। যদিও সেদিনের ভুল নীতিকে কার্য্যকরী করতে গিয়েই আমাদের কমরেডরা তাদের অমূল্য জীবনগুলিকে বলি দিয়েছেন তবুও তারা একথা প্রমাণ করেছেন যে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মিরাই পারেন তাদের সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করার জন্য এভাবে সাহসের সাথে প্রাণ দিতে। ৪জন কমরেড শহিদ হলেন ও বহু কমরেড চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে গেলেন এই লড়াইতে। এই লড়াইয়ের সমর্থনে ব্যাপক জনমত সংগঠিত করে তাকে 'ক্ষমতা দখলের' পর্য্যায়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল সে সময়ে ডি. সি'র লক্ষ্য ও দায়িত্ব।

গুলি চালনার খবর শোনার পর আমরা বিভিন্ন এলাকায় ১১ই তারিখে নির্ধারিত সাধারণ হরতালের ডাক নিয়ে ছড়িয়ে পড়ি। যে কোন উপায়ে হরতাল করাবার জন্য ডি. সি. থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়। যেখানে যিনি প্রিয় নেতা এবং জেলে আছেন তার নাম করেই আমরা আপিল করি। যেমন টালিগঞ্জের কমরেডরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কারখানার কমরেড মুজাফফর আহম্মদের নাম করে ও তিনি আহত বলে সেখানে হরতাল করান। যাই হোক তা সত্ত্বেও বিশেষ কোথাও মজুররা সাড়া দেন না। সাধারণ হরতালের ডাক একদম মাঠে মারা যায়। এই হরতালের ডাক কার্য্যকরী না হওয়া সম্পর্কে আমাদের যে মনোভাব ছিল তা পি. সি.'র, ১৫ নং বুলেটিনে যা যা লেখা হয়েছে তা থেকে অভিন্ন ছিল না। আমরা ১০ তারিখ হাজরা পার্কে

সভা ডাকি এবং সেখান থেকে শোভা যাত্রা আলিপুর জেলগেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন ওখানে চতুর্দ্দিক থেকে পুলিশ ও মিলিটারী বেষ্টিত হয়ে পড়ায় বিশেষ কিছু করার সুযোগ থাকে না। তখন শোভা যাত্রা প্রতাপ গুহরায় ও সুরেন ঘোষের বাড়ি হামলা করার জন্য পরিচালনা করা হয়। হামলার সময় কমরেডদের এক অংশের মধ্যে উৎসাহ ও এক অংশের মধ্যে বিরোধিতা দেখা যায়, তবুও আমরা হামলা করি ও শ্লোগান দেওয়া হয় পাড়ায় পাড়ায় কংগ্রেসীদের খতম কর। এ সময়ে প্রোসেক্ট থেকে 'জেলগেট ভেঙ্গে ফেল' বলে যে সার্কুলার দেওয়া হয় তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জেলগেটে সেদিন কিছু করতে না পারার ফলে কমরেড মল্লিক আমাদের বেশ সমালোচনা করেন। সেদিনের হাজরা পার্কের মিটিং টি. ইউ. সি'র তরফ থেকে ডাকা হয়েছিল। আমরা বন্দীদের দাবি সমর্থন করে জেলা কমিটি থেকে যে ইস্তাহার দেই সেই ইস্তাহারেই ফলাও করে উক্ত মিটিংএর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

এই সময় বিভিন্ন পার্কে আমরা কতগুলি মিটিং ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ডাকার ব্যবস্থা করি। প্রত্যেক জায়গাতেই আমরা কমরেডদের হামলার সামনে ঠেলে দিয়েছি এবং ফলে তারা গ্রেপ্তার হয়েছেন। ট্রামে, বাসে বে-পরোয়া আক্রমণ চালানো হয়েছে। এ সময় শুধু সাধারণ লোকদের কাছ থেকেই নয় আমাদের বহু কমরেড-এর কাছ থেকেও বহু প্রশ্ন এসেছে। আমরা তাদের উপেক্ষা করেছি এবং সংস্কারবাদী ও ভীরু বিশেষণ দিয়েছি। এক্ষেত্রে কমরেড সুনীতির ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সেদিন জেলগেটে কৃতিত্ব সহকারে কমরেডদের পরিচালনা করে যেহেতু ফাটাফাটি করাতে পারেননি ফলে তার উপর সন্দেহ বাড়তে লাগলো। তারপর থেকে তাকে আজ এখানে ও কাল সেখানে করে পি. সি. শেষ পর্য্যন্ত তাকে টি. ইউ. সি. অফিসে বসিয়ে দিলেন। অনেকদিন থেকেই পুলিশ তাকে খোঁজাখুঁজি করছিল এবং তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।

এভাবে যতই দিন যেতে লাগলো ততই মিটিগুলিতে জমায়েত কম হতে থাকলো, কারণ উপস্থিত লোকরা দেখতেন যে মিটিংগুলি ডাকা হতো যেন ফাটাফাটি করার জন্যই। একথা অবশ্যই ঠিক যে আমরা মনে করতাম বড় করে ফাটাফাটি করে আমরা যদি পুলিশদের পর্যুদস্ত করতে পারি তাহলে কমরেডরাও ভরসা পাবেন এবং মিটিংএও লোক আসতে থাকবে। এইভাবে একদিন আমরা গোটা কলিকাতা পার্টিকে জমায়েত করার জন্য মেগুেট্ দিলাম ডোভার লেন মেসে জমায়েত হওয়ার জন্য। কিছু কমরেড জমা হওয়ার পর আমরা এক শোভা যাত্রা বার করলাম। সে শোভা যাত্রা লেক মার্কেটের সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। কিছু কমরেড ঘায়েল ও গ্রেপ্তার হন। অনশন ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে বহু কমরেড হতাশ হয়ে পড়েন ও আন্দোলনের দুর্বলতা দেখে অনেকে হরতাল প্রত্যাহারের কথাও চিন্তা করেন।

২৬শে তারিখে আমরা মেটেব্রুজে সভা ডাকি ও শোভা যাত্রার জন্য চেষ্টা করি। সভায় খুব কম লোক আসেন। শোভা যাত্রায় আমাদের কমরেডরা ছাড়া অন্য কেউ অংশ গ্রহণ করেন না। শ্রমিকরা রাস্তার ২ পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন ও মুখে সহানুভূতি দেখান ও প্রশংসা করেন। শোভা যাত্রা কিছু দূর অগ্রসর হতে না হতেই বিরাট পুলিশ বাহিনী হামলা করে আমাদের কমরেডদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন হয় জুনের মাঝামাঝি। এই সময় কংগ্রেসী বিধান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে গণবিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল তা কংগ্রেসী মিটিং ভাঙ্গা (দেশপ্রিয় পার্কে)

ও তৎপর নির্বাচনে শরৎ বসু সমর্থনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, কিন্তু আমাদের সঙ্কীর্ণতাবাদী নীতির ফলে আন্দোলনের মধ্যে বন্দী হত্যার বিরুদ্ধে সেই গণবিক্ষোভকে পরিচালনা করতে পারল না। শেষ পর্য্যন্ত যদিও এর মীমাংসার ভিত্তিতে বন্দীরা অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করেন কিন্তু বিধান সরকার তা প্রকাশ্যে স্বীকারও করে নাই।

এ সময় আমরা অনেক রিপোর্টকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিকৃত করার চেষ্টা করেছি, এবং পি. সি. নেতৃত্বের মতই চিন্তা করেছি তারও যথেষ্ট উদাহরণ আছে। এই আন্দোলনের রিপোর্ট দিতে গিয়ে কমরেড সমীরণ পি. সি. কে লেখেন যে "পার্টি সভ্যদের একাংশের মধ্যে যে দ্বিধা ও সন্দেহ প্রতি পদে পদে দেখা দিয়েছে তাহা আমাদের আন্দোলনের রেশকে ভীষণভাবে প্রতিহত করেছে।"

অর্থাৎ আন্দোলন প্রতিহত হওয়ার জন্য দায়ি হলো আমাদের কমরেডদের একাংশের দ্বিধা ও সন্দেহ। যে নীতি আমরা অনুসরণ করলাম, জনতার চেতনার স্তরকে বাদ দিয়ে সে নীতি ও কর্ম্ম কৌশলের জন্যই যে আমাদের সব ব্যর্থ হলো—তা আমাদের নজরে পড়ল না। আমরা বরং তাদেরই দায়ি করলাম যারা এই কৌশল সম্পর্কে বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন বা সন্দেহ পোষণ করতেন। এই রকমই ছিল আমাদের নীতি ও কৌশল যার দ্বারা আমরা নিজেরা নিজেদেরকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি। সন্ত্রাসবাদী ও ট্রটস্কিবাদী নীতি কৌশল, চালিয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থার সুযোগ আমরা এই অত্যাচারী সরকারকে গ্রহণ করতে দিয়েছি। এ সময় বহু কমরেড মনের কথা সমালোচনার ভয়ে প্রকাশ করতে পারতেন না, ফলে নিরঙ্কুষ ভাবে পার্টির মধ্যে বামপন্থী বিচ্যুতি চলতে থাকে, পার্টির আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে। এই দুটি অনশন ধর্মঘট আন্দোলনে আমরা ক্যাডারদের সম্পর্কে অত্যন্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীন মনোভাব দেখিয়েছি। ফলে আমাদের অসংখ্য কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন ও পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এ সমস্ত সম্পর্কে তখন আমাদের মনে বিশেষ কোন প্রশ্ন বা দ্বিধা আসেনি। মনে হতো কমরেডরা হয়তো সঠিকভাবে শ্লোগানকে কার্য্যকরী করতে পারছেন না। তাই যতখানি আশা করা গিয়েছিল ততখানি সফলতা হচ্ছে না, নতুবা সবই হয়তো ঠিক আছে। জাতীয় টি. ইউ এবং সোস্যালিষ্ট নেতারা শ্রমিক ও জনসাধারণের উপর ক্রমবর্ধমান পুলিশি হামলাকে শুধু "লালঝাণ্ডা ওয়ালাদের কাজের" ফল হিসাবে প্রচার এবং সন্দেহ সৃষ্টি করতে সুযোগ পেয়েছে, আমাদের কাজের ফলে। শ্রমিকদের মধ্যে তারা একটা ভয়ের ভাব ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে চলার অর্থাৎ 'চুপ করে থাকার' মনোভাব তৈরি করে দিতে পেরেছিল। আমরা জনতাকে বাদ দিয়ে এসব করার ফলে আমাদের এই লড়াইগুলিকে জনসাধারণ সরকার ও কমিউনিস্টদের লড়াই হিসাবে তখন দেখছেন। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে জনসাধারণ কংগ্রেসী সরকারের অত্যাচারী রূপ ও বন্দী নির্য্যাতন দেখে যথেষ্ট মোহ মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু সে মোহ মুক্তির দাম আমাদের যে ভাবে দিতে হয়েছে তুলনামূলক বিচারে তাতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণটাই বেশি ছিল।

এলেনবেরী কারখানা ধর্মঘট

এ সময়ে এলেনবেরী দখল একটি বিশিষ্ট ঘটনা কিন্তু এর নেতৃত্ব ছিল বিশেষভাবে হাওড়ার কমরেডদের হাতে; যদিও যোধপুরের কারখানাতে আমাদের একটি সেল ছিল। এখানে

স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল হয় ও চলে মোট ২৪ ঘন্টা, ফলে ডি. সি.'র তরফ থেকে কোন নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। খবর পেয়ে কমরেডদের সাথে যোগাযোগ করতে করতে হরতাল ভেঙ্গে যায়।

দক্ষিণ কলকাতা উপনির্ব্বাচন

[এই অংশটি সহায়ক তথ্য-৬এ পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে।— সম্পাদক]

...

ন্যাশনাল কার্বন

গত বছর ২৭শে জুন কাশীপুরে ন্যাশনাল কার্বন কারখানায় একটা বড় রকম সংঘর্ষ হয়। পার্টি বে-আইনি হবার কয়েকদিন পরেই এই কারখানায় আর একটি সংঘর্ষ হয়েছিল এবং এই সংঘর্ষে ধৃত দু'জন নেতৃস্থানীয় শ্রমিক জুন মাসে মুক্তি পেলে কোম্পানী তাঁদের কাজে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করে। এই দু'জন শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে এই দাবি সামনে রেখে সংঘর্ষের প্রস্তুতি হয়। কিন্তু আসলে আমাদের মনে দাবিটা ছিল নিতান্ত গৌণ, সংঘর্ষটাই ছিল মুখ্য। তখন জেলে অনশন ধর্মঘট চলছে এবং বাইরে আমাদের ভুল নীতির ফলে বন্দী-মুক্তি আন্দোলন ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে। সুতরাং একটা বড় রকমের সংঘর্ষ করে এই আন্দোলনকে আরও উঁচু স্তরে নিয়ে যাবার ইচ্ছা ও চেষ্টা আমাদের মধ্যে প্রবল ছিল। মুখ্যত এই উদ্দেশ্য নিয়েই ন্যাশনাল কার্বনে সংঘর্ষ করানো হয়েছিল।

অনশন ধর্মঘট ছাড়াও তখন পটারী এবং তারপরে এলেনব্যারীর ঘটনা ঘটে গেছে। তার উপরে আবার দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন উপলক্ষে দেশপ্রিয় পার্কে কংগ্রেসীরা প্রচণ্ড মার খেয়েছে। এই সব ঘটনার ব্যাখ্যা করা হোল এই বলে যে, কলকাতায় ক্ষমতা দখলের লড়াই আসন্ন, এলেনব্যারীর শ্রমিকরা কারখানা দখল করে ক্ষমতা দখলের রাস্তা এবং সেই রাস্তায় শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছেন।

এক বৃহৎ সংঘর্ষের দ্বারা বন্দী-মুক্তি আন্দোলন আরও উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে হবে এবং এলেনব্যারীর পথে কারখানা দখল দ্বারা ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করতে হবে— এই ছিল তখন আমাদের চেতনার সবচেয়ে বড় কথা। এই চেতনা অনুসারেই কার্বন কারখানায় সমস্ত সংঘর্ষের প্ল্যান করা হয়েছিল।

পার্টি বে-আইনি হবার পরেকার সংঘর্ষে ন্যাশনাল কার্বন ইউনিয়ন গুরুতর রকম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন বাদে এই দুইজন নেতৃস্থানীয় শ্রমিক ফিরে আসায় শ্রমিকদের মধ্যে আবার চাঞ্চল্য দেখা দেয়: স্থানীয় কমরেডরা এই দুইজন শ্রমিকের পুনর্নিয়োগের দাবির উপর কিছুটা প্রচার করলে বেশ সাড়া পাওয়া যায়। তখন তাঁরা ঠিক করেন যে কোম্পানী যখন এদের কাজে নিচ্ছে না তখন জোর করে এদের কাজে ঢোকাতে হবে। উক্ত শ্রমিক দু'জনের মধ্যে একজন এই প্ল্যান সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী হিন্দু শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের কোন প্রভাব নেই। অথচ এরাই কারখানার সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধুমাত্র বাঙ্গালী মুসলমান শ্রমিকদের উপর নির্ভর করে এরকম চেষ্টা করা ঠিক না।

একথা বলার জন্য উক্ত শ্রমিকটিকে ভীরু বলে অপবাদ দেওয়া হয় এবং জোর করে তাদের নিয়ে কারখানায় ঢোকার পরে কোম্পানী ও পুলিশ বাধা দিলে কারখানা দখল করারও প্ল্যান হয়। ডি-সির পক্ষ থেকে কমরেড ভাস্কর এই প্ল্যান পূর্ণ সমর্থন করেন এবং ডি-সির প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও পরিচালনায় এই সংঘর্ষের সমস্ত ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয়।

প্ল্যান অনুসারে উক্ত শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে নেবার দাবির সঙ্গে আরও কিছু দাবি জুড়ে দিয়ে ৩/৪ দিন প্রচার করা হয় এবং ঠিক হয় ২৭শে জুন জোর করে উক্ত শ্রমিকদের নিয়ে কাজে ঢোকা হবে।

তখনকার রাজনীতি অনুসারে সমস্ত প্ল্যানের মধ্যে শ্রমিকদের দাবি এবং সেই নিয়ে ব্যাপক প্রচার খুবই নগণ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। মূল লক্ষ্য ছিল সংঘর্ষ এবং সেইজন্য ভলান্টিয়ার দল, সংঘর্ষের প্ল্যান, 'স্পেশাল' ইত্যাদির ব্যবস্থার উপরেই জোর ছিল সর্বাধিক।

২৬শে শ্রমিকদের এক সভায় ২৭শে ভোরে জোর করে উক্ত শ্রমিকদের নিয়ে কারখানায় ঢোকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই লালঝাণ্ডার সমর্থক বাঙ্গালী মুসলমান শ্রমিক। তাঁরা আমাদের প্ল্যান সমর্থন করলেও বিশেষ কোন উৎসাহ দেখালেন না। হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী হিন্দুদের সমর্থন ছাড়া এই প্ল্যানের কার্যকারীতা সম্পর্কে ২/১ জন সন্দেহ প্রকাশ করায় তাঁদের দালাল বলে গাল দেওয়া হলো। রাত্রে ভলান্টিয়ারদের ও স্থানীয় কমরেডদের দুটি সভায় সংঘর্ষের প্ল্যান ব্যাখ্যা করে প্রত্যেকের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হলো। স্থানীয় কমরেডদের সভায় ঠিক হলো কার্বন কারখানায় সংঘর্ষ লাগলেই পার্শ্ববর্তী ইলেক্‌ট্রিক কারখানায় হরতাল করবার চেষ্টা হবে এবং তারপর সেই হরতাল পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কারখানাতেও ছড়াতে হবে। এই সভায় জনৈক কমরেড আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, দাবি ইত্যাদি নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ভাল প্রচার না করে এই রকম সংঘর্ষ করতে যাওয়া সন্ত্রাসবাদ ছাড়া কিছুই না, এরকম চেষ্টা সফল হবে না। উত্তরে কমরেড ভাস্কর তাকে ধমকে চুপ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, বিপ্লবী সংঘর্ষের পূর্ব মুহূর্তে যারা এরকম সংশয় প্রকাশ করেন সেইসব ভীরুদের সরে দাঁড়ানোই ভাল। ধমক খেয়ে কমরেডটি চুপ করে যান।

২৭শে সকালে শ্রমিকরা উক্ত বরখাস্ত শ্রমিক দু'জনকে নিয়ে কারখানায় ঢোকেন এবং প্ল্যান অনুসারে প্রথমে ম্যানেজারের কাছে দাবি পেশ করেন। কিন্তু কোম্পানী আমাদের পরিকল্পনার কথা টের পেয়ে আগে থেকেই কারখানায় সশস্ত্র পুলিশ ও প্রচুর গুণ্ডা আনিয়ে রেখেছিল। শ্রমিক প্রতিনিধিরা ম্যানেজারের সঙ্গে দাবি নিয়ে কথা বলছেন তখন গুণ্ডারা হঠাৎ কারখানার মাঠে সমবেত শ্রমিকদের উপর আক্রমণ করে। সংঘর্ষ বেঁধে যায়। আমাদের ভলান্টিয়াররা গুণ্ডা ও পুলিশদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। বেশ কিছু সংখ্যক গুণ্ডা ও পুলিশ জখম হয় এবং ভলান্টিয়াররা কয়েকটা রাইফেল কেড়ে নেন। এই সংঘর্ষে পার্টি সভ্য নয় এমন সাধারণ শ্রমিক ভলান্টিয়াররা যে অপূর্ব সাহস, দৃঢ়তা, নেতৃত্বের ক্ষমতা ও উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়েছেন সাম্প্রতিক কোন সংঘর্ষে তা আর দেখা যায়নি।

কিন্তু সংঘর্ষ শুরু হতেই সাধারণ শ্রমিকরা কারখানা ছেড়ে পালাতে থাকেন। দাবি নিয়ে বিশেষ কোন প্রচার হয়নি। তাই কি নিয়ে হঠাৎ এত ফাটাফাটি হচ্ছে তা অধিকাংশ শ্রমিকই না বুঝতে পেরে ভয় ও বিভ্রান্তিতে কারখানা ছেড়ে চলে আসেন। তারপর শক্তিশালী সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর আক্রমণে আমাদের ভলান্টিয়ারদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। শতাধিক শ্রমিক গ্রেপ্তার

হন, একজন লালঝাণ্ডা সমর্থক শ্রমিক গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ দেন।

কার্বন কারখানায় যখন সংঘর্ষ চলছিল তখন পার্শ্ববর্তী ইলেকট্রিক কারখানায় কমরেড ইলিয়াস ধর্মঘট করাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয় না।

এই সংঘর্ষের পরে কোম্পানী 'লকআউট' ঘোষণা করে। কিন্তু একদিন পরেই 'লকআউট' তুলে নেওয়া হয় এবং আমাদের হরতালের আহ্বান উপেক্ষা করে সমস্ত শ্রমিক কাজে যান। কারখানা খোলার পরে কোম্পানী প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু করে। বেছে বেছে লালঝাণ্ডা সমর্থক শ্রমিকদের ছাটাই ও গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। আই. এন. টি. ইউ. সি.' কিছু গুণ্ডাদের দিয়ে অন্যান্য শ্রমিকদের দিবারাত্রি ভয় দেখানো হয়, নানারকম বাধা নিষেধ, জুলুম ও সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় কারখানাকে এক জেলখানায় পরিণত করা হয়।

এই প্রচণ্ড অত্যাচারের চাপে কারখানায় আমাদের যা সংগঠন ছিল তা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। কারখানার মধ্যে তখনও আমাদের ২/৪ জন যারা সমর্থক ছিলেন তারাও আর ভয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পর্য্যন্ত রাজি হতেন না, ফলে শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ছাটাই শ্রমিকদের রিলিফ এবং ধৃত শ্রমিকদের মামলা চালাবার জন্য কিছু টাকা তোলার আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এত শক্ত হয়ে ওঠে যে সেই চেষ্টাও বিশেষ সফল হয় না।

এদিকে আমাদের ভলান্টিয়ারদের মধ্যে ২/৪ জন যারা তখনও পুলিশের নজর এড়িয়ে এলাকাতেই ছিলেন তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও আমরা করতে পারলাম না। একদিকে তাদের পুলিশ ও দালালরা খুঁজছে, অন্যদিকে তাঁদের থাকা খাবার কোন ব্যবস্থা নেই—এই অবস্থার মধ্যে পরে এই সব সেরা শ্রমিকরা কিছুদিন পরেই কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

এইভাবে আমাদের হঠকারী নীতি ন্যাশনাল কার্বনের সংগঠনকে একেবারে চুরমার করে দিল, শ্রেষ্ঠ শ্রমিক ক্যাডারদের আমরা হারালাম এবং আজ পর্য্যন্তও সেখানে কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নি।

এই সংঘর্ষের পরে ভি. সি.'র এক সভায় এই সম্পর্কে পর্যালোচনা হয়। কমরেড ভাস্কর বলেন শ্রমিকদের দাবি এবং দাবির উপর প্রচার বাদ দিয়ে এভাবে সংঘর্ষ করতে যাওয়া ভুল ও ক্ষতিকর হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে ঐ দিন, সংঘর্ষ পর্য্যন্ত না যেয়ে ঘেরাও এর মধ্যে আমাদের লড়াই সীমাবদ্ধ রাখলেই বোধ হয় ভাল হতো। কারণ তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা আরও বড় সফল সংঘর্ষ করতে পারতাম।

পি.সি.'র পক্ষ থেকে কমরেড নিতাই ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। দাবি এবং দাবির উপরে প্রচার ইত্যাদি বাদ দেওয়ার সমালোচনা তিনিও করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন যে, এই বিপ্লবী যুগে কোন সংঘর্ষই আজ ব্যর্থ হয় না। কোন সংঘর্ষই আজ বিচ্ছিন্ন নয়। বৃহত্তর শ্রেণি সংগ্রামের পটভূমিকায় এই সব সংঘর্ষগুলিকে আমাদের দেখতে হবে। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে শ্রেণি সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা জিতেছি, সুতরাং একটা দুটা লড়াইয়ের পরাজয় দ্বারা শ্রেণিসংগ্রামের ভাগ্য নির্ধারিত হয় না। বরং এই সব আংশিক ছোট বড় সংঘর্ষ বৃহত্তর জয়ের পথ প্রশস্ত করে। সুতরাং কোন সংঘর্ষই আজ ব্যর্থ হয় না।

বলা বাহুল্য, আমরা সবাই এই ব্যাখ্যা মেনে নিই এবং এলাকায় যে সব কমরেড কার্বনের লড়াই সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাদেরও অনুরূপভাবে বোঝান হয়।

কর্পোরেশন হরতাল

টালা পাম্পিং ষ্টেশনের ধর্ম্মঘটের পর আমাদের বহু মূল্যবান পার্টি কমরেড ধরা পড়েন। তারপর থেকেই একটা ঢিলা ভাব কর্পোরেশনের সংগঠনে চলতে থাকে। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও চারিদিকের সংগ্রামী অবস্থা তাদের মধ্যে লড়াইয়ের ইচ্ছাকে প্রবল করে তোলে। শহরে লোক ৪ গুণ বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকদের সংখ্যা বা বেতন কোনটাই বাড়ানো হয় না বরং তাদের খাটুনীকেই ৪ গুণ বাড়ানো হয়। তার উপর চলতে থাকে ঝাড়ুদারদের দিনে ৪ বার ডিউটি ও নানারকম জুলুম। '৪৯ জানুয়ারিতে সরকারি কর্মচারীদের মাগ্‌গিভাতা ১০ টাকা বাড়ানো হয়। কর্পোরেশনের শ্রমিকরা সরকারি কর্মচারী হয়েও তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। এই সমস্ত কারণে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ ফাটার মত অবস্থায় আসে।

আই. এন. টি. ইউ. সি. নেতৃত্ব এই অবস্থায় নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করে না। কিন্তু তারা শ্রমিকদের ধোঁকা দেবার চেষ্টাতেও কসুর করে না। তারাও লড়াইয়ের কথা বলেন। আমরা এই সময় স্থির করি যে, পূজার পূর্বেই অর্থাৎ ২৫শে সেপ্টেম্বরই হরতাল হবে। হরতালের দিন ধার্য্য করার সময় কর্পোরেশন ফ্রাকশন থেকে সিদ্ধান্ত লওয়া হয় এবং পরে সাধারণ সভা থেকেও পাশ করানো হয়। তৎকালীন যে সমস্ত সভা হতো তাতে শ্রমিকদের সংখ্যা ৪ হাজার পর্য্যন্তও হতো। ২৫শে হরতালকে ব্যর্থ করার জন্য আই. এন. টি. ইউ. সি. ২১শে অক্টোবর হরতালের সিদ্ধান্ত করে এবং প্রচার চালাতে থাকে যে, পূজায় হরতাল করলে পাব্‌লিক বিরুদ্ধে যাবে। জনসাধারণ বিরুদ্ধে গেলে ষ্ট্রাইক-এ জেতা যাবে না।

এদিকে অবস্থা হলো এই যে, পূজা যতই নিকটবর্ত্তী হতে থাকলো শ্রমিকদের মধ্যেও দোদুল্যমানতা ততই বাড়তে থাকলো ক্রমশই মিটিংএর জমায়েত হতে থাকলো। শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিকদের মধ্যে প্রশ্ন এল আই. এন. টি. ইউ. সির শ্রমিকদের বাদ দিয়ে হরতাল করা উচিত হবে কিনা অথবা আই. এন. টি. ইউ. সি.র ডাকের সাথে মিলিয়ে ২১শে অক্টোবর একসঙ্গে হরতাল করা হবে? এই বাস্তব অবস্থা আমাদের কমরেডদের মধ্যেও প্রশ্ন জাগায়। হরতালের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার জন্য পুনরায় আলোচনা হয়। তাদের মধ্যেও দ্বিমত দেখা যায়। কমরেড মল্লিকের উপস্থিতিতে ডি-সি মিটিংয়ে স্থির হয় যে ২৫শে সেপ্টেম্বর হরতাল করাতেই হবে। আমাদের ঘাঁটি হলো দক্ষিণ কলকাতার ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট। যদি আমরা ৪নং জেলাকে হরতাল করিয়ে বিভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট-এ হল্লার কাজে লাগাতে পারি তো হরতাল নিশ্চয়ই সফল হবে। আমাদের মাথায় তখন ঐ থিওরী যে এক জায়গায় কিছু একটা জাগাতে পারলে ও কমরেডরা সঠিকভাবে চেষ্টা করলে সেটাকে নিশ্চয়ই ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। যাই হোক ২৩শে সেপ্টেম্বর কর্পোরেশন ফ্রাকশনের বর্ধিত সভায় কমঃ লাল যান। সেখানে প্রথমেই যেটা নজর পড়ে তাহলো প্রত্যেক কমরেড হরতালের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান। প্রভাত এবং আরও কয়েকজন কমরেড হরতালের বিরোধিতা করে সাবধানবাণীও করেন। শ্রমিক কমরেড হরি (কর্পোরেশনের শ্রমিক) যিনি কর্পোরেশন-শ্রমিকদের অবস্থা সবচেয়ে ভাল করে বুঝেছিলেন তার কথাকেও অগ্রাহ্য করে লাল সেখানে ডি. সি. সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার কথা বলেন। ঐ মিটিংএর পর লাল নিজেও খানিকটা সন্দিহান হন এবং ফ্রাকশন সম্পাদক কমরেড বিমানকে

জানান যে তার পরদিন ২৪শে হাজরা পার্কে কর্পোরেশন শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সভার উপর নির্ভর করে যেন হরতালের শেষ সিদ্ধান্ত নেন, অথবা অবস্থা খারাপ দেখলে ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত রাখেন। অর্থাৎ শ্রমিকদের মধ্যে একটা অংশ যদি হরতালের পক্ষে থাকেন তো হরতালের ডাক দেওয়া আর যদি কোন যোশ না থাকে তো স্থগিত রাখা। কমঃ বিমানকে জানানো হয় যে এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ডি. সি. আবার মিটিং করে তার শেষ সিদ্ধান্ত হাজরা পার্কে পৌঁছে দেবে। শেষ পর্যন্ত হাজরা পার্কের মাত্র ৫/৭শত শ্রমিকের রায়েই হরতালের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ঐ দিনের সভায় যে ২০ হাজার শ্রমিক উপস্থিত থেকে এ হরতালের বিরুদ্ধেই তাদের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করলেন, সেটা আমাদের নজরে পরল না।

তার পরদিন ভোরবেলা ৪নং ডিস্ট্রিক্টএ হরতাল হলো কিন্তু তা অন্যান্য জায়গায় ছড়ানো সম্ভব হলো না। কারণ ৪নং ছাড়া অন্যান্য জায়গায় টেম্পো তত ভাল ছিল না। এক্ষেত্রে আই. এন. টি. ইউ. সি. নেতারা দালালের ভূমিকা গ্রহণ করেও কিছু শ্রমিক গ্রেপ্তার হয়। আমাদের কয়েকজন ভাল সংগঠক কমরেডও ধরা পরেন। দুপুরের মধ্যে হরতাল ভেঙ্গে যায়। বিকেলে ময়দানের সভায় জনা ৫০ শ্রমিকের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে হরতালকে মুলতুবি রেখে ২৫/৯ এর জন্য তৈরি হতে বলা হয়। হরতালের রিভিউ করার সময় আমরা কমরেডদের হরতাল তুলে নেবার জন্য সমালোচনা করি এবং বোঝাবার চেষ্টা করি যে আই. এন. টি. ইউ. সি.র দালালী এই হরতালের মধ্য দিয়ে ধরা পরেছে, সুতরাং হরতাল ভেঙ্গে গেলেও রাজনৈতিকভাবে আমাদের প্রচুর লাভ হয়েছে। এটাও তাদের বলা হয় যে ৪নং জেলা থেকে হরতাল না ছড়াবার একমাত্র কারণ নেতৃস্থানীয় কমরেডদের দোদুল্যমানতা ও সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। পি. সি.র কাছে লালের রিপোর্টে লেখা হয় যে "কমরেড প্রভাত যতই লেলিনবাদের কথা বলুন, কমরেড কাঞ্চন যতই লজভস্কির কথা বলুন না কেন আসলে উহা যোশীবাদের নামান্তর— যে সংগ্রাম ফাটিয়া পড়িল এবং যে সংগ্রাম আরও উন্নত হইতে পারিত— বৃহত্তর সংগ্রামের কথা বলিয়া আগাগোড়া এই কমরেডরা তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন।"

২৫ তারিখ হরতালের জন্য সমস্ত কমরেডদের মেণ্ডেট পাঠানো হয় যাতে তারা ভোর পাঁচটায় উঠে সেই দিনের হরতালকে সফল করতে চেষ্টা করেন। আসলে কোন সাংগঠনিক প্রস্তুতি করা হয় না, কেবল মেণ্ডেট দেওয়া হয়। এভাবেই ২৫/৯ এর হরতাল প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কমরেডদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের একতা ও সংগঠনের প্রশ্নকে উপেক্ষা করে এক হঠকারী নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

তারপর ২১/১০ তারিখের হরতালের জন্য আমাদের চেষ্টা চলতে থাকে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে আমরা আই. এন. টি. ইউ. সি. শ্রমিকদের সাথে কোনরকম ঐক্যের চেষ্টা করিনি। আমাদের নেতৃত্বে কোন ভাল হরতাল কমিটিও ছিল না অথচ মিলিত হরতাল কমিটিও আমরা তৈরি করিনি ফলে ২১শে অক্টোবর যে হরতাল শুরু হলো তাকে ২২ হাজার শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ হরতাল না বলে ২টি বিভক্ত ও বিবাদমান শ্রমিকদলের হরতাল বলা চলে। কারণ একই উদ্দেশ্যে হরতাল হলেও নেতৃত্ব ছিল আলাদা ও বিরোধী। আই. এন. টি. ইউ. সি. পরিচালিত শ্রমিকদের একাংশের মধ্যে তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল আমরা আমাদের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিকদের নিয়ে তাদের হাতকে শক্তিশালী করতে পারলাম না বরং আই. এন. টি. ইউ. সির ডাকা শ্রমিক সভাকে ভাঙ্গার প্ল্যান আমরা নিলাম। আই. এন. টি.

ইউ. সির প্রভাবিত শ্রমিকদের বুঝিয়ে দলে আনার পরিবর্তে লাল ঝাণ্ডার তাগদ দেখিয়ে তাদের জেতার চেষ্টা করা হলো টালিগঞ্জ বস্তিতে সুরেশ ব্যানার্জ্জীর মাথা ফাটিয়ে। আই.এন.টি. ইউ.সি.র ২/১ জন নেতা বা ২/১ জন দালাল শ্রমিকদের কাছে মার খাওয়ায় আমরা শ্রমিকদের মোহমুক্ত ভাবলাম এবং একতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করলাম, আই. এন.টি.ইউ.সি.-র প্রভাবকে ছোট করে দেখলাম। ফলে হরতালের উদ্যোগ আই.এন.টি.ইউ.সি নেতাদের হাতেই রয়ে গেল। এই একতা সম্পর্কে এবং শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কি তা উপরোক্ত ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে। যারা একতা সম্পর্কে অন্যরূপ মনোভাব পোষণ করতেন তাদের সমালোচনা করতে গিয়ে পি.সি.র নিকট রিপোর্টে লাল লেখেন "তাদের সাথে একতা হয় না, সে একতা হরতাল ভাঙ্গার একতা, মালিকের দালালী করার একতা—একথা যে কোন শ্রমিককেই বোঝালে বোঝেন। তাদের সে চেতনাকে ছোট করিয়া দেখা হইল।" পরে কর্পোরেশন হরতালের রিভিউতে ধর্ম্মঘটের উদ্যোগ আই. এন.টি. ইউ.সি.-র হাতে থেকে যাওয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে পি. সি. লেখেন যে "বিধান মন্ত্রিসভার রাজত্ব টলমল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই যে তাহারা রাস্তায় মিলিটারী নামাইয়াছিল, উহা যে তাহার শক্তির পরিচায়ক নয়, দুর্বলতারই চিহ্ন—তাহা দেখাইতে পারিলে শ্রমিকরা আরও বেশি জঙ্গী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইত। জাতীয় টি. ইউ'র দালালদের বিশ্বাসঘাতকতা ও মিলিটারী পুলিশের দুর্বলতা সম্পর্কে শ্রমিককে যথেষ্ট সচেতন করতে না পারার ফলেই ধর্ম্মঘটে সাধারণ জঙ্গী শ্রমিকদের আরও বেশি সক্রিয় করা যায় নাই। ধর্ম্মঘটের কোন অবস্থাতেই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় নাই।" ঐ রিভিউতে আরও বলা হয় যে "ধর্ম্মঘটের উদ্যোগ কাড়িয়া লইবার আরও একটি পথ ছিল— এবার জলকাল ও পাম্পিং স্টেশনকে বিধান সরকার শত শত সৈন্য মোতায়েন করিয়া কারাগারে পরিণত করিয়াছিল। প্রয়োজন ছিল বাহির হইতে বিরাট শোভাযাত্রা লইয়া জলকল ও পাম্পিং স্টেশনে হামলা করা।" হরতালের পূর্বে হরতাল কমিটি ও কয়েকজন সেরা কমরেড-এর নাম দিয়ে দাবিদাওয়ার উপর যে ইস্তাহার দেওয়া হয় এবং হরতালের রাস্তায় দাবি আদায়ের আহ্বান জানানো হয়। সেই ইস্তাহারে বস্তিতে বস্তিতে ও জেলায় জেলায় হরতাল কমিটি বা বস্তি কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান থাকে না। কমরেড বিরাট ও মল্লিক ইস্তাহারে কমিটির কথা উল্লেখ না থাকায় সমালোচনা করেন এবং তা ঠিকই ছিল। কিন্তু ঐ ইস্তাহারেই পুলিশকে প্রতিরোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়নি বলেও সমালোচনা করা হয়। অথচ সেই ইস্তাহার ছিল আইনি ও তার নিচে এমন একজন কমরেড এর নাম ছিল যিনি কর্পোরেশনের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রমিকনেতা।

পি.সি. ও পি.বি. নেতা কমরেড মল্লিক এবং কমরেড গৌরও বিশেষভাবে এই হরতালের দেখাশুনা করতেন। উপরোক্ত রিভিউ থেকে তখনকার দিনে আমাদের হরতাল পরিচালনার মোটামুটি কায়দা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। ৯ দিনের দিন জাতীয় টি. ইউ. সি. বিশ্বাসঘাতকতা করে হরতাল প্রত্যাহার করে। আমাদের তরফ থেকে কয়েকদিন পর্য্যন্ত ২/১টি অঞ্চল ছাড়া হরতাল বাঁচিয়ে রাখা যায় না। শ্রমিকরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ অবস্থায় জাতীয় টি. ইউ. সি নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ও নিজেদের অনৈক্যের জন্য উভয়কে ধিক্কার দিতে দিতে কাজে যোগ দেন। তার পরও আমাদের চেষ্টা থাকে ঐ সব বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের কোন মতে মিটিং

কিম্বা শোভাযাত্রায় নিয়ে এসে পুলিশের সাথে একটা সংঘর্ষ লাগিয়ে দেওয়ার। যাতে তারা রেগে গিয়ে হরতাল ও ফাটাফাটির জন্য আবার ঘুরে দাঁড়ান। আমরা হরতাল প্রত্যাহৃত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে একটা মিটিং ডাকি। ময়দানে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক উপস্থিত হন। তখন কলকাতায় সাড়ে ৫ টার পর ১৪৪ ধারা জারি থাকে। আমরা ঠিক করি যে ঐ সময়ে কর্পোরেশন শ্রমিকদের দিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গাতে হবে এবং সংঘর্ষে আসতে হবে। প্রথম ময়দান থেকে প্রায় সব শ্রমিকই শোভাযাত্রায় যোগ দেন কিন্তু যতই সাড়ে ৫টার নিকটবর্ত্তী হতে থাকে ততই শোভাযাত্রা হাল্কা হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যখন সাড়ে ৫টা বাজে তখন একজনও শ্রমিক আর শোভাযাত্রায় অবশিষ্ট থাকেন না। পুলিশ সুযোগ বুঝে টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চালিয়ে কয়েকজন কমরেডকে ধরে নিয়ে চলে যায়।

এ হরতালে আমাদের সাংগঠনিক অবস্থার চরম দুর্বলতা ধরা পড়ে। শ্রমিকদের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত কম। আমরা কলিকাতা ব্যাপী সমস্ত কর্পোরেশন শ্রমিকদের ইস্তাহার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারিনি। ডি. সির তরফ থেকে এ ফ্রন্টকে চরম উদাসীনতার সাথে দেখা হয়েছে। ১ জন মাত্র সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন এই ফ্রন্টকে দেখার জন্য। তিনি হরতাল শুরু হওয়ার ২/৩ দিনের মধ্যেই ধরা পড়েন এবং সামগ্রিকভাবে আমরা প্রায় শ্রমিকদের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ি। এইভাবেই ২২ হাজার শ্রমিককে আমরা তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে রেখে দিয়েছিলাম। এই সাংগঠনিক দুর্বলতার দিকে আমরা কখনও তাকাই নি। উপরন্তু কমরেডদের সংস্কারবাদী বলে গালাগালি দিয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। পি. সি. রিভিউতে বলা হয় "মুষ্টিমেয় সংস্কার পন্থী সংগঠকদের উপর নির্ভর না করিয়া ... জঙ্গী ধর্ম্মঘটিদের লইয়া ষ্ট্রাইক কমিটি গঠনের জন্য আরও আগে হইতে উদ্যোগ লইতে পারিলে... ইহা আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামের মোড় ঘুরাইয়া দিত।" আর ডি-সি কমরেডদের শুধু সমালোচনাই করিল না কমরেড কাঞ্চনকে সংস্কারবাদী, ভীরু, কাপুরুষ ইত্যাদি অভিযোগ দিয়ে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য সাসপেণ্ড করা হলো। তার 'অপরাধ' ছিল ২৫শে সেপ্টেম্বর হরতালের মধ্যে তিনি কোন 'লাভ' দেখতে পাননি বলে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জাতীয় টিউ-র নেতৃত্বে শ্রমিক সভায় হামলা করায় বিরোধিতা করেছিলেন। তাই তার কাছে কোন কৈফিয়ৎ তলব না করেই তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। এই সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে ডি-সি'র মনোভাব লালের ডি-সি রিপোর্টে পাওয়া যায়। তাতে লেখা হয় "কমরেডদের যাঁচাই করিয়া তাহাদের মধ্যে সত্যিকারের যাহাদের দায়িত্ব দেওয়া যাইতে পারিত বা যাহাদিগকে এই ফ্রন্ট অথবা দায়িত্ব হইতে অপসারিত করার প্রয়োজন ছিল তাহা (ডি. সি) করেন নাই। তাই আজ ডি. সিকে এই সংকট সমাধানের জন্য অবিলম্বে যেসব কমরেডরা কর্পোরেশনের মধ্যে থাকিয়া সংগ্রামের সময়, শেষ সিদ্ধান্তের সময়, বিভিন্ন সময় হতাশার প্রশ্ন তুলিয়া প্রকারান্তরে সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন তাহাদের হাত হইতে দায়িত্ব কাড়িয়া লইতে হইবে এবং তাহাদের শাস্তিবিধান করিতে হইবে।"

এই আমলাতান্ত্রিক হঠকারী মনোভাব নিয়েই আমরা কর্পোরেশনের হরতালকে পরিচালনা করেছি। আমরা শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যের প্রশ্নকে অত্যন্ত খেলোভাবে বিচার করেছি। সংগ্রামের সাফল্য সম্পর্কে বিরাট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একই উদ্দেশ্যে সংগ্রামরত শ্রমিকদের আমরা আই. এন. টি. ইউ. সির নেতাদের মুখোশ খুলে তাদের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারিনি—

সমস্ত শ্রমিকদের ঐক্য গড়ে তুলতে পারিনি।

আমরা বুঝিনি যে পুলিশ অত্যাচারের সামনে ১৫ তারিখের হরতাল এক দুপুরও টিকল না অথচ সেই ধরণের অত্যাচার সত্ত্বেও ২১শে অক্টোবর থেকে শ্রমিকরা ৯ দিন পর্য্যন্ত হরতাল চালাতে পারল কেন? কারণ ২১/১০-এর হরতালের পেছনে একই উদ্দেশ্যে সমস্ত শ্রমিক দাঁড়াতে পেরেছিল যেটা ২৫শে হয় নি।

এই হরতালের মধ্যে আরও একটি গলদ ছিল তাহলো শ্রমিকদের দাবি যা ঠিক করা হয়েছিল তা পুরোপুরি ঠিক ছিল না, যেমন ১৫০ টাকার দাবি তাদের খুব বেশি উৎসাহিত করতে পারেনি। একমাত্র ১০ টাকা ডি.এ বৃদ্ধির দাবিই শ্রমিকরা গ্রহণ করেছিলেন। এ হরতালে ব্যাপক জনসমর্থন ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যই এ হরতাল থেকে আমরা খুব বেশি কিছু লাভ করতে পারিনি। তবে জাতীয় টি. ইউ যে শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিকদের ধোঁকা দিয়েছে এটা শ্রমিকদের বিরাট অংশের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, লাল ঝাণ্ডার প্রভাবও কিছুটা বাড়ে। শ্রমিকরা মাসে ৫ টাকার মত বেশি এ হরতালে আদায় করেন। বহু শ্রমিক মিলিট্যান্ট আমরা এ হরতালে পেলেও হরতালের কিছুদিন পরেই আর তাদের কাজে লাগানো যায় না এবং আমরা তাদের হারাই।

চটকলে ৮ই নভেম্বর ধর্মঘট ও অন্যান্য সংগ্রাম

সমগ্র বাংলাদেশের চটকল শ্রমিকরা যে ভাবে উপেক্ষিত হয়েছেন, কলকাতা জেলাতেও আমরাও সেই নীতি অনুসরণ করতাম। তবে নূতন ডি. সি. তৈরি হবার পর বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু সংগঠক কমরেডদের চটকলে আন্দোলনের জন্য আমরা পাঠাই। বজ বজ ও মেটেব্রুজকেই আমরা আমাদের আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেই। '৪৯ মে মাসের গোড়ার দিকে চটকলগুলি থেকে মালিকরা শতকরা ১২½ ভাগ তাঁত বন্ধ করে প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিককে বেকার করে। স্থায়ী চাকুরে মজুরদের পালা করে কাজ করতে দেওয়া হয়। ফলে তাদের মজুরি অর্ধেক কমে যায়। এই শতকরা ১২½ ভাগ তাঁত বন্ধ হলে কারা ছাঁটাই হবেন তা নিয়ে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়, কারণ ট্রাইবুনালের রায়ে ছিল যে মালিক কখনও কোন ছাঁটাই করলে যারা সবচেয়ে নূতন ভর্ত্তি হবে তাদেরই ছাটাই হবে সবচেয়ে আগে। পি. সি. ফ্রাকশন থেকে হরতালের শ্লোগান দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে জুটে কোন ডি. সি. ফ্রাকশন ছিল না। যাই হোক শ্রমিকদের সামনে কোন সমাধান বিশেষ করে ছাঁটাই সম্পর্কে দেওয়া হয় না। মেটিয়াবুরুজ ও বজবজের কমরেডরা শ্রমিকদের কাছে শ্লোগান দেন যে কোন শ্রমিকই তাঁত ছাড়বেন না। এই সময় আই. এন. টি. ইউ. সি. ছাঁটাইকে মেনে নিয়ে প্রচার করতে থাকে এবং আমরাও তাদের মুখোশ খোলার চেষ্টা করি, শেষ পর্য্যন্ত এই ইসুতে বজবজ মিলে হরতালও হয়ে যায়। অন্যান্য জায়গায় সেদিন ঘেরাও ইত্যাদি হয়। যেদিন থেকে তাঁত বন্ধ হওয়ার কথা ছিল সেদিন বজবজ মিলের শ্রমিকরা জোর করে অবস্থান ধর্মঘট করে তাঁত দখল করে রাখেন। কোম্পানী কোন কিছু করতে সাহস পায় না। তবে সপ্তাহ দেবার দিন যারা মেসিন জোর করে আটকে রেখেছিল তাদের বেতন দেওয়া হবে না বলে জানায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেতন দিতে বাধ্য হয়। অবশ্য এ লড়াই টেকে না। একসপ্তাহ পরে পাবলিক তাঁত বন্ধ করে দেয় এবং যাদের সরানো হয় তাদের বাধ্যতামূলক বেকারিতে ঠেলা হয়। এ সময় আই.

এন. টি. ইউ. সিকে, শ্রমিকদের কাছ থেকে আমরা অনেকটা বিচ্ছিন্ন করতে পারি তাদের এই নীতির জন্য। ক্যালেডোনিয়ান মিলেও আন্দোলন চলতে থাকে কমরেড ... ওখানকার প্রিয় নেতা। কোম্পানী তাকে ছাটাই করে। স্থানীয় কমরেডরা সিদ্ধান্ত নেন কমরেড ... নিয়ে জোর করে কারখানায় ঢোকা হবে। তখন পি. সি.র তরফ থেকে শ্লোগান দেওয়া হয়েছে ছাঁটাই তো পিটাই। আমরাও সেই শ্লোগানকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। যাই হোক শ্রমিকরা... নিয়ে ২ দিন পর্যন্ত ... করে কাজে ঢোকেন ও লড়াই চালান। দ্বিতীয় দিনে প্রচুর পুলিশ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ৭০০ শত শ্রমিক দরজা ঠেলে ... নিয়ে সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে কাজে ঢোকেন। এদিকে কোম্পানী ও কমরেড ... উভয়েই ঘাবড়ে যায়। ফলে তৃতীয় দিন কমরেড ... আর কারখানায় আসেন না। তখন ওটাকে চেষ্টা করা হয় ব্যক্তিগত দাবি থেকে সমগ্র শ্রমিকের দাবিতে রূপান্তরিত করার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কিছু হয় না। সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার জন্য কমরেড-এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ক্যালেডোনিয়ান মিলে বিশেষ কিছু করা না যেতে পারলেও তখন শ্রমিকদের মধ্যে একটা বেশ উত্তেজনা ছিল। এ সময় ৮ই ও ৯ই জুনে বন্দীদের উপর গুলি চালনা হয়। ১১ই আমরা হরতালের ডাক দেই। তখন বজবজ মিলের অবস্থা কিছুটা দুর্বল। কারণ ইতিপূর্ব্বে স্থানীয় অনেক শ্রমিক নেতা গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছেন। ফলে বজবজ মিলের অবস্থা অনেক পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। যাই হোক কমরেডদের প্রচেষ্টার ফলে সকালে না হলেও ক্যালেডোনিয়ান মিলে বিকালে হরতাল হয়ে যায়। কিন্তু হরতালের পরই কর্ত্তৃপক্ষ লক্-আউট ঘোষণা করে। কারখানার আটজন বাছা বাছা শ্রমিক নেতার নামে লিষ্ট টানানো হয় ও তারা মুচলেকা (বণ্ড) না দিলে মিল চালু করা হবে না বলে জানানো হয়। এ ভাবে লক্‌আউট ৩/৪ দিন চলার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে দুর্বলতা আসতে থাকে। স্থানীয় কমরেডদের এক সভায় কমরেড সর্দার হরতালকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বলেন। অবশ্য স্থির হয় যে তার পর দিন শ্রমিকদের অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন। ইতিমধ্যে ঐ আটজন কমরেড সাহেবের সাথে দেখা করেন ও মিল খুলে দিলে আর কোন গোলমাল হবে না— একথা বলাতে সাহেবও মিল খুলে দেয়। অবশ্য এখানে উল্লেখযোগ্য যে সাহেবও অবস্থা দেখে ঐ কমরেডদের কাছ থেকে কোন লিখিত মুচলেকা নিতে সাহস করে না। পরে মিটিং এ গোটা সেলকে সাসপেণ্ড করার জন্য কমরেড সর্দার প্রস্তাব তোলেন। কারণ ঐ কমরেডরা ভীরুতা দেখিয়েছেন ও স্থানীয় কমরেডদের সিদ্ধান্ত মানেননি। ২জন কমরেড বাদে বাদ বাকি তাদের দোষ স্বীকার করেন এবং অপর দুজনের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় ও তারা পরে একেবারে বসে পরেন। এই সময় বজবজে বন্দীমুক্তি আন্দোলনও চলছিল। একদিন সেখানে সভার পর শোভাযাত্রা বের হয় এবং আই. এন. টি. ইউ. সি.র অফিস আক্রমণ করার জন্য স্থানীয় কমরেডদের বলা হয় অবশ্য সেটা কার্য্যকরী হয় না। এ সময় মেটিয়াবুরুজের ক্লাইভ ও বদরতলা জুট মিলে কিছু কিছু আন্দোলন হয় কিন্তু কোনটাই সফলতা লাভ করে না।

এ সময়ে আন্দোলন পরিচালনার যে দুর্বলতা ছিল তা হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্যাম্পেন ও স্থানীয় শ্রমিকদের দৈনন্দিন ও বাস্তব সমস্যাগুলিকে একসঙ্গে সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যাপারে ব্যর্থতা। অনেক সময়ে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন ও অন্য রাজনৈতিক ক্যাম্পেনগুলি খাপছাড়া অবস্থায় চলেছে। ফলে আন্দোলনকে সংগঠিত করা যায় নি। যাও বা হয়েছে পরে হামলার ফলে তা ভেঙ্গে গেছে।

এর পর জুলাই থেকে মাসে ১ সপ্তাহ করে মালিকরা তাঁত বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করে। ক্ষতিপূরণ বাবদ বন্ধ সপ্তাহের জন্য অর্ধেক বেতন দেওয়া হয়। মালিকরা ঘোষণা করে যে ট্রাইবুন্যালের রায় চালু থাকার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তারা পুরাতন সুযোগ সুবিধাগুলি আর শ্রমিকদের দিতে প্রস্তুত নয়। এ ব্যাপারে পি সির তরফ থেকে হরতালের আওয়াজ দেবার প্রস্তাবে কিছু কমরেডের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন ও মতভেদ দেখা দেয় প্রশ্ন আসে যে কারখানা যখন মালিক এমনিতেই বন্ধ করে দিচ্ছে তখন সাধারণ হরতাল করে মালিককে কাবু করা যাবে কিনা বা শ্রমিকরা হরতাল করতে রাজী হবেন কিনা? তখন অবশ্য কারখানা দখলের প্রশ্নকে শ্রমিকদের সামনে আনার কথা বলা হয়।

শ্রমিকদের কাছে যে দাবি সহজবোধ্য বা সহজলভ্য ছিল তাহলো পুরা ক্ষতি পূরণের দাবি। তা না করে, ছাঁটাই তো পিটাই, অথবা কারখানা দখলের অবাস্তব শ্লোগান দেওয়া হয়। যদিও সাধারণ হরতালের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্যই ছিল এবং তা কমরেডরা স্বীকারও করেছিলেন। তথাপি সহজবোধ্য বা সহজলভ্য দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই শ্রমিকদের সংগঠিত করে সাধারণ ধর্ম্মঘটের দিকে নেওয়া সম্ভব ছিল। নতুবা ছাঁটাই পিটাই, বা কারখানা দখল, ইত্যাদি শ্লোগানে আসল সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে এড়িয়ে সস্তায় কিস্তিমাত করার সামিল হয়েছিল। তার পর ঠিক হয় যে ঐ শ্লোগানে হরতাল হবে না দাবিও ঠিক করাও হবে। ১৫০ টাকা মূল বেতন ও পূর্বের ট্রাইবুন্যালের রায়ের বাকি সাড়ে ১২ টাকা অবিলম্বে মঞ্জুর করার দাবি ঠিক হয়। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ও প্রস্তুতিবিহীন একটি সারা বাংলা জুট সম্মেলন ডাকা হয় ও তার কার্য্যকরী সমিতি তৈরি করা হয়। যদিওকোন দিন সেটা আর চালু হয় নি। সেখানে হরতালের কথা সোজা ঘোষণা না করলেও পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয় যে আমরা সেই দিকেই চলেছি, তার জন্য প্রস্তুতি ও ২৫ হাজার ইউনিয়ন সভ্য করার প্রোগ্রাম নেওয়া হয়। এইরূপেই আমরা ৮ই নভেম্বর সাধারণ ধর্ম্মঘটের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। এ সময় মালিকরাও নূতন নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। তারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলো যে যে সমস্ত মিলে কম লাভ হচ্ছে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। কাজের সময় কমিয়ে সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা করা হবে। তখন মজুরদের অবস্থা এমন পর্য্যায়ে এসেছে যে জাতীয় টি. ইউ. সির নেতারা পর্যন্ত হরতালের কথা বলতে বাধ্য হচ্ছিল। এ সময়ে সাধারণ হরতালের প্রয়োজন ছিল ঠিকই, কিন্তু সে হরতালকে কিভাবে সংগঠিত করা যায় ও সমস্ত শ্রমিককে প্রতিরোধের সারিতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড় করানো যায় সেটাই ছিল বড় সমস্যা। অক্টোবরের মাঝামাঝি কিছু কমরেডদের ডেকে গণ সমর্থন বিহীন একটি হরতাল কমিটি পি. সি. থেকে মনোনয়ন করা হয়। ৬ই নভেম্বর ময়দানে যে সভা ডাকা হয় তাতে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক জুট শ্রমিক উপস্থিত হন এবং সমস্ত কমরেডরা ভরসা হারিয়ে ফেলেন। তখন অবশ্য পিসি থেকে বলা হয় যে বজবজ চটকল শ্রমিকদের এই সাধারণ ধর্মঘট দক্ষিণ বঙ্গকে মুক্ত করার লড়াই। সুতরাং যে কোন প্রকারে একে সফল করতেই হবে। ডি. সি. থেকেও বজবজ 'অভিযান' করার জন্য সার্কুলার দেওয়া হয়। তাতে একে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম হিসাবে দেখান হয়। কমরেড সূর্য্য ও সর্দার মেটেব্রুজে ধর্ম্মঘটের সাফল্য সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়ে বলেন যে ৭০ হাজার চটকল শ্রমিক হরতালের জন্য প্রস্তুত, এখানেও হরতাল করতে হবে। ৮ই নভেম্বরের উপর বজবজে বজবজ চিভিয়-ট ও লোথিয়ান মিলে ভাল ভাবে

কাজ কর্ম চলতে থাকে। সাধারণ ভাবে কিছুটা যোশও দেখা দেয়। সবকটা মিলেই পিকেট করার চেষ্টা হয়। সব কটা মিলই বজবজ মিলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওখানে হরতাল হলে তাদের এখানেও হরতাল করবে। কিন্তু কোথাও ৮ই হরতাল হয় না। শুধু বজবজ মিলে ২৫ মিঃ-এর জন্য হরতাল হয়। মেটিয়াবুরুজেও কিছু করা যায় না। বদরতলা জুটমিলে শ্রমিকদের কাছে প্রচার করা হয়। শ্রমিকরা ৮ই কিছুক্ষণ গেটে দাঁড়িয়েও থাকেন কিন্তু পরে কারখানায় ঢুকে যান। কেন্দ্রীয় হরতাল কমিটি থেকে সেই দিনই এক ইস্তাহার দেওয়া হয় যাতে লেখা হয় "বজবজের ৩৫ হাজার বাহাদুর মজুর লড়াইয়ের ময়দানে নেমে গেছে" ইত্যাদি। এই হরতাল এমন ভাবে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে যেটা প্রথমেই নজরে পড়ে তা হলো যে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে যে ধরণের সংগঠন হরতালের জন্য করা প্রয়োজন তা আমরা মোটেই করিনি। মনোনীত হরতাল কমিটি হরতালের নেতৃত্ব করতে পারেনা—এটা আমাদের বোঝা উচিত ছিল। আমরা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজকে উপেক্ষা করেছি। আই. এন. টি. ইউ. সির মুখোশ নিশ্চয়ই খুলতে হবে। তাদের (নেতাদের) দালালীর সুবিধাবাদী চেহারা তাদের প্রভাবিত মজুরদের কাছে পরিষ্কার করতে হবে সন্দেহ নেই কিন্তু যে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক আই. এন. টি. ইউ. সির প্রভাবে ছিল তাদের টেনে আনার চেষ্টা সফল হয় নি। এমন কি আই. এন. টি. ইউ. সি. শ্রমিকদের টানার জন্য বা তাদের সাথে যুক্ত হরতাল কমিটি বানাবার জন্য কোন চেষ্টাই আমরা করি নি। কোনও আই. এন. টি. ইউ. সি. নেতারা মার খেয়েছেন বলে আমরা ধরে নিয়েছি যে আই. এন. টি. ইউ. সি. সম্পর্কে শ্রমিকদের আর কোন মোহ -ই নেই। সুতরাং ... শ্রেণি ঐক্য ও সাংগঠনিক ঐক্য উপেক্ষিত হয়েছে। তাছাড়াও শ্রমিকদের দাবি যা ঠিক করা হয়েছিল তার মধ্যেও এমন অনেক দাবি ছিল যা শ্রমিকদের হরতালে উৎসাহিত করতে পারেনি মোটেও। যেমন তিন মাসের বোনাস, ১৫০ টাকা বুনিয়াদি তলব ইত্যাদি। তাদের কাছে একমাত্র আসল দাবি হিসাবে স্থান পেয়েছিল ১২½ টাকা ও তাঁত চালু করা এবং ৪৮ ঘন্টার পুরো মজুরি। এ হরতালকে আমরা ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম হিসাবে জাহির করলেও পাঠালাম এমন সব ছাত্র কমরেডদের যাদের অধিকাংশই কোন শ্রমিক আন্দোলন করেন নি। তারা 'হরতাল কর' ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না। এভাবেই আমরা নভেম্বর হরতালের দিকে অগ্রসর হয়েছি ও তার দায়িত্ব পালন করেছি। ৮ই নভেম্বরের পর শ্রমিকদের মধ্যে প্রশ্ন আসে কেন হরতাল হলোনা? এ প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব আজও পর্যন্ত দিতে পারিনি। হরতালের ক্যাম্পেনের মধ্য দিয়ে লোথিয়ান মিলের অবস্থা কিছুটা ভাল হয়। কিছু নূতন ক্যাডারও পাওয়া যায় পরে বজবজ, লোথিয়ান ও চিত্রগঞ্জ মিলের কমরেডদের আলাদা আলাদা ভাবে মিটিং করে তাদের স্থানীয় দাবিদাওয়ার জন্য (যেমন ৪২½ ঘন্টা চালুকরা মাগ্‌গিভাতা কেটে নেওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে) পুনরায় হরতাল করার কথা বলা হয়, ১০ই ডিসেম্বর লোথিয়ানে হরতাল হয় এবং ৭০০ শত শ্রমিক শোভাযাত্রা সহকারে বজবজ মিলের গেটে আসে। কিন্তু সাময়িক ভাবে মিলের কাজ কিছুটা বন্ধ হলেও আবার কাজ চালু হয়ে যায়। গেটে মারামারি হয় ও আমাদের কমরেডরা মার খান। স্থানীয় কিছু মেয়ে শ্রমিক কমরেড প্রচুর বীরত্ব দেখান। শেষ পর্য্যন্ত বজবজ মিলে হরতাল না হওয়ায় লোথিয়ানের শ্রমিকরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন ও আমাদের সম্পর্কে অভিযোগ করেন। কারণ আমরা তাদের বলেছিলাম যে তারা বজবজ

মিলের গেটে গেলেই হরতাল হয়ে যাবে।

১৩ই ডিসেম্বর লোথিয়ান মিলের গেটে পিকেট করতে যাওয়া হয় 'স্পেশাল' নিয়ে। স্পেশাল কমরেডদের লোকাল কমরেডদের উপর নির্ভর না করে বা তাদের সহায়তা না নিয়ে খুশীমত চলার অধিকার দেওয়া হয়। কমরেড সূর্য্য ও সর্দার সেদিন প্রত্যেক কমরেডকে গেটে যাওয়া নির্দেশ দেন। সেদিনও আমাদের কমরেডরা মার খান কিন্তু মিল চালু হয় না। কমরেড বাহাদুর সেদিন বজবজে ছিলেন। তিনি বলেন যে যারা আমাদের মেরেছে তাদের খুঁজে বার করতে হবে এবং মেরে আসতে হবে।

১৪ই আবার সকালে গেটে যাওয়া হয়। ১৩ই রাত্রে কমরেড সূর্য্য, চন্দ্র ও সর্দারের উপস্থিতিতে প্ল্যান করা হয়। ১৪ই যতক্ষণ পর্য্যন্ত কমরেডরা গেটে ছিলেন ততক্ষণ অবশ্য মিল চালু হয় না কিন্তু তারপর মিল চালু হয়। আমাদের সমস্ত শ্রমিক কমরেডরা মিল থেকে ছাঁটাই হন। ১৪ই রাত্রে স্থানীয় কমরেডরা সিদ্ধান্তে আসেন যে লোথিয়ানে আর চেষ্টা করে কোন ফল হবে না তবে একটা ফাটাফাটি করতে হবে। কমরেড অভয় বিশু প্রভৃতি বজবজ মিল গেটে হামলার কথা বলেন কারণ ঐ মিলের দারওয়ান ও গুণ্ডাদের হাতে আমরা মার খেয়েছিলাম।

১৫ই মারামারি হয়, দারওয়ানরা প্রচণ্ড মার খায়। ১২জন দারওয়ান ও গুণ্ডা সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। বজবজ শহরে অবশ্যি একটা স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনও পাওয়া যায়। মারামারির কিছুক্ষণ পরেই মিলের ভিতরে ও বাহিরে প্রচুর সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। রাত্রে ১২/১৪টা জায়গায় আমাদের কমরেডদের খোঁজে তল্লাসী চালায় কিন্তু কাহাকেও পায় না। ১৭ই কমরেড '—' গ্রেপ্তার হন এবং আস্তে আস্তে প্রায় ১০/১২ জন কমরেড পরে গ্রেপ্তার হয়ে যান। ফলে বজবজের পার্টি অনেকখানি পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়ে।

জুটের দায়িত্ব ছিল কমরেড সর্দারের উপর। ডি. সি. সমষ্টিগতভাবে এই বিরাট শিল্প সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা করতেন না বা সমষ্টিগত ভাবে কোন সাহায্যও করতেন না। কলকাতায় চটকল শ্রমিক আন্দোলন চালাবার জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন জেলা জুট ফ্রাকশন তৈরি হয়নি। ফলে কোন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নূতন ক্যাডার আমরা বেছে বার করতে পারিনি। যারাও পুরোনো ছিলেন তাদের দোষ-গুণ সম্পর্কে বিশেষ কোন খোলাখুলি আলোচনার ব্যবস্থা হতো না বরং তাদের সন্দেহ করে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হতো। উপরোক্ত কাজকর্মের ফলে, এত বড় জুট শিল্পে আমরা কিছুই করতে পারিনি বরং ক্ষতিই করেছি।

ডালহৌসী কর্ম্মচারী আন্দোলন

মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারী আন্দোলন কলিকাতার পার্টির একটা প্রধান শক্তি ছিল। এই ডি. সি. আসার আগেই কয়েকটি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের তিনটি প্রধান অংশ—সি-জি, বি-জি ও ব্যাঙ্ক গুরুতর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সত্য, কিন্তু তবু যা ছিল বর্তমান জিলা কমিটির 'নেতৃত্বে' এই দেড় বছরে তাও ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে। আজ এই আন্দোলনের যতটুকু অবশিষ্ট আছে এবং এখানে সম্প্রতি যে পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তার জন্য জেলা কমিটির কোন কৃতিত্ব নেই। স্থানীয় কমরেডরা কোন কোন ক্ষেত্রে জিলা কমিটির 'নেতৃত্ব' অমান্য করে আন্দোলন ও সংগঠনকে আরও বৃহত্তর ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন এবং কমিনফর্মের নির্দেশ আসার পরে

তাঁরাই নিজ উদ্যোগে একে পুনরায় জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করছেন।

কর্ম্মচারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ডি-সির কার্য্যাবলীর পরিপূর্ণ আলোচনা এখানে করব না এবং এই অবস্থাতে তা করা সম্ভবও নয়। আমাদের অনুসৃত নীতি কি ভাবে এখানে গণসংগঠন ও পার্টি সংগঠনকে ভেঙ্গেছে কয়েকটি ঘটনা দিয়ে শুধু তাই আমরা দেখবার চেষ্টা করব। ডালহৌসীর মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারী আন্দোলন পাঁচটা ফ্রাকশনে (সি-জি, বি-জি, মার্কেন্টাইল, ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স) বিভক্ত। ডি-সির পক্ষ থেকে কমরেড ভাস্কর এই ফ্রাকশনগুলি পরিচালনা করতেন। এই ফ্রাকশনগুলিকে কি পদ্ধতিতে পরিচালনা করে এখানকার গণ-সংগঠনগুলিকে ভাঙ্গা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দিচ্ছি—

সি-জি পার্টি বে-আইনি হবার পরেই এখানে যে ধর্মঘট হয় তার ধাক্কায় এখানকার সংগঠন ও আন্দোলন গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বর্ত্তমান ডি-সি গঠিত হবার কিছুদিন পরেই সি-জি ফ্রাকশন পুনর্গঠিত হয়। যে নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে পি-সি ও ডি-সি পুনর্গঠিত হয়েছিল এই ফ্রাকশন পুনর্গঠনের বেলাতেও একই নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হলো। ডি-সি পুনর্গঠনের সময় আমাদের শেখানো হয়েছিল যে পুরানো নেতারা সবাই সংস্কারবাদী, সুতরাং যতদূর সম্ভব তাদের বাদ দিতে হবে। এবং বর্তমানে বিপ্লবী জমানায় নেতৃত্বের সর্বপ্রধান গুণ হলো সাহস ও আপসহীন জঙ্গী মনোভাব।

সি-জি, ফ্রাকশন পুনর্গঠনের বেলায় এ দুটি নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা হলো। নূতন ফ্রাকশন গঠন হওয়ার সময় দু'জন ছাড়া আর সকল পুরোনো নেতাদের সযত্নে বাদ দেওয়া হলো। পুরোনো নেতাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন (কম্ অসিত) তাকে আবার অধিকাংশ সময় ডি-সি'র অন্যান্য কেন্দ্রীয় দায়িত্ব দিয়ে এত ভারাক্রান্ত করে রাখা হতো যে সি-জি ফ্রাকশনের আন্দোলনের জন্য তিনি যথেষ্ট সময় পেতেন না। নূতন যাদের নেওয়া হলো তাদের কারুর গণ-আন্দোলন ও সংগঠনের কোন অভিজ্ঞতা নেই, কর্ম্মচারীদের কাছেও তাঁরা খুব বেশি পরিচিত নন। তাঁদের প্রধান গুণ হলো তাঁরা নূতন কর্ম্মী এবং তাঁদের যথেষ্ট সাহস ও জঙ্গীমনোভাব রয়েছে। সবেমাত্র পার্টি সভ্যপদের জন্য দরখাস্ত করেছেন এবং তখন পর্যন্তও দরখাস্ত মঞ্জুর হয়নি এমন কমরেডকেও ফ্রাকশনে নেওয়া হলো। নূতন ফ্রাকশনের জন্য কয়েকটা সেল থেকে কমরেড কাশীর নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। কমরেড কাশী সি-জি আন্দোলনের পুরনো নেতা, নিজ অফিস ইউনিয়নের অবিসম্বাদী নেতা এবং গণ-আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। কিন্তু তাঁকে ফ্রাকশনে নেওয়া হলো না কারণ একটা সভায় তিনি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের চেয়ে ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে গণ সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। এই 'অপরাধে' তাঁকে 'সংস্কারবাদী' আখ্যা দিয়ে ফ্রাকশন থেকে বাদ দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে 'কমরেড কাশী সংস্কারবাদী' এই প্রচারও এমনভাবে চালানো হলো যে সি-জি ফ্রন্টের অন্যান্য কমরেডদের থেকে তিনি কার্য্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

ভাঙ্গাচোরা সি-জি আন্দোলনকে আবার দাঁড় করাতে যখন অত্যন্ত অভিজ্ঞ নেতৃত্বের প্রয়োজন তখন গণ-আন্দোলন ও সংগঠনের অভিজ্ঞতাশূন্য ফ্রাকশন স্বভাবতই এই কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। আর এদিকে বিশেষ যে কোন চেষ্টা হয়েছিল তাও নয়। তখন আমাদের

থিওরী হচ্ছে, যত বেশি জঙ্গী সংঘর্ষ করবে জনতা তত বেশি এবং তত দ্রুত বিপ্লবী লড়াইয়ে যোগ দেবে, সুতরাং কর্ম্মচারীদের দাবি দাওয়া, সেই দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য ছোট বড় প্রাত্যহিক আন্দোলন এবং সেই আন্দোলন পরিচালনার জন্য মজবুত গণ-সংগঠন গড়ে তোলার সমস্যা— এসব দিকে বড় একটা নজর ছিল না। কর্ম্মচারীদের দাবি দাওয়ার কথা গুরুত্ব দিয়ে তখনই বিচার করা হতো, যখন তার ভিত্তিতে কোন জঙ্গী সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিত, সেখানেও দাবিটা থাকত গৌণ, সংঘর্ষটা হতো মুখ্য। যেমন ৭নং সি-জি ইউনিটে আমাদের একজন কমরেডকে কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে শাস্তি দিলে তিনি বহু চেষ্টা করেও কর্ম্মচারীদের কোন প্রতিবাদ আন্দোলনে নামাতে পারেন না। তখন তিনি ডি-সির নির্দেশ চাইলে ডি-সি-এম কমরেড ভাস্কর তাঁকে বলেন, আর কেউ আসুক চাই না আসুক আপনি একা প্রতিবাদ করবেন এবং প্রয়োজন হলে একাই অফিসের মধ্যে সংঘর্ষ করবেন। ৪নং ইউনিটের অফিসে পরীক্ষা নিয়ে কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা পরীক্ষা বয়কটের শ্লোগান তোলেন। আমাদের কয়েকটা ভুলের জন্য এই শ্লোগান কার্যকরী করা যায় না এবং সমস্ত কর্ম্মচারী পরীক্ষা দিতে বসেন। তখন কমরেড ভাস্কর ঐ অফিসের কমরেডদের নির্দেশ দেন যে, পিকেটিং করে হোক, অফিসের মধ্যে গিয়ে জবরদস্তি করে হোক পরীক্ষা বন্ধ করতেই হবে। সৌভাগ্যক্রমে কমরেডরা এই দু'টি নির্দেশের একটিও কার্যকরী করতে পারেন না এবং ফলে এই দুইটি অফিসে পার্টির অস্তিত্ব বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়।

ক্রমে ক্রমে ধর্মঘট, সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও সংঘর্ষের জন্য পার্টির আহ্বানই ফ্রাকশন সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং এতে অংশগ্রহণ করাই ফ্রাকশনের সর্বপ্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ালো।

এইসব ধর্মঘট ইত্যাদি গণসংগঠনের মারফৎ কার্যকরী করার চেষ্টা হতো এবং সেই হেতু প্রথম প্রথম গণসংগঠনের নিয়ম কানুন, তার কর্ম্ম ও স্বাতন্ত্র্য কিছুটা পরিমাণে মেনে চলার চেষ্টা হতো। কিন্তু ক্রমেই যখন এইসব সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে যোগদানকারীর সংখ্যা কমতে লাগলো তখন আর উপরোক্ত নিয়মকানুন ইত্যাদি গ্রাহ্য করা হতো না—পার্টি ফ্রাকশনই গণসংগঠনের নামে যা খুশী তাই করত। এইভাবে গণসংগঠন পার্টির খাসমহলে পরিণত হলো এবং তার যতটুকু স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বাধীন প্রভাব বজায় ছিল তাও নষ্ট হলো। অন্যদিকে গণ-সংগঠনের অস্তিত্ব লোপ পাবার দরুন গণসংগঠনের পরিচালক হিসাবে ফ্রাকশনের স্বাভাবিক ভূমিকাও লোপ পায়; ফ্রাকশন হয়ে দাঁড়ালো বিভিন্ন শোভাযাত্রা ও সংঘর্ষে পার্টি সভ্যদের টেনে নামাবার জন্য পার্টি নেতৃত্বের হাতের একটা যন্ত্র মাত্র। ডি-সি নেতৃত্ব এই যন্ত্রকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে পার্টি সভ্যদের সমস্ত প্রতিবাদ স্তব্ধ করেছেন এবং বার বার তাঁদের আত্মঘাতী সংঘর্ষে নামিয়েছেন।

এই ধরণের কার্যকলাপ চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছায় সর্বশেষ অনশন ধর্মঘট ও ২৬শে জানুয়ারীর ক্যাম্পেনের সময়।

সর্বশেষ অনশন ধর্ম্মঘটের সময় প্রায় প্রত্যহই রাস্তায় সংঘর্ষ হতো এবং প্রতিটি সংঘর্ষে বহুসংখ্যক কমরেড জখম ও গ্রেপ্তার হতেন। এইসব শোভাযাত্রা ও সংঘর্ষে সিজি কমরেডদের 'ম্যাণ্ডেট' দিয়ে অংশ গ্রহণ করানো হতো। এই সংঘর্ষের নিস্ফলতা যখন সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে তখন ফ্রাকশন সভ্য কমরেড কমল প্রতিটি সংঘর্ষে সি-জি কমরেডদের

বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে, এইভাবে চললে সি-জি ফ্রন্টের আন্দোলন উঠে যাবে। জবাবে কমরেড ভাস্কর তাঁকে লেখেন যে, ক্যাডার সম্পর্কে আপনার মাথায় এখনও পুরোনো চিন্তাধারা রয়েছে। আসাম পি-সি'র উপর পি-বি'র দলিল থেকে উদ্ধৃত করে কমরেড ভাস্কর তাঁকে বোঝান যে, এই বিপ্লবী জমানায় প্রতিটি লড়াইয়ে সাহসের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করলে যে পরিমাণ ক্যাডার ক্ষয় হবে তার চেয়ে নূতন ক্যাডার আসবে অনেক বেশি সংখ্যায়। সুতরাং এভাবে ক্যাডার বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে সংঘর্ষ এড়াবার সংস্কারবাদী কায়দা।

এই ধমক খেয়ে কমরেডরা স্বভাবতই চুপ করে গেলেন এবং প্রাণপণে এই সব আত্মঘাতি সংঘর্ষে আত্মনিয়োগ করলেন। তার ফল ফলল প্রেসিডেন্সি জেল গেটে সংঘর্ষের দিন। ঐ দিনের সংঘর্ষে সি.জি'র বহু কমরেড মারাত্মক ভাবে আহত ও গ্রেপ্তার হন। ফলে সি. জি. ফ্রন্টের দুটো সেল দীর্ঘ দিনের জন্য পঙ্গু হয়ে রইল।

২৬শে জানুয়ারীর ক্যাম্পেনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারী আন্দোলনের প্রতি পার্টির নেতৃত্বের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল। যেহেতু আমাদের চোখে ছিল সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের নেশা, সেই হেতু মধ্যবিত্তদের আমরা বিপ্লবের অংশীদার দূরের কথা বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবেও দেখতাম না। কার্যক্ষেত্রে এই থিওরীর মারাত্মক রূপ প্রকাশ পেল ২৬শে জানুয়ারির ক্যাম্পেনে। ... মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারী কমরেডদের সব বলা হলো—নিজ নিজ ফ্রন্ট ছেড়ে শ্রমিক বস্তিতে যাও। যাঁরা প্রতিবাদ করলেন তাঁদের মুখে ম্যাণ্ডেটের ছিঁপি এঁটে দেওয়া হলো। সবাই অফিস ছেড়ে, নিজ নিজ ইউনিয়ন ছেড়ে বিভিন্ন অপরিচিত শ্রমিক বস্তিতে রওনা হলেন এবং এ রকম একটি স্কোয়াড মানিকতলার এক বস্তিতে গিয়ে ধরা পরলেন। ফলে আর একটি সেল বেশ কিছু দিনের জন্য খোঁড়া হলো।

ইতিমধ্যে সি. জি. কর্ম্মচারীদের গণসংগঠনের সম্মেলন ডেকে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হলো। এই পরিকল্পনার মধ্যে ভুল বিশেষ কিছু ছিল না, বরং এই গণ-সংগঠন ও তার বহির্ভূত বিভিন্ন অফিস ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে একটা 'কো-অর্ডিনেশন কমিটি' গঠনের প্রস্তাব ঠিকই ছিল। কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার চেষ্টা হলো তার ফল হয় ক্ষতিকর।

এইসব অফিস ইউনিয়নের নেতৃত্ব ছিল এমন সব কর্ম্মচারীদের হাতে যাঁরা সাধারণ 'ট্রেড ইউনিয়নিজমে'র বাইরে এক পাও যেতে রাজি না। তবুও একটা সর্বনিম্ন প্রোগ্রামের ভিত্তিতে এঁদের সঙ্গে একত্র কাজ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তা না করে ইউনিয়নগুলিতে অবিলম্বে এঁদের কোণঠাসা করা এবং সম্ভব হলে তাড়াবার চেষ্টা করলাম। তখন আমাদের থিওরী হচ্ছে, গণসংগঠনগুলি থেকে এইসব সংস্কারবাদী প্রতিবিপ্লবীদের যত তাড়াতাড়ি তাড়ানো যায় ততই মঙ্গল। এই থিওরীর বশবর্ত্তী হয়ে বি-পি-টি-ইউ-সি থেকে মৃণালকান্তিদের আমরা তাড়িয়ে ছিলাম। সি-জি ফ্রন্টেও এই থিওরী পুরাদমে চালাবার চেষ্টা হলো। ক্রমে ক্রমে আমাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ালো বিভিন্ন অফিস ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় এইসব কর্ম্মচারীরা। আমরা প্রচার করতে লাগলাম তাঁরা কর্তৃপক্ষের দালাল এবং কর্ম্মচারীদের প্রধান শত্রু। সুতরাং এই বিভীষণদের আগে কোণঠাসা কর।

আমাদের আহুত সম্মেলনে প্রথমে এইসব নেতারা যোগ দিতে রাজি হন নি। এই সময়

বিভিন্ন অফিসে কিছু কিছু ছাঁটাই শুরু হয়ে গেছে, অন্য নানা রকম জুলুমও বাড়ছে। এইসব জুলুমের তাড়নায় সাধারণ কর্ম্মচারীরা স্বভাবতই চাইছেন যে, আবার তাঁদের একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হোক এবং এই প্রয়োজন বোধ থেকে তাঁরা আমাদের সম্মেলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্নও ছিলেন। সুতরাং এইসব অফিস ইউনিয়নগুলিকে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য গণদরখাস্ত ও সভা মারফৎ আমরা যখন তাদের নেতাদের উপর চাপ দিতে লাগলাম তখন অনেক সাধারণ কর্ম্মচারীই আমাদের সমর্থন করলেন। সাধারণ কর্ম্মচারীদের চাপে পরে অনেক অফিস ইউনিয়নই সম্মেলনে যোগ দিল! কিন্তু আমরা এমন সঙ্কীর্ণ-নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সম্মেলন চালালাম এবং যে রকম জবরদস্তি করে আমাদের পার্টির পরিপূর্ণ রাজনীতি সম্মেলনের উপর চাপিয়ে দিলাম যে সাধারণ কর্ম্মচারীরা ঘাবড়ে গেলেন, সম্মেলন সম্পর্কে তাঁদের উৎসাহে ভাটা পড়ল এবং সেই সুযোগে ঐ সব অফিস ইউনিয়নের নেতারা আবার সাধারণ কর্ম্মচারীদের থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হলেন। সম্মেলন অবশ্য হলো, কিন্তু তার ফলে গণ-সংগঠন এক পা-ও এগোলো না।

বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে সংস্কারবাদীদের তাড়িয়ে ঐ সব ইউনিয়নকে জঙ্গী বিপ্লবী ইউনিয়নে পরিণত করার নীতি সি-জি ফ্রন্টে কি রকম সর্বনাশ করেছে তার শ্রেষ্ঠ উদাহারণ হলো সি. জি'র ৯নং ইউনিট। সি. জি'র বিভিন্ন অফিস ইউনিয়নের মধ্যে এই ইউনিয়নটি হচ্ছে সর্ব বৃহৎ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী। বিভিন্ন দলীয় ও অদলীয় লোকদের সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্টের ভিত্তিতে আমাদের কমরেডরাও এখানে কাজ করতেন এবং তাঁদের যোগ্যতার দাবিতে তাঁরা ইউনিয়নের নেতৃত্বও অর্জন করেছিলেন। এই ইউনিয়নের নেতা কমরেড কাশী ইউনিয়ন থেকে অন্যান্য দলের ও অদলীয় লোকদের তাড়াবার নীতি সমর্থন করছিলেন না। ফলে তাঁকে সংস্কারবাদী আখ্যা পেতে হয়। তাঁকে 'সংস্কারবাদ' মুক্ত করার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে নানা ভাবে তাঁর উপর চাপ দেওয়া হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি আমাদের নির্ধারিত 'বিপ্লবী' নীতিতে ইউনিয়ন পরিচালনা করার সঙ্কল্প করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই 'বিপ্লবী' নীতির ফল ফলল— ইউনিয়ন দু ভাগ হয়ে গেল এবং কর্তৃপক্ষ এত দিন যা করতে সাহস পায়নি তাই শুরু করল— বেছে বেছে আমাদের কমরেডদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হলো। তিনজন নেতৃস্থানীয় কমরেড দূর মফস্বলে বদলী হলেন, একজনের পদাবনতি হলো, আর একজন গ্রেপ্তার হলেন। আমাদের নীতির ফলে ইউনিয়নটি তো ভাঙ্গলই, সেখানে পার্টি সেলটি পর্যন্ত উঠে যাবার অবস্থা হলো।

গণসংগঠন ও পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে সি. জি. ফ্রন্টে গত দেড় বছরের ডি. সি. নেতৃত্বের এই হলো ফল।

মার্কেন্টাইল— মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারী আন্দোলনের সর্ববৃহৎ ফ্রন্ট ও সব চেয়ে চালু গণসংগঠন।

সি-জি'র মত অত ঘনিষ্ঠভাবে ডি-সি এখানে 'নেতৃত্ব' দেয় নি। তাই বোধ হয় এখানে গণসংগঠন ও পার্টি সংগঠন অত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি। কিন্তু সি-জির মত সরাসরি সংগঠনগুলি না ভাঙ্গলেও ডি-সি অন্য ভাবে এখানে যথেষ্ট ক্ষতি করেছে।

দীর্ঘ দিন যাবৎ এই ফ্রন্টে দুটি বিরুদ্ধ রাজনৈতিক ঝোঁকের সংঘর্ষ চলছিল। তদানীন্তন ফ্রাক্‌শন সম্পাদক কমরেড সদানন্দ তৎকালীন বামপন্থী হঠকারী নীতির পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। অপরদিকে কমরেড ভবানন্দ কিছুটা সংস্কারবাদী দিক থেকে হলেও জনতাকে বাদ দিয়ে এই

বেপরোয়া সংঘর্ষে ও গণসংগঠনগুলির প্রতি পার্টির নীতির বিরোধিতা করছিলেন। মার্কেন্টাইল ফ্রন্টে এই দুই ঝোঁকের সংঘর্ষ ক্রমেই মারাত্মক আকার ধারণ করে। দলাদলি, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক বিভ্রান্তির দরুন সমস্ত ফ্রন্টের কাজকর্ম্মে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় কমরেডরা এই রাজনৈতিক বিরোধের ফয়সলার জন্য বারবার ডি-সিকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু ডি-সি তা করেনি। এই মতবিরোধের পরিপূর্ণ ফয়সলা বা একটা সর্বনিম্ন মতৈক্যের ভিত্তিতে সমস্ত ফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে যখন যে 'ইসু' সামনে এসেছে তার উপরে 'ম্যাণ্ডেট' দিয়ে ডি-সি কাজ চালাবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু ম্যাণ্ডেট দিয়ে রাজনৈতিক বিরোধের মীমাংসা হয় না এবং হলোও না। অবস্থা ক্রমেই জটিল হতে লাগল এবং সর্বশেষ অনশন ধর্মঘটের সময় এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল। ডি-সির নির্দেশে ডালহৌসীর বিভিন্ন ফ্রাকশন প্রতিনিধিদের এক সভার ঠিক হয় যে, ৭ই জানুয়ারি অনশন বন্দীদের সমর্থনে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের এক সভা ও শোভাযাত্রা করতে হবে। ঐ দিন একই সময় শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা শোভাযাত্রা করে সংঘর্ষ করার একটা প্ল্যান ছিল এবং ডি-সির মাথায় ডালহৌসী কর্ম্মচারীদের এই সভা ঐ প্ল্যানেরই একটা অংশ ছিল মাত্র। অবশ্য ডালহৌসীর কমরেডদের প্ল্যানে এই সংঘর্ষে যোগ দেবার কোন পরিকল্পনা ছিলনা।

কমরেড ভবানন্দ ও কুমার এই প্ল্যানের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অমান্য করে স্থির করেন যে তাঁদের গণসংগঠন এই সভা শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করবে না।

নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে ডি-সি কমরেড ভবানন্দ ও কুমারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেণ্ড করেন। ফ্র্যাকশন ভেঙ্গে দিয়ে নূতন এক ফ্র্যাকশন মনোনিত করে দেওয়া হয় এবং আরও দুজন ফ্র্যাকশন সভ্যকে তাঁদের 'অবাধ্যতার' জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়। ডি. সি. এরকম একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু যাদের শাস্তি দেওয়া হলো—শাস্তি দেবার আগে তাঁদের কোন চার্জসীট দেওয়া হলো না, এমন কি তাঁদের বক্তব্য পর্যন্ত শোনা হলো না।

এই স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থায় সমস্ত কমরেডরা স্বভাবতই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং যা সামান্য কাজ করে চলছিল তাও বন্ধ হয়ে যায়। (পরে অবশ্য ডি. সি. তার ভুল স্বীকার করে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেছে।)

এইভাবে রাজনৈতিক অপরাধের কোন ফয়সালা না করে এবং স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা দ্বারা কাজ চালাবার চেষ্টা করে ডি. সি. সমস্ত ফ্রন্টে বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি, দলাদলি ও নিস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করেছে।

মার্কেন্টাইল ফ্রন্টে ডি. সি. দৈনন্দিন আন্দোলনে তেমন ঘনিষ্ঠ নেতৃত্ব দেয় নি। তবুও যতটুকু দিয়েছে তার ফলেও যথেষ্ট ক্ষতিই হয়েছে।

গত কয়েক মাসে এখানকার গণসংগঠনের একটি বিশেষ সম্মেলন হয়। গণসংগঠনকে সংস্কারবাদ মুক্ত করার নামে আমরা যে সর্বনাশা সঙ্কীর্ণ নীতি চালিয়ে গণসংগঠনগুলিকে ভেঙ্গেছি সেই নীতি এখানেও পুরা দস্তুর চালানো হয়। আই এন. টি. ইউ. সি., সোস্যালিষ্ট থেকে শুরু করে সমস্ত রকম রাজনৈতিক দল এবং বহুসংখ্যক অদলীয় কর্মচারীকে ব্যাপক ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে এই গণসংগঠনটি এতদিন চলে আসছিল এবং এই ঐক্যই ছিল এর শক্তির উৎস। এই সম্মেলনকে এক গোঁড়া সংকীর্ণ নীতি নিয়ে এই ঐক্যকে আমরা ভাঙ্গলাম।

এরকম ব্যাপক ভিত্তিতে গঠিত একটি গণসংগঠনের সম্মেলনে আমরা ভোটের জোরে এমন একটি ম্যানিফেস্টো গ্রহণ করলাম যার সঙ্গে পার্টি ম্যানিফেস্টোর বিশেষ কোন তফাৎ নেই। ফলে কয়েকটি ইউনিয়ন এই গণসংগঠন থেকে বেরিয়ে গেল এবং আরও কিছু ইউনিয়ন বেরিয়ে না গেলেও কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ কার্যত ছিন্ন করে দিল।

ডি. সি. নেতৃত্বের ফলে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ গণসংগঠন ভেঙ্গে না গেলেও যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ল।

এর কিছুদিন পরে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের নির্দেশে বিভিন্ন অফিসে কর্মচারীদের মাগ্‌গীভাতা কমিয়ে দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে বলে ফ্র্যাকশন নেতৃত্ব প্রথমে বিশেষ ভরসা পাচ্ছিলেন না। অনেক আলোচনার পরে একদিন কয়েক ঘন্টার জন্য 'কলম ধর্মঘট' করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু 'কলম ধর্ম্মঘটে' কোন ফল হবে বলে কেউ বিশ্বাস করছিলেন না। সুতরাং ডি-সির পক্ষ থেকে তাঁদের বলা হয়, 'কলম ধর্মঘট'কে আরও বৃহত্তর সংগ্রাম ও সংঘর্ষের প্রস্তুতি হিসাবে নিতে হবে এবং 'কলম ধর্মঘট' করার সময় চেষ্টা করতে হবে যাতে ঐ ধর্মঘট থেকে অফিসের মধ্যে সংঘর্ষ বাধানো যায়। সৌভাগ্য বশতঃ অফিসের মধ্যে সংঘর্ষ বাধানোর এই প্রস্তাব কোন কমরেড কার্য্যকরী করার চেষ্টা করেননি, করলে মার্কেন্টাইল ফ্রন্টে পার্টি ও গণসংগঠনের অস্তিত্ব আজ হয়ত সামান্যই অবশিষ্ট থাকত।

২৬শে জানুয়ারি

২৬শে জানুয়ারি আসার আগে বিভিন্ন লড়াইয়ের মধ্য থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে বামপন্থী বিচ্যুতির ফলে মজুর শ্রেণির সংগঠন ভেঙ্গে পড়েছে। মজুরদের মধ্যে চূড়ান্ত ভয় সৃষ্টি হয়েছে। পার্টির তরফ থেকে মজুরদের যে সমস্ত লড়াই পরিচালনা করা হয়েছে, তাতে শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের সংগঠনের যথেষ্ট ক্ষতি করা হয়েছে। এর ফলে একটার পর একটা হরতালের ডাক বিফল হয়েছে। একথা ঠিক যে সারা কলকাতায় আমাদের সংগঠনগুলি খুব বেশি পাকাপোক্ত ছিল না, কিন্তু অনেক আগে যে সমস্ত হরতালের ডাক দেওয়া হোত তাতে শ্রমিকদের এক বিরাট অংশ যোগ দিতেন। বাংলা পি, সি, ২৬শে জানুয়ারির আগে একথা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে, আমরা মজুর শ্রেণির মধ্যে অতন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছি। সেইজন্যই ২৬শে জানুয়ারির উপর লিখিত সার্কুলারে 'শ্রমিকশ্রেণিকে জয়' করার আহ্বান জানান। ২৬শে জানুয়ারির ১০ দিন আগেই সমস্ত পার্টি সভ্যকে মজুর এলাকায় যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। যে সমস্ত মধ্যবিত্ত ও ছাত্র কমরেডরা কোনদিন শ্রমিক আন্দোলন করেন নি, তাদেরও শ্রমিক বস্তি ও কারখানা গেটে পাঠানো হলো। আমরাও পি, সি,র মতই চিন্তা করলাম যে, সবাইকে শ্রমিক এলাকায় পাঠিয়ে আবার ১০ দিনে সব সংগঠনগুলিকে জোড়া লাগানো ও যোশ দেওয়া যাবে। তখনও ভুলের মূল সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধ। তাই সমাধানের রাস্তা এইভাবেই গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ মজুরদের সংগঠন কেন কমজোর হচ্ছে বা ভাঙ্গছে, তা বিচার না করেই সবাইকে ফ্রন্টে পাঠালেই দুর্বলতা দূর হবে—এটাই ভাবলাম। এ সময়ে বিভিন্ন শ্রমিক এলাকায় বিশেষ কোন খোঁজ খবর না জানা বহু কমরেড অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হন। কাশীপুর ও মানিকতলায় আমাদের কমরেডরা গুণ্ডাদের আড্ডায় পড়ে মার খান।

অন্যদিকে ২৬শে জানুয়ারির আগেই পার্টির বামপন্থী বিচ্যুতির অঙ্গ 'মিলিট্যান্ট

এ্যাকশনের' ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে পড়েছিল। অর্থাৎ আমাদের মিটিংএ'ও লোকজন আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমাদের এই 'এ্যাকশনের' ফলে। জনসাধারণ সকলেই জানতেন যে, আমাদের মিটিং হলেই তাতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য। তারা এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, এইসব সংঘর্ষের ফলে পুলিশ হামলা আরও তীব্রতর হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে, আমাদের অনেক কমরেডরা পর্য্যন্ত মিটিংএ যেতেন না। বি. পি. টি. ইউ. সি'র জেনারেল কাউন্সিল মিটিং পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই অবস্থা বাংলা পি. সি. ও পি, বি'র সামনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তারা কলিকাতা জেলা কমিটিকে নির্দেশ দেন যে আমাদের কাজ হলো ২৬শে ব্যাপক গণ-সমাবেশ করা ও জনতার সামনে এই শাসনতন্ত্রের মুখোশ খুলে ধরা। যদি পুলিশ মিটিং হতে না দেয় ও হামলা করে তবে সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে লড়াই করা। উপরোক্ত অবস্থা সত্ত্বেও পি. সি. ২৫শে তারিখ সাধারণ হরতালের আওয়াজ দেন। জেলা কমিটি হরতাল সফল হবে না এটা জেনেও তাতে সায় দেয়।

সমগ্র পার্টিকে মজুর এলাকায় পাঠিয়েও হরতাল করানো সম্ভব হলো না। মাত্র টালিগঞ্জের ২/৩টি ছোট কারখানা ও কে, সি, মল্লিকের কারখানায় হরতাল হয়। বাকি সমগ্র শিল্প-কারখানা পুরোদমেই চালু থাকে। সাধারণ হরতালের বিফলতা থেকে জেলা কমিটি বিশেষ কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন না। কাশীপুরে দুজন ডি, সি, এম, কমরেড-এর কার্যকলাপ থেকে তা কিছুটা বোঝা যাবে। কমরেড ভাস্কর ও হামিদ সেই এলাকার দায়িত্বে ছিলেন। তারা ৭ দিন আগে থেকেই সেই এলাকার উপর নজর দেন। ২৩শে তারিখ তারা স্থানীয় কমরেডদের সাথে আলোচনা করলেন এবং নিজেরাও বুঝলেন যে জোর করে কিছু কমরেডকে গেটে পাঠালে তারা গ্রেপ্তার হওয়া ছাড়া আর অন্য কিছুই হবে না। তা সত্ত্বেও এ অবস্থার কারণ কি তা না চিন্তা করে কিছু না কিছু করতেই হবে— এটাই ভাবলেন। তারা ঠিক করলেন যে সাধারণ হরতাল না হলে অন্তত কালো ঝাণ্ডা উড়াতে হবে। কিন্তু দেখা গেল যে, জনতাকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্য ভাবে কালো ঝাণ্ডা উড়াবার ক্ষমতাও আমাদের সেখানে নেই। ঠিক হলো, ভোর রাত্রে চুপি চুপি আমাদের কমরেড গাছের মাথায় কয়েকটি কালো ঝাণ্ডা বেঁধে দিয়ে আসবেন। কমরেডরা সেটাই করলেন। আমরা সাধারণ হরতাল না হবার বিফলতাকে ঝাণ্ডা উড়াবার আপাত সাফল্যে ঢেকে দেবার চেষ্টা করলাম। আমরা গর্ব করলাম যে কোন কিছু তো অন্তত করা গেছে। যদিও ঐ সময়ে এবং বিশেষ করে এ ধরনের সাংগঠনিক অবস্থার ঐ প্রকার করা ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে আমাদের অবস্থা তখন কোন পর্যায়ে।

২৬শে তারিখ দেশপ্রিয় পার্কে মিটিং ডাকা হলো। আমাদের এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মিটিংএ ৭০০'শ-এর বেশি লোক উপস্থিত হলেন না, এবং এর মধ্যে অধিকাংশই হলো আবার আমাদের কমরেড। ময়দানের মধ্যে আগে থেকে পুলিশ উপস্থিত ছিল। আমাদের কমরেডরা একত্রিত হয়ে মিটিং শুরু করার সাথে সাথেই পুলিশ আক্রমণ করল। লাঠি চার্জের সঙ্গে সঙ্গে কমরেডরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। পুলিশের গুলির বিরুদ্ধে আমাদের কমরেডরা যে যা পেলেন তাই নিয়ে লড়াই চালালেন। ৩ ঘন্টা পর্যন্ত এ লড়াই চলল ২ জন শহিদ হলেন। পুলিশ কর্তৃক সেদিন মিটিং না করতে দিয়ে হামলা করা ও গুলি চালনার ফলে দক্ষিণ কলিকাতার জনতার এক অংশের মধ্যে বিক্ষোভটা বেশ বেড়ে যায়। আমাদের কমরেডরা ও অন্যান্য যুবকরা মিলে যখন পুলিশের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন ও কংগ্রেসী

ঝাণ্ডা ও টুপিতে আগুন দিচ্ছিলেন, তাতে জনসাধারণ সমর্থন জানায়। ফলে ট্রাম, বাস বন্ধ হয়ে যায় ও কয়েকখানা ট্রামে আগুন দেওয়া হয়।

২৬শের লড়াই থেকেও আমরা কিছু শেখার চেষ্টা করি না। কেন লোক আমাদের মিটিংএ এলো না, কেন এত কম লোক নিয়ে পুলিশের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে গেলাম তা কিছুই ভাবলাম না, উপরন্তু এটাকে একটা বিরাট ঘটনা হিসাবে দেখলাম ও দেখালাম। 'স্বাধীনতা'য় এটাকে ছাপা হলো দক্ষিণ কলিকাতাকে মুক্ত এলাকা আর লক্ষ লোকের লড়াই হিসাবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও আমাদের কাজ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ২ শত বৎসরের ভারত শাসনের ইতিহাসে বহুবার দাঙ্গা হয়েছে। কি অর্থনৈতিক কারণে কি রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজন হলেই সাম্প্রদায়িক কিম্বা প্রাদেশিক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ তার নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে; সর্বশেষ '৪৬, '৪৭ সালের দাঙ্গা ও দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে সারা দেশে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার স্থায়ী অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এমন কায়দায় দেশ বিভাগ করে ২টি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি করেছে যাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে উভয় রাষ্ট্রেরই পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা বেড়েছে। তাই কখনও পাট, তুলা, গম ও কয়লা নিয়ে আবার কখনও বা জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীরকে নিয়ে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে বিরোধ লেগেই ছিল। তবে এই সমস্ত সমস্যাগুলির মধ্যে কাশ্মীর সমস্যাই ছিল অন্যতম প্রধান সমস্যা।

অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুষ শোষনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন সম্ভাবনা দেখা দিলেই তারা বার বার দাঙ্গার আশ্রয় নিয়েছে। পূর্বের কথা বাদ দিলেও প্রায় ১ বৎসর যাবৎ ('৪৯ থেকে '৫০ সাল) বাংলা দেশের গণবিক্ষোভ বেড়ে চলেছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়াতে বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের ধর্মঘট সরকারি কর্মচারী, ও অফিস কর্মচারী এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আন্দোলন, বাস্তুহারা আন্দোলন ও ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলন, রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্মঘট প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জনসাধারণ নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই বিধান সরকার অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যেকটি আন্দোলনকে লাঠি, গ্যাস, ও গুলির সাহায্যে দমন করে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত আন্দোলন ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। নিখিল ভারত শান্তি কংগ্রেসের সফল কলিকাতা অধিবেশন এবং দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয়ে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার দালাল বিধান সরকার আতংকিত হয়ে পড়ে। ঠিক এই রকম একটা অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ নির্দেশে নাচল, কালশিরা, প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিধান সরকার কলিকাতায় দাঙ্গা লাগায়। এ দাঙ্গা অকস্মাৎ লাগেনি। বেশ কিছু দিন পূর্ব থেকেই এর ষড়যন্ত্র চলছিল। গতবারের দাঙ্গায় বিশেষ করে গান্ধীজীকে হত্যা করার পর যে শত শত আর এস এসকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। এবারে দাঙ্গা লাগার কিছু দিন পূর্ব থেকে ব্যাপক ভাবে তাদের মুক্তি দেওয়া হতে থাকে। ১৩ই জানুয়ারি সর্দার প্যাটেল ময়দানের সভায় তীব্র সাম্প্রদায়িকতা মূলক বক্তৃতা দেয়। জানুয়ারির শেষে গোলওয়ালকর কলিকাতায় আসে এবং হিন্দু মহাসভার কর্মীদের সাথে প্রকাশ্যে ও গোপনে কয়েকটি মিটিং করে। বিভিন্ন পার্কে সাম্প্রদায়িক

প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ থেকে সভা করে এবং উত্তেজনামূলক বক্তৃতাদি চলতে থাকে। সংবাদপত্রগুলিতেও উৎকট সাম্প্রদায়িক প্রচার চলতে থাকে। এই ভাবেই ৫ই ফেব্রুয়ারি বাটায় দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

উপরোক্ত সমস্ত ঘটনা আমাদের চোখের সম্মুখে থাকা সত্বেও সম্ভাবনাকে আমরা অত্যন্ত খাটো করে দেখলাম এবং জনসাধারণের দাঙ্গা ... চেতনার স্তরকে অত্যধিক বাড়িয়ে দেখলাম। সেইজন্য সময় মত দাঙ্গা ... সঠিক প্রচার প্রোপাগাণ্ডা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম না। খুব বেশি পূর্বে না হলেও কিছু কিছু কমরেড দাঙ্গা লাগার সম্ভাবনার প্রতি জেলার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমরা তখন সমাজতান্ত্রিক ... নেশায় মস্‌গুল। এ সমস্ত বাস্তব বিষয় চিন্তা করার মত চেতনা আমাদের একেবারে ছিল না। যেমন দাঙ্গা লাগার সম্ভাবনাকেও গুরুত্ব দিলাম না। কমরেডদের সময়োচিত হুঁশিয়ারীকে মূল্যহীন ভেবে প্রত্যাখ্যান করলাম। এই ভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যায় নেতৃত্ব দেবার কাজে চরম দেউলিয়া পনা দেখালাম। দাঙ্গার প্রথম দিকে আমাদের কমরেডরা প্রাণতুচ্ছ করে দাঙ্গা বিরোধী প্রচার প্রোপাগাণ্ডায় অংশগ্রহণ করেন। বেলগাছিয়ার মুসলিম ভাইদের বাঁচাতে গিয়ে ট্রাম শ্রমিক কমরেড গৌরাঙ্গ গুণ্ডাদের দ্বারা নিহত হন। অন্য এলাকার অনেক কমরেড দাঙ্গাবিরোধী লড়াইয়ে অল্পবিস্তর আহত হন। এইভাবে কমরেডরা জীবন পণ করে দাঙ্গাকে ঠেকাবার চেষ্টা করেন। কমরেডদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা এবং সরকারি ও বে-সরকারি হাজার রকমের প্ররোচনা সত্ত্বেও জনসাধারণ বেশ খানিকটা দাঙ্গাবিরোধী মনোভাবের ফলে প্রথম দিকে সাময়িকভাবে দাঙ্গা আয়ত্বে আনা কতকটা পরিমাণে সম্ভব হয়। সুতরাং দাঙ্গাবিরোধী প্রচারের কাজে খানিকটা ভাটা পরে। তার পর কেন্দ্রীয় পরিষদে নেহেরুর বক্তৃতায় দাঙ্গা সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। বিশেষ করে হিন্দুস্থানী জনসাধারণ দাঙ্গার সমর্থক হয়ে পড়ে (কিন্তু প্রথম দিকে এরা ভীষণ দাঙ্গাবিরোধী ছিল) এবং সাধারণ ভাবে গোটা কোলকাতায় দাঙ্গার পক্ষে অবস্থা সৃষ্টি হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারি হিন্দুমহাসভা কর্তৃক আহুত সাধারণ হরতালের মধ্য দিয়ে পুরা দস্তুর দাঙ্গা লেগে যায়। শত্রু পক্ষের শক্তিকে ছোট করে দেখার মনোভাব আমাদের কেটে না গেলেও শত্রুপক্ষেরও যে ক্ষমতা আছে—এ চিন্তা আমাদের মধ্যে দেখা দিতে থাকলো। তবে আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব তখনও আমাদের মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ কেটে যায় নি। দাঙ্গার মূলে সাম্রাজ্যবাদই যে প্রধান অভিনেতা— এ চিন্তা তখনও আমাদের মধ্যে ছিল না। ফলে আমাদের প্রচার প্রোপাগাণ্ডা জনতার অধিকাংশের সমর্থন লাভে অসমর্থ হয়। জাতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে "নিজ নিজ দেশের শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই করাই হচ্ছে প্রধান কাজ"—এই অসামঞ্জস্য পূর্ণ মার্কসিজিমের বুলির আড়ালে পাকিস্থানের হিন্দুজনতার উপর নৃশংস অত্যাচারের বাস্তব ঘটনা জনসাধারণের কাছে একেবারে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করলাম। "পাকিস্তানে কৃষক বিদ্রোহকে ঠেকাবার" জন্যই এই দাঙ্গার প্রচার হচ্ছে— আসলে সেখানে তেমন বিশেষ কিছু হয়নি বলে— প্রচার করতে থাকলাম। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হাজার হাজার বাস্তুহারাদের কাছ হতে তাদের উপর অত্যাচারের করুণ কাহিনী জনসাধারণ শুনলেন। আমাদের শত্রুপক্ষ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল। 'কমিউনিস্টরা—পাকিস্থানের দালাল'—একথা প্রচারের সুযোগ পেল। এর পর থেকে জনসাধারণ দাঙ্গা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যে আর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না।

দাঙ্গার প্রথম দিকে কয়েকদিন কেবল 'স্পেশালের' সাহায্যে দাঙ্গা রোখার চেষ্টা করলাম। তখন আমাদের মাথায় ছিল কেবল প্রতিরোধ দ্বারাই দাঙ্গা ঠেকানো যাবে। প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের প্রচারে জনসাধারণ যে কতখানি প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল সে সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ ধারণাই ছিল না। জনসাধারণের বাস্তব চিন্তাধারাও আমাদের চেতনার মধ্যে যে কতখানি ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা তা সহজেই বোঝা যায়।

দাঙ্গার উপর আমরা যে সমস্ত ইস্তাহার ও সার্কুলার পত্র দিই তাতে উভয় ডোমিনিয়নের ধনিক শ্রেণি ও জমিদার বর্গের ষড়যন্ত্রের কথাই বলি। কিন্তু, দাঙ্গার আসল নায়ক যে সাম্রাজ্যবাদ সে কথা বাদই পড়ে যায়। নামকাওয়াস্তে, অবশ্য ২/১ বার সাম্রাজ্যবাদের কথা উল্লেখ করা হয়। এই সমস্ত সার্কুলার যেমন পার্টি র‍্যাঙ্ক-এর মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করেনি তেমনি ইস্তাহার গুলিও জনসাধারণের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়নি। দাঙ্গার রাজনীতির ব্যাপারে পার্টির চেতনা কিছুটা ফিরে আসে একেবারে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে।

দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হয়ে যখন পূর্ববঙ্গ থেকে সহস্র সহস্র বাস্তুহারা কলকাতায় আসতে লাগল এবং খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশায় অতীষ্ট হয়ে সমাধানের উপায় খুঁজতে লাগল আমরা তখন তাদের দুঃখ দুর্দশার সাময়িক সমাধানের জন্যও চিন্তা করলাম না। তাদের আশু দাবিগুলির ভিত্তিতে আন্দোলন করার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম না। অথচ তখন রিলিফ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করার এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব থেকে তাদের বাঁচানো সম্ভব ছিল। আমাদের উপরোক্ত ভুলের সুযোগে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি বাস্তুহারাদের উপর প্রভাব বিস্তার করল এবং বাস্তুহারাদের বাসস্থান দেবার নামে মুসলিম বস্তিগুলি দখল করার মধ্য দিয়ে দাঙ্গাকে দীর্ঘ বিস্তৃত করল। আমরা শেষের দিকে যদিও বা কিছুটা রিলিফের কাজ করলাম তাও আবার বিশেষ করে মুসলিম বাস্তুহারাদের মধ্যে। অবশ্য মুসলিম বাস্তুহারাদের মধ্যেও রিলিফের কাজ করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল। কারণ আমরা ছাড়া মুসলিমদের মধ্যে কেহই কাজ করছিল না। কিন্তু হিন্দু বাস্তুহারাদের মধ্যে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল আরও বেশি। কারণ হিন্দু বাস্তুহারাদিগকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত না করে দাঙ্গা রোখা এবং মুসলিমদের আরও বাস্তুহারায় পরিণত হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। রিলিফের কাজ করার পরিমাণের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাস্তুহারাদের মধ্যে রিলিফের কাজ কিছুই করি নি; বাস্তব অবস্থা বিচারে রিলিফ প্রভৃতি কাজ করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ছিল। আমাদের দুই বৎসরের অন্যান্য সমস্যার প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল— সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই বাস্তুহারা সমস্যাকে দেখলাম। জনসাধারণের প্রাথমিক সমস্যার প্রতি অন্ধ থেকে কেবল বড় বড় অবাস্তব শ্লোগানই আওড়ালাম। এক মুঠো চিড়া কিম্বা এক ফোটা ঔষধের জন্য যখন বাস্তুহারারা শিয়ালদহ ষ্টেশনে ছটফট করছিল আমরা তখন তাদের রিলিফের জন্য কোন চেষ্টা না করে ২০, ২. ৫০এর ডি, সি, সার্কুলারে শ্লোগান দিলাম। "দাঙ্গাবাজদের শাস্তি ও রিলিফের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে ফেলুন।" মুসলিম বাস্তুহারাদের মধ্যে ঐ একই ভাবে তাদের প্রাথমিক সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলাম না। পার্কসার্কাসে তো প্রথম দিকে কেবল শ্লোগানবাজীই করলাম অথচ পার্কসার্কাস ময়দানে তখন কয়েক সহস্র মুসলিম বাস্তুহারা (অধিকাংশ শ্রমজীবী) প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানগুলির কবলে পড়ে প্রতারিত

হচ্ছিলেন। যখন আমরা সাহসের উপর ভর করে পার্ক ময়দানের বাস্তুহারাদের মধ্যে রিলিফের কাজ করার জন্য প্রবেশ করলাম এবং কিছু কিছু সেবাকার্যের মধ্য দিয়ে তাদের দুঃখ কষ্টের প্রকৃত কারণ কি এবং কিভাবেই বা এর সমাধান হতে পারে—তা যখন বললাম তখন তারা আমাদের কথাকে দারুণভাবে সমর্থন জানালেন। শেষ পর্যন্ত বাস্তুহারাদের ব্যাপক সমর্থনে ক্যাম্পের যাবতীয় কাজকর্মের কর্তৃত্বই আমাদের হাতে এসে পড়ল।

পার্কসার্কাসের মত পাটোয়ার বাগানেও আমাদের কাজ কর্ম বেশ খানিকটা সফল হয়েছিল। এখানকার কমরেডরা কেবল শ্লোগানবাজী না করে বাস্তব অবস্থার প্রতিও নজর দিয়েছিলেন। মুসলিম বাস্তুহারাদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলিতে নিজেদের উদ্যোগে এবং স্থানীয় মুসলিম জনসাধারণের সমর্থনে বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু বাস্তুহারাদের বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। ফলে এই এলাকায় আর, এস, এস, গুণ্ডারা হিন্দু জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং হাজার চেষ্টা করেও তারা দাঙ্গা লাগাতে পারে না। এইভাবে মুরারিপুকুর, বজবজ প্রভৃতি এলাকায় অল্প বিস্তর রিলিফের কাজ হয়েছিল কিন্তু অবস্থার তুলনায় তা ছিল নেহাৎই নগণ্য। কমরেডদের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ২/৩টা এলাকা বাদে তেমন সুসংগঠিত কায়দায় বা উল্লেখযোগ্যভাবে কোথাও কিছু করা যায় নি। কারণ প্রথমত পার্টির দুই বৎসরের বামপন্থী বিচ্যুতির ফলে সমস্ত গণসংগঠনগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। সাংগঠনিক ভাবে জনসাধারণ থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। তাই দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে আমরা গণ প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারি নি; যেমন পেরেছিলাম '৪৭ সালের দাঙ্গার বিরুদ্ধে শত শত পোর্ট শ্রমিকদের টেনে আনতে। দ্বিতীয়ত ২ বৎসরের বামপন্থী বিচ্যুতি পার্টিকে ধ্বংসের একেবারে শেষে কিনারায় নিয়ে এসেছিল, পার্টির ঐক্য একেবারে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ২৭শে জানুয়ারির কমিনফর্ম্ম প্রবন্ধ আসার পর অবশিষ্ট পার্টির মধ্যে তখন তীব্র আলোড়ন শুরু হয়েছে। নেতৃত্বের রাজনৈতিক 'পাণ্ডিত্যের' উপর র‍্যাঙ্কের আস্থা তখন কমতির দিকে। সর্বোপরি দাঙ্গার রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত এবং দাঙ্গা বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার চেষ্টা না করা প্রভৃতি কারণেই আমরা দাঙ্গার বিরুদ্ধে উপযুক্ত পরিমাণ সক্রিয় জনমত সৃষ্টি করতে পারি নি' কাশীপুরে সাধারণ কংগ্রেসী জনসাধারণ দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। যদিও তখন নেতৃত্ব ছিল প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে কিন্তু আমরা সেখানে একসঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করলাম। এ ভাবে পার্কসার্কাসেও জে. সি. গুপ্ত ইত্যাদির নেতৃত্বে স্থানীয় যুবকরা কাজ করতে থাকেন। আমরা তাদের সাথে কাজ করার ব্যাপারে উচ্চতর কমিটি আমাদের সমালোচনা করেন। অথচ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার মধ্য দিয়েই ঐ সব নেতৃত্বের মুখোশ খুলে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারতাম।' হিন্দু বাস্তুহারা কর্তৃক মুসলিম বাড়ি দখল বা অধিকৃত মুসলিম বাড়িগুলি মুসলিম বাসিন্দা কর্তৃক ফিরে পাওয়ার ব্যাপারেও আমরা যথা সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। এবারের কলকাতার দাঙ্গায় কলকাতা জেলা কমিটির কাজকর্মের এই হলো সংক্ষিপ্ত হিসাব নিকাশ।

মহিলা ফ্রন্টের পর্যালোচনা

কলিকাতা জেলা কমিটির পুনঃগঠিত হবার পর প্রথম বামপন্থী বিচ্যুতির পথে বেপরোয়াভাবে চলা শুরু হয় "ঐতিহাসিক" ২৭শে এপ্রিলের মহিলা শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে। যদিও ঐ

শোভাযাত্রা প্রাদেশিক মহিলা টিম ও পি, সি'র নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল, তবুও ঐ শোভাযাত্রার পরের দিনের ঘটনাবলির সাথে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম। তারপর হতে প্রতিটি ঘটনাকে ঐ মডেলেই চালাবার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। ৪ জন মূল্যবান পার্টি কর্মীকে আমরা হারালাম সত্য কিন্তু বাস্তব ঘটনা হতে আমরা একবিন্দুও শিক্ষা গ্রহণ করলাম না অথচ ঐ ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল যে শত্রুকে এপথে ঘায়েল করা যায় না। ২৭শে এপ্রিলের সভা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নামে ডাকা হয়ে ছিল। সেইজন্য এই গণসংগঠনটির উপর বিধান রায়ের হিংস্র দৃষ্টি পড়লো। তারা সর্বরকম উপায়ে এই গণসংগঠনটির উপর জুলুমবাজী চালায়। কিন্তু আমরা শত্রুর হামলা হতে সংগঠনটিকে বাঁচাবার বিষয় মোটেই চিন্তা করলাম না, উপরন্তু তদানীন্তন বামপন্থী হঠকারিতার দ্বারা যে সমস্ত আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল তার প্রত্যেকটিতেই মহিলা সংগঠনটিকে অংশ গ্রহণ করাতে থাকলাম, কারণ "প্রত্যেকটি সংঘর্ষই বিপ্লবী রূপ পরিগ্রহ করতে বাধ্য, তা সে যত ছোটই হোক না কেন'' মার্কসবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই অবাস্তব থিওরী আমাদের মনে একেবারে দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে গেছে। "জনতা বিপ্লব করার জন্য প্রস্তুত" শুধু ডাক দিতে পারলে এবং যেন তেন প্রকারে একবার লাগিয়ে দিতে পারলেই বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে। এই যখন চিন্তাধারা তখন গণসংগঠন গড়া, বাড়ানো বা তাকে রক্ষা করার কথা চিন্তা না করাই স্বাভাবিক, আর কার্যক্ষেত্রে হলোও তাই। যে কোন আন্দোলনের ইসু এলেই ডি, সি, থেকে মহিলা ফ্রাকশনের মিটিং ডেকে তাদের কাজের কোটা ও দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সভা শোভাযাত্রা গুলিতে অধিক পরিমাণ মহিলাদের নিয়ে যাবার কোটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনগুলিতে (রেল, ক্ষেত মজুর, ছাত্র ও শান্তি) স্বেচ্ছাসেবিকা পাঠানো, প্রতিনিধিদের থাকার জায়গা দেওয়া এবং সম্মেলনের প্রচার করা প্রভৃতির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জেলা কমিটির দেয় তহবিল বাড়াবার জন্য পিড়াপিড়ি করা হয়েছে। কিন্তু তাদের ফ্রন্টের অবস্থা কি, পার্টি সভ্য বাড়ছে না কম্‌ছে, গনসংগঠন আছে না ভেঙ্গে গেছে এসমস্ত ব্যাপারে মোটেই নজর দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য ফ্রন্টেব মতই মহিলা ফ্রন্টেও গণআন্দোলন পরিচালনা করা হয়েছে মহিলাদের নিজস্ব কোন গণদাবির ভিত্তিতে নয়। যে সমস্ত পার্টি সারকুলার দেওয়া হতো তারই ভিত্তিতে গণপ্রতিষ্ঠান-টিকে পরিচালনা করা হতো। তাই প্রতিটি গণপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব দৈনন্দিন যে সমস্ত কাজকর্ম থাকে এখানে আস্তে আস্তে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। এইভাবে সাধারণ মহিলাদের কাজ হতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বস্তির সাধারণ মহিলা থেকে আরম্ভ করে উচ্চমধ্যবিত্ত মহিলা পর্য্যন্ত যখন হাজারো রকমের সমস্যায় ভারাক্রান্ত হয়ে পথ হাঁতড়াচ্ছে আমরা তখন আশু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রঙ্গীণ স্বপ্ন দেখছি। অথচ সাধারণ দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ঐ অগণিত সাধারণ মহিলাদের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে টেনে আনা সম্ভব ছিল।

বামপন্থী হঠকারিতার কাজে মহিলা ফ্রন্টকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার ফলে মহিলা ফ্রন্ট কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার কিছুটা নমুনা আমরা দেবার চেষ্টা করছি। জুন মাসের পটারী ধর্ম্মঘটের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বড় বড় সংঘর্ষ হয়েছে তার অধিকাংশগুলিতেই আমাদের মহিলা কমরেডদের নেতৃত্বে ঐ কারখানার মহিলা শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেন এবং পুলিশ ও দালালদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হন। শেষ পর্য্যন্ত ধর্মঘট

ভেঙ্গে যায়। ফলে ওখানে আমাদের যে সমস্ত পার্টি সভ্যা ও মিলিট্যান্ট ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছাঁটাই হয়ে যান। সেই সমস্ত ছাঁটাই মহিলা নানা অবস্থার চাপে আজ বসে গেছেন। গণসংগঠনটি (মেয়ে ও পুরুষ শ্রমিক মিলিত) ভেঙ্গে গেছে। পার্টি সংগঠনও সাংঘাতিকভাবে দুর্বল হয়েছে।

ক্রমাগত সভা শোভাযাত্রায় পুলিশের সাথে সংঘর্ষ যখন বেড়েই চলছিল, অনেক মহিলা কমরেড আহত ও ধৃত হচ্ছিলেন সেই হঠকারী নীতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পেরে বহু মহিলা কমরেড বসে পড়েছেন। আমাদের সভা শোভাযাত্রাগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার পরিমাণ একেবারে কমে গেছে ঠিক এইরকম সময় ২৫শে ডিসেম্বর অনশনকারী রাজবন্দীদের দাবিতে আহুত ময়দানের সভা হতে জেল গেটে যে শোভাযাত্রা যায়, সেই শোভাযাত্রায় পুলিশ সাংঘাতিকভাবে লাঠি চালনা করে। ফলে পুরুষ কমরেডদের সাথে অনেক মেয়ে কমরেডও আহত এবং ধৃত হন। এইভাবেই মহিলা সংগঠনটিকে আমরা ভেঙ্গেছি।

ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে ৬ জন মহিলা কমরেডকে নিয়ে প্রাদেশিক আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য "প্রাদেশিক ফ্রাকশনের সম্পাদিকা সভা" নামে একটি প্রাদেশিক সেল গঠন করেন। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে যাঁহাদের নিয়ে এই সেল গঠন করা হলো একজন বাদে তারা সকলেই কলিকাতার আন্দোলনের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকশন গঠন হবার পর আমরা ৭ জন মহিলা কমরেডকে নিয়ে কলিকাতা মহিলা টিম নামে একটি ফ্রাকশন গঠন করি। প্রাদেশিক মহিলা টিমের অধিকাংশ সভ্যা কলিকাতাতেই থাকতেন এবং কলিকাতার মহিলা আন্দোলনের মধ্যেই কাজ করতেন। সেই জন্য কলিকাতার সাধারণ মহিলা পার্টি সভ্যাদের দারুণভাবে নাজেহাল হতে হয়। একই আন্দোলনের ইসুতে একবার প্রাদেশিক মহিলা ফ্রাকশন আবার একবার কলিকাতা মহিলা টিম তাদের মিটিং করতেন। এই অবস্থা কিছুদিন চলার পর জি. এন. এস. (গনেশ) নামে আর একটি প্রাদেশিক মহিলা সেল গঠিত হয়। এই সেলটি গঠিত হবার পর একই ইসুতে কলিকাতার মহিলা পার্টি-সভ্যাদের তিনবার করে ৩টি মিটিং করতে হতো। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসে আন্তর্জাতিক শিশু দিবস। শিশু দিবসের আন্দোলনকে পরিচালনার জন্য একটি ক্যাম্পেন কমিটি গঠন করা হয়। পরে পি, সি, বা ডি, সিকে না জানিয়েই ঐ ক্যাম্পেন কমিটিকেই পুনঃগঠিত প্রাদেশিক ফ্রাকশন বলে ঘোষণা করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কমিনফর্ম্ম প্রস্তাব আসার পর পি, সি, এবং ডি, সি, ঠিকভাবে কাজ চালাতে পারছিলেন না এবং কোন গণসংগঠনকেই পরিচালনা করতে পারছিল না। এ অবস্থার চূড়ান্ত প্রকাশ হয় আন্তর্জাতিক শিশু-দিবসের পরিচালনার ব্যাপারে। প্রাদেশিক কমিটি বিশেষ করে কলিকাতা জেলা কমিটি শিশু-দিবসের ব্যাপারে একেবারে কিছুই করে নাই।

প্রতিদিনকার সভা-শোভাযাত্রাকে সংঘর্ষের মুখে ঠেলে দিয়ে যেমন সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে অন্যদিকে তেমনি সাংগঠনিক যথেচ্ছাচার দ্বারাও এই সংগঠনকে সমানভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে। ১৯-১০-৪৯ এর প্রাদেশিক সার্কুলারে স্বতন্ত্র মহিলা সেলগুলিকে উঠিয়ে দিয়ে সকলকে টি. ইউ. সেলে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রসেস্টের ৯নং কমিউনিষ্ট বুলেটিনে সমস্ত মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যে কাজ না করার যে ভুল নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ১৯-১০-৪৯ এর প্রাদেশিক কমিটির সার্কুলারে তাকে পুরাপুরি কার্যে পরিণত করার শেষ নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে টি. ইউ. আন্দোলন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মহিলা কমরেডরা খুবই

অসুবিধায় পড়লেন। অন্যদিকে সাধারণ মধ্যবিত্ত মহিলাদের মধ্যে যেটুকু আসর ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল। এছাড়া পুরুষ কমরেডদের সঙ্গে মহিলা কমরেডদের বহুদিনের পুরান সংঘর্ষ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, যেমন চিৎপুর রেল, পটারী প্রভৃতি।

বামপন্থী হঠকারিতা, সাংগঠনিক যথেচ্ছাচারের জন্য সংগঠন ভেঙ্গেছে সত্য, এই সঙ্গে আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার অভাবও এখানে উল্লেখযোগ্য। কারণ জেলা কমিটির সভ্যদের মধ্যে মহিলা আন্দোলন সম্বন্ধে কেহই অভিজ্ঞ নন সে কথা পরিষ্কারভাবে স্বীকার করা উচিৎ। কি তাদের দাবি, কিইবা তাদের সমস্যা, এ সম্বন্ধে ২/৪টি ভাসা ভাসা ধারণা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই বুঝতাম না। অথচ কলিকাতার অন্যান্য আন্দোলন অপেক্ষা মহিলা আন্দোলনের ব্যাপকতা কোন অংশেই কম নয়।

আমরা মনে করি মহিলা আন্দোলনের উপরে শুধু আমাদের চেতনাই কম নয়। এ ব্যাপারে সাধারণ ভাবে সমগ্র পার্টির চেতনাও খুব নিম্নস্তরে। মহিলা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাবও মহিলা সংগঠন গড়ে না উঠা এবং দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ। এ ব্যাপারে সমগ্র পার্টিকে সজাগ করে তোলা খুবই প্রয়োজন।

ছাত্র ফ্রন্টে সংকীর্ণতাবাদ ও ডি, সি'র দায়িত্ব

১৯৪৯ সালের এপ্রিল থেকে শুরু করে আজ পর্য্যন্ত ছাত্রফ্রন্টে জিলা কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্বের আত্মসমালোচনা মূলক রিপোর্ট উপস্থিত করার সময় প্রথমেই বলা দরকার যে, আমাদের ২ বছরের একটানা বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদী রাজনীতির মধ্যে জিলা কমিটির সাংগঠনিক অবস্থা যে পর্যায়ে ছিল তার ফলে কোন দিনই কোন ফ্রন্ট সম্বন্ধেই জিলা কমিটির কোন সমষ্টিগত কোন ধারণা ও নেতৃত্ব ছিল না। সংগঠন কায়দার মূলগত লক্ষ্যই ছিল, কমিউনিষ্ট সংগঠন বিরোধী ডিপার্টমেন্ট্যালিজম, এক কথায় এক একজন জিলা কমিটির সভ্য এক একটা ফ্রন্টের দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন, এরই ফলে সমীরণ জিলা কমিটির পক্ষ থেকে ছাত্র আন্দোলন দেখতেন, তখন তিনিই ছাত্র ফ্রন্টের খবরাখবর রাখতেন আর কেউ সে বিষয় কোন খবর রাখতেন না। আমিও যখন ডি.সি.-তে এলাম সে সময়ও ঠিক এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই কায়দায় চলার ফলেই সমীরণ ধরা পড়ার ফলে তার সময়কার ছাত্র আন্দোলনে ডি, সির কার্যকলাপ ডি.সি.-র কাছে একরকম অজ্ঞাত। আমি যেহেতু ছাত্র ফ্রন্টেই ছিলাম ও সেখান থেকেই ডি. সি. এম হই তাই সে সময়কার যতটুকু জানতাম ও বিভিন্ন কমরেডদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে যতটুকু জানতে পেরেছি তার উপর ভিত্তি করেই এই রিপোর্ট উপস্থিত করেছি। আর (পরবর্ত্তী সময় আমি নিজেই ছিলাম) তবুও এই আত্ম সমালোচনা জিলা কমিটির সমষ্টিগত আত্মসমালোচনা হিসাবে দেওয়া গেল না কারণ প্রথমত ডি. সির সমষ্টিগত চিন্তাধারার অভাব। দ্বিতীয়ত ডি.সি.-র আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্ট ইতিমধ্যে ছাপা হতে শুরু হয়ে গেছে—এই সময় ২ জন ডি. সি. এম. বাইরে চলে গেছেন, যারা আছেন তারা সেই কজন মিলে এই আত্মসমালোচনার সমষ্টিগত দায়িত্ব নিতে রাজি নন। ফলেই এই আত্মসমালোচনা আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও যেটুকু বুঝেছি তার ভিত্তিতেই উপস্থিত করছি। বর্তমানে এই আত্মসমালোচনা বহুলাংশে ত্রুটিপূর্ণ হবে তবুও আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্ট উপস্থিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই উপস্থিত করছি। কমরেডরা, এই রিপোর্টের

সমালোচনা ও আলোচনা করে আমার নিজের ও ছাত্রফ্রন্টের ভুলের গুরুত্ব, তার উৎস এবং আমাদের করণীয় কার্যকলাপের সঠিক নির্দেশ উপস্থিত করতে পারবেন।

যখন থেকে এই জিলা কমিটি গঠিত হয় তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত ছাত্রফ্রন্টে প্রকৃত পক্ষে জেলা কমিটির সমষ্টিগত কোন রাজনৈতিক অথবা সাংগঠনিক নেতৃত্বের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অন্যান্য ফ্রন্ট যেমন শ্রমিক-ফ্রন্ট সম্বন্ধে হয়ত কখনও কখনও সমষ্টিগত ভাবে আলোচনা করা হতো। কিন্তু ছাত্রফ্রন্টের রাজনৈতিক অথবা সাংগঠনিক কোন সমস্যা নিয়েই কখনও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা হয়নি। অত্যন্ত দায়িত্বহীন ভাবে ডি, সির একজনের উপর এই ফ্রন্টের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের কমিউনিষ্ট দায়িত্ব পালন করতেন। শ্রমিক ফ্রন্ট সম্বন্ধে কখনও কখনও ভাবা হতো তার কারণ কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, তার উপর এটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেও যে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণি দিয়ে বিপ্লব হয় না প্রয়োজন হয় জনতার অন্যান্য অংশের সহযোগী মিত্রের— এই চেতনাটুকুও না থাকার ফলেই ছাত্রফ্রন্ট সম্বন্ধে ডি.সি.-র দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে পড়েছিল চরম সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। যদিও পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সর্ব নিম্ন কমিটি পর্যন্ত এই একই কায়দায় চলত। তার জন্য ডি, সির দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না কারণ কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব জনতার সচেতন অগ্রগামী অংশের নেতৃত্ব তাই বিচ্যুতির দায়িত্বের সংখ্যাগত পার্থক্য হতে পারে কিন্তু কোন মৌলিক পার্থক্য করা সম্ভব নয়। এমন কি ডি সির পক্ষ থেকে যে ডি সি এম ছাত্রফ্রন্টের ভার প্রাপ্ত থাকতেন তিনিও প্রকৃত পক্ষে নিজস্ব কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতেন না। বা দিতে পারতেন না। তার কাজ ছিল পি. সি'র পক্ষ থেকে ডি. সি'র কায়দাতেই যার উপর ছাত্রফ্রন্টের ভার থাকত (কমরেড নন্দন) তার রাজনৈতিক নেতৃত্বে অন্ধ সমর্থন জানিয়ে তাকে কার্যকরী করার জন্য কিছু দৈহিক পরিশ্রম করা। এটা আরো পরিষ্কার হবে যখন দেখা যাবে আমি একই সময় ডি. সি. সভ্য ও প্রাদেশিক ফ্রাকশন সভ্য অর্থাৎ প্রাদেশিক ফ্রাকশনের সভায় কমরেড নন্দনের নেতৃত্বে যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো তাই ডি. সি'র পক্ষ থেকে কলকাতা ছাত্র ও ছাত্রী টীম মারফৎ কার্যকরী করার চেষ্টা করতাম। এই সমস্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়ত কখনও ডি. সি'কে জানাতাম কখনও জানাতাম না। কারণ জানান না জানান দুই-ই সমান ছিল, যেহেতু ডি. সি. স্বাধীনভাবে আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু ভাবা ত দূরের কথা এই সমস্ত সিদ্ধান্তের উপর কখনও সমষ্টিগত অভিমত জানাতো না মৌখিক সমর্থন অবশ্য সব সময়ই জানাতেন।

তা হলে কলকাতা ছাত্রফ্রন্টে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব আসতো কোথা থেকে? এই নেতৃত্ব মূলত এসেছে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে কখনও সরাসরি কখনও নিখিল ভারত ছাত্রফ্রাকশন মারফৎ। এমন কি প্রাদেশিক কমিটিও বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে কখনও রাজনৈতিক ভাবে চিন্তা করেননি। তারা কেন্দ্রীয় কমিটি ও নিখিল ভারত ছাত্রফ্রাকশনের নেতৃত্বের সঙ্গে বাংলাদেশের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফেটে পড়া জোয়ারও অতিরঞ্জিত চিত্র দিয়ে তাকে আরও সংকীর্ণতাবাদী করে তুলেছে। ডি. সি. আবার এই নেতৃত্বের অন্ধ সমর্থন জানিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে।

পার্টির এই রাজনৈতিক নেতৃত্বের আসল চেহারা কি? দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে আমাদের বৈপ্লবিক স্তর ও করণীয় কার্য সম্বন্ধে অনেক সঠিক কথা বলার

সঙ্গে কতগুলি মারাত্মক বিচ্যুতি আন্তর্জাতিক অবস্থার ভুল বিচার। বিপ্লবের স্তরকে ভুল করে দেখানো গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের আসল চেহারা উপস্থিত করতে না পারার মত বহু মারাত্মক বিচ্যুতির উৎস পার্টির রাজনৈতিক প্রস্তাবে থেকে যায়। পরে পি. বি'র নেতৃত্বে সমগ্র পাটিকেই মারাত্মক ট্রট্স্কীবাদী রাজনৈতিক ও টিটোবাদী সাংগঠনিক অবস্থার মধ্যে নিয়ে যায়। এই রাজনৈতিক প্রস্তাবেই ছাত্রফ্রন্টের করণীয় কার্য এই অংশে একটি পুরোপুরি ট্রট্স্কীবাদী রাজনৈতিক লাইন উপস্থিত করা হয়। সেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয় বর্তমান বৈপ্লবিক স্তরে ছাত্রদের কাজ স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করা। সেখানে আরও বলা হয় বর্তমান শ্রেণি সংগ্রামের এই মুহূর্তে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অমূলক ভয়ে যারা জঙ্গী সংগ্রামে ডাক দিবে ও যারাই শ্রমিক শ্রেণি বিরোধী ঝোঁকের প্রকাশ করবে তাদেবি মুখোস খুলতে হবে। এবং সর্বপরি আমাদের দায়িত্ব সমস্ত রকম বুর্জোয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনকে সংগঠিত করা। রাজনৈতিক প্রস্তাবের এই নেতৃত্ব আরও সংকীর্ণতার চেহারা নিয়ে প্রকাশ পেলো যতীনের আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্টে। এই রিপোর্টে আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমস্ত সংগ্রামের ঐতিহ্য ও শিক্ষাকে সংস্কারবাদী বলে অস্বীকার করা হলো। এখানে আরও এক পা এগিয়ে এসে শ্লোগান দেওয়া হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এইস্তরে সমাজতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন ছাত্রদের একমাত্র সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান ছাত্রফেডারেশনের পতাকা তলে সমবেত করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্তরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিলে ছাত্র সমাজের সমস্ত অংশ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে না এই আওয়াজের অর্থ দাঁড়ায় কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন ছাত্রদের একটি ভগ্নাংশ অংশগ্রহণ করবে এবং এই সংগঠনও হবে এই ভগ্নাংশেরই। কেন্দ্রীয় কমিটি ও নিখিল ভারত ছাত্র ফ্রাকশনের এই রাজনৈতিক লাইনের উপর ভিত্তি করেই বাংলা পি. সি. আরও মারাত্মক রাজনৈতিক লাইন উপস্থিত করলেন। ১নং ছাত্র সংগঠন স্কুল কলেজে গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম রাখ, এই প্রবন্ধে লেখা হলো বর্তমান অবস্থায় সংগ্রামের প্রাথমিক অবস্থায় কতজন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করলো সেটা বড় কথা নয়। আমরা যদি জঙ্গী সংগ্রামের কায়দায় অগ্রগামী অংশের ভূমিকা পালন করতে পারি তবেই জনতাকে এই সংগ্রামে টেনে আনতে পারবো। জনতার সংগ্রামের মূলভিত্তি জনতার একতা নয়—জনকয়েক পার্টি সভ্য ও দরদীর জঙ্গী কার্যকলাপ। পরবর্ত্তীকালে এই রাজনৈতিক লাইন সমগ্র পার্টিকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, বাস্তব অবস্থা থেকে শিখতে অস্বীকার করতে শিক্ষা দিয়েছে, অবশেষে পার্টিকে একটি সন্ত্রাসবাদী গ্রুপে পরিণত করেছিল। এই সমস্ত রাজনৈতিক লাইন চরম রূপ নিল পি. বি'র ছাত্র সংগ্রামের উপর দলিলটিতে, সেখানে রাজনৈতিক লাইন হিসাবে একমাত্র জঙ্গী সংগ্রামের আহ্বান ও তাই পরিচালনা করা একমাত্র কর্ত্তব্য বলে বলা হলো। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যেখানেই পি, বি লাইনের যে কোন বকম বিরোধিতা হবে তাই সংস্কারবাদ এবং পার্টি থেকে এখুনি এই সংস্কারবাদীদের বিতাড়িত করতে হবে। একদিকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এই মারাত্মক রাজনৈতিক লাইন চালু করার নির্দেশ দেওয়া হলো তারই পাশাপাশি আবার দক্ষিণ বঙ্গের মুক্তি সংগ্রাম, শহরের বুকে শ্রমিক শ্রেণির সশস্ত্রাভ্যুত্থানের পথে বাধা হিসাবে দেখানো হতে লাগলো। এই জঙ্গী সংগ্রামের প্রতি আমাদের বিমুখতা। কলকাতা জিলা কমিটি এই লাইনের রচয়িতা অবশ্যই নয় কিন্তু তাঁরা এই লাইনে পুরাপুরি ভাবেই বিশ্বাসী ছিলেন এবং যে ভাবে সম্ভব চালাবার

চেষ্টাও করেছেন। যেহেতু এই লাইনকে তাঁরা আক্রান্ত বলে ভাবতেন এবং বাস্তব অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে পার্টির সার্কুলারই একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় বলে মনে করতেন তাই কখনও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পার্টি লাইনকে মিলিয়ে বিচার করার চেষ্টা করে নি। বরং যখন ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা বাড়তে থাকলো তখন তার কারণ হিসাবে আমাদের সংগ্রাম বিমুখতা ও সংস্কারবাদী বিচ্যুতিকেই দায়ী বলে আত্মসমালোচনা করা হতো। ফলে জঙ্গীবাদ আরও বাড়তে শুরু করলো। একথা অবশ্য ঠিক মূলত আমাদের ভুলের উৎস বৈপ্লবিক স্তরের বিচারে অসমর্থ হওয়ার ফলেই হয়েছে কিন্তু জঙ্গীবাদী অতিবিপ্লবী কার্যকলাপ বাড়ার মূলে আরও ছিল বাস্তব অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করা।

পুনর্গঠিত জেলা কমিটির সামনে প্রথমেই পড়ে ২৭শে-২৮শে এপ্রিলের জেলের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে কলকাতার বুকে মহিলা ও ছাত্রদের সংগ্রাম। এই সংগ্রামের সময় ডি, সির একমাত্র নেতৃত্ব ছিল জঙ্গী সংগ্রামের জন্য মাল মসলা জোগান দেওয়া। রাজনৈতিক কোন বক্তব্য বা তার লাইন সম্বন্ধে প্রাদেশিক কমিটি যা বলে তাই অভ্রান্ত বলে ধরা যায়। কিন্তু ২৭শে এপ্রিল ৪ জন মহিলা কমরেড নিহত হওয়া সত্ত্বেও কেন ছাত্রদের ধর্মঘট হলো না সে বিষয়ে ডি, সি একবারও ভাবলো না। তারা তখন ছাত্র ফ্রন্টে সংস্কারবাদী বিচ্যুতি উচ্ছেদ করার জন্য ছাত্র ফ্রাকশনের পুনর্গঠনের কাজ হাতে নিয়েছেন। পি, সির পক্ষে কমরেড নন্দন ও ডি, সির পক্ষে কমরেড সমীরণের নেতৃত্বে এই সময় কলকাতা ছাত্র ফ্রাকশন পুনর্গঠন করা হয়, সেখানে পুরাপুরি আমলাতান্ত্রিক উপায় গ্রহণ করা হয়। কারণ আমাদের রাজনৈতিক লাইন গণ-সংগঠনের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না অতএব গণসংগঠনের নেতৃত্বের জন্য গণসংগঠনের আস্থাভাজন নেতৃত্বের প্রশ্নই উঠে না। গণসংগঠনের নিজস্ব স্বাধীন সম্প্রতিও তাই গণসংগ্রামের জন্য ব্যাপক ছাত্রদের জমায়েত করার মত প্রয়োজনীয় রাজনীতিকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র পার্টি লাইনকে চালু করার জন্যই পার্টি যাদের এই সংকীর্ণতাবাদী নীতি চালু করার উপযুক্ত মনে করেছে তাদের নিয়েই ফ্রাকশন গঠন করা হলো। গণসংগঠন সম্বন্ধে ডি, সির ধারণা এর চাইতে কোন সময়েই অদল বদল হয় নি। ফলে গণসংগঠনের কাজে কি ভাবে ফ্রাকশনকে পরিচালনা করা যায় সে কথা কোনদিনই ভাবা হয় নি। গণসংগঠনের, সভ্য সংগ্রহ তার টাকা তোলা, ব্যাপক গণজমায়েতের উপযোগী দাবির ভিত্তিতে সংগ্রামকে সংগঠিত করার চেষ্টা কোন সময়েই করা হয় নি। যতদিন গেছে ততই এই অবস্থা বেড়েছে। ইনফরমেশন ব্যুরোর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আসার ঠিক আগে আমাদের গণসংগঠনের কোন অস্তিত্ব একেবারেই ছিল না। আমাদের অতি জঙ্গীপনা একদিকে কমিউনিষ্ট ছাত্রদের সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে তার পাশাপাশি সরকারকে গণসংগঠন পর্যন্ত বেআইনি করে দেওয়ার সমস্ত রকম সুযোগ করে দিয়েছে। এপ্রিল মাসে এই ফ্রাকশন পুনর্গঠনের সময় থেকে এই নীতি কার্যকরীভাবে চালু করা হলো আর তার শেষ করা হয় গণসংগঠনের সমাধি রচনা করে।

এপ্রিল মাসের পর ছাত্র ফ্রন্টে বিভিন্ন সময় যে সমস্ত সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছে— আগেই বলা হয়েছে কোন সময়ই তার রাজনৈতিক প্রস্তুতিতে ডি, সির কোন অংশ ছিল না। একথার অর্থ মোটেই নয় যে ডি. সি. ঐ সময়কার বিচ্যুতির জন্য দায়ি নয়। বরং তাদের এই নিষ্ক্রিয়তাই একদিকে ঐ বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদের প্রতি অচলা ভক্তি এবং সেই থেকে জনতার সংগ্রামের প্রতি দায়িত্বহীন মনোভাবকেই প্রকাশ করে। এই সময় স্কুল কলেজ বন্ধ থাকার ফলে

ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তখন দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচন, রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্মঘট প্রভৃতি জনসাধারণের বিশেষত ছাত্র সাধারণের সরকার বিরোধী বিক্ষোভকে এক নূতন পর্য্যায়ে নিয়ে যায়। এই সময় জনতার বিক্ষোভ এতদূর ব্যাপকতা লাভ করেছিল যার ফলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমস্ত বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বে এক গণফ্রন্ট গড়ে উঠে ও কংগ্রেসকে পরাজিত করে—ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ ছাত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার কার্যে অংশগ্রহণ করে। এই অবস্থা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল—জনতার সংগ্রামের উৎস তার একতা এবং এই একতার শক্তি কত ব্যাপক। কিন্তু আমরা তা না দেখে বড় করেই দেখলাম কংগ্রেসের সম্বন্ধে মোহমুক্তি সমাপ্ত—অতএব সশস্ত্র উপায়ে এই সরকারকে উচ্ছেদ কর। কিন্তু এর ফলে জনতার একতা রক্ষার চেষ্টা না করে কংগ্রেসী নেতাদের বাড়িতে হামলা কর প্রভৃতি অতি জঙ্গী শ্লোগান দেওয়া হলো! ফলে ঐ সময়কার একতার শক্তিকে আরও সংগঠিত না করে নষ্ট করেছি। যা আরও নগ্নভাবে ধরা পড়লো জুলাই মাসে নেহেরুর কলকাতায় আসার উপলক্ষ্যে। জনতার সরকার বিরোধী মনোভাবের সঠিক অবস্থা বুঝে তাকে আরও উচ্চ পর্য্যায়ে নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা না করে আমরা খুনী নেহেরু সরকারের উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ, পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের ডাক দিলাম—ছাত্রসাধারণ একতাবদ্ধ ভাবে যতটা তাদের বিক্ষোভ দেখানো যায় ঠিক ততটা অর্থাৎ ধর্মঘট পর্য্যন্ত করলো কিন্তু তারপর আর অগ্রসর হলো না কিন্তু আমরা আমাদের মুষ্টিমেয় কর্মী নিয়ে "সশস্ত্র প্রতিরোধের" পথে অগ্রসর হতে যেয়ে কেবল শক্তি ক্ষয় ও জনতা থেকে বিচ্ছিন্নতাই বাড়ালাম। এই সমস্ত সংগ্রামের মধ্যে বাস্তব অবস্থা যে শিক্ষা দেয় তা গ্রহণ না করে বরং একেবারে উল্টো পথই গ্রহণ করা হলো। এরই ফলে যখন ২৫শে অগষ্ট সারা বাংলা ব্যাপী ছাত্রদের দাবির ভিত্তিতে ১ লক্ষ ছাত্রদের বিরাট ধর্মঘট সংগঠিত হলো তখন সেই ধর্ম্মঘটের কারণ কি, তাকে আরও ব্যাপক করার চেষ্টা না করে জনতার বিপ্লবী সংগ্রামের সমর্থনের নামে ঐ দিনের ছাত্রশোভাযাত্রা ক্ষেত-মজুর সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাতে যাওয়া হলো—কারণ আমাদের মাথায় তখন সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গের মুক্তির চিন্তা এবং যে কোন সংগ্রামই আজ এই মুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবী শৃঙ্খলের অংশ বলে মনে হচ্ছে। তাই আমাদের কাছে ছাত্রদের দাবির ভিত্তিতে সংগ্রাম বড় কথা নয়, মুক্তি সংগ্রামের জন্য যে কোন রকমে শহরের বুকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানই বড় কথা।

আমাদের মারাত্মক বিচ্যুতি ছাত্র সাধারণের প্রতি চরম অবজ্ঞা সত্ত্বেও অর্থনৈতিব সংকটের তীব্রতা সেপ্টেম্বর মাসে সারা কলকাতায় সমস্ত ছাত্র সমাজকে এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্যে টেনে নিয়ে এলো। এই ব্যাপক গণছাত্র সংগ্রাম যখন নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধাপে ধাপে আরও ব্যাপক আকার ধারণ করছে; ছাত্রদের সমস্ত অংশ কোথাও অর্থনৈতিক কোথাও রাজনৈতিক দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনে একতাবদ্ধভাবে নেমে আসছে ও যার সম্ভাবনা আরও ব্যাপকতার দিকে ঠিক তখন আমাদের সংকীর্ণতাবাদ এই সংগ্রামের অগ্রগতি ব্যাহত করে দিল। একথা সবসময়ই ঠিক যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম উচ্চ পর্য্যায়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের চেহারা গ্রহণ করে। কিন্তু তার কতকগুলি স্তর আছে! এক কথায় মূল দাবির ভিত্তিতে অন্যান্য দাবি জড়িত হয়ে সংগ্রামের চরিত্রে ভিন্ন রূপ আনে। কিন্তু মূল দাবি কোন সময়ে উপেক্ষা করা চলে না—আর তা করার অর্থ সংগ্রামকে পিছন থেকে ছুরি

মারা— সেপ্টেম্বর ছাত্র ধর্ম্মঘটে এই কাজই করা হল। ডি.সি.-র পক্ষ থেকে যে ইস্তাহার দেওয়া হল তাতে বিধান মন্ত্রীসভার উচ্ছেদ কর বলা হল কিন্তু বলা হল না ছাত্রদের সংগ্রামের ভিত্তি সেই সময়কার মূল দাবির কথা, তার উপর অন্যান্য সমস্ত বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলিকে বিশ্বাসঘাতক, সংগ্রাম বিমুখ প্রভৃতি বলে ছাত্র ঐক্যকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করা হল। এর ফলে যে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তাকে একটা বাড়তি অবস্থায় থেমে যেতে সাহায্য করা হল। এই অবস্থায় আমরা যদি ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার চেহারা ছাত্রসমাজের কাছে উপস্থিত করতে পারতাম তা হলেই ছাত্রসমাজ সঠিক পথে আন্দোলনের একটা ধারা পেতো—তা না হওয়ার ফলে পরবর্ত্তী সময়ে ছাত্রদের কাছে চরম বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও এমনকি অর্থনৈতিক সংগ্রামের ডাক নিরর্থক বলে মনে হয়েছে। তবুও নভেম্বর মাসে আবার ছাত্র ও শিক্ষকদের মিলিত আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলো কিন্তু এবারেও তাদের দাবির ভিত্তিতে সংগ্রামকে সংগঠিত ও প্রসারিত করার চেষ্টা না করে বলা হল এই সংগ্রামের লক্ষ্য বিধান মন্ত্রীসভার উচ্ছেদ করা। দক্ষিণ বঙ্গের মুক্তি সংগ্রামের পরিপূরক হিসাবে পরিচালনা করা। স্বভাবতই এই শ্লোগানের চাইতে তাদের নিজস্ব দৈনন্দিন জীবনের দাবি তাদের কাছে অনেক বেশি সত্য—তাই সেই দাবি বাদ দিয়ে আমাদের দাবি যতই বিপ্লবী শোনাক না কেন কার্যত তা কোনক্রমেই ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনতে পারলো না। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের বিচ্ছিন্নতা যত বেশি বাড়তে শুরু করলো জঙ্গীবাদের প্রতি মোহও ততই বেড়ে চললো কারণ যেহেতু আমরা জঙ্গী সংগ্রাম আরও দৃঢ়তার সঙ্গে পরিচালিত করতে পারছি না তাই জনতাকেও টানতে পারছি না। ফলে এই অবস্থার মধ্যে যে কোন ইস্যুই আসুক না কেন প্রচার পোষ্টার অর্থাৎ সাধারণ ছাত্রকে সে বিষয়ে সচেতন করার সমস্ত পথ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র যেমন করে পারো রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই বাধাও এই আওয়াজ তোলা হল। তাই যখন জানুয়ারি মাসে আবার রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন ধর্মঘট করছে তখন তাদের সমর্থনে প্রচার প্রভৃতি সমস্ত কাজকে ছোট করে কেবলমাত্র ঢালা হুকুম জারি করা হল— রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তোল, নির্ম্মম প্রতিশোধ লও—ফলে এই ব্যারিকেড তুলতে আর নির্ম্মম প্রতিশোধ নিতে পাওয়া গেল আমাদের মুষ্টিমেয় কর্মীদের আবার তারও সংখ্যা রোজই কমতে লাগলো।

এই অবাস্তব রাজনীতি যেমন পার্টিকে একটি সন্ত্রাসবাদী চক্রে পরিণত করল আবার এই ধরনের রাজনৈতিক লাইন সাংগঠনিক ক্ষেত্রে পার্টিকে একটি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া সংগঠনে পরিণত করলো। কারণ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে থাকার ফলে সাধারণ কর্মীরা যখন আমাদের রাজনৈতিক লাইন ও জঙ্গীনীতির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছে তখন কেবলমাত্র নিয়মশৃঙ্খলা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয় দেখিয়ে ছাড়া তাদের দিয়ে এই নীতি চালু করা সম্ভব নয়। তাই যখনই সাধারণ পার্টি সভ্যরা সন্দেহ ও প্রশ্ন তুলেছেন সংস্কারবাদী ও ভীরু আখ্যা দিয়ে তাদের স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এই আমলাতান্ত্রিকতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা নিচের কয়েকটি ঘটনা থেকে বুঝা যাবে। সেপ্টেম্বরে ছাত্র ধর্ম্মঘটের সময় ছাত্রী সম্মেলন হয়। ডি. সির পক্ষ থেকে তাদের অতি সামান্যই সাহায্য করা হয় অথচ এই টীমের বয়সকাল তখন অতি সামান্য, মাত্র ১ মাস— এই অবস্থায় সম্মেলন সুস্থ ভাবে করতে না পারায় সমস্ত অপরাধ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ডি. সির পক্ষে কমরেড সমীরণ এই টীমকে ভেঙ্গে দেন।

গঠনও করা হলো ঐ একই উপায়ে, ছাত্রীদের কোন মতামত না নিয়ে কমরেড নন্দন ও সমীরণের ইচ্ছা অনুযায়ী। এর পরে সেপ্টেম্বর সংগ্রামের অব্যবহিত পরে যখন আমাদের ধর্ম্মঘটের ডাক বার বার ব্যর্থ হচ্ছে তখন তার কোন কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা না করে সমস্ত দায়িত্ব তৎকালীন কলকাতা ছাত্র ফ্রাকশনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা অযোগ্য এই অজুহাতে ভেঙ্গে দেওয়া হল ও নূতন ছাত্র ফ্রাকশন গঠন করা হল। স্কটিশচার্চ কলেজের সেল সম্পাদক ও আর একজন কমরেড দক্ষিণ বঙ্গের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে স্কটিশের ছাত্র বিতাড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যোগসূত্র ধরে জঙ্গী সংগ্রামের ডাক দিতে দোমনা ভাব দেখানোর জন্য সাস্‌পেণ্ড করা হয়। মেডিকেল সেল ভেঙ্গে দেওয়া হল, নার্স ধর্ম্মঘটের সংস্কারবাদী মনোভাবের জন্য। যদিও পি. সির নেতৃত্বে এই সেল ভাঙ্গা হয় কিন্তু ডি. সি একবারও এ সম্বন্ধে কোন খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করলেন না। আর-জি-কর সেলের সম্পাদক পার্টির গোপনীয় কাগজপত্র সেল সভ্যদের না দিয়ে বিপদজ্জনক জায়গায় জমিয়ে রাখার জন্য সম্পাদককে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাস্‌পেণ্ড ও সমস্ত সেলকেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তৎকালীন কলকাতা ছাত্র ফ্রাকশনের সম্পাদক কমরেড কান্তি ধরা পড়ার পর সে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর বেশ কিছু দিন পার্টির সাথে সংযোগ রাখেন না। এই সময় শুনা যায় কমরেড কান্তি নাকি পুলিশের কাছে বণ্ড দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন। সাথে সাথেই তার কোন খোঁজ খবর না নিয়েই। ... (*দলিলের ... অংশটি না থাকায় দেওয়া সম্ভব হল না*)

পার্টি শিক্ষা

... (*দলিলের ... অংশটি না থাকায় দেওয়া সম্ভব হল না*) সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার এই মার্কসবাদী লেনিনবাদের প্রতি তাচ্ছিল্যের ফলেই পার্টির মধ্যে ভুলভ্রান্তি ঘটার সুযোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্টির এই সর্বনাশের প্রধান কারণ গোটা পার্টির মধ্যে জ্ঞানের অভাব। এই পার্টি শিক্ষার ব্যাপারে ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকলেও নেতৃত্বের দায়িত্বই সর্বাধিক এবং আমরা জেলা কমিটির নেতারা তা মোটেই পালন করিনি।

জেলা কমিটির কাজ-কর্ম্ম ও ডি, সি, সভ্যদের দায়িত্ব

ডি. সি. পুনর্গঠনের পেছনে যে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ডি. সির কাজ-কর্ম্মের ধারাও নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই চলেছে। এই নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল?

এগুলি, এই যে পুরানো নেতৃত্ব সংস্কারবাদী ও সংগ্রামবিরোধী। সুতরাং এমন লোকদের ডি. সির নেতৃত্বে বসাতে হবে যাঁরা বিনা প্রতিবাদে পি. বির লাইন গ্রহণ করবে এবং জবরদস্তি সহকারে তা চালাবে। ... (*দলিলের ... অংশটির বহুস্থানে বাদ থাকায় অথবা পড়তে না পারার দরুন বাদ দেওয়া হল।*)

এই অতি কেন্দ্রিকতা আবার বিভিন্ন সময়ে ডি. সির মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে থাকলো। সেক্ট যেমন ডি. সিতে পরিণত হলো তেমন আবার সেক্ট-এর মধ্যে যে কমরেড যুক্তিতর্ক ও পার্টির তৎকালীন নীতি পদ্ধতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন, তিনিই আবার সেক্টের কর্ণধার হলেন। কারণ বিভিন্ন ব্যাপারে সেক্টের অন্য সভ্যরা তার উপর নির্ভরশীল হতেন। এইরূপে প্রথমদিকে কমরেড সমীরণের উপরই সেক্ট নির্ভরশীল বেশি ছিল।

তারপর সমীরণ গ্রেপ্তার হওয়ার পর বেশ কিছুদিন সেক্টে ২জন থাকেন। এ সময় তারা সেক্রেটারিয়েট ফাংশনের ব্যাপারে কমঃ ভাস্করের সহায় নিতেন।

কমরেড হামিদ আসার পর এক ডি.সি. মিটিংএ ভাস্কর ছাড়া সমস্ত ডি.সি.এম'রা একবাক্যে ভাস্করের নামে সেক্টের সভ্য হিসাবে প্রস্তাব করলেও পি.সি. হামিদকেই সেক্টের সভ্য হিসাবে মনোনীত করেন। কিন্তু সমস্যা থেকেই গেল। সেক্ট ও ডি.সি.এম-রা পরবর্ত্তী সময় তাদের সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক জ্ঞান ও তৎকালীন অবস্থার চাপে সেক্ট ভাস্করের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনার অর্থ এই নয় যে ডি.সি.-র মধ্যে আমাদের তৎকালীন নীতি ও পদ্ধতি বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের কখনও বিশেষ কোন মতভেদ বা বিরোধ হয়েছে। উক্ত কমরেডদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার অর্থ এও নয় যে অন্যান্য সেক্ট বা ডি.সি. সভ্যরা অন্ধভাবে ঐ কমরেডদের অনুসরণ করতেন। মোটামুটি ভাবে আমরা সকলেই আমাদের নিজ নিজ চেতনা অনুপাতের কার্য্যক্ষেত্রে একমত হয়েই এই নীতি প্রয়োগ করেছি।

যেমন করে হোক সংঘর্ষ লাগাতে হবে—এই যেখানে নীতি ও লক্ষ্য সেখানে গণ-সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই গৌণ হতে বাধ্য। যেখানে গণসমাবেশের প্রয়োজনীয়তা গৌণ সেখানে জনতার দাবিদাওয়া ও তা নিয়ে গণ আন্দোলন ও গণ সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। সমগ্রভাবে ডি.সি. এবং ব্যক্তিগত ভাবে ডি.সি. এমদের কাজ-কর্ম্মও এই ধারায় চলতে থাকলো। যে সব লড়াইয়ে সংঘর্ষের কোন প্রকাশ্য আশু সম্ভাবনা নেই সেই সব লড়াইয়ে সমগ্রভাবে ডি.সি. এবং ব্যক্তিগতভাবে ডি.সি.এম'রা বিশেষ কোন নজর দিতেন না, যেমন— এলবার্ট ডেভিড্, গ্যাস ইত্যাদি। এই একই কারণে বিভিন্ন এলাকা বা শিল্পে আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ডি.সি. কোন সুপরিকল্পিত প্ল্যান নিয়ে কাজ করেন নি। আন্দোলনগত ও সাংগঠনিক অবস্থার পরিপূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে ডি.সি. কখনও আলোচনা করেন নি। ডি.সি.এম'রা নিজ নিজ এলকায় আন্দোলন ও সংগঠনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতেন না। কোন এলাকা বা শিল্প সম্পর্কে সমগ্র ভাবে ডি.সি. কিংবা অন্যান্য ডি.সি. এমরা উৎসুক্য প্রকাশ বা আলোচনা করতেন তখনই যখন কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিত। ফলে একজন অপরের এলাকা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না এবং সমগ্র কলিকাতার আন্দোলনের সম্পূর্ণ ছবি ডি.সি.-র সামনে ছিল না এবং এখনও নেই। এই বিচ্ছিন্নতা এতদূর চূড়ান্ত পর্য্যায়ে এসেছিল যে কমরেড যমুনা ও সমীরণ (ট্রাম, ছাত্র, মেটিয়াবুরুজ ও পোর্ট) ধরা পরার পর উক্ত এলাকা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও জেনে যায়। ট্রামে একটা ইস্তাহার দেবার প্রয়োজন হয় কিন্তু কোন ডি. সি. এমই বলতে পারেন না—ট্রামের দাবি কি? এই একই কারণে ডি. সির আত্মসমালোচনা লেখা এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছে। যিনি যে এলাকা বা ফ্রন্ট দেখতেন তিনি সেই এলাকা ও ফ্রন্ট সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন। কিন্তু তিনি ঠিক কি ভুল বলেছেন অন্য ডি.সি.এম'রা সে সম্পর্কে কোন সুচিন্তিত মতামত দিতে পারেন না।

যে নীতি আমরা কার্যক্ষেত্রে জবরদস্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলাম এই হল কার্যক্ষেত্রে তার ফলাফল। নিচের দিকে এর সাংগঠনিক ফলাফল আরও ভীষণ হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে যেখানে সংঘর্ষই মূল লক্ষ্য সেখানে গণসমাবেশের প্রয়োজনীয়তা কমতে

থাকে। আর গণসমাবেশের প্রয়োজনীয়তা কমার ফলে গণসংগঠন ও পার্টি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও তার অস্তিত্ব ক্রমে ক্রমে লোপ পায়। কারণ আমাদের নীতির পেছনে গণসমাবেশ করাই গণসংগঠন ও পার্টি সংগঠনের মূল কাজ। সেই কাজ যখন ফুরিয়ে যায় তখন এই সংগঠনগুলিও শেকড়কাটা গাছের মত শুকিয়ে মরে। হয়েছেও তাই। আমাদের বামপন্থী হঠকারী নীতির পরিণতি হয়েছে এলাকায় গণ ও পার্টি সংগঠনের বিলোপ। এলাকার পার্টি সংগঠনকে অচল করে দিয়ে ক্রমে ক্রমে তুলে দেবার কাজ তিনটা ধাপে অগ্রসর হল।

প্রথম ধাপ হলো তথাকথিত একশন কমিটি গঠন। পি. সির নির্দেশে বিভিন্ন এলাকায় এল. সি. তুলে দিয়ে এ. সি. গঠন করা হলো। এ. সির পেছনে রাজনীতি কি? প্রত্যেক এলাকার জঙ্গী সংগ্রাম শুরু করা। এলাকার নেতৃত্ব এমন লোকদের হাতে দিতে হবে যারা সহজেই কিছু সংখ্যক লোককে টেনে আনতে পারেন এবং নিজেরা কখনও এই সংগ্রাম থেকে পিছপা হবেন না। পার্টি ও গণসংগঠন মারফত গণসমাবেশের কষ্টসাধ্য পথ ত্যাগ করে জঙ্গী সংগ্রাম শুরু করায় সহজ সাধ্য উপায় হিসাবে এ. সি. গঠন করা হলো। পার্টি সভ্য নয় এমন সমস্ত লোকও এতে থাকতে পারবেন বলে নির্দেশ দেওয়া হলো। অথচ পার্টিগত ভাবে এই সব এ. সি'র উপরই এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হলো। এই ভাবেই পার্টি সভ্য এবং অ-পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে সীমারেখা তুলে দিয়ে পার্টির অস্তিত্ব বিলোপের পথে প্রথম ধাপ এগুনো হল।

ঠিক এইরকম পদ্ধতিতেই আমরা অনেক ফ্রাকশনকে পুনর্গঠন করতে শুরু করলাম। এই সব ফ্রাকশনগুলিই বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার পরিবর্তে আসলে সব কিছুরই নেতা হিসাবে ফাংশন করতে থাকলো। শেষ পর্য্যন্ত সেল গুলির পার্টি পরিচালনায় উদ্যোগ অনেক ক্ষেত্রে এই সব ফ্রাকশনগুলির হাতে চলে এলো। তখন এই এ. সি. ও ফ্রাকশন গঠনের ব্যাপারে নেতৃত্বে যাদের আনা হতো তাদের মাপকাঠি ছিল একমাত্র সাহস ও জঙ্গীপনা। এমনও দেখা গেছে যে দীর্ঘকাল পার্টি সভ্য না হয়েও ফ্রাকশন সভ্য হিসাবে নেতৃত্ব করেছেন। সংস্কারবাদী দোদুল্যমানদের নেতৃত্বে থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা মাফিক এটা করা হয়েছে। যদিও তখন এই সাংগঠনিক জগাখিচুরী ও ঐ ধরনের পুনর্গঠনকে ব্যাঙ্ক মেনে নিতে পারছিলেন না এবং প্রশ্নও তুলেছিলেন। আমরা তা গ্রাহ্য করিনি এবং এড়িয়ে যাই। কারণ আমাদের চিন্তাধারা তখন রয়েছে শহরে সংগ্রামের তীব্রতা বাড়াতে হবে। এ নির্দ্দেশ পি. বি. থেকে পি. সি. পর্যন্ত সকলেই আমাদের দিয়েছেন এবং তা সঠিকভাবে কার্য্যকরী না হলে সমালোচনাও করেছেন। এইভাবেই আমাদের চিন্তাধারার আমলাতান্ত্রিকতা বিকাশ পেতে থাকলো।

পার্টি সভ্যের অধিকার কি তখন পর্য্যন্ত আমাদের অধিকাংশ কমরেডদের (ডি. সি. সভ্য) পরিষ্কার নেই, কারণ তখনও আমরা অনেকে পার্টির গঠনতন্ত্রও পড়ি নি। ঠিক এই অবস্থায় আমরা শিখলাম, পার্টি সভ্যদের 'কড়া নজরে' রাখতে হবে। যারা দোদুল্যমানতা দেখাবে তাদের 'শাস্তি' দিতে হবে। যারা 'সংস্কারবাদী' তাদের নেতৃত্ব থেকে 'হটাতে' হবে। আমরা ট্রাম, ইলেকট্রিক, ছাত্র প্রভৃতি ফ্রাকশন গঠনে চূড়ান্ত আমলাতান্ত্রিকতার পরিচয় দিলাম। ডি. সি. অফিসে বসেই ফ্রাকশন সভ্য কারা হবেন তার নাম আমরাই ঠিক করে দিলাম। এই সব ফ্রন্টের কমরেডদের সাথে কোন প্রকার আলোচনা করিনি। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে গণসংগঠনের ব্যাপারেও এরূপ করা হয়েছে।

বিভিন্ন ডি. সি. এম. নিজেদের খুশী মতই এইসব পুনর্গঠন চালিয়ে গেছেন। যেমন—

রিফিউজি ইউনিটের কমরেডদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মাসীকেই ইউনিট সেক্রেটারী করার জন্য লাল জবরদস্তি করেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া সেলের সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাকে সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে মিটিংএ অন্য সম্পাদক নির্বাচন করার জন্য লাল প্রস্তাব করেন ও তা কার্য্যকরী হয়। এইসব কমিটি গঠনে নেতৃত্ব থেকে অপসারণ ও নেতৃত্বের পর্য্যায়ে উন্নতি করার মধ্যে আরও একটা যান্ত্রিক চিন্তাধারা থাকে, তা হল মধ্যবিত্ত হলেই কাপুরুষ আর শ্রমিক হলেই বিপ্লবী, সুতরাং শ্রমিকদেরই বিভিন্ন পার্টি সংগঠনের মধ্যে নেতা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। একথা অবশ্যই ঠিক যে শ্রমিকদের বেশি বেশি করে দায়িত্বশীল পদে নেবার মত সুযোগ করে দেওয়া এবং তাদের নেতৃত্বে উন্নীত করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেখানে সাধারণ যোগ্যতা ও রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন শ্রমিক ক্যাডারও ছিল না সেখানেও আমরা জোর করে তা করতে গিয়েছি। ফলে সেই সব কমিটির পরিচালনায় যথেষ্ট দুর্বলতা দেখা গেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ফাংশন করেনি।

দ্বিতীয় ধাপ হলো এলাকার জি. বি. মিটিংএ এলাকার আন্দোলন ও সংগঠনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি। এই পদ্ধতি গ্রহণের ফলে সেলগুলি আর ফাংশন করেনি, সেলের স্থান গ্রহণ করল এলাকার জি. বি. মিটিং। তৃতীয় ধাপে এলাকার জি. বি. মিটিংএর ব্যবস্থাও তুলে দেওয়া হল। তার স্থান গ্রহণ করলো বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিদের (তাও আবার নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়, ডি. সি. কর্ত্তৃক মনোনীত) যুক্ত বৈঠকে। এই পদ্ধতি যখন নেওয়া হল তখন এলাকার নিজস্ব দৈনন্দিন আন্দোলন বলে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নেই। সবটাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় ক্যাম্পেন যা কোন ফাঁক না দিয়েই একটার পর একটা গ্রহণ করা হতো। এইসব এলাকা প্রতিনিধিদের সভায় একটা কেন্দ্রীয় প্রোগ্রাম এবং তা কোন এলাকার কি ভাবে প্রযুক্ত হবে তার মোটামুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো।

এইভাবে কলিকাতা জেলার সংগঠনের কাঠামো দাঁড়ালো। ডি. সি. সেক্ট, ডি. সি. এম. তার নীচে এলাকা প্রতিনিধিদের সভ্য, অর্থাৎ এক দল মবিলাইজার এবং তার নীচে পার্টি সভ্য ও জনতা। পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো, সেল, ফ্র্যাকশন, ইত্যাদি নামে না হলেও কার্য্যত তুলে দেওয়া হলো। রাজনীতি ক্ষেত্রে যে পন্থা আমরা অনুসরণ করেছিলাম সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এই হলো তার অবশ্যম্ভাবী ও একমাত্র ফলাফল।

শুধু এলাকার গণ ও পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রেই নয় ডি. সির বিশেষ বিশেষ ফাংশন যেমন টেক, লিট, স্পেশাল, ইত্যাদির বেলাতেও কাজের এই ধারা প্রকাশ পেয়েছে। এই পদ্ধতির মারাত্মক প্রকাশ পেয়েছে টেকের বেলায়। গোপন পার্টির কর্ম্ম ও হাত-পা যে টেক্ সংগঠন তাকে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং ব্যবহার করা হয়েছিল একইভাবে। কোন কোন শক্ত ব্যাপক টেক্ সংগঠন গড়ে তোলার নজর যেখানে নেই এবং সস্তায় ও অনায়াসে কাজ সারার ঝোঁকই যেখানে প্রধান সেখানে এরকম হতে বাধ্য। টেকের উপর কোনদিন ডি. সি. মিটিং এ আলোচনা হতো না। টেকের কমরেডরা গণআন্দোলন থেকে সংযোগবিহীন হয়ে থাকার ফলে তাদের মধ্যে অনেকের আবার ইউনিট গত জীবন ছিল না বা নেই। তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচনার ভিত্তিতে দৈনন্দিন ঘটনা বা রাজনীতি শেখাবাব কোন চেষ্টা ডি. সির তরফ থেকে হতো না। ফলে তাদের মধ্যে অনেকে বিক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে বসে গিয়েছেন। কমরেড মল্লিক ও সুখেন সাধারণ ভাবে এই টেক সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন। লাল সেটাকে কার্য্যকরী করতেন। ডি.

সির টেক মেশিনারিকে পি. সি. ইচ্ছামত ব্যবহার করা ও তার ক্ষতিসাধন করার ব্যাপারেও যথেষ্ট পরিমাণে দায়ি। যখন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে ডি. সি'র প্রোডাকশন সেন্টারটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এই প্রোডাকশন সেন্টারটিকে পি. সি. আমাদের কাছ থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়ে নেন। যুক্তি দেখান যে ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পি. সি'র হাতেই থাকা উচিত। অথচ সেই জায়গাটিকে অনাবশ্যকভাবে অনেক পি. সি. এম. কেই চেনানো হয় এবং ৩ মাসের মধ্যেই ৪ জন কুরিয়ারকে বাড়িটি চেনানো হয়। যদিও তাঁরা শেষদিকে ডি. সি. কে প্রোডাকশন সেন্টার ফিরিয়ে দেন কিন্তু আজ আর তা ব্যবহারের কোন উপায় নেই।

যাই হোক ডি. সি'র এই ধরনের ফাংশনের সাধারণ পরিণতি হলো একদিকে র‍্যাঙ্ক থেকে বিচ্ছিন্নতা ও অপর দিকে র‍্যাঙ্কের মত ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে নেতৃত্বের নির্দেশের সঙ্গে সংঘর্ষ। সেল ইত্যাদি ফাংশন করলে এবং ফাংশনের সাথে ডি. সি. জড়িত থাকলে র‍্যাঙ্কের মতামত ডি. সি. সহজেই জানতে পারত। কিন্তু পার্টির যে সব ফর্ম্ম মারফত র‍্যাঙ্কের মতামত ও মনোভাব প্রকাশিত হয় ও ডি. সি'র কাছে আসে—সেইসব ফর্ম্ম আমরা তুলে দিলাম। ফলে স্বভাবতই র‍্যাঙ্কের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সাধারণ চ্যানেলও বন্ধ হয়ে গেল। তাছাড়া র‍্যাঙ্কের মতামতকে বিশেষ কোন মূল্যও আমরা দিতাম না। আমাদের সঙ্গে যাদের মতের মিল হতো না তাদের হয় সংস্কারবাদী না হয় ভীরু এটাই আমরা ভাবতাম। সুতরাং যত্নের সাথে তাদের মত শোনার প্রয়োজনীয়তাও আমরা বোধ করতাম না। বরং আমাদের মতটা তাদের দিয়ে মানিয়ে নেওয়ানোটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন সংগ্রাম ও ঘটনার মধ্যে তা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে। এইভাবে চলতে থাকলে র‍্যাঙ্কও নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘাত বাধতে বাধ্য এবং প্রতিপদেই তা বাধতো। র‍্যাঙ্ক নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যেটাকে ভাল বুঝতেন নেতৃত্বের নির্দেশ প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই হতো তার উল্টো। ফলে এইসব নির্দেশ তাদের পক্ষে মানা শক্ত হতো। আমাদের নির্দেশ মানা তাদের পক্ষে যতই শক্ত হতে লাগলো জবরদস্তি করে আমাদের নির্দেশ চালু করার চেষ্টাও হতে থাকলো বেশি করে। এ থেকেই সংগঠনের টিটোবাদী স্বেচ্ছাচার জন্ম নিল ও নিরঙ্কুশভাবে চলতে থাকলো।

এই টিটোবাদী পদ্ধতি চালাবার প্রথম কথা ছিল যাদের সাথে মতের অমিল হবে—তাদেরই সন্দেহ করা ও দায়িত্ব থেকে অপসারিত করা, এলাকা পরিবর্তন করা, এমনকি শেষ পর্য্যন্ত শাস্তি দেওয়া।

যেমন আমরা পল্লবকে ট্রাম থেকে কাশীপুরে বদলি করেছি, কমরেড কাঞ্চন হরতালের বিরোধিতা করায় ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মারপিট সমর্থন করতে না পারায় তাকে বিনা কৈফিয়তে সেক্ট সাসপেণ্ড করেছে। এমনকি সংশ্লিষ্ট সেলের কমরেডদের মতামত নেওয়াও প্রয়োজন মনে করেন নি। টিটোবাদী কায়দার আর একটি অঙ্গ হলো মতের অমিল হলে জবরদস্তিমূলক ভাবে শৃঙ্খলার ডাণ্ডা দিয়ে—উচ্চতর কমিটির ক্ষমতার অপব্যবহার করে—তাকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া বা ম্যাণ্ডেট দেওয়া, না মানলে শাস্তি দেওয়া। ৭ই জানুয়ারি অনশন বন্দীদের সমর্থনে সভা শোভাযাত্রার প্ল্যানের বিরোধিতা করার দরুন মার্কেনটাইল কমরেড ভবানন্দ ও কুমারকে—ডি. সি. অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাসপেণ্ড করেন। অবাধ্যতার জন্য ফ্রাকশনকে ভেঙ্গে দিয়ে তার স্থানে নূতন ফ্রাকশন মনোনীত করে দেওয়া হয়। এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে ডি. সি. সিদ্ধান্ত নিলেন অথচ শাস্তি দেবার আগে সেই কমরেডদের

বক্তব্যও শোনা হল না।

কমরেড বিজয়কে সর্বক্ষণের কর্ম্মী থেকে আংশিক সময়ের কর্ম্মী করে দেওয়া হল। যে মিটিংএ এ সিদ্ধান্ত হয়—সে মিটিংএ কমরেড সুখেন ও মল্লিক ছিলেন এবং সেটা তারা অনুমোদনও করেছিলেন। যদিও পরে চারিদিকের অবস্থার চাপে আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরে তাকে পুনরায় সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী করার সিদ্ধান্ত করেছিলাম কিন্তু পরে আর তিনি সর্বক্ষণের কর্ম্মী হতে রাজী হন নাই।

পার্টি সার্কুলার ও কাগজপত্র সেল কমরেডদের না দেওয়া ও দীর্ঘদিন যাবৎ কাগজপত্র বিপজ্জনক জায়গায় ফেলে রাখার জন্য ডি. সি. সেক্রেটারিয়েট কারমাইকেল কলেজ ইউনিটের সেল সেক্রেটারীকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাসপেণ্ড করেন ও গোটা সেলকে ভেঙ্গে দেন। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমরেডদের মতামত শোনা হয় নাই। অবশ্য যে কাজ তারা করেছিলেন তা পার্টির নিরাপত্তাকে বিপন্ন ও পার্টি সভ্যদের অধিকারকে সংকচিত করারই সামিল ছিল। এজন্য দায়ি কমরেডকে শাস্তি দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু আমরা যা করেছি, তা কোন ক্রমেই সমর্থন যোগ্য নয়। শৃঙ্খলা সম্পর্কে আমাদের একটা যান্ত্রিক ধারণা দেওয়া হয়েছিল যা আমরা পরে পুরোপুরি গ্রহণ করেছি। অথচ আমাদের কখনও মনে হয়নি কমিউনিষ্ট পার্টিতে ডাণ্ডা মেরে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব নয়, র‍্যাঙ্কের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও সেই অধিকার পালন মারফত র‍্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয় একমাত্র তখনই নেতৃত্বের সেই সিদ্ধান্ত র‍্যাঙ্ক স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারেন এবং পার্টির মধ্যে স্বেচ্ছামূলক ও দৃঢ় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু ডি. সি. নেতৃত্ব র‍্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের মন গড়া ধারণা মাফিক সিদ্ধান্ত নিতেন এবং সেই সিদ্ধান্ত গায়ের জোরে এবং শৃঙ্খলার নামে র‍্যাঙ্কের উপর চাপাবার চেষ্টা করতেন। ফলে নেতৃত্বের নির্দেশের সাথে র‍্যাঙ্কের অভিজ্ঞতার সংঘাত ক্রমেই বাড়তে থাকে। এ ব্যাপার আমাদের অপরাধের গুরুত্ব অসীম কিন্তু এ ছাড়া আরও এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে যেগুলিকে অন্যায় হিসাবে বুঝতে পারা সত্ত্বেও পি. সি'র হস্তক্ষেপ ও চাপের ফলে আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং বিশেষ কোন প্রতিবাদও করিনি। এ ক্ষেত্রে উচ্চতর কমিটির 'অবদানে'র উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। যেমন বলা যেতে পারে মেডিক্যাল কলেজের নার্সদের ধর্ম্মঘটের সময়কার কথা। ধর্ম্মঘটি নার্সদের সংখ্যা ৪০ জন থেকে যখন ৩/৪ জনে এসে দাঁড়ালো, তখন কমরেড অবিনাশ ধর্মঘট প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়ায় কমরেড মল্লিক প্রাদেশিক মহিলা নেতৃদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আমাদের সাথে আলোচনা না করেই তাকে সাসপেণ্ড করেন। এ ব্যাপারে চন্দ্র ও লালের সাথে কমরেড মল্লিকের মতভেদ হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতাল ইউনিটকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রাদেশিক মহিলা নেতৃবৃন্দের হাতে। এই ধর্ম্মঘটে মেডিক্যাল ছাত্রদের জমায়েত করতে ব্যর্থ হয়ে মেডিক্যাল ছাত্রমহল তৎকালীন নীতির সমালোচনা করায় পি. সি. তাদের সেলকে ডি. সি'র কোন অনুমোদন না নিয়েই ভেঙ্গে দেয়। কমরেড সুনীতিকে জেল গেটে 'সাহসের' সাথে নেতৃত্ব দিতে না পারায় পি. সি. তাকে তৎকালীন দায়িত্ব থেকে সরিয়ে টি ইউ. সি. অফিসে বসান এবং পরে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান।

পি. সির তরফ থেকে কমরেড সুখেনের নির্দেশে আমরা পটারীর একজন কমরেডকে ...ও চারুচন্দ্র কলেজের একজন ছাত্রী কমরেডকে ...'অনন্ত সিং এর সাথে যোগাযোগ রাখার

অভিযোগে পার্টি থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন করে রেখেছি। অথচ পরে প্রমাণিত হয়েছে যে তারা নির্দোষ ছিলেন।

একথা ঠিকই যে টিটোবাদী কায়দায় সংগঠন চালানোর ফলে আমরা পার্টির অপূরণীয় ক্ষতি করেছি এবং কিভাবে করেছি তারও উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটা কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কলকাতায় ক্ষতির পরিমাণ এত অধিক হওয়ার কারণ কি? পূর্ব্বোক্ত কারণ ছাড়া আরও একটি কারণ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং আশা করি তা (দুঃখিত পড়া গেল না, তাই দেওয়া সম্ভব হল না।—সম্পাদক) প্রয়োগ করার ক্ষেত্র হিসাবে পি.বি. ও পি.সি. নেতৃত্ব কলকাতাকে ভাল করে বেছে নিয়েছিলেন। পি.সি.পি.বি. মফস্বলের জেলাগুলিকে কিভাবে দেখতেন তা জানা না থাকলেও আমরা দেখেছি যে কলকাতার বড় বড় ফ্র্যাকশন ও বিভিন্ন ফ্রন্টকে পি.সি.এম'রা, নিজেরাই আমাদের সঙ্গে থেকে দেখতেন। প্রতিটি ডি.সি. মিটিং এ তাদের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। যেমন কমরেড সূর্য্য দেখতেন জুট, ইঞ্জিনীয়ারীং, পোর্ট; নন্দন দেখতেন ছাত্র ফ্রন্ট; কমরেড গৌর দেখতেন স্পেশাল ইত্যাদি। এমন কি পি.সি.এম'রা ডি.সি. হেড কোয়াটারে থেকে আমাদের কাজকর্ম্মে সাহায্য করতেন। আমরা স্বেচ্ছায়ই তাহাদের এই সাহায্য গ্রহণ করতাম সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবুও এক কথায় বলা যায় যে কলকাতা শহরকে বামপন্থী কার্যকলাপে প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেবার ফলে এবং পি.বি.পি.সি-র প্রত্যক্ষ পরিচালনার ফলে এখানে ক্ষতি হয়েছে অন্য জায়গার চেয়ে তুলনামূলক ভাবে বেশি। কলিকাতার পার্টি সংগঠন ও গণ আন্দোলন এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য এটাও একটি দিক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন নেতৃত্বের ক্ষতিকর প্রস্তাব বা হস্তক্ষেপকেও আমরা মেনে নিতাম। আমাদের মধ্যে বিনা প্রতিবাদে অনেক ভুল মেনে নেওয়ার দাসমূলক মনোভাবও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এ দাস মনোভাব তৈরি হলো কেন? তার কারণ হলো আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে দাস মনোভাব হতে বাধ্য। উপরের আমলারা তাদের অধীনস্ত আমলাদের যে ব্যবহার করে তারাও আবার তাদের অধীনস্ত আমলাদের সেই ব্যবহারই করে। এ ক্ষেত্রে ঘটনা কতকটা তাই। পি.সি.পি.বি-র তাড়া খেয়ে আমরা র‍্যাঙ্ককে তাড়া মেরেছি। আমরা র‍্যাঙ্কের প্রতি যা করেছি নেতৃত্বও ঠিক সেই ব্যবহার আমাদের উপর করতে পারেন এই ভয় আমাদের মনে দাস মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং প্রথমত ... নিজেদের চেতনা অনুসারে তৎকালীন পার্টি লাইন যতটা বুঝতাম সেই মতো তাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়ত মাঝে মাঝে নিজেদের মনে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ জাগলেও নিজেদের রাজনৈতিক দুর্বলতার দরুণ তা নিয়ে লড়াই করি নি, পি. সি-বা পি. বি, নেতৃত্বের নির্দ্দেশ মেনে নিয়েছি।

যাই হোক, এই ভাবেই আমরা সংগঠনে টিটোবাদ চালিয়েছি। ক্যাডারদের প্রতি দায়িত্ব জ্ঞানহীন ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছি। প্রথম দিকে সমস্ত চিঠিপত্রের জবাব দিয়ে উঠতে পারা যেত না যদিও পরবর্তী সময়ে চিঠিপত্রের অধিকাংশেরই উত্তর দেওয়া হতো কিন্তু তার মধ্যে র‍্যাঙ্কের রাজনৈতিক প্রশ্নের কোন সমাধান বা পরিষ্কারভাবে জবাব দেওয়া হতো না।

ডি.সি. ফাণ্ডের দেখাশুনার ভার প্রথম ছিল সেক্টের উপর কিন্তু ভালভাবে তা দেখা হতো না বলে ফেব্রুয়ারি মাসে ভাস্করের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং একটি ফাণ্ড টিমের মারফত কাজ চালাবার চেষ্টা করা হয়। ডি.সি. সভ্যদের তরফ থেকে নিজ নিজ এলাকার পার্টি সভ্য ও

সমর্থকদের ক্ষমতা দিয়ে টাকা তোলার ব্যবস্থা বা তাদের কোন সাহায্য ডি.সি.এম'রা করতেন না। একমাত্র ভাস্কর ছাড়া অন্য কোন ডি.সি.এম ব্যক্তিগত ভাবে টাকা তুলতেন না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে ডি.সি.এম'রা নিজ নিজ এলাকা থেকে চলে আসার সময় তাদের ব্যক্তিগত কন্টাক্টগুলি স্থানীয় সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তবে ২/১ জন ডি.সি.এম ছাড়া অন্যরা চেষ্টা করলে যে কিছু টাকা ব্যক্তিগত ভাবে তুলতে পারতেন সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। ফাণ্ড তোলার কোন ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ছিল না, খরচ সম্পর্কেও প্রতিমাসে বাজেট করা হতো না।

লিট সম্পর্কে আমাদের মনোভাব ছিল আরও খারাপ। কারণ আন্দোলনে নেতৃত্ব করার জন্য প্রতিটি পার্টি সভ্যকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে বা মতবাদগত ভাবে শক্তিশালী করার জন্য সাহিত্যকে একটি প্রধান হাতিয়ার হিসাবে আমরা দেখিনি। জনসাধারণকে আন্দোলনে টেনে আনার প্রয়োজনীয়তা যেখানে মূখ্য স্থান লাভ করে না সেখানে সাহিত্যের গুরুত্বও উপেক্ষিত হতে বাধ্য। আমরা করছিও তাই। সাহিত্য বিভাগের কয়েকজন কমরেডের উপর আমরা এজেন্সি দিয়ে রেখেছিলাম। ডি.সি.এম'রা নিজ নিজ এলাকা বা ফ্রন্টে কোন সময় সাহিত্যের উপর প্রচার বা তার টাকা পয়সা ঠিকমত আদায় প্রভৃতি করার ব্যাপারে নজর দিতেন না। গোটা জেলায় গণআন্দোলন ও পার্টি সংগঠনের ব্যাপারে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগকে আমরা প্রকৃতপক্ষে কেউই দেখতাম না। প্রচুর টাকা বাকি পড়ে থাকতো এবং পি.সি.-র তরফ থেকে যখন টাকার তাগাদা আসত আমরাও তখন আমলাতান্ত্রিক কায়দায় তাদের চাপ দিতাম। নতুবা টাকার তাগাদা ছাড়া আমরা বিশেষ কোন সম্পর্ক তাদের সাথে রাখতাম না। মাঝখানে পি. সি এই সংগঠনটিকে নিজের হাতে নিয়ে সুষ্ঠভাবে চালাবার এক অবাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আমাদের মধ্যে তখন এ ব্যাপারে অনেকে প্রতিবাদও করেছিলেন কিন্তু তা শোনা হয় নি। যাই হোক তারা শেষ পর্যন্ত আবার সংগঠনটি আমাদের হাতে ফিরিয়ে দেন। ঐ সময় মার্চ মাসের প্রথম দিকে ভাস্করকে অন্যান্য দায়িত্বের উপর প্রায় জোর করেই লিট দেখবার দায়িত্ব দেওয়া হয় কিন্তু কোন ফল হয় না। যেমন পূর্বে চলত তেমন পরেও চলতে থাকে। লিটের কমরেডদের প্রচেষ্টায় ও তাদের নিজেদের যোগ্যতায় যতটুকু সম্ভব সেই ভাবেই তারা সংগঠনকে চালিয়েছেন ও চালাচ্ছেন, এতে ডি. সির কোনই বাহাদুরী নেই। উপরন্তু তাদের বিভিন্ন সমস্যাকে আমরা উপেক্ষাই করেছি।

ডি. সির কেন্দ্রের প্রত্যেকটি কাজকেই আমরা এ ভাবে চালিয়েছি। শেষের দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে যখন আমাদের সংঘর্ষের উন্মাদ নীতি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখন র‍্যাঙ্কের মধ্য থেকেও প্রতিবাদ ক্রমশই প্রবলতর হতে থাকে। সেই প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য টিটোবাদী স্টীমরোলার আমরা আরও শক্ত করে চালাতে থাকি।

এই অবস্থায় এলো কমিনফর্ম্ম নির্দ্দেশ। পার্টিতে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হলো। এই নূতন অধ্যায়ের শুরু হলো। এই নূতন অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করলাম আমাদের পুরোনো ধারণা নিয়ে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আমরা কমিনফর্ম্ম প্রবন্ধের উপর পি. বির প্রথম বিবৃতি পেলাম। আমরা প্রথম ভুল করলাম পি. বির ভুল বিবৃতিকে ... বিপ্লবের স্তর ঠিক করতে না পারার ফলে আমাদের অগ্রগতি অনেকটা রুদ্ধ হয়ে গেছে, তবে আমরা যে লাভ করেছি তাকেও ছোট করে দেখলে চলবে না। অর্থাৎ উক্ত বিবৃতিকে মোটামুটি ভাবে সমর্থন করেই আমাদের বুঝিয়ে যান। আমরা ভুলকে ঠিকমত ধরতে পারি না। অর্থাৎ একটা ভুল নীতিকে

সমর্থন করে র‍্যাঙ্ককে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করি এবং শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। র‍্যাঙ্ক তখন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবেই পি.বি. বিবৃতির বিরুদ্ধে তাদের মত ব্যক্ত করতে শুরু করেছেন। আমরা এপ্রিল অবধি দীর্ঘ তিন মাস পর্যন্ত এই ভুলের গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে অক্ষম হই, যেটা পরিষ্কার ভাবে দেখা যাবে পি. বির প্রথম বিবৃতির উপর আমাদের এপ্রিল প্রস্তাবে। "আমাদের অনুসৃত লাইন ও কমিনফর্ম্ম লাইন যে দুটো যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র লাইন"—এ কথাটা পি.বি. বিবৃতিতে অস্বীকার করেছে, এটা আমরা কেউ কেউ বুঝতে পারি না। ফলে পি.বি. বিবৃতি নিয়ে পি.বি. ও পি.সি.-রই মত আমরাও দালালি করেছি।

এর ফলে আমাদের প্রতি র‍্যাঙ্কের অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা জন্মগ্রহণ করতে সাহায্য হয়েছে এবং পি.বি.পি.সি'র দালাল হিসাবে র‍্যাঙ্ক আমাদের ধরে নিয়েছেন। এ অবস্থায় কলিকাতা পার্টি সভ্যদের মধ্যে একটা তুমুল আলোড়ন হচ্ছে, তখন নেতৃত্বের কাছ থেকে প্রথমত এত বড় ভুলের কোন স্বীকৃতি তারা পাচ্ছেন না। দ্বিতীয়ত এই ভুলের ভেতর থেকে কি করে সমগ্র পার্টি মুক্তি পেতে পারে সে সম্পর্কেও নেতৃত্ব কোন পথ নির্দ্দেশ দিচ্ছেন না। উপরন্তু র‍্যাঙ্ক যখন নিজেদের উদ্যোগে পরস্পরের সাথে আলাপ আলোচনা দ্বারা ভুলের মূল খোঁজা ও সংশোধনের চেষ্টা করছেন তাকেও আমরা সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছি। কমরেডরাও বে-পরোয়া হয়ে বে-আইনি পার্টির কথা প্রায় মনে না রেখেই যে ভাবে পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছেন তাতে পার্টির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অনেক সময় মনে রাখা হয়নি। কিন্তু এর কারণ কি তা আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করিনি। একদিকে নেশন পত্রিকায় কমিনফর্ম্ম প্রবন্ধ বেরোয় অথচ সে সম্পর্কে আমাদের পত্রিকাগুলি নীরব। অন্যদিকে সভ্যযুগে লিলিসানের বক্তৃতা ছাপে আর আমাদের নেতৃত্ব ছাপান বিকৃত মুখবন্ধ সহ ষ্ট্যালিনের বক্তৃতা, র‍্যাঙ্ককে ধোকা দেবার জন্য। র‍্যাঙ্কের আলোচনার আগ্রহকে ডি, সি'র তরফ থেকে কোন মূল্য না দিয়ে, তাদের মতামত আদান-প্রদানের কোন ব্যবস্থা না করে দিয়ে আমরা কোন ফোরাম বার না করে তাদের সমালোচনাকে পার্টি-বিরোধী বলে ভাবতে থাকি। আমরা আন্তঃপার্টি সংগ্রামে কোন নেতৃত্ব দিতে সক্ষম না হয়ে বরং বাধার কারণই হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রোসেক্ট সারকুলার ১৬নং ও পি. সি. আবেদনের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডি. সি. এ সময়ে আন্তঃপার্টি সংগ্রামে ঠিকভাবে নেতৃত্ব নিতে না পারায়, পি. বি. পি. সি'র বিভিন্ন বক্তব্য সম্পর্কে র‍্যাঙ্কের কাছে আমাদের মত ব্যক্ত না করায়, উপরন্তু পি. বি. পি. সি'র মত সমর্থন করে র‍্যাঙ্ককে সন্দেহের চোখে দেখায় আমরা আস্তে আস্তে র‍্যাঙ্কের বিশ্বাস হারাতে থাকি। না আমাদের তরফ থেকে না পি. সি. সি. সি'র তরফ থেকে এ ব্যাপারে সঠিকভাবে ভুলের গভীরতা বোঝা এবং কমরেডদের আন্তঃপার্টি সংগ্রামকে পরিচালনার অযোগ্যতাই সংকটকে ঘনীভূত করে তোলে। এ সময় আমরা অবস্থার চাপে কিছুটা হুঁস মাঝে মাঝে ফিরে পেলেও যেহেতু আমাদের মধ্যে পুরাতন খেয়াল বর্ত্তমান ছিল তাই আমরা তার জের তখনও টেনে চলি। যেমন বলা যায় যে এপ্রিলের মাঝামাঝি আমরা প্রস্তাব নেই যে বর্ত্তমান সংকট থেকে পার্টিকে বাঁচাবার জন্য ও ডি-সি'র, দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম পরিচালনার ব্যাপারে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তার সমাধানের জন্য র‍্যাঙ্কের মতামত নেব। র‍্যাঙ্কের তরফ থেকেও প্রচুর মতামত আসে কিন্তু পরে আমরা কার্য্যত তার কোন মূল্যই দিই না।

এদিকে সংকট বাড়তির মুখে। নেতাদের প্রতি অবিশ্বাসের ফলে সমস্ত কমিটিগুলির পুনর্গঠনের প্রশ্ন র‍্যাঙ্কের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। মে মাসে আমরা মে দিবস ও শান্তি সপ্তাহকে সামনে রেখে কিছু কাজকর্ম্ম করার চেষ্টা করি এবং আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য হিসাবে ভুল হোক শুদ্ধ হোক টি. ইউ. বুলেটিন ও শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের মতামত র‍্যাঙ্কের হাতে দিই। মে মাসের শেষ দিকে (২৫/৫/৫০) আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করি যা ডি.সি.'র জুন প্রস্তাব হিসাবে পরিচিত। এ প্রস্তাব মোটামুটি সঠিক ছিল। আমরা র‍্যাঙ্কের দাবিকে এ প্রস্তাবে মোটামুটি স্বীকার করি। পুনর্গঠন সম্পর্কে পি.বি. থেকে ডি.সি. পর্যন্ত সমস্ত কমিটিগুলিকে জুন মাস থেকেই পুনর্গঠনের দাবি জানাই। স্থানীয় কমিটিগুলির পুনর্গঠনে র‍্যাঙ্ককে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আমরা ঠিক করি যে বিভিন্ন ফ্রাকশন ও এ-সি গুলি কমরেডরা যেখানে যেখানে পুনর্গঠন করতে চান আমরা তাদের সে ব্যাপারে সাহায্য করব। কিন্তু আমরা এইসব পুনর্গঠনের দাবিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকার করলেও আসলে তাকে কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করলাম না। পরন্তু কেবল সেইব জায়গাতে গিয়েই হাত লাগালাম যেখানে ইতিমধ্যেই আমাদের মুখ চেয়ে না থেকেই কমরেডরা নিজেদের উদ্যোগে এইসবগুলিকে পুনর্গঠন করতে শুরু করেছেন। ডি-সি, টি. ইউ. ফ্রাকশন তৈরি করার প্রোগ্রাম নিয়েও তা কার্যকরী করা হয় না। এই সমস্ত প্রোগ্রাম নেওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকরী না হওয়ার কারণ কি ছিল? আমরা কিছুটা এগিয়ে এসেও পেছিয়ে যাবার কারণ কি ছিল? প্রথম কথা হলো যে র‍্যাঙ্কের চাপে আমরা ভুলের গুরুত্ব ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা কিছুটা বুঝলে আসলে আমাদের মধ্যে সে সম্পর্কে পূর্ণ অনুভূতি ছিল না। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক জ্ঞানের অপরিপক্কতা হেতু বার বার দোদুল্যমান মনোভাব দেখা দিয়েছে। তৃতীয়ত বিভিন্ন ব্যাপারে পি. সির হস্তক্ষেপও কিছুটা এর জন্য দায়ি। যেমন জুন প্রস্তাবকে পড়ে "সুবিধাবাদী ও আত্মসমর্পণকারী" বলে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। এবং কমরেড সূর্য্য বলেন যে এর ফলে অবাধভাবে নীতিহীন ও কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'নীচু থেকে' পুনর্গঠনের মনোভাবকে সবল করা হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে ঐ প্রস্তাবের পেছনে না দাঁড়িয়ে পরে সূর্য্যর বক্তব্যকে মোটামুটি মেনে নিই।

সুতরাং ... আন্তঃপার্টি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে অক্ষমতা, অবাধ আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করা অথচ ফোরাম বা ঐ জাতীয় কোন কিছু র‍্যাঙ্কের হাতে না দেওয়া, বিভিন্ন প্রস্তাব ও উচ্চতর কমিটির বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের মতামত প্রকাশ না করা, অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাব নেতৃত্ব না দিতে পারা সর্বশেষ পুনর্গঠনের ব্যাপারে র‍্যাঙ্কের ন্যায়সঙ্গত ও সাধু উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ ও সহযোগিতা না করা এবং দোদুল্যমানতা প্রভৃতির জন্য কলিকাতা জেলার সংকটকে আমরা আয়ত্তে আনতে পারিনি বরং বাড়াতে সাহায্য করেছি।

একথা অবশ্যই সত্য যে র‍্যাঙ্ক পি-বি, সি-সি, বা পি-সির সঙ্গে সমান লেভেলে আমাদের বিচার করেন নি। আমাদের বক্তব্যকে তারা প্রথমে শোনার ও বোঝার চেষ্টা করতেন। আমরা উপরোক্ত কাজগুলি ঠিকমত চালাতে পারলে সংকটকে কিছুটা পরিমাণে আয়ত্ব করতে পারতাম। পরবর্ত্তী সময়ে যে সংকট আরও গভীর হয়ে পড়ে তাকে কিছুটা পরিমাণে রুখতে পারতাম। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি।

এখানে এটাও পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কলকাতায় যে সংকট ছিল বা আছে তা সর্বভারতীয় সামগ্রিক রাজনৈতিক সংকটেরই একটা অংশ মাত্র। রাজনৈতিক সংকটই

শেষ পর্য্যন্ত সংগঠন ও নেতৃত্বগত প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়েছে। একে আলাদা করে ভাববার কিছু নেই। এ সংকট সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল সমগ্রভাবে নীতি ও নেতৃত্ব পরিবর্ত্তনের মধ্যে। সেটা প্রধানত সি-সি ও উচ্চতর কমিটিগুলির পক্ষেই করা সম্ভব ছিল। কিন্তু অত্যন্ত বিলম্বে নূতন সি-সির চিঠি আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় (জুলাই মাসে)। সি-সি চিঠিতে অনেক স্ববিরোধী ও বিভ্রান্তকর বক্তব্য থাকাতে তার মূল বক্তব্য সম্পর্কে বহু কমরেড- এর বহু কিছু প্রশ্ন জাগে। তাছাড়াও যোশীর 'ভিউজ' থেকে আরম্ভ করে বহু কমরেডই কমিনফর্ম্ম বা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রবন্ধগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিজের মত করে দিতে থাকেন। কেউ কেউ সমগ্রভাবে নেতৃত্বের এই গাফিলতি ও অকর্ম্মন্যতাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করে পার্টিব সংকটকে আরও তীব্র করতে সুবিধা পান।

কেউ কেউ আবার নিচু থেকে পুনর্গঠনের আওয়াজ তোলেন যাতে করে কেন্দ্রকে অস্বীকার করে নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন কমিটিগুলিকে পুনর্গঠনের চিন্তা অনেকের মধ্যে এসে যায়। এমতাবস্থায় আসে পি-সি পুনর্গঠনের ব্যাপার। সি.সি. থেকে সমঝওতার ভিত্তিতে পি.সি. পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয় এবং একটা দর কষাকষির ব্যাপার চলতে থাকে উপরতলার নেতাদের নিয়ে। পি-ও-সি গঠনের ব্যাপারে পি-বির সার্কুলার কমরেডদের মধ্যে অত্যন্ত বিক্ষোভ ও হতাশার সঞ্চার করে, এ সংকটকে আরও গভীর করে তোলে। পার্টির দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। আমরা কোন মিটিং ডাকলে কমরেডরা আর মিটিংএও আসেন না। টাকা পয়সা আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, ফলে সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মীরা পর্যন্ত খেতে পান না। পার্টির মধ্যে বিভিন্ন মতের বিনিময় ও আন্তঃপার্টি সংগ্রাম তখন যেভাবে চলছিল তাকে সুষ্ঠ নেতৃত্ব না দেওয়ার বিভিন্ন অরাজনৈতিক ঝোঁকও দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত পি-ও-সি গঠিত হয়। কিন্তু প্রাদেশিক কেন্দ্র হিসাবে আমরা যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের কাছে আশা করলাম তা পাওয়া গেল না। বিভিন্ন দিক থেকে সংকট সর্ব্বগ্রাসী রূপ নিয়ে পার্টিকে ঘিড়ে ধরলো, পার্টির মধ্যে অনৈক্য, বিভেদ ক্রমেই বাড়তির দিকে চলল। অথচ আজ পার্টিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, পার্টিকে সঠিক নীতি গ্রহণ করতে হলে একমাত্র মতবাদগত ভিত্তিতে আন্তপার্টি সংগ্রাম চালিয়েই তা সম্ভব। এই নীতিগত লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই ভুল এবং নির্ভুলের সঠিক মার্কসীয় বিশ্লেষণ ও পার্টিকে ভুলের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। নতুবা পার্টিতে অনৈক্য, হতাশা, সংগঠনিক জোড়াতালি, সুবিধাবাদ ও উপদলীয় চক্রান্ত জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য। মতবাদগত লড়াইয়ের অভাবই যে উপরোক্ত অবস্থার জন্ম দান করে এটা আমরা বর্ত্তমান অবস্থা থেকে পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পারছি।

একথা ঠিক যে কমরেডদের রাগ ছিল বামপন্থী নীতির উপর মূলত যা পার্টির সর্বনাশের মূল কারণ; এবং দ্বিতীয়ত ও গৌণত যারা এই নীতি কার্যে পরিণত করার চেষ্টা কবেছেন ডাণ্ডার জোরে তাদের উপর। কিন্তু আন্তঃপার্টি সংগ্রামের নামে আজ যেটা চলছে তাকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। কারণ বিভিন্ন এলাকার কমরেডদের একত্র করে যে আলোচনা চালানো হচ্ছে তা নীতিহীন ও বুর্জোয়া কায়দায় নেতৃত্ব থেকে সরানো ও নেতৃত্বে বসানোর জন্য। বর্তমান নেতৃত্ব যারা র‍্যাঙ্কের বিশ্বাসভাজন নন এবং বামপন্থী হঠকারী নীতির জন্য যারা সবচেয়ে বেশি দায়ি পার্টির স্বার্থেই তাদের অপসারণ প্রয়োজন এবং সে সম্পর্কে কারও দ্বীমত থাকতে পারে না। কিন্তু আলোচনার মূল বিষয়বস্তু যদি অন্য দিকে পরিচালিত করা হয় শুধু

মাত্র ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ও বিপক্ষে তাতে করে পার্টির বিশেষ কোন লাভ হয় না।

"আই-পি-এস" এর নেতারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন এরূপ কমরেডদেরই ইপ্‌স'এর সভ্য করে থাকেন অন্যদের নয়। আন্তঃপার্টি সংগ্রামের উদ্দেশ্য কি তাই? পুনর্গঠনের ব্যাপারে ইপ্‌স মনোনীত প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে যদি কোন কমরেড অন্য কাউকে ভোট দেন শোনা যায় যে তাদের ধমকানোও হয়ে থাকে। এটি (ইপ্‌স) মারফত বুর্জোয়া পদ্ধতিতে পার্লামেন্টারী নির্বাচনের কায়দায় বিভিন্ন এলাকার ভোট সংগ্রহ করার জন্য ক্যানভাস করা হয়। ইপ্‌স্ এর তরফ থেকে নেতারা কাশীপুর কমরেডদের কাছে এইরূপ ভাবে ভোট সংগ্রহ করতে গেলে তাদের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে আসেন। ডজন ডজন গোপন ও প্রকাশ্য কর্ম্মীদের নিয়ে দিনে দুপুরেও আলোচনা হয়। এমন কি টেকের কমরেডরা টেকের কোন বালাই না রেখে আই. পি. এস করে থাকেন যাতে মনে হতে বাধ্য যে পার্টি কোন দিন বে-আইনি ছিলনা এখনও বে-আইনী নয়। ফলে শত্রুদের কাছে পার্টির সব কিছুই উন্মুক্ত ও অসহায় করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ... এই ধরনের আই.পি.এস. ১০০ শত বছরের কম্যুনিস্ট নীতির পদ্ধতিকে আমরা সকলে মিলেই (নেতৃত্ব ও র‍্যাঙ্ক) এতদিন যাবৎ উপেক্ষা করেছি তার দাম আমাদের কড়ায় গণ্ডায় শোধ করতে হচ্ছে এবং হবে।

টিকা : ১. এই দলিলটিতে কোন তারিখ উল্লেখ করা নেই। তবে ধরা যেতে পারেযে এটি ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি কোন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

২. মনে হয় দলিলটির কিছু অংশ বাকি থেকে গেছে। 'পড়া যাচ্ছে না', অথবা 'প্রাপ্ত দলিলে কোন অংশ নেই', এমন জায়গাগুলিতে ... চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

৩ পার্টির অতিবাম সংকীর্ণতাবাদী নীতির ফলে সাংগঠনিক অবস্থা কীরূপ ধারণ করেছিল সেটাই এই দলিলের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এমনকী আন্তঃপার্টি সংগ্রামের কমিউনিস্ট পদ্ধতিকেও উপেক্ষা করা হয়েছিল।

৪. এতে অনেক 'টেক' নামের উল্লেখ রয়েছে। এগুলির মধ্যে আমরা দু'টির আসল নাম উল্লেখ করছি। যেমন গৌর— সোমনাথ লাহিড়ী এবং সুখেন— সরোজ মুখার্জি। এছাড়া আরো কয়েকটি 'টেক' নামের আসল নাম ৪নং সহায়ক তথ্যে দ্রষ্টব্য। (- সম্পাদক)

প্রাদেশিক সার্কুলার নং
সমস্ত পার্টি ইউনিটের প্রতি

২০শে আগস্ট, ১৯৪৯

প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনের আয়োজন

আপনারা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে দেখিয়াছেন যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে পশ্চিমবাংলায় একটি প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন ডাকার চেষ্টা চলিয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে গত ১০ই অগস্ট ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি শান্তি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তুতি কমিটিতে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি গণসংগঠন যোগদান করিয়াছেন।

ইহা মোটেই আশ্চর্য্যের কথা নয় যে শান্তির জন্যে এই সংগ্রামে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বিশেষভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। একথা সকলেই জানেন যে মজুরি, জীবিকা, খাদ্য এবং জমির জন্যে যে সংগ্রাম তাহার সহিত শান্তির সংগ্রাম অবিচ্ছেদ্য এবং অভিন্ন। ধনিক শ্রেণি সংকট হইতে বাঁচিবার জন্যে একদিকে সংকটের বোঝা যেমন শ্রমিক-কৃষক-গরীব জনতার উপর চাপাইতে চাহে, প্রতিদিন শ্রমিক ছাঁটাই করে, মজুরি কাটে, তেমনি অপরের দেশ দখল করিয়া তাহাকে শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত করিতে চায়, নতুন বাজারের জন্যে যুদ্ধ আরম্ভ করে। গত যুদ্ধে আমরা দেখিয়াছি, উহাতে ধনিক শ্রেণির লুণ্ঠন চালাইবার সুযোগ বাড়ে আর গরীবদের জন্যে সৃষ্টি হয় ১৯৪৩-এর মত দুর্ভিক্ষ।

ধনিক শ্রেণি যুদ্ধ চায় বলিয়াই এক যুদ্ধের ক্ষত শুকাইতে না শুকাইতে তাহারা আর এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হইতেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই হইতেছে এই যুদ্ধকামীদের নেতা। তাহারাই এ যুদ্ধের হিটলার গোষ্ঠী। তাহারা সারা দুনিয়ায় যুদ্ধ-ঘাঁটি তৈরি করিতেছে, প্রকাশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নয়া গণতন্ত্রের দেশকে আক্রমণ করার কথা বলিতেছে। সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধ-ঘাঁটি তৈরি করার জন্যে গ্রীসে জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও সৈন্য পাঠাইতেছে, তুরস্কে কোটি কোটি ডলারের যুদ্ধ সরঞ্জাম পাঠাইতেছে, ইরাণে সামরিক মিশন ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইতেছে; কোরিয়া, বর্মা, মালয়, ইন্দোনেশিয়ায় প্রভৃতি দেশের জনগণের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতেছে। জার্মানী ও জাপানকে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে তৈরি করিতেছে, সেখানকার ফ্যাসিস্টদের আবার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করিতেছে। পশ্চিম ইউরোপে মার্শাল প্ল্যানের সাহায্যে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য কায়েম করিয়াছে, আটলান্টিক চুক্তি প্রভৃতি মারফৎ তাহারা ইউরোপের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে অস্ত্র দিবার প্ল্যান করিয়াছে; জাতিসংঘকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা আবার হিটলারী-কায়দায় সোভিয়েট ইউনিয়নকে ঘেরাও করার প্ল্যান করিয়াছে। এখন তাহারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি প্রভৃতির মারফৎ এশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মুক্ত চীন এবং বর্মা-মালয়-ইন্দোচীন-ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র করিতে চাহিতেছে। তাহার জন্যেই ভারতের

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর ওয়াশিংটনে ডাক পড়িয়াছে। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট কুইরিনো, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট রী, কুয়োমিংটাং দস্যু চিয়াং কাইশেক প্রভৃতি মার্কিন ক্রীতদাসের দল এই যুদ্ধ-চুক্তি তৈরি করার জন্যেই এত সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইতিমধ্যেই সোভিয়েত-ভারত সীমান্ত কাশ্মীরে মিলিটারী 'পর্যবেক্ষক' পাঠাইয়াছে, নেপালে সামরিক ও বিমান ঘাঁটি তৈরি করিয়াছে, ভারতের সর্বত্র ডলার মারফৎ অস্ত্রশস্ত্র ও গোয়েন্দা পাঠাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে। 'ভারতবর্ষ'কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিরাপদ যুদ্ধ-ঘাঁটিতে পরিণত করার জন্যেই নেহরু-বিধানের দল এখানে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি করিয়াছে, ধর্মঘটের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে, সমগ্র দেশকে ফ্যাসিস্ট কারাগারে পরিণত করিয়াছে।

যুদ্ধ-বিরোধী সংগ্রাম, শান্তির জন্যে সংগ্রাম— মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই বিশ্বগ্রাস করার অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাহাদের আজ্ঞাবহ নেহরু সরকারের প্রত্যেকটি আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এখানে নিরপেক্ষতার কোন সুযোগ নাই। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, নয়া গণতন্ত্রের দেশ, মুক্ত চীন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরা ধনিক শ্রেণির যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে বাধা দিতেছে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমস্ত মানুষের জন্যে জীবনধারণের উপযোগী মজুরি, জীবিকা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতেছে, অপরদিকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও নেহরু-লিয়াকত প্রভৃতি মুষ্টিমেয় ধনিকের দল নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে, নিজেদের মুনাফা বাড়াইবার জন্যে দেশের সমস্ত টাকা এটম বোমার পিছনে খরচ করিতেছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করিয়া তাহাদের পথের ভিক্ষুকে পরিণত করিতেছে। নিরপেক্ষতার অর্থ কি? রবার কারখানার মুনাফা লুঠ করার জন্যে যাহারা ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান গণপতিকে মালয়ে খুন করিয়াছে সেই হত্যাকারী ম্যাকডোনাল্ড সম্পর্কে কে নিরপেক্ষ থাকিতে পারে? তেমনি পশ্চিমবাংলা আর সারা ভারতে যাহারা চটকল, ট্রাম, চা-বাগান প্রভৃতিতে বিদেশী মূলধনকে নিরাপদ রাখিবার জন্যে নুনিয়ার মত শ্রমিকদের খুন করিতেছে তাহাদের সম্পর্কে কে নিরপেক্ষ থাকিতে পারে? নিরপেক্ষতার নামে যাহারা গ্রীসে মার্কিন হস্তক্ষেপকে সমর্থন করে যাহারা হত্যাকারীদের আড়াল করিয়া দাড়ায়— শান্তির সংগ্রামে তাহাদের স্থান নাই। শান্তির সৈনিকরা এক পক্ষ লইয়াই সংগ্রাম শুরু করিয়াছে— তাহা হইল ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত এবং গণতন্ত্রের পক্ষ, টাটা-বিড়লা নেহরু সরকারের আত্মসমর্পণের নীতির বিরুদ্ধে, শ্রমিক-কৃষক-জনগণের সংগ্রামী পক্ষ।

এই জন্যেই শান্তি সম্মেলনের প্রধান প্রস্তুতি শুরু করিতে হইবে প্রত্যেক কলকারখানা ও গ্রামে শ্রমিকশ্রেণি এবং গরীব মেহনতী জনতার মধ্যে। প্রতিদিনের সংগ্রামে যাহারা ধনিক শ্রেণির শোষণকে ঘৃণা করিতে শিখিয়েছে, ধনিক নেহরু-বিধান সরকারের যুদ্ধ-নীতি-চিনিতে পারিতেছে তাহাদেরই প্রথমে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এই শান্তির সংগ্রামকে লইয়া যাইতে হইবে ছাত্র ও নওজোয়ানদের মধ্যে, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, দোকানদার ও শিল্পীদের মধ্যে। যাহারাই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বগ্রাস করার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে তাহাদের মধ্যে শান্তির জন্যে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করিবার কাজে শ্রমিকশ্রেণি এবং কমিউনিস্ট পার্টিকেই নেতৃত্ব লইতে হইবে।

শান্তি আন্দোলনকে কোন একটি মাত্র ধরনের [ফরম] মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না,

উহাকে নানারূপে ছড়াইয়া দিতে হইবে। শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে এখনো আমরা রাজনৈতিক প্রচার চালাইতে ইতস্তত করি। অথচ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, অনগ্রসর শ্রমিকরা পর্যন্ত আজকাল চীনের মুক্তি-ফৌজদের কথা আলোচনা করে, বর্মার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি জানায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করে। পুস্তকের দোকান হইতে দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস এখনো সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।

শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে যাহাতে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে আমরা নেহরু সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির মুখোশ সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দিতে পারি তাহার জন্যে ব্যাপক প্রচার কার্য্য শুরু করিতে হইবে। তাহার জন্যেই যে শান্তির ঘোষণাপত্র প্রস্তুতি সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে তাহার উপর গণ সহি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যেক কারখানা, গ্রাম, স্কুল-কলেজ ও অফিস-দোকানে ঐ ঘোষণাপত্রের উপর ব্যাপক আলোচনা হওয়া দরকার। প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকরী সমিতিতে ঐ শান্তির ঘোষণাপত্র লইয়া আলোচনা করিতে হইবে, উহার প্রতি সমর্থন জানাইতে হইবে; প্রত্যেক কারখানায় ঐ ঘোষণাপত্রের উপর স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রত্যেক ক্লাব, সমিতি, সংঘ প্রভৃতি হইতে ঐ শান্তির ঘোষণাপত্রকে সমর্থন করিতে হইবে; পাড়ায় পাড়ায়, বস্তীতে বস্তীতে, পার্কে পার্কে জনসভা ও বৈঠক প্রভৃতি করিয়া সেখানেই উহার উপর গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে হইবে।

শান্তি সম্মেলনের দ্বিতীয় প্রস্তুতি হইবে জনসভা ও শোভাযাত্রা সংগঠিত করা, ইস্তাহার প্রচার করা, চিত্র ও পোস্টার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, গণনাট্য প্রভৃতির মারফৎ শান্তির সংগ্রামকে তীব্রতর করা। আতলান্তিক যুদ্ধচুক্তির বিরুদ্ধে ইতালীর শ্রমিকরা যেভাবে রাজপথে নামিয়াছিল ট্রুম্যান-নেহরুর প্রশান্ত মহাসাগরীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কলিকাতার শ্রমিককে সেইভাবেই লড়িতে হইবে। নেহরু সরকারের যুদ্ধ-বাজেটকে পায়ের তলায় ধ্বংস করিতে হইবে। এই ধরনের জঙ্গী চেতনা লইয়াই প্রত্যেকটি সমাবেশকে পরিচালিত করিতে হইবে।

জনগণের প্রত্যেক অংশ, যেমন শ্রমিক, ছাত্র, মহিলা, লেখক প্রভৃতিকে নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন শান্তি সমাবেশ সংগঠিত করিতে হইবে এবং সেখান হইতে প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইতে হইবে। বর্মা, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া বা মুক্ত চীনের বিরুদ্ধে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বা নেহরু সরকার যদি ভারতের কোন ঘাঁটি ব্যবহার করে, কোন প্রকারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে তাহা বন্ধ করিবার জন্যে জঙ্গী সংগ্রাম শুরু করিতে হইবে, ভিয়েতনাম দিবসের ঐতিহ্যকে জনগণের সমর্থনে ধরিয়া তুলিতে হইবে।

এই সকল শান্তি-সমাবেশ ও শান্তি-অভিযানে সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্মা, চীন প্রভৃতির উপর যে সকল পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা [তুমি সোভিয়েতের পক্ষে না বিপক্ষে, বর্মায় গণ-অভ্যুত্থান, মাও-সে-তুং-এর বক্তৃতা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি প্রভৃতি] ব্যাপকভাবে বিক্রয় করিতে হইবে। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির পক্ষ হইতে বাংলা এবং ইংরাজীতে যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহা বিরাট সংখ্যায় বিক্রির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যে জেলায় জেলায় এই শান্তি আন্দোলনকে তীব্র করিতে হইবে। জেলায় জেলায় শান্তি সম্মেলন করিতে হইবে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ বা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন হইবে। এই

সম্মেলনে প্রত্যেক জেলা হইতে শান্তি-বাহিনী পাঠাইতে হইবে। পণ্ডিত নেহরু যেসময়ে আমেরিকায় যুদ্ধ শিবিরের সহিত ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত থাকিবে সেই সময়ে ভারতবর্ষ নিজেকে শান্তি স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের শিবিরের সহিত যুক্ত করিবে।

এই সম্মেলনকে সফল করার জন্যে প্রত্যেক ইউনিট নিজের নিজের কার্যক্রম স্থির করুন; প্রচার, অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ এখনই শুরু করুন। শান্তি প্রস্তুতি কমিটির সহিত যোগাযাগ স্থাপন করুন [৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিট]। শান্তির শত্রুরা কোণঠাসা হইয়াছে, আপনারা রুটি, চাকুরী, জমি, স্বাধীনতা ও শান্তির সংগ্রাম, তীব্র করিয়া তাহাদের পরাজিত করুন, ধ্বংস করুন।

প্রাদেশিক কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

টিকা : সার্কুলারে যদিও বলা আছে যে প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে। কিন্তু ২০ সেপ্টেম্বর প্রস্তুতি কমিটির সভা থেকে স্থির হয়েছিল যে প্রাদেশিক সম্মেলন হবে ৪-৭ নভেম্বর। তাদের কাছে সর্বভারতীয় প্রস্তুতি কমিটির সভা থেকে এই নির্দেশও এসেছিল যে সারা ভারত শান্তি সম্মেলন কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হবে। আর তা হবে ২৪-২৭ নভেম্বর। (- সম্পাদক)

সহায়ক তথ্য - ১৩

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির কার্যালয়ে পুলিশের হানা
আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলনের উপর আক্রমণ

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বেলা ছয়টার সময় সশস্ত্র পুলিশ সহ সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির অফিস ও পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির কার্যালয় ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রীটে, পুলিশ হানা দেয় এবং শান্তি সম্মেলনের প্রচার পুস্তিকা, প্রাচীর চিত্র ও প্রয়োজনীয় খাতাপত্র বাজেয়াপ্ত করে, এবং ড্রয়ার প্রভৃতির তালা ভাঙ্গিয়া খানাতল্লাসীর পর টাকা পয়সা লইয়া যায়। উপস্থিত ব্যক্তিদের সবাইকে রাত্রি দশটার সময় থানায় লইয়া যায় এবং তিন ঘন্টা হয়রানীর পর রাত্রি একটার সময় দুইজন বাদে সবাইকে ছাড়িয়া দেয়। ইহারা অধিকাংশই স্থানীয় পাঠাগারের সভ্য অথবা সাধারণ পাঠক। ইতি-পূর্বে একাধিকবার পুলিশ হানা দিয়ে বহুলোককে নাজেহাল করিয়াছে। এর একমাত্র কারণ সাধারণ লোকের মনে ভয় ঢুকাইয়া দেওয়া, যাহাতে কোন প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানে কিম্বা বিশ্বশান্তির আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ না করে। ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর এই বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে আমরা প্রত্যেকটি গণতন্ত্রকামী মানুষকে সংগঠিত আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

তথ্যসূত্র : বঙ্গীয় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির প্রচারপত্র ২ অক্টোবর, ১৯৪৯

বিশ্বশান্তির সংগ্রাম
২রা অক্টোবরের তাৎপর্য

সারা দুনিয়ার মেহনতকারী মানুষ ২রা অক্টোবর তারিখে (১৯৪৯-সম্পাদক) আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালন করবে। সর্বনাশা যুদ্ধের বঞ্চনা ও হাহাকার যাতে আবার মানুষের জীবনকে দুর্বহ না করতে পারে, সে জন্য আমাদের দেশের জনসাধারণও ঐ জগদ্ব্যাপী আন্দোলনে আগ্রহে যোগ দেবে।

যুদ্ধের কথা ভাবতে ভালো না লাগতে পারে। কিন্তু না ভেবেও আর নিস্তার নেই। ঝড় যখন বইছে তখন উটপাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে পার পাওয়া যায় না। তাই আমাদের ভাবতে হবে আজকে দুনিয়ার সব চাইতে সাংঘাতিক সমস্যার কথা। দুনিয়ার দৌলত লুঠ করেও যাদের লোভ চরিতার্থ হয় না, তারা আজ যুদ্ধ বাধিয়ে কোটি কোটি মানুষের যন্ত্রণার বদলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় নেমেছে— তাদের দুষ্কৃতির জবাব দিতে হবে, তাদের পরাজিত করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দুনিয়ার মালিক শ্রেণি নিদারুণ দুশ্চিন্তায় পড়েছে। এখনও বহুদেশে জনশক্তি জয়লাভ করতে পারেনি। বুর্জোয়া নেতৃত্ব জাতীয় আন্দোলনকে কেমন করে বিপথে নিয়ে যায়, স্বাধীনতার বদলে কি ধরনের বুজরুকি দিয়ে দেশের লোকের চোখে ধুলো দেয়— তার পরিচয় তো আমরা হাড়ে হাড়ে পাচ্ছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোটের ওপর সারা পৃথিবীতে জনতার শক্তি পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে বলে সব দেশের বুর্জোয়াদের আশংকার আর অবধি নেই।

সোভিয়েতের রক্তপতাকা উড়ছে দুনিয়ার এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে। যে-দেশে মানবজাতির প্রায় এক-চতুর্থাংশ বাস করে, সেই চীনের প্রায় সর্বত্র কদর্য বুর্জোয়া শাসনকে দূর করে জনতা রাষ্ট্র শক্তি দখল করেছে। পূর্ব-ইউরোপের নতুন গণতন্ত্রসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন সমাজ— পুঁজিবাদ-জমিদারের দৌরাত্ম্যের সেখানে অবসান ঘটেছে। আর সর্ব দেশে জন-আন্দোলন নতুন প্রতিষ্ঠা নিয়ে— সোভিয়েতের অতুল নেতৃত্বে নতুন ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে।

পুঁজিদারী ব্যবস্থা আজ যে মরতে বসেছে তা পুঁজিদার শ্রেণি নিজেরাই বুঝতে আরম্ভ করেছে। পুঁজিবাদীর স্বর্গ, খাস আমেরিকায় বেকারের সংখ্যা বাড়ছে— আমেরিকার তাঁবেদারী যে সব দেশের স্বার্থমগ্ন নেতারা মেনে নিয়েছে, যেখানে যেখানে মার্শাল প্ল্যান, অ্যাটলান্টিক প্যাক্ট ও ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন ইত্যাদি বিরাট ধাপ্পাবাজি চলছে, সেখানেই আজ সাধারণ

মানুষের দুঃখকষ্টের সীমা নেই। আর ভারতবর্ষের মত যে-সব দেশে জনতা চাইছে সমাজকে নতুন করে ঢেলে গড়তে, সেখানে চলছে আর্থিক দুর্গতি আর অজস্র অত্যাচার। অন্যদিকে সোভিয়েতে ও নতুন গণতন্ত্রের দেশগুলিতে সাধারণ মানুষ মহানন্দে নিজের হাতে গড়ছে নিজের মনোমত সমাজ।

যদি তাই সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াই লাগানো যায় এবং ক্রমাগত বেমালুম মিথ্যা প্রচার চালিয়ে সোভিয়েত সম্পর্কে জনমতকে বিষিয়ে তোলা যায়— এই হল সব দেশের মালিকদের চেষ্টা। তাই কাগজে কাগজে রব তোলা হচ্ছে যে সোভিয়েতে সুখ নেই, স্বাধীনতা নেই; আছে শুধু নাকি 'পশ্চিমী গণতন্ত্র' মার্কা দেশগুলোতে!

কথাটা যে কত মিথ্যা, তা ভুক্তভোগী আমরা জানি। কিন্তু বার বার বলে বলে মিথ্যাকে মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার যে-চেষ্টা হিটলার করেছিল সে চেষ্টা হিটলারের বর্তমান উত্তরাধিকারীরাও করছে— ফলও পাবে তেমনই।

আমেরিকা থেকে প্রায় রোজই কোন না কোন বাতুল চীৎকার করছে— "আমাদের হাতে এটম্ বোমা, সোভিয়েতের আবালবৃদ্ধ বনিতাকে আমরা তিন হপ্তায় শেষ করব!" ইউরোপে জেনারেল মন্টগোমারি বলতে সঙ্কোচ অনুভব করে নি যে, সোভিয়েতকে ধ্বংস করাই হল তার কাজ। ট্রুমান এচিসন আর এটলি বেভিনের মুখ নিঃসৃত বাক্যের মর্মার্থই তাই।

বাতুলেরা জানে না যে, আজ জনশক্তির দৃপ্ত পদক্ষেপের সামনে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। তারা জানে না যে, রূপোর শিকল পরিয়ে সব মানুষকে বান্দা বানাতে কেউ পারে না!

যুদ্ধ যদি বাধে তো লড়তে হয় কেমন করে, তা লালফৌজ দেখিয়েছে, চিনের মুক্তিযোদ্ধারা দেখিয়েছে, সব দেশের সাধারণ মানুষ দেখিয়েছে। এটম্ বোমার জুজুর ভয় সোভিয়েতকে দেখিয়ে কোন লাভ নেই। বহুদিন আগে স্ট্যালিন বলেছিলেন : "যুদ্ধ আমরা চাই না, কিন্তু আমাদের সাজানো সোভিয়েত বাগানে তোমরা শূয়োরের মত নাক যদি ঢোকাও তো যথোচিত শিক্ষা দিয়ে দেব।" আজ দুনিয়ার জনতা ঐ কথাই বলবে— যুদ্ধ নিতান্ত যদি বাধে তো জয়ী আমরা হব-ই। কিন্তু যুদ্ধ বাধাতেই আমরা দেব না, নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে আমরা নিজেদের মেহনতে নতুন সমাজ বানাবো।

আমাদের যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন তাই নিছক বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্ভর করছে না— নির্ভর করছে জাগ্রত, সংঘবদ্ধ সংগ্রামী শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের ওপর। আমাদের যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন নেতিবাচক নয়— নতুন সমাজ গড়ার অটল প্রতিষ্ঠাই এর ভিত্তি। শত্রু-সমাবেশ যত বিপুলই হোক্ না কেন, আমাদের বিজয় অনিবার্য।

বিশ্বশান্তির সংগ্রামে কয়েকটি শ্লোগান

- ২রা অক্টোবর শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক সংগ্রাম দিবস পালন করুন
- সোভিয়েত ও মুক্ত চীনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ষড়যন্ত্র ধ্বংস হোক!
- দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের স্বার্থ নিয়ে লড়ছে কে— ভারতবন্ধু সোভিয়েত দেশ!
- অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধী জেহাদের বিরুদ্ধে লড়ছে কে— ভারতবন্ধু সোভিয়েত দেশ!
- মার্কিন দস্যুদের জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সকল জাতির সমান অধিকারের জন্য লড়ছে কে— সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত দেশ!

- কোরিয়া, জাপান, গ্রীস, জার্মান প্রভৃতি দেশ থেকে বিদেশী সৈন্য তোলার দাবি করে আসছে কে— মুক্তিদূত সোভিয়েত দেশ!
- এটম শক্তিকে মানব কল্যাণে লাগাবার দাবি তুলেছে কে— গরীবের বন্ধু সোভিয়েত দেশ!
- সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েতকে রক্ষা করার জন্য জান দেবে কে— মজুর, কৃষক, ছাত্র, নওজোয়ান!
- সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তকে বানচাল করে শান্তির সংগ্রামকে সফল করুন!

প্রাপ্তিস্বীকার : ঐ

সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের আহ্বান

[কলিকাতা অধিবেশনের মূল প্রস্তাব]

আমরা ভারতের সকল স্থানের জনগণের প্রতিনিধি।

আমরা নর-নারীগণ— ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক, খেতমজুর, গণতান্ত্রিক যুবক ও নারী, প্রগতিশীল শিল্পী, লেখক, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিদদের গণ-সংগঠন ও বহুবিধ কর্মজীবীদের প্রতিনিধি।

যে যুদ্ধের বিপদ আজ দুনিয়ার সকল মানুষকে বিপন্ন করে তুলেছে— সেই যুদ্ধের বিষম বিপদ সম্পর্কে আমরা সচেতন।

আমরা জানি যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-লিপ্সুদের ষড়যন্ত্রেই দুনিয়ার শান্তি আজ বিপন্ন। এই যুদ্ধ-পাগলেরা যুদ্ধের হুমকি থেকে এখন প্রকাশ্য যুদ্ধ প্রস্তুতিতেই মেতে উঠেছে।

দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে— গ্রীসে, ভিয়েতনামে, বর্মায়, মালয়ে— আমেরিকা, ফরাসী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সশস্ত্র ফৌজ বাস্তবপক্ষে আক্রমণাত্মক যুদ্ধই চালিয়ে যাচ্ছে। এই সাম্রাজ্যবাদীরাই ঐ সকল দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষভাবেই সাহায্য করছে— তাদের দেশের জনতাকে পিষে মারার জন্য— যে জনতা আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়ার শান্তিকে আরও বিপন্ন করে তুলেছে।

তারা আটলান্টিক চুক্তির মত সামরিক জোট তৈরি করে সম্মিলিত জাতিসংঘের বনিয়াদকেই ভেঙে দিচ্ছে— যে জাতিসংঘ তৈরি হয়েছিল সমস্ত জাতির ভিতর শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থানকে রোধ করার জন্য।

তারা পশ্চিম জার্মানি ও জাপানকে আবার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করছে ও সেই সব দেশের ফ্যাশিষ্ট শক্তিগুলিকে আবার সঞ্জীবিত করে তুলছে।

আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ও দুনিয়াকে গ্রাস করার উদ্দেশ্য নিয়েই বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাকে পায়ে দলে তারা দুনিয়ার সকল স্থানে ঘাঁটি তৈরি করছে।

বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে চুক্তিতে বিভিন্ন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি থাকার সম্ভাবনাকে স্বীকার করা হয়েছিল— সেই চুক্তিগুলিকেই তারা আজ বরবাদ করে দিয়েছে।

এটম বোমার বিভীষিকা দ্বারা তারা আজ দুনিয়ার লোককে ভয় দেখিয়ে বশ্যতা স্বীকার করাতে চাচ্ছে।

শ্রমিকের রক্তে তৈরি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অতিরিক্ত মুনাফা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আর একটি যুদ্ধে জনগণকে ভুলিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা সংবাদপত্র, ছায়াচিত্র, সাহিত্য ও বিবিধ উপায়ে যুদ্ধের উত্তেজনামূলক প্রচার চালাচ্ছে।

তারা দুনিয়ার সর্বত্র গণতন্ত্রবিরোধী ও জনগণের দুশমন গভর্নমেন্টগুলিকেই সাহায্য করছে— যেমন স্পেনে তারা সাহায্য করছে ফ্রাংকোর গভর্নমেন্টকে ও গ্রীসে ফ্যাসিষ্ট সরকারকে।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই সব চেষ্টায় শুধু দুনিয়ার শান্তিই বিপন্ন হচ্ছে না, দুনিয়ার জনগণের স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে পড়েছে এবং এ সবের উদ্দেশ্য হল— একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অতিরিক্ত মুনাফা আরও বাড়িয়ে তোলা ও উপনিবেশগুলির জনগণের পরাধীনতা ও দাসত্বকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করা।

সর্বোপরি, সাম্রাজ্যবাদীদের এই সব চেষ্টার উদ্দেশ্য হল, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান— যে জনগণ একটা উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের এই সব চেষ্টার উদ্দেশ্য হল— পূর্ব ইউরোপের ও স্বাধীন চীনের গণরাষ্ট্রগুলিতে যে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। আমেরিকার পরিচালনার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পাগলের মত হয়ে উঠেছে দুনিয়াকে গ্রাস করার জন্য— যার পরিণতি হবে যুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাত্র চার বছর পরেই জনগণের সামনে দেখা দিয়েছে আবার নতুন যুদ্ধের মহাবিপদ। সেই বিশ্বযুদ্ধ এনেছিল বিরাট ধ্বংস ও জনগণের অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা— যার আঘাত জনগণ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ভারতের জনমতের বিরুদ্ধেই নেহরু সরকার ভারতকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের নাগপাশে বেঁধে রাখতে রাজি হয়েছে— এইভাবে নেহরু সরকার জোর করেই ভারতকে ইঙ্গ-আমেরিকান নেতৃত্বে যুদ্ধ-শিবিরের অংশীদার করেছে।

ভারতের জনমতের বিরুদ্ধেই নেহরু সরকার ভারতকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছায় এশিয়াকে সামরিক অভিযান চালানোর পরিকল্পনায় জুড়ে দিয়েছে। ভিয়েতনাম, বর্মা ও মালয়ের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকারী জনতার বিরুদ্ধে সেই সব দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্র-বিরোধী সরকারগুলিকে সাহায্য করার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায়ও নেহরু সরকার ভারতের জনমতের বিরুদ্ধে ভারতকে সামিল করেছে।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশমত যুদ্ধের পরিকল্পনায়ও ভারতের বড় বড় পুঁজিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই নেহরু সরকার দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট এবং চড়া দাম, বেকারি ও দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত ভারতের জনগণের কাঁধে সামরিক ব্যয়ের অসহনীয় বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। জনগণের উপর চলছে একটা ভয়াবহ সন্ত্রাসরাজ ও তাদের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

নেহরু সরকারের এই সব কাজে শুধু ভারতের জনগণের ধ্বংস ও সর্বনাশই ডেকে আনছে না, এতে সারা দুনিয়ার শান্তিকামী জনগণের পক্ষেও এক বিষম বিপদ সৃষ্টি করছে। নেহরু সরকারের এইসব কাজে ভারতের জনগণের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং আমেরিকান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুমের কাছে সেই সার্বভৌমত্বকে সঁপে দেওয়া হচ্ছে।

আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, আজ শান্তি জনগণের সবচেয়ে প্রধান ও জরুরি দাবি। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধলিপ্সু ও তাদের অনুচরদের সমস্ত পরিকল্পনাকে খতম করার জন্যই আমরা ভারতের সমস্ত নরনারীকে আহ্বান জানাচ্ছি— যেসকল নীতি ও কাজ ভারতকে যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করছে, যাতে ভারতকে ইঙ্গ-আমেরিকান পরিচালনায় আক্রমণাত্মক যুদ্ধ-শিবিরে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে— তাকে প্রতিরোধ করতে।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশীদার হওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য আমরা সমস্ত জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অংশীদার হওয়ার অর্থই হল দুনিয়ার জনগণের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ-শিবিরে যোগ দেওয়া।

আমরা বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনের ঘোষণাকে জানাচ্ছি স্বাগত সম্ভাষণ; প্যারিসের বিশ্ব-সম্মেলনের শান্তি কমিটিকে জানাচ্ছি আমাদের পূর্ণ সমর্থন।

আমরা সম্মিলিত জাতিসংঘের সনদের পক্ষে।

তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও ঘোষণা করছি :

যে সকল সামরিক চুক্তি এই সনদের পরিপন্থী ও যার ফলে হবে যুদ্ধ— আমরা তার বিরোধী।

আমরা চাই— যুদ্ধের কাজে এটম বোমা নিষিদ্ধ হোক ও সেই নিষেধকে কার্যকরী করার জন্য তার উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। আমরা চাই— স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে সমস্ত জাতির ভিতর শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা।

প্যারিসের শান্তি ইস্তাহারের ভাষায় আমরাও ঘোষণা করছি, শান্তি রক্ষা করাই আজ দুনিয়ার সকল লোকের স্বার্থ।

আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে এবং পূর্ব ইউরোপের গণরাষ্ট্রগুলির ও স্বাধীন চীনের জনগণকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁরা দুনিয়ার সব দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের সঙ্গে এক বিশ্ব-শান্তি ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ও গড়ে তুলেছে শান্তির সুদৃঢ় ও অপরাজেয় শক্তি।

আমরা তাঁদের কাছে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি— ভারতের সমস্ত জাতির, সমস্ত মতের, সমস্ত পেশার লোকের জবরদস্ত জমায়েত গড়ে তুলে আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করব, অন্যদেশের জনগণের স্বাধীনতা ধ্বংস করার কাজে ভারতের জনবল, ধনবল ব্যবহারে বাধা দেবো। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করব, সামরিক ব্যয়ের দুঃসহ বোঝার প্রতিবাদ জানাব এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতির কাজে ব্যবহার হতে অস্বীকার করব।

শান্তির জন্য সংগ্রাম-ই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জীবনের জন্য সংগ্রাম।

আসুন— শান্তির সংগ্রামে জয়লাভের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হই।

প্রাপ্তিস্বীকার : 'মার্কসবাদী', ষষ্ঠ সংকলন, ডিসেম্বর, ১৯৪৯ প্রকাশক সুশীল জানা।

টিকা : সারা ভারত শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়, নভেম্বর মাসের ২৪-২৭ তারিখে। — সম্পাদক।

প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্র

১. ধনবাদী সভ্যতার শেষ সংকটের এই চরম পর্যায়ে পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত। ইতিহাস আজ প্রত্যেক মানব-প্রেমিককে প্রশ্ন করিতেছে, আপনি কোন্ পক্ষে আছেন? আপনি কি মৃত্যুপথযাত্রী ধনবাদ-ফ্যাশিবাদের শিবিরে, না নবজীবনের জয়গানে মুখর সমাজবাদের শিবিরে? বাঙলা দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিককে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

২. ডলার-সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে ধনবাদী শিবির তৃতীয় মহাসমরের আয়োজনে মত্ত। পৃথিবীকে তাহা পুনরায় রক্তের প্লাবনে ডুবাইতে চায়। যুক্তিতর্ক, বিচার, বিবেক সবকিছু বর্জন করিয়া ধনবাদী সভ্যতা আজ একটি মৃত্যুবর্ষী এ্যাটম বোমার আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতের শাসক-সম্প্রদায় নিরপেক্ষতার নামে এই আন্তর্জাতিক সমর-প্রস্তুতিকে সমর্থন করে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

৩. মানবতার বিরুদ্ধে এই হীন চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র পৃথিবীর জনগণ ও ভারতের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত যে শান্তির অভিযান চালাইতেছে, আমরা তাহাতে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে সফল করিয়া তুলিব। আমরা ঘোষণা করিতেছি, বিশ্ব-মানবিকতার ঐতিহ্য বহনকারী বাঙলার শিল্পী ও সাহিত্যিক আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রত্যেক দেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অবিচলিত ভাবে লড়াই করিবেন।

৪. ধনবাদী সংস্কৃতি তাহার প্রথম যুগে মানুষকে বড় করিয়া দেখাইয়াছিল, পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষকে নূতনের জন্য সংগ্রাম করিতে অনুপ্রেরিত করিয়াছিল। ধনবাদী সংস্কৃতির প্রথম যুগে আমরা দেখিতে পাই সামন্তবাদী জীবনযাত্রার সুকঠোর সমালোচনা, শাস্ত্রের স্থলে বিজ্ঞান, গোষ্ঠীর স্থলে জাতি, ক্ষুদ্রের স্থলে বৃহৎ, গ্রামের স্থলে বিশ্ব, আচারের স্থলে বিচার, অন্ধবিশ্বাসের স্থলে স্বচ্ছ যুক্তি, এবং পরলোকে স্বর্গসুখের পরিবর্তে ইহলোকে জীবন সম্ভোগের উন্মাদনা।

৫. কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত ধনবাদী সমাজে প্রগতির সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ধনবাদী সমাজে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণির একাধিপত্য শ্রমিকশ্রেণিকে ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া ক্রমশ অধিকতর দুর্গতির দিকে ঠেলিয়া দেয় এবং ধনবাদের মধ্যে সৃষ্টি করে ক্রমবর্ধমান সংকট। জনসাধারণের বিক্ষোভ ধনবাদী সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইতে লাগিল। সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যিক ও শিল্পী ধনিক ও পেটিবুর্জোয়াশ্রেণির মানুষের স্বার্থান্ধতা, লোভ, লক্ষ্যহীনতা, নিষ্ঠুরতা, যৌনবিকৃতি, আত্মরতি ইত্যাদির নিখুঁত চিত্র আঁকিয়া কঠোরভাবে ধনবাদী সমাজের সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

৬. আজ মুমূর্ষ ধনবাদের যুগে ধনবাদী সাহিত্য হইতে প্রগতিশীলতার সুর ও সত্যনিষ্ঠ সমালোচনার সুর অন্তর্হিত হইয়াছে। ধনবাদী সংস্কৃতি আজ আসন্ন মৃত্যুর বিকৃতিতে আচ্ছন্ন। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা। মানুষকে এতটুকু মর্যাদা দিতে তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাহার বিলাস মানুষের 'পশুত্ব' লইয়া। মৃত্যুই তাহার কাছে জীবনের একমাত্র সার্থক পরিণতি, আত্মহত্যাই বীরত্বের একমাত্র পরিচায়ক। বিজ্ঞানকে এবং প্রেম, বন্ধুত্ব, দেশপ্রীতি ইত্যাদি মানবিক মূল্যকে অস্বীকার করিয়া তাহা মানবের মনে দুর্জ্ঞেয়তা, রহস্যবাদ, দুঃখবাদ, ইত্যাদির পচা রোমান্টিক মোহজাল বিস্তার করিতেছে।

৭. বাঙলা দেশের রামমোহন-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ একদা মানবের বিরাটত্বের সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহিত্যে পাই অতীতকে পশ্চাতে ফেলিয়া নূতনের দিকে জয়যাত্রার প্রেরণা। মানবের মহৎ ভবিষ্যৎ, মহৎ চরিত্র, মহৎ কর্ম, মহৎ চিন্তা ও শক্তি—এই সকল ঐতিহ্য তাঁহারা বাংলা সাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক ধনবাদী ভারতবর্ষের বাস্তব পরিণতি তাঁহাদের সেই সকল স্বপ্নকে ভাঙিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়াছে। পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্য ধনবাদী সমাজের ক্ষয়িষ্ণু ভাবধারায় আচ্ছন্ন। মধ্যবিত্তশ্রেণির অহমিকা, আত্মকলহ, নৈরাশ্য, ভাববিলাস ও বিভ্রান্তি এই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। অন্যদিকে ভারতীয় ধনিকশ্রেণির সামান্য একটু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা ছিল বলিয়া ধনবাদী ভাবধারা মধ্যবিত্তের মনে একটা মিথ্যা জাতীয়তাবাদী 'প্রগতিশীলতার' ও আশাবাদের মুখোশ পরিয়া দারুণ বিভ্রান্তি জাগাইয়াছে এবং মধ্যবিত্তের মারফৎ বাংলা সাহিত্যকে বিকৃত ও অভিভূত করিয়াছে। আজ ভারতীয় ধনিকশ্রেণির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া ধনবাদী ভাবধারা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল হইয়াছে এবং সাহিত্য ও শিল্পকে বিনাশের দিকে লইয়া যাইতেছে। বহু মধ্যবিত্ত লেখক নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন, ধনবাদী সাহিত্যের আর কোনো ভবিষ্যৎ নাই। কিন্তু ধনিকশ্রেণির উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদী ভাবধারা এখনও নানারূপ ভেক ধারণ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে কলুষিত করিতেছে। আজ সকল প্রগতিশীল লেখকের কর্তব্য ফ্যাসিবাদী ভাবধারার সমস্ত মুখোশ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা এবং যেসকল সাহিত্যিক এই ভাবধারার বাহক তাঁহাদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে অভিযান চালানো।

৮. বাঙলার ধনবাদী সাহিত্যে ও শিল্পে শ্রমিকের গৌরবময় সংগ্রামের চিত্র স্থান পায় না। শ্রমিক-কৃষক-মানুষের হীন নিন্দাবাদে এই সাহিত্য মুখর। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার জয়স্তুতিতে ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের কুৎসা প্রচারে ধনবাদী প্রচার-সাহিত্যের ক্লান্তি নাই। ধনবাদী সাহিত্যিকদের কেহ কেহ আবার 'তৃতীয় শক্তি' সাজিয়া শ্রমিক-কৃষকের 'দাবিদাওয়া'র প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানান এবং 'অহিংস' ও 'উদার' মধ্যবিত্ত শ্রমিক-কৃষককে স্বখাতসলিল হইতে 'উদ্ধার' করিতেছে—সযত্নে এই অপপ্রচার চালান। 'তৃতীয় শক্তির' গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীরা প্রচার করেন, তাঁহারা 'সৃষ্টির স্বাধীনতা' বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যে বা শিল্পে রাজনৈতিক মতবাদের স্থান নাই, তাহা একান্ত 'বিশুদ্ধ' ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, শিল্পীর আত্মপ্রকাশেই তাহা সিদ্ধ, তাহার সামাজিক সার্থকতার প্রয়োজন নাই, তাহাতে বিষয়বস্তুর মূল্য নিরর্থক, প্রকাশভঙ্গীর চাতুর্যই একমাত্র বিচার্য। চিরন্তন সত্য ও সুন্দরের উপাসনার আড়ালে এই সকল লেখক ধনবাদের বেতনভুক প্রচারকের কাজই করিয়া থাকেন।

মুখে সমাজ-বিপ্লবের সমর্থন ও কার্যত বিপ্লবের বিরোধিতা—এই বিভীষণ বৃত্তি 'তৃতীয় শক্তি'কে ভারতের নয়া ফ্যাসিবাদের উপযুক্ত দোসর করিয়া তুলিয়াছে।

৯. মৃত্যুধর্মী ধনবাদী-ফ্যাসিবাদী ভাবধারার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সাহিত্য ও শিল্প কিরূপে নবজন্ম লাভ করিবে ও পূর্ণতম বিকাশের দিকে অগ্রসর হইবে, ইতিহাস আজ তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতেছে। ধনিকশ্রেণির ও ধনবাদী দাসত্বের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনসাধারণ ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী অপূর্ব প্রতিভার ও বীরত্বের সহিত যে চূড়ান্ত মুক্তিসংগ্রাম চালাইতেছেন, তাহা সমগ্র মানবসমাজকে দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি দিবে এবং সমাজবাদী সভ্যতা সৃষ্টি করিয়া শিল্প ও সাহিত্যকে অফুরন্ত বিকাশের সম্ভাবনা দান করিবে।

১০. ভারতে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে যে গণবিপ্লবের অভিযান চলিয়াছে, তাহারই মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি মানবের সৃষ্টিশীল শক্তির এক সর্বাঙ্গীণ নূতন অভ্যুদয়। এই সৃষ্টিশীল শক্তির মুক্তধারাই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সর্বপ্রকার প্রগতির ও মূল্যের একমাত্র উৎস। গণবিপ্লবই তাই আজিকার দিনের শ্রেষ্ঠ বাস্তব সত্য। সামাজিক বিকাশের সমস্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইহারই মধ্যে নিহিত।

১১. সাহিত্যে এই গণবিপ্লবের প্রতিফলন কেহই রোধ করিতে পারে না। ইতিহাসের অমোঘ বিধি ইতিমধ্যেই বাঙলাদেশে যে গণসাহিত্যের সূচনা করিয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক ভূমিকা হইল ধনবাদী সমাজের ও ধনবাদী সাহিত্যের প্রতিরোধ করা এবং গণবিপ্লবকে জয়যুক্ত করা। অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যেরও দুই শিবির গড়িয়া উঠিয়াছে, ধনবাদী সাহিত্যের শিবির ও গণসাহিত্যের শিবির।

১২. প্রগতিশীল সাহিত্যিকের স্থান এই গণবিপ্লবের ও গণসাহিত্যের শিবিরে। যেখানেই পাঁচজন শ্রমিক বা কৃষক সংঘবদ্ধ হইয়া ধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছেন, সেখানেই আমরা শুনিতে পাইতেছি মানবতার দুর্জয় শপথ—সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা শুধু নিজেদের শক্তির জোরে সমাজবাদী সমাজ, গণরাষ্ট্র, গণসাহিত্য ও গণশিল্প গড়িয়া তুলিব। ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নূতন সাহিত্য ও শিল্পকে গড়িয়া তোলার জন্য একদিকে যেমন শ্রমিক ও কৃষক নিজেরাই আগুয়ান হইয়া আসিবেন, অন্যদিকে তেমনই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকের পাশাপাশি থাকিয়া গণসাহিত্য ও গণশিল্প সৃষ্টির কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

১৩. আমাদের দেশে আজিকার দিনের গণসাহিত্য গণবিপ্লবেরই বাস্তব রূপায়ণ। গণবিপ্লবের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া এবং শ্রমিক-কৃষকের জীবনের সহিত একাত্ম না হইয়া যে সার্থক সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, একথা মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রগতিশীল সাহিত্যিক নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছেন। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিককে আজ জনগণের নিকটে যাইতে হইবে, তাঁহাদের সংগ্রামশীল জীবনকে নিখুঁতভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের মধ্যে যে সরলতা, ঋজুতা ও মানবিক মূল্যবোধ আছে, ধনবাদী সাহিত্যিকগণ আজ তাহা পদদলিত করিতেছেন। প্রগতিশীল সাহিত্যিক এই সকল ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া গণসাহিত্য রচনা করিবেন। এই সাহিত্য হইবে জনগণের সম্পত্তি। জনগণ ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন। বিপ্লবের ধারালো অস্ত্ররূপে ইহা

জনগণের সংগ্রামী চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করিবে এবং সমাজবাদী সমাজের ক্রমবিকাশকে ফুটাইয়া তুলিবে।

১৪. যে মানবতার সাধনা ধনবাদী সাহিত্যের প্রথম যুগে সাহিত্যিকের কল্পনা-বিলাস ছিল, আজ শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ নিজের বাস্তব জীবনে সেই সাধনাকে মূর্ত করিতেছেন। সাধারণ মানুষ আজ বীরত্বের ও মহত্ত্বের চরম শিখরে আরোহণ করিতেছেন। আমরা এক নূতন এপিক যুগে বাস করিতেছি। সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য তাই নির্দেশ দিতেছে, সাহিত্যকে আজ বাস্তবতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। জনগণের বাস্তব জীবনেই আজ সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ মানবিক মূল্য খুঁজিয়া পাইবেন।

১৫. পুরাতন মানবতা—যাহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আমরা বাঙলাদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাই—মানুষকে বড় করিয়া দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু এই দেখার মধ্যে দুটি গুরুতর অসম্পূর্ণতা ছিল। পুরাতন মানবতা মানুষকে নিজের আত্মার মধ্যে, একাকীত্বের মধ্যেই বড় করিয়া দেখাইত এবং অশুভের সহিত যে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিয়া শুভকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহা দেখাইত না। মুমূর্ষু ধনবাদের যুগে মানবতার নীতিও বিকৃত হইয়া মানুষকে পাপী, অপরাধী, ক্ষুদ্র ও করুণাযোগ্য বলিয়া চিত্রিত করিতেছে। প্রগতিশীল সাহিত্য নূতন সমাজবাদী মানবতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবে। ধনিকশ্রেণীর ধনবাদী অশুভের বিরুদ্ধে তীব্র ও নিষ্করুণ সংগ্রামের চিত্র তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে। মানুষকে তাহা দেখাইবে 'যোদ্ধা ও কর্মী' রূপে, ইতিহাসের স্রষ্টা ও নূতন সমাজের সংগঠক রূপে।

১৬. শ্রমজীবী জনসাধারণের বীরত্ব, মহত্ত্ব ও সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা যে নূতন সমাজের ও সভ্যতার পত্তন করিতেছে, তাহারই পূর্ণ বিকাশ হইবে সমাজবাদী সমাজ ও সভ্যতায়। শ্রমিক ও কৃষক শুধু যোদ্ধা নন, তাঁহারা নূতন সভ্যতার রচয়িতা। শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের ভিতর দিয়া কিরূপে সমাজবাদী সমাজের ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে, আজিকার সাহিত্য ও শিল্প হইবে তাহারই রূপায়ণ। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি, এই দুইয়েরই পূর্ণ সমন্বয় ঘটিবে সমাজবাদী বাস্তবতায়। এই সমাজবাদী বাস্তবতার পথেই সাহিত্য ও শিল্পকে অগ্রসর হইতে হইবে।

১৭. প্রগতিশীল গণসাহিত্যের বিরুদ্ধে ধনিকশ্রেণি, ধনিকরাষ্ট্র ও ধনবাদী সাহিত্যিক আজ সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাইতেছে। ধনবাদী রাষ্ট্রের জেলখানা আজ অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করিতেছে, প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী কোন শিবিরে। সেন্সরশিপ, নিষেধাজ্ঞা, কুৎসা, অপপ্রচার, খানাতল্লাসি, গ্রেপ্তার ইত্যাদি সর্বপ্রকার অস্ত্র লইয়া ধনবাদ আজ প্রগতি-সাহিত্যকে আক্রমণ করিতেছে। আমরা এই আক্রমণকে প্রতিহত করিব ইহাই আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা। প্রগতিশীল গণসাহিত্য ও গণশিল্প মরিতে পারে না। ইতিহাস ইহার স্বপক্ষে। ইহার জয় অবশ্যম্ভাবী।*

* পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ৭০৩-৭০৮; প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে নানা বাক-বিতণ্ডার পর উপর্যুক্ত 'ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয়। ১৯৪৯ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনটি। পরবর্তীকালে 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'-প্রসঙ্গে এই 'ঘোষণাপত্র'-টির কথা উল্লিখিত হয়েছে। দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৪, ৬১, ৮২।—সম্পাদক

প্রাপ্তিস্বীকার : মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (অখণ্ড), ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, পৃ. ৩২৯-৩৩১

সাহিত্য ও গণসংগ্রাম

চিন্মোহন সেহানবীশ

এ-সম্মেলনে যাঁরা জড়ো হয়েছেন তাঁদের কাছে সাহিত্য ও সমাজের নিবিড় সম্পর্ক, তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের অসারতা বা বাস্তবের অবিকল প্রতিফলনের নামে নৈরাশ্যবাদ ও বিকৃতি-বিলাসের বিষময়তা নতুন করে প্রমাণের দরকার নেই। এসব মেনেই তাঁরা এখানে এসেছেন, আর গণসংগ্রামে যোগদান ছাড়া সমাজের তথা সাহিত্যের যে মুক্তি নেই এ-সত্যও তাঁদের স্বীকার করতে বাধা নেই।

আমাদের প্রশ্ন হল সে-যোগদানের রূপ কি হবে? এর জবাব না নিয়ে যদি আমরা এখান থেকে যাই, তবে সম্মেলন অনেকটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, কারণ তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে এই প্রশ্নই হল আজ সব থেকে জরুরি।

আমাদের মধ্যে এ-সম্পর্কে দু'ধরনের চিন্তা দেখা যায়—যদিও আগেই মুখবন্ধ করেছি, গণসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছাড়া সাহিত্য-শিল্পের যে এগোবার জো নেই এ-বিষয়ে উভয়েই একমত। একদল ভাবছেন গণসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রয়োজন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য— যে-অভিজ্ঞতা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ, ফলবান করে তুলবে। যে-সাহিত্য আবার গণসংগ্রামকে পুষ্ট করবে, এগিয়ে দেবে নূতন কর্মোদ্যোগের পথে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ সভার কর্মীর মতো সাহিত্যিক বা শিল্পীর গণসংগ্রামে যোগ দেবার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ সে-'প্রলোভন' এড়াতে না পারলে সেই বিরামহীন কর্মস্রোতের অতলে তলিয়ে যাবে সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির সমস্ত প্রেরণা। এরকম 'সাহিত্যিক অপমৃত্যু'র নজীরও তাঁরা দেখান আমাদের আশপাশ থেকে।

অন্যদল বলেন, মজুর-কিষাণকে সংঘবদ্ধ করতে মজুর-কিষাণ সংগঠকেরা যে কাজ করেন, শিল্পী-সাহিত্যিককেও তা করতে হবে। করতে হবে শুধু গণসংগ্রামের খাতিরেই নয়— সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও। তাঁরা বলেন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগের নামে দূরত্ব রাখা চলবে না—বিশেষ সুবিধা দাবি করা চলবে না। কারণ তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুধু গণসংগ্রাম নয়—সাহিত্যও, কারণ ভাসা ভাসা অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হবে শুধু কৃত্রিম সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> জীবনে জীবন যোগ করা
> না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

বাস্তবিক অন্য কর্মীদের মতো গণসংগ্রামের সৈনিক হলে শিল্প-সাহিত্যের স্রোত রুদ্ধ হবেই—এ-কথাটা বিচারসহ নয়। আরাগঁর পক্ষে সব থেকে ফলপ্রসূ সময় হল রক্তাক্ত প্রতিরোধের বছর

কটি। স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভেসে এল কর্নফোর্ডের অবিস্মরণীয় কবিতা। নাৎসী-পদানত ফ্রান্সে পিকাসোর তুলি থামে নি যদিও অন্তরীক্ষচারীদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল অব্যাহত। কডওয়েল সম্পর্কে জর্জ টমসন বলেছেন, "It was not an accident that his most productive period as a writer coincided with his political activity in Popler." জুলিয়াস ফুচিকের কথা না হয় নাই তোলা গেল।

আসলে অফুরন্ত অবকাশ, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার অনুকূল পরিবেশ না হলে সাহিত্যশিল্পের সৃষ্টি ব্যাহত হবে—এ ধারণাটি ঠিক নয়। বরঞ্চ আজকের মতো তীব্র শ্রেণিসংগ্রামের যুগে সব থেকে অনুকূল সেই পরিবেশকেই বলব যা সাহিত্যিকের শ্রেণিসচেতনতাকে সবচেয়ে বেশি শাণিত করে তুলতে সাহায্য করবে। আর যেহেতু আমরা জ্ঞান ও কর্মের নিবিড় পারস্পরিকতায় বিশ্বাসী, তাই কর্মস্রোত থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখেও পরিপূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ সচেতনতা লাভ করা সম্ভব মনে করি না। বিশেষ করে আমাদের মতো নিরক্ষরতার দেশে লেখক ও শিল্পীরা হলেন মধ্যবিত্তশ্রেণি উদ্ভূত। গোর্কির মতো নিপীড়িত শ্রেণি থেকে সাহিত্যিকের আবির্ভাব এখানে অনেক বেশি কঠিন। কাজেই আপন জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতঃই লেখকের পক্ষে তীব্র সচেতনতা অর্জন করা স্বাভাবিক নয় (যদিও আমরা জানি সেই স্বতঃস্ফূর্ত চেতনাও সোশ্যালিস্ট চৈতন্য নয়)। তাই আমাদের মতো লেখক ও জনগণের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের দেশে কর্মের দিক দিয়ে একাত্ম না হতে পারলে সাহিত্যের মুক্তি নেই। তাই বাইরের খানিকটা দূরত্ব রাখতে গেলে মনের দিক থেকেও ব্যবধান ঘুচবে না।

তাছাড়া যদি ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ সভার অবিশ্রান্ত কাজকর্মের ফলে যদি দু'চার বছর লেখা বন্ধও থাকে, তাতেই বা কি আসে যায়। ইতিমধ্যে সেই কাজের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মানসিকতার ক্ষেত্রে পলি পড়বেই—আগামী দিনে সোনালী ফসলের যা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। তাই বৈশাখের রুদ্রদাহ দেখে বিহ্বল না হয়ে ভরসা রাখতে হবে আষাঢ়ের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে।

চীনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। চীনও আমাদেরই মতো অক্ষর-জ্ঞানহীন—দারিদ্র্যের প্রচণ্ডতাও এক পর্যায়ের। সেখানে নবজীবনের উন্মেষে শিল্পী-সাহিত্যিকের ভূমিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রনায়ক মাও সে তুং অত্যন্ত আস্থাশীল। তিনি বলেছেন আমাদের ফ্রন্ট দুটোই—সামরিক ও সাংস্কৃতিক এবং দুটো পরস্পরমুখাপেক্ষী। কিন্তু ঠিক ফ্রন্টের মতো করেই শিল্পীকে সাহিত্যিককে দায়িত্ব অর্জন করতে হবে—লক্ষ্য স্থির রেখে সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে হবে। শুনেছি সেখানে সংস্কৃতি-কর্মীদের দু-তিন বছরের জন্য কিষাণের আত্মীয়তা অর্জন করতে যেতে হয়। তার ফলে প্রথমটা সত্যই থেমে গিয়েছিল কলম আর তুলি, কিন্তু অত্যন্ত সাময়িকভাবে। তারপর এসেছে নতুন সৃষ্টির জোয়ার।

বুদ্ধিজীবীর পক্ষে কিষাণের মনের মধ্যে প্রবেশ করা, তাকে তার সংশয়, পিছুটান কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার মতো আত্মীয়তা অর্জন করা দুরূহ, তা একটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে। চীনা একটি নারী-সংস্কৃতিকর্মীর অভিজ্ঞতার কথা। উত্তর চীনের এক গ্রামে তিনি তখন কিষাণদের সংঘবদ্ধ করছেন। সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ দেখে তিনি একদিন বিহ্বল হলেন, কিন্তু সঙ্গের কৃষাণী সেই চাঁদ দেখেই প্রচণ্ড শীতের রাত্রির সম্ভাবনায় ভয়ার্ত হয়ে উঠল আসন্ন দুর্গতির কথা ভেবে। চীনা নারীকর্মী লজ্জিতা হলেন—অত্যন্ত রুক্ষ কঠোর বাস্তবের আঘাতে

সংবরণ করলেন তাঁর বিহ্বলতা।

তবে কি শিল্পী-সাহিত্যিক শুধু মজুর-কিষাণের বর্তমান সচেতনতা নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকবেন। নিশ্চয়ই নয়। তিনি বুদ্ধিজীবী হিসাবে সেখানে আনবেন সোশ্যালিস্ট চৈতন্য, আর তারই ভিত্তিতে তাদের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করবেন। কিন্তু সোশ্যালিস্ট চেতনা মজুর-কিষাণেরা সহজভাবে গ্রহণ করবে শুধু তাদের আপনজনারই কাছ থেকে, গুরুমশায়ের কাছ থেকে নয়। তাই কবিকে, শিল্পীকে, সাহিত্যিককে ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত মজুর ও কিষাণ সভার কিষাণের সহকর্মী হতেই হবে—তাদের বিপ্লবী কাজের দর্শকমাত্র নয়।

অন্য ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ-কর্মীর সঙ্গে তবে তফাৎটা হবে কোথায়? তফাৎ হবে দু'দিক থেকে। সাহিত্যিক বা শিল্পীর মন সংঘবদ্ধ মজুর-কিষাণের সংস্পর্শে এসে অলক্ষ্যে বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ হবে—যে-চেতনা হল নতুন সাহিত্যের বনিয়াদ। অন্যদিকে শিল্পী-সাহিত্যিক মজুর-কিষাণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের মধ্যেও অলক্ষ্যে সংক্রামিত করবেন সেই তীব্র প্রচণ্ড অনুভূতি যা হল শিল্পী-সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য। সে-অনুভূতি প্রশস্ত করবে আগামী বিপ্লবের পথ। বিপ্লবী-কবি এলুয়ার তাই বলছেন : "কবিরা বুঝতে পেরেছে যে সব মানুষই তাদের মতো সৌন্দর্যের প্রতি আবেগময় অনুভূতি পেতে পারে।" নাৎসী-অধ্যুষিত ফ্রান্সে জনসাধারণ ও সাহিত্যিক যে একই বিপ্লবী প্রচেষ্টার মধ্যে একাত্ম হতে পেরেছে, তারই উল্লেখ করে তিনি বলেছেন : "এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা মানুষ সম্বন্ধে হতাশ হই নি; এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা অত্যাচারিতদের মুক্তি এবং অত্যাচারীদের ধ্বংসের ভরসা ছাড়ি নি। মুক্তি তার দুর্গ ফ্রান্সকে ছেড়ে যায় নি। তার রক্ষীদের অনেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে, নিহত হয়েছে এবং বাকী সকলে অন্ধকারে লড়াই চালিয়ে গেছে; কিন্তু তাদের সকলেরই হৃদয়ে ছিল একই উদ্দীপনা, ছিল একই আশা যা চিরন্তনের রঙে রাঙানো। কেউ আর বলত না 'আমি', বলত 'আমরা' আর কবিদের সম্মান যা প্রকাশ পেয়েছিল এবং যা টিকে থাকবে তা হল এই যে তারা বলেছে 'আমরা মানুষরা'। একথা তারা বলেছে সমগ্র পৃথিবীর সেই সমস্ত মানুষের হয়ে যারা নীচভাবে জীবনযাপন করতে আর রাজী নয়।"*

আমি জানি এ-প্রসঙ্গে বিপ্লবীর কাজের মধ্যেও কাজ-ভাগাভাগির কথা উঠবে, এই মুহূর্তে সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে মজুর-কিষাণ আন্দোলনে বিনাশর্তে আত্মনিয়োগ করার পথে নানা অসুবিধার কথা উঠবে, আত্মনিয়োগ করলেই সৎসাহিত্য সৃষ্টি হবে—এ মত যান্ত্রিকতাদোষদুষ্ট, এমন কথা উঠবে। এ সবই ঠিক; কিন্তু এ-সবের বিচার হবে প্রাথমিক সমীকরণের চেষ্টার পর। যেটা প্রথমে করবার সেটা হল প্রত্যেক শিল্পীকে সাহিত্যকে যুক্ত হতে হবে মজুর-কিষাণ-আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে। সৈনিক হওয়ার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর কথা উঠবে কাজ ভাগাভাগির, বিচার হবে নতুন ফসল ভালো না মন্দ, খতিয়ে দেখা যাবে লাভক্ষতি। ইতিমধ্যে সবাইকে যেতে হবে ফ্রন্টে।**

* 'ফরাসী কবির জবানবন্দী', 'পরিচয়', চৈত্র, ১৩৫৫।

** পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ৭০৯-১৩; ১৯৪৯ সালের ২২-২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চতুর্থ সম্মেলনে পঠিত। এই প্রবন্ধটির বক্তব্যই পরবর্তীকালে 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'-প্রসঙ্গে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রাপ্তিস্বীকার : ঐ, পৃ. ৩২৬

FIGHT AGAINST BOURGEOIS NATIONALISM ON CULTURAL FRONT

[A Critical and Self-Critical Review]

By Narahari Kaviraj

An Introductory Note To Polit Burean

In conformity with the new general line, laid down by the Second Congress of C.P.I. (1948), the West Bengal leadership of the party decided to chalk out a party line on literature on the basis of Rabindra Gupta's article—Bangla Pragati Sahityer Atmo-Samalachona, published in Marxbadi, No.5. (Rabindra Gupta was pseudonym of Com. Bhawani Sen, a member of the Polit Bureau.)

To facilitate the acceptance of the line, enunciated by Rabindra Gupta three representatives of the P.C.–Com. Promode Dasgupta, Com. Niranjan Sen and Com. Nripen Chakroborty, were deputed to meet the members of the PWA cell. At the meeting, the PWA cell was asked to consider the views expressed in Rabindra Gupta's article and submit their considered opinion to P.C. (It may be noted that the party was then functioning underground.)

Accordingly, a meeting of the PWA cell was arranged with Rabindra Gupta's articles as the sole agenda for discussion. The meeting was attended by comrades Niren Roy, Amarendra Prasad Mitra, Manik Bandopadhyay, Moni Roy, Mangala Charan Chattopadhyay and Narahari Kaviraj, all of them members of the cell. There was no absentee.

The meeting unanimously decided to reject Rabindra Gupta's thesis as unacceptable.

Rabindra Gupta's thesis raised a storm of controversy within the party among comrades working in the cultural front. A series of articles appeared on the pages of Parichay, the party's literary journal, most of which were sharply critical of Rabindra Gupta's line of thinking.

It was in this background, this Review Article (Fight against Bourgeois Nationalism on Cultural Front) was prepared and drafted by Narahari Kaviraj and sent to the Polit Bureau, on 01.03.51 with the permission of PWA cell of which he was a member.

1. AN INTRODUCTION

The Communists can justly be proud of being the most consistent fighters for freedom. It is they, who for the last twenty years, have consistently represented the conscious demands of the most revolutionary section of our people viz., the proletariat. The slogans "DOWN WITH IMPERIALISM" and "COMPLETE INDEPENDENCE" and the very thorough anti-imperialist programme were laid by them, while later the agrarian movement was put into motion solely on their initiative. The ALL INDIA TRADE UNION CONGRESS and the ALL INDIA KISHAN SABHA, which since their foundation were led by the Communists, have been the chief tribune of the working people. In the field of culture too, it is the Communists who have laid the beginnings of an anti-imperialist peoples' culture, democratic in content and national in form. The ALL INDIA PROGRESSIVE WRITERS'movement and the ALL INDIA PEOPLES' THEATRE movement have been the first to lay the beginnings of such a culture.

The revolutionary thoroughness of the Communists is admitted on all hands. What then is the source of their strength? Their strength lies in their nearness to the people. Through sun and shower they have stood by our people. So people love them and have come to like Communism. They can be hundred times more popular than they are today, if they can forge a closer link with our people, if they reflect their breath, if they speak their language.

Herein lies their strength. But they have their limitations too, and very serious limitations at that. On many occasions they have deviated from the Leninist path, vulgarised the consciousness of their class, and

wedded themselves to the worst excesses of bourgeois nationalism. During the period between the 1st and the 2nd. Party Congress, the chief mistake of the leadership of the then central committee led by P. C. Joshi, consisted in the renunciation of the independent role of the party. They failed to understand the historical role of the working class in a colonial country and trailed behind the bourgeoisie.

The obvious result of this in the cultural sphere was felt in the development of a doctrine of non-class culture. Substituting 'general interests' for the class interests of the proletariat, obliterating the boundary between the party, the working class and the people, by dulling the consciousness of the party members, bourgeois nationalism threatened the party with loss of its class orientation, with the danger of going over to the stand-point of the bourgeoisie.

In a word, ours was a wrong approach. Our understanding about our countrys social development during different historical periods was not only defective, in some places nothing other than social-reformist. Barring the work of Comrade Dange and a few other works of importance from other comrades, hardly any attempt was made to reach a scientific understanding of the social and cultural development of INDIA at any historical period from the stand-point of the world view of the proletariat. Having no independent point of view of our own, we succumbed either to the social demagogy of such big bourgeois ideologists as Nehru (did we not have illusion about Nehru's biographical work published in the thirties and his 'Discovery of India' published in the forties?), or trailed behind such social-reformist ideologists as Sree Dhurjati Prosad Mukherji, or Dr. Neehar Ranjan Roy or Dr. Bhupendra Nath Datta.

Particularly serious is our failure to make a correct appraisal of the historical forces during the long period of foreign capitalism. In many of our works we made a reformist rendering of Marx's famous "Letters on India" or of R.P.D.'s monumental work "India Today". We failed to recognise the peasantry as the motive force of struggle against foreign capitalism in the 19th century and either ignored or underestimated the role of the agrarian revolutions towards the development of forces of production. This led us to make an overestimation of the role of the bourgeoisie and to play into the imperialist ... de-colonising theory. In the

cultural sphere, this led to an overestimation of the cultural traditions of the bourgeoisie.

The reformist understanding appears prominently in many of the works of Bengali Marxists produced during this period. The works of Amit Sen (Notes on Bengal Renaissance), Gopal Halder (Sanskritir Rupantar, Bengali Sanskritir Rup), Hiren Mukherji (India's Struggle for Freedom), Benoy Ghosh (Banglar Nabajagriti), Narahari Kaviraj (Madhyabitta Kone Pathe) and most of the articles on the subject published in 'Parichay' during the period, suffered from such a mistake.

In the period beginning with the first imperialist war and the Russian Revolution of 1917, when the upper section of the bourgeoisie in India were showing the first symptoms of betraying the Indian Revolution till the announcement of the Mountbatten Award in August 1947, which saw the end of the process of the above betrayal, our understanding in the cultural sphere was blurred by an equally non-class national-reformist consciousness. Barring a few works of art produced by Sukanta Bhattacharya and stray poems-stories by others, hardly was the consciousness of our class reflected in our literature. Any glance at the literary creative writings of this period would make us aware of the alien trends (formalism in some cases and crude naturalism and slogan-mongering in the case of others), from which our works suffered.

This does not, however, mean that all the writings of this period were fruitless; on the other hand, the spade-work of this period will serve as the most valuable foundation of our more mature Marxist literature that is still to come. But we must not forget that only a principled criticism of our old mistakes can serve as a guarantee for our present success. Moreover, such a self-critical approach to our past mistakes is absolutely necessary to correctly evaluate our 'left' mistakes of the more recent period. Unless and until we are fully aware of our mistakes both of a right reformist and of a left adventurist nature we cannot expect to achieve a correct understanding which is the urgent need of the present.

The root of our reformist understanding lay in our slowness to understand the historical significance of the leadership of the working class towards the evolution of a new anti-imperialist people's culture. The cultural comrades were given an absolute charter of freedom. This

was in flat defiance of the Leninist Principle of Party Spirit in Literature. For this concession of freedom to cultural comrades was in reality a concession to petty-bourgeois individualism, a thing alien to Marxism. Lenin has sounded a sharp warning against such a phenomenon—"Not only in that for the socialist proletariat literature cannot be means of enrichment for individuals or groups, but in that it cannot be at all an individual affair independent of the proletariat as a whole. Down with non-party writers. Down with literary superman. Literature must become a part of the proletariat cause as a whole, a 'little wheel and screw' in the great one and individual Social Democratic mechanism set into action by the whole conscious vanguard of the working class. Literature must become an integral part of the organised, planned, unified work of the Social Democratic Party." (Party Organisation and Party Literature.)

The prolatarian writer does not need to disguise his views with the hypocritical slogan of non-partisanship. He openly joins the advanced class which is fighting to overthrew the system based on oppression, for the triumph of the loftiest ideals of mankind. The ideals of the proletariat are noble and pure; they are appreciated and cherished by all labouring humanity. The writer who devotes himself to the struggle for these ideals is openly partial. Herein lies the essence of the Leninist Principle of Party Literature.

The 2nd Party Congress failed to improve things in any way. The new Central Committee who interpreted the Party Thesis according to their lights, indulged in lofty left phrases about a 'struggle against reformism'. But actually under the cover of the left slogan of a socialist revolution, they perpetuated the basis of the old reformist line. As in the reformist period the interpretation of the struggle of the Indian Revolution was based upon the old conception of the overestimation of the role of the bourgeoisie. Joshi allowed the bourgeoisie the leading role in the national liberation struggle, Ranadive allowed the bourgeoisie the credit of the revolutionary task of liquidating imperialism in India and establishing a full-fledged bourgeois dictatorship. ("Struggle for People's Democracy and Socialism—some Questions of Strategy and Tactics",—"Communist", Vol. II, No. 4, 1949). This was tailism in its worst form. This was clearly a negation of the role of the working class. In the cultural field Robi, a close associate of Ranadive, dictated a 'party line'

quite in keeping with above political formulation. The key-note of this 'line' was an overestimation of the role of the bourgeois culture. Just as the state which Nehru came to represent was miscalled a 'bourgeois national state', (People's Democracy; Vol. II, No. I, "Communist", 1949), so the culture which they came to represent was miscalled a bourgeois national culture. Its compradore character was carefully concealed under the cover of the bombastic phrases of a fight for a 'socialist culture'. (Marxbadee—No. I, Sree Beeren Pal's article on Literature). This was a clear departure from the the New Democratic cultural line as envisaged by the Chinese Communist leader Mao Tse-tung.

The Editorial of "For a Lasting Peace, and For a People's Democracy", Jan. 27, 1950, came as a sharp rejoinder to all this filth and dirt so long ceremoniously dished out as cent percent Marxism.

The Editorial proves the utter falsity of the theory of the Congress having established a capitalist dictatorship in India. Giving lie to the 'theory' of liquidation of Imperialism in India, the Editorial asserts that "The interest of the British Imperialism remains, and octopus-like grips India in its bloody tentacles." In these conditions, the taske, as the Editorial points out, of the Indian Communists, drawing on the experience of the National Liberation movement in China and other countries, is, naturally "to strengthen the alliance of the working class with all the peasantry, ... on the basis of common struggle for freedom and national independence of their country, against the Anglo American Imperialist oppressing it and against the reactionary big bourgeiosie and feudal princes collaborating with them ...."

The main task of the Party at the present moment is to elaborate a full- fledged tactical line on the basis of the directives of the above Editorial. For as Lenin teaches us "The role of the vanguard fighters can be fulfilled only by a Party that is guided by the most advanced theory". The responsibility of the cultural comrades at this moment is very great. Like all other comrades in the T.U., K.S., S.F. or other mass fronts, the cultural comrades must contribute their might to the inner party struggle for the elaboration of a correct tactical line. For without a correct strategy, a correct political cultural line for the cultural front is unthinkable.

Any underestimation of the above inner party struggle on the part of the cultural comrades, springs from an erroneous conception of the relation between culture on the one hand, and politics and economy on the other. Any variety of culture, as it appears in a thought form is the reflection of the political organisation and economy of a specific type of society, the politics of which in its turn is the concentrated expression of the economic relations prevalent in the same. Conversely, the culture of a certain society exerts no small influence over the corresponding political and economic relations. This is our fundamental view point on the relation between culture, on the one hand, and politics and economy on the other; as also between politics and economy in relation to each other. Therefore, it is the specific forms of politics and economy that determine the corresponding forms of culture, which in turn exerts influence over the same forms of politics and economy.

So the question presents itself to us what is the specific form of politics, economy and culture, that we seek to destroy? What is again the specific form of politics, economy and culture that we seek to build up?

II. THE BOURGEOIS NATIONALIST VIEW OF THE INDIAN REVOLUTION

There are some people who would like us to believe that our society is no longer a colonial and semi-feudal one. According to them, we have outgrown that stage of social development and since the independence award of 1947, we have entered upon a stage of phenomenal independant capitalist development. They seek to prove that imperialism no longer remains. Lord Mountbatten has made a gift of independence to our country! India is now a Sovereign Independent Republic. The state that Mountbatten allows Nehru to build up is a National State, the economy that Nehru seeks to promote is a national economy, and the culture he seeks to foster is a national culture. And to signify this change we have a national administration in the place of the old imperialist administration, national reconstruction in the place of the old imperialist economy, and a national culture in the place of the old colonial culture as examples of which we have today a national library in the place of the old imperial library, a national archieves in the place of the old imperial archives, etc.

It is not, however, difficult to understand that it is the imperialists and their native agents who are spreading such ideas.

Workers, and mass of the peasantry and petty bourgeiosie have already from their life's experience learnt to give little credance to all such ideas. This explains Nehru's wide lack of popularity. This underlines the remarkable lack of enthusiasm about the grandiose schemes of national cultural reconstruction which Nehru, Azad, Munshi and Radha Krishnan seek so jealously to promote.

The fairly large number of workers' strikes, peasants' upsurge in the countryside, the students' struggle and the struggles of the middle class employees most under the leadership of the Communist Party, are positive evidences of organised resistance of the toiling people against these manouvres of imperialism and its native agents.

Nevertheless, the bourgeois nationalist traditions die hard. Illusion about the social domagogy of Nehru is still strong among a large section of the people. The leadership of the left parties, especially that of I.S.P., R.S.P. and certain sections of Forward Blockists in Bengal, who follow a right socialist line, endeavour constantly to plant fresh illusion in the minds of the backward sections of the working class, peasantry and the petty bourgeoisie.

But there are some concealed apologists of the Nehru order even amongst the vanguard section of the working class and they managed to penetrate even into highest positions of the Communist Party. They used their position to propagate their pet nationalist theories about India's ruling economy, politics and culture. Of these agents of the bourgeoisie in the party of the working class, Stalin wrote "We can always cope with open nationalism, for it can easily be discerned. It is much more more difficult to combat a nationalism which is masked and unrecognisable beneath its mask. Protected by the armour of Socialism, it is less vulnerable and more tenacious. Implanted among the workers, it poisons the atmosphere and spreads noxious ideas of mutual mistrust and aloofness among the workers of the different nationalities ..."

The chief mission of the bourgeois nationalists in the party of the working class is to adapt the internationalist policy of the working class to the nationalist policy of the bourgeoisie. So it is not surprising that the bourgeois nationalists in the Communist Party of India come to the same

conclusion as does Nehru regarding our ruling economy, politics and culture; although the arguments are very different, being camoufledged by lofty 'left' phrases. In chorus with Nehru, they acclaim ... the period of democratic revolution against imperialism is over and that the existing state is a National State (People's Democracy, pp. 8-9). Herein lies the totally new feature of the situation. The Thesis continues ... "In the earlier period the democratic revolution marched against imperialism, ... now its aim is to deliver the frontal blow against the power of the bourgeoisie itself ... It is missed by those ... who argue as if it is imperialism that is to be overthrown as in the earlier days." (Ibid). So with these bourgeois nationalists donning as Marxists our economy is no longer colonial economy., our administration is no longer colonial administration. Hence our perspective of the Indian revolution too is no longer that of a colonial revolution.

This bourgeois nationalist view of the Indian revolution had its starting point in some of the most authoritative speeches delivered during the Second Party Congress itself. (Feb-March, 1948). B. T. Randive in his Report on Right Reformist Deviation revised the elementary Marxist conception of the law of uneven development of capitalism and characterised the entire world bourgeoisie as reactionary in the period after the Second World War, forgetting the sharpening of the inner contradictions of the world capitalism and of the acute crisis of the colonial system. In another authoritative speech, Bhawani Sen indulged in a typically revisionist formulation on the subject of People's Democracy characterising it in all its stages as nothing other than the Dictatorship of the Proletariat. (Bhawani Sen's speech in the 2nd Party Congress– Document on Left Deviation, p. 42). Bhawani Sen went even further. He in an article, (Bangla Sahityer Kayekti Dhara) written under the pseudonym of Beeren Pal, much before the publication of Strategy and Tactics document (Marxbadee No. 1) anticipated the basic trotskyite formulations of our revolution being directed against the dictatorship of the bourgeoisie and not against the imperialism. (See his formulations on the United Front in Culture).

In its authoritative statement and articles such as, 'On Peoples Democracy', 'On the Agrarian Question in India', 'Struggle for a People's Democracy and Socialism', 'Some Questions of Strategy and

Tactics', and 'On Revisionism in the Light of Lenin's Teachings', the Polit Bureau of the Central Committee elected by the said Congress, (incidentally both Randive and Sen were very prominent members of this P. B.) developed these wrong formulations into a full-fledged trotskyite thesis.

The Trotskyite Polit Bureau started with the basic fact that the perspective of our revolution is not that of a colonial country but that of the revolution in Russia. This has been explicitly stated in the policy documents of the P. B. The General Secretary in his report on 'Strategy and Tactics' writes ... "It should be understood that whatever differences there might be between the industrial development in India and Russia before the Russian Revolution, they are not of qualitative character and that entire experience of the Russian Revolution is fully valid in case of India also." (p. 61)

Proceeding from this wrong premise, they sought to prove that during the last two decades there had been a fundamental change in India's ruling Economy. Speaking of the present they discovered that with the disintegration of feudal economy and an un-heard-of growth of capitalist relations, colonial economy in India had become out-of-date ('Agrarian Question in India', pp. 2, 12). Hence the perspective of Indian Revolution is, according to them, that of the revolution in capitalist countries. The Congress Govt. is described as an 'avowedly capitalist government', the Mountbatten Award and subsequent developments meaning a big shift in class relations. ('Strategy & Tactics', pp. 28, 29). Under the circumstances, the main enemy is no longer imperialism and the remaining feudal elements. On the contrary, the bourgeoisie become the sprearhead of Indian counter-revolution. The socialist character of the revolution is emphasised in the conception of the Democratic Front which is defined as the alliance of the working class, toiling peasantry and oppressed middle class. The forces of the revolution are as follows; ... the proletariat is the leader; its firm allies are the proletarians of rural areas and next to that, the poor peasants; the middle peasants, petty bourgeoisie and intelligentia all vacillate. As a policy document candidly admits, "this alignment itself is a striking illustration of the fact that the perspective of the Indian Revolution today is not different from the perspective of a socialist revolution in a capitalist country." (People's

Democracy ...)

We are of the opinion that this identification itself is a trotskyite nonsense. It is definitely against the fundamental position from which Leninism generally approaches the problems of revolutionary movement in colonial and dependent countries. What is most important, the fundamental idea contained in our colonial Thesis ... asks Lenin. He answers ... "The distinction between oppressed nation and oppressing nations. Unlike the Second International and bourgeois democracy, we emphasise this distinction ... This distinction, the idea of dividing the nations into oppressing and oppressed nations, runs like thread through all the theses, not only first theses which appeared over my name and which were published earlier but also through Comrade Roy's theses. The latter were written mainly from the point of view of the situation in India and among other large nationalities which are oppressed by Great Britain, and this is what makes them very important for us."

The fundamental mistake of our Polit Bureau is that they do not understand the difference between the one type of revolution and the other type of revolution.

III. TROTSKYITE VIEW OF INDIAN HISTORY

They identify the progress of the revolution in Russia, an imperialist country, which oppressed other peoples, with the revolution in India, an oppressed country, a colonial country which is forced to resist the imperialist oppression of other states.

Such is the un-Marxist and bourgeois nationalist outlook of our Polit Bureau. Having revised Marxism in the context of our present perspective of the Indian Revolution, they come to substitute a full-fledged bourgeois nationalist view of the laws of Indian social development in all historical stages. The theoretical organ, the Marxbadee elaborated the 'line' of the Polit Bureau. On their behalf, Rabindra Gupta and his associates were commissioned to invade the field of history and culture.

This revisionist view of Indian history and culture can be discerned from the pages of the Marxbadee, especially, from the context of the following articles .... (1) Beeren Pal (a pseudonym for Bhawani Sen, a member of the Polit Bureau) ... "Bangla Sahityer Kayekti Dhara" (or

"Some Trends in Bengali Literature") in Marxbadee No. 1, Oct. 1948; (2) Prakash Roy ... "Bangla Pragati Sahityer Atmo-Samalochana" or "Self-criticism of Bengali Progressive Literature" (Marxbadee, No. 4, July, 1949); (3) Rabindra Gupta (a pseudonym for Bhawani Sen) ... "Bangla Pragati Sahityer Atmo-Samalochana" or "Self-criticism of Bengali Literature" (Marxbadee No. 5 ...); (4) Naba Gopal Bandyopadhyaya ... "Unabingsha Shataker Banglay Bankim Sahityer Bhumika" or "Role of Bankims Literature in the 19th Century Bengal" (Marxbadee No. 6, Dec. 1949); (5) Booddha Deb Chattapadhyaya ... "Unabingsha Shatabdite Santhal Jagaran" or "Santhal Awakening in the 19th Century" (Marxbadee, No. 6, Dec. 1949); the articles referred to above represent the official view of then Trotskyite leadership of the Bengal Committee.

Of all these articles, however, the most important was No. 3, that by Rabindra Gupta, where the esteemed member of the Polit Bureau embarked upon the role of a petty bourgeois phillistine when he came to revise the views of Marx on the nature of the development of the Asiatic Society and the bearing of the role of foreign capitalism over the same as embodied in his famous "Articles on India". Like a typical bourgeois chauvinist of a colonial country, he idealises the past in order to dismiss the objectively regenerating role of the foreign capitalism in our country. Like a Narodnik, he visualises a rare democratic upsurge amongst peasants in Bengal in the 17th and 18th centuries, levelling down all feudal superstitions including distinctions of sex, etc. (Marxbadee, No. 5, p. 134) and releasing rare historical energies. This is in flat defiance of Marx's categorical assertion on the subject. Has not Marx declared unequivocally British rule in India as "an unconscious tool of history", having produced "the greatest and, so to speak, the only social revolution ever heard of in Asia". Explaining what he means by it, he writes elsewhere .... "However changing the political aspect of India's past must appear, its social condition has remained unaltered since its remotest antiquity, until the first decennium of the 19th century." (Emphasis ours). The above social condition, as Marx further elaborated it, condemned India to "an undignified, stagnatory, and vegetative life", to a "passive sort of existence". So the 'thesis' of a democratic ferment energising the Bengal peasantry in the 17th and 18th centuries is nothing

but a figment of imagination of a petty bourgeois intellectual. Thus the 'Marxist' Rabindra Gupta out-does Marx himself.

The root of the above mistake lies in a wrong understanding of the Marxian view of the dual role of foreign capitalism in India, especially in the underestimation of the objectively regenerating role of British rule in India.

And from the same wrong understanding flows another striking formulation about the historical development of India in the 19th century.

In his analysis of the historical development of India in the 19th century, Rabindra Gupta visualises an independent capitalist development of India, a continuation of the energising role of the peasant revolutions of the 17th and 18th centuries. Not only that, the independent capitalist development that he visualises for India in the 19th century is equal to that of Russia in the same period. And all this inspite of the domination of imperialism over India.

What is the root of this mistake? The root lies again in a wrong understanding of the dual role of foreign capitalism in India. This time Rabindra Gupta underestimates the destructive role of British rule in India. And thus he tries to revitalise the discredited theory of 'decolonisation' once put forward by the revisionists of the Second International, according to which the imperialists, as it were, promote the development and industrialisation of the colonies.

So there is logic behind Rabindra Gupta's inconsistencies. All his calculations about the historical development of India in the 17th or 18th or 19th century or of the present perspective of our revolution, are based fundamentally upon one thing viz., repudiation in all stages of development of the role of imperialism, and consequently renunciation in all stages of development of perspective of a colonial country, and substitution for it the perspective of the development of a capitalist country viz., Russia.

Proceeding from this analogy between India and Russia, Rabindra Gupta visualises the perspective of a peasant-bourgeois revolution for India by the middle of the 19th century. As in Russia, so in India, by the Sepoy Revolt of 1857, a large measure of capitalist development had taken place resulting in a differentiation of peasantry, with one section being promoted to the social status of the peasant bourgeoisie, and

another section going down and creating the conditions for the development of a large number of agricultural labourers. And the conflict between imperialism and these capitalist elements had matured to such a height that these resulted in the development of a bourgeois democratic revolution.

The Sepoy Revolt of 1857 is the first conscious bourgeois democratic revolution in India (Marxbadee, No. 5).

The Indigo uprisings and the Santhal insurrections which came after the Sepoy Revolt were equally conscious mass democratic movements obviously falling within the same period of bourgeois democratic revolution (Ibid).

This revolution was directed against imperialism and its native agents, viz., the feudal remnants and the bourgeoisie.

As in Russia, so in India, the bourgeoisie were counter revolutionary at every stage of the revolution holding a compradore position all through.

The leading forces of revolution, according to him, were the peasant-bourgeoisie again as in the Russian revolutionary movement of the Sixties, which, as Lenin called it, was a 'Peasant-bourgeois Revolution'.

Since 1860-70, the Indian revolution, however, underwent a qualitative change when the working class emerged as a Social force (Ibid).

Such is the priceless logic of Rabindra Gupta, a prominent member of the Polit Bureau.

But Rabindra Gupta makes fundamental errors. The analogy that he draws between India and Russia is wrong. Russia being an imperialist country, and India being a colonial country the stages of development of social forces in these countries are different. Rabindra Gupta is wrong when he underestimates the stage of capitalist development in Russia. He is equally wrong when he overestimates the stage of capitalist development in India.

Rabindra Gupta fails to comprehend the measure of capitalist development in Russian society in the Sixties and naturally also the nature of "the peasant-bourgeoies revolution" in Russia in the same period. The Russian experts give us the following description of the Russian society

between the years 1815 and 1853. "The distinguishing feature of the Russian empire in this period was that, owing to its backwardness, there were no profound contradictions in its military-feudal system....... Unlike the Western Countries, Russia had no developed and politically matured bourgeoisie. The working class as a revolutionary force did not yet exist. The millions of Russian serfs peasants, who formed an inexhaustiable source of man power for the state, represented an ignorant uncivilised and downtrodden mass. The isolated peasant revolts that did occur could not seriously weaken the power of the Tsarist police, army and bureaucracy." (Emphasis, our) (History of USSR Vol II, p. 183). Such were the conditions till 1853 of the Russian society inspite of the fact that Russia entered upon the path of industrial capitalism in the first quarter of the 19th century. (Ibid).

Compare this picture of Russia in 1853 with Rabindra Gupta's picture of India in 1857 with a mature peasant-bourgeoisie leading organised mass peasant revolts.

But towards the latter half of the 19th century capitalism in Russia entered a new higher stage. At the end of fifties capitalism had become firmly established in industry. Class differentiation was in progress in the country-side. A rural bourgeoisie came into being. The Land Reform of 1861 which abolished serfdom was a turning point in Russia's history. It greatly hastened the forces of industrial capitalism and the corresponding growth of the industrial proletariat. Between 1861 and 1881, the industrial proletariat developed as a new social force.

Corresponding to the above peasant-bourgeois economy of the sixties and seventies Russia developed a peasant-bourgeois revolution in the political sphere. The chief characteristic of the peasant-bourgeois revolution in Russia in the period between sixties and seventies was that it adopted a programme of revolutionary democracy and not that of a bourgeois democracy as Rabindra Gupta understands it. It championed the interests of serf peasants (and not those of the peasant-bourgeoisie). It advocated the utopian-socialist belief that the peasant revolution would enable Russia to avoid capitalism (and not towards its development) and pass directly to Socialism.

Summing up the degree of capitalist development in Russia, Lenin arrived at the following conclusion in his book "Development of

Capitalism in Russia", "It is clearly seen that on the one hand, commodity circulation and consequently commodity production is firmly established in Russia. On the other hand, it is clear that Russia is a backward country, compared with other capitalist countries in its economic development."

By the beginning of 1900's, Russian capitalism developed into imperialism, but in Russia imperialism bore numerous distinctive features. Lenin and Stalin called it militarist feudal imperialism. The bourgeois democratic revolution in Russia too bore distinctive features in that it was the first bourgeois democratic revolution to take place in the epoch of imperialism. The Russian bourgeois democratic revolution of 1905 differed from all bourgeois revolutions that had taken place in Europe. Those revolutions were led by the bourgeoisie. The Russian revolution was led by the proletariat. The Russian bourgeoisie sought to strike a bargain with Tsarism. Hence they were counter-revolutionary. Such are the pre-requisites and also the perspective of the bourgeois democratic revolution in Russia.

Only an ignoramus can compare the material conditions in India with those in Russia in the 19th century or in the 20th. It is true, Russia lagged much behind the Western countries in its social development, but it is silly to forget that India being chained to colonial domination, could ever attain that much of development. It is in flat contradiction with the directives embodied in the Suplementary Theses for the Second Congress of the Communist International which deal with the revolution in China and India, where it is explicitly stated that in those countries "foreign domination perpetually hinders the development of social life."

Elaborating the distinction between the revolution in Russia and that in China, Stalin writes, ... with Russia in 1905, "the revolution was directed against the bourgeoisie, against the liberal bourgeoisie, inspite of the fact that it was a bourgeois democratic revolution. Why? Because the liberal bourgeoisie of an imperialist country is bound to be counter-revolutionary." But ... Revolution in colonial and dependent countries is another thing; in these countries the oppression exercised by the imperialism of the other states, is one of the factors of revolution, the oppression cannot but affect the national bourgeoisie also; the national bourgeoisie, at a certain stage and for a certain period, may support the

revolutionary movements of its country against imperialism, and the national element, as an element in the struggle for emancipation, is a revolutionary factor. Not to make this differentiation, not to understand this difference and to identify revolution in imperialist countries with revolution in colonial countries, is to depart from the road of Marxism, from the road of Leninism, adopt the road of those who support the Second International.

It is this difference again which explains the delayed growth of social forces in a colonial country. Thanks to imperialism, social development is hindered at all stages. In India the bourgeoisie appears as a social force only as late as seventies of the last century, and the working class emerged as a social force, as Lenin himself puts it, as late as 1908. Hence the period of the bourgeois-democratic revolution in Asia begins when Europe had outgrown that stage of revolutionary movement. As Lenin himself puts it ... In Western, continental Europe, the period of the bourgeois-democratic revolutions embraces a fairly definite portion of time, approximately from 1789 to 1871. This was precisely the period of national movements and the creation of national states... In Eastern Europe and in Asia the period of the bourgeois-democratic revolution only began in 1905. The revolution in Russia, Persia, Turkey and China, the wars in the Balkans, such is the chain of world events of our period 'in our Orient'. And only the blind can fail to see in this chain of events the awakening of a whole series of bourgeois-democratic national movements, strivings to create nationally independent and nationally uniform states. (Lenin's Selected Works .... Moscow Two Volume Edition, p. 572)

Hence Rabindra Gupta's theory of a bourgeois-democratic revolution taking place in 1857, and the working class emerging as a force in 1860–70, is all myth. It is a slavish logic of a worst apologist of imperialism, a continuator of the rotten traditions of the opportunists of the Second International, who impart to imperialism the so-called civilising role. It is tantamount to admitting that, due to the munificence of imperialism the bourgeois-democratic reformation of India has already been consummated and India is already an independent national state.

Such is the much discredited theory of decolonisation which Randive and his associate Rabindra Gupta sought to rear up again from within the

Communist Party of India at the behest of their ideological guide ...... Kardelji.

IV. THE BOURGEOIS NATIONALIST VIEW OF THE CULTURAL REVOLUTION.

Corresponding to these political formulations, Rabindra Gupta arrived at the following cultural formulations. Being himself one of the most important members of the Polit Bureau, he took upon himself the task of formulating a 'party line' on literature. There was nothing wrong in this attempt. But what was wrong was how and what he dictated as a 'party line'.

The perspective of the cultural revolution which Rabindra Gupta held up before us as early as in October, 1948, (Beeren Pal's article on Bengali Literature, Marxbadee, No. 1) was that of the cultural revolution in an imperialist country. The perspective of cultural revolution in a colonial country was completely placed above board. Our cultural revolution was proposed to be directed against decadent bourgeois culture. Its object was to build up a socialist culture. The fight against any form of colonial and semi-feudal culture was not even thought of.

The article by Prakash Roy in July, 1949 (Marxbadee, No. 4) re-iterated this objective with redoubled emphasis. He chastises the then Editors of 'Parichay' the highest theoretical-cultural organ of the Bengal Committee, because they failed to give a call to the building up of 'a living proletarian culture' throwing overboard the 'rubbish of a decadent bourgeois culture'. (PIII). Prakash Roy along with it posed socialist Realism as an immediate fighting slogan (p. 129). Last came an article by Rabindra Gupta himself which sought to finalise this controversy in favour of the left trend so long advocated by Beeren Pal, Prakash Roy and the like. Summing up the discussion, he gave a call for a Democratic front in culture which should be composed of only Communist and near-Communists. For according to him, the progressives in the cultural field are those who have forsaken the path of Gandhism and are on the way to Marxism, although they might not accept all the tenets of the Marxist outlook (Marxbadee No. 1, p. 96 and Marxibadee No. 5, p. 167).

This is in flat contradistinction to the perspective of the cultural revolution in a colonial country as given by Comrade Mao Tse-Tung in

his epoch-making Thesis China's New Democracy, "The culture of the New Democracy" as Mao writes, "is the proletarian-led, anti-imperialist and anti-feudal culture of the people" (New Democracy). Quoting Mao, Kuo Mo-Jo writes, in his political field, "We have a broad and consolidated united front. Our united front is so broad that it includes the working class, the peasantry, the petty bourgeoisie and national bourgeoisie." Kuo Mo-Jo continues ... "The same applies to literary and artistic united front. Writers and artists should first of all be united politically within the scope prescribed by Chairman Mao. In the literary and artistic united front, as in the political one. There are naturally as many different view-points in regard to literature art as there are different classes." (Kuo Mo-Jo ... The United Front in Literature and Art ... China Digest, Vol. 1, No. 1, 1950).

The root of this mistake, as we know springs from a wrong parallelism of a cultural revolution in a colonial country with that in an imperialist country, for example, Russia.

Proceeding from this wrong premise, Rabindra Gupta like a Russian Narodnik, idealises the Indian feudal society in the 17th and 18th centuries. While Marx considered the social condition in India until the first decennium of the 19th century, extremely 'stagnatory and vegetative' which 'restrained' the human mind within the smallest possible compass, making it the unresisting tool of superstition, enslaving it beneath traditional rules, depriving it of all grandeur and historical energies, (Marx ... British Rule in India), Rabindra Gupta saw a pulsating life and an energising movement within the Indian Society during the same period, which was reflected in a thought from in the new 'democratic literature' of Bharatchandra and Alwal. As Rabindra Gupta writes ... As against feudal classes, the peasantry figure prominently in this literature. As against social orthodoxy, equality of sex and community were being proclaimed in such literature. (Marxbadee, No. 6).

Every honest reader knows that this sheer overestimation of the literature referred to this overestimation again springs from an overestimation of the contradictions that generated within the womb of the then feudal society.

Proceeding from the same premise Rabindra Gupta visualises a great period of peasant-bourgeois revolution in India (as in Russia) during the

period of 1857–70 in which the bourgeoisie played at all stages a reactionary role. The picture of the cultural revolution during this period, which Prakash Roy and Rabindra Gupta hold up before us, is in a thought form the reflection of this economic political development.

Hence as in Russia, so in India during 1857–70, there could be two cultures. (1) The culture of the enemies, i.e., the culture of the imperialists and their partisan, i.e., feudal classes and the bourgeoisie, (2) the culture of the people i.e., the culture of the peasant bourgeoisie and the agricultural proletariat.

Ram Mohan, Bankim Chandra, Vivekananda, even Rabindranath being representatives of bourgeois culture, were dubbed up as imperialist partisans.

Rabindranath was particularly singled out for an all-round attack. He was denounced as a communalist, the spiritual guide to Savarkar. In anti-communism he is said to have anticipated the present congress leaders. In many respects, he is condemned as having sunk lower than even Gandhi. (Marxbadee, No. 5).

On the other hand, the revolutionary democratic culture which reflected the strivings of the peasant bourgeoisie, were represented chiefly by the peasant bards whose works have chiefly disappeared through the deliberately planned annihilation by the imperialists. Under the circumstances, Rabindra Gupta suggests we must get a glimpse of that literature from existing pages of the work of such writers as Kali Prasanna Sinha, Dina Bandhoo Mitra, Michael Madhu Sudan and Nazrul, who being partisans of the revolutionary camp reflected to some measure, inspite of their vacillations, the above peasant bourgeois trend in culture. And this peasant bourgeois trend in Indian literature is a counter-part of the Russian peasant bourgeois literature as represented by Chernichevsky and Plekhanov. (Marxbadee No. 5).

Rabindra Gupta vulgarises the Leninist conception of the revolutionary democratic tradition in politics and art. This specific form of politics and culture was suited to the particular stage of the historical development of Russian society where peasant bourgeois class, on the one hand, and the treachery of the liberal bourgeoisie, on the other, a revolutionary democratic movement and a revolutionary democratic culture could be ushered into existence. Speaking of the literary work of

Herzen who was the first amongst the great Russian revolutionary democrats, Lenin writes ... "His work was a product and reflection of that epoch in world history when the revolutionism of the bourgeois democracy was already passing away (in Europe), and revolutionism of the socialist proletariat had not yet ripened." Herzen exposed the hypocrisy of the nobles and also of the liberals. Of him Lenin says ... "Herzen was turning his gaze not to liberalism, but to the International ... to the International led by Marx." Herzen, Belinsky, Chernyshevsky, Dobrolyubov ... the stalwarts amongst the Russian revolutionary democrats ... fought not only against feudal autocracy but also against the treachery of the liberals. Lenin called Chernyshevsky ... the great socialist of the pre-Marxian period. He was follower of the materialist Feurbach, an immediate predecessor of Marx. He wanted Russia to avoid capitalism and pass directly to socialism. Lenin regarded him as a "remarkably profound critic of capitalism."

Only an ignoramous can compare Chernyshevsky with Dina Bandhoo. In India, where capitalist development was retarded by imperialism, such a phenomenal peasant bourgeois revolution was out of the quesiton. Secondly, the colonial character of the Indian revolution made the national factor important in India, imparting to national capitalism and the national bourgeoisie a revolutionary role. Unlike Europe, the revolutionism of bourgeois democracy in Asia was a progressive and a revolutionary factor in India. The proletariat having not yet emerged as a social class, the talk of socialist phrases even in their utopian forms was out of the question. Hence any comparison of the literature of Michael, Kali Prasanna, or Dina Bandhoo with the spirit of Russian revolutionary democratic literature is born out of wrong historical parallelism. How could Dina Bandhoo and Kali Prasanna be critical of national capitalism which was just a progressive force helping to build a new society? This is arrant nonsense.

To draw any line of division between Ram Mohan, Bankim Chandra and Rabindranath on the one hand, and Michael, Dina Bandhoo and Nazrul on the other, is unscientific and arbitrary. On the contrary all of them played an equally progressive role in that their writings breathed a spirit of bourgeois nationalism.

Such is the 'party spirit' which Rabindra Gupta dictated in the

sphere of politics and literature. Rabindra Gupta knew full well that the 'discoveries' he had made were contrary to socio-economic analysis of the Indian historical development as embodied in R.P.D.'s monumental work, "India Today". Hence clever attacks were made against him, he was even accused of being under the influence of imperialist ideologists. Slandering R.P.D. was nothing new. It was a link in a chain of events which led to the denunciation of other brother parties and their leaders, especially Mao Tse-Tung. ... Of all the crimes that the bourgeois nationalists and Titoites had committed against all tenets of proletarian internationalism, slandering brother parties was one. As for R.P.D. ... he has from the very beginning of the activities of the C.P.I. been associated with it as its unfailing friend who has always intervened in moments of crisis within our party. Hence it was not unlikely that an attempt was made to counteract his sober influence within the party, for this could clear the way to the propagation of Titoite pseudo-Marxist theories. The attack on R.P.D. has been made in a very subtle manner, and poisoned the atmosphere for long, all sorts of rumours were spread doubting the validity of the analysis made by R.P.D. in 'India Today' ... leading to the suspension of the translation of his works into Bengali for a pretty long time. This aspect of the crime of the Titoites in India has not received the adequate exposure that it deserves. It is the task of the party as a whole and of the cultural workers in particular to point out the venality of this aspect of the game of the imperialist agents within the party.

V. RABINDRA GUPTA'S LINE IN PRACTICE

Rabindra Gupta, however, could not be expected to have just penned down a 'line'. He was alert and perservering to have his 'line' translated into practice. With the toga of the Polit Bureau in his hand he ordered the cultural comrades to carry out this 'line' under threat of expulsion. He selected some of his docile lieutenants from amongst immature comrades and wanted that the political-tactical line of his Polit Bureau be reflected directly in art. To keep up this demand, a whole lot of vulgar literature appeared on the scene. Any one who is familier with the pages of "Parichay", "Ispat" and "Fatwa" during this period, knows how the words of Rabindra Gupta were parroted by a host of young enthusiasts and how these were rendered into lines of 'poetry'. These poems and

also some songs composed by IPTA comrades and published in the form of a booklet, are an adequate indication of what trash bourgeois nationalism is capable of producing in the era of imperialism and that from inside the party. These 'poems' were worse than cheap picture-posters of commercial advertising company. The 'songs' of IPTA were described by IPTA comrades themselves at later period in a self-critical review as 'advertisement notices of a veneral disease specialist'.

The above line of Rabindra Gupta worked havoc in matters of organisation. A large majority of party writers who refused to be convinced of the 'line' of Rabindra Gupta were described as disloyal, petty bourgeois academicians and cowards. They were described, in the words of the old P.C., as comrades 'on strike' and orders were issued to follow a line of split against them. Under the pretext of disloyalty, many comrades were expelled, suspended, dropped and many of them left inactive. The Progressive Writers' movement was turned into an appendage of the Communist Party. All democratic elements were purged out. A mechanical levelling was made of art and politics. Art was given a decent burial. In course of a few months Progressive Writers' movement withered into nothingness. The fate of IPTA was equally decided. In the name of serving the messes, the provincial IPTA unit was decentralised. Unreal slogans were rendered into songs and dramas which isolated it from the love of the people and prepared the way for ruthless repression by the Government. Gradually all democratic elements were purged out as cowards. All honest comrades rotted and were either rendered inactive or turned into passive supporters of a wrong that they could not undo. Demoralisation and degeneration set in.

Party artists too were equally victims of this wrong lead. Creative art was denounced by all means, slogans were ordered to be rendered into posters. A lot of vulgar posters appeared on the scene. The effects were all too obvious. The artist group was isolated from all democratic artists and their work was denounced by all men of goodwill as vulgar art.

The movement of radio and cinema artists which had just started and showed signs of a bright prospect, was equally disrupted by our wrong line. This resulted in a thorough demoralisation and disorganisation from which it will take pretty long time to recover.

Such is the extent of havoc which bourgeois nationalists and Titoites

wrought upon the cultural front in Bengal which was one of the strongest potential bases of the party in the period preceding the Second Party Congress.

In the name of popularisation, literature and art were vulgarised to satisfy the tastes of the backward sections of the readers, to pander to their primitive instincts. Lenin sounded a sharp warning against both such politicalisation and so-called popularisation of literature.

Marxists never believe in any such rigid parallelism between literary and political development. Lenin warned against a primitive interpretation of the principle of Party spirit of art. He pointed out that this principle does not imply gross intrusion in sphere of artistic creation. "It goes without saying" he wrote, "that literary activity is least of all subject to mechanical equalisation or levelling, to the domination of a majority over a minority. It goes without saying that in this sphere it is absolutely necessary to ensure larger scope for personal initiative and individual inclinations, full play for thought and imagination, form and content. All this goes without saying. But all this only proves that the literary cause of the Party of the proletariat cannot be mechanically identified with other parts of the party cause of the proletariat."

Again, while demanding that literature must be accessible to the working masses, Lenin taught, "not to fall into vulgarisation, not to descend to the level of the undeveloped reader, but steadily ... to raise his level of development". He continues ... attention must be devoted principally to the task of raising the workers to the level of revolutionaries, and to degrading ourselves to the level of the 'labour masses' ("WHAT IS TO BE DONE").

Hence the writer has no right for the sake of popularisation to trail behind the reader, but on the contrary, must take the lead. The writer who produces crude literature, walks behind the reader, whereas he ought to be little ahead of him.

Just as in politics, Rabindra Gupta's analysis is an epitomisation of the consciousness of the backward worker (that is why he is a bourgeois nationlist), so the literature of his followers was a crude literature which symbolised the consciousness of the backward workers. It was a thorough vulgarisation of the Leninist Principle of Party Spirit in Literature.

VI. OUR PRESENT TASKS

What then are our present tasks?

The present task of the cultural comrades is one and only one. It is to bury the past, to break away from all shades of bourgeois nationalism whether from left or right and to establish Marxism in the cultural front. Hence our tasks are as follows—

1) To formulate a draft tactical line for the cultural front in the light of the broad features of the strategy embodied in the LPPD Editorial of Jan, '50 and the CPGB Letter and circulate it for discussion.

2) To prepare an organisational report on the cultural movement in all its aspects during the period of Right Opportunism as also the period of Left Adventurist Polit Bureau.

3) To make self-critical review of the articles that have appeared criticising the line of Rabindra Gupta, e.g., Neeren Roy's article, also those by Animesh Roy, Sateen Chakravarty, Sanat Bose, etc.

4) To hold a cultural convention of party writers and artists to adopt the draft political-cultural line, the organisational report and finally to elect a new leadership.

5) Simultaneously with preparatory tasks for the proposed Cultural Convention, we should immediately take up the long-term task of preparing tracts on economic, political and cultural events in the 19th and 20th centuries and properly evaluating the works of Ram Mohan, Bankim Chandra, Michael, Vivekananda, Rabindranath, Nazrul, etc., from the working class point of view on the lines of approach to the problem suggested by Soviet Academicians like Zhukov, Dyakov, etc., and such specialists on the colonial question as Mao Tse-Tung and R.P.D.

টিকা : নরহরি কবিরাজের এই দুষ্প্রাপ্য দলিলটি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। এটি তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন যাতে আমরা তৎকালীন প্রগতি সাহিত্য বিতর্ককে বোঝবার জন্য কাজে লাগাতে পারি। আমরা পুরো প্রবন্ধটিকেই সহায়ক তথ্য হিসাবে সংযোজিত করাটাই সমীচীন মনে করেছি। — সম্পাদক

একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী

ভবানী সেন

সামাজিক পটভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর পুরো একটি শতাব্দী কেটে গেল, পূর্ণ হয়ে গেল ভারতের জাতীয় জীবনের একটি সম্পূর্ণ মহাযুগ। কবিগুরুর জন্মকালটি ছিল ভারতীয় ইতিহাসের একটি মহাসন্ধিক্ষণ। ১৮৫৭ সালের জনবিদ্রোহ যে আগুন জ্বেলেছিল তা তখন নির্বাপিত, কিন্তু তার স্মৃতি তখনও জাগরুক। জাতীয় জাগরণের জন্য ভারতীয় জনমনের মর্মস্থলে তখন যে অস্পষ্ট রূপরেখা রচিত হচ্ছিল, নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনায় তা ভরপুর, পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বোঝাপড়া তখন প্রত্যাসন্ন। ভারতের সামাজিক এবং নৈতিক প্রগতি কোন পথ ধরে চলবে, কোন পথে হবে নূতন জাতি-সৃষ্টি, এই আত্মচিন্তা তখন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। তারপর একশো বছর পরে আজ দেখা গিয়েছে নূতন আত্মচিন্তা,—স্বাধীন ভারত কোন পথ ধরে এগোবে। মাঝখানে পড়ে রইল যে একশো বছরের ইতিহাস তার প্রতিটি অধ্যায় কবিগুরুর বিচিত্র সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম সমাজের নবীনতম মহাজাতিরূপে উদয়ের পথে সুখে-দুঃখে জয়-পরাজয়ে মহাকবির গীতিকাব্য তাকে সর্বদা সজীব করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন যখন শুরু হয়, বাংলায় তখন নূতন চেতনা, নূতন মূল্যবোধ, নূতন রসোপলব্ধি এবং নূতন গণ-অভিযান ধীরে ধীরে জন্মগ্রহণ করছে। ইতিহাস শুরু করে 'আধুনিক' যুগের সৃষ্টির কাজ।

মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু ও কালীপ্রসন্ন, টেকচাঁদ ও অক্ষয়কুমার ইতিপূর্বেই বাংলার সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে নবযুগের নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছেন, সমাজ-সংস্কারকেরা উদ্যমে ও কর্মপ্রবাহে মধ্যযুগীয় সামাজিকতাকে আঘাত করেছেন, তুলে ধরেছেন নূতন সমাজের প্রগতিশীল লক্ষ্যকে; তারই পাশাপাশি উপর্যুপরি কৃষকবিদ্রোহ থেকেও তখন জন্ম নিয়েছিল নূতন সমাজের নূতন ভাবজগত। সে যুগের নীলবিদ্রোহ এবং একাধিক প্রজাবিদ্রোহ প্রতীক ওই ভাবসম্পদ তা না হলে হয়ে পড়তো বন্ধ্যা। (সম্ভবত কোন গুরুতর মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে— সম্পাদক)

১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত, এই ত্রিশ বছর ধরে ভারতে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের যে তীব্র সংগ্রাম চলে তারই ভেতর দিয়ে তখন জন্মগ্রহণ করছিল এক সৃষ্টিশীল সংস্কৃতি, ভারতের আধুনিক জাতীয় আন্দোলন হলো তারই সহজাত শক্তি; তারই পুরোভাগে আবির্ভূত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টির সম্পূর্ণ ও অখণ্ড এক ইতিহাস। এই আবির্ভাব আকস্মিক নয়, অলৌকিক নয়; প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সমাকুল এক ঐতিহাসিক মহাযানে রবীন্দ্রসৃষ্টির এই

সমারোহময় উদ্বোধন যেমন প্রত্যাশিত তেমনই স্বাভাবিক। শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র একটি যুগ।

রবীন্দ্রযুগ হলো বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের উত্থান এবং অবসান,—এই দুইটি যুগের সমষ্টি, তাঁর সৃষ্টিশীল সাধনা ছিল ইতিহাসের একটি নয় দুইটি বিশিষ্ট যুগে পরিব্যাপ্ত। বিশ্বের মানুষ তখন যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছে ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে মহাকালের যাত্রাপথ অনুসরণ করে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহান শিল্পী। সৃষ্টিশীল মহৎ শিল্পের বৈশিষ্ট্যই হলো যুগের সমগ্র সত্তাকে প্রতিফলিত করা। তাই সেই যুগের সমস্ত সত্তা, সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং সমস্ত ধারা তাঁর বিপুল এবং ব্যাপক সৃষ্টির মধ্যে বর্তমান। বিজ্ঞানের বিকাশে প্রকৃতির উপর মানুষের জয়যাত্রা যখন শুরু হয়ে গেছে, অথচ সমগ্র এশিয়া এবং আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত বিজয়োল্লাসে বহু জাতির স্বতন্ত্র সত্তা যখন বিলুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ তখন তার সৃষ্টির কাজ শুরু করেন, আর যেদিন এই মহান শিল্পীর সৃষ্টির উপর যবনিকা পড়লো সেদিন সেই সাম্রাজ্যবাদের শেষ সংকট সমুপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার ইতিহাসের দুটো যুগ দেখে গেছেন। সামন্তবাদের অবসান ঘটিয়ে ধনিক সভ্যতা যখন সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে, আবার ধনিক সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের প্রথম ভিত্তি যখন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে—এই দুটো যুগ ধরেই রবীন্দ্রনাথ নিরবচ্ছিন্নভাবে শিল্প সৃষ্টি করছেন এবং যথাসম্ভব অংশ গ্রহণ করেছেন জাতীয় জীবনের নানাবিধ প্রগতিশীল আয়োজনে। তিনি দেখেছেন ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের উদীয়মান সৃষ্টিশীল অবদান, তিনি দেখেছেন দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র অভিযান, তিনি দেখেছেন এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির বহু অভ্যুত্থান; দুই দুটো সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ, সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম সংকট—এ সবই ছিল তাঁর সৃষ্টির উপাদান। ইতিহাসের এই দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল আবর্তন দেখবার মত দৃষ্টি তাঁর ছিল, ছিল অনুভব করার মত প্রাণ এবং সেই অনুভূতি প্রকাশ করার শক্তি। তাই তাঁর সৃষ্টি হয়েছে অভূতপূর্ব যার মূল্য ও সৌন্দর্য কখনও ম্লান হবার নয়, ইতিহাসের রথচক্রতলে যা কখনও পিষ্ট হবে না, চির অম্লান যার মাধুর্য যুগযুগান্ত ধরে মানুষের অন্তরাত্মাকে বলদীপ্ত করতে সক্ষম।

ধনিক সভ্যতার সৃষ্টিশীল পর্বের প্রদোষকালে রবীন্দ্রনাথের শিল্প সৃষ্টি শুরু হয় এবং তা সমাপ্ত হয় সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার ব্রাহ্মমুহূর্তে; তাই তাঁর সংস্কৃতিতে পাই দুই সভ্যতারই ঐতিহাসিক মর্মবাণী, তাই তাঁর সংস্কৃতি সর্বদা সৃষ্টিশীল, সর্বদা বৈচিত্রময় এবং সর্বদা যুগসীমা অতিক্রান্ত। মহান শিল্পীর সৃষ্টিতে এই দুই যুগের নৈতিক বাণীই শুধু নয়, দ্বন্দ্ব সমূহও প্রতিফলিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে কিছু লেখা কিম্বা কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন, সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। একদিকে নিছক স্তোতবাক্যে তাঁর সৃষ্টিশীলতার অবমাননা এবং অপরদিকে অপরিণত সমালোচনা দ্বারা তাঁর মূল্য উপলব্ধির অক্ষমতা—প্রতিপদে এই দুই রকম ভুলেরই সম্ভাবনা আছে।

রবীন্দ্র সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথ যে বস্তুবাদী ছিলেন না, ছিলেন ভাববাদী সে বিষয় বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ভাববাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বহুলাংশে বাস্তবতাময়। 'গীতালি', 'মহুয়া' এবং 'পূরবী'তে পাই ভাববাদী চিন্তাধারার চরমোৎকর্ষ বাস্তবধর্মবর্জিত নিষ্কর্ষিত প্রেমের গীতিকাব্য।

ভাববাদী কবিদের মধ্যে এমন একটি সুর থাকে যা মানুষকে বাস্তব সংগ্রামে বিমুখ করে তোলে, পলায়নের মনোবৃত্তি যোগায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবাবেগ সে জাতের নয়। মানুষকে মানুষ হিসেবে উন্নত করবার জন্য যে আদর্শবাদের প্রয়োজন হয়, তা কোন বস্তুবাদী অস্বীকার করে না, বা বস্তুবাদের সঙ্গে সেই আদর্শবাদের কোন বিরোধিতা নেই। রবীন্দ্রনাথ ভাববাদের দিক থেকে হলেও সেই আদর্শ-পরায়ণতার জয়ধ্বনি করেছেন। বস্তুবাদী না হলেও তাঁর মন ছিল বাস্তবতায় স্পর্শকাতর, তাই 'নৈবেদ্য'র মধ্যে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে আদর্শবাদকে ভাববাদের দৈন্য থেকে মুক্ত করে সুস্থ সামাজিক আদর্শের অনুকূলে রূপায়িত করেছেন। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়', 'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা', 'যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'—এই সমস্ত ঘোষণাই কবির ভাবাদর্শের বাস্তবানুগত দিক, যা নূতন জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির উপাদান। ভাববাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের এবং প্রগতির যে বিরোধ, রবীন্দ্রনাথ তাকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। বলাকার মত মহাকাশে বিচরণ করতে করতে মাটির টানে মর্তে নেমে এসেছেন বারংবার, আবার মর্তের পঙ্কিলতায় অতিষ্ঠ হয়ে আকাশে উড়ে গেছেন কতবার। 'ভাববাদ' মানুষকে জীবন সংগ্রামে নির্লিপ্ত ও নৈরাশ্যবাদী করে দেয়, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য' সেই অবসাদের সুর থেকে মুক্ত। প্রেম ও সৌন্দর্যকে তিনি বাস্তব জগৎ থেকে অবিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তার নিষ্কর্ষিত রূপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের মধ্যে জীবনবাদের বিরোধী কোন সুর নেই, যদিও ভাববাদের সঙ্গে জীবন্ত সত্যের বিরোধিতাই চিরন্তন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে-ভাববাদ যদি জীবন্ত সত্যের বিরোধীই হবে তা হলে রবীন্দ্রনাথ কেমন করে ভাববাদের আশ্রয় থেকে জীবনের মহাসত্যকেই রূপ দিতে পারলেন, কেমন করে তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো ভাববাদের উর্ধ্বে উঠে, যে সত্য বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের একান্ত নিজস্ব, তাকে উজ্জীবিত করা? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে তিনি ছিলেন মহান শিল্পী এবং মহান শিল্পীর সৃষ্টি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এই যে সত্য তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তাই তাঁর মনের মধ্যে ছিল এমন একটি সত্যানুসন্ধানী আবেগ যা তাঁকে তাঁর দার্শনিক বিশ্বাসের উর্ধ্বে তুলে ধরেছে, অতিক্রম করে নিয়ে গেছে তাঁকে সেই ভাববাদী দর্শনের সীমা থেকে—যা রূপকে মনে করে ভাবের ছায়া মাত্র, ভাবকেই মনে করে আসল সত্তা। উপনিষদের প্রতি কবির আস্থা তাঁকে সেই ভাববাদের আকাশে বিচরণ করালেও, শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে কবির অবচেতন মন আবিষ্কার করেছে—"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।" বলাবাহুল্য, এই অনুভূতি, ভাবের সঙ্গে এই আত্মীয়তাই রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনটিকে জীবন্ত সত্যের সংস্পর্শে রেখে দিত। বস্তুবাদ না হলেও ঠিক ভাববাদও নয়, এ দর্শন হলো সর্বাস্তিবাদ তথা বৌদ্ধ বাস্তবতার অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে—আমি সমগ্রকেই মানি, গাছ যেমন আকাশের আলো থেকে আরম্ভ করে মাটির তলা পর্যন্ত সমস্ত কিছু থেকে ঋতু-পর্যায়ের বিচিত্র প্রেরণা দ্বারা রস ও তেজ গ্রহণ করে তবেই সফল হয়ে ওঠে— আমি মনে করি আমারও ধর্ম তেমনি—সমস্তের মধ্যে সহজে সঞ্চারণ করে সমস্তের ভিতর থেকে আমার আত্মা সত্যের স্পর্শ লাভ করে সার্থক হতে পারবে।"

—রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৯৪

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন এবং এই দর্শনই তাঁকে পরিচালনা করেছে শিল্পসৃষ্টির কাজে। তাঁর এই জীবন দর্শনের ভিতরই ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব বর্তমান। এই দ্বন্দ্বই রাবীন্দ্রিক শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর সৃজনশীলতার প্রধান উপাদান। এই জীবন দর্শন অনুসরণ করেই তিনি তার সুদীর্ঘ জীবন ধরে যুগ থেকে যুগান্তরে অতিক্রম করার সময় নিত্য নবযুগের উপযোগী প্রগতিশীল ভাবধারাকেই অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। দ্বন্দ্ব-সমাকুল এই ভাবধারাই আবার সত্যানুসন্ধানে সমস্যা সৃষ্টি করেছে ইতিহাসের জটিল রাজপথের মোড়ে মোড়ে। শুধু তত্ত্বের সাহায্যে যখনই সত্যাসত্য নির্ধারণ করতে গেছেন তখনই ভুল করেছেন, ভুল শুধরেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে। ভুলের এই সংশোধনই তাঁর মহত্ত্ব।

সামন্তবাদের বিরুদ্ধে উদীয়মান ধনিক সভ্যতাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন কিন্তু ধনিক সভ্যতার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও তাঁকে প্রপীড়িত করেছে, এ দ্বন্দ্বের সমাধান ছিল তাঁর অজ্ঞাত। সামন্ত সমাজের কুসংস্কার ও ব্যক্তিপীড়নের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের বিজ্ঞানানুগত্য ও ব্যক্তিত্ববাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থগৃধ্নুতা ও যন্ত্রসর্বস্বতা ছিল তাঁর চক্ষুশূল। এই সমাজেরও সমস্ত ভড়ং তিনি ধরে ফেলেছেন, দেখতে পেয়েছেন মানুষের প্রতি মানুষের নির্যাতন এবং ব্যক্তিমনের নিষ্পেষণ, 'মুক্তধারা'র বাঁধ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন নিষ্ফল আক্রোষে। কিন্তু তিনি সমাধান খুঁজেছেন অতীত সমাজের অতীত ব্যবস্থার মধ্যে। সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণ করে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের নূতন সৃষ্টিশীলতা তাঁর চোখে ধরা পড়ে, কবি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের। শেষ জীবনে তিনি নিজেই আবিষ্কার করেন নিজের সৃষ্টির মধ্যে কোথায় ছিল ফাঁক, ধরে ফেলেন যে শুধু "এ পাড়ায়" ঘুরেছেন, "ও পাড়ার" সঙ্গে আত্মীয়তা করা হয় নি। তাই আহ্বান জানালেন নূতন যুগের কবিকে—"যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রোগ শয্যায় শুয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার জয় কামনা করেছেন। "সভ্যতার সংকটে" ঘোষণা করেছেন নূতন যুগের নূতন সমাজের অভ্যুদয় সম্পর্কে তাঁর অবিচলিত আস্থার কথা, কারণ "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ" এই বিশ্বাস ছিল তাঁর মনে।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ পুরাতনের বিরুদ্ধে নূতনের সংগ্রাম এবং "আধুনিক" সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়িত করার কাজে হাত দেন। কাব্যের ভিতর তাঁর জীবন দর্শনের অধ্যাত্মবাদী দিক মূর্ত হয়ে উঠলেও, উপন্যাসে তিনি অনেক বেশি বাস্তব। 'চোখের বালিতে' বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের যে ছবি আঁকলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষকে' তা সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করে গেল। প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাতে ঘটনার যে আবর্ত সৃষ্ট হয় তার ঘূর্ণিপাকে এক মানুষ অন্য হয়ে যায়, সংসারের নৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে যায় চুরমার হয়ে। প্রেমের সঙ্গে বিবাহের যে বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে, সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে তার সমাধান নেই। সমাজ ভেঙ্গে যায়, কিন্তু তবু সেই সমাজ ছাড়া নূতন কোন সমাজের অভ্যুদয়ের চিহ্নমাত্র দেখা যায় নি, তাই রবীন্দ্রনাথ সমাধান খোঁজেন এই প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যেই আদর্শনীতিব আশ্রয়ে। অথচ সে আদর্শ ফানুসের মত হাওয়ায় ভরা নয়, তার মধ্যে আছে বাংলার সামাজিক জীবনের সম্ভাব্য বাস্তব।

"যোগাযোগে" কবির দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়মে পরিচালিত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের কঠোর বাস্তবে কুমুর আদর্শিকতা ছত্রখান হয়ে গেল, চূড়ান্ত

পরাজয় ঘটলো তার। বিবাহের অধিকার ছেড়ে তাকে চলে যেতে হলো স্বামীর সংসার ছেড়ে, এই হলো তার প্রথম বিদ্রোহ। কিন্তু আবার তাকে যেচে ফিরে আসতে হলো সেই সংসারে অপমানের পসরা মাথায় করে। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন যে সামাজিক নীতিবোধ চিরস্থায়ী নয়, যুগে যুগে তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তবু বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান কি?

সমাজের ব্যক্তিসত্তার এই যে বিরোধ তার যে কোন সমাধান নেই প্রচলিত সমাজের মধ্যে কবি তা বুঝলেন, কিন্তু নূতন সমাজের ইঙ্গিত এই সমাজেরই গর্ভে যতক্ষণ না জন্মগ্রহণ করে ততক্ষণ কবির কাছে প্রশ্নটি থেকে যায় সমাধানের অসাধ্য। তাই তিনি প্রতিভার খেলা খেলতে বসলেন "শেষের কবিতায়"। প্রেমের সঙ্গে বিবাহের যে বিরোধ তার সামঞ্জস্য ঘটালেন এমন এক উচ্চাঙ্গের আদর্শ দিয়ে যা সুন্দর হলেও অবাস্তব, অথচ শিল্পসৃষ্টির প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। সামাজিক সমস্যার যে সমাধানটি তিনি দিলেন তা একটি অলীক কল্পনা। এ থেকেই বোঝা যায় যে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাও বাস্তবকে অতিক্রম করে যেঁতে পারে না, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসই তার এক অকাট্য প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল প্রতিভার মহত্ত্ব এই যে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নূতনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বারংবার। উদাত্ত সুরে ঘোষণা করেছেন— "নব লেখা আসি দর্পভরে ...উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়, নবীনের রথযাত্রা লাগি।"

সমাজতন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের একটি সত্যকে তিনি মর্মে মর্মে গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে ইতিহাসের গতিশীলতা, পুরাতনের গর্ভে নূতনের অভ্যুদয় এবং সমাজ ব্যবস্থার অনিত্যতা। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত। এই দৃষ্টি ছিল বলেই ধনতান্ত্রিক সমাজের আত্মবিরোধ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। রোঁমা রঁলার ষষ্ঠীতম জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত রচনায় কবি লিখলেন—

"আমেরিকায় অবস্থানকালে যন্ত্র সংঘসমূহ (organisation) ব্যক্তিগত (personal) মানুষকে একেবারে নির্বাসন দিয়া যন্ত্রগত মানুষকে (mechanical) প্রকাণ্ড পদ্ধতিপিণ্ডের মধ্যে সংহত করিয়া প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করিয়া দ্রুত ও বিপুল প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমার মন পীড়িত হইয়াছিল... যে ধর্ম প্রেম ও করুণায় কমনীয় সেই ধর্মের নামে কী কদর্য রক্তলোলুপ ধর্মমত গড়িয়া উঠে তাহা আমরা দেখিয়াছি— ব্যবসায়ের দোহাই দিয়া কী বিরাট প্রবঞ্চনা চলিতেছে। অথচ এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যাহারা তাহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ। নিরীহ প্রজাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য রাজতন্ত্রের নামে কী বীভৎস মিথ্যাবাদ প্রচারিত হইতেছে দেখিতেছি, অথচ যাহারা এই রাজতন্ত্রের কর্ণধার তাঁহারা সকলেই আচার-আচরণ ও বংশ গরিমায় ভদ্র।"

—রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৬৯-৭০

আমেরিকা ঘুরে এসে ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা তাঁর চোখে ধরা পড়লেও এর কারণস্বরূপ শ্রেণিগত শোষণ পদ্ধতির তত্ত্ব তখনও তাঁর অপরিজ্ঞাত ছিল; তাই তিনি মনে করেছিলেন যে এর কারণ হলো "জড়পৌত্তলিকতার প্রভাব"। কিন্তু এ ভুল তার ভেঙ্গে গিয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে। সেখানে দেখতে পেয়েছিলেন ঐ একই যন্ত্রের নূতন

ভূমিকা; যন্ত্রের হাতে মানুষ নয়, মানুষের হাতে যন্ত্র। এখানে এসে তিনি বুঝতে পারেন যে, আমেরিকায় "যন্ত্র পৌত্তলিকতার" মূলে আছে এক শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণির শোষণ। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি লিখলেন—

"এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভাল লেগেছে সে হচ্ছে এই ধন-গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।...কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে।" এর আগে কমিউনিস্ট মতবাদ বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভারতে বসে বলশেভিক মতবাদ সম্পর্কে ধনিকদের কাগজে অনেক অপপ্রচার তিনি পড়েছেন, তাঁর মন তা দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছে। কিন্তু তাঁর মুক্ত মন সোভিয়েট রাশিয়ার "ঐতিহাসিক যজ্ঞ" স্বচক্ষে দেখে লিখেছিলেন—সোভিয়েট রাশিয়ায় না এলে "এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"

সোভিয়েট সমাজের মর্মস্থল লক্ষ্য করে কবি রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছিলেন—

"আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বজাতির স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।...স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।"

যে মহাকবি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবন আরম্ভ করেছিলেন সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা নিয়ে, তিনি যে এইভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতায় এসে পৌঁছতে পেরেছিলেন কুণ্ঠাহীন মনে, তার কারণ তাঁর জীবন দর্শনের মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদই ছিল তাঁর ভাববাদ ও বস্তুবাদের, ব্যক্তিবাদ ও সমাজবাদের এবং ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমস্ত দ্বন্দ্বের সেতুস্বরূপ। তাই "এপাড়ায়" অবাধে বিচরণ করেও যখনই "ওপাড়ার" সংস্পর্শে এসেছেন তখনই তাকে চিনতে তাঁর কষ্ট হয় নি একটুও।

রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের মহিমাই উপলব্ধি করেন নি, আবিষ্কার করেছিলেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মহাসত্য। তিনি লিখলেন—

"এই যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কতদিন থেকেই চলছে। খ্যাত অখ্যাত কতলোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে।...যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।

"একদিন ফরাসি-বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্রের বাণী স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিকলো না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী।"

—রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৯

এই মহাসত্য রবীন্দ্রনাথ যখন উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা তখনও তাঁর অনেক পিছনে পড়ে। আজও ঐ মহাসত্য স্বীকার করতে তাঁদের সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী নেতাদেরও সংস্কারে বাধে। রবীন্দ্রনাথকে সংস্কার মুক্ত করেছিল তাঁর মানবতাবাদ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ

এই মানবতাবাদের তাগিদেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে নেমে পড়েছেন। অথচ প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন রাজনীতি চর্চার প্রতি বিমুখ। হিজলী বন্দীশালায় গুলিচালনার প্রতিবাদে ১৯৩১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় এক জনসভা হয়। রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন এই সভার সভাপতি। রাজনীতির প্রতি তাঁর মনোভাব এই সভায় নিজেই তিনি ব্যক্ত করে বলেন—

"প্রথমে বলে রাখা ভাল আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্র-আন্দোলনের বাহিরে। কর্তৃপক্ষের কৃত কোন অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে। এই যে হিজলীর গুলিচালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষত্বের দিকে তাকিয়ে।"

—'রবীন্দ্র জীবনী', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১১

সাম্রাজ্যবাদী শাসন তার স্বভাবসিদ্ধ "মনুষ্যত্বের অবমাননা" দ্বারা বার বার কবিগুরুকে রাজনীতির মধ্যে টেনে নামিয়েছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনে। সেদিনকার দরখাস্ত-সর্বস্ব রাজনীতিকে তিনি তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, স্বদেশী-মেলার মারফৎ শহুরে রাজনীতিগুলিকে গ্রাম্য জনতার সংস্পর্শে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন। গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে জাতিগঠনই ছিল তাঁর কামনা। এদিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর পূর্বগামী।

তিনি তখনও ভাবতেন যে, রাষ্ট্রের মালিক যেই হোক না কেন, সমাজের মধ্যে আমরা লাভ করতে পারি আত্মকর্তৃত্ব। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ছিল গ্রাম্য সমাজ সম্পর্কে নির্লিপ্ত; আধুনিক যুগে ধনতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সেই নিরপেক্ষ ভূমিকা যে অবাস্তব এবং অসম্ভব তা তত্ত্বের দিক দিয়ে তিনি মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু তবু তার নিজস্ব আদর্শের বাস্তব সুফল হয়েছিল এই যে দেশের মধ্যে জাতি গঠনের জন্য গঠনমূলক কাজের নীতি জাতীয় গণজাগরণের উপাদান হয়ে দাঁড়ালো। জাতীয় গণজাগরণের কোন আভাষ দেখলেই মন নেচে উঠতো, বেরিয়ে আসতেন তিনি তাঁর কাব্য সাধনার মন্দির থেকে, রাজনীতির কলরবের মধ্যে। বঙ্গভঙ্গের যুগে তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টি শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন জাতীয় গণজাগরণের কাজে,—জাতীয়তা যাতে জনমনের একটি সত্তা হয়ে দাঁড়ায় সেই প্রচেষ্টায়। রাখী-বন্ধনের গান গেয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন নূতন উদ্দীপনা; স্বদেশ ভক্তির নূতন চেতনা এলো জনমনের গানের মাধ্যমে।

এই স্রোতের জোয়ারে ভেসে এলো বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই দুটোরই বিরোধী। সরকারি জুলুমের প্রতিবাদে স্বদেশী জবরদস্তিও তিনি পছন্দ করতেন না। ভাববাদসুলভ দৃষ্টি নিয়ে তিনি জবরদস্তিকে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখতেন, কার বিরুদ্ধে কার জবরদস্তি সে প্রশ্ন তুলতেন না।

ভারতের স্বাধীনতা কোন পথে আসবে এ তত্ত্ব নিয়ে তিনি কখনও মাথা ঘামান নি এবং ঐ বিষয়ে তাঁর মতামত ছিল প্রধানত নেতিবাচক। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে যেখানেই ফাঁকি

দেখেছেন অথবা দেখেছেন বিকৃতি, তারস্বরে তার প্রতিবাদ করেছেন। নব জাতীয়তার শক্তি যাতেই অনুভব করেছেন, তাকে অভিনন্দন জানাতে কখনও দ্বিধা বোধ করেন নি। সন্ত্রাসবাদ যে নিষ্ফল সে সত্য সহজেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কারণ তা ছিল গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু জাগ্রত জনতা তার শক্তি প্রয়োগ করবে কি ভাবে—এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক। তাই ১৯১৯-২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে জাতীয় আন্দোলন জেগে উঠলো, তাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, দু-হাত বাড়িয়ে—যেন তিনি এরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতি, বিলাতি বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ এবং রাজদ্রোহমূলক কোন আন্দোলনই তাঁর সমর্থন পায় নি। ১৯৩১ সালে ২রা অক্টোবর শান্তিনিকেতনে গান্ধীজীর ৬৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না। যে দৃঢ় শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর, জন্মান্তর ঘটে গেল। দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল।...আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজী। এখন শাসন কর্তারা উদ্যত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করতে। কেন না তাদের পরশাসনতন্ত্রের গভীরতর ভিত্তি টলছে, যে-ভিত্তি আমাদের বীর্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎ সমাজে আমাদের স্থান দাবি করছি।"

—'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

এই উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায় বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তিক্ত মনোভাব ও জাতীয় স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সম্মিলিত কর্মশক্তিকে তিনি কত বড় স্থান দিতেন তারও আভাষ এতে পাওয়া যায়। জনশক্তিই যে ইতিহাসের চালনীশক্তি এ বিশ্বাস তাঁর ছিল, যদিও পথের সন্ধান তিনি রাজনৈতিক নেতাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান, সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় এবং সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম সংকট। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র পরিত্যাগ করে ফ্যাসিজম্-এর রাস্তা ধরে এবং পৃথিবীর দেশে দেশে জেগে ওঠে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ। মানব সভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ প্রগতির শিবিরেই তাঁর নিজস্থান নির্বাচিত করেছিলেন। এদিক থেকে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে যান। তখন মুসোলিনি তাঁকে দিয়ে ফ্যাসিস্ট মতবাদের স্বপক্ষে আনবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। তত্ত্বের দিক থেকে অবিচ্ছিন্ন ভাববাদের সাহায্যে তিনি প্রথমটা ফ্যাসিজমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি, তাই তিনি ইতালির জনসভায় ফ্যাসিস্টদের সাজানো-গোছানো জনসমাবেশ দেখে মুগ্ধ হন, প্রশংসা করেন ইতালির বৈষয়িক উন্নতির। ফ্যাসিস্ট বর্বরতার স্বরূপ তখনও তাঁর কাছে অপরিব্যক্ত ছিল। মহর্ষি রোঁমা রঁলা এ বিষয়ে তাঁকে সচেতন করে দেন। রোঁমা রঁলার সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তিনি তাঁর মতামত স্থির করে ফেলেন এবং ফ্যাসিস্ট বিরোধী শিবিরকে সমর্থন জানান অকুণ্ঠিত মনে। মানবতাবাদই তাঁকে সাহায্য করে আধুনিক বিশ্বের এই বৃহত্তম সংকটে সঠিক শিবির নির্বাচনে। ১৯২৬

সালের ২০শে জুলাই এনড্রুজের নিকট লিখিত এক পত্রে মানবতার প্রতি তাঁর স্পর্শকাতর মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ফ্যাসিজমকে তিনি প্রচণ্ড ধিক্কারে ধিকৃত করেন। ইংলন্ডের ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে এ পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর থেকে তাঁর সত্য সাধনার অন্যতম লক্ষ্যও হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিজম ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ।

জাপানের বিখ্যাত কবি নোগুচি চীনের বিরুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের হামলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থনলাভের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার উত্তরে নোগুচি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের তীব্র তিরস্কার। নোগুচির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ পত্র প্রগতি শিবিরে একটি অবিস্মরণীয় দলিল। এমনি তাঁর একখানি দলিল হল মিস র‍্যথবোনের নিকট লিখিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কবির ধিক্কারবাণী।

১৯৩০ সাল থেকে কবির মনে জাগছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এক অপরাজেয় গণসংগ্রামের স্বপ্ন। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক নির্লিপ্ততা তখন থেকেই কেটে গেছে। তাঁর এই নূতন ধ্যান ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় রাশিয়ার চিঠিতে। ১৯৩০ সালে তিনি রাশিয়া সফরের শেষে ভারত থেকে চিঠি পান আইন অমান্য আন্দোলন এবং পুলিশী নির্যাতনের। জবাবে তিনি লেখেন—

"যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উল্টে যায় কিন্তু এ ছাড়া বন্ধনমুক্তির অন্য উপায় নেই। ব্রিটিশ রাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়ছে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড় লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে। কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিকৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।

"সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি-দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিশের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বোলো, এখনো অনেক বাকি আছে—তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে যে, বড়ো লাগছে-সে কথা বললে লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।"

—রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ খণ্ড, রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৭১৯

কবিগুরুর এই ঐতিহাসিক ঘোষণার সঙ্গে তুলনা করুন "ঘরে বাইরেতে" তাঁর যে ইঙ্গিত আছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাবের বিরুদ্ধে নিছক সংস্কারপন্থী গঠনমূলক কাজের প্রতি পক্ষপাতিত্বের। কবি বদলেছেন বিস্ময়করভাবে, ইতিহাসের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত গণবিপ্লবের সঠিক মূর্তি স্বচক্ষে দেখে। বয়স যত বেড়েছে কবির মন ততই তরুণ হয়ে উঠেছে।

মৃত্যু শয্যায় শুয়েও তাই তিনি কামনা করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের জয়। হিটলারের বর্বর অভিযান যে পরাস্ত হবেই এবং সোভিয়েতের জয়ই যে আনবে বিশ্বের কল্যাণ সে কথা তিনি বুঝে গেছেন এবং বলে গেছেন জীবনের শেষ মুহূর্তে। তাঁর আকাঙ্ক্ষা আজ

মহাসত্যে পরিণত হয়েছে, তিনি তা দেখে যেতে পারেন নি। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিশ্ব প্রগতির সঙ্গে যে এগিয়ে চলেছিলেন—এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। এই অভিনবত্বের জন্যই তাঁর জীবন চরিত অধ্যয়ন করলে একটি সমগ্র যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করা হয়।*

প্রাপ্তি স্বীকার— মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত, পৃ. ১৩৯, এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'রবীন্দ্র-বীক্ষা', সংকলন গ্রন্থে, যার সম্পাদক ছিলেন—শ্রীনীলরতন সেন, কলিকাতা, এশিয়ান পাবলিশিং, ১৩৬৮, পৃ. ২২০-২৩২

টিকা - ১ : * 'রবীন্দ্র-বীক্ষা' গ্রন্থের সম্পাদক গ্রন্থের ভূমিকায় এই প্রবন্ধ সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন : "গ্রন্থের সব শেষের প্রবন্ধটি লিখেছেন মার্কসবাদী সুপণ্ডিত ভবানী সেন। একদা 'রবীন্দ্র গুপ্ত' ছদ্মনামে রবীন্দ্রমানসের মার্কসবাদী বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি পাঠক সমাজকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। চিন্তার প্রবীণতায় দুটি দশক পেরিয়ে এসে আজ তিনি আরও নূতনভাবে মূল্যায়ন করেছেন। 'একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী', রবীন্দ্র প্রতিভার মার্কসবাদী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মূল্যবান সংযোজন রূপে স্বীকৃত হবে বলেই আশারাখি।" এই টিকাটি ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত বই থেকে নেওয়া।

টিকা - ২ : ভবানী সেনের এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে। ১৯৪৯ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন যেভাবে করেছিলেন, সেটি যে ভুল ছিল, বর্তমান প্রবন্ধটি হল তারই নেতিকরণ এবং একাজ তিনি নিজেই করেছেন। কমিউনিস্ট বিরোধী শক্তি ইচ্ছাকৃতভাবেই পরের প্রবন্ধটিকে চেপে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে আজও নিন্দা করে চলেছে। এঁরা হয়ত জানেন না যে রবীন্দ্রনাথ একদিন ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং কয়েকদিন পরেই রম্যাঁ রলাঁর সাহচর্যে এসে 'real face of Fascism' সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে তিনি 'Publicly dissociated himself from fascism' এই কথা ঘোষণা করেছিলেন 'in the form of letters to his Italian Friends and to C.F. Andrews'. এবিষয়ে কমিউনিস্ট বিরোধী শক্তিদেরকে রম্যাঁ রলাঁর 'I will not Rest' বইটির ৪৫ পৃষ্ঠাটি দেখে নিতে অনুরোধ করছি। — সম্পাদক।

ব্যক্তিনাম নির্দেশিকা

অখিল নিয়োগী ৭৯
অচ্যুৎ পটবর্ধন ৩০০
অজয় মুখার্জি ৬০৩, ৬০৪
অজিত ঘোষ ২০
অজিত অধিকারী ২৬
অজিত চ্যাটার্জি ৮৩
অজিত বসু ৮৩, ৪০৮
অতুল প্রসাদ সেন ১২
অতুল চন্দ্র গুপ্ত ২৬৭
অনন্ত মাইতি ১৮
অনিল গোস্বামী ২৭
অনিল রায় ৭৪
অন্নদা চরণ মজুমদার ৭৯
অনিল বিশ্বাস ৮৫, ৮৬, ১৫০, ৪৩০, ৭৩৯
অনন্ত সিংহ ২৬১, ৭৮৬
অনন্ত মাজী ২৬৬, ৪৯২
অনন্তকুমার ভট্টাচার্য ২৬৬
অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য ২৬৮, ৫১১, ৫১২, ৬৩৪
অনিলা দেবী ৪২৬
অনিতা ঘোষ ৪৯৮
অনিমেষ রায় ৮৩৫
অপরেশ লাহিড়ী ৮৩
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৭
অমিয়া বসু ২০
অমরেন্দ্র কুমার পাল ৭৫
অমলেন্দু সেনগুপ্ত ৮৬, ২৬৯, ৩২৭, ৪৩০, ৬৪১, ৬৬২, ৬৭৬
অমিয় কুমার বসু ১৬৯
অমূল্য লাহিড়ী ২৬২
অম্বিকা চক্রবর্তী ২৬৬, ২৬৭, ৪০২
অমিয়া দত্ত ৪২৬, ৪২৭, ৬১৩
অমিত সেন (সুশোভন সরকার) ৪৩৩, ৮১৪
অমর মণ্ডল ৪৪৪, ৫৪৫
অমর বাগচী ৪৯৬
অমলেন্দু (ছাত্র নেতা) ৪৯৮
অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র ৬৩৯, ৮১১
অমিয় দাশগুপ্ত ৭৪৫
অবণী দাশগুপ্ত ৪১, ৪৪
অবণী বাগচী ২৬২
অবণী লাহিড়ী ৪৮৮
অরুণ সেন ১৬৯
অরুণ মিত্র ১৬৯
অরুণ বসু ২৬৪, ২৬৬
অশোক মেহতা ৩০০
অশোক বসু ৪২২
অশ্বিনী দাস ৪৪৪, ৫৪৪
অহল্যা দাসী ৪৪৪, ৪৭৪, ৪৭৭, ৫৪৪
অংশুভূষণ মিত্র ৭২

আ

আউব আলি ২৪
আজিজুল হক ৬৯৯
আতা মোহাম্মদ ২৬২
আনন্দগোপাল ঘোষ ৮৫
আনোয়ার হোসেন ৫১১
আবদুল আজিজ মুন্সী ২৩
আবদুর রেজ্জাক খাঁ ৭৭, ১১৬, ২৬৬, ৬৩৪
আবদুল্লাহ রসুল ৭৭, ১১৬, ৪৩১, ৫১২

আবদুল হালিম ৭৭, ১১৬
আবদুল মোমিন ৭৭
আবুল হাসিম ১৭৩
আবদুল কাদের চৌধুরী ২৬২
আবুল মনসুর আহ্মদ ২৬৭
আমানুল্লা ৭১০
আমিন ২০
আলতাব হোসেন ২৬২
আলাওল ১৬১
আলি মাহমুদ ২১
আশু দত্ত ৪২৩, ৪৩১, ৪৯৫
আশু হালদার ১৮
আসফ আলী ২৪৪
আঁরি বারব্যুস ৬২৬

ই

ইউসুফ ১৭
ইন্দ্রমোহন সরকার ২৫
ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ৭৭, ১১৬, ৬৩৪
ইরসাদ ৬৩৪, ৭০০, ৭০৮
ইলা মিত্র ৪২৩, ৪৩১
ইলিয়াস, মহম্মদ ৮৩
ইসমাইল, মহম্মদ ৬৩৪
ইয়ারোস্লোভস্কি ৪৩৩
ইয়াকুব আলি ২৫

ঈ

ঈষাণী চক্রবর্তী ৪৩১

উ

উত্তমী দাসী ৪৪৪, ৫৪৪
উদয়ভানু ঘোষ ২৬৬
উপেন বর্মণ ২৬

ঊ

ঊষা দত্ত ৪০, ৪৫
ঊষা পাঠক ২৬

এ

এইচ এন মিত্র ১৬৯
এ এন রায় ১৬৯
এঙ্গেলস ৩৬৪, ৩৭৫, ৪৩৩
এচিসন ৭৯৯
এন. এন. বোস ১৬৯
এন সি চ্যাটার্জি ১৬৯, ১৭৩
এ বি বর্ধন ১২
এম এম সেন ১৬৯
এম চ্যাটার্জি ১৬৯
এমিল বার্নস ৪৩৩
এরকোলি ৪৩৮
এল ফার্ডসন ২৪৪, ২৪৫, ২৪৭
এ লজোভস্কি ৪৩৩
এলুয়ার ৮১০
এ্যান্ড্রুজ ৮৪৫
এ্যাটলি ৯৯, ১৬৫, ৭৯৯
এস পি রায় ১৬৯
এস সি সেন ১৬৯
এস বসু ১৬৯
এস কে সেনগুপ্ত ১৬৯
এয়াছিন ফকির ৫১১

ও

ও পিয়াৎনিটস্কি ৪২১, ৪৩০, ৪৩৪, ৪৩৫
ওমর আলি খাঁ ১৭
ওয়ামিক ৩৫

ক

কডওয়েল ৮০৯
কদম রসুল ৩১
কনক মুখার্জি ৪২৬
কমলা মহারাজ ২৪
কমলাপতি রায় ৬৩৪, ৭০০, ৭০৮
কল্যাণী কুমার মঙ্গলম ৪৫
কল্যাণী কর ২৯
কংসারী হালদার ৮২, ৪২২, ৬১১

কার্তিক ধাড়া ৪৪৪, ৫৪৪
কার্তিকচন্দ্র দাস ৭২
কানাই বাগ (১) ৪৪৩
কানাই বাগ (২) ৪৪৪, ৫৪৫
কানাই রায় ১৫৪
কানাইলাল দত্ত ১৮৪
কারদেলীয় ১৯১
কালিদাস ভৌমিক ২১
কালি সোম ২৬
কালু গাঙ্গুলী ২৯
কালিচরণ ঘোষ ৭২, ৭৩, ৮৭
কালিপ্রসন্ন সিন্‌হা ৮৩০, ৮৩১
কালীপদ চৌধুরী ১৫৪, ১৯১, ২৩৪
কালীবালা পাখিরা ৪২২, ৪৪৪, ৫৪৪
কালী সরকার ৪৮৮
কালীপদ (হরিদাস) মালাকার ৬৩৪, ৭০০, ৭১০
কালোবরণ দাস ৮৩
কামিনীকুমার দত্ত ১০১
কাশীনাথ সেন ২১
কিশোরী দাস ১৮
কিরণশঙ্কর রায় ৭২, ২৬৯, ৪২৬, ৫১২, ৬৪৬
কুঞ্জ বিহারী ২৪
কুমারেশ বসু ৮৩
কুলকার্নি ৪০২
কুদনো মাঝি ৪৪৪, ৫৪৪
কুমুদ বিশ্বাস ৬৩৪
কুইরিনো ৭৯৪
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ২৪
কৃষ্ণপদ ২১
কৃষ্ণ চন্দ্র মণ্ডল ২৩
কৃষ্ণ বিনোদ রায় ৭৭, ১১৬, ২৬২
কৃপালিনী আচার্য ১০৬, ১০৭
কেষ্ট ব্যানার্জি ৮৩
কেদার ভট্টাচার্য ৮৫
কে সি মুখার্জি ১৬৯
কে. এম. মুন্সী ২৫২

খ

খগেন পাল ১৮
খগেন্দ্র মিত্র ৮৩
ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৮৩, ২৬৭, ২৬৮, ৪০৫, ৪১০
ক্ষিতীশ বসু ৮৩
ক্ষুদিরাম বসু ১৮৪
খোকা রায় (সুধীন রায়) ৭৭, ৮৫, ১১৬, ২৬২, ৫১২

গ

গঙ্গেশ ভট্টাচার্য ২৭
গঙ্গাধর অধিকারী ৮১, ৮৫
গজেন মালী ৮২, ৪২২, ৪৭১
গজেন ভুইঞা ৪৪৪, ৫৪৪
গণেশ ভুইঞা ৪৪৩, ৫৪৫
গণেশ সুব্বা ২৬৬
গণেশ ঘোষ ২৮১
গান্ধী, মহাত্মা ৭৬, ১০৭, ১৫১, ২০৬, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬৫, ৩৮৭, ৩৯৯, ৪৯৯
গিরিধর মণ্ডল ৫১১
গীতা মুখার্জি ২৬৬, ৪১১, ৪২৬
গীতা মল্লিক ২৬৭
গীতা সরকার ৪২৬, ৪২৭, ৬১৩
গুরুদয়াল সরকার ১৯
গুইরাম মুদী ৪৪৩, ৫৪৫
গুইরাম মণ্ডল ৪৪৪, ৫৪৪
গোর্কি, ম্যাকসিম ৪২৮, ৬২৫, ৬২৬, ৮০৯
গোলাম শরীফ ১৮
গোপেশ্বর মজুমদার ২১
গোষ্ঠবিহারী ঘোষ ২৬
গোপাল আচার্য ৭৬
গোপাল হালদার ১৬৯, ২৬৬, ৬৩৯, ৮১৪
গোলাম কুদ্দুস ১৬৯, ৪২৩
গোলক ৪৪৫, ৫৪৪
গোপেন চক্রবর্তী ৬১৪

গৌতম চট্টোপাধ্যায় ২৬৮, ৪১১
গৌরশঙ্কর মিত্র ১৭
গৌর দে ২৭
গৌর ঘোষ ৮৩
গৌরী কেদার ভট্টাচার্য ৮৩
গৌর পাত্র ৫৫৩
গৌর (সোমনাথ লাহিড়ী) ৭৪৬, ৭৫৫

ঘ

ঘান্দালিয়া ৩৯

চ

চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় ১৬৯
চঞ্চল কুমার শর্মা ৭৫
চন্দ্রনাথ ৭৪৫
চিত্তরঞ্জন গুহ ১৯
চিত্তরঞ্জন দাশ ৭৫, ৪১০
চিত্তরঞ্জন দাস ২৬২
চিন্মোহন সেহানবীশ ৮৫, ৬৩৯, ৬৪২, ৮০৮
চিয়াংকাই শেক ৩৭৬, ৩৮২, ৪৫৮, ৭৯৪
চেরনিশেভস্কি ৮৩১
চৈতন্য সামন্ত ৪৪৫, ৫৪৪

ছ

ছবি রায় ৪৩৩
ছিদ্দিক রহমান ২৮

জ

জওহরলাল নেহরু ৭৬, ৮১, ১৭৬, ১৭৯, ১৮৬, ১৯৭, ২০৪-২০৬, ২০৮-২১২, ২৪৩-২৪৭, ২৫১, ২৫২, ২৬৭, ২৮৫, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ৩২৭, ৪০০, ৪২৬, ৪৯৯, ৬৩৭, ৬৪৬, ৬৯৯, ৭৩৩, ৭৯৫, ৮১৩, ৮১৭-৮১৯
জগদীশ চন্দ্র পালিত ২৬৬
জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর ৭৪, ৮৫
জগন্নাথ চক্রবর্তী ৬৩৯
জদানভ (ঝানভ) ৮২, ১৯১, ২৪৩, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৭৫, ৩৭৮, ৬৩৮
জনেন সেন ২০
জমীরুদ্দীন ১৭
জলি কল ৭৭, ৮৬, ১৫০
জসিমুদ্দীন ১৬১
জয় রায় ২৩
জয়প্রকাশ নায়ারণ ২৩৬, ২৪৬, ৩০০
জামালুদ্দীন ২৬২
২৪৮, ৪৯৯
দে ৭৪, ৮৮
১৭
জুলিয়া ফুচিক ৮০৯
জে. সি. গুপ্ত ১৭৯, ১৮২, ২৬৭
জে. কে. ঘোষ ১৬৯
জে এন সরকার ৭৯
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ১৩, ১৬৯, ৬৩৭
জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত ২৩
জ্যোতির্ময় রায় ৮৩, ১৬৯
জ্যোতি বসু ৭৭, ৮০, ৮৪, ৮৬, ১৫০, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৯, ১৮২, ১৮৬, ২৫৯, ২৬৬, ২৬৭

ঝ

ঝুকভ ৮২, ১৯১

ট

ট্রুমান ৯১, ৩৬১, ৭৯৩, ৭৯৯

ড

ডাঙ্গে, এস এ ৮১৩
ডায়াকভ ৮২
ডি ভেলেরা ২৫৩
ডি এন প্রিট ২৬৩, ৩১৪

ত

তপেন্দ্র ৫৬৩
তারা দাস ৭২৭

তারাপদ রায় ৪৪৩
তারাপদ সর্দার ৫৪৫
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯, ১৬৯
তারিণীকুমার পাত্র ২২
তিলকধারী সিং ১৮
ত্রিদিব চৌধুরী ১৭৩
ত্রিলোচন হাজং ১৮
তেজমণি শর্মা ২৩
তোজো ৯১, ৫৭৫
তোরে ১৯১

দ

দক্ষিণারঞ্জন বসু ৭৯
দক্ষিণা মজুমদার ২১
দশরত লাল ৪৪
দরাব ড্রাইভার ২৩৬
দাসীবালা মাল ৪২২, ৪৪৪, ৫৪৪
দাশু মাঝি ৪৪৩, ৫৪৪
দাশু মণ্ডল ৪৪৪, ৫৪৫
দ্বারকানাথ মিত্র ১৭৮
দিলীপ বসু ২০
দিনতারিণী মুখোপাধ্যায় ২৭
দিলীপ কুমার ব্যানার্জি ৭০, ৩৯৭
দিগেন দাশগুপ্ত ৭৫
দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩৭
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১২
দীনা সাংঘবী ৩৯
দীনেশ চৌধুরী ৭৫
দীনেশ কার্যী ৮৯
দীপশ্বরী ৪৮৬
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৩
দীপেন মিত্র ৫২২
দীনবন্ধু মিত্র ৮৩০-৮৩১
দুখু প্রামাণিক ২৭
দুবরাজ ৫৬৩
দেবেন সরকার ১৯
দেবেন আচার্য ২১
দেবাই বর্মণ ২৪
দেবেন দাস ৬০১
দেবেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯
দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি ১৭৩
দেবনাথ দাস ১৭৮, ২৬৭
দেবী নিয়োগী ৭৪, ৮৫, ৮৮, ৮৯
দেবেন মালিক ৪৪৩, ৫৪৫
দেবেন ধাড়া ৪৪৩, ৫৪৪
দৌলত কাজী ১৬১

ধ

ধনঞ্জয় দাশ ৬৪২, ৮০৭, ৮৪৫
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ৮৩
ধীরেন বিশ্বাস ২২
ধীরেন মজুমদার ৬৩৪, ৬৮৮, ৬৮৯
ধীরেন্দ্রলাল রায় ২৫
ধীরেন্দ্রনাথ সেন ৭৯, ১৬৯
ধূর্জটি প্রসাদ মুখার্জি ৮১৩

ন

নজরুল, কাজী ১২, ১৬১, ৮৩০
নগেন্দ্র চৌধুরী ২৫
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৭৯
নন্দন ৭৭৬
ননী ভৌমিক ১৬৯, ৪২৩, ৫০২
ননীবালা পাত্র ৪৪৩
ননী গুপ্ত ২১
নবগোপাল সাধু ২১
নবেন্দু ঘোষ ১৬৯, ৬৩৭
নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২২
নরহরি কবিরাজ ১৪, ৮৬, ৬৩৭, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪২, ৮১১, ৮১৪, ৮৩৫
নরেন্দ্র দাস ৪৯৬
নরেশচন্দ্র ব্যানার্জি ৬৩৭
নরেশ সেন ১৭
নলিনী সরকার ৪৮১
নাদের হুসেন চৌধুরী ২৮

নাদেঝদা ক্রুপস্কায়া ৪৩৩
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৬৯, ৬৩৭
নারায়ণ রায় (ডা.) ২৬১
নির্মল সেন ২১
নিখিল কর্মকার ২৩
নিখিল চক্রবর্তী ৮৩, ৮৬, ২২৭
নিখিল ভাদুড়ী ৪১৭
নিখিল মুখার্জি ৭৪
নিতাই (নৃপেন চক্রবর্তী) ৭১০
নিমাই সেন ২৬
নিমাই চাঁদ জৈন ৪৪
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ৭৭, ১১৬, ১৭৩, ৬৩৯, ৮১১
নির্মল ঘোষ ৮৫
নিমাই ভট্টাচার্য ৪২২
নীরেন দে ২৬৭
নীরেন্দ্র চক্রবর্তী ৬৩৭, ৬৩৯
নীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি ২২
নীরেন্দ্রনাথ রায় ৬৩৯, ৮১১, ৮৩৫
নীরোদ দাশগুপ্ত ১৭
নীল ২১
নীলমণি বক্‌সা ১৮
নীলকণ্ঠ ঘড়ুই ৪৪৪
নীলমণি মাইতি ৪৭২
নীলকণ্ঠ সামন্ত ৫৪৪
নীহার রঞ্জন রায় ৮১৩
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ১৮৩
নুরজালাল ৫০৪, ৫০৫
নৃপতি নন্দী ২৭
নৃপেন চক্রবর্তী ৭৭, ১১৬, ৬৩৪, ৮১১
নেপাল নাগ ৭৭, ১১৬, ২৬২

প

পঞ্চানন সিংহ ৩০
পঞ্চানন কৈদর ৪৪৫, ৫৪৪
পটল ঘোষ ৫০০, ৫০২
পতিত জানা ৪৯২
পবিত্র দে ৩১
পবিত্র গাঙ্গুলী ৬৩৭
পরমানন্দ দত্ত ৭৯
পরিতোষ শীল ৮৩
পলাস রায় ৪২৩, ৪৩১, ৫০৩
পশুপতি সাহা ২২
পানু পাল ৪০, ৪৪
পান্নিকর ২৪২
পানিক লেট ৪৪৫, ৫৪৪
পারুলবালা সাঁতরা ৪৪৩
পাঁচু বেরা ৪৪৩,৫৪৫
পাঁচুবালা দাসী ৪২২, ৪৪৪, ৫৪৪
পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ৭৭, ২১৬, ২৬৬-২৬৮, ৪১০
পাঞ্জু শেখ ৫০৮
পি কে বোস ৭৯
পি সি যোশী ৭৬, ৭৭, ৮০-৮২, ৮৫, ১১৬, ১৫১-১৫২, ২৬৪, ৬৩৯
পি এন সেন ১৬৯
পি সি বোস ১৬৯
পুষ্পবালা দাসী ৪২২, ৪৪৪, ৫৪৪
পূর্ণিমা শীল ২৯
পূর্ণেন্দু দস্তিদার ২৬২
পূর্ণ মণ্ডল ৪৪৩, ৫৪৫
প্রকাশ রায় ৬৩৮, ৬৪২, ৮২২, ৮২৮
প্রতিভা গাঙ্গুলী ৪২৬, ৪২৭, ৬১৩
প্রদ্যোৎ গুহ ৬৩৮, ৬৪২
প্রদোষ কুমার বাগচী ৮৫
প্রফুল্ল মণ্ডল ২৭
প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ৭৭, ৮০, ১৬৬, ১৭৪, ১৭৬-১৭৭-১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭-১৮৯, ৪১৩
প্রফুল্ল সেন ৫৫৩
প্রভাত কুণ্ডু ৪৪৫
প্রভাত দাশগুপ্ত ৬৩৪, ৭০০, ৭০৮
প্রভাত দত্ত ২৩
প্রভাত মুখার্জি ৫০৮
প্রভাত মণ্ডল ১৮
প্রভানন্দ বর্মণ ২১

প্রভাস লাটুয়া ২৩
প্রভাতকুমার গোস্বামী ৭৯
প্রমথ ভৌমিক ২৬২
প্রমোদ দাশগুপ্ত ৭৭, ১১৬, ২৬৬, ৬৩৯, ৮১১
প্রমোদ ঘোষ ৭৮
প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত ২৬৭, ৪০৮
প্রাণকৃষ্ণ বর্মণ ২২
প্রাণগোপাল চক্রবর্তী ৩১
প্রাণেশ ৭১০
প্রেম ধাওয়ান ৪৪
প্রাসট্ মিল ২৬৩, ৩১৪

ফ

ফটিক গলুই ৪৪৩, ৫৪৫
ফণী গোস্বামী ৪৯৯
ফণী গুহ ২৬২
ফণী চক্রবর্তী ২০
ফণী মজুমদার ২২
ফণী মুখার্জি ২৭
ফণীন্দ্রনাথ শেঠ ২৬৭, ৪০৮
ফ্রাঙ্কো ২৫৩

ব

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২, ১৬১, ৬৩৮, ৮৩১
বঙ্কিম শেঠ ৩০
বঙ্কিম গিরি ৪৯২
বঙ্কিম মুখার্জি ৭৭, ১১৬, ৫০৬
বশিরা খানম ২১
বলরাম গোপ ৩১
বলাইলাল পাল ৬৩৭
বল্লভভাই প্যাটেল ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৯৭, ২০৩, ২৮২, ২৮৬, ২৯০, ৪৯৯
বরেন মাহাত ৪৭২
বসন্ত রায় ৪৪৪
বংশী বটব্যাল ৬৩
বাণী দাশগুপ্তা (১) ২৯
বাণী দাশগুপ্ত (২) ৪২৬
বাতাসী দাসী ৪৪৪
বাতাসী সিং ৫৪৫
বারীন দত্ত (আব্দুস সালাম) ২৬২
বালাবুশেভিচ ৮২
বালিকা পাত্র ৪৪৩
বাশীনাথ বর্মণ ২৭
বি কে ঘোষ ১৬৯
বিজন ভট্টাচার্য ৩৫, ১৬৯
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ২৫৩
বিজয় সিং নাহার ৪৭৭, ৬৭৪
বি দাস ১৬৯
বিদ্যা মুন্সী ৪২৬
বিধান চন্দ্র রায় ১১, ৩৩, ৭২, ৭৭, ১৮৫, ১৮৮, ২৫০, ২৫৩, ২৬৫, ৪১৯, ৪২৬, ৫১৮, ৬৮৯, ৬৯১
বিনয় ঘোষ ৮১৪
বিনয় রায় ১৩-১৪, ৩৭, ৪০
বিনয় ভৌমিক ৭২
বিনয়কৃষ্ণ রোহাতগী ২৩৬
বিপিন বৈষ্ণব ২৩
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৬৯, ২৬৭
বিবেকানন্দ ৬৩৮, ৬৩৯
বিভূতি গুহ ২৬২
বিভূতি রায় ৫০৮, ৫০৯
বিভূতি ঘোষ ৫০৯
বিমল চন্দ্র ঘোষ ৬৩৭
বিমল চন্দ্র সিনহা ১৭৯, ১৮৫, ৪৭৭
বিমল দাশগুপ্ত ৪২৩, ৪৩১, ৫০০
বিমলা মাজী ৪৯২
বিমল ঘোষ ৫০৮
বিমান ৭৫৩
বি রায়চৌধুরী ১৬৯
বিরাট ৭১০
বিশ্বনাথ তেলী ১৮
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩০
বিশ্বনাথ দুবে ১৭৩
বিশ্বনাথ মুখার্জি ১৭, ২৬৪, ২৬৬

বি সি ঘোষ ১৬৯
বীণা ভৌমিক ৭২৭
বীণাপাণি সুর ২৭
বীরেন চন্দ্র দে সরকার ৭৪, ৮৫, ৮৮, ৮৯
বীরেন পাল (ভবানী সেন) ৮২১, ৮২৮
বুখারী ২৬২
বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় ৮২২
বৃন্দাবন বর্মণ ২১
বেণীমাধব গাঙ্গুলী ২১
বেরাজ ৫৬৩
বৈদ্যনাথ সেন ৩০
ব্রজেন্দ্রনাথ পাল ২৭

ভ

ভবানী সেন ১৩, ১৪, ৬৪, ৭০, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮৩-৮৬, ৯০, ১১৬, ১৫৩, ১৮৯, ২৩২, ২৫৮, ২৬২-২৬৪, ২৬৬, ২৬৯, ৪২৩, ৪৩১, ৪৯৯, ৫১২, ৫১৪, ৬৩৪, ৬৩৮, ৬৪০, ৬৪২, ৮১১, ৮১৯, ৮২২, ৮৩৬, ৮৪৫
ভবানী মুখার্জি ৭৩
ভবেন নস্কর ৪৪৪, ৫৪৫
ভবেশ ৪৪৫, ৫৪৪
ভবেশ সিং ৪৮৫
ভরদ্বাজ ৪০২
ভানুদি ৫১০
ভানু মজুমদার ২৬
ভাবমাধব ঘোষ ৮৪
ভাবা ২৩৮-২৪১
ভাবময়ী দাসী ৫৪৫
ভাস্কর ৭৫১, ৭৫২, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৮২
ভিখা চৌহান ২২
ভি পি মেনন ৮৫
ভূপতি নস্কর ৪৭৬
ভূপতি নন্দী ৪০, ৪৪
ভূপতি মজুমদার ১৮৪
ভূপাল পাণ্ডা ৭৮, ৪২৩, ৪৩১, ৪৯১, ৪৯২
ভূপেশ গুপ্ত ৭৭, ১১৬, ১৭৩, ২৬৬, ২৬৮, ২৭০, ৪১২
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ৫০৬, ৮১৩
ভূপেশ ব্যানার্জি ২২
ভোলানাথ বিশ্বাস ৫০৪

ম

মকদুম মহিউদ্দীন ৩৮
মগনলাল চাণ্ডালিয়া ৩৯
মঞ্জুশ্রী দেবী ৪৩২
মঙ্গলা চরণ চট্টোপাধ্যায় ৪৩২, ৬৩৯, ৮১১
মটুম রাম ২৯
মণি সিং (১) ৭৭, ১১৬, ২৬২, ৪৯৫, ৪৯৭, ৫১২
মণি সিং (২) ৫০০, ৫০১
মণি চক্রবর্তী ২০
মণিকৃষ্ণ সেন ৭৭, ১১৬, ৪২৩
মণিকুন্তলা সেন ৭৭, ৮৬, ১৫০, ২৬৬, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩২
মণি ধাড়া ৪৭৬
মণি রায় ৬৩৯, ৮১১
মতলব শেখ ২৯
মতি ধাড়া ৪৪৩, ৫৪৫
মধু মোল্লা ৫০৮
মধু ৫৮৭, ৬১১
মধুসূদন দত্ত ৮০৫, ৮৩০, ৮৩১
মনসুর হবিবুল্লাহ ৭৭, ১১৬, ২৬২, ২৬৯
মন্মথ কয়াল ৪৪৩, ৫৪৫
মনোহরি বর্মণ ২৪
মনোহর সোম ২৫
মনোরমা রায় ৪৪৩, ৫৪৫
মনোমোহন সেন ৮৫, ৮৮, ৮৯
মনোরঞ্জন রায় ১৭৩
মনোরঞ্জন হাজরা ৮২, ২৬৬
মরাদজ্জামান ২৪
মল্লিক (মহঃ ইসমাইল) ৭০৩, ৭০৫, ৭১০, ৭৫৩, ৭৫৫

মলয় ৭০৩, ৭১০
মহম্মদ ২০
মহাবীর ২৬
মহেশ সরকার ২৮
মহাবীর চৌহান ৩০
মহীমোহন বসু ২৬৭
মহেন্দ্র খাঁ ৫০৬-৫০৮
মাউন্টব্যাটেন ৮১, ১০৪-১০৭ ১৫১, ১৬৫, ১৯৪, ১৯৫, ২৮৪, ২৮৫, ৩৬৬, ৪১২
মাও-সে-তুং ৩৬৭, ৩৭০, ৩৭৬-৩৭৮, ৬৩৮, ৮০৯, ৮২৮
মার্ক্স ৩৬৪, ৩৭৫, ৪৩৩, ৮৩১
মাখন ঘোষ ২০
মাখন পাল ১৭৩
মাখনবালা সাঁতরা ৪৪৩
মানিক দত্ত ৭৮
মানিক হাজরা ৪২২
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৯, ৪২৩, ৬৩৯, ৮১১
মামা ফানসালকার ৩৮
মারুফ হোসেন ২৬২
মালেক ৬৩৪, ৭০০, ৭০৭, ৭০৮
মিহির মুখার্জি ২৮
মুকুল সেন ২৬২
মুকুন্দ দাস ১২
মুক্তকেশী মাঝি ৪২২, ৪৪৪, ৫৪৪
মুজফ্ফর আহ্মদ ১৭, ৭৭, ৮৩-৮৫, ১১৬, ২৫৮, ২৬৪, ২৬৬
মুনীর চৌধুরী ২৬২
মুসোলিনী ৫৭৫, ৮৪৫
মুহম্মদ হারিস ৩০
এম কে মিত্র ১৯
মৃণালকান্তি বসু ৭৯, ৮৩, ১৭৩
মেসবাহ্ কামাল ৪৩১
মৈত্রেয় ঘটক ৪৩১
মোতাহার হোসেন সুফী ৪৩১
মোরাব আলি ২৬
মোহিনী মণ্ডল ১৮

য

যতীন হাজং ২৩
যতীন মাইতি ৪২২
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (দেশপ্রিয়) ৪১০
যশোদাময়ী সর্দার ৪৪৩, ৫৪৫
যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য ২৬৭
যুগোল মালিক ৪৪৫
যোগেন গুপ্ত ১৯
যোগেন ২৪
যোগেন্দ্র সরকার ২৫
যোগীমোহন বর্মণ ২১

র

রজ সিং ২৩
রজনী কান্ত সেন ১২
রজনী পাম দত্ত ৭৬, ৪৩৩, ৮১৩, ৮৩২
রজনী সিংহ ৮৯
রঞ্জিৎ গুহ ২৬
রঞ্জিত গুপ্ত ২৬৫, ২৬৯, ৩৮৬, ৩৯৭
রণেন সেন ৭৬, ৭৭, ৮৫, ৮৬, ১৫০, ২৬৪, ৪২৭, ৬৩৪
রণদীভে, বি টি ৮১-৮২, ৮৫, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৯, ৬৪০, ৮১৫, ৮১৯
রতন প্রামাণিক ২৯
রতনলাল ব্রাহ্মণ ২৬৬
রথীন মৈত্র ১৬৯
রমণী দাস ১৮
রমেশ রায় ৭৪
রমেন সেন ১৯১
রমেন ব্যানার্জি ৪২০
রমেশ সেন ৬৩৭
রমানাথ মণ্ডল ৪৭৫
রবি মিত্র ৫৯৭, ৫৯৮
রবীন্দ্রগুপ্ত (ভবানী সেন) ৪৩১, ৪৩৩, ৫১৩, ৬৩৮-৬৩৯, ৬৪১, ৬৪২, ৮১১-৮১২, ৮২২-৮২৫, ৮২৭, ৮২৯-৮৩২, ৮৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২, ৩৩, ১৬১, ৪৩২, ৬৩৮-৬৪০, ৮০৫, ৮০৮, ৮৩১, ৮৩৬-৮৪৫
রসিদ আলি ১৬৪
রাখাল বাগ ৪৯২
রাজ বর্মণ ২৪
রাজমোহন শর্মা ২৬
রাজাগোপালাচারী ২৩৭
রাজেন সরকার ৮৩
রাজ্যেশ্বর রাও ১০, ১৬
রাণী মিত্র (দাশগুপ্ত) ৪৮৯, ৫১২
রাধা শ্যাম ২১
রাধাশ্যাম মন্ডল ২১
রাধানাথ ভট্টাচার্য ২৫
রামমোহন রায় ৬৩৭, ৮০৫
রামমনোহর লোহিয়া ৩০০
রামেশ্বর ৭৮
রাসমণি, 'বীরমাতা' ৩১, ৪২৫
রাসবিহারী ঘোষ ৪২২
রুবি চট্টোপাধ্যায় ৭২
রূপনারায়ণ রায় ৪৮৫
রেখা জৈন ৪৪
রেণু চক্রবর্তী ৪২৬, ৪৩১
রেণু চ্যাটার্জি ২১
রেবতী ৫৬৩
রেবতী দাস ২০
রেবতী ভট্টাচার্য ৮৯
রেবা রায় ৪০, ৪৫
রোম্যাঁ রোলাঁ ৬২৬
র‍্যাডক্লিফ ১০৭, ১০৮, ১১৮

ল

লক্ষ্মীময়ী দেবী ৪৪৩, ৫৪৫
লতিকা সেন ৪২৬, ৪২৭, ৬১৩
লাল ৭৫৩
লালমোহন হাজং ১৯
লালমোহন সেন ৩১
লালা শরদিন্দু দে ৭৫
লীলা লাহিড়ী ২৮
লেনিন ১০৯, ৩৪৬-৩৪৮, ৩৫১, ৩৫৩-৩৫৬, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৭৪, ৩৭৫, ৪৩৩, ৫৩০, ৬৩৬, ৮২০, ৮২১, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮৩১, ৮৩৪

শ

শঙ্খমণি ৫৬৩
শচীন বসু ৫০৬-৫১০
শচীন্দ্রলাল ঘোষ ৭৯
শম্ভু মিত্র ৪৪
শরত ৭১০
শরৎচন্দ্র দেব ২৫
শরৎচন্দ্র বসু ১০১, ১০২, ১৭৩, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৭৫
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬১
শশীশেখর রায়চৌধুরী ২৮
শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৯
শান্তি চক্রবর্তী ২০
শান্তি বর্ধন ৪১, ৪৪
শ্যামলাল ২৫
শ্যামসুন্দর দে ৮৫
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ১৮০, ২০৩, ২৮৬, ৫২১
শ্যামল চক্রবর্তী ৪০৮
শ্যামাচরণ ত্রিপাঠী ৪৯২
শিবরাণী মিত্র ৪২৫
শিবরাম মাঝি ৪৮৬, ৪৯৯, ৫৬৩
শিবশঙ্কর মুখার্জি ৮০
শিবেন চৌধুরী ৭৪, ৮৮, ৮৯
শিমলা বর্মনী ২৫
শিশির গাঙ্গুলী ২৬৬
শীতাংশু মৈত্র ৬৩৯
শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ২০
শ্রীদাম দাস ২৪
শেখ রওসন আলি ২৬২
শেখর ৭০৪, ৭০৫, ৭১৭
শেফালি নন্দী ৭২

শৈলেন চক্রবর্তী ১৭৩
শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২৫

ষ

ষ্ট্যালিন ৩৪৪-৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫১-৩৫৪, ৩৫৯, ৩৭৫, ৪৩৩, ৫১৮, ৬৩৬, ৬৩৮, ৮১৮

স

সতীন চক্রবর্তী ৮৩৫
সতীশ পাকড়াশী ২৬৬
সত্য গুপ্ত ১৭৮
সত্য প্রামাণিক ২২
সত্যজীবন ৪০, ৪৪
সত্যবালা বেরা ৪২৫
সত্যবালা দাসী ৪৪৩
সত্যেন গাঙ্গুলী ৬৪১
সত্যেন সেন (১) ৪৩১
সত্যেন সেন(২) (খুলনা) ৫০৯, ৫১০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ৮৩, ১৬৯, ২৬৭
সদানন্দ ৭৬৫
সর্দার ৭৫৭-৭৫৯, ৭৬১
সনৎ বসু ৫০৮, ৮৩৫
সনৎকুমার রাহা ২৬৬
সন্তোষ চক্রবর্তী ১৯
সন্তোষ রায় ৪৪৫
সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় ৭২
সর্বেশ্বর ডালু ৪৯৮
সমীর দাশগুপ্ত ৮৬
সমীরণ ৭৪৯, ৭৮২
সমীরুদ্দিন ৪৮৬, ৪৯৯, ৫৬৩
সরোজ ভট্টাচার্য ৮৮
সরোজ মুখার্জি ৭৭, ৮৫, ৮৮
সরোজ রায় ৭৮, ৪৯২
সরোজিনী দাসী ৪৪৪, ৫৪৪
সলিল চৌধুরী ১৩
সহদেব মণ্ডল ৫০৬, ৫০৮
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ১৬৯
স্বরূপা দেবী ২৯
সাধন সেন ২৪
সাধন বাগ ৪৪৩, ৫৪৫
সাধু ৭১০
সাজ্জাদ জাহির ২৬২
সাবিত্রী দেবী ১৯
সামসুদ্দীন ১৯
সারথি ২৯
সিন্ধুময়ী দাসী ৫৪৫
সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ৭২
সিরাজুল হক ২৮
সীতারাম ৬৩৪, ৭০০, ৭০৮
সীতারাম ব্যানার্জি ৬৩৭
সুকুমার ব্যানার্জি ১৭
সুখেন্দু গোস্বামী ৮৩
সুধাকর দাস (সতু) ৭৪৬
সুধাংশুশেখর সিংহ ২৯
সুধাংশু চক্রবর্তী ৩১
সুধাংশু দাশগুপ্ত ৪২০
সুধাময়ী সাঁতরা ৪৪৩, ৫৪৫
সুধীর উকিল ৩১
সুধীর ঘড়ুই ৪৪৪, ৫৪৪
সুধীর নায়েক ৪৪৫, ৫৪৪
সুধীর সর্দার ৪৪৫, ৫৪৪
সুন-ইয়ত-সেন ৩৮২
সুনীল পাল ৪৪৫
সুনীল সেনগুপ্ত ৪২০
সুনীল নাগ ২৪
সুনীল পান্থ ২৮
সুনীল রায় ৮৩
সুনু ঘোষ ৫০৮
সুবল মাঝি ৫৪৪
সুবল মিত্র ৪২৩. ৪৩১, ৫০৬
সুবীর দত্ত চৌধুরী ২৬২
সুবীর পোদ্দার ১৯
সুভাষ নাগ ১৯
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৬৯, ৪২০, ৪২৩

সুভাষচন্দ্র বসু ১৭, ৪১০
সুরাবর্দ্দী, সৈয়দ ৭৬, ৮০, ১০১, ১০২
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ২৮
সুরেন দত্ত ২৩৩
সুরেশ চক্রবর্তী ২১
সুরেশচন্দ্র মজুমদার ১৭
সুরেন্দ্র হাজং ৩১
সুরেন মণ্ডল ৪৪৪, ৫৪৪
সুরেন মিস্ত্রি ৪৪৪, ৫৪৬
সুরেশ দাস ৬৩২, ৬৭৪, ৬৭৫
সুশীল কৃষ্ণ সেন ৪২৩, ৪৩১, ৪৮৩
সুশীল জানা ১৬৯, ৪২৩
সুশীল ধাড়া ৬০৪
সুশীল মুখার্জি ৮৪
সুশোভন (অমিত সেন) সরকার ৬৩৯
সূর্য সেন ১৮৪
সূর্য (ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত) ৭১০, ৭৪৬, ৭৫৭, ৭৫৯, ৭৬১, ৭৯০
সৃজনেশ্বরী ২৬
স্নেহাংশু কান্ত আচার্য ৭৭, ১১৬, ১৭৩
সোমনাথ লাহিড়ী ১০, ৭৭, ৭৯, ৮৩, ৮৪, ১১৬, ২৫৭, ২৬৪, ২৬৬, ৪২৭
সোমেন চন্দ ১৮
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৮, ১৬৬, ১৭৭
সৌরি ঘটক ৪৮৯
স্রাফ আলি ৪৫

হ

হরনাথ মণ্ডল ৪৯৬
হরি ৭৫৩
হরিপদ সিকদার ১৮
হরিসাধন চক্রবর্তী ৪৯২
হরিপদ কুশারী ৫১১
হরুবালা রায় ২৪
হরেকৃষ্ণ কোঙার ২৬৬
হরেন ৬৩৪, ৭১০
হসরত মোহানি ২৫১
হাজী মহম্মদ দানিশ ৪৮৮
হাবুল লেট ৪৪৫, ৫৪৪
হামিদ ৭৮২
হারজেন ৮৩১
হিটলার ৯১, ২৪৭, ২৫৩, ৩৬৫, ৪৩৫, ৫৭৫, ৭৯৯
হিমাংশু বিশ্বাস ২৫
হিমাংশু চক্রবর্তী ৫১১
হিরন্ময়ী ব্যানার্জি ৪৪৩
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩, ৭৭, ১১৬, ১৬৯, ২৬৭, ৮১৪
হেম নস্কর ৪৭৫, ৪৭৬
হেমচন্দ্র ঘোষ ১৭৩
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ৮৩
হেমন্ত সরকার ২৫
হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৩, ৮৫
হেমেন্দ্র চক্রবর্তী ২৫
হো-চি-মিন ৭৬
হৃদয় শুক্লদাস ২৫
হৃদয়ভূষণ চক্রবর্তী ৪৭৫
হ্যারি পলিট ২৬৩, ৩১৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অজয় ভবন গ্রন্থাগার, সি পি আই অফিস, দিল্লী
ভবানী সেন গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র, ভূপেশ ভবন, কলকাতা
মুজফ্ফর আহ্মদ পাঠাগার, গণশক্তি ভবন, কলকাতা
জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা
রাজ্য লেখ্যাগার, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ
আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের গ্রন্থাগার
নরহরি কবিরাজ
দিলীপ ব্যানার্জি
শোভনলাল দত্তগুপ্ত
সুনীল মুন্সী
দেবকুমার বসু
দেবাশিস দত্ত
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুণ ঘোষ
গোপাল ঘোষ
গৌতম নিয়োগী
দীপিকা বসু
বন্দনা ভট্টাচার্য
প্রদীপ বক্শী
বালকৃষ্ণান, দিল্লী
প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
মিন্টু দত্ত

সহায়ক তথ্যের প্রাপ্তি এবং সেগুলির ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।